দশটি উপন্যাস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেখকের অন্যান্য বই

নগরপারে রূপনগর
অপরিচিতের মুখ
কাল, তুমি আলেয়া
চলাচল
পঞ্চতপা
শিলাপটে লেখা
সাতপাকে বাঁধা
স্বয়ংবৃতা
রাত্রির ডাক
বকুল বাসব
অলকাতিলকা
আশ্রয়
সাঁঝের মল্লিকা
বাজীকর
নবনায়িকা
সমুদ্রসফেন
দিনকাল
চলাচল (নাটক)
মালবী মালঞ্চ
শতরূপে দেখা
শ্রেষ্ঠ গল্প
বলাকার মন
রোশনাই
নতুন তুলির টান
পরকপালে রাজারানী (১ম/২য)
এক রমণীর যুদ্ধ
সজনীর রাত পোহাল
সবুজতোরণ ছাড়িয়ে
আবার আমি আসব
হীরামঞ্জিল
দিনকাল
খনির নতুন মণি
রূপের হাটে বিকিকিনি
সিকেপিকেটিকে
পিন্‌ডিদার গপ্‌পো
নিষিদ্ধ বই
আরো একজন
বাসক শয়ন
ফয়সালা
পুরুষোত্তম
মেঘের মিনার
দুটি প্রতীক্ষার কারণে
আনন্দরূপ
মন মধু চন্দ্রিমা
প্রণয়পাশা
রাগশর
দ্বীপায়ন
চলো, জঙ্গলে যাই
হৃদয়ের পথে খুঁজো
প্রতিবিম্বিতা
যার যেথা ঘর
আমি সে ও সখা
সেই আমি সেই তুমি
দু'জনার ঘর
নগশৃঙ্গার
উত্তর বসন্তে
অন্য নাম জীবন
জানালার ধারে
সাবরমতী
বিদেশিনী
আলোর ঠিকানা
একজন মিসেস নন্দী
প্রতিহারিণী

ভূমিকা

বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকের কথাশিল্পী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য পরিচিতি নতুন করে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। উনিশশো পঞ্চাশ থেকে উনিশশো উননব্বই—প্রায় চল্লিশ বছর ধরে, জীবনের শেষতম দিনটি পর্যন্ত অবিরাম লেখনী-কর্ষণে উৎপন্ন হয়েছে যে বহুমুখী সোনালি ফসলের সম্ভার, তার থেকেই কুশলী নির্বাচনে চয়ন করা হয়েছে বিভিন্ন স্বাদের দশখানি উপন্যাস। জনপ্রিয়তার নিরিখে অতি আদরণীয় এই দশ-কাহনের কাহিনীদশক যথাক্রমে 'যার যেথা ঘর', 'আমি সে ও সখা', 'অপরিচিতের মুখ', 'প্রণয় পাশা', 'আনন্দরূপ', 'মেঘের মিনার', 'ঝংকার', 'হৃদয়ের পথে খুঁজো', 'সাবরমতী' এবং 'আশ্রয়'। যার মধ্যে 'আমি সে ও সখা' এবং 'সাবরমতী' চলচ্চিত্র হিসেবেও অত্যন্ত জনপ্রিয়; এবং 'যার যেথা ঘর' ও 'অপরিচিতের মুখ' ইদানীং ছোটপর্দায় সাফল্যের সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে 'সাহিত্যের সেরা সময়'-এর অন্যতম সেরা উপাখ্যান হিসেবে। অবশিষ্টের কয়েকটি বেশ কিছুকাল যাবত অপ্রকাশণার কারণে লোকচক্ষু থেকে হারিয়ে যেতে বসেছিল। এই সংকলন এই সবকটির সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল উদ্ধার।

কালের নিয়ম মেনে একসময় চলে যান কথাশিল্পী। কিন্তু অনুরাগী পাঠকের জন্য চিরকালের জন্যে রেখে যান তাঁর সৃষ্টি-সম্ভার—যা কখনো পুরনো হয় না, যার শরীরে কখনো লাগে না বয়সের ভার। সেই নিয়মেই সুপ্রাচীন অথচ চিরনবীন এই দশখানি উর্বশী-যৌবনা উপন্যাস নতুন করে আশুতোষ সাহিত্যপ্রেমী পাঠকের দরবারে পেশ করা হল তাঁদেরই চাহিদা এবং ভালোবাসায়।

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

এতে আছে

যার যেথা ঘর

উৎসর্গ

শ্রীসুকমল ঘোষ

অগ্রজভাজনেষু

আমি যা হতে পারতুম তা হইনি। কাহিনি বলুন, গল্প বলুন, এটুকুই সব। এটুকুই শেষ।

শুরুতেই এই শেষের আঁচড় বর্ণশূন্য লাগার কথা। বর্ণ মানে যদি রঙের চটক হয়, তাহলে তাই লাগবে। কিন্তু, মুখ দেখাবার আগে যে সূর্যটা স্লেট-রঙা পুবের আকাশের পরতে পরতে লালের পিচকিরি ছোটায়, আর বিদায়ের পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমের আকাশে নরম আবির ছড়িয়ে রাখে—রং বলতে সেটুকুই যদি বেশি মনে ধরে, তাহলে বর্ণশূন্য নাও লাগতে পারে।

...আমি যা হতে পারতুম তাতে রঙের চটক আছে। আর, তা না হওয়ার মধ্যে রঙের প্রসাদ আছে।

কিন্তু সূর্যের কি শুধু রং নিয়ে কারবার? শুধু রং ছড়ানো কাজ? সে জ্বলে না? দগ্ধায় না? জ্বলুনি যখন মধ্যগগনে, তার আলোও তখন অসহ্য লাগে না?

জ্বলে। দগ্ধায়। অসহ্য লাগে। কিন্তু একমাত্র সে-ই সব কালো সব অন্ধকার চেটেপুটে খায়।

মেয়েদের জীবনে একটি সূর্য দরকার। একজন সূর্য দরকার। যে রং ছড়াতে জানে, জ্বলতে জানে, দগ্ধাতে জানে। কালো দূর করতে জানে। দরকার যে, তার নজির আমি। আমি যা হতে পারতুম তা হইনি।

কি হতে পারতুম, আমি আর তা ভাবতে পারি না, ভাবতে চাই না। ভাবতে গেলে আমার সর্ব অঙ্গে কাঁটা দেয়। আমার কাহিনি বলুন, গল্প বলুন এটুকুই সব। এটুকুই শেষ।

তবু এটুকুই জনে-জনের কাছে ঘোষণা করার একটা তাগিদ প্রায়ই অনুভব করি। বিশেষ করে সেই মেয়েদের কাছে যারা আমারই মতো ভুলের বীজ বুনে খাঁটি ফসল আশা করে।

আগে আমার চিত্রটা একটু স্পষ্ট হোক। আমার নাম আরতি। আরতি বসু। আগে মিত্র ছিলাম, পরে বসু হয়েছি। বসু-মিত্রের যোগটা আত্মীয়-পরিজনেরা নানা জনে নানা চোখে দেখেছে। সে কথা থাক। আমার বয়েস এখন তেত্রিশ। এ-বয়েসটা এখন খুব বেশি লাগে না। পাঁচ বছর আগেও ওটা তিরিশের দিকে গড়াচ্ছে দেখে মেজাজ খারাপ হত। সেই গড়ানোটা অপরের চোখে স্পষ্ট না হয়ে উঠতে দেবার সঙ্গোপন আর সক্রিয় তাগিদও একটু ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্থূল আত্মদর্শনে আর সুচারু প্রসাধনে আমার অনেক সময় কেটে যেত। কিন্তু এখন একজনের কাছে অন্তত 'বুড়ী হয়ে গেলাম আর কেন' গোছের কথা বলতে বাধে না।

সেই একজন আমার ঘরের লোক। নাম সুনন্দ বসু। তার বয়েস চল্লিশ। আমার থেকে সাত বছরের বড়ো। বড়ো হলেও আগে অনেকের সামনেই দিব্বি নাম ধরে ডাকতে পারতুম। এই ডাকার মধ্যে আধুনিকতার গর্ববোধটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠত। আর একজনের সেটা পছন্দ হত কি হত না, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ ছিল না। কিন্তু এখন আর নাম ধরে ডাকতে পারি না। আর, এই না-পারার মধ্যেও যে বেশ একটু আনন্দ আছে সেটুকু যারা অনুভব করতে পারে তারাই জানে।

বউয়ের নিজের মুখে বয়সের কথা শুনলে আর পাঁচজন স্বামী-ভদ্রলোক কি বলে, কি জবাব দেয়? ছদ্ম কোপে চোখ রাঙায়, নয় তো নিজেকে ঢের বেশি বুড়ো বলে জাহির করে।

কিন্তু আমার ভদ্রলোক কিছুই করে না। একটু ভারী দুই ঠোঁটের কোণে সামান্য কৌতুক ঝিলিক দেয়, আর সাদামাটা চোখের দৃষ্টিটা আমার দিকে আর একটু মনোযোগী হয়। তাইতেই একটা অস্বস্তিকর লজ্জায় আমার কান গরম হয়। মুখও লাল হবার কথা, কিন্তু আমি তেমন ফর্সা নই। ওই কৌতুক আর ওই মনোযোগ পুরুষেরই বটে।

শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়িনি। আমার ঠাকুমার দৌলতে শাস্ত্রোক্তি কিছু শোনা আছে। কথায় কথায় তার শাস্ত্রবচন আমাদের কখনো কৌতুকের খোরাক যোগাতো, কখনো বা কানের পরদা বিদ্ধ করত। ঠাকুমা বুড়ী বলত, পুরুষ একজনই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বিনা আর পুরুষ নেই। আমার তখন চোদ্দ বছর বয়েস হলেও বেশ পাকাপোক্ত মেয়ে আমি। ঠাকুদার বড়ো ছবিটা দেখিয়ে চোখ রাঙাতাম, বলতাম, ওই বুড়োটাও যদি মেয়ে, তোমার সংসারের এত ডাল-পালা গজালো কি করে?

ঠাকুমা হাসত। হাসিটা ভারি তৃপ্তির হাসি মনে হত আমার। ঠাকুমার পাঁচ ছেলে পাঁচ মেয়ে। বলত, কৃষ্ণের অংশ তাই কিছুটা পুরুষই বলতে হবে। ঠাকুমার রসনা এক-এক সময় বেশ রসিয়েও উঠত। বলত, গেছে হাড় জুড়িয়েছে, নইলে বাড়ি ভরতি তোদের মতো ডবকা ছুঁড়ীগুলোকে কি আস্ত রাখত! ওই কেষ্ট ঠাকুরের স্বভাব চরিত্তির তো আমার জানতে কিছু বাকি নেই।

এও যে এক ধরনের অনুরাগের কথা সে আমরা খুব ভালোই জানি। অনেক দিনের কথা, এখনো মনে আছে ঠাকুরদা চোখ বুজতে ঠাকুমা তিনদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল।

নিরক্ষরা ঠাকুমার শাস্ত্রবচন এখন আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। মাঝে মাঝে কেন, প্রায়ই মনে পড়ে। মনে হয়,...দুনিয়ায় পুরুষ কি সত্যিই খুব বেশি আছে? আর, সব মেয়ের জীবনেই কি সেই পুরুষ আসে?

যা বলছিলাম, আমার বয়সের প্রসঙ্গে লোকটার পুরু ঠোঁটের ফাঁকে কৌতুকের আভাস আর চোখের দৃষ্টিতে মনোযোগ দেখেই যে অস্বস্তিকর লজ্জায় আড়াল খুঁজি আমি তাই নয়। তক্ষুনি সেই ঠোঁটকাটা ডাক্তারের কথা মনে পড়ে যায়। কি লজ্জা, কি লজ্জা। মনে পড়লে এখনো ঘেমে উঠি। ব্যাপারটা বলি।

কাজ নেই কর্ম নেই ইদানীং বড়ো বিচ্ছিরি লাগত আমার। মনে হত সংসারের যে চাকাগুলো কাদায় পড়ে গেছে সেগুলো আবার টেনে তোলার তাড়নায় একলা একটা মানুষ দিনরাত হিমশিম খাচ্ছে—তার পাশে আমি যেন বড়ো বে-খাপ্পা রকমের বেকার। শুধু তাই নয় সংসারের ওই চাকাগুলো কাদায় পড়ে যাবার মধ্যে আমারও বেশ খানিকটা বিকৃতি ছিলই। আমার ধারণা বর্তমানের এই পরিস্থিতি সবটাই সেই কারণে। আর একজন এখন সে-কথা স্বীকার করুক, না করুক, এই সত্যটার দিক থেকে আমি একেবারে চোখ ফিরিয়ে থাকতে পারি নে। হয়ত এ-সব কারণেই মাঝে মাঝে একটা বিষণ্ণ ভার আমার মধ্যে চেপে বসছিল। তখন কিছু ভালো লাগে না, মাথা ধরে। এক এক সময় মনে হয়, খুব নিরিবিলিতে সকলের অলক্ষে বসে একটু কাঁদতে পারলে বেশ হত।

কিন্তু মনের এই ইচ্ছে তো কারো কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিনি কখনো! তবু জানল কি করে? রোজ ফিরতে যেখানে রাত হয়, সেদিন সন্ধ্যার অনেক আগেই বাড়ি ফিরল মানুষটা। বলল, এক জায়গায় যাব, রেডি হয়ে নাও।

আমি মনে মনে একটু অবাক হলাম, কিন্তু কোথায় যেতে হবে নিজে থেকে বলল না যখন আমিও কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। আমার ব্যবহারের এই পরিবর্তন নিজের কাছেই প্রায় বিস্ময়কর। কিন্তু এ পরিবর্তন আপনিই এসেছে, চেষ্টা করতে হয়নি। আগে হলে পাঁচ বার জেরা করতাম, সঙ্গে নিয়ে বেরুবার উদ্দেশ্য পছন্দ না হলে তক্ষুনি বাতিল করে দিতাম। আর তার মধ্যেও বিরক্ত আর বিতৃষ্ণার ঝাঁঝই বেশি থাকত।...আর আগে হলে ওই লোক ঠিক এভাবে বলতও না।

শুধু জিজ্ঞেস করলাম, আমি একা না ওরাও রেডি হবে?

ওরা বলতে আমার দুই মেয়ে রুমু ঝুমু। রুমুর বয়েস দশ, ঝুমুর সাত। আমার এক-একসময় মনে হয় এরই মধ্যে ওরাও বাপের স্বভাব পাচ্ছে। আগে এ-কথা মনে হলে রাগে গা রি-রি করত। ...এখন আবার সেই ঠাকুমার কথাই মনে পড়ে। ঠাকুমা বলত, পিতৃধারার কন্যা সুখী। ঠাকুমা তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

হাতের কাগজ-পত্র রাখতে রাখতে জবাব দিল, না, ওরা বাড়িতেই থাক।

খাবার-টাবার দিয়ে আমার কাপড় বদলে আসতে একটু দেরি হচ্ছে দেখেও বিরক্তি বোধ হয়! এখন এ বিরক্তি দেখতে আমার মজাই লাগে। হাতে কাজ থাকলে কারো বিরক্তি-টিরক্তির ধার ধারি না, ফাঁক পেলে আমিও তা বেশ জোর দিয়েই বুঝিয়ে দিই। আশ্চর্য, জোর যে আমার আগের থেকে ঢের ঢের বেড়েছে তাতে আমার নিজেরও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শাড়ি বদলাতে দেখে মেয়েরা দৌড়ে এসেছিল।—মা বেরুচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—আমরা?

—তোমরা বাড়িতেই থাকবে। কোনো কাজ-টাজ আছে বোধহয় তাই যাচ্ছি।

ব্যস ওরা ওতেই ঠাণ্ডা। একবারও জিজ্ঞেস করল না কি কাজ, কোথায় কাজ, বা কখন ফিরব। দশ বছরের রুমু এরই মধ্যে বেশ পাকা মেয়ে হয়ে উঠেছে। এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে বসে আমার শাড়ির পিছনটা টান-টোন করে দিল।

বাড়ির সামনেই ট্রাম। ট্রামের অপেক্ষায় দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। কিছুদিন আগেও আমাদের ভালো গাড়ি ছিল একটা। এখন নেই। গাড়ি না থাকাটা একসময় নিজের দুটো পা না থাকার মতোই ভাবতুম আমি। গাড়ি গেল মানে মান-সম্ভ্রম গেল, ভাবতুম। কিন্তু নিজের দুটো পায়ের ওপরই ভরসা করতে এখন বেশ লাগে। ভরসা করার মতো তেমন সুযোগ সুবিধে পাইনে বলেই এখন মাঝে মাঝে ওই পাশের লোকের ওপর রাগ হয় আমার। সে দিব্বি পারে ভরসা করতে। আর আমার বেলায় ট্যাক্সি করতে চায়। বকে ঝকে এই চাওয়াটা বাতিল করা গেছে।

ট্রামে পাশাপাশি বসে খানিকটা যাবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোথায় যাচ্ছি?

আমার সেই ডাক্তার বন্ধুর ওখানে।

সেই ডাক্তার বন্ধু অর্থাৎ রণেন দত্ত। গাইনকোলজির মস্ত ডাক্তার এখন। মস্ত অবস্থা। নিজের গাড়ি নিজের বাড়ি নিজের নার্সিং হোম। শোনা মাত্র ভিতরে ভিতরে আমি কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম একটু। দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর অবস্থার এখন অনেক ফারাক বলে নয়। ওই ডাক্তারের ওপর আমি ভয়ানক বিরূপ ছিলাম একসময়। বিরূপ তখন আমার ঘরের লোকের সংস্পর্শের সকলের ওপরেই ছিলাম। তার মধ্যে ওই ডাক্তারের ওপর আরো বেশি রাগ ছিল, তার কারণ, বছর কয়েক আগে ভদ্রলোকের বিয়ে উপলক্ষ্যেই এক মর্মান্তিক মানসিক বিপর্যয় ঘটে গেছল আমার। শুধু আমার কেন, এই পাশের মানুষেরও।

...সে ঘটনা না ঘটলে আমার দ্বিতীয় মেয়ে ঝুমু এই পৃথিবীর আলোর মুখ দেখত কিনা জানি না। দেখত না ভাবলেও যন্ত্রণায় আমার গা শিরশির করে এখন। বড়ো মেয়ে রুমু যে শোনায়, আমার থেকে ঝুমুকেই তুমি বেশি ভালোবাসো—সত্যিই ও কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব দেখে কিনা আমি জানি না। যাক, এ-সব পরের প্রসঙ্গ। ওই ডাক্তারকে যে আমি সুনজরে দেখতাম না সেটা সেই ভদ্রলোকও জানে। রুমু যখন হয় তখন আমি বাপের বাড়িতে। ঝুমুর বেলায় নিজের বাড়িতে এই ডাক্তারের ডাক পড়েছিল। আমাকে না জানিয়েই তাকে ডাকা হয়েছিল। দেখেশুনে আর উপদেশ দিয়ে সে চলে যেতেই আমি ফুঁসে উঠে বলেছিলাম, এ ডাক্তারের হাতে আমি থাকব না, আর, ফের বাড়িতে আমাকে দেখতে আসবে তাও চাই না!

সুনন্দ (লিখতে যখন বসেছি নাম না নিয়ে আর করব কি?) পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, কেন? বিলেতফেরত ডাক্তার...

এ-কথা শুনে কি রাগ যে হয়েছিল আমিই জানি। কেন সেটা তার থেকে ভালো আর কে জানত? দু'চোখে ওই নির্লিপ্ত মুখ ঝলসে দিয়ে বলেছিলাম, আমার খুশি, আবার কেন কি? ফের ওকে ডাকলে তুমি অপমান হবে।

ডাকেনি। অন্য ডাক্তার এসেছিল, অন্য নার্সিং হোমে ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু অনেক দিন খবর না পেয়ে ওই রণেন দত্ত নিজে থেকেই এসে উপস্থিত একদিন। খানিকটা ভারী মাস তখন, আমি আড়ালেই ছিলাম। তা না হলেও আড়াতেই থাকতাম। কিন্তু কান সজাগ ছিল। বন্ধুর উদ্দেশ্যে তাকে বলতে শুনলাম, খবর-বার্তা নেই কি ব্যাপার?

এদিকের ঠাণ্ডা জবাব কানে এলো, খবর দেবার উপায় নেই, তোর হাতে থাকতে চায় না। অন্য ডাক্তার দেখছে, অন্য নার্সিং হোমে ব্যবস্থা হয়েছে।

—বলিস কি! এ হতভাগা কি দোষ করল? আচ্ছা ডাক তো তোর বউকে।

—থাক, ডাকলে নাও আসতে পারে।

—সে কি রে! একটু-আধটু মাথা বিগড়েছে নাকি তোর বউয়ের?

—একটু-আধটু নয়, অনেকখানি।...অনেক দিন বিগড়েছে।

এই উক্তি কানে যাবার পর আমি কি আর আমাতে ছিলাম? আমি সটান পাশের ঘরে ঢুকে গেছলাম, ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসেছিলাম। ঘরের লোক না হোক আমাকে ওভাবে ঢুকতে দেখে বা বসতে দেখে তার ডাক্তার বন্ধু বিলক্ষণ সচকিত হয়েছিল। আমি চাপা ঝাঁঝে বলেছিলাম, মাথা বিগড়োলে তার সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলা যায় না, না ডাকলেও এসে হাজির হতে পারে। শুনুন, আপনার বন্ধুর টাকা-কড়ি আছে—আর, আপনি বিলেতফেরত হলেও নতুন বিশেষজ্ঞ, তার ওপর বন্ধু বলে টাকা-কড়ি নেবেন না, এ অবস্থায় ঠিকমতো যত্ন-আত্তি করবেন কিনা কে জানে—এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই উনি ডাক্তার বদল করেছেন।

শুনে ভদ্রলোক যেমন অবাক তেমন বিব্রত। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু এত বড়ো মিথ্যাচারের পরেও সেদিন এই একজনের গম্ভীর মুখে একটা আঁচড় পড়তে দেখিনি। ভদ্রলোক চলে যাবার পর শুধু বলেছিল, ও আমাকে অনেককাল চেনে, তুমি আসার আগে আমি ওকে যা বলেছি সেটাই সত্যি ভেবে গেল।

—কি ভেবে গেল, পাগল ভেবে গেল?

—অনেকটা।

শুনে আমি কি করেছিলাম? চেঁচামেচি করে পাগলের মতোই আমি ঘরের ছাদ নামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

সেই ডাক্তারের কাছেই চলেছি শুনেও সঙ্কোচ সামলে নিলাম।—হঠাৎ সেখানে?

—অনেক কাল দেখা হয় না, চলোই না।

আমাদের দেখে ডাক্তার রণেন দত্ত একটুও অবাক হল না, খুশীমনে অভ্যর্থনা জানালো। মনে হল, আমারা আসছি সেটা টেলিফোনে তাকে জানিয়ে রাখা হয়েছিল। ঘরে রোগিণী ছিল না, ধপধপে সাদা পোশাকের দুই-একজন নার্স এক-আধবার এসে এটা ওটা জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছিল।

অন্তরঙ্গ কুশল বিনিময়ের পর চা এলো। আমার কেমন ধারণা হল, অনেক কাল দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও আমাদের সব খবরই ভদ্রলোক রাখে। একটু বাদে এখানে আসার উদ্দেশ্য বোঝার পর আমি অবাক। ডাক্তার আমার শরীরের খোঁজ-খবর নিতে লাগল। কখন কি খাই, হজম হয় কি না, সকাল-দুপুর-বিকেল রাত্রির কখন কি করি, কখন ভালো লাগে কখন খারাপ লাগে, মাথাটাথা ধরে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। উঠে কাছে এসে একবার চোখের পাতা টেনে দেখল, আঙুলের ডগা টিপে রক্তের লালচে আভা পরীক্ষা করল। জিভও দেখাতে বলল।

আমি হেসে ফেলে তাও দেখালাম। বললাম, আসলে আমার ভেঙচি কাটতে ইচ্ছে করছে। কি ব্যাপার বলুন তো, আমি রোগী নাকি?

হাসিমুখে ডাক্তার জবাব দিল, কোনো রোগ লুকিয়ে আছে কিনা আমার বন্ধুর সেই দুশ্চিন্তা। প্রায়ই মন খারাপ করেন শুনলাম, ঠিকমতো খান-দান না, মাথা ধরে—অন্য ঘরে যাবেন, না এখানে বসেই কি হয় না হয় খোলাখুলি বলবেন?

আমি সকোপে একবার পাশের লোকের দিকে তাকালাম। ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানে না এমন মুখ। জবাব দিলাম, কোথাও যেতে হবে না, এখানে বসেই আগে আপনার বন্ধুর মাথাটা পরীক্ষা করুন।

ডাক্তার হাসতে লাগল। কিন্তু ওদিকে নির্বিকার মুখ। তার বন্ধুর দিকে চেয়েই সে বলে বসল, আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ও একলা বসে কাঁদে পর্যন্ত, এক-একদিন মুখ-চোখ কেমন ফোলা-ফোলা দেখি।

সত্যিই রাগ হচ্ছিল আমার, সেই সঙ্গে লজ্জায় মাথাও কাটা যাচ্ছিল। বললাম, ঘুমুলেও তো চোখ মুখ ফোলে, খামোকা কাঁদতে যাব কেন?

জবাব দিল না। আমার দিকে তাকালও না। বন্ধুকে বলল, ঘুম কেমন হয় জিজ্ঞেস কর দেখি।

ডাক্তার হাসছে মুখ টিপে।

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, দিন-রাত শুয়ে বসে ঘুম হবে কি করে?

ঠাকুমা গো,তুমি লেখা-পড়া জানো না, তোমার বিদ্যেবুদ্ধি নেই, কিন্তু মুখে তোমার আলো হাসত সর্বক্ষণ—সেই তুমি বলতে তোমার ছেলের ঘরের সব নাতনিদের মধ্যে এই মেয়েটা উমার তপস্যা করে এসেছে, শিবের ঘরে যাবে ঠিক—বিয়ের পরেও এই নিয়ে তোমার আত্মার উদ্দেশ্যে কত কটূক্তি করেছি ঠিক নেই—এখন তো স্বর্গে বসে সব দেখছ আর হাসছ তুমি—তোমার আশীর্বাদ বুকে আঁকড়ে আছি, কিন্তু আমার ভয়টা শুধু ভয়ই তো? তার বেশি কিছু নয় তো?

কতক্ষণ চুপচাপ ছিলাম দুজনেই জানি না। দরজার বাইরে লাঠির ঠুক ঠুক আওয়াজ। ও-ই দরজার দিকে ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়ে হেসে বলল, ওই আসছে বুড়ো, উপদেশ কাকে বলে বুঝিয়ে ছাড়বে'খন।

বেঁচে গেলাম যেন আমি। কারণ বুকের তলার ঢেউটা চোখের দিকে ঠেলে উঠছিলই। যিনি এলেন তিনি দাসমশাই। আমাদের নীচের তলার এক ঘরের ভাড়াটে। দোতলার এই তিনটে ঘর ছাড়া বাড়ির সবটাতেই ভাগে ভাগে ভাড়াটে বসানো হয়েছে এখন। কিন্তু দাসমশাই সকলের পুরনো সর্বপ্রথম ভাড়াটে। যখন বাড়ির কোনো অংশের ভাড়া দেবার কোনো প্রশ্নই ছিল না, তখনকার। ঘরের এই গোঁয়ার লোকের প্রশ্রয়ে বাইরের একজোড়া উটকো বুড়োবুড়ি ছ'বছর আগে নীচের তলায় একটা ঘর দখল করে বসতে আমার মাথায় আগুন জ্বলেছিল। এতে সমাজের পরিচিত মানুষদের কাছে আমার মান-সম্ভ্রম যেন কয়েক ধাপ নেমে গেছল। আর তারপর নানা কারণে সেই আক্রোশ ভুলতে আমার কম সময় লাগেনি। কিন্তু এও পরের বৃত্তান্ত।

লাঠি ভর করে ভুবন দাস চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে আমার শাড়ির আঁচল মাথায় উঠেছে। আগে উঠত না এখন ওঠে। আমাদের দুজনকে এক ঘরে দেখেই একগাল হাসি। কেন এসেছেন তাই ভুলে গেলেন বোধহয়। এমন একখানা আস্ত হাসি আমি বোধহয় কম দেখেছি। (আগে তো ওই হাসিই আমার চক্ষুশূল ছিল—বুড়োবুড়ি দুজনেরই) দাসমশাই খুশিমুখে বললেন, দুজনেই একসঙ্গে আছ দেখছি, তাহলে আমি যাই।

আমি লজ্জা পেলেও আমার সামনের লোক সিরিয়স। বলল, যাবেন কেন, আমাদের দুজনের মধ্যে আপনি কাকে একলা পেতে চেয়েছিলেন—আমাকে নিশ্চয়?

বুড়ো তক্ষুনি মাথা দোলালো।—না তো, বউমাকে...

ও—। গম্ভীর।—তাহলে আপনি তাকে নিয়েই থাকুন, আমি বরং যাই।

—না বাবা, না! দাসমশাই ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলেন। তারপরেই সেই হাসি। বললেন, দুজনের মধ্যে তৃতীয় জন নাক গলালেই গণ্ডগোল, বুঝলে বাবা? বড়ো অসময়ে এলাম দেখছি, আমি যাই।

আমার ভ্রূকুটির নিষেধ সত্ত্বেও বাবাটি আর এক দফা তাকে নিয়ে পড়ল। আপনি এলে কি আর গণ্ডগোল, আপনি ঠিকমতো চোখে দেখেন, না কানে শোনেন?

আশি বছরের বুড়োর রসের উৎসে নাড়া পড়ল যেন একপ্রস্থ। আর জলবৃন্তের মতো সেই খুশিটা যেন বড়ো হয়ে স্থবির দেহতট ছুঁয়ে ছুঁয়ে দন্তহীন মুখ-গহ্বরে আশ্রয় নিতে লাগল। সেই খুশির জোয়ারে নিজেই বিহ্বল খানিক। তারপর টেনে টেনে বললেন, আসল দেখার আর আসল শোনার যেটুকু তার সবই দেখি রে বাবা, সবই শুনি। বাজে জিনিস দেখে আর বাজে জিনিস শুনে চোখ-কান নষ্ট করে কি হবে? ঝুলনে রাধা-কেষ্ট দোলে যখন তখন ঠিক দেখি, আর কুঞ্জতলে মুরলী আর রাধার পায়ে নূপুর বেজে ওঠে যখন, তাও ঠিক শুনি।

—ও। সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের কোমরে দু'হাত। আবারও আলটাবে ঠিক জানি। ইশারায় আমি চেষ্টা করছি যাতে চুপ করে থাকে। কিন্তু কার কথা কে শোনে। বলল, তা ঘরে ঢুকে পড়ে কি দেখলেন আর কি শুনলেন? রাধা-কেষ্ট ঝুলনে দুলছে, আর কুঞ্জতলে মুরলী আর রাধার পায়ে নূপুর বাজছে?

আঃ! গলা দিয়ে আমার অস্ফুট একটা স্বরই বেরিয়ে গেল!

আর তাইতেই জোরে হেসে উঠেও দাসমশাই থেমে গেলেন। ছদ্ম রাগের সুরে বললেন, তুই ছোঁড়া বড়ো ডেঁপো হয়েছিস—দেখিস না মা-জননী আমার লজ্জা পাচ্ছে!...আমি যাই গো মা, নইলে এই বিট্‌লে থামবে না...কিছুকাল ধরে তোমাদের দেখে আমার চোখ জুড়োয় মন জুড়োয় সব জুড়োয়।

বলতে বলতে আবার দরজার দিকে ফেরার উদ্যোগ করলেন তিনি। এদিক থেকে আবারও বাধা পড়ল, জিজ্ঞেস করল, কিন্তু আমাকে সন্দেহের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন কেন, মা-জননীকে একলা পেতে চেয়েছিলেন কেন বললেন না তো?

ভুলে গেছি। ভুবন দাস ফিরলেন আবার। নিষ্প্রভ দুটো ঘোলাটে চোখ আমার দিকে তুলে বললেন, হ্যাঁ গো মা, রাত কত হয়ে গেল আমাকে চারটে খেতে দিলে না এখনো! গিন্নি জানতে পেলে তো তোমাকে বকেঝকে একশেষ করবে—

গিন্নি বলতে দাসমশায়ের স্ত্রী-ই বটে, কিন্তু বছর দুই হতে চলল তিনি স্বর্গে গেছেন। আমরা ভেবেছিলাম বার্ধক্যের এই নিঃসঙ্গতা দাসমশাইও আর বেশিদিন সহ্য করতে পারবেন না, তাঁরও সময় ঘনিয়ে এলো বলে। কিন্তু কদিনের মধ্যেই আবার প্রায় আগের মতোই তাজা হয়ে উঠলেন তিনি। শুধু তাই নয়, আগের মতোই আবার তাঁর ঘরে এক-তরফা হাসি, গল্প, কখনো বা রাগ-বিরাগের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল। ভুবন দাসের বিশ্বাস তাঁর গিন্নি তাঁকে ছেড়ে যাননি, যেতে পারেন না। তিনি আসেন, হাসেন, গল্প করেন, কখনো বা দুজনার একটু-আধটু রাগারাগিও হয়ে যায়। দাসমশাই বলেন, কাছাকাছি বাপের বাড়ির মতোই কোনো জায়গায় আছেন তাঁর গিন্নি। সেখানে বেশ আনন্দে থাকলেও বুড়োটার একটু-আধটু খবর না নিয়ে আর পারেন কি করে? রোজই আসেন, গল্প-সল্প করেন, সাধ্য-সাধনা করলেও আর তিনি এখানে এসে থাকতে রাজি নন, একটানা ষাট বছর তিনি এই লোকের ঘর করেছেন, আর কত? আর তাঁর দ্বারা কিছু হবেটবে না। ভাবনা নেই চিন্তা নেই, বাপের বাড়িতে তোফা আরামে আছেন তাঁর মায়ের কাছে। সময় হলে বুড়োই যেন তাঁর কাছে যায়।

অগত্যা কি করা যাবে, সময়ের অপেক্ষায় আছেন ভুবন দাস। সময় হলেই শ্বশুরবাড়ি যাবেন তিনিও। এক-একসময় রসিকতাও করেন, বলেন, ও-সব শ্বশুর বাড়িটাড়ি আমি একদম পছন্দ করতাম না, বুঝলে গো মা, ষাট বছরের মধ্যে ষাট দিনও যেতে দিইনি, নানা ছলে ভুলিয়ে রেখে দিতাম। ফাঁকি দিয়ে পালালই যখন কি আর করা যাবে, এখন আমারও শ্বশুরবাড়ির ওপর টান হয়েছে, যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ও মাগী কি সহজ নেবে আমাকে, বললেই হি হি করে হাসে, বলে রোসো, আমাকে ছাড়া কেমন লাগে টের পেয়ে নাও একটু, তারপর যাব—

গোড়ায় গোড়ায় আমার ভয় হত মানুষটা পাগলই হয়ে গেলেন বুঝি! ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। ডাক্তারের সঙ্গেও মানুষটা বউয়ের গল্পে জমে গেলেন। তারপর ডাক্তার উঠে দাঁড়াতে হাসিমুখেই বিছানার তলা থেকে দুটো তেলচিটে দশ টাকার নোট বার করে তার হাতে গুঁজে দিলেন—নাও বাবা নাও, সঙ্কোচ কিসের, তোমার তো বউ ছেলেপুলে আছে আমিও বুড়ীর যক্ষের ধন যতটা পারি হাল্কা করে যাই। তাছাড়া, ঋণ রাখতে নেই, ঋণ রেখে কি আবার এখানে মজতে আসব! তার ওপর কিনা ডাক্তারের কাছে ঋণ! সর্বনাশ!

মানুষটা যখন যাবেন অঋণী হয়েই যাবেন সে আমাদের চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। উল্টে আমাদেরই বোধ হয় ঋণে আবদ্ধ করে যাবেন। মাস-কাবার হতে না হতে ওর পকেটে ঘরভাড়ার টাকা আর খাবার খরচা গুঁজে দিয়ে যাবেন। তাঁর গিন্নি চোখ বোজার পর থেকে আমাদের হেঁসেলেই তাঁর খাবার ব্যবস্থা। টাকা নিতে না চাইলে তখনো ওমনি করে ঋণের কথা বলেন। ওদিকে না চাইতে ইদানীং রুমু-ঝুমুর সব শখের যোগনদারীও তাদের এই দাসদাদুই করে আসছেন।

বাইরে এসে ডাক্তার অবাক মুখ করে বলেছেন, অদ্ভুত লোক এ যুগেও দুই-একজন আছেন দেখি—যেমন আছেন তেমনি থাকতে দিন, তা না হলেই বরং পাগল হয়ে যাবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, দাসগিন্নি সত্যিই দাসমশাইকে ছেড়ে গেছেন কিনা এখন আমার নিজেরই মাঝে মাঝে সেই সন্দেহ হয়। তাঁর বন্ধ ঘরে যখন একতরফা কথাবার্তা চলে, আমি সাহস করে সে দরজা ঠেলে ঢুকতে পারি না।

এত রাত অবধি খাবার দিইনি শুনে আমার সামনের লোকও ঈষৎ বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালো। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমার ঠিক সময়ের হিসেব আছে, সময় হলেই আপনার ঘরে গিয়ে দিয়ে আসব—মা আমাকে একটুও বকবেন না, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যান।

—তাই বুঝি? আচ্ছা, সময় হলেই দিও তাহলে। আমি নীচে গিয়ে বসি।

ঠুক ঠুক করে ফিরে চললেন আবার। আমি তাঁকেই দেখছিলাম, প্রশ্ন কানে এলো, এখন পর্যন্ত ওঁকে খেতে দাওনি?

ফিরে তাকালাম।—কি মনে হয়, দিইনি?

দিয়েছি যে সেটা তক্ষুনি বুঝল। তবু বললাম, কি করব বলো, ডায়াবেটিসের রোগী, খিদে পায় বোধহয়, তাই ভুলে যায়। কিন্তু ডাক্তার যে বেশি দিতে বারণ করে, এরপর আর একটু দুধ ছাড়া আর তো কিছু দিতে পারব না।

দাসমশায় ঘরে ঢোকার আগের আবহাওয়ার মধ্যে আর ফিরতে চাইনে বলে বাড়তি কথা বলছিলাম। কিন্তু ফিরতে হল। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, আমার আরজির কি হল?

—কিসের আরজি?

—ওই যে, আবার লেখার কথা বলছিলাম।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ঘরের পয়সা খরচ করে ও-সব ছাইভস্ম ছাপবে?

—সে আমি বুঝব, তোমার তাতে কি? এগিয়ে এলো। গলা খাটো করে বলল, কথা না শুনলে রণেন ডাক্তার যা ব্যবস্থা দিয়েছে তাই হবে কিন্তু!

—ধেৎ!

পালাব বুঝেই খপ করে হাত ধরে ফেলল। বলল, বিশ্বাস করো আমার সত্যি ভারি ইচ্ছে আবার তুমি লেখা ধরো, খুব ইচ্ছে, এবার তোমার সত্যি নামডাক হোক।

বুকের তলার সেই ঢেউ আবার টের পাচ্ছি। তবু ভ্রূকুটি করলাম, আবার স্তাবক জুটুক, কেমন?

—জুটুক। কথা দিচ্ছি, এবার তোমার স্তাবকদের আমি মাথায় তুলে নাচব।

—আর তারা যদি আমাকে মাথায় তুলে নাচতে চায়?

—ঠিক ঠিক মাথায়ই যদি তোলে তাহলে আপত্তি করব না।

মুখের এতটুকু লাগাম যদি থাকত! আমি হেসে ফেললাম। কিন্তু সেই সঙ্গে চোখের কোণ দুটো বড়ো বেশি শিরশির করছে। আমার মুখের ওপর যে দুটো চোখ ঝুঁকে আছে সে দুটো সরলে বাঁচতুম। কিন্তু সরবে না জানি। বলল, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ না?

এই দুটো চোখে চোখ রেখেই মাথা নাড়লাম। পারছি।

খুশির জোয়ার এলো যেন, আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আর তক্ষুনি ছেলেমানুষের মতো দুষ্টুমিও করে উঠল একটা। সচকিত হয়ে আমি হাত ছাড়িয়ে পালাতে চেষ্টা করলাম। মাঝের দরজাটা খোলা, ও ঘরে আলো জ্বলছে—রুমুঝুমু শোয়নি এখনো।

খানিক বাদে নীচে নেমে দাসমশাইকে দুধ খাইয়ে শুইয়ে দিয়ে ওপরে এসে দেখলাম হিসেব-পত্র নিয়ে বসে গেছে। এ তন্ময়তা চট করে ভাঙবে না এখন। লঘু পা ফেলে মেয়েদের কাছে এলাম। তারাও শুয়ে পড়েছে। বড়ো আলোটা নিভিয়ে সবুজ আলো জ্বেলে দিয়ে দু'ঘরের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালাম আবার। ঢিমে সবুজ আলোয় দাঁড়িয়ে ও মুখখানা দেখতে যেন আরো বেশি ভালো লাগছে। কাজের এই তন্ময়তাটুকুও বুঝি দু'চোখ ভরে দেখার মতো। ভোর না হতে উদয়াস্ত পরিশ্রম চলবে আবার। কিন্তু বেশিক্ষণ এ-ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে ভয়, যেমন করে হোক টের পাবেই, আর মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটবে।

সন্তর্পণে ওই ঘরের ভিতর দিয়েই সিঁড়ির দিকের অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আবারও খানিক ওই মুখই দেখলাম।

এই মানুষ নিজের মুখে আবার আমাকে লেখার কথা বলছে। লেখায় আমার নামডাক হোক এ-কথা নিজের মুখে বলেছে। আমি হাসব, না কাঁদব? বাইরের ঘরে বসে এক কবিতা-সাপ্তাহিকের নতুন সম্পাদকের প্রশংসার উচ্ছ্বাসে ভাসছিলাম আমি! নিজের ভিতরে তখন এত অশান্তি আমার যে সেই গুমোটের মধ্যে ওইটুকুই এক-ঝলক দক্ষিণের বাতাসের মতো লাগত। ঘণ্টাখানেক ধরে সেই বাতাসই বইছিল। ছোট মেয়ে ঝুমুর খাবার সময় পেরিয়ে গেছে—খিদের জ্বালায় ও ছটফট করছে বা কাঁদছে কিনা তাও খেয়াল নেই। আপ্যায়নে বিগলিত অল্পবয়সী সম্পাদক চলে যেতে দোতলায় এসে

দেখি, এই মানুষ আমার শেষ ছাপা কবিতার বইটা দুখানা করে ছিঁড়ে নিয়ে তাই জ্বালিয়ে মেয়ের দুধ গরম করছে!

আমি কি করেছিলাম সে-প্রসঙ্গ এটা নয়। আমি শুধু ভাবছি, এই লোকই আবার আমাকে লেখার জন্য অনুনয় করছে, লিখে নাম-ডাক হোক আমার চাইছে। মাঝের এই ক'টা বছর কি সত্যি নয়? সে-কি একটা দুঃস্বপ্ন?

কোনো ছোটো পরিসরের মধ্যে নিজেকে যেন আর ধরে রাখা যাচ্ছিল না। ছাদে চলে এলাম। এখানে আলোছায়ার মিতালি। মাথার ওপর তারা-ভরা আকাশ। ওরা যেন কৌতুক-ভরে আমাকেই লক্ষ করছে।

লিখতে তো পারি।

বলতে গেলে চোদ্দ থেকে উনত্রিশ—এই একটানা পনের-যোলটা বছর এই নেশার ঘোর কোনো নেশার থেকে কম ছিল না। স্কুলে লিখেছি, কলেজে লিখেছি। সে-সব লেখা নিয়ে মেয়েদের থেকে ছেলেরাই বেশি হৈ চৈ করেছে। আর, কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পরেও ছাই-ভস্ম যা-ই লিখেছি, তাতেও আমার চেনা-মহলে অন্তত নিন্দার থেকে প্রশংসাই বেশি হয়েছে। বলা বাহুল্য, সেও একরকম পুরুষের মহলই। একান্ত শুভার্থীজনের আনুকূল্যে বিয়ের আগেই আমার একখানা কবিতার বই আর একখানা গল্পের বই ছাপা হয়ে গেছল। বিয়ের পর আরো একটা কবিতার বই এবং একখানা গল্পের বই। সে সবের এক-তৃতীয়াংশ উপহারে নিঃশেষ হয়েছে। তবু, স্বভাবতই তখন লেখার ক্ষেত্র বিস্তৃত করার দিকে ঝোঁক আমার। একটু সুযোগ আর সহানুভূতি পেলে সেটা যে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, সে-বিশ্বাস প্রায়-বদ্ধমূল।

...সব আশা সব আকাঙ্ক্ষা, সকল বিশ্বাস আর সকল নির্ভরতা ভেঙে গুঁড়িয়ে তচনচ হয়ে স্রোতের মুখে কুটোর মতো ভেসে গেছে। উৎসাহ আর উদ্দীপনা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

গেছে যে, সেটা অভিশাপ না আশীর্বাদ?

ওই ভস্মস্তূপই যে জীবনের শেষ কথা নয় সে আর আজ আমার থেকে ভালো কে জানে?

তাই, এই রাতে লেখার জন্য এমন অদ্ভুত নির্ভেজাল তাগিদ পাওয়ার পর থেকে থেকে কেবলই মনে হচ্ছে, লিখতে পারি। আগে কখনো পারিনি, পারতুম না। আজ পারি।

কিন্তু সে-লেখা সাহিত্য হবে না প্রায়শ্চিত্ত হবে?

...ভাবছি। শক্তি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছি।...সাহিত্য কী জীবন ছাড়া? জীবনে আলো আছে অন্ধকার আছে, সুন্দর আছে, কুৎসিত আছে। সেই আলো-অন্ধকার সুন্দর-কুৎসিতের ভিতর থেকেই যদি জীবন-সোনা ঝালিয়ে নিতে পেরে থাকি নাম তার যাই হোক, সে-বারতা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যাবে না কেন?

একটা আলগা লজ্জা আর সঙ্কোচ চারদিক থেকে ছেঁকে ধরছে। লেখার এই চেষ্টাটা নিজেকে অনাবৃত করে দেবার মতোই যেন। তবু ভেতর থেকে কে বলছে, এই লজ্জা আর সঙ্কোচও ঝেড়ে ফেলে দেওয়া অসম্ভব নয় একেবারে। কারণ, আমি যা হতে পারতুম, তা হইনি।

আমার কাহিনি বলুন, গল্প বলুন, এটুকুই সব। এটুকুই শেষ।

দুই

আমি রূপসী নই।

বোনেদের মধ্যে আমারই গায়ের রং মাজা। তিন বোন আমরা। আমাদের ওপরে দাদা। দাদার নাম চঞ্চল। নামের সঙ্গে স্বভাবের মিল। স্বভাব দেখেই ঠাকুমা ওই নাম রেখেছিল শুনেছি।

সকলের বড়ো হলেও ছেলেবেলা থেকেই দাদাকে আমরা ছেলেমানুষ ভাবতুম। বাবা বলত ওর জ্ঞান-গম্যি কোনোকালে হবে না। বাবার কথার ঝুড়ি ঝুড়ি নজির আমরা অনেক কাল ধরে দেখে আসছি।

ভাই-বোনেদের মধ্যে দাদার সঙ্গে আমারই সব থেকে কম বনত। তার প্রথম কারণ বাড়ির আদর। বড়ো ছেলে আর একমাত্র ছেলে বলে ঠাকুমার কাছে, আর আমার ধারণা ভিতরে ভিতরে বাবার কাছেও তার একটু বেশি আদর ছিলই। আর সবার ছোট বলে, আর আমার মাত্র ছ'বছর বয়সে মা চোখ বুজেছে বলে, আমারও একটু বাড়তি আদরই ছিল। এই আদরে আদরে ঠোকাঠুকি লাগত। বিশেষ করে দাদার প্রতি ঠাকুমার কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব দেখলে আমার অসহ্য হত। দ্বিতীয় কারণ, দাদাও সুদর্শন। রাগ হলে বা একটু বিগড়োলেই দাদার মুখ দিয়ে বিকৃত সম্ভাষণ বেরুতো। কালী, কেলী—

কালী বলার মতো কালো নই আমি। বরং দাদা আর দিদিরাই অনাবশ্যক রকমের এইসব বলত।

ফরসা আমার চোখে। ওরা না থাকলে দিব্বি ফর্সা বলেই চলে যেতে পারতুম আমি। অতএব দাদা ওইরকম বললে রাগে আমার কালীর মতই জিব বেরিয়ে পড়ত।

রাগ করে বাবা অনেক সময় বলত, ওই ছোটো মেয়েটার যা বুদ্ধি আছে তোর তাও নেই। বলে রাখি বুদ্ধির খ্যাতি আমার ছেলেবেলা থেকেই ছিল। রাগে দাদার হাত নিশপিশ করত। বাবা কাছে না থাকলে মাথায় গাঁট্টা মেরে বলত, দেখি কেমন বুদ্ধি আছে। নয়ত বলত, ওই বুদ্ধিই তো গা দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে, নইলে এমন বর্ণ হবে কেন!

মোটকথা, ছেলেবেলা থেকেই দাদাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতুম না আমি।

একটু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দাদার বাইরের চঞ্চলতার থেকেও ভেতরের চঞ্চলতা বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর প্রগাঢ় আস্থা। সর্বব্যাপারে নিজের মাথা খাটাতে চাইত। তার ফল যখন আশাপ্রদ হত না, তখন সকলের ওপর রাগ।

আরো একটা বড়ো দোষ দাদার—যার যা কিছু মনে ধরত, তাই তার চাই। কেউ একটা ভালো কিছু করলে তার থেকেও চমকপ্রদ কিছু করা চাই। তার এই সব চাওয়ার ধকল সামলাতে হত ঠাকুমাকে। আমাদের সচেতন জীবনে মা অনুপস্থিত। ঠাকুমাই সব। আরো চার-চারটে ছেলে আছে তাঁর। কিন্তু মা নেই বলে ঠাকুমাই এ বাড়ির গৃহিণী।

বাবার বিরক্তি থেকে ঠাকুমা দাদাকে সর্বদাই আড়াল করত বটে, কিন্তু এক একসময় নিজে রেগে যেত। গজগজ করত, কেবল চাই চাই চাই, অন্যের যা ভালো সব তোর চাই—এরপর কারো সুন্দর বউ দেখলে বলে বসবি ওটাও তোর চাই!

কিন্তু এও ছেলেবেলা থেকেই আমরা জানি, দাদার মাথা যদি কেউ বিগড়ে দিয়ে থাকে, সেও ওই ঠাকুমা-বুড়ীর কাজ। দাদা এমন এক-একটা কাণ্ড করত যে বাবা শুনলে আর রক্ষে রাখবে না। তখন দাদার জন্যে আমাদেরই ভয় হত। স্কুলের এক পরীক্ষার আগে অনেক মাথা খাটিয়ে আর রাত জেগে 'টুকলিফাইং ববিন' (নামটা দাদারই দেওয়া) তৈরি করেছিল। ছোট্ট কাঠের ববিনে ফিতের মতো জড়ানো পাতলা কাগজে সর্ববিষয়ের সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর লেখা। পরীক্ষা-ঘরে সেই বস্তুটিই হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। নাম করা স্কুল। তার হেডমাস্টারও তেমনি কড়া। দাদাকে বার করে দিয়ে তক্ষুনি বাবাকে কড়া চিঠি পাঠালেন, তোমার ছেলেকে আর এ স্কুলে রাখা হবে না।

সেই চিঠি ঠাকুমার হাতে পড়তে রক্ষা। পিওন মারফত চিঠি পাঠানো হয়েছিল। দিদি সে-চিঠি নিয়ে বাবার হাতে দেবার আগেই দাদা সে-চিঠি ছিনিয়ে নিল। তারপর ঠাকুমা ছাড়া আর গতি কি? বাবার বদলে ঠাকুমা নিজে স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করল। তারপর দাদা শুধু সে-বছর ফেল করেই খালাস পেল। আর কিছু হল না।

আমার দিদি ভারতী একটু ভালো-মানুষ গোছের। সেই কারণেই লোকের চোখে ওর রূপের ছটা অত ঠিকরোতো না। তার ওপর সুখী গোছের একটু মোটাসোটা। সেদিক থেকে রূপসী বলা চলে ছোড়দি অদিতিকে। যেমন ফর্সা তেমনি ধারালো চেহারা। মাথায় বুদ্ধির প্যাঁচও বেশ খেলে। নিজেকে নিখুঁত রূপসীই ভাবত সে, কিন্তু মনে মনে এও জানত, খুঁত একটু আছেই। দিদি যেমন একটু বেশি মোটা, ও তেমনি একটু বেশি রোগা। ঢেপসি মোটা হওয়ার থেকে রোগা হওয়া যে ঢের ভালো সে কথা ও সর্বদাই সকলের মুখের ওপর ঘোষণা করত।

সবার ছোট আমি আরতি।

দাদা বলত কেলী, আর দিদিরা পরামর্শ দিত সর্বদা দুধের সর মুখে মেখে বসে থাক , আর অত হুটোপুটি করিস না—গায়ের রং আরো বেশি কালো হয় তাতে।

সত্যি কথা বলতে কি, গায়ের রং দিদিদের মতো না হওয়াতে মনে মনে বেশ একটু খেদ ছিল আমার। অথচ, দুরন্তপনা বা হুটোপুটি করার আনন্দে মেতে থাকতুম যখন, দিদিদের উপদেশ একটুও মনে থাকত না।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকে আমি এমন কতকগুলো ব্যাপার দেখেছি যাতে রূপ সম্পর্কে আমার বিচারবিশ্লেষণ ক্রমশ অন্যভাবে দানা বেঁধেছে। আমার ধারণা মেয়েদের যথার্থ রূপ সব থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে পুরুষের চোখের আয়নায়। সেই সঙ্গে মেয়েদের চোখও একেবারে ফেলনা নয়।

দাদা যেমন বড়ো স্কুলে পড়ে, আমরাও তেমনি নামকরা ইংরেজি মিশনারি স্কুলে পড়ি। স্কুলের বেশির ভাগ সমবয়সী মেয়ে আমাকে সমীহ করত, তার কারণ আমার পেটানো স্বাস্থ্য! অনেককেই ধরে দু'চারটে ঝাঁকুনি-টাকুনি দিতে পারতুম। ছোড়দির দু হাত শক্ত করে চেপে ধরলে ও নড়তে চড়তে পারত না। রেগে গেলে দিদিরা বলত, ঠাকুমা আদর করে ওকে বেশি-বেশি দুধ-ঘি খাইয়ে ধিঙ্গি করে তুলেছে। আমারই সম্পর্কে স্কুলের দুই টিচারের আলোচনা আমার মনে গেঁথে আছে। স্ব-কর্ণে শুনিনি। সুখবরটা জানিয়েছিল আমাদের ক্লাসের রঞ্জনা। ওই দুটি টিচারের একজন তার দিদি, আর অন্যজন আমাদের রাশভারী ক্লাসটিচার। আলোচনাটা হয়েছিল রঞ্জনাদের বাড়ি বসেই। ছোটো বোন যে আবার দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে-কথা গিলেছে কেউ জানেও না।

ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস এইটে ওঠার কথা তখন। রেজাল্ট বেরোয়নি, প্রমোশন আসন্ন। রঞ্জনার দিদি অন্য টিচারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তার ক্লাসে কে ফার্স্ট হল। সেই টিচার আমার নাম করল। কিন্তু আনন্দের সমাচার একটুও নয়। ফার্স্ট যে আমিই হব প্রায় জানতুমই। শুনে রঞ্জনার দিদি বলেছিল, মেয়েটার অনেক গুণ তো, আর চেহারাখানাও কি মিষ্টি—একমাথা চুল।

আমাদের রাশভারি ক্লাসটিচার নাকি সেই কথার পিঠে যোগ দিল, চোখ দুটোও চমৎকার, বড়ো বড়ো দুটো চোখ মেলে যখন এদিক থেকে ওদিকে তাকায় আমি লক্ষ করি—মনে হয় কত কি দেখে মেয়েটা তার ঠিক নেই।

রঞ্জনার ধারণা, ওকে সেদিন আমি পেট পুরে খাইয়েছিলাম আগেভাগে পরীক্ষার রেজাল্ট বলে দেবার দরুনই। আসল কারণটা শুধু আমিই জানি।

ক্রমে গায়ের রং যে মাজা সেই খেদ আমার ঘুচে গেছে। এমনকি এও মনে হয়েছে আমি যা, সে-ই ঠিক। দিদিদের মতো অমন ধপধপে ফর্সা হলেই যেন বেমানান হত। কিন্তু মনের এ-কথা আমি কখনো প্রকাশ করিনি। নানা অনুভূতির মধ্য দিয়ে এই দুর্বলতাটুকু বেশ একটা বিশ্বাসের দিকে গড়াচ্ছিল।

ছোড়দি অদিতি মাত্র দেড় বছরের বড়ো আমার থেকে। আর দিদি ভারতী সাড়ে তিন-চার বছরের। আমার যখন তেরো, ছোড়দির তখন সাড়ে চোদ্দ, আর দিদির সাড়ে ষোল। পিঠোপিঠি এই তিন বোন একসঙ্গে স্কুলে যেতাম। ফেরার সময় একসঙ্গেই বাড়ির গাড়িতে ফিরতাম। এই যাওয়া-আসার সময় পারিপার্শ্বিকের দিকে আমাদের চোখ থাকত না বললে সত্যের অপলাপ হবে। সব থেকে বেশি চোখ থাকত ছোড়দির। আমাদের মধ্যে বাহ্যতঃ পাকা সে-ই সব থেকে বেশি। বাহ্যতঃ বললাম কারণ, আর একটু বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মতো চৌকস আর বুদ্ধিমতী আমি ওদের একজনকেও ভাবতুম না। তবে বাই[illegible] সজীব দ্রষ্টব্যের দিকে আমার চোখ খুলে দেবার ব্যাপারে ছোড়দিই যে গুরু তাতে কোনো [illegible] নেই।

বি[illegible]ের দিকে সামনের পার্কে অথবা দোকান থেকে নিজেদের জিনিস কেনা-কাটার ব্যাপারেও তিন [illegible] একসঙ্গে বেরোতাম। তখনো আমি আর ছোড়দি ফ্রক পরতাম, দিদিই শুধু শাড়ি ধরেছিল।

[illegible] ছোড়দি প্রায়ই দিদির শাড়ি পরত, আর বলত, ঠাকুমা কিছুতেই বোঝে না যে আমার আর ফ্রক [illegible]র বয়েস নেই। ছোড়দির আর ফ্রক পরার বয়েস নেই সেটা আমিও একবাক্যে স্বীকার
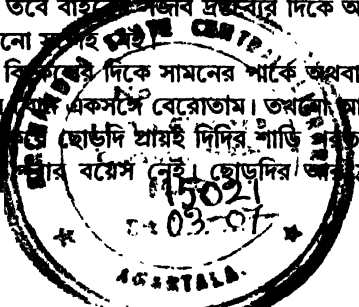
করতাম। কারণ, ফ্রক-পরা ছাড়লে ওর ভালো ভালো ফ্রকগুলো সব আমার হবে। কিন্তু ও যখন ফ্রক-পরা ছাড়ল, ওর ফ্রকের কোনোটাই তখন আমার গায়ে হয় না।

. সেকথা থাক। তিন বোন একসঙ্গে বাইরে বেরুবার সময় ছোড়দি অনেক ব্যাপারে আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। শুধু আমার কেন, দিদিরও।

বাড়ি থেকে বেরুলে পাড়ার আর বে-পাড়ার জোড়া-জোড়া চোখ যে আমাদের দিকে ধাওয়া করবেই এ-ব্যাপারটা আমি প্রায় স্বতঃসিদ্ধই ধরে নিয়েছিলাম। পনের থেকে সাতাশের মধ্যে সেই সব চোখের মালিকদের বয়েস। ছোড়দি প্রায়ই বলত দিদিকে, সব তাকাচ্ছে দেখ, যেন ধরে ধরে গিলবে আমাদের সব।

দিদি দেখত। হেসে মাথা নেড়ে সায় দিত। চোখ দিয়ে গেলা কাকে বলে আমি তখন সবে একটু-আধটু বুঝতে শিখেছি। অতএব ওই সব গেলার চোখ আমার দিকেও ধাওয়া করছে কিনা তা না লক্ষ করে পারতুম না। ছোড়দি প্রায়ই হাসি চেপে ধমকে উঠত, এইটুকু মেয়ে তুই আবার দেখছিস কি? খবরদার আমাদের কথায় কান দিবি না।

ছোড়দি যে মাত্র দেড়-বছরের বড়ো আমার থেকে সে-কথা ও নিজে তো সর্বদাই ভুলত, দিদিরও মনে থাকত না। এমন কি, দিদি এক একসময় প্রায় বড়োর মতোই দেখত এই ছোড়দিটিকে।

তেরো না পেরুতে হঠাৎ একসময় ছোড়দির আবার আমার সঙ্গেই বেশি ভাব হয়ে গেল। তার কারণ একটি ছেলে। ছেলেটার নাম রমেশ ভার্গব। বাঙালি নয়। ইউ পি'র ছেলে। আমাদের স্কুলের পাশের মিশনারি বোর্ডিংয়ের ছেলে। 'সেবারেই সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষা দিয়ে লায়েক হয়েছে। বড়জোর বছর সতের হবে বয়স।

তার সঙ্গে ছোড়দির খাতির কি করে হয়ে গেল আমার জানা নেই। ছেলেটাকে মাঝে-সাঝে আমাদের স্কুলের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম মনে পড়ে। তা ছুটির আগে আর পরে গেটের বাইরে অমন কত ছেলেই তো দাঁড়িয়ে থাকে।

দিদির একদিন সামান্য জ্বর-ভাব হয়েছিল। জ্বর নিয়ে স্কুলে গেলে কত খারাপ হতে পারে ছোড়দি ঠাকুমাকে বুঝিয়ে দিদির স্কুলে যাওয়া বন্ধ করল। তাছাড়া কি কারণে সেদিন আগেই স্কুল ছুটি হবার কথা। বাড়ির গাড়ি আসতে ছুটির পরে ছোড়দি আমার সঙ্গে এলো না। কোন টিচারের কাছে তাকে ঘণ্টা দুই-তিন পড়তে হবে—তারপর অন্য মেয়ের গাড়িতে বাড়ি ফিরবে।

কিন্তু বিকেল সাড়ে চারটে না বাজতে বাড়ি থেকে তিনটে বড়ো রাস্তা পেরিয়ে দশ মিনিটের পথ ঠেঙিয়ে একলা পার্কে আসতে পারি সেদিন সেটা ছোড়দির হিসেবের মধ্যে ছিল না। আসলে আমিও বাড়ির লোকের চোখে ধুলো দিয়েই এসেছি। সেখানে পুকুরের ধারে একটা ছেলের পাশে ছোড়দিকে বসে বাদামভাজা খেতে দেখে আমি হাঁ। কিছু বিবেচনা না করেই তাদের সামনে হাজির আমি। প্রথমে ছোড়দি বিষম থতমত খেল। সচকিত হয়ে দেখল আমার সঙ্গে আর কেউ আছে কিনা। তারপর আমি একলা এসেছি শুনে ভয়ানক রেগে গেল। বাড়িতে বলে দেবে শাসালো।

ওর পাশের ছেলেটা সকৌতুকে আমাকে দেখছিল।

যাই হোক, একটু বাদেই ছোড়দি আমার সঙ্গে আপস করল। আমাকে ওদের পাশে বসিয়ে বাদামভাজা খেতে দিল। ছেলেটার সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিল। বলল, ব্রিলিয়েন্ট ছেলে, ওর সঙ্গে ইংরেজিতে আলাপ করে আমি ইংরেজি রপ্ত করছি—বড়ো হয়ে বিলেত যাব জানিসই তো—বলতে কইতে না পারলে সেখানে গিয়ে তো বোকা বনে যাবো। ইজন্ট দ্যাট ভার্গব?

মাথা নেড়ে ভার্গব খাঁটি বাংলায় জবাব দিল, সত্যি কথা। ছেলেমানুষ ভেবে অন্তরঙ্গ হেসে আমার কাঁধে একখানা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দির ভ্রূকুটির ইশারায় ঘায়েল হয়ে বিব্রত মুখে ভাষা বদলাল, বার দুই ঘাড় দুলিয়ে বলল, দ্যাট্স্ টু, উই ডিস্কাস ইন্ ইংলিশ, হোয়াট্স ইওর নেম্ প্লিজ?

কাঁধে হাত রাখতেই আমার রাগ হয়েছে, গম্ভীরমুখে জবাব দিলাম, মাই নেম ইজ্ আরতি—ইউ আর এ মিথ্যুক ছেলে, ইউ নো বেঙ্গলি!

ছেলেটা জোরেই হেসে উঠল এবার। সেই ফাঁকে আমি কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে দিলাম। আর তার পর ছোড়দি আমাকে বেশ খাতিরই করতে লাগল। আমি কত ভালো মেয়ে রমেশ ভার্গবকে সেটা অনেকভাবে বলল।

পার্ক থেকে উঠে রমেশ আমাদের একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। তিনজনে মনের আনন্দে খেলাম। বাড়ির পথে ছোড়দির সঙ্গে আমার কড়ার হল, সে আমার কথা কাউকে বলবে না, আর আমিও রমেশের কথা ঘুণাক্ষরে কাউকে বলব না। তাছাড়া রমেশ সত্যি খুব ভালো ছেলে, পড়াশোনার ব্যাপারে তার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে।

সাহায্য যে ঘোড়ার ডিম পাওয়া যাবে সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে। আর আমার একলা পার্কে আসার থেকেও তার দোষটা যে ঢের বেশি তাও আমার বুঝতে বাকি নেই। তবুও ভালো মেয়ের মতো ছোড়দির সঙ্গে আপস করতেও আমার আপত্তি নেই।

এর পরেই দেখতে দেখতে ছোড়দির সঙ্গে আমার ভাব জমে গেল। তার কারণ শিগ্‌গিরই রমেশ ভার্গব আর ছোড়দির মধ্যে আমি পোস্ট-গার্ল-এর ভূমিকা নিলাম। পার্কেই বেশিরভাগ ওদের চিঠি চালাচালি হতে লাগল। দিদির বা বাড়ির চাকরের চোখে ধুলো দিয়ে ছোটাছুটির ফাঁকে আমি তীর্থের কাকের মতো বসা রমেশের সামনে ছোড়দির চিঠি ফেলে দিতাম, আবার তেমনি করে জবাবও নিয়ে আসতাম। কোনো-কোনোদিন একলাই চিঠি নিয়ে পার্কে যেতাম। চিঠি খুলব না বা পড়ব না তিন সত্যি কেটে দিব্বি করতে হত। ওরা কি অত লেখা-লেখি করে দেখতে খুব ইচ্ছে হত। কিন্তু তিন-সত্যির ভয়ে পারতুম না।

ইতিমধ্যে চোখ আরো একটু খোলার মতো কিছু রসদ পেলাম আমি। আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে একটা ভাঙা একতলা পুরনো বাড়ি। তাকালেও চোখ অখুশি হত এমন বাড়ি। এক হাড় জিরজিরে বুড়ো সে-বাড়ির দাওয়ায় বসে তামাক খায় দেখি। তার বড় ছেলের বউয়ের সঙ্গে ঠাকুমার ভাব-সাব আছে দেখি। মাঝে মাঝে আসে ঠাকুমার কাছে। চার পাঁচটা রোগা-রোগা ছেলেপুলে বউটার। ভালো করে খেতে পরতে পায় না বোঝাই যায়।

ওটা বোস-বাড়ি। ও বাড়ির একটা ছেলেকে প্রায়ই এ বাড়ির দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বিশেষ করে বুড়োমত লোকটা যখন দাওয়ায় থাকে না তখন। তারই ছোট ছেলে এই জন? বড় ছেলের সঙ্গে বয়সের অনেক তফাত।

মুখোমুখি বাড়িতে বাস, তাই ওদের নাম-ধাম সকলেরই জানি প্রায়। আমাদের অবস্থা ভালো বলে হোক বা যে কারণেই হোক এ-বাড়ির সকলকেই বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখত ওরা। আর, আমরা কিছুটা নির্লিপ্ত করুণার চোখে।

যে ছেলেটার কথা বলছি তার নাম সুনন্দ বোস। বয়েস তখন সবে উনিশ ছাড়িয়েছে। এখন কলেজে ঢুকেছে বোধহয়। অভাবী বাড়িতে এই ছেলেটারই দিব্বি পুষ্ট স্বাস্থ্য। চুপচাপ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার অনেক আগে থেকেই তাকে আমরা জানি, চিনি। যখন হাফ প্যান্ট পরে হাঁ করে গাড়ি চেপে আমাদের যেতে আসতে দেখত তখন থেকে। এখন ধুতি পরে, আর মাঝ মাঝে লম্বা মোটা ট্রাউজার পরেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আরো অনেক ছোট বয়েস থেকেই ছেলেটাকে আমরা সুচক্ষে দেখি না, তার কারণ পাড়ার সম-বয়সী ছেলেদের সঙ্গে কত যে তাকে মারামারি করতে দেখেছি তার ঠিক নেই। আর ছোটলোকের মতো সেই রাস্তার মারামারিতে বেশির ভাগ সময়ই ওর প্রতিপক্ষ ঘায়েল হত বলে আমি অন্তত ওর ওপর সদয় ছিলাম না। তার ওপর ওই পুরু ঠোঁট আর ছোট চোখ দেখেই আমার ভালো লাগত না। গায়ের রঙও প্রায় কালোই।

সেদিন স্কুলে যাবার সময় গাড়িতে উঠেই ছোড়দি বলল, সুনন্দটা আজকাল কেমন হ্যাংলার মতো ড্যাবড্যাব করে আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে থাকে দেখেছিস? উক্তিটি দিদির উদ্দেশে।

ফলে দিদি আর আমি দুজনে গাড়ি থেকে ও বাড়ির দিকে ঘাড় ফেরালাম। চোখাচোখি হল শুধু আমার সঙ্গেই। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ওকে অনেক সময়েই দেখি, চোখাচোখিও হয় হয়ত, কিন্তু ড্যাবড্যাব করে হ্যাংলার মতো চেয়ে থাকবার তাৎপর্য নিয়ে কখনো দেখিনি।

দিদি বলল, ছোড়দিকে, আমার থেকে একটু আধটু বড় হবে বয়সে, তাহলে বোঝা গেল, তোকেই দেখে, তোর জন্যেই হ্যাংলার মতো দাঁড়ায়।

ছোড়দি অমনি ফোঁস করে উঠল, ইঃ, অত সাহস হবে না, আমাকে ভালো করেই চেনে—মুখ ভোঁতা করে দেব না একদিন! তার পরেই হেসে আমাকে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, অরুকে দেখে না তো রে দিদি! যে হাবাগোবা মেয়ে, নির্ভয়ে হয়ত ওর জন্যেই দাঁড়িয়ে থাকে।

আমার রাগ হয়ে গেল। একটা ছেলে আমাকে দেখুক তাতে খুব আপত্তি নেই। তা বলে ওই রকম বাড়ির ওই রকম একটা ধুমসো ছেলে! আমি বলে উঠলাম, কক্ষনো না!

দিদি আর ছোড়দি একসঙ্গে হেসে উঠল। তাই শুনে আমাদের অবাঙালী ড্রাইভার পর্যন্ত একদফা ঘাড় ফেরালো।

তারপর যেতে আসতে পর-পর দুটো দিন ইচ্ছে থাক আর না থাক, সামনের বাড়ির দিকে আমার চোখ গেলই। আর চোখাচোখিও হল। বিরক্ত হয়ে আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। দুদিনই ছোড়দির হাসি আর কথা শুনে আমার কানের পরদা জ্বলে গেছে। ছোড়দি বিস্ময়ে আর পুলকে বলে উঠেছে, হাঁরে দিদি, সুনন্দ খুদে চোখে ড্যাবড্যাব করে অরুর দিকেই চেয়ে থাকে, লক্ষ্য করেছিস?

তার ওপর দিদির কথায় আমার পিত্তি যেন আরো জ্বলে গেল। সায় দিয়ে হাসিমুখে মন্তব্য করল, যেমন হোঁৎকা চেহারা, তোদের দুজনের মধ্যে অরুকেই বেশি হৃষ্টপুষ্ট দেখেছে, তাই ওকেই পছন্দ বোধহয়।

আমি রেগে গিয়ে জবাব দিলাম, হৃষ্টপুষ্ট ছেড়ে তুমি তো ঢেপসি একটি, তাহলে তোমাকে পছন্দ নয় কেন?

দিদি অমনি শাসনের সুরে বলল, অরু আমি তোমার থেকে অনেক বড়, ঠাকুমাকে বলে দেব।

এর পরেই আমি তিন-চারদিনের জ্বরে পড়ে গেলাম। স্কুল বন্ধ, সেদিন বিকেলে বাইরে থেকে ফিরেই আমার ঘরে এসে ছোড়দি আর দিদির সে-কি হাসি। ছোড়দি তো হাসতে হাসতে আমার জ্বরো বিছানাতেই গড়িয়ে পড়ল। শেষে হাসি সামলে চোখ পাকাতে চেষ্টা করে বলে উঠল, বলেছিলাম কিনা সুনন্দ বোস তোকে দেখার আশাতেই ভিজে বেড়ালটির মতো অমনি করে দাঁড়িয়ে থাকে? আজ একেবারে ফয়সালাই হয়ে গেল।

আমি হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে?

আবার একপ্রস্থ হাসির দমক। ছোড়দি দিদিকে ঠেলে দিল, বল্ না!

শেষে দুজনেই ভাগে-সাগে যা বলল তার সারমর্ম : মাথার তেল কিনতে বেরিয়েছিল ওরা দুজনে, ফেরার সময় সামনের ওই মোড়ের মাথায় সুনন্দ ওদের ধরেছে। জিজ্ঞেস করেছে, আরতির কি হয়েছে?

দিদিরা এত অবাক হয়েছিল যে, চট করে জবাব দিতে পারেনি। তারপর ছোড়দিই জিজ্ঞেস করেছে, কেন?

সুনন্দ বলেছে, ক'দিন তোমাদের সঙ্গে স্কুলে যেতে দেখছি না, তাই ভাবছিলাম অসুখ-টসুখ হয়েছে কি না।

ছোড়দি বলেছে, অসুখ হয়েছে। খুব অসুখ। খুব জ্বর। ইচ্ছে করলে বাড়ি এসে দেখে যেতে পারে। বলে আবার বেদম হাসতে লাগল।

জ্বর আমার ছেড়েই গেল। কালই ভাত খাব। কিন্তু ওদের হাসি দেখে আর এইসব শুনে আমার জ্বর যেন মাথায় উঠল। তার ওপর ছোড়দি বলল, এখনো বাড়ির সামনে এদিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, উঠে দেখে আয় গে যা না!

এক লাফে আমি উঠে সত্যিই বারান্দায় চলে এলাম। আর সত্যিই দেখলাম মূর্তি এদিকেই চেয়ে আছে বটে। আর তাই দেখে রক্ত এমন মাথায় চড়ল যে আমি একটা কাণ্ডই করে বসলাম। মুখ বিকৃতি করে চার-ছ' আঙুলের মতো জিভ বার করে বেশ বড়-সড় একটা ভেঙচি কেটে বসলাম। তারপর দুমদাম পা ফেলে ঘরে চলে এলাম।

এদিকে দিদি আর ছোড়দি আমার রাগ আর কাণ্ড দেখে হাঁ।

দিনকয়েক পরের কথা। আবার স্কুলে যাতায়াত করছি। বাড়ির সামনে এক-আধবার ওই মূর্তি চোখে পড়ছে। সর্বদা নয়। চোখে পড়লেও আমি জোর করেই চোখ ফিরিয়ে থাকি। আমার মেজাজ দেখে দিদি আর ছোড়দিও সামনাসামনি আর কিছু বলে না।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে খেয়ে-দেয়ে একাই বড় রাস্তার দোকানে গেছি। কাগজ ফুরিয়েছে, কাগজ কেনার জন্য। কাগজ কিনে ফেরার সময় সেই মোড়ের মাথায় যেন ভূত দেখে চমকে উঠলাম। সামনেই পথ আগলে দাঁড়িয়ে সুনন্দ। গম্ভীর।

জিজ্ঞাসা করল, সেদিন আমাকে ওভাবে জিভ ভেঙচেছিলে কেন?

সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম ধাক্কায় আমার ভয়ানক ভয় ধরেছিল। এই গোঁয়ার ছেলেটার গুণ্ডামি আগে অনেক দেখেছি। ধরে মারধোর করে বসবে কিনা কে জানে। আমি যত হৃষ্ট-পুষ্টই হই, আর বন্ধুদের কাছে গায়ের জোরের যত দাপটই দেখাই, তেরো বছরের মেয়ে উনিশ কুড়ি বছরের একটা ষণ্ডা ছেলের কাছে কি? যে ভাবে সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে পাশ কাটিয়ে যে ছুট দেব তারও উপায় নেই। অগত্যা অসহায় চোখে তার দিকেই তাকালাম এবার।

সে আবার জিজ্ঞাসা করল, জিভ ভেঙচেছিলে কেন?

বললাম, কদিন ভাত না খেয়ে সেদিন মেজাজ ভালো ছিল না।

পুরু ঠোঁটে হাসি দেখে আমার ভয় কমে রাগ চড়তে লাগল। সে আবার বলল, তা বলে আমাকে জিভ ভেঙচানো কেন, আমি কি করেছিলাম?

আমার ভয় পেতেও সময় লাগে না আবার রাগতেও সময় লাগে না—এই রকমই স্বভাব আমার। বলে উঠলাম, আমার জ্বর হোক বা যা হোক, কার তাতে কি? দিদিদের জিজ্ঞাসা করার দরকার কি ছিল?

পুরু ঠোঁটের হাসিটা আরো স্পষ্ট। হাসি হাসি চোখ দুটো এখন যেন আরো বিচ্ছিরি।—সেইজন্যে তোমার রাগ হয়েছিল?

আমি মাথা নাড়লাম কি নাড়লাম না।

—এখন কি হচ্ছে, রাগ হচ্ছে?

আমি জবাব দিলাম না।

—তাহলে আর একবার জিভ ভেঙাও দেখি। সত্যি বলছি, আমার খুব ভালো লেগেছিল।

এবারে হনহন করে পাশ কাটিয়ে আমি চলে এলাম। বাড়ির যত কাছে এসেছি, তত মনে হয়েছে, ওর চুলের ঝুঁটি ধরে ঝুলে পড়লেই ঠিক কাজ হত।

ছোড়দি আর দিদি ব্যাপারটা শুনে তাজ্জব একেবারে। ছোড়দি বলল, বলিস কি রে, এ বাড়ির মেয়ের পথ আগলে দাঁড়ায় এত সাহস!

তখনো আমি জানি না, কোনোদিন গল্প লেখার ঝোঁক আসবে আমার। কিন্তু গল্পের মতোই কত সময় কত যে উদ্ভট কল্পনা মাথায় আসত আমার ঠিক নেই। সেদিন ছোড়দির কাছেই আমার কল্পনার একটা নিখুঁত প্রমাণ দিয়ে ফেললাম। ছোড়দিই আমাকে জ্বালায় বেশি, তাই ওর ওপরেই রাগ। হঠাৎই ওকে জব্দ করার মতলব মাথায় এসে গেল। বললাম, আসলে ও আমার জন্যে দাঁড়ায় না, আমাকে দেখেও না—তোকেই দেখে, তোর দিকেই তাকায়।

—কি? কি বললি? ছোড়দি মারমুখী অমনি।—তোকে কে বলল?

দিদিও ভয়ানক উৎসুক। আমি জবাব দিলাম, ও নিজের মুখেই তো বলল, বলল, তোর সঙ্গে ভাব করার খুব ইচ্ছে, তাই ফাঁকতালে আমার অসুখের অজুহাতে তোর সঙ্গে দুটো কথা বলে নিতে এসেছিল!

বিশ্বাস দুজনেই করল। ছোড়দির লাল মুখ তখন দেখবার মতো। আমি কি করে যে হাসি সামলে ছিলাম জানি না। রাগে গড়গড় করে ছোড়দি বলল, চাল নেই চুলো নেই, বস্তির মতো ঘরে থাকে

তার এত শখ! দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। ওর বউদি আবার আসুক ঠাকুমার কাছে—ঠাকুমার সামনেই বলব সব । সাহস বার করছি!

মিথ্যেয় মিথ্যে বাড়ে। ঠাকুমার সামনে যদি বলে কিছু তাহলে এই মিথ্যে নিয়েই গণ্ডগোল হতে পারে। ও ছেলে নালিশ স্বীকার তো করবেই না, উল্টে আবার হয়তো ক্যাঁক্ করে রাস্তায় ধরবে আমাকে।

তাই সামাল দিতে হল।—খবরদার কিছু বলিস না ছোড়দি, ও এক নম্বরের গুণ্ডা, মারামারি ছাড়া আর কিছু জানে না, বাড়ির লোকের শাসনও মানে না। তুই তো সর্বদা রাস্তায় বেরোস, শেষে মুশকিলে পড়ে যাবি। সত্যি আমাকে খুব ভদ্রভাবে বলেছে, একটুও খারাপ ভাবে বলেনি।

এ-কথায়ও ছোড়দির রাগ পড়ল না তেমন। কিন্তু সুনন্দর বউদি ঠাকুমার কাছে আসার পর ছোড়দিকে তার ধারে কাছেও না যেতে দেখে আমি নিশ্চিন্ত।

এরপর আবার নিয়মিত যেতে আসতে ওই মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলেও ছোড়দি আর কিছু বলে না। মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করে শুধু তাকায় দুই একবার।

ছোড়দিকে জব্দ করা গেছে বটে, তার মুখ বন্ধ। কিন্তু আমি যে সত্যি কথা বলিনি সে তো নিজে অন্তত জানি। তাই ওভাবে দাঁড়ানোটা আমারই চক্ষুশূল। অথচ কেউ যদি তার নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে কার কি বলার আছে?

ঠাকুমা একদিন ওদের বাড়ির প্রশংসা করছিল। ও-বাড়িতে এখনো সকাল-সন্ধ্যা কাঁসর ঘণ্টা বাজে, পুরুত নিয়মিত এসে পুজো করে, এ-সব ঠাকুমার ভারি পছন্দ। আর আমাদের ঠিক সেই কারণেই অপছন্দ। শুধু ওই ভাঙাচোরা বাড়িটা নয়, বাড়ির মানুষগুলোও যেন সব সেই পুরনো কালের কোনো এক কোণে পড়ে আছে। সে-কথা না বলে ঠাকুমার প্রশংসার জবাবে আমি ফস করে বলে বসলাম, কিন্তু ও-বাড়ির সুনন্দ না ফুনন্দ—সে একটা হাড়বজ্জাত ছেলে।

ঠাকুমা অমনি পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, কেন লা, তোর সঙ্গে ভাবসাব করতে চায় নাকি?

আমি জবাব দিলাম, আমার সঙ্গে কেন, তোমার সঙ্গে চায়—ডাকব একদিন?

—তা ডাক দেখি একদিন, দেখে শুনে রাখি, সময় হলে তোদের একটার দিকে চালান করে দেব। একটা তো নয়, তোদের তিনটের জন্য তিন-তিনটে নাগর চাই আমার, তোদের মা হতভাগী আচ্ছা কলে আটকে গেছে আমাকে, ভাবলেও বুক ঠাণ্ডা।

ছোড়দির বয়-ফ্রেন্ড অর্থাৎ রমেশ ভার্গবের সঙ্গে ছোড়দির ভাব ঘুচে গেল একদিন। তার উপলক্ষ আমি।

তেরো পেরিয়ে সবে চৌদ্দয় পা দিয়েছি। কিন্তু মনে মনে ধারণা বুদ্ধিটা বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পেকেছে। কিন্তু ছোড়দির সে ধারণা নেই। সে আগের মতোই আমার মারফত চিঠিচাপাটি চালাচ্ছে। আমার হাসিই পায়, দেখা প্রায় রোজই হয়, অথচ চিঠিও লেখা চাই। ওদিকে কলেজে ভর্তি হয়ে রমেশ আগের থেকে বেশি লায়েক হয়েছে। ফড়ফড় করে সিগারেট খায়।

রমেশকে একটাই কারণে আমার যা একটু পছন্দ। একলা দেখা-সাক্ষাৎ হলে ও আমাকে আর একটু বেশি খাতির করে। চিনেবাদাম আর আইসক্রিম তো আছেই, রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়েও বেশ খাওয়ায়-দাওয়ায়।

সেদিন গিয়ে দেখি রমেশের আর একরকম মুড। জলের ধারে বসে গম্ভীর মুখে সিগারেট টানছে। আমি গিয়ে বললাম, এই নাও তোমার চিঠি, আমার হয়েছে এক ঝকমারি কাজ।

নির্লিপ্ত মুখে হাত বাড়িয়ে চিঠি নিল। খুলে পড়ল না। আগের মতো সিগারেট খেতে লাগল।

—পাল্টা চিঠি-পত্র দেবে, না, আমি যাব?

—বোসো।

বসলাম। একটু চুপ করে থেকে ও বলল, আজ আমার মনটা ভয়ানক খারাপ আবার ভয়ানক ভালো।

—খারাপ কেন?

—বলার অসুবিধে আছে।

—আর, ভালো কেন?

—সেটা বলার আরো অসুবিধে।

—তাহলে তুমি বসে বসে সিগারেট খাও, আমি ছোড়িদিকে গিয়ে এই কথাই বলি।

সিগারেটটা জোরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর করুণ চোখে খানিক চেয়ে রইল আমার দিকে।—না, কিছু বলতে হবে না, চলো দুই একটা ফাউল কাটলেট খেয়ে নিই, তারপর কথা হবে।

ছেলেটাকে এই জন্যেই খুব বোকা ভাবি না আমি। আমার কোন জিনিসটা পছন্দ ও বেশ বুঝতে পারে।

রেস্টুরেন্টের এক কোণের ছোট কেবিনে গিয়ে বসলাম আমরা। ডিশে উপাদেয় বস্তু এবং আনুষঙ্গিক রসদ টেবিলে আসার পর রমেশ হঠাৎ উঠে কেবিনের পর্দাটা ভালো করে টেনে দিয়ে আবার মুখোমুখি বসল। বসেই খপ করে ওর ডান হাত দিয়ে আমার বাঁ হাতটা ধরল। তারপর যেন ঘুম ঘুম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খাও।

আমি বললাম, হাত না ছাড়লে কাঁটা-চামচ ধরব কি করে?

ও বলল, 'হাতে করেই খাও না, বাড়িতে কি কাঁটা-চামচ ব্যবহার করো?

অগত্যা আমি ডান হাতে আরও বাঁ হাতে করে খেতে লাগল। আমার বাঁ-হাত ওর ডান হাতে ধরা। আমার কেমন মনে হল সেই হাতে একটু একটু চাপ পড়ছে। আর, খুব ঘন-ঘন অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। ফাউল কাটলেট খাচ্ছে কি স্বপ্ন দেখছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

এমনি করে আমার খাওয়া প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ শেষ। আমার ডিশের দিকে একবার তাকিয়ে খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করল, আর একটা দিতে বলি?

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লাম, আর না। প্রথম কথা, আর এক প্রস্থ ডিশ এলে বাড়িতে ফিরতে দেরি হবে। দ্বিতীয় কথা, আমার একখানা হাতের ওপর ওর এই দখলটা আমার কেমন যেন ভালো লাগছিল না। তৃতীয় কথা, ওর হাব-ভাব আজ ভারি বিচিত্র।

রমেশ জিজ্ঞাসা করল, মন কেন খারাপ শুনবে?

কাটলেট মুখে আমি মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ শোনার ইচ্ছে আছে। ও প্রস্তাব করল, তাহলে আমি উঠি তোমার পাশের চেয়ারটায় বসি?...খুব চুপিচুপি বলব।

কে জানে কেন, তাড়াতাড়ি কাটলেট শেষ করে আমি বাধা দিলাম, না না, ওখান থেকেই আস্তে আস্তে বলো, আমি দিব্বি হাত-পা ছড়িয়ে বসেছি।

এমন চোখে চেয়ে রইল যেন এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে।—তুমি কাউকে বলবে না তো?

আমি মাথা নেড়ে আশ্বাস দিলাম, বলব না।

—মিস অদিতিকেও না?

সকরুণ আগ্রহ দেখেই আবারও আশ্বাস দিতে হল, বলব না।

একটু থেমে আমতা আমতা করে ও বলল, আমি আজই টের পেলাম, মিস অদিতিকে আমি ভালোবাসি না। অবশ্য মিস অদিতি খুব ভালো মেয়ে—খু-উ-ব।

ভয়ানক মন খারাপের কারণ বোঝা গেল। আমি খুব একটা চিন্তায় পড়লাম না এজন্যে। বড়জোর ছোড়দিটার কাটলেট খাওয়া বন্ধ হবে, এর থেকে বেশি ক্ষতি আর কি হবে?

ও টেনে টেনে বলল, আর মন খুব ভালো কেন শুনবে?

আমি উৎসুক নেত্রে তাকালাম।

—আমি আজই টের পেলাম আমি আর একটা মেয়েকে ভালোবাসি—ভয়ানক ভালোবাসি—সি ইজ্ সো লাভলি, আর কি, ফুল অফ্ লাইফ! আমি তাকে এক মিনিটের জন্যও ভুলতে পারছি না।

আমার দু'চোখ তার মুখের ওপর বড় বড় হয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, নতুন করে কোন মেয়েটা এমন কাটলেটের ভাগ্য করল। বোঝা গেল না। জিজ্ঞাসা করলাম, সেই মেয়ে কে?

জবাবে আমার দিকে খুব ফিসফিস করে বলল, সেই মেয়ে আমার সামনে বসে কাটলেট খাচ্ছে।

প্রথম অনুভূতিতে আমি বিষম খেলাম, কাটলেটের শেষটুকু গলায় আটকালো। দ্বিতীয় অনুভূতিতে হকচকিয়ে গিয়ে খানিক চেয়ে রইলাম। তৃতীয় অনুভূতিতে কাটলেট খাওয়া হাতেই ওর গালে ঠাস করে একটা চড় কষাতে ইচ্ছে করল—কারণ ওর হাতে ধরা।

সব-কিছুর পরে অবস্থাটা বে-গতিক গোছের খারাপ মনে হতে লাগল আমার। আমার বাঁ-হাত ও এত জোরে চেপে ধরে আছে এখন যে আঙুলগুলোর ডগায় রক্ত জমছে। ও আরো ঝুঁকে বলল, এবারে আমি তোমার পাশে গিয়ে বসি?

অজানা ভয়ে ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল।—কেন?

—বোকা মেয়ে, কিচ্ছু বুঝতে পারো না?

আমি দু'চোখ টান করে বুঝতে চেষ্টা করছি। ও এবার কাঁদ-কাঁদ মুখ করে বলে উঠল, তুমি খুশি হওনি? তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারবে না?

এখন এই খুপরি থেকে বেরুবার জন্য ব্যস্ত আমি। জবাব দিলাম, সবে তো আজ জানলাম, একটু ভেবে দেখি, কাল পরশুর মধ্যে মাঠে এসে তোমাকে বলব। এক্ষুনি না উঠলে বাড়ি থেকে লোক খুঁজতে বেরুবে। বলেই টেবিলের ঘণ্টাটা বার কয়েক জোরে জোরে বাজিয়ে দিলাম।

বয় আসার আগেই আমার হাতখানা খালাস পেল। বিরস মুখে রমেশ একটা পাঁচ টাকার নোট তার দিকে ছুঁড়ে দিল। আমি ততক্ষণে পরদা ঠেলে বাইরে।

আপনারা কেউ ভূত দেখেছেন? না, আমি কোনো প্রেত-আত্মা-টাত্মার কথা বলছি না। পর্দা সরিয়ে পা ফেলামাত্র সশরীরে এক জ্যান্ত ভূত দেখে মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে ত্রাসে কাঠ আমি। কেবিনটার মুখোমুখি বসে আমার চোখে সেই মুহূর্তে পৃথিবীর সব থেকে দুর্জন লোক সুনন্দ বোস। সামনে খাওয়া চায়ের পেয়ালা। এদিকেই চেয়ে বসে আছে। যেন আমারই অপেক্ষায় বসে আছে। চোখ থাকলে ঠোঁটের ডগায় একটু হাসিও দেখতে পেতাম হয়ত। কিন্তু আমি সেই মুহূর্তে চোখে সর্ষে ফুল ছাড়া আর কিছু দেখছি না।

সাড় ফিরতে প্রায় দৌড়েই রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। তার পরেই দেখলাম আমার একদিকে সুনন্দ দাঁড়িয়ে অন্যদিকে রমেশ। তখন কি-যে অবস্থা আমার আজ বোঝাতে পারি না। শ্যাম-কুল-দুই-ই বিসর্জন দিয়ে কোনো অস্তিত্বশূন্য গহ্বরে সেঁধিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।

সুনন্দ জিজ্ঞেস করল, প্রায় একঘণ্টা ধরে এত কি খাচ্ছিলে?

রমেশও এই বিঘ্ন দেখে ঘাবড়েছে একটু, সেটা বুঝতে না দিয়ে তড়বড় করে জিজ্ঞাসা করল, হু ইজ্ হি?

আমাকে বলতে হল না। বুকটান করে সুনন্দ তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।—ইয়োর ফাদার। পছন্দ হয়?

সঙ্গে সঙ্গে আর এক মূর্তি রমেশের। ঘাড় নেড়ে আর জিভে করে ঠোঁট ঘষে অস্ফুট স্বরে জবাব দিল, ইয়েস, ইউ আর ভেরি গুড! বাই-বাই—

চোদ্দ বছরের এক অবলা মেয়েকে বাঘের মুখে ফেলে রেখে খরগোশের মতোই দ্রুত প্রস্থান করল। পারলে আমিও বাড়ির দিকে ছুটি, কিন্তু পায়েব যেন আর নড়ার শক্তি নেই। এক পা দু'পা করেই এগোচ্ছি।

কিন্তু নচ্ছার লোকটা সঙ্গে সঙ্গে আসবে জানা কথাই। একটু বাদে বলল, সেই কতক্ষণ ধরে কত কি দেখলাম। পার্কে এসে ছেলেটার হাতে কি গুঁজে দিলে, তারপর কথা-বার্তা, তারপর রেস্টুরেন্টে চপ-কাটলেট—মিত্তির বাড়ির মেয়ের এই কাণ্ড! বাড়ি গিয়েই সব বলে দেব। হাসছে মিটিমিটি।

এরপর মাথা আর কার ঠিক থাকে বলুন? আমার অন্তত ছিল না। জবাব দিলাম, আর আমিও বাড়ি গিয়েই বলব, হ্যাংলার মতো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘোরে—

—আমার বাড়ির সামনে আমি দাঁড়াব আর সরকারি রাস্তায় হাঁটব, তাতে কার কি?

আমার সাহস বাড়ছে।—আমার খুশি আমি মাঠে আসব, রেস্টুরেন্টে যাব তাতে কার কি?

—ঠিক আছে, কার কি সেটা বাড়ি গিয়েই টের পাবে।

দুশ্চিন্তায় সত্যি কাহিল অবস্থা আমার। তবু তেজ দেখিয়ে জবাব দিলাম, বাড়িতে আর ঢুকতে হবে না, আমি তার আগেই ঠাকুমাকে বলব।

—আমি নিজে যাব কেন, আমি আমার বউদিকে বলব। বউদি তোমার ঠাকুমাকে সাবধান করে দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি ছিটকে উঠলাম, কেন? কিসের জন্য সাবধান করবে? ছোড়দির চিঠি দেবার জন্য এসেছি, চিঠি পেয়ে লোকটা আমাকে রেস্টুরেন্টে ডেকে নিয়ে এলো—তাতে দোষ কি হয়েছে?

—ও তোমার ছোড়দির ব্যাপার, তোমার নিজের কিছু নয় তাহলে? এবার গলার স্বর একটু সদয় যেন।

এক নম্বরের ভীতুর মতো গোপন কথা ফাঁস করে দিয়ে নিজের ওপরেই প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে।—নিজের ব্যাপার আবার কি?

সে-কথার জবাব না দিয়ে বলল, তোমার ছোড়দির জন্যই বাড়িতে সাবধান করা দরকার—এসব ভালো নয়।

—কেন, আপনি কি ছোড়দির গার্জেন?

—পাড়ার মুখোমুখি বাড়িতে থাকি, একটা কর্তব্য তো আছে।

কর্তব্য-ওলার মুখে ঝামা ঘষে দিতে ইচ্ছে করছিল আমার। কিন্তু এমন নিরুপায় অবস্থায়ও কেউ পড়ে? এটুকু বোঝার বুদ্ধি আমার আছে লোকটা কর্তব্য ফলালে ছোড়দির কপালে দুর্ভোগ আছে আর আমারও অব্যাহতি নেই।

একটু বাদেই আশ্বাসের সুর কানে এলো।—কিছু বলব না যদি একটা—একটা নয়, যদি দুটো কথা শোনো।

আমি আশান্বিত হয়ে তাকালাম। ও আবার বলল, আর কক্ষনো এ-ভাবে চিঠি-ফিঠি নিয়ে আসবে না।

বোকার মতো আমি ফস করে বলে বসলাম, আর চিঠি আনার দরকারই হবে না, ছোড়দি আর চিঠি লিখবেও না।

—কেন?

এবারে সামলাবার পালা। ঘটনা উল্টে দিয়ে বললাম, ছোড়দি আর ওকে একটুও পছন্দ করে না।

চিঠিতে তোমার ছোড়দি সেই কথা লিখেছে?

ঢোঁক গিলে মাথা নাড়লাম, তাই লিখেছে।

—তাই লিখেছে জেনেও তুমি রেস্টুরেন্টে ওর সঙ্গে খেতে এলে?

—বুঝুন কাণ্ড। যেন আমি আসামী আর উনি একজন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। ইচ্ছে হল বলি, বেশ করেছি। পরমুহূর্তে আবার সামাল দেবার বুদ্ধিই জাগল মাথায়। —চিঠি তো রেস্টুরেন্টে এসে খোলা হয়েছে, আগে কি করে জানব?

—ও। চিঠি পড়ে কি করল, কাঁদল-টাদল?

যা মাথায় আসছে তাই বলছি। জবাব দিলাম, না।...খুব মন খারাপ করে কাটলেটের অর্ডার দিল।

লোকটা জোরেই হেসে উঠল এবার। আর তাই শুনে রাগে আমার পিত্তি জ্বলতে থাকল।

হাসি থামিয়ে শেষে বলল, আচ্ছা, এবার দ্বিতীয় কথা শোনো—অর্থাৎ বাড়িতে কিছু ফাঁস না করার দ্বিতীয় শর্ত। আমি উদ্‌গ্রীব।

—তোমাদের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখনই আমাকে আমাদের বাড়ির সামনে দেখতে পাবে, তখনই কেউ যাতে দেখে না ফেলে এ-ভাবে চট করে আমাকে একবার জিভ ভেঙচাবে—রোজ একবার করে আর বেশ বড় করে। মনে থাকবে?

এ-রকম শর্ত কোনো মানুষ করতে পারে না। অতএব এটা ইয়ার্কির ব্যাপার। আমার যা মনের অবস্থা, পারলে ওর জিভ টেনে ছিঁড়তাম।

আমার মুখের দিকে চেয়েই ছোড়দি কিছু একটা গণ্ডগোলের আঁচ পেল বোধহয়। আসামাত্র আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গেল—তোর ফিরতে এত দেরি হল যে?

কে জানে কেন, রাগ আমার ছোড়দির ওপরেও হচ্ছিল। সোজা জবাব দিলাম, আমাকে ফাউল কাটলেট খাবার জন্য ধরে নিয়ে গেল তাই। তোকে আর চিঠি-ফিটি লিখতে হবে না, ওর তোকে আর ভালো লাগে না।

ছোড়দি হকচকিয়ে গেল প্রথম। তারপরেই রাগ।—ফাজলামো করতে হবে না। চিঠির জবাব দিয়েছে?

চিঠি খোলেইনি মোটে। যা বললাম সত্যি কথা, রমেশ বলেছে তোকে ভালো লাগে না, আমাকে ভালো লাগে। রেস্টুরেন্টে সারাক্ষণ আমার একটা হাত চেপে ধরে রেখেছিল, আর আমার পাশে এসে বসতে চেয়েছিল।

দু'চোখ কপালে তুলে ছোড়দি যেন আমাকেই নতুন করে আবিষ্কার করল একদফা। তারপরেই আগুন হয়ে বলে উঠল, পাজী, ছুঁচো, বদমাইশ—এত সাহস ওর! এই বলেছে—এই করেছে? আর এ-সব শুনেও আদেখলের মতো তুই কাটলেট গিলতে গেলি?

—আগে তো বলেনি, পরে বলেছে। কিন্তু এর থেকেও অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে, বুঝলি?

দুর্বোধ্য ভয়ে ছোড়দির দু'চোখ আবার আমার মুখের ওপর থমকালো।

—ও বাড়ির সুনন্দ সব টের পেয়েছে—ওর বউদিকে দিয়ে ঠাকুমার কাছে সব বলে দেবে বলেছে।

ছোড়দির মুখ চুন।—বলিস কি রে! কি করে জানলো?

মাঠে যখন যাই চুপি চুপি কেউ আমার পিছু নিয়েছে জানব কি করে? রমেশকে তোর চিঠি দিতে দেখেছে, আমাদের রেস্টুরেন্টে খেতে দেখেছে। এত বড় পাজী, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে রেস্টুরেন্টে এসেছে —আর যেই আমরা বেরিয়েছি ওমনি ক্যাঁক করে ধরেছে!

—কি সর্বনাশ! তারপর, তারপর?

—তারপর আর কি, ওর কথা শুনে আর মারমুখো ভাব দেখে রমেশ পালিয়েছে, আর ও সমস্ত রাস্তা শাসাতে শাসাতে এসেছে—তোর নামে ঠাকুমাকে বলবে।

—তুই বলে দিলি আমার চিঠি, আমি লিখেছি?

—না তো কি, আমার নিজের চিঠি আমি নিজে নিয়ে গেছি বলব?

কাঁদ কাঁদ মুখ করে ছোড়দি বলল, তাহলে কি হবে—ঠাকুমা জানলে তো ঠিক বাবাকে বলবে!

—আমি এবার আশ্বাস দিলাম, দুটো কাজ করলে বলবে না বলেছে।

—কি কাজ? তুই বললি না কেন করব? কি কাজ, বল্ না?

—একটা কাজ হল, রমেশকে আর তুই চিঠি লিখবি না।

—ওই রাসকেল্টাকে আবার চিঠি লিখব! তুই বলেছিস লিখব না?

—বলেছি।

—আর একটা কি কাজ?

এর জবাবে যা বলেছিলাম সেকি একদিন যে গল্প লিখব তারই নজির?

জবাব দিলাম, যখনি ওর সঙ্গে তোর দেখা হবে, একবার করে আর বেশ বড় করে ওকে তোর জিভ ভেঙাতে হবে।

ছোড়দি তক্ষুনি রেগে উঠেছে।—পাজী নচ্ছার, ইয়ার্কি পেয়েছে।

ঠাকুমার ডাক কানে আসতে কথা তখনকার মতো সেইখানেই ক্ষান্ত। পরে ভেবে-চিন্তে ছোড়দি একসময় চুপি চুপি বলল, দেখ আমি ভেঙাতে-টেঙাতে পারব না, তুই ছেলেমানুষ, আমার হয়ে তুই-ই একটু ভেঙিয়ে দিস না?

ওর দুরবস্থা দেখেই হাসি চেপে আমি বলেছিলাম, দেখি।

এর পর সুনন্দ বোসকে ওদের বাড়ির সামনে আরো বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। আর তখন সত্যি সত্যি রাগের চোটে আমার তাকে ভেঙাতে ইচ্ছে করত।

তিন

আমার ঠাকুরদা ছিলেন নাম করা উকিল। খানিক দূরে একই রাস্তার ওপর তিনটে বাড়ি করেছিলেন তিনি। পাঁচ ছেলে তাঁর। তাই আরো দুটো করার ইচ্ছে ছিল। এ ইচ্ছে তাঁর পূরণ হয়নি। তার আগেই তিনি চোখ বুজেছেন।

তখন মেয়েদের ভাগ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু পাঁচ ছেলের মধ্যেই বা তিনটে বাড়ি ভাগ হবে কেমন করে? আমার বাবাও উকিল। ঠাকুরদার ধারে কাছেও তাঁর পসার নয়। তার ওপর অসময়ে আমার মা গত হওয়াতে রোজগারের দিকে খুব একটা ঝোঁক ছিল না। পড়াশোনা করতেই বেশি ভালোবাসতেন। তবু বাবা আর কাকাদের মধ্যে বাবার রোজগারই কিছু বেশি। আর এই বাড়িটাই সব থেকে বড়।

ঠাকুমার মত নিয়ে ভাগ বাঁটোয়ারার একটা সুব্যবস্থাই করেছিলেন বাবা। তিনটে বাড়ির একসঙ্গে দাম ধরা হয়েছিল এক লক্ষ আশী হাজার টাকা। তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ছত্রিশ হাজার টাকা বাবার পাওনা। আর এই বাড়িটার আলাদা দাম ধরা হয়েছিল সত্তর হাজার টাকা। তার থেকে বাবার পাওনা ছত্রিশ হাজার বাদ দিলে থাকল চৌত্রিশ হাজার টাকা। এই টাকা বাকি চার ভাইকে ভাগ করে দিয়ে বাবা গোটা বাড়িটাই নিজের নামে করে নিয়েছেন। বাকি দুটো বাড়ি আর চৌত্রিশ হাজার টাকা আমার চার কাকার ভাগে গেছে। বাবার এই উদার ব্যবস্থায় সকলেই খুশী ছিল।

মায়ের কথা কিছু মনে নেই। ঠাকুরদার মরার চিত্রটা মনে আছে। বাড়িতে সে কি কান্নাকাটি, আর ঠাকুমার সে-কি অবস্থা। সেই থেকে মরার নামেই আমার বড় ভয়। বাড়ির সামনে দিয়ে 'বলো হরি' দিয়ে কাউকে নিয়ে গেলে আমার বড় বিচ্ছিরি লাগত। আর রাতে শুনলে তো কথাই নেই। ঠাকুমাকে দু'হাতে জাপটে ধরে তার বুকের সঙ্গে মিশে শুয়ে থাকতাম।

অল্প বয়সে মাকে হারিয়েছি বলে কিনা জানি না, কারণে অকারণে সেই ছেলেবেলা থেকে আমার ভিতরে কি রকম একটা ভয় মেশানো অনিশ্চয়তার ছায়া পড়ত। কেন বা কি সেটা কিছুই বুঝতাম না। সর্বব্যাপারে এ-রকম হত। সবেতে ভয় বা বিপদ বা শোকের কাল্পনিক প্রতিকূল চিত্রটা আগে মনে আসত।

ছেলেবেলা থেকেই তাই মনে মনে নিজেকে ভীতু বলে জানি। ফলে আমার বাইরের ব্যবহার বা চালচলন এর ঠিক উল্টো। সর্ব-ব্যাপারে এই ভীতু ভাবটা চাপা দেবার চেষ্টা। তাই বাইরের আচরণে যেমন সাহসী, তেমনি মুখরা, তেমনি বেপরোয়া। নিজের দুর্বলতা ঢাকা দেবার জন্য সেই ছেলেবেলো থেকেই আমি একটা বিপরীত খোলস আশ্রয় করে ছিলাম। সকলে সেই খোলসটাই দেখত, সেইটাকেই বিশ্বাস করত।

এ-ছাড়া, ওই বয়েস থেকেই অনেক রকম উদ্ভট কল্পনা আমার মাথায় আসত। কেউ কিছু অন্যায় বা অত্যাচার করেছে শুনলেই মনে মনে আমি ভয়ানক শক্তিমতী হয়ে গিয়ে কল্পনায় তাকে যথাযোগ্য শাস্তি দিতাম। ওই সুনন্দ বোসকে ওই গোছের কত শাস্তি যে দিয়েছি ঠিক নেই। তখন কি জানি ওর সঙ্গেই আমার জীবনের গাঁটছাড়া বাঁধা হবে? যাই হোক নিজের কল্পনায় সর্বব্যাপারে আমি মহীয়সী ও অদ্বিতীয়া!

শুধু এই লেখার মধ্যে কাল্পনিক বিষাদের চিত্রটাও ভালো ফোটাতে পারতুম। স্কুলে বিদেশ-ভ্রমণ রচনার উপসংহারে লিখেছিলাম, এ ভ্রমণে আমরা হাসিমুখে অভ্যস্ত হতে পারলে চরিত্রে একটা প্রস্তুতির বাঁধুনি আসবে। সেটা সম্বল করে তখন আমরা হয়ত এই ধরাধাম থেকে শেষের অজ্ঞাত বিদেশ-ভ্রমণের পথে পা বাড়াতেও ভয় পাব না। আসলে তো সবই ভ্রমণ—এই পৃথিবীতে আসাটাও, এখান থেকে যাওয়াটাও।

এই গোছের অনেক কিছু মাথায় গজাতো, আর সে-সব লিখেও ফেলতাম। এই করে শুধু স্কুলের মেয়েরা নয়, টিচারদেরও ধারণা হল আমি খুব ভালো বাংলা লিখি, আমার কল্পনাশক্তি প্রখর, আর চিন্তার মধ্যে মৌলিকতা আছে।

কে কি হবে বা হতে চায় তাই নিয়ে লিখতে দেওয়া হয়েছিল একবার। সেই প্রথম আমি বেশ স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছিলাম লেখিকা হবো। তার জন্য কি-রকম গুণাগুণ দরকার, প্রস্তুতি দরকার সে-সম্পর্কেও যা মনে আসে তাই লিখেছিলাম। সেই লেখাটা টিচার নিয়ে গিয়ে আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনের ছাত্রী সম্পাদিকার হাতে দিয়েছিলেন। তারপর একদিনের সে বিস্ময় আর পুলকের সীমা নেই। 'ভাবী লেখিকার স্বপ্ন' নাম দিয়ে লেখাটা স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে।

সেই থেকে নিজের কাছে অন্তত আমি লেখিকা হয়েই গেছি। সহপাঠিনীরাও বিশ্বাস করেছে লেখিকা হতে আমার আর বাকি নেই কিছু। সেই লেখাটা পড়ে বাড়ির সকলে খুশী। ঠাকুমা বাবাকেও সেই ছাপা লেখাটা দেখিয়েছে। আনন্দ ছোড়দিরও হয়েছে, আমার কিন্তু মনে হয়েছে সেই সঙ্গে ওর একটু হিংসেও হয়েছে কারণ এরপর কিছুদিন ওকেও লেখা মক্স করতে দেখেছি। আমাকে বোঝাতে চেয়েছে ইচ্ছে করলে ও এর থেকে ভালো ছাড়া খারাপ লিখবে না।

একটা কথা বলে রাখি। রমেশ ভার্গবের ওপর রাগ অনেক দিন পর্যন্ত যায়নি। সুনন্দ বোসের বাড়িতে সব বলে দেবার ভয়টা কেটে যাবার পর থেকে কারণে অকারণে সেই রাগটা ও আমার ওপর ফলাতো। না, রমেশ ভার্গবকে ও আর দু'চক্ষে দেখতে পারে না, দেখার সুযোগও আর ঘটেনি। কিন্তু আমার জন্যেই যে রমেশ ভার্গব ওকে বাতিল করেছিল—সেই ক্ষোভ ও বোধহয় শিগগির ভুলতে পারেনি।

ওদিকে একটা বছর যেতে না যেতে সুনন্দ বোস যে তার বাড়ির মাথায় কাউকে দেখার বা কারোর সঙ্গে দুটো কথা বলার আশায় তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে তাও বোধহয় ও টের পেয়েছে। তিন বোনের কেউ সত্যি আমরা ওকে সুচক্ষে দেখি না। তবু ছোড়দির ধারণা ওই একটা অতি বাজে লোকের আগ্রহ ক্রমে ওর দিক থেকে আমার দিকে ঘুরেছে। তাই যখন-তখন ঠেস-ঠোস দেয়, উপদেশও দেয়, বলে, খবরদার, ও একটা এক নম্বরের লোফার—ওর দিকে তাকাবিও না, কথাও বলবি না!

ষোল বছর হতে না হতে আমি পুরোদস্তুর লেখিকা হয়ে গেছি। সামনের বার উঁচু ক্লাসে উঠলেই আমি যে ছাত্রী-সম্পাদিকা হব তা স্কুলের জানা কথা। ইতিমধ্যে ছোটদের মাসিক পত্রে আমার অনেক গল্প আর কবিতা ছাপা হয়ে গেছে। মিশনারি স্কুলের প্রিন্সিপাল পর্যন্ত জেনেছে তাঁর স্কুলের এক ছাত্রী নামজাদা লেখিকা হতে চলেছে। ছোটদের সব কাগজেই আমি লেখা পাঠাতাম। তার মধ্যে কোনোও লেখাই ফেরত আসত না এমন নয়। যে লেখাগুলো ফেরত আসত সেগুলির অপরিচিত সম্পাদককে মনে মনে ভস্ম করতাম আমি।

লেখিকা হওয়ার আর একটা জ্বালাও টের পেতাম। সব ছাপা লেখা দুনিয়াসুদ্ধু লোক না পড়লে যেন শান্তি নেই। দু'চক্ষে দেখতে পারি না এমন যে-লোকটা এখনো ফাঁক পেলে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে—মনে মনে চাইতাম সেই সুনন্দ বোসও আমার ছাপা গল্প আমার কবিতা পড়ুক। বুঝুক আমি মেয়েটা কোন্ দরের।

এইখানে আর একটা কথাও বলে রাখি। ঠাকুমা বুড়ির অবিবেচনায় ষোলর আগেই আমাকে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরতে হয়েছে। ঠাকুমার মতে ধিঙ্গি মেয়েকে ফ্রক পরলে বিচ্ছিরি দেখায়। ওই মুখপুড়ি বুড়ি আর যে কথা বলত শুনলে রাগও হত আবার, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ফ্রক-পরা মূর্তির দিকে চেয়ে লজ্জাও করত। ঠাকুমা বলত, বাড়ন্ত শরীর এখন, ফ্রক পরলে কি বিচ্ছিরি দেখায় আয়নায় দেখিসও না!

আমি খেঁকিয়ে উঠতাম, মেমসাহেবরা তোমার মতো বুড়ি হয়েও ফ্রক পরে কি করে?

ঠাকুমা সমান তালে জবাব দিত, তা বলে তোরাও মেমসাহেবদের মতো ঠ্যাং দেখিয়ে বেড়াবি! যে দেশের যা—

যাই হোক, আমাকে একটু আগেই শাড়ি ধরতে হয়েছে। ঠাকুমা গজগজ করে বলত, ওই মেজ ছুঁড়ীটা রোগাপটকা বলে ওকে তবু কিছুকাল মানিয়েছে, তোকে মানায় না। আর এই শাড়ি পরতে শুরু করার পর থেকে স্পষ্টই আর একজনের চাউনি-বদল লক্ষ করেছি আমি। এর পর থেকে আমাকে

দেখলেই প্রথম কিছুদিন অন্তত ওর ছোট ছোট চোখদুটো আগের থেকে অনেক বেশি উৎসুক হয়ে ওঠে, আর পুরু ঠোঁটের ডগায় খুশির দাগ পড়ে। আর, তাই দেখে রাগে শাড়ি ছেড়ে আবার ফ্রক ধরার ইচ্ছে হত আমার।

যে কথা বলছিলাম, লেখিকা হওয়ার এমনই যাতনা যে, মনে মনে চাইতাম ওই চক্ষুশূল সুনন্দ বোসও আমার ছাপা লেখা পড়ুক আর অবাক হোক।

অবাক একদিন আমিই হলাম।

শুনেছি, সে-বছরেই বি-কম না কি পাস দিয়ে দিগ্গজ হয়ে সামনের ভাঙাবাড়ির ঐ ছেলে কোনো একটা ব্যাঙ্কে কেরানীগিরিতে ঢুকেছে। মনে হয় ওর বয়েস তখনো বাইশ ছাড়ায়নি, ওই বয়েসেই চাকরিতে ঢুকে হাব-ভাব বেশ একটু ভারিক্কি হয়ে উঠেছে। হঠাৎ এক ছুটির দিনে বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখি গম্ভীর মুখে রকে বসে কি একটা পড়ছে। আমাকে দেখেই মুখ তুলে তাকালো একবার, তারপরেই হাতের বস্তুটা আর একটু তুলে ধরে বেশ মন দিয়ে পড়তে লাগল। আর তক্ষুনি খুশির বদলে কেন যেন আমার প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল।...লোকটার হাতে ছোটোদের একটা রং-চঙে মাসিকপত্র। দিনকয়েক আগে ওই কাগজটা আমার কাছেও এসেছে, কারণ ওতে আমার একটা গল্প ছাপা হয়েছে।

আমি না দেখেও বলে দিতে পারি ওর সামনে কোন পাতাটা খোলা। আর এও বলে দিতে পারি ও কিছুই পড়ছে না, আসলে আমাকে দেখিয়ে মজা করছে।

আমি হন-হন করে এগিয়ে গেলাম। কাছের ওষুধের দোকান থেকে ঠাকুমার জন্য কি একটা ওষুধ আনতে বেরিয়েছিলাম।

—শোনো।

আমি চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম। ওই উপদ্রব। হাসছে একটু একটু। বলল, তোমার গল্পটা পড়লাম।

এমনভাবে বলল যেন গল্প পড়ে আমাকে কৃতার্থ করেছে। এই কাগজেই আমার লেখা বেরিয়েছে জানল কি করে ভেবে পেলাম না। কিন্তু তার পরেই যে মন্তব্য করল শোনামাত্র মাথায় ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে থাকল। বলল, একেবারে ছেলেমানুষি ব্যাপার, মেয়ের লেখা বলেই ও-রকম কাঁচা লেখা ছাপা হয়েছে।

কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, কাঁচা পাকা চিনতে হলে একটু লেখা-পড়া জানার দরকার হয়, হাঁ-করে দাঁড়িয়ে থাকলেই হয় না।

শাড়ি পরার পর থেকে আমার বাইরের সাহস অন্তত বেশ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

জবাবে সে মস্ত মাতব্বরের মতো হাসতে লাগল। বলল, তুমি রাগ করছ কেন, পাঠক হিসেবে সমালোচনা করব না!...আগের দু'চারটে কবিতা পড়েছি, সে বরং মন্দ লাগেনি।

ও পড়বে জানলে আমি কবিতা লিখতাম না এমন মুখ করে আমি হনহন করে বাড়ির পথে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। তার পরেই মনে পড়ল ঠাকুমার ওষুধ কিনতে বেরিয়েছি। আবার ওই মূর্তির পাশ কাটিয়েই সামনের দিকে এগোতে হল। আর তখন মনে হল গা-জ্বালানো একটা নীরব হাসি আমার সর্বাঙ্গে লেগে আছে।

আমার বয়েস তখন ষোল ছাড়িয়ে সতের চলছে। স্কুল ফ্যাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছি। তখনো রেজাল্ট বেরোয়নি। সকলের ধারণা ভালোই পাশ করব। আমারও এক এক সময় সেই রকমই মনে হয়েছে। আবার কি জানি কি হয় ভেবে ভিতরে ভিতরে একটু উতলাও বোধ করি। কিন্তু সেটা গোপন।

এই সময়েই পর পর কয়েকটা ঘটনায় আমাদের বাড়ির বাতাস হঠাৎ বদলে গেল। প্রথমে একটা আনন্দের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। দিদি ভারতীর বেশ বড়ো ঘরে বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের পরিবারের সব থেকে বড়ো উৎসব। কিন্তু উৎসবের গোড়াতে ছোটো-খাটো একটু নিরানন্দের ব্যাপার হয়ে গেল। আর উৎসবের পরেও তার চাপা একটা অপ্রীতিকর জের চলল।

দিদির বরের নাম অমরেন্দ্র দত্ত। এ-যুগের চাকরির বাজারে কৃতী মানুষ। ভালো স্কলার। আই. এ.

এস্. পরীক্ষায় মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করে অল্প বয়সে বড়ো চাকরিতে ঢুকেছে। এ-রকম জামাই আনার যোগ্য মর্যাদা দিয়ে কাজে এগোবার জন্যে বাবাও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ছেলের বাবার বিচারে সে যোগ্যতা কাকে বলে বাবার ধারণা ছিল না।

সে ভদ্রলোকের আবার ধারণা তাঁর ছেলের মতো এতবড়ো কৃতী ছেলে এ যুগে আর হয় না। অতএব সেই অনুযায়ী তাঁর প্রত্যাশা। শুধু তাঁর নয়, তাঁর গৃহিণীরও। ঠিকুজিতে রাজ-যোটক মিল হওয়া এবং তিন দাদা দেখাশোনার পর যখন স্থির হল এখানে ছেলের বিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তখন ছেলের বাবা প্রথম দাবি জানালেন, দশ হাজার নগদ দিতে হবে, পঁয়ত্রিশ ভরি সোনা।

বাবা বললেন, দেব।

পরের লিস্ট্, ছেলের সব থেকে দামী ঘড়ি, হীরের বোতাম, হীরের আঙটি, ফ্রিজ, ফার্নিচার, কাঁচ-বসানো আলমারি, ডাইনিং টেবল্, রেডিওগ্রাম ইত্যাদি।

বাবা বললেন, দেব।

তৃতীয় দফা মেয়েদের লিস্ট্। আরো কিছু বাড়তি গয়না, অতখানা বেনারসী, নমস্কারীর অতখানা গরদ আর অতখানা এমনি দামী শাড়ি। সব মিলিয়ে তাও সাড়ে তিন ডজন হবে। এই লিস্টের মধ্যেই কয়েক দফা রূপোর আর স্টেইনলেস বাসনের সেট।

বাবা জানালেন দেওয়া হবে। এই সঙ্গে বাবা আর একটু বেশি মুখ খুললেন। বললেন, আপনারা ফর্দ না পাঠালেও এ-সব দেওয়া হত।

পাকাদেখা হয়ে যাওয়ার পর প্রস্তাব এলো, আলমারি দুটো হলেই ভালো হয়—একটা ছেলের, একটা মেয়ের। নইলে মস্ত চাকুরে ছেলের অনেক দফা স্যুট-টুট রাখার অসুবিধে। ছেলের বাবার হয়ে যে আত্মীয়টি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, বাবা তাকে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন এখন সে-সব কোথায় রাখা হয়?

যাক, যে এসেছে সে কোনোরকম জবাবদিহি করতে আসেনি। গম্ভীর মুখে বাবা তাকে জানিয়েছেন, আচ্ছা দেওয়া হবে। তার পরেই ঠাকুমার কাছে এসে বলেছেন, এখানে কাজে এগিয়ে ভালো করলাম না।

দাবির ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেলেও বোধহয় কারো মনে সে রকম বড়ো কিছু দাগ পড়ত না। বিয়ের মাত্র সাতদিন আগে শেষ আরজি নিয়ে উপস্থিত ছেলের বড়ো ভগ্নীপতি। জামাইকে (একমাত্র জামাই) বলে কয়ে দিদির হবু শ্বশুরই পাঠিয়েছেন। সে-ভদ্রলোক মাথা চুলকে জানালো, বক্তব্যটা একটু ডেলিকেট। ছেলে হঠাৎ মুখ ফুটে একটা ইচ্ছে জানিয়েছে, শ্বশুরমশাই তাই জামাইকে পাঠিয়েছেন। আলমারি দুটো লাগবে না, একটাতেই হবে...তার বদলে ছোটো-খাটো একটা গাড়ি যদি দেওয়া হয় ছেলেকে তাহলে সকল সাধ পূর্ণ হয়।

দিদির হবু-শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে শুনলেই আমরা আড়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়তাম। এই আরজি শুনে আমি আর ছোড়দি সভয়ে বাবার দিকে তাকালাম। মাথার ওপর পাখা ঘোরা সত্ত্বেও বাবার কপালে যেন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

খানিক চুপ করে থেকে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো ভদ্রলোকের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেছেন, আপনাকে এ-সব দেওয়া হয়েছে?

ভিতরে ভিতরে বড়ো রকমের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটলে বাবার মুখ দিয়ে এমন কথা বেরোয় না। দিদির হবু-নন্দাইয়ের মুখ কালো। জবাব দিল, আজ্ঞে না, ছেলে দেখে কথাটা তোলা।

বাবা জবাব দিলেন, আমার শক্তি নেই, পারব না।

ভদ্রলোক চলে গেল। সেই বিকেলেই দিদির হবু-শ্বশুরের কাছ থেকে পত্রদূত এলো। চিঠির বক্তব্য, তাঁর জামাইকে মাননীয় অতিথি হিসাবেই গণ্য করা উচিত ছিল। তাকে কি দেওয়া হয়েছে না হয়েছে সে-প্রশ্ন তোলা আদৌ সুরুচির পরিচায়ক হয়নি। যাই হোক, নতুন কুটুম্বিতার মধ্যে তিনি তিক্ততা সৃষ্টি করতে চান না। তাঁর কেবল বক্তব্য, মেয়ের নিতান্ত সুকৃতির ফলেই এমন যোগ্য ছেলের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন ঘটতে যাচ্ছে। এ-কথা চিন্তা করেও ছেলে যে জিনিসটা মুখ ফুটে চেয়েছে সে-সম্বন্ধে

আর একবার বিবেচনা করা উচিত।...আর নিতান্তই যদি ছোটো-খাটো একটা গাড়ি দেওয়া এখন সম্ভব না হয়, ভবিষ্যতে সম্ভব হবে এমন প্রতিশ্রুতি পেলেও সপুত্র তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

দূত বিদায় করে বাবা ঠাকুমাকে এসে বললেন, এ বিয়েতে আর এগিয়ে কাজ নেই।

ঠাকুমা প্রথমে আকাশ থেকে পড়লেন। পরে সব শুনে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। ও-দিকে লজ্জায় অপমানে দিদিও কাঁদতে লাগল।

বাড়ির বাতাস থমথমে। ছোড়দি দিদির সেই হবু-শ্বশুর ভদ্রলোককে চামার বলে গালাগালি দিতে লাগল। দাদাও যা মুখে আসে তাই বলতে লাগল। আমার কেবল মনে হতে লাগল যদি আমাদের এত টাকা থাকত যে যা-খুশি করা যায়, যা-খুশি কেনা যায়—তাহলে দিয়ে দিয়ে ওই-অদেখা বুড়ো ভদ্রলোকের আমি দম বন্ধ করে ছাড়তাম। আবার রাগ যেতে না যেতেই ত্রাস। কেনাকাটা সারা, ব্যবস্থা সারা, এখন কি হবে?

ভেবে-চিন্তে বাবা ঠাণ্ডা মাথাতেই জবাব দিলেন, যোগ্য জামাই আনার আগ্রহে এতখানি সাধ্যের বাইরে তিনি এগিয়েছেন, ধারণা ছিল না। গাড়ি দেবার প্রতিশ্রুতি দিতেও তিনি অসমর্থ। আর, ভাবী বৈবাহিকের জামাতা বাবাজী ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বলে তিনি অনুতপ্ত। নিজের দীন দশার যাতনায় এমন উক্তি তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে থাকবে।

আমার ধারণা, গাড়ি যদি বাবা একটা দিতে পারতেন তাহলে ওর ডবল কথা শোনালেও বর বা বরের বাপের গায়ে ফোস্কা পড়ত না। বিয়ে নির্বিঘ্নেই হয়ে গেচে, কিন্তু ঠারে-ঠোরে বিয়ের আসরেই ছেলের বাবা আমার বাবাকে কিছু কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন, সবই নিয়তি নির্বন্ধ, যেখানে যার ঘর ঠিক করা আছে সে সেখানেই যাবে নইলে এ-রকম একটা ছেলের জন্য দেওয়া-থোয়ার তো কত লোকই ছিল। দান সামগ্রী যা দেওয়া হয়েছে ভদ্রলোক একটি একটি করে তা মিলিয়ে নিয়েছেন, আর, কোথাও ফাঁক বা ফাঁকি আছে কিনা তা খুঁটিয়ে লক্ষ করেছেন।

জীবনে সেই প্রথম বাস্তব দেখেছি যেন আমি। আক্রোশে এই বাস্তব নিয়ে আমার একটা গল্প লেখার বাসনা ছিল। দিদির কথা ভেবেই আর এগোইনি। শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রথমবার ফিরে আসার পরেই দিদির হাব-ভাব আর কথা-বার্তা শুনে আমি আর ছোড়দি আড়ালে হেসেছি। কত বড়ো যোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, দিদি এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছে। ওর বর নাকি কখনই আদেখলের মতো এটা চাই ওটা চাই করেনি। গাড়ির কথা একবার মুখ ফুটে বলেছিল এই মাত্র। বাবার সাধ্য নেই শোনার পর আর একবারও নাকি ও নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। সব ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর কাণ্ড।...তবে, দিদিরও মত, বিয়ের আগে নন্দাইকে ও-ভাবে কথা শোনানো বাবার উচিত হয়নি। এই নিয়ে নাকি বাবার সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা হয়েছে ওর শ্বশুরবাড়িতে।

আমাদের ভগ্নীপতি অমরেন্দ্র দত্ত মানুষটা অপছন্দের নয়। একে বিদ্বান, তার ওপর কতো বড়ো চাকরি করে সে-সম্বন্ধে নিজেই একটু বেশি মাত্রায় সচেতন। এ-সবের একটু আলগা জলুস আছেই। গোড়ায় গোড়ায় একটু গম্ভীর থাকত। সেটা বিয়ের আগের অপ্রীতিকর ব্যাপারটার দরুনও হতে পারে। পাওয়া-থোয়ার ব্যাপারে তার কোনো লোভ নেই—দিদি এ-কথা বললেও ছোড়দির কাছে অন্তত সেটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। কিছুদিন না যেতে মুখ মচকে ছোড়দি আমাকে বলেছে, বড়ো চাকরি করলে কি হবে, বিষয়বুদ্ধি খুব টনটনে। নতুন বিয়ে হলে শালী-টালী নিয়ে লোকে কতো ফুর্তি করে আর খরচা করে—কিন্তু সে-বেলায় হাতের মুঠো একেবারে বন্ধ।

আর, বড়ো চাকুরে ভগ্নীপতি সম্পর্কে দাদার উক্তি আরো বাঁকা। ভাগ্যিস্ দিদির কানে যায়নি। দাদা ফস করে বলে বসেছিল, সাড়ে সাতশ টাকা তো মোটে মাইনে এখন, ভারি বড়ো চাকরি। ও যদি বড়ো চাকরি হয় তো লাইসাহেবের হেড খানসামা আরো বড়ো চাকরি করে।

বাড়ির হাওয়া বদলের দ্বিতীয় ঘটনা এই দাদাকে নিয়ে।

বাবার সঙ্গে আমাদের বাক্যালাপ এমনিতে খুবই কম। সেই বাবা হঠাৎ এক সন্ধ্যায় ঠাকুমার সামনেই গুরুগম্ভীর মুখে দাদাকে ডেকে পাঠাতে আমরা ঈষৎ সচকিত।

দাদার মুখের দিকে চেয়ে বাবা সোজা জিজ্ঞেস করলেন, ময়দানের দিকে বিকেলে যে মেয়েটির সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম, সে কে?

আচমকা আক্রান্ত হবার ফলে দাদার বিবর্ণ মূর্তি। ওদিকে আমাদেরও যেন আকাশ থেকে পতন। মৃদু কঠিন গলায় বাবা আবার বললেন, শুধু আজ নয় আরো দুদিন দেখেছি। কে মেয়েটি? কি জাত?

ঠোঁটে জিভ ঘষে দাদা জবাব দিল, কায়স্থ।

তুমি তাকে বিয়ে করবে?

এখন নয়...পরে।

...তাহলে ঘোরাঘুরিটাও পরে করলে ভালো হয় না? তুমি কি করো না করো সে জানে?

দাদা সভয়ে মাথা নাড়ল, জানে।

বাবা ঠিক বিশ্বাস করলেন বলে মনে হল না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, কি ইচ্ছে না ইচ্ছে ঠাকুমাকে সব বলো, আমি পরে শুনে নেব। এভাবে ঘোরাঘুরি আমি পছন্দ করি না।

ঠাকুমার চোখজোড়া কপালে উঠেছিল এতক্ষণ। ঘরের বাইরে আমাদেরও। হঠাৎ বড়োলোক হওয়ার চিন্তা ছাড়া দাদার মাথায় আর কিছু আসে, আমাদেরও ধারণা ছিল না। যদি শুনতাম দাদা একসঙ্গে হাজার খানেক টাকার লটারির টিকিট কিনেছে তাহলে বোধহয় একটুও অবাক হতাম না।

দাদার যে বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে বাড়ির মধ্যে সে-কথা একমাত্র ঠাকুমাই বলত। দিদির থেকেও বছর তিনেকের বড়ো, দাদার বয়েস পঁচিশ হবে। কিন্তু বাড়িসুদ্ধ লোক দাদাকে ছেলেমানুষই ভাবত। বাবা চলে যেতে ঠাকুমার রাগ আর বিস্ময় একসঙ্গে ভেঙে পড়ল—পাজী, হতচ্ছাড়া, ডুবে ডুবে এই কাণ্ড তোর? তোকে আজ আমি পাখার ডাঁটি দিয়ে পিটব, আয় এদিকে। ছুঁড়ী দেখতে কেমন?

ঠাকুমাকে দাদা থোড়াই কেয়ার করে।

—ভালো না।

—তাহলে তুই কি দেখে মজলি?

দাদা হেসেই জবাব দিল, আমি মজিনি।

—ও ছুঁড়ী মজেছে এই মাতাল কার্তিক দেখে?

আমাদের ভাইবোনের মধ্যে দাদার চেহারাই সব থেকে ভালো। হেসেই মাথা নাড়ল, তাই।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করল, ঘর কেমন?

—ভালো।

—বয়েস কতো?

একটু ভেবে দাদা বলল, একুশ। পরে জেনেছি মেয়ের বাইশ ছাড়িয়েছে। দিদির থেকেও একটু বড়ো। কিন্তু একুশ শুনেই ঠাকুমার অপছন্দ। বলে উঠল, তুই সেদিনের ছোঁড়া, একুশ বছরের মেয়ে নিয়ে তুই করবি কি?

দাদা হাসতে লাগল।

মেয়ের নাম সুরমা। বি. এ. পড়ে। এই প্রথম বছর। ওরা ঠিক করেছে শুনলাম, সুরমা বি. এ. পাস করার পর বিয়ে হবে। ইতিমধ্যে দাদা চেষ্টা করবে চাকরিতে কিছু উন্নতি হয় কি না। দাদা একটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে যাতায়াত করে, কি চাকরি করে বা কতো মাইনে পায় আমরা কিছুই জানি না, বাড়ির কেউ জানে না। হাতে পয়সা যা পায় তার অর্ধেকের বেশি বোধ খরচ হয় নিত্য নতুন জামা-প্যান্ট তৈরি করতে। তা ছাড়া হেন লটারি নেই যার টিকিট দু'চারখানা করে না কেনে। ওদিকে ছুটির দিনের দুপুরে বাড়ির নীচের ঘর বন্ধ করে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তাস খেলে। তাতে যে টাকা পয়সার লেনদেন হয়, তা আমরা দু'বোন অন্তত বেশ জানি। মাথা খাটিয়ে এ পর্যন্ত ব্যবসার নামেও কিছু টাকা জলাঞ্জলি দিয়েছে সে-খবরও রাখি।

এই দাদা কিনা প্রেম করতেও জানে!

ছোড়দির আগ্রহেই দাদা একদিন তার ভাবী বউ দেখালো আমাদের। তাছাড়া ব্যাপারটা যখন বাবা সুদ্ধ জেনেছে তখন আর অত রাখ-ঢাকার কি আছে? কিন্তু সত্যি বলতে কি, দাদা যেমনই হোক, তার এ-রকম বউ হবে আমরা আশা করিনি। রোগা লম্বা নিতান্ত সাদা-মাটা চেহারা। গায়ের রং আমার থেকেও দু-প্রস্থ মাজা। তবে কথা-বার্তা বলার পর আমার কিন্তু খারাপ লাগেনি। বেশ নরম অথচ

বুদ্ধিমতী মনে হয়েছে। কিন্তু পরেও ভরসা করে ছোড়দিকে সে-কথা বলতে পারিনি। কারণ, দাদার অসাক্ষাতে ছোড়দি প্রথমেই বলেছে, দাদার মাথা খারাপ হয়েছে, ঠাকুমাকে বলে যে-করে হোক এই বিয়ে বন্ধ করা উচিত। লোকে ছি-ছি করবে।

ছোড়দির এতটা বাড়াবাড়ি আমার ভালো লাগেনি। ঠাকুমাকে অতটা বলেনি অবশ্য। কিন্তু যেটুকু বলেছে তাইতেই এক অদেখা মেয়ের ওপর ঠাকুমার মেজাজ খাপ্পা। রাগে গজগজ করে বলে উঠেছে, রূপ দেখে ও মেয়ে নিজে মজে কি-ভাবে মুণ্ডু ঘুরিয়েছে ছেলেটার ঠিক কি! আভাসে ঠাকুমা বাবাকেও বলেছে, ওই মেয়ে তো দেখতে একটুও ভালা নয় শুনলাম, তুই নিজেও তো দেখেছিস—পছন্দ যদি না হয় তো চঞ্চলকে বল্—আরো দুই একটা মেয়ে দেখ্ শোন্।

বাবা নির্লিপ্ত। জবাব দিয়েছেন, হাত পা বেঁধে কেউ তো আর মেয়েকে জলে ফেলে দেয় না। তোমার নাতির জন্যে ওর থেকে ভালো মেয়ে আসবে না।

এ বিয়ে ঠেকানো যাবে না বোঝাই গেল। জানাজানি হবার পর চোখে আর একবার দু'বার পড়ে গেলে আর একজনের বি. এ. পাস করার আগেই বিয়েটা হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। চোখে না পড়লেও হতে পারে। কারণ, দাদা আজকাল দরজা বন্ধ করে ভাবী বউকে এক-আধটা চিঠিও লিখতে শুরু করেছে নিশ্চয়। নইলে ঢোক গিলে হঠাৎ একদিন 'দীর্ঘ নিঃশ্বাস' আর, আর একদিন 'ঊর্ধ্ব' বানান জিজ্ঞাসা করতে আসবে কেন আমাকে। ফলে ঠাকুমাকে চুপিচুপি একদিন আমিই আশ্বাস দিয়েছিলাম, এমন কিছু খারাপ মেয়ে নয়, কথা-বার্তা বলে আমার তো অন্তত খারাপ লাগেনি—

রাগত মুখে ঠাকুমা জবাব দিয়েছে, কথা-বার্তা ধুয়ে তোরা জল খেগে যা—

আমি মুখরার মতো বলেছি, অপরের মেয়ের বেলায় বলতে খুব সুবিধে, আমার বেলায় যদি কেউ এ-রকম বলে তোমার শুনতে কেমন লাগবে শুনি?

ঠাকুমা আরো রেগে গেছে।—তোকে কুৎসিত বলবে কোন্ ড্যাকরা রে? মাথাটা মুড়িয়ে দেব না তার! গায়ের রং ধপধপে সাদা হলেই রূপ খোলে না, বুঝলি? শ্রী থাকা চাই।

জানি, ঠাকুমার চোখে আমার থেকে শ্রীমতি কম মেয়েই। আর এই কারণেই ঠাকুমার চোখের ওপর ছোড়দির এতটুকু আস্থা নেই। ঠাকুমার ঠিকুজি কুষ্ঠি ঘাঁটা বাই ছিল আগেই বলেছি। অনেক বারের কথা-বলার পুনরুক্তি করেছে আমার কথার জের ধরে।—তোর থেকে ভালো বিয়ে আর কারো হবে না আমি জোর গলায় বলে রাখছি। আর জন্ম তুই উমার তপস্যা করেছিলি। তোর ঠিক শিব জুটবে দেখিস।

অনেক বারের শোনা হলেও শুনতে ভালোই লেগেছিল।

এই সময়েই আর একটা বড়ো পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। সে পরিবর্তন আমার নিজের জগতেরই।

স্কুল ফ্যাইন্যালের রেজাল্ট বেরুল, ঠিক তার আগের সন্ধ্যায় কেউ বুঝি আমার সমস্ত গায়ে জল-বিছুটি ঘষে দিল। পরীক্ষার ফল দেখে আমি তাজ্জব। সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছি। ছাপার অক্ষরে সেই ঘোষণা দেখেও আমার বিশ্বাস হয়নি। আমারই নামের নীচে লাল দাগ—আর তার পাশে দু-নম্বর দেখেও না। পরে নম্বর আনিয়ে জেনেছি বাংলা ইংরেজি আর সংস্কৃত ছাড়া অন্য বিষয়গুলোতে আমি কোনো রকমে পাস করে গেছি এই পর্যন্ত। বাংলায় অবশ্য খুবই ভালো নম্বর পেয়েছি—য়ুনিভার্সিটিতেই অত নম্বর খুব কম ছেলে মেয়ে পেয়েছে বোধহয়।

যাই হোক, আগে নামের নীচে লাল দাগের কথা বলে নিই।

রেজাল্ট কবে বেরুবে বা বেরুতে পারে সেটা ঠিক আমার মাথায় ছিল না। কিন্তু কারো মাথায় ছিলই। সামনের ওই ভাঙা বাড়ির সুনন্দ বোসের মাথায় অন্তত ছিলই।

রেজাল্ট বেরুবার আগের সন্ধ্যায় সুনন্দর বউদি ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। হাতে একটা পাতলা চটি ছাপা বই। হেসে হেসে ঠাকুমাকে বলল, নাতনির পাসের খবর এনেছি, কি খাওয়াবেন বলুন।

কতো বড়ো ধড়িবাজ ছেলে বুঝুন। একসন্ধ্যা আগে কি করে ওই ছাপা বই সংগ্রহ করল সেটাই অবাক কাণ্ড। সে-ই যে বউদির হাত দিয়ে বই পাঠিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ফল জানার আগে আমার অতশত ভাবার সময় ছিল না। শঙ্কিতচিত্তে ছাপা বইয়ের পাতা উল্টেছি। তার পরেই চোখে কাঁটা। নামের পাশে ছাপার অক্ষরে দু-নম্বর। আর নামের নীচে লাল পেন্সিলের দাগ!

আমার বদ্ধমূল ধারণা আমাকে জব্দ করার জন্যেই আগেভাগে ওই বই সংগ্রহ করা হয়েছে। আর আমাকে জব্দ করার জন্যেই দাগ মেরে বউদির মারফত ওটা এ-বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। ওই লাল দাগের ভিতর দিয়ে একখানা কালো মুখ আর পুরু ঠোঁটের ব্যঙ্গ হাসি যেন ফুটে বেরুচ্ছে। ঠাকুমাকে সত্যি রসগোল্লা আনিয়ে ওর বউদিকে খাওয়াতে দেখে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। আমি তক্ষুনি সেখান থেকে উঠে এসেছিলাম।

এরপর পরীক্ষকের থেকেও সুনন্দ বোসের ওপরেই আমার রাগ বেশি। ক'দিন ধরে আমি শুধু ওর ওপরেই জ্বলেছি। সে-জ্বলুনি ছোড়দিও টের পেয়েছে। বলেছে, সত্যি, তোর পেছনে আচ্ছা লাগা লেগেছে লোকটা।

ছোড়দির মুখের এই উক্তি প্রায় অশালীন লেগেছে আমার তবু নিরুপায়।

শিগগিরই মোক্ষম সুযোগ পেলাম একটা। ক'দিনের জন্য আমার আহার নিদ্রা ঘুচে গেল।

সেদিনও সুনন্দ বোসের বউদি এসেছিল ঠাকুমার কাছে। ইদানীং তার আসা-যাওয়া একটু বেড়েছে লক্ষ করছিলাম। ওদের বাড়ির একজনকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না, সেই রাগে ওই বউদিটি এলেও আমি ঠাকুমার ঘরে থাকি না। কিন্তু সেদিন যোগাযোগ এমনি যে আমার চুলের ঝুঁটি ঠাকুমার হাতের মুঠোয়। ঠাকুমা মাঝে মাঝে তেল ঘষে আমার চুল সংস্কার করতে বসে। সেদিনও তাই বসেছিল।

সুনন্দ বোসের বউদি সেদিন হাসিমুখে তাদের বাড়ির এক কাণ্ড বলল ঠাকুমার কাছে। কাণ্ডটা হাসির নয় আদৌ, বরং ভাবতে গেলে মর্মান্তিক। কাণ্ড শুনে ঠাকুমাই শুধু দুঃখে আহা-আহা করে উঠেছিল।

ব্যাপারটা সাদামাটা ভাবে বললেও এইরকম দাঁড়ায় :

মহিলার বৃদ্ধ শ্বশুর অর্থাৎ সুনন্দ বোসের বাবা প্রায় অথর্ব শয্যাশায়ী এখন। তার ওপর এতো লো-প্রেসার যে উঠতে বসতে মাথা ঘোরে। পাড়ার দু'টাকা ফিয়ের ডাক্তারের নির্দেশ মাছ দুধ ঘি ছানা ইত্যাদি খাওয়াতে হবে। তা সংসারের যা অবস্থা, এতসব হয় কি করে। একমাত্র ঠাকুরপো (সুনন্দ বোস) বাড়তি যা ক'টা টাকা ধরে দেয়, বাপের জন্য তাই দিয়ে যেটুকু হয়।

কিন্তু বুড়োর আবার এমনি রোগ যে কিছুই একলা খেতে পারেন না! আর, পারবেনই বা কি করে, বড়ো ছেলের ঘরের চার-পাঁচটা ছোটো ছোটো নাতি-নাতনি—তাদের চোখের সামনে একলা ভালো জিনিস খাওয়া শক্ত। দাদুর ডাক শুনলেই তারা খাবার লোভে দৌড়ে আসে। তাদের মা (মহিলা স্বয়ং) চেষ্টা করে দাদুর খাওয়ার সময় ছেলেমেয়েদের তফাতে রাখতে, কিন্তু ওদের দাদুর জন্যেই পেরে ওঠে না। দাদুও তাদের না ডেকে পারে না।

কিন্তু এদিকে ভালো পুষ্টির অভাবে বুড়ো শ্বশুরের শরীর দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে। সেইজন্যে বুড়োর নিজেরও মন খারাপ, দুশ্চিন্তা। ভালো যেটুকু বরাদ্দ, নাতি-নাতনিদের দিয়ে-থুয়ে তাঁর বরাতে কমই জোটে।

এর ওপর হঠাৎ কদিন ধরে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটতে লাগল। বিকেলে বুড়োর বরাদ্দ ছানার অর্ধেকটা কে যে কখন চুরি করে খেয়ে যায় মহিলা টের পায় না। ওইটুকু ছানা শ্বশুরের সামনে ধরে দিতে তার মাথা কাটা যায়। এগারো বছরের বড়োছেলের বা ন'বছরের মেয়েটার কাণ্ড ভেবে কদিন তাদের ধরে ঠেঙানো হয়েছে। ওরা স্বীকার করে না দাদুর ছানা খেয়েছে। ওদের মারতে দেখে শ্বশুর তো একদিন ছানা খেলই না।

সেদিন দুপুরে এই কাণ্ড। দু'চোখ সবে লেগে এসেছিল মহিলার। হঠাৎই কেমন মনে হল রান্নাঘরে কেউ শ্বশুরের ছানা চুরি করে খাচ্ছে না তো! ছুটির দিন বলে বড়ো ছেলে আর মেয়েটাও তো

বাড়িতেই। মনে হওয়া মাত্র মহিলা উঠল। ঘরের বাইরে এসেই দেখে রান্না ঘয়ের দরজা খোলা। সঙ্গে সঙ্গে আবার ভিতরে ঢুকে পেটবার জন্য পাখাটা তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে এসেই হাঁ একেবারে।

গো-গ্রাসে ছানা গিলছেন শ্বশুর নিজেই। তাড়াতাড়ি গেলার তাড়ায় মুখ থেকে বেরিয়েও পড়েছে খানিকটা। একদিকে মহিলা আর ছুটে পালাবার পথ পাচ্ছে না, অন্যদিকে শ্বশুরের ছানা ভরতি মুখ একেবারে চোরের মুখ।

হাসিমুখে কাণ্ডটা বলতে বলতে চোখে জল আসার উপক্রম সুনন্দ বোসের বউদির। বলছিল, এমনই পোড়া অবস্থা মা কি বলব, শিশুগুলোকে না দিয়ে খেতেও পারেন না, আবার পুষ্টির অভাবে বেশিদিন টিকবেন না সেই ত্রাস এমন যে নিজের ছানাই চুরি করে খেতে হয়।

কাণ্ডটা শোনার পর থেকে আমি যেন কি-রকম হয়ে গেছলাম। আক্রোশে আর উদ্দীপনায় তিন দিন পর্যন্ত ভরপুর সারাক্ষণ। রাত জেগে বহুবার কাঁটাছেঁড়া করে সেই প্রথম বড়োদের জন্য একটা গল্প লিখেছি আমি। হুবহু ওই ঘটনাটাই গল্পের বিষয়বস্তু। ব্যতিক্রম কেবল বুড়োর দুই ছেলের চরিত্র-বিশ্লেষণে।

আমার গল্পের দুই ছেলের মধ্যে বড়ো ছেলে সংসারের কাঠামো আর বাপের দেহ-যন্ত্র সচল রাখতে দিনরাতের পরিশ্রমে শরীরের রক্ত জল করে ফেলছে। আর ছোটো ছেলে বাবুয়ানা করে ব্যাঙ্কে কেরানীগিরি করতে যায়, আর অবসর সময়ে বাড়ির সামনে হাঁ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে মেয়েদের রূপ দেখে। ওদিকে পুষ্টির অভাবে বুড়ো বাপ ভয়ে ত্রাসে নিজের বরাদ্দ ছানা নিজে চুরি করে খায়।

গল্পটা এক নাম-করা সাপ্তাহিক কাগজেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই সে-গল্প ছাপা হয়ে যেতে বিস্ময়ে আনন্দে অস্থির আমি। অতবড়ো সাপ্তাহিকের সম্পাদক নিজে আমাকে 'পুষ্টি' গল্পের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। লিখেছেন, এমন বাস্তবধর্মী গল্প মেয়েরা কমই লিখতে পারেন। সেই গল্প পড়ে দিদির স্কলার এবং বড়ো চাকুরে বরও সেই প্রথম আমার লেখার প্রশংসা করেছে।

কিন্তু এত আনন্দের থেকেও আমার আক্রোশ কম নয়। যার জন্য লেখা সে দেখল কি না। ছোড়দির সঙ্গে পরামর্শ করে একখানা সেই সাপ্তাহিকপত্র কেনা হল। তারপর নিজেদের নাম ধাম না দিয়ে সেটা সুনন্দ বোসের নামে বুকপোস্ট করে দেওয়া হল।

দুদিন বাদে আশা সফল হল আমার। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েই ওই মূর্তি দেখলাম। চার চোখে মিলন হল। কিন্তু শুভদৃষ্টি নয় সেটা। সুনন্দ বোসের দু'চোখ আমার চোখের ওপর স্থির, ভাবলেশশূন্য। আর আমার দু'চোখ খরখরে আক্রোশে ভরা।

এরপর অবশ্য আমার একটু দুশ্চিন্তা হয়েছে, লোকটা তার বউদিকে গঞ্জনা দেবে কিনা। কারণ, গল্প কার মুখ থেকে শুনেছি সেটা বার করা এমন কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু সে দুর্ভাবনা পরদিনই কেটে গেছে। ওর বউদি আগের মতো হাসিমুখেই ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করে গেছে। গল্পের খবরও রাখে না।

পরদিন। আমি আর ছোড়দি গাড়িতে দিদির ওখানে যাব। গাড়িতে উঠতেই ছোড়দি বেশ জোরে চিমটি কাটল একটা। সামনে চেয়ে দেখি সুনন্দ বোস অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে।

আমাদের দেখে রাস্তা ডিঙিয়ে সোজা গাড়ির সামনে চলে এলো। একটু ঝুঁকে আমার দিকে চেয়ে বলল, বই পেয়েছি, গল্পও পড়েছি। ভালো লেগেছে।

ড্রাইভারের দিকে চেয়ে আমি ঝাঁঝিয়ে উঠেছি।—চালাও।

কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যে যে ব্যাপারটা ঘটল তার জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। মনে বরং প্রচুর আনন্দ ছিল। পুষ্টি গল্পের দরুন মাত্র তিন দিন আগে কুড়িটা টাকা পেয়েছি। সেই প্রথম উপার্জন আমার। কুড়ি টাকা পাওয়ার আনন্দ কুড়ি হাজারের মতো।

হঠাৎ সেদিন বিকেলের দিকে সামনের ভাঙা-বাড়িতে গাড়িওলা ডাক্তারের আনাগোনা চোখে পড়ল। পরদিনও। ঠাকুমা বলল, বুড়োর অবস্থা খারাপ। তার পরদিন বাড়িতে কান্নাকাটি।

সুনন্দ বোসের বাবা মারা গেলেন।

আমি হঠাৎ যেন কি এক বিচ্ছিরি রকমের অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। কেবলই মনে হতে লাগল এই একটা মৃত্যুর সঙ্গে আমার যেন কি একটা যোগ থেকে গেল। ওরা দেহ তুলে নিয়ে গেল। সকলের সঙ্গে আমি দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াতে পারলাম না। অন্ধকার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম। দেহ তোলার আগে উস্কো-খুস্কো মূর্তি সুনন্দ এ-বাড়ির দিকে তাকাল, একবার, তা লক্ষ করলাম।

দিন সাত আট বাদে ওকে আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখলাম। এগারো দিনে শ্রাদ্ধ করবে। বাবাকে নেমন্তন্ন করে গেল।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়া পর্যন্তই আমার ভিতরে ভিতরে কি একটা অজ্ঞাত অনুশোচনা ছিল। তার পর থেকে আর একদিনও ওই মূর্তিকে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল না। ছোড়দি বলল, তোর গল্পে কাজ হয়েছে। আমিও ভাবলাম তাই হবে।

এর মাস খানেক বাদে কানে এলো সুনন্দর বউদি ঠাকুমার কাছে দুঃখ করছে, তাদের সংসার প্রায় অচল হয়ে উঠেছে। তার দেওরের মতি-গতি কিরকম অবুঝ হয়ে উঠেছে। এই দুর্দিনের বাজারে হটাৎ অফিসের এক বড়ো কর্তার সঙ্গে রাগারাগি করে ব্যাঙ্কের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বসল। ব্যাঙ্কের সেই বড়ো কর্তা নাকি একটা মোটা বাঁধানো খাতা তার হাতের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আর তক্ষুনি সেই খাতা তার পায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেওর সেই যে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে আর ও-মুখো হয়নি। দাদা তার হাত ধরে সাধ্য সাধনা করেছে, তবু না।

আরো কিছুকাল বাদে কানে এসেছে, মহিলার দেওর কোন্ দুই একটা ওষুধের দোকানে অ্যালুমিনিয়মের কৌটো সাপ্লাই করে বেড়াচ্ছে। এর থেকে রোজগার কি হয়, বা কিছু হয় কিনা, কেউ খবর রাখে না। আমরা আর কোনোদিন, এমন কি কোনো ছুটির দিনেও সুনন্দ বোসকে আর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি।

মোট কথা লম্বা পাঁচ বছরের মতো আমার জীবন থেকে সুনন্দ বোস নামে এক উপদ্রব মুছে গেছে। আমি আর তার অস্তিত্বের খবরও রাখি না।

চার

এবারে পাঁচটা বছরের যবনিকা তুলে আবার শুরু করা যেতে পারে।

আমার বয়েস বাইশ। বাংলায় এম. এ. পড়ছি। শুধু পড়ছি না, এই একটা বিষয়ে নিজের চটকদার আসন আমি অনেকের ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছি। না, বি. এ.-তে ফার্স্টক্লাস পাইনি। এম. এ. তেও পাব এমন আশা রাখি না। অপরে রাখে কিনা জানি না। তবু ফার্স্টক্লাস পাওয়া ছেলে-মেয়েরা আমাকে একটু ঈর্ষার চোখে দেখে।

আমি কবিতা লিখি, গল্প লিখি। সেই গল্প আর কবিতা নিয়ে তরুণ মহলে অন্তত আলোচনা হয়। ছেলেরা ছেড়ে অল্প-বয়সী মাস্টারদেরও আমার প্রতি একটু বাড়তি মনোযোগ অনুভব করতে পারি। ছুটির দিনে আমাদের বাড়িতে সাহিত্যের আলোচনাচক্র বসে। এক একদিন সাংস্কৃতিক হৈ-চৈ মন্দ জমে না।

এই পাঁচ বছরে বাড়ির সমাচারে কিছু যোগ-বিয়োগ হয়েছে।

পাঁচ বছরের গোড়ার বছরেই সুরমা আমাদের বউদি হয়ে এ-বাড়িতে পদার্পণ করেছে। সে-বিয়েতে ঘটা খুব একটা হয়নি। বউদির বাবা কর-জোড়ে আমার বাবার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁকে কি করতে হবে।

বাবা বলেছিলেন, ছেলে যখন পছন্দ করেছে, মেয়েটিকেই শুধু দিতে হবে। আর কিছু করতে হবে না। মেয়ের বাবা হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন।

এই গোছের বিয়ে ঠাকুমার খুব পছন্দ হয়নি। মেয়ের রূপ নেই, সেই সঙ্গে দেওয়া-থোয়াও নেই—এ ভালো লাগবে কেন। বাবা বলেছেন, বি. এ.-টা পাস করুক, তারপর হয়ত চাকরি করেই ছেলেকে খাওয়াতে হবে—দেবে আবার কি।

বউ দেখে ঠাকুমার মুখ আরো বিষণ্ণ হয়েছে। আমাদেরও ভয় ছিল ওই বউকে ঠাকুমা দু'চক্ষে দেখতে পারবে না।

কিন্তু পৃথিবী গুণের বশ। বউদিটির মতো এমন নরম আর মিষ্টি মানুষ আমি কম দেখেছি। আর বুদ্ধিমতী যে সে-সম্বন্ধে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। তার রূপ নেই সে জানে। তার বাবার বিত্ত নেই তাও জানে। তাই এ-বিয়ের ফলে আমাদের বাড়ির প্রতিটি লোকের কাছে সে যেন কৃতজ্ঞ। তার বিনিময়ে প্রত্যেককে আপনার করে নেবার চেষ্টা।

প্রতি সন্ধ্যায় ঠাকুমার পা টিপেই তার মন জয় করে ফেলল সে। ঠাকুমার রান্নাও বউদি নিজের হাতে করবেই। যা-কিছু ভালো হবে, বাবাকে নিঃশব্দে দিয়ে আসবে। সত্যি কথা বলতে কি বাবাকে এত যত্ন-আত্তি আমরা জীবনে কখনো করিনি। এই বউদিকে দেখেই নিজেদের অনেক ত্রুটি চোখে পড়ে।

বছর না ঘুরতে শুধু বাবা আর ঠাকুমা নয়, আমরাও তার ওপর কেমন নির্ভরশীল হয়ে পড়লাম। ঠাকুমা তো তাকে চোখে হারায়। বলে, কি করে যে ওই ছোঁড়াটাকে তুই বশ করেছিস এখন বুঝতে পারি। সকলেই তোয়াজের বশ। আর, আমি অন্তত বুঝতে পারি ঠাকুমার পরে ওই বউয়ের ওপর সব থেকে খুশি বাবা। বউদিকে ডেকে আভাসে ইঙ্গিতে প্রায়ই বলতেন, ঠিক-ঠিক রোজগারের দিকে দাদার মতি-গতি যাতে একটু ফেরে সেই চেষ্টা করতে।

এ চেষ্টায় বউদি ব্যর্থ হয়েছে তাও ঠিক। হেসে হেসে বউদি আমাদের বলে, ওই এক জায়গাতেই পাত্তা পেলাম না ভাই।

দাদার রোজগারের নেশা আরো বেড়েছে বলেই আমার ধারণা, অপচয়ও আগের থেকে বেড়েছে।

সংসারের ঝামেলা এ-ভাবে কাঁধে নেবার ফলেই বউদির বি. এ. পাস করা আর হল না। অবশ্য পড়াশোনার প্রতি তার তেমন আগ্রহও ছিল না। তার ওপর বছর না ঘুরতে একটা ছেলে হল দাদার। পড়াশুনোর চেষ্টাও শিকেয় উঠল। এই চার বছরে দাদার আরো একটা ছেলে আর একটা মেয়ে হয়েছে। বউদি বয়সে আমার থেকে কয়েক বছরের বড়ো হলেও মুখে যা আসে বলতে আটকায় না। শেষের মেয়েটা হবার পরেই আমি বউদিকে বলেছি, আর নয় বাপু, এবারে ক্ষান্ত দাও।

মুখ টিপে হেসে বউদি জবাব দিয়েছিল, চঞ্চলবাবুকে আর একটু সুস্থির হতে বলো।

দু বছর আগে ছোড়দি অদিতির বিয়ে হয়ে গেছে।

আমার জগতে বড়ো রকমের পরিবর্তন যা-কিছু এসেছে, তার পিছনে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রেরণা যোগাতো একটি লোক—ছোড়দির বর মনোতোষ চৌধুরি। সর্বতোভাবে এমন একটা সম্পূর্ণ মানুষ আমি আর বুঝি দেখিনি।

না, প্রেম করে বিয়ে হয়নি ছোড়দির। বাবার এক বন্ধুর মারফত যোগাযোগ। বড়দির বিয়েতে বাবা মনে মনে আঘাত পেয়েছিলেন। বড়ো চাকুরে জামাই আনার লোভ আর তাঁর ছিল না। বাবা বিয়ে দিতে দেরি করছিলেন বলে ছোড়দির মন-মেজাজ ভালো থাকত না। আমরা ঠাট্টা করলে মেজাজ আরো বিগড়ত। শেষে যোগাযোগ যখন হল ছোড়দির মুখে খুশি ধরে না। দেখা গেল, এই জামাই বড়ো চাকরি না করলেও ঢের বড়ো বনেদি ঘরের ছেলে, আর ঢের বেশি বিত্তবান।

ছেলে চাকরি করেই না। ব্যবসা করে। কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা। কিন্তু এদিকে এম. এ. পাস। তাঁর বাবা ছিলেন দেশের একজন নাম-করা কর্মী। তিনি বিগত। ওই ছেলে এখনো দেশের গণ্যমান্য কাণ্ডারীদের বিশেষ স্নেহভাজন। বিয়ের পর ছোড়দির বাড়ি গিয়ে এক-একদিন কত যে আনন্দ নিয়ে ফিরেছি ঠিক নেই। সেখানে এমন সব লোকের সঙ্গে অনায়াসে আলাপ পরিচয় হয়েছে যাঁদের চেহারা এ-যাবৎ কেবল খবরের কাগজের ছবিতেই দেখেছি। তাঁদেরই স্নেহ-ভালোবাসায় ছোড়দির বরের ভাগ্যস্থানে বৃহস্পতি। ধুলোমুঠো ধরলে সোনা হয়।

ছেলের সমস্ত বৃত্তান্ত জানার পর বাবা চট করে এগোতে সাহস করেননি। নিজের সঙ্গতি জানেন। কিন্তু যোগাযোগের ফলে ছেলে নিজে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এলো ছোড়দিকে দেখতে। কিন্তু ছোড়দিকে দেখবে কি, ছেলেকে দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। ছোড়দির এত ভাগ্য হবে কিনা সেই সংশয় জাগল। যেমন ফর্সা, তেমনি সুন্দর স্বাস্থ্য, নাক-মুখ-চোখ যেন শিল্পীর আঁকা। তার থেকেও সুন্দর, মুখের মিষ্টি হাসিটুকু। ঠোঁটের ডগায় সারাক্ষণ যেন ওই হাসি লেগেই আছে।

বেশ সুন্দর ভদ্র পরিবেশের মধ্যেই ছোড়দিকে দেখা হয়ে গেল। মেয়ে দেখার আনুষ্ঠানিক সিরিয়াস ভাবটা ওই ভদ্রলোকই কাটিয়ে দিল। বাবা ইচ্ছে করেই ঘরে নেই, তাই কথাবার্তারও অসুবিধে নেই কিছু। ছোড়দিকে আনার দু'মিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোক ঠাকুমাকে বলল, আমরা মেয়ে দেখতে আসার আগে আপনারা ছেলে দেখতে চান না কেন? একমাত্র এই করলেই ছেলেরা ঠিক ঠিক জব্দ হতে পারে।

ঠাকুমা তক্ষুনি জবাব দিল, পরে তো সমস্ত জীবন ধরেই তোমাদের জব্দ হওয়া আছে ভাই, তাই গোড়াকার সুবিধেটা তোমাদেরই দিই।

পরদিনই টেলিফোনে তারা খবর দিল, পছন্দ হয়েছে, কাজে এগোনো যেতে পারে।

বাবার শরীর ভেঙে পড়েছিল। প্রায়ই ভোগেন। নিয়মিত কোর্টে যেতে পারেন না। তাই মনোবলও কম। এখানে দাবিদাওয়া কি রকম হবে কে জানে।

না, দিদির বিয়ের মতো এখানে লিস্ট ধরে দাবি-দাওয়া কেউ করল না। বিয়ের খরচা বাবদ কেবল হাজার পাঁচেক টাকা নগদ নিল তারা। তারপর মেয়ে-জামাইকে বাবা যা দেবেন তার ওপর আর কথা কি।

অতএব আনন্দের সাড়া পড়ে গেল বাড়িতে। কিন্তু কাজে নেমে বাবা হাত টান করতে পারলেন না। বনেদী ঘরে মেয়ে যাচ্ছে, না চাইলেও বাবা না দিয়ে পারেন কি করে। তাছাড়া দিনকালের দরুন প্রতি জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। হতে হতে সেই খরচাই হল। কেবল দিদির বিয়ের তিক্ততাটুকু বাদ গেল।

বিয়ের পরদিন। ছোড়দি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। উৎসবের ভাঙা হাটে আমরা কলরব করে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ ঠাকুমার ঘরে ঢুকে দেখি বাবা ঠাকুমার বিছানায় শুয়ে আছেন। ঠাকুমা আদর করে ছেলের মাথায় হাত বুলোচ্ছে আর বলছে, তুই কিছু ভাবিন না খোকা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

শরীর বাবার থেকেও ঠাকুমার বেশি খারাপ চলেছে। বয়েসটাই রোগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু ঠাকুমা সর্বদা সেটা বুঝতে দেয় না। তাই আমাদের বাবাকে নিয়েই চিন্তা বেশি। আমি এগিয়ে গেলাম।—কি হয়েছে, বাবার শরীর খারাপ নাকি?

ঠাকুমা জবাব দিল, না, এখন তোর জন্যে চিন্তা ঢুকেছে মাথায়, বলছে, হাতে তো আর কিছুই থাকল না, অথচ পরের মেয়ের বিয়ে তো এখন দিলেই হয়।

আমার বয়েস তখন উনিশ ছাড়িয়ে কুড়ি চলেছে। বাবা সাধারণত গম্ভীর মানুষ। কিন্তু মনে হল বাবা যেন কেমন অসহায় চোখে আমার দিকে চেয়ে আছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম, আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না তো বাবা—ছোড়দির কত ভালো বিয়ে হল সেকথাই চিন্তা করো।

বাবা বললেন, সে-জন্যে নয়, শরীরটাই কেমন ভেঙে যাচ্ছে, কোর্টে আবার আগের মতো যাতায়াত করতে পারলে বছর দুইয়ের মধ্যে তোর ব্যবস্থাও আমি করে ফেলতে পারব।

আমি জবাব দিলাম, সুস্থ শরীরে কোর্টে তুমি যাতায়াত কোরো, তা বলে আমার জন্যে তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না।

খুশি হয়ে ঠাকুমা বাবার সামনেই মন্তব্য করল, ও বোধহয় নিজের চিন্তা নিজেই করে রেখেছে। আমি তো তোকে বলে রেখেছি, ও ছুঁড়ীর জন্য তুই কিচ্ছু ভাবিস না—তোর সবকটা মেয়ের থেকে ওর ভালো বিয়ে হবে দেখিস। তোর টাকা থাক আর নাই থাক—

আমি লজ্জা পেয়ে ঠাকুমার উদ্দেশ্যে চোখ রাঙিয়ে চলে এসেছি। কিন্তু বাবার সামনে এই অনেকবারের শোনা কথা অদ্ভুত মিষ্টি লেগেছে।

যত মিষ্টিই লাগুক, ছোড়দির থেকে ভালো বিয়ে কারো হতে পারে, আপাতত আমি ভাবতে পারি না। সার্থক নামও বটে ছোড়দির বরের। নামে মনোতোষ, রূপে মনোতোষ, গুণে মনোতোষ। হাসিখুশি, দিলদরিয়া রসিক মানুষ। তার রসিকতার ছোঁয়ায় দিদির বর বড়ো চাকুরে অমর দত্তও একটু রসিক হয়ে উঠল। তাকে দেখলেই মনোতোষ চৌধুরি এক-গাল হেসে বলে উঠত, দাদা, তোমরাই ভাগ্যবান— গবু-চন্দ্র রাজার সরকার চালাচ্ছ—পায়ের ধুলো দাও।

সেদিন শুনলাম, আমার দিকে একবার কটাক্ষে চেয়ে অমরদা জবাব দিল, আসল ভাগ্যবান তো ভাই তুমি, এত সহজে রমণীর মন জয় করতে পারো।

কটাক্ষ আমাকে নিয়ে। আর সেটা একেবারে মিথ্যে নয়। হেসে গড়িয়ে ছোড়দি তক্ষুনি আমাকে চোখ রাঙিয়েছে, দুর্নাম রটলে তোকে কিন্তু আমি আস্ত রাখব না!

ঘরে বাইরে মনোতোষ চৌধুরীর সর্বত্রই একটা আদরের নাম আছে। মনতু। ছোড়দির বর এই নামটাই চালু করে সর্বত্র। মনতু, মনতু চৌধুরী। আমাদের বাড়িতেও সে মনতু হয়ে উঠেছে সাতদিন না যেতে। ঠাকুমা আর বাবার আদরের মনতু, বউদির মনতুবাবু, আমার আর দিদির মনতুদা।

ছোড়দির ভ্রূকুটির জবাবে মনতুদা টেনে টেনে পাল্টা শাসালো যেন, আমার প্রিয় সখীকে আস্ত না রাখলে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে মনে করো?

বিয়ের পনেরো দিন না যেতে আমি মনতুদার প্রিয়সখী, আর দিদি 'হার ম্যাজেস্টি'। এরই মধ্যে মনতুদা আমার লেখার ভক্ত। মন দিয়ে লেখা শোনে, পরে নাটকীয় উচ্ছ্বাসে বলে, তুমি একটা জিনিয়াস, চালিয়ে যাও আমি আছি তোমার পিছনে। তুমি সাহিত্য-মধু পরিবেশন করে যাও, আমি আছি তোমার একমাত্র ভক্ত মৌমাছি।

আমি জবাব দিয়েছি, মৌমাছির ভনভন আমার ভালো লাগে না।

—তুমি আমাকে হতাশ করলে প্রিয়সখী, আমি মনতু মৌমাছি ভনভন করি না—গুনগুন করি!

সকোপে ছোড়দিকে দেখাই আমি।—ওই কানে গুনগুন করো গে যাও।

দিদির বরকে 'আপনি' করে বলি, কিন্তু এই ভদ্রলোক 'আপনি' বলাটা নিজেই বাতিল করেছে। নিষেধ করার পর যতবার সেটা লঙ্ঘন করেছি ততবার মনতুদাও আপনি-আজ্ঞে করে জবাব দিয়েছে।

আমার ছদ্মকোপের জবাবে বড়ো নিঃশ্বাস ফেলে মনতুদা জবাব দিয়েছে, তোমার ছোড়দি তো আছেই, পুরুষ মানুষের যে ফাউয়ের দিকে বড়ো লোভ প্রিয়সখী। কি বলো দাদা?

দাদা অর্থাৎ অমরদার সমর্থন মেলে, বটেই তো।

আমি হেসে বলে উঠেছি, ও-সব একজন আধজন ভক্ত নিয়ে আমার চলবে না।

অমরদা রসের যোগান দিতে চেষ্টা করেছে, মনতুর পরে আমিও তো আছি!

এই ভদ্রলোকও দুটো ছেলেমেয়ের বাপ তখন। ফলে মাঝে আরো গম্ভীর হয়ে পড়েছিল। তার পরিহাস অবশ্যই অতটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। তবু ভালো লাগত। মনতুদার দিকে চেয়ে আমি ভাবতাম, কৌতুকোচ্ছল রসিক মানুষের জীবনশক্তি আছে বটে।

বিয়ের এক মাস না যেতে হঠাৎ এক সন্ধ্যার মজলিশে আমার ওপর চড়াও হল মনতুদা। সেখানে তখন দিদি বা অমরদা নেই। শুধু আমি, ছোড়দি আর বউদি আছি। গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করে বসল আমাদের ভায়ার খবর কি?

দাদার কথা কি কার কথা জিজ্ঞাসা করছে সঠিক বুঝলাম না। দাদাকে ভায়া কখনো বলে না, অসাক্ষাতে 'প্রিন্স' বলে। প্রশ্নের পুনরুক্তি করল আবার।—জিগগেস করছি সুনন্দ বোসের খবর কি, রাস্তায় চড়াও-টড়াও করছে আজকাল।

আমি হতভম্ব। গত ক'টা বছরের মধ্যে যে মানুষটার আর অস্তিত্ব নেই আমার কাছে, তাকে নিয়ে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে ছোড়দি তার বরের কানে রসের খোরাক জুগিয়েছে! ভালো বিয়ে হওয়ার আনন্দে ছোড়দিটা জ্ঞানগম্যি খুইয়েছে মনে হল। ওদিকে বউদিও অবাক। রাস্তার উল্টোদিকের বাড়ির সুনন্দ বোসের নামটা তার শোনা না থাকার কথা নয়। ও-বাড়ির মহিলাটির সঙ্গে বউদিরই এখন বেশি ভাব। এক-এক দিন সমস্ত দুপুর দুজনে গল্প করে কাটায়।

সঠিক না বুঝে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, ওই সামনের বাড়ির সুনন্দ বোস?

মনতুদা ওমনি তাড়া দিল, সে-খোঁজে আপনার কি দরকার ম্যাডাম, প্রিন্সকে আঁচলে বাঁধার পর আপনার কি আর কারো সুখ-দুঃখের খবর নেবার সময় আছে?

আমি হেসেই ছোড়দিকে বললাম, এই এক মাসেই তোর গল্প এমন ফুরোলো যে ওই লোকটাকে টানতে হল? তোর রমেশ ভার্গবের কথা বলা হয়েছে?

ছোড়দি পাল্টা মুখিয়ে উঠল, বল্ না, সেও তো শেষ পর্যন্ত তোরই কথা! বরের দিকে ফিরে সোৎসাহে বলল, জানো ছেলেবেলায় আমি ভাবতাম একটা ছেলে আমাকে কি পছন্দই না করে—শেষে শুনি আসলে তার চোখ ওর দিকে—রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়, হাত ধরে বসে থাকে।

ঘটা করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনতুদা বলে উঠল, ও-ছোঁড়া আমার থেকে অন্তত চালাক, আমি শুধু বোকার মতো তোমাকে দেখতে এসে তোমাকেই পছন্দ করে গেলাম!

হাসাহাসির পর বউদি আগের প্রসঙ্গে ফিরতে চাইল।—কিন্তু ও বাড়ির সুনন্দ বোস আবার কবে কি করেছে, আমি তো কিছু জানি না?

আমি বললাম, থাক, আর রসে কাজ নেই।

ওদিকে ছোড়দিও যে-কারণেই হোক, এ-প্রসঙ্গ বাতিল করতে চায় না। মন্তব্য করল, তুই যাই বলিস অরু, সুনন্দর এখনো টান নেই তোর ওপর এ আমি বিশ্বাস করি না।

আমি জবাব দিলাম, তোর বোধহয় টানাটানির ওপরেই বিশ্বাস বেড়েছে এখন।

আনন্দে মনতুদা আমার পিঠ চাপড়ে দিল। বলল, একখানা মেয়ে বটে তুমি! তোমার ছোড়দি কি বলে জানো? বলে সুনন্দ বোস আস্ত একটা মোষ, কিন্তু তার চোখদুটো সেই ফ্রক-পরা বয়েস থেকে তোমার প্রিয়সখীর ওপর আটকে আছে। শুনে সেই থেকে চোখে ঘুম নেই আমার, প্রিয়সখী শেষকালে কিনা মোষের খপ্পরে পড়বে!

এই ইয়ারকি আমার কেন যেন ভালো লাগছিল না। ওদিক থেকে বউদি প্রতিবাদ করল, কেন, ছেলেটি তো বেশ ধীর স্থির, ভদ্র, দিন-রাত পরিশ্রম করে নাকি, তার বউদি তো দেওরের খুব প্রশংসা করে!

—ওয়ান্ডারফুল! বউদির উদ্দেশ্যে মনতুদা দু'হাত জোড় করে ফেলল তক্ষুনি।—আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি ম্যাডাম, ওই সুনন্দ মোষের চোখদুটো দয়া করে আপনার নিজের দিকে টেনে নিন, প্রিন্সকে আমরা যা-হোক বোঝাব'খন—মোষের চোখ যত ঠাণ্ডাই হোক, প্রিয়সখীকে তার সামনে ছেড়ে দিতে পারব না, আপনার আত্মত্যাগ সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

আমরা হেসে উঠলাম।

বউদি তারপর দু'তিন দিন আমাকে আলটালো—কি হয়েছিল বলো না? আমার কিন্তু ছেলেটাকে সত্যি খারাপ লাগে না।

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠেছি তবে আর কি, মুখ থুবড়ে পড়গে যাও না।

গত তিন বছরের মধ্যে সর্বসমেত সাত দিনও হয়ত ও-মূর্তি আমার চোখে পড়েনি। পড়লেও সেই চোখ আমার দিকে আটকে থাকেনি। নিজে থেকেই সরে গেছে। আমার ধারণা, সেই এক পুষ্টি গল্প থেকেই তার চেতনার পুষ্টি বেড়েছে। কোন্ মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা টের পেয়েছে।

অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো সাপ্লাই করতে করতে নিজেও সেই কৌটো তৈরির ছোটো একখানা কারখানার মতো করেছে—এরকম একটা খবর কবে যেন আমার কানে এসেছিল। তার ওপর প্লেটিংয়ের কাজ করে ওষুধের কারখানায় সাপ্লাই করে। কিন্তু সে খবর শোনার আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। ওটা যে কোনো খাঁটি ব্যবসার অন্তর্গত বস্তু, তাও কখনো মনে হয়নি।

গেল বছর সেই প্রথম ওদের একতলা ভাঙা-বাড়ি ঢেলে সংস্কার করতে দেখলাম। ওদের বাড়ির পিছনের দিকে দুটো বস্তিঘর ছিল, সেটা ভেঙে দুটো নতুন ঘর তোলা হল তাও চোখে পড়ল। কথায় কথায় তখন ঠাকুমা একদিন বলল, ছেলেটা এখন দুটো পয়সার মুখ দেখেছে বোধহয়, ঘরবাড়ি সারাচ্ছে—আ-হা, ভালো হোক, বড়ো দুঃখের দিন গেছে ওদের।

আর একটা ব্যাপারও চোখে পড়েছিল। আমার চঞ্চল দাদাটিকে ক্বচিৎ এক-আধ সময় ওই সুনন্দ বোসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা কইতে দেখতাম। কিন্তু দাদা আগে কখনো ওদের কাউকে মানুষ বলেও গণ্য করেনি।

জ্ঞান-বয়েস অবধি আমার চোখে এ বাড়িতে সব থেকে বড়ো শোকের ঘটনা ঠাকুমার বিদায়। ছোড়দির বিয়ের মাস ছয় বাদে হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে ঠাকুমা চোখ বুজল। এ সংসারে আমার চোখে অন্তত একটা যেন বজ্রপাত হয়ে গেল। সেই প্রথম আবার টের পেলাম, আমার ভিতরে সেই অবুঝ ভীতু ছোটো মেয়েটা এখনো বাস করছে। তার সকলের বড়ো আশ্রয়টা যেন খসে গেল। ভয়ে ত্রাসে আমি কাঁপতে লাগলাম। শোকের থেকেও আমার ভয় বেশি। একটা অজ্ঞাত ত্রাস অজ্ঞাত ভয় যেন আমাকে ছেঁকে ধরতে লাগল।

ঠাকুমার সঙ্গে সকলেই শ্মশানে গেল, কেবল আমি ছাড়া। কাঁদতে কাঁদতে দিদি গেল, ছোড়দি গেল, বৌদি গেল। আমি কিছুতে যেতে পারলাম না। ঘরের জানলা ধরে শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হরিধ্বনি দিয়ে ঠাকুমার খাট কাঁধে তুলে নিতে দেখলাম। আর তখনি দেখলাম, বাড়ি থেকে খাটের তিন দিকে কাঁধ দিয়েছে দাদা, আর আমার দুই কাকা আর একদিকে ও বাড়ির সুনন্দ। কে তাকে ডেকেছে আমি জানি না। খাট কাঁধে নিয়ে জানলা বরাবর সোজা একেবারে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আর তক্ষুনি কেন যেন ওর বুড়ো বাবাকে শেষযাত্রায় নিয়ে যাওয়ার সেই দৃশ্যটা আমার চোখে ভেসে উঠেছিল। আর, তখনি একবার আমার মনে হয়েছিল, ওর বাবাকে তুলে নিয়ে যাবার সময় ওর ভেতরটা কি আমার মতই এমনি আশ্রয়শূন্য হয়ে গেছল?

বাড়িতে আমি একা। আমার শূন্যতাই যেন আমাকে গ্রাস করছে।

নীচে কড়ানাড়ার শব্দ হতেই ছুটে নীচে এসে দরজা খুলে দিলাম। যে কোনো একটা চেনামুখ দেখলেও আমি যেন বাঁচি।

মনতুদা।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এরই মধ্যে ফিরলে যে?

জবাব না দিয়ে তার ড্রাইভারকে বলল শ্মশানে ফিরে যেতে। আমাদের গাড়িও গেছে, আরো গাড়ির দরকার হতে পারে। দরজা বন্ধ করে ওপরে এসে ঠাকুমার ঘরেই বসল। বলল, শোকে অস্থির হয়ে বাড়িতে তুমি একলা বসে আছ, তাই ভালো লাগল না...চলে এলাম। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, ঠাকুমার সময় হয়েছে ভালোই তো গেলেন। কাল থেকেই লক্ষ করছি তোমাকে, শোকে এ-রকম ভেঙে পড়বে কেন?

মনতুদার সামনেই একটা মোড়াতে বসেছিলাম আমি। মুখে একরাশ শাড়ির আঁচল গুঁজে দিয়েও সামলাতে পারলাম না। মনতুদা চুপ। আমি এই প্রথম অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে বাঁচলাম। মনে হল, এই একজনই আমার শোকে আমার ব্যথা বুঝেছে। তাই শ্মশানে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে। আমি কেঁদে হাল্কা হতে পেরেছি। এই লোকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কাকাদের অনুরোধে আমাদেরও এগার দিনে শ্রাদ্ধের বিধান দিলেন পুরোহিত। ঠাকুমা যেতে বাবা ভেঙে পড়েছেন, তবু শক্ত পায়ে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই। বাবা টাকা-পয়সা সব বউদির হাতে দিলেন, আমাকে বললেন, তুই ওকে সাহায্য করিস।

বাবা সকলের বড়ো, তাছাড়া ঠাকুমা বরাবর এখানে থাকত--তাই কাজও এ-বাড়িতে হবে জানা কথা।

পূর্ববঙ্গ দেখিনি। আমাদের কোনো এককালে আদি নিবাস নাকি ছিল পূর্ববঙ্গে। এসব ক্রিয়া-কর্মে প্রাচীন সংস্কারই চালু আছে। সেই অনুযায়ী শ্রাদ্ধের আগের দিন শ্মশান-বন্ধুদের চিঁড়ে-দই-মিষ্টি দিয়ে ফলার করানোর বিধান। সেইদিনই ও-বাড়ির সুনন্দ বোসের নামটা কানে এলো আবার। সে অনুপস্থিত। ব্যবসার কাজে কোথায় মফস্বলে গেছে। আজ আর ফেরার সম্ভাবনা নেই নাকি। বাবা

খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, ছেলেটা নিজে থেকে যেচে এলো, কাঁধে নিল, শ্মশানেও কত সাহায্য করল, অথচ এই দিনেই বাইরে আটকে পড়ল।

পরদিনও আবার ওই নাম কানে এলো। রাত তখন সাড়ে দশটা। বাইরের নিমন্ত্রিতরা সব খেয়েদেয়ে চলে গেছে। শুধু জামাই দুজন, কাকা-কাকীমারা আর আমরা বাড়ির ক'জন বাকি। সকলেই শ্রান্ত। কোনোরকমে চারটে খেয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচি।

ইতিমধ্যে দু'বার সামনের বাড়িতে লোক গেছে সুনন্দ বোসের খোঁজে। দু'বারই বাবার কাছে খবর এসেছে, কারখানা থেকে এখনো ফেরেনি ফিরতে রোজই রাত হয়। তার দাদা বলে পাঠিয়েছে তার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই।

তাকে নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামাইনি। এমনকি খেয়াল না করে নিজেরা টেবিলে বসেও গেছলাম। বাবা হঠাৎ এসে বললেন, ও-বাড়ির ছেলেটিকে তো বাড়িতে ঢুকতে দেখলাম এইমাত্র, কে ডেকে আনবে—

শোনামাত্র বউদি উঠে চলে গেল। আর তক্ষুনি একটা বিরক্তিকর ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। হাসি চেপে ছোড়দি মনতুদাকে কি ইশারা করল। আর তার পর মনতুদা ভালোমানুষের মতো আমার দিকে চেয়ে রইল।

ছোড়দিটার রসিকতারও আর সময়-টময় নেই।

একটু বাদে বউদি সুনন্দ বোসকে একেবারে সঙ্গে করে ফিরল। আমার উল্টো দিকে খান পাঁচ-ছয় চেয়ার ছেড়ে তাকে বসতে দেওয়া হল। বাবা খুশিমনে বললেন, তুমি বন্ধুর কাজ করেছ অথচ কাল আসতে পারোনি আর আজও আমার মাকে ফাঁকি দিচ্ছিলে।

সকলের চোখ ওই দিকে। আমারও। সুনন্দ ঠাণ্ডা মুখে নরম জবাব দিল, না, আজ আমি ঠিকই আসতুম—ঠাকুমাকে আমার অনেক দিন একটা প্রণাম করার ইচ্ছে ছিল, সে-সুযোগ হল না, একেবারে কাঁধে করার সুযোগ পেলাম।...বউদির মুখে শুনতুম, আমরা এত গরীব, তবু উনি আমাদের মানুষ ভাবতেন।

বাবা বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইলেন তার দিকে। বাদবাকি সকলে চুপ হঠাৎ। মনতুদা একটু ঝুঁকে তাকে নিরীক্ষণ করছে। ভিতরে ভিতরে আমি আবার বিরক্ত বোধ করছি। আমার ঠাকুমাকে 'ঠাকুমা' বলাটাও কানে কি-রকম লেগেছে। আর ঘটা করে সভার মধ্যে নিজেদের দারিদ্র্যের কথা টেনে এনে ওই উক্তি করার মধ্যে একটু যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে—আর তার লক্ষও যেন শুধু আমিই। আমি এখানে আছি কি নেই একবার মুখ তুলে চেয়েও দেখেনি। ধারণা, জানে আছি, তাই দেখেনি।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি ঘরে আসামাত্র ছোড়দি ছুটে এলো। বলে উঠল হ্যাঁরে অরু, আজকাল যে দিব্বি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ফুটেছে রে! আর ঠাকুমাকেও দিব্বি ঠাকুমা বলে গেল শুনলি! কি মতলব? তোর সঙ্গে আবার কিছু চলছে-টলছে না তো?

আমি গম্ভীর মুখেই দাবড়ানি দিলাম, এটা তোর রসিকতার সময়? নাকি নিজের অত ভালো বিয়ে হয়েছে বলেই কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে যাকে-তাকে টেনে এনে রসিকতা করিস?

ছোড়দি পালালো।

দিন গড়াতে লাগলো আবার। একটি বৃদ্ধার অভাবে বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে। ওদিকে বাবাকে দিনরাতের বেশিরভাগ সময়ই বিছানায় শোয়া দেখি। তাইতে আরো খারাপ লাগ। বাবার মাথায় আবার দুশ্চিন্তা ভর করেছে টের পাই। দুশ্চিন্তা আমারই জন্য। বউদির মুখে শুনেছি শ্রাদ্ধের দরুন কাকারাও কিছু-কিছু টাকা দিয়েছে। কিন্তু বড়ো খরচটা বাবার ওপর দিয়েই গেছে। দু'দিন আগে নাকি বৌদির কাছে বাবা বলেছেন, এই মেয়েটার জন্য আর কিছুই থাকল না।

কিছু থাকল না বলে নয়, আমি অসহায় বোধ করেছি বাবাকে এভাবে মুষড়ে পড়তে দেখে। বাড়িতে এক মুহূর্তও ভালো লাগে না। ফাঁক পেলে চলে যাই দিদির ওখানে, নয়তো মনতুদার ওখানেই বেশি যাই। হাসি-আনন্দে ডুবিয়ে মাথা হালকা করে দিতে তার জুড়ি নেই।

ছ'মাস না যেতে আবার এক বিভ্রাট। হঠাৎ একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেই শুনি দাদার ইন্সিওরেন্সের চাকরি যায় যায়। অফিসে দাদার নাকি প্রায় হাজার দশেক টাকা দেনা। কোন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বড়োলোক হবার এক মোক্ষম রাস্তা পেয়ে গেছল দাদা। অফিসের সঙ্গে যুক্ত বাইরের পার্টির এক অন্তরঙ্গ ভদ্রলোকের কাছ থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা ধার করেছিল। শতকরা বারো টাকা সুদ। এছাড়া অফিসের লোকের কাছ থেকেও কিছু টাকা ধার করেছিল। সেই সব টাকা শেয়ার বাজারের সেই অব্যর্থ-লাভের ফাটকায় খাটিয়ে সর্বস্বই লোকসান খেয়েছে। পার্টির সেই অন্তরঙ্গ ভদ্রলোক অনেকদিন অপেক্ষা করে সুদ বা আসল কিছুই না পেয়ে শেষে অফিসের বড়োকর্তার কাছে নালিশ করে দিয়েছে। বড়োকর্তা শুনে ক্ষেপে গেছে, দাদাকে ডেকে সাতদিন মাত্র সময় দিয়েছে। এর মধ্যে টাকা দিতে পারে তো ভালো, নয়তো তার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা থেকে ধার শোধ করা হবে। তাছাড়া ফিল্ড ওয়ার্কারের পার্টির লোকের কাছ থেকে টাকা ধার করা ঘোরতর অপরাধ। এই অপরাধে দাদার চাকরি যাওয়াই উচিত। সাতদিনের মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে চাকরি যাবেই। দিলে এবারের মতো বিবেচনা করা যেতে পারে।

আইনত চাকরি খেতে পারুক বা না পারুক, বড়োকর্তার এই হুমকি মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো যথেষ্ট। তার ওপর ঘেন্নায় একেবারে মরে যেতে ইচ্ছে করল যখন শুনতে পেলাম ব্যাপারটা জানাজানি কি করে হল। আর কোনো পথ না পেয়ে দাদা নাকি সুনন্দ বোসকে ধরে পড়েছিল দশ হাজার টাকা ধার দেবার জন্য। সব শুনে সুনন্দ দুদিন সময়ে নিয়েছে ভেবে দেখার জন্য তারপর এই দুপুরে সোজা বাবার কাছে এসে হাজির হয়েছে। বিপদের কথা খুলে বাবাকে জানানো নাকি দরকার বোধ করেছে সে, আর বলেছে, বাবার অনুমতি পেলে দশ হাজার টাকা সে দাদাকে দিয়ে দিতে পারে।

বাবা বলেছেন, দিতে হবে না।

বউদির মুখ চুন। বাবার মুখ বিবর্ণ পাংশু। একবেলার মধ্যে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে। সব শোনার পর ওই সুনন্দর ওপরেই দপ করে জ্বলে উঠলাম আমি। ভালোমানুষের মতো বাবাকেই এসে জানানোর দরকার ছিল কি? বৌদিকে জানালেও তো হত। কিছু উদ্দেশ্য আছে বলেই বাবার কাছে এসে কর্তব্য ফলিয়েছে। আর এত সাহস যে মুখ ফুটে বলে গেছে বাবার আপত্তি না হলে দশ হাজার টাকা ধার দিতে পারে?

আমার রাগ বউদির কাছে গোপন ছিল না। পাংশু মুখে বউদি বলেছে, সে ভদ্রলোক উচিত কাজই করেছে।

বাবা নীরবে কি-যে সহ্য করলেন আমি আর বউদিই জানি। পাঁচদিনের মধ্যে আমাদের গাড়িটা আট হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে গেল। আরো দু'হাজার টাকা সংগ্রহ করে বাবা বউদির হাতে দিলেন। দাদাকে বললেন, বউমাকে সঙ্গে করে তোমাদের বড়ো-সাহেবের কাছে যাও, সে তার হাতে টাকা দিয়ে আসবে। আগেই টেলিফোনে জানিয়ে দাও, যারা যারা টাকা পাবে তারা যেন সময়মতো আসে।

তারা চলে যাবার পর বাবা কি রকম অস্থির হয়ে পড়ল। আমি বাবার কাছে বসে থাকলাম, বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। বাবা হঠাৎ এক সময় বিবর্ণ অথচ উত্তেজিত মুখে বলে উঠলেন, তুই সকলের ছোটো, আর ওরা সকলে মিলে তোকেই বঞ্চিত করল, বুঝলি? আমি ওদের দেখাচ্ছি মজা।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, বাবা তুমি ওরকম বোলো না, আমাকে কেউ বঞ্চিত করেনি। আমার জন্য তুমি অত ভাবো কেন, ঠাকুমার কথা বিশ্বাস করো না কেন?

বাবা তখনকার মতো চুপ করে রইলেন। দাদা-বৌদি ফেরামাত্র তাদের ডেকে বললেন, এই বাড়ির অর্ধেক আমি অরুর নামে লিখে দিয়ে যাব—তোমাদের আপত্তি হবে না তো?

বাবার সেই অস্বাভাবিক লাল চোখ দেখে ভয় পেয়ে দাদা ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচল। বউদি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাবাকে শুইয়ে দিয়ে তাঁর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কেঁদে ফেলল। বলল, তাই দেবেন বাবা, তা না দিলেই বরং অন্যায় হবে।

বাবা ঠাণ্ডা হলেন। অনেকক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে বললেন, তুমি তো ভালো, মা, খুব ভালো, কিন্তু কি করবে, সব অদৃষ্ট।

গাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে, ফলে ব্যাপারটা গোপন থাকার কথা নয়। দিদিরা জানল, ভগ্নীপতিরাও জানল। দু'তিন দিনের মধ্যেই মনতুদা এলো। গম্ভীর। সচরাচর তাকে গম্ভীর দেখা যায় না। আমাকে বলল এরকম একটা ব্যাপার ঘটেছে, মাত্র আট-দশ হাজার টাকার জন্য গাড়ি বিক্রি করতে হল, আমরা জানতেও পেলাম না।

বাবা যে ব্যবস্থা করেছেন তার থেকে ভালো ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারত বলে আমি ভাবি না। তবু আপনার জন এই কথা বলবেই। তাছাড়া মনতুদার কাছে আট-দশ হাজার টাকা যে টাকাই নয় সে আমি অন্তত জানি। ছুটির দিনে অনেক সময় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছোড়দির বাড়ি কাটিয়েছি। গেলে নিজেরও ভালো লাগে, ভদ্রলোকও ছাড়তে চায় না। টাকা কত সহজে রোজগার করে কেউ কেউ, তখন দেখেছি। হাসিমুখে গল্প করতে করতে লোক এসেছে শুনে নীচে নেমে গেছে। আধ-ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে সাদা কাগজের মতো পাঁচ-সাত হাজার টাকা ছোড়দির হাতে দিয়েছে—ওমুক ট্রানজাকশনের টাকা রেখে দাও। পাঁচ-সাত হাজার টাকা হাতে নিয়ে বাক্সের কোণে ফেলে রাখতে ছোড়দিও যেন এরই মধ্যে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। কোনো তাপ উত্তাপ নেই। মনতুদা নিজেই নিজেকে যখন-তখন দালাল বলে গাল দেয়। আবার ছোড়দি এক একদিন বেশিরকম জব্দ হলে নিরুপায় মুখ করে তার সামনেই আমাকে বলে, দালালকে বিশ্বাস নেই দেখলি তো, কি দিয়ে যে কি করে বুঝে উঠিনে।

আগে কারো দালালি বা ব্রোকারি পেশা শুনলে সেটা আদৌ সম্মানের ব্যাপার ভাবতুম না। অনেকেই বোধ হয় ভাবে না। নইলে বিয়ের আগে ছোড়দির বর কন্ট্রাক্টরি করে শুনেছিলাম কেন? ভদ্রভাষায় এর নামও কন্ট্রাক্টরি বোধহয়। কিন্তু আমার ধারণা ছিল সরকারী বেসরকারী বড়ো বড়ো রাস্তা বাড়ি-ঘর বানানোর নামই কন্ট্রাক্টরি।

কিন্তু দালালের এই সুখের ঘরে রূপ আর রূপোর বাসা দেখে আমার ধারণা বদলে গেছে। এম. এ. পাস সুপুরুষ রসিক মানুষ অঢেল টাকা রোজগার করে নিজের বুদ্ধির জোরে আর ক্ষমতার জোরে সে নিজেকে দালাল বললেও সেটা সুন্দর বিশেষণের মতোই লাগে।

মনতুদা এই অনুযোগ করার পর আমার শুধু মনে হয়েছিল, দাদা যদি বোকার মতো এই সুনন্দ বোসের কাছে টাকার জন্যে না গিয়ে মনতুদার কাছে যেত সেও এত খারাপ লাগত না। মনতুদাকেও বলার দরকার হত না, আট-দশ হাজার টাকা হয়ত ছোড়দিই তার বাক্স থেকে বার করে দিতে পারত।

আবার আমি নতুন করে নিজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছি। ঠাকুমা গত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে অজ্ঞাত ভয় আর ত্রাস ভিতরে ভিতরে আমাকে দিশেহারা করে তুলেছিল—তার ওপর একটা দ্বিগুণ শক্তির মুখোশ চড়িয়েছি। তার ফলে আমার চাল-চলন আচরণে এক ধরনের জোরালো ছটা ঠিকরেছে। তাতে নিজেও ভুলেছি, অপরেও ভুলেছে। ভয়ের চাষ করলেই ভয় বাড়ে, আমি চেষ্টা করি তা না করতে।

এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়ার তিন-চার মাসের মধ্যে জীবনে একটা নতুন স্বাদ পেলাম। আর তার সবটুকুই মনতুদার দাক্ষিণ্যে। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল আসার দাখিল।

মনতুদা সাহিত্যে এম. এ.—সাহিত্যরসিক। সাহিত্য বা কবিতা নিয়ে তার সঙ্গে বিতর্কটা বেশি জমত। এ পর্যন্ত আমার কয়েকটা গল্প আর কবিতা নিয়ে গেছে আর তার কিছুদিনের মধ্যেই নামকরা কোনো মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রে ছাপার অক্ষরে সেগুলোর আত্মপ্রকাশ দেখেছি। বাবার হঠাৎ অসুখে এক ঘণ্টার মধ্যে বড়ো ডাক্তার ধরে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে সর্বব্যাপারে এমন শক্তিধর মানুষ আমি আর দেখিনি। কিন্তু বড়ো কাগজে অনায়াসে আমার লেখা ছাপা হওয়ার পর থেকে লোকটার ক্ষমতার যেন কূলকিনারা পাইনি আমি।

মাস দেড়েক আগে মনতুদা আমার কিছু ছাপা কবিতা বগলদাবা করে নিয়ে গেছল। বলেছিল, অবসর সময়ে প্রিয়সখীর কবিতা থেকে বাড়তি কিছু রস আহরণ করা যায় কিনা দেখি। কিন্তু দেড় মাস বাদে এমন রসই আহরণ করল যে দেখে নিজের দুটো চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আমারই

সামনে ছাপা ঝকঝকে কবিতার বই একটা—তার লেখিকা আমি! ছাপা আর অঙ্গসজ্জা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মনতুদা অবশ্য বলেছে কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে প্রকাশকই যত্ন করে ছেপেছে। কিন্তু কি দিয়ে কি হয়েছে সেটা না বোঝার মতো নির্বোধ আমি নই। আনন্দে আমার একটা প্রণাম করে ফেলতে ইচ্ছে করছিল মনতুদাকে—কিন্তু সকলের সামনে লজ্জায় সেটা পারিনি। আরো আনন্দ হয়েছে এই দেখে যে বুদ্ধি করে মনতুদা উৎসর্গের পাতায় বাবার নাম লিখে দিয়েছে। বাবা কত যে খুশি হয়েছেন তাও জানি। বইখানা নেড়ে চেড়ে বলেছেন, সুন্দর হয়েছে...তোর ঠাকুমা দেখতে পেল না।

বড়ো বড়ো সব ক'টা কাগজেই এই কবিতার বইয়ের সমালোচনা বেরিয়েছে। সমালোচনা মানে প্রশংসা। এর পিছনেও যে মনতুদার হাত আছে তাও জানি। তবু আনন্দ ধরে না।

মাস পাঁচেক বাদে এই কবে আমার একটা ছোটো গল্পের বইও ছাপা হয়ে গেল। তবে সেটা আগেকার মতো অমন অগোচরে নয়। আমি নিজেই তার যত্ন করে প্রুফ দেখেছি, আর উৎসর্গের পাতায় জোর করেই মনতুদার নাম লিখেছি। তার আগে তাকে বলেছি, তোমার টাকাগুলো এ-ভাবে নষ্ট করছ কেন।

জবাবে মনতুদা বলেছে, দালালের সঙ্গে লোকসানের ভাদ্দর-বউ সম্পর্ক—লোকসানই যে হবে তোমাকে কে বলল?

এই বই সম্পর্কেও কাগজে সদয় সমালোচনা ছাপা হয়েছে। বিশেষ করে সেই 'পুষ্টি' গল্পটার প্রশংসা তো অনেকেই করেছে।

ফিফ্থ ইয়ারে পড়া মেয়ের দু'দুখানা বই ছাপা হয়ে গেছে—এমন মেয়ে আর মাটির উপর দিয়ে হাঁটে কতক্ষণ? আমার জীবনে যেন ভরা ফাল্গুনের মৌসুম চলেছে তখন।

ও-দিকে মনতুদার বাড়ির উৎসব আর বাইরে পার্টি-টার্টিতেও আমার একটা স্থান হয়ে গেছে। আর অন্তরঙ্গ অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে। মনতুদা দরাজ হেসে বলে, আমার পার্টি আমার উৎসব মানেই আমার বউ থাকবে আর আমার শালী থাকবে। বউ ছাড়া যদিও চলে শালী ছাড়া একদম অচল আমি। ছোড়দি বলে, আমাকে না দেখলে নাকি ওর বন্ধুরা ওকে জিজ্ঞাসা করে, আপনার শালী কোথায়? আর না গেলে ছোড়দিই অনেক সময় গাড়ি হাঁকিয়ে এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়—ধমকে বলে তুই না গেলে আসর জমে না, চল্।

মোট-কথা দিব্বি আনন্দেই দিন কাটছিল আমার।

এরই মধ্যে একদিন একটা দৃশ্য চোখে কাঁটার মতো বিঁধল আমার। উল্টোদিকের একতলা দালানের সামনে ছোটো একটা মরিস গাড়ি থামল। তার পরেই অবাক হয়ে দেখলাম তার চালক সুনন্দ বোস। গাড়ি থেকে টক করে নেমে কোনো দিকে না তাকিয়ে ভিতরে চলে গেল।

লোকটার তাহলে এরই মধ্যে গাড়ি কেনার মুরোদ হয়েছে! সেকেন্ডহ্যান্ড্ হলেও গাড়িটা চকচকেই। এখন মনে হল ও-বাড়ির ছেলেগুলোর জামা-কাপড় আজকাল একটু ফিটফাটই দেখি বটে। আর এক-আধ সময় সুনন্দ বোসের পরনে ভালো ট্রাউজার আর গায়ে টেরিলিন দেখেছি। কিন্তু এরই মধ্যে গাড়ি কেনা আর সে-গাড়ি নিজে ড্রাইভ করার সম্ভাবনা কল্পনা করিনি। আমাদের গাড়ি বেচে দেওয়া আর নাকের ডগায় এই একজনের গাড়ি কেনাটা ভিতরে কোথায় খচ খচ করছিল বলেই বোধহয় মনে হল, এটা বাহাদুরি ছাড়া আর কিছু নয়—পয়সা তো অ্যালুমিনিয়াম কৌটো বিক্রির—গাড়ি দেখাচ্ছে।

ঠিক সেই সময় বউদি পাশে এসে দাঁড়াতে ঝাঁঝালো হেসে বললাম, গাড়ি দেখছি।

বউদি অবাক!—ও মা, গাড়ি তো দু'মাস আগে কিনেছে ভদ্রলোক, তুমি এতদিনে দেখলে! এরই মধ্যে নিজেও দিব্বি ড্রাইভিং শিখে নিয়েছে, এখন নিজেই চালায়।

অত বিস্তার শুনতে চাইনি। কিন্তু বউদি কি ভেবে হঠাৎ আবার বলল, ওর বউদির মুখে শুনেছি ছেলেটা একরোখা আর জেদী বলেই চট করে এত উন্নতি করেছে—ওদের সংসারেরর চেহারা বদলে দিয়েছে। ...আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে ভদ্রলোককে, বেশ খাতিরও হয়ে গেছে।

শোনামাত্র মনে হল বউদির মনে আরো কিছু কথা আছে, এটা তারই ভূমিকা। দপ্ করেই রাগ হয়ে গেল আমার। বলে ফেললাম, তিন ছেলেপুলের মা হবার পরে আর খাতির জমিয়ে কিছু লাভ হবে?

থতমত খেয়ে বউদি তক্ষুনি প্রস্থান করল। বয়সে বড়ো হলেও ইদানীং আমাকে ভয়ই করে একটু।

পাঁচ

ওপরওয়ালা নতুন জাল-বিস্তারে মগ্ন হয়েছেন সেটা তখনো বুঝিনি।

বিপর্যয়ের ধাক্কায় হকচকিয়ে গেছলাম। য়ুনিভার্সিটি থেকে একটু বেলায় ফিরে বাড়ির রাস্তার মোড় ঘুরেই দেখি, আমাদের দোরগোড়ায় দু'দুটো অচেনা গাড়ি দাঁড়িয়ে। আর, বাড়িতে পা দিয়েই হতচকিত।

...বাবা চোখ বুজে শুয়ে আছেন। দুজন ডাক্তার গভীর মনোনিবেশে তাঁকে পরীক্ষা করছেন। অদূরে মুখ চুন করে দাদা-বউদি দাঁড়িয়ে। তাদের পাশে সুনন্দ বোস।

আমি এসে বোবা একেবারে।

বাবাকে পরীক্ষা করার পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন ডাক্তার দুটি। বুঝলাম, করোনারি স্ট্রোক হয়েছে বাবার। তবে ডাক্তারদের মতে মাইলড্ অ্যাটাক। এ অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া যাবে না, তার দরকারও নেই। বাড়িতেই খুব সাবধানে রাখতে হবে। সুনন্দ বোসের দিকে চেয়েই ব্যবস্থাপত্র বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা। আমরাই যেন বাইরের লোক।

ওই লোকের সঙ্গেই ডাক্তাররা চলে গেলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে সুনন্দ বোস একগাদা ওষুধ-পত্র নিয়ে সোজা আবার দোতলায় উঠে এলো। দাদা-বউদিকে সেগুলি বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে একটু সুস্থির হয়ে ঘটনা শুনেছি: বিকেলের দিকে বাবা বেশিরকম অস্থির হয়ে পড়তে বউদি প্রথমে দাদাকে ফোন করেছিল। পায়নি। তারপর মনতুদার বাড়িতে ফোন করে জেনেছে ছোড়দি বা মনতুদা কেউ বাড়িতে নেই। অমরদার ফোন নম্বর জানার জন্যে বাবার ঘরে এসে দেখে বাবা অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছে। দিশেহারা বউদি কি করবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ দেখে ও-বাড়ির সামনে সুনন্দর গাড়ি দাঁড়িয়ে। ছুটে গিয়ে তাকেই ধরে এনেছে। তারপর যা করার ছোটাছুটি করে সুনন্দই করেছে।

সন্ধের আগে বাড়ি ভরপুর। দিদি অমরদা ছোড়দি মনতুদা কাকারা কাকীমারা খুড়তুতো ভাইবোনেরা অনেকেই চলে এসেছে। যে দুজন ডাক্তার এসে বাবাকে দেখে গেছেন, তাঁরা বড়ো ডাক্তারই যখন—পরামর্শ করে তাঁদের হাতেই বাবাকে রাখা স্থির হল। কেবল মনতুদা একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল। বড়ো ডাক্তার হলেও সবথেকে বড়ো ডাক্তার তো নয়।

রাত আটটা-সাড়ে আটটা তখন। আত্মীয়-পরিজনেরা অনেকেই আছে তখনো। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে এগিয়ে এলাম। উঠে আসছে সুনন্দ বোস। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল।

কেমন?

বললাম, ভালোই।

নেমে চলে গেল।

অসময়ে উপকার করেছে, এ-রকম উপকারের দরুন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু নির্ভেজাল কৃতজ্ঞ বোধ করছিলাম কিনা সন্দেহ আছে।

লোকজন চলে যেতেই বউদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওই যে ডাক্তার এলো ওষুধ-পত্র এলো—তুমি টাকা দিয়েছ?

সঙ্কুচিত মুখে বউদি জবাব দিল, মাসকাবারে দেব ভেবেছি ভাই...এখন তো হাতে তেমন নেই।

শুনে আমার গা জ্বলে গেল। কিন্তু ও বেচারীই বা করবে কি। আমি সোজা নিজের ঘরে এসে ট্রাঙ্ক খুললাম। ঠাকুমার দেওয়া আর এমনিতে জমানো নিয়ে ট্রাঙ্কে আমার হাজারখানেক টাকা আছে। সে-সব নিয়ে বউদির হাতে দিলাম।—সব কাল দিয়ে দেবে, এক পয়সাও ফেলে রাখবে না।

আরো লাগবে হয়তো। বাবার বক্সে আমার নামে একটা পাস-বই আছে। ঠাকুমা মারা যাবার পর সেটা হয়েছে। যতদূর জানি ওতে হাজার চারেক টাকা জমেছে এখন। বাবার হাতে কখনো টাকা এলেই যেমন করে হোক তার থেকে কিছু বাঁচিয়ে ওতে রাখেন। নিজের শরীর খারাপ, তাই টাকাটা জমা দেবার জন্য প্রায় প্রত্যেক বারই টাকা আর পাসবইসুদ্ধু আমাকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন। ফিরে এলে প্রতিবারই বলেন, ওটা তোর কাছেই থাক না।

আমি রাখি না।

মনে মনে ঠিক করলাম দুই-একদিনের মধ্যেই ওটা বাবার বাক্স থেকে বার করে নিয়ে চিকিৎসার খরচ চালাব।

তার দরকার হল না। দিনকয়েকের মধ্যেই বাবা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। আর তাঁর কার্ডিওগ্রাফ থেকে শুরু করে যা-কিছু হৈ-চৈ করার সবই মনতুদা করল। আমার সেই হাজার টাকা থেকে তাকে টাকা দিতে গিয়ে বউদি মনতুদা আর ছোড়দি দুজনেরই ধমক খেয়ে মরল।

গত সাতদিনের মধ্যে রোজই সুনন্দ বোস একবার করে অন্তত বাবার খবর নিতে এসেছে। বাবার শোবার ঘরেই বসেছে। বাবা তার সঙ্গে আস্তে আস্তে গল্প করেছেন। অসময়ে সে কত উপকার করেছে সেই কথা বলেছেন। বউদিকে ডেকে একদিন তাকে এক পেয়ালা চাও করে দিতে বলেছেন। অবশ্য চায়ের জন্য সে বসে থাকেনি। না-না করে তার আগেই উঠে চলে গেছে।

কিন্তু এ ক'দিন কৃতজ্ঞতার বদলে আমার দুর্বোধ্য অসহিষ্ণুতাই প্রবল হয়ে উঠছিল কেন? এই হৃদ্যতা অভিসন্ধিশূন্য ভাবতে পারছিলাম না কেন?

সেদিন সকালের দিকে ঘরে ঢুকেই দেখি ওই মূর্তি বসে। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন হল আমার। বাবাকে বললাম, আজ কিন্তু সকাল থেকে অনেকের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছ।

সকালের মধ্যে দু'দফা বাবার উকিল বন্ধুরা এসেছিলেন ঠিকই। বাবা বাধা দেবার আগেই সুনন্দ উঠে দাঁড়াল। বাবাকে বলল, বেশি কথা বলা ঠিক নয় কিন্তু। আমার দিকে ফিরল, আমি কথা বলতে দিইনি—আমিই বলছিলাম, উনি শুনছিলেন।

চলে গেল।

তারপরেই বাবার উক্তি কানে এলো, চমৎকার ছেলেটা। অহঙ্কার নেই, দেমাক নেই, অথচ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে।...আর বেশ স্পষ্টভাষীও।

বাবার মুখে হঠাৎ এই প্রশংসা শুনে আমার মনে কি কোনো অনাগত আশঙ্কার ছায়া পড়েছিল?

জানি না।

জাল বোনার কৌতুকে ওপরওয়ালা এরপর আর একটু তৎপর হয়েছেন।

মাস দেড়েক পরের কথা। য়ুনিভার্সিটি বন্ধ ছিল। সকাল থেকে কি একটা গণ্ডগোলের কথা কানে আসছে। স্কুলের মাস্টাররা সব স্ট্রাইক করেছে, ছেলেরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দুপুরের দিকে সব দল বেঁধে রাইটার্স-বিল্ডিং চড়াও করবে নাকি।

কলকাতায় একটা না একটা এই গোছের ঝামেলা লেগেই আছে। এ-সব নিয়ে আমি অন্তত মাথা ঘামাই না। বেলা তখন একটা। দুপুরে ঘুমনো অভ্যাস নেই, একটা গল্প-টল্প লেখা যায় কিনা ভাবছিলাম।

এমন সময় টেলিফোন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার বারান্দার মুখেই টেলিফোন। বাবার ঘুম ভাঙার ভয়ে দৌড়ে এসে রিসিভার তুলে নিলাম। মনে মনে যা আশা করেছিলাম, তাই। হয় ছোড়দি নয় মনতুদা। ছুটির দিনে আমার বাড়ি বসে থাকাটা যেন ওদের চক্ষুশূল। তলব আসবেই।

মনতুদার গলা। বক্তব্য মেট্রোর টিকিট কাটা হয়ে গেছে, ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়া চাই।

বাবার অসুখের দরুন অনেকদিন এ-পাট বন্ধ ছিল। খুশিই হলাম। কিন্তু পরক্ষণে গণ্ডগোলের কথা মনে পড়ল। বললাম, ট্রাম-বাস তো ঠিকমতো চলছে না শুনলাম, যাব কি করে?

ওদিক থেকে প্রত্যাশিত উত্তর এলো। মনতুদা বলল, আচ্ছা ঠিক সময়ে আমার গাড়ি যাবে, রেডি থেকো।

মনতুদাদের দুটো গাড়ি এখন। ছোড়দির কাছে শুনেছি ওটা দাও-এ কেনা গেছে, একটা গাড়িতে বড়ো অসুবিধে।

একটু বাদে তৈরি হয়ে নিলাম। বাইরে গাড়ির সাড়া পেয়ে বউদিকে ঠেলে তুলে দিয়ে গাড়িতে এসে বসলাম। আমার ছোড়দির বাড়ি যাওয়া বা তাদের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া বউদির কাছে নতুন কিছু নয়।

গাড়িতে উঠেই দেখি ও-বাড়ির জানলার সামনে সুনন্দ দাঁড়িয়ে। দুপুরে বড়ো একটা বাড়িতে দেখা যায় না তাকে। আজ জানলায় দাঁড়িয়ে কোন্ কাব্যে তন্ময় হয়ে ছিল সে-ই জানে। ঝকঝকে গাড়িতে চেপে আমায় বেরুতে দেখে একটু অবাকই হল যেন।

চেনা ড্রাইভার। আমি ওঠা-মাত্র গাড়ি চালিয়ে দিল।

বড়ো রাস্তায় পড়তে কি-রকম একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। সর্বদা ট্রাম বাস গাড়ি চলাচলের রাস্তাটা যেন ভারি নির্জন। রাস্তায় লোকও বিশেষ চোখে পড়ল না। সমস্ত পথটাই এই রকম।

চৌরঙ্গীতে এসে অবশ্য লোকজনের ব্যস্ততা কিছু চোখে পড়ল, তবে অপেক্ষাকৃত কম। মেট্রোর গাড়িবারান্দার নীচে মনতুদা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সঙ্গে ছোড়দিকে না দেখে আমি অবাক।

—ছোড়দি কই?

—বলো কেন, তোমার ছোড়দির হঠাৎ কর্তব্যবোধ চারিয়ে উঠেছে, ছেলেপুলে নিয়ে আমার এক বোন এসেছে বাইরে থেকে—আটকে গেল।

কি কাণ্ড, তাহলে টেলিফোনে আমাকে বলে দিয়ে ক্যানসেল করলেই হত!

হ্যাঁ, ইচ্ছে করলেই আসতে পারত, তারা থাকবে দু'চার দিন, টিকিট কেনা আছে বলে যাবার জন্য সাধাসাধিও করেছিল, কিন্তু মাথায় কখন যে কি চাপে, চলো—

ড্রাইভারকে শো-ভাঙার আগে আসতে বলে বাড়ি চলে যেতে নির্দেশ দিল মনতুদা।

সত্যি ভালো ছবি একটা। ঘণ্টা দুই আর এ জগতে ছিলাম না।

শো ভাঙতে ভিড় ঠেলে নেমে এলাম আমরা। আমার একখানা হাত মনতুদার হাতে ধরা। ছোড়দির সামনে অমন হামেশাই হাত ধরে যখন একটুও সঙ্কোচ হয় না। কিন্তু সে না থাকলে একটু যেন অস্বস্তি।

বাইরে এসে গাড়ির সন্ধানে দশ পা এগোতে না এগোতে আচমকা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড একটা। ফটাফট আট দশটা বন্দুকের আওয়াজ একেবারে কানের গোড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ায় সামনেটা একাকার। তারপরেই টের পেলাম চোখ একেবারে যেন জ্বলে যাচ্ছে। এরই মধ্যে যে-যেদিকে পারে হুলুস্থুলু ছোটাছুটি। সেই অবস্থায় মাত্র দু'তিন মিনিট আমার হাত মনতুদার হাতে ধরা ছিল—তারপরেই ভিড়ের চাপে দুজনের কে কোথায় ছিটকে গেলাম। আবার সেই ফটাফট শব্দ, আবার ধোঁয়াটে অন্ধকার, অসম্ভব চোখ জ্বালা। আর সেই দিশেহারা পালানোর হিড়িক। ভিড়ের চাপে আমিও একদিকে চলেছি, কিন্তু কোনো দিশা পাচ্ছি না, জ্বলুনির চোটে চোখ মেলে ভালো করে তাকাতেও পারছি না। বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত ত্রাস।

আভাসে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, রাস্তায় আর মোড়ে মোড়ে কেবল রিভলভার হাতে সার্জেন্ট।

তৃতীয় দফা সেই ফটাফট শব্দ হতে আমার মনে হল চোখ দুটো বুঝি অন্ধই হয়ে গেল। সামনেই একটা মোড়, পড়ি-মরি করে সকলে সেদিকেই ছুটছে—অন্ধের মতো আমিও ঘুরলাম সেদিকেই। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন শক্ত হাতে আমার একখানা হাত ধরে ফেলল, কিছু বোঝবার আগেই দ্বিগুণ বেগে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে রাস্তাটা পার হল। সামনেই ছোটো গাড়ি একটা। চোখের পলকে সামনের দরজা খুলে

আমাকে একরকম ধাক্কা দিয়েই ঠেলে বসিয়ে দিল। তারপর ও-দিক ঘুরে ড্রাইভারের আসনে বসে যেন মুহূর্তের মধ্যেই গাড়ি ছোটালো।

আমার চোখে শাড়ির আঁচল চাপা, গাড়ি যে চালাচ্ছে তার মুখের আর চোখের চারভাগের তিনভাগ এক-হাতের রুমালে চাপা।

বড়োজোর তিরিশ কি চল্লিশ সেকেন্ড। হুঁশ ফিরতে দেখি, আমি পাশে বসে আছি, ঝাপসা চোখ কোনো রকমে টান করে সবেগে গাড়ি চালাচ্ছে সুনন্দ বোস।

আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

বসে আছি। হতচেতন যেন আবার। দু'মিনিটে বোধহয় দেড় মাইল পথ পেরিয়ে এলাম। চোখ ভয়ানক জ্বালা করছে এখনো। স্টিয়ারিং ধরা লোকটার লাল চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে, আমারও সেই দশা।

হঠাৎ গাড়িটা থামলো রাস্তার পাশে এক জায়গায়।

—নামো।

দুই-এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বিমূঢ়ের মতোই নেমে এলাম।

—এসো।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করতেই সামনের টিউবওয়েলটা চোখে পড়ল। আমি যেন জল দেখে বেঁচে গেলাম। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলাম। সে পাম্প করতে লাগল। আমি বোধহয় পরপর আট দশ আঁজলা জল চোখে মুখে ঝাপটা মেরে মেরে একটু সুস্থ বোধ করলাম।

—টেপো।

সুনন্দ বোস এবারে টিউবওয়েলের মুখে গিয়ে দাঁড়াল। ভেজামুখে আমি পাম্প করলাম বারকতক। সে চোখে মুখে জল দিল। তারপর রুমাল করে নিজের মুখটা মুছে নিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি তখনো বুঝি আমাতে নেই।

—রুমাল কোথায়?

প্রশ্ন শুনে আমি এদিক-ওদিক তাকালাম। ভিড়ের ছোটাছুটিতে রুমাল কোথায় পড়ে গেছে। নিজের আধভেজা রমাল আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এতে চলবে।

আমি দামী শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে নিলাম।

—ওঠো।

যন্ত্রের মতো গাড়িতে উঠলাম। চোখে অত জল দিয়ে একটু ভালো লাগছে, কিন্তু বোধশক্তি তখনো আচ্ছন্ন যেন। বড়ো রাস্তা দিয়ে সবেগে আসতে আসতে গাড়িটা হঠাৎ বাঁয়ের রাস্তায় ঘুরে গেল। কিছু বোঝবার আগে সেটা একটা গেট দিয়ে বিরাট কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর দেখলাম একটা বড়ো হাসপাতাল কম্পাউন্ডে ঢুকেছি। গাড়ি চালাতে চালাতে পাশের লোকের ডাইনে-বাঁয়ে সন্ধানী দৃষ্টি।

এক জায়গায় ফাস্ট-এড্-এর লাল বোর্ড দেখে গাড়িটা সেখানে থামালো। নিজে নামল। আমি বসেই আছি দেখে বলল, নেমে এসো, চোখ এখনো ভয়ানক লাল হয়ে আছে।

যন্ত্রচালিতের মতোই আমি নেমে এলাম।

ফাস্ট-এড্-এ একজন ছোকরা ডাক্তার বসে ছিল। এগিয়ে গিয়ে তাকে কি বলতে সে এসে আমাকে পরীক্ষা করল। পরে মাথা নেড়ে জানালো সেরকম কিছু নয়—টিয়ার গ্যাসের ঝাপটা বেশি লাগলে এ-রকম হয়ই। আজকালের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার সুনন্দর দিকে এগোতে সে বলল, আমার কিছু হয়নি, ঠিক আছে।

আমার জন্য এক শিশি লোশন দিতে দিতে গম্ভীর রসিকতার সুরে ছোকরা ডাক্তার সুনন্দকে বলল, শহরের সর্বত্র গোলমাল শুনছি আজ, আর আজকের দিনেই সিনেমা দেখাতে নিয়ে বেরিয়েছিলেন।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ততোধিক গম্ভীরমুখে মাথা নাড়ল লোকটা। অর্থাৎ তাই নিয়ে গেছল।

লোশনের শিশি হাতে আবার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো,—ওঠো।

উঠে বসার পর যেন আমার মাথাটা সক্রিয় হতে থাকল। আর তক্ষুনি মনে হল, লোকটা যেন সেই থেকে আমাকে হুকুম করে যাচ্ছে আর আমি মুখ বুজে তাই পালন করে চলেছি। ওঠো-নামো-এসো—হুকুম করেই চলেছে পরপর। এতক্ষণে সচেতন অসহিষ্ণুতায় সজাগ হয়ে উঠতে লাগলাম আমি। ইচ্ছে হল গাড়িটা থামাতে বলে নেমে যাই। কিন্তু ট্রাম-বাস নেই যাব কি করে। তাছাড়া কেমন ধারণা হল, নামতে চাইলেও নামতে দেবে না বা গাড়ি থামাবে না। নিজের কল্পনায় ভিতরে ভিতরে আরো উষ্ণ হয়ে উঠলাম। গাড়িটা আবার বড়ো রাস্তায় এনে সামনের দিকে চোখ রেখেই আবার বলল, ডাক্তার ভদ্রলোক কি বলল শুনলে তো!...তুমি যখন গাড়ি চেপে বাড়ি থেকে বেরোও তখনি শুনেছিলাম গণ্ডগোল বেধে গেছে—কলেজ স্ট্রিটে পুলিশের গুলিতে তিনটে ছেলে খতম হয়ে গেছে। এই দিনে সিনেমা না দেখলেই হত না?

পরিস্থিতি বিশেষে এই সাধারণ উক্তিও ভয়ানক অভদ্র মনে হয়েছে আমার। সেই থেকে গুরুমশায়ের মতো তুমি-তুমি করে বলছে, তাও কানে লাগছে। যেন সেই ফ্রক-পরা মেয়ে আমি আর উনি সেই মাতব্বর। রাগে 'তুমি'র জবাবে আমারও তুমি করে বলতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু মেয়েদের বেলায় তার আবার অন্য অর্থ দাঁড়ায়। কালচারের 'ক' জ্ঞান নেই যার তার সঙ্গে কথা বলতেও বিতৃষ্ণা। ওদিকে মনে দুশ্চিন্তাও দেখা দিয়েছে এতক্ষণে। মনতুদার কি হল কে জানে। তক্ষুনি মনে হল এই লোকটা আচমকা এ-ভাবে গাড়িতে টেনে না তুললে একটু বাদেই হয়ত মনতুদার সন্ধান মিলত—সেই বিভ্রাটের মধ্যে এখনো আমাকে খুঁজছে কিনা কে জানে! আর এই লোকটাই বা ও-রকম একটা সময়ে সেখানে গিয়ে পড়ল কি করে। বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে তো দুপুরের আকাশ দেখছিল।

ঝাঁঝালো জবাব দিলাম, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে বেরুলে এই ভুল হত না বোধহয়। তা আপনিই বা সে-সময়ে ওখানে ছিলেন কেন—বিপদে পড়তে পারি ভেবে?

চোখ সামনের দিকেই। কিন্তু পুরু ঠোঁটে হাসির রেখা ঠিকই চোখে পড়ল। বলল, না— এই দিনে তুমি সিনেমা দেখতে গেলে শুনে আমারও দেখার লোভ হল। অনেক দিন দেখি না...

রাগ সত্ত্বেও আমি বিস্মিত।—কার কাছ থেকে শুনে?

—বউদির। তুমি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলে যখন, তোমার বউদি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। শহরে গণ্ডগোল লেগেছে, তার মধ্যে তুমি কোথায় বেরুলে জিজ্ঞাসা করাটা কর্তব্য মনে হল। তিনি বললেন মেট্রোয়। তখন আমারও ইচ্ছে হল সুদিনে একটু সিনেমা দেখি...

কথা নয় তো যেন জলবিছুটি। তার ওপর একটু বাদেই আবার আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, ওই গাড়িটা কার, এমন দিনে, সিনেমা দেখতে কে গাড়ি পাঠিয়েছিল?

আস্পর্ধার কথা শুনে নিজেকে সংযত রাখা গেল না—সে খোঁজে আপনার দরকার কি।

নির্বিকার মুখেই জবাব দিল, দরকার একটু ছিল।

এ-রকম অমার্জিত লোকের সঙ্গে কথা না বলাই ভালো। আমি চুপ করে থাকতে চেষ্টা করলাম।

—তোমার বাবা কেমন আছেন?

—ভালো।

—এখন আর বেশি কথা বললে ক্ষতি হবার ভয় নেই?

কথার ছলে কথা বাড়াচ্ছে দেখেও রাগ হচ্ছে। ঠান্ডা জবাব দিলাম, বেশি কথা কোনো সময়েই না বলা ভালো।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, কাল-পরশুর মধ্যেই তাঁর কাছে একবার যাব ভাবছি।

নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা রসাতলে গেল।—কেন? আপনার গাড়ি আছে, আর সেই গাড়িতে তুলে আমাকে এতবড়ো একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন, এ-কথা বলতে?

পুরু ঠোঁটে আবার সেই হাসির দাগ।—না, আমার নিজেরই দরকার আছে।

এই দরকারের পিছনে যেন একটা অমার্জনীয় উদ্দেশ্যের ছায়া পড়ছে আমার মনে। তাই সরোষেই আবার বললাম, কি দরকার? মামলার ব্যাপার হলে বাবাকে বিরক্ত না করাই ভালো, বাবা আজকাল কোনো কেস নেন না।

খুব সত্যি কথা বলিনি। আমার কথা ভেবেই এই শরীরেও বাবার আজকাল কেস নেবার ঝোঁক। আমরাই বাধা দিই।

সামনেটা ফাঁকা। দু-হাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে এই প্রথম আমার দিকে সোজাসুজি ফিরল একবার। জবাব দিল, আমার কেস যাতে নেন, সেই চেষ্টা করব।

বাড়ির গায়ে গাড়ি থামতে দেখি, উদ্‌গ্রীব মুখে রেলিং ধরে বাবা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। পাশে বউদি। এই গাড়ি থেকে আমাকে নামতে দেখে বউদি হাঁ!

যে আমাকে নিয়ে এলো তার দিকে একবারও না তাকিয়ে আমি সোজা ভিতরে ঢুকে গেলাম। ওদিকে বউদি তর-তর করে নীচে নেমে এলো।—কি কাণ্ড, চারদিকে এত গণ্ডগোল শুনে বাবা সেই থেকে ভয়ানক—ও কি? তোমার চোখ এত ফোলা কেন? এত লাল কেন?

ওপরে উঠতে উঠতে আমি রসিকতাই করলাম।—অনেক কেঁদেছি।

সঙ্গ নিয়ে বউদি আবার বলল, সত্যি মুখচোখ অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোমার! ওদিকে বাবা ভয়ানক অস্থির, তার ওপর বাড়ি গিয়েই মনতুবাবু টেলিফোনে জানিয়েছেন, টিয়ার গ্যাসের মধ্যে ভিড়ের ছোটাছুটিতে তুমি কোথায় ছিটকে গেছ—অনেক খুঁজেও তোমাকে পেলেন না—তাই বাড়ি ফিরেই টেলিফোন করেছেন—শুনে তো বাবা আরো যান আর কি!

না থেমে বললাম, আমি বাবার কাছে যাচ্ছি, তুমি মনতুদাকে টেলিফোনে জানিয়ে দাও আমি ঠিকমতো ফিরেছি।

—কিন্তু তুমি সুনন্দবাবুর গাড়িতে এলে কি করে?

বিরক্তিতে থমকে দাঁড়ালাম। ব্যঙ্গ করে বললাম, ওই গাড়িতে আসার ব্যবস্থা তো তুমিই করেছ শুনলাম।

বাবা এগিয়ে আসতে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গেলাম। আমার দিকে চেয়েই আঁতকে উঠলেন তিনি।—কি সর্বনাশ! এ কি হয়েছে? বউমা টেলিফোন করে শিগগির একজন ডাক্তার-টাক্তার ডাকো!

আমি তাড়াতাড়ি বাবাকে ধরে বললাম, ডাক্তার দেখিয়েই বাড়ি আসছি, তুমি কিছু ভেবো না বাবা, আমার কিছুই হয়নি।

ধরে এনে তাঁকে বিছানায় বসিয়ে আমিও পাশে বসলাম। বাবা উত্তেজিত হয়ে বকে উঠলেন। —তোর সঙ্গে সঙ্গে কি মনতুটারও মাথা খারাপ হয়েছিল! এই দিনে কেউ বেরোয়! তার ওপর টেলিফোন, গণ্ডগোলে ওর গাড়িটাও যেতে পারেনি, আর ওদিকে তুইও কোথায় ছিটকে গেছিস যে, সে তোকে আর খুঁজেই পেল না—এভাবে ভাবিয়ে আমাকে কি মারবি তুই?

আমি সভয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, না জেনেশুনে আর কক্ষনো এভাবে বেরুবো না বাবা—

বাবা জিগগেস করলেন, তারপর এলি কি করে? সুনন্দকে পেলি কোথায়?

—ওখানেই ছিল।

—ওখানেই ছিল! ট্রাম নেই, বাস নেই, ও না থাকলে কি হত—আসতিস কি করে?...ডাক্তার সে-ই দেখিয়ে এনেছে?

মাথা নাড়তে হল।

বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। কিছু ভয় নেই তো, চোখ এখনো এত লাল কেন?

—সেরে যাবে। ওষুধ দিয়েছে।

তক্ষুনি মনে পড়ল লোশনের শিশিটা ওই লোকের গাড়িতে থেকে গেছে।

বাবার কাছ থেকে উঠে নিজের ঘরে এসে আয়নায় মুখ দেখলাম। দুটো চোখ যেন এখনো জবা ফুল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে আলগা রক্তের ছোপ লেগে আছে।

আধ-ঘণ্টার মধ্যেই লোশনের শিশি হাতে বউদি হাজির।—তোমার ওষুধ, সুনন্দবাবু পাঠিয়ে দিলেন।

আমার মনে হল, ওষুধ আনা বা এই কথা বলার মধ্যে যেন চাপা হাসি লুকিয়ে আছে। শিশিটা তার

হাত থেকে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ভাঙতে ইচ্ছে করল। তার বদলে ঠক করে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখলাম।

তিন দিন পরের ঘটনা।

আমাদের বাড়ির দোতলার সিঁড়ির সামনের বারান্দায় সুনন্দ বোসের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। হাতে একটা মোটা ফাইল। এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে তারপর পাশ কাটিয়ে সোজা বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। যেন নিজের অধিকারেই সোজা দোতলায় এসে বাবার কাছে যাচ্ছে। ও-ধারের ঘর থেকে বউদিকে মুখ বাড়াতে দেখে আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, একটা খবর না দিয়ে এ-ভাবে ওপরে উঠে আসে কেন?

বউদি—আমতা আমতা করে জবাব দিল, বাবার কাছে তো সকালেই খবর পাঠিয়েছিল, বাবা আসতে বলেছেন—

য়ুনিভার্সিটির সময় হয়ে আসছে আমার। খেতে বসা দরকার। কিন্তু ভিতরে কি-জানি একটা অস্বস্তি। বাবার ঘরের দরজার কাছে একবার ঘুরে না গিয়ে পারলাম না।...ফাইল খুলে কৌটো-কারখানার জায়গা জমি কিছু একটা দেখাচ্ছে মনে হল। আর বাবাও গভীর মনোযোগে দেখছেন।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে খেয়েদেয়ে আমি য়ুনিভার্সিটি চলে গেলাম।...হয়ত ব্যবসাসংক্রান্ত কোনো পরামর্শ নেবার জন্যই বাবার কাছে এসেছে। আবার ভাবছি এটা ছলও হতে পারে।

বিকেলে বাড়ি ফিরে বাবাকে কেমন খুশি খুশি দেখলাম। এ-রকমটা আজকাল বড়ো দেখিনে তাঁকে। কিন্তু ততক্ষণে সকালে ওই লোকের আসার ব্যাপারটা আমি ভুলে গেছি। তাই বাবাকে খুশি দেখে আমিও খুশি।

পরদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ দাদাকে বাবার ঘরে দেখে আমি অবাক একটু। দাদা পারতপক্ষে বাবার ঘরে আসে না। অথচ আজ দাদা হাসিমুখে বাবাকে কি বলছে আর বাবা সাগ্রহে তাই শুনছে। আমি ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ালাম। কারো ব্যবসা ভালো চলার চাক্ষুস-দেখা ফিরিস্তি দিচ্ছে দাদা। তারপরেই সুনন্দর নাম!

আমি যেন তক্ষুনি কিছু একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পেলাম। আর তারপর থেকেই মাথায় যেন আগুন জ্বলতে লাগল। কেবলই মনে হল মানুষের স্থূল বিবেচনারও একটা সীমা থাকা উচিত। বাবার বয়েস হয়েছে, শরীর ভেঙেই পড়েছে, আমার জন্যে খুবই চিন্তা করেন সবই ঠিক—কিন্তু তা বলে এই স্তরে নেমেছে!

খানিক বাদে বাবার ঘরে আমার ডাক পড়ল। আমি প্রস্তুত হয়েই গেলাম। বাবা শুয়ে ছিলেন, খুশিমনে ডাকলেন, আয়, য়ুনিভার্সিটি নেই?

—আছে।

—তোর সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল, আজ না যদি যাস?

—দেরিতে যাব। বলো।

—বোস।

আমি পাশে বসতে শুয়ে শুয়েই আমার পিঠে দুই-একবার হাত বোলালেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ রে, ও বাড়ির সুনন্দ তো বেশ চমৎকার ছেলে, ওর বাবাকে অবশ্য আমি জানতাম, গরীব হলেও বড়ো ভালো লোক ছিল—তোর ঠাকুমাও ওদের খুব পছন্দ করত। তা হাতের কাছে এ-রকম একটা ছেলে থাকতে আমি তোর জন্য এত ভেবে মরছি কেন?

আমি খুব স্পষ্ট করেই পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আমার জন্য তুমি এত ভাবছই বা কেন?

—কেন ভাবি সে তুই এখন বুঝবি না।...তোর বউদি অনেক দিন ছেলেটার খুব প্রশংসা করেছে আমার কাছে। তুই কবে নাকি কি একটা গল্প লিখেছিলি ওদের নিয়ে, তাই পড়েই ঝোঁকের মাথায় সুনন্দ ব্যাঙ্কের কেরানীগিরি ছেড়ে ব্যবসায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শুনে ওর দাদাকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে একটু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। তার মধ্যে সুনন্দ কাল নিজেই একেবারে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির।...কোথায় কারখানা, কারখানায় কি কি হয় না হয়, ভবিষ্যতে আরো কি কি করার

ইচ্ছে সব দেখালো। এই দক্ষিণেই কোথায় জমি কিনেছে একটা তারও কাগজ-পত্র দেখালো। আমি তখনো বুঝিনি কি বলতে চায়।

আমার ভেতরটা কঠিন হয়ে উঠেছে। বাবার হাসি-হাসি মুখের দিকে স্থির চেয়ে আছি আমি।

কি মনে পড়তে বাবা হেসেই ফেললেন। বললেন, এমন ছেলেমানুষ, ফাইলের মধ্যে ব্যাঙ্কের পাসবইসুদ্ধু নিয়ে এসেছিল, আমি দেখতে চাইলে তাও দেখাত! এতসবের পর বিয়ের প্রস্তাব—ছেলেবেলা থেকেই নাকি তোকে ওদের বাড়ির সকলের পছন্দ, তাই আজ নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর এ প্রস্তাব নিয়ে এসেছে।

আরো শুনতে হল। যার সারমর্ম, ছেলেটার স্পষ্ট কথায়-বার্তায় আর সহজ অথচ বলিষ্ঠ আচরণে বাবা একেবারে মুগ্ধ। নিজের সম্পর্কে এত কথা বলা সত্ত্বেও একটুও দেমাকি মনে হয়নি তাকে। বরং খুব স্বচ্ছ জোরালো ছেলে বলে মনে হয়েছে। আর তার ফলেই বাবার নিজের যে কিছু নেই সে কথাও নাকি মুখ ফুটে বলতে বাধেনি তাকে। আর, সেইসঙ্গে বাড়ির একটা অংশ আমাকে লিখে দেবার ইচ্ছে আছে তাও জানিয়েছেন। তার জবাবে ওই চমৎকার ছেলে সবিনয়ে অথচ স্পষ্ট করে বলেছে, চঞ্চলদার তিনটে ছেলেপুলে...সেটা ঠিক হবে না, আপনার আশীর্বাদে আপনার মেয়ের কোনো অভাব থাকবে না।

আমি নির্বাক। আমার দিকে চেয়ে এতক্ষণে বাবার খটকা লাগল একটু। তবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তুই কি বলিস?

—তুমি কি তাকে কোনোরকম কথা দিয়েছ?

—না কথা ঠিক দিইনি...তবে ছেলেটা যেন ধরেই নিয়েছে এখানে বিয়ে হবে।...কিন্তু তোর মত নেই নাকি?

আশা আর উৎকণ্ঠা চাপতে না পেরে বিছানায় উঠে বসেছেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ঠাণ্ডা সুরেই বললাম, বাবা, আমি তোমাকে আগেও বলেছি এখনো বলছি আমাকে নিয়ে তুমি এত চিন্তা-ভাবনা কোরো না।

উদ্বেগে বাবার দু'চোখ আমার মুখের ওপর থমকে রইল একটু।—তোর কি আর কোনো ছেলেকে পছন্দ?

জোর দিয়েই বললাম, না, এখন পর্যন্ত কাউকেই পছন্দ না।

শুনে বাবার আগ্রহ আরো বাড়ল।—তাহলে এখানে আপত্তি কি ? আমি সব বলতে পারলাম না, বউমাকে জিজ্ঞেস করে দেখ্, তার সঙ্গে সুনন্দর অনেক দিন অনেক কথা হয়েছে।

—জিগগেস করব।

আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে এলাম আমি। সেই মুহূর্তে সব থেকে বেশি অভিমান আমার বাবার ওপরেই। এর থেকে বাবা যদি আমার জন্যে অল্প মাইনের কোনো কলেজের মাস্টারও ঠিক করতেন, এত খারাপ লাগত না। টাকা নেই বলে মেয়ের জন্যে একটু বিবেচনাও থাকবে না? একজনের টাকা আছে? সেটাই সব!

য়ুনিভার্সিটি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে খেতে বসলাম। এ সময় বউদি সামনে থাকে। সামনেই ছিল। ভয়ে ভয়ে আমাকে লক্ষ করছে টের পাচ্ছি। কিন্তু বিতৃষ্ণায় আমি তার দিকে তাকালামও না। তার সাহসের একটা সীমা আছে এটাই বোঝাতে চাইলাম।

য়ুনিভার্সিটিতে বেশিক্ষণ ভালো লাগল না। সেখান থেকে ছোড়দির বাড়ি চলে গেলাম। ওদের দুজনের সামনেই বললাম ব্যাপারটা। শুনে ছোড়দি একেবারে আকাশ থেকে পড়ল।—বলিস কি রে, টিনের কৌটো-ওলার সঙ্গে বিয়ে! ওর বরের দিকে তাকালো।—তুমি কিছু বলছ না যে!

বিস্ময়ের ধাক্কায় ছোড়দি অ্যালুমিনিয়ামকে টিন বানিয়ে ফেলল। নিস্পৃহ কৌতুকে মনতুদা জবাব দিল, তোমার সাহিত্যিক বোনের জিনিয়াস তো কৌটোয় পুরে রাখারই জিনিস! তারপর হেসেই বলল, তুমি একেবারে জলে পড়ে আছ ভাবছেন কেন শ্বশুরমশাই...মাসে তোমার চার-পাঁচশ টাকা রোজগারের ব্যবস্থা তুমি এম. এ. পাস করার আগেই আমি করে দিতে পারি।

আমি উত্তেজিত।—সত্যি পারো?

মনতুদা রহস্য করে জবাব দিল, তোমার নিজের সৌরভ তো নিজে টের পেলে না প্রিয়সখী—কালে-দিনে তোমার নিজের গুণেই এর থেকে ঢের বেশি তুমি নিজেই রোজগার করতে পারবে।

ছোড়দি বাধা দিল, থাক, এম. এ. পাস করার আগে আর রোজগার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই।

আমি উত্তেজিত।—এ-সব কথা বাবাকে তোমরা বলতে পারবে?

মনতুদা জবাব দিল, তুমি হুকুম করলেই পারব।

ঠিক তখনই মনতুদার বড় অ্যালসেশিয়ানটা ঘরে ঢুকল। বাড়িতে জমকালো দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে মনতুদার। আমার সঙ্গে ওদের চেনা পরিচয় হয়ে গেছে, কিন্তু দেখলে এখনো ভয়ই করে। মনতুদা ঠাট্টা করল, এক কাজ করো, এই বড়টাকেই নিয়ে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে রাখো—কৌটো-ওলা ফৌটো-ওলা ঢুকলে আর আস্ত ঠ্যাং নিয়ে ফিরতে দেবে না।

বেশ একটা উদ্দীপনা নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু চার-পাঁচ ঘণ্টা যেতে না যেতে সেই পুরনো অসহিষ্ণু অস্বস্তি আবার যেন ছেঁকে ধরতে লাগল। ভিতরটা আমার দুর্বল জানি বলেই নিজের ওপরে রাগ। থেকে থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল একজনের এই সবল চাওয়া প্রতিহত করার ক্ষমতা যেন আমার নেই।

সেদিন আর পরদিন বিকেল পর্যন্ত বউদির সঙ্গে আমার কথা বন্ধ। রাগ আমার সব-থেকে বেশি তারই ওপর। এর মধ্যে বাবা অনেকবার করে তাকে ঘরে ডেকেছেন টের পেয়েছি। ধারণা, আমি কিছু বললাম কিনা সেই খোঁজখবর নিচ্ছেন, আর আশায় উদগ্রীব হয়ে আছেন।

একটানা দেড়দিন কথা বন্ধ থাকার পর বউদি আর চুপ করে থাকতে পারল না। বিকেলে আমি চা নিয়ে বসেছিলাম, ভয়ে ভয়ে বউদি মুখ খুলল।—তুমি আমার ওপর রেগে আছ কেন?

এই প্রতীক্ষাতেই ছিলাম। ঝলসে উঠলাম, নিজেকে তুমি খুব বুদ্ধিমতী ঠাওরেছ, কেমন? বাবাকে দুর্বল দেখে তোমার এত সাহস যে আমার ব্যাপার নিয়ে তুমি তাঁর কাছে পর্যন্ত নাক গলাও—আর দিনের পর দিন তুমি বাইরের একটা লোককে প্রশ্রয় দাও? বাবা যে আমাকে নিয়ে খুব ভাবতেন তাতে তোমারও খুব সুবিধে হয়েছে, না?

মিনমিন করে বউদি বলল, এ-সব কি কথা ভাই!

—থামো! তোমাকে আমি খুব ভালোরকম চিনেছি। নিজের কি বিয়ে হয়েছে সেটা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছ বলেই আমাকে যেখানে খুশি ঠেলে নিয়ে মজা দেখতে চাও, কেমন? আর, ওই লোকটা তোমার চোখে এত ভালো কেন—বাড়ির অংশ লিখে দিতে হবে না বলে?

ক্ষিপ্ত হবার ফলে আমার গলা কতখানি চড়েছিল আমি জানি না। বউদির সমস্ত মুখ বিবর্ণ। কিন্তু আমার জ্বালা বরং তাতে বাড়ল। বলে উঠলাম, শোনো, তোমাকে খুব ভালো জানতুম, কিন্তু আর তোমার মুখের দিকে তাকাতেও আমার রুচি হয় না।

—অরু!

আমি ঈষৎ চমকে ফিরে তাকালাম। দরজা ধরে বাবা দাঁড়িয়ে, তার পিছনে দাদা। বাবার সমস্ত মুখ সাদা, কাঁপছেন ঠকঠক করে। বিস্ময় আর বেদনার শেষ নেই যেন। অব্যক্ত যাতনায় বিড়বিড় করে বললেন, বউমাকে তুই এত অপমান করলি...এ-রকম হয়ে গেছিস তুই...মুখের ওপর এইসব বললি বউমাকে!

বাবা ঘামছেন, কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পড়েই যাবেন বুঝি। বউদিই দৌড়ে এসে বাবাকে ধরল, তারপরেই দাদার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, কি-রকম করছেন দেখছ না! শিগগির শুইয়ে দাও!

ধরাধরি করে বাবাকে তাঁর বিছানায় এনে শুইয়ে দেওয়া হল। আমিও নিস্পন্দের মত এসে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম। বাবার অস্থিরতা দেখে মনে হল এক্ষুনি বুঝি প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। ভাগ্যের এমন বিভীষিকা আর বুঝি হয় না।

দুটো দিন দু'বেলা করে ডাক্তার আনাগোনা করল। আর আমি কেবল অদৃশ্য দেবতার পায়ে মনে মনে অবিরাম মাথা ঠুকলাম।

ফাঁড়া কাটল। স্ট্রোক হল না। তৃতীয় দিনে বাবা অনেকটা সুস্থ। সমস্ত রাত টানা ঘুমোলেন। সকালে বেশ খুশিমুখ। নিজের ওপর অপরিসীম ধিক্কারে আমি ঘরে যেতে পারিনি, আড়াল থেকে দেখছি। বউদি তাঁর শিয়রে বসে।

খানিক বাদে বাবা ডাকলেন আমাকে। আমি এলাম।

খুব সহজ মুখে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, বউমায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছিস?

বউদির অপ্রস্তুত মুখ একটু। আমি তার দিকে ফিরে তার চোখে চোখ রেখে বললাম, ক্ষমা করো বউদি।

বউদি উঠে বাবার সামনেই আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি নির্বাক। ভিতর থেকে বউদিকে যে ক্ষমা করতে পারিনি সে শুধু আমিই জানি।

বাবার মুখখানা খুশিতে ভরপুর। ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে যেন ভারি আনন্দের কিছু দেখছেন। বললেন, আর আমার কোনো ভাবনা নেই রে...ভোর রাতে চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখলাম...সুনন্দর সঙ্গে তোর সদ্য সদ্য বিয়ে হয়েছে, আর তোর ঠাকুমা আমাকে হেসে হেসে বলছে, তোর এই মেয়েটারই সব থেকে ভালো বিয়ে হবে বলেছিলাম কিনা—এখন দ্যাখ্।

পরিস্থিতিবিশেষে মুখের ক'টা কথায় অনুভূতির এতবড় বিপর্যয়ও ঘটে যেতে পারে? সেই মুহূর্তে আমার ভিতরে ভিতরে কি-যে হয়ে গেল আমি জানি না। প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করে আবার বউদির দিকে ফিরলাম। বললাম, আমি আর আপত্তি করব না, তোমরা ব্যবস্থা করো।

নিজেকে নির্দ্বিধায় বলি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আমি যেন ঘর ছেড়ে চলে এলাম।

বাড়ির হাওয়া সরগরম। বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। বারণ করা সত্ত্বেও মনতুদা বাবাকে একটু বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। বাবা জবাব দিয়েছেন, ও নিজেই মত দিয়েছে...ভালোই হবে দেখো। পরে একসময় ঘরে ঢুকে দেখি ছোড়দি খুশিমুখে বাবাকে বলছে, খুব ভালো হয়েছে, চমৎকার হয়েছে—নিজের জোরে ব্যবসায়ে বড় হয়েছে, ক'জন পারে?

আমাকে পিছনে দেখে অপ্রস্তুত। বাইরে এসে ফিসফিস করে বলেছে, বিয়ে হচ্ছেই যখন খারাপ বলে লাভ কি বল্—ভালো বললে বাবা কত খুশি হয় দেখলি তো?

আমি হেসে ফেললাম। ছোড়দিটা চিরকালের ভীতু জানি।

বিয়ের কিছুদিন আগে বউদির ওপর মনে মনে আর একপ্রস্থ বিরূপ হয়েছি আমি। তার এত দেমাক যে বাবাকে বারকয়েক অনুরোধ করেছে, বাড়ির অংশ আমাকে আগেই লিখে দেওয়া হোক।

বাবাকে দো-মনা দেখে আমি বাবাকেই বকেছি।

আমার কেবল ভয় বাবা এ বিয়ের দরুন কোথাও ধার-ধোর না করে বসেন। আবার যে-ঘরে যাচ্ছি তার উদারতা দেখেও রাগ। জামা-বোতাম ঘড়ি যা-ই পছন্দ করার কথা বলা হয়, তার জবাবেই আপত্তি আসে, কিছু দরকার নেই—সব আছে।

এটা নতুন পয়সার দেমাক ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারিনি। বউদি ঠাট্টা করেছে, দেখেছ লোকটার কাণ্ড, তার কিছুই চাই না, কেবল আসল জিনিসটি পেলেই হল!

আমি তির্যক ঠেস দিয়েছি, সেটাই কি যথেষ্ট নয়?

কিছুদিন ধরে এই মর্যাদার আসনেই মনে মনে নিজেকে আমি বসিয়ে রেখেছি, সত্যি কথা।

বিয়ে হয়ে গেল।

সকলের চপল পীড়াপীড়িতে পাঁচ বার করে শুভদৃষ্টি হল। প্রতিবারই আমি খুব স্পষ্ট করে তাকিয়েছি। দেখেছি। আগে যা দেখিনি, এরই মধ্যে তাও চোখে পড়েছে...ঠোঁট একটু পুরু জানি, চোখও তেমন বড় নয়...কিন্তু কান দুটোও যেন স্বাভাবিকের থেকে একটু লম্বা ধরনের।

যাবার আগে বাবাকে প্রণাম করলাম। বউদির চোখে জল দেখেও তার দিকে এগোলাম না। ধরা গলায় বাবা বলে উঠলেন, এ কি রে, তোর ঠাকুমার ছবি প্রণাম করলি না!

ঠাকুমার ফটোর দিকে এগোলাম। পিছনের জোড়ে-বাঁধা মানুষটাও। কেউ জানল না, আমি

ঠাকুমার-মুখের দিকে তাকাইনি। হাত জোড় করে প্রণামই করেছি শুধু। পাশের লোক বরং আমার থেকে অনেক বেশি প্রণাম করেছে।

উল্টোদিকের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি। আমারই সম্মানে এ বাড়ির ভোল আর একদফা বদলানো হয়েছে। আমার ভাসুর সুনন্দর থেকে অনেক বড়। আমি বাড়িতে পা-দেওয়া মাত্র সেই মানুষটির ব্যস্ততা দেখবার মত। কি যে করবেন, কোথায় বসাবেন, কত ভাবে যত্ন করবেন ভেবে পাচ্ছেন না যেন। আমার নতুন জায়েরও সেই অবস্থা।

রাতের বউ-ভাতের উৎসব হয়ে গেল। বাড়ি নিঝুম হতে রাত প্রায় একটা।

ঘরের দরজা বন্ধ করে, আনাচে-কানাচে কেউ উঁকি দিচ্ছে কিনা দেখে নিয়ে আমার সামনে চেয়ার টেনে বসল। আমি নতুন শয্যায় বসে।

বলল, কেমন জব্দ?

আমি চেয়ে রইলাম।

বলল, শুভদৃষ্টির সময় তুমি যে-ভাবে তাকাচ্ছিলে, আমি ভাবলাম ঠিক জিভ ভেঙাবে।

ঠোঁটের ডগায় হাসির আভাস ধরে রেখেছি। বললাম, ইচ্ছে ছিল। পারা গেল না।

হেসে উঠল।—এখন তো ঘরে কেউ নেই, ইচ্ছেটা এখন পূরণ করে ফেল।

বললাম, তাও পারছি না।

চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। তারপর সামনে ঝুঁকে এসে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আমাকে তোমার এত অপছন্দ কেন? আমি সবই জানি, মাঝখানে তোমার বউদি আর তোমার বাবা না থাকলে এ বিয়ে হতই না, কেন অপছন্দ?

জবাব না দিয়ে এবারে আমি চুপচাপ চেয়ে রইলাম।

এতেই ধৈর্য গেল যেন। উঠে এক ঝটকায় আলোটা নিভিয়ে দিল।

ছয়

সুনন্দর তৃষ্ণার অনাবৃত দুর্দম রীতি অনেক সময় স্বেচ্ছাচারী স্থূল জুলুমের মত মনে হত। গোড়ায় গোড়ায় এর সঙ্গে আপস করে নেওয়াটা সহজ হয়নি খুব। তবু, একে অস্বীকার না করেও জীবনযাত্রার এই নতুন পটভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে বেগ পেতে হয়নি। আমার সে-স্বাধীনতায় অন্তত অনেকদিন পর্যন্ত কেউ হস্তক্ষেপ করেনি।

কিন্তু শুরুতেই আমি কতকগুলো ভুলের বীজ ছড়িয়ে বসেছিলাম।

প্রথম ভুল, নিজের এক বিশিষ্ট সত্তার স্পষ্ট ঘোষণা নিয়ে আমি এই নতুন জীবনে পদার্পণ করেছিলাম। তাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি উপলব্ধি করতাম সেই ঘোষণা আর একজনের মধ্যেও থাকতে পারে। উপলব্ধি করিনি।

দ্বিতীয় ভুল, যে স্থিতধী নিষ্ঠার ফলে এই দরিদ্রের সংসারে কমলার হাসি ঝলমল করে উঠেছে, আমি তাকে পুরুষকার ভাবিনি। তার কাজটাকে কখনো দরদের চোখে দেখিনি, সে-কাজের সঙ্গে কোনো সময় নিজেকে আমি মানসিকভাবে যুক্ত করিনি। তার কর্মক্ষেত্রে তাকে আমি নিঃসঙ্গ রেখেছি।

তৃতীয় ভুল, আবার গল্প আর কবিতা লেখা শুরু করে নিজস্ব যে আনন্দ জগৎ গড়তে চেয়েছিলাম, সেখানে বাইরের রসিকজনের আমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু নিজের ঘরের লোকের সাদর অভ্যর্থনা ছিল না।

চতুর্থ ভুল, আর সেটাই বোধকরি সব থেকে বড় ভুল—নিজে বোকা বলেই এই ঘরের লোককে আমি তেমন বুদ্ধিমান ভাবিনি।

এতগুলো প্রাথমিক ভুল থেকে পরে খুঁটিনাটি আরো বহু ভুলের সূত্রপাত। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই সব ভুলের একটাও বিদ্বেষপ্রসূত নয়। রাতের নিভৃতে যে মানুষটা প্রায় উদভ্রান্ত বাসনার দাস, দিনের আলোয় সে কাজের জাঁতায় আবদ্ধ। এ দুয়ের বাইরে তার আর কোনো রূপ আমি দেখতে পেতাম না। আর এই জীবনের শুরুতে তার বিজেতার ভূমিকা বলে চেষ্টাও করিনি দেখতে।

দিনকয়েকের মধ্যেই সে আমাকে গাড়িতে পাশে বসিয়ে তার কারখানা দেখাতে নিয়ে গেছল। আগে যা শুনেছিলাম, ওষুধের কারখানায় অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো সাপ্লাইয়ের ব্যবসা, ঠিক তা নয়। নানা আকারের অ্যালুমিনিয়াম কনটেনার তৈরি হয় ঠিকই। কিন্তু তার থেকেও বড় এবং সুচারু কাজ যা দেখলাম, তার নাম শুনলাম অ্যানোডাইজিং—অর্থাৎ, অ্যালুমিনিয়ামের বিভিন্ন বস্তুর ওপর প্লেটিং করা। এইভাবে প্লেটিং করে ওষুধের কারখানার কনটেনার ছাড়াও বহু শৌখিন জিনিস বাজারে চালু করা হয়েছে। শৌখিন ছিটকিনি, বাথ-শাওয়ার, টাওয়েল হ্যাঙার, রং-বেরঙের বাটি-গেলাস। জিনিসগুলো দেখলে চোখ টানে ঠিকই!...তখনো যদি মনে হত, শুধু ব্যবসা নয়, সেই সঙ্গে খানিকটা শিল্প-দৃষ্টি ভিন্ন এই সব হয় না!

গাল-ভরা নাম বটে, অ্যানোডাইজিং—কিন্তু কৌটোর ফ্যাক্টরি শুনেও এর থেকে বড় ধারণা ছিল আমার। বড় দুটো ঘরের আয়তনে এক ইঁটের ওপর করোগেটেড শেড একটা। সেখানেই স্পিনিং মেসিন, বল প্রেস, পাওয়ার প্রেস, ওয়েলডিং সেট, অ্যাসিড বাথ্, জেনারেটর ইত্যাদি সরঞ্জাম। আর ওটুকুরই আর একধারে গোডাউন।

না বলে পারলাম না, এটুকু থেকেই তোমার এত রোজগার হয়?

পরিতুষ্ট মুখে জবাব দিল, যত আশা করছি তত আর কোথায় হয়।...দেখো না, বেশ মোটা টাকা ইনভেস্ট করতে পারলে সিঁড়ির ডেকরেটিভ হ্যান্ডল, নানা রঙের গ্রিল আর গাড়ির ড্যাশ বোর্ডও তৈরি করব। মাথায় অনেক কিছু প্ল্যান আছে।

এরপর মনতুদা যখন জিগগেস করেছে, কি গো, তোমার কর্তার কৌটোর কারখানা কেমন চলছে—ছদ্ম কোপ দেখালেও আমি মনের কথাই বলেছি।—কৌটো নয়, কনটেনার, আর বলবে অ্যানোডাইজিং।

আগ্রহ নিয়েই ছোড়দি আর মনতুদা একদিন ফ্যাক্টরি দেখে গেছে। আমি সঙ্গে ছিলাম এবং অস্বস্তি বোধ করছিলাম। পরে গাড়িতে উঠে মনতুদা আমাকে বলল, চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বা লাখ-খানেক টাকা খাটালে এটা যদি বড় করে তোলা যায় তো সে-চেষ্টা করতে বলো, টাকার ব্যবস্থা করা যাবে।

মনতুদা না হয়ে আর কেউ হলে আমি উৎসাহ বোধ করতাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু মনতুদা এগিয়ে আসা মানেই গোটা জিনিসটার মর্যাদা বেড়ে যাওয়া। সুনন্দ বাড়ি ফিরতেই মনতুদার প্রস্তাব জানালাম তাকে।

—না।

এমনভাবে শব্দটা উচ্চারণ করল যে আমি হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। পরে অবশ্য বলল, বড় একদিন আমি নিজেই করতে পারব।

তা সত্ত্বেও ওই অসহিষ্ণু না শব্দটাই আমার কানে লেগে থাকল। তার কাজের সঙ্গে আমার যোগও সেইখানেই শেষ।

বিয়ের দেড় বছরের মধ্যে রুমু এলো। ও হবার কিছুদিন আগে থেকে বাবা আমাকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। প্রথম সন্তানের মা হয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হইনি, আবার যে এলো তার অনাদরও করিনি। আমার মেয়ে রূপসী না হোক কুশ্রী কেউ বলবে না। তাছাড়া শিশুমাত্রেই আলাদা একটা রূপ আছে। তবু, মেয়েটা আরো সুশ্রী কেন হল না সে-কথা আমার মনে এসেছে।

বিয়ের দু'বছরের মধ্যে এখানে এই নতুন বাড়ি করে আমরা উঠে এসেছি। ব্যবসার উন্নতি হচ্ছিলই। আরো উন্নতির জন্য সেখানে সব টাকা ঢালার আগে বাড়ি করাটা আমি দরকার মনে করেছি। ভাসুর আর বড় জা আমাকে কত ভালোবাসে জেনেও আমি এই তাগিদ দিয়েছি। আমার পদস্থ আত্মীয় পরিজন অথবা কাব্য-সাহিত্য রসিকরা কেউ ওই একতলা দালানের নিজস্ব দখলের একখানা মাত্র ঘরে এলে আমি অস্বস্তিবোধ করতাম। মনতুদার কল্যাণে দু'চারজন নামী লোকও আসত। এমনও হয়েছে তখন যে আমি তাদের বাপের বাড়িতে বসার ব্যবস্থা করেছি। তাই জমি যখন কেনাই আছে, বাড়িটাই আগে তোলার কথা ভেবেছি। নতুন বাড়িতে আসার সময় ভাসুরের চোখে জল দেখেছি, বড়-জা তো কেঁদেই ভাসিয়েছে—আর মন আমারও খারাপ হয়েছে। পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে তারা আসবে না জানা

কথাই। কিন্তু আমি কারো ওপর অবিচার করেছি ভাবিনি। যে মানুষের ওপর তাদের একান্ত নির্ভর, বাড়ি বদল করলেও সে নির্ভরতা কমিয়ে আনার কথা আমার কোনো সময়ে মনে হয়নি।

নতুন বাড়িতে এসে আমি নিজস্ব আনন্দ-জগৎ রচনায় মগ্ন হয়েছি। কবিতা আর গল্প লেখায় মন দিয়েছি। বাড়িতে সংস্কৃতির মজলিশ বসেছে। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বেড়েছে। বলা বাহুল্য এ-ব্যাপারে প্রধান সহায় মনতুদা। মনে মনে এটা সর্বদাই অনুভব করতাম, এই একজন না থাকলে আমার জীবন অনেকখানি নীরস আর বিরস হয়ে যেত। মেয়ের জন্য মোটা মাইনে দিয়ে এক বয়স্কা ট্রেন্‌ড্‌ গভরনেস্‌ রাখা হয়েছে। তাকেও মনতুদার মারফতই পাওয়া গেছে। মেয়েটা তার কাছে দিব্বি থাকে। অতএব আমার অবকাশে টান পড়েনি।

এরই মধ্যে আমার ঘরের লোকের নিভৃতের তৃষ্ণা আমাকে বেশ উতলা করে তুলতে লাগল। মনে হত এটা আরো বেড়েছে। তাই স্পষ্ট করেই একদিন জানালাম, আর ছেলেপুলে হোক সেটা আমার ইচ্ছে নয়।

মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, একটাই যথেষ্ট?

—হ্যাঁ, ও-ই বেঁচে থাক। ছোড়দির তো একটাও হয়নি।

তেমনি চেয়ে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল, তাহলে?

হেসেই জবাব দিলাম, তাহলে আবার কি, কতরকম ব্যবস্থা আছে, আজকাল আবার এক-গাদা ছেলেপুলে হয় কার?

ফট্‌ করে বলে বসল, এ পরামর্শটাও কি তোমার মনতুদার নাকি?

এই উক্তি আমার কান বিষিয়েছিল। আমার স্পষ্ট মনে হয়েছিল লোকটা মনতুদাকে ঈর্ষা করে। তবু রাগ না করে বলেছিলাম, না, এই পরামর্শটা আমার নিজেরই।

—ভালো কথা!

হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে কাজ নিয়ে বসেছিল। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছিল। তার পরেও কটা রাত কাছে আসেনি। আমি নিজের সঙ্কল্পে অটুট থেকেই হাসিমুখে তার রাগ ভাঙিয়েছি।

না, আমার মধ্যে কোনো বিদ্বেষ ছিল না, শুধু ভুলই ছিল। কিন্তু সংসার-জীবনের কতকগুলি ভুল যে বিদ্বেষেরই দোসর এ কে জানত!...অমরদা মস্ত স্কলার, মনতুদা যেমন বিদ্বান, তেমনি বুদ্ধিমান, আর ধনী হয়েও শিল্পানুরাগী মানুষ—অন্য যারা আসে এ-বাড়িতে তারাও উঁচু পর্যায়ের রসিক—এ বৈষম্য আমি কিছুতেই ভুলতে পারতাম না। ফলে তারা যখন আসত, আমি আদর-অভ্যর্থনায় অনেক বাড়তি জাঁকজমক করে আর বাড়তি খরচ করে এই বৈষম্যটুকু ঢেকে রাখতে চাইতাম। বাড়িতে কাব্য-সাহিত্য ইত্যাদির ঘরোয়া বিতর্কের আসর বসলে এই ঘরের লোককেই আমি নিরাপদ ব্যবধানে রাখতে চেষ্টা করতাম। আর সেটা নিজের উদারতাই ভাবতাম।

কিন্তু তবু অবকাশ থাকলে সুনন্দ এসে যোগ দিত। মাঝে-সাজে এটা সেটা মন্তব্যও করে বসত। আর আমার শঙ্কা বাড়ত। ছোট-গল্পে কবিতার স্বাদ থাকতে পারে, এই আলোচনার মধ্যে একদিন তো বলে বসল, বাঘের গায়েও যেমন কবিতা লেখার মত সুন্দর ডোরা কাটা দাগ থাকে। সকলে হেসে উঠল। মনতুদা তো ওর পিঠ চাপড়ে বাহবা-বাহবা করে উঠল। আমি ছদ্ম রাগ দেখিয়েই বললাম, আদার ব্যাপারী তুমি এ-সবের মধ্যে কেন, অ্যানোডাইজিং-এর প্ল্যান ভাবো গে যাও না!

এ-রকম কথা আরো বলেছি। ফলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছে তাও টের পেয়েছি। আর সেই কারণে আমিও বিরক্ত হয়েছি। কিছু বোঝার বুদ্ধি যদি থাকত!

খুঁটিনাটি অসন্তোষ বাড়তেই থাকল। যে-কোনো খুঁত ধরে কথা শোনাতে ছাড়ে না। মনতুদার দৌলতেই আমার দ্বিতীয় গল্পের বই ছাপা হল। সকলে খুশি। কিন্তু এই একজনের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা দূরে থাক, উল্টে গম্ভীর। বইটা উল্টে-পাল্টে দেখল, বড় প্রকাশকের নাম দেখল। তারপর বলল, যে-ই ছাপুক, টাকা নিশ্চয় তোমার ঘর থেকে গেছে। কত লেগেছে জিগগেস করে দিয়ে দাও।

হতে পারে যা বলেছে তাই ঠিক; কিন্তু সেই মুহূর্তে কথাগুলো বিচ্ছিরি লাগল। মনতুদা আসতে তার সামনেই বললাম, কত খরচ হয়েছে তোমার বলো আর টাকা নিয়ে নাও—নইলে একজনের মান যাচ্ছে।

হা-হা শব্দে হেসে উঠে মনতুদা ওকেই বলল, তুমি একটি আস্ত মূষিক দেখি যে হে, এ-ভাবে তল-কাটুনী।

—কেন? আপনার শালী এমন লেখিকা যে প্রকাশক আগ্রহ করে এই বই ছেপেছে বলতে চান?

মনতুদা হাসিমুখে জবাব দিল, যে-ই ছাপুক, আমি বলতে চাই তুমি আমার প্রিয়সখী অর্থাৎ তোমার স্ত্রীরত্নটির কদর বুঝলে না।

ওমনি ঠাস করে মুখের ওপর জবাব দিল, সে-তো আপনারাই বেশ যত্ন করে বোঝাচ্ছেন।

মনতুদা অবাক। আর লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা গেল। অথচ এমন অশালীন উক্তির পরেও একটুও অনুতাপ নেই। উল্টে দুদিন ধরে আমার সঙ্গে প্রায় বাক্যালাপ বন্ধ।

অশান্তির রাশ টেনে না ধরলে সেটা বাড়তেই থাকে। গোড়ায় আমি আপসের চেষ্টা করি, কিন্তু সেটা যখন তোষামোদ ভেবে আরো বেশি বিরক্তি দেখায় তখন আমারও রাগ হয়ে যায়।

আরো অপমান বোধ হয় যখন কোনো অসুবিধের কথা বললেও এ কান দিয়ে শুনে ও কান দিয়ে বার করে দেয়। ক'দিন একটা ড্রাইভার রাখার কথা বলেছি। নিজে ড্রাইভ করলে আমার দরকারে গাড়ি পাই না। ওটা কারখানাতেই আটকে থাকে। ড্রাইভার রাখলে দুজনের কারোই কোনো সমস্যা থাকে না।

ক'দিন কান না দেবার পর রাগত মুখেই বললাম, তোমার তো সময় নেই দেখছি, ড্রাইভারের ব্যবস্থা তাহলে আমিই করি? মুখের কথা খসালে মনতুদা ড্রাইভার এনে হাজির করবে সেটাও ও জানে।

—না। গাড়িটা আমার শখের জিনিস নয়, যখন তখন কাজে বেরুতে হয়, গাড়ি কারখানায় না থাকলে অসুবিধে।

সত্যি কিনা জানি না। আমি সত্যি ভাবিনি। এ-রকম স্বার্থপরতা দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

আগে বাবাকে দেখতে যাব বললেই অবশ্য ঠিক-ঠিক সময়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে এসেছে। বাবা আজকাল বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারেন না। এর পর সেজন্যেও গাড়ি চাওয়া ছেড়ে দিলাম।

গাড়ির জন্যে অবশ্যই আটকায়নি কখনো। মনতুদার গাড়ি আছে, ট্যাক্সি আছে। আড়াআড়ি করে ট্যাক্সিতেই বেশি চড়ি। তার চোখের সামনেই ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে বেরিয়ে চলে যাই। রাগ বেশি হলে এক-এক সময় ইচ্ছে হয় আর একখানা গাড়ি কিনে ফেলি। পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা আমার নামে আমার পাস বইয়েতেই আছে এখন। আছে ইনকাম ট্যাক্সের ভয়ে বোধ হয়!

কিন্তু আসল গোঁ কি জন্যে আমার বুঝতে দেরি হয়নি। আমি উৎসব অনুষ্ঠানে বেরোই, সাহিত্য অধিবেশনে যাই, মনতুদার পার্টিতে যোগ দিই—এ-সবেই আপত্তি। এগুলো ঠেকানো যাচ্ছে না বলেই রাগ বাড়তে লাগল। ভালো কথা, রুমু হবার আগে নিয়মিত য়ুনিভার্সিটিতে না গিয়েও আমি এম. এ-টা পাস করে নিয়েছিলাম। ভালো না হোক একেবারে মন্দ রেজাল্টও হয়নি। মনতুদা জিগগেস করেছিল চাকরির যোগাড় দেখব নাকি?

তখন গা করিনি। কিন্তু এখন ঘরের লোকের ব্যবহারে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে চাকরি করলে কেমন হয়। বেশি রাগ হলে সে-কথা শোনাইও। একবার তো ওর সামনেই মনতুদাকে বলেছিলাম, আমার জন্য একটা চাকরি-বাকরি দেখো তো—এই দিনেও মেয়েরা দিন রাত ঘরে বসে থাকবে, এ যারা আশা করে তারা একটু বেশি আশা করে।

মুখ কালো করে উঠে চলে গেছল। মনতুদা জিজ্ঞাসা করেছিল, মানলীলা চলছে?

রাগের মুখেও আমি হেসে ফেলেছিলাম।—আর বোলো না।

যা বলছিলাম, আমার নিজের ব্যাপারে বাইরে বেরুনো নিয়েই পষ্টাপষ্টি গণ্ডগোলের সূত্রপাত।...এক বেলার জন্য আমরা একদিন দল বেঁধে আউটিং-এ বেরিয়েছিলাম। দিদি-অমরদা, ছোড়দি-মনতুদা, জনা-দুই উঠতি সাহিত্যিক, আর মনতুদার জনা-তিনেক শাঁসালো অন্তরঙ্গ বন্ধু। সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরেছি। এসেই দেখি মুখ হাঁড়ি একেবারে।

শুনলাম সমস্ত দিন কাজে মন দিতে পারেনি, কারখানা থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়েছে—মেয়েটার এই অসুবিধে হয়েছে, ওই অসুবিধে হয়েছে, ইত্যাদি।

আমারও তক্ষুনি মেজাজ চড়ে গেল কেমন। মেয়েটার একটুও অসুবিধে হবার কথা নয়, কারণ সমস্ত দিনের বেশির ভাগ সময় মেয়ে এমনিতেও গভর্নেসের কাছেই থাকে, আর বেশ ভালোই থাকে। তক্ষুনি ডাকলাম গভর্নেসকে, বেশ ঝাঁজের মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি বলছেন মেয়ের এই এই অসুবিধে হয়েছে—কেন?

মেয়ে তখনো তার কোলে চেপে হাসছে। গভর্নেস বেচারি আমার মেজাজ দেখে হকচকিয়ে গেল। আর ওদিকের মুখ আরো থমথমে।

আরো মাসকয়েক পরের কথা।

দেশে ভয়ানক বন্যা হয়ে গেছে। কত জায়গায় কত যে ক্ষতি হয়েছে ঠিক নেই। মনতুদা সবেতে আছে। তাদের সাহায্যের জন্য একটা নাটক মঞ্চস্থ হবে। সেই নাটকের লেখিকা আমি। এটা আমার প্রতি একটা দুর্লভ সম্মান কারণ মনতুদাদের যে কালচারাল ইউনিট এই নাটক অভিনয় করবে তার মধ্যে জনাকতক নামজাদা শিল্পীও আছে। মনতুদা বলেছিল, শুধু নাম নয়, বেশ কিছু টাকাও আমার প্রাপ্য হবে। আমি সে-টাকাও ত্রাণের উদ্দেশ্যে দিয়ে দেব বলেছি।

রাত জেগে নাটক লিখে দিয়েছি। আমি উত্তেজনায় ভরপুর। কিন্তু তখনো ঘরের লোকের এতটুকু আগ্রহ দেখিনি। বরং সর্বদাই মহা বিরক্ত মুখ।

মনতুদার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে টিকিট বিক্রি করেছি। অবাক হয়ে দেখেছি পঞ্চাশ-পঁচাত্তর-একশ টাকার টিকিটও কত সহজে বিক্রি হয়ে যায়। নাটক রচয়িত্রী সঙ্গে থাকার দরুনও সর্বত্র সমাদর। মনতুদা সেদিন খুশিমুখে বলছিল, তোমার কদর দেখলে প্রিয়সখী।

সেই মুহূর্তে আমার ঘরের কথাই মনে হয়েছিল। সেখানে এর অর্ধেক কদর দেখলেও দ্বিগুণ আনন্দ হোত।

মনতুদার বাড়িতে পুরো দমে রিহার্সাল হয় বিকেলের দিকে। আমি রোজই ছুটি সেখানে। ফিরতে এক-একদিন রাত হয়। মনতুদার গাড়িতে যাতায়াত করি।

সেদিন সকাল থেকে গভর্নেসের দেখা নেই। এ রকম কখনো হয় না। দুপুরে সুনন্দ খেতে এলে বললাম, মহিলা আজ এলো না, একটা খবরও দিল না, কি করে যে বেরোই আমি—

খেতে খেতে গম্ভীর মুখে জবাব দিল, গভর্নেস আর আসবে না।

আমি হতভম্ভ।—তার মানে?

—সে অন্য জায়গায় বেশি মাইনের কাজ পেয়ে চলে গেছে।

আমি তেতে উঠলাম তক্ষুনি।—তোমাকে বলে গেছে?

—হ্যাঁ।

—একটা লোক না দিয়ে চলে গেল, আর তুমি তাকে ছেড়ে দিলে? আমাকে একবার বলারও দরকার মনে করলে না?

—তোমার দেখা আর কতক্ষণ পাওয়া যায়।...কারো ভালো হলে তাকে আটকাবই বা কেন?

আমার কেমন খটকা লাগল।...এই মানুষটাই ওকে তাড়ায়নি তো! জিগগেস করলাম, ভালো কাজটা সে কোথায় পেল?

—আমার ডাক্তার বন্ধুর নার্সিং হোমে, সেখানে অনেক বাচ্চা-কাচ্চা, একজন ট্রেনড্ গভর্নেস দরকার—

ডাক্তার বন্ধু রণেন দত্ত দু'তিন দিন বেড়াতে এসেছে। আলাপ আছে। সোজা বেরিয়ে এসে আমি টেলিফোন তুলে নিলাম। ডায়েল করছি, এরই মধ্যে খাওয়া ফেলে উঠে এলো।

—কোথায় টেলিফোন করছ?

—রণেন দত্তকে। সে কি-ভাবে আমার লোক ছাড়িয়ে নিয়ে যায় জিগগেস করব।

—টেলিফোন রেখে দাও, সে ছাড়িয়ে নেয়নি। তার দরকার শুনে আমিই ছেড়ে দিয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ধৈর্য গেল।—তুমি এত নীচ!

একেবারে গায়ের কাছে এগিয়ে এলো।

—কি বললে?

—কি বললাম বেশ ভালোই শুনেছ!

ঘোরালো চোখে চেয়ে রইল একটু।—হ্যাঁ আমি নীচ, চেষ্টা করলে তুমি আমাকে আরো অনেক নীচে নামাতে পারো বুঝলে?

খাওয়া ফেলেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। রাগে দুঃখে আমি স্তব্ধ।

বিকেলের দিকে গাড়ি আসতে রুমুকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম। তাকে বাপের বাড়িতে বউদির কাছে রেখে আমি রিহার্সালে চলে গেলাম। আসার সময় তাকে নিয়ে এলাম।

এই ভাবেই চলতে লাগল। যাবার সময় রুমুকে বাবার ওখানে দিয়ে যাই, আসার সময় নিয়ে আসি। দেখতে দেখতে বাড়ির বাতাস ঘোরালো হয়ে উঠল। বাক্যালাপও বন্ধ।

সেদিন স্টেজ রিহার্সাল। আর দিন দশেক বাদে নাটক মঞ্চস্থ হবে। মনতুদার ধরা-করায় মাঝে একদিন স্টেজ খালি পাওয়া গেল।

সেই দিনই দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর গম্ভীর মুখে সুনন্দ আমার সঙ্গে কথা বলল।—আজ বেরোবে না, সন্ধ্যার পর এক জায়গায় যেতে হবে।

আজকের দিনে এ-কথা শুনলে মাথা কার ঠিক থাকে? তবু ব্যাপার বোঝার জন্য সংযত মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়?

—রণেনের বিয়ে। বিশেষ করে যেতে বলেছে।

শোনামাত্র ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠলাম। আগে বললে মনতুদা হয়ত এই দিনে স্টেজ রিহার্সালই ফেলত না। আমি ধরে নিলাম আমাকে জব্দ করার জন্যেই বলেনি।

—বিয়েতে যাওয়া সম্ভব নয়, আমার আজ স্টেজ রিহার্সাল আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গভরা কুৎসিতই দেখালো মুখখানা।—তোমার স্টেজ রিহার্সাল কি-রকম, অভিনয়ও করছ নাকি?

আমিও জবাব দিলাম, করার জন্য ওরা সাধাসাধি করেছিল। অভিনয় করছি না, স্টেজ রিহার্সালে আমার থাকা দরকার।

কাছে এগিয়ে এসে বলল, কিন্তু আজ আমি তোমাকে নিষেধ করছি!

—আমার নিষেধ শোনার উপায় নেই, কি করব বলো।

গলার স্বর আরো কঠিন পর্দায় চড়ল।—কি করবে তাই তোমাকে বললাম। আজ তুমি কোথাও বেরুবে না, আমার সঙ্গে যাবে!

—আর সেকথা শোনা যদি আমার পক্ষে সম্ভব না হয়?

—হতে হবে! না হলে তার ফল আরো অনেক খারাপ হবে, বুঝলে?

আমি নির্বাক। রাগে অপমানে ঘণ্টা দুই পর্যন্ত কেঁপেছি থরথর করে। তারই মধ্যে টের পেয়েছি লোকটা আর কারখানায় গেল না। আমাকে পাহারা দেবার জন্যই যেন বসে রইল। মনতুদার গাড়ি আসতে বাড়িতে কাজ আছে বলে সেই গাড়ি ফিরিয়ে দিল। খানিক বাদে মনতুদা টেলিফোন করেছে টের পেলাম। জবাব সে-ই দিচ্ছে কানে এলো। বাড়িতে দরকার আছে, তাই যাওয়া সম্ভব হল না। মনতুদা হয়ত আসার জন্য অনুরোধ করেছিল। তার জবাবে এদিক থেকে সাফ জবাব গেল, বাড়ির দরকারটা শখের রিহার্সালের থেকেও বেশি।

অপমান হবার ভয়েই মনতুদা টেলিফোনে আর আমাকে ডাকেনি।

রাগে অপমানে আমি দিশাহারা, নিস্পন্দ।

বিকেলে রুমুকে নিয়ে বেরুতে দেখলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে বাপের বাড়িতে রেখে উপহারের প্যাকেট হাতে ফিরল।

সন্ধ্যার আগেই মুষলধারে বৃষ্টি।

সন্ধে গড়িয়ে গেল বৃষ্টি ছাড়ল না। হঠাৎ এক সময় উঠে এসে বলল রেডি হয়ে নাও।

রেডি হতে আমার দশ মিনিটও লাগল না। যে সাজে রেডি হলাম তার থেকে বেশি সাজ আমি রিহার্সালে যাবার সময়েও করে থাকি। ক্রূর গাম্ভীর্যে দেখলাম একটু, কিছু বলল না।

দুজনে পাশাপাশি বসে আছি। মাঝে দুস্তর ব্যবধান। একহাঁটু জল ভেঙে সে গাড়ি চালাচ্ছে। বিয়েবাড়ি কাছে নয়।

হঠাৎ এক জায়গায় বেশি জলে গাড়িটা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে আমার একটা উৎকট আনন্দ হল।

রাতের অন্ধকারে ঠায় দেড় ঘণ্টা আমরা সেই জলের মধ্যে বসে রইলাম। ইতিমধ্যে রাস্তায় লোক এগিয়ে এসেছে গাড়ি ঠেলার জন্য! গাড়ির মালিক বলেছে দরকার নেই।

আমি সেই থেকে নির্বাক। মানুষটা ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আবছা অন্ধকারে সেই মুখ আর চাউনি আরো কুৎসিত, আরো হিংস্র মনে হচ্ছে আমার।

হঠাৎ সবিস্ময়ে একসময় দেখি গাড়ি চলতে শুরু করল। দুপুরের পর এই প্রথম আমি কথা বললাম।—এতক্ষণ গাড়ির কল বিগড়েছিল না তোমার?

উগ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে জবাব দিল, আমরা কোনো শোকের বাড়িতে যাচ্ছি কিনা তাই ভাবছিলাম।

নির্বাক আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, দেড় ঘণ্টা ভাবার পর গাড়ি বাড়ির দিকে ফিরে চলেছে। আমার বাইরেটা যত স্থির, ভিতরটা তত কঠিন।

রাত্রি।

মেয়েকে আনা হয়নি। টেলিফোনে কি বলে দিয়েছে আমি জানি না।

তখনো যে চরম কিছুই বাকি, ভাবিনি।...মানুষটা ঘরে এসেছে। নীরব কিন্তু হিংস্র। নিঃশব্দে দখল নিতে এগিয়ে এলো। আমি বিস্ফারিত চোখে দেখছি তাকে। বিদ্বেষের ঝাপটায় ওই মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে চেয়েছি। কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়নি। উল্টে আমিই এক নির্মম নিষ্ঠুর গ্রাসের অতলে ডুবে গেছি।

একদিন নয়, পর পর সাতদিন মানুষটা বাড়ির বার হল না। কাজে গেল না। শুধু রাতের প্রতীক্ষা, গ্রাসের প্রতীক্ষা। সাতটা দিন আমি যেন একটা পশুকবলিত হয়ে ছিলাম।

ইতিমধ্যে মনতুদা ফোন করেছে, চিন্তিত হয়ে বাড়িতে আসতে চেয়েছে। আমি বাধা দিয়েছি। আসতে বারণ করেছি।

বিকৃতি কতদূর গড়াতে পারে আমারও দেখার সঙ্কল্প। আমার একটা স্নায়ুও তখন নিজের বশে নেই।

সাত দিন পরে মাথা থেকে ওই পশুটাকে বিদায় হতে দেখলাম। শান্ত, ঠাণ্ডা মাথায় আবার কাজ-কর্মে মন দিতে চেষ্টা করল।...চেষ্টাই শুধু।

কিন্তু আমি চেষ্টাই বা করব কেমন করে? কি করে ঠাণ্ডা হব, শান্ত হব?

সাত

পরের তিন বছর সাড়ে তিন বছরের মধ্যে যে বিপর্যয় একে একে ঘটে গেল তার জন্যে আমি নিজে কতটা দায়ী সে হিসেব করিনি। একেবারে শেষের প্রান্তে এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত আমার চেতনা ফেরেনি।

ওই সাত দিনের ঘটনার দেড় মাসের মধ্যে আমি টের পেয়েছি আবার সন্তান আসছে। আর আমার মাথায় তখন শুধু আত্মধ্বংসী আগুনই জ্বলছে। আমি যেন তখন সব-কিছুর একটা শেষ জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির মালিক শুধু যেন আমাকে জব্দ করার জন্যেই নীচের তলায় আমার বসার ঘরটা দুজন অজানা অচেনা বুড়ো-বুড়িকে ভাড়া দিয়ে বসল।

ভুবন দাস আর তাঁর স্ত্রী।

কোথা থেকে এসে বাড়ির দাওয়ায় ঘণ্টাখানেক বসে রইল। দোতলা থেকে লক্ষ্য করলাম থেকে থেকে দুজন বেশ হাসছে। বুড়ির কপালে আগের দিনের পয়সার মত মস্ত টকটকে সিঁদুরের টিপ। ওঁদের মুখের অত হাসিই বোধহয় আমার লক্ষ্য করার কারণ। আমি সেই দেড় মাস যাবৎ হাসতে ভুলেছি। আমার মেয়ে পর্যন্ত আমাকে দেখলে ভয়ে ভয়ে দূরে সরে থাকে।

খানিক বাদে নীচের সিঁড়ির আধা-আধি নেমে দেখি সেই বুড়ো-বুড়ি সুনন্দর সঙ্গে কথা কইছেন। তাঁদের দুজনারই মুখে হাসি যেন চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। অথচ আমাদের একটা ঘরে থাকার আবেদন জানাচ্ছেন তাঁরা। বুড়োটি বলছেন, যেখানে থাকেন তাঁরা সেখান থেকে হারামজাদারা একেবারে বিনা কারণে উচ্ছেদ করেছে তাঁদের—

বুড়ি ফোঁস করে উঠলেন, আ-হা, ভীমরতি ধরেছে তোমার? একপাল ছেলেপুলে, ঘরের দরকার ছিল না ওদের? বেঁচে থাক সব—

বুড়ো ওমনি চোখ পাকালেন, তা বলে ওরা মামলা করবে? সুনন্দর দিকে ফিরলেন, মুখে সেই চোয়ানো হাসি। বুঝলে বাবা, যেই শোনালে মামলা করবে, আমরা তক্ষুনি বোঁচকা আর প্যাঁটরা নিয়ে বুড়োবুড়িতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম, থাক বাবা, তোরা সুখে থাক—

পরের বক্তব্য, তিন দিন ধরে একটা অতি বাজে হোটেলে এক কাঁড়ি করে টাকা গুনে রাত কাটাচ্ছেন দুজনে, আর সমস্ত দিন ধরে ঘর খুঁজছেন। কিন্তু আগাম টাকা গুঁজে দিতে চাইলেও কেউ ঘর ছাড়ে না, আসলে কেউ বিশ্বাসই করে না যে সত্যি-সত্যি টাকা দিয়ে তাঁরা থাকতে পারেন।...এখানে বসে থাকতে থাকতে শুনেছেন, এতবড় বাড়িটাতে মাত্র আড়াইটি প্রাণী থাকা হয়, তাই আশা নিয়ে এসেছেন। তক্ষুনি ঝোলা থেকে এক বাণ্ডিল নোট বার করে বুড়োটি ওর হাতে গুঁজে দিতে চেষ্টা করলেন।—বিশ্বাস করো বাবা টাকা আমাদের আছে, এই হাজার টাকা তুমি যত মাসের খুশি আগাম ধরে নাও—একটা ঘরে আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই দাও। সময় তো হয়ে এলো, শেষে কি তোমাদের নামে নালিশ নিয়ে খেয়া পাড়ি দেব—নাকি বুড়োবুড়ি দুটোতে মিলে রাস্তায় পড়ে মরে থাকব!

আমি বোকাচোখে তাঁদের মুখের সেই অদ্ভুত হাসি দেখছি। হাসিটা নালিশের কল্পনায় কি রাস্তায় পড়ে মরে থাকার দৃশ্য মনে করে জানি না।

সুনন্দর কথা কানে এলো, এতক্ষণ সেও হাঁ করে দেখছিল তাঁদের। বলল, টাকা পরে দেবেন—সামনের এই ঘরটায় থাকার ব্যবস্থা করে নিন।

সেই মুহূর্তে মাথায় বুঝি দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল আমার। আগুন আগেই জ্বলছিল। ওপরে এসেই স্যুটকেস গুছিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। ও এসে দাঁড়াল। দেখল।

—কোথায় যাচ্ছ?

দু'চোখে ভস্মের আগুন নিয়ে জবাব দিলাম, যমের বাড়ি, তোমার সে খোঁজে দরকার কি?

—যেখানেই যাও, খোঁজ আমাকে নিতে হবে। যাচ্ছ কোথায়?

হঠাৎ খুব কঠিন আর সেই সঙ্গে খুব ঠাণ্ডাও হয়ে গেলাম আমি। —এখন বাবার ওখানে, পরে কি করা যায় ভেবে ঠিক করব।

—এর দরকার হল কেন? ওঁদের ঘর ছেড়ে দিলাম বলে?

জবাব দিলাম না। ও আবার বলল, কি করা যায় ঠিক করার মালিক তুমি?

ওই মুখ আর একপ্রস্থ ঝলসে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, না তো কি তুমি?

—তাই তো জানি।

এক সর্বনাশা আক্রোশেই বুঝি পেয়ে বসল আমাকে। বিকারগ্রস্তের মতই চিৎকার করে উঠলাম। অকথ্য গালাগাল করতে লাগলাম। ওই ভাষা আমার মুখ দিয়ে বেরুতে পারে নিজেও জানতাম না।

ছোটলোক বলেছি, কাপুরুষ বলেছি, চরিত্রহীন লম্পট বলেছি, আবার ছেলেপুলে এনে আমার জীবন বিষিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে এত বড় ঘৃণ্য হীন সে, তাও বলেছি।

আর এই শেষটুকু শুনেই বোধহয় এই গালাগালের পরেও সে নির্বাক। স্যুটকেস ফেলেই আমি বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ির মুখে ও বুড়োবুড়ি হাঁ করে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে চেয়ে আছেন। ওপরের চেঁচামেচি তাঁদের কানে না আসার কথা নয়। আমার চোখের ঝাপটায় সভয়ে দুজনেই সিঁড়ির মুখ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন।

আমি চলে গেলাম।

মনতুদাকে খোলাখুলিই বললাম, এভাবে আর চলছে না, মুক্তি চাই, যা হোক ব্যবস্থা করো।

মনতুদা বিমর্ষ, চিন্তিত। বলল, চলছে যে না, সে তো অনেকদিন ধরেই দেখছি।

অসহিষ্ণু মুখ করে ছোড়দি বলে উঠল, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে, বাবার এই অবস্থা, কিছু একটা করে বসে মেরে ফেলবি? ক'দিন আর, তাঁকে যেতে দে—

ছোড়দির ওপর আমার রাগ হল। আমার এ অবস্থার জন্য বাবাই দায়ী। তবু আমার ব্যাপারে আঘাত পেয়ে চোখ বুজুক এ আর কে চায়?

মনতুদা পরামর্শ দিল, চুপচাপ থাকো এখন কিছুদিন, ছাড়া-ছাড়ি হলেও সেটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার কিছু নয়। আকছারই হচ্ছে। কিন্তু এ-ভাবে ছেড়ে দেবে কেন, নিজের আর তোমার মেয়ের ব্যবস্থা বুঝে নিয়ে তারপর যা করার ভেবে-চিন্তে করতে হবে।

আমি রেগে গেলাম, কেন নিজের ব্যবস্থা আমি নিজে করতে পারব না?

মনতুদা হেসে বলল, তুমি না পারলে এ-দেশের কোনো মেয়ে পারবে না—সে কথা নয়, ভায়ারও একটু শিক্ষা হওয়া দরকার।

ঠিক বলেছে মনতুদা, শিক্ষা হওয়া দরকার। ওই লোককে কিছু একটা চরম শিক্ষা দেওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আর বোধহয় কিছুই আমি চাই না। তার শিক্ষার কথা ভেবেই বিকেলের দিকে বাড়ি চলে এলাম। শিক্ষা দিতে হলে আমারও চোখের ওপরেই থাকা দরকার।

মনের এই অবস্থায় অসহ্য লাগল ওই বুড়োবুড়িকে। যে হাসি দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম, সে হাসিই আমার চক্ষুঃশূল। তার ওপর ওই বুড়ি আদর করে গায়ে হাত পর্যন্ত বোলাতে আসে। আমি শুনি বা না শুনি, তাঁর নিজের গল্প বলা সারা। ভুবন দাস সুতোর ব্যবসা করতেন। বুড়ি একটাই হতভাগা ছেলে পেটে ধরেছিলেন। তার বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাকার একটা ডাইনি মেয়ে নিয়ে ছেলে কোথায় পালিয়ে গেল। শোকে বউটা আত্মহত্যা করল। না, আর তাঁরা ওই শত্তুরের মুখ দেখেননি—সেও আর মুখ দেখাতে আসেনি। বেঁচে আছে কিনা সে খবরও রাখেন না।

বুড়ি যেন আমার শাশুড়ি। তাঁকে দেখলেই আমার পিত্তি জ্বলে যায় এখন। মেয়েকে বকলে উপদেশ দিতে ছুটে আসেন, কপালে সিঁদুর না দেখে সেদিন তাঁর চোখ কপালে। বকাবকি করে সিঁদুরকৌটো হাতে ছুটে এলেন। আমি তাঁকে প্রায় অভদ্রভাবে বকে তাড়ালাম।

দিন দশেকের মধ্যে আমাদের ভিতরের অশান্তিটা তাঁরা ভালোই টের পেলেন। আর ধরে নিলেন তাঁদের ঘর দেওয়া হয়েছে বলেই এই অশান্তি। সেদিন বেলা এগারোটা নাগাদ বুড়োবুড়ি দুজনেই ওপরে এসে হাজির। সুনন্দ তখন কারখানায়।

দাসমশাই বললেন, আমরা চলেই যাচ্ছি গো মা। বুড়ি বলল, আমরা এসে মা লক্ষ্মীর মুখের হাসি কেড়ে নিলাম এ-কেমন কথা! আমাদের তো প্রায় চার কাল গেছে—তোমরা সুখে থাকো।

ওঁরা গেলেও ঘরের লোক একটু জব্দ হবে, তাই তেতে উঠে মুখের ওপর জবাব দিলাম, হ্যাঁ যান, আগাম যা দিয়েছেন তাও নিয়ে যান।

পাঁচদিন আগে দু'মাসের ভাড়া দেড়শ টাকা ওর পকেটে গুঁজে দিয়েছিলেন দাসমশাই, তাও জানি।

বুড়ো মাথা নেড়ে বললেন, চাঁদপানা মেয়ে তোমার আমাকে দাদু ডেকেছে, ও-টাকা দিয়ে তাকে কিছু কিনে দিও। চলো গো—

স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি দেখলাম, রাগ করা দূরে থাক, চার চোখে আমার ওপর যেন স্নেহ ঢেলে দিয়ে তাঁরা টুকটুক করে নীচে নেমে গেলেন।

একলা ঘরে আমার ভিতরটা কেমন করতে লাগল। কিন্তু চলেই যে যাবেন তাঁরা এ বিশ্বাসও করতে পারছি না।

খানিক বাদে নীচে নেমে এলাম। দেখি রান্না পর্যন্ত চড়েনি, তাঁরা বেরোবার জন্য প্রস্তুত। আমাকে দেখে দাসমশাই হেসে বললেন, চিঁড়ে গুড় বেঁধে আর ঝোলাঝুলি নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম গো মা—পরে কোনো আস্তানা জুটলে এই রাজশয্যা নিয়ে যাব—কটা দিন তোমাদের কষ্ট হবে।

কি রকম যেন হয়ে গেলাম আমি। বললাম, আপনাদের কোথাও যেতে হবে না।

বুড়োবুড়ি দুজনেই সবিস্ময়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। আনন্দে আত্মহারা ভুবন দাস প্রায় ধমকের সুরেই বুড়িকে বলে উঠলেন, দেখলি? শুনলি এখন? আমি তোকে বলিনি মায়ের আমার এমন লক্ষ্মী-শ্রী, তার ভেতরটা সব-সুন্দর না হয়ে যায় না! বলিনি তোকে? আর তারপরেও তুই কিনা আমার কান ভাঙানি দিলি! আমার দিকে ফিরলেন, এমন হাসি আর এমন চাউনি আর বুঝি দেখিনি। বললেন, বাঁচালে গো মা বাঁচালে, কটা দিন নিশ্চিন্তে কাটিয়ে আবার বড় কষ্টে পড়তাম।

আমার চোখের কোণ দুটো সিরসির করে উঠল কেমন। একরকম ছুটেই পালিয়ে এলাম ঘর থেকে।

এরপর আর রাগ দেখালেও হাসেন ওঁরা, বলেন, ভেতর দেখে নিয়েছি গো মা তোমার—আর রাগলেও যাচ্ছি না, তাড়ালেও যাচ্ছি না।

ওঁদের প্রতি আমার আচরণের ব্যতিক্রমটা সুনন্দ যাতে টের না পায় সে চেষ্টাও করি। বুড়োবুড়ি নিজেদের ঘরে বসে হি-হি করে হাসেন, কড়ি খেলেন, লুডো খেলেন। এই নিয়ে এক-একদিন ঝগড়াও বেধে যায় দুজনের—তখন পরস্পরকে গালি-গালাজ। তার আধ ঘণ্টা না যেতে আবার সেই হাসি।

এক-একদিন দেখি, নামা বা ওঠার সময় ওই সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কি রকম সতৃষ্ণ চোখে ওঁদের বন্ধ ঘরের দিকে চেয়ে আছে। তাই দেখেও কে জানে কেন আমার রাগ হত, জ্বালা ধরত।

মানসিক অশান্তির মধ্যে ন'মাসে ছোট মেয়ে ঝুমু এলো।

আর তার ঠিক এক বছর বাদে বাবা মারা গেলেন। আমার কষ্ট অন্য বোনদের থেকে বেশি ছাড়া কম হয়নি। কিন্তু সেই সঙ্গে বাবার প্রতি অভিমানও আমি ভুলতে পারিনি।

আরো পারিনি কারণ ঘরের অশান্তি বেড়েই চলেছে। বাবা চলে যাবার পর থেকেই আমার কেবলই মনে হয়েছে সামনে কি-এক অনাগত দুর্যোগ হাঁ করে আছে। আর তারই ফলে আমি দিনকে দিন বে-পরোয়া হয়ে উঠছি।

মানুষটা প্রায়ই কারখানা কামাই করে আজকাল। চুপ-চাপ ঘরে বসে থাকে। আর এক-একসময় ঘোরালো চোখে তাকায় আমার দিকে। কিন্তু আমি যে তাকে আর একটুও কেয়ার করি না, সেটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিই।...ব্যবসার রোজগার কমে আসছে তাও অনুমান করতে পারি। এও ইচ্ছাকৃত আমার মনে হয়। দিন-রাত ঘরে বসে মতলব ভাঁজলে ব্যবসার আয় কমবে না তো কি?

রেষারেষি করেই আমি বাইরের যোগ বাড়িয়ে তুলেছি। দু'মেয়ের জন্য একটা ছেড়ে দু'টো ভদ্র-ঘরের আয়া রেখেছি। সে-জন্যে কারো অনুমতি নিইনি। ছোট মেয়েটাকে আমি দু'চোক্ষে দেখতে পারি না বলেই ধারণা, তবু ওর অসুবিধে যাতে না হয় সেদিকে একটু বেশিই চোখ রেখেছি। তার ওপর দাস-গিন্নি তো সর্বক্ষণই ওকে নিয়ে থাকতে চান।

আমার জন্যে মেয়েদের অসুবিধে যেটুকু দেখা যায়, আমার ধারণা তার সবটুকুই সুনন্দর আবিষ্কার। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। বাক্যালাপ তো বলতে গেলে বন্ধই। যেটুকু বলার চোখ দিয়ে বলে।

কথা আমারও বিশেষ বলার দরকার হয় না। আমার নামের দুটো পাস বইয়ে সাতষট্টি হাজার টাকার মত আছে এখন দেখেছি। সে পাস বই আমার নিজের কাছেই থাকে। টাকার দরকার হলে চাইতে হয় না। সোজা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনি।

...রাতে অনেক সময় যখন ঘুম আসতে চায় না, তখনই শুধু অগোচরের ভয়ের অনুভূতি একটা। থেকে থেকে শুধু মনে হয় কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু দিনের আলোয় এই দুর্বলতার আমল দিই না, বরং দ্বিগুণ বেগে চলি।

সেদিন মনতুদা বলছিল, তোমাদের যদি মান-অভিমান মিটে থাকে ভালো কথা, কিন্তু তোমার মত মেয়ে এ-ভাবে বসে থাকবে কেন, উপার্জনে মন দাও। তখন দেখবে ঘরেও কদর বাড়ছে।

ঘরের কদর বাড়ানোর তাগিদে না হোক, কথাটা কিছুদিন ধরে চিন্তা করছি আমি।

সেদিন এক সাহিত্য চক্রের আলোচনা চক্র থেকে রাতে বাড়ি ফিরে দেখি, সুনন্দ বিছানায় শুয়ে আছে আর বউদি তার মাথা টিপে দিচ্ছে। বাবা মারা যাবার পর থেকে বউদি মাঝে মাঝে আসা শুরু করেছে। বউদির সঙ্গে তার বরাবরই খাতির, আমার আড়ালে তাকে কিছু বলে বোধহয়। কারণ বউদি ভয়ে ভয়ে আমাকে দুই একটা উপদেশ দিতে আসে। এই দিন বকুনির সুরেই বলে উঠল, তোমার কি আক্কেল ভাই, ভদ্রলোক সেই থেকে মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছে, গায়ে তাপও একটু উঠেছে মনে হয়, ওদিকে তোমার শুনলাম বিকেল থেকে দেখা নেই।

আমার স্নায়ু আজকাল এটুকুতেই তেতে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। তবু ঠাণ্ডা মুখেই টিপ্পনী কাটলাম, তাতে কি, সেবা-যত্ন তো আটকায়নি দেখছি।

লোকটা ও-পাশ ফিরে ছিল, ছিটকে এদিক ফিরে চিৎকার করে উঠল, ও-সব গাড়োয়ানি ইয়ারকি এ-ঘরে করবে না!

বউদি অপ্রস্তুত। চোখে চোখ রেখে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম একটু। তারপর বউদির দিকে ফিরে বললাম, জ্বর তো বেশিই মনে হচ্ছে।

ঘর ছেড়ে চলে এলাম। একটু বাদে বউদি কি বলতে আসতে কঠিন মুখেই তাকে বিরত করলাম।—রাত হয়েছে বউদি, এখন বাড়ি যাও।

আধ-ঘণ্টা বাদে আবার ওর ঘরে এলাম। ঝুমু হবার পর থেকেই আলাদা ঘরে শোয়া আমাদের। এ ব্যাপারেও আমি কোনো আপস করিনি।

ও-পাশ ফিরেই শুয়ে আছে। বললাম, জ্বর বেশি কিনা বা ডাক্তার ডাকতে হবে কিনা জিগগেস করলেও গাড়োয়ানি ইয়ারকি হবে বোধ হয়?

জবাব দিল না বা এদিকে ফিরল না।

আরো মাস ছয়েক গেছে। ব্যবসার অবস্থা মনে হয় আরো খারাপ। আমার বদ্ধ ধারণা আমাকে জব্দ করার জন্যেই কারবারে মন নেই। আয় কমিয়ে আমাকে শিক্ষা দেবে।

কিন্তু শিক্ষা যে আর আমাকে দেওয়া যাবে না সেটা জানে না।

এই সময়ে আমি ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে বসলাম। এর সঙ্গে মনতুদা যুক্ত বলেই দ্বিধা করিনি। মনতুদা ছোড়দির সামনেই হঠাৎ আমাকে বলে বসল, তোমার কাছে তো টাকা আছে, হাজার ষাটেক টাকা আমাকে দাও তো।

আমি অবাক। দেখি ছোড়দি মুখ টিপে হাসছে। বললাম, একেবারে রাজভিখারি ভিখারিনীর কাছে কি ব্যাপার?

মনতুদা যা বলল তার সারমর্ম, টাকা আমারই জন্য চাইছে। খুব দাঁওয়ের ওপর বড় একটা জমি কেনা হবে বড়জোর পাঁচ ছ' মাসের জন্য—মনতুদা পাকা খবর জানে, তার দ্বিগুণ দামে সে-জমির জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে দেখতে দেখতে, কারণ বিরাট সরকারী প্ল্যান্ট বসছে তার গায়েই। আমার কিছু টাকার যোগাড় থাকা দরকার বলেই মনতুদার এই ব্যবস্থা। পাঁচ ছ'মাসে ষাট হাজার টাকায় কম করে আরো ষাট হাজার ঘরে আসবে—এর কোনো মার নেই।

আসবে জানা কথাই। এই করে মনতুদাকে কত টাকা ঘরে আনতে দেখেছি ঠিক নেই। ছোড়দির উৎসাহ পেয়ে আমারও কেমন ঝোঁক চেপে বসল। মনতুদাকে সুনন্দ হিংসেই করে জানি, কিন্তু মানুষটা কোন্ দরের একবার বুঝুক।

মানসিক উত্তেজনার মধ্যে সাত দিনের নোটিসে ব্যাঙ্ক থেকে ষাট হাজার টাকা তুলে মনতুদার হাতে দিলাম।

মনতুদা হেসে বলল, ব্যাঙের আধুলি হাত-ছাড়া করেছ শুনলে ওদিকে আবার হার্টফেল করবে না তো?

আমি ঝাঁজ দেখিয়ে জবাব দিলাম, শুনে কাজ নেই—একবারে ডবল টাকার পাস বই সামনে ফেলে দেব।

ছ'মাস না যেতে একের পর এক বিপর্যয়। মা গো! এতও পর পর কোনো জীবনে ঘটে!

প্রথম সূত্রপাত আমার দ্বিতীয় কবিতার বইটা কেন্দ্র করে। এবারে ঘরের টাকা খরচ করেই এটা ছেপেছি। টাকা তো তখনো আমার কাছে পাঁচ ছ'হাজার ছিল।

এই বইটারও সুখ্যাতি হয়েছিল।

সেদিন ছোট মেয়ে ঝুমুর আয়া আসেনি। আমিই ওকে খাওয়াব। এর মধ্যে নতুন একটা সাহিত্যপত্রের তরুণ সম্পাদক দেখা করতে এলো। তারপর আমার কবিতা আর গল্পের শতমুখে প্রশংসা। সেই প্রশংসার উচ্ছ্বাসে আমি ভাসতে লাগলাম। মেয়েকে সময়ে খাওয়াবার কথা ভুলে গেলাম। ওদিকে পাশের ঘরে দাস-গিন্নিও অসুস্থ, নইলে তাঁর অন্তত মনে থাকত।

ঘণ্টাখানেক বাদে সম্পাদক উঠে যেতে সিঁড়ির কাছে এসে ঝুমুর কান্নার আওয়াজ পেয়ে লজ্জিত হয়েই তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলাম। তারপরই দু'চোখ বিস্ফারিত আমার।

আমার দুটো নতুন কবিতার বই ছিঁড়ে নিয়ে থমথমে মুখে সুনন্দ তাই জ্বালিয়ে দুধ গরম করছে। আর ঝুমু অদূরে বসে কাঁদছে।

দৃশ্যটা দেখামাত্র ওই আগুন আমার মাথায় জ্বলে উঠল। আমি পাগলের মত চিৎকার করে সেই ছেঁড়া আধপোড়া বই ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে বললাম, এ কি করছ?

সজোরে ঠেলে সরিয়ে দিল আমাকে। কঠিনমুখে বলল, কাছে এসো না, যা করা উচিত তাই করছি।

নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে আমি বই জ্বালিয়ে দুধ গরম হতে দেখলাম। সেই দুধ মেয়েকে খাওয়াতে চেষ্টা করে পারল না। ক্ষিপ্ত রোষে দুধের বোতল মাটিতে আছড়ে ভাঙল। ঘরের মেঝে ভাঙা কাচে ছত্রখান। মেয়ে দ্বিগুণ জোরে কেঁদে উঠল। তাকে বিছানায় ফেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমার মাথায় আবার দাবানল জ্বলতে লাগল। ঝুমুকে তুলে নিয়ে আমি কোণের ঘরে রুমুর আয়ার কাছে দিলাম। বললাম, দুধ গরম করে খাইয়ে দাও।

সেই বেশেই বাড়ি থেকে বেরুলাম আমি। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা মনতুদার বাড়ি। ছোড়দি আর মনতুদাকে সব জানিয়ে বললাম, এবারে সময় হয়েছে, ব্যবস্থা করো।

ছোড়দি নির্বাক। মনতুদাও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার মত মেয়ে বলেই এতদিন সহ্য করেছে, কিন্তু এরপর আর সহ্যই বা করবে কি করে।

—সহ্য করার আর দরকার নেই। আর এক কথা, ওই টাকাটা এবারে পাবার ব্যবস্থা করে দাও, আর বেশি লাভের দরকার নেই, যা পাবে তাই দাও, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

মনতুদা বলল, ক্ষেপেছ! এর পর ওর হাতে টাকা দেবে, আগে একটু নাকের জলে চোখের জলে হোক, তারপর ভাবা যাবে।

এই প্রথম বোধহয় মনতুদার কথা আমার ভালো লাগল না। বললাম, তার আর দরকার নেই, তুমি এখনই জমি ছেড়ে দিয়ে যা পাও রেডি রেখো।

বাড়ি ফিরেই দেখি ডাক্তার এসেছে। দাস-গিন্নি বেশিরকম অসুস্থ। তিন চার দিনের জন্য আর বিশেষ কিছু ভাবার সময় পেলাম না। দাস-গিন্নি একটু ভালো হলেই আপাতত বাপের বাড়ি চলে যাব ঠিক করেছি। তারপর পরের ব্যবস্থা।

সন্ধ্যার পর সুনন্দ আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ক্রূর দৃষ্টি।—তোমার এখন ডাইভোর্সই দরকার তাহলে, সে চেষ্টায় এগোচ্ছ?

আমি নিরুত্তর। তক্ষুনি মনে হল, ছোড়দি বউদিকে বলেছে আর বৌদি শোনামাত্র এই কানে

দিয়েছে। এ সে ছাড়া আর কারো কাজ নয়। দাস-গিন্নির অসুখের মধ্যেই দাদা আর বউদিকে শুকনো মুখে আসতে দেখছি এর কাছে।

জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তার আগে অনেক কিছু দেখবে তুমি, অনেক কিছু দেখতে বাকি। ছাড়া-ছাড়ি হবার আগে দুজনের একজন শেষও হয়ে যেতে পারি—বুঝলে?

আমি এবারও নির্বাক, কঠিন।

ও চলে গেল। ভেবেছিলাম চূড়ান্ত কিছু নিষ্পত্তির আগে বাপের বাড়ি যাব।....না, সেখানে যাব না। তাহলে কোথায় যেতে পারি, ছোড়দির ওখানে? কেন জানি না, ভিতর থেকে সায় মিলছে না।

পরদিন সকালেই বউদি এসে হাজির। তার এই মূর্তি দেখে আমি অবাক, কথা শুনে আরো বিভ্রান্ত। কথা সুনন্দর সঙ্গেই কইছিল, আমি তখন ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

বউদির এমন উত্তেজিত কণ্ঠস্বরও আর বোধহয় শুনিনি। এসেই সোজা ওর ঘরে ঢুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি ওকে টাকা দেবেন আশা দিয়েছেন?

প্রশ্নটা শুনেই অবাক হয়ে আমি ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ালাম। সুনন্দ গম্ভীর মুখে খবরের কাগজ পড়ছিল। জবাব না দিয়ে বলল, বসুন।

আরো চাপা অসিহষ্ণু গলায় বউদি আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনি ওকে টাকা দেবেন বলেছেন কিনা?

—ঠিক দেব বলিনি, বলেছি কি করা যায় দেখি।

—কি করে দেখবেন আমি জানি কিন্তু কেন? কেন আপনি টাকা দেবেন? কেন এভাবে দয়া করবেন? কেন আপনি অন্য দু'বোনের মত বাড়ির দাবি জানিয়ে অ্যাটর্নির চিঠি দিচ্ছেন না? আমি জানি শ্বশুরমশায়ের একমাত্র অরুকেই বাড়ির অংশ দেবার ইচ্ছে ছিল—কোর্টে আমি বলব সে-কথা!

আমি হতভম্ভ। সবই দুর্বোধ্য লাগছে।

সুনন্দ ঠাণ্ডা মুখে জবাব দিল, আপনার নির্বুদ্ধিতার জন্যেই এরকম হয়েছে, শ্বশুরমশাইকে উইল করতে দিলে এতটা হত না। কিন্তু ভাগাভাগির ব্যাপার তো পরের কথা, তার আগেই তো বাড়ি নিলামে যাবে। ছেলেপুলে নিয়ে তখন দাঁড়াবেন কোথায়?

বউদির দিকে চেয়ে যাতনা-ক্লিষ্ট ধৈর্যের অবসান দেখছি। বলে উঠল, আমি কোথায় দাঁড়াব সে দেখার দায়িত্ব আপনার নয়, রাস্তায় দাঁড়াব, চোখের সামনে ছেলেপুলে মরতে দেখব—তাতে আপনার কি?

আরো ঠাণ্ডামুখে সুনন্দ জবাব দিল, আমার কর্তব্য। চোখ বোজার আগে শ্বশুরমশাই একমাত্র আমাকেই বলে গেছেন, ওদের দিকে চোখ রেখো।

বউদি বলে উঠল, বেশ দয়া যদি করতে চান, দুদিন ধরে আমি যা বলছি তাই করুন। বাড়ি বিক্রি করে দিন, মর্টগেজের টাকা মিটিয়ে দিয়ে যা থাকে আপনারা তিনজন ভাগ করে নিন।

খবরের কাগজ ফেলে সুনন্দ উঠে দাঁড়াল। তেমনি ঠাণ্ডা গলায় স্পষ্ট করে বলল, আমার কর্তব্য কি আমি জানি বউদি, মর্টগেজ থেকে বাড়ি খালাস করে দেব—তারপর অন্য দুজনের কর্তব্য কি তাঁরা বুঝবেন।

আমার পাশ কাটিয়ে ঘরে থেকে বেরিয়ে গেল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমি বিমূঢ়। পায়ে পায়ে বউদির কাছে এলাম—কি হয়েছে?

—তুমি কিছু জানো না?

আমি মাথা নাড়লাম, জানি না।

রাগত স্বরে বউদি বলে উঠল, এমন মহাদেবের মত স্বামী তোমার, আমাদের জন্য এত বড় ঘা খেতে চলেছে, আর তুমি তার খবর রাখারও দরকার মনে করো না?

—বাজে বোকো না! কি হয়েছে?

শুনলাম কি হয়েছে। বাবা চোখ বোজার পর থেকে বড়লোক হবার নেশায় দাদা বেশ ভালো মত রেস খেলা ধরেছিল। সেই সঙ্গে স্পেকুলেশনও বাদ যেত না। বাবা অনেকবার বাড়ি উইল করে যেতে

চেয়েছিলেন, আমাদের চারজনেরই প্রাপ্য বলে বউদি তা করতে দেয়নি, বিশেষ করে আমার কথা ভেবেই দেয়নি। নানা অছিলায় বাবাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। উইল না করেই বাবা চলে গেছেন। এদিকে দাদা সেই বাড়ি বন্ধক রেখে এই দু'বছরের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা উড়িয়েছে। বন্ধকের দায়ে বাড়ি এখন নিলামে যেতে বসেছে। আর ওদিকে ঠিক এই সময়েই আমার দুই দিদি বাড়ির অংশ দাবি করে অ্যাটর্নির চিঠি দিয়েছে।

এও বিশ্বাস করব? বউদি চলে যাবার পরেও একলা ঘরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছটফট করে শেষে টেলিফোন তুলে নিলাম। ওধারে মনতুদার গলা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা নাকি বাবার বাড়ির অংশ চেয়ে অ্যাটর্নির চিঠি দিয়েছ?

ওধারে মনতুদার হাসি।—দিয়েছি তো, তুমি ঘাবড়ে গেছ?

—তা একটু গেছি তো। কি ব্যাপার?

মনতুদা জানালো, ওই রাজপ্রাসাদের প্রতি তার অন্তত একটুও লোভ নেই। দাদার হাতে থাকলে ওটা একেবারে যাবে. তাই বাড়িটা রক্ষা করার জন্যেই তারা এই ব্যবস্থা করেছে। কোনো ভাবনা নেই।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা করলাম। যা বলেছে ঠিক কথাই। কিন্তু তবু এতটুকু স্বস্তি পাচ্ছি না কেন মনে? আমার বাপের বাড়ি বিকিয়ে যাক এটুকুও চাই না। কিন্তু সেই জন্য এখান থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার উদারতাও বিঁধছে। আমিই যেন এক অবাঞ্ছিত ঋণজালে আটকে পড়লাম মনে হচ্ছে। বউদিকে আজও প্রীতির চোখে দেখি না আমি, আর এখন পর্যন্ত ঘরের লোকের অনুকূলেও কিছু ভাবার মন নয়। তাই উল্টো চিন্তাই মাথায় আনতে চেষ্টা করছি।...বউদিকে ওই একজনের বরাবরই পছন্দ, আমাকে এ-পরিবারে টেনে আনায় একমাত্র সে-ই সহায় হয়েছিল। উদারতা সেই কৃতজ্ঞতার বিনিময়েও হতে পারে। কিন্তু চিন্তা যে-ভাবেই করি ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বাড়ছেই।

দুটো দিন একভাবেই কাটল। নিঃসীম নীরবতা।

তৃতীয় দিন সকালের দিকে সুনন্দ এসে বলল, তোমার পাস বই দুটো বার করো তো—

আমি কি হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম? একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকে ও আবার বলল, পাস বই দুটো চাইছি।

—কেন?

বিরক্ত মুখেই জবাব দিল, দরকার আছে।

কি দরকার আমি জানি। কিন্তু রাজ্যের অস্বস্তি। বললাম, পাস বইয়ে টাকা বিশেষ নেই।

ও বিমূঢ় মুখে চেয়ে রইল খানিক। কি বলছি তাই যেন বুঝতে পারছে না। দৃষ্টিটা ঘোরালো হল তারপর। টাকা আমি দিতে চাই না তাই ভাবছে বোধহয়। জিজ্ঞেস করল, টাকা নেই মানে?

বললাম, ষাট হাজার টাকা একটা জমির জন্য দেওয়া হয়েছে, পাঁচ ছ'মাসের মধ্যে এক লাখ টাকার ওপর পাওয়ার কথা—সে-সময় হয়ে গেছে। ষাট হাজার টাকার ওপর এখন কত পাওয়া যাবে জানি না, যাই পাওয়া যাক, আমি দুই একদিনের মধ্যে এনে দিচ্ছি।

এমন চোখে চেয়ে রইল যে আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম একটু। ও বলে উঠল লাখ টাকার ওপর পাবে বলে ষাট হাজার টাকার জমি নিয়েছ! আমাকে কিছু না বলে! কোথায় জমি! কার জমি?...দেখি, জমির দলিল দেখি।

—সে-সব আমি কিছু জানি না, ছোড়দির কাছে থাকতে পারে। টাকা কবে চাই?

—কবে চাই? জমি না দেখে দলিল না রেখে তুমি ষাট হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছ? কাকে দিয়েছ? তোমার মনতুদাকে বোধহয়? তার দু'চোখে ব্যঙ্গ যেন উপচে উঠে আমার মুখের ওপর ঝাপটা মারতে লাগল। আরো জোরে চিৎকার করে উঠল, দিয়েছ কাকে—তোমার মনতুদাকে তো? এখন চাইলেই সে-টাকা তুমি আমাকে এনে দেবে, কেমন?

এবার আমার সহিষ্ণুতায় ভাঙন ধরছে। সে যা ভাবছে আমার সে-রকম ভাবার কোনো কারণ নেই। ষাট হাজার টাকা মনতুদা এক ঘণ্টার মধ্যেই দিয়ে দিতে পারে সে আমি জানি। বললাম, চেঁচিও না, টাকা আজই চাই তোমার?

—আজই এনে দেবে? তোমার মনতুদার কাছ থেকে? ব্যঙ্গচ্ছটায় ওই মুখ বীভৎস দেখছি আমি। বলে উঠল, যাও নিয়ে এসো। লোক চিনতে যদি আমার এত ভুল হয় তাহলে তোমার সামনেই হাতের কব্জি দুটো কেটে ফেলব আমি। পরক্ষণে হা-হা শব্দে বেদম হেসে উঠল।—লাখ টাকা পাবার লোভে আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ষাট হাজার টাকা দিয়েছ তুমি! আবার সেই বিশ্রী হাসি।—যাও নিয়ে এসো, লাখ টাকার দরকার নেই, ষাট হাজারই নিয়ে এসো!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে গেলাম। মুখের উপর ওই টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিতে না পারা পর্যন্ত জ্বালা কমবে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, মনতুদার বাড়ির যত কাছে আসছি তত যেন কি এক অস্বস্তি আমাকে ছেঁকে ধরছে।

গিয়ে দেখি মনতুদা বাড়ি নেই। বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছে ছোড়দি। সামনে চায়ের পেয়ালা। চোখে-মুখে ঝিমুনি ভাব, রাতে ঘুম হয় না বলে প্রায়ই রাতে আজকাল ঘুমের ওষুধ খায় শুনি।

বললাম, মনতুদা কোথায় গেছে? তাকে খুব দরকার আমার। কখন ফিরবে বলেছে?

নির্লিপ্ত মুখে ছোড়দি ঠোঁট উল্টে দিল। অর্থাৎ কিছু জানে না। তারপরেই দু'চোখ কেমন খরখরে দেখলাম ছোড়দির, অস্বাভাবিক টান-ধরা মুখ।—কেন, কি দরকার তাকে?

বললাম কি দরকার। বললাম, ষাট হাজার টাকা এক্ষুনি না পেলে আমার মান-সম্ভ্রম সব যেতে বসেছে ছোড়দি!

ছোড়দি সোজা হয়ে বসল। আমাকে একেবারে তাজ্জব করে দিয়ে কি রকম যেন হেসে উঠল।—মান-সম্ভ্রম! তোর? এত দিনে তোর টনক নড়েছে তাহলে? হাসছে।—ষাট হাজার টাকা চাই? হাসছে। —দেবার সময় মনে ছিল না? হাসছে।—ষাট হাজার ছেড়ে ষাট টাকাও তুই কোনোদিন ফিরে পাবি না—বুঝলি?

আমি কি দুঃস্বপ্নের ঘোরে কিছু দেখছি, কিছু শুনছি? শরীর কাঁপছে, পায়ের নীচের মাটি সজোরে দুলে উঠছে। তবু অস্ফুটস্বরে বললাম কেন, জমি...

—জমি! আবার সেই বিচ্ছিরি হাসি।—ওরকম অনেক জমি, অনেক কিছু আজ পর্যন্ত ও হজম করেছে—বুঝলি? ওর হজম-শক্তির তুলনা নেই!

আমি কাঠ একেবারে। এ-কি ছোড়দিকে দেখছি না তার প্রেত দেখছি! বললাম, সব জেনে শুনে তুই আমাকে টাকা দিতে বলেছিলি!

রাগে ছোড়দির ঘোলাটে চোখ দুটো থমকালো, তারপরেই বিকারগ্রস্তের মত চেঁচিয়ে উঠল, কেন বলব না? তোর থেকে বড় শত্রু আমার আর কে আছে? তোর মনতুদার ঘরে একটা বউ দরকার ছিল, এমন বউ যে বাইরে তার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারবে—টোপ ফেলতে পারবে। সেদিক থেকে তোর মত মেয়ের তুলনা হয় না—বিয়ের পর থেকেই এ-কথা শুনে আসছি। কেন করব না তোর সর্বনাশ? একদিন তুই ওকে চিনতে পারবি এই আশাতেই তো করেছি—আর ওই সুনন্দকে আক্কেল দেবার জন্যে—কতবার তাকে টেলিফোনে সাবধান করেছি ঠিক নেই—এত তেজ দেখায়, কিন্তু বিয়ে করেও তোর মত একটা মেয়েকে আটকে রাখতে পারল না কেন?

আমি স্তব্ধ, পাথর একেবারে।

ছোড়দির দু'চোখ ধক-ধক করে জ্বলছে। আবার বলে উঠল, তুই চাইলে টাকা তোকে দিতেও পারে—বড় আনন্দে আছে, তোদের ছাড়াছাড়ি হবে—তখন আর তাকে পায় কে, তার হাতের মুঠো থেকে আর তোকে রক্ষাই বা করে কে? তার জালে পড়লে আর বেরুতেও ইচ্ছে করবে না তোর—খুব সুখে থাকবি! যা—দূর হ তুই আমার চোখের সমুখ থেকে—তোকে এই সব বলেছি শুনলে আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে! ওকে আমি ভয় করি, এত ভয় পৃথিবীতে আর কাউকে করি না—যা যা, চলে যা এক্ষুনি এখান থেকে!

বাড়ি।

স্তব্ধ হতচেতনার মত বসে আছি। সুনন্দ কাছে এসেছে, তীক্ষ্ণ চোখে দেখেছে আমাকে। জিজ্ঞেস করেছে, টাকা পেয়েছ? পাওনি? পাবে না আমি জানি—আমি জানি—আমি জানি।

আমি নির্বাক, নিস্পন্দ। এই মুহূর্তে নিজের মৃত্যুমুখ দেখানো ছাড়া আর আমার কিছু কাম্য নয়।...থেকে থেকে কোনো একদিনের এক ছোকরার কথা মনে পড়ছে—রমেশ ভার্গব। তখনো ছোড়দির হিংসে দেখেছিলাম, রাগ দেখেছিলাম আমার ওপর! এও কি সেই বিকৃতি?

...কিন্তু মন থেকে জানি তা নয়। আজ এই জানার অনুভূতিটা কোথা থেকে এলো জানি না।

একে একে চার পাঁচ দিন কেটে গেল।...পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বাবার বাড়ি নিষ্কণ্টক করা হল টের পেলাম। কোথা থেকে টাকা দিল জানি না। দাদা-বউদি দুজনেই এসেছিল। সুনন্দকে বলতে শুনেছি, দাদাকে বলছে, আপনার মেজ বোন লোক ভালো, তার সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে, আমি আশা করছি সে সত্যই কিছু দাবি করবে না—আর ইচ্ছে থাক আর না থাক অমরদা দাবি ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে, এখন দেখুন—

আমি নির্বাক শ্রোতা, নির্বাক দ্রষ্টা। ভগবান আমাকে অন্ধ করো না কেন, বধির করো না কেন? ক্ষণে ক্ষণে মাথা ঘুরে চোখে যে অন্ধকার দেখছি—তাতেই মুখ থুবড়ে পড়ে একেবারে শেষ অন্ধকারে ডুবে যাই না কেন?

টেলিফোন বেজে উঠল। সুনন্দ নীচে দাসমশায়ের ঘরে হয়ত, একটু আগে নীচে থেকে তার ডাকাডাকি কানে এসেছিল।

উঠে টেলিফোন ধরলাম।

পর-মুহূর্তে সভয়ে আঁতকে উঠলাম। আর্তনাদও করে উঠলাম বোধহয়। বউদি ফোনে জানাচ্ছে, গতকাল ছোড়দি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। তখুনি ধরা পড়তে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ফাঁড়া কেটেছে। পুলিশের কাছে ছোড়দি বলেছে, রাতের পর রাত ঘুম না হওয়ার যন্ত্রণায় এই চেষ্টা করেছে। সেই টানা-হেঁচড়া এখনো বাকি। হাসপাতাল থেকে ছোড়দি নিজের বাড়ি না গিয়ে এক-রকম জোর করেই দাদা-বউদির সঙ্গে ওদের ওখানে চলে এসেছে। এসেই বার বার আমাকে দেখতে চাইছে। এখনো দুর্বল খুব—

ফোন ফেলে ঝড়ের বেগেই আমি ছুটে গেছি।

ছোড়দি শুয়ে আছে। কাঁদছে। তাকে ঘিরে বসে আছে দাদা বউদি দিদি অমরদা। আমাকে দেখেই ছোড়দি অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

আমি বলে উঠলাম, ছোড়দি এ তুই কি করেছিলি?

ওদিক ফিরে ছোড়দি আরো বেশি কাঁদতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক ছিলাম। ছোড়দি পরে কথা বলেছে। তার থেকেও কেঁদেছে বেশি। কেবল বলেছে, আমি পাগল হয়ে গেছলাম, নইলে তোর সঙ্গে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করলাম কি করে!

কথায় কথায় দাদার মুখে শুনলাম ছোড়দির বর মনোতোষ চৌধুরীও হাসপাতালে গেছল। ছোড়দি জোর করে এখানে এলো বলে সে রাগ করে বাড়ি চলে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাথায় বুঝি খুন চাপল আমার। আমি যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম। অসহ্য আক্রোশ, আর মাথার মধ্যে অসহ্য দাপাদাপি।...আমাকে একবার ওই লোকটাকে দেখতে হবে, ওই লোকের মুখোমুখি একবার অন্তত গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম। দাদা জিজ্ঞাসা করল, কোথায় চললি?

সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললাম, ছোড়দির বাড়ি।

ছোড়দি চিৎকার করে নিষেধ করে উঠল, দাদা বাধা দেবার জন্য এগিয়ে এলো। কারো কথায় কান না দিয়ে এক দুর্জয় আক্রোশে আমি সোজা রাস্তায় নেমে একটা চলতি ট্যাক্সি থামালাম।

ওই বাড়িতে ঢোকার মুখে কি আমার বুক কেঁপে উঠেছিল? জানি না। শুধু জানি এক অব্যক্ত যাতনা আর অবক্ত তাড়না যেন আমাকে দোতলায় ঠেলে তুলেছিল।

মনতুদা আয়েস করে চা খাচ্ছে আর পায়ের ওপর পা তুলে খবরের কাগজ পড়ছে। আমাকে দেখা-মাত্র সেই চিরাচরিত খুশির অভ্যর্থনা। —এসো প্রিয়সখী এসো, সকাল বেলায়ই এত ভাগ্য আমার!

স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে বললাম, দুর্ভাগ্যও হতে পারে। আমি ছোড়দি নই সেটা তোমার জানতে এখনো বাকি আছে।

—এ আবার কি কথা! হেসে উঠল, ছোড়দি নও বলেই তো তুমি প্রিয়সখী!

এই ডাক শুনে আজ গা ঘিনঘিন করে উঠছে। তবু খুব শান্ত কঠিন সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, টাকাটা ফেরত দিচ্ছ না কেন?

কিসের টাকা!...ও সেই টাকা। হাসছে।—সুনন্দকে দেবে?

আমি চেয়ে আছি। দেখছি। দেখতেই এসেছি।

হাসি কমে এলো। বলল, বেশ দেব—এক শর্তে। তোমাদের ছাড়াছাড়ি হবার কথা ছিল—তোমার যদি এখনো সেই মতলব থাকে তো দেব।

শরীরের সমস্ত রক্ত খুব ধীরে ধীরে মাথার দিকে চলেছে আমার। তবু প্রাণপণে সংযত রাখছি নিজেকে। জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

ছুরির ফলার মত দুটো চকচকে চোখ আমার মুখের উপর বিঁধিয়ে রেখে জবাব দিল, তার পর আশা করব তুমি খুব নির্বোধ মেয়ে নও। সুনন্দর সঙ্গে তোমার এ জীবনে বনবে না সেটা যদি বুঝে থাকো যা বলছি তাই করো।

দ্রুত, খুব দ্রুত চিন্তা করে নিলাম।—তাই করলে তুমি এক্ষুনি ওই ষাট হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করবে?

ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তির্যক চোখে তাকালো।—যদি বলি হ্যাঁ?

বেশ, টাকা দাও।

হঠাৎ সজোরে হেসে উঠল। কৌতুক যেন আর ধরে না। বলল, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি এ-বাড়ির সিঁড়ি টপকে দোতলায় উঠেছ প্রিয়সখী! আজ নয় কোর্ট থেকে যেদিন তোমাদের ছাড়াছাড়ির রায় বেরুবে সেদিন দেব।

এরপর আর কি কথা হত বা কি করতাম আমি জানি না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ফিরে দেখি সুনন্দ। পরে শুনেছি, আমি বেরিয়ে আসার পরেই ছোড়দির তাগিদে ব্যস্ত হয়ে বউদি তাকে টেলিফোনে জানিয়েছে আমি এখানে এসেছি। এই মানুষকে দেখে জীবনে বোধহয় এমন নিশ্চিন্ত আর কখনো বোধ করিনি। সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করেছি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি কোন্ নরকে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

বিরসমুখে হাসি টানতে চেষ্টা করে মনতুদা বলল, ভায়া যে, কি খবর...।

জবাব না দিয়ে সুনন্দ আমাদের দুজনকেই নিঃশব্দে দেখল খানিক। ওদিকে নতুন মানুষের গন্ধ পেয়েই যেন টাইগার—বাড়ির বড় অ্যালসেশিয়ানটা ফোঁস-ফোঁস করতে করতে ঘরে ঢুকল। আজ ওটাকে দেখা মাত্র অজানা আতঙ্কে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। হাত বাড়িয়ে মনতুদা গলার বেল্ট ধরে ওটাকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিল।

সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নির্মম অনুচ্চ-কঠিন গলায় সুনন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে কেন এসেছ...টাকার আশায়?

আমি জবাব দিতে পারলাম না। জবাব মনতুদা দিল। ঠোঁটের ডগায় হাসি।

—ওর আসাটা নতুন কিছু নয়, তুমি হঠাৎ এখানে কোন্ আশায় হাজির তাই বলো দেখি ভায়া শুনি—।

সুনন্দর নির্মম চাউনিটা আমার দিক থেকে এবারে তার দিকে ঘুরল। মনতুদা কুকুরের মাথায় হাত বোলাচ্ছে, ব্যঙ্গ-ভরা হাসি-হাসি মুখ। তার চোখে চোখ রেখে আবার বলল, হ্যাঁ, তোমার ওই টাকা কটা ও দিয়ে দেবার কথাই আপাতত বলছিল বটে।...তা আমি এক শর্তে রাজি হয়েছি, বলেছি তোমাদের ডাইভোর্সটা হয়ে গেলেই দিয়ে দেব, কিন্তু প্রিয়সখী তাতে রাজী নয়, আগে টাকা কটা ফেলে দেবার জন্য ঝোলাঝুলি করছে।

এবার আতঙ্কে আমার বুকের ভিতরে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সুনন্দ এই মুহূর্তে কুকুর কোলে ওই লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বুঝি।

কুকুরটা তার দিকে চেয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করে উঠল। তার মাথা চাপড়ে দিয়ে মনতুদা হেসে উঠল।—দেখলে? মনিবের উপর কেউ চোখ রাঙাবে সেটা টাইগার পছন্দ করে না...এ-রকম আর একটা আছে। সোজা হয়ে বসল, সুনন্দর হাসিমুখ মুহূর্তের মধ্যে বীভৎস কঠিন। বলল, আর এক মিনিট তোমাকে সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে নেমে সোজা বাড়ির বাইরে চলে যাও, নইলে এরপর কোথায় যে তোমাকে যেতে হবে আমি জানি না—

এক মিনিটের মধ্যে তিরিশ সেকেন্ড বোধহয় চলে গেল। আমার ইচ্ছে করছে, পাগলের মত ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে আসি। কিন্তু পারছি না। ওর মুখের দিকে চেয়ে রোষের এক অব্যক্ত রূপ দেখছি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখছি।

হঠাৎ ঝড়ের মতই নেমে চলে গেল। সেই মুহূর্তে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আমারও সম্বিৎ ফিরলো। দ্রুত সিঁড়ির দিকে ছুটলাম আমি। পিছন থেকে মনতুদা ডাকল, যেও না, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

ততক্ষণে আমি নীচে। উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়ালাম। সুনন্দ গাড়িতে উঠে বসেছে। আমাকে দেখেও ক্ষিপ্ত হাতে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করল।

এক রাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে গাড়িটা আমার চোখের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমার দেহের সবগুলি স্নায়ু একসঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে মুখ থুবড়ে বিকল হয়ে গেল বুঝি। এক বিন্দুও শক্তি অবশিষ্ট নেই আর। মাটি কাঁপছে, পৃথিবীটা ঘুরছে, চোখে রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসছে।

একটা ট্যাক্সি ধরলাম। তার পরেই বাড়ি ফেরার এক অসহ্য তাড়া। মনে হতে লাগল যে বেগে ও বেরিয়ে গেল তার নাগাল আর জীবনে আমি পাব না।

আর তখনি এক বিচিত্র বিস্ময় আমার, বিচিত্র অনুভূতি। আমি কেমন করে যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি, ওই একটা লোক ছাড়া আমি অচল, অস্তিত্বশূন্য। ওকে ছেড়ে আমার একদিনও চলেনি, একদিনও চলতে পারে না।...শুধু আজ নয়, আমার মধ্যে সেই এক তেরো বছরের মেয়েও জানত, ওই একজন তার আছে—জানত বলেই তার অত তেজ অত দাপট।

ট্যাক্সি থেকে অবশ পা দুটোকে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে এলাম। পায়ের নীচের মাটি যেন আরো অস্থির। ওই সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে পারব কিনা জানি না।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে গেলাম। দাসমশাইয়ের হাসি। অসুস্থ দাসগিন্নীর সঙ্গে লুডো খেলছেন। জিতেছেন কিংবা হেরেছেন—তারই হাসি।

ওপরে উঠতে পারলাম।

সামনের ঘরের দোরে এসে পা দুটো আটকে গেল। দরজা ধরে দাঁড়ালাম।

...ওদিক ফিরে টেলিফোনে কথা কইছে। পরক্ষণে মুহূর্তের জন্য সচকিত। মাটি এবার প্রচণ্ড বেগে দুলে উঠল। কথা বউদির সঙ্গেই কইছে। মেয়ে দুটোকে কিছুদিনের জন্য নিয়ে গিয়ে রাখতে বলছে। আজই কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে যাবে বলছে। কোনো কথার জবাবে তার শেষ অসহিষ্ণু উক্তি, সে কি করবে, কোথায় থাকবে আমার তা জানার দরকারই নেই!

সশব্দে রিসিভার ফেলে দিয়ে ফিরল। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গিয়েও দাঁড়াল। জীবনের একটা শেষ কথা শোনার জন্যই আমি প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করছি।

বলল, আমি আজই কলকাতা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, মেয়েদের ব্যবস্থা আমি এসে করব, তোমার দাদা এসে ওদের নিয়ে যাবে।...এর মধ্যে তুমি কোর্টে ডাইভোর্সের দরখাস্ত করে রাখতে পারো, আমার দিক থেকে আর কোনো বাধা আসবে না।

মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়েছি। কথা বলতে পারিনি। কিন্তু তবু সেটা ঠেকাবার জন্যে সবেগে মাথা নেড়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম, না...না!

কাছে ঝুঁকল। নির্মম তীক্ষ্ণ দু'চোখ আমার মুখে বিঁধে আছে—আর তুমি তা চাও না, না? এখন আর তুমি এটা চাও না—কেমন? কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি চাই। তুমি ডাইভোর্স করতে পারো, যা খুশি করতে পারো—আমার জীবনে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

পাশ কাটিয়ে মেয়েদের ঘরের দিকে চলে গেল। আমি হাত বাড়াতে পারলাম না, তাকে ধরে রাখার শেষ চেষ্টা করতে পারলাম না। যে অন্ধকারের সঙ্গে এতক্ষণ যুঝছিলাম সমস্ত দিক ঢেকে দিয়ে সেটা এবার আমাকে গ্রাস করতে আসছে। মা-গো এত অন্ধকার! চারদিকে কি ভূমিকম্প হচ্ছে? দরজাটাই বা কোথায়?

তারপর আর কিছু মনে নেই।

চোখ মেলে দেখি আমি আমার ঘরে খাটে শুয়ে আছি। আমাকে ঘিরে কয়েকটা মুখ।...দাদার, বউদির, দাসমশায়ের, বাড়ির ডাক্তারের, আর, অদূরে আর একজনের। ফ্যালফ্যাল করে সেই মুখের দিকেই চেয়ে আছি। আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলাম একটা? না কি এটাই আশার স্বপ্ন!

মনে হল বিকেল তখন। ওই একজন ছাড়া সকলে আমার দিকে ঝুঁকে এলো। বউদি যেন কিছু জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু ঠিক শুনতে পাচ্ছি না। ডাক্তার এগিয়ে এসে ইন্‌জেকশান দিল একটা। বোধহয় ঘুমের। একটু বাদেই আর চোখ মেলতে পারলুম না।

পরদিন সকাল থেকে সুনন্দ অনেকবার ঘরে এলো। গম্ভীর। চুপচাপ চেয়ে দেখেছে, ওষুধ খাইয়েছে, আবার চলে গেছে। আমার কিছু হয়েছে। যা-ই হোক, এ-যদি তাকে আটকে রেখে থাকে, ভগবান, জীবনে আমি আর ভালো হতে চাই না।

বিকেলের দিকে খাটে বসেছিলাম। স্নায়ুগুলো সব অবসন্ন তখনো। বউদি এলো। ওদিকে ছোড়দির শরীর খারাপ, কত ছোটাছুটি করবে। আমাকে বসে থাকতে দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করল, কেমন?

আমি একটু চেয়ে থেকে আমার পাশটা দেখালাম।—এইখানে বসো।

বউদি বসল। আমি আস্তে আস্তে নেমে দাঁড়ালাম। তারপর মেঝের ওপর তার পায়ের কাছটিতে বসে দু'হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে দুই হাঁটুর ওপর কপাল রাখলাম। বউদি ব্যস্ত হয়ে উঠল, ও-কি!

হাঁটুতে মুখ গুঁজে রেখেই আমি বললাম, মা কেমন ছিল জানি না বউদি, এখন জেনেছি, আমাকে এমনি করে কিছুক্ষণ থাকতে দাও।

আমি কাঁদিনি। কিন্তু বউদি আনন্দে কাঁদছে জানি।

একটু বাদে তার নড়াচড়ায় ঘরে কেউ এসেছে টের পেলাম। কে এসেছে জানি। আস্তে আস্তে উঠলাম আবার। আমার দিকে একপলক তাকিয়ে সুনন্দ জিজ্ঞাসা করল, বউদি কতক্ষণ?

—এই তো। হাসি-ভরা মুখে, জল-ভরা চোখে বউদি প্রায় ঝাঁঝিয়েই উঠল, আপনি মশাই এই ভালো মেয়েটাকে সেই থেকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কোন্ সাহসে শুনি?

...গম্ভীর মুখের পুরু ঠোটের কোণে আমি কি হাসির আভাস দেখলাম?

রাত্রি।

ছাইয়ের ওষুধের ধকলে দু'চোখ বেশিক্ষণ মেলে রাখতে পারি না। ঝিমুনো শরীরে হঠাৎ যেন স্পর্শের তরঙ্গ একটা। চেয়ে দেখি শিয়রে বসে মানুষটা আমার মাথায় কপালে গালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কি এক দুঃসহ আবেগে সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল আমার। পরমুহূর্তে সবলে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলাম তাকে।

কতক্ষণ ছিলাম এ-ভাবে জানি না। আর আমার ভয় নেই জানি। দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা কাটতে চায় না তবু। জিজ্ঞাসা করলাম, ভালো হলে তুমি কি আমাকে ছেড়ে যাবে?

হাসছে। পুরু ঠোঁটের, ছোট চোখের হাসি এত সুন্দরও হয়!

জবাব দিল। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে গলা খাটো করে বলল, একটা ফ্রক-পরা মেয়ের জন্য ন'বছর আর বিয়ের পরও ছ'বছর অপেক্ষা করে তাকে পরে ছেড়ে যাওয়া এত সহজ!

কাল আমি অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলাম, আজ এত আলোও বুঝি সহ্য হবার নয়!

এখন আমাদের গাড়ি নেই। এক-তলাটা ভাগ-ভাগ করে ভাড়া দিয়েছি। আর একজন তার দেনায় বিকনো নড়বড়ে ব্যবসা আবার আগের মত দাঁড় করানোর জন্য দিনরাত পরিশ্রম করছে। তারই মধ্যে ওই মানুষকে আমি দিনে দিনে আবিষ্কার করেছি। করছি। যত দেখি তত যেন তার মাথাটা প্রায় নাগালের বাইরে উঁচু মনে হয় আমার।

...ঠাকুমা গো, আর জন্মে কি তুমি দেবী ছিলে?

গোড়ায় গোড়ায় আমার মনে অনটনের কালো ছায়া পড়ত অস্বীকার করব না। মনে হত, আগের মত সচ্ছলতা ফেরা দূরে থাক, মোটামুটিভাবে দিন কাটবে তো? কিন্তু দু'বছর ধরে এই একজনের কাজের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত হয়ে সে-ভয় ঘুচে গেছে। মনে হয়েছে, ঠিক এই রকম কেটে গেলেও, বা আরো অনটনের মধ্যে পড়তে হলেও ক্ষতি নেই, ভয় নেই। এই একজনের সঙ্গে মিশে থাকতে পারাটাই পরম নির্ভয়ের। এখন বেশি পরিশ্রম করতে দেখলে আমি ধমকাই পর্যন্ত।

দাস-গিন্নী মারা গেছেন প্রায় দু'বছর হতে চলল। আমি অত কান্না বোধহয় জীবনে কাঁদিনি। সেদিন দাসমশাই আমাদের দুজনকেই নীচে ডেকেছিলেন। আমরা যেতে তোশকের ওয়াড়ে হাত ঢুকিয়ে দশ টাকার আর একশ টাকার গাদা-গাদা নোট বার করতে লাগলেন। তেলচিটে পুরনো নোট সব। বার করছেন তো করছেন। আর আমাদের হাঁ-করা মুখের দিকে চেয়ে হাসছেন মিটিমিটি।

ওকে বললেন, এগুলো তোমাদের জন্যেই ছিল, সব নিয়ে যাও—পাপের টাকা নয়, একটা পয়সা অবধি হকের টাকা—এই দিয়ে আবার ব্যবসা দাঁড় করাও।

তারপর একদৃশ্য। ও নেবে না, দাসমশাই নেওয়াবেনই। শেষে ও হাত জোড় করে বলল, এ-টাকা আপনার কাছেই থাক এখন, তেমন দরকারে নেব, আমি আপনার মা-লক্ষ্মীকে বড়াই করে কথা দিয়েছি, আবার আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবই, আবার সব ঠিক হয়ে যাবেই। আর কিছুদিন আমাকে চেষ্টা করতে দিন।

এ-কথার পর দাসমশাই ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু আমার অস্বস্তি ও এই প্রতিজ্ঞা কেন করে? কেন এত জোর দিয়ে বলে আগের ঐশ্বর্য আবার ফিরেই আসবেই। সেদিন রাতে তাই ওর বুকে মুখ গুঁজে বলেছিলাম, তুমি এভাবে আর বলবে না, এত পরিশ্রম করবে না—তুমি যে-ভাবে বলছ সে-ভাবে আবার সব ঠিক না হলেও আর কিছু যায় আসে না—যা গেছে তার কত গুণ ঐশ্বর্য ফিরে এসেছে তুমি জানো না।

...হ্যাঁ আজ আমি লিখতে পারি। আজই পারি, আগে পারতুম না।...জীবনে এই রূপটা আমি আঁকতে পারি। জীবনে আলো আছে, অন্ধকার আছে, সুন্দর আছে, কুৎসিত আছে। সেই আলো-অন্ধকারে সুন্দর-কুৎসিতের ভিতর থেকে যদি জীবন-সোনা ঝালিয়ে নিতে পেরে থাকি—সে-বারতা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে আর আমার কোনো দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। নেই, কারণ, আমি যা হতে পারতুম তা আমি হইনি।

আমার কাহিনী বলুন, গল্প বলুন, এটুকুই সব। এটুকুই শেষ।

আমি সে ও সখা

উৎসর্গ

শ্রীতুলসীকান্তি দে বিশ্বাস
প্রিয়বরেষু

কোথায় যেন পড়েছিলাম বা কোথায় যেন শুনেছিলাম কথাটা ঠিক মনে নেই। প্রেরণা আর দ্বিধার এক নৌকোয় ঠাঁই হয় না। একটা আর একটার সহচর বা সহচরী নয় কখনো।

কথাটা আমার মনে আছে কারণ এই সত্যটা আমি বিশ্বাস করতে চেয়েছি, অনেক সময় ওটা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি। ওই সত্যের ওপর নির্ভর করে অনেক বাধা অনেক বিঘ্ন উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করেছি, অনেক সংশয় অনেক সংকোচের ওপর ছড়ি উঁচিয়ে সত্তা উপলব্ধির রসদ খুঁজেছি।

কিন্তু আসলে মেয়েটা আমি দুর্বল। যে সবল, সর্ব রকমের প্রেরণার স্রোতে সে অনায়াসে গা ভাসাতে পারে। তার কোনো সবল উক্তি বা প্রবচনের নির্ভর দরকার হয় না। আমার মনের তলায় একটার সঙ্গে আর একটা বিরোধ লেগেই আছে। সমস্ত রকম প্রেরণার সামনেই একটা না একটা দ্বিধার প্রাচীর মাথা উঁচিয়েই আছে। আমাকে সেটা লঙ্ঘন করতে হয়, প্রাণপণ চেষ্টায় সে অবরোধ ডিঙোতে হয়। সেটুকু পাবার মধ্যে এক ধরনের আত্মপ্রসাদ আছে বটে। কিন্তু তার শ্রান্তি আর ক্লান্তিও আছেই।

কায়িক শ্রমের অবসাদ ভালো করে স্নান করলে কাটে। ভালো করে মাথা আঁচড়ে নিপুণ হাতে অল্প-স্বল্প প্রসাধন বিন্যাস করে, কপালে জ্বল-জ্বলে ছোট সিঁদুরের টিপ পরে সিঁথিতে রক্তিম শিখার আঁচড় কাটার পর ভেতর-বার সবই ঝরঝরে দেখায়। কিন্তু অবসাদের বাসা যে-মেয়ের বুকের তলায় সে কি করবে? নির্ভেজাল সাদাটে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর প্রেরণায় যে-মেয়ের ভিতরে ভিতরে উদ্দীপনার কাঁপন ধরে অথচ এই অবরোধের প্রাচীরটাতে ক্রমাগত মাথা ঠুকতে হয়, তার সঙ্গে যুঝতে হয়— সে কি করবে? সেই ক্ষত তার শ্রান্তি আর অবসাদ সে মুছবে কেমন করে?

না মুছুক, ঢাকা পড়ে। চাপা পড়ে।

গরমের দিনে আমি কম করে চার বার স্নান করি, আর ঘুরে ফিরে কতবার যে কানে চোখে মুখে জল দিই তার হিসেব নেই। শীতের দিনেও দু'বার চান করিই। ঠাণ্ডা-জল গরম-জল দু'রকমেরই অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে। দুটো আলাদা আলাদা কল খুললেই হল, চাইলে ঠাণ্ডা জল পড়বে, চাইলে গরম জল। শুধু এই কেন, ঝকঝকে তকতকে এই ছোট বাড়িটুকুর মধ্যে আরামের আরো অজস্র ব্যবস্থা অজস্র উপকরণ রয়েছে। যা নেই তা এ-বাড়ির মালিকের মাথায়ও নেই। নইলে থাকত, থাকবে। এই সেদিন রচনাবলী ওলটাচ্ছিলাম, অদূরে বসে আমার মালিক নিবিষ্ট মনে তার নার্সিংহোম সম্প্রসারণের ছক দেখছিল।...কি বললাম? আমার মালিক? নিজেই বললাম, নিজেই স্বীকার করলাম অথচ ভিতর থেকে একটা অসহিষ্ণুতা ঠেলে উঠতে চাইল কেন?...তবু মালিক বই কি। এ-কথা সে মুখে বলে না, আচরণে ব্যবহারে মালিকানা খাটায় না, আমার মুখের কথা খসলে অন্তরঙ্গ খুশির প্রলেপে সেটা হুকুমের মতো করে শিরোধার্য করে। তবু আমি কে? আমি কি? আমি তার সজীব একখানা আদরের সামগ্রী, সংরক্ষণের সামগ্রী, আরামের সামগ্রী। কথাগুলো অত্যন্ত স্থূল আর শ্রুতিকটু জানি। মনের কথার রূপ দেবার মতো ভাষার দখল আমার কিছুটা আছে। কিন্তু কথাটা যদি নির্মম সত্য হয় অলঙ্কারে সাজালে তার ধার খোয়া যায়!

যাক, রচনাবলীর কবিতাটিতে চোখ আটকে যেতে দুটো পঙক্তি জোরেই পড়লাম, 'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা, এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।' এটুকুই পড়ে অদূরের মানুষটার দিকে চুপচাপ চেয়ে রইলাম।

সেই নীরবতাটুকুই তন্ময়তা ভঙ্গের কারণ সম্ভবত। ফিরে তাকালো।

বাঃ, চমৎকার কথাগুলো তো!

কি চমৎকার?

ওই যে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা—এর মধ্যে যাকে বলে স্ট্রাগল-এর একটা বলিষ্ঠ আর সম্মানের দিক আছে, তাই না?

আমি মাথা নাড়লাম। তাই মনে মনে ভাবলাম কবিগুরুর এইখানেই বাহাদুরি। তাঁর ভাণ্ডার থেকে যে যার মনের মতো রসদ সংগ্রহ করে নিতে পারে।

কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় এসে গেলাম। আমার লেখার সমালোচকরাও মাঝে মাঝে এই জন্যে হুল ফোটাতে ছাড়েন না। লেখেন, আমার মতি চঞ্চল, একটা কথা বলতে গিয়ে বক্তব্য ছেড়ে পাঁচদিকে ছোটাছুটি করি। বার বার চান করা আর চোখে মুখে জল দেবার কথা বলছিলাম। আমার কর্তার ধারণা শীতের দিনের সন্ধ্যার স্নানটা অন্তত আমি গরম জলে সারি। কিন্তু হাড়ে-হাড়ে ঠকঠক কাঁপুনি ধরলেও বেশির ভাগই আমি গায়ের ওপর ঠাণ্ডা জলের শাওয়ার খুলে দিই। তখন যন্ত্রণা হতে থাকে। পরে ভালো লাগে। মাঝে মাঝে নিজেরই অবাক লাগে, শরীরটা আমার কোন্ ধাতুতে গড়া? কোনোদিন ঠাণ্ডা বা সর্দি লাগার নাম নেই। ভিতরটা সর্বদা কেমন তপ্ত আর খর-খরে। যত বার কানে মুখে চোখে জল দিই ততবার ভালো করে মুখ মোছার পর আর কিছু না হোক একটু পাউডার অনন্ত বুলিয়ে নিই।

কিন্তু কেন? কেন এ-রকম করি আমি?

নিজেকে ঝরঝরে তাজা দেখাবার লোভে? কারো চোখের প্রসাদ পাই বলে? না ভিতরের ওই ওই অবসাদ ওই শ্রান্তি চাপা দিতে চাই বলে, ঢেকে রাখতে চাই বলে?

টেলিফোন বেজে উঠল। উঠলাম। কার ফোন অনুমান করতে পারি। কি বলবে তাও। ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। বেলা দেড়টা...

হ্যাঁ, বলো।

কি আশ্চর্য, আমিই ফোন করছি তুমি বুঝলে কি করে?

হাসতে ইচ্ছে করছিল কিনা জানি না। তবু ওদিকের কান জুড়নোর মতো করেই হাসলাম।—বলো তো কি করে?

কি জানি, তুমি যাকে বলে ওয়াণ্ডারফুল। কি করছিলে, লেখা থেকে আনলাম না তো?

বেলা দেড়টা, খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ, এখন লেখা! আমি কি তোমার মতো ডাক্তার যে নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান নেই। না এসে টেলিফোন করছ মতলবখানি কি?

সত্যি বড় আটকে গেলাম। লক্ষ্মীটি আর অপেক্ষা না করে খেয়ে নিও।

তুমি?

আমার ফিরতে সেই সন্ধ্যা। তবে আমার খাওয়া তোমার থেকে ভালোই হবে নিশ্চিন্ত থাকো, সুধীর বড় হোটেল থেকে টেলিফোনে খাবার আনাচ্ছে, আমি সেই ফাঁকে তোমাকে ধরেছি।

হ্যাঁ, কথা শুনলে একটা স্পর্শের মতোই লাগে বইকি। হেসেই জবাব দিলাম, খুব ধরেছ। সুধীরকে বোলো, এই নিয়ে এ-মাসে চারদিন হল, এরপর আমি ওর চুলের ঝুঁটি ধরব।

ও-দিক থেকে আরো জোরালো হাসি ভেসে এলো। সেই লোভে সুধীর না আমাকে উপোস করিয়ে রাখে, চুলের ঝুঁটি তো আর দূর থেকে ধরা যায় না।

ছকে বাঁধা রসিকতা। আমার দিক থেকেও ছকে বাঁধা হাসি আর ভ্রূকুটি।—দেব দুজনের মাথা ঠুকে!

সুধীর দত্ত। তার যোগ্য দোসর, যোগ্য সহচর। দুজনে মিলে সার্থক সফল জীবনের সিঁড়ি তৈরি করে চলেছে। সেটা শেষ পর্যন্ত কত উঁচু হবে কোথায় গিয়ে থামবে সে-সম্বন্ধে নিজেদেরও স্পষ্ট ধারণা নেই। সুধীর আমার নির্লজ্জ স্তাবক। সকলের সামনে ওর সেই চোখ-কান-কাটা স্তুতি শুরু হলে আমাকে পালাবার পথ খুঁজতে হয়।

এই যে সুধীর এসে গেছে, দেব ওকে?

না, রক্ষে করো। নিজেরা না হয় হোটেলের ভালো-ভালো খাবার আনিয়েছ, এই খিদের মুখে আমার রসিকতা শোনার সময় নেই। তুমি আটকে গেলে কি জন্যে, অপারেশন-টপারেশন কিছু?

...না, সেই এক্সটেনশন প্ল্যান নিয়ে বসেছি...আড়াইটেয় ইঞ্জিনিয়ার কনট্রাক্টর আসবে, সুধীরটা তাই ছাড়ল না।

বাবা, এক্সটেনশন একেবারে সন্ধে পর্যন্ত চলবে?

এই দেখো, আমার কাজটা তোমার কাছে কাজই নয়, আর নিজে যখন একসময় সমস্ত রাত জেগে লেখো?

তুমি একটি মিথ্যেবাদী! আমি রাতে লিখতে বসলে তুমি কি করো?

আবার হাসি। চিৎপাত হয়ে শুয়ে পাখার হাওয়া খাই, আর ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ি—আর কি করব!

বেইমান।

শোনো, ছেড়ো না। দরকারি চিঠিপত্র কিছু এসেছে?

তার চিঠিও আমাকে খুলতে হয়, পড়তে হয়, দরকার বুঝে সামনে এগিয়ে দিতে হয়। ব্যস্ত মানুষ, সময় কম। এই সাহায্যটুকুর জন্যও কৃতজ্ঞ।—দুটো এসেছে। একটা তোমার, একটা আমার। তোমার নামের খামে চিঠির সঙ্গে চেক একটা...অজিত গুপ্ত না কার।

হ্যাঁ, কত টাকার চেক?

বারো শ' পঁচাত্তর।

ঠিক আছে। তোমাকে কে লিখল?

জানি না, বে-নামী চিঠি।

কি সর্বনাশ! প্রোপোজ-টপোজ করেনি তো?

এই সময়ে, ঠিক এই মুহূর্তে আমার সহজতায় চিড় খাবার উপক্রম। টেলিফোনের ওধারের মানুষ আমার মুখ দেখতে পাচ্ছে না, চোখ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু গলার স্বর পালটালে আর জবাবের সুর পালটালেই আমার অনেকটা দেখতে পাবে, অনেকখানি বুঝে নিতে পারবে। সেই উদগ্র ইচ্ছেটাই ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করছে, বোঝাতে ইচ্ছে করছে। কোন্ মেয়ে চিঠি লিখেছে আর কি লিখেছে সেটা বলে দেবার জন্য একটা বিদ্রোহ যেন টেলিফোনের মুখটার ওপর এসে ভেঙে পড়তে চাইছে। ওদিকে যার হাতে টেলিফোন, বলার পরেও আমি তাঁর মুখ দেখতে পাব না—কিন্তু ব্যতিক্রমটুকু সেই মুহূর্তে আঁচ করে নিতে পারব।...বলব কোন্ মেয়ের চিঠি? বলব, কি লিখেছে? তারপর...তারপর আবার কি, আমি লেখিকা গল্প লিখি, গল্প বানাই...হেসে উঠে ভণিতা করতে পারি, দেখো কেমন জোরালো একখানা গল্পের ছক কেটেছি—তুমি তো আঁতকেই উঠেছিলে। কিন্তু না, হাতের এই একটিমাত্র অস্ত্রের ধার বোকার মতো এক্ষুনি আমি খুইয়ে বসব না। এখনো আমার অনেক অনেক জানতে বাকি, বুঝতে বাকি! তবু, গোলাপের কাঁটার মতো রসিকতার সামান্য একটু আঁচড় ছুঁইয়ে যাবার লোভ সামলানো গেল না। হেসেই জবাব দিলাম।

—না, কোনো মেয়ের চিঠি। আমাকে দরদী লেখিকা বলে জানে, তাই আমার কাছে তোমার নামে নালিশ করেছে।

সে কি! কি লিখেছে?

লিখেছে তোমার বাইরের ব্যবহার যে-রকম মোলায়েম সুন্দর, ভিতরের স্বভাব-চরিত্র সে রকম নয়। সেই সঙ্গে আস্ত একটি কসাইও বলেছে।

বা, বা! কি ভাগ্য—কোথা থেকে এসেছে চিঠিটা, ছাপ দেখেছ?

...কি জবাব দেব? কোথা থেকে এসেছে বলব। খামসুদ্ধু, চিঠিটা ওই আমার সামনেই পড়ে আছে। কোথা থেকে এসেছে বলার জন্য ওটা একবার উলটে দেখারও দরকার নেই। কিন্তু সত্য চাপা দিতে হলে অন্য কোনো জায়গার নাম করা দরকার। নইলে রসিকতার কাঁটা আর গোলাপের কাঁটা মনে হবে না। জবাব দিলাম, বে-নামী চিঠি কি কেউ ঠিকানা-পত্তর দিয়ে লেখে! খাম উলটে পালটে দেখেছি। হুগলি মনে হল...

ও-ধার থেকে হাল্‌কা হাসি ভেসে এলো—বুঝেছি, দিন কয়েক আগে ওদিকের একটা সিজারিয়ান কেস্ ডিসচার্জ হয়েছিল, কেমন কাঁটার মুকুট পরে বসে আছি দেখো...ভালো রসদ পেয়েছ, একটা গল্প লিখে ফেলো। তোমাকে নিয়ে কেন, আমি বুঝি একটা গল্পেও জায়গা পাবার যোগ্য নই? তাহলে সুধীরকে নিয়ে লেখো—এই সুধীর, ডাকছে তোকে—

এই! না, না, ডাকছি না!

ও-দিকের রিসিভারের ততক্ষণে হাত বদল হয়ে গেছে। সুধীর দত্তরই মোটা ভারী গলা শোনা গেল।—নিশ্চয় ডাকছ, আমি সেই ডাক শুনতে পেয়েছি, এখন অস্বীকার করলে কি হবে—ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক সুয্যি ঠাকুরকে ডেকে বসে কুন্তী ঠাকরোনের কি হাল হয়েছিল জান তো? কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে জোরে চুমুর শব্দ একটা।

অভ্যদ্র-অসভ্য কোথাকারের!

ও-দিকের সমস্বরে হাসির শব্দ জোরালো হয়ে ওঠার আগে ঝপ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম।

না, সুধীরের কথায় বা ওর এই সব স্থূল রসিকতায় এখন আর আমার কান গরম হয় না, মুখ লাল হয় না (মুখ লাল না হবার আরো কারণ গায়ের রং আমার তেমন ফর্সা নয়)। ভেবে দেখেছি ওর ওপর সত্যিকারের রাগও কখনো হয়নি। ও একটা বেপরোয়া ডাকাত বিশেষ সর্বনাশ করার হিম্মত রাখে কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ধ্বংস-বিমুখ হৃদয়ও ওর ভিতরে কোথাও লুকিয়ে আছে বোধ হয়। যে-কাজ সকলের কাছে একান্ত গর্হিত, সে-কাজও সুধীর দত্ত এমন অনায়াসে করে বসতে পারে যে তার ধাক্কায় নীতির বিচারে বসতেও সময় লাগবে। আর, তারপর বিচারে বসলে ওই লোকটার যোগ্য শাস্তি যদি ফাঁসিও হয় তবু ওই ঠোঁটের ডগায় হাসি-ছোঁয়া জোরালো মূর্তির দিকে চেয়ে রায় ঘোষণা করতে বিচারককে হিমসিম খেতে হবে। সে-বিচারক কোনো মহিলা হলে কথাই নেই, বে-কসুর খালাস।

মাস কতক আগের একটি ঘটনা বলি। সে-রাতটার কথা মনে হলে এখনো সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে! সুধীর দত্তর সেই অবিশ্বাস্য বে-পরোয়া অপরাধের কোনো বিচারক ছিল না। ছিল না কারণ ঘর-সুদ্ধু মেয়ে-পুরুষের সেই বিমূঢ়তার অবসানে কারো-কারো চোখে আসামী যদি ধরা পড়েও থাকে (পড়েছিল নিশ্চয়, আমার চোখে অন্তত পড়েছিল) সেটা মুখ ফুটে বলা দূরের কথা—চোখের আচরণেও কেউ প্রকাশ করতে ভরসা পায়নি।

পরে আমার কাছে ও অপরাধ স্বীকার করেছে। জেরার ফলে ঘটনার যে চিত্রটা চোখে ভেসেছে, আমার গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠেছে। রাগে ভয়ে বিস্ময়ে আমারই মাথার মধ্যে বুঝি কি একটা ঘটে গেছিল। আমার ঘরের মানুষ অদূরের সোফায় বসে অল্প অল্প হাসছিল আর মুগ্ধ বিস্ময়ে বন্ধুটিকে দেখছিল। আমার কাণ্ড দেখে সে-ও হকচকিয়ে গেল।

হঠাৎ ঝুঁকে দু'হাতে খাবলা দিয়ে আমি সুধীরের ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে যতখানি জোরে সম্ভব ঝাঁকিয়েছিলাম বার-কতক, তারপর সেই অবস্থাতেই ওকে নিজের দিকে টেনে বলে উঠেছিলাম, তুমি ক্ষমা চাইবে কিনা বলো—

কার কাছে?

মিসেস বোসের কাছে!

কি মুশকিল, তুমি তো আর মিসেস বোস নও, চুলের মুঠি ধরে আমার মাথাটা নিজের হাঁটুর দিকে টানছ কেন?

ওরই জন্যে ভয়ে আর উত্তেজনায় আমার কাণ্ডজ্ঞান বিলুপ্ত যেন। চুলের মুঠো-ধরা দুই হাতের জোরে ওর মাথাটা আরো টেনে নামাতে চেষ্টা করে বলে উঠেছিলাম, আমাকেই মৈত্রেয়ী বোস বলে ভাবো, আমার-পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাওয়াটা আগে রপ্ত করো।

জোরে বড় একটা হাসে না। গলার স্বর এমন পুরুষ্টু গম্ভীর যে একটু শব্দ করে হাসলেই গুরু-গুরু রেশ বাজে। সেই লোক গলা ছেড়ে হা-হা শব্দে হেসে উঠল। আর তার ফলে আমার চুলের মুঠো ধরা হাত আপনিই যেন অবশ শিথিল হয়ে এসেছিল।

সেই ফাঁকে নিজের মাথাটা উদ্ধার করল ও। তারপর হাসতে হাসতেই অদূরের বিস্ফারিত বন্ধুর দিকে তাকালো। —তোর বউয়ের আসলে মৈত্রেয়ী বোসের ওপর হিংসে হয়েছে, বুঝলি? আমার দিকে ফিরে মিটিমিটি হাসতে লাগল।—তোমাকে মৈত্রেয়ী বোস ভাবার আগে সেই অপরাধটাও করে নিই তাহলে?

হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ছুঁড়ে মারার জন্যে অ্যাশপটটাই হাতে তুলে নিয়েছিলাম। তারপর ঠক করে আবার ওটা নামিয়ে রেখে উঠে নিজেই পালিয়েছিলাম।

সেই ঘটনা বা অঘটনের চিত্রটি সুসম্পূর্ণ করতে হলে তার আগে থেকে একটু বিস্তার প্রয়োজন। অন্যথায় আমি কেনই বা অমন ক্ষেপে গেছিলাম আর কেনই বা সুধীর দত্তর ওই শেষের কথা শুনে নিজেই ছুটে পালিয়েছিলাম, সেটা স্পষ্ট হবে না।

নাম-জাদা হার্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর অমল বোসের স্ত্রী মৈত্রেয়ী বোস। লোকে বলে ডক্টর বোসের টাকার খাঁই একুট বেশি, কিন্তু সাদাসিধে ভালো-মানুষ কোনো সন্দেহ নেই। মাথা-জোড়া টাক, মোটার দিক ঘেঁষা খাটো গড়ন, বছর সাতচল্লিশ হবে বয়েস—কোনোরকম দেমাক নেই, সাজ-পোশাকেরও আড়ম্বর নেই। তাঁরই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মৈত্রেয়ী বোস। প্রথম পক্ষ একটি মাত্র মেয়ে রেখে আট বছর আগে চোখ বুজেছেন। মেয়ের তখন ছ'মাস মাত্র বয়েস। মৈত্রেয়ী বোস বছর বারো ছোট হবেন স্বামীর থেকে। অর্থাৎ তাঁর বয়েস এখন পঁয়ত্রিশ। সেই বয়েসটা তিরিশের নীচে দেখানোর একটু সংগোপন প্রয়াস শুধু আমাদের মেয়েদের চোখেই ধরা পড়ে। মহিলা উচ্চশিক্ষিতা, ছ'মাসের জন্য বিলেত গেছিলেন কিসের ডিপ্লোমা আনতে। কোনো লোকের সঙ্গে দশ মিনিটের আলাপের পরেই কথা বা দৃষ্টান্তের ছলে তাঁর বিলেত ঘুরে আসার খবরটা প্রকাশ পেয়ে যায়। কলেজের মাস্টারি করতেন। কপালগুণে এবং যোগাযোগের ফলে আজ মস্ত ডাক্তারের ঘরনী।

...কপালগুণই আসল, নইলে যোগাযোগের ব্যাপারটা মামুলি। সুধীরের ধারণা, কোনো অবিবাহিতা মেয়ের আর কোনো অবিবাহিত বা বউ-মরা ছেলের মাথায় যদি কন্দর্প-শরের ক্ষত চাপা থাকে—অনিবার্য যোগাযোগ তাহলে জলে স্থলে শূন্যে শ্মশানে যে কোনো জায়গায় ঘটে থাকে। আর সেই ছেলে বা মেয়ের বয়েস যদি খানিকটা ভাঁটার দিকে গড়িয়ে থাকে, তাহলে তো একজন আর একজনকে দেখা-মাত্র চুম্বকের মতো টেনে নেবে। অমল বোস আর মৈত্রেয়ীর বেলায় তাই নাকি হয়েছিল। অমল বোসের সবে তখন ঘর খালি, আর বিলেত ফেরত কলেজের মাস্টার মৈত্রেয়ী সরকার ঘর খুঁজছেন। সেই শুভক্ষণে বনের পাখি আর খাঁচার পাখি কাছাকাছি। মৈত্রেয়ীর আরো তিনটে ছোট বোন আছে, তাদের আগেই বিয়ে হয়ে গেছিল। তার মধ্যে সব থেকে ছোট বোনের সব থেকে ভালো বিয়ে হয়েছিল। সেই ভদ্রলোক ডাক্তার অমল বোসের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। ভদ্রলোক, অর্থাৎ মৈত্রেয়ীর ছোট ভগ্নিপতির ফলাও রাবারের ব্যবসা। সেটা আরো বড় করে তোলার তাগিদে হামেশাই তাঁকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। ভদ্রলোক দিন কতকের জন্য সেবারে গেলেন আন্দামানে। সেই সাময়িক নির্বাসনের সুতো ধরে এ-মিলনের গ্রন্থি। সময় বুঝে ছোট বোন অসুস্থ হলেন, অমল বোস এলেন তাঁর হৃদয়-যন্ত্র পরীক্ষা করতে, বোনের তদারকে মৈত্রেয়ী সেখানে সশরীরে উপস্থিত তখন। তারপর (সুধীরের অনুমান অনুযায়ী) পরস্পরকে দেখে পরস্পরের মুগ্ধ হতে সাত দিনও লাগেনি। কারণ ডক্টর অমল বোস মৈত্রেয়ীর বিলেত ঘুরে আসার খবর নিশ্চয় প্রথম দিনেই পেয়েছেন, আর মৈত্রেয়ীর দিক থেকে ভদ্রলোকের স্ত্রী বিয়োগের আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আঁচ করতে ক'দিন লাগতে পারে? মোট কথা ওই সাত দিনের শেষের মাথায় না ডাকতেই ভদ্রলোক রোগিনী দেখতে এসেছেন আর ভদ্রমহিলা সে-রকম জরুরী প্রয়োজন ছাড়াই নিজে ভদ্রলোকের বাড়ি গেছেন রোগিনীর সমাচার জানাতে। সুধীর হলপ করে বলেছিল, শেষের এই মিলনাত্মক খবরটা কোনো প্রগলভ মুহূর্তে তাঁদের পরিবেশন করেছেন অমল বোসের অন্তরঙ্গ বন্ধু মেডিসিন-বিশারদ ডক্টর বথীন খাশনবিশ। মোট কথা

এক রোগিনীর হৃদয়-সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে অচিরে ওঁদের পাকাপোক্ত হৃদয়-বন্ধন (সুধীর বলেছিল, হৃদয়-উদ্বোধন)। মৈত্রেয়ী বোসেরও স্বামীর মতই ছোট-খাটো গড়ন, তবে মোটা নয় একটুও রোগা না বলে বড় জোর ছিপছিপে বলা যেতে পারে। মুখশ্রী মন্দ নয়, শিক্ষা আর বুদ্ধির ছাপের দরুন বেশ সুশ্রীই দেখায়। সুধীর দত্ত অবশ্য বলে, ওই শ্রীটুকু বিয়ের পরের আমদানী—ওর মতে সুখের ঘরে রূপ খোলে, যেমন আমি, ছিলাম একটা পেত্নীর মতো, আর এখন নাকি লোকে আড়চোখে দুই-একবার চেয়ে চেয়ে দেখেও—আর মাঝে-মধ্যে নাকি ওর চোখেও লোভ উঁকিঝুঁকি দেয়।

মৈত্রেয়ী বোসের প্রসঙ্গ উঠলেই সুধীর যাচ্ছেতাই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার কারণ, সুধীর নিজেও জানত সে ওই মহিলার দু'চক্ষের বিষ। এক ঘর লোকের সামনেও এক-এক সময় ভালো মুখ করে বিলেতের গল্প শুনতে চায়, চায়েল্ড স্পেশালিস্ট হিসেবে মহিলার প্রথম সন্তানটিকে তার হাতে ছেড়ে দেবার বায়না ধরে। মৈত্রেয়ী বোস নিঃসন্তান। আট বছরেও যখন সন্তান হয়নি, আর হবে কেউ আশাও করে না। সে জন্য তাঁর কোনোরকম খেদ আছে বলে কেউ ভাবে না। তিনি নিজেই বলেন, ও-সব ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেলে বেঁচে যায়। আমার ঘরের মানুষ, অর্থাৎ প্রশান্ত রায় গাইনো-কলজির মোটামুটি নামী ডাক্তার। বিলেতের ছাপও আছে। বছর তিনেক আগে মৈত্রেয়ী বোসের ঘরে চুপিচুপি একার তার ডাক পড়েছিল। সে খবর এক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমার স্বামীর মতে মৈত্রেয়ীর ছেলে-পুলে না হওয়ার মতো বিশেষ কোনো কারণ নেই। তার সন্দেহটা বরং ডক্টর বোসের ওপরে গিয়ে পড়েছিল। আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, কিন্তু ডক্টর বোসের তো আগের পক্ষের মেয়ে আছে?

পরে গণ্ডগোল হতে পারে, তাঁকে আর কে পরীক্ষা করছে। পরে হেসে টিপ্পনী কেটেছিল, কে জানে কার মেয়ে, তোমাদের তো আর ধরা-ছোঁয়ার উপায় নেই।

এই ডাক্তারগুলোর স্বভাব যেমন, মুখও তেমনি। সুধীরের সঙ্গদোষেই মুখ আরো খারাপ হয়েছে।

যাই হোক, আমার ধারণা, মৈত্রেয়ী বোস মুখে যা-ই বলুন, ভিতরে ভিতরে সন্তানের বাসনা একটু আছেই। অবশ্য জোর গলায় বলতেও পারি না। স্বামীর আগের পক্ষের ওই আট সাড়ে আট বছরের মেয়েটাকেও তো নিজের কাছে না রেখে দার্জিলিংয়ের কনভেন্ট-এ রেখে পড়াচ্ছেন। ওঁদের যখন বিয়ে হয় মেয়েটার তখন বছরখানেক বয়েস শুনেছি। শিক্ষিত মার্জিতরুচি মহিলার এ-হেন অসহায় সপত্নী কন্যার ওপর কোনোরকম বিতৃষ্ণা থাকা সম্ভব নয়। ছিলও না। হয়তো বা সত্যিই ঝামেলা পোহাবার মেজাজ নয় তাঁর।

দু'বছর আগে দুই বন্ধুতে মিলে সত্যিই যখন নার্সিং হোমের পত্তন ঘটিয়ে ছাড়ল, সেই শুভারম্ভের দিনে কলকাতার সমস্ত বড় ডাক্তারদের সেখানে সস্ত্রীক পদার্পণ ঘটেছিল। সেদিনও এই সুধীরকে নিয়ে আমি কম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িনি। হৈ-চৈ আনন্দের মধ্যেও এসে মৈত্রেয়ীর সামনে দাঁড়াল, ঘটা করে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো, তারপর সবিনয়ে একটি আর্জি পেশ করল যেন। বলল, ম্যাডাম, নার্সিং হোম রেডি, চায়েল্ড্ স্পেশ্যালিস্ট তো তার আগে থেকেই রেডি—এখন আপনি অনুগ্রহ করে এগিয়ে এলেই হয়।

কাছাকাছি যারা ছিল তারা হেসে উঠেছিল। মৈত্রেয়ী বোসও হাসতে পারলে সংকট কিছু থাকত না। কিন্তু তাঁর থমথমে মুখ। পরে সকলের অগোচরে আমাকে বলেছেন, অপমান করার জন্য ডেকেছ এখানে?

অনেক সাধ্যসাধনা করেও তারপর ওঁকে এক পেয়ালা চা পর্যন্ত খাওয়াতে পারিনি। ডক্টর বোস ঘুরে ঘুরে কেবিনগুলো দেখছিলেন। একটু আগের প্রহসনটা তাঁর অগোচর। ভদ্রলোক কাছে আসার সঙ্গেসঙ্গে শরীরের দোহাই দিয়ে তাকে যেন বগলদাবা করে নিয়েই স্ত্রী প্রস্থান করেছেন।

এর পরে অবশ্য সুধীরকে নিয়ে পড়েছিলাম আমি। আমার রাগই হয়েছিল। কিন্তু কার ওপর রাগ তার গণ্ডারের চামড়া।

আমি কত সময় রাগ করে বলি, ভদ্রমহিলা তোমাদের থেকে বয়সেও বড় সে-খেয়াল আছে?

গম্ভীর মুখে সুধীর মনে মনে হিসেব কষে। আমি তখনই বুঝতে পারি এর পর ও কি বলবে। বলবে,

দেড় বছরের বড়, আমার সাড়ে তেত্রিশ, প্রশান্তর তেত্রিশ বছর সাত মাস, কিন্তু তাতে কি, ইচ্ছে করলে আমি ওকে নার্সিং হোমে টেনে আনতে পারিনে ভেবেছ? দেড় বছরের বড় তাতে কি?

একদিন ওই জবাব দিয়েছিল। হাতে আমার সেদিন কি একটা ছিল, জোরে ছুঁড়ে মেরে রণে ভঙ্গ দিয়েছিলাম। তারপর থেকে মৈত্রেয়ীর প্রসঙ্গে ওকে বয়েসের হিসেব করতে দেখলে আমাকে পালাতেই হয়।

মাঝে মাঝে আমার অবাকও লাগে। চটুল চপল স্বভাব বটে লোকটার, আমাকে বাদ দিলে অন্য সব ডাক্তারের অল্প-বয়সী স্ত্রীদের ছেড়ে মৈত্রেয়ীর পিছনেই বা ও এভাবে লেগে আছে কেন! আমার সঙ্গে যে লাগে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। আর কারো কথা জানি না, আমার মনে অন্তত এতটুকু দাগ পড়ে না। কিন্তু ওই মহিলা বয়সেই শুধু দেড় বছরের বড় নয় এদের থেকে, কোনোরকম স্থূল রসিকতা তাঁর দু'চক্ষের বিষ। আর এই জন্যেই সুধীর দত্তর নাম শুনতে পারে না পর্যন্ত। অথচ তাঁকে দেখলেই শয়তানি যেন মাথায় চড়ে বসে ওর।

তাঁর স্বামী ডক্টর বোসকে অল্পবয়সী ডাক্তাররা সকলেই পছন্দ করে। অতবড় হার্ট স্পেশালিস্ট, উপার্জনও প্রচুর। কিন্তু জুনিয়ার নামী ডাক্তারদের সঙ্গে সম-বয়সীর মতো মিশুক ব্যবহার তাঁর। তাদের তিনি দাদা। তাদের স্ত্রীদেরও। সুধীর যত বাচালই হোক, ওই ভদ্রলোককে অসম্মান করতে দেখেনি কখনো। কিন্তু তাঁর এই স্ত্রী-টি যেন সর্বদাই ওর বেপরোয়া রসিকতার একটা বড় শিকার।

ঘটা করে বড় নিঃশ্বাস ফেলে সুধীর একদিন বলেছিল, ভদ্রলোক দুনিয়ার মেয়ে-পুরুষের বুক। চষে বেড়াচ্ছেন—কেবল নিজের স্ত্রী-টির ছাড়া—কপালে দুঃখ আছে।

হার্ট স্পেশালিস্ট, অতএব মেয়ে-পুরুষের বুক চষে বেড়াচ্ছেন। মুখের ভাষাও স্বভাবের মতোই চাঁছা-ছোলা। জিজ্ঞাসা করলাম, কি রকম?

কি রকম আবার কি; নিজের বউয়ের বুকের খবর রাখেন? রাখলে অতল রহস্যের মধ্যে পড়ে খাবি খেতেন।

ওর ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর বউয়ের বুকের খবর তুমি রাখো কি করে?

এই গোছের কথা বলেও তৃপ্তি শুনেও তৃপ্তি যেন। বন্ধুর দিকে ফিরে একবার চোখ নাচিয়ে তারিফ করে নিল, অর্থাৎ দলে ভিড়ছে। তারপর সাদা মুখ করে জবাব দিল, আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি হোলাম গিয়ে যাকে বলে অনুভব জ্ঞানী।

মৈত্রেয়ী বোসকে মনে মনে আমিও যে খুব সুচক্ষে দেখতাম তা নয়। সেও ওই দস্যিটা অর্থাৎ সুধীরের জন্যেই। নইলে, আমার আটাশ চলছে এখন, মহিলা কম করে সাত বছরের বড় আমার থেকে। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো রকমের রেষারেষি থাকার কথা নয়। কিন্তু অত বড় ডাক্তারের বউ হয়েও তাঁর ভিতরকার মাস্টারটি অবসর নেয়নি এখনো। কোনো ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি দেখলেই তাঁর নীতির কড়া চক্ষু সেদিকে যেন একখানা ছুরি উঁচিয়ে ধাওয়া করবে। সুধীরের সঙ্গে আমার এতটা মাখামাখি তাঁর চক্ষুশূল। তাঁর বিবেচনায় সুধীর দত্ত একটা স্কাউনড্রেল! আমার স্বামী তাঁর স্বামীটির প্রিয়পাত্র এবং স্নেহের পাত্র। অতএব আমার ভালো-মন্দ নিয়েও তাঁর মাথা ঘামানোর অধিকার আছে। সেই অধিকারের জোরে আমার আর সুধীরের সম্পর্কে অনেকের কাছে মাঝে-মধ্যে দুই একটা-বেফাঁস উক্তিও করে থাকেন। বলাবাহুল্য, অতিরঞ্জিত আকারে সে-সব আবার আমাদের কানে আসে। শুনলে মনে হবে আমার জন্য মৈত্রেয়ী বোসের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

বন্ধুর বউ নিয়ে ভেগে পড়া নাকি সভ্য মানুষের অমোঘ এবং আদিমতম প্রবৃত্তি। প্রশ্রয় পেলে শতকরা নব্বুইটি ক্ষেত্রে আগুন জ্বলেই থাকে। মৈত্রেয়ীর মন্তব্য, প্রশান্তটা বোকা, আর আমি ভালো মেয়ে সুধীরের মতো একটা স্কাউনড্রেলের খপ্পরে পড়ে কবে না ভেসে যাই।

ভেসে যাই বা না যাই, এ-রকম নীতির বচন শুনতে কার ভালো লাগে? আর সুধীরও এই জন্যেই তাঁর সামনে একবার আমাকে পেলেই হল। এমন কাণ্ড শুরু করবে যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত সত্যি সত্যি রেগে গিয়ে ওর মাথায় আর পিঠে দুই-এক ঘা বসিয়েও দিয়েছি—কিন্তু ওর যেন তখন উন্মাদ দশা।

যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছি, তার মাস দেড়েক আগে ডক্টর রথীন খাশনবিশের বাড়িতে একটা বড় পার্টি ছিল। রথীন খাশনবিশ অমল বোসের সম-বয়সী। জেনারেল ফিজিশিয়ান হিসাবে তাঁর নামডাক আর পসার হার্ট স্পেশালিস্ট অমল বোসের থেকে কম নয়। ওই ভদ্রলোক আবার একটু বেশি রসিক আর এলেমদার মানুষ। এমনি ডিনার হোক বা বুফে ডিনার হোক, তাঁর বাড়িতে পার্টি হলে রঙিন জল অর্থাৎ ড্রিঙ্কস্-এর ঢালা ব্যবস্থা থাকবেই। মহিলারা সকলেই সফ্ট ড্রিঙ্ক-এর খদ্দের, কিন্তু কি কারণে জানি না, তাঁর বাড়ির পার্টিতে উপস্থিত থাকার আগ্রহ তাদেরও কম নয়।

সুধীরের ভয়ে আমি প্রথমে যাবই না ঘোষণা করেছিলাম। সঙ্কল্প টিকবে না তাও ভালোই জানতাম। সময় হলে টেনে হিঁচড়ে ও আমাকে ঠিক গাড়িতে নিয়ে তুলবে। অতএব সন্ধ্যার পর থেকে ওর ওপর আমার হম্বি-তম্বি চলেছিল। এতটুকু বে-চাল দেখলে আমি সোজা বাড়ি চলে আসব বলে অনেকবার শাসিয়েছি। ও নিঃশব্দে সিগারেট টেনেছে আর দার্শনিকের চোখে আমাকে দেখেছে। শেষে যেন বিরক্ত হয়েই বন্ধুর উদ্দেশে বলেছে, তোর বউটার বারোটা বেজে গেছে, বেচালের লোভে আমাকে সেই থেকে কি-রকম উসকে চলেছে দেখেছিস্?

থতমত খেয়ে আমি হেসে ফেলেছিলাম। সত্যি সেই থেকে ওকে এক-তরফাই শাসন করে চলেছি আমি।

গাড়িতে উঠে নিজের কর্তার উদ্দেশে ঘাড় ফিরিয়ে (ঘাড় ফিরিয়ে কারণ আমি সামনে সুধীরের পাশে বসেছি, সুধীর চালক, তারই ফিয়েটটাতে চলেছি, কর্তা পিছনের আসনে) ভ্রূকুটি করেছি, মনের আনন্দে খুশিমতো ছাই ভস্ম গেলো তো ভালো হবে না, একবারের বেশি দু'বার গেলাস হাতে নিতে দেখলে রাত্তিরে ঘরে ঢুকতে দেব না বলে দিলাম।

এদিক থেকে গম্ভীর মুখে সুধীর জিজ্ঞাসা করল, আমি যদি একবারও গেলাস হাতে না নিই?

জবাবে আমি ওর হাঁটুতে কষে একটা চিমটি বসাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্যান্টের ওপর দিয়ে কত আর জোরে লাগবে। তেমনি গম্ভীর মনোযোগে গাড়ি চালাতে চালাতে ও মন্তব্য করল, মধুর মধুর!

বিপাক আর কাকে বলে! খাশনবিশের বাড়ির দোরে গাড়ি থামতেই দেখি সামনের গাড়ি থেকে নামছেন অমল বোস আর মৈত্রেয়ী বোস। সুধীরের গাড়িতে সুধীরের পাশে আমাকে দেখে মৈত্রেয়ী বোসের তেরছা চোখ আর একটু তেরছা হল। গম্ভীর মুখে কয়েক পা এগিয়ে গেল সে। দাদা অর্থাৎ অমল বোস অবশ্য আমাদের হাসি মুখে আপ্যায়ন জানালেন। সুধীরকে বললেন, এই যে, তুমি না হলে পার্টি জমে!

খাশনবিশ থাকেন তিন তলার মস্ত ফ্ল্যাটে। সকলে একসঙ্গে লিফট-এর দিকে এগোলাম। আর সেই ফাঁকে শেষবারের মতো চোখ রাঙিয়ে রাখলাম! অর্থাৎ বেচাল দেখলে রক্ষে রাখব না।

বহুক্ষণ পর্যন্ত শান্তশিষ্ট হয়েই বসেছিল সুধীর। তাতেও অস্বস্তি আমার। মাথার মধ্যে কিছু একটা মতলব ঘুরপাক খেতে থাকলে ওই রকম ভালো মানুষের মুখ দেখি। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যেতে আমার সন্দেহ কমে আসতে লাগল। ওকে চুপচাপ দেখে অনেকে উসকে দিতে চেষ্টা করেছে, বলেছে, এমন নিরামিষ মুখ কেন হে? কেউ বা আমাকেই জিজ্ঞাসা করেছে, সুধীরের এ-রকম অফ্ মুড্ দেখছি, কি ব্যাপার?

আসর বসেছিল সামনে মস্ত হল্ ঘরে। চারদিক জুড়ে সোফাসেটি-ডিভান পাতা। মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটাতে নরম গালচে বিছানো। সেখানে একটা সেণ্টার টেবিলে স্তূপীকৃত সৌখিন ফুল। যেদিকে সুধীর সে তার উলটো দিকের কোনাকুনি অমল বোস আর মৈত্রেয়ী বোস বসেছেন। মেয়েদের হাতে সফট্ ড্রিংক-এর গেলাস, পুরুষদের হাতে অন্য জিনিস। মেয়েরা বেশির ভাগ কথাবার্তার ফাঁকে-ফাঁকে সকৌতুকে চারদিক দেখে নিচ্ছে। পুরুষদের হাতে ওই গেলাসগুলো থাকার দরুন ভিতরে ভিতরে অনেকে মজার খোরাক খুঁজছে।

সুধীর কতবার গেলাস বদল করেছে আমি ঠিক খেয়াল করিনি। যতবার চোখে পড়েছে ওর গেলাস মাঝামাঝি ভরতি দেখেছি। ও সিগারেট টানছে আর দার্শনিকের মতো মাঝে মাঝে ঘরের ছাদ দেখছে।

আমি এক-একবার উঠে মিসেস খাশনবিশ অর্থাৎ দীপালী খাশনবিশকে একটু-আধটু সাহায্য করার চেষ্টায় ভিতরের ঘরে যাচ্ছিলাম। তিনি এক-একবার অতিথি সম্বর্ধনায় আসছেন, বসে দু'চার মিনিট কথা বলছেন আবার উঠে বুফের তদারকে যাচ্ছেন।

ডিনারের ডাক পড়তে আধঘন্টাখানেক বাকি তখনো। দীপালী খাশনবিশের সঙ্গে আমি ওদিকের ঘর থেকে ভারী পরদা ঠেলে গালচে পেরিয়ে নিজের সোফার দিকে এগোতেই ও-ধারের সোফা থেকে হঠাৎ সুধীর উঠে দাঁড়াল।

দাঁড়াও!

পরিবেশের সঙ্গে বেমানান হুকুমের মতোই গুরু-গম্ভীর শোনালো প্রায়। আমি হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সকলের জোড়া-জোড়া চোখ আমাদের দিকে।

লম্বা পা ফেলে গালচের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে সুধীর সোজা আমার হাত ধরল। তেমনি গম্ভীর মুখেই ফুলের টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলো। আমি হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে চাপা তর্জন করে উঠলাম, আঃ কি হচ্ছে!

ওর ভ্রূক্ষেপও নেই। শক্ত হাতে হাত ধরে আছে, অন্য হাতে বড়সড় একটা ফুল তুলে নিয়ে আমার মাথায় গুঁজে দিল, তেমনি আর একটা ফুল নিজের বুকের বোতামে। তারপর সভাজনদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।—লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এখানে অনেকেই বলছেন অনুষ্ঠান সে-রকম জম-জমাট হয়ে উঠছে না। সো উই উইল গিভ ইউ সামথিং—আমি এবং আপনাদের প্রিয় লেখিকা মিসেস চন্দ্রাণী রায় একটা নাচ দেখাব—এ পারফেক্ট ড্রইংরুম ড্যান্স, এতদিন এ নাচের একমাত্র দর্শক ছিলেন মিসেস রায়ের হাসব্যাণ্ড ডক্টর প্রশান্ত রায়—আজ আপনারাও দেখবে, আশা করি ভালো লাগবে।

আমি রেগে গিয়ে হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে একটু জোরেই বলে উঠলাম, ছাড়ো, ভালো হবে না বলছি, ইয়ারকির আর জায়গা পাও না!

কিন্তু তার আগেই অনেকের সোৎসাহ কলরবে আমার গলা ডুবে গেল। আমার অনিচ্ছা ভেবেই তারা আরো চেঁচামেচি করতে লাগল, প্লীজ, মিসেস রায়, আমাদের বঞ্চিত করবেন না—ইটস সচ এ সার প্রাইজ—

হাতটা শক্ত মুঠোতে ধরা, আমার দিকে চেয়ে অমায়িক হেসে সুধীর বলল, লজ্জা কি, এত কষ্ট করে শিখলাম শুধু নিজেরা নাচব আর ওই একজন দেখবে বলে!

ওর দ্বিতীয় হাতটা অনায়াসে আমার কাঁধের ওপর উঠে এলো। কথা না বাড়িয়ে এবার নাচ শুরু করলেই হয় যেন।

রাগে আর লজ্জায় আমার ঘেমে ওঠার দাখিল। সেই মুহূর্তের মধ্যেই দুজনের দিকে চোখ গেছে আমার। একজন ওর প্রাণের বন্ধু—সেও নির্লজ্জের মতো হাসছে, আর একজন মৈত্রেয়ী বোস। তাঁর বিস্ফারিত কঠিন দুটো চোখ আমার মুখের সঙ্গে আটকে আছে যেন। শেষবারের মতো জোরেই ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে আর সেই সঙ্গে দাঁত কড়মড় করে অস্ফুট স্বরে বললাম, ছাড়ো বলছি, ভালো হবে না, অভদ্র ইতর কোথাকার—

ছাড়ানো গেল না, অন্য হাতটাও থাবার মতো আমার কাঁধে চেপে বসে আছে। ওই একটু টানা-হেঁচড়ার ফলে দৃশ্যটা আরো বেশি উপভোগ্য ঠেকছে অনেকের চোখেই।

লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আপনাদের প্রিয় লেখিকার এত লোকের সামনে নাচতে আপত্তি। রেগে গিয়ে সাহিত্যিকের ভাষা ভুলে আপনাদের কানের অগোচরে তিনি আমাকে অভদ্র বলেছেন, ইতর বলেছেন। এ-পর্যন্ত আমি মাত্র চার গেলাস উড়িয়েছি —এই অবস্থায় উলটে রাগের মাথায় আমি যদি বে-চাল কিছু করে বসি সেটা আমার দোষ হবে না ড্রিংক-এর দোষ হবে?

হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল একটা। রসিকতায় উচ্ছল হয়ে উঠল অনেক মেয়েরা পর্যন্ত। মেয়ে-পুরুষের সমবেত কলরব শোনা গেল, আপনার কিচ্ছু দোষ হবে না—সব দোষ ড্রিংক-এর ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। চন্দ্রাণী রায় নাচতে রাজি না হলে ওই গালাগালের জবাবে আপনারও রাগ করার রাইট আছে। ইত্যাদি—

এই পর্যায়ে সুধীর ইচ্ছে করেই হাতের মুঠো ঢিলে করেছিল বোধ হয়। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি সোফায় এসে ধুপ করে বসে পড়লাম। হাঁপ ধরে গেছে। ভিতরে ভিতরে ঘামছিও। তরল কলরবে হলঘর মুখরিত তখনো। আমি কারো দিকে ভালো করে তাকাতে পারছি না। অন্য লোকের সঙ্গে ঘরের মানুষটারও হাসি দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। ওদিকে সুধীর সোফায় ফিরে গিয়ে আগের মতোই গম্ভীর মুখে গেলাস তুলে নিয়েছে।

ও যে একটা গেলাসও শেষ করেনি তাতে আর আমার একটুও সন্দেহ ছিল না।

এরপর তিন চার দিন আর সুধীরের দেখা নেই। কেন বুঝতেই পারছি। আক্কেল দেবার জন্য আমিও চুপ মেরে আছি। একবারও ডাকিনি। তার বন্ধু হেসে হেসে আমাকে একটু নরম করতে চেষ্টা করছে, তোমার ভয়ে আর এ-দিক মাড়াচ্ছে না, বুঝলে? রোজই জিজ্ঞাসা করে বাড়ির ওয়েদার কেমন। একবার ডাকো না টেলিফোনে—

মুখের দিকে চেয়ে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে ভরসা পায়নি। বন্ধুর হয়ে সাফাইও গেয়েছে, মৈত্রেয়ী বোসের জন্যেই ওর মাথায় এই দুষ্টুমি চেপেছিল, তুমি সোফা ছেড়ে উঠলে বা একটু নড়লে-চড়লেও সে নাকি দূর থেকে শ্যেনদৃষ্টিতে সুধীরকে পাহারা দিচ্ছিল—দেখছিল ওর চোখ তোমার দিকে কিনা—

চার দিন বাদে মনে মনে আমিই হাল ছাড়লাম। ওই দস্যিকে চার দিন না দেখা চার যুগ না দেখার সামিল। ও যেন দক্ষিণের ঝড়ো বাতাস। দরজা বন্ধ করলে গুমোট। খুললে বিস্রস্ত হবার ভয়ে ধড়-ফড়। তবু সামলে-সুমলে থাকার দায় নিয়ে দরজা খোলা না রেখে উপায় নেই।

মাসের মধ্যে প্রায় বিশ দিন দু'বেলা এখানে আহার বরাদ্দ তার। সে সময়েই বেশি খারাপ লেগেছে কটা দিন। এক একদিন কি যে কাণ্ড করে ঠিক নেই। মুখ ফিরিয়ে হয়ত বেয়ারাকে কিছু বলছি, ফিরে দেখি আমার ডিসের ভালো ভালো কিছু খাবার উধাও। কোনোদিন বা ডিসসুদ্ধ উধাও।

একদিন খাওয়া ফেলে টেলিফোন ধরতে গিয়ে ফিরে এসে দেখি, সুধীরও খাওয়া ভুলে গভীর মনোযোগে আমার নতুন লেখার খাতাটা পড়ছে। আর আমার স্বামীটি তেমনি গম্ভীর মনোযোগে ডিসের খাবার নাড়াচাড়া করছে। সুধীরের হাতে আমার লেখার খাতা দেখলেই ভয় ধরে—টিকাটিপ্পনী কেটে অস্থির করে ছাড়ে। এ লেখাটা সবে শুরু করেছি, তিরিশ পাতাও এগোয়নি—এরই মধ্যে এত মন দেবার মতো ও কি রস পেল বুঝলাম না। ধমকের সুরে বলেছিলাম, আবার এটা টেনে বার করেছ?

জবাব না দিয়ে এবং খাওয়া ভুলে তেমনি পড়তেই থাকল। এদিক থেকে তার বন্ধু বলল, তোমার এ লেখাটা অদ্ভুত ভালো হয়েছে ও বলছিল—

লেখক বা লেখিকা মাত্রে নিজের লেখা সম্পর্কে দুর্বলতা একটু আছেই। আমার অন্তত আছে। ভালো বললে ভালো লাগে। মন্দ বললে খারাপ লাগে, অনেক সময় রাগ পর্যন্ত হয়। সুধীরের কথা আমি ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না, কারণ প্রশংসার কোটিং মাখিয়ে সে-ই আমার লেখার সব থেকে বেশি নিন্দে করে। সেই লোক অবিমিশ্র ভালো বলছে শুনে কৌতূহল হল। ঝুঁকে দেখতে গেলাম, কোন্ কোন্ জায়গায় পড়ছে।

ও খাতাটা নিয়ে চেয়ারে ঠেস দিতে দিতে গম্ভীর মুখে বলল, ডিস্টার্ব করো না, সত্যি ভালো লাগছে।

আধ মিনিটের মধ্যে মুখ তুলে বন্ধুর দিকে তাকালো। —শুনবি?

সে ভালো মুখ করে মাথা নাড়ল। আমি বাধা দিতে চেষ্টা করলাম, আগে খেয়ে নাও তো—

মনে মনে নিজেরও আশা এ বইটা ভালোই উৎরোবে।

দাঁড়াও। গড়গড় করে পড়ে চলল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই চক্ষু কপালে।

...'আমি চন্দ্রাণী। চাঁদের মতোই আমার বুকে কলঙ্ক আঁকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও চাঁদকে তোমরা দু'চোখ ভরে দেখো। কিন্তু চন্দ্রাণীর কলঙ্ক গোপন। কারণ সেটা দেখলে তোমরা মুখ ফেরাবে—কু কথায়

পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। তাই আমার কলঙ্ক গোপন। কিন্তু এই গোপনতার ব্যথা অষ্ট-প্রহর আমার বুকে বাজছে। কেন, কেন আমি গোপনতার খাঁচায় আটকা পড়ে থাকব। কেন আমি মুক্ত বিহঙ্গের মতো নিজেকে মেলে ছড়িয়ে দিতে পারব না? বসন্ত মধ্যাহ্নে বিরহকাতর কোকিলের মতো আমি যখন প্রিয়কে ডেকে বেড়াই, তখন আমার এক রূপ, বনের বাঘিনী হয়ে প্রিয়কে যখন ডাকি তখন আর এক রূপ, আবার চন্দ্রাণী হয়ে যখন চকোরকে ভোলাতে চাই—সেও আমারই এক ভিন্ন রূপ। আমার এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভিন্ন প্রেমিকদের দেখলেই তোমরা আমার মধ্যে কলঙ্কের ছড়াছড়ি দেখবে। কিন্তু আমি কি করব? আমি যখন কোকিল তখন কি বনের বাঘকে ডাকব, না যখন বাঘিনী তখনো চকোরের মতো চাঁদের দিকে তাকাবো? কিন্তু এই গোপনতার ব্যথা অসহ্য, তাই আজ আমি সমস্ত লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে চন্দ্রাণীর কলঙ্ক-কথা শোনাতে বসেছি।'

ওয়াণ্ডার ফুল!

খাতাটা শব্দ করে টেবিলের ওপর ফেলে খাবার ডিসটা সামনে টেনে নিল। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম খানিক। এক মেয়ের জবানবন্দীর অনেকটা ওই সুরেই এ-লেখাটা আরম্ভ করেছিলাম বটে, আমার কতগুলো শব্দ-বন্ধও উলটে-পালটে তুলে নিয়েছে, কিন্তু ওই লেখার বা ওই গোছের বিষয়ের ধার-কাছ দিয়েও আমি যাইনি। আমার লেখা নয় জানি, কিন্তু মাথা থেকে বানিয়ে ও-রকম গড়গড় করে পড়ে গেল কি করে!

খাতাটা টেনে নিয়ে খুললাম। তারপর চক্ষু আরো স্থির আমার। গোটা গোটা অক্ষরে এক পাতা ভরতি ওই লেখাই বটে। একটা আলগা পাতায় ওই সব ছাইভস্ম লিখে আমার লেখার পরে আঠা দিয়ে জুড়ে রেখেছে।

রাগ করে সেদিন খাতাটা জোরেই ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিলাম।। কিন্তু পরে ওর ওই লেখাটা যত্ন করেই রেখে দিয়েছি, ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও ছিঁড়িনি।

এলে এই রকমই প্রতিটি মুহূর্ত ভরাট করে রাখে যেন। সেই লোক পর পর চার দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকলে কেমন লাগে? তার ওপর যে পেটুক—পেট ভরে খাচ্ছে-দাচ্ছে কিনা তাই বা কে জানে!

টেলিফোন করব ভাবছিলাম। ওদিকে বিকেলের দিকে নার্সিং হোমে বেরুবার আগে নিজেই বলল, দেখি আজ যদি সুধীরটাকে ধরে আনতে পারি—ওর আবার উলটো গোঁ, তুমি না ডাকা পর্যন্ত আসবেই না।

আমি বললাম, ওকে বোলো এরপর আর ওর মাথার একটা চুলও আস্ত থাকবে না।

প্রকারান্তরে ডাকাই হল। সত্যি কথা বলতে কি, এখন যতবার ওই পার্টির ব্যাপারটা মনে পড়ছে, রাগের বদলে বরং হাসিই পাচ্ছে আমার।

কিন্তু সেই বিকেলেই হাসির ওপর যেন কালি ঢেলে দিয়ে গেল মিসেস দীপালী খাশনবিশ। আসে না বড়, হঠাৎ গাড়ি নিয়ে সেই বিকেলেই হাজির। পার্টির পরদিনই টেলিফোন করেছিলেন, বলেছিলেন, অনেক মজার মজার কথা আছে—মৈত্রেয়ী বোসের সে-কি রাগ তোমার ওপর, দেখা হলে বলব'খন।

তাঁকে দেখেই বুঝলাম মজার কথা বলার তাগিদে এসেছেন। মৈত্রেয়ী বোসের সঙ্গে দীপালী খাশনবিশের বাইরে ভাব খুব—কিন্তু ভিতরের রেষারেষির খবর সকলেই জানে। দীপালী খাশনবিশ এম.এ., বি. টি., মৈত্রেয়ী বোস এম. এ., কিন্তু সঙ্গে বিলেতের ডিপ্লোমা। প্রাকবিবাহ জীবনে দীপালী ছিলেন ইস্কুলের মাস্টার, আর মৈত্রেয়ী বোস কলেজের। এখন দুজনেরই বড় অবস্থা, তবু তার মধ্যেই জেনারেল ফিজিসিয়ান হিসেবে ডক্টর খাশনবিশের পসার একটু বেশি এ-কথা যদি কেউ আভাসেও ব্যক্ত করে স্ত্রীর মুখখানা অমল বোস সেদিন থমথমে দেখবেনই। আবার স্পেশালিস্ট হিসেবে অমল বোসের তুলনা নেই এ-কথা শুনলে দীপালী খাশনবিশও তাঁর ভদ্রলোককে বরাদ্দের বাড়তি দুই-একটা মুখ ঝামটা দিয়ে থাকেন শুনেছি। অবশ্য এই সবই আবার সুধীরের উক্তি।

দীপালী খাশনবিশ ঘরে পা দিয়েই বললেন, বেশিক্ষণ বসার উপায় নেই, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন একবার নেমে গেলেন, বাড়ি পৌঁছেই তাঁর প্রভুটির কাছে গাড়ি পাঠাতে হবে। কিন্তু উঠলেন ঘড়ি

ধরে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে। তার মধ্যে একদফা কফি আর দু-দফা পান খেলেন। আমার নতুন লেখা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন। আর আসল প্রসঙ্গের দিকে আমি ঘেঁষছি না দেখে বার কয়েক উসখুস করে শেষে নিজেই তুললেন কথাটা। —আচ্ছা, সুধীরের সঙ্গে কি সত্যিই তুমি বাড়িতে নাচো নাকি?

আমি হাসি মুখেই চেয়ে রইলাম খানিক, তারপর ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম,আপনার কি মনে হয়?

আমার তো একটুও বিশ্বাস হয় না, সুধীরটা রাজ্যের ফাজিল কে আর না জানে —কিন্তু মিসেস বোস সকলকে ওই কথা বলে বেড়াচ্ছেন, নিশ্চয় নাচে ওরা। সেদিন তোমার মুখ দেখেই নাকি বুঝেছেন ধরা পড়ে গেছ—ওঁর ভদ্রলোক হার্ট স্পেশালিস্ট উনি তো তাঁর ওপর দিয়ে মুখ স্পেশালিস্ট। মদের ঝোঁকে কেউ নাকি কখ্খনো মিথ্যে কথা বলে না, মিসেস বোসের বিশ্বাস সুধীর মদের ঝোঁকে গোপন ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছে আর সেই জন্যেই তোমার সেদিন ওইরকম ধড়ফড় অবস্থা। তাঁর মতে তুমি সেয়ানা মেয়ে কিন্তু প্রশান্ত হল যাকে বলে পয়লা নম্বরের আহম্মক—তুমি তাকে চোখে ঠুলি পরিয়ে চালাচ্ছ।

আমি হাসতেই চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার রাগ হচ্ছিল। যিনি বলছেন, যার সম্পর্কে বলছেন আর যার জন্যে বলছেন, সক্কলের ওপর।

বসে বসে আরো শুনতে হল। মিসেস বোস নাকি ওই একই কথা অনেককে বলেছেন, কিন্তু বাড়িতে সুধীরের সঙ্গে আমি নাচি এ এক উনি ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করেনি। তাতেই তাঁর আরো রাগ। বলেছেন, সত্যি না হলে ও-রকম ইতরামোর জবাবে চাবুক এনে চন্দ্রাণীর দু'ঘা বসিয়ে দেবার কথা—সে যার বাড়ি হোক, তিনি নিজে হলে অন্তত তাই করতেন। তার বদলে আমি কিনা ধরাপড়া আসামীর মতো কাঁপতে লাগলাম।

চার দিন বাদে সুধীর আমার কোন্ মেজাজের মুখে এসে পড়ল সেটা সহজ অনুমান সাপেক্ষ। চুল বাঁচাবার জন্য সেদিন আবার ঘটা করে মাথায় একটা রবারের সুইমিং ক্যাপ পরে এসেছিল।

কিছুতে আমাকে হাসাতে বা রাগাতে না পেরে শেষে বলল, তোমার রাগ এখনো পড়েনি তো আশ্বাস দিয়ে ডাকলে কেন?

আমি বললাম, পড়েছিল। মিসেস খাশনবিশ বিকেলে এসে সেটা আবার চড়িয়ে দিয়ে গেছেন। ওরা দুজনেই উৎসুক। কি তিনি বলে গেছেন তার আদ্যোপান্ত বললাম। বিশেষ করে চাবুকের কথাটা বার কয়েক জোর দিয়ে বললাম—তিনি হলে কি করতেন আর আমি কি করেছি।

আমার ঘরের লোক এ-সব কথা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার মানুষ। কিন্তু আমার মেজাজ বুঝেই চুপ করে থাকল। তাতেও আমার রাগ হতে লাগল। নিজের বউ সম্পর্কেও পুরুষ মানুষ অমন কানে তুলো গুঁজে আর পিঠে কুলো বেঁধে চললে কার সব সময় ভালো লাগে?

সুধীর মিটি মিটি হাসছিল।—এই ব্যাপার!...তা তাঁর ঘরে চাবুক-টাবুক আছে কিনা তুমি খবর রাখো?

জবাব না দিয়ে আমি তপ্ত চোখে তাকালাম ওর দিকে। সুধীর আবার বলল, আচ্ছা, তুমি এবারকার মতো আমাকে ক্ষমা করে ফেলে—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মৈত্রেয়ী বোসের চাবুকের জোর আমি যাচাই করব।

এরপর মাস দেড়েক কেটে গেছে। ওই ব্যাপারটা ততদিনে প্রায় ভুলেও গেছি। এর মধ্যে হঠাৎ আবার একটা অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণের ব্যাপার ঘটে গেল। অপ্রত্যাশিত কারণ, নিমন্ত্রণটা ডক্টর অমল বোসের বাড়িতে। উপলক্ষ তাঁদের বিয়ের নবম বার্ষিকীতে পদার্পণ। আমি অবাক এই জন্যে যে এর আগে আটবার করে তাঁদের বিয়ের দিন কেটে গেছে কেউ খবরও রাখে না। হঠাৎ এ-বারে এত ঘটনা কেন!

কেন, পরে শুনলাম। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা দুজনেরই একটু হাতটান দেখে অনেকেই তাঁদের ছেঁকে ধরার মতো একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল—কি করে ভালো-রকম কিছু টাকা খসানো যেতে পারে। কে একজন খবর বার করেছে ওমুক দিন ওঁদের বিয়ের দিন। ব্যস, বিয়ের দিনই সই।

স্নেহভাজন ডাক্তাররা সব দল বেঁধে ওঁদের বাড়ি গিয়ে হাজির। এবার ঘটা করে উৎসব করতে হবে এবং খাওয়াতে হবে, ছাড়ন-ছোড়ন নেই।

অগত্যা কর্তা-গিন্নী খুশি মুখে রাজী। খরচের মধ্যে একবার নেমে পড়ে আর তাঁরা কার্পণ্য করলেন না। অন্তরঙ্গ সকলকেই আমন্ত্রণ জানালেন। আর এক ড্রিংক্ বাদে খাওয়া-দাওয়ারও প্রচুর ব্যবস্থা করলেন।

সুধীরের নেমন্তন্ন হবে কি হবে না, আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু স্ত্রীর মনোভাব যেমনই হোক, ডক্টর বোস তাকে না ডেকে পারেন কি করে। ওর নেমন্তন্ন হয়েছে শোনামাত্র আমি বেঁকে বসলাম, যাব না, কিছুতেই যাব না।

সুধীরই হাসি মুখে তোয়াজ তোষামোদ করল আমাকে। বলল, তোমরা নিজেদের গাড়িতে যেও, আমি আলাদা যাব, আর কথা দিচ্ছি সেখানে গিয়ে তোমাকে চিনতেও পারব না। তাছাড়া তুমি না গেলে মৈত্রেয়ী বোস ধরেই নেবে তার ভয়ে গেলে না।

কথাটা সত্যি। তাকে কেয়ার করি না এটুকু বোঝাবার জন্যেও যাওয়া দরকার।

এই উৎসবেও হৈ-চৈ মন্দ হল না। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার এক-প্রস্থ হালকা জটলা শুরু হল। কারো কারো প্রস্তাব বছরের এই দিনের উৎসবটা এবার থেকে পাকাপোক্ত হোক।

ডক্টর এবং মিসেস বোস দুজনেই হাসছেন, তাঁরা কথা দিতে রাজী নন। খাবার আগে পর্যন্ত আমি সারাক্ষণ সুধীরের দিকে চোখ রেখেছিলাম, মৈত্রেয়ী বোসের চাবুকের জোর যাচাই করবে বলেছিল, কি আবার করে বসে আমার সেই শংকা। কিন্তু শুরু থেকে খাওয়া-দাওয়ার পরে পর্যন্ত ওকে একধারে একেবারে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে আমি অনেকটাই নিশ্চিন্ত। অনেকেই তাকে তার নিজস্ব ফর্ম-এ আনতে চেষ্টা করে হার মেনে সরে গেছে।

আমি উঠে পড়ার মতলবে ঘরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় ছিলাম। সে মশগুল হয়ে আর এক ডাক্তারকে তার নার্সিংহোম এক্সটেনশনের প্ল্যান বুঝিয়ে তারিফ পাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ এক সঙ্গে দোতলার সমস্ত আলো টুপকরে নিভে গেল। দিনের মতো আলো ঝলমল করছিল, সব একসঙ্গে নিভে যেতে ঘুটঘুটি অন্ধকার।

দুই এক মুহূর্তের জন্য হতচকিত অবস্থা সকলের। তারপরেই হালকা হৈ-চৈ চেঁচামেচি। একজন রসিক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠল, লেডিজ সাবধান! ডক্টর বোস বেয়ারাদের উদ্দেশে হাঁক পাড়তে লাগলেন। তাদের হুজুর-হুজুর শোনা গেল, কিন্তু মুখ দেখা যাচ্ছে না। আমার একবার মনে হল কোনো মেয়ে-গলার অস্ফুট কাতরোক্তি কানে এলো যেন একটু, তারপর আর কিছু ঠাওর করা গেল না। এ-দিক ও-দিকে ঘন অন্ধকার, সমস্বরে অনেকেই কথা কইছে, কি হতে পারে, কি করা যায় ইত্যাদি। ডক্টর বোসের গলাই বেশি শোনা যাচ্ছে, তিনি অন্ধকারেই ছোটাছুটি করে চাকর-বাকরের উদ্দেশে নির্দেশ ছুঁড়ছেন।

ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে এক সঙ্গে সব ক'টা আলো জ্বলে উঠল আবার। সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়ে শব্দ বার করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সকলে। ডক্টর বোসের আধ বয়সী পুরনো চাকর এসে জানালো, কি করে যেন মেন্ সুইচটা বন্ধ হয়ে গেছিল—

ডক্টর বোস ধমকে উঠলেন, মেন্ সুইচ আবার বন্ধ হবে কি করে, নিশ্চয় তোদের কোনো উজবুকের কাণ্ড।

এদিক থেকে একজন বলে উঠল, মিসেস বোস গেলেন কোথায়?

তাই তো! সকলেরই হালকা বিস্ময়, অন্ধকারের মধ্যে মিসেস বোস আবার গা-ঢাকা দিলেন কখন!

কোনোরকম ষষ্ঠ চেতনার ব্যাপার কিনা জানি না। চকিতে আমি সুধীরের সোফার দিকে তাকালাম। তারপর নিশ্চিন্ত অবশ্য। সে তেমনি সোফায় গা-ছেড়ে বসে আছে—চোখে ঝিমুনির ভাব একটু।

ডক্টর বোস সেই আধ-বয়সী চাকরকে হুকুম করলেন, মেমসাহেব কোথায় গেলেন দ্যাখ, এঁরা সব যাবেন এখন—

একটু বাদে মেমসাহেব এলেন। তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ বিমূঢ় সকলে। এই ক'টা মিনিটের মধ্যে ভিতরে বাইরে বিষম কিছু বিপর্যয় ঘটে গেছে যেন। পরনের সেই বেশ-বাসই একটু যেন বিস্রস্ত। চাউনি অস্বাভাবিক। মুখখানা লালচে, হঠাৎ বেশি ব্লাডপ্রেসার চড়লে যেমন হয়।

একটু ঘাবড়ে গিয়ে ডক্টর বোস জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গেছিলে?

আত্মস্থ নন যেন তখনো। জবাব না দিয়ে কয়েকজন ডাক্তারের মুখের ওপর দিয়ে তাঁর দৃষ্টিটা গিয়ে স্থির হল ওই কোণের দিকের সোফারওপর যেখানে ঢুলু-ঢুলু চোখে সুধীর দত্ত বসে। হাতের ওপর গাল রেখে সুধীর হাই তুলছে।

সেই কয়েক পলকের মধ্যে অনেকেরই মনে হল যা-ই ঘটে থাক তার সঙ্গে ওই এক লোকের যোগ আছে। আমার অন্তত মনে হল, আর এক অজানা আশংকায় বুকের ভেতরটা গুর-গুর করতে লাগল।

ডক্টর খাশনবিশ এগিয়ে এলেন, কি হল মিসেস বোস, খারাপ লাগছে কিছু?

মৈত্রেয়ী বোস চমকে আত্মস্থ হলেন যেন। দেখলেন তাঁর ওপর জোড়া-জোড়া চোখ। সামলে নিতে চেষ্টা করলেন, হ্যাঁ, মাথাটা কি রকম ঘুরছে, দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে, আপনারা কিছু মনে করবেন না।

দু'হাত একবার কপালের দিকে তুলেই দ্রুত ভিতরে চলে গেলেন তিনি।

ঘর ভর্তি পুরুষদের মধ্যে মোটামুটি নামী ডাক্তার সকলেই। তাদের উদ্বেগ স্বাভাবিক এবং কি হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করাও স্বাভাবিক। ডক্টর বোসের কাছে কেউ ব্লাডপ্রেসারের খোঁজ নিলেন, কেউ বা ব্লাডসুগারের। কেউ গরমের ওপর দোষ চাপালেন, কেউ বা সকাল থেকে অত্যাধিক পরিশ্রমের ওপর। তারপর দু'মিনিটের মধ্যে ডক্টর বোসকে স্ত্রীর কাছে ঠেলে পাঠিয়ে সকলে বিদায় নিলেন। কিন্তু তলায় তলায় একটু দুর্বোধ্য খটকা অনেকের মনেই লেগে থাকল। বিদায় নিয়ে অনেকেই সুধীরের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকিয়েছেন—সব থেকে বেশি আমি। কিন্তু সে কোন্ ফাঁকে নেমে চলে গেছে।

ফেরার সময় প্রশান্ত (ঠাট্টা-বিদ্রূপের সময় ভিন্ন নাম নিয়ে আমি ডাকি না, কিন্তু নাম না করে লিখতে অসুবিধে—কতবার আর ঘরের লোক, ঘরের মানুষ করে বলব?) অবাক মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার বলো তো আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না—মহিলা সুধীরের দিকে অমন গেলবার মতো করে তাকালোই বা কেন?

এই কথাই আমিও ভাবছিলাম। আর বারবার সুধীরের সেই কথা মনে পড়ছিল, বলেছিল, তোমাকে কথা দিচ্ছি মৈত্রেয়ী বোসের চাবুকের জোর আমি দেখব। বললাম, সুধীরের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছু বোঝা যাবে না।

আশা করেছিলাম গিয়ে দেখব সে আমাদের ওখানেই বসে আছে। নেই। খানিক বাদে ওর ফ্ল্যাটে ফোন করলাম। টেলিফোন বেজেই গেল, কেউ ধরল না। আমার কেমন মনে হল কোনো বারে-টারে বসে মদ গিলছে। এক-এক সময় ওই রকম করে দেদার মদ গেলে। ঠিক কোন্ মানসিক অবস্থার সময়, সেটা আজও ধরতে পারিনি।

পরের দেড় ঘণ্টার মধ্যে আরো তিনবার ফোন করলাম। এনগেজ সিগন্যাল। অর্থাৎ রিসিভার নামিয়ে রেখেছে। এত রাতে এক আমরা ছাড়া অতক্ষণ ধরে ওর সঙ্গে কথা বলার মতো আর কেউ নেই।

পরদিনটা রবিবার। সমস্ত দিন নিপাত্তা। শুনলাম নার্সিংহোমেও যায়নি। সকালে প্রশান্ত ডক্টর বোসের বাড়িতে ফোন করেছিল। মিসেস বোসের সঙ্গে কথা হয়েছে। বলেছেন গরমে আর সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মাথাটা হঠাৎ প্রচণ্ড ঘুরে গেছিল, এখন সম্পূর্ণ ভালো আছেন। সকলকে ও-ভাবে অপ্রস্তুত করার জন্য লজ্জাও পাচ্ছেন বললেন। ইতিমধ্যে আরো অনেকে নাকি ফোন করে খবর নিয়েছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, বুঝলে কিছু?

না, বেশ স্বাভাবিক কথাবার্তাই তো!

সুধীর হাজির সেই সন্ধ্যার পর। চিরাচরিত হাসি-হাসি মুখ। যেন কিছুই হয়নি, কিছুই জানে না। জিজ্ঞাসা করল, কি খবর সব—

দোতলার বসার ঘরের সেটিতে বসল ধুপ করে। হাত দেড়েক ফারাকে ওই সেটিতেই আমিও বসলাম। পাশের সোফায় প্রশান্ত।

কি ব্যাপার? অবাক যেন একটু, এমন গা ঘেঁষে বসলে, নাচবে—টাচবে নাকি আমার সঙ্গে!

দেব এক থাপ্পড়। সমস্তদিন কোথায় ছিলে?

ওয়েজ জস্ট লোফিং—যত্রতত্র ঘুরে ঘুরে একটা ভবঘুরে ভাব আনার চেষ্টা করছিলাম।

কাল রাতে কোথায় ছিলে?

কেন, ঘরেই তো! পাঁচ পেগ মেরে এসে তোমার টেলিফোনের ফ্যাঁচফ্যাঁচারি ভয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখে একঘুমে রাত কাবার।

মুখের দিকে চেয়ে রইলাম খানিক। ওর ভেতর দেখতে চেষ্টা করছিলাম হয়ত। সুধীর বন্ধুর দিকে ফিরে তম্বি করে উঠল, শ্রীমতী এ-রকম কটাক্ষ-বাণে বিদ্ধ করলে তোকে আমি কোন্ দিন পথে বসাব বলে দিলাম!

বন্ধু পরিহাসের সুরে জবাব দিল, আমি তো পথে বসেই আছি।

ও-সবে কান না দিয়ে আমি চেয়েই আছি তেমনি। কাল ডক্টর বোসের বাড়ির মেন্ সুইচ অফ্ করেছিল কে, তুমি?

জবাব না দিয়ে হাসতে লাগল। সকালে মৈত্রেয়ী বোসের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হবার পর তার বন্ধুর কৌতূহল আর বিশেষ ছিল না। এবারেও সে-ও নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল।

আমি আবার বললাম, মেন্ সুইচ অফ্ করার পর কি হল?

কি আর হবে, মৈত্রেয়ী বোসের চাবুকের জোর দেখলাম একটু।

কি করে?

বেড়াল যেমন ইঁদুর মুখে নেয়, সেই রকম তাঁকে দু'হাতে পাঁজা কোলে করে তুলে নিয়ে।

তিনি চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন?

যাচ্ছিলেন, পারেননি।

কেন যেন আমার সমস্ত গা সিরসির করছিল, তবু জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম, তুমি আটকালে কি করে?

দুটো বাড়তি হাত যখন নেই তখন আর কি করে আটকানো যায় বলো—দাঁত দিয়ে ঠোঁট দিয়ে মুখ দিয়ে।

উত্তেজনায় পাশের লোকের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর দাখিল। আমারও সামলাতে সময় লাগল। সুধীর হাসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

তারপর সোজা শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধুপ করে গদিঅলা বিছানায় আছড়ে ফেললাম তাঁকে। বেরিয়ে আসার সময় দরজার ল্যাচটা টেনে দিয়ে এলাম।...আলো জ্বলতে দরজা-ধাক্কা শুনে চাকর-বাকর কেউ খুলে দিয়ে থাকবে।

দুজনেই আমরা স্তব্ধ খানিকক্ষণ। তারপর ওই কাণ্ড করেছিলাম। হঠাৎ ঝুঁকে দু'হাতে খাবলা দিয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে মাথাটা সবলে নিজের হাঁটুর কাছে টেনে এনে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেছিলাম।

এ-ই সুধীর দত্ত।

আমার স্বামী-রত্নটির মনে মনে ধারণা, সে কায়া আর বন্ধুটি তার ছায়া। সেই রকমই দেখে আসছে অনেকে। আমিও।

কিন্তু মানুষটা ডাকাত না আধা-পাগল না আর কিছু অনেক সময়েই আমি ভেবে পাই না।

দুই

সাধারণ গল্পের একজন নায়ক থাকে, একজন নায়িকা থাকে। আমার এ গল্প সাধারণ কিনা জানি না। কিন্তু নায়কটি অসাধারণ। যে-মানুষটা ডাকাত না আধ-পাগলা না আর কিছু অনেক সময়েই আমি ভেবে পাই না—নায়ক ওই একজন। সুধীর দত্ত।

কিন্তু নায়কের সন্ধান পাওয়া মাত্র আপনারা খুব স্বাভাবিকভাবেই নায়িকার খোঁজ করবেন। এইখানেই বিড়ম্বনা। না, তবু আপনাদের হতাশ করবে না। নায়িকাও আছে একজন। তার জন্য নায়িকার সংজ্ঞা-বদলের প্রশ্ন ওঠে উঠুক। নায়ক যেমন অসাধারণ, দুর্দম বেপরোয়া—নায়িকাটি ঠিক ততখানিই সাধারণ। নায়কের পাশে প্রায় নিষ্প্রভ। কিন্তু নায়ক তাকে নিষ্প্রভ হতে দেয়নি। শুনেছি সূর্যের দাক্ষিণ্যের আলোয় চন্দ্রের জীবন। এই নায়িকার জীবনেও এক সূর্য জ্বলছে। এই নায়িকা চন্দ্র নয়, চন্দ্রাণী।

আমি। চন্দ্রাণী রায়। পরস্ত্রী। বন্ধুর স্ত্রী।

আপনারা চমকে উঠবেন জানি।...অমনি সত্তা-নিঙড়ানো আর দুমড়ানো চমক খেয়েই এ-কাহিনীর আমি নায়িকা। এই জন্যেই বলছিলাম, নায়িকার সংজ্ঞা-বদলের প্রশ্ন ওঠে উঠুক।

ঠাট্টা করে সুধীর প্রায়ই বলত, নাম যদি করতে চাও আমাকে নিয়ে একটা গল্প লেখো দেখি। সব জলো, সব জলো—বাঁচতে চাও তো আমাকে ধরো।

কি কথাই বলেছিল! কলম নিয়ে বসেও সে-কথাই মনে পড়ছে, আর চোখের সামনে বার বার ঝাপসা দেখছি সব। নামের চিন্তা আর করি না। কিন্তু বাঁচার কথা ভাবি। ওকে ধরেই বেঁচে আছি! শুধু আমি কেন, আমার স্বামীও আজ ওকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে আছে। মুখে সে-কথা বলে না কখনো। কিন্তু আমি বুঝতে পারি। এখন আমার বয়েস বত্রিশ ছাড়িয়ে তেত্রিশে গড়িয়েছে। মফস্বল শহরে থাকি। প্রশান্ত রায় এখানকার বহু সাধারণ মানুষের হৃদয় মন জয় করে বসেছে এই ক'বছরের মধ্যেই। সরল গরীব মানুষেরা দীনবন্ধু বলে ওকে। ও হাসে আমার দিকে চেয়ে, আমি হাসি ওর দিকে চেয়ে। সূর্যের আলোর দাক্ষিণ্যে চাঁদ হাসে আর চন্দ্রাণী হাসে।

...আমাদের একটা ছেলে আছে বছর আড়াইয়ের। হাসিখুশির জ্যান্ত ডেলা একখানা। ওর হাসির মধ্যে আঁতি-পাতি করে আমি সুধীরের হাসি খুঁজি। মনে মনে অনেক সময় বলি, ওরে তুই সুধীর হ', সুধীর হ'—তোর কাছে তোর এই মা আর কিচ্ছু চাইবে না।

নাঃ। চোখে কি যেন ছাই হয়েছে আজ। কেবলই ঝাপসা দেখছি...এ কাহিনী যখন লিখছি সুধীর দত্ত আমার ধারে-কাছে নেই। অবশ্য খুব দূরে যে আছে তাও না। কলকাতায় গিয়ে সরকারি দপ্তরে একটু লেখালেখি করলেই ওর দেখা পেতে পারি। কিন্তু কলকাতা ছাড়ার পর সে-চেষ্টা আর করিনি। কেন করব? ওকে তো চোখ বুজলেই কাছে দেখতে পাই। চোখ চেয়েও পাই। তাছাড়া আর বছর দুইয়ের মধ্যে ও তো আসবেই এখানে। না এসে যাবে কোথায়? মাঝখান থেকে ছোটাছুটি করে আমি সময় নষ্ট করি কেন? সে-সময়টা বরং ওর যোগ্য নায়িকা হতে চেষ্টা করলে সার্থক।

...আমি বলতাম, তোমাকে নিয়ে গল্প লিখব মানে নায়ক তুমি?

মাথা নেড়ে জবাব দিত, তোমার হাতে পড়লে কি হবে জানি না —সামলাতে পারো যদি তুমি নিজেই উতরে যাবে।

চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, আর নায়িকা?

তুমি ছাড়া আর কে? একটু উইক চরিত্র হয়ে গেল বটে, তবে লেখক-লেখিকার হাতে না পড়লে বাস্তবের কোন নায়িকা আর স্ট্রং বলো! তারপর চিন্তাচ্ছন্নের মতো দু'চোখ পিটপিট করে একবার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে নিয়ে তারপর আবার আমার দিকে ফিরে বলেছিল, আধুনিক গল্পের রীতি অনুযায়ী নায়কের সঙ্গে নায়িকার একটা লটঘট বাঁধাবার খুব যদি লোভ হয় তো সাবধানে বাঁধিও—এ বেচারার না আবার নিজের বুকে স্টেথসকোপ বসাতে হয়।

হাসি পাচ্ছিল। কথাগুলো যেন সদ্য সামনে বসে বলছে। আর আমি সামনে বসে শুনছি! কিন্তু সেই মুহূর্তে বুকের ভিতরে ধড়ফড় করে উঠল কেমন। আমারই ভিতর থেকে কি যেন সব কথা ঠেলে উঠছে! কান পাতলে শোনা যাবে, এমন।...শোনা যাচ্ছে!

...সুধীর, তোমার নায়িকার সমস্ত সর্বনাশ তোমারই হাতে দুলছিল। তোমার সেই দিশেহারা নায়িকার চোখে যখন ধ্বংসের আগুন জ্বলছিল সেই চোখে যে একই সঙ্গে ওই সর্বনাশের আগুনও জ্বলে উঠেছিল সে আর তোমার থেকে ভালো কে জানে? তোমার হাতের একটা আঙুলের ইশারায় চোখের সামান্য একটু ইঙ্গিতে তোমার এই উইক নায়িকা জাহান্নমের বন্যায় কোন রসাতলে ভেসে যেতে পারত সেই বা তোমার থেকে ভালো আর কে জানত?

কিন্তু সুধীর, তুমি কি মানুষ?

তুমি ডাকাত না পাগল না আর কিছু?

ওই কলকাতার শহরেই দশ বছরের একটা মা-বাপ মরা দুরন্ত ছেলে তার থেকেও বারো বছরের বড় এক দাদার কাছে এক-এক সময় হাড়ভাঙা ঠ্যাঙানি খেত। সে এমন মার যে তার বর্ণনা শুনেও মাথা ঝিম ঝিম করত আমার।

সে-বর্ণনা শুনেছিলাম বিয়ের পরে। তার বন্ধুর মুখ থেকে। এখানে বলে রাখি, যে-রকম যোগাযোগ তাকে বিয়েটা আমার সেই হাড়-ভাঙা মার-খাওয়া ছেলেটার সঙ্গেই হতে পারত। হয়নি কেন, সেটা বিয়ের আগে খানিকটা বুঝেছিলাম। বিয়ের পরে সবটাই বুঝেছি।

সেই দুরন্ত দুর্দান্ত ছেলেটার নামই সুধীর। সুধীর দত্ত। ও নিজেই কত সময় হেসে বলেছে, এই নামটাই আমার জীবনের সব থেকে বড় পরিহাস, বুঝলে। এমন সুধীর আর দশ-বিশটা থাকলে বাংলা দেশটাকে একবার দেখে নিতাম।

ওর বাবা ছিলেন স্কুল মাস্টার। প্রশান্তকে বাড়িতেও পড়াতেন প্রশান্তর বাবার থেকে বয়সে অনেকটাই বড় ছিলেন ওর বাবা। দরিদ্রের প্রায় অচল সংসার। ভদ্রলোকের ছয় মেয়ে দুই ছেলে। প্রথম দুই মেয়ের পর বড় ছেলে, তারপর চার মেয়ের পরে আবার এই বেশি বয়সের ছোট ছেলে। এ ছাড়াও তাঁর ঘরে বিধমা মা আর বিধমা বোন। তারও আবার তিনটি ছেলেমেয়ে।

ছয় থেকে আট এই দুটো বছর কাছাকাছি বাড়িতে কলকাতায় কাটিয়েছে প্রশান্ত আর সুধীর। কাছাকাছি বাড়ি বটে, কিন্তু অবস্থার দিক থেকে বিরাট ফারাক। আলো বাতাস ঢোকে না এমন গলির মধ্যে তিনখানা ঘরের জীর্ণদশা বসত-বাড়ি সুধীরদের। তার ঠাকুরদার আমলের সে-বাড়ি সংস্কারের অভাবে সামান্য ঝড় জলেও মাথার ওপর ভেঙে পড়তে পারে এমন দশা। আর, ঠিক সেই গলির বাইরেই বড় রাস্তার ওপর বিশাল দোতলা ভাড়াটে দালান প্রশান্তদের। তার বাবা বড় সরকারি অফিসার—ওই পর্যায়ের অফিসারদের জন্য ওই বাড়িও সরকারের দখলে।

প্রশান্ত তার বাবার একমাত্র সন্তান। ছেলেবেলা থেকেই ওর প্রতি তিনি সচেতন ছিলেন। তাছাড়া ছোট ছেলেদের প্রতি বিশেষ ভাবে চোখ রাখাটা তাঁর পেশাগত ব্যাপারও ছিল। প্রশান্তকে যে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল সেখানকার এক মাস্টার সামনের গলিতে থাকেন শুনে আর তাঁর সম্পর্কে গোপনে একটু খবরাখবর নিয়ে খুশি হয়ে সেই ভদ্রলোককে তিনি ভালো মাইনের বাড়িতে বহাল করেছিলেন।

সেই দুটো বছর সুধীরও তার বাপের স্কুলে ফ্রি পড়ত। প্রশান্তর বয়সী, তার সঙ্গেই পড়ত। পড়ত বটে, কিন্তু ওই ছেলের প্রতি কখনো একটু বাড়তি মনোযোগ দেবার অবকাশ পেতেন না ওর বাবা। তাই প্রশান্তকে পড়বার সময় নিজের ছেলেকেও প্রায়ই সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। যদি পড়ানো শুনেও ছেলেটা কিছু শিখতে পারে। অবশ্য তার জন্যেও ভদ্রলোক প্রশান্তর বাবার অনুমতি নিয়েছিলেন। সত্যিকারের উদার মানুষ ছিলেন প্রশান্তর বাবা। শোনামাত্র বাপের সমস্যা বুঝে বলেছিলেন, ছি ছি, এ আবার একটা জিজ্ঞাসা করার কথা—নিশ্চয় নিয়ে আসবেন।

কিন্তু বাপের সঙ্গে সুধীর আসত অন্য লোভে। খাবার লোভে। সন্ধ্যায় এলে প্রশান্তর মা সুধীরের বাবার জন্য চা পাঠাতেন আর সুধীরের জন্যেও কিছু না কিছু খাবার পাঠাতেন। দিন কয়েক না যেতে

সুধীর প্রশান্তকে স্কুলে বলে দিল, তোর মাকে বলিস আমাকে আর একটু বেশি করে খাবার দিতে, স্কুল থেকে গিয়ে দু'মুঠো মুড়ি ছাড়া আর কিছু খেতে পাই না, বেজায় খিদে পায়—আর খবদ্দার, আমি বেশি করে খাবার দিতে বলেছি, বাবাকে বলবি না!

ওই বয়সে সুধীর পাড়ার আর স্কুলের সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মারামারিতে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। সেইজন্যে অন্য ছেলেরা ওকে সমীহ করত একটু। রাস্তায় ডাংগুলি আর মার্বেল খেলত। যাদের সঙ্গে খেলত তাদের সঙ্গে মারামারিটাও নৈমিত্তিক উপসংহার ছিল। একবার ডাংগুলির ডাণ্ডার ঘায়ে এক ছেলের তো মাথা ফাটিয়ে বসেছিল। তাই নিয়ে বাড়িতে ওর সে-কি নির্যাতন। প্রশান্তকেও খেলার জন্য ডাকত ও। কিন্তু রাস্তায় খেলার ব্যাপারে তার বাবার কড়া নিষেধ, তাই ইচ্ছে থাকলেও সে খেলতে আসতে পারত না। ঝগড়াঝাঁটি সুধীর প্রশান্তর সঙ্গেও করত, কিন্তু রাগ হলেও তার গায়ে হাত তুলত না। ওই বয়সেই ছেলেটা জানত, প্রশান্তর বাবা ওর বাবাকে মাস গেলে অনেক টাকা দেয়। আর বিকেলের খিদের জ্বালাটাও সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে গেলে তবে ঠাণ্ডা হয়।

স্কুলে পাশাপাশি বসা নিয়ে দুই বন্ধুতে একবার মতান্তর হয়েছিল। সুধীরের দাবি প্রশান্তকে তার পাশে বসতেই হবে, প্রশান্তর গোঁ সে কিছুতে বসবে না। কারণ বসলে সুধীর ওকে জ্বালাতন করে, মাস্টারমশায় ক্লাসে থাকার সময়েও নানারকম খুনসুটি করে। ধরা পড়লে দুজনকেই বকুনি খেতে হয়, দাঁড়িয়ে থাকতেও হয়। অতএব সে আর তার পাশে জীবনে বসবে না।

ছেলেদের মধ্যে সুধীরের রাগকে একমাত্র প্রশান্তই কেয়ার করে না। ওদের কড়া অঙ্কের মাস্টারের ক্লাস ছিল সেদিন। বাড়ির টাস্‌ক না আনলে শাস্তি পেতেই হবে, কোনো অজুহাতের ধার ধারেন না তিনি। বাচ্চা ছেলেগুলো যমের মতো ভয় করে তাঁকে। টিফিনের পরে ক্লাসে এসেই তিনি টাস্‌ক দেখতে চাইলেন। প্রশান্ত তার খাতা বার করতে গিয়ে হাঁ। ডেস্কে খাতা নেই। অঙ্কের মাস্টার রেগে আগুন। খাতা খোঁজাটা মিথ্যে ভণিতা বলে ধরে নিলেন তিনি। গর্জন করে ওকে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন।

সেই আট বছর বয়সেই ক্লাসের সেরা ছেলে প্রশান্ত। পড়ার জন্যে কোনোদিন কোনো টিচারের কাছে শাস্তি পেতে হয়নি। মুখ লাল করে বেঞ্চির ওপর দাঁড়ালো, চোখে জল আসার উপক্রম। আগুন চোখে সে ঘাড় ফিরিয়ে সুধীরের দিকে তাকালো। কিন্তু সুধীর তখন ভালো ছেলের মতো নিজের অঙ্কের খাতার দিকে চেয়ে আছে।

ঘণ্টা শেষ হতে আর অঙ্কের মাস্টার চলে যেতেই প্রশান্ত এক লাফে বেঞ্চি থেকে নেমে এসে সুধীরের সামনে এসে চেঁচিয়ে উঠল, তুই আমার অঙ্কের খাতা দিবি কি না? তোকে আমি মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়া, খাতা চোর কোথাকার!

প্রশান্ত রাগে কাঁপছে, রক্তবর্ণ মুখ। কিন্তু সুধীর ভেবাচাকা তার রাগ দেখে বা তম্বি শুনে নয়। খাতা ও নিয়েছে জেনেও প্রশান্ত অঙ্কের মাস্টারকে বলে দিল না কেন সেটাই ওর বিস্ময়ের কারণ। ও ভেবেছিল এক ফাঁকে যে-ভাবে খাতাটা চুরি করেছিল, অঙ্কের ক্লাস শেষ হলে তেমনি আর এক ফাঁকে খাতাটা জায়গা মতো রেখে দেবে—তারপর্ স্বীকার না করলেই হল, কে জব্দ করেছে মনে মনে বুঝলেও প্রশান্ত কিছু বলতে পারবে না। ভবিষ্যতের ভয়ে আপনা থেকেই তখন আবার সুড়সুড় করে ওর পাশে এসে বসবে।

রাগের মাথায় প্রশান্ত ওর বইপত্র ফেলে ছড়িয়ে নিজের খাতা উদ্ধার করে নিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতেই চলে গেল। আবারও বলে গেল চুরির মজা দেখাবে। অন্য ছেলেরা হতভম্ব একেবারে।

ছুটির পর প্রশান্ত ওর সঙ্গে কথা বলবেই না। কিন্তু সুধীর ওর সঙ্গ ছাড়ল না। ওর ছোট্ট বুকের তলায় অদ্ভুত মোচড় পড়েছে। ও বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আমি খাতা নিয়েছি জেনেও তুই অঙ্কের সারকে বলে দিলি না কেন?

প্রশান্ত খেঁকিয়ে উঠল, বললে মেরে তোকে আধমরা করত, আর একবার তোকে কি করেছিল মনে নেই বেহায়া কোথাকার! তোকে আমি ছাড়ব ভেবেছিস, আমি বাবাকে বলব—

বিমর্ষ মুখে সুধীর চুপচাপ খানিক তার সঙ্গে চলল। তারপর বলল, দাঁড়া একটু—

ঝুঁকে মাটি থেকে বড়সড় একটা পাথর তুলে প্রশান্তর হাতে দিতে গেল।—ধর্ এটা...

—কেন? প্রশান্তর রাগ একটুও ঠাণ্ডা হয়নি।

—ধর্ না। পাথরটা হাতে গুঁজে দিল।—আমাকে তুই যত জোরে খুশি মার, য-ত জোরে পারিস, যেখানে ইচ্ছে মার, মার না—

পাথর হাতে প্রশান্ত ওর দিকে চেয়ে রইল।

ও বলল, তোর বাবা জানলে আমার বাবাকে বলবে, বাবা খুব কষে মারবে আমাকে তার জন্যে কিছু না, কিন্তু পড়ার সময় আর কখনো আমাকে তোদের বাড়ি নিয়ে যাবে না, সন্ধে হতে না হতে তখন সেই আগের মতো কলের জল খেয়ে পেট ভরাতে হবে—।

কিন্তু প্রশান্তর রাগ পড়েনি তবু, বাবার কাছে বলেছে। তারও তো বয়েস সবে আট তখন। বাবার কাছে প্রশান্ত সুধীরের পরের কথাগুলোও বলেছে সেই সঙ্গে। পেশাগতভাবে প্রশান্তর বাবা কিশোর মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন করে থাকেন। ছেলে মাস্টারের কাছে নালিশ করেনি শুনে খুশি হয়েছেন, তাঁকেও কিছু না বললে হয়তো আরো খুশি হতেন। ছেলেকে আরো একটু পরীক্ষা করার সুযোগ ছাড়লেন না তিনি। বললেন, ঠিক আছে, ও-রকম ছেলেকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

বাবার এই উক্তি ছেলের ঠিক যেন পছন্দ হল না। কিন্তু স্কুলের হেনস্থার রাগ আছে তখন পর্যন্ত। বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, নীচের রাস্তায় এসে সুধীর আধা ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, বাড়িতে বলেছিস?

প্রশান্ত ওপর থেকে মাথা নাড়ল। বলেছে। বাস সেখানেই সম্পর্ক শেষ। সুধীর হনহন করে চলে গেল। সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে পড়তে এলো না। রাতে বাবার হাতে মার খাবার জন্য প্রস্তুতই ছিল, কিন্তু ও-বাড়ি থেকে ঘুরে এসেও বাবা কিছুই বলল না দেখে অবাক একটু। ওদিকে রাতে খেতে বসে প্রশান্তরও মন খারাপ, আর একজন বোধহয় সন্ধ্যা থেকে কলে জল গিলেছে। পরদিন স্কুলেও কথা নেই। বাড়ি ফিরে বাবার অনুমতি নিয়ে প্রশান্ত সুধীরকে ডেকে বলল, বাবা তোর বাবাকে কিছু বলবে না, তোকে আসতে বলেছে।

দাঁত কড়মড় করে সুধীর জবাব দিয়েছে, যাব না যা, আমি কি ভিকিরি?

সেই থেকে দুটো শিশুর পাকাপোক্ত বিচ্ছেদ। বাপের ভয়েই সুধীর প্রশান্তকে কিছু বলতে পারে না, নইলে মজা বুঝিয়ে ছাড়ত। ওদিকে অপমান বোধে প্রশান্তও গোঁ ভরে বিষম উপেক্ষা করতে লাগল। সুধীরের বাবা সুধীরকে দুই একদিন কানমলা আর চড়-চাপাটি দিয়েও ও-বাড়িতে পড়ানোর সময় ছেলের টিকির নাগাল পাননি। অভাবের দায়ে যাঁরা একাধিক টিউশনি করেন, নিজের ছেলের সম্পর্কে তাঁরা প্রায়শই আশাহত।

মাস দেড়েকের মধ্যে প্রশান্তর বাবা হঠাৎ বদলি হয়ে গেলেন। ওরা চলে গেল। শেষ পর্যন্ত আড়িই থেকে গেল সেই রাগে সুধীর শূন্য বাড়িটার দিকে চেয়ে জিভ ভেঙচাল দিনকতক।

দারিদ্র্যের হাড়-ভাঙা খাটুনির চোটেই সুধীরের বাবা অকালে মারা গেলেন। সব থেকে বড় দুটো বোনের বিয়ে হয়েছে মাত্র। বাকি সব দাদার ঘাড়ে। বাবা মারা যাবার এক বছরের মধ্যেই মা চোখ বুজেছেন। মাঝি-মাল্লাশূন্য নৌকোর মতো ওদের সংসারটা ভেসে চলছিল। খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, পড়ার ব্যবস্থা নেই। ওর দাদার মাথায় সর্বদা তখন আগুন জ্বলত। সামান্য দোষেও ছোট ভাই বোনগুলোকে ধরলে আধ-মড়া করে ছাড়ত।

ওই বয়সেই দাদা তিন তিনটে টিউশনি করত সকাল-বিকেল। মাস্টারদের হাতে পায়ে ধরে বিনে পয়সায় নিজের কলেজের পড়া চালাতো। সুধীরের পিসী এক বাড়িতে রান্নার কাজ করত।

আট থেকে দশ, এই দুটো বছর সুধীররা কতদিন দু'বেলা খেতে পেয়েছে হাতে গুনতে পারত। তবে একটা জিনিস সুধীরেরমতো অপর্যাপ্ত আর কেউ খায়নি। সেটা হল মার। দিদিদের হাতে মার, পিসীর হাতে মার, আর দাদার হাতের তো কথাই নেই। ওর দাদার যেন মারের নেশা চাপত এক-এক সময়। তখন কেউ ওকে জোর করে ছিনিয়ে না নিয়ে গেলে সেই মারের চোটে কোনো সময় মুখে রক্ত উঠেই মরে যেতে পারত। দশ বছরের সেই ছেলে দুনিয়ার সব থেকে বেশি ঘৃণা করত দাদাকে।

কত সময়ে ভাবত, বাবা-মায়ের মতো কোনো মন্ত্রবলে দাদাও যদি হট করে মরে যেত, তার থেকে ভালো বোধকরি আর কিছু হয় না।

মার খাবার মতো সমস্ত গুণাবলীই অবশ্য অর্জন করেছিল সুধীর। সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াতো। বাপের স্কুল থেকে নাম কাটা গেছে। করপোরেশনের ফ্রি স্কুলে ওর নামটাই শুধু লেখা ছিল। আর সেও বেশিদিন থাকেনি। প্রথম কারণ, বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুল-মুখো বড় একটা যেত না। দ্বিতীয় কারণ, স্কুলের ছেলেদের খাতা পেনসিল বই ফাঁক পেলেই চুরি করে বসত।

মাস্টার মশাইরা একাধিক বার ওর দাদার কাছে লিখিত নালিশ পাঠিয়েছে। শেষে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভাইকে শোধরানোর একটাই ওষুধ জানত ওর দাদা। মার। সেই ওষুধ সে নির্দয়ভাবে প্রয়োগও করত। কিন্তু ফল কিছু হত না। দুষ্টুমি আর গোঁয়ারতুমি ব্যাধির মতোই পেয়ে বসেছিল ওকে। মাস্টারদের নালিশ এলেই দাদা ওকে ধরে বেদম ঠেঙাতো আর নাম কাটা যাবার পর ঠেঙিয়ে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিল। তারপর ঘাড় ধরে রাস্তায় বার করে দিয়েছিল।

দশ বছরের ছেলেটার সঙ্গে বাড়ির তখন এক বেলা খাওয়ার সম্পর্ক। সেও দাদা বাড়ি না থাকলে। বিকেলের খাওয়া আর রাতের খাওয়া ও তখন মাঝে মাঝে নিজেই সংগ্রহ করতে পারত। ওই দশ বছর বয়সেই গোকুলের আড্ডায় মেশার সুযোগ পেয়েছিল। গোকুল পাড়ার নামজাদা গুণ্ডা। বে-পাড়ার খুন-জখম রাহাজানির সুনাম ছিল তার। অল্পবয়সী একটা ছেলে থাকলে অনেক রকমের সুবিধে। সুধীর ওর ফাই-ফরমাইস খাটত। হুকুম-মতো ঘুরে ঘুরে কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করে দিত। সে সব খবর পেয়ে গোকুলের কি লাভ সঠিক বুঝত না। কিন্তু লাভ যে কিছু হয় সেটা অনুমান করতে পারত। মেজাজ ভালো থাকলে গোকুলই ওকে মাঝে মাঝে খাবারের ভাগ দিত, দু'চার আনা পয়সাও দিত সময় সময়। ওই বয়সেই গুণধর গোকুলের আধ-খাওয়া বিড়ির শেষটুকু হাতে পেলে কৃতার্থ বোধ করত নিজেকে।

পাড়ার কাছাকাছি এক বাড়িতে একবার বড় রকমের একটা চুরি হয়ে গেল। পাঁচ সাত হাজার টাকার গহনা চুরি। সেই চুরির খবর সুধীরও জানত, কিন্তু কে যে চুরি করেছে ঠিক-ঠিক জানে না। শুধু এইটুকু জানে ওই বাড়িতে বাচ্চা ছেলের চাকরির খোঁজে গোকুল তাকে দু'তিনদিন পাঠিয়েছিল, সোজা ভিতরে ঢুকে গিয়ে বাড়ির গিন্নীর কাছে মিছিমিছি চাকরির বায়না ধরতে বলেছিল। তারপর কোন ঘরের কোনদিকে ক'টা দরজা, কোন দিকে দোতলার সিঁড়ি, কোন ঘরে গিন্নী থাকে এ-সব তার কাছে থেকে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিল। আর এইটুকুর বদলেই পেট ভরে ওকে রসগোল্লা খাইয়েছিল সেদিন।

চুরির দু'দিন বাদে গোকুল তিন চারজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তার আড্ডায় বসে আনন্দ করে চপ-কাটলেট গিলছিল। সুধীরও ছিল সেখানে, গোগ্রাসে চপ কাটলেট খাচ্ছিল সে-ও। হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলে চক্ষুস্থির সকলের। পুলিশে ঘর ঘিরে ফেলেছে।

ওদের সঙ্গে সুধীরকে থানায় নিয়ে গেল তারা। ঘণ্টা দুই বাদে সুধীর হাঁ করে দেখে যে-বাড়িতে চুরি হয়েছে, অর্থাৎ যে-বাড়ির গৃহিণীর কাছে সে চাকরির আব্দার করতে গেছল তিনিও থানায় হাজির। তিনি ওকে দেখেই চিনলেন আর দাঁত কড়মড় করে ওর শয়তানীর কথা বলতে লাগলেন। তারপর পিঠে পুলিশের দু-একটা রুলের বাড়ি পড়তেই ও গলগল করে বলে দিল কেন গেছল, কার নির্দেশে গেছল।

এরপর পুলিশ ওর দাদাকে থানায় টেনে এনেছে। দাদা তো হাঁ প্রথম। তারপর পুলিশের হাত থেকেই ওকে ছিনিয়ে এনে শেষ করে দেয় আর কি! পুলিশের লোকই তখন দাদার হাত থেকে রক্ষা করেছে ওকে।

কি কাণ্ড যে হল তারপর ক'দিন ধরে ঠিক নেই। রোজ একটা বন্ধ গাড়িতে ঢুকিয়ে যেখানে নিয়ে যাওয়া হত ওদের তার নাম নাকি কোর্ট। শুনল সেখানে অপরাধীর বিচার হয়, সাজা হয়। দাদাকেও রোজ দেখত সেখানে। বিচারে গোকুলদের কয়েক বছর করে জেল হয়ে গেল। সুধীরের বয়েস মাত্র দশ, মৃত স্কুল মাস্টারের ছেলে আর কুসঙ্গে এই প্রথম অপরাধ—এই সব বিবেচনায় ধমক-ধামক দিয়ে আবার দাদার হাতেই সঁপে দেওয়া হল ওকে।

সুধীরের তখন বদ্ধধারণা দাদা ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়েই দা দিয়ে দুখানা করে কেটে ফেলবে। প্রাণে বাঁচার তাড়নায় দাদার হাত ছাড়িয়ে দু'বার ট্রাম থেকে লাফিয়ে পালাতে চেষ্টা করেও পারেনি। দাদা বাড়ি নিয়ে এল ওকে। এনে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিল।

তারপর টানা বারো ঘণ্টা বন্ধ ঘরে দশ বছরের ছেলেটার শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষা। কিন্তু দাদা সেদিন আর এলোই না। দিদিরা তালা খুলে খাবার দিয়ে আবার তালা বন্ধ করে চলে গেল।

পরদিন আরো হতভম্ব সে। বেশ সকাল-সকাল তাকে চান করানো হল। তারপর খেতে দেওয়া হল। পাশে দাদাও খাচ্ছে গম্ভীর মুখে বসে। খাওয়া-দাওয়ার পর একটা পুঁটলি হাতে করে ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলো আবার।

বিস্ময়ের শেষ নেই দশ বছরের ছেলেটার। দাদা তাকে নিয়ে ট্রেনের টিকিট কেটে একটা গাড়িতে চেপে বসল। বিস্ময়ের সঙ্গে ভয়ও কম নয়। দাদা কি তাহলে ওকে দূরের কোনো বন-জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কেটে-কুটে ফেলে দিয়ে আসবে?

বিকেলের দিকে যে স্টেশনে নামা হল তার নাম বহরমপুর। দাদা একে-ওকে কি-সব জিজ্ঞাসা করে করে এক বাড়িতে এসে উঠল। তারপরেই সুধীর অবাক হয়ে দেখে দাদা তাকে এনে হাজির করেছে প্রশান্তর বাবার কাছে—দু'বছর আগে যিনি বদলী হয়ে পাড়া ছেড়ে চলে গেছলেন। প্রশান্তকেও দেখল সেখানে।

হঠাৎ ওকে দেখে প্রশান্ত খুশিতে আটখানা। আর সুধীর হতভম্ব। দু'বছর আগের অভিমান এক মুহূর্তে শেষ।

ঘরের মধ্যে ঘণ্টা দুই ধরে দাদার সঙ্গে প্রশান্তর বাবার কি কথা হল জানে না। দুজনে একসঙ্গে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো যখন, প্রশান্তর বাবা সুধীরের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন আর সুধীরের দাদা কাঁদছে।

তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে দাদা আর একবারও ওর দিকে ফিরে না তাকিয়ে সোজা চলে গেল। প্রশান্তর বাবা ওর কাছে এসে মাথাটা একবার নেড়ে দিয়ে বললেন, খুব দুষ্টু হয়ে গেছিস বুঝি? আমার কাছে ভালো হয়ে থাকবি তো?

সুধীর অবাক তখনো। জীবনে এমন মিষ্টি হাসি ও আর বুঝি দেখেনি।

পরে সবই আস্তে আস্তে বুঝেছে। প্রশান্তর বাবা এখানকার বোরস্টাল সুপারিন্টেনডেন্ট। অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্ক দুরন্ত অপরাধী ছেলেদের যে জেলে আটকে রেখে তাদের মতিগতি ফেরানো হয়—তার খোদ কর্তা। সুধীর প্রথমে ভেবেছিল ওকেও ওই সব ছেলেদের সঙ্গেই রাখা হবে। পরে নিশ্চিন্ত হয়েছে, প্রশান্তই জানিয়েছে ও একসঙ্গে এই বাড়িতেই থাকবে। মনের আনন্দে বন্ধুর কাছে ভিতরের গোপন কথাও ফাঁস করে দিয়েছে। ওর মা নাকি আপত্তি করেছিলেন, বলেছিলেন বোরস্টালে পাঠিয়ে দিতে, তা না হলে তাঁদের নিজের ছেলেও নাকি খারাপ হয়ে যেতে পারে। তখন ওর বাবা নাকি হেসে বলেছেন, আমার থেকেও একটা বাচ্চা ছেলের শক্তির ওপর তোমার বেশি বিশ্বাস দেখি।

ব্যস, মা চুপ।

ছেলেদের সেই জেলখানা এরপর সুধীর কত দেখেছে ঠিক নেই। তাদের সঙ্গে হৈ-চৈ করেছে, খেলা-ধুলোও করেছে। আর কেন যেন সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিল ওদের। স্বভাব দোষে স্কুল বা খেলার সময়ে কখনো বেশি দুষ্টুমি করে ফেললে প্রশান্তর বাবা হেসে হেসেই বলতেন, ফের ও-রকম করলে কিন্তু ওই ছেলেগুলোর ওখানে পাঠিয়ে দেব তোকে।

কিন্তু আশ্চর্য একটা দিনের জন্যেও গায়ে হাত তোলেননি তিনি। প্রায়ই নিজের ছেলেকে আর ওকে নিয়ে গল্প করতে বসতেন পৃথিবীর কত সব দুরন্ত ছেলে পরে কত ভালো ভালো কাজ করেছে—সেই সব সত্যি গল্প। বোরস্টালের কত বয়ে-যাওয়া ছেলে স্বভাব শুধরে কত বড় হয়েছে সেই সব গল্প।

সুধীর কান পেতে শুনত, বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেত না।

সেই সব গল্পের ফসল যে ফলেছিল সেটা আর কেউ না হোক প্রশান্তর বাবা অন্তত অনুভব করেছিলেন।...একবার এক দুর্দান্ত ছেলের আবির্ভাব ঘটেছিল বোরস্টালে। তাঁর নাম বাবু। বয়েস মাত্র চৌদ্দ। অর্থাৎ সুধীরদের থেকে এক বছরের মাত্র বড়। কিন্তু ওই বয়সেই বাবু অনেকবার পুলিশকে সুদ্ধু ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। বস্তিতে থাকত। ন'বছর বয়সে মা মারা যেতে বাপ আবার বিয়ে করে তিন মাসের মধ্যে ওকে হাড়ভাঙা পিটুনি দিয়ে রাস্তায় বার করে দিয়েছিল। তারপর কু-সঙ্গে মিশে দেখতে দেখতে সে ওস্তাদ ছেলে বনে গেছে। তের বছর বয়সেই এক সাংঘাতিক দলের প্রথম সারির সাগরেদ সে। সুধীর ওর নিজের মুখেই শুনেছে, তার দল ডাকাতি করেছে, মানুষ খুন করেছে, মেয়ে চুরি করেছে, আরো কত কি বীরত্বের কাজ করেছে। দলের সর্দারের বুদ্ধির দোষে ধরা পড়ে দলকে দল জেলে পচছে এখন—আর বয়েস কম বলে তাকে এখানে আনা হয়েছে। সর্দারের বুদ্ধির দোষটা কি শুনে সুধীর অবাক। একটা মেয়েকে নিয়ে সর্দারের সঙ্গে দলের দ্বিতীয় মাতব্বরের প্রায় খুনোখুনি ব্যাপার। সেই লোকটাই পুলিশকে খবর দিয়ে দলসুদ্ধু ধরিয়ে দিয়েছে। বাবুর মতে সর্দার জেল থেকে বেরিয়েই প্রথমে সেই লোকটাকে খুন করবে তারপর ওই মেয়েটাকে। সেই সঙ্গে বাবু সুধীরকে একটু জ্ঞানও দিয়েছে, বলেছে, কোনো কিছুতে মেয়ে ভিড়লেই সর্বনাশ, বুঝলি।

সুধীর বুঝত না, কিন্তু বাবু ওকে কেমন করে যেন বশ করেছিল। তার স্বাস্থ্য দেখে মুগ্ধ, সাহসের কথা-বার্তা শুনেও। প্রশান্তর বাবার নিষেধ সত্ত্বেও ওই দুর্দান্ত ছেলেটার প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করত। বড় সাহেবের বাড়িতে থাকে বলে সকলের সঙ্গেই অবাধে মেলামেশার সুযোগ ছিল তার। বাবুকে ও নিজের গল্পও করেছে, কোথা থেকে কি-ভাবে এখানে এসেছে সেই গল্প। বড় সাহেবের বাড়ির এই ছেলেটার সঙ্গে ভাবের সুযোগ নিতে ছাড়েনি বাবু। সুধীর সঙ্গে থাকলে বোরস্টালের অনেক নিয়ম কানুন ফাঁকি দেবার সুযোগ মিলত। একসঙ্গে পালাবার নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে ওর মাথাটা আবার বিগড়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল সে। বাঁধা-ধরা এই খাঁচার জীবনকে ধিক্কার দিয়ে থুথু ছিটাতো সে। তার বদলে দুজনে মিলে কত স্বাধীন আর কত দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারে সেই সব সম্ভাবনার কথা বলত। সুধীর তাকে ভালোর দিকে ফেরাতে চেষ্টা করত, কিন্তু এক-একসময় ওর মনে এই খাঁচার জীবন থেকে পালাবার লোভ চিকিয়ে উঠত। বাবু ওকে বোঝাতো, ওরও খাঁচার জীবন, ভালো হওয়ার আফিম খাইয়ে ওকে বশ করে রাখা হয়েছে। তাছাড়া অন্যের দয়ায় মানুষ—একথা সকলে চিরকাল বলবে। যারা মানুষ করছে তারাও বলবে।

সুধীরকে আধা-আধি বশ করার পর এক বিকেলের দিকে বাবু ওকে নিয়ে পালালো। বড় সাহেবের বাড়ির ছেলের সঙ্গে যাচ্ছে, কেউ একটুও সন্দেহ করল না, ওদিকে সুধীরও ঠিক বুঝতে পারেনি চিরকালের মতো পালাচ্ছে তারা। ভেবেছিল, এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার জন্য যেমন এক-একদিন এদিক-সেদিক চলে যায় তারা, তেমনি যাচ্ছে।

...টানা পাঁচ ছ' মাইল চলে আসার পর সুধীরের সন্দেহ হতে বার বার সুধালো কোথায় যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাবুর মুখ তখন ধারালো গম্ভীর। চলছে জঙ্গলের ধার ধরে, কখনো বা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। বাবু এতক্ষণ ওকে বুঝিয়েছে, আজ এমন একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে যা জীবনে ভোলবার নয়। কি অ্যাডভেঞ্চার সুধীর ক্রমশ যেন তার আভাস পাচ্ছে। সেটা যেন বাবুর চোখে মুখে ফুটে উঠছে।

বাড়ি ফেরার জন্য বার কয়েক তাগিদ দেবার পর বাবু ওকে জঙ্গলের ধারে একটা ভাঙা দেয়ালের ও-ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে কোমর থেকে ছোট চকচকে ছোরা বার করল একটা। তার চোখ মুখও ওই ছোরার মতোই ভয়ানক করে উঠল।—আর ফেরার নাম করবি, না এখানেই তোকে শেষ করব, বল?

সুধীর বোবা হঠাৎ।

ধাক্কা দিয়ে একে মাটিতে ফেলে বাবু ওর বুকের ওপর চেপে বসল। তারপর ছোরাটা উঁচিয়ে ধরল, আর ফেরার নাম করবি কিনা বল শিগগির!

সুধীর সভয়ে মাথা নাড়ল। করবে না।

পাশে বসে বাবু ওকে টেনে তুলল। আদর করে দুটো ঝাঁকানি দিয়ে বলল, আমরা ওদের খাঁচা থেকে পালিয়ে এলাম বুঝছিস না! সন্ধে হয়ে এলো আর আমাদের পায় কে?...তোতে আমাতে দল

গড়ব, একদিন সেই দলে আরো কত মরদ আসবে দেখিস, আমাদের বন্দুক থাকবে, রিভালবার থাকবে—বিলেতি ছবির মতো ব্যাঙ্কডাকাতি করব—ঘরে পাঁজা পাঁজা নোট থাকবে—তার বদলে কিনা এই দয়ার জীবন! ছোঃ, তুই মরদ না?

হ্যাঁ, সুধীরের মাথায় প্রলোভন আবার দানা পাকিয়েছে। বীরত্বের স্বপ্ন দেখারই বয়েস সেটা—সম্ভব অসম্ভবের বিচার মাথায় আসে না। তাছাড়া শিশু অবস্থা থেকেই দুজনে ওই বিপদের রোমাঞ্চ জেনেছে। বাবু অবশ্য আরো ঢের বেশি জেনেছে।

এরপর অন্ধকারে দুজনে আরো পাঁচ ছ মাইল পথ ভেঙেছে। সমস্ত পথ বাবু সুধীরকে ভবিষ্যতের উদ্দীপনা জুগিয়েছে। তারপর হাত বাড়িয়েছে, তোর কাছে কি আছে দে—

অ্যাডভেঞ্চারের জন্য যে কটা টাকা সম্ভব বাবু ওকে সঙ্গে নিতে বলেছিল। সুধীরের সম্বল মাত্র দু'টাকা সঙ্গে নিয়েছিল। পকেট থেকে টাকা দুটো বার করে তার হাতে দিল। মাত্র দুটো টাকা দেখে হাসিমুখেই ওকে একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে বাবু বলল, ঠিক আছে, টাকা আমরা ঠিক যোগাড় করে নেব, আমি কি করতে পারি সকাল হলে দেখিস—

একটা দোকান থেকে কিছু গুড়মুড়ি কিনে খেয়ে আবার চলল তারা।

কিন্তু সুধীরের ততক্ষণে বিপরীত চিন্তা আর অনুশোচনা শুরু হয়েছে। ক্রমে সেই চিন্তা আর অনুশোচনা বাড়তে থাকল। প্রশান্তর বাবার মুখে শোনা সেই সব ছেলের মুখগুলো চোখের সামনে ভাসতে লাগল, অল্প বয়সে যারা এদের মতোই ঘৃণ্য শয়তান ছিল, কিন্তু পরে যারা আদর্শ মানুষ হয়ে উঠেছে। তারা যেন সব একসঙ্গে ছি-ছি করতে লাগল ওকে। তাছাড়া মেসোমশায়...প্রশান্তর বাবা কি ভাবছে? মা কি ভাবছে? প্রশান্ত কি ভাবছে। তাদের বিশ্বাসের উপর এতবড় বেইমানি করবে? মেসোমশায়ের মাথা হেঁট করে দেবে? সকলে বলবে এই বেইমানকে আশ্রয় আর প্রশ্রয় দিয়েছিল বলে এমনটা ঘটল। আর ও যদি একলা কোনোরকমে বাবুর খপ্পর থেকে বেরিয়ে ফিরে যেতেও পারে, তবু সকলে বলবে ওর জন্যেই বাবু পালাতে পারল, ওর জন্যেই বাবুকে আর ভালোর দিকে ফেরানো গেল না। একলা ও ফিরবে কি করে? মেসোমশাইকে মাসিমাকে প্রশান্তকে মুখ দেখাবে কি করে?

মাথায় আগুন জ্বলতে থাকল একসময়। থমকে দাঁড়াল।

বাবুও থামল।—কি?

যাব না। ফিরে চল।

সঙ্গে সঙ্গে ছোরায় হাত পড়ল।—কি বললি, আবার বল তো?

সুধীরও প্রস্তুতই ছিল। লাফিয়ে দু'হাতে জাপটে ধরল তাকে।—আমিও যাব না, তোকেও যেতে দেব না, মেসোমশাইয়ের পা ধরে আমরা ক্ষমা চাইব—

আর বলার অবকাশ পেল না। অন্ধকার রাস্তায় দুজনের জাপটা-জাপটি শুরু হল। সুধীর প্রাণপণে ওকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে লোক ডাকতে থাকল।

...তারপর আর মনে নেই। ছোরাটা বুক ঘেঁষে কাঁধের দিকে বসে গেছে। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় চারদিক কালো হয়ে যাচ্ছে। তবু বাবুকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করছে, আর চিৎকার করছে।

...তারপর আর কিছু মনে নেই।

চোখ মেলে দেখে দিনের আলো। অচেনা একটা ঘরে লোহার খাটের ধপধপে বিছানায় শুয়ে আছে। সামনে ঝুঁকে আছে প্রশান্তর বাবা...মেসোমশায়। তার পাশে মাসিমা আর প্রশান্ত। শুকনো উতলা মুখ তাদের।

একটু বাদেই সুধীর বুঝেছে সে হাসপাতালে শুয়ে আছে। কিন্তু ও স্বপ্ন দেখছে কি ঠিক দেখছে বুঝে উঠছে না। স্বপ্ন নয়। বুকে কাঁধে ব্যান্ডেজ বাঁধা। আর ভয়ানক যন্ত্রণা। তবু প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবু কোথায়?

মেসোমশাই গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছেন, সেও জায়গা-মতো আছে।...শিক্ষা হয়েছে? আর কখনো এমন করবি?

যন্ত্রণায় নয়, ওই কথা শুনেই চোখে জল এসেছিল সুধীরের। মাথা নেড়েছে, আর করবে না।

পরে শুনেছে, জাপটা-জাপটির সময় ওর চিৎকার শুনে কয়েকজন লোক ছুটে এসে ওদের দুজনকেই ধরেছে। একটা গাড়ি যোগাড় করে সুধীরকে হাসপাতালে আর বাবুকে থানায় দিয়েছে। থানার লোকও তখন চারদিকে বেরিয়েছিল ওদের খুঁজতে।

ও একটু ভালো হয়ে উঠতে মেসোমশায় অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনেছেন। শোনার পর যা বলেছিলেন, লজ্জায় সুধীর কুঁকড়ে গেছল। কিন্তু বিস্ময়েরও সীমা পরিসীমা ছিল না তার। তিনি বলেছিলেন, তুই একটা ছেলের মতো ছেলে হবি আমি বলে দিলাম।

...সুধীর তুমি যে কি, তুমি যে কি হয়েছ সে আর তিনি কতটুকু দেখেছেন, কতটুকু জেনেছেন?

প্রশান্ত আর সুধীর ছায়া আর কায়া। একসঙ্গে খায় একসঙ্গে শোয় একসঙ্গে খেলে একসঙ্গে পড়ে। স্কুলের পরীক্ষায় ফল প্রশান্তর বরাবরই সুধীরের থেকে ভালো হয়। তুলনামূলকভাবে সুধীরের ফলও চমকপ্রদই বটে। কিন্তু বরাবর প্রশান্তর কিছু নীচে থাকত সে। প্রশান্তর বাবা বলতেন, তোর এখনো বাঁদারামি যায়নি, একটু চেষ্টা করলেই তুই ওর থেকে ঢের ভালো রেজাল্ট করতে পারিস।

এ-কথা বলার কারণ আছে। ওই রকম একটা দুরন্ত ছেলে যে প্রশান্তর নীচে পড়বে না বলে গোঁ ধরে একটা বছর বাড়িতে মাস্টারের কাছে পড়ে পরের বছর ঠিক প্রশান্তর একই ক্লাসে গিয়ে ভর্তি হতে পেরেছিল, ভদ্রলোকের কাছে সেটাই প্রচণ্ড বিস্ময় আর আশার ব্যাপার। কিন্তু তারপর দৈবাৎ যদি কোনো পরীক্ষায় সুধীর বন্ধুর থেকে ভালো রেজাল্ট করে বসল তো নিজেই অপ্রস্তুত যেন। বলত, তুই ভালো করে পড়িসনি, এবারে ভালো করে পড়।

তিন বছর বাদে সুধীরকে এক ছুটিতে প্রথম দাদার কাছে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন প্রশান্তর বাবা। দিন কুড়ি ছিল দাদার কাছে। দাদা তখন একটুও শাসন করত না, বরং সাধ্যমত যত্ন করত। কিন্তু সেই পুরনো পরিবেশে সুধীরের যেন হাঁপ ধরত, দম বন্ধ হয়ে আসত। মনে মনে দিন গুনত কবে ছুটি ফুরোবে, কবে যাবে এখান থেকে।

এরপর একটা ব্যাপার সুধীর লক্ষ্য করত। কোনো বড় ছুটি এলেই প্রশান্তর বাবা ওকে এক-রকম জোর করেই কলকাতায় দাদার অভাবের সংসারে দিন কতক থেকে আসার জন্যে পাঠিয়ে দিতেন। প্রশান্ত বা তার মা আপত্তি করলেও সেটা টিকত না।

বেশ ভালোভাবেই হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করল দুজনে। প্রশান্তর ফল অবশ্য ওর থেকে অনেক ওপরের দিকে। নিজের জন্য আফসোস নেই সুধীরের, বন্ধুর ফল আরো ভালো হল না কেন সেই খেদ।

প্রশান্তর বাবা ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশান্ত তো ডাক্তারি পড়বে বলছে, তুই কি পড়বি?

সুধীর নিরুত্তর। ওর হয়ে প্রশান্তই জবাব দিল, দুজনেই ডাক্তারি পড়ব, অনেক আগেই দুজনার দরখাস্ত করা সারা।

প্রশান্তর বাবার খরচা চালাতে একটুও আপত্তি নেই। এই ছেলেটা তখন নিজের ছেলের থেকে কম নয় তাঁর কাছে। কেবল ওই ছেলে ডাক্তারিতে সীট পাবে কিনা সেই সংশয়। নিজের যেটুকু প্রতিপত্তি ছিল এই ছেলের জন্য খাটালেন। নিজের ছেলে রেজাল্টের জোরেই সীট পাবে। বন্ধুর সঙ্গে কলকাতায় এসে প্রশান্তও তার জন্য বাপের নির্দেশমতো আদা জল খেয়ে চেষ্টায় লেগে গেল। সে-ক'দিন সুধীরের দাদার কাছেই ছিল। দাদা তখন মার্চেন্ট অফিসের কেরানি। ভগ্ন স্বাস্থ্য। ওদের সেই দারিদ্র্য দেখে প্রশান্ত মনে মনে স্তব্ধ। তবু তো ওদের সংসার তখন আগের থেকে কিছুটা হাল্কা হয়েছে। সুধীরের ওপরের চার বোনের মধ্যে দুই বোন তখন নিখোঁজ। কোথায় আছে—আছে কি নেই কেউ জানে না। সেই সঙ্গে পিসীর এক মেয়েও নি-পাত্তা।

রাত্রিতে বন্ধুর কাছে সব বলে সুধীর হেসে হেসে বলেছিল, এর পরেও তুই আমাকে ডাক্তার বানাবি? তার ঢের আগে দাদাটা তো মরে ভূত হয়ে যাবে!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ডাক্তারিতেই ভর্তি হতে হয়েছে। প্রশান্তর এক কথা, হয় দুজনে পড়বে নয়তো কেউ পড়বে না। বাবার কাছ থেকে টাকা এনে প্রশান্ত অনেক সময় গোপনে সুধীরের দাদার

কাছে দিয়ে এসেছে। কিন্তু গোপন থাকেনি। সুধীর হেসে হেসেই বলেছে, দারিদ্র্যের দশ হাঁ—তুই কোন্ হাঁয়ের খিদে মেটাবি রে?

এদের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ আগ্রায়।

আমার মাঝে মাঝে ভাবতে অবাক লাগে একটা মেয়ের প্রতি একটা ছেলের অথবা ছেলের প্রতি একটা মেয়ের হঠাৎ আকর্ষণের জন্য কি বিশেষ কোনো যোগাযোগের দরকার হয়ই? আমার বিশ্বাস দরকার হয় না, যদি পরস্পরের মন জানাজানির অবকাশ থাকে। কিন্তু সে-রকম যোগাযোগ ঘটলে সেই বিলম্বিত অবকাশ অনেকটা সংক্ষেপ করে আনা যায় বোধহয়। পরস্পরের মন দেখা, মন বোঝাটাই আসল ব্যাপার। ঘটনার আয়নায় সেটাই অনেক সময় খুব সহজে দেখা যায়, বোঝা যায়।

এই কারণেই লেখক-লেখিকাদের কিছু একটা অনুকূল বা প্রতিকূল ঘটনা ঘটিয়ে ফেলার দিকে এত ঝোঁক। এরই মধ্যে মাসিক সাপ্তাহিকের কত গল্পে নায়ক নায়িকাকে কাছাকাছি আনার জন্যে বা সাময়িকভাবে দূরে ঠেলে দেবার জন্যে নিজেই আমি কত রকমের ঘটনার আশ্রয় নিয়েছি ঠিক নেই। সেই নিজের জীবনেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা না ঘটলে কোনো লেখক বা লেখিকার সেটা কল্পনা করা সম্ভব নয়। বাস্তব অনেক সময় গল্পের থেকেও বিস্ময়কর বটে।

আর আমার বেলায় আরো বিচিত্র ব্যাপার এই যে সেই ঘটনার আয়নায় আমাকে মন দেখতে হল জানতে হল বুঝতে হল আর একজনের। ঘটনার যে প্রত্যক্ষ উপলক্ষ তার নয়।

তখন আমার বয়েস কুড়ি। সেবারে বাংলা অনার্স-এ বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছি। মেয়েরা আজকাল সাধারণত উনিশ বছরে বি. এ. পরীক্ষা দেয়। সেই জন্যে আমার মনে একটু খেদ ছিল। কিন্তু আমার দাদামশায় বলতেন, একটু পাকা বয়সে যে-রস টানবি সেটা জমজমাট হবে, বুঝলি রে কুড়ির বুড়ি!

তা সেই কুড়ি বছর বয়সেই নিজেকে আমি বেশ একজন নাম-করা মেয়ে ভাবতুম। শুধু আমি কেন, আমার বাড়ির মানুষেরা ভাবত, পাড়ার ছেলেমেয়েরা ভাবত, কলেজের মেয়েরা তো বটেই, অনেক টিচারও তাই ভাবত। আর মনে মনে জানি অনেক মুখ-চেনা ছেলেরও ঈর্ষা আর সম্ভ্রমের পাত্রী আমি।

আমার দাদামশাই ছিলেন নামকরা কবি। তিনি বড় চাকরি করতেন, কিন্তু চাকরির থেকে তাঁর কবি খ্যাতি ঢের বেশি ছিল। আমার বাবা তেমনি নামজাদা সাংবাদিক। এই দুজনের স্নেহ আর সহায়তায় আমি খানিকটা অকাল-পক্ক হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রথম হাতে-খড়ি দাদুর কাছে। দশ বছর বয়সে দিব্বি ছড়া-কবিতা লিখে ফেলতাম। দাদুর কল্যাণে বারো বছর বয়সেই সেই সব ছড়া-কবিতা ছোটদের কাগজে ছাপা হতে লাগল। চোদ্দ বছরের মধ্যে সেই সব কাগজে কবিতা ছেড়ে গল্পও ছাপা হয়েছে। সতের বছর বয়সে বড়দের মাসিক সাপ্তাহিকে আমার কবিতা শুরু হয়েছে (এর পিছনে দাদু আর বাবার পরোক্ষ সুপারিশের জোর ছিল সেটা আমি স্বীকার করতে নারাজ)। কিন্তু কবিতার থেকে গল্প লেখার দিকে আমার ঝোঁক বেশি। দাদুর ইচ্ছে আমি কবিতাই লিখে যাই, কিন্তু আমি লিখতে চাই গল্প। দাদু বলেছিলেন, হায়ার সেকেন্ডারিতে ভালো রেজাল্ট করলে কবিতার বই ছাপিয়ে দেবেন। বাবার মতে না হোক, দাদুর বিবেচনায় ভালো রেজাল্টই করেছিলাম। দাদু কবিতার বই ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে আমার মন ভরে ওঠেনি। আঠার বছর বয়সে এক মস্ত সাপ্তাহিকে একটা বড় গল্প ছাপা হতে আমার সে উল্লাস দেখে কে! তার ফলে অপেক্ষাকৃত ছোট কাগজগুলিতে মাথা গলানো অনেক সহজ হয়ে গেল। ওই একটা বছরের মধ্যে লেখাপড়া বিসর্জন দিয়ে কত গল্প যে লিখে ফেললাম ঠিক নেই।

এর এক বছর বাদে, অর্থাৎ বয়েস যখন উনিশ তখন তো আমি পাকা-পোক্ত লেখিকা। দাদুর টাকায় আমার প্রথম উপন্যাস প্রকাশের আলোয় এসে জ্বলজ্বল করছে তখন। নিজের টাকায় ছাপা হয়েছে সে অপ্রিয় সত্যটা বন্ধু-বান্ধবের কাছে গোপন। বই খুললেই মস্ত প্রকাশকের নাম—অতএব ওই সত্যটা কে আর জানছে। বাবা নামী সাংবাদিক, তাঁর অগোচরে নিজে একটু তদবির-তদারক করতে ছোট বড় সমস্ত কাগজে আশাতিরিক্ত ভালো সমালোচনা বেরুলো বইয়ের। মাত্র উনিশ বছর

বয়সে বাংলা দেশের কোন মেয়ের ভাগ্য এমন প্রসন্ন? ওই বই বেরুনোর পর রেডিওতে গল্প পড়ার সুযোগ পেয়েছি, আর বর্তমানে মাঝারি গোছের এক মাসিকপত্রে বেশ বড়সড় একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছি। পরীক্ষার জ্বালাতনের মধ্যে পড়ে যাব জানতুম বলেই আগে থেকে খেটেখুটে ওটা শেষ করে রেখেছিলাম। ধারাবাহিকের মেয়াদ ফুরোলেই ওটাও বই আকারে বার করার ব্যবস্থা হয়ে আছে। এবারে আর দাদুর পকেট থেকে গচ্চা যাবে না। প্রচারের জোরে আর কিছুটা ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি খাটানোর ফলে প্রথম বইটা মন্দ কাটল না দেখে ওই নামী প্রকাশকই এটা এবারে নিজেরা ছাপাতে রাজি হয়েছেন। তাছাড়া, ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে সেটাও তাঁদের কাছে একটা বাড়তি আকর্ষণ।

বি. এ.-তে ভালো অনার্স পেলেও এম. এ. পড়ব কি পড়ব না সে চিন্তা আমার মাথায় নেই তখন। আমি আঁতি-পাতি করে তখন আর একটা জমজমাট উপন্যাসের প্লট হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আর ওই বয়সে তরুণ-তরুণী মহলে মাথা এতটা উঁচু হয়ে ওঠার সৌভাগ্যে নিজেই নিজেকে একখানা জিনিয়াস ভাবছি।

আমার ভাবনার সঙ্গে দাদুর ভাবনা অনেকখানি মিলত। দাদুর তুলনায় বাবা বরং একেবারে কাটখোট্টা গোছের লোক। দাদু বলতেন, এই তো সবে শুরু রে, এর মধ্যে যেমন তেড়ে-ফুড়ে এগিয়ে চলেছিস তোকে রোখেই বা কে, সামলায়ই বা কে!

সামলাবার কথা ভাবি না, দাদু যদি আর ক'টা বছর বেঁচে থাকে তো রুখবার কেউ নেই তাতে আমি নিঃসংশয় প্রায়।

দাদু আরো বলতেন, এমন রত্ন যে শেষ পর্যন্ত কোন বাঁদরের গলায় ঝুলবে ভেবে তো চোখে এখন থেকে ঘুম নেই আমার।

আমিও তেমনি জবাব দিতাম, আপাতত তোমার গলাতেই ঝুলি না—বুড়ির বুড়োর গলায় দুলতে কত লোভ তুমি জানো না।

দাদু আমাকে ছোট থেকেই বুড়ি বলে ডাকতেন। এ-সব রসের কথায় দাদু আনন্দও পেতেন খুব। চোখ পাকিয়ে বলতেন, হ্যাঁ রে ছুঁড়ি—কচি কাঁচা ছেলেগুলো এসে যখন ঘুরঘুর করে বুড়ি তখন খুকী হয়ে ঢল ঢল করে, আমি দেখি না ভাবিস?

মিথ্যে নয়। সবে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছি। এর মধ্যে লেখিকা হয়ে বসার ফলে আমার বেশ কিছু স্তাবকও জুটে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মন্দ লাগে না। তার মধ্যে দুই একটা ছেলে আবার কি আশা নিয়ে ফাঁক পেলেই আনাগোনা করত, লেখিকার তাও বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। দাদু না থাকলে মায়ের গম্ভীর মুখ আর গোল চোখ দেখেই বাড়ি ছেড়ে পালাত তারা। মায়ের ধারণা দাদু আমাকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে। আর এই বয়সে অত যে ভালো বাসাবাসির গল্প উপন্যাস লিখি মায়ের মতে সেটাও খুব ভালো কথা নয়।

ওই বয়সে আমার মনের তলায় কোনো পুরুষের মুখ উঁকিঝুঁকি দেয়নি এ-কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। দিত। প্রায়ই দিত। কিন্তু সে পুরুষের মুখ আমি নিজেই তৈরি করতাম। ফলে সে মুখের হামেশাই রকমফের হত। কারণ সেই মানুষকে আমি বাস্তবে কখনো দেখিনি। বাইরের নয়, পৌরুষের রূপ দিয়ে নিজেই আমি সেই মুখ গড়তাম। আমার অনেক লেখার উপাদান থেকে পুরুষের গুণাবলী সংগ্রহ করা এক একটা মূর্তি।...না, গড়তাম না, আপনা থেকেই এক একটা মূর্তি আকার নিত। বাস্তবে তার সাক্ষাৎ মিলবে কি করে। না মেলার জন্য বিন্দুমাত্রও খেদ ছিল না। নিজেকে এক একটা কল্পনার সামনে দাঁড় করিয়ে ভাবতে ভালো লাগত। ভাবতাম। ভেবে খানিক কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতাম। তারপর নিজেই থাকতাম। মনে মনে নিজের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করতাম। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

তবু তেড়ে-ফুড়ে একজন অন্তত সামনে আসতে চেষ্টা করেছিল। কল্পনায় নয় বাস্তবের একজন। নতুন বয়স কালের সেই ধাক্কায় আমি একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম সত্যি কথা।...ছেলেটার নাম অনুপম। আমার তখন বি. এ. পরীক্ষার মাস ছয় মাত্র বাকি। অনুপম ইউনিভার্সিটিতে সিক্সথ ইয়ারে পড়ে। বিষয় বাংলা। বি. এ.-তে ফার্স্টক্লাস পেয়েছিল। মাসিক সাপ্তাহিকে তার দুই একটা কবিতা আমার চোখে পড়েছিল।

বিকেলের দিকে একদিন দাদু বললেন, তোর কাছে আবার কে একজন এলো দ্যাখ, নাম বলল অনুপম মজুমদার, তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়, আমার তো ওই শুনলেই আবার বুক ধড়ফড় করে—

বলাবাহুল্য, অনুপম মজুমদার নামে কেউ তখন আমার মাথার মধ্যে নেই। নীচে এসে দেখি বাইরের ঘরে আমার থেকেও একহাত লম্বা (আমি বেশ লম্বাই) একটি ছেলে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে দেয়ালের ছবি দেখছে।

ঘুরে দাঁড়াল। দুই এক পলক চুপচাপ দেখল আমাকে। এই স্মার্টনেসটুকু বৈচিত্র্য বলতে হয়। কারণ যে ছেলেরা তখন পর্যন্ত ধারে কাছে ঘেঁষতে চায় তারা মুখের দিকে সোজসুজি বড় একটা তাকাতে পারে না।

আপনি চন্দ্রাণী?

এই প্রশ্নও গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম। সঙ্গে দেবী বা পদবী যুক্ত হলে কানে লাগত না। মাথা নাড়ালাম।

বসুন। আপনার একটু সময় নষ্ট করতে এলাম, কিছু মনে করবেন না।

মুখোমুখি বসলাম দুজনে। অনুপম মজুমদার গড় গড় করে নিজের পরিচয় দিল। তার হাতে কাগজে মোড়া বই একখানা, সেটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, আমি কবিতা লিখি কারণ অন্য রচনা কোনো মাসিক সাপ্তাহিক ছাপতে চায় না, দু'দশ লাইন কবিতার জায়গা দিয়ে দাক্ষিণ্য দেখানো সম্পাদকদের কাছে সহজ।...যাক, আমাদের ছেলে মহলে আপনার কথা খুব হয়, আগে আপনার কোনো লেখা পড়িনি—এই বইটাই প্রথম পড়লাম।

টেবিলের ওপর কাগজে মোড়া বইটা দেখিয়ে দিল সে। আমি সেটার দিকে তারপর তার মুখের দিকে তাকালাম।

অনুপম মজুমদার বলে গেল, বইটা যত্ন করেই পড়েছি...ভাব প্রকাশে বা কনস্ট্রাকশনে যে-সব জায়গায় ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে মনে হয়েছে দাগ দিয়েছি। আপনার বক্তব্য আমার ভালো লেগেছে—কিন্তু ছাপার অক্ষরে ওই ত্রুটিও থাকা উচিত নয়। আমরা চান্স পাই না, আপনি পাচ্ছেন, আপনার ভাগ্য, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন তার জন্যে ঈর্ষা নেই—বরং খুশি মনেই আলাপ করতে এলাম—

বলার ধরনে বাঁকাচোরা কিছু নেই। আমি অবাক হচ্ছিলাম আবার অস্বস্তিও বোধ করছিলাম। সাহিত্য প্রসঙ্গে এক তরফা আরো কিছু কথা বিস্তার করার পর বইটা আবার ফেরত নিতে আসবে জানিয়ে চলে গেল।

বইটা টেনে নিয়ে দু'চারটে পাতা ওলটাতেই আমার চক্ষু স্থির। পেন্সিলের গোল গোল দাগে ছাপার অক্ষরগুলো কণ্টকিত। পাশে ক্ষুদে অক্ষরে মন্তব্য। ছাপার ভুল বানান ভুল, উপমার অসামঞ্জস্য বাণী-বন্ধের অসংগতি ইত্যাদি যে কত তারচোখে ধরা পড়েছে, গুণে শেষ করা যাবে না।

প্রথম অনুভূতিতে রাগই হয়ে গেল। বইটা টেবিলের উপরেই ছুঁড়ে ফেললাম। কিন্তু যাবার সময় হাতে করে আবার সেটা নিয়ে যেতেও হল। দু'দিন ধরে তারপর পাল্টা জবাব দেবার জন্যেই সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি-ধরা দাগ আর মন্তব্যগুলো বিচার বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলাম। এই করতে গিয়েই যেন নিজের জোরের দিকটা কমে আসতে লাগল। সত্য অস্বীকার করব কি করে, ত্রুটিগুলো যে ত্রুটিই নিজের কাছেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আগাগোড়া বইটা খুঁটিয়ে পড়েই যে ত্রুটিগুলো বার করা হয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই। আর, আরো দু'তিন দিন যেতে নিজেরই মনে হতে লাগল, পরের সংস্করণে (সংস্করণ যদি হয়) এই দাগগুলোর দিকে লক্ষ্য করে যদি বইটা ঝাড়ামোছা করা যায় তাহলে সত্যিই অনেক ঝকঝকে হবে।

অনুপম মজুমদারের পরের আবির্ভাব এক ছুটির দিনে। মুখখানা কমনীয়, কিন্তু হাসিটা ঠোঁটের বাইরে খুব বেশি ছড়ায় না। জিজ্ঞাসা করল, আমার ওপর নিশ্চয় খুব রেগে আছেন?

আমি সহজভাবেই সত্যি কথা বললাম, প্রথমে রেগে গেছলাম, পরে দেখলাম, আপনি উপকারই করেছেন, আর তার জন্য আপনার পরিশ্রমও কম করতে হয়নি।

—তা ঠিক। অম্লান বদনে স্বীকার করল।—প্রথমে আমারও হিংসেই হয়েছিল, বুঝলেন, আমরা সুযোগই পাব না, আর দাদুর জোরে বাবার জোরে আর পয়সার জোরে কেউ সস্তায় নাম কিনে বেরিয়ে যাবে, তার ওপর কাগজের ওই চোখ-কান-কাটা প্রশংসা—তাই বই নিয়ে লেগে গেলাম। কিন্তু শেষ করে মনে হল যত ত্রুটিই থাক, আপনি সুন্দরই তো কিছু করতে চেয়েছেন, তাকে ছোট করে নিজে ছোট হই কেন। ব্যাস, কাগজে না লিখে সোজা আপনার কাছে চলে এলাম মাস্টারি করতে।

আমি হাসি মুখে জবাব দিলাম, ভালোই করেছেন। ও বইটা আমার কাছে থাক, আমি আপনাকে আর একখানা বই দিচ্ছি—

জবাব দিল, কিছু দরকার নেই, ওই বইটা আমারই, আমিই কিনেছিলাম—

হ্যাঁ, বৈশিষ্ট্য যে কিছু আছে অস্বীকার করার উপায় নেই। নিজে বই দিতে চাইলাম, বললে লিখেও দিতাম নিশ্চয়, তার বদলে অনায়াসে নিজের কেনা বই ফেলে গেল।

সেই থেকে যোগাযোগ। অল্পদিনের মধ্যে সেই যোগাযোগ পুষ্টও হতে লাগল। পুরুষের গুণাবলীর কিছু কিছু আভাস আমি তার মধ্যে পেতে শুরু করলাম। বাড়ির লোকে তার আনাগোনা লক্ষ্য করতে লাগল। দাদু তো বিশেষ করেই করল। মাঝে মাঝে আমার কলেজে হাজিরা দিত, আমাকেও মাঝে মাঝে তার ইউনিভর্সিটির রাস্তায় তলব করত। গোড়ায় গোড়ায় দুজনে কফি হাউসে যেতাম, শেষের দিকে কোনো নিরিবিলি দিকে।

অনুপম মজুমদারকে আমার ভালো লাগত অস্বীকার করব না। আমাদের সেই প্রীতির পরমায়ু তিন মাস। আমি কোনো অবধারিত পরিণামের দিকে এগোচ্ছি কিনা প্রায়ই ভাবতাম। মা বেশ স্পষ্টভাবেই আমাকে আগলে রাখতে চেষ্টা করতেন, বাড়িতে ফিরতে দেরি হলে জেরা করতেন, উপদেশ দিতেন। কিন্তু সে-সব আমি উপেক্ষা করতাম। কারণ নিজের বুদ্ধি আর বিবেচনা তখন কারো থেকে অপরিণত ভাবতে পারতাম না।

...মায়ের জেরা বা উপদেশের দরুন নয়, অনুপম মজুমদারের সম্পর্কে কি একটা অজ্ঞান সংশয় আমার নিজের মনেই দানা বেঁধে উঠছিল। তার সঙ্গ আমার ভালো লাগত কারণ তার সঙ্গে দু'ঘণ্টা কাটালে লেখার অনেক রকম রসদ পেতাম। অবচেতন মনের অনেক রহস্য যেন সে গড়গড় করে বলে যেত, যা থেকে কিছু ছোট গল্প লেখার আইডিয়া আমার মাথায় এসেছিল। অথচ ছেলেটাকে প্রায়ই অস্থির মনে হত, মনের তলায় কিছু যেন একটা ক্ষোভ পুষছে। আর মাঝে মাঝে তার তাকানোটাও কি-রকম অস্বাভাবিক আর ধার ধার লাগল।

...মাঝে কয়েক মাস দেখা হল না। আমার বি. এ. পরীক্ষা তার এম. এ. পরীক্ষা। আমি আশা করেছিলাম, পরীক্ষার ব্যাপারে তার কিছু সাহায্য পাব। বি. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস, তার সাহায্যের মূল্য সকলেই স্বীকার করবে। তাছাড়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। কিন্তু একেবারে নিপাত্তা।

কলেজের পরীক্ষাটাকে আমি জীবনে কোনোদিন খুব একটা বড় জিনিস বলে ধরে নিইনি—চিঠি লিখেও যখন জবাব পেলাম না, গোঁ-ভরে আমি নিজেই প্রস্তুত হতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ একদিন একটা চিঠি পেয়ে ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে গেল। আমার চিঠির উত্তরে চিঠি লিখেছে অনুপমের কাকা। বক্তব্য, অনুপম সম্প্রতি এক মানসিক চিকিৎসালয়ে আছে, অবস্থা রীতিমত খারাপের দিকে। সে আর তার একটি বোন তাদের মায়ের বংশগত রোগে ভুগছে।

...অনুপমের কাকা স্পষ্ট করে কেন আমাকে সেটা লিখেছিলেন অনুমান করতে পারি। সেই চিঠি পড়ে মনটা যে কত খারাপ হয়েছিল নিজেই শুধু জানি। চিঠিটা দাদুকে শুধু দেখিয়েছিলাম।

দুদিন বাদে দাদু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ছেলেটাকে তুই পছন্দ করেছিলি?

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছি।

দাদু আবার জিজ্ঞাসা করেছেন, পছন্দ মানে বিয়ে করবি ঠিক করেছিলি?

উল্টো মাথা নেড়েছি।—না সেরকম কিছু ঠিক করিনি।

দাদু বলেছেন, আচ্ছা ধরে নে তার কিছু হয়নি, সে যেমন ছিল তেমনি আছে—বি. এ. পাসের পর তাকে বিয়ে করতিস কি না?

জবাব দিইনি। তবে ভাবতে চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টা করতে গিয়েই ছেলেটার জন্য দুঃখ সত্ত্বেও নিজেকে আমি অনেকখানি বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পেরেছি। জীবনের পুরুষ হিসাবে এই মুখ আমার কাছে খুব একটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। উল্টে মনে হয়েছে অসুখ-বিসুখ না হলেও হৃদ্যতার পরিণাম বিয়ে পর্যন্ত গড়াত না।

অথচ, অনুপম মজুমদারের জন্য অনেকদিন আমার ভিতরটা বিষণ্ণ হয়েছিল এও সত্যি কথা।

বি. এ. পরীক্ষার পর আমাদের কলেজের টিচার সুধাদির সঙ্গে আমরা তিন বন্ধু বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সুধাদি বয়সে কম করে বারো বছরের বড় আমাদের থেকে। কিন্তু সব মেয়ের সঙ্গেই সম-বয়সীর মতো ব্যবহার তার। আমি সাহিত্যিক হয়ে বসেছি বলে আমার সঙ্গে আবার সব থেকে বেশি খাতির। চারজন মেয়েছেলের এ-ভাবে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারে এক মা ছাড়া আর কারো আপত্তি হয়নি।এ পর্যন্ত দাদুর সঙ্গে আর বাবা মায়ের সঙ্গে বহু জায়গায় অমি ঘুরেছি, কিন্তু স্বাধীনভাবে বেরুনো সেই প্রথম।

বেরুবার আগেও দাদু ঠাট্টা করেছিলেন, দেখিস রে বুড়ি, এ বয়সে বুড়োকে পথে বসাস না।

আমিও ফিরে ঠাট্টা করেছিলাম, তোমার ভয়টা কিসের, বাঁদরের!

আশ্চর্য কাণ্ড। এ-রকম কৌতুককর যোগাযোগও জীবনে ঘটে? বাঁদরের খপ্পরেই পড়েছিলাম আমি—বাঁদর বলতে সত্যি-সত্যিই গদ্যাকারের বাঁদরের দঙ্গল।

সুধাদি আর আমরা তিন বন্ধু—আমি, রমা আর বীণা বিকেলের আগেই ইতমৎউদদ্দল্লায় ঢুকেছিলাম। বিশাল চত্বরের মধ্যে ইতিহাসের স্মৃতিসৌধ। চেয়ে চেয়ে দেখার মতোই পাথরের জালির কাজ। সে সব দেখার পর বেড়াতে বেড়াতে আমরা বাগানের রাস্তা ধরে চলে এসেছিলাম যমুনার দিকে। লোকজন নেই বললেই চলে। কিছু দূরে দুটি ছেলে শুধু বেড়াচ্ছে দেখছি। না দেখি না দেখি করে মাঝে-মাঝে তারা সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও দেখে নিচ্ছে। ছেলে দুটোর একজন যে বেশ হাসি-খুশি ফুর্তিবাজ চাউনি দেখলেই বোঝা যায়।

আমাদের মধ্যে রমাই ফাজিল সব থেকে বেশি। সুধাদির কান বাঁচিয়ে ও বলল, এখানে তাজমহল, এখানে ইতমৎউদদল্লা, এখানে আরো কত কি, সত্যি ভাই আগ্রায় এসেও প্রেমে না পড়ার কোনো মানে হয় না।

ছেলে দুটোকে একবার ইশারায় দেখিয়ে তেমনি ফিসফিস করে আমি জবাব দিলাম, পড় গে যা না, ওই তো যাচ্ছে—

রমা জবাব দিল, উঁহু, আমার মতো পেত্নীর দিকে কোনো ভূতেও ফিরে তাকাবে না—তোর পরিচয় পেলে বরং জিভের জল টসটসিয়ে উঠবে।

একটু বাদে ছদ্ম-গম্ভীর মুখে রমা আবার বলল, আমাদের তিনজনের কারো প্রেমে পড়াটা একেবারে গতানুগতিক ব্যাপার—সব থেকে ভালো হত সুধাদিকে প্রেমে পড়াতে পারলে। কিন্তু তার বয়সের তুলনায় ছোঁড়া দুটো যে আবার বেজায় পুঁচকে।

আমাদের হাসি সামলানো দায়। সুধাদি বার দুই এর মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের লক্ষ্য করেছে। এবারের হাসি সামলাবার চেষ্টা দেখে ভুরু কুঁচকে ফিরেই দাঁড়ালো।—আমাকে ফাঁকি দিয়ে কি রসিকতা হচ্ছে সেই থেকে? বল শিগগির, শুনব—

আমতা-আমতা করে রমা জবাব দিল, না সুধাদি, চন্দ্রাণী সাহিত্যিক তো, তাই এখানে এসে ওর অনেক কথা মনে হচ্ছিল—

মনে হচ্ছিল?

আমার সশংক ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ও জবাব দিল, এই, ইয়ে—বলছিল, আগ্রার বাতাসে প্রেম-টেম ছড়ানো—

অপ্রস্তুত হয়ে সুধাদিও হেসেই ফেলল।—দেব ধরে এক-একটা থাপ্পড়!

হাসি সামলাবার চেষ্টায় আমার আর বীণার প্রাণান্তকর অবস্থা।

ঠিক সেই সময় ওই অকল্পিত ঘটনা।

আমাদের গজ তিরিশেক দূরে রাস্তা জুড়ে উল্টোদিক থেকে আসছে গোটা পাঁচেক বাঁদর। সেইদিকে চোখ পড়তেই বীণা বলে উঠল, ও মা-গো, ওঁরা আবার রাস্তা ধরে আসছেন কেন—কিছু করবে না তো!

একটু খেয়াল করলে অনেক দূরের সেই গেটের দিক থেকে একটা চেঁচামেচির মতো শুনতে পেতাম। কিন্তু বাঁদরগুলোকে ভালো মুখ করে এগোতে দেখে সেদিকে চোখ কান গেল না। আমি বললাম, সোজা এগিয়ে চল, কাছাকাছি হলেই ওঁরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেবেন—

দশ-পনের পা এগোতেই আচমকা দিশেহারা ত্রাস আমাদের। হঠাৎ বাঁদরগুলো আমাকে আর বীণাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তেড়ে এলো। সুধাদি আর রমা খানিকটা ছুটে গিয়ে রেহাই পেল, আর আর্তনাদ শুরু করে দিল। আমাকে ছেঁকে ধরেছে একসঙ্গে তিনটে বাঁদর আঁচড়ে কামড়ে দিতে চেষ্টা করছে। আমি দিশেহারা ত্রাসে পালাতে চেষ্টা করছি। কামড়াতে না পারলেও নখের আঁচড় লাগছে। আমার শাড়িটা এমন কি শায়াটাও ছিঁড়ে ফালা-ফালা। সে-কি রাগ আর খকখক শব্দ ওগুলোর—মূর্তিমান যম যেন তিন তিনটে—আতঙ্কে সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে—প্রাণ বাঁচানোর সে কি মর্মান্তিক চেষ্টা আমার।

চোখের সামনে রাজ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। হঠাৎ সব থেকে বড় বাঁদরটা কি একটা আঘাত খেয়ে ছিটকে সরে গেল, আর কে যেন হাত ধরে দু'হাতে টেনে নিলো আমায়। আমি তাকে আঁকড়ে ধরতে গেলাম। সেই ছেলে দুটোর একজন। বীণার দিকের দ্বিতীয় ছেলেটার বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত আক্রোশে ওই দুটো বাঁদরও আমার দিকের তিনটের সঙ্গে যোগ দিল। ছেলেটার দিক থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নেবার সে-কি বীভৎস দুর্জয় পণ ওদের। সেই সময় ওই দ্বিতীয় ছেলেটাও এদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাঁদরগুলো একটু দূরে দাঁড়িয়ে গজরাতে লাগল। ততক্ষণে লাঠি-সোটা নিয়ে হৈ-চৈ করতে করতে লোক ছুটে আসছে।

বাঁদরগুলো পালালো।

আমার তখনো নাড়ি ছাড়ার অবস্থা। ভয়ে ত্রাসে ঠক-ঠক করে কাঁপছি। ছেলেটার বাহু আঁকড়ে ধরেছিলাম, এবারে বসে পড়লাম। চোখের সামনে রাজ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে সুধাদি বীণা আর রমা তিনজনে মিলে ধরাধরি করে আমাকে টেনে তুলল। মাথাটা তখনো ঝিম-ঝিম করছে। পরনের শাড়িটার যে অবস্থা অন্য সময় হলে লজ্জায় মরে যাবার কথা। কিন্তু ও-সব লক্ষ্য করার মতোও স্নায়ুর দখল হারিয়েছি।

ধরাধরি করে আমাকে টাঙ্গায় তোলা হল। সেখান থেকে হোটেলে। ছেলে দুটোর আমাকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কোথায় লেগেছে না লেগেছে সুধাদি টাঙ্গাতে উঠে বসেই ভালো করে দেখে নিয়েছিল। শাড়ি শায়ার ভিতর দিয়ে তেমন কিছু লাগেনি। পায়ের দুই এক জায়গায় ছড়ে গেছে। আসলে সেই বীভৎস টানাটানির ফলে আমার প্রাণান্ত দশা। শাড়িটার যা অবস্থা হাসপাতালে যাই কি করে। হোটেলের একজন ডাক্তার আনার অনুরোধ জানিয়ে সুধাদি আমাদের নিয়ে হোটেলে ফিরল।

নিজেদের ঘরে শয্যা নিয়ে ততক্ষণে খানিকটা সুস্থ হয়েছি। তবু যতবার মনে পড়ছে ব্যাপারটা ততবার শিউরে উঠছি। কিছুই প্রায় হয়নি বটে, কিন্তু কি যে হতে পারত ওই ছেলে দুটো না থাকলে ভাবা যায় না। সুধাদিও বারবার সেই কথাই বলছিল। পরে হাসি চেপে মন্তব্যও করেছে, তোকে যে ছেলেটা বাঁচালো সে-ও ওই বাঁদরগুলোর থেকে কম যায় না, বড় বাঁদরটাকে তো ফুটবলের মতো লাথি মেরে সরাচ্ছিল।

রমা ততক্ষণে মুখ টিপে হাসার অবস্থায় এসেছে। আর আমারও স্বাভাবিক লজ্জা সঙ্কোচ ফিরে এসেছে। সুধাদি সরলেই রমার মুখ খুলবে বুঝতে পারছি।

ডাক্তার সঙ্গে করে ছেলে দুটি ঘরে ঢুকতে সুধাদি বলল, পায়ের দু'চার জায়গায় ছড়ে গেছে, এ ছাড়া আর কিছু হয়নি—ডেটল ঘষে দিয়েছি।

যে ছেলেটা বীণার দিক থেকে পরে আমার সাহায্যে এসেছিল, সে বলল, বাঁদরের আঁচড় বিষিয়ে উঠতে পারে, ইনজেকশন দিতে হবে।

ডাক্তারও পরীক্ষা করে সেই মতই সমর্থন করল এবং বিতিকিচ্ছিরি ইনজেকশন দিয়ে ছাড়ল। সেই পেল্লায় ইনজেকশনের এত যন্ত্রণা যে এই ছেলে দুটোর মাতব্বরির জন্যেই উল্টে রাগ হল আমার। ডাক্তারের আর কি. তার তো ইনজেকশন দিতে পারলেই বাড়তি পয়সা।

ডাক্তার তার কাজ সেরে বিদায় হবার পর সুধাদি খুব স্বাভাবিক সৌজন্যেই ছেলে দুটোকে আপ্যায়ন জানালো, বসুন, চা খেয়ে যান—আপনারা না থাকলে আজ প্রাণ নিয়ে ফেলা দায় হত।

যে ছেলেটা আমার দিকের হিরো সে তৎক্ষণাৎ জাঁকিয়ে বসে সঙ্গীকে বলল, বোস প্রশান্ত, চায়ের তেষ্টা পেয়েছে বটে। তারপর সুধাদির দিকে চেয়ে হেসে বলল, ওই বাঁদরগুলো কি করে জানবে আমরা তাদের থেকে কম যাই না।

সকলেই হাসতে লাগল। সে আবার বলল, আমার নাম সুধীর—সুধীর দত্ত, আর ইনি প্রশান্ত রায়—আমার ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড। আমরা দুজনেই একেবারে হবু-হবু ডাক্তার—এবারে ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছি—দিয়ে বাঁদরের দেশে অর্থাৎ আমাদের জাত ভাইয়ের দেশে বেড়াতে এসেছি।

সকলের আর একপ্রস্থ হাসির ফাঁকে আমার হঠাৎ দাদুর কথা মনে পড়ে গেল।

সুধাদি নিজের পরিচয় দিল, ওমুখ কলেজের মাস্টার—এরা ছাত্রী, তিনজনেই বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। তার কথা একরকম কেড়ে নিয়ে রমা হড়বড় করে আমার বাড়তি পরিচয়টা বেশ সাড়ম্বরেই বিস্তার করে ফেলল। শেষ হতে সুধীর দত্ত সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে বার কয়েক নিরীক্ষণ করল আমাকে, তারপর সঙ্গীর দিকে ফিরে বলল, আর চা খেয়ে কাজ নেই, পালাই চল—

বলার ধরনে খারাপ লাগার বদলে উল্টে আরো হাসির উদ্রেক করল। সুধাদি মাস্টার মানুষ, এরই মধ্যে আপনি থেকে অনায়াসে 'তুমি'তে পাড়ি দিল। রমাকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে তার দিকে ফিরল, তোমরা বয়সে অনেক ছোট, তুমি বলছি কিছু মনে কোরো না—পালাবে কেন?

বিড়ম্বিত মুখ করে সুধীর দত্ত জবাব দিল, আমি যে ওঁর লেখা কিছুই পড়িনি।

প্রশান্ত রায় বলল, আমি পড়েছি। আমার উপন্যাসখানার নামও করল। ভাবলাম এবারে একটু প্রশস্তিও করবে বোধহয়। তা অবশ্য করল না। সুধীর দত্ত নালিশের ভঙ্গিতে তাকালো আমার দিকে। দেখলেন, বিশ্বাসঘাতক আর কাকে বলে!

ইনজেকশনের দরুন আমাকে তখনো শুইয়ে রাখা হয়েছে। এই দুটো লোকের চোখের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকতে অস্বস্তি লাগছিল।

সকলের চা জলখাবার উদরস্থ হবার ফাঁকে কথা-বার্তার ধারা আরো একটু অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। সুধাদি বলল, কিন্তু কি কাণ্ড, দেখার জায়গায় এমন বাঁদরের উৎপাত, কত সময় কত মেয়ে তো সাংঘাতিক বিপদে পড়তে পারে। এর কোনো ব্যবস্থা থাকা উচিত—

প্রশান্ত রায় বলল, এই উৎপাত হালে শুরু হয়েছে। এখানকার কোন এক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জন্য হালে ওদিক থেকে একটা বাঁদর ধরা হয়েছিল শুনলাম—তারপর থেকে এইরকম হচ্ছে—ট্যাঁরা পিটিয়ে ক'দিন নাকি লোককে সাবধান করা হয়েছে।

পলকা গাম্ভীর্যে সুধীর দত্ত আমার দিকে তাকালো।—সোজা ব্যাপারটা বুঝলেন না? যে বাঁদরটিকে ধরা হয়েছে তিনি ওই জাঁদরেল বাঁদরটিরই মহিলা হবেন, মানুষ তাঁকে ধরে নিয়ে গেছেন বলে প্রতিহিংসায় মানুষ মহিলাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর শূন্যস্থান পূরণের সঙ্কল্প—নইলে বেছে বেছে শুধু মহিলাদেরই আক্রমণ করবে কেন!

সেই দিনই বুঝেছিলাম লোকটা যেমন বাচাল তেমনি দুর্মুখ।

পরদিনও তারা আমার খবর নিতে এলো, আর সানন্দে চা-জল-খাবার খেয়ে গেল। তারা চলে যেতে রমা ঘোষণা করল, আমাদের চা-জলখাবারের খরচা বেশ বেড়ে গেল মনে হচ্ছে, যে-কদিন আছি এখানে রোজ একবার করে অন্তত ওঁরা আসবেনই।

সুধাদি বলেছে, তুই তো কম অকৃতজ্ঞ নোস, চা-জলখাবারের বাড়তি খরচা না হয় আমিই দেব—সেদিন ওরা না থাকলে কি হত!

সে সরে যেতে রমা আমার দিকে চোখ পাকালো, শুধু চা-জল-খাবার কৃতজ্ঞতার শেষ! তারপর হেসে সারা, সত্যি বলছি আমার এখন মনে হচ্ছে আগ্রায় বাতাসে প্রেম ছড়ানো। সেদিন তুই যে-ভাবে জাপটে-মাপটে ধরেছিলি লোকটাকে, তার তো বারোটা বেজেই গেছে, তোরও না জানি ভিতরে ভিতরে কি কাণ্ড হয়ে গেছে। ওই হতভাগা বাঁদরটা যদি আমাকে ধরত তাহলে সত্যি বলছি এই রূপ নিয়েই উৎরে যেতে চেষ্টা করতাম—বলতাম, হে নাথ, ওইভাবে জাপটে ধরার ফলে হৃদয় মন প্রাণ সব সমর্পণ করে বসেছি, এখন তুমি রাখো তো রাখো, নইলে যমুনার জলে এ প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া গতি নেই—তা না, ওই বাঁদর পামরও বেছে বেছে ধরে বসল তোকেই। ও ব্যাটারও চোখ আছে—

রমা কলেজের থিয়েটারের নাম করা শিল্পী। আমি আর বীণা হেসে সারা।

রমা যা-ই বলুক, রূপসী আমাকে কেউ বলবে না। আমার গায়ের রং খুব ফর্সা নয়। তাছাড়া নাক মুখ চোখও গল্প-উপন্যাসের নায়িকাদের ধারে-কাছে নয়। তবে সুশ্রীও বলে থাকে সকলে। ভালো স্বাস্থ্য, পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি মাথায়, আর দাদুর মতে আমার নাক ঠোঁট সঙ্কল্পব্যঞ্জক, চোখে গভীর বুদ্ধির ছাপ আছে—আর সব মিলিয়ে তাঁর চোখে আমি রসোগোল্লার মতো মিষ্টি। তাছাড়া আমি এটুকু অনুভব করতে পারি মেয়েদের রূপের সঙ্গে কতগুলো আনুষঙ্গিক ব্যাপারের যোগ আছে। সে-দিক থেকে শুধু রমা কেন, অনেক মেয়ের চোখেই আমার ভাগ্যটা অনুকূল। ভালো-স্বাস্থ্য কোনো শিক্ষিতা সুশ্রী সপ্রতিভ মেয়ে যদি এই বয়সে এমন তেড়ে-ফুঁড়ে সাহিত্যিক হয়ে বসে, তাহলে রূপের বাজারে সে প্রায় রূপসী বলেই চলে যেতে পারে। তার আকর্ষণটা যে অন্তত সেই গোছের হয়ে দাঁড়ায় মুখে কখনো প্রকাশ না করলেও মন দিয়ে সেটুকু অন্তত বুঝতে পারি।

সেদিন অনেক বার করে দেখা তাজমহলে বেড়াচ্ছিলাম আমরা! সন্ধ্যা সবে পার হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। পিছনের দিকে বিশাল চত্বরে অন্ধকার জমাট বাঁধছে। চত্বরের শেষ মাথার ও ধারের কার্নিশে ঝুঁকে নীচের শুকনো যমুনা দেখছিলাম। জায়গাটা নির্জন হয়ে গেছে দেখে সুধাদি যাবার তাড়া দিচ্ছিল। আমরা শুনেও শুনছি না।

পাঁজরে একটা বড় রকমের খোঁচা খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। খোঁচাটা মেরেছে রমা। দেখি আবছা অন্ধকারে হাসি মুখে দুই মূর্তি এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে সুধীর দত্ত বলে উঠল, কি কাণ্ড, আপনারা এ সময়ে এখানে!

সুধাদি হাত পনের দূরে ছিল, সেই সুযোগে রমা ফস করে বলে বসল, কেন, বড্ড বেশি খুঁজতে হয়েছে আপনাদের?

তা না, তবে আর হাওয়া না খেয়ে অনুগ্রহ করে ফেরার রাস্তা দেখুন।

এই কথা আর এই মাতব্বরি আমার একটুও ভালো লাগল না। সুধাদিকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখেও বললাম, আপনাদের তাড়া থাকে তো যান না, আমাদের কোন তাড়া নেই।

প্রশান্ত রায় হেসে সঙ্গীর উক্তি নরম করতে চাইল। বলল, ওর কথা হল এই নির্জনে মেয়েদের এখানে একলা-একলা ঘোরা-ফেরা করাটা ঠিক নয়—শুনেছি বহুকাল আগে একদল ডাকাত নাকি এ-রকম সুযোগের ফিকিরেই থাকত। গয়না-পত্র-কেড়ে নিয়ে ওই নীচের যমুনায় ফেলে দিলেই তো হল, জোয়ারে কোথায় ভেসে যাবে ঠিক নেই। আগে আগে এ-রকম নাকি অনেক হয়েছে—তার থেকে খারাপ ব্যাপারও ঘটেছে।

শোনামাত্র আমাদের গা ছমছম করে উঠল। অন্ধকারেই নীচের দিকে তাকালাম একবার।

সুধীর দত্ত বলল, আমরা যাই তাহলে, আপনারা হাওয়া খান।

সুধাদি বলে উঠলেন, দাঁড়াও বাপুরা, এতবড় চত্বর একলা পেরুতেও ভয় করছে এখন—সেই কখন থেকে মেয়েগুলোকে বলছি, চল্ চল্, আমার কথা কানে তোলে ওরা।

অতএব মুখ বুজেই চত্বর পেরিয়ে নেমে এলাম। মনে মনে রাগও হচ্ছিল। তাজমহলের আঙিনা পার হয়েই ওদের জব্দ করার জন্য বললাম, একটা টাঙ্গা ধরো, হাটতে ভালো লাগছে না।

এত কাছে হোটেল, তবু টাঙ্গা ডাকতে বলছি শুনে সুধাদি অবাক একটু। কিন্তু এত সাহস ওই সুধীর দত্তর যে হাসি-হাসি মুখ করে ফস করে বলে বসল, হাঁটলে কিন্তু মাথা বেশ ঠাণ্ডা থাকে।

হোটেলের ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে সুধীর দত্ত সহজ দাবীর সুরে সুধাদিকে বলল, বেশ ভালো করে বানাবার অর্ডার দিন দিদি, আর সঙ্গে কিছু খাবার-টাবার হলে ভালো হয়। অনেক হেঁটে আজ বেজায় পরিশ্রম হয়ে গেছে—

যেন পরিশ্রম বেশি হলে ওদের তাজা করে তোলার দায় আমাদের। সুধাদি হাসি মুখে হুকুম তামিল করতে গেলেন। যত সাহসী মাস্টারই হোন সুধাদি সঙ্গী হিসাবে এই ছেলে দুটোকে সহায় ভাবতে শুরু করছেন। বীণা আর রমাও যে ওদের বেশ পছন্দ করছে বোঝা যায়। কলকাতায় বাঁধা-ধরা দিন-যাপনের মধ্যে বাইরের এই মেলামেশায় একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ আছেই। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমিও যে ওদের অপছন্দ করছি এমন কথা বলতে পারব না। কিন্তু ইতমৎউদদল্লার এই বাঁদরগুলোর শিকার হবার ফল অর্থাৎ আমার সেই বিতিকিচ্ছিরি হেনস্থার সুযোগেই যে ওরা এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে, তাতেই আমার অপত্তি। আমার সেই অসহায় অবস্থাটা ওরা না দেখলে হয়ত এমনটা হত না। বাঁদরের শিকার বীণাও হয়েছিল কিন্তু বরাতজোরে ও যেন টুপ করে সেই প্রহসনের বাইরে দাঁড়িয়ে গেল। আমার চাপা অসহিষ্ণুতার আড়ালে মনস্তত্ত্বগত কারণও ছিল কিছু। ওই বয়সেই গল্প লিখিয়ে মেয়ে আমি, বুঝব না কেন? ছেলে দুটোর চোখ যে সকলকে ছেড়ে আমার দিকে সেটা আমি অনায়াসে অনুভব করতাম। রমা তো ফাঁক পেলেই ঠাট্টা করে, হিংসা হিংসা—হিংসেয় আমি আর বীণা একেবারে জ্বলে পুড়ে গেলাম—কিন্তু ওই দু'দুটো ছোঁড়া তোকে নিয়ে করবে কি, দ্রৌপদীর দিন কি আর আছে যে পাঁচজনকে পাব, একটা তো আমাদের দিকে ফিরালেও পারে। আমার আর সুধাদির দিকে না-হয় বাঁদরগুলোও ফিরে তাকায়নি, কিন্তু বীণার তো একটু ভাগ পাবার অধিকার আছে।

এই ঠাট্টার ছাপ তখন পর্যন্ত আমার মনের ওপর পড়েনি সেটা ঠিক। উল্টে মনে হয়েছে, ইতমৎউদদল্লার ওই হতভাগা বাঁদরগুলো অমন প্রাণান্তকর সংকটে ফেলেছিল বলে পরে অন্তত কেউ যদি ভিতরে ভিতরে প্রচুর খুশি হয়ে থাকে তো ওই ছেলে দুটো হয়েছে। সেই বয়সে ওই দুর্বল চিন্তাটাই এক একসময় ওদের সামনে ক্ষোভের আকার নিত। মনে হত, দুজনের মধ্যে সুধীর দত্ত অন্তত যে মুখের ওপর ফটফট কথা বলে, সুযোগ পেলে একটু যে ঠাট্টাটাট্টাও করে—সেটা ওই কারণে। আমাকে সংকট থেকে উদ্ধার করতে পেরেছে বলে।

সুধাদি ঘর থেকে বেরুতেই সুধীর দত্ত আমার দিকে ঘুরে বলল। আমাদের ওপর আপনার হঠাৎ অমন...কি বলে, রাগ-ভাব কেন?

শোনামাত্র আমার রাগই হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলার আগেই রমাটা তড়বড় করে ইন্ধন যোগালো, রাগ-ভাব যে কি করে বুঝলেন?

সুধীর দত্ত জবাব দিল, বারে বা, সেটুকু বুঝতে আবার কোনো ছেলের অসুবিধে হয় নাকি! প্রথম কথা, উনি ধরে নিয়েছেন আমরা ভয় দেখিয়ে আপনাদের তাজমহল থেকে বার করে আনলাম, দ্বিতীয়, আমাদের কাটান দেবার জন্য উনি এই পাঁচ মিনিটের পথ টাঙ্গায় আসতে চাইলেন, এর পরেও বুঝব না আমরা কি এত মুখ্খু!

ভিতরে তেতে উঠলেও বোকার মতো সেটা প্রকাশ করার পাত্রী নই আমি। হেসেই ঠেস দিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাদের কাটান দেওয়া গেলই না।

এক গাল হেসে সুধীর দত্ত জবাব দিল, সেটাই বাঁদরের দাদা এই হনুমানের একটা মস্ত গুণ, জ্ঞান-বয়স থেকে চোখ-কান কেটে বসে আছি—আমার এই বন্ধুর বরং ভদ্রলোকের মতো একটু-আধটু চক্ষুলজ্জা আছে, আপনাদের এখানে আসার কথা বললেই বলে, কি ভাববে, থাক্—

বীণা আর রমা হেসে উঠেছে। আর ভিতরে ভিতরে আমার আরো বেশি রাগ হয়েছে। তখন কি লোকটার চরিত্র জানি।

সুধাদি ঘরে ঢুকতে সুধীর দত্ত একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তাকে। বলল, বসুন দিদি—। তারপর তেমনি হাসিখুশি মুখে আবার আমার দিকে ফিরল।—আপনি সত্যিই ভেবেছেন আমরা মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে আপনাদের তাজমহল থেকে বার করে আনলাম, ঠিক কি না?

আমি তেমনি হাসতে চেষ্টা করেই জবাব দিলাম, ঠিক কিনা বেশ তো জানেন দেখছি।

গম্ভীর মুখে লোকটা তার বন্ধুর দিকে তাকালো, এই কাল রাতে যে গল্পটা বলেছিলি সেটা আর একবার শুনিয়ে দে তো—

প্রশান্ত রায় বলল সেটা তো গল্প—

তা হোক, তুই বল না, গল্প কি একেবারে ভুঁইফোড় হয় নাকি, সত্যের মালমশলা তার মধ্যে থাকে না!

রমা আর বীণা আগ্রহ দেখালো, কি গল্প, শুনবো। সুধাদিরও শোনার কৌতূহল।

চা জলখাবার উদরস্থ করার ফাঁকে প্রশান্ত রায় গল্পটা বলল। সত্যি কথা বলতে কি কান পেতে শোনার মতোই গল্প, আর গায়ে কাঁটা দেবার মতোও। বহুযুগ আগের তাজমহলের এক গাইডের জীবনকল্পনার ওপর গল্প। দুর্ধর্ষ মানুষ ছিল সেই লোকটা, মানুষ খুন করাটা জল-ভাত ব্যাপার ছিল তার কাছে। তার বউয়ের রূপ ছিল। সেই রূপসী বউকে লোকটা ভালোবাসত। কিন্তু বউ তাকে ঘৃণা করত। একদিন ফাঁক মতো এক বছরের মেয়ে নিয়ে সে অন্য লোকের সঙ্গে পালিয়ে গেল। মেয়েটা ছিল সেই শয়তান লোকটার চোখের মণি। সেই থেকে অকারণে খুন করে চলল লোকটা। বিবাহিতা কোনো রূপসী মেয়ে তাজমহলে এলে ছলে কৌশলে স্বামীসহ তাকে রাত পর্যন্ত আটকে রাখতে চেষ্টা করত। তারপর নির্জনে ওই পিছনের দিকটায় এনে মেরে ওপর থেকে যমুনায় ফেলে দিত। সকালের মধ্যে কচ্ছপ তাদের কোথায় টেনে নিয়ে যেতে ঠিক নেই। বছর কয়েক ধরে এ-রকম কত জোড়া মেয়ে পুরুষ সে খুন করেছে হিসেব নেই। শেষে বয়স হতে ওই খুনের নেশা তার কেটে গেছল।

প্রায় বিশ বছর বাদ এক নববিবাহিত দম্পতীকে দেখে হঠাৎ আবার কেন যেন সেই খুনের আগুন মাথায় জ্বলে উঠল। বড় ঘরের সেই মেয়েটাকে দেখে বউয়ের তাজা মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওই মুখ সে এ-যাবৎ ভোলেনি। অনেক রকমে ভুলিয়ে ওই দম্পতীকে রাত পর্যন্ত আটকে রাখল। তারপর ভয়াবহ ভাবে তাদের খুন করল—খুন করার আগে তার মনে হল নিজের সেই বউকেই খুন করছে—ত্রাসে বিস্ফারিত মেয়েটাকে তা বুঝিয়ে দিল।

এরপর কাগজে কাগজে নিখোঁজ দম্পতীর খোঁজ পড়ে গেল। আর তাই থেকেই প্রায় বৃদ্ধ ওই দুর্ধর্ষ লোকটা জানল সে তার নিজের মেয়ে জামাইকে হত্যা করেছে। গল্পের নাম—তাজমহল।

গল্পের নিছক সার এইটুকু। কিন্তু প্রশান্ত রায় যে-ভাবে বলল, সকলেরই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

একটু বাদে সুধীর দত্ত গম্ভীর চালে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এখন কি মনে হয়, তাজমহলের এই পিছনের চত্বরের অমন নিরিবিলিতে আপনাদের হাওয়া না খেতে দেওয়া অন্যায় হয়েছে?

আমার মাথায়ও তক্ষুনি একটু দুষ্টু বুদ্ধি চাপল। মানুষের দুর্বলতার শাশ্বত দিকটা ধরেই টান দেবার ইচ্ছে জাগল। তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে এবং জবাব না দিয়ে প্রশান্ত রায়ের দিকে তাকিয়ে গলায় প্রশংসা ঢেলে বললাম, আপনি তো খুব পড়েন...আর বলেনও ভারী সুন্দর!

কিন্তু আমার উদ্দেশ্য অনেকটাই ব্যর্থ। কারণ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওই সুধীর দত্তই প্রাণখোলা উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, ও একখানি আসল রত্ন বুঝলেন, আমার মতো হাঁক-ডাক সর্বস্ব মেকী নয়—সেই স্কুল থেকে এই ডাক্তার হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনোদিন ওর নাগাল পেলাম না, আবার গল্প লেখা ধরলে আপনার মতো সাহিত্যিকরাও হয়তো ওর শিষ্য হয়ে বসত। সস্নেহে বন্ধুর দিকে তাকালো সুধীর দত্ত, তুই-ই আমাকে পথে বসালি—

আমরা দিল্লী হয়ে কলকাতা ফিরলাম। ওরা দুই বন্ধুতেও তাই। আগ্রা থেকে দিল্লী কতটুকু আর পথ, তাই আগ্রায় যে বেড়াতে যায় তার দিল্লীর প্রোগ্রাম থাকেই। কিন্তু আমার কেবলই মনে হত ওরা যেন ইচ্ছে করেই আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। দিল্লীতে বেড়াবার সময় আমরা চারজন ট্যাক্সি নিতাম, ওরা স্কুটার। দেখা হতই, কারণ কবে কোথায় কি বেড়ানোর প্রোগ্রাম আমাদের ওরা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেই জেনে নিত। অন্য দর্শকরা ভাবত আমাদের ছ'জনেরই দল একটা। দুই একদিন হোটেলে এসেও আড্ডা জমিয়েছে। আমিও মিশেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে লেখিকাসুলভ দূরত্ব বজায় রেখেও চলেছি।

এক সঙ্গেই কলকাতায় ফেরার দিন ঠিক হয়েছে। ওরাই চেষ্টা-চরিত্র করে আমাদের রিজারভেশনের ব্যবস্থা করেছে। রমা চুপি চুপি ঠাট্টা করেছে, আমি যে ভেবেছিলাম আগ্রায় বাঁদর তাড়াতে গিয়ে যে যাকে ধরেছিল, শেষ পর্যন্ত সে-ই তাকে ধরবে—অর্থাৎ সুধীর দত্ত তোকে আর প্রশান্ত রায় বীণাকে, কিন্তু তা আর হলই না, দুজনারই তোর দিকে চোখ! একটা গল্প লিখে ফেল্ না—

নায়িকার নাম বদলে ওদের নিয়ে একটা গল্প লেখার বাসনা আমার মনেও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। একটা প্ল্যানও মাথায় এসেছে। আগ্রার কথা বা বাঁদরের কথা লেখা যাবে না, তাহলে পড়ামাত্র ধরে ফেলবে (আমার ধারণা আমার সব লেখাই এখন থেকে রেষারেষি করে পড়বে ওরা)। নায়িকাকে লেখিকা করলেও চলবে না। ডাক্তার বা স্কুলের বা কলেজের মাস্টার করা যেতে পারে। সেই নায়িকাকে বাইরের কোনো পরিবেশে যুতসই রকমের সংকটের মধ্যে ফেলতে হবে। সংকট ত্রাণের ভূমিকা নেবে উপস্থিত দুই বন্ধুর মধ্যে একজন। তার পরের আলাপ পরিচয় মেলামেশার পর সকলে ধরেই নেবে ওই ত্রাতার ভূমিকা যার নায়িকার পুরুষ সে-ই হবে। এরপর কাহিনিতে একটা মোক্ষম কিছু মোচড় আনতে হবে। পরিণামে ত্রাতা নয়, নায়িকার জীবনবাস্তবে বা যৌবনবাস্তবে নায়িকার দোসর হয়ে বসবে দ্বিতীয় মানুষটি, অর্থাৎ বন্ধুটি।

তখন কি ছাই একবারও কল্পনা করতে পেরেছি নিজের ভবিতব্যের সাদাসাপটা ছকটাই দেখছি আমি! গল্পের থেকেও বাস্তব অভিনব, ও-বয়সে সে-জ্ঞান আমার ছিল না।

কলকাতায় ফিরেই দাদুকে সবিস্তারে বাঁদরের ঘটনাটা বলেছিলাম। ভূমিকায় রসিকতা করেছিলাম, আমাকে নিয়ে আগ্রায় বাঁদরের সঙ্গে হনুমানের খণ্ড-যুদ্ধ হয়ে গেল—

সেই খণ্ডযুদ্ধের বিবরণ শুনে দাদুর দুই চক্ষু বিস্ফারিত প্রথম। পরে হেসে বাঁচে না। তারপর জিজ্ঞাসা করল, দুজনের মধ্যে তুই কাকে বরণ করলি? তাছাড়া তোকে নিয়ে ওদের মধ্যে আবার বালী-সুগ্রীবের ব্যাপার হয়ে যাবে না তো?

সে-রকম আশংকা আমার মনের তলায় যে ছিল না তা নয়। দাদুর ভাষায় বরণ না করলেও ওই সুধীর দত্তকে আমার মোটামুটি ভালোই লেগেছিল। লোকটা বাচাল বটে কিন্তু সেই বাচালতার মধ্যেও এক ধরনের পুরুষের ধার আছে। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন এই ভালো লাগা মানে প্রেমে পড়া নয়। তখন পর্যন্ত আমার ভিতর থেকে অনুপম মজুমদারের ছাপটা একেবারে মুছে যায়নি। পুরুষের এক ধরনের ধার আমি তার মধ্যেও দেখেছিলাম। প্রায়ই মনে হত সেটা ব্যর্থতার দরুন। তাই তার ব্যর্থতাব প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল। ইউনিভার্সিটিতে পড়তেই সেই ছেলে ভাবতো, তার মধ্যে বড় হবার স্ফুলিঙ্গ ছিল, সেটা আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারল না। ওর বংশের ধারা জানি না তখনো তাই মনে হত ওই ব্যর্থতার যন্ত্রণা ঘুচলে ওই লোক অন্য মানুষ হয়ে উঠবে।

কিন্তু সুধীর দত্তর পুরুষকারের ধার একেবারে ভিন্ন জাতের। তার মধ্যে ব্যর্থতার যন্ত্রণা নেই কিছুমাত্র। ওই অল্প দিনের হৃদ্যতায় মনে হয়েছে, সর্ব ব্যাপারে একটা প্রবল বেগে চলার ধাত তার। আচরণ দেখলে মনে হবে কোনো প্রত্যাশার বালাই নেই তার মধ্যে। এই আচরণ মেকী কিনা তখন পর্যন্ত সেই সন্দেহ আমার পুরোমাত্রায় ছিল। সংশয় মেশানো এই কৌতূহলের নাম যে প্রেম নয়, তার কারণ, বন্ধুর প্রায় বিপরীত স্বভাবের মানুষ প্রশান্ত রায়কেও আমার খারাপ লাগেনি। লেখা-পড়ায় সে যে একটি উজ্জ্বল রত্নবিশেষ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুধীর দত্ত সেটা অনেকবার শুনিয়েছে। সুধীরের তুলনায়

ওই লোক স্বল্পভাষী, কিন্তু চোখে মুখে সপ্রতিভ বুদ্ধির ছাপ। দিল্লীতে রমার ঠাট্টার জবাবে বীণা বলেছিল, তা আমার ভাই চন্দ্রাণীর দস্যি হনুমানের থেকে আমার রক্ষাকর্তা ওই ঠাণ্ডা মানুষটাকেই বেশি ভালো লেগেছে সত্যি কথা।

গোড়ায় গোড়ায় ছুটির দিনে দুই বন্ধু একসঙ্গেই বাড়িতে আসত। কবিতা পড়ুক না পড়ুক দাদুর নাম সকলেই জানে—তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে আসবে এ-প্রস্তাব তারা দিল্লীতেই দিয়ে রেখেছিল।

তাদের আনাগোনা বাড়তে পাড়ার যে ছেলেদের আমার প্রতি একটু সপ্রেম নজর ছিল, তারা সচকিত হয়ে উঠল। বাড়িতে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে থাকলে তার বাপ মায়ের ছেলে-যাচাইয়ের চোখ থাকেই। সে যাচাইয়ে সুধীর দত্ত অনেকটাই পিছনে পড়ে গেল। প্রশান্ত রায়ের বাবা পদস্থ সরকারি অফিসার ছিলেন, সম্প্রতি রিটায়ার করে বহরমপুরেই বাড়ি করেছেন। তাঁর একটিমাত্র ছেলে, আর মেয়েও নেই, এমন কি শাশুড়ীও নেই, অতএব এমন ঘরে যে মেয়ে যাবে সে যে সুখে থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি। অন্যদিকে সুধীর দত্ত ওই বাড়িতেই খেয়ে-পরে মানুষ। সে-গল্প সুধীর দাদুর কাছে নিজেই করেছে।

অস্বীকার করব না, এই স্বাভাবিক যাচাইয়ের ধরনটা আমি খুব সুচক্ষে দেখিনি।...এই সময় ছোট একটা ঘটনা ঘটল, আর সেই ছোট ঘটনার আয়নায় সুধীরকে যেন আরো একটু স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম। এক সৌখিন অ্যামেচার পার্টি আমার উপন্যাসখানার নাট্যরূপ দিয়েছে। ছুটির দিনে শহরের এক নামকরা মঞ্চে সেই নাটকের অভিনয় হবে। সকাল থেকেই আমার ভিতরে একটা রোমাঞ্চ চলেছে। বাড়ি থেকে শুধু দাদু যাবে। বাবা-মা এ সবের ধার ধারে না। আর সুধীর দত্ত আর প্রশান্ত রায় যাবে। খুশিতে ভরপুর হয়েই আমি ওদের দুজনকে নেমন্তন্ন করেছিলাম। নিজের চোখে আমার কদর দেখুক, মনের তলায় এই লোভও ছিল অস্বীকার করব না।

থিয়েটার শুরু হয়ে গেল। আমার এক পাশে দাদু বসে, অন্য পাশের দুটো সিটই খালি। ওদের দুজনের দেখা নেই। আমি উস্‌খুস করছি টের পেয়ে দাদু চাপা গলায় রসিকতা করল, আমাকে এ-ভাবে অপমান করবি তো উঠে চলে যাব বলে দিলাম, ওরা নেই তাতে কি, আমি তো আছি।

জবাবে আমি দাদুর হাঁটুতে জোরেই চিমটি কাটলাম একটা।

এর একটু বাদেই অন্ধকার হাতড়ে দুই মূর্তি হাজির। প্রশান্ত রায় আমার পাশে বসল, তার পাশে সুধীর দত্ত। এবারে নিঃশব্দে দাদু একটা চিমটি কাটল আমাকে। প্রশান্ত রায় ফিসফিস করে বলল একটু দেরি হয়ে গেল, রাস্তায় আটকে গেলাম—

বলতে ইচ্ছে করছিল, কলকাতার রাস্তায় আটকে যাওয়াটা স্বাভাবিক, সে-কথা চিন্তা করে একটু আগেই বেরুনো উচিত ছিল।

কিন্তু কিছু না বলে মঞ্চের দিকে মনোযোগ দিলাম। বললে নিজের লেখা গল্পের প্রতি বেশি দরদ দেখানো হবে।

প্রথম অঙ্কের পর আলো জ্বলতে দাদু হাসিমুখে সামনের দিকে ঝুঁকল। কি ভায়ারা, এত দেরি কেন, সময়ে এলে নাটক জমে না বুঝি?

দাদু আর বাবা মায়েরও যে প্রশান্ত রায়ের ওপরেই চোখ বেশি সেটা আমি অনুভব করতে পারি। নইলে দাদু যত রসিক মানুষই হোক, দাদু এমন লাগাম ছাড়া ঠাট্টা বাইরের লোকের সঙ্গে অন্তত করে না।

প্রশান্ত রায় একবার আমার মুখখানা দেখে নিয়ে দাদুর কথার জবাব দিল। বলল, একটা হাঙ্গামায় পড়ে গেলাম, যে বাসে আসছিলাম সেটাতেই অ্যাকসিডেন্ট—কোথা থেকে একটা রাস্তার ছেলে এসে হুড়মুড় করে বাসটার তলায় চাপা পড়ল। সেই হৈ-চৈ থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে তবে আসা—

—ও মা! আমার গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরুলো একটা।

উতলা মুখ করে দাদু বলল, দেখো কাণ্ড, ছেলেটা বাঁচবে?

—আমার মনে হল বাঁচবে, সুধীর বলছে বাঁচবে না।

আমি তার পাশ দিয়ে সুধীরের দিকে তাকালাম। দেখি, চুপচাপ সাদা পরদার দিকে চেয়ে বসে আছে সে। মনে হল ভাবছে কিছু। এই মুখভাব কৃত্রিম কি অকৃত্রিম বুঝতে চেষ্টা করলাম। বোঝা গেল না।

পরের অঙ্ক শুরু হল এবং যথাসময়ে শেষ হল। চার অঙ্কের বই। এবারে আলো জ্বলতে প্রশান্ত রায় অবাক একটু। তার পাশে সুধীর দত্ত নেই, আসন খালি। প্রথমে ভাবলাম বাইরে গেছে। পরের অঙ্ক শুরু হতেও এলো না যখন আমিও অবাক। প্রশান্ত রায় বার বার বাইরের দিকে তাকাতে লাগল, অনেকেই সময়ে ফেরে না বলে বার বার দরজা খোলা হচ্ছে। তারপর বলল, পাশ থেকে কখন উঠে গেছে টেরই পাইনি।

কে জানে কেন, আমার সত্যিকারের রাগ হচ্ছিল। বলতে ইচ্ছে করছিল, টের পাবেন কি করে, নাটক বাদে বাড়তি মনোযোগটুকু তো আমার দিকে। কিন্তু রাগ আসলে হচ্ছে সুধীর দত্তর ওপর। ঠাণ্ডা চাপা গলায় বললাম, ভালো লাগছে না তাই পালিয়েছেন হয়ত—

পাশ থেকে মৃদু জবাব এলো, তা নয় বোধ হয়...ঠিক হাসপাতালে ধাওয়া করেছে মনে হচ্ছে।

হাসপাতালে!

ওই যেখানে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে তার কাছেই যে হাসপাতাল আছে সেখানে গেছে মনে হচ্ছে। আসার সময়ই বলছিল, চল যাই—

এই কথা শোনার পরেও রাগ করব তেমন অমানুষ মেয়ে নই। বরং ভয়ানক কৌতূহল হল। বললাম, ভদ্রলোকের ভিতরটা খুব নরম বুঝি?

পাশ থেকে চাপা জবাবের সঙ্গে হাসির আভাস একটু—ঠিক উল্টো, আমার থেকেও ডবল শক্ত, ওই রকমই খেয়াল ওর।

জবাবটা একটুও ভালো লাগল না। নিজের সঙ্গে তুলনা করাটাও না। একজন রাস্তা থেকেই হাসপাতালে চলে যেতে চেয়েছে, এখানে এসেও চলেই গেছে। আর একজন নিশ্চিন্ত মনে বসে নাটক দেখছে, অথচ মুখে বলছে তার থেকেও ডবল শক্ত ভেতরটা।

...কিন্তু মিথ্যে যে বলেনি সেটা আমি ঢের ঢের পরে অনুভব করতে পেরেছি।

দু'দিন বাদে যখন দুজনেই আবার এলো আমি ছদ্মকোপে সুধীর দত্তর ওপর চড়াও হলাম।—নাটক ভালো লাগেনি সরাসরি বললেই হত, চুপিচুপি পালালেন কেন?

চুপিচুপি কি রকম?

অন্ধকারে কাউকে না বলে চলে গেলেন চুপিচুপি না তো কি?

ও...। হাসতে লাগল।—ব্যাপার কি জানেন, থিয়েটারের কিছুই দেখতে পারছিলাম না। চোখের সামনে থেতলানো ছেলেটাকে শুধু দেখছিলাম। আর ভাবছিলাম, বাঁচবে না মরবে। আমি ওকে মারছিলাম, আর আমার ভিতরের ডাক্তার বলছিল চেষ্টা করলে বাঁচতেও পারে। প্রশান্তও তাই বলেছিল। শেষে আমার ভিতরের ডাক্তার-এ আর আমাতে লড়াই লেগে গেল। আমি যত বলছি মরবে ডাক্তার তত বলছে বাঁচবে। শেষে চলেই গেলাম হাসপাতালে।

এ-রকম অদ্ভুত জবাব আর শুনিনি। জিজ্ঞাসা করলাম, বাঁচল না মরল?

হেসেই জবাব দিল, বাঁচল কিন্তু আমার হাত থাকলে ঠিক মেরে ফেলতুম।

আমি হাঁ। —এ আবার কি কথা!

খাঁটি কথা। একটা পা ভেঙেছে, দুটো হাত ভেঙেছে, বুকের দুটো রিব ভেঙেছে, বাঁচিয়ে কষ্ট দেওয়ার কোনো মানে হয়!

অবাক হয়ে আমি ওর মুখখানা দেখছিলাম। প্রশান্ত রায় বলেছিল তার থেকে ওর ভিতরটা ডবল শক্ত। কিন্তু তখনো কঠিনের আড়াল থেকে একখানা নরম মনই আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলাম আমি।

বাড়িতে প্রশান্ত রায়কে নিয়ে দাদুর সঙ্গে বাবা মায়ের কথাবার্তা এগোচ্ছে। ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষায় সকলকে টপকে গোলড্ মেডেল পেয়েছে সে-সুখবর বাড়ির লোকে অনেক আগেই

পেয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে, আরো বড় ডাক্তার হবার জন্য শিগগিরই সমুদ্র পাড়ি দেবে। অতএব এ-রকম একটা যোগ্য ছেলে যখন সেধে এগিয়ে এসেছে, সুযোগ হাত-ছাড়া হতে দেওয়া উচিত নয়।

অথচ দুজনের মধ্যে কার প্রতি আমার আগ্রহ বেশি সেটা স্পষ্ট করে কেউ বুঝতে পারছে না বলেই অস্বস্তি তাদের। হাব-ভাবে তারা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে, প্রশান্ত রায়ের মতো ছেলে হয় না।

এরপর এক আধদিন প্রশান্ত রায় একলাই এলো। আমার মনে হত সে-যেন যোগ্যতার দাবি নিয়েই আসছে। দ্বিতীয় দিনেও তাকে একলা দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, একলা যে, সুধীরবাবুর কি হল?

প্রশান্ত রায় হেসেই জবাব দিল, ওর নাম সুধীর হলেও মতি খুব ধীর নয়—ডাকলাম এলো না।

আমার কেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না জানি না। সেদিন আমার কথাবার্তা বা আচরণ থেকে প্রশান্তর মনে কোনোরকম খটকা লেগেছিল কিনা বলতে পারব না।

পরদিনও একলাই এলো প্রশান্ত রায়। হাব-ভাব গম্ভীর একটু। দাদু খানিক গল্প করে উঠে গেল। অন্তরঙ্গ আলাপের সুযোগ দিয়ে গেল, চাউনিতে সেটা স্পষ্ট করে আমাকে বোঝাতে ছাড়ল না। মা ভিতর থেকে চা-জলখাবার পাঠালো। থালা ভরতি জল-খাবার। ভিতরটা আমার অকারণেই কেমন তেতে উঠতে থাকল। যতটা সম্ভব সহজ মুখ করে বললাম, আজও সুধীরবাবুকে ডাকলেন, এলো না?

সোজাসুজি মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মতো একটু। মাথা নেড়ে জবাব দিল, তাই আর সেইজন্যেই আমি চলে এলাম—

ঠিক এই জবাব দেবে আর এ-রকম করে বলবে আশা করিনি। প্রশান্ত চায়ের পেয়ালা তুলেছিল, খাবারের থালা স্পর্শও করল না। পেয়ালায় গোটাকতক চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকালো আবার। আরো একটু গম্ভীর মনে হল। তারপর যে কথা বলল, একেবারে অপ্রত্যাশিত।

—দেখুন, সুধীরের যা স্বভাব, ও নিজের মুখে আপনাকে কোনোদিন কিছু বলবে আমার মনে হয় না।...এদিকে আমি বোধহয় আর খুব বেশিদিন থাকছি না এখানে।..আপনার মন আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, ওকে আমি যে করে হোক রাজী করাতে পারব। আমি না পারলেও বাবাকে দিয়ে পারবো। আর তারপর আপনার দাদু আর বাবা মাকে বলে বাকি ব্যবস্থাও করে যেতে পারবো। এখন আপনি যদি সঙ্কোচ ছেড়ে মতামতটা জানান সুবিধে হয়।

আচমকা অথৈ জলে পড়ে হাবুডুবু খাবার দাখিল আমার। আয়নায় না দেখেও নিজের মুখের অবস্থা বুঝতে পারছি। আরো খারাপ লাগছে এই ভেবে যে এই লোক বন্ধুকে বাতিল করে নিজে সামনে এগিয়ে আসতে চায় ধরে নিয়েছিলাম বলে। আমার ওই মনোভাব এই ছেলে বুঝতে পেরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই জন্যেই মুখ গম্ভীর। সেই সঙ্গে ওই মুখের দিকে চেয়ে আর একটা সত্যও মুহূর্তের মধ্যে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল যেন।...সামনে যে বসে আছে, আমার প্রতি তার দুর্বলতা আছে। কিন্তু আমি কি চাই সেটা বিবেচনা করেই নিজেকে ছেঁটে দিয়ে বন্ধুর জন্যে ফয়সালা করতে এসেছে। সেই জন্যেই শুকনো মুখ।

বিব্রত অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাগই হয়ে গেল আমার। মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দিল নিজে থেকে সুধীর দত্ত কোনোদিন এগিয়ে আসবে না, অর্থাৎ আমার মতো মেয়ের জন্য ওই লোকের তাপ উত্তাপ আশা করা বৃথা। অতএব তাকে ধরে বেঁধে রাজি করাতে হবে, দরকার হলে প্রশান্তর বাবার সাহায্য নিতে হবে—যেন সুধীর দত্তকে বিয়ে করার জন্য আমিই পাগল হয়ে উঠেছি।

একটু নীরস সুরেই জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বন্ধুর স্বভাব জেনেও তার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন?

জবাব দিল, আপনি আমাদের বাড়ি আসুন এটা চাই বলে।

—কে চায়, আপনি না আপনার বন্ধু?

—আমিই চাই।

—আপনাদের বাড়ি আর আপনার বন্ধুর বাড়ি এক?

—একের থেকেও বেশি।...আপনাকে আমি নিশ্চিন্ত করতে পারি, আপনি অযোগ্য লোকের হাতে পড়বেন না, ওর স্বভাব যেমনই হোক, ওর মতো মানুষ হয় না।

এই লোকের মুখে প্রশংসাটা কেন যেন অদ্ভুত ভালো লাগল। এই প্রথম আমি অনুভব করলাম ভিতরে ভিতরে এই মানুষটিও উদার। আবহাওয়া তরল করার জন্য কি কি-জন্য জানি না, হেসেই বললাম, কিন্তু সুধীরবাবু তো ফাঁক পেলেই বলেন, আপনার মতো বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ দুটি হয় না। আপনি গোলড্ মেডেল পেয়েছেন জানিয়ে বলেছিলেন, তার বেশি নেই তো কি পাবে, হীরের মেডেল থাকলে তাও পেত।

হাসল একটু। হাসিটা কেমন বিমর্ষ ঠেকল আমার চোখে। জবাব দিল, ও নিজেও মন্দ ছেড়ে দস্তুরমতো ভালো পাশ করেছে—আমার বরাবরই সন্দেহ হয় আমার জন্যেই ও ইচ্ছে করে আরো ভালো করে না—আমার বদলে ও প্রথম হলে আনন্দের বদলে ওর যন্ত্রণা হত।

...হ্যাঁ, সেইদিন এই মানুষকে, এই প্রশান্ত রায়কে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলাম আমি। সেদিন স্পষ্ট করে তাকে কিছু জবাব দিতে পারিনি। দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সেই দিন থেকে কয়েকটা দিনের জন্য আমি যে নিজেকে নিয়েই একটা দো-টানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, অস্বীকার করব না।

এরপর...

দু'সপ্তাহ একজনেরও দেখা নেই। তারপর একদিন সহাস্যবদন সুধীরচন্দ্র একা হাজির।

আমি অবশ্য তাকেও জিজ্ঞাসা করলাম, প্রশান্তবাবুর খবর কি?

জবাব দিল, আপাতত বিলেত যাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। খুব ভালো রেজাল্ট করেছে তো—ওর বাবারও ইচ্ছে একটা বাড়তি ছাপ নিয়ে আসুক।

আমি বললাম, রেজাল্ট তো আপনারও ভালোই হয়েছে শুনেছি, আপনি যাচ্ছেন না?

দু'চোখ কপালে তুলে ফেলল, সর্বনাশ, এ-কথা কখনো ওই পাগলটার সামনে জিজ্ঞাসা করবেন না যেন, একা কিছুতেই যেতে রাজি নয় বলে মেসোমশায় শেষে আমারও খরচ দিতে স্বীকার—অতি কষ্টে ওকে বাগে এনেছি, মাসিমা বেঁচে নেই, মেসোমশায়ের স্বাস্থ্য খারাপ, কাছাকাছি একজনের থাকা দরকার—এই সব বলে-টলে।

কেন?

ও অবাক একটু, কেন আবার কি, ওরা ভালোবাসে বলে আমি কি তার মাশুল নিতেই থাকব নাকি!

সেদিনই খোলাখুলি এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসেছিলসে। বলেছিল, অভয় দেন তো একটা কথা বলি—

আমার বুকের ভিতরে হঠাৎ ধুকপুক করে উঠেছিল কেমন। জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়েছিলাম।

ও বেচারাকে আর কষ্ট দিচ্ছেন কেন? মেসোমশায়ের খুব ইচ্ছে বিলেত যাবার আগে বিয়ে করে যাক, এদিকে আপনি ওকে ঘায়েল করে বসে আছেন, ও-দিকে আপনার দাদুর মুখে শুনেছি এম. এ. পাশ করার আগে আপনি নাকি বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন। তা বেচারা কি তাহলে বিলেতে গিয়ে আপনার কথা ভেবে ভেবে ফেল মারবে।

নিজের অগোচরে আমার দু'চোখ ওই মুখের ওপর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল কিনা জানি না।

প্রশান্ত রায়ের সঙ্গে কথা বলে সেদিন একটু অন্তত বুঝেছিলাম, এদের দুই বন্ধুর মধ্য ঈর্ষার জায়গা নেই। সেটা ভালো লেগেছিল। কিন্তু সেদিনের কথা-বার্তার কিছুই এই লোকের কানে ওঠেনি এটা বিশ্বাস হচ্ছিল না। মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

কোনোরকম অনুক্ত অনুভূতির লেশমাত্র দেখিনি। কি-যেন হয়েছিল আমারও। ও যেমন মুখে আসে বলতে পারে, আমিই বা পারব না কেন? হেসেই বললাম, দুজনার মধ্যে আমি কার দিকে ঝুঁকব তা নিয়ে বাড়িতে একটু-আধটু গবেষণা চলছে—

জোরে বড় হাসে না, কিন্তু এ-কথা শোনামাত্র অট্টহাসি একেবারে। তারপর যা বলে বসল আরো চমৎকার। সেই প্রথম তুমি করে বলল আমাকে।

—আমার মনে হয় ওই বোকাটার মাথায়ও ওই রকম কিছু একটা সন্দেহ ঢুকেছে। নইলে বার বার ও আমাকে তোমার কাছে ঠেলতে চায় কেন! সেদিন আবার বলছিল, আমি বিলেত থেকে ঘুরে আসার পর নিজের বিয়ের কথা ভাবব, তুই আগেই বিয়েটা করে ফেল, নইলে বাবার খুব অসুবিধে। তাছাড়া তোর যা চরিত্র, আমি না থাকলে কখন কি করে ফেলবি ঠিক নেই।...আমি সতের ধান্ধায় থাকি বলে ওর আসল সমস্যাটা বুঝতেই পারিনি। হাসি মাখা দু'চোখ আমার মুখের ওপর রাখল।—শোনো ম্যাডাম, ও যখন তোমাকে পছন্দ করেছে তখন ও বললে ওর হয়ে আমি প্রেম পর্যন্ত করে দিতে পারি, তুমি রাজি না হলে মুখ চাপা দিয়ে তোমাকে সেই আগের দিনের মতো গায়েব করে ফেলতে পারি—কিন্তু বিয়েটা শেষ পর্যন্ত ও-ই করবে। তারপর বন্ধু যে ওর তুলনায় কত বড় সেই ফিরিস্তি দিয়েছে।

আমি চুপচাপ মুখের দিকে চেয়েছিলাম শুধু।

এর দিন পাঁচ ছয় বাদে নীচে দাদুর ঘরে ডাক পড়ল হঠাৎ। এসে দেখি সেখানে বাবাও বসে এবং আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। তাঁকে দেখামাত্র আমার মন বলল, ইনি প্রশান্তর বাবা।

দাদু ডাকলেন, আয়, এঁকে প্রণাম কর—

প্রণাম করতে ভদ্রলোক আমাকে কাছে টেনে নিলেন। বলে উঠলেন, বাঃ খাসা মা দেখি আমার—ছেলে-দুটোর পছন্দ আছে বলতে হবে। হেসে উঠলেন, দাদুর দিকে ফিরে বললেন, সুধীরের কথাবার্তা তো জানেন, চিঠিতে আমাকে সে-কি তাড়া—মেসোমশায় ছেলের বিয়ে দিতে চান তো শিগগির এসে বুক করুন—নইলে ফসকে যাবে।

সকলেই হেসে উঠলেন। আমারও খারাপ লাগছিল না। দাদু মন্তব্য করলেন, সুধীরও খাশা ছেলে—

ভদ্রলোকের দ্বিগুণ উচ্ছ্বাস, আর বলতে, কোনো ছায়ের গাদায় কি রত্ন পড়েছিল, শুনবেন'খন পরে।

পরে শুনেছি। পরে বলতে বিয়ের পরে। ওই লোকটার জন্য সত্যিকারের মমতা বোধ করেছি। আর একটা ব্যাপার আমার ভালো লেগেছিল। পরস্পরের প্রতি দুই বন্ধুর টান এমন যে ওদের মধ্যে এক একসময় নিজেকেই বাড়িতে মনে হত।

সময় সময় প্রশান্তকে আমিই উসকে দিয়েছি। বলেছি, বড় হবার জন্যে বন্ধুকেও সঙ্গে নাও না, বাবাকে দেখার জন্য আমি তো আছি।

ফলে আর একদফা তর্কাতর্কি হয়েছিল। সুধীর রাজি হয়নি। বন্ধুকে বলেছে, তোর বউ এখানে এম. এ. পড়তে পড়তে বহরমপুরে গিয়ে খুড় শ্বশুরের সেবা করবে। তারপর আমার দিকে ফিরে চোখ পাকিয়েছে, ওকে বিলেত পাঠিয়ে দিয়ে একটা দেড়টা বছর কষে তোমার সঙ্গে প্রেম করব তাতেও বাদ সাধতে চাও?

এদের কথা-বার্তার ধরন এমন যে লাজ-লজ্জার বালাই আমার দিন কয়েকের মধ্যেই কেটে গেছল। চোখ পাকিয়ে ঠোঁট কাটার মতো জবাব দিয়েছি, কষে প্রেম করার চান্স তো বিয়ের আগেই পেয়েছিলে, এখন এত সাধ কেন?

সুধীর জবাব দিয়েছে, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গল্প উপন্যাস লেখো! তখন প্রেম করলে তুমি যে বঁড়শিখানার মতো আমার গলায় আটকাতে না তার কোনো গ্যারান্টি ছিল? এখন তোমার কপালে আর সিঁথিতে কলঙ্কের দাগ পড়েছে—এখন নিশ্চিন্তে প্রেম করা যেতে পারে।

প্রশান্ত সায় দিয়েছে, ও দেশের মেয়েরাও শুনেছি বিয়ের পরেই বেশির ভাগ প্রেম-প্র্যাকটিস করে।...তুই-ই ওকে তালিম দে, আর ও-দিকে আমিও একটা জুটিয়ে নেব'খন।

শোনামাত্র সুধীর গম্ভীর। বয়োজ্যেষ্ঠের অনুশাসনের চোখে তাকিয়েছে বন্ধুর দিকে। গলার স্বরও সেই রকম।—তুই কি নিজেকে আমার মতো ভাবিস? প্রেম-প্র্যাকটিস করতে গিয়ে ধপাস করে পা

পিছলে পড়লে তোকে রক্ষা করবে কে? তখন ও-পারে তুমি রাধে এপারে আমি, মাঝে সমুদ্র বহে রে—ওই করে শেষে আমার ঘাড়ে এই সেকেন্ডহ্যান্ড মাল চাপাবি! তার থেকে সঙ্গে একটা গীতা নিয়ে যাস—

তখন থেকেই সুধীর দত্তর গায়ে আমার হাত ওঠা শুরু হয়েছিল।

...কিন্তু সুধীর দত্তর সংযমের সেই নজিরও আমি দেখেছি। হ্যাঁ, তখন বরং আমারই বুকের তলায় ধুকপুকুনি। প্রশান্ত বিলেত যাবার পর একমাত্র ছুটিছাটায় আমি শ্বশুরের কাছে বহরমপুর যেতাম। শ্বশুরমশাই সেই রকমই ব্যবস্থা করেছিলেন। বলেছিলেন, আগে এম. এ. পাশটা করে নাও তারপর শ্বশুরের সেবা হবে।

যখন যেতাম সুধীরের সঙ্গেই যেতাম, ওর সঙ্গেই ফিরে আসতাম। প্র্যাকটিস জমানোর উদ্দেশ্যে সুধীর তখন বড় একটা ওষুধের দোকানে বসছে। কিন্তু প্র্যাকটিস জমানোর ব্যাপারে ওর ভিতরে কোনোরকম তাগিদ ছিল বলে মনে হত না। ফাঁক পেলেই এসে আড্ডা দিত। বলত, বন্ধুর দায়িত্ব পালন করছি। আমার চেষ্টায় তুমি যদি এম. এ. পরীক্ষায় ফেল মারতে পারো, বিলেতে সবার আগে আমি এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাঠাবো।

সম্ভব হলে ওকেও আমি আমার সঙ্গে এইখানে অর্থাৎ বাপের বাড়িতে রেখে দিতাম। বিলেতের প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে আবেদন থাকত, সুধীরের দিকে লক্ষ্য রেখো, আমরা ছাড়া এই দুনিয়ায় ওর আর কেউ নেই।

আমি চিঠির সেই জায়গাটুকু শুধু ওকে দেখাতাম। ও সবটা দেখার জন্য কাড়াকাড়ি করত। ওকে পরীক্ষা করার জন্য ইচ্ছে করেই একদিন কাড়াকাড়িতে হার মেনেছিলাম।—পড়বে তো পড়ো, কি বয়ে গেল।

পড়েনি। ফেরত দিয়েছে। বলেছে, কাজ নেই পড়ে, আমি ব্রহ্মচারী মানুষ, এ-সব করে শেষে চরিত্রখানা যাক আর কি—

ঘনিষ্ঠ মেলামেশাও যে এমন অমলিন আনন্দের হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। সকলে সেটা কোন চোখে দেখে আমার সংশয় ছিল। এমন কি আমার বাড়িতেও। মা সেকেলে ধাঁচের মানুষ, মাঝে মাঝেই আমাকে সামলাতে চেষ্টা করতো, বিয়ে-থা হয়েছে, এখন আর এত হুটোপুটি মানায় না।

আমি বলতে পারতুম না, হুটোপুটিটা তো মা বিয়ের পরেই শুরু হয়েছে।

বহরমপুরে গেলেও দুজনে এক একদিন অনেক দূরে দূরে চলে যেতাম। শ্বশুর দেবতুল্য মানুষ, তাঁর চোখে বিসদৃশ কিছু ঠেকত না। নিজের দুটো হাতের মধ্যে সুধীরকেই ও ভদ্রলোক ডান হাত ভাবতেন। কিন্তু আশপাশের বাড়ির মেয়ে বউদের চোখে মুখে বক্র কটাক্ষ আর কৌতুক দেখতাম। এ রকম মেলামেশাটা সকলে হয়তো সহজ বা স্বাভাবিক ভাবতে পারত না। দুটো বাড়ি পরের এক বাড়ির বয়স্কা ভদ্রমহিলা প্রায় সন্ধিগ্ধ চোখে আমাদের বেরুতে দেখতেন। সুধীরকে সে কথা বলতে সেদিন হাসল শুধু, কিছুই বলল না। পরদিন যে কাণ্ড করে বসল, আমার সঙ্গিন অবস্থা। বেরুতেই দেখি ভদ্রমহিলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে, অপ্রসন্ন দু'চোখ আমাদেরই ওপর।

সুধীর তাঁকে না দেখার ভান করে খপ করে আমার একটা হাত ধরে কাঁধে প্রায় কাঁধ ঠেকিয়ে হাঁটতে লাগল। আমার সব চাপা তর্জন ব্যর্থ, ও হাতও ছাড়ল না, সরলও না। ভদ্রমহিলা চোখের আড়াল হতে তবে স্বস্তি।

...বেড়াতে বেড়াতে এক একদিন দূরে গাঁয়ের দিকে চলে যেতাম। একদিন লক্ষ্য করলাম, মাটির ঘরের কয়েকটি মেয়ে বউ বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে আমাদের। গম্ভীর মুখে সুধীর টিপ্পনী কাটল, আমাদের ওরা ভারী সুখী দম্পতী ভাবছে।

আমি রাগ দেখিয়ে জবাব দিলাম, ছাই ভাবছে, তোমাকে আমার দারোয়ান ভাবছে—

ও আমার দিকে তাকালো একবার। তারপর কথা নেই বার্তা নেই সোজা ওই মেয়ে বউয়ের দিকে এগিয়ে চলল। আমি তর্জন করে উঠলাম, ভালো হবে না বলছি!

কে কার কথা শোনে। এগিয়ে গিয়ে বলল, এক গেলাস জল দেবেন?

সচকিত হয়ে দুটো মেয়ে জল আনতে ছুটল। সুধীর আমার দিকে ঘুরে ডাকল, এসো না, লজ্জা কি—

ওর ভয়েই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম আমি। জল এলো দু'গেলাস, একটা রেকাবিতে কিছু নাড়ু। মেয়েরা আমাকে বলল, ভিতরে আসুন না, বসে জল খান—

সুধীর জবাব দিল, না আর বসব না, অনেকটা হেঁটে হাঁপিয়ে গেছি। জলের গেলাস নিয়ে দুটো নাড়ু চিবুতে চিবুতে আমাকে বলল, জল খাবে না?

আমি মাথা নাড়লাম, অর্থাৎ তেষ্টা পায়নি। ওদের মধ্যে বয়স্কা রমণীটি অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করল, এদিকে বেড়াতে এসেছ বুঝি?

সুধীর জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতায় থাকি তো, তাই এই নিরিবিলিতে বেড়াতে খুব ভালো লাগে।

বয়স্কা রমণীটি বলল, আর একদিনও দূর থেকে তোমাদের বেড়াতে দেখেছিলাম...নতুন বিয়ে হয়েছে বুঝি?

আমার মুখের অবস্থা আমি জানি না। সুধীর অম্লানবদনে জবাব দিল, ওঁর নতুন বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পরেই আমার বন্ধু মানে ওঁর স্বামী বিলেত চলে গেল, তাই আমিই নিয়ে বেড়াই-টেড়াই—

মুহূর্তের মধ্যে বিমূঢ় মূর্তি সকলের। আমি পালাবার জন্যেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললাম। পরে সুধীরকে শাসালাম, আর কোনোদিন যদি তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি—

সুধীর ফোড়ন দিল, ওদের ধারণাটা ভেঙে দিলাম বলে তোমার এত রাগ।

ও এই রকমই নাজেহাল করত আমাকে। কলকাতায় ফিরে দুদিন ওকে না দেখলে হাঁপ ধরে যেত। ছুটির দিনে টেলিফোনে তলব পাঠাতাম, ও রাতের আগে ছাড়া পেত না। কলকাতায়ও এক একদিন এদিকে সেদিক বেরিয়ে পড়তাম আমরা।

...এরই ফলে প্রাণান্তকর সঙ্কট একবার।

কলকাতার আবহাওয়া ভালো নয়। এদিকে-সেদিকে একটা আধটা খুন-যখম লেগে আছে। রাজনীতির নেতারা গদীতে বসতে না বসতে একে অন্যের ওপর কাদা ছুঁড়তে লেগেছে। এই হাওয়ার পরোয়া না করে যে আমরা কোথায় কোথায় চলে যাই—সেটা মায়ের অন্তত একটুও পছন্দ নয়। কিন্তু তার উপদেশ আমি তেমন কানে তুলি না। আমার কেমন ধারণা, সুধীর সঙ্গে থাকলে সকলেই নির্ভয় হতে পারে।

এখানে মনের কথা বলে নিই দুই একটা। পাঠক ভাবতে পারেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে বুঝি মন দেওয়া নেওয়ার খেলা চলেছে আমার। কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি তা নয়। সুধীরকে অত কাছে পেয়েছিলাম বলেই তার বন্ধু দূর থেকেও আমার ভারী কাছে কাছেই ছিল। সুধীর যখন তার বন্ধুর উঁচু মনের কথা বলতো, আমার ভিতরটা আনন্দে ভরে যেত। বিয়ের আগে দুজনের মধ্যে সুধীরের দিকেই আমার আগে চোখ গেছল সত্যি কথা, কিন্তু নিজেকে আমি এই একজনের চোখে কোনোদিন বাতিল ভাবিনি। তার জন্যে আমার এতটুকু রাগ বা অভিমান ছিল না। উল্টে মনে হত, যা হয়েছে সেটাই স্বাভাবিক আর সেটাই ভালো।

...তবু চক্ষুলজ্জা ছেড়েই বলছি, মানুষের সততা সংযম এ-সবের চূড়ান্ত পরীক্ষা নির্ভর করে পরিবেশের ওপর। পরিবেশের স্বাভাবিক গণ্ডির মধ্যে আত্মশাসনের চেতনাটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আকস্মিক কোনো পরিস্থিতিতে সে গণ্ডিটা একেবারে ভেঙে গেলে পুরুষের অভ্যস্ত সংযমের বাঁধে ফাটল ধরতেও পারে। রমণী তখন যত অসহায় বোধ করুক, তাকে প্রতিরোধ করতে পারে কিনা আমি জানি না।

সে-রকম পরিস্থিতিতেই পড়েছিলাম আমি। সুধীরের দিক থেকে সংযমের সেটা চূড়ান্ত নজিরই বটে। কিন্তু আমি লেখিকা, বিপরীত কল্পনাও মাথায় আসে।...সেই বিতিকিচ্ছিরি পরিস্থিতিতে ওর

সংযমে ফাটলধরা একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না।...যদি সেই রকমই হত...যদি এগিয়ে আসত...যদি হাত বাড়াত। আমি কি করতাম?

আমি জানি না কি করতাম।

সেই ছুটির দিনে বাসে-বাসে আমরা অনেক দূরে চলে গেছলাম। কলকাতা ছাড়িয়ে বহু দূরের এক গাঁয়ের দিকে। শেষে বাস ছেড়ে একটা সাইকেল রিকশায় মাইল তিনেক পথ এসেছিলাম। তখনো সুধীরের হাসি-ঠাট্টার লাগাম ছিল না। বলেছিল, চলে এসো, আর হাঁটতে পারি না, কে আর দেখছে আমাদের। তার পরেই দুঃখ করেছিল, আ-হা, একটা ফটো তুলে যদি বিলেতে পাঠাতে পারতাম!

সন্ধ্যা যখন হয়-হয় তখন ফেরার তাড়া আবার। বাড়ি ফিরতে কত রাত হয়ে যাবে ঠিক নেই। কিন্তু রিকশায় উঠতেই একটা দুঃসংবাদ শুনলাম, কলকাতায় কি কারণে ভয়ানক হামলা হয়েছে, পুলিশ গুলি চালিয়েছে, তিন চারটে লোক মরেছে, বাস মিলবে কিনা ঠিক নেই।

বাস স্টপে এসে দেখি বাসের চিহ্নও নেই। দু'ঘণ্টা আগেই নাকি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আরো দু'আড়াই মাইল পথ ভাঙলে গ্রামের ছোট স্টেশন। কিন্তু বাসের খবর নিতে এসে জানা গেল ট্রেনও নেই, হামলার দরুন সব বন্ধ। এখন আমরা করি কি, গাঁয়ের স্টেশনের যে বহর, ঘরে তালা আটকে মাস্টারবাবু এতক্ষণে গা-ঢাকা দিয়েছে হয়তো। আশেপাশে জন-মানব নেই, সেখানকার খোলা মাটিতে রাত কাটানো এই দিন-কালে অন্তত নিরাপদ নয়।

অনির্দিষ্টের মতো রাত পর্যন্ত হাঁটলাম দুজনে। একটা দোকানে কিছু খেয়ে নিলাম। সেই দোকানঅলার শরণাপন্ন হওয়া যায় কিনা ভাবছিলাম। আমাকে বসিয়ে রেখে সুধীর উঠে গেল। ফিরল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে। আমার মনের অবস্থা তখন আরো কাহিল। যাই হোক, সুধীর ফিরতে হাঁপ ফেলে বাঁচলাম।

ও ডাকল, এসো, একটা ব্যবস্থা হয়েছে।

রাস্তায় পা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যবস্থা?

কলকাতার এক বাবুর বাগন বাড়ির বাইরের ঘরে।

অস্বস্তি চেপে হালকা করেই জিজ্ঞাসা করলাম, বাবু বা বাবুনীরা কেউ নেই?

না, তারা কলকাতায় থাকে, মালী পাহারাদার, দশ টাকা খসিয়ে তবে তার মন পাওয়া গেছে।

চারদিকে দেয়াল ঘেরা অনেকটা জমির ভিতরে দালান। ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম আমরা। মালী বাইরের ঘর খুলে দিল। ঘরে ইলেকট্রিক আছে। আলোটা জ্বেলেই মালীটা সোজা আমার দিকে ঘুরে তাকালো। আমার কপালে আর সিঁথিতে সিঁদুর দেখেই তার কিছু একটা চাপা সংশয় গেল যেন। কিন্তু আমার অস্বস্তি বাড়তেই থাকল।...বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে এই বিপদে পড়েছে মালীকে এ-কথা নিশ্চয় বলা হয়নি। কি বলা হয়েছে অনুমান করে আমার কানের দু'পাশ গরম হয়ে উঠছে।

কিন্তু বাইরেটা ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে কি-কম। শীতের শেষের দিক সেটা। আমার গায়ে ছোট একটা গরম চাদর জড়ানো, সন্ধ্যার মধ্যে ফিরবো ধরে নিয়ে গরম জামা আনিনি। তখন থেকেই শীত বোধটা আমার কম। কিন্তু মনে হচ্ছে ঠাণ্ডাটা যেন হাড়ের দিকে ধাওয়া করছে। অবশ্য বাইরের খোলামেলা জায়গায় শহরের তুলনায় শীত এমনিতেই বেশি।

নির্দেশ মতো এক কুঁজো জল রেখে মালী প্রস্থান করল। যাবার আগে বলে গেলে, দিন-কাল ভালো না, দরজা বন্ধ রাখা হয় যেন।

মালী চলে যেতে সুধীর ঘরের চারদিক পর্যবেক্ষণ করে নিল একবার, তারপর চোখ দুটো আমার মুখের ওপর এসে থমকালো।—কি' গো, ভয় করছে?

আমি হাসতে চেষ্টা করে জবাব দিলাম, ভয়ের কি আছে, তবু তো একটা জায়গা পাওয়া গেল...কিন্তু বাড়িতে ভয়ানক ভাবছে।

—তা অবশ্যই। আরো দু'তিন ঘণ্টা চলে গেলে তোমার মায়ের সন্দেহ হতে পারে আমি তোমাকে ইলোপ করেছি। যাক, এক রাতের সংসার কি করে গোছানো যায় ভাবো এখন।

চেষ্টা সত্ত্বেও সহজ হতে পারছি না আমি। বাইরের খোলা দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, সুধীর প্রথমেই সেটা বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে আমার অস্বস্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমার শোয়ার কোনো অসুবিধে নেই, একটা ডিভান রয়েছে, সোফায় কুশন রয়েছে। দুটো কুশন তুলে নিয়ে সুধীর ডিভানের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, মহারানীর শয্যা প্রস্তুত, এখন সমস্যা এই বান্দাকে নিয়ে।

ঘরে বড় টেবিল নেই, কতগুলো সোফার মাঝে কেবল ছোট গোল সেন্টার টেবিল একটা। একটা সেটিও নেই। একটা সোফায় বসে পড়ে সুধীর বলল, আমার কপালে বসা-নিদ্রা।

আমি ডিভানে আশ্রয় নিয়ে গল্প শুরু করে দিলাম। সমস্ত রাতই গল্প করে কাটিয়ে দেবার বাসনা। বাবা-মা-দাদুর সঙ্গে মফস্বলের এক আত্মীয়ের বিয়ে বাড়িতে গিয়ে কি ফ্যাসাদে পড়েছিলাম সেই গল্প বললাম। মেয়েদের আলাদা আলাদা করে আর ছেলেদের সব একটা হল ঘরে শুতে দেওয়া হয়েছিল। ঘরে ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। গল্প করতে করতে এক সময় তো সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু আমার চোখে আর ঘুম আসে না। ঝিঁ-ঝির ডাকে কান ঝালাপালা, থেকে থেকে শেয়াল ডেকে উঠছে, ঘরের মধ্যেও মাঝে খুট খুট শব্দ। যত ঘুমুতে চেষ্টা করছি, ততো ভয় বাড়ছে। শেষে রাগ করে চোখ তাকালাম। ঘুমুবই না ঠিক করলাম। যেই তাকানো, ওমনি শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল। জানলার কাছে একজোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে, আমার দিকেই ঘুরল সেই জ্বলন্ত চোখজোড়া। আর কিছু দেখা যায় না, শুধু দুটো জ্বলন্ত চোখ।

ভয়ে বুকের ভিতরটা ঠকঠক করে কাঁপছে আমার। অথচ হাত পা নাড়তেও পারছি না। শেষে প্রাণপণ চেষ্টায় হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। অনেকেই জেগে গেল। কিন্তু জানলায় তখন চোখ দুটো আর নেই। চোখের কথা কেউ বিশ্বাসই করল না, সকলেই ভাবল আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি।

পরদিন সকালে আবার আঁতকে উঠতে হল, একটা নিকষ কালো বিড়াল দেখে। এমন বিদঘুটে কালো বিড়াল আমি আর দেখিনি। তক্ষুনি বুঝলাম রাতে জানলায় আমি কার জ্বলন্ত চোখ দেখেছিলাম।

সুধীর সাদা মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, জানলা কটাও বন্ধ করে দেব নাকি?

আমি সদম্ভে বললাম, সে ভয়ের দিন চলে গেছে।

সুধীর তবু বলল, এখানে ভয়-টয় পেও না বাপু, জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরলে শেষে ফ্যাসাদে পড়ে যাব।

এ-রকম কেন, এর থেকেও ঢের বেশি লাগাম-ছাড়া ঠাট্টা ও হামেশাই করে থাকে। এই প্রথম মনে হল, আজ অন্তত এ-রকম ঠাট্টা-তামাশা করাটা উচিত নয়।

কথায় কথায় নিজের ছেলেবেলার গল্প টেনে আনলাম। ওর ছেলেবেলার শোনা গল্পও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আবার নতুন করে শুনলাম। শেষে একসময় কথা যেন ফুরিয়েই গেল। ও-দিকে শীত বাড়ছে। গুটিসুটি মেরে ছোট চাদরটাই জড়িয়ে নিলাম। তাছাড়া মশার উপদ্রব।

সমস্ত দিনের ঘোরাঘুরিতে খুবই ক্লান্ত হয়েছিলাম। দুজনেই চুপ করে যেতে সেই অস্বস্তিটা আবার বাড়তে লাগল। বাড়িতে এতক্ষণে কি কাণ্ড না জানি হচ্ছে। তবে কলকাতার অবস্থা সে-রকম খারাপ যখন, সকলেই ধরে নেবে আমরা আটকে গেছি কোথাও। চাদরের ফাঁক দিয়ে সুধীরের দিকে তাকালাম। সোফায় মাথা রেখে শরীর এলিয়ে বসে আছে। চোখ চেয়ে আছে কি বুঝে আছে বোঝা যাচ্ছে না।

ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার অস্বস্তি যেন বাড়ছেই—বাড়ছেই মনে মনে বার বার প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে আর এ-ভাবে বেরুবো না। নিজের একটা ত্রুটি অসামান্য মনে হল হঠাৎ।...সাগর পারে যে লোকটা পড়ে আছে, তার কথা তার গল্প টেনে আনতে পারলে ভালো হত। কেন মনে হল জানি না। অথচ তার প্রসঙ্গ ওঠেইনি বলতে গেলে। এই ত্রুটি যেন আমাকে আরো বেশি অস্বস্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল।

চাদর মুড়ি দিয়ে শেষে উঠে বসলাম। বসেই থাকলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু তারপর তাও পারা গেল না। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে যাচ্ছে।

...রাত কত জানি না। ঘুমিয়ে ছিলাম কিনা তাও জানি না। হঠাৎ মনে হল আমি হাত-পা নাড়তে পারছি না। আমাকে কেউ আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছে। বুকের ওপর প্রচণ্ড চাপ। ঘরটাও ঘুটঘুটি অন্ধকার। আমি প্রাণপণে ছাড়াতে চেষ্টা করছি নিজেকে, চিৎকার করে উঠতে চেষ্টা করছি—কিন্তু কেউ যেন অমোঘ অব্যর্থ গ্রাসের আওতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। আমার চেতনা বিলুপ্ত হবার উপক্রম। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ঘরে আলো জ্বলছে তেমনি। আমার গায়ে জড়ানো সুধীরের গরম কোটটা। ভয়ে ঠকঠক করে ভিতরটা কাঁপছে তখনো। কপালে গলায় ঘাম জমেছে। তীক্ষ্ণ চোখে সামনের দিকে তাকালাম।

শুধু শার্ট গায়ে শীতে গুটিসুটি মেরে সুধীর সোফায় কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে।

বাইরে মুরগি ডেকে উঠল কোথায়। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আমি আরো অবাক। ভোর হয়ে এসেছে। রাতের অন্ধকারের চার ভাগের তিন ভাগ মুছে গেছে।

কোটটা হাতে করে আমি উঠলাম। পায়ে পায়ে সুধীরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ওই ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে এমন একটা কুৎসিত স্বপ্ন দেখলাম বলে নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে। কোটটা বেশ সন্তর্পণে আবার ওর গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল। চোখ রগড়ে প্রথমে আমার দিকে পরে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। বলে উঠল, যাক বাবা, রাত কাবার, আর আমি কক্ষনো তোমাকে নিয়ে কোথাও বেরুচ্ছি না।

এখন আমার হাসিই পাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন আমি আবার কি করলাম?

—কি করলাম! হাঁদা পেয়েছো আমাকে—সমস্ত রাত ভয়ে সেঁধিয়ে ছিলে আমি বুঝতে পারি না! দাঁড়াও, মালী ব্যাটাকে তুলে একটু চায়ের যোগাড় করতে পারি কি না দেখে আসি, বাড়ি গিয়ে তোমার মায়ের সামনে আমি দাঁড়াচ্ছি না বলে দিলাম—

শুধু শার্ট গায়েই চলে গেল। আমি সেদিকে চেয়ে রইলাম। ওই স্বপ্ন দেখার জন্য নিজের গালে কষে একটা চড় বসাতে ইচ্ছে করছিল আমার।

প্রশান্ত একাই রওনা হয়ে গেছল বটে, কিন্তু ওপরঅলার ইচ্ছে অন্য রকম। ছ'মাসের মধ্যে হঠাৎ স্ট্রোকে শ্বশুরমশাই চোখ বুজলেন। খবর পেয়েই ছেলে ছুটে চলে আসতে চাইল। এদিক থেকে সুধীর বাধা দিল, লিখল, ছেলের কাজ তো আমি করেই ফেলেছি, এখন এসে কি করবি?

সে বিলেতে যাবার আগেই শ্বশুরমশাই তাঁর নগদ টাকা-পয়সা সব আমার আর ছেলের নামে ব্যাঙ্কে চালান দিয়েছিলেন। এরপর বিলেত থেকে প্রশান্তর ঘনঘন তাগিদে আসতে লাগল বন্ধুর কাছে, আর তো বাবাকে দেখার কিছু নেই, শিগগির চলে আয়। আমাকেও লিখেছে, প্লেনের টিকিট কেটে ওকে পত্রপাঠ রওনা করে দাও। শেষে হুমকি, অত দিনের মধ্যে সুধীর না এলে এদিক থেকে আমি ফেরার টিকিট কাটছি।

সুধীরকে আমি একরকম ঠেলেই পাঠিয়েছি।

ও চলে যাবার পর আমি যেন একটা ক্লান্তিকর ছুটির মধ্যে দিন কাটাতে লাগলাম। সব একঘেয়ে লাগে, সবেতে অবসাদ। একে একে অনেকগুলো দিন কেটেছে, মাস কেটেছে। বছর ঘুরেছে। আমি যথাসময়ে এম. এ. পাশ করেছি। ফলে ছুটির বোঝা যেন আরো বেড়েছে। এক একসময় ব্যাঙ্কের টাকার হিসেব করেছি ঘরে বসে। মনের তলায় একটা লোভ উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। মজুত তহবিল ভেঙে আমিও সাগর পাড়ি দিয়ে ওদের সঙ্গে মিলতে পারি। কিন্তু ওরা না লিখলে আমি যাই কি করে। দুজনে মনের আনন্দে আছে, লিখবে কেন।

নিজেরই আবার একসময় হাস্যকর মনে হয়েছে ইচ্ছেটা। আমি বাংলায় এম. এ. সেখানে গিয়ে কি

করব। একটা স্কুল মাস্টারিও জুটবে না। তাছাড়া ওরা ফিরে এলে অনেক কাঁচা টাকার দরকার হবে হয়ত।

প্রশান্তর চিঠি নিয়মিত আসে। সব চিঠিতেই সুধীরের খবর থাকে। লেখে, ওটার স্বভাব-চরিত্র আর বদলানো না, সেই এক রকমই আছে। সুধীরের পৌঁছনোর সংবাদের চিঠিতে লিখেছিল, দুর্যোগের মধ্যে বেড়াতে বেরিয়ে বাইরে তোমাদের এক রাতের সংসার পাতার গল্প শুনলাম। সুধীর বলে, তুমি নাকি ভয়ে সেঁধিয়ে গেছলে—কি কাণ্ড, সুধীরকেও ভয় তোমার!

চিঠিটা ভালো লেগেছিল। ঠাট্টা করে প্রশান্তকে জবাব দিয়েছিলাম, তুমি উদার বটে।

প্রশান্ত লেখে, ফিরে গিয়ে তোমার অন্তত ভালো ভালো পাঁচখানা ছাপা বই দেখতে চাই—লেখায় ফাঁকি দেবে না, খবরদার।

চিঠি মাঝে মাঝে সুধীরও লেখে। লোকটা লিপি রচনায় তেমন পটু নয়। কিন্তু পড়লে হাসি পায়, মনে হয় সামনে বসে কথা বলছে। সেবারে লিখল, এতদিনে এখানে সকলে জেনে গেছে আমি তোমার কর্তার জবরদস্ত বডি-গার্ড। তুমি কিছু ভেবো না, আর কটা দিন বিরহ তাপ ভোগ করে নাও, ওকে আমি পরীক্ষা পাশের চুড়োয় চড়িয়ে এখানকার নীলনয়নাদের বুকে হাতুড়ি ঠুকে কলা দেখিয়ে তোমার আঁচলের তলায় পৌঁছে দেব।

আমি লিখলাম, বডি-গার্ডও পরীক্ষ-পাস না করে এলে আমি তার মুখ দেখব ভেবো না।

বছর খানেক বাদে প্রশান্তর এক চিঠি পেয়ে আমার চক্ষু স্থির। লম্বা চিঠি। রসিয়ে লেখা সেই চিঠির প্রধান সংবাদ, সুধীর হাসপাতালের এক ওয়ার্ডেন ক্লীনারের প্রেমে পড়েছে। ওর জন্যে এখন সে ভয়ানক চিন্তায় আছে। সেদিন নাকি অল্প-স্বল্প ড্রিঙ্ক করে তাকে বলেছে, তুই চন্দ্রাণী-স্বর্গে বিচরণ করগে যা, আমি অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে রসাতলে যাত্রা করব, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

চিঠির কতটা সত্যি কতটা কৌতুক আমি ঠিক বুঝে উঠলাম না। সুধীরকে লিখলাম শেষে কিনা মেথরানী—এই কপালে লেখা ছিল তোমার। জবাবে ও গুরুগম্ভীর চিঠি লিখল একখানা। যথা, চিঠি পেয়ে আমার ওপর ওর ভক্তিশ্রদ্ধা চটে গেছে। অথচ আমার কাছ থেকেই সবার আগে সদয় সায় মিলবে আশা করেছিল। সে-মেয়ে আর যাই হোক রানী তো শেষ পর্যন্ত। চন্দ্রাণীর মধ্যেও যুক্তাক্ষরজনিত ভেজাল আছে কিন্তু মেথরানী ভেজালবর্জিত। আর লিখেছে, লেখিকা হয়েও তোমার এমন বুর্জোয়া মেনটালিটি! নীচের পর্যায়ের মানুষদের নিয়ে বড় বড় কথা লেখো অথচ ভেতরখানা এই রকম। তোমার এই চিঠি আমি রেখে দিলাম, আমাদের দেশে যদি দিন আসে কখনো, এই চিঠি তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করব।

প্রশান্তর পরের চিঠিতে আরো বিশদ করে সমাচার এবং শেষ ফলাফল জানা গেল। লিখেছে, সুধীরের পাগলাটে স্বভাবের জন্যেই ওয়ার্ডের ক্লিনার অ্যাঞ্জেলার ওকে ভালো লেগেছিল। তার ওপর সুধীর ওর আগের পক্ষের ছেলেটার যত্ন করে চিকিৎসা করেছে। ফলে মেয়েটা ওকে ভয়ানক খাতির করা শুরু করল। আর সুধীরও চোখ কান বুজে সেই খাতির গিলতে লাগল। এদিকে একটা লোক অ্যাঞ্জেলাকে পছন্দ করত, কাজের উপলক্ষে সে বিদেশে গেছল। যাবার আগে কথা দিয়েছিল ফিরে এসে সে অ্যাঞ্জেলার দ্বিতীয় স্বামী হয়ে বসবে। কিন্তু ফিরে আসবে কি আসবে না, অ্যাঞ্জেলার মনে সেই সন্দেহ ছিল, আর দুর্ভাবনাও ছিল। সেটা জানতে পেরে সুধীর তাকে আশ্বাস দিয়েছিল, না এলো তো বয়ে গেল, আমি তো আছি।

কিন্তু সেই লোকটা এসেছে। অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে তার অনুরাগপর্ব এখন জমজমাট। খুশি হয়ে সুধীর ওদের দুজনকেই সেদিন একটা পার্টি দিয়েছে।

সাতাশ মাস বাদে একসঙ্গে ফিরেছে দুজনে। সোয়া বছরের মধ্যে গাইনোকোলজির এম. আর. সি. ও. জি. পাশ করে প্রশান্ত সেখানকার এক হাসপাতালে হাত পাকিয়েছে। আর ইতিমধ্যে সুধীরও এম. আর. সি. ও. জি. এবং সেই সঙ্গে শিশু চিকিৎসা-সংক্রান্ত সব থেকে বড় ছাপ ডি. সি. এইচ. সংগ্রহ করেছে।

ফিরে এসেই সুধীরের তম্বি, তোমাদের পয়সায় গিয়ে তোমার হাসব্যান্ড-এর থেকেও বেশি বিদ্বান হয়ে ফিরেছি, বুঝলে?

আশ্চর্য, আমাদের এত সাধ্যি সাধনা সত্ত্বেও এবারে কিন্তু ও আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করল, আলাদা চেম্বার করল। বলল, এক বাড়িতে দু'দুটো দিগ্‌গজ ডাক্তার থাকলে পসার জমবে না। তাছাড়া এবারে তোমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে আমার কমপিটিশন।

কিন্তু কমপিটিশন না ছাই। মেয়েদের দিক ছেড়ে ও চায়েলড্ স্পেশালিস্ট হয়েই বসল। অবশ্য দরকার হলেই প্রশান্তকে সে এদিকেও সাহায্য করত।

সত্যিকারের আনন্দের মধ্যেই কেটে ছিল দুটো বছর। নিজেদের পসার বাড়ানোর ঝোঁকের ফাঁকে ফাঁকে আমার লেখার শ্রীবৃদ্ধি আর খ্যাতিবৃদ্ধির দিকেও চোখ ছিল দুজনারই। প্র্যাকটিস ভালোই জমে উঠছে, পয়সার অভাব নেই, প্রচার আর খ্যাতি দুই-ই সহজলভ্য হয়েছে। আমার এক-একটা বই বেরুলে দুজনেই পড়ত সবার আগে। ঘরের লোকের প্রশংসা সহজেই অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু সোজাসুজি প্রশংসা সুধীর কমই করত। উল্টে টিপ্পনীই বেশি কাটত, বলত বড় বেশি স্বপ্নালু ব্যাপার সব, দুই একটা মাটির মানুষের কথা লেখো দেখি।

আমি চোখ পাকাতাম, আমার এরা কিসের মানুষ?

ও জবার দিত, সন্দেশের খোশা ফেলে খাওয়া মানুষ।

আমার ধারণা, ছেলেবেলার সেই অপরিসীম দারিদ্র্যের ক্ষতটা ওর মনের তলায় থেকেই গেছে। রোগে ভুগে ওর দাদা অনেক আগেই মারা গেছে। শুনেছি বাড়ির অন্য সকলের মুখ দেখে না, কিন্তু মাস গেলে মোটা টাকা পাঠায় সেখানে।

এদিকে পসার যত বাড়তে লাগল আমার মনের তলায় একটা অস্বস্তির ছায়া ততো যেন বড় হয়ে উঠতে লাগল। প্রায়ই মনে হত যে-মানুষটা বাইরে গেছল ঠিক সে-মানুষ যেন ফেরেনি। সুধীর বাইরে থেকে অন্তত একরকমই আছে। কিন্তু ঘরের লোক যে বদলেছে সেটা একটু একটু করে টের পাওয়া যাচ্ছে। তার ভিতরে ভিতরে বড় হবার নেশা ভালোমতো দানা পাকিয়ে উঠেছে। সেটা মন্দ কিছু নয়, কিন্তু নেশার আকার নিলে সবই মাঝে মাঝে অস্বস্তিকর ঠেকে।

বড় হবার নেশাই বটে। অনেক বড় হওয়া চাই, অঢেল টাকার মুখ দেখা চাই। ওদিকের পসার বাড়ছে, সময় কমছে। আমারও কি-রকম যেন লেখা কমছে, অবকাশ বাড়ছে। আলস্যও বাড়ছে, সেই সঙ্গে তলায় তলায় অস্বস্তিও বাড়ছে।

অথচ ফাঁক পেলে সুধীরই মদ খায় দেখি। প্রশান্ত সৌজন্য রক্ষার্থে একটু-আধটু খায়। তাতেও আমার চোখ রাঙানিকে সমীহ করে। সুধীর নিজেই বলে, বিলেতের সেই যে মেম-মেয়ের প্রেমে পড়েছিল —সেখান থেকে বাতিল হয়ে মদ ধরেছে। তা নিয়ে ওকে আমি কম গঞ্জনা দিইনি। অথচ মনে মনে আমার কেমন যেন ভয় ওকে নিয়ে নয়, প্রশান্তকে নিয়ে। কিন্তু মুখ ফুটে সে-ভয় প্রকাশ করিনি কখনো!

প্রায় দু বছর হল দু-বন্ধুতে মিলে জাঁক-জমক করে মস্ত নার্সিংহোম খুলেছে। আর তখনই যেন বড় হওয়ার নেশাটা সময় সময় আমার চোখে বেশি বড় হয়ে উঠেছে।

নার্সিংহোমের ব্যবস্থা-পত্র আদব-কায়দার জাঁক-জমক আছে। সপ্তাহে কম করে দু'দিন আমাকে সেখানে যেতে হয়। রোগিনীদের ফুলের তোড়া দিতে হয়। যারা আসে এখানে নার্সিংহোমের প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ। কিন্তু আসে যারা, তারা প্রায় সকলেই বিশেষ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে বউ। সুধীর তার নিজস্ব চেম্বারে শুধু চায়েলড্ স্পেশালিস্ট। কিন্তু নার্সিংহোম-এ চায়েলড্ স্পেশালিস্ট আর গাইনোকোলজিস্ট দুই-ই।

টাকা আসছে। আসছেই আসছেই। থোকে এক এক সময় এত টাকাও আসে যে আমার অবাক লাগে। আর সেই সঙ্গে অস্বস্তিও বাড়ে। ওই নার্সিং হোমের চার্জ বেশি জানি। ব্যবস্থাপত্র যা, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এক-এক পেশেন্টের কাছ থেকে পাঁচ সাত দশ বারো হাজার টাকা পর্যন্ত

আসে। জিজ্ঞাসা করলে বলে বড় অপারেশন ছিল। কিন্তু কত বড় আমি ভেবে পাই না। সুধীরকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, ও-সব কিসে কি টাকা-পয়সা আসছে বা যাচ্ছে আমি খবরও রাখি না, সে সব তোমার হাজব্যান্ড-এর হেড এক, আমাকে যা ভাগ দেয় আমি নির্লজ্জের মতো নিয়ে পকেটে পুরি।

লক্ষ্য করেছি, তাকে ভাগ অবশ্য কম দেয় না।

তিন

টেলিফোনটা ছেড়ে দিলেই মনে হল অধঃপাতের পথে যাত্রা শুরু হয়েছে আমারও। এইমাত্র টেলিফোনে প্রশান্তকে যা বললাম আমি, সেটা সত্যি নয়। বলেছি, বার শ'টাকার একটা চেক এসেছে আর একটা বেনামী চিঠি এসেছে হুগলী না কোথা থেকে।...বেনামী চিঠির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর গলার স্বর একটু উদ্বেগ কানে ঠেকেছিল আমার। বলেছি, বেনামী চিঠিতে লিখেছে, তোমার বাইরের ব্যবহার যে-রকম মোলায়েম সুন্দর, ভিতরের স্বভাব-চরিত্র সে-রকম নয়। আর বলেছি, সেই সঙ্গে তোমাকে আস্ত একটি কসাইও বলেছে।

এই মিথ্যের জবাবে প্রশান্তরও মিথ্যে বলতে একটুও বাধেনি। চিঠি কোথা থেকে এসেছে শুনেই বলে ফেলল, দিন কয়েক আগে ওদিকের একটা সিজারিয়ান কেস ডিসচার্জ হয়েছিল। তারপর ঠাট্টার সুরে বলেছিল, কেমন কাঁটার মুকুট পরে বসে আছি দেখো...ভালো রসদ পেয়েছ, একটা গল্প লিখে ফেলো।

হ্যাঁ, চেকও এসেছে, চিঠিও এসেছে। চেক নিয়ে আমি এক মুহূর্তও মাথা ঘামাইনি। চিঠি হুগলী থেকে আসেনি, কলকাতা থেকেই এসেছে। আর বেনামীতে আসেনি স্ব-নামেই এসেছে।

লিখেছে শ্রীলেখা চ্যাটার্জী। ওই নার্সিংহোমেরই স্মার্ট আর মোটামুটি রূপসী সেক্রেটারি। বয়সে আমার থেকে বছর তিনেক ছোট হবে, অর্থাৎ বছর চব্বিশ বয়েস মেয়েটার। নার্সিংহোমের প্রায় শুরু থেকেই আছে বলতে গেলে। মেট্রন নার্স আর সেক্রেটারি নেবার ব্যাপারে দুই বন্ধুরই একটা বিশেষ দৃষ্টি আছে লক্ষ্য করেছিলাম। সুধীর হেসেই বলেছিল, শুধু কোয়ালিফিকেশন থাকলেই চলবে না, চেহারা-পত্রেরও কিছু চটক চাই আমাদের, বুঝলে?

তখন ঠাট্টা করেছিলাম, চটক তোমার দরকার হতে পারে, সে-রকম মনে ধরলে শেষ পর্যন্ত তোমার ঘরে এনে তুলতে পারবে, ওর কি দরকার?

মনের বাসনাটা তোমাকে তাহলে বলেই ফেলি, চটক দেখে যদি আমার মুণ্ডু ঘোরে তাহলে ফুরিয়েই গেল আর যদি ওর মুণ্ডু ঘোরে তখন আমি অনায়াসে তোমাকে নিয়ে সটকান দিতে পারব, সেটা তখন খুব একটা নীতিবিরুদ্ধ হবে না।

আমি ওর মাথায় জোরেই একটা থাপ্পড় বসিয়েছিলাম। আমিও হেসেছি ওরাও হেসেছে। তাছাড়া মনে কোনো দাগ পড়বে কি, ওকে আমার থেকে বেশি আর কে চেনে? হেসেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তোমাদের কারবার তো সব মেয়েছেলে আর শিশুর সঙ্গে—চটকদার মেয়ে দিয়ে কি হবে?

সুধীর তক্ষুনি জবাব দিয়েছে, অন্য জুনিয়র অ্যাসিসট্যান্টদের মেজাজ ভালো থাকবে, আমাদের মেজাজ ভালো থাকবে, তাছাড়া, মেয়ে পেশেন্টরা কেউ পুরুষ-বিহীন আসে না বড়—তাদের মন ভরবে, চোখ তৃপ্ত হবে, ফলে নিজেদের কেস ছেড়ে আত্মীয়স্বজনের কেসও এখানে ঠেলে পাঠাবে।

ওদের উদ্দেশ্য আমি জানি। আসল কথা, ওরা যাকে বলে একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়—বাইরে যেমন দেখেছে। বেছে বেছে কোয়ালিফিকেশনের সঙ্গে মোটামুটি সুশ্রী মেয়ে দেখেই নিয়েছে। কিন্তু চটক বলতে ওই একজনেরই। ওদের সেক্রেটারি শ্রীলেখা চ্যাটার্জীর।

মেয়েটাকে প্রথম দিন দেখেই কেমন চেনা মুখ মনে হয়েছিল আমার। সুধীর পরিচয় করিয়ে দিতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার মুখখানা চেনা-চেনা লাগছে—দেখেছি কোথাও?

শ্রীলেখা মিষ্টি হেসে জবাব দিয়েছিল, আপনি বলতে হবে না, তুমি বলুন। আপনি আমাকে দেখেছেন কিনা বলতে পারব না, আপনাকে আমি অনেক দেখেছি।

—কোথায় বলো তো?

—অনেক মিটিংএ, ফাংশানে...আপনাকে না চেনে কে।

মেয়েটার কথা-বার্তায় বেশ খুশি হয়েছিলাম সেদিন। তার পরেও ভালো লেগেছে। আমি গেলেই হাসি মুখে কাছে এসেছে, মিসেস রায় না বলে দিদি বলে ডেকেছে গোড়া থেকেই। তাই শুনে আবার দুই বন্ধুতে বাড়িতে হাসাহাসি করেছে, আর মন্তব্য করেছে, মেয়েটা ঝানু বটে। গোড়ায় গোড়ায় ভাবতাম কোথায় দেখেছি মেয়েটাকে। পরের হৃদ্যতায় আর সে-চিন্তা মাথায় আসত না।

চিঠি এই শ্রীলেখার।

এতবড় চিঠি দেখে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম। কে লিখল আগেই নামটা দেখে নিয়ে আরো অবাক। চিঠি পড়তে পড়তে আমার সর্বাঙ্গ সিরসির করছে।

খেতে বসে চিঠিটা আবার খুললাম। বাড়ি ফেরার আগেই এটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে, বা একটা কিছু করতে হবে। চিঠিটা দ্বিতীয় দফা পড়তে পড়তে খাওয়ার কথা মনেও থাকল না।

চন্দ্রাণীদি,

প্রথম দিন আমাকে দেখেই আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মুখ চেনা লাগছে, কোথায় যেন দেখেছি...মনে আছে? আমি বরাবর স্মার্ট মেয়ে, অবস্থাগুণে আগের থেকেও ঢের বেশি স্মার্ট হয়েছি। তাই কোথায় দেখছেন আপনি আজও জানেন না।

আপনি যে বছর কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে বেরিয়ে গেলেন, সেই বছর আমি স্কুল ছেড়ে ওই কলেজে ঢুকি। মাত্র মাস কয়েকের জন্য আপনি আমাকে ওই কলেজে দেখেছেন। আমি স্মার্ট মেয়ে, অনেকের চোখে রূপসীও তাই হয়ত আপনিও আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন। নইলে, কলেজে আপনার তখন যা নাম-ডাক নীচু ক্লাসের মেয়েরা আপনার কাছে ঘেঁষতে পেত না। দূর থেকে আপনাকে দেখতো আর কত যে ভক্তি শ্রদ্ধা করতো সে-শুধু তারাই জানে।

আপনি কলেজ ছেড়ে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার ছ'মাসের মধ্যে কলেজের একটি মেয়েকে নিয়ে কাগজে-কাগজে এক কেলেংকারির খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছিল, মনে আছে?...পয়সাঅলা এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর ছেলে ষড়যন্ত্র করে কলেজের এক রূপসী মেয়েকে কিডন্যাপ করে কোথায় নিয়ে চলে গেছে কেউ জানে না। বাঙালি ছেলেরা তখন ক্ষেপে গিয়ে অবাঙালি ছেলেদের ওপর চড়াও হচ্ছিল। সে ধরা পড়লে কাগজে আবার ফলাও করে কোর্ট-নিউজ বেরুলো, সেই মেয়ে স্বীকার করেছে, কেউ ষড়যন্ত্র করে তাকে অপহরণ করেনি, মেয়েটি নিজে স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে চলে গেছল।

আমি সেই মেয়ে শ্রীলেখা চ্যাটার্জী।

কোথায় দেখেছেন জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও আমি গোপন করেছি কারণ, কলেজের নাম আর আমার নাম এক হলে বাকিটুকু আপনার মনে পড়ত।

আমার বাবা স্বল্প বিত্তের মানুষ ছিল। ভয় পেয়ে ওই ছেলেটি কাপুরুষের মতো আমায় ত্যাগ করার পর ঘরেও আমার জায়গা হয়নি। তারপর দুটো বছর আমার কি ভাবে কেটেছে আমিই জানি। পুরুষের বাসনা নিম্নগামী হলে সে-কি বীভৎস তাও জানি। শেষ পর্যন্ত আমার আশ্রয়দাতা উত্তরপ্রদেশের এক প্রৌঢ় শিক্ষিত অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক। তার কাছে থেকেই আমি বি. এ. পাস করি। তখন আমার সন্তান-সম্ভাবনা, কিন্তু সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক, যার শিক্ষা ছিল দয়ামায়াও ছিল—নিজের এই দুর্বলতাটুকু জানাজানির ভয়ে সে নিষ্ঠুর। আমি স্মার্ট মেয়ে হলেও আসলে এমন বোকা যে, আমি তার কাছ থেকে স্ত্রী স্বীকৃতি আশা করেছিলাম আর মা হতে চেয়েছিলাম। না, সে-সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হতে দেওয়া হয়নি—অনেক টাকার বিনিময়ে সেখানকার এই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সব সম্ভাবনা নির্মূল করেছে।

সেই থেকে আবার আমি আমার ডিগ্রি আর স্মার্টনেসের ওপর নির্ভর করে জীবিকার সন্ধানে নেমেছি, কাজ পেয়েছি, আরো ভালোর সন্ধান পেলেই সেটা ছেড়ে নতুন কাজে ঢুকেছি। আপনাদের নার্সিংহোমে আমি পাঁচ শ' টাকা মাইনে পাই, আরো বড় জায়গায় সাড়ে সাত শ' টাকার চুক্তিতে এই মাসের শেষে আমি এখানকার কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনার স্বামী ডক্টর রায় মাইনে বাড়ানোর আভাসও দিয়েছেন, কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত রাজি হয়নি।

...তিনি আমাকে রাখতে চান, কারণ আমি তাঁর বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছি। মাঝে মাঝে এমন রাস্তায় চলতে হয় তাঁকে যার দরুন তাঁর বিশ্বস্ত মেট্রন, আর সেক্রেটারি দরকার।

কেন যাবার আগে আপনাকে এ চিঠি লিখছি আপনি বুঝতে পারছেন কিনা জানি না। এই দু'বছরে আমি আপনাকে আগের থেকেও কত বেশি ভক্তি করি শ্রদ্ধা করি আপনি জানেন না। ভালোবাসি। আপনার সমস্ত লেখা আমি পড়ি, আর দেখি আপনার ভিতরটা কত সুন্দর, কত স্নিগ্ধ। আপনার রুচি-বোধের সঙ্গে কোনো কালো জিনিসের আপোস নেই। আপনার সমৃদ্ধি কামনা করি, কিন্তু কোনো কালো রাস্তা ধরে সেটা এলে আমার জ্বালা ধরে, অসহ্য ঠেকে। আপনি দেখছেন অজস্র-ধারে টাকা আসছে, কিন্তু তার সবটাই সাদা রাস্তা ধরে আসছে না সে-খবর আপনি রাখেন? এখানে বেশির ভাগই মা হতে আসে, কিন্তু পুরুষের বাসনার চিহ্ন মুছে দেবার দায়ে মা না হতেও যে আসে অনেকে—সে-খবর রাখেন? এ ছাড়াও আমার কাছে আরো অনেক অভিযোগের নজির আছে, যা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। জুনিয়র ডাক্তারদের দু-একজন আমাকে তাদের প্রিয়পাত্রী ভাবে, নিজেরাও আমার চোখে প্রিয় হতে চায়। এই দুর্বলতার ফাঁকে আমি কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করে থাকি। সে-সবের বিস্তৃত ফিরিস্তি থাক, আমার শুধু অনুরোধ, আপনার ভেতর-বার সুন্দর বলেই ডক্টর রায়কে আপনি সুন্দরের দিকে টেনে আনতে চেষ্টা করুন। নইলে আপনার ভবিষ্যৎ ভেবেও আমার ভয় হয় কেন জানি না। আমার ভেতরে আগুন জ্বলছেই, আমি স্মার্ট মেয়ে বলেই সে-আগুন কেউ দেখবে না। কিন্তু আপনি? আপনি তো পলকা স্মার্ট নন আমার মতো।

—শ্রীলেখা চ্যাটার্জী

খাওয়া ফেলে আমি উঠে পড়েছি এক সময়। চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলব কিনা ভেবেছি। বার কয়েক। পরে কি ভেবে ট্রাঙ্কে রেখে দিয়েছি।

শ্রীলেখার চিঠির প্রতিটি বর্ণ আমি বিশ্বাস করেছি। কেন করেছি আমি জানি না। অনেক দিনের একটা দুর্বোধ্য অস্বস্তি আজ একেবারে স্পষ্ট হয়ে আমাকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। ভিতরটা সেই থেকে চিনচিন করে জ্বলছে। জ্বলছেই। ঘরে আর টেকাই গেল না। বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় নেমে ট্যাক্সি ধরলাম একটা। শ্রীলেখার বাড়ি চিনি না। ফ্ল্যাটের নম্বর জানা আছে। ঘড়িতে সময় দেখলাম। আরো ঘণ্টা দুই পরে তার ডিউটি। সকালে সাতটা থেকে এগারোটা আর বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা তার নার্সিংহোমে হাজিরার সময়।

আমি গিয়ে হাজির হব, শ্রীলেখা কল্পনা করতে পারেনি। বড় জোর তাকে ডেকে পাঠাবো ভেবেছিল হয়ত। আমাকে দেখেই থতমত খেল একপ্রস্থ।—কি আশ্চর্য, আপনি?

খুব আশ্চর্য বলছে?

না...ভিতরে এসে বসুন।

ভিতরে এলাম। সাজানো-গোছানো একজনের ঘর। চেয়ারে বসলাম। ও শয্যায়। বললাম, আমাকে ভালোবাসো, ভক্তি-শ্রদ্ধা করো সে-জন্যেই চিঠিটা লিখেছো না কি আমি এত ভালো আছি দেখে ভিতরে ভিতরে কিছু যন্ত্রণাও আছে?

শ্রীলেখা গম্ভীর তক্ষুনি। এই মুখ দেখেই বোঝা যায় মেয়েটা কাউকে পরোয়া করে না বড় একটা। ফিরে জিজ্ঞাসা করল, যন্ত্রণা মানে হিংসে?

চোখে চোখে রেখে আমি মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ তাই কিনা আমার জিজ্ঞাস্য।

আপনি প্রমাণ চান?

তেমনি চেয়ে থেকে আমি মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ চাই।

মেয়েটা এমনিতেই ছটফটে একটু। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে আমার চারদিকে চক্কর খেল একপ্রস্থ। তারপর সামনে দাঁড়াল। বলল, দুই একজন ডাক্তারকে ডাকতে পারি, কিন্তু আপনার সামনে তারা হয়ত স্বীকার করবে না, কারণ তারাও বড় হবার স্বপ্ন দেখে। দুই একজন মেয়ের ঠিকানা দিতে পারি, কিন্তু যে-ব্যাপার গোপন করার জন্য তাদের পুরুষেরা হাজার হাজার টাকা খরচ করে তারা আপনার কাছে সত্য স্বীকার করবে না। যাক, আপনি যখন হিংসে ভাবতে পেরেছেন তখন আমার আর কিছু বলার নেই, আপনাকে যেটুকু জানাবার জন্য আমার ভিতরটা অস্থির হয়েছিল আপনাকে জানিয়েছি, আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন আমার কিছু যায় আসে না।

—তোমার অনেক যায় আসে। আমার গলার স্বর উঁচু নয়, কিন্তু কঠিন।—আমি অবিশ্বাস করলে নিজের হাতে নিজের নাম দিয়ে যে-চিঠি লিখেছ সেটা কোর্টে যাবে। প্রমাণ যে করতে পারবে না সে তুমি নিজেই বললে। মানহানির মামলায় তোমার সাড়ে সাত শ'টাকা মাইনের নতুন চাকরিই শুধু হাওয়ায় ভেসে যাবে না, তোমার ভবিষ্যৎ তার থেকেও অন্ধকার হবে বোধহয়।

শ্রীলেখা থমকে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। শয্যায় বসল আবার। স্তব্ধ চাউনি। তারপরেই ঝলসে উঠল। যেন। বলল, ঠিক আছে, কোর্টে গিয়ে কেস করুন তাহলে, আমি খারাপ মেয়ে আবার না-হয় খানিকটা তলিয়ে যাব। কিন্তু আপনার স্বামী তাঁর সুনামের নার্সিংহোম নিয়ে নাড়া-চাড়া বরদাস্ত করবেন বলে আমার মনে হয় না। আপনি চেষ্টা করুন—

আবার খানিক চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে গলার সুর পালটালাম আমি। বললাম, আমি সে চেষ্টা করব বলে আসিনি, তোমার সব কথা আমি বিশ্বাস করেছি বলেই এসেছি, তোমার ভিতরে এখনো আগুন জ্বলছে বিশ্বাস করছি বলেই এসেছি, আর সেই আগুনে পুড়ে-পুড়ে তোমার ভিতরটা সোনা হয়ে গেছে ভাবতে পেরেছি বলে এসেছি।

বিপরীত বিস্ময় শ্রীলেখা বিমূঢ় হঠাৎ। চেয়ে আছে। একটা উদ্গত অনুভূতি চাপতে চেষ্টা করে মাথা ঝাঁকালো। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, না না, আমি খুব খারাপ, আমার ভিতরে কত যন্ত্রণা জানেন না।

যন্ত্রণা থাকলে কেউ খারাপ হয় না। তোমার ওপর রাগ হয়েছিল, আমার মধ্যেও যন্ত্রণা ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও বলে।

কি বলতে চাই সঠিক ঠাওর করতে পারল না। চুপচাপ একটু ভেবে বললাম, আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো, আজ থেকে আমি তোমার সত্যিকারের দিদি!...আমার অবাক হবার মতো তোমার কাছে আরো অভিযোগের নজির আছে লিখেছ—সেগুলো কি?

আরো খানিক চেয়ে রইল। বিশ্বাস করল আমাকে। ওর ভিতরটা এত শূন্য যে বিশ্বাস করে আঁকড়ে ধরতেই চায় কাউকে। একে একে যে-সব কথা বলল শুনে আমি স্তব্ধ। অবশ্য, ও নিজে ডাক্তার বা মেট্রন নয়, তাই হলপ করে বলতে পারবে না—কিন্তু ওখানে থেকে আভাসে ইঙ্গিতে যেটুকু বুঝেছে তা অবিশ্বাসও করেনি।

...এক পয়সাওলা পেশেন্টের কেস জানে, যার পঞ্চাশ টাকার ইনজেকশনে অসুখ সেরে যেতে পারত বলে কানাঘুষা শুনেছে, কিন্তু টিউমার বলে তাকে দু'হাজার টাকার অপারেশনের ধাক্কায় ফেলা হয়েছে। পয়সা আছে বুঝলে তিন দিনের কেস দশ দিনে ফয়সলা হয় বলে তার বিশ্বাস। এমন কথাও শুনেছে, সিজারিয়ান দরকার নেই, অন্তত অপেক্ষা করে দেখা চলত—কিন্তু নির্দ্বিধায় অপারেশন করে মোটা টাকা রোজগার হয়ে থাকে। এক পেশেন্টের ক্যানসার সন্দেহ করা হয়েছিল, একুশ দিন তাকে আটকে রাখার পর ত্রাসে প্রায় পাগল হয়ে দেড় হাজার টাকার ওপর বিল মিটিয়ে সেই পেশেন্ট অন্যত্র গিয়ে বড় ডাক্তার দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছে। তারপর রীতিমতো গালাগাল করে নার্সিংহোমে

চিঠি দিয়েছে। সেক্রেটারি হিসেবে সে-চিঠি আমি খুলে পড়েছি। ডক্টর রায় সেটা পড়ে ছিঁড়ে ফেলেছেন, হেসে বলেছেন, যত সব পাগলের কাণ্ড, আমরা তো সন্দেহ করেছিলাম—ক্যানসার হয়েইছে সে-কথা তো বলিনি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর ওর সঙ্গে আরো একটু অন্তরঙ্গ হবার আশায় বললাম, এক পেয়ালা চা খাওয়াতে পারো?

ব্যস্ত হয়ে শ্রীলেখা সেখানেই চা করতে বসল। ফলে আমি ভাবার অবকাশ পেলাম একটু।

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, এ-রকম যে হচ্ছে ডক্টর সুধীর দত্তও জানেন তো?

ডক্টর দত্তর কথা ছেড়ে দিন, তিনি এক অদ্ভুত মানুষ—কোনো কিছুতেই তিনি সে-ভাবে মাথা দেন না, দিলেও ডক্টর রায়ের ওপর দিয়ে কিছুই ভাবতে চান না।

অদ্ভুত মানুষ বলতে তুমি ভালো বলছ না খারাপ বলছ?

ভালো। খুব ভালো।...গরিব পেশেন্টও তো এক-আধজন এসে পড়ে। এই তো সেদিন এক পেশেন্ট এসেছিল যার সিজারিয়ান দরকার—অথচ টাকার যোগাড় নেই। কত টাকা লাগবে জানিয়ে ডক্টর রায় বাইরের কলে বেরিয়ে গেছলেন—মেট্রন এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল কি হবে, কেস খারাপের দিকে গড়াচ্ছে। ডক্টর দত্ত তখন এসে পড়তে তাঁকে জানালাম। কেস দেখেই তিনি অপারেশন করলেন। আমি টাকার কথা বলতে হেসে ঠাট্টা করলেন, আমার শেয়ার থেকে কেটে নিও।

ভিতরটা আমার চিনচিন করতে লাগল। চায়ের পেয়ালা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শ্রীলেখা আবার বলল, আসলে ব্যাপার কি জানেন, ওই ভদ্রলোকও যে দুই একটা অন্যায় অপারেশন করে না এমন নয়, যা তাঁকে করতে বলা হল করে দিয়ে খালাস, কোনোরকম ন্যায় অন্যায়ের ভাবনা চিন্তাই নেই তাঁর। এমনই হয়েছে এখন উনি খারাপ কিছু করে বসলেও খারাপ কেউ ভাবে না।

চা খেতে খেতে চিন্তাচ্ছন্নের মতো কাটালাম খানিক। কিন্তু কিছুই ভাবছিলাম না। নিজেকেই ঠাণ্ডা করতে চাইছিলাম। তুমি নোটিশ দিয়েছ?

মুখে জানিয়েছি।...ডক্টর রায় আপত্তি করেছেন, মাইনে বাড়াবার কথা বলছেন—

কত বাড়ায় দেখো, বাদ বাকিটা তুমি আমার কাছ থেকে নিও, মোট কথা ওই সাড়ে সাত শ'ই পাবে তুমি, তার থেকে বেশিও দিতে পারি—কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার চিন্তা তোমাকে ছাড়তে হবে।

না চন্দ্রাণীদি, না—আমি শুধু টাকার জন্যেই যাচ্ছি না, আমার মাথাই কেমন হয়ে গেছে, কেউ গণ্ডগোলের রাস্তায় চলেছে মনে হলেই কি রকম অসহ্য লাগে—ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু আমাকে এই যন্ত্রণার মধ্যে রেখে তুমি পালিয়ে যাবে? তাহলে জানালে কেন? আমাকে যদি তুমি একটুও ভালোবাসো তাহলে যাবার কথা আর মুখেও আনবে না...এরপর তোমাকেই আমার সব থেকে বেশি দরকার। তুমি চলে যেতে চাইলে তোমাকে আমি শত্রু ছাড়া আর কিছুই ভাবব না।

দ্বিধায় পড়ে শ্রীলেখা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আমি থেকে আপনার কি কাজে লাগব?

অনেক—অনেক কাজে লাগবে, তুমি না থাকলে আমি অন্ধকার দেখব। কিন্তু সে-সব পরের কথা। আজই তুমি ডক্টর রায়ের সঙ্গে মাইনে সম্পর্কে বোঝাপড়া করে নাও, তাহলে কেউ জানবে না আমি তোমাকে জোর করে আটকেছি। সুধীর দত্তও না। তারপর টাকা যদি আরো বেশি চাও তো আমি দেব—কারো কিছু জানার দরকার নেই। এরপর যখন দরকার হবে তোমার সঙ্গে আমি এখানেই দেখা করব।

ওকে আর ভাবনা চিন্তার অবকাশ না দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

চার

তিন মাস হল আমি একটা মুখোশ পরে কাটাচ্ছি।

সহজতার মুখোশ। স্বাভাবিকতার মুখোশ। এর একটা যন্ত্রণা আছে যা ভেতরটা কুরে খায়। আমি যদি রাগারাগি চেঁচামেচি করতে পারতাম তাহলে হয়ত এর থেকে সুস্থ থাকা যেত।

আমার কথা মতো শ্রীলেখা থেকে গেছে। তার সাত শ' টাকা মাইনে ঠিক হয়েছে। ঘাটতির বাকি পঞ্চাশ টাকা দিতে চেয়েছিলাম সে নেয়নি। ও আমার দূত। খবর যোগাচ্ছে আমাকে। এতে ওর এত উৎসাহ, এত চাপা উদ্দীপনা। যে মনে হয় ওকে আগের মাইনেয় নামিয়ে আনলেও ও শুধু এই সংগোপন দায়িত্বটুকু পালন করার জন্যেই থেকে যাবে। গোড়ায় গোড়ায় আমি গেছি ওর ওখানে। ফাঁক বুঝে ও আমাকে টেলিফোন করত, একবার দেখা হলে ভালো হয়। আমি যেতাম। কিন্তু ওর এই দেখা করার তাগিদটা ঘন ঘন হয়ে উঠতে আমার হাঁপ ধরার দাখিল। এরপর আমি ওকে সময় দিতাম, এই সময় এসো।

খবর থাকলে সেটা জানার ঝোঁক আমারও কম নয়। কিন্তু যে কাজের জন্য আমি লাগিয়েছি ওকে সেটা যে আমার দিক থেকে কত মর্মান্তিক ও বোধহয় কল্পনাও করতে পারত না। অতি তুচ্ছ ব্যতিক্রমও ওর কাছে তুচ্ছ নয়। শ্রীলেখা যা বলতে আসে আমার কাছে সেটা কতখানি অবাঞ্ছিত তা নিয়ে ও মাথা ঘামায় না। তাই অনেক সময় আমার মনে হয় ও তিলকে তাল করছে না তো?

ও যে-সব খবর দেয় আমি একটা নোট বইয়ে লিখে রাখি। মাঝারি সাইজের একটা নোট বইয়ের আধাআধি ভরাট হয়ে গেল। কবে কোন্ পেশেন্টকে কি সংশয়জনিতভাবে চিকিৎসা করা হয়েছে, কত টাকা নেওয়া হয়েছে, নার্সিংহোমের তহবিলে কোন্ কোন্ খাতে মোটা অঙ্কের টাকা আসছে, কখন কি বিসদৃশ খবর শ্রীলেখার কানে এসেছে, স্ত্রীর অগোচরে এবং স্বামীর প্ররোচনায় কোন্ মহিলার দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তান লাভের সম্ভাবনা নির্মূল করা হয়েছে—এ-সব তারিখ দিয়ে দিয়ে আমার সেই খাতায় লেখা আছে।

আমার ক্লান্তি ধরে আসছিল। এ-সব দিয়ে আমি কি করব জানি না। ঘরের লোকের দিকে আমি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছি। তেমন কিছু ব্যতিক্রম আমার চোখে পড়ে না। নার্সিংহোমের সম্প্রসারণ নিয়ে একটু বেশি ব্যস্ত। নতুন একটা ব্লক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অপারেশন থিয়েটার ঢেলে সাজানো হচ্ছে। লেবার বা স্ত্রী-রোগ সংক্রান্ত পেশেন্ট ছাড়াও বাইরের সার্জন ইচ্ছে করলে এখানে কেস এনে এবং রেখে অপারেশন করতে পারবে।

ওদের ব্যস্ততা দেখে মাঝে মাঝে আমি আগের মতই ঠাট্টা করি। সেদিন বললাম, নার্সিংহোম নার্সিংহোম করে অস্থির দেখি সর্বদা—ঘর বলে কিছু নেই?

প্রশান্ত বলল, তুমি কুড়ে হয়ে গেছ—লেখা কমিয়েছ কেন?

জবাব দিলাম, সুধীর বলে আমার লেখার বিষয়বস্তু হাওয়ায় ভাসে, তাই বাস্তব বস্তু খুঁজে বেড়াচ্ছি। ...নার্সিংহোম নিয়ে লিখলে কেমন হয়?

সত্যি কিনা জানি না, আমার মনে হল প্রশান্ত যেন সচকিত একটু। —সে তো আরো অবাস্তব হবে, নার্সিংহোম সম্পর্কে তুমি জানো কি?

সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে আমিও যেন নাড়াচাড়া খেলাম একপ্রস্থ। ভিতর দেখার উদগ্র তাড়না একটা। কিন্তু তার ওপর দিয়ে সহজতার প্রলেপ ছড়ানো কত শক্ত, আমিই জানি। আমি চাই গলার স্বরেও কৌতুক ঝরুক। বললাম, এমন দু' দুটো নার্সিং হোম বিশারদ আমার হাতের মুঠোয়, আমার জানতে কতক্ষণ লাগবে? রসদ তোমরা যোগাবে—

. সুধীর সিগারেট টানছিল, হাসছিল মিটিমিটি আর শুনছিল। এবারে ওর যেন উৎসাহ দেখা গেল। বলে উঠল, এবার লেখার ছিচকাঁদুনি ছেড়ে বুদ্ধিমতীর মতো ভাবতে শুরু করেছ দেখা যাচ্ছে,

ওয়ান্ডারফুল হবে—তুমি লেখো, আমি মেটিরিয়াল সাপ্লাই করব।—কিন্তু আমরা কত সময় কত রকমের কাণ্ড করি জানলে যে তোমার আবার নরম-স্নায়ুতে ঘা পড়বে!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম যেন, সে-রকম কাণ্ডও আবার করো নাকি তোমরা!

আলবত করি। পয়সা ছড়ানো দেখলে কেউ না কেউ ঘরে তুলবেই—যে না তোলে সে বোকা।

তাহলে আমি ধাক্কা খাব কেন?

ঠিক এই জায়গাতেই প্রশান্ত বাধা দিল বন্ধুর উদ্দেশ্যে আধা-বিরক্তির সুরে বলল, কি বাজে বকিস ঠিক নেই। আমার দিকে ফিরল, সাদা-সিধেভাবেই বলল, তুমি যদি ডাক্তার-লেখিকা হতে তাহলে বলতাম লেখো—মাঝখান থোকে লোক হাসবে, আমার মনে হয় যা নিয়েই লেখো তার ভেতরে ঢোকা চাই।

উৎসাহের অভাব নেই যেন আমার, অবুঝপনারও নয়। সাগ্রহে প্রস্তাব করলাম, কেন আমি যদি কিছুদিন তোমাদের নার্সিংহোমেই থাকি—ভিতরে ঢুকতে পারব না? আমি তো আর ডাক্তারি শাস্ত্র লিখতে যাচ্ছি না—

মাথা খারাপ নাকি! যুক্তির দিকে না গিয়ে প্রশান্ত সোজাসুজি প্রস্তাবটা নাকচ করে দিল।

ছদ্ম-গাম্ভীর্য সুধীর বলল, তুমি লিখবে বলে আমরা আমাদের ট্রেড সিক্রেট ফাঁস করতে রাজি নই।

ভিতরে ভিতরে আঁচড় পড়ছে। তার জ্বালা আছে, যন্ত্রণা আছে। প্রকাশ নেই। আমার নোট বইয়ে যা-সব লেখা আছে সেগুলো আমি লেখার কাজে খাটাব, এমন চিন্তা আগে কখনো মাথায় আসেনি। কিন্তু মনের তলায় এখন সেই লোভই যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তখনকার মতো সেটা বাতিল করেছি।

আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ ছ'বছর। এর মধ্যে একটু-আধটু মান-অভিমানের ব্যাপার কখনো ঘটেনি। এমন নয়। কিন্তু সে-সব এত তুচ্ছ যে মনের ওপর এতটুকু দাগ কাটেনি কখনো। কিন্তু আবার একটা সামান্য ঘটনায় মানুষটা সেদিন হঠাৎই যেন আমার সম্পর্কে সজাগ একটু।

ঠিক যা আমি চাইনি।

আমার পরিচিত লেখকদের কারো স্ত্রীদের স্বাস্থ্যগত ব্যাপারে কোনোরকম সমস্যা উপস্থিত হলে তারা সোজাসুজি আমাকে টেলিফোন করেন, তারপর নির্দেশ মতো স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে বা নার্সিং হোমে দেখিয়ে যান। অস্বীকার করব না, কোনোরকম ফী-র আশা না রেখেই প্রশান্ত যত্ন করে দেখে, ভেবে চিন্তে পরামর্শ দেয়। কেউ কেউ ফি দিতে এলে হাসি মুখে সে পাল্টা অনুযোগ করেই ফি দেবার ইচ্ছে বাতিল করে দেয়।

সেদিন এক লেখক ভদ্রলোক অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে একবার বাড়িতে এসেছিল। ভদ্রলোক ওরই বয়সী, আর তার স্ত্রীটি আমার থেকে কিছু ছোট হবে। লেখকদের মধ্যে ইদানীং এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার একটু বেশি খাতির হয়েছিল, কারণ, তাঁর লেখার মধ্যে বলিষ্ঠ হৃদয়ের খবর মেলে। তাঁর শেষের দুখানা বই বড়ে আমি নিজে থেকে চিঠি লিখে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম, এবং সস্ত্রীক বাড়িতে ডেকে চা খাইয়েছিলাম।

সম্প্রতি স্ত্রীটিকে নিয়ে তাঁর একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে। তিনি বছর আগে অর্থাৎ স্ত্রীর যখন তেইশ বছর বয়স, ছেলে হতে গিযে মহিলা ভয়ানক কষ্ট পেয়েছিল। তখন বাইরে ছিল, সেখানকার হাসপাতালের ব্যবস্থাও ভালো ছিল না। মেয়ে হয়েছিল, ফরসেপের আঘাতে হোক বা যে কারণেই হোক, বাঁচেনি। তিন বছর বাদে আবার তার সন্তান সম্ভাবনা। অবশ্য তার ঢের দেরি এখনো। কিন্তু মহিলা এখন থেকেই কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রথমবারের সেই যাতনা আর অঘটন ভুলতে পারেনি। উল্টো-পাল্টা কথা বলে, তার সবটাই ভয়-মেশানো। এবারে যা হবার হয়ে গেলে পরে আর ছেলে-পুলের লোভ নেই—তাও ঘোষণা করেছে, এবং একই সঙ্গে অপারেশন করে সেই সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়ার বায়না ধরেছে, ইত্যাদি।

এসব আলোচনায় আমার সামনে বসে থাকাটা সংকোচের ব্যাপার। যে কোনো আছিলায় উঠে

যেতে পারতাম। কিন্তু তা না গিয়ে বসেইছিলাম। একে লেখিকা, তার ওপর ডাক্তারের বউ, পরিচিত জনের এই গোছের সমস্যার আলোচনায় উপস্থিত থাকা যেন জল-ভাত ব্যাপার আমার কাছে, উল্টে সতীর্থ লেখকের সমস্যা সহানুভূতি সহকারে শোনাটাই যেন স্বাভাবিক।

কিন্তু আমার বিশেষ লক্ষ্য ঘরের লোকের দিকে কেন, নিজেও সঠিক জানি না হয়তো তখনো।

চেয়ে চেয়ে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককেই দেখছি আমি। তার কথা শুনছি।

একটু চুপ করে থেকে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন?

তা অনেকদিন হবে, ওর তখন বছর আঠেরো বয়েস।

আপনার স্ত্রীর সেই প্রথম সন্তান হয়েছিল তেইশ বছর বয়সে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেন?

একেবারে চাঁছাছোলা প্রশ্ন। লেখক ভদ্রালোক হঠাৎ যেন বিব্রত একটু। কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। বলল, তেইশ বছর তো খুব একটা বেশি নয়...

বেশি নয়, কিন্তু খুব কমও নয়। কারো কারো ক্ষেত্রে বেশিই বলব। একটা জিনিস কি জানেন, এ-সব জটিলতা আগে একটা ছিল না। ষোল সাতের আঠেরোয় যাদের ছেলেপুলে হয়ে যায়, তাদের বেলায় দেখবেন সব থেকে কম ঝামেলা। আর মনের দিক থেকেও তারা অনেক সবল থাকে।...যাক, ওই দুর্ঘটনার তিন বছর বাদে আবার এই সন্তান সম্ভাবনা বলছেন, এই লম্বা গ্যাপটাও বোধ হয় আপনাদের ইচ্ছাকৃত?

ভদ্রলোকের অপরাধী মুখ। জবাব দিয়ে উঠতে পারল না। আমি প্রশান্তর দিকে চেয়ে আছি। তার চাউনিতে অভিযোগ, অভিজ্ঞতাঠাসা মুখ। বলল, খুব অন্যায় করেন, প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সায়েন্স আছে, সেটা না জেনে আপনারা নিজেরাই ডিসিশান নিয়ে বসেন...।

এরপর পেশেন্ট সম্পর্কে নির্দেশ আর তাকে নার্সিংহোমে দেখাবার তারিখ দিতে ভদ্রলোক বিদায় নিল।

আমি প্রশান্তর দিকে চেয়ে আছি। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যে তাতে আমারও সন্দেহ নেই।

সে-ও আমার দিকে ফিরল।—কি?

অর্থাৎ আমার চাউনিতেই এমন কিছু ছিল যার জন্য এই প্রশ্ন।

না...। আয়নায় না দেখলেও জানি আমি হাসছিলাম অল্প অল্প।—এ ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমি একটু ব্যবসাই করলে বোধহয়?

সে অবাকই একটু।—কি রকম?

সতরোয় বিয়ে করে সকলেরই যদি তেইশে ছেলেপুলে হয় আর তারপরেও যদি তিন বছর কাটিয়ে দেয় তাহলে তোমাদের ব্যবসার অসুবিধে না?

কি যে বলো ঠিক নেই। বিরক্ত একটু।—আমি যা বলেছি তার সঙ্গে ব্যবসার কোনো সম্পর্ক নেই।

আরো বেশি হাসছিলাম বোধহয়।—একেবারে নেই বলছ?

কি ব্যাপার বলো দেখি...হঠাৎ তোমার এরকম সন্দেহ হল কেন?

হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল! মুখের ওপর থেকে চোখ সরানো গেল না। বললাম, প্রথম সন্তান আসার ব্যাপারে তেইশ বছর বয়েসটাই বেশি মনে হয়েছে তোমার, আর অঘটনের পর আরো তিন বছর কাটিয়ে দেওয়া তোমার মতে প্রায় অপরাধ। কিন্তু তোমার চোখের সামনে কারো বয়েস সাতাশ পার হতে চলল, তার ভালো মন্দ ভাবার তাহলে সময় হয়নি তোমার?

মুখের দিকে চেয়ে এবার আমার সত্যিই হাসি পাবার কথা। আচমকা শুকনো মাটিতে আছাড় খেয়ে উঠল যেন। কিন্তু হাসি দূরে থাক, ভিতরটা কেমন খরখরে হয়ে উঠছে আমার।

—কি কাণ্ড! হতভম্ব যেন।—একেই বলে উপন্যাস-লিখিয়ে মেয়ে। হাসার চেষ্টা।—তুমি নিজেই তো বলেছিলে ও-সব এখন না!

যখন বলেছিলাম তখন আমার বয়েস একুশ আর তুমি বিলেত যাচ্ছ—ফিরে আসার পরেও কয়েকটা বছর কেটেছে, তার মধ্যে তুমি মস্ত ডাক্তার হয়েছ, কিন্তু এই ভালো মন্দের দিকটা তুমি আমাকে একবারও বলোনি!

কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও ওই ফাঁপরে-পড়া মূর্তি আমি ঠিকই লক্ষ্য করেছি। তার পরেই হেসে উঠল। লোকটাকে নির্বোধ বলবে কে? বলল, ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল চন্দ্রা—ভালো-মন্দটা নির্ভর করে ব্যক্তিগত টেম্পারামেন্টের ওপর—তাছাড়া তোমার মতো সকলের হাতের মুঠোয় বড় ডাক্তার আছে? ওই ভদ্রালোককে যা বলেছি সেটা ডাক্তারি শাস্ত্রের কথা, কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশের আগে তো মেয়েদের বিয়েই হয় না, চল্লিশের ওপর ফার্স্ট ডেলিভারি কেস কত আছে নার্সিং হোমের রেকর্ডটা উল্টে দেখে এসো—

প্রাণপণ চেষ্টায় আমিও সহজ হতে চেষ্টা করছি এবারে। জবাব দিলাম, আমার দায় পড়েছে।

ও কাছে এগিয়ে এলো। খুব কাছে ঝুঁকে দাঁড়াল। ঠোঁটের ডগায় হাসি টিপটিপ করছে। বলল, তোমার হচ্ছেটা যখন বোঝা গেল, গ্যারান্টি দিচ্ছি অঘটন কিছু ঘটবে না।

ধাক্কা মেরে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।—ছাই বুঝেছ, আমিও তর্কশাস্ত্র অনুযায়ী তর্ক করলাম, ওই ভদ্রলোককে যে তুমি খাঁটি কথা বলোনি ঘুরিয়ে সেটা নিজেই স্বীকার করলে।

ঘর ছেড়ে দ্রুত প্রস্থান করলাম।

লজ্জা লজ্জা লজ্জা। আমারই মাথায় যেন অস্বাভাবিক কিছু ভর করছে। ওই প্রসঙ্গ যতবার মনে পড়েছে ততবার নিজের ওপর রাগ হয়েছে। অথচ এও ঠিক, জলের মাছকে হ্যাঁচকা টানে টেনে তোলার মতোই ঘরের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারটিকে ধড়ফড় করে উঠতে দেখেছি আমি।

সন্ধ্যার পর আমার অবস্থা আরো শোচনীয়। বন্ধুকে নিয়ে প্রশান্ত ঘরে ফিরেছে। সুধীরের মুখের দিকে চেয়েই মাথা কাটা যাবার দাখিল আমার। তার হাসি-হাসি চোখের দুষ্টুমি দেখেই বুঝেছি সকালের কথা ফাঁস হয়ে গেছে। যত বন্ধুই হোক এ কেউ বলে দিতে পারে! ভিতরে ভিতরে সত্যিই বিষম ক্রুদ্ধ আমি।

সুধীর সোফায় গা ছেড়ে বসেই হাঁক দিল, কফি—

কফি না আসা পর্যন্ত দুজনের কেউ ফষ্টি-নষ্টির ধার দিয়ে গেল না। প্রশান্ত ছদ্ম মনোযোগে চিঠি-পত্র কি আছে দেখতে লাগল। আর ঘরের ছাদটা যেন গবেষণার বস্তু সুধীরের।

কফি আসতে গম্ভীর মনোযোগে তাতে দু'চারটা চুমুক দেবার পর সুধীর তাকালো আমার দিকে।—তোমার সঙ্গে আমি এক মত, তোমার স্বামী রত্নটি একটি নির্ভেজাল রাসকেল—

আমি সকোপে জবাব দিলাম, তোমরা দুজনেই।

আমি! আমিও? আমি তোমার কি উপকার করতে পারতাম!

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি দুজনের। আমার কানের ডগা পর্যন্ত তপ্ত। উঠে পালাতে গেলাম। সুধীর পথ আগলালো।—বোসো।

সরোষে দ্বিতীয় হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে নিলাম একবার। তারপর বলে উঠলাম, তোমার বন্ধু যদি ভেবে থাকে অন্যের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখে আমার হিংসে হয়েছে তাহলে খুব ভুল করেছে। তোমরা যে কতখানি পেশাদার হয়ে উঠেছ সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলাম। সরো—

ওর গা ঠেলেই আমি বেরিয়ে এলাম।

রাত্রির আপোসের চেষ্টাটা আরো অসহ্য। যতবার কাছে আসতে চেষ্টা করেছে, বিরক্তিতে ঠেলে সরিয়েছি। শেষে ও বলেছে, কি আশ্চর্য, সুধীরকে তো শুধু বলেছি , তার জন্যে তোমার এত রাগ কেন?

তপ্ত জবাব দিলাম, সব কিছুরই একটা সীমা আছে, বুঝলে?

—আমি জানতাম ওই একজনের বেলায় নেই। যাক, আমার ভয়ানক অন্যায় হয়েছে।

এবারে একরকম জোর করেই সবলে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

ছাড়ো।

কেন?

যা তুমি বুঝছে সেটা আপাতত মিথ্যে।

আপাতত মানে কি, সাতাশ সাঁইতিরিশের দিকে গড়াবে?

রাগ হচ্ছে। কিন্তু রাগ মানেই হার। ভ্রূকুটি করে তাকালাম। গড়ালেও তোমার হুঁশ ফিরত কিনা সেটাই যাচাই করে দেখতে গেছলাম।

ফিরত।

ঠিক আছে। তাহলে আরো এক আধ বছর সবুর করো। একটা বড় জিনিসে হাত দিতে যাচ্ছি, এর মধ্যে কোনোরকম গণ্ডগোল বরদাস্ত হবে না।

কি বড় জিনিস?

সঙ্গে সঙ্গে নোট বইয়ের লেখাগুলো আর তার ফ্ল্যাপে গোঁজা শ্রীলেখার সেই চিঠিটা চোখের সামনে এই প্রথম যেন আকার নিতে থাকল। তা সত্ত্বেও এটা কোন রকম বড় জিনিস ভাবা যাচ্ছে না। পলকা রাগে আবার ঠেলে সরাতে চেষ্টা করলাম, সরো—তোমার কাছে বড় জিনিস তো শুধু ওই নার্সিং হোম—

...ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছি বই কি। আদরে সোহাগে আমাকে অস্থির করে তোলার আগ্রহ।

ঠিক এই সময় সুধীরকে নিয়ে আবার এক বিভ্রাট। সে এমন এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার যেন দিন কতকের জন্য আমারই আহার নিদ্রা ঘুচে যাবার দাখিল। সে ক'টা দিনের জন্যে শ্রীলেখার দেওয়া খবরা-খবরেও আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। উল্টে আমার ভিতরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর সন্দেহ কয়েকটা দিনের জন্য মুক্তি পেয়ে বেঁচেছিল?

বিভ্রাটের প্রহসন কবে থেকে কি ভাবে দানা পাকাচ্ছিল প্রশান্তও জানে না, আমিও না। সেদিন প্রশান্ত এসে বলল, প্রায়ই আজকাল বোস সাহেবের বাড়িতে সুধীরের ডাক পড়ছে কেন বুঝতে পারছি না।

বোস সাহেব মানে হার্ট-স্পেশালিস্ট অমল বোসের বাড়িতে। সেই ব্যাপারের পর থেকে সুধীরের সঙ্গে মৈত্রেয়ী বোসের অন্তত মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তাই কথাটা শুনে কৌতূহল হল। পরদিন সুধীরকে জিজ্ঞাসা করতে ও হাসতে লাগল। বলল, আমি লোক ভালো সেটা বুঝে তাঁরা যদি আমাকে ডাকাডাকি করেন তো না গিয়ে কি করব?

জিজ্ঞাসা করলাম তুমি লোক ভালো এটা মৈত্রেয়ী বোসও বুঝেছেন?

—বুঝতে চেষ্টা করছেন। এখন মাঝে মাঝে মহিলার সন্দেহ হচ্ছে তোমার পাল্লায় পড়েই হয়তো আমি বিগড়েছি, মেয়েদের নিয়ে ইয়েটিয়ে করার ব্যাপারে তুমিই হয়তো আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছ, মানে বে-পরোয়া করে তুলেছ। তোমার সম্পর্কে আর তোমার লেখাটেখা সম্পর্কে যা বলেন শুনে আমার কান জুড়িয়ে যায়...ওই হিংসুকটা তোমার কানে কি লাগিয়েছে শুনি?

প্রশান্ত প্রতিবাদ করল, আমি শুধু টোপটা ফেলেছি, আর কিছু বলিনি।

আমিও তার পক্ষ নিয়েই চোখ রাঙালাম, হিংসা কেন, মৈত্রেয়ী বোসের খাতির পাচ্ছ বলে?

—না তো কি, আমার বদলে যদি ওর ডাক পড়ত, গলদ চোখে পড়ত কিছু?

ডাক পড়ার তাৎপর্যও শুনলাম। মৈত্রেয়ী বোস যে এলাকায় থাকেন সেখানকার অভিজাত মহিলারা বিলিতি কায়দায় একটা চায়েলড সেন্টার খুলেছেন। চায়েলড সেন্টার বলতে প্রথম শ্রেণীর কিণ্ডারগার্টেনের থেকেও উঁচু দরের কিছু। ফ্রি সার্ভিস অর্থাৎ বিনে পয়সায় শিশু নারায়ণ আর নারায়ণীদের সেবা। প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে ডোনারদের টাকায়। অভিজাত মেয়েরা নিজেদের চেষ্টায়

(এবং বলাবাহুল্য স্বামীদের সহায়তায়) রুই কাতলা গোছের অনেক বড় বড় ডোনার সংগ্রহ করেছেন। এ ব্যাপারে মৈত্রেয়ী বোস সহৃদয়ার মতই এগিয়ে এসেছেন। মাসে নাম-মাত্র (?) ভাড়ায় নিজের মস্ত বাড়ির এক তলাটা ছেড়ে দিয়েছেন। সামনে পিছনে মস্ত লন—এর থেকে ভালো আস্তানা আর কোথায় মিলবে?

নতুন সংস্থার প্রধান পরিচালিকাও মৈত্রেয়ী বোস। একে বিলেত ফেরত, তার ওপর এক কালে কলেজের ছাত্রী ঠেঙিয়ে অভ্যস্ত—তাঁর থেকে যোগ্য আর কে আছে? সকলের ধরা ধরিতে পড়ে তিনি দায়িত্ব না নিয়ে পারেননি। রোজ দুপুরে মায়েরা সব দু'ঘণ্টার জন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে সমবেত হন। শিশুদের তো বটেই, মায়েদেরও সময় ভালো কাটে।

এ হেন সংস্থায় শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন চিকিৎসক না থাকলেই নয়। সপ্তাহে দু'দিন অন্তত ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হওয়া দরকার। এদিক থেকে (যত রাগই থাক) মৈত্রয়ী বোস নিরপেক্ষ পরিচালিকা। তাঁর বিবেচনায় এ ব্যাপারে যোগ্যতম ব্যক্তি সুধীর দত্ত এটা স্বীকার করেই তাকে ডেকে নেওয়া হয়েছে। সুধীরের ধারণা এই কারণেই প্রশান্তর হিংসা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, শিশুরা তো আসে শুনলাম দুপুরে, তোমার রাত্তিরে ডাকে পড়ে কেন?

ও জবাব দিল, পরামর্শের জন্যে, দুপুরে পরামর্শের ফুরসত মেলে না জমে?

এর দিন কয়েক বাদে সুধীর নিখোঁজ হঠাৎ। পর পর পাঁচ ছ'দিন দেখা নেই ওর। প্রশান্তও ভেবে পেল না কি হতে পারে। সম্ভব অসম্ভব সর্বত্র খোঁজ নিল। ডক্টর বোসের ওখানে খবর নেওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে প্রশান্ত জানালো সেখানে থেকেই তো উল্টে ওর খোঁজে টেলিফোন আসছে। আজ আমার সঙ্গেই মিসেস বোসের টেলিফোনে কথা হল, বেশ রাগ-রাগ ভাব! বললেন, কতগুলো বাচ্চার স্বাস্থ্যের ভার নিয়ে এরকম দায়িত্বজ্ঞানশূন্যের মতো হুট করে কোথায় চলে যাওয়ার কি মানে হয়! এ-সব লোকের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া উচিত।

সত্যিকারের দুর্ভাবনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। সাত দিনের মাথায় নার্সিংহোম থেকে ফিরে হাসি-হাসি মুখে প্রশান্ত জানালো, সুধীর ফিরেছে।

আমি উদগ্রীব মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গেছল?

ও বলে হরিদ্বারে, আমার ধারণা কলকাতাতেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে ছিল।

কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে ভুল নেই, কিন্তু আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না—ও এলো না যে বড়?

মিটি মিটি হেসে প্রশান্ত জবাব দিল, তোমার জেরার পাল্লায় পড়তে চায় না বোধ হয়।

তুমি হাসছ কেন, কি হয়েছে বলতে পারছ না?

প্রশান্তর মুখেও এবারে কাব্য ঝরল, আমার দিকে চেয়ে টেনে টেনে বলল, রমণীর মন কে বা জানে...। আমার মনে হয় প্রণয়ঘটিত ব্যাপার, আর তার সঙ্গে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বোস জড়িত।

আমি তাজ্জব। শোনার পরেও বিশ্বাস হল না। তক্ষুনি মনে হল মহিলা ওদের থেকে কম করে দু'বছরের বড়। কিন্তু একবার সে কথা তুলতে সুধীর কি জবাব দিয়েছিল মনে পড়তে তা আর বললাম না। অসহিষ্ণু আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে বলো না?

—কিছু জানি না। জিজ্ঞাসা করতে ও বলল, প্রাণের দায়ে পালিয়েছিলাম, শেষে বাঁচার একটা আসুরিক রাস্তা বার করে ফিরে এসেছি।...নার্সিংহোমে কাজের চাপ ছিল, পরে কথা কইব ভেবেছিলাম, হাত খালি হতে দেখি পালিয়েছে।

তক্ষুনি সুধীরের ফ্ল্যাটে টেলিফোন করলাম আমি। ও-দিক থেকে রিসিভার তুলেই সুধীর জবাব দিল, আমি নেই।

তুমি এখুনি আসবে কি না?

না। মেয়েদের আর আমি বিশ্বাস করি না।

ভালো হবে না বলছি! আসবে কি না?

না। অত কৌতূহল ভালো নয়, সেটা দমন করে সংযম শিক্ষা করো।

সংযম বার করছি, আমিই যাচ্ছি তাহলে!

তার মানে আমার সংযম বিনাশের জন্য তুমি আসছ! স্বাগত, স্বাগত, বিশ্বামিত্রর থেকেও আমি ভাগ্যবান। ও ছোঁড়াটার হাতে একটা মোয়া-টোয়া কিছু দিয়ে এসো।

টেলিফোন আছড়ে ফেলতে গিয়েও সামলে নিলাম। শেষে তর্জনের মতো করে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আসছ না তাহলে?

এবারে ও বলল, রাত্রিতে আসব'খন, শ্রীমতীর ত্রাসে ক'রাত ভালো ঘুম হয়নি, দিনের বেলাতেই তিন পেগ চড়িয়ে এখন টেনে ঘুম দেবার তোড়জোড় করছি।

ও টেলিফোন ছাড়ার আগেই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রীমতীর ত্রাসে মানে?

মানে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বোসের ত্রাসে, তুমি আমার আদরের প্রেয়সী বলে তোমাকে বললাম, কিন্তু বাইরে যদি ফাঁস হয় তো এই বল্লভকে তোমারও হারাতে হবে বলে দিলাম।

ফোন ছেড়ে দিল।

রাতে দুই বন্ধুতে একসঙ্গেই এলো। দুজনেই গম্ভীর। এই গাম্ভীর্য কত পলকা এক নজর তাকিয়েই বোঝা গেল। গম্ভীর আমিও। কোনো কথা না তুলে আগে রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেললাম। কিন্তু সমস্তক্ষণই আমার হাসি পাচ্ছিল। ভিতরের যাতনায় অনেক দিন মন খুলে হাসতে পারিনি। মনের সে গুমোটও কেটে গেছে।

খাওয়া দাওয়ার পর ওকে নিয়ে পড়লাম। মুখখানা এমন যেন বধ্যভূমিতে এসে হাজির। প্রশান্তই প্রসঙ্গের আবতারণার চেষ্টায় এগোলো। বলল, মিসেস বোস কড়া রকমের প্রপোজ করেছিল—

তুমি থামো! সুধীরের দিকে ফিরলাম, বলো—

খানিকক্ষণের ফষ্টি-নষ্টির পরে সার ব্যাপারটা আমার মগজে বসে যেতে লাগল।

...এত চায়েলড় স্পেশালিস্ট থাকতে মৈত্রয়ী বোসের চায়েলড় সেন্টারে সুধীরের ডাক পড়তে ওর মনে খটকা লেগেছিল। মৈত্রেয়ী বোসের হাব-ভাব-আচরণ গম্ভীর। সুধীরকে বলেছেন, পাঁচজনের স্বার্থে যাকে ডাকা উচিত তাকেই ডেকেছেন—এর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু সুধীর নিঃসংশয় ব্যক্তিগত সম্পর্কটাই সব। সেটা যাচাইয়ের লোভে সাগ্রহেই সংস্থার শিশুস্বাস্থ্যের ভার নিয়েছিল। ক'টা দিন যেতে সন্ধ্যার পর পরামর্শের জন্য বাড়িতে ডাক পড়তে লাগল। পরামর্শটা যে অজুহাত মাত্র সেটা বুঝতে দু'দিনও লাগেনি। মিসেস বোস ভালো রকম খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তার হাব-ভাব-আচরণ একটু বেশি মার্জিত আর সংযত। কথা কম বলেন, গম্ভীর চোখে মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

সপ্তাহ তিনেক এইভাবে চলেছে, তারপর সুধীর দত্ত একদিন খোলাখুলি বলেছে, হঠাৎ আপনার এত স্নেহের কি করে যোগ্য হয়ে উঠলাম বুঝতে পারছি না—

অপলক চোখে মৈত্রেয়ী বোস মুখের দিকে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে জবাব দিলেন, সেই এক পার্টির রাতে তুমি আমার যা করেছ, বোঝা উচিত। তুমি আমার শান্তি নষ্ট করেছ, ঘর নষ্ট করেছ—

সুধীরের বরাত জোরে এই সময়ে ডক্টর বোস বাইরে থেকে রোগী দেখে ফিরলেন। যাবার আগে তাঁর অগোচরে মৈত্রেয়ী বলে দিলেন, কাল এসো—

সুধীর বাতাস সাঁতরে তার ফ্ল্যাটে চলে এলো। এই মহিলার ওপর তার দীর্ঘকালের জাতক্রোধ একটা! যখন সুধীরের বয়েস মাত্র আঠেরা উনিশ, তখন থেকে। (সেই রাগের হেতু তখন পর্যন্ত আমার বা প্রশান্তেরও অজ্ঞাত। সে একটা প্রতিশোধের আনন্দ নিয়েই ঘরে ফিরল। পরদিন গেল না, তার পরদিনও না। টেলিফোন আসবে জানা কথাই এলো। সুধীর জবাব দিল, জরুরী কেসএ পর পর দু'দিন ধরে আটকে আছে। সেই সন্ধ্যায় যেতে চেষ্টা করবে।

বলাবাহুল্য, গেল না। তার পরদিন বিকেলে ফ্ল্যাটে এসেই হাঁ। মৈত্রেয়ী বোস বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

বললেন, তোমাকে আমি এই গোছের কাপুরুষ ভাবিনি। তারপর কঠিন মুখ করে জিজ্ঞাসা করেছেন, একটা কথার খোলাখুলি জবাব দাও, চন্দ্রাণী রায়কে কতটা ভালোবাসো?

সুধীর জবাব দিয়েছে, খু-উ-ব।

তাকে তুমি কোনোদিন পাবে আশা করো?

সুধীর বোকা মুখ করে বলেছে, তাকে তো পেয়েই আছি।

মৈত্রেয়ী বোসের ঠাণ্ডা গলায় যেন আগুন ঝরছে।—আমি কি বলছি তুমি ভালোই বুঝতে পারছ। ঠিক ঠিক জবাব দাও।

এবারে ঠিক জবাই দিয়েছে সুধীর। আর সেই প্রথম তুমি করে বলেছে মৈত্রেয়ীকে।—না, তুমি যে-ভাবে বলছো সে রকম করে পাওয়ার আশা কোনোদিনই নেই।

—তাহলে সেদিক থেকে তোমার চোখ ফেরাতে হবে। 'তুমি' শুনে তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে সেই প্রথম হাসি উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। আদেশের সুরে বলেছেন, তুমি আর আমি বাইরে কোথাও চলে যাব। সেই ব্যবস্থা করো—বাইরে মানে একেবারে বিদেশে। টাকা-কড়ি আমার কিছু আছে, তুমিও যা পারো সংগ্রহ করো—বাইরে তুমি ডাক্তারি করবে, আমিও কিছু করতে পারব, সেজন্যে ভাবনা নেই। মুখের দিকে খানিক থমকে চেয়ে আবার বলেছেন, পার্টির সেই রাতে তুমি যা করেছ, তারপর থেকে নিজের বিবেক ঠিক রেখে আমার পক্ষে বোসের ঘর করা সম্ভব হচ্ছে না। তোমাকে যা বললাম, অনেক ভেবে মন স্থির করেই বলেছি।

সুধীরের তখন বিগলিত মুখ। কিন্তু ভিতরে টিপ-টিপ। সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করবে বলে কোনো প্রকারে তাঁকে বিদায় করল। যাবার আগে (সুধীরের ধারণা) মৈত্রেয়ী বোস আশা করেছিলেন, পার্টির সেই গর্হিত কাজটি সুধীর আবার করবে। কিন্তু ওর তখন খুশির এমনই ূরীয় অবস্থা যে সে-সব যেন আর খেয়ালই ছিল না।

মৈত্রেয়ী বোস চলে যেতে আধ ঘণ্টার মধ্যে সুটকেস গুছিয়ে ঘরে তালা লটকে সুধীর দত্ত নিখোঁজ। দেওঘরের নিরিবিলিতে কাটিয়েছে কটা দিন। কিন্তু এভাবে গা-ঢাকা দিয়ে কি আর সুরাহা হবে? শেষে মরীয়া হয়েই চলে এসেছে। এসে মৈত্রেয়ী বোসকে টেলিফোন করেছে। স্পষ্ট করে বলেছে, এ জীবনটা তাঁকে পূজনীয় মাস্টারমশায়ের অর্থাৎ ডক্টর বোসের স্ত্রী হয়েই কাটিয়ে দিতে হবে, এছাড়া আমার কোনো পথ নেই। সে চায়েলড্ সেন্টারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিচ্ছে। এর পর ওকে নিয়ে টানাটানি করলে লোক জানাজানি হবে শুধু, আর লোকের হাসির খোরাক জোগানো হবে, তার বেশি আর কিছু ফল হবে না। পার্টির সেই এক রাতের গর্হিত আচরণের জন্য সে ক্ষমা চেয়েছে, এক পুরনো প্রতিশোধের তাড়নায় সে ওই কাজ করেছে, প্রতিশোধটা কোন ছেলেমানুষি ঘটনাপ্রসূত তাও বলেছে।

ওধার থেকে মৈত্রেয়ী বোস নির্বাক শ্রোতা।

সুধীর দত্ত টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

...নির্বাক শ্রোতা আমরা দুজনও। অর্থাৎ আমি আর প্রশান্ত। আমি ওকেই দেখছি, চোখে পলক পড়ে না।

সুধীর হেসে বলল, হাঁ করে চেয়ে আছ কি, মৈত্রেয়ী বোসের খুব সম্ভব এখনো বিশ্বাস, তোমার আশা ছাড়তে পারিনি বলেই আমি ওকে ত্যাগ করলাম।

এসব কথা এমন কান-সওয়া আমার যে কানে ঢোকেও না ভালো করে। যে কৌতূহল এতক্ষণ ধরে আমার মনের তলায় ঘুর ঘুর করছিল সেই প্রসঙ্গে এলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, মৈত্রেয়ীর ওপর তোমার পুরনো রাগ আর প্রতিশোধের কথা বললে, ওঁর বিয়ের আগেও কি তোমাদের জানাশোনা ছিল নাকি?

উনি চিনতেন না, আমি ওঁকে চিনতাম।

কি রকম?

আমার মতো প্রশান্তও অবাক একটু। তার অন্তত জানার কথা, কিন্তু জানে না।

হাসি-হাসি মুখেই সুধীর বলে গেল, আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল ওঁর বাপের বাড়ি। আমাদের তুলনায় ঢের বড় অবস্থা। বাবা মৈত্রেয়ীকে পড়াতেন। তিনি চোখ বোজার পর চেষ্টা-চরিত্র করে দাদা

সে টিউশনিটা পেয়েছিল। আমি যখন স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ি তখন লম্বা ছুটি পড়লেই প্রশান্তর বাবা আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতেন! তখনই বোনেদের মুখে শুনেছিলাম, দাদা তার ছাত্রীর প্রেমে পড়েছে। আড়ালে গরিবের ঘোড়া রোগ নিয়ে তারা হাসাহাসি করত।..আমরা যখন কলকাতায় ডাক্তারি পড়ি, সে-সময় দাদার আশা একটু বেড়েছিল, বোকার মতো স্বপ্ন দেখছিল, মৈত্রেয়ী বড় রকমের একটা আত্মত্যাগ করবে, দাদার জীবনে এসে দাদাকে জীবন-যুদ্ধে জয়ী করে তুলবে। ফলে ও-বাড়ি থেকে দাদাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছিল। ...এর মাস কয়েক বাদে দাদা যখন মারা যায়, তার দিনকতক আগে নিজেই আমাকে ব্যাপারটা বলেছিল।...নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা বলে দাদা হাসতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দু'চোখে জল টলটল করছিল। দাদাকে কোনোদিন আমি ভালো চোখে না দেখলেও সেই থেকে আমারও একটা ছেলেমানুষি আক্রোশ ছিল মৈত্রেয়ীর ওপর।...আর দেখাশুনা না হলে অবশ্য ভুলেই যেতাম।

প্রশান্ত অবাক।—কই, আমাকে তো কোনোদিন কিছু বলিসনি?

জবাব না দিয়ে সুধীর হাসছিল। সেই প্রথম আমার কেমন মনে হল, যত বড় ডাক্তারই হোক ও এখন, আর যে মেজাজেই থাকুক সর্বদা, পিছনের এটা স্মৃতির ক্ষত ওর মধ্যে থেকেই গেছে।

পাঁচ

হঠাৎই আমার মাথায় চাপল সুধীরের এবারে একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। ধরে বেঁধে বিয়ে না দিলে ও সেদিকে মাথাই গলাবে না। এত বয়েস হয়ে গেল, রোজগারও অঢেল, বিয়ে আর কবে করবে? তাছাড়া শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকলে ওকে নিশ্চয় এভাবে চলতে দিতেন না, তিনি নেই যখন দায়িত্ব তো আমাদেরই।

রাতের নিরিবিলিতে কথাটা তুললাম। কিন্তু এদিকে সেরকম একটা উৎসাহ দেখলাম না। ও-পাশ ফিরে ঘুমুবার তোড়জোড় করে প্রশান্ত জবাব দিল, আমরা বললেই ও বিয়ে করতে গেল আর কি—।

জবাবটা নয়, এই গোছের নিস্পৃহতা আমার ভালো লাগল না। যদি নার্সিংহোম সম্পর্কে কোনো কথা তুলতাম, বা যদি বলতাম, অমুক বিদেশের জার্নালে অমুক আইডিয়াল নার্সিংহোম সম্পর্কে একটা লেখা পড়লাম—শোয়া ছেড়ে উঠেই বসতো হয়তো, আর আলো জ্বেলে তক্ষুনি জার্নালের খোঁজ করত।

আমি খোঁচা দিতে ছাড়লাম না, সে করুক বা না করুক আমরা বলছি না কেন?

ও-পাশ ফিরে উত্তর দিল, আমার ও-সব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আছে!...তাছাড়া নার্সিং হোম যে-ভাবে বাড়ছে এখন, ওরও আপাতত অন্য দিকে মন না গেলেই ভালো—

সামান্য কথা। হয়তো বন্ধুর সামনেই ও-কথা বলতে পারত। কিন্তু আমার তাইতেই রাগ হয়ে গেল। কেবলই মনে হতে লাগল, এরকম স্বার্থপরের মতো কথা আর বুঝি হয় না।

পরদিন সুধীর আসতে বেশ জোর দিয়ে নিজেই তুললাম কথাটা। বললাম, অনেক কাল নেচে কাটিয়েছ, আর না, এবারে বিয়ে-করতে হবে। নিজে না পারো আমি মেয়ে দেখে দিচ্ছি।

দুই চক্ষু কপালে তুলে সুধীর বন্ধুর দিকে তাকালো—কি ব্যাপার রে?

প্রশান্ত হেসেই জবাব দিল, কাল আমাকে বলছিল, তোর স্বভাব-চরিত্র নিয়ে কিছু সন্দেহ-টন্দেহ হয়েছে বোধহয়।

সুধীর বলল, স্বভাব-চরিত্র আবার নতুন করে কি খারাপ হল!

ঠাট্টায় কান না দিয়ে আমি ওর দিকেই চোখ রেখে বললাম, তোমার বন্ধু তো নার্সিংহোম নিয়ে এত ব্যস্ত যে এসব দিকে মন দেবার সময়ই নেই, তাই তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি বিয়ে করবে কি করবে না?

পলকা গাম্ভীর্যে আমার চোখে চোখ রেখে সুধীর জিজ্ঞাসা করল, আমি বিয়ে না করলে তোমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে?

—হ্যাঁ হচ্ছে।

—তাহলে লাগিয়ে দাও।

প্রশান্ত অল্প অল্প হাসছিল। এবারে বলল, তুই এক কাজ কর সুধীর, আমাদের সেক্রেটারি শ্রীলেখা চ্যাটার্জী তোকে বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে দেখি, বিয়ের অফারটা তাকেই না হয় দিয়ে ফেল, বেশ ঝকঝকে মেয়ে—

সুধীর কিছু বলার আগেই আমি বোকার মতো ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, না, ও-সব সেক্রেটারি-টেক্রেটারি চলবে না—

অবশ্য এটুকুতে ওদের মনে কোনোরকম খটকা লাগার কথা নয়। লাগলও না। সুধীর পাল্টা আক্রমণের সুযোগ পেল।—তবে কি-রকম চলবে, সাহিত্যিক মেয়ে?

প্রশান্ত চপল গাম্ভীর্যে সায় দিল, বোধহয়। তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস, ওর পছন্দের ওপর যখন নির্ভর, তোর কপালে শিগগির বিয়ে জুটছে না।

অর্থাৎ সুধীরের জন্য কোনো মেয়ে আমার সহজে পছন্দ হবার নয়। জোর দিয়ে বললাম, জোটে কিনা দেখো, শিগগিরই আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি।

হা-হা শব্দে হেসে উঠেই যেন সুধীর আমার সঙ্কল্পটা বাতিল করে দিয়েছে।

আরো কিছু ঠাট্টা ইয়ারকির পর বলেছে, আমাকে নিয়ে তোমার মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই ম্যাডাম, বুঝলে—লেখিকা হিসেবে তোমার লোকচরিত্র ঠাওর করতে পারার কথা, আই অ্যাম নট্ এ ম্যারিইংম্যান—

কথাগুলো আমার ভালো লাগেনি। অথচ মনে হয়েছে, এ ধরনের কথা যেন একমাত্র ওর মুখেই সাজে।

ভিতরটা দিনকে দিন এমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে কেন জানি না। আর তার তলায় কি এক অস্বস্তি থিতিয়ে আছে। মন দিয়ে সত্যি ভালো কিছু লেখার কথা ভেবেছি। কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বসতেও ইচ্ছে করে না। প্রায় অকারণেই ভিতরটা কি রকম সজাগ সর্বদা।

দুপুরে সেদিন শ্রীলেখার টেলিফোন আবার। ওর টেলিফোন মানেই খবর কিছু। যা সব থেকে বেশি অবাঞ্ছিত মনে হয় এখন। ওকে যেন মানুষের আচরণের তলা খুঁড়ে কীট বার করার কাজে লাগানো হয়েছে। এক ধরনের হিংস্র উদ্দীপনা নিয়ে ও তাই করে চলেছে। সেই সব কীট এখন পর্যন্ত শুধু আমাকেই দংশাচ্ছে। আর, কীট খুঁজে না পেলেও সর্বদাই কীটের ছায়া দেখে শ্রীলেখা। এ কাজ থেকে এখন ওকে বিরত করা যায় কি করে মাঝে-মাঝে এ চিন্তাও মাথায় আসে।

হ্যাঁ, বলো।

আজ আপনার সঙ্গে দেখা না হলেই নয়, খুব—খু-উ-ব জরুরী।

এসো।

না, আজ আমি যাব না, আপনি আসুন আমার ওখানে। বলতে সময় লাগবে, একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে চলেছে, আপনি একটু সময় নিয়ে আসুন, সুধীরবাবু আসছেন এদিকে, আমি ছাড়লুম—

ছেড়ে দিল। নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে আমার। শ্রীলেখা এখন অনায়াসে ওর ওখানে যেতে বলে আমাকে। বলবে না কেন, প্রশ্রয় তো আমিই দিয়েছি।

তক্ষুনি ঠিক করে ফেললাম যাব না। থাক ওর জরুরী কথা। কিন্তু বেলা যত বাড়তে থাকল ভিতরে ততো অস্বস্তি।...কি বলবে শ্রীলেখা, সাংঘাতিক ব্যাপার কি ঘটে থাকতে পারে? এ এমনই ব্যাপার যার মধ্যে একবার নেমে দাঁড়ালে চট করে ফেরাও শক্ত। অস্বস্তি অশান্তির আকার নিতে থাকল। শেষে বেরিয়ে পড়লাম।

এক নেশাগ্রস্ত লোকের কথা পড়েছিলাম। বার বার প্রতিজ্ঞা করত নেশা আর করবে না। এই নিয়ে নিজের সঙ্গে মর্মান্তিকভাবে যুঝত। কিন্তু অভ্যাসের তাড়না শেষে যাতনার আকার নিত যখন, হাল

ছেড়ে নেশায় বসে যেত। তখন দ্বিগুণ আনন্দ আর উৎসাহে নেশা করত। একবার ছেলের সঙ্কটজনক অসুখের দরুন দিন-কতক নেশায় ছেদ পড়েছিল। যাতনা শুরু হলেই সে বিবেকের চাবুক কশাতো। শেষে এক রাতে ছেলের জন্য দরকারি ওষুধ আনতে গিয়ে নেশায় বসে গেল। ফিরল যখন ছেলে নেই।

সেই থেকে তার নেশা ছুটে গেল।

আমারও ভিতরে ভিতরে একটা হারাবার আতঙ্ক কেন?

শ্রীলেখা আগ্রহ আর উত্তেজনায় যে সমাচার শোনালো—আমিও স্তব্ধ খানিক। গল্পের সেই নেশাগ্রস্ত মানুষের মতই আমারও শুভ অশুভের চিন্তা ঘুচে গেল।

নার্সিংহোমে গতকাল সন্ধ্যায় এক নতুন পেশেন্ট এসেছে। তার নাম অনিমা দাস। সুন্দরী নয়, কিন্তু বেশ সুশ্রী মেয়ে। বয়েস একুশ বাইশ। তার কোনো রোগ নেই। সুস্থ তাজা মেয়ে। ছেলেপুলে হবার ব্যাপারে নয় কিছু। এসেছে তার উল্টো উদ্দেশ্য নিয়ে। ছেলেপুলে যাতে কোনোদিন না হয়, আগে-ভাগে সেই ব্যবস্থা করতে।

শুনে আমি থ। জিজ্ঞাসা করলাম, রোগ নেই বা অপারেশন দরকার নেই তুমি জানলে কি করে?

জেনেছি। ডক্টর রায় প্রথমে রাজি হননি। শেষে রাজি হয়েছেন।

সেই মেয়ের সঙ্গে শ্রীলেখার একটা সকালের মধ্যেই খুব ভাব হয়ে গেছে নাকি। শ্রীলেখার গোড়া থেকে কেমন সন্দেহ হয়েছিল, তাই সেধে ভাব করেছে। আজও কেউ এই গোছের কোনো অন্যায় ব্যবস্থার জন্য এলে ওর ভিতরে ভিতরে জ্বালা-পোড়া শুরু হয়। পুরুষের অবিচারে তার যে সন্তান আলোর মুখ দেখল না, তার কান্না শোনে, (শ্রীলেখা এখন তার মনের কথা আমার কাছে কিছুই গোপন করে না। কথা প্রসঙ্গে নিজের অনেক কথাও বলে ফেলে।) মেয়েটার সঙ্গে ভাব হতে তার সন্দেহ আরো দানা পাকিয়ে উঠেছে। মোটামুটি লেখাপড়া জানা হলেও অনিমা দাস মেয়েটা একেবারে সরল। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এ ধরনের অপারেশনে ভয়ের কিছু আছে কি না।

শ্রীলেখা আশ্বাস দিয়েছে কিছুমাত্র না। পুরুষের প্রতি শ্রীলেখার আক্রোশটা বিকৃতির আকার নিয়েছে কিনা আমি জানি না। অনিমা দাসের বিশ্বাস অর্জন আর মনের কথা টেনে বার করার আগ্রহে লজ্জার মাথা খেয়ে ও নিজে থেকেই তাকে জানিয়েছে, এই গোছের একটা অপারেশন তারও হয়ে গেছে—দিব্বি সুস্থ সবলই তো আছে তার পরেও।

শোনার পর মেয়েটা গলগল করে মনের কথা বলেছে তাকে। এখন মস্ত গাড়ি হাঁকিয়ে যে লোকটা স্বামী পরিচয় দিয়ে অনিমা দাসকে এখানে রেখে গেছে—সে ওর সত্যিই স্বামী কিনা শ্রীলেখার তাতে ঘোর সন্দেহ, কারণ অনিমা দাসের স্বপ্ন সে সিনেমার নায়িকা হবে। কলেজে পড়তে বাপ-মায়ের অমতে ও শৌখিন দলে অনেক থিয়েটার করেছে। তাতে খুব নামও হয়েছিল। ওই থেকেই শ্রীদাসের সঙ্গে তার পরিচয়। শ্রীদাস পয়সাঅলা মানুষ, পরপর খান কয়েক ছবি করবেন। অনিমারা ছিল ব্রাহ্মণ, বাবা-মায়ের সমস্ত রকমের বাধা উপেক্ষা করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীদাসকে বিয়ে করেছে (যদিও ভদ্রলোক বয়সে ওর থেকে অনেক বড়)। একটা ছবিতে ইতিমধ্যে ছোটখাট কাজ করেছে। তার স্বামীই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সে-ছবি দু-এক মাসের মধ্যেই বাজারে আসবে। অনিমার নাকি সত্যিকারের ফোটোজেনিক চেহারা—অর্থাৎ আসল চেহারা থেকেও ছবিতে ওর মুখ ঢের ঢের ভালো আসে। এখন আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছে ঘরের ব্যাপার নিয়ে। অর্থাৎ সন্তান সম্ভাবনার ঝামেলা নিয়ে। একবার গণ্ডগোলে পড়ে অনেক রকমের ওষুধ-পত্র খেয়ে বেঁচে গেছে। সত্যিকারের বড় শিল্পী হতে হলে ওদের মতে এই ঝামেলা এড়াতেই হবে। গোটা দুই ছেলেপুলে হলেই তো চেহারা-পত্র সব গেল। তাছাড়া সংসার আর শিল্পসাধনা দুটো একসঙ্গে হয় না। এই শিল্পজীবন সার্থক না হলে অনিমার জীবন বৃথা। তাই স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঝামেলা একেবারে শেষই করে দিতে এসেছে।

এখন শ্রীলেখার ধারণা, ধারণা, কেন, বদ্ধ বিশ্বাস ওই লোকের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে-থা কিছুই হয়নি—বাজারে কি সিঁদুর কিনতে পাওয়া যায় না? আসলে ভাঁওতায় ভুলে এই পয়সাঅলা লোকের

সঙ্গে পালিয়েছে, আর এ-ভাবে নিজের সর্বনাশ করতে চলেছে। স্বামী-স্ত্রী হলে হোটেলের সুইটে থাকে কেন দুজনে।

সব শোনার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ আমি। বলাবাহুল্য, শ্রীলেখার প্রতিটি কথা আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, অপারেশন কবে?

আজ শনিবার, কতকগুলো চেকিংটেকিং হয়ে গেল। কাল রবিবার তো হবেই না—পরশু তরশু নাগাত হতে পারে।

কি করব আমি, কি করতে পারি জানি না। ভিতরটা শুধু অশান্ত, ভয়ানক অশান্ত। রাত্রিতে ঘরের লোককে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছি—কোনো কারণে এতটুকু উদ্বেগ দেখিনি।

এই কারণেই ভিতরে আমার আরো যন্ত্রণা।

এখনো প্রায় রবিবারেই আমি নার্সিংহোমে যাই। বিলেতি কায়দামতো পেশেন্টদের ফুল দিই। তাদের সঙ্গে গল্প করি। মোটামুটি নামী লেখিকা আমি। শ্রীলেখার মুখে আমার পরিচয় শুনে তারা খুশি হয়।

এই রবিবার অর্থাৎ পরদিনও গেলাম। কিন্তু ফুল নিয়ে সেদিন শুধু একটিমাত্র কেবিনেই ঢুকলাম আমি। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে হাসি মুখে বসে বসে শুধু অনিমার সঙ্গেই গল্প করলাম। শুধু ছবির জগৎ ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কথা হয়নি, তবু আমারও বদ্ধ বিশ্বাস, শ্রীলেখা যা বলেছে সব সত্যি।

অতক্ষণ ধরে একটা ঘরে একজনের সঙ্গে গল্প করতে দেখে আমার ঘরের মানুষ কি ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছিল? অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ এই কেবিনে এসে ঢুকেছিল কি এমনি? অন্তরঙ্গ আলাপচারী দেখে গলার স্বরে কি একটু উৎকণ্ঠার আভাস ছিল? সঠিক বলতে পারব না, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, ইনি পরিচিত নাকি?

আমি হেসেই জবাব দিতে পেরেছি, পরিচয় যাকে বলে সেটা আজ হল, কিন্তু এঁকে আমি আগে দেখেছি, তাই দেখেই চেনাচেনা লাগছিল। ইনি একজন শিল্পী জানো তো?

আমি মিছে কথা বলি না। মিথ্যাচারকে ঘৃণা করি। কিন্তু অম্লানবদনেই কথাগুলো বলে ফেলতে পারলাম।

প্রশান্ত মাথা নাড়ল। অর্থাৎ জানে। কিন্তু আমি কোথায় দেখলাম বা কি করে জানলাম সেটাই বোধহয় তার বিস্ময়। তবু, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আর এখানকার কর্ণধার হিসেবে বেশি কৌতূহল দেখানো সাজে না তার। গম্ভীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

বললাম, মাস কয়েক আগে আমরা দু-তিনজন সাহিত্যিক একদিন স্টুডিও দেখতে গেছলাম। সেদিন এঁর কি একটা ছবির শুটিং চলছিল। এখানে এঁকে দেখে ঠিক পরিচয় বার করে ফেলেছি।... শিগগিরই দুটো বড় ছবিতে নায়িকার রোলে দেখব ওঁকে...জানো।

সামান্য হেসে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তৎপরতায় চলে গেল।

রাত্রিতে দুই বন্ধুকে এব্যাপারে একেবারে নির্বিকার দেখে আমার অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। বার বার মনে হতে লাগল, ব্যাপারটা কি এমনি জলভাত এদের কাছে যে এ নিয়ে এতটুকু তাপ উত্তাপ পর্যন্ত নেই!...এরকম কাজ তা হলে আরো কত করেছে এরা?

শেষে আমিই বললাম, তোমাদের ওই নতুন পেশেন্ট অনিমা দাসের ব্যাপারখানা কি? আলাপ করে মনে হল যেন কোনোদিন ছেলেপুলে যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করতে এসেছে?

সুধীর বলে উঠল, এই খেয়েছে, তুমি আবার এর মধ্যে গলাতে গেছ!

আমার ভিতরটা থমথমে হয়েই ছিল। বাইরেও তার আঁচ লাগল। দু'চোখ প্রশান্তর মুখের ওপর স্থির। কাল অনিমা দাসের কি অপারেশনে হতে যাচ্ছে?

মুখ দেখেই বোঝা গেল এ আলোচনা মনঃপূত নয় খুব। নির্লিপ্ত সুরে প্রশান্ত জবাব দিল, তুমি যা ভেবেছ তাই, মেয়েটার মাথায় ঢুকেছে ছেলেপুলে হতে থাকলে জীবনে আর বড় আর্টিস্ট হওয়া হবে না—ওর স্বামী বেচারা অতিষ্ঠ হয়ে শেষে অপারেশনে মত দিয়েছে।

কঠিন সুরে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, ওর স্বামী সত্যি কথা বলেছে তুমি জানলে কি করে?

বিরক্ত মুখে জবাব দিল, সত্যি না হলে দুজনে একসঙ্গে এই উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে কেন?

সত্যি হলেও আইনত তোমরা এ কাজ করতে পারো?

মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে পারি।

এটা মেডিক্যাল গ্রাউন্ড?

সুধীর দত্তর ফুর্তি উপচে উঠল। সে বলে উঠল, ব্রেভো! প্রশান্ত চল, সব ছেড়েছুড়ে আমরা কোথাও গিয়ে একটা আশ্রম খুলে বসি!

রাগত মুখে আমি শাসিয়েই উঠলাম, ইয়ারকি নয়, আমি বলে দিলাম এরকম জঘন্য কাজ তোমরা করতে পারবে না!

তার পরেই স্তব্ধ আমি। প্রশান্তর এই গোছের রাগও আর দেখিনি, এ রকম কর্কশ কণ্ঠস্বরও আর শুনিনি! সে বলে উঠল, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? রোগী ভর্তি করেছি, টাকা নিয়েছি—এসব বাজে চিন্তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে কে বলেছে? এ-রকম বেশি বেশি বোঝো যদি আর তোমার নার্সিং হোমে গিয়ে দরকার নেই।

ব্যাপারটা এমন তপ্ত হয়ে উঠছে দেখেই সুধীর দত্ত হাসি মুখে সামাল দিতে চেষ্টা করল। বলল, তোমার সাহিত্যের বাইরের দুনিয়াটা অন্য রকম ম্যাডাম। অপারেশন আমরা না করলেও কলকাতায় একঝুড়ি নার্সিংহোম আছে যারা করে দেবে—মাঝখান থেকে একটা মোটা টাকাই লোকসান আমাদের। ঠিক আছে, এত যখন আপত্তি তোমার, ওই পাপ কাজ অর্থাৎ অপারেশনটা না হয় আমিই করে দেব—আমি নীলকণ্ঠ, পাপ-পুণ্যের ধার ধারি না।

ওর কথায় কান না দিয়ে নির্বাক দু'চোখ মেলে তখনো আমি প্রশান্তকেই দেখছিলাম।

পরদিন শ্রীলেখাই জানালো, অনিমা দাসের অপারেশন হয়ে গেছে। সে আপারেশন সুধীর দত্ত করলেও কেন যেন আমার সমস্ত অভিযোগ ঘরের লোকের বিরুদ্ধেই। কেবলই মনে হয়েছে, কোথায় যেন আমার অনেকখানি খোয়া গেছে।

সেই থেকে ওই নোট বইটা আঁকড়ে ধরেছি আমি। ওটার পাতা ভরাট হয়ে উঠছে। আপোসশূন্য একটা সঙ্কল্প মনের তলায় দানা বেঁধে উঠছে। আমি লিখব। এমন একটা চিত্র আঁকব যা দেখে ওরা দু'জনেই চমকে উঠবে। বিশেষ করে ঘরের একজন আঁতকে উঠবে। আর, সেই থেকে আমি ভিতরে এক রকম বাইরে আর এক রকম। বাইরের চন্দ্রাণী রায় অনেকটা আগের মতোই সহজ সপ্রতিভ। ভিতরের চন্দ্রাণী তীক্ষ্ণ সজাগ সচেতন।

এই ভিতরটা নিয়ে আমি ক্ষত-বিক্ষতও। বাইরে হাসছি। ভিতরে জ্বলছি।

ছয়

পরের তিন মাসে শ্রীলেখা আমার আরো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। এখন আর ওর খবরাখবর অবাঞ্ছিত ভাবি না। আমি লেখিকা। আমার কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্যের সঙ্গে কোনো আপোস আর করতে চাই না।

...চাই না বটে, কিন্তু বুকের তলায় যে লাগে সেটা অস্বীকার করব কি করে? শ্রীলেখা বোধ হয় সেটা বুঝতে পারে। পারে বলেই ও আমার স্নায়ু টেনে রাখতে চেষ্টা করে। ওই অনিমা দাস সম্পর্কেই এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে শুনলে ভিতরটা খচখচ করে ওঠে। বলেছে, মেয়েটা চালাক নয়, অন্তত আমি যে রকম ছিলাম সে রকম নয়। ওর সামনের দিনগুলি তুমি দেখতে পাচ্ছ চন্দ্রাণীদি?...যে লোক ওকে এ পথে টেনে এনেছে সে তাতে ছিবড়ের মতো একদিন ছুঁড়ে ফেলে দেবে। দেবেই। বড় আর্টিস্ট ও কোনোদিন হবে না। তখন ও নীচের দিকে নামতে শুরু করবে। তারপর ঠিক দেখবে একদিন রাস্তায় এসে দাঁড়াবে—সন্ধ্যায় মুখে স্নো-পাউডার মেখে আর তপতপে সাজ-পোশাক পরে যে-কোনো

শিকার ধরার আশায় রাস্তার মোড়ে বা ট্রাম বাসের স্টপে দাঁড়িয়ে থাকবে। এ রকম আমি অনেক সুশ্রী মেয়েকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি—তুমি দেখোনি? দেখতে চাও? ...ঠিক ওই রকম করেই ধাপে ধাপে ওরা নেমে আসে, অনিমা দাসেরও নেমে আসার রাস্তাটা ওই নার্সিংহোম থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

শুনে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। আমি তর্ক করেছি। বলেছি, এ রাস্তা যে-কোনো নার্সিংহোম থেকেই পরিষ্কার হতে পারত, তাছাড়া যে মেয়ে ওখানে এসে দাঁড়াবেই তুমি ভাবছ, তার ছেলেপুলে আসার যন্ত্রণাটা তো আরো পাঁচ গুণ বেশি হত। ওই অবস্থায় মা হয়ে ছেলেপুলেকে হয়ত গলা টিপে মারত অনিমা দাস।

তর্ক করেছি বটে। কিন্তু দেয়ালের দিকে মুখ করে তর্ক করার সামিল। আমার ঘরের লোক যে এক দুশ্চরিত্রের বাসনার ইন্ধন যুগিয়ে নিজের পকেট টাকায় ভরাট করেছে সেটা মিথ্যে হবে কেমন করে? তার বদলে সে যদি ছড়ি উঁচিয়ে গর্জন করে উঠত?

সেদিনও নিজের ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে চাপা আগ্রহ আর উত্তেজনা সত্ত্বেও শ্রীলেখা বিড়ম্বিত মুখে যে খবরটা দিল, শুনে আমারই কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকল কানে।

সত্যিকারের এক রূপসী পেশেন্টের যাতায়াত শুরু হয়েছে নার্সিংহোমে। অ-বাঙালি মেয়ে। নাম ললিতা সরদেশাই। বম্বের মেয়ে। টগবগ করে কথা বলে আর সুন্দর হাসে। বছর চব্বিশ পঁচিশ হবে বয়েস। শ্রীলেখার ভাষায় মেয়েটা যেমন সুন্দর দেখতে তার স্বামীটা আবার তেমনি হোঁতকা কুৎসিত। মোটা-সোটা বেঁটে-খাটো। অমন মেয়ের সঙ্গে এমন লোকের বিয়ে হতে পারে ভাবাই যায় না। লোকটা মস্ত ব্যবসায়ী আর মস্ত বড়লোক বলেই বিয়েটা হয়েছে হয়ত।

মেয়েটা অর্থাৎ ললিতা সরদেশাই হাসপাতালে ভর্তি হয়নি এখনো। প্রথম দিন তার স্বামী সঙ্গে করে দেখিয়ে নিয়ে গেছল। এখন একলাই আসে প্রায়ই। দেখিয়ে যায়। অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার আছে। পরে খুব সম্ভব নার্সিংহোমে ভর্তি হবে। তারও আপাত দৃষ্টিতে রোগ কিছু নেই। কিন্তু বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে ছেলেপুলে হল না। তার স্বামীর স্টেটমেন্টে, স্ত্রীটি নাকি সন্তানের জন্য পাগল। আগেও অন্য ডাক্তার দেখানো হয়েছে। নামডাক শুনে এবারে এই নার্সিংহোমের ডাক্তারদের শরণাপন্ন।

খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে তাকে। ডি. সি. আই. কেস। অর্থাৎ একটা ছোট-খাট অপারেশনের পরে ছেলেপুলে হতে আর বাধা থাকবে না। মিস্টার সরদেশাইকে অবশ্য ছোট-খাট অপারেশন বলা হয়নি। ওই সব লোকের কাছে অপারেশন মানেই মস্ত ব্যাপার কিছু। ভদ্রলোক কিছুতে স্ত্রীকে নার্সিংহোমে রাখতে রাজি নয়, তার ইচ্ছে, যত টাকা খরচা হোক, স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে অপারেশন হোক।

এ পর্যন্ত সমাচার শোনানোর পরেই বিব্রত মুখ শ্রীলেখার। কিন্তু ওর মানসিক অবস্থা আবার এমন যে যত অপ্রিয় হোক শেষ পর্যন্ত না বলে পারবে না।

বলল। ইদানীং এই দুই ডাক্তারের সঙ্গেই খুব ভাব ললিতা সরদেশাইয়ের। গোড়ায় গোড়ায় ভাবটা খুব বেশি ছিল ডক্টর রায়ের সঙ্গেই। যখন তখন এসে তার ঘরে ঢুকত, অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা কয়ে গল্প-সল্প করে ঘর থেকে বেরুতো, যখন-তখন কল্ দিয়ে তাকে বাড়িতে ডেকে পাঠাতো। কিন্তু দিন কয়েক ধরে দেখছে, মেয়েটা ডক্টর দত্তর কাছে বেশি আসছে, আর প্রায়ই তাকে বাড়িতে কল্ দিচ্ছে। শ্রীলেখার ধারণা, এই জন্যে ডক্টর রায় ডক্টর দত্তর ওপর ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট একটু।

শোনা মাত্র রাগে দু'কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল আমার। অপলক চোখে শ্রীলেখার দিকে চেয়ে রইলাম খানিক।

ঠিক তক্ষুনি কেন যেন বন্ধুর উদ্দেশ্যে প্রশান্তর একটা ঠাট্টা আমার মনে পড়ল। বলেছিল, আমাদের সেক্রেটারি শ্রীলেখা চ্যাটার্জী তোকে বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে দেখি, বিয়ের অফারটা তাকেই না হয় দিয়ে ফেল।

শোনামাত্র সম্ভব অসম্ভব চিন্তা করার আগেই ভিতরটা বিমুখ হয়ে উঠেছিল আমার। শ্রীলেখার

ভক্তি-শ্রদ্ধা করার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাইনি, তার জীবনের অতীত অধ্যায় জানা ছিল বলেই ওই ঠাট্টার প্রসঙ্গও আমি বরদাস্ত করিনি। চেয়ে আছি ওর দিকে। মগজে চিন্তার দ্রুত ছাপ পড়ছে একটা। মনে হল, ওর বিকৃত মন আর চোখ দিয়ে ডক্টর রায়ের সঙ্গে ও ললিতা সরদেশাইয়ের বেশি ভাব দেখেছে যতদিন, ততদিন ও চুপ করে থেকে মজা দেখেছে আর ছুরি শানিয়েছে। সময় হলে নির্দ্বিধায় সেই অস্ত্র সে আমার হাতে তুলে দেবার প্রতীক্ষায় থেকেছে।...কিন্তু এখন ওই ললিতা মেয়েটার সঙ্গে সুধীরের বেশি ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করেই ও আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারেনি। দুজনকেই জড়িয়ে ওর মনের বিষ উগড়ে দেবার জন্য আমাকে ডেকেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তা আসল সমস্যাটা কি, ওই মেয়েটা ডক্টর দত্তর কাছে বেশি আসছে আর তাঁকে বাড়িতে কল্ দিচ্ছে সেটা না, ডক্টর রায় ডক্টর দত্তর ওপর ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট—সেটা?।

আমার মুখের দিকে চেয়ে হোক বা ঠাণ্ডা হাবভাব দেখে হোক, শ্রীলেখা থতমত খেল একটু। তারপর নিজের উদ্দীপনার জোরেই যেন আমার অবিশ্বাসের ভাবটা দূর করে দিতে চাইল।—ডক্টর দত্তকে তো আপনি চেনেন, পদ্ম-পাতায় জল, তার জন্যে কে ভাবছে...কিন্তু একটা মেয়েকে নিয়ে দুজনের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হলে তো নার্সিং হোমের হয়েই গেল—এই বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপারটা কারো কারো চোখে পড়ছে পর্যন্ত!

বন্ধুর ব্যাপারে প্রশান্তর বুকভরা উদারতা আমার যে আজকের দেখা নয় শ্রীলেখা সেটা জানবে কি করে। তপ্ত কঠিন সুরেই বললাম, স্পর্ধারও একটা সীমা আছে শ্রীলেখা। এরপর কোনো খবর দেবার জন্য আর তুমি আমাকে এভাবে ডেকো না। আর, ভালো চাও তো নিজের চিকিৎসা করাও।

বাড়ি ফেরার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত অস্থিরতা কাটেনি। কান দুটো একেবারে যেন জ্বালিয়ে দিয়েছে শ্রীলেখা। এতটা বাড়াবাড়ি করবার ফলেই মনে হল, ও যেন আমাকেও বিকৃত কবে তুলেছিল। উঠে আসার সময় ওর সেই স্তব্ধ মুখ লক্ষ্য করেছি। সব থেকে আপনার জন যাকে ভাবত, তার কাছে থেকে এ-রকম আঘাত যেন সহ্যের অতীত।

কিন্তু আশ্চর্য, ক'টা দিন না যেতে ঘরের লোককে কেমন যেন একটু অশান্ত, অসহিষ্ণু মনে হয়েছে আমার। আর সুধীরের আসার মধ্যেও মাঝে মাঝে ছেদ পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলে প্রশান্ত জবাব এড়িয়ে যায় মনে হয়, অন্যমনস্কের মতো ভাবেও বোধহয় কিছু।

আমার ভিতরটা সত্যিই বিষিয়ে দেয়নি তো শ্রীলেখা, বিকৃত করে দেয়নি তো? মনের ওপর আঁচড় পড়ছে কেন? আগেও তো একেবারে দিন-মাস ধরে নিয়মিত আসত না সুধীর। এক আধ-দিন ছেদ পড়ে যেতই। আসে যখন, তখন তো এতটুকু ব্যতিক্রম দেখি না ওর মধ্যে। তেমনি হাসিখুশি, তেমনি বে-পরোয়া আচরণ। মাথায় সে-রকম কিছু চাপলে এখনো আমার বেণী ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে—খেতে বসে কতরকম কাণ্ড করে। কিন্তু আমার ভিতরে আঁচড় পড়ছে প্রশান্তকে লক্ষ্য করে। সে যেন বন্ধুর এ-সব দুরন্তপনা ঠিক আগের মতো উপভোগ করে উঠতে পারে না। কোথায় যেন একটা কৃত্রিমতা দানা বেঁধে উঠেছে।

যে চিন্তা ভেতর থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করতে চাই সেটা ক্রমে পেয়ে বসতে থাকল আমাকে। রূপসী রমণীর কারণে বন্ধু বিচ্ছেদ তো সামান্য ব্যাপার, দুনিয়ার তার থেকে অনেক বড় আগুন জ্বলেছে, অনেক বড় বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। সে-রকম কিছু নয়তো? শ্রীলেখার ওপর আমি অবিচার করিনি তো?

তক্ষুনি সে-চিন্তা সমূলে বাতিল করতে চেয়েছি। বাতিল করেছি। শ্রীলেখার বিকৃতি আমাকেও পেয়ে বসেছে ভেবেছি।

পর পর দু'দিন সুধীর নি-পাত্তা হঠাৎ। আর ঘরের লোক আরো গম্ভীর। স্থির থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, সুধীরের ব্যাপার কি বলো তো..কি-রকম যেন বদলেছে একটু?

ও সাগ্রহে তাকালো আমার দিকে।—তুমিও লক্ষ্য করেছ?

একটা অগোচরের অনুভূতি বুকের ওপর যেন শব্দ হয়ে বাজতে থাকল। মাথা নাড়ালাম। লক্ষ্য করেছি।

একটু ভেবে ও বলল, ওর জন্যে আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়েছি...মাথার তো ঠিক নেই, কি থেকে কি হয়ে বসে। সেবার তুমি ওর বিয়ের কথা বলেছিলে...ওর বিয়ে করা উচিত।

হালকা বোধ করতে চেষ্টা করলাম। আমারই বিকৃতি ছাড়া আর কি। বন্ধু যে ওর কতখানি হৃদয়-জোড়া সে কি আমার জানতে বাকি? এ বন্ধুত্ব আজকের নয়, দু' যুগেরও ওপরের। যদি কিছু হয়েও থাকে, সেটা বন্ধুর জন্য বন্ধুর দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কি হতে পারে?

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে বলো তো, কোনো মেয়েটেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে নাকি?

মাথা নাড়ল। তাই। পরে বলল, একটি বিবাহিতা মেয়ে—স্বামী মস্ত ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোক, বিপদে না পড়ে—

শোনামাত্র ভিতর থেকে একটা অবিশ্বাস ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইল। এ যেন হতে পারে না।

তার মুখেই শুনলাম সব। হ্যাঁ, ললিতা সরদেশাইকে কেন্দ্র করেই একটা নতুন পরিস্থিতির সূচনা। মেয়েটা শুধু রূপসী নয়, বুদ্ধিমতীও। সে সন্তান চায়। তার চিকিৎসার ব্যাপারে দুই বন্ধুর মধ্যে একটু মতবিরোধ হয়েছে। প্রশান্তর ধারণা, অপারেশন হলেই ছেলেপুলে হবে। সুধীরের মত, তা নয়, গলদ যা-কিছু ললিতা সরদেশাইয়ের স্বামীর। সে জন্যেই ছেলেপুলে হচ্ছে না। ললিতার যেটুকু দোষ, সে-রকম অনেক মেয়েরই থাকে, আর তাতেও ছেলেপুলে হয়।

দুই বন্ধুর মত-বিরোধটা বড় কথা নয়। দুজনের যে কারুরই ভুল হতে পারে। কিন্তু আসল মুশকিল হল, সুধীর তার নিজের মতটা ললিতাকে জানিয়ে বসেছে, আর ললিতা সেটাই ধ্রুব সত্য ধরে নিয়েছে। এমনিতেই মেয়েটা তার নিজের স্বামীকে খুব একটা পছন্দ করে না। অবশ্য করার মতো লোকও নয়। ইদানীং সুধীরের সঙ্গে মেয়েটার যে-রকম মাখামাখি শুরু হয়েছে, প্রশান্ত সেই কারণেই চিন্তিত। বলল, ওর মেলামেশার ধরন তো জানো, ও-রকম বে-পরোয়া লোকের দিকেই অনেক মেয়ে ঝোঁকে।...যাক, এ নিয়ে তুমি সুধীরকে কিছু বোলো না যেন।

বন্ধুর প্রতি যে-টান দেখেছি, দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষটা সুধীর দত্ত বলেই কি এই শোনার পরেও উতলা বোধ করছি না আমি? এটা কি আমার স্বার্থপরতা, না কি জোরালো বে-পরোয়া লোকটার প্রতি কোনোরকম অন্ধ বিশ্বাস?

দুশ্চিন্তার ভাগ আমাকে দিতে পেরে প্রশান্ত কিছুটা হালকা হতে পেরেছে মনে হল।

এরপর সুধীরকে খানিকটা সময় একলা পাবার সুযোগ খুঁজছিলাম আমি। দিন তিনেক বাদে সুযোগ মিলল। সন্ধ্যার দিকে সুধীর নার্সিং হোম থেকে টেলিফোনে জানালো, প্রশান্তর ফিরতে রাত হবে, একটা জরুরী, কেস্ দেখতে তাকে হঠাৎ ব্যারাকপুর ছুটতে হয়েছে। খবরটা আমাকে জানাতে বলে সে বেরিয়ে গেছে।

এটা নতুন কিছু নয়। মাসের মধ্যে দু'চারবার এরকম হয়ই। শুনে নিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা তোমার কাজটা কি—চলে এসো না।

ওদিকে থেকে ও হেসে ঠাট্টা করল, বন্ধু কাছাকাছি নেই এই ফাঁকে বন্ধু-পত্নীর কাছে যাব বলছ?

হ্যাঁ, এই ফাঁকে মুখ দেখতে না পেলে আর কোনোদিন মুখ দেখব না বলে দিলাম। পাল্টা ঠাট্টা করে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

আধ-ঘণ্টা বাদে সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শোনা গেল। হালকা শিস দিতে দিতে ওপরে আসছে। আমিও এগিয়ে এসে প্রস্তুত হয়ে অর্থাৎ ভ্রূকুটি করে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই ও বলে উঠল, প্রতীক্ষার এ আবার কি নতুন রূপ!

আমি চুপচাপ চেয়েই রইলাম। ও দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, উপরে উঠব না পালাব?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পালাবার ছুতো খুঁজছ তাহলে?

বাকি সিঁড়ি ক'টা টপকে উঠে এলো।—কি রকম?

ডেকে কোনো আনন্দে ব্যাঘাত ঘটালাম?

ও একই সুরে আবার জিজ্ঞাসা করল, কি-রকম?

ঘরে এসো। বসার ঘরে চলে এলাম। একটা সেটিতে বসলাম। ও সামনের সোফায়।—চা না কফি?

কিছু না। আসার ঠিক আগে শ্রীলেখা আদর করে এক পেয়ালা কফি খাইয়ে দিলে।

মেয়েদের আদর-টাদর আজকাল বেশ ভালো লাগছে তাহলে?

বরাবরই তো লাগে!

মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে আমি ঝপ করে বলে বসলাম, এক মেয়ের প্রেমে পড়ে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছ শুনলাম?

জবাবে বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইল খানিক। তারপর ছদ্মত্রাসে জিজ্ঞাসা করল, ধরা পড়ে গেছি?

আমি মাথা নাড়লাম।—একটি বিবাহিতা মেয়ে....ঠিক বলছি?

এবারে ও মাথা নাড়ল, অর্থাৎ ঠিক। তারপর তেমনি উতলা মুখ করেই হড়বড় করে বলে গেল, তার বয়েস সাতাশ, দেখতে শুনতে মন্দ নয়, নাম চন্দ্রাণী রায়—ক'বছর ধরেই তো ওই এক মেয়ের প্রেমে মজে আছি...হঠাৎ ধরা পড়লাম কি করে?

অপরাধ-প্রবণ মুখ যদি এই হয় তো আমার লেখিকা হওয়া মিথ্যে। বললাম, দেব দুই থাপ্পড়, ললিতা সরদেশাইয়ের খবর আমরা রাখি না, কেমন?

চেয়ে আছে। চেয়েই আছে। কৌতুকে দু'চোখ চকচক করছে মনে হল। ছদ্মকোপে আমিও চেয়ে আছি।

খবর যারা রাখে তাদের একজন তো তুমি বুঝলাম, আমরা বলতে আর কে?

আমি থমকালাম একটু, তারপর ঝাঁঝিয়ে বললাম, সে খোঁজে দরকার কি, সত্যি কিনা বলো।

হাসতে লাগল। সত্যি। বুঝলাম, গাধাটা তোমার কাছে লাগিয়েছে তাহলে।

এই! গাধা শুনে ধমকে উঠতে গিয়েও হেসে ফেললাম।—খবরদার, ওকে কিছু বোলো না যেন, বারবার তোমাকে ঘাঁটাতে নিষেধ করেছে।

হাসতে লাগল।—তা তো করবেই, নইলে একটু মুশকিল যে!

তার মানে?

না, কিছু না। সব ঠিক শুনেছ।

দেখো, ভালো হবে না, কি বলছিলে?

সিগারেট ধরাবার ফাঁকে হাসছে মিটিমিটি।—সাধে মেয়েছেলে বলে, কোনো কিছুর গন্ধ পেলেই হল!

বে-ফাঁস কিছু বলতে গিয়েও এখন সামলে নেবার চেষ্টা করছে তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই।—তুমি বলবে কি না?

ভিতরে ভিতরে কি-যেন অস্বস্তি আমার। এই লোকের মুখেও বিড়ম্বনার আভাস দেখছি?

হাসছে। সিগারেট টানছে। তবু সেই রকমই মনে হচ্ছে কেন আমার? একটু বাদে বলল, দেখো, ওর সঙ্গে আমার দম্পর্কটা কতখানি, ঠিক-ঠিক বুঝতে পারো?

অনেক কালের একটা সুপ্ত আবেগ ঠেলে উঠতে চাইল যেন। আমার থেকে বেশি বুঝতে কে পারে? সম্পর্কটা ততোখানি গভীর না হলে আমার পরিচয় মিসেস রায় না হয়ে মিসেস দত্তর হতে পারত যে, নিজের কাছে সেটা স্বীকার করলে খুব অপরাধ হবে কি?

জবাব দিলাম, বোধহয় পারি, বলে যাও।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যে বচন তুমি শুনতে চাইছ সেটা ওর কাছে গোপন থাকবে?

অস্বস্তি বাড়ছেই চোখ পাকালাম, কি, নিজের স্বামীর কাছে কথা লুকোতে বলছ?

তা হলে থাক।

আপোসের চেষ্টা করলাম, আচ্ছা, আগে শুনি কি কথা, পরে বিবেচনা করব।

তোমার ঘাবড়াবার মতো কোনো কথা নয়, তবু বিবেচনাটা আগে না করলে আমার মুখ সেলাই।

নিজের তাগিদেই হার মানলাম।—আচ্ছা, করলাম বিবেচনা, কাউকে বলব না, বলো কি বলবে।

হাসছে তার পরেও। এই হাসিটাই কেমন অদ্ভুত লাগছে আমার। মজার কিছুই মাথায় ঘুরছে যেন!

শুনে প্রথমেই যেন চমকে ওঠো না, আমার ধারণা ললিতা সরদেশাই এমন মেয়ে যে ইচ্ছে করলে কর্তাটিকে আমি তেমন সবল পুরুষ ভাবি না, আমার মতো এটা হতভাগার জন্যেই ওর কত দরদ দেখ না, সেই ছেলেবেলা থেকে। পাছে ও ওই মেয়ের খপ্পরে পড়ে তাই বলতে গেলে তোমার মুখ চেয়ে খানিকটা ঘটা করেই ওই মেয়ের চোখ আমি ওর দিকে থেকে নিজের দিকে ফিরিয়েছি।

শুনছি। আসলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুধীরকে লক্ষ্য করছি আমি। কিছু গোপন করছে কিনা বোঝার তাড়না। জিজ্ঞাসা করলাম, খপ্পরে পড়ার লক্ষণ দেখেছিলে তাহলে?

এই গেল যা, সীরিয়াস হয়ে উঠলে যে! না, লক্ষণ একটুও দেখিনি। ও বলেছিল অপারেশন দরকার, আমি বলেছিলাম দরকার নেই। এ ভুলটা অবশ্য ওর করার কথা নয়...হয়তো পরে শুধরে নিত। আমি যা বলেছি ললিতা সরদেশাই বরাবরই তাই বিশ্বাস করত। সেই বিশ্বাসের ঝোঁকে সে তোমার ভালো মানুষ স্বামীটির কাঁধে চাপবে সে-রকম কোনো সুযোগই আমি সেই মেয়েকে দিতে চাইনি। তোমার স্বামী রত্নটি নির্দোষ এবং নিষ্কলঙ্ক।

তা তোমারই বা মতলব কি, মেয়েটাকে সাহায্য করবে?

আ-হা, সে-ভাগ্য কি হবে, বড় খাসা মেয়ে। সাহায্যের আশা দিয়ে সে-মেয়েকে কাল বম্বেতে রওনা করে দিয়েছি। সেখানেও ওর স্বামীর ব্যবসা আছে—ও জানে ফাঁক খুঁজে আমিও শিগগিরই বম্বে যাচ্ছি, তারপর প্রেম জমতে আর বাধা কোথায়?

যাচ্ছ?

মুখখানা বিমর্ষ করে জবাব দিল, ওই যে অসুবিধের কথা বললাম তোমাকে, ভিতরে ভিতরে আমি এক মেয়েরই প্রেমে মজে আছি তার নাম চন্দ্রাণী রায়। বিশ্বাসঘাতকতা করি কি করে...

মুখে ও যে কথাই বলুক, ওকে আমি চিনি—এতটা ওর প্রাণের বন্ধুও চেনে কিনা আমার সন্দেহ আছে। ললিতা সরদেশাই যে-রকম মেয়েই হোক, এই একজনের মাথা ইচ্ছে করলেই সে ঘোরাতে পারবে না সেটা আমি অন্তত বিশ্বাস করি।

কিন্তু একটা চিন-চিন জ্বালা অনুভব করছি অন্য কারণে। আমার স্বামী এই লোকের থেকে অনেক দুর্বল সে-কারণেও নয়। বন্ধুর সম্পর্কে যত হলপ করেই বলুক শ্রীলেখার ইঙ্গিত আমি ভুলতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে ওর ওপর আমি অবিচার করেছি। তাছাড়া ক'টা দিন আমি স্বচক্ষে যে ব্যতিক্রম দেখেছি সেটা ভুলব কি করে? ক'টা দিন চঞ্চল দেখেছি প্রশান্তকে, অন্যমনস্ক দেখেছি। কেন? কেন? বন্ধুর জন্য দুশ্চিন্তায়...? দুশ্চিন্তা হতে পারে, কিন্তু ক্ষোভ কি একটুকুও ছিল না? শুধুই দুশ্চিন্তা হলে বন্ধুত্বের দাবীতে এ-কথা সে চেঁচিয়ে বলত, আর আমাকেও এ-প্রসঙ্গ তুলতে নিষেধ করত না!

হাসতেই চেষ্টা করছি, কিন্তু কি একটা কঠিন তাপ গা বেয়ে মুখের দিকে উঠে আসছে।

খানিক বাদে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলে সুধীর। তোমার মতিগতি কি রকম যেন লাগছে আজকাল! লেখা-টেখা ছেড়েই দিলে নাকি?

বললাম, না, লিখতে যাচ্ছি শিগগিরই কিছু, কিন্তু সে-লেখা তোমাদের পছন্দ হবে না।

দু'চোখ কপালে তুলে ফেলল।—সে কি! নার্সিং হোম নিয়ে?

জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম।

কি কাণ্ড! কোনো রকম গণ্ডগোলের ব্যাপার কিছু শুনেছ-টুনেছ নাকি?

বলে ফেললাম, না শোনার কি, খুব সাদা রাস্তায় চলছ তোমরা?

ও ভাবল, সেই অনিমা দাসের ঘটনায় এখনো আমি তেতে আছি। হা-হা শব্দে হেসে উঠল। বলল, এ-দেশের লেখক লেখিকারা সবাই তোমার মতো সেন্টিমেন্টাল নাকি? বাস্তবে কত কি অনায়াসে ঘটে যাচ্ছে সব জানলে তো পাগল হয়ে যাবে দেখি!

এবারেও জবাব দিলাম না। মনে হল এতক্ষণের চিন-চিন জ্বালাটা যেন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে।

সাত

অদূর ভবিষ্যতে কিছু একটা ঘটতে পারে এজন্যে মনে মনে হয়ত কিছুটা প্রস্তুত ছিলাম আমি। এমনও মনে হত, ঘটেই যদি কিছু, আমিই হয়ত বা তার উপলক্ষ্য হব। কিন্তু সেটা যত মর্মান্তিকই হোক, কোনোরকম ধ্বংসের চিন্তার ঠাঁই আমার মনের ত্রি-সীমানাতেও ছিল না।

কিন্তু দুটো মাস না যেতে তাসের ঘরের মতই আমার সবকিছু এমন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে এ কে কল্পনা করেছিল? না, যা ঘটে গেল কেউ তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার প্রথম পর্বে আমি শুধু নির্বাক বোবা দ্রষ্টা। পরের অধ্যায়ে অবশ্য ধ্বংসের আগুনই আমার মাথায় জ্বলে উঠেছিল।

প্রথম ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত কিছুই ঠাওর করে উঠতে পারিনি। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল, রাত তখন আটটাও নয়। স্বাভাবিকভাবেই—লোকটা উঠে টেলিফোন ধরল। সাড়া দিল। আচমকা কালীবর্ণ মুখ তারপর। মনে হল, মানুষটা কাঁপছে থরথর করে। গলা দিয়ে অস্ফুটস্বর নির্গত হল, কি ভয়ানক কথা!

টেলিফোন ছেড়েই তাড়াতাড়ি আবার নম্বর ডায়েল করতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

জবাব দিল না। বিবর্ণ মুখ। উদগ্রীব প্রতীক্ষা। তারপরেই বিরক্ত হয়ে শব্দ করে রিসিভারটা নামাল। সঙ্গে সঙ্গে আবার তুলে নিল। নতুন নম্বর ডায়েল করতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হয়েছে কি?

কানে ঢুকলই না।

হ্যালো? হ্যাঁ, আমি...ডক্টর দত্ত কোথায়?...না, বাড়িতে ফোন করেছি, সেখানে নেই।...কোথায় কেউ জানে না?

রিসিভার রেখে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এমন অস্থির বিপন্ন মূর্তি আর বুঝি দেখিনি। এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালাম—এতবার করে জিজ্ঞেস করছি কি হয়েছে, জবাব দিচ্ছ না কেন?

থমকে দাঁড়াল। মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপরেই আক্রোশে ফেটে পড়ল যেন, কি শুনতে চাও? সর্বনাশ হয়েছে, কেউ সর্বনাশ করেছে, আমি যাব, নার্সিং হোম যাবে, আমার জেল হবে, বুঝলে?

একটা আচমকা আঘাতে আমি বিমূঢ়। ঠিক শুনছি কিনা জানি না , ঠিক দেখছি কিনা জানি না। সর্বাঙ্গ সিরসির করছে।

হঠাৎ কাছে এগিয়ে এলো লোকটা খুব কাছে। দুটো হাত আমার দুই কাঁধের ওপর উঠে এলো। হাত দুটো কাঁপছে টের পাচ্ছি, তবু থাবার মতো আঁকড়ে ধরতে চাইল। চাউনিটা যেন আমার মুখ ভেদ করে ভিতরে গিয়ে ঢুকতে চাইছে।—সুধীর তোমাকে এর মধ্যে কিছু বলেছে? তার হাব-ভাব থেকে কখনো কিছু আঁচ করতে পেরেছো?

নির্বোধ বিস্ময়ে আমি শুধু চেয়েই আছি তার দিকে।

চুপ করে আছ কেন?...ও, তোমার তো আবার আমার থেকেও ওর ওপর বেশি টান—সেদিন আমাকে সাবধান করছিল আমাদের শিক্ষা দেবার মতো করে কিছু লেখার জন্য তুমি মাল-মশলা সংগ্রহ করছো বোধহয়।...সে মাল-মশলা তোমাকে কে যোগান দিচ্ছে, সুধীরই বোধ হয়?

আমারও গা-পা কাঁপছে, মাথাটা হঠাৎ ঝিমঝিম করে উঠল। ত্রাসে লোকটা পাগল হয়ে গেল কিনা বুঝতে পারছি না। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছি, চেয়ে আছি।

বুঝতে পারছি, এখন একটু একটু সবই বুঝতে পারছি—বুঝলে? অব্যক্ত ক্ষোভে গলার স্বর প্রায় কুৎসিত ঠেকছে। চাউনিও। ললিতা সরদেশাইয়ের মতো মেয়েকেও হাতের মুঠোয় পেয়ে দূর করে দিল কার টানে বুঝতে পারছি। আমি চলে গেলে আর আমার জেল হলে কার লাভ তাও বুঝতে পারছি!

চাপা আর্তনাদের মতো শোনালো শেষের কথা ক'টা। আমার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, নীচে নেমে যাচ্ছে। একটু বাদে মোটর স্টার্টের শব্দও কানে এলো।

আমি নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে তেমনি।

কতক্ষণ কেটেছে জানি না। হয়ত মিনিট দু'চার মাত্র। সম্বিৎ ফিরতে প্রথমেই টেলিফোনের দিকে ছুটে গেলাম। রিসিভার তুলে নম্বর ডায়েল করলাম। রিং হচ্ছে, কারো সাড়া নেই। প্রতিটা মুহূর্ত বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা মেরে চলেছে।

সুধীর ফ্ল্যাটে নেই তাহলে। এবারে নার্সিংহোমে ফোন করলাম। মেট্রন সাড়া দিল। সুধীরের খোঁজ করতে জানালো, সন্ধের পর ডক্টর রায় আর ডক্টর দত্ত একসঙ্গে নার্সিংহোম থেকে বেরিয়েছিলেন। তার আধ-ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার পরে সেক্রেটারি হয়তো ডক্টর দত্তকে ফোন করেছিল, কারণ তার খানিক বাদে ডক্টর দত্ত আবার এসে মিস শ্রীলেখা চ্যাটার্জীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

আমি নির্বাক একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মনে হচ্ছে বড় রকমের কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, কি হয়েছে আপনি জানেন?

ওদিক থেকে ঠাণ্ডা গলায় পাল্টা প্রশ্ন, আমি টেলিফোনে ডক্টর রায়কে জানিয়েছি, তিনি কিছু বলেননি?

থমকালাম একটু। তারপর জবাব দিলাম, না, তিনি তক্ষুনি ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেছেন। কি হয়েছে?

একটু বাদে মেট্রনের দ্বিধান্বিত উত্তর এলো। খুব খারাপ খবর। আজ বেলা তিনটেয় একটা অপারেশন ছিল...পেশেন্ট অপারেশন টেবিলেই মারা যায়। বেলা চারটে নাগাদ ডেড-বডি ডিসচার্জ করা হয়। সন্ধ্যার পর বার্নিংঘাটে নিয়ে যাওয়া হতে সেখানকার কর্তৃপক্ষ ডেড-বডি আটকে দিয়েছে। তারা সন্দেহজনক রিপোর্ট পেয়েছে। সেই ডেড-বডি এখন পুলিশের মারফত পোস্টমর্টেমে চলে গেছে।

পা দুটো থরথর করে কাঁপছে আমারও। মাথাটা ঘুরছে কেমন। তবু সংযতস্বরেই জিজ্ঞেস করলাম, কি অপারেশন হয়েছিল, লেবার কেস?

মাপ করবেন, আমি এ সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারব না।

ফোন রেখে দিল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠতে হুঁশ ফিরল যেন। ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম। সাড়া দিতেই কানে যেন গলানো শিসে ঢুকল একপ্রস্থ।

ও-দিক থেকে শ্রীলেখা চ্যাটার্জীর গলা। কথার মধ্যে হাসি ঝরছে বোঝা যাচ্ছে। চন্দ্রাণীদি? আমি শ্রীলেখা। টেলিফোন করতে বারণ করেছিলেন, আর আমাকে ছেঁটে দিয়েছিলেন...তবু এই দুঃসময়ে না ডেকে পারলাম না।...বড় দুঃখের কথা, শুনেছেন তো সব?

এদিক থেকে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ করছি আমি। কিছুই শুনিনি, তুমি বলো।...

...শোনেননি? কি আশ্চর্য! সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে যে! বিকেলে একটা অপারেশন হয়ে গেছে নার্সিং হোমে। ছ'মাস চলছিল মেয়েটার, ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে, দেখতেও ভালো, পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বয়েস ..বিয়ে হয়নি, অনেক বড় বড় রুই-কাতলার সঙ্গে দহরম-মহরম ছিল তার, ডক্টর রায় প্রথমে অপারেশন করতে চাননি...কিন্তু থোক ষোল হাজার টাকার টোপ না গিলেই বা পারে ক'জন? তাছাড়া অভ্যাস তো আছেই, টাকার অঙ্ক বাড়লে গররাজির মোচড় উল্টোয়। কিন্তু আফসোসের কথা মুশকিল-আসান হল না, মেয়েটা অজ্ঞান অবস্থায় টেবিলেই মরে বসল...আরো কি গণ্ডগোল ছিল কে জানে, তাছাড়া অ্যাডভান্সড্ স্টেজের এতবড় ধকল...কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য, ঠিকঠাক মতো ডেথ্ সার্টিফিকেট দেখেও বার্নিংঘাটের ডাক্তার ডেড-বডি আটকে দিল...আর অত কাটা-ছোঁড়াসুদ্ধ ধরা পড়ে গেল। এখন কি যে হবে...

হ্যাঁ, এই রকমই কিছু অনুমান করেছিলাম বটে। দুর্যোগ সম্পর্কে সব সংশয় ঘুচে যেতে আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা সংযত আমি।

বার্নিংঘাটে খবরটা তুমিই জানিয়েছিলে তাহলে?

ওদিক থেকে হাসির শব্দ একটু।—খুব অন্যায় করেছি বলছেন? এ-ঘটনাও আপনার ওই নোট বইয়ে জমা থাকলেই খুব শিক্ষা হত বুঝি?

না এই ভালো হয়েছে। তুমি খুব ভালো কাজ করেছ। ডক্টর দত্ত কোথায়?

সুধীর? আমার কাছেই তো ছিল এতক্ষণ। ও, হি ইজ্ ওয়াণ্ডার ফুল। সেও স্বীকার করেছে আমি অন্যায় কিছু করিনি, সে চলে যেতে মনে হল আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি। হ্যালো—

আর সাড়া না দিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম।

বসে আছি। প্রতীক্ষা করছি। প্রশান্ত, না প্রশান্ত নয়, সুধীর আসবে। এসে কি বলবে জানি না। কিন্তু শ্রীলেখার ওখান থেকে ও এখানেই আসবে জানি। শ্রীলেখা আজ ডক্টর দত্ত বলল না, সুধীর বলল।

এলো।

আমি শোবার ঘরের খাটে বসেছিলাম, সুধীর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখল একটু। আমিও দেখলাম ওকে। এতবড় একটা ঝড় বয়ে গেছে মুখ দেখলে এখনো বোঝা যায় না। ঠোঁটের ডগায় যেন হাসি আটকে আছে।

কিছু না বলে ফিরে গেল। আমি ভাবলাম বসার ঘরে গিয়ে বসল। একটু বাদে উঠে এসে দেখলাম বসার ঘরে নেই। আমার লেখার ঘরে পায়চারি করছে, টেবিলের আর বইয়ের তাকের এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করছে।

পিছন ফিরে আমাকে দেখে হাসল একটু। বলল, এমন দিনেও আমাকে সাহিত্য চর্চায় পেয়ে বসেছে, তাই এ-ঘরে ঢুকে পড়লাম। বেশ ভালো করে এক কাপ চা খাওয়াও দেখি।

আমি দেখছি ওকে। ওই মুখ খুঁড়ে খুঁড়ে দেখতে চাইছি। বললাম, সন্ধ্যা থেকে পাগলের মতো খুঁজছিল তোমাকে—সব জেনেও সরে ছিলে কেন?

আর বলো কেন, যাকে বলে প্রেমে পোড়া কপাল আমার। এখন আবার শ্রীলেখা দেবী কাঁধে ভর করার জন্যে ক্ষেপে উঠেছেন—তাকে একটু সামলে-সুমলে এলাম। নাও, চা আনো—

চা শ্রীলেখা দেবী খাওয়ায়নি?

খাইয়েছে, তবু সে কি আর তোমার হাতের মতো মিষ্টি?

আমি অপলক চোখে দেখছি ওকে। মাথার মধ্যে তেমন কিছু হতে না থাকলে আমার খেয়াল করার কথা, বইয়ের তাকগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখছে ও। এই ঘরেও সাময়িক বিশ্রামের মতো ছোটখাটো একটা শয্যা বিছানো। তার সামনেই ড্রেসিং টেবিল।

সেই বিছানায় গিয়ে বসল। বালিশটা টেনে নিয়ে কনুয়ের তলায় চেপে এদিক-ওদিক তাকালো। আমার মাথায় আগুন জ্বলতে না থাকলে তখনো এই হাব-ভাব দেখে খটকা লাগতে পারত।

বললাম, এত বড় ব্যাপারের পরেও তোমাকে এমন নিশ্চিন্ত দেখছি কেন? অপারেশনটা তুমি নিজের হাতে করোনি বলে? তুমি একেবারে পার পাবে ভেবেছ? শ্রীলেখা চ্যাটার্জী সাক্ষী দিয়ে রক্ষা করবে তোমাকে?

জবাব দিল না। শুধু চেয়ে রইল খানিক। তারপর হঠাৎ উঠে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। আয়নার পাশের খুপরি ড্রয়ারটা খুলল। ওতে নীচের বড় ড্রয়ারের চাবি। চাবিটা হাতে নিল। একটা চাবি বেছে বড় ড্রয়ারে লাগাতে আমার সব স্নায়ু একসঙ্গে যেন ঝনঝন করে উঠে জানিয়ে দিল, ও কেন এ-ঘরে ঢুকেছে, চায়ের অছিলায় কেন আমাকে এ-ঘর থেকে সরাতে চেয়েছে—ও কি খুঁজছে।

আমার সেই নোট বইটা ওর চাই। শ্রীলেখার কাছে শুনেছে ওতে এমন সব তথ্য আছে যা ওই নার্সিংহোমের পক্ষে বিপদজনক। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই শুধু ও এটা খুঁজছে—ওর সম্পর্কেও অভিযোগ আছে কিনা দেখে নেবার জন্য।

ড্রয়ারটা টেনে খোলার আগেই ছুটে এসে সজোরে ধাক্কা মেরে সরালাম ওকে। নোট বইটা আমি হাতে পাবার আগেই ধস্তাধস্তি শুরু হল। ড্রয়ারটা খুলতে না পেরে এক প্রবল হ্যাঁচকা টানে আমাকে কাছে টেনে এনেই গালের ওপর আচমকা প্রচণ্ড চড় একটা। সঙ্গে সঙ্গে চোখে অন্ধকার দেখলাম আমি। সেই অবস্থায় আমাকে টেনে এনে ধুপ করে বিছানার ওপর ফেলল। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে নোট বইটা হাতে নিয়ে একবার ভিতরটা দেখে নিল। তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

আমি নির্বাক দ্রষ্টা। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত যেন। একটু বাদে ড্রয়ারখোলা ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। যন্ত্রের মতো ড্রয়ারটা ঠেলে বন্ধ করলাম। আয়নায় নিজের দিকে চোখ পড়ল। গালের ওপর পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছে।

টেলিফোন।

নার্সিংহোমের মেট্রন। উতলা স্বরে জানালো, একটু আগে পুলিসের লোক এসে ডক্টর রায়কে থানায় নিয়ে গেল। ডক্টর রায় যেন তাদের অপেক্ষাতেই নার্সিংহোমে বসেছিলেন।

পরদিনের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় রোমহর্ষক মর্মান্তিক ঘটনার খবর ছাপা হল ছোট বড় নানান হরফে। মাঝখানে পশুপুরুষের লোভের বলি যে মেয়েটা, তার ছবি। একটি সুশ্রী মেয়ে ঘুমিয়ে আছে যেন।

অনেক বড় বড় তথাকথিত পয়সাঅলা পদস্থ ভদ্রলোক এই ব্যভিচারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত। সময়ে খবর দেবার জন্য নার্সিংহোমের সেক্রেটারি শ্রীলেখা চ্যাটার্জীর ভূয়সী প্রশংসা। আত্মরক্ষার চেষ্টায় শেষ নৃশংসতার নজির হিসেবে নামি নার্সিং হোমের বিলেত-ফিরত ডাক্তারকে বহু হাজার টাকার টোপ গেলানোর বিবরণ। কি নৃশংসভাবে শেষ সময়ে হত্যা করা হয়েছে ফুলের মতো একটা মেয়েকে তার অনুমান-সূচক গবেষণা।

সম্পাদকীয়তেও এই সংবাদ এবং তীক্ষ্ণ কশাঘাত। ওই নৃশংস মানুষদের লোক-চক্ষে এবং আদালতে টেনে আনার হুমকি, অসাধু ডাক্তারকে চরম শাস্তি দেবার দাবি।

টেলিফোন এলো গোটা দুই তিন। শুভার্থী ডাক্তারদের আক্ষেপ, সস্নেহ উপদেশ। আমি নির্বাক।

সকাল পেরুলো। দুপুরও কাটতে চলল। আমি বসেই আছি চুপচাপ। আমার কি করণীয় আছে আমি জানি না। থানায় ফোন করে খবর নিইনি। কোনো উকীল ব্যারিস্টারের কাছে গিয়ে পরামর্শও চাইনি। বার বার কেবল একটা কথাই মনে হচ্ছিল। এই শহর ছেড়ে সভ্যতার এই আলো বাতাস ছেড়ে এমন কোথায় যাওয়া যায় যেখানে কোনো চেনা মুখের সঙ্গে এ-জীবনে আর দেখা হবে না।...আছে এমন জায়গা?

বিষম চমকে উঠলাম। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও কে? শাড়ির আভাস দেখলাম। আমি মুখ তুলতে সরে দাঁড়াল। ধড়মড় করে উঠে এগিয়ে এলাম।

তুমি!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করব কিনা জানি না। সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীলেখা চ্যাটার্জী। বিবর্ণ পাণ্ডুর আতঙ্কগ্রস্ত মুখ তার। একদিনের মধ্যে এ-রকম পরিবর্তন কল্পনা করা শক্ত। কি এক অস্বাভাবিক ভয় যেন ওর দু'চোখে জমাট বেঁধে আছে। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, ডক্টর সুধীর দত্ত এখানে নেই তো?

আমি মাথা নাড়লাম। নেই।

একটু ভরসা পেয়ে সামান্য এগিয়ে এলো। বলল, আমি আপনার সব থেকে বেশি ক্ষতি করেছি...কাল যখন ওই মেয়েটার অপারেশন চলছিল, আমি তখন পাগল হয়ে গেছলাম, কেবল মনে হচ্ছিল সেই—সেই একবারের মতো ওরা আমাকেই কাটছে আবার। এমন জঘণ্য কাজ করেছে বলে ডক্টর রায়কে আমি এখনো ঘৃণা করি...কিন্তু আপনাকে আমি ভালোবাসি চন্দ্রাণীদি, তাই সাবধান করতে এলাম, আপনিও পালিয়ে যান এখান থেকে, ডক্টর দত্তর কাছ থেকে দূরে চলে যান, সে সাংঘাতিক লোক, সে শয়তান!

আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে ও অপ্রকৃতিস্থ। বললাম, ঘরে এসে বসবে?

না না? আমি এক্ষুনি যাব, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, ওতে আমার বেডিং আর স্যুটকেশ আছে। ডক্টর দত্ত আমাকে খুন করতে গিয়েও দয়া করেছে, বলেছে, আজকের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে চলে না গেলে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, আর পুলিস যদি সাক্ষী দেবার জন্য আমাকে খুঁজে পায় তাহলে পরে আর আমার মৃতদেহ কোথাও খুঁজে পাবে না। নিখোঁজ হবার জন্য আমাকে সে অনেক টাকা দিয়েছে—নগদ দশ হাজার টাকা। আমি চলে যাচ্ছি, এ-জীবনে আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু যাবার আগে আপনাকে আমি সাবধান করে যেতে এসেছি। আমি বরাবর জানি ডক্টর দত্ত আপনাকে পছন্দ করে—এখন সে হয়ত আপনাকে হাতের মুঠোয় পুরতে চাইবে—সময় থাকতে আপনিও পালান চন্দ্রাণীদি!

কথা শেষ করেই ও সিঁড়ি দিয়ে নীচে ছুটল।

আমি হতভম্ব খানিকক্ষণ। মাথার মধ্যে কি-রকম যেন জট পাকিয়ে গেছে। পরিষ্কার করে কিছুই ভাবতে পারছি না। নিজের অগোচরে একটা হাত গালের ওপর উঠে এলো...সুধীরের আঘাতের দাগ মিলিয়েছে হয়ত, অনুভূতিটা আছে।

কিছুটা ভাবতে পারিছি না বটে। তবু মন বলছে এখনো কিছু ঘটতে বাকি। কিছু একটা ঘটবে। ঘটবেই।

ঘটল।

সন্ধ্যার পর নিঃশব্দ পায়ে যে লোকটা ওপরে উঠে এলো, তাকে আমি আশা করিনি। প্রশান্ত। আমার স্বামী ডক্টর প্রশান্ত রায়।

একদিনে কালী-বর্ণ মুখ। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দুই চোখ গর্তে। কাল সমস্ত রাত ঘুমোয়নি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। খাওয়াও জোটেনি হয়ত।

মুহূর্তের মধ্যে কি-যে হল আমার জানি না। কাছে এগিয়ে এলাম। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালাম। গলার স্বরও নরম নয়।

তুমি! তোমাকে ছেড়ে দিল?

জবাব দিল না। মাথা নাড়ল শুধু। শূন্য দৃষ্টি। একটু বাদে বিড়বিড় করে বলল, সুধীর কি কাণ্ড করেছে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না...ওরা আমাকে ছেড়ে দিল...ভুলের জন্য ক্ষমা চাইল...তুমি কিছু জানো না?

আমি কোনো কথাই বলতে পারছি না। চেয়ে আছি শুধু। কি এক অজ্ঞাত আশংকায় শরীরটা আমার নতুন করে কাঁপছে আবার।

নিজের ঘরে চলে এলাম। প্রশান্ত বসার ঘরে একটা সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে নির্জীবের মতো পড়ে আছে। আমার ও-ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

ছটফটানি বাড়ছেই। আর থাকা গেল না। বসার ঘরে এলাম। যা বললাম, নিজের কানেই রুক্ষ ঠেকল।—উঠে সুধীরকে টেলিফোন করে জানতে চেষ্টা করবে কি হয়েছে?

উঠল। শরীরটাকে টেনে টেনে টেলিফোনের দিকে চলল। এই মূর্তি দেখে আমার মায়া হবার কথা। কিন্তু হচ্ছে না।

একটু বাদেই ফিরে এলো। মাথা নাড়ল। অর্থাৎ ধরা গেল না।

আরো আধ-ঘণ্টা গেল। কি ভেবে হঠাৎ আমিই টেলিফোনের রিসিভার তুললাম। নার্সিংহোমের নম্বর ডায়েল করলাম। মেট্রনের গলা। তাকে খবর জিজ্ঞাসা করতে সে জানালো, ডক্টর দত্ত এখানেই ছিল বিকেল প্রায় ছ'টা পর্যন্ত। এখান থেকে পুলিস এসে তাকে নিয়ে গেছে, ওই অপারেশনের রেকর্ডপত্রও সব নিয়ে গেছে। শেষে গলা খাটো করে বলল, আপনি এখানে এলে কিছু বলতে পারি, টেলিফোনে বলার অসুবিধে আছে।

টেলিফোন রেখে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম খানিক। শরীরের রক্ত মাথার দিকে উঠছে।...এই সুধীরই না গত সন্ধ্যায় আমার গালে প্রচণ্ড চড় মেরে, আমাকে ঠেলে এনে বিছানায়

ফেলে ড্রেসিং টেবিলের বড় ড্রয়ার থেকে আমার সেই নোট বই নিয়ে চলে গেছে? তবু এ-রকম লাগছে কেন আমার? তার অমঙ্গলের আশংকায় বুক দুরুদুরু করছে কেন?

শোবার ঘরে ছুটলাম হঠাৎ। দু' তিন মিনিটের মধ্যে পরনের শাড়িটা বদলে নীচে নেমে এলাম। সোজা রাস্তায়। একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে বসলাম।

ফিরলাম প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে। পা অবশ। সর্বাঙ্গ অবশ। মাথায় শুধু আগুন জ্বলছে। চোখও জ্বলছে কিনা জানি না। দোতলায় উঠে এসে ওই ড্রইং রুমেই ঢুকলাম আবার। প্রশান্ত তেমনি সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে।

শোনো!

ও চমকে উঠল। তারপর আমার মুখে দিকে চেয়ে রইল অসহায় চোখ মেলে। কিন্তু আমার মধ্যে তখন মায়া-মমতার লেশমাত্র নেই।

—সুধীরের সব খবর আমি এইমাত্র জেনে এলাম। তুমি জানতে চাও?

ও তেমনি চেয়ে আছে। আমার বিশ্বাস অনুমানও করতে পারছে আমি কি বলব।

বলে গেলাম, বেলা চারটের আগে থেকে সে নার্সিংহোমে ছিল। তার আগে শ্রীলেখাকে ভয় দেখিয়ে কলকাতা থেকে তাড়িয়েছে। নার্সিং হোমে গিয়ে পিছনের তারিখ দিয়ে অপারেশন ফর্ম-এ নিজের নাম সই করেছে, চার্টে আর রেকর্ডেও নিজের নাম সই করেছে—তোমার সই-এ অফিসিয়াল যা কাগজ-পত্র ছিল সব পুড়িয়েছে। শেষে পুলিশের বড় কর্তাদের টেলিফোনে জানিয়েছে সমস্ত অপরাধ তার—তুমি তাকে বাঁচাবার জন্যেই সত্য স্বীকার করছ না। আর বলেছে, তার আগে ওর কথায় বিশ্বাস করে তুমি ডেথ সার্টিফিকেট সই করেছ। বলেছে, টাকার লোভে ওই পেশেন্ট সুধীরই অ্যাডমিট করেছে, তুমি কিছুই জানতে না। প্রমাণস্বরূপ পুলিশ খোঁজ করলেই তার সুইট সার্চ করলে বাক্সের তলায় পার্টির দেওয়া ষোল হাজার টাকা পাবে। কিন্তু বন্ধুর উদারতা দেখে সে সত্য স্বীকার না করে পারছে না, তোমাকে ছেড়ে দিতে অনুনয় করে নিজে সব প্রাপ্য শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে। ...নিজের ঘর বন্ধ করেই সে টেলিফোনে পুলিশের সঙ্গে এসব কথা বলেছে। কিন্তু মেট্রনের সন্দেহ হতে সে তার ঘরের সাব-লাইনের রিসিভার তুলে এ-সব কথা শুনেছে। পরে সুধীর মেট্রনকে আর নার্সকে ডেকে শাসিয়েছে, পুলিশ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের বলতে হবে অপারেশনের আগে তাদের বিদায় করা হয়েছিল। এ-ছাড়া একটি বে-ফাঁস কথা বললে তাদেরও এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত করা হবে, কেউ রেহাই পাবে না।...পুলিস তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। কাগজপত্র দেখে আর তার ঘরে ষোল হাজার টাকা পেয়ে সবই বিশ্বাস করেছে। তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে।

স্তব্ধ নির্বাক মুহূর্ত কয়েকটা। আমি তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে দেখছি তাকে। একটা নিষ্প্রাণ মূর্তি দেখছি।

এখন তুমি কি করবে? এরকম মুখ করে আছ কেন? মুক্তি পেয়েছ আনন্দ হচ্ছে না?

পরদিন সকালের কাগজে বড় বড় হরফে বড় খবর আবার! আসল আসামীর আত্মসমর্পণের সংবাদ। তার ঘৃণ্য কারসাজির খবর। সেই সঙ্গে বন্ধুকে বাঁচানোর চেষ্টা ডক্টর প্রশান্ত রায়ের আচরণের সাধুবাদ এবং মৃদু ভর্ৎসনা!

বিচারে পাঁচ বছর জেল হয়ে গেল সুধীর দত্তর। ডাক্তারির লাইসেন্স আর ডিগ্রীও বাজেয়াপ্ত করা হল।

এতদিনের মধ্যে প্রশান্তর সঙ্গে আমার দশটা কথা হয়েছে কিনা সন্দেহ। তা সত্ত্বেও সাধ্যমত চেষ্টা করেছি আমরা সুধীরের হয়ে। কিন্তু খুব একটা চেষ্টার পথ সে-ই রাখেনি। সমস্ত অপরাধ স্বীকার করলে চেষ্টার আর থাকে কি? এর মধ্যে থানায় ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য কত আকূতি করেছি আমি। কিন্তু ও-ই দেখা করতে রাজি হয়নি।

শাস্তি ঘোষণার পরদিন দেখা করার অনুমতি পেলাম। নার্সিংহোম সংক্রান্ত জরুরী কিছু জেনে নেওয়ার প্রয়োজনে এই সাক্ষাৎকারের অনুমতি মিলেছে—তার অবর্তমানে নার্সিং হোমের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দায়িত্ব আমার—এ কথা লেখা হয়েছিল।

বেরুবার মুখে প্রশান্তকে সামনে পেলাম। বললাম, সুধীরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি...ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তো কিছু ঠিক করতে হবে... এ-ভাবে আর ক'দিন চলতে পারে।

পিছনের দিকে না চেয়েই নেমে এসে গাড়িতে উঠেছি।

আমি বিশিষ্ট মহিলা। সাক্ষাৎকারের জন্য আলাদা একটা ছোট ঘরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভেবেছিলাম শক্ত থাকব। কঠিন হয়ে থাকবে। কিন্তু ও এসে সামনে দাঁড়ানোমাত্র বুকের ভিতরটা যেন ডুকরে কেঁদে উঠল। অতি কষ্টে সংবরণ করতে চেষ্টা করছি নিজেকে। ও সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে সেই দুষ্টু দুষ্টু হাসি।

বললাম, তুমি বলতে এঁরা তোমাকে আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে জীবন দিয়েছে।...এতদিনে সেই ঋণ শোধ করলে?

ও হাসি মুখে মাথা ঝাঁকালো। তাই।

বেশ করেছ। কিন্তু আমার কারো কাছে কোনো ঋণ ছিল না। এরপর আমি কি করব?

একথা বলছ কেন?

বলব না? তুমি...তুমি কি ভেবেছ আমাকে? বলতে বলতে স্থানকাল ভুলে এগিয়ে এসে পাগলের মতই দু'হাতে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। বলে উঠলাম, বেশ, বলব না, কিছু বলব না, দূরে কোথাও গিয়ে পাঁচ বছর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব—তারপর পৃথিবী সুদ্ধু মানুষ তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেও আমি তোমাকে এমনি করে ধরে থাকব—আর কোনো দিন চোখের আড়াল করব না!

আমি কাঁদছি। কিন্তু ওর মুখে বেদনার ছায়া দেখছি কেন? ও আর হাসছে না কেন!

আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমাকে ভালোবাসো?

বাসি বাসি, কত ভালোবাসি আমি নিজেও এতদিন জানতুম না সুধীর! তোমার জন্যে আমি আজ সব করতে পারি, তোমার জন্য আমি মরতেও পারি।

ঠিক?

মুখের দিকে চেয়ে থমকালাম আমি। ও বলল, আমাকে যদি ভালোবেসে থাকো আর আমাকে যদি চিনে থাকো, আমার একটি কথারও নড়চড়া করো না। পাঁচ বছর বাদে আমি তোমাদের দুজনের সংসারে ফিরে আসতে চাই, এখানে থেকো না, প্রশান্তকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাও, আজ ওর থেকে বড় দুঃখী আর বোধহয় কেউ না।

না না! সুধীর!

শোনো। যে মুহূর্তে তুমি আমার বন্ধুকে ছাড়বে, জেনে রেখো সেই মুহূর্তে তুমি আমাকেও ছেড়েছ।

সুধীর!

আমি যা বলছি তাই শেষ কথা। ওর বুকের ভেতরটা কত বড় আমিই জানি। সেই জন্যেই বলছিলাম, ওর থেকে বড় দুঃখী আর কেউ না। ওর এই দুঃখকে তুমিও যদি অসম্মান করো, তাহলে আর বাকি থাকল কি? আমি তোমাকে বলছি ও আমার থেকে একটুও ছোট নয়...এই যুগের লোভ আমাদের খেয়েছে, ও উপলক্ষ মাত্র। আর এই যুগের লোভটা এমনি যে তোমার মতো মেয়েও সেটা ঠেকাতে পারল না, তুমি ওকে ছাড়ার কথা বলছ? তুমি থাকতে ও এ-রকম হতে পারল, তোমার দায় নেই? তোমার দোষ নেই?

আমি নির্বাক, স্তব্ধ।

ও হাসছে আবার। বলল, কথা দিচ্ছি পাঁচ বছর বাদে তোমাদের কাছেই ফিরে যাব। কিন্তু এ রকম ঘরে নয়, দুষ্টু হাসি উপচে পড়ছে এবার, আরো ভরাট ঘরে—একটা অন্তত ছেলে বা মেয়ে না থাকলে সেটা কি ঘর?

আমি চেয়েই আছি ওর মুখের দিকে। আর ও হাসছে। বলল, আমার বিশ্বাস, তুমি পাশে থাকলে তোমার স্বামী রত্নটি এবারে পুড়ে পুড়েই সোনা হয়ে যাবে।

আট

সোনা হয়েছে।

লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করছি সোনাই হয়েছে।

বেলা দেড়টা বেজে গেল প্রশান্তর এখনো দেখা নেই। এই রকমই অনিয়ম করে চলেছে। ধমকালে বলে রোগীরা ছাড়ে না...কি করব। কত রোগা হয়ে গেছে আমিই জানি।

বেজায় খিদে পেয়েছে আমার। তাই ছেলেটার সঙ্গেই খেলায় মেতেছি। ওকে নেড়েচেড়ে খুনসুটি করছি। ও এক-একবার হাসছে খিল খিল করে।

শেষে একবার ধাক্কা দিয়ে বললাম, না, তোর নাম সুধীর রাখব না, কলকাতার সেই পাগলটা এসে শুনলে ঠাট্টার চোটে আমাকে অস্থির করে মারবে—তার থেকে তুই সুবীর—কাছাকাছি হল।

পায়ের শব্দে ফিরে তাকালাম। বাবু আসছেন এতক্ষণে ঘেমে নেয়ে। বড় ব্যাগটা পাশে রেখে বসল ধুপ করে। আমি উঠে পাখাটা জোরে চালিয়ে দিলাম। তারপর বসে পায়ের জুতো খুলে দিতে লাগলাম।

আগে রোজ এই নিয়ে রাগারাগি হত। কিছুতে জুতোয় হাত দিতে দেবে না। শেষে হার মেনে হাল ছেড়েছে। এখন মনে মনে যে খুশিই হয় বুঝতে পারি।

জুতো জোড়া সরিয়ে রেখে হাত ধুয়ে এসে দেখি, মানুষটার অন্যমনস্ক দু'চোখ দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে। বড়সড় একটা নিঃশ্বাসও কানে এলো।

আমি বললাম, ও কি?

অপ্রস্তুত একটু। হাসতে চেষ্টা করল।—না...ভাবছিলাম ওই পাগলটার আসতে এখনো দেড় বছর দেরি।

আমি ধমকের সুরে বলে উঠলাম, তুমি ওঠো তো এখন, প্যান্ট-ফ্যান্ট ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমার খিদে পেয়ে গেছে। তারপর নরম করে বললাম, দেড়টা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাব...।

অপরিচিতের মুখ

উৎসর্গ

শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী

প্রিয়বরেষু

উনচল্লিশ বছর বয়সেও কোনো মহিলার যৌবনের প্রসাদ যদি অটুট থাকে, তাঁর অনাড়ম্বর আঁট-সাঁট পরিচ্ছন্ন বেশবাসের ভাঁজে-ভাঁজে যদি চব্বিশের কমনীয় বক্ররেখার লীলা প্রায় অব্যাহত থাকে, তার চলনে বলনে হাসিতে খুশিতে রাগে বিরাগে এক রমণীয় সত্তাবোধ যদি পুরুষের দু-চোখে মাধুর্য ছড়ায়, আর সেই সঙ্গে যদি আরো অনেকগুলো 'যদি' যুক্ত হয়, যেমন, মহিলা যদি সুন্দরী না হোক সুশ্রী হয়, যদি শিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী হয়, প্রায় উঁচুমহলে মেলামেশার দরুন তার রুচি এবং শালীনতা বোধ তরল জলের মতো যত্র-তত্র না গড়িয়ে যদি আত্মস্থ অথচ প্রখর হয়, যদি তার আশপাশে এমন মানুষ থাকে যাকে নিজের স্বামীর থেকে নিঃসংশয়ে উঁচুদরের মানুষ মনে হয়, আর দীর্ঘ স্নায়ু-যুদ্ধের ফলে সেই আত্মাসক্ত দাম্ভিক স্বামীটির সঙ্গে বহুদিনের এক পরোক্ষ অসহযোগ যদি শক্ত দানা বেঁধে ওঠে—আর সব শেষে সেই মহিলার একুশ বছর বয়সের একটি মাত্র মেয়ে থাকে—এই রাতটা পোহালেই কাল যার বিয়ে এবং সেই উপলক্ষে বাড়িতে ইতিমধ্যে অনেক অতিথি সমাগত এবং আরো অনেকে প্রত্যাশিত—তাহলে, অর্থাৎ, এত সব 'যদি' কণ্টকিত এমন কোনো মহিলার সদ্য মানসিক অবস্থার নিপুণ বিশ্লেষণ সম্ভব কি?

বিশ্লেষণ কেউ করছে না। বিশ্লেষণের অল্প-স্বল্প চেষ্টা একজন মাত্র করেছিলেন। সমীরণ দত্ত। নিজের স্বামীর থেকে যে-একজনকে অনেক উঁচুদরের মানুষ ভাবেন মহিলা—তিনি। কিন্তু এত উলটো-পালটা ধরনের অভ্যাসগত সমাগমের মধ্যে নিজের মনটাকেই নিভৃতচারী করে তোলা সম্ভব নয়, ভদ্রলোক বিশ্লেষণের দিকে এগোবেন কী করে? তাছাড়া যে মহিলার মানসিক অবস্থা নিয়ে কথা, এ সময়ে নিভৃতে ছেড়ে একটানা পাঁচ মিনিটও তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। আর যেটুকু দেখেছেন তাতেও শুধু চাপা উদ্বেগ ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করছেন না। ফলে মাঝে-সাঝে চোখাচোখি হলে দৃষ্টি-সেতু-পথে একটু শুধু আশ্বাস ছাড়তে চেষ্টা করছেন-যার অর্থ অত ব্যস্ত হবার কী আছে, সব নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে।

অপর্ণা সোম যে ব্যস্ত অথবা ভিতরে উদ্বিগ্ন সেটা এ বাড়ির আর দ্বিতীয় কোনো প্রাণী লক্ষ্যও করেছে কি না সন্দেহ। লক্ষ্য করেনি কারণ, কোনো ব্যাপারে বাড়তি সুর চড়ান না অপর্ণা সোম। তাঁর অস্তিত্ব স্পষ্ট কিন্তু সংযমের রাশে ধরা। না, আজ এই দিনে, সুপর্ণার বিয়ের আগের দিনের এই সন্ধ্যায়, সুপর্ণার মা অপর্ণা সোম ব্যস্ত বা উতলা যত না, তার থেকেও অনেক বেশি শ্রান্ত। কারো ওপর নির্ভর করে হাল ছাড়তে পারলে এই মুহূর্তে আর বোধ হয় কিছু চান না তিনি। সেই বিকেল থেকে ভিতরে ভিতরে কেমন যেন হাঁপ ধরে আসছে তাঁর। একা একটা মানুষ কত দিক দেখতে পারে, কত দিকে শুনতে পারে? মাথা ঠিক রেখে কত দিকের ব্যবস্থা বাতলে দিতে পারে? তাই মাথাটা যেন ঝিমঝিম করছে থেকে থেকে।

...তাঁরই মেয়ের বিয়ে, তাঁরই দায়িত্ব। তিনি তাই ভাবেন। এ দায়িত্বের ভাগ নেবার মতো সত্যিকারের দোসর কেউ আছে বলে তিনি মনে করেন না। ... বাড়ির বাইরে একজন আছেন, কিন্তু এই বেষ্টনীর মধ্যে থেকে, কপালে সিঁথিতে এই সিঁদুরের চিহ্ন বজায় রেখে বাইরের ওই লোককে কতটুকু আর দায়িত্বের ভাগ দেওয়া যায়? পরে বলতে এই রাতের পরে। সুপর্ণার বিয়েটা নির্বিঘ্নে চুকে যাবার পরে। কালকের যে দিনটা সামনে রেখে দীর্ঘ এগারোটা বছর কাটিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি। রাত পোহালে সেই দিন। তার পরে কী হবে বা হতে পারে সে পরের কথা। কিছু একটা হবে আর চূড়ান্ত কিছুই হবে সে সম্পর্কে অপর্ণার সঙ্কল্প অটুট, অনমনীয়। এবং সে পরিস্থিতিতে বাইরের ওই লোক, ওই সমীরণ দত্ত আরো অনেক বড় দায়িত্ব নেবার আগ্রহে দু'হাত বাড়াবেন কি না সে-চিন্তাও অপর্ণা সোম বড় করে মনের কোণে ঠাঁই দেননি। প্রয়োজনের বিচ্ছিন্ন এবং একক জীবন যাপনেরও সাহস এবং সঙ্গতি তাঁর আছে। আগামী দিনের উৎসব শেষে সকলে দেখবে (কত দিনের

মধ্যে দেখবে অপর্ণা জানেন না, কিন্তু দেখবেই) মেয়ের সংসার গড়ে ওঠার আগেই মায়ের সংসার ভাঙল। ... ভেঙেছে এগারো বছর আগে, ভাঙার অনুষ্ঠানটা শুধু দেখবে সকলে।

কিন্তু সুপর্ণা বা সুপাকে পাত্রস্থ করার এ-দায়িত্বের চেহারাটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ-দায়িত্ব বহনের ব্যাপারে সামাজিক গণ্ডিটা খুব সূক্ষ্ম নয়। আর তাতে সর্বাগ্রগণ্য দায় যাঁর তিনি মেয়ের বাপ। তাঁর প্রতি নির্ভরতা খোয়া গেলে মায়ের একাই কোমর বেঁধে প্রস্তুত হতে হয়। অপর্ণা সোমও সেই গোছের প্রস্তুত। কিন্তু সেই প্রস্তুতি যে একদিন আগে থেকেই এ ভাবে বারবার ঠোক্কর খেতে পারে তিনি ভাবেননি। প্রাণপণে তিনি ভাবতে চেষ্টা করছেন ঠোক্কর খাচ্ছেন না—সব ঠিক-ঠিক চলছে, ঠিক মতোই সব ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাবে।

মা, চেতলা থেকে ছোট মাসির ফোন, সেই থেকে খুঁজছি তোমাকে, অনেকক্ষণ ধরে আছে।

খবরটা দিয়েই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল পুরনো ঝি বৃন্দা। অপর্ণার সমবয়সী। তাই তার মা ডাক সর্বদা কানে তেমন মধু বর্ষণ করে না। কিন্তু গোড়ায় যখন বাধা দিতে পারেননি, এখন আর সে প্রশ্ন ওঠে না। অপর্ণা ওকে পছন্দ করেন, অন্দরমহলের অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে ওর পরামর্শ মতো চলতে হয়। সমবয়সী হলেও ওর অভিজ্ঞতা অনেক। সামনে পেলে পরে ফোন করার কথা বলে দিতেন। কিন্তু ওরই বা ফুরসত কোথায়। দশ হাত বার করে কাজ করতে হচ্ছে। মুখের কথা শেষ না হতে কোন্ দিকে ছুটেছে আবার। মুখ তুলে অপর্ণা সেদিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন খানিক।

না, আর পেরে ওঠেন না। হাতের লিস্টের সঙ্গে খুঁটিনাটি জিনিসগুলো মেলাচ্ছিলেন। কাল সকালেই পুরুতঠাকুর এসে এ সব বুঝে নেবেন। ওই ভদ্রলোকের আবার সবেতে অপ্রসন্ন মুখ। যেন তাঁর ফর্দ মেলানোর ওপরেই সুপার বিয়ের ভালো-মন্দ নির্ভর করছে। আরো যে ক'টা লিস্ট মেলানো বাকি ঠিক নেই—ফার্নিচারের লিস্ট, শাড়ির লিস্ট, শয্যাসামগ্রীর লিস্ট, আরো কত রকমের লিস্ট। এ রকম দশা হবে জানলে মেয়েকে অপর্ণা বলতেন রেজিস্ট্রি বিয়ে করে আয়গে বাপু, পরে ধীরে-সুস্থে যেটুকু সম্ভব করা যাবে। এ-ব্যাপারে তাঁর সংস্কার কিছু নেই। বিয়ে যেভাবে হোক হলেই হল। মনের মিলটাই আসল. সেটুকু না হলে সবটাই অর্থশূন্য। ...নিজের বিয়েতে ঘটা কম হয়নি। এর তিন গুণ অন্তত হয়েছিল। ... বাইশ বছর আগের সেই স্মৃতির গাছে কী ফুল ধরেছে দেখতেই পাচ্ছেন। তবু মরতে কেন এত বড় এক যজ্ঞ ফেঁদে বসলেন।

এটা মাঘের মাঝামাঝি। কলকাতার শীত পড়ে এলেও ঘাম হবার মতো নয়। কিন্তু অপর্ণা সোমের কানের পাশে আর নাকের নীচে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। তেমন ফর্সা হলে মুখখানা আরো লালচে দেখাত। বড় করে একটা দম নিয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন। ধারে-কাছে কাউকে দেখতে পেলেন না। অর্থাৎ, যে ঘরে ফোন সে-ঘরে পাঠাবার মতো কাউকে। ...ঝামেলার কি শেষ আছে! মেয়েটাই বা গেল কোথায়। সে-ও তো পারে ফোনটা ধরতে। রাত পোহালে বিয়ে, বন্ধুদের আসার বিরাম নেই আর ওর আড্ডা আর হি-হি-হাসিরও শেষ নেই।

যে পর্যন্ত মেলানো হয়েছে, লিস্টের সে-জায়গাটা দু আঙুলে চেপে ধরে অপর্ণা সোম উঠলেন। ... টেলিফোনটা একেবারে ওই কোণের এক ঘরে। যে ঘরে পারলে তিনি ঢোকেন না, ঢুকতে চান না। টেলিফোন বা তেমন বিশেষ কোনো দরকারে ছাড়া। টেলিফোনটা সামনের এই ঢাকা বারান্দায় এনে বসালে সাত দিনেও একদিন ও ঘরে ঢোকার দরকার হত না হয়তো। তাই টেলিফোন এসেছে শুনলেই বিরক্ত হন। ওটা বারান্দায় আনার কথা এ পর্যন্ত দু-দিন বলেছেন তিনি। একদিন বলেছেন, একটা মিস্ত্রি ডেকে ফোনটা বারান্দায় আনলে সুবিধা হত।

...টেলিফোনের মালিক খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে সে কথা শুনেছেন। মালিকই বলতে হবে, কারণ ফোনটা তাঁর অাপিসের। শুনে আবার খবরের কাগজে মন দিয়েছেন।

...মাস ছয় বাদে আবার একই কথা বলেছিলেন অপর্ণা সোম। কিন্তু সে বলার বয়ান ভিন্ন। বলেছিলেন, দিনের মধ্যে মেয়ের দশ-পনেরোটা ফোন আসে, কারো নাকের ডগায় বসে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে তার অসুবিধে হবার কথা ... টেলিফোনটা বাইরে আনা দরকার।

সেবারেও সাপ্তাহিক পত্র থেকে মুখ তুলে ফোনের মালিক শুনেছিলেন। তারপর পড়ায় মন দিয়েছিলেন।

তার ঘণ্টা দুই বাদে মেয়ে ছুটে এসেছিল তাঁর কাছে—মা তুমি বাবাকে বলেছ ও ঘরে ফোন থাকলে আমার অসুবিধে হয়?

মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে একটু থমকেছিলেন অপর্ণা। —হ্যাঁ কেন?

বাবা জিজ্ঞেস করছিল।

তুই কী বললি?

বললাম, ভয়ানক অসুবিধে হয়। মন খুলে কারো সঙ্গে একটু গল্প করতে পারি না।

সুপার মুখের দিকে খানিক চেয়েছিলেন অপর্ণা। ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। মেয়েটার যে বাপের ওপর টান আছে জানেন, হয়তো বা উলটো বলে এসেছে। ফোন সরালে মায়ের যে আর ও-ঘরে কখনো ঢোকারই দরকার হবে না বিশেষ, মেয়েও জানে।

সরাবে বলল?

ছাই সরাবে। মুখে সত্যিকারের বিরক্তি টেনে এনেই সুপা জবাব দিয়েছিল আমাকে উপদেশ দিলে, টেলিফোনটা মন খুলে গল্প করার জিনিস নয়, দু'চার মিনিটে কথা শেষ করা উচিত। আর বলল, শনি রবিবার বাদে সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত আমি বাইরে থাকি—তা সত্ত্বেও মন খুলে গল্প করার সুযোগের অভাব তোর?

কানের দু'পাশ গরম ঠেকছিল বলেই অন্যত্র সরে গিয়েছিলেন অপর্ণা। এই এক রোগ তাঁর। একটু অপ্রীতিকর কিছু শুনলে বা ঘটলেই কান গরম। নয় তো কেউ কিছু বুঝতেও পারে না। অন্যত্র সরে গিয়েও ঠান্ডা হতে সময় লেগেছিল। ভেবেছিলেন পরদিনই নতুন টেলিফোনের জন্য একটা দরখাস্ত করে দেবেন। বলা বাহুল্য তার খরচাও তিনিই দেবেন। মেজাজ আজও ঠাণ্ডা হয়নি বটে, কিন্তু দরখাস্ত আর করেননি। টেলিফোন পেতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় জানেন। কিন্তু দরখাস্ত না করার সেটাই আসল কারণ নয়। তিনজনের বাড়িতে দুটো টেলিফোন বিসদৃশ গোছের ব্যাপার যেন। এই দুনিয়ায় কারো কৌতূহলের উদ্রেক করতে চান না অপর্ণা সোম।

বারান্দার আধাআধি আসতে মুখে কঠিন রেখা পড়ল একটা দুটো। ...ভালই হয়েছে, পরোক্ষে ওই লোককে শুনিয়েই দুটো কথা বলার সুযোগ পাবেন। যে কারণে প্রায় সকাল থেকেই মাথাটা খারাপ হয়ে আছে, অথচ মুখ বুজে থাকতে হচ্ছে, বোনের সঙ্গে পরোক্ষে তাই নিয়ে দুটো কথা বলতে পারবেন। সীমুকে বলবেন, আগের দিন আসতে বলেছিলাম, আসিস না বাপু—বাড়িতে অনেক অতিথি, আর জায়গা নেই—তোরও অসুবিধে আমারও অসুবিধে—একেবারে কাল রাত্রেই নেমন্তন্ন খেতে আসিস।

নিজের ছোট বোনকে অনায়াসে এ কথা বলতে পারবেন। ও কিছুই মনে করবে না। ...তাছাড়া সকলেই তো সব জানে। অতিথি এলে আনন্দের কথা। বড় পরিবারের মেয়ে তিনিও, পাঁচজনকে দেখে আর ডেকে অভ্যাস আছে। কিন্তু কেউ যদি তাঁকে জব্দ করার জন্য অতিথি সমাগম ঘটাতে থাকে, সেটা বরদাস্ত করা সহজ নয়।

দোরগোড়ায় এসে থমকালেন এক মুহূর্ত। টেবিলের সামনের চেয়ারটা খালি, ওপাশের শয্যা খালি, ঘরে কেউ নেই। ঘরের চারদিকে একবার চেয়ে দেখলেন অপর্ণা। এই শূন্য ঘর আশা করেননি, আস্তে আস্তে টেলিফোনের দিকে এগোলেন।

...হ্যালো, কে রে, সীমু?

—হ্যাঁ ভাই, বড় ব্যস্ত ছিলাম। ...কী কাজ মানে? কাজের কি শেষ আছে না আমার করে দেবার কেউ আছে? কিন্তু তোর কী হল, আসছিস না যে?

—বলিস কী রে, ছেলেটার জ্বর এসে গেল! এ সময়ে জ্বর কেন, টিকে-ফিকে নেওয়া হয়েছে তো?

—অ্যাঁ, কী যে করিস তোরা বুঝি নে, দিন-রাতের চৌদ্দ ঘণ্টা তো ফুর্তি করে কাটাস, আর এই হুঁশটুকুও নেই!

কী আর করবি বল্, জ্বর কম থাকলে কাল সকাল সকালই চলে আসিস।

...সুপা? তাকে কোথায় পাব, নীচের কোন্ ঘরে দরজা বন্ধ করে কার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে কে জানে, ধন্যি বাপু আজকালকার মেয়ে।

...কী বললি? অপর্ণা প্রায় চেষ্টা করে হাসলেন একটু। — আমাকে বুঝি বুড়ি বানিয়ে ফেললি তুই? ...আচ্ছা, রাখলুম, সকাল সকাল আসিস কিন্তু কাল।

ফোন রেখে দ্রুত বেরিয়ে এলেন। অসীমার শেষের কথা কেন যেন কানে খুব ভাল লাগেনি। আজকালকার মেয়েকে ধন্যি বলাতে ও পালটা ঠাট্টা করেছে, তোমাদের দিন কি আর আছে যে দু'দিন আগে থেকে মেয়ে কাঁদতে বসবে।

ছোট বোন অসীমা বা সীমু কম করে দশ বছরের ছোট তাঁর থেকে। তিন বোন তাঁরা। ভাই নেই। অপর্ণা সকলের বড়। অসীমা বড়দির বিশেষ ভক্ত বরাবরই। কিন্তু যত ভালই বাসুক বড়দিকে, ঢিলে মুখ ওর। আর মুদ্রাদোষের মতো হাসি লেগেই আছে মুখে। অপর্ণার মনে মনে ধারণা সেই বিয়ের পর থেকেই এমনটা হয়েছে। রসিকতার সময় বড়দি যে কত বড় সেটা মনে থাকে না। সেদিনও হিংসে-হিংসে মুখ করে হেসে রসিকতা করেছিল, ও বর নাকি বলেছে বড়দিকে ওর থেকে দুই এক বছরের বেশি বড় মনে হয় না, আর মেজদির থেকে তো ছোটই মনে হয়।

শোনামাত্র মুখ লাল হয়েছিল অপর্ণার, তার ভিন্ন কারণ। এর দিন কয়েক আগে সামান্য সর্দিজ্বর হয়েছিল অপর্ণার। তাই শুনে সন্ধ্যার পর সীমু আর ওর বর প্রশান্ত তাঁকে দেখতে এসেছিল। মেয়ে তখন দু-দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেছে। বাড়ির যিনি কর্তা, অর্থাৎ, বরেন সোম যথারীতি তাঁর ঘরে বসে। একবার এসে খোঁজও করেননি। স্ত্রীর শরীর সুস্থ নয় সে খবরও রাখেন না হয়তো। অবশ্য খোঁজ রাখলে এবং খবর নিতে এলে সেটাই অস্বাভাবিক হত আর বিড়ম্বনার কারণ হত। ...অপর্ণার তখন মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল খুব। তাঁর শিয়রের কাছে চেয়ারে সে কপালে কী একটা ঠাণ্ডা মলম ঘষে দিচ্ছিলেন সমীরণ দত্ত। সেই সময় ওরা এসে হাজির।

জানে সকলেই সব, তবু অপ্রস্তুত একটু। তার তিন-চার দিনের মধ্যে সীমুর ওই কথা—ওর বর বলেছে বড়দিকে সীমুর থেকে দুই-এক বছরের বেশি বড় মনে হয় না, আর মেজদির থেকে তো ছোটই মনে হয়।

শোনামাত্র অপর্ণার মুখ লাল হবে না তো কী। বুদ্ধি সকলের থেকে বেশিই রাখেন। ... সমীরণবাবুকে শোবার ঘরে শয্যার পাশে বসে কপালে ওষুধ ঘষতে দেখে বাড়ি গিয়ে নিশ্চয় নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করেছে ওরা, আর তাই থেকে বড়দির বয়স-ফাঁকি-দেওয়া স্বাস্থ্যের বাঁধুনির কথা উঠেছে।

উঠেছে কারণ সীমুর কী আশা, অপর্ণাই সেটা সব থেকে বেশি অনুভব করতে পারেন। আশা, বড়দির একটানা এই ব্যর্থ জীবনে নতুন সুর আসবে আবার। ওর ধারণা, ওদের জীবন খুব সুখের হয়েছে, সফল হয়েছে বড়দির কারণে। সেই জন্য দু'জনেরই ওদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সীমু প্রশান্তকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। অবশ্য অনেক বছর হয়ে গেল, সেদিনের কথা মনে হয় অপর্ণার। ওদের সুখের সংসার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওদের দেখে অপর্ণার বাবা মা-ও অনেক পরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন আর মনে মনে বড় মেয়ের বিচক্ষণতার তারিফ করেছিলেন।

...সীমুর বিয়েতে সব থেকে বেশি আপত্তি করেছিলেন বাবা-মা। বড় মেয়ের দুরদৃষ্টের ক্ষত তাঁদের মনে লেগেই ছিল। এই কারণেই অপর দুই মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে বেশি মাত্রায় সজাগ সতর্ক ছিলেন তাঁরা। তাছাড়া দিনের হাল যেমনই হোক, রক্ষণশীল পরিবারে এই গোছের স্বাধীন হাওয়া ঢোকেনি। ওদের সেই বিয়েতে সব থেকে বড় বাধা ছেলে নিজেই। প্রশান্ত তখন সদ্য সদ্য ডাক্তার হয়েছে, রোজগারপাতি তেমন নেই। কিন্তু বাধা সেই কারণে নয়। অপর্ণার বাপের বাড়ির পাড়াতেই প্রশান্তদের বাড়ি ছিল। তার বাবাকে পাড়ার অনেকেই চিনত, অপর্ণার বাবাও মুখ চিনতেন। সেই ভদ্রলোক মানুষ কেমন কেউ সঠিক জানত না, কিন্তু মদ্যপ যে সেটা সকলেরই জানা ছিল। পরে খবর নিয়ে আরো কিছু জানা গেছল। বিশেষ করে ওই সংসারের অভাবের কথা। প্রশান্তর বাবার উপার্জন নিতান্ত মন্দ

ছিল না, কিন্তু রোগের মতো মদে আসক্তির দরুন উপার্জনের বেশির ভাগ সেই স্রোতে ভেসে যেত। সকলের চোখেই সেটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। প্রশান্ত যখন ডাক্তারি পাস করেছে তখন সেই ভদ্রলোকের মদের নেশা অপরিহার্য ব্যাধির আকার নিয়েছে।

প্রশান্তর সঙ্গে সীমুর মেলামেশাটা অনেক দিন পর্যন্ত গোপন ছিল। কিন্তু এ জিনিস শেষ পর্যন্ত গোপন থাকার নয়। ধরা যখন পড়ল প্রশান্ত তখনো ডাক্তারি পাস করেনি, ফাইন্যাল ইয়ার চলছে। পড়বি তো পড়, বাবার চোখেই ধরা পড়ে গেল একদিন। এর আগে আভাসে ইঙ্গিতে পাড়ার একজন তাঁকে ওদের মেলা-মেশার কথা বলেছিল। তিনি বিশ্বাস করেননি, উলটে মনে মনে রেগেই গেছিলেন। ভেবেছিলেন কোনো কারণে হয়ত মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখেই ও-রকম কিছু ভাবা হয়েছে। কিন্তু মনের ভিতরটা তাঁর খুঁতখুঁত করছিলই। ছোট মেয়ে তাঁর ওই ছেলের সঙ্গে কথা বলতেই বা যাবে কেন।

সীমুকে তিনি ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ...এরকম একটা কথা কানে আসছে কেন, কী ব্যাপার? হকচকিয়ে গিয়ে সীমু তাঁর সামনে থেকে ছুটে পালিয়েছে। বাবা তাইতে অবাক হয়েছিলেন, মেয়ে রেগে যাবে সেটাই আশা করেছিলেন।

এরপর একদিন বিকেলে গাড়ি থেকে দেখেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছে। কারো দিকে চোখ নেই। কোথায় বাড়ি কোথায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল! চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন বাবা। ওদের সামনে গাড়ি থামিয়ে সীমুকে গাড়িতে ডেকে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে দেখে ওদের তখন ভূত দেখার দশা। গাড়িতে বাবা একটি কথা বলেননি, কারণ বললে ড্রাইভার শুনবে।

বাড়ি ফিরেই মায়ের সামনে ফয়সালা করতে চেয়েছেন। মেয়ের কৈফিয়ত তলব করেছেন। তর্জন গর্জন করেছেন। প্রশান্তর মদ্যপ বাপের কথা বলেছেন। ও-রকম বাড়ির ছেলে যে কত খারাপ হতে পারে সেই কথা শুনিয়েছেন। তাছাড়া খারাপ না হলে পড়াশুনার সময় কোনো ছেলে কোনো মেয়ের সঙ্গে হাওয়া খেয়ে বেড়ায় বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। স্পষ্ট করে শাসিয়ে দিয়েছেন, দ্বিতীয় বার এরকম নির্বুদ্ধিতার ব্যাপার যেন আর না দেখা যায়। কিন্তু ফল হয়নি, ওদের মেলামেশার খবর আবারও কানে এসেছে, কেউ কেউ স্বচক্ষে দেখেছে ওদের দুজনকে একসঙ্গে। সীমুকে জিজ্ঞাসা করতে ও অস্বীকার করেনি। কিন্তু শাসন করতে গিয়ে বাবা অবাক। সীমু বলেছে, ও ছেলে একটুও খারাপ না, তাকে জানালে কেউ খারাপ বলবে না।

মা এগিয়ে এসেছেন শাসন করতে। রাগের চোটে সীমুর দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়েছেন আর বলেছেন, ভালো হোক খারাপ হোক তুই ওর সঙ্গে মিশবি কেন? এত সাহস তোর হবে কেন?

কিন্তু ছোট মেয়ের যে এমন গোঁ বাবা-মা কেউ জানতেন না। তাকে ভয় দেখিয়ে কাজ হয়নি, অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করেও ফল হয়নি। বাবা তখন বিষম উতলা হয়ে বড় মেয়ে অর্থাৎ অপর্ণার শরণাপন্ন হয়েছেন। ব্যাপারটা মা ওকে আগেই জানিয়েছিলেন। বাবা-মায়ের প্রতি কিছুটা অভিমানবশতই অপর্ণা খানিকটা নিস্পৃহ ছিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে উদ্বেগ ছিলই। অভিমান ভুলে অপর্ণা চেষ্টা করলেন হাল ধরতে। যে বাড়ির ছেলে, কী চরিত্রের হবে বোঝাই যাচ্ছে। সীমুর ভবিষ্যৎ ভেবে অপর্ণা কেঁপেই উঠেছিলেন। তাঁর মতো ভুক্তভোগী আর কে? সীমুটা এত বোকা কেন, বড়দিকে দেখেও শিক্ষা হল না?

সীমুকে ডেকে পাঠাতে ও কেঁদে কেটে একশেষ। সকলে মিলে মিথ্যে একটা ছেলেকে এত খারাপ বলছে, জানলে বলত না, সে মোটেই তার বাপের মতো না। অপর্ণা তাকে অনেক বুঝিয়েছেন, নিজের কথা বলেছেন, শেষে রাগ পর্যন্ত করেছেন, বাবা মা এতবড় আঘাত পেলে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না সে-কথা বলেও শাসিয়েছেন, কিন্তু ওর সেই এক কথা।

প্রশান্ত ততদিনে বেশ ভালভাবে ডাক্তারি পাস করেছে। সীমু একদিন ওকে অপর্ণার কাছে নিয়ে এলো। এই বাড়িতে। তখনো ভিতরে ভিতরে রেগেই গেছলেন অপর্ণা। যদিও প্রথম দর্শনে ছেলেটাকে তাঁর মন্দ লাগেনি। প্রশান্ত এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, বড়দি আমি সবই শুনেছি, সীমু

ব'লেছে। কিন্তু আমার দিকের দুটো কথা আপনাকে শুনতে হবে। ... যে কারণে আমার সঙ্গে আপনাদের বোনের বিয়ে দিতে আপত্তি সেই কারণেই আমার মায়ের জীবন ভ'র অশান্তি। তাঁর দুঃখ আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। বাবার জন্যে মদ জিনিসটা আমার মতো ঘৃণা আর বোধ হয় কেউ করে না। ... আমার ডাক্তারি পড়ার শেষের দিকে দেখলাম আমার প্রতিও মায়ের অবিশ্বাস। একদিন ঠাকুর ঘরে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম, খেলার ছলেও যদি কোনদিন মদ ছুঁই, মায়ের অভিশাপ যেন আমার মাথায় নেমে আসে, আর সেই দিনই আমার যেন মৃত্যু হয়। মা নিশ্চিন্ত হলেন। মায়ের দুঃখ দূর করব, মায়ের একটুখানি হাসি মুখ দেখব, এই আমার সব থেকে বড় আকাঙ্ক্ষা। সীমুকে দেখে মায়েরও সে-কী আনন্দ আর কত আশা। ওকে জড়িয়ে ধরে মা কেঁদেই ফেলেছিলেন। বলেছেন, এমন ঘরে কি তোমার মা-বাবা মেয়ে দেবেন, আমার কি এমন ভাগ্য হবে?...বড়দি, মায়ের সেই শঙ্কাই সত্য হবে? মায়ের এত দুঃখ দেখার পরেও সীমু আমার কাছ থেকে দুঃখ পাবে বলে আপনি মনে করেন?

অপর্ণা সত্যিই অভিভূত হয়ে গেছলেন। ছেলেটাকে সেই মুহূর্তে তাঁর কত যে ভালো লেগেছিল তিনিই জানেন। আর ঠিক তখনি বাড়ির মালিক দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর দিকে একনজর তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সীমুকে যথার্থ ভাগ্যবতী মনে হয়েছিল অপর্ণার। বরেন সোম দোরগোড়া থেকে চলে যেতে বলেছিলেন, না ভাই আগে যা মনে করেছি না জেনে করেছি, আর করব না। আমার বাবাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করব।

চেষ্টা যথার্থই করেছিলেন। ফলে বাবা তাঁর ওপরেই বিষম ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এমন কি, অপর্ণার ধারণা, বাবার সন্দেহ হয়েছিল নিজের সুস্থ জীবন বরবাদ হয়েছে বলেই বড় মেয়ে তাঁদের আক্কেল দেবার জন্যে সীমুর দিকে ভিড়েছে। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, ওই ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। তাঁর অমতে যদি বিয়ে হয় তাহলে তাঁর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না-ছোট মেয়ে যেখানে খুশি চলে গিয়ে বিয়ে করতে পারে।

সেই একদিন অপর্ণাও রেগে গেছিলেন বাবার ওপর। তাঁর সমানেই সীমুকে ডেকে বলেছেন, বাবাকে যখন কিছুতেই বোঝানো যাবে না কী আর কী করবি, আমার বাড়ি থেকেই বিয়ে হোক তাহলে—প্রশান্তকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস, আমি সব ব্যবস্থা করতে পারব।

অতটার দরকার হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাবাকে সম্মত করা গেছে। বিয়ে তাঁর বাড়ি থেকেই হয়েছে। তবু বিয়ের পরে ক'টা বছর বাবার ভিতরের শঙ্কা দূর হয়নি। শেষে নিশ্চিন্ত। প্রশান্ত বিলেত থেকে ফিরে আরো বড় ডাক্তার হয়েছে। উপার্জনও তেমনি। পরে ওই বাবারই মনে হয়েছে, জামাইদের মধ্যে সীমুর বরই সব থেকে যোগ্য।

...বড়দির জন্য সীমুর দুঃখের অন্ত নেই। সে-কথা মুখে বলে না বটে কিন্তু অপর্ণা বুঝতে পারেন। ও কোনোরকম সংস্কারের ধার ধারে না। ওর বদ্ধ ধারণা বড়দির দুঃখের দিন শেষ হবে। সমীরণবাবুর সঙ্গে সীমুর হৃদ্যতা হবার পর থেকেই এই আশা ওর। যে কোনো ফাঁক পেলে সমীরণবাবুর প্রশংসা করে। বলে চমৎকার লোক, যেমন বিদ্বান, তেমনি নিরহঙ্কার।

একদিন তো অপর্ণা ওর সামনেই ঠাট্টা করে বলেছিলেন ভদ্রলোককে, আপনি কি সীমুকে ঘুষ টুষ দিয়ে রেখেছেন নাকি আপনার কথা উঠলেই কেবল প্রশংসা।

সমীরণবাবু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, করবে না, জহুরির চোখ যে ওর। ... এখন ওর বোধহয় দুঃখু হয়েছে সাত তাড়াতাড়ি একজনকে ধরে না ফেললে আরো ভালো রত্ন জোটাতে পারত।

অসীমা চোখ পাকিয়েছে তক্ষুনি, আর এমন জিভ ওর, ঠাস করে ব'লে বসেছে, দেখুন মশাই লোকে শালীর সঙ্গে অমন ঠাট্টা করে, আমি এখন পর্যন্ত আপনার ছাত্রীর বোন।

'এখন পর্যন্ত' একথাটার ওপর বিচ্ছিরি জোর দিয়েছিল, আর তারপর নিজেই হেসে সারা। মোট কথা অপর্ণার তখন ভয়ানক খারাপ লাগছিল, আর ভদ্রলোকেরও বিড়ম্বিত মুখ। মানুষটা কত উদার কত মহৎ জানেন বলেই অপর্ণার অত খারাপ লেগেছিল। পরে সীমুকে বকবেন ভেবেছিলেন। বকা আর হয়নি।

হ্যাঁ, সীমু অনেক দিন ধরেই সেই আশা নিয়ে বসেছিল। বড়দির দুঃখ ঘুচবে। বরেন সোমকে দুচক্ষে দেখতে পারে না কোনোদিন। ... তারপর সেই এক বিপর্যয় নেমে আসার পর তো সীমু খেপেই গেছল। ...মেয়েদের শেষ আশা নির্মূল হয়ে যাবার মতোই সেই বিপর্যয়—যে বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলাবার জন্য বরেন সোমকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। সেদিন সীমুই সর্বপ্রথম ছুটে এসেছিল। এই বাড়িতে। অগ্নিমূর্তি হয়ে বলেছিল, তুমি এখনো এই লোকের সঙ্গে এই বাড়িতে আছ—আমার বাড়িতে চলে এসো, এক্ষুনি এসো!

অপর্ণা জবাব দেননি। সীমু ধরে নিয়েছে, বড়দি এখনো এই বাড়িতে আছে তার ভিন্ন কারণ। ধরে নিয়েছে, বড়দির অন্য আশ্রয় আছে, যে আশ্রয় মেয়েদের কাম্য সেই-রকমই আশ্রয়। সে-কথা মনে হতে এখান থেকে বেরিয়ে ও সোজা সমীরণবাবুর কাছে গেছে—একেবারে দোতলায় তাঁর পড়ার ঘরে। এ-খবর অপর্ণা পরে শুনেছেন। সীমু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছে, বড়দি এখন কী করবে? আমি তাঁকে আমার ওখানে নিয়ে যেতে এসেছিলাম, কিন্তু যাচ্ছে না। আপনার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে?

শুনে ভদ্রলোক বিষম অবাক। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ, সবদিক বজায় রেখে হেসেই জবাব দিয়েছেন, তোমার মতো রাগের মাথায় কিছু করার লোক নন তোমার বড়দি, যা করবেন ভেবেচিন্তেই করবেন, তুমি উতলা হ'য়ো না।

তারপর একটা-দুটো করে বছর ঘুরেছে অনেকগুলো। সীমু আর আশা করে না বোধ হয়। কিন্তু এক-একদিন দু জনার উপরেই রাগ হয় ওর। বড়দির ওপর আর সমীরণবাবুর ওপর। বছর দুই আগেও একদিন বলেছিল, মাস্টারগুলো যেন একেবারে শিবের সগোত্র, ধ্যান না ভাঙালে আর ভাঙতেই চায় না।

অপর্ণার সঙ্কল্প জানে না ও, কীসের প্রতীক্ষায় আছেন তিনি তাও জানে না। অপর্ণা তাই বিরক্ত হয়েছিলেন, বলেছিলেন, তোর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী?

তারপর সেদিন বড়দিকে দেখতে এসে শোবার ঘরে সমীরণবাবুকে তাঁর কপালে মলম মালিশ করতে দেখে নতুন করে আবার বোধহয় আশা হয়েছিল ওদের। তাই এই বয়সেও বড়দির স্বাস্থ্যের বাঁধুনির কথা উঠেছে।

...সে সীমুই আজ ফোনে বলল, সুপা আনন্দ করবে না তো কী, তোমাদের দিন কি আর আছে যে দুদিন আগে থেকে মেয়ে কাঁদতে বসবে!

নিজের ঘরের পাশ কাটাতে গিয়ে অপর্ণার একবার ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে একবার দেখার বাসনা, দিন সত্যিই কতটা গেছে। কিন্তু বাসনার প্রশ্রয় অপর্ণা কমেই দেন। তাড়াতাড়ি কাজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আজ বাদে কাল মেয়েটার বিয়ে ...

সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে পড়ল কোন্ এক জায়গায় একটা ফোন করবেন ভেবেছিলেন, ভুলে গেছেন। সুপার বরের বাড়িতে। মনের তলায় কী রকম যেন একটা অস্বস্তি থিতিয়ে ছিল। কোনো কিছুই যেন আর অনুকূল মনে হয় না। সেই জন্যেই ভুলের পর ভুল। ... ছেলেটা দেওঘর থেকে ফিরল কি না টেলিফোনে একেবার খোঁজ নেবার কথা মনে হয়েছিল। ওই রঞ্জন, যার সঙ্গে কাল সুপার বিয়ে। দিনকাল সত্যিই অন্যরকম হয়ে গেছে। পাঁচ দিন আগে ছেলে গেল মিটিং করতে। গতকাল পর্যন্ত ফেরেনি। অথচ দু'দিন আগেই ফেরার কথা। সত্যি কথা বলতে কী, এই সব পার্টি-টার্টি অপর্ণা দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় সব। মিটিংয়ের হুজুগে এখন বিয়ে মনে থাকলে হয় ছেলের।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ল। বাবা-মায়ের সঙ্গে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গেছিলেন। বাইরের কোথা থেকে বর আসার কথা। বিয়ের লগ্ন বয়ে যায়, বরের দেখা নেই। বিয়ে বাড়িতে কান্নাকাটি। শেষে খবর এলো বড় চাকুরে বরের হঠাৎ কি পদোন্নতির ব্যাপারে জরুরি তলব পড়েছে। হেড আপিস থেকে। বিয়ে ভুলে বরকে সেখানে ছুটতে হয়েছে। বিয়ে দিনকতক পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মেয়ের বাপ তখন নির্দেশ দিলেন কন্যাপক্ষের বিয়ের

খাওয়া দাওয়া আগেই হয়ে যাক, বিয়ে পাঁচ দিন পরের তারিখে হবে। কান্নাকাটির বাড়িতে আবার হাসাহাসি।

মনে পড়ল বলেই অপর্ণা নিজের ওপর বিরক্ত। এ বাড়িতে এমন হাসাহাসির সম্ভাবনার ছায়া পড়তেও গায়ে কাঁটা দিয়েছে। ছায়াটা ঠেলে সরিয়েছেন। সব ব্যাপারে অস্বস্তি ভোগ করাটা তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

যাকগে, পরেই খোঁজ নেবেনখ'ন। নিজের খামাখো দুশ্চিন্তার স্বভাব নিজেও জানেন। দুনিয়ার যত সব উদ্ভট ভাবনার বাসা তাঁর মাথায়। পরে নিজেই হাসবেন।

যাঃ! হাতের ফর্দ থেকে কখন আঙুল সরে গেছে। কোন্ পর্যন্ত মেলানো হয়েছিল ভুলে গেছেন। বিরক্তিতে চোখ-মুখ কুঁচকে গেল। একরাশ জিনিস, সব আবার নতুন করে মেলাতে হবে। হাতের লিস্টটা ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করল।

মা! সেই থেকে তুমি এখানে বসে কী করছ, সবাই যে খোঁজাখুঁজি করছে— বৃন্দার গলার ঝাঁঝ এই রকমই। কাজের লোক, কিন্তু জিভ খরখরে।

রাগত মুখে অপর্ণা তাকালেন তার দিকে। এখানে বসে হাওয়া খাচ্ছি দেখছিস না? কে খুঁজছে?

এক পলকে মায়ের মেজাজ বুঝে নিয়ে বৃন্দা জবাব দিল, ছেলেপুলে বাক্স-বিছানা নিয়ে বর্ধমান থেকে মেজপিসি এলেন যে গো! এসেই বাবুকে খুঁজছেন—

আবারও ফর্দ থেকে আঙুল সরে গেল অপর্ণার, হিসেব মেলানোর ভুল হয়ে গেল। বৃন্দার মুখের দিকেই চেয়ে আছেন কিন্তু আসলে তাকে দেখছেন না। মুখ থমথমে হয়ে উঠতে লাগল।...তাঁকে বিব্রত বিপর্যস্ত করে দেবার পাকা ষড়যন্ত্র যে তাতে আর ভুল নেই। এর আগে অমনি ছেলেপুলে-সহ বাগবাজার থেকে ন'বোন আর বেলেঘাটা থেকে ছোট বোন এসেছে—সুপার ন'পিসি আর ছোট পিসি। টালিগঞ্জ থেকে সপরিবারে দুই দেওরও এসেছে। অপর্ণার ধারণা ছিল ভাইঝির বিয়ে তাই আগের দিন খবরাখবর করতে এসেছে শুধু। কিন্তু বিকেলের মধ্যেই সে ভুল ভেঙেছে। একদিন আগে থাকতেই উৎসবে যোগ দিতে এসেছে সকলে —সেটা বোঝা গেছে। বিনা আমন্ত্রণে বা বিশেষ আমন্ত্রণ ছাড়া যে আসেনি জানা কথাই। ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন বর্ধমান থেকে এলো মেজ ননদ। এরপর কোচবিহার থেকে বড় ননদ এসে হাজির হলেও অপর্ণা খুব অবাক হবেন কি?

কি গো বউদি, তুমি এখানে! বাড়ি ভরতি অতিথি গিসগিস করছে আর কর্তা গিন্নি দুজনেই হাওয়া! কী দেখছ, সত্যিই হাজির হব ভাবনি তো?

মেজ ননদের নাম ধীরা। নামটা বেমানান। চার ননদের মধ্যে এই মেয়েই মুখরা সব থেকে বেশি। এখন অবশ্য দীর্ঘকাল দেখা নেই। আগে মুখের ওপর যা নয় তাই বলে বসত। পাঁচটা ছেলেমেয়ে এখন। শরীর আগের থেকে অনেক শীর্ণ। তবু একনজর দেখেই অপর্ণার মনে হল স্বভাব বদলায়নি।

অপর্ণা হাসলেন একটু। উচ্ছল হাসিতে কেউ তাঁকে ডগমগ দেখেনি কোনোদিন। তাই ভেতরটা ধরা পড়ল না। বললেন, সুপার ভাগ্য। ছেলেমেয়ে কোথায়?

সব এসেছে, কেবল ওদের বাপ ছাড়া। ধীরা খুশি মুখে বলে গেল, কাল তার কোর্টের জরুরি কেস সেরে বিকেলের আগে আসতে পারছে না—আবার পরশু দুপুরের মধ্যে আমাকে সুদ্ধু নিয়ে ফিরবে নোটিস্ দিয়েছে—আমি রাগ করে বললাম, থাকো তুমি একলা পড়ে, দাদা নিজে এসে যে করে বলে গেছে আমি একটা দিন অন্তত আগে না গিয়ে পারব না।

চিঠির আমন্ত্রণ নয়, নিজে বর্ধমান গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছে। সকলকেই নিশ্চয় আগে আসার এমনি সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ জানিয়েছে, নইলে এখানকার অন্দরের খবর সকলেই রাখে—একদিন আগে কেউ মজা দেখতে ছুটে আসেনি। তাঁকে কিছু না জানিয়ে সকলকে ডেকে মজা শুধু একজনই দেখতে চেয়েছে আর দেখাতে চেয়েছে। ওই লোকের চরিত্র জানা আছে, তবু সহজতা বজায় রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের মুখ লাল হয়ে উঠেছে কি না অপর্ণা জানেন না।

ধীরা হাসি মুখে আরো কী বলতে যাচ্ছিল, বৃন্দা তখনো দাঁড়িয়ে দেখে তাকে ধমকে উঠল। —তুমি বাপু আমাদের ননদ-ভাজের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে শুনছ কী—কাজেও যাও না।

অপ্রস্তুত বৃন্দা তাড়াতাড়ি সরে গেল সেখান থেকে। সেদিকে একনজর তাকিয়ে ধীরা বলল, বৃন্দা না? ... খেয়ে-দেয়ে দিব্বি ধুমসি হয়েছে দেখছি।

এ কথাও কানে বিচ্ছিরি লাগল অপর্ণার। জবাব দিলেন না। ধীরা ঈষৎ আগ্রহে আরো কাছে ঘেঁসে দাঁড়াল।—দাদাকে দেখছি না, দাদা কোথায়?

আঁচলে বেঁধে রাখি না দেখছই তো, আমার দিকে মাড়ালে দাদার খোঁজ্ পাবে কী করে?

বলে ফেলে নিজেরই বিচ্ছিরি লাগল অপর্ণার। না, তিনি রসিকতা করেননি। রসিকতার মেজাজ তাঁর নয়। তবু ননদ এটা রসিকতা বলেই ধরে নেবে। নিলও।—ইস! আনন্দ বুঝি ধরে না এখন? খুশিতে ঝুঁকে এক হাতে অপর্ণার একদিকে কাঁধ জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল। —সত্য বলছি বউদি, বলা নেই কওয়া নেই দাদাকে আমাদের বর্ধমানের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে দেখে হঠাৎ বুকের ভেতরটা আমার কেমন কেঁপে উঠেছিল। তারপর সুপার বিয়ের খবর। দাদা বারবার করে বলল, এই একটাই কাজ তার, আগে থাকতে গিয়ে সব দেখাশুনা না করলে আর সম্পর্ক থাকবে না। —শোনামাত্র আমার বুকের থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল—তক্ষুনি বুঝলাম ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন, তোমাদের গন্ডগোল মিটে গেছে, নইলে অত উৎসাহ নিয়ে দাদা বর্ধমানে ছুটত না।

হাতের ফর্দর দিকে চোখ রেখে অপর্ণা সামনের জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করছেন। শরীরে রক্ত আস্তে আস্তে মাথার দিকে উঠছে, ধীরা সেটা টের পাচ্ছে না।

খুশিতে উপচে ও আবার বলল, কিন্তু আমিও সেই মেয়ে আর ঠোঁট-কাটা উকিলের বউ। নিজের কানে না শোনা পর্যন্ত বিশাস করি না। সরাসরি মুখের ওপর দাদাকে জিজ্ঞেস করে বসলাম, উৎসব তো লেগেছে বুঝলাম, আর আনন্দ করে তুমি যেতেও বলছ, কিন্তু বউদির খবর কী—তোমাদের ফাঁড়া কেটেছে? দাদা হাসতে লাগল, বলল, যাচ্ছিস তো, নিজের চোখেই দেখিস'খন। সত্যি ভাই বউদি, কী ভাল যে লাগল! জানো, আমাদের ওখানে ইচ্ছাপূর্ণ ঠাকুর আছে, ভারি জাগ্রত দেবতা—বাড়ি থেকে চার মাইল দূরে অবশ্য, তা আমি অনেকদিন আগে মানত করে এসেছিলাম, বলেছিলাম, ঠাকুর দাদার সুমতি এনে দাও আর বউদির সঙ্গে কষে মনের মিল করিয়ে দাও, তোমার ভাল করে পুজো দেব—এত দিনে সেই পুজো দিয়ে তবে গাড়িতে উঠেছি, বুঝলে?

না না! আমি কিছু বুঝিনি, কি-চ্ছু বুঝতে চাই না—আমাকে জব্দ করে মজা দেখার জন্য তোমাদের সব এ ভাবে ডেকে এনেছে, তোমরা দূর হও এখান থেকে—তোমার দাদাকে আমি ঘৃণা করি, আগের থেকে ঢের বেশি ঘৃণা করি, সেই সঙ্গে তোমাদেরও ঘৃণা করি, তোমাদের ছাড়াও আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারব, তোমাদের কাউকে দরকার নেই আমার —কাউকে না!

না, এ কথাগুলো অপর্ণা মুখ ফুটে বলেননি, মুখ বুজেই ছিলেন। এ কথাগুলো তাঁর রক্তের মধ্যে ওঠা-নামা করছিল। বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলতে পারেননি। বলা স্বভাব নয়। এমনি অনেক কথাই তাঁর ঠোঁটের ডগা পর্যন্ত এসে শেষে স্নায়ুপথে মাথার ভিতরে গিয়ে কিলবিল করতে থাকে।

ফর্দটা হাত থেকে পড়ে গেল। কুড়িয়ে নিলেন। ধীরার অত কথার পর মুখ তুলে একবার না তাকানোটা অভব্যতা। তাকালেন। বললেন, এসেই তো ঝড় তুললে একখানা, এখন যাও দেখি, মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদলে কাজে লাগো। আমি তখন থেকে আর এগুলো মিলিয়ে উঠতে পারছি না—

ধীরা হাসতে হাসতে চলে গেল। অপর্ণা সেদিকে চেয়ে রইলেন খানিক। চোখের উষ্ণ তাপ নিজেই টের পাচ্ছেন। উঠে পড়লেন। থাক এগুলো এখন, পরে হবে—

...এই সেই ধীরা যে একদিন তাঁর সঙ্গে গলা ছেড়ে অনেক ঝগড়া করেছে আর পরে সেধে আবার অনেক ভাব করেছে, অনেক গঞ্জনা দিয়েছে আর পরে সেধে এসে আবার তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে অপর্ণা ভিন্ন বাড়িতে চলে আসার পর ও হিংসেয় যেন জ্বলেপুড়ে মরেছে, তাঁর বাড়িতে পা দিতেও চায়নি। কখনো সখনো এসেও ঝগড়া করেই গেছে। ওর বিয়ের তিন বছরের মধ্যে সেই মেয়ের কী পরিবর্তনই না দেখেছেন তিনি। একবার বর্ধমান থেকে এসে চুপি চুপি তাঁকে বলল, ওর সঙ্গে তাঁকে বর্ধমান যেতেই হবে। সেখানে নাকি এক মস্ত সাধুর আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁর কৃপা পেলে না ঘটে এমন ব্যাপার নেই। ধীরা এবং তার স্বামী দুজনেই সেই সাধুর কৃপার ভাগীদার

এখন। অপর্ণাকে একেবারে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারলে আর দুঃখু থাকবে না—দাদা বশ হবেই। তাঁর মতিগতি ফিরবেই। তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যেই বর্ধমান থেকে ছুটে এসেছিল ও।

যাওয়া দূরে থাক, অপর্ণা রেগেই গেছিলেন। আর রাগ করে ধীরাও সেই বিকালেই বর্ধমানে ফিরে গেছিল। যাবার আগে বলে গেছল, আসলে তুমি চাও না দাদা ফিরুক। ... রাগ সেদিন অপর্ণার নিজের ওপর হয়েছিল কি আর কারো ওপর, জানেন না। ধীরা চলে যাবার পর ওর ওপর অন্তত একটুও রাগ ছিল না। উলটে মনে হয়েছে কি মেয়ে ছিল আর কত সুন্দর হয়েছে এখন ওর ভিতরটা। বিবাহিত জীবনে ও সুখী। সেই সুখ সকলকেই দেখাতে চায়— দিন এলে বদলায় সকলেই, কেবল তাঁর ঘরেরই একজনের রকমফের নেই।

ধীরার কথাগুলো এখনো কটকট করে কানে বিঁধছে। জাগ্রত দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছে দাদার সুমতি এনে দাও—নিজে বর্ধমানে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছে, তাইতে মনের আনন্দে ওরা ধরেই নিয়েছে দাদার সুমতি হয়েছে। আর যারা এসেছে, সুপার ন'পিসি ছোট পিসি দুই কাকা, তাদেরও সকলেরই হয়তো ধারণা, দাদার সুমতি হয়েছে। আর লোকটা এত বড় শঠ যে সকলকে তাই বুঝতে দিয়েছে। বুঝতে দিয়েছে, স্ত্রীর সঙ্গে তার আপস হয়েছে, মিল হয়েছে, আগের অপ্রিয় যা কিছু সব ধুয়েমুছে গেছে। ধীরা যখন তাই বুঝে একেবারে ঠাকুর পুজো দিয়ে ছুটে এসেছে—অন্যেরাও নিশ্চয় তাই ধরে নিয়েছে। অথচ খুব ভাল করেই জানে বাড়ি এসে পাঁচ ঘণ্টা কাটলেই পঞ্চাশটা ফাঁক ওদের চোখে পড়বে, তখন যা বোঝবার ঠিক বুঝে নেবে। কিন্তু তাতে কী যায় আসে, ওই লোকের চরিত্রে নতুন করে আর কতটুকু কালি পড়বে—উদ্দেশ্য তো শুধু অপর্ণাকে জব্দ করা।

কানের দু-পাশ আরো বেশি তেতে উঠেছে। অন্যসময় এ রকম হলে জলে হাত ভিজিয়ে কানে বোলান। এখন সে ফুরসতও পেয়ে উঠছেন না। সেই সঙ্গে ভিতরে কী যেন অস্বস্তি একটা। দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালেন। নিজের নিভৃতেই দৃষ্টি ফেলে দেখতে চেষ্টা করলেন কী সেটা। ... জাগ্রত ঠাকুরের কাছে ধীরা মানত করেছিল, দাদার সুমতি এনে দিলে পুজো দেবে।

না, ঠাকুর দেবতার ওপর কোনোদিন কোনো বড় রকমের বিশ্বাস বা নির্ভরতা অপর্ণার ছিল না। আজ তো নেইই। অল্প বয়সে কোন রকম বিপাকে পড়লে সময় সময় ঠাকুর দেবতাকে একটু-আধটু ডাকত অবশ্য, তারপর ভুলেও যেত। কিন্তু ভক্তি বিশ্বাস থাক বা না থাক, তখন সংস্কারগত দুর্বলতা ছিলই একটু। সেটা বাবা মায়ের দরুন। প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও ওই অদৃশ্য শক্তির ওপর তাঁদের আবার অগাধ ভক্তি বিশ্বাস। মা তো ঠাকুর পুজো না সেরে জলও খেতেন না। ওরা বোনেরা তাই নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত, টিকা-টিপ্পনী কাটত। ... ন'বছর বয়সে একবার নাকি টাইফয়েড হয়েছিল অপর্ণার। কিছুই মনে নেই, মায়ের মুখে অনেক বারের শোনা ঘটনাটা মনে আছে শুধু। তখন টাইফয়েড সারানোটা আজকের মতো এমন জলভাত ব্যাপার ছিল না। রোগ ঘোরালো হলে আশা ছেড়ে দিতে হত, কান্নাকাটি পড়ে যেত। সেই রকম বিষম অবস্থাই দাঁড়িয়েছিল নাকি অপর্ণার।

ডাক্তারের ওপর ভরসা ছেড়ে মা তখন একমনে তাঁর গুরুদেবকে ডাকতে শুরু করেছিলেন। গুরুদেব তখন কোথায় কোন তীর্থে ঘুরছেন জানতেনও না। এক সকালে হঠাৎ সেই গুরুদেব বাড়ি এসে হাজির। বললেন, মনটা ক'দিন ধরে কেমন ছটফট করছিল তাই দেবপ্রয়াগ থেকে সোজা চলে এসেছেন কলকাতায়। এসে বুঝেছেন কেন অত ছটফট করছিল মন। ওই মারাত্মক অসুখের বাড়িতে বসেই বৃহৎ শান্তিযজ্ঞের ব্যবস্থা করলেন তিনি। আর তারপর থেকেই নাকি অপর্ণা একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। সেই থেকে এ-যাবত আর কোনো বড় রকমের অসুখ হয়েছে বলে মনে পড়ে না তাঁর।

এ সব কারণেই ভক্তি-বিশ্বাস না থাক, ছেলেবেলা থেকে অলক্ষ্য দেবতাদের প্রতি সংস্কারগত দুর্বলতা একটু ছিলই। কিন্তু এত দিন এত কাণ্ডের পরে আজও কি সেটুকু নির্মূল হয়ে যায়নি! নইলে মেজ ননদ ধীরার কথা শুনে হঠাৎ এই অসম্ভব চিন্তাটা তাঁর মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিল কেন?

কী উঁকিঝুঁকি দিল, থমকে দাঁড়িয়ে আর নিজের ভিতরে চোখ চালিয়ে সেটাই দেখলেন তিনি। না দেখলেন না, মনে হল শুনলেন কিছু। সেখানে কেউ যেন বলছে, ধীরার কথাই যদি সত্যি হয়, অসম্ভব কিছু ঘটার মতো অদৃশ্য শক্তির কৃপায় লোকটার সুমতিই যদি হয়ে বসে—তাহলে? তাহলে?

অসহিষ্ণু আক্রোশে প্রায় অগোচরের ওই চিন্তার বুদবুদটা সেখানেই শেষ করে দিলেন অপর্ণা। সে রকম কখনো হয় না, হতে পারে না। কালো কখনো সাদা হয় না, রাত কখনো দিন হয় না, হাজার চেষ্টা করলেও কাকের গলা দিয়ে কোকিলের স্বরে বেরোয় না। আর, সে রকম অসম্ভবই যদি কিছু ঘটে, ভালো কথা। ভালো থাকুক। কারো অশুভ তিনি চান না। তা বলে সেই ভালোর সঙ্গে তাঁর নতুন করে আর কোনো সম্পর্ক জুড়বে না। টানা এগারো বছর ধরে যা কিছু জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, হাজার জল ঢাললেও তাতে আর জীবনের রঙ ধরবে না। হাজার বাতাস করলেও শুধু ছাই-ই উড়বে, তার বেশি কিছু নয়।

...ঠিক এগারো বছরই হল অপর্ণার জীবনে সেই বিপর্যয় নেমে এসেছে। তার আগের বিবাহিত জীবনের সঙ্গে তিনি আপস করতে পেরেছিলেন। সেখানে অনেক কালো অনেক কুৎসিত জঞ্জাল জমা হয়ে ছিল। কিন্তু একজনের শুচি সান্নিধ্যে এসে অপর্ণা নিজের মনটা অন্তত পরিষ্কার রাখতে পেরেছিলেন। সেই একজন সমীরণবাবু। সমীরণ দত্ত। তাঁকে দেখেই ক্ষমার বিচিত্রসুন্দর প্রভাব অপর্ণার মনেও অনেক সময় উঁকিঝুঁকি দিত। ঘরের লোকের অত কুৎসিত আচরণ সত্ত্বেও। এটা সমীরণবাবুই শিখিয়েছিলেন তাঁকে। বক্তৃতা করে বা উপদেশ দিয়ে শেখাননি। তাহলে উলটে সেটা বিরক্তির কারণ হত। নিজের আচরণ দিয়ে শিখিয়েছেন।

...কিন্তু এগারো বছর আগের সেই এক বিপর্যয়ের পরে অপর্ণার বুকের ভিতরটা জ্বলে জ্বলে অঙ্গার হয়েছে শুধু। তখন সব পুড়েছে। পুড়ে ছাই হয়েছে। সমীরণ দত্তর আচরণের শিক্ষণীয় বস্তুটুকু পর্যন্ত। সেই দাহর মুখে সমীরণবাবু যদি এগিয়ে সে হাত ধরতেন, হাত ধরে যদি তাঁকে নিজের জীবনে ডেকে নিতেন অপর্ণা এক মুহূর্ত দ্বিধা করতেন কি না সন্দেহ। তিনি ডাকেননি। ডাকেননি বলেই পরে ওই লোকের ওপর শ্রদ্ধা বেড়েছে অপর্ণার।

টানা এগারো বছর ধরে শুধু এই দিনের অপেক্ষায় ছিলেন অপর্ণা। সুপার বিয়ের দিনের অপেক্ষায়। কালকের দিনের অপেক্ষায়। শুধু এটুকুর জন্যেই এক বাড়ির মধ্যে সংসার নামে একটা ছাদের নীচে জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ঠাট বজায় রেখে দীর্ঘ এগারোটা বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। নিজের সুখের দিকে তাকাননি, স্বার্থের দিকে তাকাননি। এই সব অবস্থান কী দুঃসহ সেটা কাউকে দেখানো সম্ভব নয়, বোঝানো সম্ভব নয়। কালকের দিনটা কাটলে এই অভিশপ্ত শাস্তির মেয়াদ ফুরাবে। তারপরে আর পিছন ফিরে তাকাবেন তিনি? আবার?

সুপ্ত চিন্তার বুদবুদটা সমূলে বাতিল করে ঈষৎ রেগেই সামনের দিকে এগোলেন অপর্ণা সোম।

দুই

বারান্দার মাঝামাঝি আসতে বৃন্দা পথ আগলালো। এদিক ওদিক চেয়ে ফিস-ফিস করে বলল, এই যে হুড়মুড় করে সব আসতে লেগেছেন, রাতে এদের খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে গো মা?

...ঠিকে বামুনের তো সেই সন্ধের আগে টিকির দেখা মিলবে না, তাছাড়া ওই বুড়োর সাধ্যি আছে এত সব করে!

জবাব না দিয়ে অপর্ণা ওর দিকে চেয়ে রইলেন শুধু। মুখে যা এসেছিল বলতে পারলেন না। হঠাৎ বৃন্দার ওপরেই রাগ হচ্ছিল তাঁর। বলতে যাচ্ছিলেন, তুই সব্ব ব্যাপারে আগে ভাগে আমার মাথা গরম করে দিস কেন, আর তোরই বা মাথা ঘামানো কেন—নেমন্তন্ন যে করেছে সে বুঝুক।

কিন্তু এও জানেন বৃন্দা মাথা ঘামায় বলেই অনেক ব্যাপারে তাঁর নিজের মাথাটা অব্যাহতি পায়। তাছাড়া তাঁকে জব্দ করার জন্যেই নিঃশব্দে একজনের এই ষড়যন্ত্র। একটা বিশৃঙ্খলা ঘটানোই উদ্দেশ্য।

সেটা যত বেশি হবে সকলে তাকে ততো দুষবে, মতলব করে গন্ডগোল যে পাকালো তাকে কেউ কিছু বলবে না। অপর্ণার অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না, কারো কোনো সমালোচনার ধার ধারেন না তিনি আর। তবু এই গোছের বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনায় বিরক্তি আসা স্বাভাবিক।

বৃন্দা আবার বলল, হেঁসেলে না হয় আমিই যেতে পারি, এতগুলো লোকের ব্যাপার তাও কি চাট্টিখানি কথা—কিন্তু সময় থাকতে হাট-বাজার না হলে কী দিয়ে কী হবে, সন্ধে তো হয়ে এলো। বাজার তো কারো ইচ্ছেমতো খোলা থাকবে না—

তোদের বাবু কোথায়?

বাবুকে তো সেই ঘণ্টাখানেক আগে বেরোতে দেখেছি। হঠাৎ বাবুর খোঁজ করা হল কেন এক পলক তাকিয়ে বৃন্দা সেটা বুঝে নিতে চেষ্টা করল। কারণ, ওই একজনের খোঁজ আর যে-ই করুক, কর্ত্রী কখনো করে না। কিন্তু তার কাজের তাড়া, বলল, যাক বাবুকে দিয়ে তো আর কিছু হবে না, বাজারের দরকার হয় তো টাকা বার করো, আর কী আনতো হবে বলো—লোকটা এসেছে যখন, চট করে গিয়ে নিয়ে আসুক।

অন্য সময় হলে অপর্ণা এই কথা থেকেই বুঝতে পারতেন কে এসেছে। কিন্তু এখন তাঁর মাথার মধ্যে কেবলই গোল পাকাচ্ছে। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, কে এসেছে?

বিরক্তি মেশানো খুশিমুখে বৃন্দা জবাব দিল, ওই ওদের বাবা—আবার কে!

ওদের বাবা অর্থাৎ বৃন্দার ছেলেমেয়ের বাবা নিরঞ্জন। বৃন্দার তিনটে শক্তসমর্থ ছেলে আর একটা মেয়ে। ছেলে তিনটেই কলে চাকরি করে। কলের চাকরিতে আজকাল ভাল উপার্জন। বড় দুই ছেলের বিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা মোটামুটি সুশ্রী, তারও ভালই বিয়ে হয়ে গেছে। নিরঞ্জন নিজেও কোন্ আপিসে পিওনের চাকরি করে। অতএব এ-হেন সৌভাগ্যবতী বৃন্দার কোনো বাড়িতে ঝি-গিরি করার কথা নয়। করুক, তা নিরঞ্জন বা তার ছেলেরাও চায়নি। কিন্তু বৃন্দার মুখ ঝামটায় ওদের ইচ্ছে বাতিল হয়ে গেছে। বয়েস কালের আনন্দের সময় খেটে খেটে ওর হাড়-মাস কালি হয়েছে, কত সময় তখন ওর সোয়ামীর চাকরি থাকত না, তার ওপর গাঁজা-ভাং খেয়ে পয়সা ওড়াত, সেই দুর্দিনে লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ করে চার-চারটে ছেলেমেয়েকে বলতে গেলে বৃন্দাই টেনে তুলেছে—স্বাধীনতা খুইয়ে এখন ছেলের আর ছেলের বউদের তাঁবেদারি করার জন্যে তাকে ডাকা হচ্ছে, অত সোহাগে কাজ নেই—তার পষ্ট কথা। এসব কাহিনি অপর্ণাকে ও-ই বলেছে, আর অপর্ণাও ওর অনেক 'পষ্ট কথা' স্বকর্ণে শুনছেন। ছেলেরা মাসের মধ্যে দুই-একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে, বৃন্দা তখন বেশ পষ্ট করেই তাদের আদেশ-উপদেশাদি দিয়ে থাকে। ওর কড়া ভাবটা আরও বেশি প্রবল আর স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিরঞ্জনের বেলায়। সপ্তাহে দু-তিন দিন অন্তর বউয়ের খবর নিতে আসে। বেশ ভদ্র চেহারা, আপিসের পোশাক না দেখলে কেউ পিওন বলবে না। কিন্তু সে বেচারা আসে যেন বউয়ের মুখঝামটা খেতে। সে-ঝঙ্কার অপর্ণার কানেও আসে মাঝে-সাঝে। মাসের মধ্যে দুই-একদিন ছুটি নিয়ে বৃন্দা সোয়ামীর আর ছেলেদের ঘর-দোর দেখতে যায়। যায় যখন, অপর্ণা তখন দোতলার বারান্দায় না দাঁড়িয়ে পারেন না। দেখে হাসিই পায়। রাজেন্দ্রানীর মতো আগে আগে চলেছে বৃন্দা, পিছনে অনুগত স্বামী। আবার দুই একদিন বাদে ফেরেও যেন ওদের সক্কলকে কৃতার্থ করে।

আর একবারের ঘটনা যখনই মনে পড়ে অপর্ণার হাসি পায়। হাসি পায় বটে, কিন্তু ভিতরটা কেমন জ্বালা জ্বালাও করে। সেই ব্যাপারে বৃন্দার মান ভাঙাতে ওর স্বামী নিরঞ্জন, তিন ছিলে আর মেয়ে সকলেই নাজেহাল। মানের হেতু তখনো জানেন না অপর্ণা। কিছু একটা গণ্ডগোল পাকিয়েছে তাই শুধু বুঝেছিলেন। বৃন্দার সর্বদা খড়খড়ে মুখ। মেজাজের ওপরেই আছে। অপর্ণা কিছু বললেও মুখের ওপর ঠাস-ঠাস জবাব দিচ্ছে। পর পর ক'দিনই দেখা গেল বিকেলে আপিস ফেরত নিরঞ্জন এই বাড়িতে আসছে। শুকনো বিষণ্ণ মুখ। এসে নীচেই বসে থাকছে, ও যতক্ষণ নীচে বৃন্দা ততক্ষণ ওপরে। গন্ডগোলটা কোনখানে অপর্ণা তখনই বুঝেছেন। হেতু জানেন না। জানার কৌতূহল ছিল। কিন্তু মুখ

ফুটে জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ। নিরঞ্জন দু'দিন এসে ফিরে যাওয়ার পর তৃতীয় দিনে অপর্ণা বললেন, নিরঞ্জন নীচে বসে আছে দেখলাম, কী দরকার শুনে আয়—

বৃন্দা থমকে তাকালো তাঁর দিকে। তাকালো না ভস্ম করল যেন। তারপর হাতের ঝাঁটা আছড়ে ফেলে হনহন করে নীচে নেমে গেল। থমথমে মুখ রাগে ফেটে পড়ছে। দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে দ্বিগুণ আক্রোশে ঝাঁট দেওয়া ঘর আবার ঝাঁট দিতে লেগে গেল। অপর্ণা বারান্দায় এসে দেখলেন নীচের রাস্তায় নিরঞ্জন বিবর্ণ মুখে ওপরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওর মুখ দেখে অপর্ণার কষ্টই হল। নীচে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে যেন তাঁরই শরণাপন্ন লোকটা। অপর্ণা ঘরে এসে বললেন, কী ব্যাপার তোর বল্ তো, তিন দিন ধরে নিরঞ্জন এসে এসে ফিরে যাচ্ছে, আর এদিকে তুই কেবলই রাগে ফুটছিস—কী হয়েছে?

ঝাঁটা হাতে বৃন্দা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর তপ্ত মুখে যে জবাব দিল শুনে অপর্ণা হাঁ। বলে উঠল, তাতে তোমার কী ক্ষতি হয়েছে? আমার রাগের জন্যে তোমার কাজের কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে তো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করো আমাকে।

ঘর ছেড়ে চলে গেল। তার পরদিন থেকে ওর ছেলেদের আনাগোনা শুরু হল। তারা এক-একজন এক ঘণ্টা করে বসে থাকে। কিন্তু বৃন্দার ওদের সঙ্গে কথা বলা হয়ই না প্রায়। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই নিজের কাজে এসে লেগে যায়। এরপর একদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর মেয়ে এসে হাজির। মা-কে ছেড়ে মেয়ে সোজা অপর্ণার দ্বারস্থ হল। অপর্ণার তখন বোধগম্য হল ব্যাপারখানা কী। ... মনিবের পরিবারের সঙ্গে নিরঞ্জন পনেরো দিনের জন্য নিখরচায় কাশী আর হরিদ্বারে ঘুরে এসেছে। ওই দুটো জায়গার ওপরেই বৃন্দার অনেক দিনের লোভ। তা জেনেও নিরঞ্জন একলা গেছে। বলেছে মনিবের হুকুম, না গিয়ে উপায় ছিল না। তাছাড়া বিনে পয়সায় ঘুরে আসার লোভও সামলাতে পারেনি। বৃন্দা যে পনেরো দিনের ছুটি পেতে পারে এ সে কল্পনাও করেনি। আর খোদ মনিবের সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যায়ই বা কী করে। কিন্তু কোনো বিচার-বিবেচনার ধার ধারে না বৃন্দা। সে সোয়ামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেও। নিরঞ্জনকে বলেছে স্বচ্ছন্দে সে আবার বিয়ে-থা করতে পারে। বৃন্দার ধারণা, মনিবের বাড়িতে একটি বছর তিরিশেকের বিধবা ঝি আছে এবং সেও মনিবের সঙ্গে গেছে বলেই নিরঞ্জন অনায়াসে স্ত্রীর কথা একবারও না ভেবে নাচতে নাচতে চলে গেছে। শেষেরবারে বৃন্দা নিরঞ্জনকে শাসিয়েছে ফের যদি সে এ-বাড়ি মুখো হয় তো উকিল লাগিয়ে নিজেদের বিয়ে খারিজ করবে।

অপর্ণা ওর মেয়েকে কী আশ্বাস দিয়ে ফেরাবেন, বা বৃন্দাকে কী করে ঠান্ডা করবেন ভেবে পাননি। শেষে বৃন্দাকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা ওপরওয়ালাই করলেন। ও ছেলের মারফত খবর পেল নিরঞ্জন ধুম জ্বর নিয়ে আপিস থেকে ফিরেছে, একশো চার জ্বর, জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে।

মান জলাঞ্জলি দিয়ে ছেলের সঙ্গেই বৃন্দা ছুটলো। তিন ঘণ্টা না যেতে ফিরে এলো আবার। রাগে খই ফুটছে মুখে। —সবগুলো বজ্জাত, সবগুলো হাড় পাজি, চার জ্বর না হাতি, গা ছ্যাঁক-ছ্যাঁকও করছে না অথচ কম্বল চাপা দিয়ে পড়ে আছে—ওর তখনই বোঝা উচিত ছিল সব শয়তানী—বাপ শয়তান, ছেলেগুলোও শয়তানের ঝাড় ইত্যাদি।

কিন্তু সেই দিন থেকেই বৃন্দার মেজাজ আবার প্রসন্ন দেখেছেন অপর্ণা। আগের মতোই হেলে দুলে ওকে কাজ করতে দেখেছেন। তিনি হেসেছেন। কিন্তু ভিতরটা জ্বালা জ্বালাও করেছে।

গলা খাটো করে খানিকটা চাপা অভিমানের ঝাঁঝে বৃন্দা এবার বলল, বেহায়ার মতো নিজেই ছুটে এসেছে মায়ের কিছু দরকার আছে কি না তাই জানতে, দরকার হলে কাল ছুটিও নিতে পারে বলল, অথচ তোমার মেয়ের বিয়ে তুমি একটা মুখের কথা বলেও নেমন্তন্ন করলে না—আমার তো মান্যি বলে কিছু আছে।

অপর্ণা যথার্থই অপ্রস্তুত। ওর আঁতে লাগতেই পারে। ও সাধারণ ঝি নয়, এ-বাড়িতে ওর বাড়িতে একটু মর্যাদা আছে সকলে জানে। ধমকের সুরে অপর্ণা উলটে ওকেই বকলেন, তুই বাইরের মানুষ? আমাকে মনে করিয়ে দিবি তো—দেখছিস তো কান্ড, আমার মাথার ঠিক আছে!

ওকে মাথার কাপড় টানতে দেখে অপর্ণা ফিরে তাকালেন। পিছনের দিকে সমীরণ দত্ত দাঁড়িয়ে। পায়ে রবারের চপ্পল বলেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠার শব্দ কানে আসেনি। রাস্তার উলটো দিকে দুটো বাড়ির পরেই ওঁর ফ্ল্যাট। এমনি সাদাসিধে ভাবেই যাওয়া আসা করেন। আজ তো সকাল থেকে অনেকবারই যাওয়া আসা করছেন। খানিক আগে অপর্ণা তাঁকে নীচের বসার ঘরে দেওরদের সঙ্গে কথা-বার্তা কইতে দেখেছেন। তারাও চেনে তাঁকে। দাদার পুরনো বন্ধু, না চেনার কারণ নেই! যদিও সে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় কোনোদিন ছিল না। বরেন সোম ছিলেন সায়েন্সের ছাত্র আর উনি ফিলসফির। পড়াশুনার পর বরেন সোম ছুটেছেন চাঞ্চল্য বা বেগ আছে এমন কাজের সন্ধানে। মেধা অনুযায়ী কর্মজীবনে খুব সফল তাঁকে কেউ বলবে না। সমীরণ দত্ত এগিয়েছেন সাদাসিধে অধ্যাপনার দিকে। এখন তিনি ডক্টর সমীরণ দত্ত!

এদেশ ছেড়ে দর্শন শাস্ত্রের সর্ব-ভারতীয় সমাবেশেও তাঁর বিশেষ আমন্ত্রণ। বিয়ের পর একক সংসারে বছর দেড়েকের বেশি থাকা সম্ভব হয়নি বরেন সোমের পক্ষে। সকলে জানে অপর্ণার প্রভাবেই হয়নি। সে কথা যাক, তখন এখানে সমীরণ দত্তর ওই বাড়ির নীচের ফ্ল্যাটে এসে উঠেছিলেন তাঁরা। ফ্ল্যাটের খবর দেওয়া থেকে শুরু করে তখন উনিই সর্বব্যাপারে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছিলেন। সামনের এই বাড়িতে উঠে আসা হয়েছিল তার বছর কয়েক বাদে। অপর্ণার বিয়ে হয়েছিল সতেরোয়। বিয়ের এক বছরের মধ্যে মেয়ে এসেছে। সমীরণ দত্তর ফ্ল্যাটে যখন উঠে আসেন তাঁরা, সুপা তখন ছ'মাসের। প্রায়ই ভুগত মেয়েটা। অপর্ণার স্বাস্থ্য তখন খুব ভাল নয়। এ অবস্থায় শাশুড়ি আর ভাইদের থেকে পৃথক হয়ে আসার দরুন তাদের আনাগোনা খুব বেশি ছিল না। অনেক সময়েই তখন সমীরণ দত্তর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ভদ্রলোকের মা তখন কত সাহায্য করেছেন ঠিক নেই। মেয়ের ব্যাপারে অন্তত অপর্ণা সর্বদা তাঁর পরামর্শ মতো চলতেন। সে সময়ের চাকরিতে মাঝে মাঝে ট্যুরে বেরুতে হত বরেন সোমকে, তখন তো সমীরণ দত্ত আর তাঁর মা-ই বল ভরসা। শ্বশুরবাড়ির মানুষদের যাওয়া-আসা একেবারে বন্ধ ছিল না তা বলে। সমীরণ দত্তর সঙ্গে তখন থেকেই তাদেরও আলাপ-পরিচয়।

মাথায় কাপড় টেনে বৃন্দার হন হন করে চলে যাওয়ার ভঙ্গিটা সামান্য বিসদৃশ ঠেকল অপর্ণার চোখে। যদিও ওর চল নরম-সরম নয় কখনো। ... সোয়ামীকে তুচ্ছ করা হয়েছে ভেবে হয়তো ওর মেজাজ বিগড়েছে। এ আলোচনায় বাধা পড়ল বলেও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে—যা হঠাৎ অপর্ণার এক এক সময় মনে হয়েছে ধীর ঠান্ডা এই স্বল্পভাষী ভদ্রলোকটিকে বৃন্দা যে কারণেই হোক মনে মনে খুব পছন্দ করে না।

...সেদিনও হয়েছিল, যে দিন রাত্রিতে অপর্ণার খুব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল, মেয়ে গেছিল শান্তিনিকেতন বেড়াতে, আর শোবার ঘরে শিয়রের কাছে একটা চেয়ারে বসে সমীরণবাবু তাঁর কপালে ঠান্ডা মলম ঘষছিলেন, যখন সীমু আর প্রশান্ত বড়দিকে দেখতে হাজির হয়েছিল। সমীরণবাবুর সুশ্রূষার সহজ মুখ সত্ত্বেও অপর্ণা একটু যে অস্বস্তি বোধ না করেছিলেন এমন নয়। কিন্তু এই মানুষের কাছে সেটা প্রকাশ হয়ে গেলেই সঙ্কোচ যেন। জানান দিয়ে শোবার ঘরে অবশ্য সমীরণবাবু হামেশাই আসেন। মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে শুনে দিব্বি নির্লিপ্ত মুখে কপালে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করেছেন। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজেছেন কী। তাকের ওপর রিলিফের বামের শিশিটা চোখে পড়ছে। সেটা নিয়ে একটা চেয়ার টেনে শিয়রের কাছে বসে মলম মালিশ করতে লেগে গেছেন। এর দরকার আছে কি নেই এ-প্রশ্ন যেমন জিজ্ঞাসা করেননি, এ-রকম সুশ্রূষা শোভন কি অশোভন সেই প্রশ্নও মনে আসেনি। মাঝে মাঝে তাকিয়ে অপর্ণাই বরং মানুষটার সেই নির্লিপ্ত মুখ দেখছিলেন।

...ঘরের কাজে দু-দু'বার এসে বৃন্দাও তখন ওই দৃশ্য দেখেছে। একবার না জেনে ঘরে ঢুকে পড়েছিল আর একবার কী কাজে এসেও দোরগোড়া থেকে ফিরে গেছল। তারপর থেকে দু'দিন পর্যন্ত তপতপে মুখ বৃন্দার। অপর্ণার মনে মনে রাগ হয়েছিল, কিন্তু মুখ ফুটে বৃন্দাকে কিছু বলতে পারেননি বা কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেননি। অবশ্য এই ভদ্রলোককে মনে মনে বৃন্দা যে খুব পছন্দ করে না

এ-রকম অনুমানের প্রত্যক্ষ কোনো কারণ নেই। কারণ, ভদ্রলোকের ভাল-মন্দ নিয়ে ও কোনো দিন একটা কথাও বলেনি। তবু এক এক সময় অপর্ণার এরকম মনে হয়—যেমন আজও হল।

বৃন্দা চলে যেতে মৃদু হেসে সমীরণবাবু জিজ্ঞাসা করলে, এ সময় মাথায় আবার নতুন করে কী হল?

প্রশ্নটার বক্র কৌতুক অপর্ণার কানে ঠিকই ধরা পড়ল। এই একজন ভিন্ন এ-রকম কথা আর কারো বলার সাহস নেই। হাসি মুখেই ভুরু কোঁচকালেন একটু—নতুন করে মানে, আমার মাথা প্রায়ই ঠিক থাকে না, এই তো?

জবাব না দিয়ে সমীরণ দত্ত আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সমস্যাটা কী এমন?

চাপা রাগে অপর্ণা বললেন, সমস্যা কী দেখতে পাচ্ছেন না, সমস্যা ছাড়া এক পা এগোনোর উপায় আছে। ... আদর করে আগের দিন থেকে এসে থাকার নেমন্তন্ন করা হয়েছে সকলকে, আমি কিছুই জানিনে। তাদের দোষ কী, তারা এসেছে, এখন সব দায় আমার।...লোকগুলো কোথায় থাকবে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে কিচ্ছু ঠিক নেই।

এ দায় কে তাঁর কাঁধে চাপিয়েছে বুঝে নিতে একটুও সময় লাগল না। একটু ভেবে সমীরণ দত্ত বললেন, থাকার ব্যাপারটা আমার ওখানে হতে পারে, ছেলেদের সব আমার ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিতে পারো, কিন্তু খাওয়া দাওয়া—হরিকে নিয়ে একবার বাজারে ঘুরে আসব?

রাগের মুখেও অপর্ণার হাসিই পেল। টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও যাঁর খাওয়া দাওয়ার ঠিক-ঠিকানা নেই, সর্বব্যাপারে একমাত্র ভরসা চাকর হরিদাস—সময় মতো দিলে খাবেন নয়তো মুখ শুকিয়ে অপেক্ষা করবেন—তাঁর এই প্রস্তাব। এর মধ্যে অপর্ণার অনেকবার নীচ-ওপর করতে হয়েছে, চোখাচোখি হতে ভদ্রলোক উতলা হয়ে নিঃশব্দে তাঁকে লক্ষ্য করেছেন। অপর্ণার মনের অবস্থা একমাত্র এঁরই চোখে ধরা পড়েছে। এবারে ফাঁক পেয়ে উঠেই এসেছেন যদি কিছু কাজে লাগতে পারেন। একলা এত বড় একটা দায়িত্বের বোঝা নিয়ে অপর্ণা ভিতরে ভিতরে হাঁপিয়ে উঠেছেন তাও অনুভব করেছেন।

গম্ভীর মুখ করেই অপর্ণা জবাব দিলেন, তা হলে মন্দ হয় না, বৃন্দাকে বলি বাজারের থলেটলেগুলো আপনার হাতে দিয়ে যেতে। কিন্তু বাজারটা কোন্ দিকে আপনার জানা আছে, না সে বাজার কাল সকালের আগে পৌঁছুবে?

এ-রকম টিপ্পনীরও একটা মজার হেতু আছে। তখন ভদ্রলোকের মা জীবিত আর আপর্ণারা তাঁদের একতলার ভাড়াটে। ওই মা কী এক ব্রত পালন করবেন। পুরনো চাকর হরিদাস তখন দেশে, বাড়িতে নতুন চাকর। মা ছেলের কাছে ব্রত-উপচারের ফর্দ ধরে দিলেন—সব দেখেশুনে মিলিয়ে আনতে হবে। মায়ের হুকুম, অতএব দ্বিরুক্তি না করে বেরুলেন। কিন্তু বেলা দেড়টা বেজে যায় ছেলের ফেরার নাম নেই। বড় জোর এক-দেড় ঘণ্টার কাজ, সেখানে সাড়ে চার ঘণ্টা কাবার। দুশ্চিন্তায় মায়ের মুখ কাঁদ-কাঁদ। সেটা আবার কলেজের দিন, সওদা নিয়ে ছেলে কলেজেই চলে গেল কি না কে জানে। ঘেমে নেয়ে বেলা দুটোর পর কুলির মাথায় বোঝা চাপিয়ে হাজির। দেরির কারণ যা দর্শালেন শুনে অপর্ণা হেসে বাঁচেন না। প্রথমে তো এক প্রবাসী সতীর্থের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে কেনাকাটা শুরু হতেই দেড় ঘণ্টা দেরি। তারপর শুরু করে দেখেন কোন্ বস্তু কোথায় মিলতে পারে সে-সম্পর্কেই কোনো ধারণা নেই। ফলে কুলিকে জিজ্ঞাসা করে করে এক জায়গায় পনেরো মিনিটের সওদাই পাঁচ বারে পাঁচ জায়গা থেকে কিনতে দিন কাবার। তার ওপর লিস্টও দাগ দিতে ভোলার ফলে কয়েকটা বস্তু দু'তিন বার করেও কেনা হয়ে গেছে। দোষ কুলির ঘাড়ে চাপিয়েছেন, তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন কেনা হয়েছে কি না, ও মুখ্যু ব্যাটা বলতেই পারে না—

দুশ্চিন্তার বদলে অপর্ণার এই হাসি মুখ আর হালকা কথা শুনে ভালো লাগল। হাসি মুখেই সমীরণ দত্ত জবাব দিলেন, তা প্রায় ঠিকই বলেছ, কিন্তু আমি কিছু করব তো, নাকি চুপচাপ তোমাকে এ-রকম মাথা খারাপ করতে দেখব! এক-এক সময় দেখছি কথা বলতেও হাঁপ ধরে যাচ্ছে তোমার!

অপর্ণার দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপর থমকালো একটু। অনেক দিনের অভ্যস্ততা সত্ত্বেও বুকের তলায় একটু মোচড় পড়ে বইকি। — কার মেয়ের বিয়ে, অথচ কে এভাবে চিন্তা করছে। চিন্তা যার করার কথা সব ছেড়ে সে এখন শুধু তাঁকে জব্দ করার ফিকিরে আছে। কাটুক, কালকের দিনটা ভালয় ভালয় কেটে যাক, এই নিস্বতার জবাব তিনি সেই একজনকে দেবেন। নিজের এই দিনের সহিষ্ণুতার পাহাড় এরপর যদি ধসেও যায় একেবারে, তাতেও নিজেকে দুষবেন না তিনি। বললেন, কিছু করে কাজ নেই, মাথা আমার একটুও খারাপ হয়নি, আর অতবার করে ওপর নীচ করতে হলে হাঁপ একটু ধরবেই। আপনি নীচে গিয়ে বসুন, নয়তো নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি গিয়ে জিরোন—

অপর্ণার দু-চোখ হঠাৎ তাঁকে ছাড়িয়ে কেন যে সামনের দিকে প্রসারিত হল জানেন না। তারপরেই আর এক প্রস্থ থমকালেন। সামনের বারান্দা ধরে ডানদিকের একটা ঘর ছেড়ে পরের ঘরটার দরজার আধখানা আড়ালে মেজ ননদ আর ছোট ননদ দাঁড়িয়ে এদিকেই চেয়ে আছে। ওদের চোখে-মুখে চাপা কৌতূহল কি চাপা উদবেগ ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারলেন না।

সমীরণবাবু নীচে নেমে গেলেন। অপর্ণা সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে থামলেন। বৃন্দার স্বামী নিরঞ্জনকে বলা হয়নি, বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামাটা ওই দুই ননদ কী চোখে দেখবে ঠিক নেই। নিজের ওপরেই মহা বিরক্ত অপর্ণা। এই দিনটা কেটে গেলেই দুনিয়ার আর কারো পরোয়া করেন না, কে কী ভাবল তাতে কী এসে গেল! কিন্তু এই দিনটা কাটলে, তার আগে নয়। তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সুপার জন্যে তাঁর হাত-পা বাঁধা। ননদদের দিকেই তাকালেন আবার, সেখান থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, বলবে কিছু?

ধীরা এগিয়ে এলো। সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করল, উনি সমীরণবাবু না—?

অন্য সময় বা অন্য দিন হলে অপর্ণা দিতেন না। শুধু চেয়ে থাকতেন মুখের দিকে। জবাবের থেকে সেটা আরো ঢের বড় করে খোঁচা দিত। ধীরার সহজতায় তাতেই চিড় খেত। এই লোককে নিয়ে অর্থাৎ সমীরণ দত্তকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে যে একদিন অনেক জটলা হয়ে গেছে জানেন। এখনো গলার স্বর বার করে জবাব দিতে পারলেন না, মুখের দিকে চেয়ে থেকে সামান্য মাথা নাড়লেন শুধু।

ধীরা বলল, ভদ্রলোকের এরই মধ্যে দিব্বি বয়েস বেড়ে গেছে দেখি, মাথার চারদিকের চুলে পাক ধরেছে।

এই ব্যস্ততার দিনে এটা কোনো আলাপ বা আলোচনার বিষয় নয়। অপর্ণা ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। এর থেকে ধীরা যদি তার মনের কথাই ব্যক্ত করে ফেলত, যদি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করত, ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার ভাব-সাব কেমন গো বউদি এখনো—তার মধ্যেও সরলতা দেখতে পেতেন অপর্ণা। তার বদলে কথাগুলো ঘোর-প্যাঁচের মতো লাগল। জবাব দিলেন, বয়েস সকলেরই বাড়ছে, তাতে কী?

—না, অনেক দিন পরে দেখলাম তো...আচ্ছা, দাদা সেই থেকে কোথায় ডুব মারল বলো দেখি?

মুখের দিকে তাকিয়ে ভিতরের দিকটা অপর্ণা অনেকখানি দেখতে পান আজকাল। দেখতে পাচ্ছেন। ... ছোট ননদ সেই সকালে এসেছে, বোনের মুখ থেকে ধীরা এতক্ষণে কিছু সংশয়ের আভাস পেয়ে থাকবে। যে আনন্দ নিয়ে বর্ধমান থেকে ছুটে এসেছে তার ওপর সন্দেহের ছায়া দুলছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন অপর্ণা। ইচ্ছে হল মুখের ওপর বলে দেন, তোমার সন্দেহ মিথ্যে নয়, যা ভেবেছ তার সবটাই ভুল—তোমার দাদার আমি খবর রাখি না, রাখার দরকার মনে করি না। তিনি তোমাদের বাড়িতে ডেকে এনে মজা দেখছেন। বাড়িতে না থাকলেও তাঁর মজা দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না। বলা সম্ভব নয়। জবাব দিলেন, আমাকে বলে যাননি—

আর কিছু বলা বা শোনার অপেক্ষা না রেখে অপর্ণাই আগে সোজা নীচে নেমে এলেন। কানের দু-পাশ বেশিই গরম ঠেকেছে হঠাৎ। একটু জল দিতে পারলে ভাল হত। অথচ অপর্ণার এ-ও মনে হল, ওরা দু-বোন হয়তো কিছুই দেখছিল না, কিছুই ভাবছিল না। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ওই

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে দেখেই হয়তো ঘর থেকে বেরিয়ে না এসে অপেক্ষা করছিল। এবারে অপর্ণা সত্যিই রেগে উঠলেন। রাগটা নিজের উপর। দেখুক না দেখুক, ভাবুক না ভাবুক তাঁর তাতে কী? কী এসে গেল তাতে? তাঁর মাথা ঘামানোর বা কান গরম করার দরকার কী?

নীচে পা দিতেই সামনের বন্ধ ঘরের ওদিক থেকে চেনা-অচেনা মেয়েদের গলার কলরব কানে এলো। বন্ধুদের নিয়ে সেই থেকে সুপা দরজা বন্ধ করেছে। কেউ একজন হালকা চটুল গান গাইছে, আর তালে তালে মেয়েরা হইহই করছে। অপর্ণা এ-ধারের জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন একবার। গরম কান আরো গরম হয়ে উঠল। পাঁচ পাঁচটা মেয়ে ধিঙ্গি-পনা করছে—সকলের ওপর দিয়ে গলা উঠেছে ওই ঝুমুর মেয়েটার। সুপার ওই অন্তরঙ্গ বন্ধুটিকেই সব থেকে বেশি নির্লজ্জ ভাবেন অপর্ণা। হিন্দী সিনেমার চটুল গান ওই মেয়েটা গাইছে আর টেবিল চাপড়ে তাল ঠুকছে অন্য মেয়েগুলো। এই বিয়েতে ওই ঝুমুর মেয়েটারই আনন্দ বোধহয় সব থেকে বেশি, নিজের রাস্তা নিষ্কণ্টক ভাবছে এখন।

অপর্ণার এ-রকম ভাবার নিগূঢ় একটা কারণ আছে। মাস দুই আগে সুপা তরল আনন্দে তাঁকে এসে বলেছিল, তুমি তো বাবার সিংহ মশাইকে অত খারাপ বলো মা, আমাদের ওই ঝুমুর তার প্রেমে হাবুডুবু। তার কথা উঠলেই ও একেবারে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ শুনলাম, ঝুমুরের বাবা তাকে নেমন্তন্ন টেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছে আজকাল।

বাবার সিংহ মশাই অর্থাৎ বিকাশ সিংহ। ম্যাট্রিক পাসের পর যে ছেলে বরেন সোমের আপিসে কেরানিগিরিতে ঢুকেছিল। তখন দপ্তরী পিওনের মতোই আপিসের ফাইল নিয়ে এ বাড়িতে যাতায়াত করতে ছেলেটা। তার মুরুব্বির অর্থাৎ বরেন সোমের খাস চাকর যেন। চাকরি করতে করতে সেই ছেলে রাতে কলেজে পড়ে আই.এ, বি.এ. পাস করেছে আর একটা একটা করে আপিসের পরীক্ষাগুলোতেও পাস করে জুনিয়র অফিসার হয়েছে। বরেন সোমের এখন মহা সমাদরের পাত্র সে। আর ঠিক সেই কারণেই ছেলেটাকে অপর্ণা পছন্দ করেন না। সুপার বাপের মতলব বোঝার পর ওই ছেলের ওপর আরো কঠিন হয়েছেন তিনি। আর ছেলেটারও আস্পর্ধা কম না, বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা। ... দু'জনেরই আশা বরবাদ করে দিয়েছেন তিনি।

ঝুমুরের বাবা বরেন সোমের আপিসে অন্য বিভাগের অফিসার। নিজের মেয়ের যোগ্য যদি ভেবে থাকেন ওই ছেলেকে, অপর্ণার রাগের কোনো কারণ নেই। অথচ সুপার মুখে ওই কথা শুনে রাগ হয়েছিল। ঝুমুর আর ঝুমুরের বাপ দুজনকেই খেলো ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই নিজের রাগের হেতু বুঝতে পারতেন। বিকাশ সিংহ ছেলেটাকে তিনি পছন্দ করেন না তার একমাত্র কারণ ঘরের লোক তাকে পছন্দ করে। তাঁর পছন্দ করা ছেলেকে শুধু অপর্ণা নয়, দুনিয়ার সমস্ত লোকেই বাতিল করলে তিনি বোধহয় খুশি হতেন।

সুপার সেই কথা শুনে আর অত হাসি দেখে তিনি গম্ভীর ঝাঁঝে বলেছিলেন, যে খুশি প্রশংসা করুক আর যে-খুশি নেমন্তন্ন করে খাওয়াক, তোর তাতে কী?

—বা রে আমার আবার কী, ঝুমুর ভাবে আমি ওর পথ আগলে আছি, তাই আমাকে শোনায়।

অপর্ণার আরো বিরক্তি, ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলেন, ঝুমুর ভাবে কেন, রঞ্জনের কথা ও জানে না?

—কি মুশকিল, মজার দিকটা মা বুঝতে পারছে না বলে সুপাও আধা বিরক্ত, আমাকে নিয়ে তো ঝুমুরের ভাবনা নয়, ওর ভাবনা তো সিংহ মশাইকে নিয়ে—সে ছেলে তো এখনো আশা করছে আমার আর তোমার মত বদলাবে।

গম্ভীর চাউনিটা কি এক প্রচ্ছন্ন সংশয়ে একটু ধারালো হয়ে উঠেছিল অপর্ণার। মেয়ের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করেছেন, আশা করছে তুই জানলি কী করে, তোকে বলেছে?

সুপার ফাঁপরে পড়ার দাখিল।—বাঃ, বাড়িতে বাবার কাছে হরদম আসছে যাচ্ছে এখনো, কে না বোঝে—

এর কিছুদিন আগেও মেয়ের ওপর বিষম রেগে গেছলেন অপর্ণা। মেয়ে রাত ন'টার পর বাড়ি ফিরতে কোথায় গেছল জেরার ফলে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। প্রকাশ হত না, যদি না রঞ্জন সেদিনই সন্ধ্যায় ওর খোঁজে বাড়িতে আসত। অপর্ণা ধরে নিতেন, রঞ্জনের সঙ্গেই মেয়ে হুটহাট করে বেড়াচ্ছে

কোথাও। অপর্ণার সুবিধে মেয়েটার পেটে কথা থাকে না, একটু নাড়াচাড়া করলেই বেরিয়ে পড়ে। সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে কোথায় গেছল জিজ্ঞাসা করতে জবাব দিয়েছিল, সিনেমায়। এমন চোরের মুখ করে বলেছিল যে তাইতেই সন্দেহ আরো বেড়েছিল অপর্ণার। এমনিতে ছ'টা-নটা সিনেমা দেখাটা মেয়ে একটুও অপরাধ মনে করে না। তাই কঠিন মুখ করেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর কে গেছল, কার সঙ্গে গেছলি?

সেই মুখ দেখেই সুপার ধারণা হয়েছিল মায়ের কাছে গোপন নেই কিছু, তাই মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করেছিল, বলেছিল, আমি কী করব ঝুমু বলল একেবারে তিনখানা টিকিট কেটে এনে হাজির হয়েছে বেচারা, টাকাগুলো নষ্ট হবে, চল্ যাই—

টিকিট যে বিকাশ সিংহ কেটে এনেছে অপর্ণা তক্ষুনি বুঝেছিলেন। মেয়েটার স্বভাব দেখে ঘেন্না ধরে গেছল তাঁর সেদিন। আর পরের ওই দিনও ঝুমুরের প্রেমে পড়ার প্রসঙ্গে নিজের মেয়ের সেই হাসি আর কথাগুলো চোখে কানে যেন ঙ্গুলো ধরিয়ে দিয়েছিল। বিকাশ এখনো সুপার আর তার মায়ের মত বদলাবার আশায় আছে, সেই আশা নিয়ে তখনো হরদম বাড়িতে আসে, এ-সব গল্প বন্ধুদের কাছে সুপা নিজে না করলে ঝুমুর জানল কী করে। সুপাই যে সে-গল্প করেছে তাতে কোনো ভুল নেই, ও-কথা বলে বন্ধুকে নিজের কদর বুঝিয়ে দিয়েছে। নিজের মেয়ে বলে কি চোখ বুজে আছেন অপর্ণা, তার গুণপনা জানেন না, স্বভাব জানেন না? আসলে ও পছন্দ করুক না করুক পাঁচটা ছেলে ওকে পছন্দ করুক আর ওর জন্যে বুক চাপড়ে বেড়াক—এই চায়। চাইবে না, যে বাপের মেয়ে।

আজ আবার ওই ঝুমুরের গলায় তরল হিন্দী গান শুনে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল তাঁর। মেয়েগুলো সবই বেহায়া আজকালকার। ওই গান আর ওই সুর গলা দিয়ে বার করার আগে গলা বুজে যাবার কথা। আসতে যেতে ঝি-চাকর পর্যন্ত শুনছে। সেই সঙ্গে নিজের মেয়ের ওপরও রাগ হল। খুশি হয়েছিস ভালো কথা তা বলে এত হইচই করে সেটা জানান দেবার কী আছে! তোর সুখের জন্য মা এত সব একা করছে জেনেও তো কাছে থেকে সাহায্য করতে পারিস।

হঠাৎই বাইশ বছর আগের একটা দিন যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল তাঁর। লোক ঠাসাঠাসি বাড়ি, এর চারগুণ জমজমাট। সকলে ব্যস্ত, সকলে হইহই করছে। তার মধ্যে কেবল সতেরো বছরের একটা মেয়ে, যার নাম অপর্ণা, বলতে গেলে সেই সকাল থেকে কেঁদে সারা! অত বড় বাড়িতে মন ভরে একটু কাঁদার মতোও নিরিবিলি জায়গা পাওয়া ভার। একটু কাঁদার জন্যে মেয়েটা একবার এ-কোণে যায় তো আর একবার ও-কোণে।

সতেরো বছরের সেই মেয়ের মনে তখন ভয়, আর তার থেকেও বেশি বাবা-মায়ের প্রতি অভিমান। ভয়ের থেকে অভিমানই বেশি। কান্নার আবেগ সেই জন্যেই আরো বেশি। সবে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে, কলেজেও ভর্তি হয়নি তখন পর্যন্ত। এরই মধ্যে বিয়ে দিয়ে মেয়ে পার করার জন্যে বাবা-মা ব্যস্ত। কি না, ছেলের কোন্ এক মাসির মেয়েটাকে বড় ভাল লেগেছিল। তাদের বাড়িতে ওই মহিলার যাতায়াত ছিল, আর তার মাথায় এই অভিসন্ধি ছিল জানলে সেই মেয়ে তার ভাল লাগাটা বরবাদ করে দিত। কিন্তু তখন নেহাতই সরল ছিল মেয়েটা। ভাল লাগার কারণ পরে বুঝেছে, আর বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে আরো ভালো বুঝেছে। ... অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে ছেলের মতি-গতি শুধরাতে চেয়েছিল তার বাবা-মা। তাদের হয়ে টোপটা ফেলেছিল ওই মহিলা, অর্থাৎ ছেলের মাসি।

কিন্তু মেয়ে ছেড়ে মেয়ের বাবা-মাও সেদিকটা ভাবেনি। তাদের মেয়েকে কোনো পাত্র-পক্ষের এত ভাল লেগেছে শুনেই বিগলিত তারা। তাদের মেয়েকে কেউ সুন্দরী না বলুক, সুশ্রী বলে সকলে। তবু সাত তাড়াতাড়ি মেয়ে পার করার জন্য বাবা-মা যেন মহাব্যস্ত। ছেলে তখন সদ্য এম.এস-সি পাস করে কোন্ এক জুনিয়র সার্ভিসে ঢুকেছে, প্রোবেশনারি পিরিয়ড শেষ হলেই অফিসার হয়ে বসবে। বাবা-মায়ের কাছে সেটাই যেন মস্ত আকর্ষণ, নইলে অবস্থার বিচারে মেয়ের বাড়ির অবস্থা ছেলের বাড়ি থেকে যে ঢের বড় সে কথা অনেকের মুখেই শোনা গেছে। বড় অবস্থা জেনে ছেলের বাবা-মা দাবির খসড়াটাও ছোট করে করেনি। বলেনি, মেয়ে মনে ধরেছে, মেয়ে নিয়ে যাচ্ছি, যা খুশি

দাও...প্রথম জীবনে মেয়ের বাপ সামান্য চাকরি করতেন। সে অবস্থায় সন্তুষ্ট না থেকে ধার-দেনা করে এক বন্ধুর সঙ্গে বখরায় একখানা লরি কিনেছিলেন। সেই একখানা লরি চারখানায় এসে ঠেকতে বন্ধুর পরামর্শে প্রৌঢ় বয়সে চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি ব্যবসায় নেমে পড়েছিলেন। তারপর আরো সুদিন এসেছে। কিন্তু মাঝবয়েস পর্যন্ত চাকরি করার দরুন হোক বা যে কারণেই হোক ডিগ্রি আর বড় চাকরির প্রতি কিছু মোহ বোধ হয় বাবার ছিলই। নইলে সতেরো বছরের মেয়ে পার করার জন্য হয়তো এত ব্যগ্র হয়ে উঠতেন না।

এ সবই অপর্ণা অনেক পরে ভেবেছেন—সেই বিয়ের দিনে নয়। বিয়ের পর থেকে দিনের পর দিন ভেবে ভেবে মাথার কী অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তিনিই জানেন। আজ নিজের বিয়ের সেই দিনটা তাঁর চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল মেয়ের তুলনায় তাঁর সেদিনের মানসিক অবস্থাটা স্মরণে আসতে। বাবা-মায়ের ওপর অভিমান ছাড়া বিচ্ছেদের বেদনাও তাঁর কাছে সেদিন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ... দিন বদলেছে সবাই জানে, আর সুপারও সতেরো বছর বয়েস নয়—তা বলে এতটা কেন!

এদিকে চলে এলেন। সামনের বাঁধানো ছোট উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের সামনে থমকে দাঁড়ালেন আবার। চৌকাঠের ওধারে বরেন সোম দাঁড়িয়ে। তাঁর সামনে মেঝেতে অনেক মাছ আর একরাশ আনাজ-পাতি। স্মরণীয় কালের মধ্যে তাঁকে রান্নাঘরে এসে দাঁড়াতে দেখেছেন বলে অপর্ণার মনে পড়ে না। অদূরে ওই মাছ আর আনাজপাতির দিকে চেয়ে ঈষৎ বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে আছে বৃন্দা। তার পিছনে ওর স্বামী নিরঞ্জন। এদিকে বুড়ো রাঁধুনি বামুনের পাশে আর একটা কে লোক দাঁড়িয়ে।

কাউকে কিছু বলতে হল না। অপর্ণা এক নজর তাকিয়েই সব বুঝে নিলেন। অর্থাৎ কর্তা নিজে বেরিয়ে বাজার করে এনেছেন, কারো মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেননি। ওই অচেনা লোকটাকেও রান্নার কাজের জন্যেই আনা হয়েছে মনে হয়, কারণ ফতুয়ার ভিতর দিয়ে তার পৈতা দেখা যাচ্ছে। এই বুড়ো রাঁধুনির মারফত ব্যবস্থা করা হয়েছে হয়তো, নইলে বৃন্দা অন্তত জানত।

বরেন সোম ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকালেন একবার। কিন্তু অপর্ণার খরখরে দৃষ্টি তখন বৃন্দাকে ছাড়িয়ে বৃন্দার স্বামীর দিকে। এই ঘরে যেন আর কিছুই তাঁর লক্ষ্য করার নেই। বললেন, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম নিরঞ্জন, আজ থেকেই তুমি এখানে থেকে যাও, কাল তোমার অনেক কাজ—

নিরঞ্জন কৃতার্থ হয়ে মাথা নাড়ল।

আর শোনো, এই সঙ্গে অপর্ণা সমস্ত ত্রুটি শুধরে নিতে চাইলেন, তোমার ছেলে ছেলের বউ মেয়ে সক্কলের কাল নেমন্তন্ন রইল, তুমি আমার হয়ে তাদের বোলো।

বৃন্দা খুশি, কিন্তু বাবু সামনে বলে বিড়ম্বিতও। নিরঞ্জন আবার যথাসম্ভব মাথা নোয়ালো।

ঠান্ডা মুখে বরেন সোম পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। এই লোকগুলো না থাকলেও অপর্ণা তাঁর দিকে ঘুরে তাকাতেন না এবং পরেও ঘুরে দেখতেন না। ... ওই লোক তাঁর ভাইবোন বন্ধু-বান্ধবের নেমন্তন্ন পর্ব নিজে সেরেছেন, আর অপর্ণার দিকেরটা অপর্ণা। কোথায় কাকে বলা হল না হল কেউ খবর রাখেন না। তার মধ্যে বৃন্দার পরিবারবর্গকেও যে অপর্ণা আত্মজন ভাবেন সেটা বুঝিয়ে দেওয়া গেল।

তবে নেমন্তন্ন নিয়ে যে তাঁদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি এমন নয়। চারদিন আগে অপর্ণাই তাঁর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, কেটারার এসেছে, কত জনের ব্যবস্থা তাঁকে আজই জানিয়ে দিতে হবে—তুমি কতজনকে বলেছ?

জিজ্ঞাসা না করাটাই যে অস্বাভাবিক হবে সেটুকু বোঝার মতো স্থির বুদ্ধির অভাব অপর্ণার হয়নি। বরং ওই একজনই যেন এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। একটু চিন্তা করে বরেন সোম পালটা প্রশ্ন করেছেন, বরযাত্রী কত জন হবে?

ঈষৎ বিরক্ত মুখে অপর্ণা জবাব দিয়েছেন, সে হিসেব আমার জানা আছে—তোমারটা বাকি। অর্থাৎ অকারণে একটা বাড়তি কথা বলারও ইচ্ছে নেই তাঁর সেটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আবার একটু চিন্তা করে বরেন সোম আমন্ত্রিতের সংখ্যা বলেছেন। শুনে অপর্ণার ভুরুর মাঝে দুই-একটা কুঞ্চন রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই সংখ্যা তিনি ভাবতে পারেননি। শহরের সব থেকে নামী কেটারারের মারফত আহার সরবরাহ এবং পরিবেশনের ব্যবস্থা। সমীরণবাবু এই ব্যবস্থা বাতলে দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু কেটারার ধরার দরুন মাথাপিছু খরচা অনেক। তার মধ্যে এ-রকম একটা সংখ্যা শুনলে কারো খুশি হবার কথা নয়। কিন্তু অপর্ণা এ নিয়ে কোনোরকম বাদানুবাদ করেননি। আর একটি কথাও না বলে চলে এসেছিলেন এবং অর্ডার যা দেবার দিয়েছিলেন।

বরেন সোম চলে যেতে বৃন্দার জিভ নড়ল। —দেখো বাবুর কান্ড, মনে মনে ব্যবস্থা করেই রেখেছেন আমি কি জানি!—কিন্তু এলোমেলো এত সব তরকারি, কী দিয়ে কী হবে?

বিরক্তি চেপে অপর্ণা জবাব দিলেন, যা খুশি কর্‌গে, আমি জানি না।

ফিরলেন। কানের দু'পাশে এক্ষুনি জলের হাত বোলানো দরকার, কিন্তু বৃন্দার সামনে সেটা পারা যাবে না। ও জানে কখন মায়ের কান-মাথা গরম হয়।—সাত জন্মে যা করে না তাই করে বাহাদুরি দেখানো হল, নিজে গিয়ে বাজার করে আসা হল। যেন ওইতেই সব উদ্ধার হয়ে যাবে।

অপর্ণার এত তিক্ত-বিরক্ত হবার আরো কারণ আছে। একমাত্র গয়নার টাকা ভিন্ন এ পর্যন্ত যাবতীয় খরচ তিনিই করে চলেছেন। নিজে অবশ্য সবটুকুই করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তিনি, এখনো আছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা যখন করা হয়েছিল তখন ওই লোক লম্বা কথা বলেছিলেন। এদিকে আজ বাদে কাল বিয়ে, খরচার ব্যাপারে একেবারে মুখ শেলাই করে বসে আছে। এখন বিশ-পঞ্চাশ টাকার বাজার করে এসে মস্ত বাহাদুরি!

তিন

হ্যাঁ, এই বিয়ে নিয়ে দুজনের মধ্যে খুব স্পষ্ট কথা আরো হয়ে গেছে। এ বিয়েতে বরেন সোমের একটুও মত ছিল না সেটা মা-মেয়ে দুজনেরই খুব ভাল করে জানা আছে। কারণটাও। বাপের ইচ্ছে ছিল মেয়ের বিয়েটা আর একজনের সঙ্গে হোক—সেই তাঁর একান্ত অনুগত এবং প্রীতির পাত্র বিকাশ সিংহের সঙ্গে। এখনো সে বরেন সোমের অধীনেই কাজ করে। তাঁর সঙ্গে ট্যুরে যায়, বাড়িতে এসেও আফিসের দরকারি কাজ-কর্ম নিয়ে বসে যায়। দু-দুটো ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় পাস করার পর সাধারণ করণিক থেকে জুনিয়র অফিসার হয়েছে, সেই থেকে ছেলেটা বরেন সোমের প্রিয়পাত্র এবং প্রীতির পাত্র। তাঁর ধারণা ওই ছেলে কালে দিনে আরো অনেক উন্নতি করবে। সে-কথা সুপাকে তিনি মুখ ফুটে বলেছিলেন।

অফিসার হবার পরেও ছেলেটাকে অত ঘন ঘন বাড়ি আসতে দেখে সেই সঙ্গে কিছু সূক্ষ্ম আচরণ দেখে অপর্ণার মনেই প্রথম সন্দেহের আঁচড় পড়েছিল।

গোড়ায় যখন আসত ওর দিকে চোখও পড়ত না। কেরানিগিরি যে করে তাও পরে জেনেছিলেন, আগে ভেবেছিলেন দপ্তরী পিওন হবে। একেবারে ছেলেমানুষ তখন, চাকরি করার বয়সই না। সুপা তখন ফ্রক পরে, আর স্কুলের ক্লাস সেভেনে পড়ে। ছেলেটা যে তলায় তলায় সেয়ানা আছে সে-রকম আভাস অপর্ণা মাঝে সাজে পেতেন। কারণ, সুপা এসে ওর নামে নালিশ করত। কারো চোখে না পড়লে ওর সঙ্গে খুনসুটি করতে ছাড়ত না। একবার নাকি সুপা ওকে ভ্যাবাগঙ্গারাম বলেছিল আর তার ফলে ও আর একদিন ওকে আধ ঘণ্টা হাতে ধরে আটকে রেখেছিল। অপর্ণা সেদিন বাড়ি ছিলেন না, আর বিকাশকে বসিয়ে রেখে সুপার বাবাও খানিকক্ষণের জন্যে বেরিয়েছিলেন কোথায়। সেই ফাঁকে আটকে রেখে ছেলেটা ভ্যাবাগঙ্গারাম বলার শোধ নিয়েছিল। মেয়েটা অবশ্য তখনো দুষ্টুই ছিল। ওই হেনস্থা করার পর ওকে দেখলেই দূর থেকে জিভ ভেঙাতো, ভ্যাবাগঙ্গারাম, হাঁদারাম এ-সব বলে পালাতো। অপর্ণার চোখে পড়লে বা কানে এলে মেয়েকে বকতেন। একদিন শুনেছিলেন নিরাপদ

ব্যবধানে দাঁড়িয়ে মেয়ে ওকে বলছে, এই বাবার ফাইল টানার মতো আমারও বইপত্র নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দেবে আর নিয়ে আসবে? মা-কে বলে তোমার কিছু মাইনের ব্যবস্থা করে দেব।

মেয়েকে সেদিন ভালোরকমই শাসন করেছিলেন অপর্ণা। মেয়ের স্বভাব খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলেই শাসন করেছিলেন, ছেলেটার কথা তেমন ভাবেননি।

সুপা যখন ক্লাস টেনে না ইলেভেন পড়ে তখন একবার ওই ছেলের ওপর বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি। সুপার তখন নাচে বেশ নামডাক। এখানে সেখানে নাচতে যায়। লোকের প্রশংসায় সর্বদা ডগমগ ভাব। ধরাকে সারা দেখছে। মেয়ের সেই সময়ে চাল-চলন হাব-ভাবের পরিবর্তন দেখে ভিতরে ভিতরে ওর জন্যে উতলা তিনি একটু। নাচের নাম শুনলেই সেখানে ছোটার জন্য পা উঁচিয়ে আছে। বাধা দিতে গেলে রাগারাগি চেঁচামেচি করে। আশপাশের অনেক ছেলে ওর সঙ্গে ভাব করার জন্য উসখুস করে। শাসন করে আর উপদেশ দিয়েও মেয়েকে সব সময়ে সামলে রাখতে পারেন না।

আবার বেশি বললে মেয়েও মুখে মুখে জবাব দেয়, ছেলেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুটো কথা কইলে কী হয়েছে?

সেই সুপাই একদিন চোখ-মুখ লাল করে এসে বলল, মা বাবার ওই সিঙ্গীর বড় সাহস বেড়েছে, আমার সঙ্গে লাগতে এলে ভালো হবে না বাবাকে আমি স্পষ্ট বলে দেব। আর বাবা যদি কিছু না বলে তো আমি একদিন মেরেই বসে থাকব বলে দিলাম।

অত রাগের হেতু শুনলেন। সুপা তার দুজন বন্ধুর সঙ্গে নাচের স্কুল থেকে ফিরছিল। তখন ওই ছেলের সঙ্গে দেখা। সুপার ধারণা ইচ্ছে করেই ছেলেটা তখন ও-জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে আঙুল তুলে ডাকল। সুপা ভেবেছিল কোনো দরকারি কথা আছে, বন্ধুদের দাঁড় করিয়ে কাছে আসতে বলল, আমাকে একদিন নাচ দেখাবে তোমার?

না, সুপার তখনো রাগ হয়নি। নাচ দেখতে চাইলে রাগ করার কী আছে। তবু এভাবে রাস্তায় আঙুল তুলে ডেকে বলার দরকার কী—বাড়িতে বললেই হত। সুপা বলেছে, আবার কোনো ফাংশন এলে জানাব।

তার জবাবে সেই ছেলে নাকি বলেছে, ও-সব ফাংশনের নাচ-টাচ দেখতে চায় না। পয়সা খরচা করলেও তো আরো ঢের ভালো নাচ দেখা যায়। বাড়িতে ওকে একলা নাচ দেখাতে হবে—বাবা-মা বাড়ি থাকবে না এমন কোনো দিন। রাগ করে সুপা বলেছে ও রকম নাচ দেখতে হলে তপস্যা করতে হবে। এত সাহস যে তখনো হেসে হেসে ওই ছেলে জিজ্ঞাসা করেছে, এত তপস্যা করছি টের পাও না? আর কী রকম তপস্যা করতে হবে বলে দাও। রাগের মাথায় সুপা তখন আবার তাকে ভ্যাবাগঙ্গারাম বলেছে, আর তাই শুনে ওই ছেলেও ওকে ভয়ানক অপমান করেছে। এগিয়ে গিয়ে ওর বন্ধুদের বলেছে, তোমরা চলে যাও, সুপা আমার সঙ্গে বাড়ি যাবে। বন্ধুরা অবাক হয়ে চলে যাচ্ছে দেখে সুপা তাদের কাছে ছুটে আসছিল, কিন্তু তার আগেই খপ করে তার হাত ধরে ফেলে ওই ছেলে কম করে একশো দেড়শো গজ একরকম জোর করেই বাড়ির দিকে টেনে এনেছে। সুপা ওকে মায়ের নাম করে শাসিয়েছে, তবু ছাড়েনি। রাস্তার কত লোক যে দেখেছে ঠিক নেই—তখনো ও দাঁত বার করে হেসেছে আর বলেছে, রাগ করলে হাত ছাড়বই না, লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপচাপ সঙ্গে এলে হাত ছেড়ে দেব।

শুনে অপর্ণাও দস্তুরমতো রেগেই গেছলেন। মেয়েদের সেটা এমনই একটা বয়েস যে সামান্য ব্যাপারেও মায়ের মন আপনা থেকেই সজাগ সচেতন হয়ে ওঠে। তাছাড়া এত সাহস তিনি কল্পনা করতে পারেন না। ও ছেলে এরপর বাড়ি এলে তার মুরুব্বির সামনেই আচ্ছা করে ধমকে দেবেন ঠিক করেছিলেন।

সে সুযোগ অবশ্য মেলেনি। তার দুই-একদিনের মধ্যেই সুপার কী একটা শক্ত অসুখ হয়ে পড়ল। মেয়ের বাপ তখন মফঃস্বলে আর সমীরণবাবুও তখন বাইরে কোন্ হিস্ট্রি কনফারেন্সে যোগ দিতে চলে গেছেন। ওই বিকাশ সিংহ তখন নিজে থেকেই এসে অনেক করেছে—ছুটোছুটি করে ডাক্তার এনেছে, তাকে খবরাখবর দিয়েছে, ওষুধ-পত্র এনেছে। সবই অনুগত পরিচারকের মতো করেছে। রাতে

থাকতেও চেয়েছিল কিন্তু অপর্ণার অতটা দরকার মনে হয়নি। যাই হোক, অপর্ণা সেবারের মতো ওকে ক্ষমা করেছেন।

দৃষ্টিকটু রকমের পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল বিকাশ সিংহ জুনিয়র অফিসার হয়ে বসার পর থেকে। তবে পোশাক-আসাক চাল-চলন বদলানো এটা স্বাভাবিক কথা। কিন্তু অপর্ণার মনে হল, দীন-দরিদ্রের ছদ্মবেশের খোলস ছেড়ে ছেলে যেন রাতারাতি রাজাবাদশার ছেলে হয়ে বসল। বাড়ির কর্তার আদর কদর দেখে মা-মেয়ের সে-রকমই মনে হতে লাগল। অথচ অপর্ণার সামনাসামনি পড়ে গেলে ছেলের আগের থেকেও যেন সুবোধ বিনীত মূর্তি।

ছুটির দিনে ওই ছেলের এ-বাড়িতে অবধারিত পদার্পণ ঘটবে। আর তখন সুপার বাবা নানা অছিলায় মেয়েকে ঘরে ডাকবেনই। বাবার সেই কাণ্ড সুপার কাছে কখনো হাসির কখনো বিরক্তির ব্যাপার। ওকে ডেকে বাবা চা বা কফি দিতে বলবেন, এমন কি পড়াশুনা কেমন চলছে তাও জিজ্ঞাসা করবেন। নয়তো ঘরের মধ্যে নিজের দুই-একটা টুকিটাকি জিনিস খুঁজে দিতে বলবেন। বিকাশ সিংহর জুনিয়র অফিসার হবার সুখবরটা ওর সামনে অনেক আগেই সুপাকে দেওয়া হয়ে গেছে, যেন সুপার কাছেও সেটাও মস্ত সুখবর একটা। সেই উপলক্ষে ওকে একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, গৃহকর্ত্রী নির্লিপ্ত বলে সুপাকেই আতিথেয়তার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে, অর্থাৎ বাবা আর সিংহর সঙ্গে এক টেবিলে বসে আহার করতে হয়েছে। এক কথায় ছেলেটা অনেক দিন যাবৎ বাড়িতে আনাগোনা করলেও গৃহস্বামীর আচরণে পরিবর্তন দেখা গেছে সে জুনিয়ার অফিসার হবার পর থেকে।

হেতু বোঝার মতো বুদ্ধি মা মেয়ে দুজনেরই আছে। সুপা হেসেছে আর অপর্ণার মুখ রাগে থমথমে হয়েছে।

মেয়ে আর তখন ও-ছেলের নামে মায়ের কাছে নালিশ টালিশ করত না। তার চোখ উচ্ছল কৌতুক দেখতেন অপর্ণা। সেটাই তাঁর সব থেকে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ। ইতিমধ্যে সুপা এমন অনেক কান্ড করে বসেছে যার দরুন এই মেয়ে নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত নেই। এমন কান্ড হয়েছে যে তাঁর আহার-নিদ্রা ঘুচতে বসেছিল। অবশ্য সে-সব ব্যাপারের সঙ্গে ওই ছেলের কোনো সম্পর্ক নেই। আসল কথা মেয়ের স্বভাব-চরিত্রের ওপর তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। মেয়ের চোখে কৌতুক নেচে উঠতে দেখলেই মায়ের মনে অনাগত শংকার ছায়া পড়ে। চোখের অগোচরে ছেলেটাকে সুপা প্রশ্রয় দেয় কি না সে রকম সন্দেহও মনে আসে।

অফিসার হবার কিছুদিন বাদেই বিকাশ সিংহ একদিন নিরিবিলিতে ধরেছিল সুপাকে। তার আগে ক'দিন নাকি বলেছিল কথা আছে। তারপর ফাঁক পেয়ে বলেছিল, তোমাদের জন্য আমার এমন একটা উন্নতি হল আর তোমার একটুও আনন্দ হচ্ছে না?

ভালো মুখ করে সুপা জিজ্ঞাসা করেছে, আমাদের জন্যে মানে আমার আর বাবার জন্যে?

—তোমাদের জন্যে মানে তোমার আর তোমার মায়ের জন্যে।

—কী রকম?

—তুমি আর তোমার মা আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করতে না, সেই রাগে আমি আই.এ.বি. এ. পাস করে, ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় পাস করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিলাম।

পাজি মেয়ে সুপা তখন ঢং করে অর্থাৎ হাঁ করে নাকি তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বিকাশ সিংহ জিজ্ঞাসা করেছে, কী দেখছ?

বড় বড় চোখ করে সুপা ওকে দেখেছে, তারপর বলেছে—দেখছি না, মানুষ বলে গণ্য করতে চেষ্টা করছি।

—করা যাচ্ছে না?

—কী করে যাবে, মানুষ দেখতে গিয়ে বার বার সিংহ দেখে ফেলছি—খাঁচার সিংহ!

হেসে গড়িয়ে মাকে এই সমাচার শুনিয়েছে সুপা। অপর্ণা গম্ভীর। হাসা দূরে থাক, শুনে তাঁর গা জ্বলেছে। প্রথমেই মনে হয়েছে, বাড়ির মধ্যে সুপাকে নিরিবিলিতে ওই ছেলে পায় কী করে? আর

কথা আছে বললেও সুপা শুনতে যায় কেন? অফিসার হোক আর যা-ই হোক, ওই ছেলেকে দুটো কড়া কথা বলে অপর্ণা এখনো সমঝে দিতে পারেন। কিন্তু নিজের মেয়ের যে রঙ্গরসের মতিগতি, শুধু ছেলেটাকে বকে কী হবে।

হাসি থামিয়ে সুপা মুখে পলকা বিস্ময় টেনে আর বোকা বোকা মুখ করে বলেছে, আচ্ছা, ওই সিংহ অফিসার হয়ে নিজেকে ভাবে কী, আর কী-ই বা আশা করে? তাছাড়া বাবাই বা তাকে আজকাল এমন তোয়াজ তোষামোদ করে কেন?

কঠিন মুখে অপর্ণা জবাব দিয়েছেন, তুই কিছুই বুঝিস না, কেমন?

অগত্যা মেয়ে মায়ের সামনে থেকেও পালিয়েছে। আর একদিন সুপর্ণা প্রায় ছুটেই মায়ের ঘরে এলো। —মা, সিংহ মশাই এসেছে, বৃন্দা বলল বাবা বাড়ি নেই শুনে আমাকে ডাকছে—আমাকেই অফিসের ফাইলপত্র বোঝাবে নাকি!

অপর্ণা গম্ভীর। মেয়ের মুখে ফাটল-ধরা চাপা হাসি আরো বিরক্তির কারণ।—তোর কলেজ নেই?

আছে তো!

কেন ডাকছে শুনে আয়, আবার আড্ডা দিতে বসিস না—যে স্বভাব তোরও।

বা রে, আমি কী করলাম! পরক্ষণে উদ্গত হাসি ভেঙেই পড়ল যেন। মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে সুপর্ণা বলল, আজকাল আবার সিংহ মশাইয়ের সঙ্গে ট্রামে ওঠা-নামার সময়ও হঠাৎ-হঠাৎ দেখা হয়ে যাচ্ছে মা, তুমি রেগে যাবে বলে বলি নি ... সেদিন কলেজ থেকে বেরুতে দেখি সে রাস্তায়ও আপিস পালিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিগ্যেস করতে বলল, এদিকে তার হঠাৎ একটু কাজ পড়ে গেছে বলে এসেছে, আর হঠাৎ যখন দেখাই হয়ে গেল, ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইলে!

তুই কী করলি?

বা রে, আমি আবার কী করব, একটা চলতি ট্যাক্সি ডেকেই বসল যে!

অপর্ণার যথার্থই রাগ হয়েছিল। মেয়ের ওপরেও, ওই ছেলের ওপরেও। সেই মুখে সুপর্ণা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমার বদলে তুমি যাও না মা, লক্ষ্মীটি — বলে দাও আমার কলেজ আছে, খেতে বসে গেছি।

রাগ সত্ত্বেও অপর্ণা হেসেই ফেলেছিলেন। হেসেছেন, 'আমার বদলে তুমি যাও' শুনে। মেয়ের কথার এই রকমই ছিরি। কিন্তু হাসির ব্যাপার এটা নয়, তাই পরক্ষণে গম্ভীর—তুই শেখাবি আর আমি অমনি গিয়ে মিছে কথা বলব?

যে কারণেই হোক সুপা সেদিন মা-কেই পাঠাতে চেয়েছে। বলেছে,—বাবা রে বাবা, আচ্ছা এই দেখো, আমি সত্যি সত্যি খেতে চললাম।

অপর্ণাই নীচে নেমে এসেছিলেন।

মেয়ের বদলে মাকে দেখে ছেলেটা কী করবে ভেবে না পেয়ে উঠে তাড়াতাড়ি প্রণাম করতে এগিয়ে এসেছিল। অপর্ণা তাতেও নরম না হয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন একটু। থাক, বোসো।

না, মিছে কথা বলেননি। মিছে কথা তিনি বলেন না। বলেছেন, সুপা কলেজের জন্য তৈরি হচ্ছে ...কী দরকার বলো তো?

ছেলেটার বিড়ম্বিত মুখ দেখে হাসি পেতে পারত, মায়া হতে পারত। হাসি পায়নি, মায়াও হয়নি। গলার স্বর অনুচ্চ কিন্তু কঠিন, চাউনিও সদয় নয়। হৃত পৌরুষের মতো সিংহ মিন মিন করেছে। —না...এমনিই এদিকে এসে গেছলাম। ইয়ে, শুনেছিলাম ওর বেশির ভাগ দিন এগারোটায় ক্লাস।

কোথায় শুনেছিলে?

ইয়ে...আপনার মে-মেয়েই বলেছিল।

চোখে চোখ রেখে অপর্ণা অপেক্ষা করেছেন একটু, তারপর জিজ্ঞাসা করেছে, আজ তোমার আপিস নেই?

না, আজই সকালের ট্রেনে মফঃস্বল থেকে ফিরেছি, তাই অফ্—

তারপর আর একটিও কথা না বলে অপর্ণা নিঃশব্দে মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শুধু। অতঃপর অবস্থান বাঞ্ছনীয় নয় বুঝেই ছেলেটা প্রস্থান করেছে।

কিন্তু তারপরেও অপর্ণার রাগ হয়েছিল ভিতরে পা দিয়েই। মেয়ের এই চপলতাও চক্ষুশূল। দরজার আড়ালে সুপা হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখেই হাসির দমকে মেয়ের সর্ব অঙ্গ যেন বেঁকেচুরে গেল।

হাসছিস কেন?

হাসি সামলে জবাব দিতেও সময় লাগল। —ওই মূর্তি দেখে, তুমিও না হেসে থাকতে পারলে কী করে!

মেয়ের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন অপর্ণা। —আমাকে পাঠিয়ে তারপর মূর্তি দেখার জন্য তুই নেমে এলি?

বেশ। সুপা জোরালো কৈফিয়ত কিছু হাতড়ে পেল না। বলে বসল, সমীরণ কাকুর মতো তোমারও কলেজের মাস্টার হওয়া উচিত ছিল। মন্তব্য করে হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়েছে।

ঠিক এই নামটা এসে না গেলে হয়তো বা মেয়েকে বকতেন। মেয়ের এত চপলতা তাঁর পছন্দ নয় একটুও। ওর স্বভাবের দরুনই যে ছেলেগুলো অনেক সময় প্রশ্রয় পায় নিজের মেয়ে বলে এই সত্যটা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। দুই-একটা করে অপ্রিয় ব্যাপার তো সেই স্কুল ছাড়ার আগে থেকেই ঘটে আসছে। আর, এই সবকিছুর জন্যেই একজনকে দায়ী করেন তিনি। মেয়ের বাবাকে। বাপের রক্তকে।

যাক, এরপরেও সিংহ ধৈর্যশূন্য হয়নি। তার ওপরঅলার অর্থাৎ বাড়ির কর্তার কাছে আসা-যাওয়া বেড়েছে বই কমেনি। সুপার বি.এ. পাসের খবর বেরুতে এত মিষ্টি আর ফুল নিয়ে বাড়িতে হাজির হয়েছিল যে বরেন সোম পর্যন্ত বিব্রত বোধ করেছিলেন। আর ব্যাপারটা কতখানি অবাঞ্ছিত এবং দৃষ্টিকটু হয়েছে — দুই একবারের ঠাণ্ডা চাউনিতে অপর্ণা সেটা তাদের দুজনকেই ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর ঠাণ্ডা চোখে ছেলের দিকে ফিরেছিলেন। সমস্ত প্রহসনটা ঘটেছিল সুপার ঘরে। ফুল মিষ্টি নিয়ে বিকাশ সিংহ সেই ঘরেই ঢুকেছিল। বরেন সোমও মেয়ের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তার একটু বাদে অপর্ণা। জিজ্ঞাসা করেছেন, এত ফুল মিষ্টি কী জন্যে?

আমতা আমতা করে ছেলে জবাব দিয়েছে, সুপা ভালো পাস করল, তাই ...

সুপা ভাল পাস করেনি, কোন রকমে পাস করেছে।

ঢোঁক গিলে তখন ও ছেলে যা বলল তাই শুনে আর ওই মুখ দেখে সুপার অন্তত দম ফেটে হাসি আসছিল। বলল, পা-পাস করবে আশা করে নি তো তাই ভালো বলছি—

অপর্ণার খটকা লেগেছিল একটু। যতটা গো-বেচারা দেখায় ঠিক যেন অতটা মনে হচ্ছিল না তাঁর। মুখের দিকে চেয়েছিলেন খানিক। বরেন সোম গম্ভীর। সুপা ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত একটু। তার ভয়, ফুল মিষ্টি আনার অপরাধে না হোক, বাবার ওপর রাগের দরুনই মা কি না জানি এখন বলে ছেলেটাকে।

কিন্তু অপর্ণা তা করেননি। তাঁর মর্যাদা-বোধ আছে। শুধু বলেছেন, সামান্য থেকে বড় হয়ে উঠছ ভাল কথা, আরো বড় হতে চেষ্টা করো—এ-সব করতে গেলে তোমার ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হবে না।

কোনো দিকে দৃকপাত না করে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন।

তার ক'দিন বাদেই সুপর্ণা দুমদাম পা ফেলে এবং মুখ লাল করে মায়ের কাছে হাজির। —মা আমার বিয়ে সব একেবারে ঠিক—উলু দাও, শাঁখ বাজাও!

অপর্ণা হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। রাগে মেয়ের মুখ লাল দেখতেই পাচ্ছেন তবু মেয়েগুলো কি যে নির্লজ্জ হয়েছে আজকাল তিনি বুঝে ওঠেন না।

সুপর্ণা আরো তেতে উঠে বলল, হাঁ করে দেখছ কী, বুঝতে পারছ না? সিংহকে বিয়ে করে আমি সিংহী হতে চলেছি।

মেয়ের কথা শুনে হোক বা মূর্তি দেখে হোক মুহূর্তের জন্যে হাসিই পেয়েছিল অপর্ণার। কিছু একটা হয়েছে অনুমান করে সামলে নিয়ে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে বলবি তো, ওই ছেলে এ-কথা বলেছে তোকে?

অপর্ণা আরো অসহিষ্ণু বিরক্তির সুরে বলে উঠল, আমাকে এসে ও-কথা বলবে তার অত সাহস আছে? আর তাহলে আমি তোমার কাছে আসতুম! সে বাবাকে দিয়ে বলিয়েছে, বাবা বলেছে। আমাকে একটু আগে ডেকে একেবারে পষ্ট করে বুঝিয়েছে, সিংহের মতো অমন একখানা ছেলে কুমোর বাড়িতে অর্ডার দিয়েও পাওয়া যায় না—একেবারে ছোট থেকে এমন বড়টি হয়েছে—আরো কত বড় হবে ঠিক নেই—আর সবই আমার জন্য হয়েছে, আমার যোগ্য হবার জন্যে। অতএব আমি মাথাটা একবার নাড়লেই বাবা সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে।

দেখতে দেখতে অপর্ণার মুখ ঠাণ্ডা কঠিন। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে ওই বাপের অন্তত মাথা গলানোটা নির্লজ্জ স্পর্ধা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলেন না। বললেন, তুই তোর কাজে যা, আমি দেখছি।

সুপর্ণা খানিকটা নিশ্চিন্ত মনেই সরে গেল। কারণ, যে-কানে কথাটা তুলে দিয়েছে তারপর আর বেশি বাড়াবাড়ি কাউকে করতে হবে না।

মেয়ের এই বীতরাগের হেতু অবশ্য অপর্ণা জানেন। ইদানীং এক ছেলের সঙ্গে একটু বেশিই মেলামেশা দেখছেন মেয়ের। মায়ের শঙ্কা প্রচ্ছন্ন নিষেধ অনুভব করেই সুপর্ণা সেই ছেলের পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছে। বলেছে, তুমি এখনো আমাকে একেবারে ছেলেমানুষ ভাবো না। বাড়িতে আসবে তো দেখো 'খন। ... আজকের দিনে অমন একখানা ধারালো লোক আর হয় না মা, এই বয়সেই কত নাম—বক্তৃতা যখন করে যদি শুনতে—গায়ে একেবারে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওর বক্তৃতা তো কত সময় কাগজেও বেরোয়! রঞ্জন বোস —দেখোনি।

অস্বস্তি চেপে অপর্ণা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোর সঙ্গে এত খাতির হয়ে গেল কী করে?

সলজ্জ খুশি মুখে মেয়ে যা জানিয়েছে তার মর্ম, দেশের জন্য সর্বদা খাড়া উঁচিয়ে থাকলেও ভিতরে ভিতরে শিল্পবোধ আছে ছেলেটার। থাকবে না কেন, বিদ্বান তো আর কম নয়, এম. এ. পাস। সেও সাধারণ দশটা ছেলের মতো কলেজ আর য়ুনিভার্সিটি ঘসটে পাস নয়। বি. এ. পড়তে পড়তে এক পোলিটিকাল দলে ভিড়ে হুট করে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। তখন বাবা-মায়ের কাতর আবেদন-নিবেদন শোনেনি। একবার বেশি দিনের জন্য জেল হতে বাবা দেখা করতে এসে তাই খুব দুঃখ করেছিলেন, বলেছিলেন, বড় আশা ছিল লেখাপড়াটা অন্তত করবি, তাও করলি না।

ছেলে বলল, আচ্ছা, আশা মেটাচ্ছি তোমাদের, করছি লেখাপড়া। ব্যস, তার এক বছরের মধ্যে ভাল অনার্স পেয়ে পাস, আর তার দু'বছর বাদেই এম. এ.। বাপকে গিয়ে বলল, খুশি তো? এবারে কী বলবে, আই.এ.এস. পরীক্ষায় বসতে? তারপর বড় চাকরি করতে? আমার দ্বারা আর কিছু হবে না, এবারে নিজের পথে চলতে দাও।

সুপর্ণার সঙ্গে আলাপ হয় গেলবারের পৌষ-মেলায় মহাজাতি সদনে ওর নাচের আসরের পরে। চণ্ডালিকা নাচ দেখে ছেলের চণ্ডমূর্তি মোলায়েম একেবারে। প্রশংসা অবশ্য একবাক্যে সকলেই করেছে। ও-ছেলে সেদিন নিজে এসে সেধে আলাপ করল। তারপর থেকে ওকে যত দেখছে সুপর্ণা ততো অবাক হচ্ছে।

তারপর আর বেশিদিন সবুর সয়নি সুপার। পরে মাকেও অবাক করার জন্য রঞ্জন বোসকে একদিন বাড়িতে ধরে এনেছিল। আলাপ করার পর অপর্ণাও খুশি হননি এ-কথা বলা যায় না।

সর্ব ব্যাপারে বেপরোয়া কথা বলার স্বভাব সত্ত্বেও যেন মায়া কাড়তে জানে ছেলেটা। প্রথম দর্শনেই তাঁকে মা বলে ডেকে বসল আর বলল, আমি বাংলা দেশের সমস্ত মায়ের চোখের একটা

অকর্মণ্য অপদার্থ ছেলে, কিন্তু আপনার মেয়ে আমার মধ্যে কিছু কিছু গুণ আবিষ্কারের চেষ্টায় আছে—আপনার এখন থেকেই সাবধান হওয়া উচিত।

স্বভাব গম্ভীর অপর্ণা সোম ঠিক এই গোছের আলাপে অভ্যস্ত নন খুব। বিস্মিত হয়েছেন, পরে কৌতুকও বোধ করেছেন একটু। চোখ দুটো ভারি স্বচ্ছ, একমাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, ঠোঁটের ফাঁকে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। অপর্ণা জিজ্ঞাসা করেছেন, মায়েরা ও-রকম ভাবে কেন?

রঞ্জন বোস হেসে জবাব দিয়েছে, আমাদের দেশের মায়েরা যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মা—আমি যা করে বেড়াই তাদের চোখে তার সবটুকুই বেচাল—একটা মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে না বসা পর্যন্ত কেউ আর ভাল চোখে দেখবে না আমাকে—গত কয়েক বছর ধরে এত সব বড় বড় কথা বলে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল দিয়েছি যে মন্ত্রীর নীচে কিছু হতে গেলেই লোকে ঠাট্টা ঠিসারা করবে।

বলার মতো করে বলতে পারলে অনেক কথাই কানে লেগে থাকে। অপর্ণা হেসে ফেলেছিলেন।—তুমি তাহলে মন্ত্রীই হবে ঠিক করেছো?

ঠিক করিনি। অশান্ত ছেলের তত্ত্ব-কথা শোনাবার মতো গম্ভীর মুখ রঞ্জনের। জবাব দিয়েছে, আসল কথা মা, ওর ওপরেও লোভ নেই। কিন্তু ইচ্ছে করলে হওয়া কিছু শক্ত নয়। তবে ইচ্ছে করি বা না করি লোকে ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করেই উঁচু গদিতে বসাবে, এমন ভয় আছে। আসলে এ দেশে মানুষের কত দুর্ভিক্ষ সেটা কাজের বেলায় সকলেই মনে মনে বোঝে।

আরো ঘণ্টাখানেক আলাপের পর রঞ্জন বোসকে মনে মনে অন্তত ঝকঝকে ধারালো ছেলে বলে স্বীকার করেছেন অপর্ণা সোম। নিজে দেখার পর এই ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য মেয়েকে দুষতে পারেননি তিনি। আর পরদিন য়ুনিভার্সিটি থেকে ফিরেই মেয়ে একেবারে হেসে সারা। হাসির কারণ শুনে অপর্ণাও না হেসে পারেননি। দেখা হতে রঞ্জন নাকি মায়ের সম্পর্কে খুঁটিয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছে সুপাকে। বিয়ের পর মা নিজের চেষ্টায় একে একে এম.এ. পর্যন্ত পাস করেছে শুনেও একটুও অবাক হয়নি। উলটে বলেছে, এ আর বেশি কী, তোমার মায়ের সামনে পাঁচ মিনিট বসেই মনে হয়েছে কত বড় একখানা শক্তির অপচয় হয়ে গেল মা নিজেও তা জানেন না বোধ হয়। আর বলেছে, মায়ের তুলনায় তুমি একখানা কলে-দম-দেওয়া পুতুল—

শুনে মেয়ে যে রাগ করেনি তাতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন অপর্ণা সোম। ওই ছেলেটার ও রকম বলা উচিত হয়নি। একজনের প্রশংসা করতে হলে আর একজনের নিন্দে করার দরকার কী বাপু। তবু তার প্রতি অপ্রসন্ন হতে পারেননি।

কিন্তু এ-সব পরের বিস্তার। এর আগে মেয়ের নতুন করে আবার কারো প্রতি অনুরাগের আভাস শুধু পাচ্ছিলেন অপর্ণা আর অস্বস্তি ভোগ করছিলেন। এ-সব ব্যাপারে মেয়ের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর তাঁর একটুও আস্থা ছিল না। ঠিক এই সময়ে মেয়েকে ডেকে বাপের ওই প্রস্তাব। তার পিয়ারের ওই বিকাশ সিংহকে বিয়ে করলে মেয়ের জীবন একেবারে সার্থক হয়ে যাবে।

সুপাকে সরিয়ে দিয়ে অপর্ণা তক্ষুনি ঘর ছেড়ে বেরুতে পারেননি। সদ্য রাগের মুখে তিনি কিছু করেন না বা বলেন না। খানিক বাদে বেরুলেন। সেই ঘরে এলেন, যে-ঘরে টেলিফোনের তলব ভিন্ন বড় একটা ঢোকেন না।

বরেন সোম খাটে আধ-শোয়া হয়ে ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছিলেন। তাঁর অবকাশ বিনোদনের একমাত্র খোরাক তাস, বই আর মাসিক পত্র। স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত পদার্পণে সচেতন, তাই বেশি নির্লিপ্ত।

তুমি সুপাকে কিছু বলেছ?

বই সরালেন। সামান্য সোজা হয়ে বসলেন। চোখের দিকে তাকালেন।—কী ব্যাপারে?

বিয়ের ব্যাপারে?

ও হ্যাঁ, ওই ছেলেটাকে আমার বিশেষ পছন্দ, তাই ওর মতামত জিজ্ঞেস করছিলাম।

অনুচ্চ কঠিন সুরে অপর্ণা বললেন, তার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করোনি কেন?

বিয়েটা সুপা করবে বলে?

অপর্ণার দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর প্রথম থেকেই স্থির। —তাহলে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের ফাঁক দিয়েই অসহিষ্ণু বিদ্রূপ উপচে উঠল বরেন সোমের। পালটা প্রশ্ন করলেন, কে মাথা ঘামাবে, সমীরণ দত্ত?

কয়েক নিমেষের জন্য মুখে লালের আভা ছড়াল অপর্ণার। ঈর্ষার দেউলে রূপটাই চুপচাপ দেখলেন খানিক। দেখতে পেলেন বলেই অপরিতুষ্ট নন খুব। জানেন সবই, কিন্তু সামানসামনি দেখার সুযোগ ইদানীং হয়ই না। তেমনি ঠাণ্ডা অথচ খুব স্পষ্ট করে বললেন, তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে আমার রুচিতে বাধে। যাক, মতামত যখন জিজ্ঞাসা করেছ ওর জবাবটাও শুনে রাখো, সুপা ওই ছেলেকে বিয়ে করবে না, এ নিয়ে তাকে আর বিরক্ত কোরো না।

ধৈর্য উবে যাচ্ছে। বরেন সোম চুপচাপ চেয়ে রইলেন খানিক। কিন্তু তিনিও গলা চড়ালেন না। —কেন বিয়ে করবে না?

পছন্দ নয় বলে।

কার পছন্দ নয়, সুপার না তোমার?

আমারও পছন্দ নয়।

তোমার পছন্দমতো ছেলে জোটানো আমার সামর্থ্যে না-ও কুলোতে পারে।

কঠিন অবজ্ঞার সুরে অপর্ণা জবাব দিয়েছেন, তোমার সামর্থ্যের ওপর কেউ খুব ভরসা করে বসে নেই।

বক্তব্য শেষ। চলে এসেছিলেন।

তারপর থেকে এ-বাড়িতে বিকাশ সিংহর অস্তিত্ব নিষ্প্রভ একেবারে। এখনো আসে মাঝে সাঝে। কিন্তু ওই মা-মেয়ের কাছে সে প্রায় অপরিচিত।

চার

জোর কদমে দিনে দিনে যে কাছে এগিয়ে এসেছে সে রঞ্জন বোস। মেয়েকে আগেই ঘায়েল করেছে, মায়েরও মন কাড়তে তার খুব সময় লাগেনি। সর্ব ব্যাপারে ছেলেটার বিদ্রোহ মূর্তি অথচ হাসি মুখ। মেয়েকে ছেড়ে মায়ের ওপর চড়াও হয়েছে, আপনি আমাদের দলে চলে আসুন তো, কি ছাই ঘরের মধ্যে আটকে আছেন!

ওকে আর একটু উসকে দেবার জন্যেই অপর্ণা হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করেছেন, গিয়ে কী করব?

জবাব রঞ্জনের ঠোঁটের ডগায়। বলল, কী আবার করবেন, হাজার হাজার ছেলে মেয়ের মা হয়ে বসবেন।

হাসি মুখে সুপা একবার মায়ের দিকে তাকাচ্ছে আর একবার ওর দিকে। মেয়ের দিকে কটাক্ষ করে অপর্ণা জবাব দিয়েছেন, একটার মা হয়েই তো সামলাতে পারছি না। পরে সশঙ্কে মেয়েকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, তুই আবার দলে-টলে নাম লিখিয়ে বসিসনি তো?

মেয়ে কিছু বলার আগেই সম্ভাবনাটা যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে রঞ্জন বোস।—হুঁঃ, ওর মতো নাচিয়ে মেয়েকে নিয়ে আমাদের কী হবে?.....টাকা-পয়সার দরকার হলে অবশ্য নেচে টেচে আমাদের দু'পয়সা তুলে দিতে পারবে।

মন্তব্যটা খট করে কানে বিঁধেছিল অপর্ণার। কথাটার বক্র অর্থ মনে আসার কারণ আছে। চপল স্বভাব আর বিচার বুদ্ধির অভাবেই মেয়ে একাধিকবার বিপাকে পড়ো-পড়ো হয়েছিল। ছদ্ম-কোপের আড়ালে মেয়ের মুখে হাসি দেখে একটু নিশ্চিন্ত। ওই মুখে রাগ বা অভিমানের আভাসও নেই। ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করেছেন, ও তাহলে শুধু এই করবে আর কিছু করার নেই?

আর আবার কী করবে, আমি আটকে গেছি যখন আমার ঘরে যাবে। যতদিন বয়েস আছে নেচে-গেয়ে ফুর্তি করবে, তারপর ভাল মেয়ের মতো ঘর-সংসার করবে।

বলতে একটুও বাধল না মুখে, সব যেন একেবারে ছকে বাঁধা, ও আটকে গেছে তাই সুপাকে ওর ঘরে যেতে হবে। হাসি চেপে অপর্ণা জিজ্ঞসা করলেন, তাহলে আমাকে টেনে বার করতে চাইছ কেন, আমিও তো তাই করছি।

সটান সোজা হয়ে বসেছে রঞ্জন বোস—আপনার সঙ্গে ওর তুলনা! আপনার মধ্যে সব কিছু ধ্বংস করার মতো আগুন আছে।

চকিতের জন্য অপর্ণা বিমূঢ় যেন। মেয়েও। কথাগুলো অস্বস্তিকর রকমের নাড়াচাড়া দিয়েছে ভিতরে। ছেলেটার উদ্দীপনা ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে অপর্ণা হাসতেই চেষ্টা করেছেন।—এটা কি প্রশংসার কথা হল!

প্রশংসার নয়! আমার বলতে ভুল হয়েছে তাহলে। আমি মিন করছি সমস্ত জঞ্জাল ধ্বংস করার মতো আগুন আছে, আপনার মধ্যে। অবজ্ঞার জঞ্জাল ভয়ের জঞ্জাল—সমস্ত দেশের এই জঞ্জালের স্তূপ চোখের সামনে দেখতে পেলে আপনার নিশ্চিন্তের আহার-নিদ্রা ঘুচে যেত।

না, এ রকম একটা জোরালো ছেলে অপর্ণা সোম কমই দেখেছেন। এই বলিষ্ঠতার রূপটাই মেয়ের কাছে প্রধান আকর্ষণ বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু মনে মনে তাঁর বরং একটু ভয় ধরেছে. পরে ওই ছেলের কাছে তাঁর মেয়ে তেমন পাত্তা পাবে কি না।

হৃদ্যতা এ-পর্যায়ে আসার আগে অপর্ণা ছেলেটার ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-পরিজন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। বাবা মোটামুটি নামী উকিল ছিলেন, বছর দুই আগে অবসর নিয়েছেন। কন্‌সালট্যান্ট হিসেবে ঘরে বসে এখনো মন্দ রোজগার করেন না। দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। রঞ্জন বোস সর্ব-কনিষ্ঠ। বড় ছেলে চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট, ভাল চাকরি করে। নিজেদের বাড়ি, বেশ সচ্ছল অবস্থা।

রঞ্জন বোসের আগ্রহে এবং আমন্ত্রণে অপর্ণা সোম ওদের বাড়ি ঘর-সংসার নিজের চোখেই দেখে এসেছেন একদিন। মেয়েও সঙ্গে ছিল। আর এও বুঝেছেন, ইতিমধ্যে ও বাড়িতে সুপার অনেকবারই পদার্পণ ঘটে গেছে। বাবা মা বড় ছেলে আর তার বউ—সকলের সঙ্গেই আলাপ করে ভাল লাগল।

ছেলের নিজস্ব রোজগার বলতে কিছু নেই, মেয়ের মায়ের কাছে সেটা একটা বড় সমস্যা বটেই। কিন্তু আলাপ-পরিচয়ের খানিকক্ষণের মধ্যেই সে সমস্যা অনেকখানি তরল হয়ে গেছল অপর্ণার। অনেক কিছু করার যোগ্যতা নিয়েও যে ছেলে অর্থকরী বাস্তবের মধ্য মাথা গলাচ্ছে না, তার প্রতি বাড়ির সকলেরই যেন একটু বাড়তি মমতা। শুনলেন, এ ক'বছরের মধ্যে রঞ্জন অনেক ভাল ভাল চাকরির অফার বাতিল করে দিয়েছে, দু' দু'বার কলেজের মাস্টরি ছেড়েছে। বলেছে নাকি, ছেলেগুলোকে গাধা বানিয়ে কী হবে। আর এখন তো ও ছেলে মাথা নাড়লেই বড় যে কোনো সরকারি সংস্থার কর্ণধারই হয়ে বসতে পারে! কতবার তো সাধাসাধি করেছে সব। উঁচু পর্যায়ের যে সব মানুষদের ছেলের কাছে ওই বাড়িতে হামেশা আনাগোনা, তারা সব অপর্ণার চোখে অন্তত বড় দরের খবরের কাগজের মানুষ। কাগজে তাঁদের ছবিই দেখেছেন শুধু।

অন্য দিকে, ছেলেকে এ-ভাবে একটা মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট দেখেও তার বাবা মা কিছুমাত্র অখুশি নন্। ওই ছেলে কোনোদিন সংসারী হবে এ আশা তাঁরা ছেড়েই দিয়েছিলেন নাকি। তাঁদের ছন্নছাড়া পাগলাটে ছেলেটাকে বশীভূত করতে পেরেছে বলেই সুপার প্রতি ভারি টান তাঁদের। সব ছেড়ে এই এক গুণেই মেয়ে তাঁদের চোখে গুণবতী।

এরপর অপর্ণা সোম নিরিবিলিতে পরামর্শ শুধু একজনের সঙ্গে করেছেন। সমীরণ দত্তর সঙ্গে। ইতিমধ্যে রঞ্জন বোসের সঙ্গে এই বাড়িতেই তাঁর আলাপ-পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছেন। সমীরণবাবু ভেবেচিন্তেই মন্তব্য করেছেন, ভারি চালাক-চতুর চৌকস ছেলে তাতে আর সন্দেহ কী—তবে এ-বয়সে পলিটিক্স-এ মেতে গেছে বলেই ভয় আমার—ওদিকটা ঠিক বুঝি না।

পলিটিক্স-এ মেতেছে বলেই ওই ছেলের প্রতি এখন এত আকর্ষণ মা মেয়ে দু'জনারই। ওটুকুই তার আসল শোভা। কোনো বৃত্তে ওই ছেলেকে যেন মানায় না। কিন্তু আকর্ষণের এ দিকটার প্রতি নিজে

খুব সচেতন নন অপর্ণা সোম। তাঁর ভাল লেগেছে এবং আশা করেছেন দু'দণ্ড কথা বললে সকলেরই ভাল লাগবে। ভদ্রলোকের একবাক্যে চমৎকার ছেলে বলে না ওঠাটাই একটু অপ্রত্যাশিত লেগেছে।

তর্কের সুরেই অপর্ণা বলেছেন, কেন, পলিটিক্স যারা করে তারা বিয়ে-থা ঘর-সংসার করে না?

সমীরণ দত্ত হেসে জবাব দিয়েছেন, করবে না কেন! করলে আর আটকাচ্ছে কে, তাছাড়া বিয়ে যখন এখানে হবেই ঠিক, তখন আর ভেবে কী হবে?

মুখের দিকে চেয়ে অপর্ণা মন বুঝতে চেষ্টা করেছেন।—ভাবার কিছু আছে কি না তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

একটু চিন্তা করে সমীরণ দত্ত জবাব দিয়েছেন, মনে তো হয় না, তাছাড়া সুপা তো নিজেই সব দিক বিবেচনা করে তবে মন স্থির করেছে।

সুপার বিবেচনার ওপর আস্থা অপর্ণার একটুও নেই, এবং আগের কিছু ব্যাপার এরই মধ্যে ভুলে বসে না থাকলে আস্থার অভাব এই ভদ্রলোকেরও হবার কথা। কারণ ওকে নিয়ে তাঁকেই সব থেকে বেশি ধকল সামলাতে হয়েছে। কিন্তু আস্থা নিজের ওপর আছে অপর্ণার। এবং এবারের বিবেচনায় মেয়ের কিছুমাত্র ভুল হয়নি বলেই ধারণা তাঁর।

রঞ্জন বোস যখন-তখন হুট করে এসে হাজির হয়, নিচের থেকেই মা বলে হাঁক দেয়। ও-রকম জোরালো ডাক শুনতে অপর্ণার ভাল লাগে, শরীরের রক্ত সিরসির করে কেমন! নিজের ও-রকম একটা ছেলে থাকলে কেমন হতো মনের তলায় তাও একবার উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। তার পরেই সে-চিন্তা সরোষে বাতিল। ছেলে থাকলে বাপের মতোই হতো তাতে সন্দেহ নেই।—মেয়েটার স্বভাবও তো অনেকটা ওই রকম, মেয়ে বলেই তিনি শক্ত হাতে রাশ টেনে রাখতে পেরেছেন। রঞ্জন বোস সময় অসময়ের ধার ধারে না, বাড়িতে কিছু আছে কি নেই তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, প্রায় বলে, ঘরে কী আছে বার করুন দেখি, বেজায় খিদে।

অপর্ণা তাড়াতাড়ি খাবার ব্যবস্থা করেন। ওর জন্যে ঘরে খাবার মজুত রাখতে হয়। খাবার দিয়ে তারপর মিষ্টি শাসনের সুরে বলেন, শরীরটা আগে তারপর কাজ, সময়ে খাওয়া দাওয়া না করলে শরীর থাকবে কেন!

রঞ্জন হাসে। জবাব দেয়, থাকবে, কোটি কোটি না-খাওয়া লোকের শরীর যেমন থাকে তার থেকে ভালো থাকাটা পাপ—কিন্তু খিদের মাথায় সে-সব নীতির কথা ঘণ্টা মনেই থাকে না—হাতের কাছে মা পেলেই খাবার চেয়ে বসি। আর মায়েরাও আমাদের মতো ছেলেদের খাওয়াতে ভারি ভালবাসেন। আরো হেসে বলেছে, তা বলে উপোস করতে পারি না ভাববেন না, জেলে একবার টানা ছদিন উপোস করেছিলাম, মাঝে মাঝে শুধু নুন জল খেতাম।

শুনেই অপর্ণার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠেছিল।—তোমার মা জানতেন?

—জানবেন না কেন, সেই হাঙ্গার-স্ট্রাইকের খবর কাগজেই তো বেরিয়েছিল। জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমার মা কেঁদে বলেছিল, তুই না খেলে আমি খাব কী করে? ভেবেছিল, ওই রকম বললেই আমি নরম হয়ে যাব। আমি বলেছিলাম, খেও না, তোমারও না খাওয়ার খবরটা কাগজে তুলে দিলে আরো বেশি কাজ হবে।

কথাগুলো কী রকম যেন লেগেছিল অপর্ণার কানে। আরো বেশি কাজ হলে বয়স্কা মায়ের উপোসেও আপত্তি নেই, মনের এতটা জোর বাঞ্ছনীয় কি না তিনি জানেন না।

বাড়িতে এসে সুপাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ারও সময়-অসময় নেই কিছু। কেউ কিছু ভাববে কি না সে চিন্তারও ধার ধারে না। এসে বললেই হল, চলো, বেরুতে হবে চট্‌পট—

সুপার সাজতে গুজতে বরাবরই সময় লাগে একটু। সে-জন্যে রঞ্জন কখনো ঠাট্টা করে কখনো বা সত্যিই বিরক্ত হয়ে অপর্ণার সামনেই যা মুখে আসে বলে বসে তাকে। বলে, এত দেরি হল কেন, নাচের ফ্যাংশনে যাচ্ছে ভেবেছ নাকি! নয়তো অপর্ণাকেই বলে, আচ্ছা মা আপনার মেয়ের এমন সাজের ঝোঁক হল কী করে—আপনার ব্যক্তিত্বের কানা-কড়িও কি ওর পেতে নেই!

অপর্ণা কী বলবেন ভেবে পান না। এ-রকম কথা শুনলে একটা অজ্ঞাত শঙ্কা বোধ করেন তিনি। বিয়ের পরে ঠাট্টা গিয়ে ও ছেলের বিরক্তির দিকটাই আরো বাড়বে কি না ভাবেন। অবশ্য সুপাকে হাসতে দেখে শঙ্কা দূর হয়। ও ওর হম্বিতম্বি গায়ে মাখে না। এই গোছের অনুশাসন শুনতে ওর যেন ভালোই লাগে। এক রঞ্জন ছাড়া আর কেউ অমন কথা বললে ও ফিরে সাত কথা শুনিয়ে দিত। নয়তো রাগ করে ওপরে চলে যেত—যেতই না সঙ্গে।

মেয়েকে বেরুতে দিতে অপর্ণা আপত্তি করেননি কখনো, কিন্তু ওদের ফিরতে বেশ রাতই হয়ে যেত এক এক দিন। অপর্ণার দুশ্চিন্তা হত। আর মেয়ের বাবাকেও তখন গম্ভীর মুখে সিঁড়ির বারান্দায় পায়চারি করতে দেখতেন। মুখ দেখেই বুঝতে পারতেন লোকটা ভিতরে ভিতরে জ্বলছে। তাঁর রাগ বা দুশ্চিন্তার পরোয়া করেন না অপর্ণা। মেয়ে বিকাশ সিংহর সঙ্গে বেরুলে ওই মুখেই কুটিল হাসি দেখতে পেতেন তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু মেয়ের অত রাতে ফেরাটা শুধু দুশ্চিন্তার কারণ নয়, অশোভনও যে সেটা অস্বীকার করতে পারেন না। কিছু বলতে গেলে মেয়ে মুখ ঝামটা দেয়। ওই অদ্ভুত মতির ছেলের ওপর মায়ের দুর্বলতা বুঝতে পারে সেও। একদিন বলেছিল, আমি কী করব, ফেরার তাড়া দিতে পাঁচজনের সামনেই বলে বসল, দেরি হল তো কী হয়েছে, তোমাকে গেলার জন্যে কি রাতের লোকেরা সব ওঁত পেতে বসে আছে নাকি!...উল্টে মায়ের ওপরই দোষ চাপিয়েছে সুপা।—না চাও তো যেতে দাও কেন, ডাকতে আসে যখন যাবে না বলে দিলেই পারো।

মা যে সে ভাবে ওই ছেলেকে কিছুই বলতে পারবে না, জানে। অপর্ণা এক আধসময় তবু নরম করে রঞ্জনকে কিছু বলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শুরুতেই ও ছেলে যে-ভাবে ঝেড়ে ফেলে, আপত্তি আর করা হয়ে ওঠে না। বলে, আপনার মেয়েকে নিজের পায়ে একটু হাঁটতে চলতে দিন। তাছাড়া আমি সঙ্গে আছি, আপনার ভাবনার কী আছে।

বিকাশ সিংহকে এ-বাড়িতে বার দুই দেখেছে রঞ্জন বোস। এক-দিন সুপা নীচের ঘরে বসে গল্প করছিল রঞ্জনের সঙ্গে, বিকাশ এসেছিল বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা করতে। তার আসা কিছু কমেছে বটে, একেবারে না এসে পারে না। ও চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে সুপা ওপরে এসে হেসে সারা।

—সিংহ মশাইয়ের সে মুখ যদি দেখতে মা, গোল গোল চোখ করে রঞ্জনকে দেখতে দেখতে দরজা দিয়ে বেরুতে গিয়ে কপালে ঠোক্কর! সত্যি বলছি মা, ঠাট্টা করছি না! ফেরার সময় আর মুখ তুলে তাকাতে পারে না।

এর পরের মজার ব্যাপারটুকুও হেসে আটখানা হয়ে সপল্লবে মায়ের কাছে ব্যক্ত না করে পারেনি সুপা। সিংহের ওই মূর্তি দেখে আর দরজায় ও-ভাবে তাকে ঠোক্কর খেতে দেখে রঞ্জন হাঁ, পরে তার কিছু সন্দেহ হয়েছে—চালাক ছেলে তো, হবে না কেন। সুপাকে জিজ্ঞাসা করেছে, ভদ্রলোক কে?

সুপা গালভরা জবাব দিয়েছে, বাবার আপিসের মস্ত একজন জুনিয়র অফিসার— বিকাশ সিংহ।

রঞ্জন বলেছে, কিন্তু সিংহর বিক্রম দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন তার বুকে শেলবিদ্ধ করেছি!

সুপা হাসি মুখেই সেটা স্বীকার করেছে, আর বিকাশ সিংহ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছে। আর তাই শুনে নাকি ছেলেটার জন্যে রঞ্জনের ভারি দুঃখ।

না, মেয়ের মতো অপর্ণা হাসতে পারেননি, উল্টে বিরক্তই হয়েছেন।

রঞ্জন বোসকে পছন্দ করলেও তার সম্পর্কে ভিতরে ভিতরে ভয়টা তখনো একেবারে কাটেনি তাঁর। থেকে থেকে নিজেরই মনে হত, যে স্বভাবের মানুষ ওই জোরালো ছেলেটা, মেয়ে ঠিক সেই স্বভাবের যোগ্য নয়। মেয়েটা একদিন ওর অবজ্ঞার পাত্রী হয়ে উঠতে পারে মনে মনে সে-রকম আশঙ্কা কিছুতে দূর করা যাচ্ছিল না। নিজে ভুক্তভোগী বলেই বেশি দুশ্চিন্তা তাঁর। তাই সুপার অনুপস্থিতিতে রঞ্জনের কাছে খোলাখুলিই একদিন প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, দেখো, আমার মেয়ের দোষগুণ সবই আমি জানি, এতদিনে তুমিও খানিকটা বুঝেছ বোধ হয়—তুমি ভালো করে ভেবে দেখেছ, পরে এই বিয়েটা তোমার কোনোরকম মনস্তাপের কারণ হবে না তো?

রঞ্জন হাসিমুখে জবাব দিয়েছে, আগে শুধু আপনার মেয়েকেই ভাল লেগেছিল, আপনি তখন কাছাকাছি ছিলেন না। আপনার মেয়ে বলে ওকে এখন আরো বেশি ভালো লাগে।

এই ছেলেকে অপর্ণা কী বলবেন। তবু বলেছেন, তুমি কথা এড়িয়ে যাচ্ছ, সুপাকে সত্যিই তুমি কতটা নিজের যোগ্য ভাবো আমার ভাবনা তাই নিয়ে।

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রঞ্জন মিটিমিটি হাসছিল। তারপর আন্তরিক সুরেই বলেছে, আমি যে কাজ করে বেড়াই, আপনার মেয়ে তার একটুও যোগ্য নয়। তবে মজার কথা কী জানেন মা, সে-দিক থেকে যোগ্য হলে আমি বোধহয় এগোতামই না।....ওর চণ্ডালিকা নাচ দেখে আর ওর মধ্যে এক সহজ শিল্পীকে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। নাচ-গানের কদর বুঝিনি কোনোদিন, কোন খেয়ালে যে সেদিন দেখতে গেছলাম তাও জানি না—কিন্তু নাচ দেখে সেদিন মনে হয়েছিল, দেশের অন্য সমস্যা মিটে গেলে এও বড় কম জিনিস নয়—একটা সার্থক রূপের তৃষ্ণা আমাদের সকলের মধ্যেই আছে সেদিনই প্রথম টের পেলাম। আরো হেসে বলল, মেলামেশার পরেও সুপা যদি পলিটিক্স বুঝতে চাইত, বা বুঝতে চেষ্টা করত তাহলে ওর আলাদা সত্তার আমি কোনো দাম দিতাম না। আমার পলিটিক্স নিয়ে ও-যে ইয়ারকি ফাজলামি করে আমার সেটাই বেশি ভালো লাগে।

এরপর ঠাণ্ডা মাথায় বাস্তবের দিকে এগিয়েছেন অপর্ণা অর্থাৎ, ছেলের বাবার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কথাবার্তা উত্থাপন করেছেন। ছেলের বাপ তাঁর যোগ্য কথাই বলেছেন, এ-ধরনের বিয়েতে ফর্দ ধরে দাবি-দাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই, তবু সকলের জানা বাঞ্ছনীয় যে দু' তরফের বাবা-মায়েরাই বিয়ে দিচ্ছে। তাই পাঁচজনের চোখে সুশোভন ঠেকে সেভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলেই খুশি তিনি। আর সেই প্রথম ভদ্রলোক মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপের প্রত্যাশা জ্ঞাপন করেছেন। খুবই স্বাভাবিক। অপর্ণা সোম যথাসম্ভব সহজ মুখ করেই মাথা নেড়েছেন। বলেছেন, এরপর তিনি আসবেন তো বটেই।

সেই রাতেই আবার ওই বিশেষ ঘরে তাঁর পদার্পণ, যে ঘর তিনি সহজে মাড়াতে চান না। বরেন সোম বিছানায় বসে পেসেন্স খেলছেন।

সুপার বিয়ে ঠিক হয়েছে।

আচমকা আক্রান্ত হবার মতো মুখ তুললেন বরেন সোম। পরের কয়েক মুহূর্তের মধ্যেও নীরব প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়?

ছেলের নাম রঞ্জন বসু।

ওই যে ছেলেটা প্রায়ই আসে আজকাল, আর পলিটিক্স আওড়ায়?

বলার ধরনটুকু অন্যরকম হলে এই প্রশ্নই কটু লাগত না হয়তো। অপর্ণা জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

মুখের দিকে চেয়েই বরেন সোম বুঝেছেন, ঠিক যা হয়েছে সেটা আর তাঁর কথায় অন্তত বদলাবে না। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলে আর কী করে?

কিছু করে না, তবে ইচ্ছে করলেই করতে পারে, সে-রকম লোকের সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ আছে। তাছাড়া এম. এ. পাস, বাড়ির অবস্থাও ভাল।

মুখভাব অপ্রসন্ন হয়ে উঠছে বরেন সোমের। গলার স্বরে ঝাঁঝ মেশানো স্পষ্ট বিদ্রূপ।—তাহলে বিয়েটা ঠিক হচ্ছে শুধু এম. এ. পাস আর বাড়ির অবস্থা দেখে?

ঠাণ্ডা সংযত মুখে অপর্ণা জবাব দিলেন, বিয়ে সুপা নিজেই ঠিক করেছে।

উষ্ণ স্বরে বরেন সোম বলে উঠলেন, এ-রকম ঠিক সুপা আগেও করেছে আর সেটা বাতিল করা হয়েছে।

সেটা অপর্ণার থেকে ভাল আর কেউ জানেন না। মেয়ের ওপর আস্থা নেই, এই বাপেরই তো মেয়ে! নিজের পছন্দ না হলে এবারেও তিনি বাদ সাধতেই চেষ্টা করতেন। তাছাড়া আগের দু-দু'বারের ছেলেমানুষি থেকে সুপাকে নিরস্ত করা এই বাপের দ্বারা সম্ভব হয়নি। যা করার অপর্ণা নিজেই করেছেন আর সে-ব্যাপারে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছেন সমীরণবাবু। এত কথা না বলে ঠাণ্ডা জবাবটুকুই দিলেন শুধু—এবারে বাতিল করা দরকার বোধ করছি না।

কেন, রাজনীতির বক্তৃতা শুনে তুমিও মুগ্ধ হয়েছ?

এ-রকম দুঃসাহসিক উক্তি অপর্ণা শিগগির শুনেছেন বলে মনে পড়ে না। চকিতে এমন কিছু মনে পড়ল যা খানিক আগেও মনে পড়েনি। জীবনে এই লোক সব থেকে বেশি নাজেহাল হয়েছেন কোনো রাজনৈতিক দলের খোঁচাখুঁচিতেই। অবশ্য সেটা অন্য দল এবং অনেক বছর আগের ঘটনা। যার জন্যে কেস্ হয়েছিল, কোর্টকাছারি হয়েছিল, এই মানুষের মান-সম্ভ্রম ধুলায় লুটিয়েছিল, দীর্ঘ দিনের জন্য শান্তির আহার-নিদ্রা ঘুচে গেছল। বিচারের ফাঁক দিয়ে শেষে খালাস পেয়েছিল, চাকরিও বজায় থেকেছে কিন্তু দাগ ঘোচেনি। আর তার ফলেই উন্নতির সোজা সড়কটা অনেক সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তার থেকেও বড় ব্যাপার, আইনের চোখে খালাস পেলেও অপর্ণা তাঁকে ক্ষমা করেননি। ওই ঘটনার ফলে শেষ ধৈর্যটুকুও নিঃশেষ হয়েছে এবং চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটেছে।

অপর্ণা মুখের দিকে চেয়ে আছেন। বরেন সোম আবার বলে উঠলেন, এ বিয়েতে আমার আপত্তি আছে।

চাউনির মতই সংযত অবিচল কণ্ঠে অপর্ণা বললেন, তাহলেও এ বিয়ে হবে। তুমি খুব বেশি আপত্তি করলে বা তেমন অসুবিধে দেখলে ওরা রেজিস্ট্রি বিয়ে করবে, আমি তাতে বাধা দেব না। কিন্তু আমি তা চাই না। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে আসিনি, এই ছেলের সঙ্গে সুপার বিয়ে হচ্ছে সে-খবরটা জানাতে এসেছি। ছেলের বাবা-মায়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়ে গেছে, তাঁরা ভিতরের খবর কিছু জানেন না, তাই স্বাভাবিক ভাবেই ছেলের বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। হয়তো তাঁর কিছু বলার আছে যা আমাকে বলতে পারেননি। তুমি কবে যেতে পারবে আমাকে জানাবে।

আর অপেক্ষা না করে অপর্ণা ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করেছিলেন। আর ফিরে না তাকিয়ে এক জোড়া চোখ যে আহত পশুর মতো জ্বলছে তাও অনুভব করতে পেরেছিলেন।

এর ঠিক দু'দিন পরে সন্ধ্যার দিকে সমীরণ দত্ত এসেছিলেন। বলতে গেলে রোজই আসেন, পড়াশুনা না থাকলে থাকেনও অনেকক্ষণ। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় তাঁর মুখে কেমন একটু বিড়ম্বনার ছায়া লক্ষ্য করলেন অপর্ণা।

দুই-এক কথার পর ভদ্রলোক বললেন, ইয়ে, একটু মুশকিলে পড়া গেছে, আজ সকালে হঠাৎ বরেন আমার ফ্ল্যাটে এসেছিল।

অপর্ণা যথার্থই অবাক। আজ ক'বছর ধরে দু'জনের বাক্যালাপ একরকম বন্ধ। মুখোমুখি দেখা হলেও ঘরের লোক গম্ভীর মুখে পাশ কাটিয়ে যায়।

অপর্ণার দু'চোখ জিজ্ঞাসু, গম্ভীর।—কী ব্যাপার?

বরেনের কেমন ধারণা হয়েছে ও বিয়েতে সুপা সুখী হবে না, রঞ্জনের সম্পর্কে কিছু খোঁজ খবরও নিয়েছে বলল, কিন্তু সুখী না হবার মতো কী শুনেছে জিজ্ঞাসা করতে ভালো করে তাও বলতে পারল না।

ঈষৎ তপ্ত স্বরে অপর্ণা বলে উঠল, তাতে আপনার মুশকিলে পড়ার কী আছে—সুখ কাকে বলে সেটা তার নিজের ভালো করে জানা আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন না কেন?

মৃদু হেসে সমীরণ দত্ত জবাব দিলেন, তা অবশ্য বলিনি। ওর কেবল এক কথা, কিছু করে না, শুধু পলিটিক্স করে, এমন ছেলেকে পছন্দ করা সুপার একটা মোহ ছাড়া আর কিছু নয়, এখন আমাকে ধরেছে সুপাকে বুঝিয়ে হোক বা তোমাকে বলে হোক, যেমন করে পারি এ বিয়ে বন্ধ করতে।

কানের দু'পাশ লাল আর গরম হয়ে উঠছিল অপর্ণার। সমীরণবাবুর কথাবার্তার এই সুর একটু ভালো লাগছে না।—বললেন না কেন, ছেলে আপনারও অপছন্দ নয়?

বলেছি তো অনেক কথাই। ও কানে তোলে না। আসলে ওর হাতে যে ছেলেটি আছে তার সঙ্গেই সুপার বিয়ে দিতে চায়। সব দিক থেকে সে-ই নাকি সুপার যোগ্য পাত্র। তোমাকে এটাই ভাল করে বোঝাতে হবে।

তেমনি অনুচ্চ তপ্ত স্বরে অপর্ণা বললেন, বোঝাতে শুরু করুন তাহলে।

সমীরণবাবু হেসে ফেললেন।—ভাল। তুমি আমার ওপর রাগ করছ কেন? আমি কি তার হয়ে সুপারিশ করছি কিছু, খবরটা শুধু জানালাম। কাল পরশুর মধ্যে আবার যখন ধরবে আমাকে, কী বলব ভাবছি।

তেমনি তপ্ত মুখে অপর্ণা জবাব দিলেন, বলবেন আমি বলেছি সুপার বিয়ে রঞ্জনের সঙ্গেই হবে, তখন তার বিকাশ সিংহকে যদি নেমন্তন্ন করা হয় আমি আপত্তি করব না।

পরদিন সমীরণবাবু আসতে বৃন্দা এসে তাঁকে খবর দিয়েছে, বাবু তাঁর ঘরে একবার ডাকছেন।

ভদ্রলোক কতখানি বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছেন অপর্ণা মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলেন। তাঁর দিকে একটু চেয়ে থেকে ও-ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এভাবে ঘরে ডাকাটা একটা নতুন ব্যাপার। অপর্ণার কঠিন মুখ। ইচ্ছে করছিল, তাঁকে এখানে বসিয়ে রেখে নিজে যান। বক্তব্য শুনে জবাব যা দেবার দিয়ে আসেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধা দিলেন না। কঠিন মুখে নিজেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিনিট পনেরোর মধ্যে সমীরণবাবু ও-ঘর থেকে ঘুরে এসে আবার বসলেন।

অপর্ণা জিজ্ঞাসু।

—বলে এলাম।

অপর্ণা চুপচাপ চেপে রইলেন খানিক। আর মুখ খুলবেন না বুঝে চাপা অসহিষ্ণু স্বরে নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, বলে আসতে এতক্ষণ লাগে না, আর কী কথা হল?

বিব্রত মুখে সমীরণবাবু হাসতেই চেষ্টা করলেন একটু। জবাব দিলেন, কী আর বলবে, রাগ হলে কবে আর ওর মাথার ঠিক থাকে, যা মুখে এসেছে তাই বলেছে।

অপর্ণা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ইতর না হলে যা মুখে আসে কেউ তা বলে না—আপনাকে কোনোরকম অপমান করেছে কি না আমি জানতে চাই।

সমীরণবাবু সকৌতুকে জবাব দিলেন, অপমান ঠিক নয়, জিজ্ঞেস করেছে মেয়ের বিয়ের পর তোমারও প্ল্যান কিছু ঠিক হয়ে গেছে কি না।

মুহূর্তে টকটকে লাল মুখ অপর্ণার। ওই লোক এই রকমই ইতর বটে, আর এই একজন সে-রকম ভদ্রলোক বলেই গায়ে মাখেন না কিছু।....পরে কী হবে সে-জবাব ভালো রকমই দেবেন অপর্ণা, সুপার বিয়েটা হয়ে যাক।

দিন তিনেক পরে রাত্রিতে সুপা ঈষৎ উদগ্রীব মুখে ঘরে ঢুকে বলল, মা, বাবা ডাকছে তোমাকে।

অপর্ণাও বিস্মিত।—কোথায়?

বাবার ঘরে।

বহুদিনের মধ্যে এ-রকম ডাকারও নজির নেই। কেন ডাকা হয়েছে একটু বাদেই অপর্ণা সেটা অনুমান করে নিলেন। ছেলের বাড়িতে কবে যাওয়ার সুবিধে হবে তাঁকে জানাবার কথা ছিল। হয়তো সে জন্যেই। এ ছাড়া অন্য তর্ক উঠলে অপর্ণা বরদাস্ত করবেন না।

কিন্তু ঘরে পা দিতেই বরেন সোম যা বললেন, তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলেন না—আজ ছেলের বাড়িতে গেছলাম।

তার মানে! কেন? ঈষৎ রূঢ় প্রশ্নটা আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো অপর্ণার।

পেসেন্সের অখণ্ড মনোযোগে ছেদ পড়ল। বরেন সোম তাকালেন একবার।—তুমি যেতে বলেছিলে।

যেতে বলিনি। কবে তোমার যাবার সুবিধে হবে জানাতে বলেছিলাম।

চেয়ে আছেন। চোখে মুখ ব্যঙ্গ ঝরছে যেন।—কেন, আমি একলা গেলে বিশ্বাস নেই বলে?

হ্যাঁ।

ও। অসহিষ্ণু ক্ষোভে তাসের দিকে চোখ ফেরালেন বরেন সোম। জবাব দিলেন, আমি বুঝতে পারিনি।

এই একটি মাত্র ব্যাপারে, অর্থাৎ মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে অপর্ণা নির্মম। নইলে এই লোকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি বা তর্ক তিনি করেন না। ঠাণ্ডা কঠিন গলায় বললেন, তুমি বুঝতে পেরেছ, তোমার বুঝতে সময় লাগে এ-কথা কেউ কোনোদিন বলেনি।

বরেন সোম নির্বাক, গম্ভীর। মাথা নীচু করে বসে তাস নাড়াচাড়া করছেন।

চেষ্টা করে নিজেকে সংযমে বাঁধলেন অপর্ণা। জিজ্ঞাসা করলেন আর কিছু বলার নেই তাহলে?

তাসের দিকে অখণ্ড মনোযোগ। মুখ না তুলেই জবাব দিলেন, ছেলের বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমার যাওয়ার তেমন দরকার ছিল না, মনে হয় মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমি মানুষটা কেউ নই এটা তাঁরা জানেন।

অপর্ণার মুখে আরো গোটাকতক কঠিন রেখা পড়ল। এত কাল মেয়ের বন্ধনেই তিনি এই নরকে আটকে আছেন। কালকেই ওই দিনটার প্রতীক্ষায়। আর শুধু এই কারণেই সামাজিক সম্পর্কটা বাইরের কারো চোখে তিনি হেয় বা ঠুন্‌কো করে তুলতে চাননি। ছেলের বাড়ির মানুষেরা যদি জেনে থাকে তবে তাঁর এত দিনের আত্মনিগ্রহ অনেকখানি ব্যর্থ হয়েছে। নিজে তিনি কাউকে কোনোরকম আভাস দেননি, মেয়েকেও এ-ব্যাপারে কিছু বলার মতো নির্বোধ ভাবেন না। রঞ্জন অবশ্য চালাক ছেলে, নিজে থেকে যদি কিছুটা আঁচ করে থাকে। তবু সমস্ত রাগ এই একজনের ওপরে গিয়ে পড়ল। রঞ্জনও যদি জেনে থাকে বা বুঝে থাকে তা এই মানুষের অচরণের দরুনই জেনেছে, বুঝেছে।

মুখের ওপর সমুচিত জবাব দিতে পারতেন। দিলেন না। আসল কথা এখনো শোনা হয়নি। শুধু ওই কথা শোনাবার জন্যই তাঁকে ঘরে ডাকা হয়নি। জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর?

তারপর ভদ্রলোক মেয়ের খুব প্রশংসা করলেন, তার থেকেও বেশি প্রশংসা করলেন তোমার। বললেন, তুমি সংসার চালাচ্ছ, এমন কি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারেও আমাকে ভাবনা-চিন্তা থেকে অব্যাহতি দিয়েছ—এমন নিপুণ মহিলা আজকাল বড় দেখা যায় না, এদিক থেকে আমি মহাভাগ্যবান।

অপর্ণার দু'চোখে ব্যঙ্গ উপচে উঠল। বলতে ইচ্ছে করল, ভদ্রলোক জানেন না যে অত ভাগ্য সকলের সয় না। কিন্তু আসল প্রসঙ্গ অনুক্ত এখন। তিনি অপেক্ষা করছেন।

এবারে শয্যায় বিছানো তাসের ওপর থেকে মুখ তুললেন বরেন সোম।—তারপর ছেলের বাবা বললেন, এ-সব বিয়েতে দেনা-পাওনার প্রশ্ন ওঠে না। আর ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে দাঁও হাঁকার মানুষও নন তিনি। তবে দিন-কাল যা পড়েছে খরচ অনেক, আমাদের খুব অসুবিধে না হলে নগদ হাজার তিনেক টাকা যদি হাতে পান তিনি ভালো হয়। এছাড়া আমরা আমাদের মেয়েকে যে মনের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে দেব এ তো জানা কথাই।

অস্বাভাবিক দাবি কিছু নয়। তবু কথাগুলো যেন খচ করে কানে বিঁধল অপর্ণার।—তুমি কী বললে?

আমি বলা না বলার কে?

অপর্ণার দরজার দিকে পা বাড়াতে বাধা পড়ল।—শোনো।

ঘুরে দাঁড়ালেন।

সুপার বিয়ে ওখানে হবেই তাহলে?

অপর্ণা চেয়েই রইলেন শুধু। জবাব নিষ্প্রয়োজন।

সে শুধু তোমার একলার মেয়ে, আমার কোনো দায়িত্ব নেই, কেমন?

গাম্ভীর্য সত্ত্বেও অপর্ণার গলায় ব্যঙ্গ ঝরল যেন একপ্রস্থ। ঠাণ্ডা মোলায়েম সুরেই বললেন, এ-পর্যন্ত তুমি অনেক দায়িত্ব পালন করেছ, এই একটা থাক।

বাইরে আসতেই সুপর্ণার মুখোমুখি। চাপা রাগ আর উত্তেজনায় ও ফিসফিস করে বলে উঠল, এ কখনো হতে পারে না, আমি বলব রঞ্জনকে।

মেয়ের রাগত মুখের দিকে চেয়ে অপর্ণা থামলেন একটু! পাছে কথা কারো কানে যায় তাই নিজের ঘরের কাছাকাছি আসার পর জিজ্ঞাসা করলেন, কী হতে পারে না, কী বলবি?

ওই টাকার কথা। রঞ্জন নিশ্চয় কিচ্ছু জানে না, জানলে উল্টে খেপে যাবে, এ ওই বাপের কারসাজি।

অপর্ণা মৃদু ধমকই দিলেন মেয়েকে।—ছেলেমানুষি করতে হবে না। শুরুতেই ওর বাবা-মাকে অসন্তুষ্ট করলে তোর ভালো হবে? মুখ ফুটে চেয়েছে যখন দিতে হবে, এ নিয়ে তোর মাথা ঘামানোর দরকার কী!

ঘরে ঢুকে গেলেন। মেয়েকে যা-ই বলুন, নগদ দাবিটা তাঁর কাছেও অস্বস্তিকর ঠেকেছে।

...এই এক বিয়ে উপলক্ষে দীর্ঘদিন বাদে বরেন সোমের সঙ্গে অপর্ণা সোমের কথার বিনিময় আরো হয়েছে কিছু। শুধু তাই নয়, একসঙ্গে দু'জনকে ছেলের বাড়িতে যেতেও হয়েছে একদিন। এ ব্যাপারে অপর্ণা বিতৃষ্ণ হলেও দ্বিধাশূন্য। বরেন সোম আপিসে বেরুবার আগে সোজা ঘরে ঢুকে বলেছেন, তুমি চানে গেছলে যখন রঞ্জনের বাবা ফোন করেছিলেন—কিছু পরামর্শের জন্য যেতে অনুরোধ করেছেন।

আয়নার ভিতর দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বরেন সোম জিজ্ঞাসা করেছেন, আমার অনুমতি নিতে এসেছ?

না। তোমাকে না পেয়ে তিনি আমাকে ডেকেছেন। দু'জনকেই যেতে বলেছেন।

তুমি তাঁকে বলে দিও দু'জনের একজন অন্তত তাঁর প্রজা নয়। আর স্পষ্ট করে জানিয়ে দিও, এ বিয়েতে আমি কেউ নই, আমার মত নেই, উল্টে আমার আপত্তি আছে।

অপর্ণা শুনলেন। গম্ভীর অথচ বিদ্রূপভরা দু'চোখ তাঁর মুখের ওপরে বিচরণ করে নিল একপ্রস্থ। তারপর বাক-বিতণ্ডার নিষ্পত্তির মতো করে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ঠিক ছ'টায় আমি তৈরি হয়ে ট্যাক্সি ডাকব।

শিথিল চরণে প্রস্থান করেছেন। এই লোকের চরিত্র অণুতে অণুতে জানেন তিনি। ঠিক ভয়ে যে সঙ্গে যাবে তা নয়। ভয়ডর নেই, নির্লজ্জতা আছে তার চতুর্গুণ। এত দিন বাদে আধহাত ফারাকে বসে ট্যাক্সিতে যাওয়া-আসার লোভেও যাবে। আধহাত ছেড়ে বাইরে এক আঙুলের ফারাক না থাকলেও ভিতরের ফাঁক এ জীবনে আর জুড়বে না জেনেও যাবে।

...কিছুদিন আগেও এই নির্লজ্জতার নজির দেখা গেছে। সুপার বেশ একটা নামী জায়গায় নাচের ফাংশন ছিল মাস দেড়েক আগে। মেয়ের এইসব অনুষ্ঠানে তার মা-কে যেতে হয়েছে অনেক সময়। সুপার তাগিদে যেতে হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার বাবা মেয়ের কোনো নাচ দেখেননি, কেউ কখনো ডাকেনি তাঁকে। কিন্তু সেবারে তাঁর ডাক পড়েছিল।

সেই একদিন বেশ একটু দুশ্চিন্তা নিয়ে সুপা মায়ের কাছে উপস্থিত।—একটা মুশকিল হয়েছে মা, আজকের ফাংশনে খুব সম্ভব রঞ্জনের বাবা মা আর বউদি থাকবেন... তুমি তো থাকবেই, ইয়ে রঞ্জন বলছিল, বাবা থাকলেও ভালো হয়। ভদ্রলোক একটু সেকেলে ধরনের মানুষ তো, বাবা-মা দু'জনেই সঙ্গে আছে দেখলে আর সাত-পাঁচ কিছু ভাবতে বসে যাবে না...তাছাড়া এতদিনের মধ্যে বাবার সঙ্গে তো একবারও আলাপ হয়নি ওর বাবার...তুমি একবার বলো না বাবাকে?

মনের কথাটা মেয়ে খোলা-খুলি বলতে না পারলেও অপর্ণা ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন। অন্যায় কিছু বলেনি, কিন্তু বিরক্ত হয়েছিলেন শুধু তাঁর ওপর দায় চাপানোর দরুন। বলেছিলেন, তুই বলে দেখ—

—আমি! তাহলেই হয়েছে, আমার দ্বারা হবে না মা, তুমি একটা মুখের কথা খসালেই বাবা ঠিক যাবে। সত্যি বলছি মা, ওই ভদ্রলোক যদি আসেন বাবার যাওয়া খুব দরকার—

হ্যাঁ, অপর্ণাই গেছেন ওই ঘরে। বলেছেন। মেয়ের বিয়ে যখন ওখানে হবেই, কারো মনে কোনোরকম সংশয় রাখতে চান না। রঞ্জন যখন বলেছে, তখন দরকার বা উচিত বুঝেই বলেছে।...প্রস্তাব শুনে মানুষটা অবাক হয়েছিল বইকি। মুখের দিকে চেয়ে ছিল বেশ খানিকক্ষণ। অপর্ণা বলেছিলেন আজ ওমুক জায়গায় সুপার নাচের ফাংশন, অনেকে আসবেন, ও বলছিল তোমার আমারও যাওয়া দরকার। অপিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি আসতে হবে, ছটায় আরম্ভ।

শুনেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না বরেন সোমের। ব্যাপারটা বোঝার জন্য মুখের দিকে আরো খানিক চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমার যাওয়া দরকার কেন?

অপর্ণা নিরুত্তাপ জবাব দিয়েছেন, দরকার আছে, একটু চেষ্টা করলে নিজেই তুমি সেটা বুঝতে পারবে। সুপা যখন মুখ ফুটে বলেছে, দরকার না হলে বলেনি।

....বিকেল পাঁচটার আগে সেদিন আপিসের গাড়িতেই বাড়ি চলে আসা হয়েছিল। তার পরেও গাড়িটা ধরে রাখা হয়েছিল। সেই গাড়িতেই পাশাপাশি বসে মেয়ের নাচের অনুষ্ঠানে গেছেন দু'জনে। এই সান্নিধ্যটুকুও বাঞ্ছিত ছিল না একটুও। মেয়ের মা হিসেবে যতটুকু বেশবাস আর প্রসাধন করা যায় অপর্ণা সেইটুকুই করেছিলেন। তবু তার মধ্যে চোখ টানার মতো চাকচিক্য একটু ছিলই। গাড়িতে একটিও কথা হয়নি। থেকে থেকে লোকটার দু'চোখ যে এদিকে ঘুরেছে অপর্ণা সেটা ভালই লক্ষ্য করেছেন।

ফাংশনে এসে রঞ্জনের মুখে অপর্ণা শুনলেন, হঠাৎ শরীর অসুস্থ বোধ করার দরুন তার বাবার আসা সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁকে একলা রেখে তার মা-ও আসতে পারেননি। তার বউদি এসেছে। শুনে অপর্ণা খুশি হতে পারেননি। মিছিমিছিই একসঙ্গে টেনে আনা হল।

হঠাৎ এ-ভাবে মেয়ের নাচ দেখতে নিয়ে আসা হল কেন শেষ পর্যন্তও মেয়ের বাবার সেটা মাথায় ঢোকেনি। সুপা জনাকতক বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিয়েছে এই পর্যন্ত। শিল্পী মেয়ের বাবা হিসেবে তারা তাঁকে একটু খাতির যত্ন করেছে।

...নাচের বিষয় চিত্রাঙ্গদা। নাচের ছন্দে সুপর্ণার রাগ অনুরাগের অভিব্যক্তিগুলো দেখার মতোই। অপর্ণা দেখেছিলেন, হলসুদ্ধ মেয়ে পুরুষেরা দেখেছিল। দেখছিলেন না শুধু একজন। বরেন সোম। অন্ধকার ঘরে হঠাৎই সেটা অপর্ণা লক্ষ্য করেছিলেন। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন দুটো ক্রুর লোলুপ চোখ তাঁর মুখের ওপর আটকে আছে। চোখাচোখি হতে লোকটা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। তারপর আর ঘাড় না ফিরিয়েও এ ব্যাপারটা অনেকবার অনুভব করেছেন অপর্ণা।

শো শেষ হবার পরেই মেয়ে চলে আসতে পারেনি। রঞ্জনের সঙ্গে পরে আসবে। তার পরিচিত এক ভদ্রলোককে মাঝপথে নামিয়ে দিয়ে যেতে অনুরোধ করল সে। আর তাইতেই যেন এই লোকের সুবিধে হল। গাড়িতে প্রথমে অপর্ণা উঠেছিলেন। তাঁর পরেই বরেন সোম উঠে ওই ভদ্রলোককে জায়গা দেবার জন্যে অপর্ণার একেবারে গা ঘেঁষে বসলেন। বড় গাড়িতে তিন জন উঠলে এত ঘেঁষাঘেঁষি করে বসার দরকার হয় না।

গাড়ি চলল। পাশের লোক ইচ্ছে করেই যে কোমরে কাঁধে চাপ দিচ্ছে থেকে থেকে অপর্ণার সেটা বুঝতে এক মুহূর্তও লাগেনি। নির্লজ্জতা দেখে বিরক্তিতে ভিতরটা সঙ্কুচিত হয়েছে তাঁর। নির্দিষ্ট জায়গায় ওই তৃতীয় ভদ্রলোক নেমে যাবার পরে অন্তত পাশের লোক সরে যাবে ধরেই নিয়ে ছিলেন অপর্ণা। কিন্তু এমনি নির্লজ্জ যে তেমনিই গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে রইল, কে নেমে গেল না গেল খেয়ালই নেই যেন। জায়গা থাকলে অপর্ণাই অনেক আগে সরে বসতেন।...ফের একবার কাঁধে চাপ পড়তে অপর্ণা সোজাসুজি ঘুরে তাকিয়েছিলেন। ড্রাইভারের কানে যাবে বলে একটি কথাও বলতে পারেননি।

রাতে বাড়ি ফিরে সুপা দেখে বাবা গম্ভীর মুখে সামনের বারান্দায় পায়চারি করছে। এরকমটা সচরাচর দেখে না। মেয়ের গলা অপর্ণার কানে এলো, বাবা, কেমন দেখলে বলো?

জবাবও কানে এলো। —ভালো, সকলের ভালো লেগেছে?

মেয়ে খুশি মুখে জবাব দিয়েছে খুব, খুব—একজন আবার মেডেল-ডিক্লেয়ার করেছে।

মেয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ার পরেও লোকটার বারান্দায় পায়চারির বিরাম ছিল না। মায়ের তখন নিজের ঘরে সেই কঠিন মুখ দেখলে মেয়েও অবাক হত। সুপার ঘরের দরজা বন্ধ হতে বাইরের পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে অপর্ণার খোলা দরজার সামনে থেমেছিল। না, শব্দ ঠিক হয়নি, তবু অপর্ণা টের পেয়েছিলেন। কারণ, অপর্ণা সেই থেকেই প্রস্তুত ছিলেন।

...পায়ে পায়ে তিনিও দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর মানুষটার মুখের দিকে স্থির চোখে চেয়ে কী দেখেছিলেন তিনি?...লোভ দেখেছিলেন। সেই সঙ্গে হয়ত বা নীরব আকুতিও দেখেছিলেন একটু।...মেয়ের বিয়ের সেতু ধরে এতকালের ফারাকটা ঘুচে যাবে আশা করছে। অপর্ণা সেই আশার জবাব দিয়েছিলেন। যে-রকম জবাব তাঁর ভিতরে টগবগ করে ফুটছিল, সেই জবাবই

দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। চোখে চোখ রেখে সরে এসে একটু শব্দ করেই নাকের ডগায় দরজা দুটো বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

তাই অপর্ণা স্থির জানেন, এই লোক আজও তাঁর সঙ্গে যাবে।

আপিস থেকে কখন ফিরল লক্ষ্য করেছেন অপর্ণা। নিজে সময়মতো প্রস্তুত হয়েছেন। তারপর একবার এ-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নীচে নেমে ট্যাক্সিতে উঠে বসেছেন। মিনিটখানেকের মধ্যেই বরেন সোম নেমে এসেছেন।

যাবার সময় একটি কথারও বিনিময় হয়নি।

ভাবী কুটুম্বরা সমাদরে গ্রহণ করেছেন তাঁদের। অপর্ণার মুখে তখনই সৌজন্যের সহজ অভিব্যক্তি দেখা গেছে। এ-কথা সে-কথার পর রঞ্জনের বাবা সুবিমলবাবু আলোচনার প্রধান বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। রঞ্জনের ইচ্ছে সাবেকি হইচই বাদ দিয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে হোক। ভদ্রলোক ছেলেকে বলেছেন এক তরফা ইচ্ছে হলেই হবে না, মেয়ের পক্ষের মতামতও জানা দরকার।

অপর্ণা সোম ঠিক এই এই আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেননি। দ্রুত ভেবে নিতে চেষ্টা করেছেন তিনি। আপত্তি না থাকলে চট করেই সায় দিতে পারেন, কিন্তু ভিতর থেকে সে-রকম অনুমোদন আসছে না। মুখ তুলে সঙ্গের মানুষের দিকে তাকালেন। সহজ চাউনি, প্রশ্নের সুরও।—কী বলো?

বরেন সোমের মুখখানা চিন্তাছন্ন দেখাল একটু। কিন্তু কিছুই চিন্তা করছেন না, স্ত্রীর মুখখানাই দেখছেন শুধু।

একটু বাদে স্পষ্ট করেই মাথা নাড়লেন অপর্ণা। হাসলেনও একটু। দৃষ্টি ছেলের বাবার দিকে। বললেন, শুনেই তো উনি বেশ ধাক্কা খেলেন দেখছি, মত হবে বলে মনে হয় না। আপনারা রঞ্জনকে বুঝিয়ে বলুন, আমিও বলব।

সুবিমলবাবু এবারে হাসিমুখে নিজের স্ত্রীর দিকে তাকালেন। খুশি তো?

মহিলার মুখেও একটু খুশির ভাবই দেখা গেল বটে। ভদ্রলোক অর্থাৎ রঞ্জনের বাবা এবারে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করলেন। বললেন, আপনারাই সমস্যাটার সমাধান করলেন তাহলে, আই হ্যাভ্ প্লেড এ ফেয়ার গেম, কোনো রকম ইনফ্লুয়েন্স করিনি আপনাদের—আমাদের ছেলের গোঁ রেজিস্ট্রি বিয়ে হবে, কোনোরকম হইচই করাটা তার পছন্দ নয়। ওর মায়ের তাতে আপত্তি, এই নিয়ে ঝগড়া। শেষে আমি বললাম, মেয়ের বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করব, তাঁরা যা বলবেন তাই হবে। হাসতে লাগলেন। ছেলেও তাতে রাজি হল, তার বিশ্বাস, ইচ্ছের কথা শুনলেই আপনি ওর মতে সায় দেবেন।

শেষেরটুকু অপর্ণার উদ্দেশে।

এর পরের আলোচনার চেহারাটা প্রস্তাবিত বিয়ের মতোই করে তুললেন অপর্ণা। প্রণয়ঘটিত বিয়ে বলে যে দেওয়া-থোয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র ফাঁকি দেবার ইচ্ছে নেই সেটুকুই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চান। কিন্তু জানাবার ভঙ্গিটুকু সহজ এবং মিষ্টি। গহনাপত্র পাছে ডবল হয়ে যায় এই জন্যেই তিনি সোনার জিনিস কী কী দেবেন ঠিক করেছেন জানালেন। গলা কান হাত আঙুলের কিছুই বাদ গেল না তার মধ্যে। তারপর ফার্নিচার এবং অন্যান্য সামগ্রীর কথাও যেন আপনা থেকেই উঠল। খাট আলমারি ড্রেসিং টেবল আলনা সোফা-সেট গানবাজনার সরঞ্জাম এমন কি কিছু রুপো স্টিলের বাসন ইত্যাদি।

পাশের মানুষের মুখ শেলাই করে বসে থাকাটা অশোভন লাগছে। তাঁর দিকে তাকালেন অপর্ণা।—আর কিছু তো মনে পড়ছে না...এ-ই তো?

একটা ফ্রিজ দেবে না? চিন্তা করেই যেন ফিরে প্রশ্ন করলেন বরেন সোম।

মুহূর্তের মধ্যে সংযত মূর্তি উগ্র হয়ে উঠতে চাইল। কিন্তু অপর্ণা সোম তা হতে দিলেন না। বিশেষ চেষ্টা করেই সহজতায় চিড় খেতে দিলেন না। এমন কি হাসতেও পারলেন না একটু।—দিতে চাও দেবে, আমি অবশ্য ফ্রিজ-ট্রিজ-এর কথা ভাবিনি।

ছেলের বাবা-মা ভিতরে ভিতরে আশাতীত খুশি সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। আদর-আপ্যায়নের পর হাসিমুখে অতিথি বিদায় করলেন তাঁরা।

আবার ট্যাক্সি। দু'জনে দু'প্রান্তে বসে। নির্বাক কিছুক্ষণ।

বুড়ো পাঞ্জাবি ট্যাক্সি ড্রাইভার। বাংলা বুঝবে না। ঘাড় ফিরিয়ে বরেন সোমই প্রথম শ্লেষের সুরে মৃদু প্রশ্ন ছুড়লেন।—তিন হাজার টাকা নগদ দেওয়ার কথাটা তুললে না যে, ওটুকু বেশি কিছু নয় বোধ হয়?

রাগে ভিতরটা এখন কাঁপছে অপর্ণার। নিছক তাঁকে জব্দ করার জন্য ফ্রিজের কথা বলে আরো হাজার আড়াই টাকার ফেরে ফেলা হয়েছে। জবাব দিলেন, না বেশি কী, বিয়ের সময় আমার বাবা তোমার বাবার হাতে নগদ পাঁচ হাজার পাঁচশো একান্ন টাকা গুনে দিয়েছিলেন।

বরেন সোমের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর আটকে আছে।—সেটা আর এটা এক হল?

আরো কম হল।

পাশের রাস্তার দিকে চোখ রেখেই ওই ঠাণ্ডা জবাবটা দিলেন অপর্ণা সোম। না, এই রাস্তায় ট্যাক্সিতে বসে এখন আর কিছু বলবেন না অপর্ণা। তাঁর রুচি বোধ আছে। কিন্তু পরে বলবেন কিছু। খুব ভাল করেই বলবেন। ফ্রিজের কথা বলে তাঁকে জব্দ করার জবাব তিনি দেবেন। না তাকিয়েও পাশে মানুষের ওই ক্রূর ধকধকে চাউনিটা তিনি অনুভব করেছেন। আর তার আড়ালের কুৎসিত অভিলাষটুকুও।... অনেক বছর আগের একটা রাতের দৃশ্য আবারও ঝপ করে চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর। কিছুই ভোলেননি। ....তিন মাসের বিচ্ছিন্নতার পর রাতে তাঁর একটা কটূক্তির সুতো ধরে মানুষটার মধ্যে পশু জেগে উঠেছিল।

অনেক বছর আগের কথা।...সুপার মুখ থেকে অপর্ণা শুনেছিলেন সমীরণ দত্তর সেটা জন্ম-দিন। রবীন্দ্র জন্মতিথি উপলক্ষে সমীরণকাকুর সঙ্গে তার কী কথা হচ্ছিল, কৌতূহল বশে সুপা হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কাকু, তোমার জন্মদিন কবে?

সমীরণবাবু হেসে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন, উৎসব করবি নাকি?

যাই হোক তারিখটা শুনে নিয়ে সুপা লিখে রেখেছিল। সেই দিন আসতে ও মাকে বলেছিল, আজ সমীরণকাকুর জন্মদিন মা, আমি কিছু দেব, কী দেব বলো?

সমীরণ দত্ত অপর্ণার গুরু আবার মেয়েরও গুরু। মেয়ের কথা শুনে খুশি মুখেই তাঁর জন্য ধুতি-চাদর আনিয়েছিলেন। দুপুরে নিজের হাতে খাবার বানিয়েছিলেন। আগ্রহের আতিশয্যে সুপা আবার বড়সড় একটা ফুলের তোড়া কিনে এনেছিল। অবশ্য, তোড়াটা কে আনিয়েছে বরেন সোম জানতেন না। তিনি অনুষ্ঠানটুকুই দেখেছিলেন শুধু, আর মেয়ের মুখে অনুষ্ঠানের উপলক্ষ শুনেছিলেন। সমীরণ দত্তর জন্য তৈরি খাবারের থেকে বিকেলে তাঁর খাবার আসতে তিনি থালাসুদ্ধু এমন ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন যে বৃন্দা সভয়ে এসে খবরটা অপর্ণাকে জানিয়েছিল।

ঈর্ষা বুঝেও অপর্ণা এতটুকু পরোয়া করেননি। পরোয়া করেনও না তখন আর। সুযোগ পেলেই উপেক্ষা আর অবজ্ঞার চাবুকে বরং আরো বেশি ঘা দেন। বিকেলে মেয়ের সঙ্গে ধুতি চাদর খাবার আর ফুলের তোড়া নিয়ে সমীরণবাবুর বাড়ি চলে গেলেন। ফিরেছিলেন ঘণ্টা দুই বাদে। সমীরণবাবুকে অমনি খুশি দেখে তাঁর মনটাও খুশিই ছিল।

...বাড়িতে পা দিয়েই মনে হয়েছিল, একজন যেন নখদন্ত গুটিয়ে প্রতীক্ষায় বসে আছে। মেয়ে সরে যেতে গুটিগুটি তাঁর ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল। ঘরে আসতে হলে তখন এমনি ছলছুতো খুঁজতে হত। দু'চোখে সর্বাঙ্গ লেহন করে হাসি-হাসি মুখ করে বলেছিল, উৎসবটা ভালই হল তাহলে...তা ফুলের তোড়া কেন, মালা নিয়ে গেলেই তো হত...আর মেয়েটাকেই বা মিছিমিছি সঙ্গে নেওয়া কেন?

—দু'চোখে ঘৃণা আর বিদ্বেষ উপচে উঠছিল অপর্ণার। জবাব দেননি, চেয়ে ছিলেন শুধু।

কথাগুলো ভালো লাগল না! কী দেখছ?

জানোয়ার দেখছি! গলা দিয়ে যেন চাপা এক ঝলক আগুন ঠিকরে ছিল অপর্ণার।

...হ্যাঁ, মানুষটার মধ্যে পশুই জেগে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। যে পশুটাকে চেনেন তিনি তার থেকেও অনেক নির্লজ্জ, নির্মম। তখনকার মতো চলে গেছল। নিঃশব্দ পায়ে রাতে এসেছিল। আচমকা অতর্কিতে দখল নিয়েছিল তাঁর ওপর। সেই পশুশক্তির সঙ্গে তিনি যুঝে উঠতে পারেননি। নৃশংস ব্যভিচারী বিজয়ীর মতোই ফিরে গেছে তারপর।...রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ যেমন ফিরে আসে তেমনি পরের রাতেও এসেছিল আবার। কিন্তু সে-রাতে অপর্ণা প্রস্তুত ছিলেন। তবু পেরে উঠছিলেন না, পশুশক্তিই প্রবলতর হয়ে উঠছিল। দু'হাতে আটকে রেখে, বুকের হাড়-পাঁজর দুমড়ে দিয়ে সেই পশু গ্রাসোদ্যত হয়েছিল। সেই মুহূর্তে বুকে বিষম পদাঘাতে নিজের দেহচ্যুত করতে পেরেছিলেন তাকে। সেই আঘাতের ফলে নাক দিয়ে রক্ত ঝরেছিল। আহত বাঘ মরণ কামড় বসাতে আসে, আবার তেমন বেগতিক দেখলে পালায়ও।....পালিয়েছিল। আর আসেনি।

আজ অনেক বছর পরে ধমনীর রক্ত সেই এক রাতের মতোই উষ্ণ ঠেকছে অপর্ণা সোমের।

ইদানীং তিনি যা করেন ঠাণ্ডা মাথায় করেন। যা বলেন ঠাণ্ডা মাথায় বলেন। অপর্ণার নিজের অন্তত তাই বিশ্বাস। আর বিশ্বাস ওই মানুষ তাঁর এই ব্যক্তিত্বের কাছেই স্তিমিত। এই বক্তিত্ব তিনি জাহির করে বেড়ান না। তবু ওই লোক সেটা অনুভব করে বুঝতে পারেন। অন্যথায় তার উগ্র রূপ জানা আছে।

সেদিনটা বাদ দিয়ে পরের রাতে প্রস্তুত হয়েই ঘরে ঢুকেছেন আবার।

দুহাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। সোজা মুখের দিকে চেয়ে বলেছেন, বিয়েতে কত খরচ হবে তার মোটামুটি হিসেব করেছিলাম।...সুপার গয়না সামান্য যা আছে তা বাদে আরো হাজার ষোলো টাকা লাগতে পারে ধরেছিলাম, নগদ তিন হাজার নিয়ে! তুমি ফ্রিজের কথা বলতে আরো হাজার আড়াই বাড়ল—সবসুদ্ধ সাড়ে আঠেরো উনিশ হাজার লাগবে—উনিশ হাজার ধরে রাখাই ভালো।

বরেন সোম মন্তব্য করেননি। দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর নড়াচাড়া করছিল। আসল বক্তব্য শোনার প্রতীক্ষা। খরচের হিসেব শোনাতে যে আসেনি জানা কথাই।

ইচ্ছে করে সময় নেবার আগ্রহ নেই। খুব ধীর ঠাণ্ডা সুরে অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ের বিয়ের জন্য তুমি কত টাকার ব্যবস্থা ঠিক রেখেছ?

গতকাল ফ্রিজের কথা বলে তাঁকে জব্দ করতে চেষ্টা না করলে অপর্ণা সোম এ-প্রসঙ্গ নিয়ে ঘরে ঢুকতেন না। মেয়র বাপের ক্ষমতার খবর তিনি রাখেন। চাকরির সিঁড়ি ধরে উন্নতির উত্তুঙ্গ শিখরে ওঠার আশা অনেক আগেই গেছে।...অনেক বছর আগের সেই অঘটনের পর থেকেই। প্রাণান্তকর টানা-হেঁচড়ার পর চাকরি বজায় থেকেছে বটে, কিন্তু চাকরির রেকর্ডের সেই কালো দাগ সবটুকু মুছে গিয়ে আবার ঝকঝকে সাদা হবার সম্ভাবনাও তখনি ঘুচে গেছে। এখন মোটামুটি পদস্থ অফিসার, এই পর্যন্ত। মাঝারি মাইনে। যে আশা ছিল বরেন সোমের নিজের, আর বিয়ের আগে অপর্ণা সোমের বাবা-মায়ের, সে তুলনায় অন্তত কিছুই নয়। এ-বাজারে সংসার চালিয়ে, মেয়ের লেখা-পড়া, নাচ-গান-বাজনার খরচ জুগিয়ে ওই মাইনে থেকে আর উদ্‌বৃত্ত কী থাকতে পারে সে ধারণা অপর্ণার আছে। ওই লোক জীবন তাঁর যত বিষময়ই করে তুলুক, চোখে ঠুলি পরে বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেননি তিনি। উদ্‌বৃত্ত থাকা সম্ভব নয় তিনি জানতেন। তাই আশাও কিছু করেননি। মেয়ের বিয়েতে ওই বাপ আর্থিক ব্যাপারে কর্তব্য পালন করবে সে সম্ভাবনা মন থেকে এক রকম ছেঁটেই দিয়েছিলেন। তার ওপর ছেলে অপছন্দ করার সুযোগ যখন পেয়েছে তখন তো কথাই নেই। দু'দিন আগেও, অর্থাৎ ছেলের বাড়িতে ফ্রিজের খোঁচা দেবার আগে পর্যন্ত নিজের সম্বলের ওপর ভরসা করেই এগিয়েছেন অপর্ণা। এখনো তাই এগোবেন। এই মানুষের হাতে মেয়ে সঁপে দিয়ে বাবা-মা তাঁকে যতখানি নিঃস্ব করেছেন, বিত্তের দাক্ষিণ্যে তাঁরা তার অনেকখানি পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। অন্য বোনেরা যা পেয়েছে অপর্ণা সোম তার ঢের বেশিই পেয়েছেন। শান্ত চিত্তে বাবার দেওয়া টাকা তিনি গ্রহণ করেছেন। একদিন না একদিন টাকার দরকার হবেই। কারণ, তখন থেকে তিনি এই বাস্তবের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। মেয়ের বিয়ে আর তারপরের মুক্তির কঠিন বাস্তব।

আড়াই হাজার টাকার বাড়তি খরচ এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। এও তিনি অনায়াসে বহন করতে পারেন। তাছাড়া একটা ফ্রিজ দিলে নিজের মেয়েই খুশি হবে। কিন্তু এই গোছের হীন ছোবল তিনি বরদাস্ত করবেন না। ফ্রিজের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছিল শুধু তাঁকে দংশন করার জন্য। তার সমুচিত জবাব দেবেন বলেই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, এবং এই সুরে খরচের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

বরেন সোমের ঈষৎ চঞ্চল দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর স্থির হতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু স্থির হতে পারছে না। আগের দিনের মতোই একটা ক্রূর অভিলাষ চিকচিক করছে বলে অপর্ণার মনে হল। স্বামীর চোখে ব্যভিচারী দৃষ্টি দেখতে কোনো স্ত্রী অভ্যস্ত কি না জানেন না, কিন্তু অপর্ণা সোম অনভ্যস্ত নন খুব। তিনি স্থির নেত্রে চেয়ে আছেন। জবাব শোনার অপেক্ষায় আছেন।

একটু সময় নিয়ে বরেন সোম জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকার ব্যবস্থা ঠিক রেখেছি মানে?

মানেটা খুব কঠিন লাগছে?

একটু লাগছে।...গলা দিয়ে যেন গলিত বিষ ঢাললেন বরেন সোম।—আমার ব্যবস্থার বাইরে যা লাগবে সেটা দেবার জন্য কি আর কোনো উদার ভদ্রলোক এগিয়ে আসবেন?

এই হীন উক্তির উদ্দেশ্য অপর্ণা বুঝতে পারেন। তাঁকে তাতিয়ে তুলতে চায়, তাঁর মাথা মাথা গরম করে দিতে চায়। সত্যিকারের এক উদার ভদ্রলোককে টেনে এনে নিম্নস্তরের কথা কাটাকাটির মধ্যে ঢুকতে চায়। নইলে টাকা কোথা থেকে আসবে সেটা খুব ভাল করেই জানা আছে। বাবা তাঁকে কত টাকা দিয়েছেন সে-খবর জানা আছে। তাঁর পিতৃদত্ত ওই সম্বল এই লোকের সব থেকে বেশি পরিতাপের বস্তু।

জবাব দিলেন, দরকার হলে আসতে পারেন, সে রকম উদার ভদ্রলোকের অভাব যে নেই সেটা তুমি ভালোই জানো।....এলে তোমার মাথা কাটা না যাক আমার যাবে। যা জিজ্ঞাসা করছি তার সোজা জবাব দাও।

বরেন সোম হেসে উঠলেন একটু। বলা বাহুল্য, অপর্ণার চোখে সেটা কুৎসিত ঠেকল। তারপরের ছলনাশ্রয়ী উক্তিও অপ্রত্যাশিত নয়। ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি টেনে বরেন সোম বললেন, ও, তোমার যে অনেক টাকা ভুলেই গেছি। তাহলে আমার কাছে এসেছ কেন, মেয়ের বিয়ে আমি দিচ্ছি না তুমি দিচ্ছ?

আমিই দিচ্ছি। কিন্তু সেটা তোমার সহ্য করতে অসুবিধে হচ্ছে দেখছি। বার বার বাধা দিতে চেষ্টা করে আর আমাকে জব্দ করার জন্য ওইভাবে ফ্রিজের কথা বলে মেয়ে যে তোমারও সেটাই তুমি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছ। দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা থাকলে আমার বুঝতে আপত্তি নেই—

লোকটার চাউনি আরো নির্লজ্জ, আরো নগ্ন ঠেকল। ঠোঁটের হাসিও। ওই চাউনি আর হাসি দিয়ে সর্বাঙ্গ লেহনের অভিলাষ যেন। ঘুরে ফিরে একটা নামের ওপর বিষ ছড়ানোর সুযোগ মিলেছে। বললেন, মেয়ে আমারও বই কি, সুপার ছ'মাস পরে তো সমীরণের বাড়িতে উঠে এসেছিলাম—অস্বীকার তুমি আমি কেউই করতে পারছি না। যাক, দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা থাকলে তোমার বুঝতে আপত্তি নেই বলছ? দায়িত্ব নিলে তুমি এ বিয়ে বন্ধ করবে?

এখনো মাথা গরম না করতে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন অপর্ণা সোম। কিন্তু ঘৃণা আর রোষের অভিব্যক্তি চোখেমুখে ছড়িয়েই পড়েছে। প্রশ্নের অনুপ্রাসের মতো আগের যে হীন ইঙ্গিতটুকু, তা শুধু এই একজনের দ্বারাই সম্ভব।

অনুচ্চ কঠিন স্বরে জবাব দিলেন, না। বিয়ে সুপা করছে!

আমি জানি বিয়ে সুপা করছে। সুপা করছে, তুমি দিচ্ছ। সুপার কাণ্ডজ্ঞান নেই তাই করছে, আর আমি নিষেধ করছি তাই তুমি দিচ্ছ।

এবারে মুখের ওপর অপর্ণা তপ্ত ব্যঙ্গ ছুড়ে দিলেন একপ্রস্থ।—তুমি নিষেধ করছ কেন, তোমার মতে বিকাশ সিংহ রঞ্জনের থেকে ভালো ছেলে?

হ্যাঁ, ঢের ভালো ছেলে। কত ভালো ছেলে তুমি জানো না, জানলে তোমারও আনন্দ হত, জানতে চাও তো এখনো শোনাতে পারি—

অপর্ণা চেয়ে রইলেন একটু। দু'চোখে ঘৃণা আর বিদ্বেষ উপচে পড়ছে।—লোকে নিজের চরিত্র দিয়ে অন্যের ভাল-মন্দ বিচার করে। বিকাশ সিংহকে এত ভাল যে দেখছে তার নিজের চরিত্রখানা কেমন?

বরেন সোমের উত্তেজনা সমে নেমে এলো। আর জবাব দিতে পারলেন না। কটূক্তি করতে পারলেন না। দু'চোখে আহত জন্তুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

এবারে আরো ভাল করে বিঁধবার সুযোগ অপর্ণার। গলার স্বর তেমনি অনুচ্চ। কিন্তু আরো বেশি টনটনে।—তাহলে তুমি এ বিয়ের কোনোরকম দায়িত্ব নিতে রাজি নও?

চাউনিটা আস্তে আস্তে বদলাতে লাগল বরেন সোমের। মুখের ওপর থেকে চোখ নামালেন। ভুরু কুঁচকে দুই এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন, আমার মেয়ে অস্বীকার করছ না যখন দায়িত্ব সবটাই নেব। বিয়ে যদি হয় টাকা পাবে।

এরপর দায়িত্বের কথাটা অপর্ণা আর স্মরণ করিয়ে দেননি। দিলে দুই-একটা বাজে তর্ক টেনে এনে পিছু হটার পথ পাবে। কিছু না বলাটাই বরং খোঁচার মতো বিঁধবে। উনিশ হাজারের মধ্যে এ পর্যন্ত একবার চার হাজার দিয়েছে। সেও সেদিন নীচের ঘরে স্বর্ণকারের সামনা-সামনি পড়ে গেছল বলে। আর সে ঘরে তখন তার প্রিয়পাত্র বিকাশ সিংহ উপস্থিত ছিল বলে।

...স্বর্ণকার গয়না নিয়ে এসেছিল। চাকরকে দিয়ে ওপরে খবর পাঠিয়ে বরেন সোম তার কাছে থেকে বিলটা চেয়ে নিয়েছিলেন। অপর্ণা নেমে আসার আগেই বিকাশকে বিদায় করে ওপরে উঠেছেন। অপর্ণা যখন গয়নার ওজন দেখছিলেন তখন আবার নেমে এসে চার হাজার টাকা তাঁর সামনে রেখে চলে গেছেন। গয়নার দিকে ফিরেও তাকাননি।

ব্যস, বাহাদুরি ওখানেই শেষ। আজ বাদে কাল বিয়ে, টাকার ব্যাপারে এ-যাবৎ মুখ সেলাই।

পাঁচ

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খাবার ঘর পেরিয়ে আবার সিঁড়ির দিকে এগোতে পা দুটো হঠাৎ যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল অপর্ণার। যে-ঘরের দরজা বন্ধ করে সুপা আর তার বন্ধুরা হই-হুল্লোড় করেছিল সে-ঘরের দরজা খোলা। মেয়েরা চলে গেছে। শুধু সুপা বসে আছে। তার সামনে বিকাশ সিংহ।

সুপা ওদিকে ফিরে ছিল। ছেলেটার মুখ এদিক। শুকনো টান-ধরা মূর্তি। চোখাচোখি হতে আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ফলে সুপাও ঘুরে তাকালো। মাকে দেখে অপ্রস্তুত একটু।

অপর্ণা এগিয়ে এলেন। কৈফিয়ত দাখিলের সুরে সুপর্ণা বলল কি ছুটি-ছাটার ব্যাপারে বাবার সঙ্গে এঁর দেখা করা খুব দরকার! ...বাবা আছেন তো?

বিকাশের দিকে না তাকিয়ে অপর্ণা মেয়েকে বললেন, আছেন কি না সেটা আমি এসে বলব বলে বসেছিলি?

বলার ভঙ্গি রূঢ়ই একটু। সুপা তাড়াতাড়ি সামাল দিতে চেষ্টা করল। বিকাশের দিকে ফিরে বলল, দেখে আসি, আপনি বসুন একটু।

দেখতে হবে না। অপর্ণা বাধা দিলেন, তারপর একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটার চোখে চোখ রাখলেন।—আছেন, ওপরে চলে যাও। কাল আসছ তো?

কাল যে মেয়ের বিয়ে তার কাছে ওকে বসে থাকতে দেখে অপর্ণার মেজাজ বিগড়েছিল। শেষের উক্তিতে আপ্যায়নের লেশমাত্র ছিল না, বরং ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত বিদ্রূপের আঁচ। আর আজ কোনো দরকারে মুরুব্বির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তাও বিশ্বাস্য নয়। নির্লজ্জ বেহায়া ভিন্ন এ-ভাবে কেউ আসে না।

যে-জবাব কানে এলো তাও মা-মেয়ে দু'জনার কাছেই অপ্রত্যাশিত। অভিমানহত ছেলেটা যেন ঝপ করে বলে বসল, হ্যাঁ, তা তো আসবই।

এগিয়ে গেল। অসহিষ্ণু পদক্ষেপে সিঁড়ি ধরে দ্রুত ওপরে উঠে গেল। অপর্ণা সেদিকে চেয়ে রইলেন। সুপর্ণাও।

ছেলেটা অদৃশ্য হতে সুপর্ণা হেসেই উঠল।

ওই ছেলের থেকেও অপর্ণা মেয়ের ওপর বেশি বিরক্ত হয়েছিলেন। সুপার দিকে ফিরলেন আস্তে আস্তে। চাপা ঝাঁঝে বললেন, থাম! কেবল হাসি আর হাসি—অত মন দিয়ে কী শুনছিলি, ও কী বলছিল।

ধমক খেয়েও সুপর্ণা হাসতেই লাগল। কী শুনছিল বা কী বলছিল, ভরসা করে মাকে সেটা খোলাখুলি বলতে পারল না! মোট কথা আজ বিকাশ সিংহর হাবভাব ভারি অদ্ভুত লাগছিল সুপর্ণার। আজ সে আসতে পারে আশাই করেনি মোটে। বাবার কাছে নয়, এসেছে ওর কাছেই। উসকো-খুসকো মূর্তি, রাতে ভালো ঘুম হয়নি বোঝাই যায়। তাকে দেখে সব থেকে বেশি অবাক হয়েছিল ঝুমুর। কিন্তু ওই ছেলে কারো দিকে তাকায়নি। এক দঙ্গল মেয়ের মধ্যেই ঢুকে পড়ে সুপর্ণাকে বলেছে, তোমার সঙ্গে একটু দরকারি কথা আছে—

ঝুমুর ছাড়া অন্য মেয়েরাও যে বিকাশ সিংহকে একেবারে না চেনে এমন নয়। সুপর্ণা আর ঝুমুরই চিনিয়েছে। কৌতূহল সত্ত্বেও তারা বিদায় নিয়েছে। ঝুমুর শুধু বাইরে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু গম্ভীর মুখে বিকাশ সিংহ ইশারায় তাকে চলে যেতে বলেছে, যেন তারই বাড়ি ঘর। সকলে চলে যেতে বাবার খবর জিজ্ঞাসা করেছে, সুপা সঠিক হদিস দিতে না পারায় মিনমিন করে বলেছে, তাঁকেও দরকার ছিল, ছুটি-ছাটার ব্যাপারে আর কি...

কি জানি কেন মুখের দিকে চেয়ে সুপর্ণা একটুও কঠিন হতে পারেনি। কঠিন হতে ইচ্ছেও করেনি। উল্টে কেমন মায়া হয়েছে তার। ভেবে নিয়েছে, ছুটি-ছাটা নিয়ে মনের দুঃখে বাইরে-টাইরে চলে যাবে বোধহয়।

যাই হোক, সুপা চুপচাপ অপেক্ষা করছিল। আজও তাকে হঠাৎ কী এমন দরকার পড়ল ভেবে পাচ্ছিল না। এই দিনেও ওকে বিয়ে বন্ধ করার অনুরোধ- টনুরোধ করে বসবে নাকি। নিজের মনেই যেন বিকাশ সিংহ হঠাৎ বলল, ইয়ে, আমার খুব বিচ্ছিরি লাগছিল, তাই চলে এলাম, ভাবছিলাম হঠাৎ যদি—

আর বলে উঠতে পারেনি। সুপা জিজ্ঞাসা করেছে, হঠাৎ যদি কী?

বলেনি কি, বিকাশ সিংহ আবারও যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তারপর ভাঙা-ভাঙা ভাবে যা বলেছে বা জিজ্ঞাসা করেছে, তার কোনো অর্থই হয় না। সুপা হ্যাঁ-না করে দুই-এক কথায় জবাব দিয়েছে। লোকটার মাথায় গণ্ডগোল হল কি না তাও ভাবছিল। এমন সময় মায়ের আবির্ভাব।

হাসিমুখেই মায়ের চোখে চোখ রেখে সুপা জবাব দিল, জিজ্ঞেস করছিল ব্যবস্থা সব ঠিক ঠিক এগোচ্ছে কি না, কোথা থেকে কে এলো না এলো এই সব। আর বলছিল, বিয়ে নির্বিঘ্নেই হয়ে যাবে নিশ্চয়, তবু খুব অস্বস্তি লাগছে তার।

কেন?

সুপা অনুযোগের সুরে বলে উঠল, সেটা জিজ্ঞেস করার আগেই তো তুমি ঘাড়ের ওপরে এসে পড়লে। আধ-মরা মানুষটাকে তোমার এ-ভাবে বলার কী দরকার ছিল।

মেয়ের গলায় সহানুভূতির আঁচ পেয়ে ভিতরে ভিতরে আরো তেতে উঠলেন অপর্ণা।—যে-ভাবে জবাব দিয়ে গেল তাকে আধ-মরা বলিস তুই?

মেয়ে আবার হেসে উঠল। সব জেনেশুনেও বেঁধে মারতে গেলে কী করবে, পুরুষ মানুষ তো।

অপর্ণা চোখের ভিতর দিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন এবার! যেভাবে তাকালে তিনি ভিতর দেখতে পান। গম্ভীর। সামনের দুটো চেয়ারের ফারাক দেড় হাতও নয়। অভ্যস্ত না হলে এ-ভাবে মুখোমুখি বসে গল্প করাও স্বাভাবিক নয়। বিশেষ ওই ছেলের সঙ্গে। মেয়েকে তিনি চেনেন, তার স্বভাব জানেন। হঠাৎ গলার সুর পালটে ঈষৎ সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, এর মধ্যে ওর সঙ্গে তোর কতদিন দেখা হয়েছে?

সুপর্ণা সচকিত একটু।—সিংহর সঙ্গে?

মুখের দিকে চেয়ে অপর্ণা জবাবের প্রতীক্ষা করছেন। প্রশ্নটা অতর্কিত বলেই সুপর্ণার সময়ের দরকার একটু।—এর মধ্যে মানে কত দিনের মধ্যে?

মেয়ের এই হাবভাব দেখে অপর্ণার সন্দেহ আরো বাড়াল বই কমল না। এক মাস হল রঞ্জন তার দলের কাজে ব্যস্ত-সমস্ত। প্রায়ই এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে। এক এক জায়গায় দু'পাঁচ দিন করে থেকে আসছে। অতএব অপর্ণা এই সময়টুকুরই ব্যাস টানলেন।—গত এক মাসের মধ্যে?

এক মাসের মধ্যে? মায়ের কোণ-ঠাসা করার মতলব বুঝতে পারছে সুপর্ণা।—তা বার কয়েক তা দেখা হয়েছেই, তার জন্যে তোমার অত—

কোথায় দেখা হয়েছে?

ইয়ে, রাস্তায়-টাস্তায়—

অসহিষ্ণু চাপা ঝাঁঝে অপর্ণা ফের প্রশ্ন করলেন, রাস্তায় আর কোথায়? আরো ক'দিন ওর ট্যাক্সিতে চড়েছিস?

বা রে, বেগতিক দেখে সুপাও গলা চড়ালো একটু, গায়ের ওপর ট্যাক্সি থামিয়ে দরজা খুলে ডাকলে কী করব—দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করলে রাস্তায় লোক জমে যাবে না!

মুখে লালের আভাস অপর্ণার।—ক'দিন ওর সঙ্গে রেস্টুরেন্টে ঢুকেছিস?

কি মুশকিল, রেস্টুরেন্টের সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে যদি বলে নামো, না নেমে আমি ট্যাক্সিতে বসে থাকব!

ক'দিন সিনেমায় গেছিস?

একদিনও না। সুপা হাঁসফাঁস করে জবাব দিল, ও বলেছিল কিন্তু একদিনও যাইনি, সত্যি সত্যি সত্যি—তিন সত্যি, আর বিশ্বাস করো, কোনদিন ও আমাকে বিয়ের কথা বলেনি, আর একদিন ছাড়া কক্ষনো খারাপ ব্যবহারও করেনি।

নিজের বে-ফাঁস কথায় নিজেই জড়াচ্ছে সুপর্ণা। অপর্ণার স্বর তেমনি মৃদু, কঠিন। কয়েক পলকে অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন, একদিন কী খারাপ ব্যবহার করেছিল?

কথা হাতড়ে হাতড়ে সুপা জবাব দিল, ইয়ে, ইনস্টিট্যুটে নাচের প্রোগ্রাম ছিল সেদিন, শেষ হতে সেখানকার লোকেরা বলল, আপনার লোক ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করছেন। আমি ভেবেছিলাম রঞ্জন। এসে দেখি ওই মূর্তি—মানে তোমাদের ওই সিংহ মশাই। সেদিনের নাচ এত ভাল হয়েছিল, ও বলল, বিচ্ছিরি। আমিও রাগ করে তখন দু'কথা শোনালাম। তখন ওই সিংহ সিংহর মতো ফোঁস ফোঁস করে উঠল, বলল, আমি বরেন সোমের মেয়ে না হলে ও আমাকে এর থেকে ঢের ভালো নাচ দেখিয়ে ছাড়ত—

বলতে বলতে হঠাৎই কথাটার একটা বিচ্ছিরি কদর্য মানে মনে আসতে, সুপর্ণার সমস্ত মুখ টকটকে লাল। সামাল দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বলল আমিও সেদিন ভয়ানক রেগে যেতে তখন নরম হয়ে ক্ষমা-টমা চাইলে—

অপর্ণা মেয়ের মুখের ওপর থেকে একবারও চোখ ফেরাননি। তেমনি রূঢ় গাম্ভীর্যে জিজ্ঞাসা করলেন, ও এই সব করে বেড়াচ্ছে আমাকে একদিনও জানাসনি কেন?

হ্যাঁঃ, যে মেজাজ হয়েছে আজকাল তোমার। আসলে কি জানো ছেলেটা গোঁয়ার গোছের আর অল্প-বুদ্ধি, কিন্তু সত্যি সত্যি খারাপ নয়।

সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙল অপর্ণার। চিড়-বিড় করে উঠলেন তিনি।—এই ছেলেটার জন্যেও তোর তাহলে বেশ মায়া পড়েছে এখন, কেমন?

মায়ের তীক্ষ্ণ ঠেসের তাৎপর্য বোঝামাত্র সুপর্ণা আধা-আধি রেগে গেল।—কী যে হয়েছে মা তোমার আজকাল ঠিক নেই—লোক খারাপ নয় বললেই তার ওপর আমার মায়া পড়ে যাবে! তাছাড়া রঞ্জনের কড়ে আঙুলের যোগ্য নাকি ও।

মা-মেয়ের উষ্ণ আলাপে ছেদ পড়ল। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। বিকাশ সিংহ নেমে আসছে। নেমে এলো। দুটি অচেনা মুখের পাশ কাটানোর মতো করে এগোতে সুপার ঠোঁটের ডগায় হঠাৎ আবার কৌতুক ঝিলিক দিল। বলে উঠল, কাল ঠিক আসছেন তো তাহলে?

বিড়বিড় করে বিকাশ সিংহ জবাব দিল, আসব বই কি, ঠিক আসব।

চলে গেল। মেয়ে হাসছে। এই হাসিও অপর্ণার চক্ষুশূল। বাইরের দিকে আর একবার মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি সিঁড়ির দিকে ফিরলেন।

মেয়ের এই স্বভাবের জন্যই দুর্ভাবনার অন্ত নেই অপর্ণার। খুব রাগ হলে এক এক সময় মনে হত মেয়ের স্বভাব-চরিত্রও বুঝি বাপের মতোই হল। ওর খুব ছেলেবেলায় মা আবার আদর করে বলত, বাপ-মুখো মেয়ে সুখী হবে দেখিস। শোনামাত্র পিত্তি জ্বলে যেত অপর্ণার। বয়েসকালে বাপ অসুন্দর ছিল কেউ বলবে না, এখনো বাইরের খোলসটা মোলায়েম, সুশ্রী। কিন্তু সেটা যে কত কৃত্রিম অপর্ণার থেকে ভাল কেউ জানে না। তাঁর বদ্ধ ধারণা, ভিতরে অত কদর্য কুৎসিত কোনো পুরুষ মানুষ হয় না। মেয়ে সেই বাপের মুখ পেলে ভিতরটাও যে পাবে না কে বলল? সেই কারণেই মায়ের কথা শুনলে রাগ হত অপর্ণার।

দু-দু'বার কী বিষম ত্রাসই না গেছে। ক্ষোভে রাগে দুঃখে তখন কেবলই মনে হয়েছে, ওই বাপের মেয়ে কত আর ভাল হবে! তখন সতেরো বছর মাত্র বয়েস সুপার। নাচের স্কুলের এক ডবল বয়সের মাস্টারকে বিয়ে করবেই বলে ঘোষণা করেছিল মেয়ে। মেয়ের নাচের স্কুলে অপর্ণারও যাতায়াত ছিল। তারও চার বছর আগে থেকে সুপা সেই স্কুলের ছাত্রী। আগে অপর্ণাই তাকে পৌঁছে দিতেন, নিয়ে আসতেন। পরেও রোজ না হোক মাঝে মাঝে যেতেন। ওই মাস্টারকেও দেখেছেন। রোগা, কাঁধ অবধি বাবরি চুল। ক্রমাগত বিড়ি সিগারেট খাওয়ার দরুন দুই ঠোঁট কুচকুচে কালো। কোন্ নামী শিল্পীর কাছে নাচ শিখেছিল বলে তার কদর। অপর্ণা কোনোদিন তাকে সুনজরে দেখেননি, কেন জানেন না। হয়তো মেয়েদের নাচের স্কুলে বেটাছেলের নাচ শেখানোটাই পছন্দ নয়।

সতেরো বছর বয়সে মেয়ে ওই লোককে বিয়ে করতে চায় শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। প্রথমে ধমক ধামক দিয়েছেন, শাসিয়েছেন, নাচের স্কুলে নালিশ করেছেন। শেষে স্কুল থেকে নাম কাটিয়েও মেয়ের মন থেকে লোকটাকে সরাতে পারেননি। মা-নেই বাবা নেই আত্মীয়-পরিজন নেই এমন এক নিঃসঙ্গ শিল্পীর জন্যে আত্মোৎসর্গ না করে উপায় নেই সুপার। মনের দুঃখে লোকটা যদি আত্মঘাতী হয়ে বসে তো কে দায়ী হবে? আর, ও বিশ্বাসঘাতকতা করলে এই গোছের কিছু মর্মান্তিক কাণ্ডই ঘটবে।

ব্যাপারটা মেয়ের বাপের কানেও গেছল কী করে অপর্ণা জানেন না। অবশ্য মেয়ে ভালো লোকের সঙ্গে মিশছে না, কিছুদিন আগে রূঢ় মুখে এই আভাসও বরেন সোমই তাঁকে প্রথম দিয়েছিলেন। মনে হয়, তখন অপর্ণার মুখ দেখেই কিছু একটা বিপদ আঁচ করেছিলেন। বিপদের কথা একটুও চিন্তা না করে উল্টে যেন স্ত্রীর উপরেই নিষ্ঠুর হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন। অপর্ণার অন্তত তাই ধারণা হয়েছিল। ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বরেন সোম বলে গেছলেন, নাচ শিখিয়ে মেয়েকে কী চমৎকার আধুনিকাই না বানানো হয়েছে—এত যখন সুবিধে মেয়ে একা কেন, মেয়ে-মা একসঙ্গে নাচ শিখতে গেলেই তো ভালো হত!

অপর্ণাও ফুঁসেই উঠেছিলেন সেদিন। দরজার সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জবাব দিয়েছিলেন, মেয়ের গায়ে কার রক্ত জানা নেই? এর থেকে ভাল হবে কী করে—আনন্দ তো তোমার হবার কথা—হয়েছে যে দেখাও যাচ্ছে।

শেষে সমীরণ দত্তর শরণাপন্ন হতে মুশকিল আসান। ছ'মাস বয়েস থেকে যাকে দেখে আসছে আর স্নেহ আদর ভালবাসা পাচ্ছে তার প্রতি সুপর্ণার অগাধ বিশ্বাস। ওর সমস্ত আব্দার এই একজনই হাসিমুখে শুনে থাকেন। মেয়েকে ডেকে তিনি গায়ে পিঠে হাত বুলিয়েছেন, ওর আত্মত্যাগের মহিমা একমাত্র তিনিই উপলব্ধি করেছেন। তার সামনেই অপর্ণাকে বোঝাবার মতো করে বলেছেন, মেয়ে

যখন চায় বিয়ে দিতে হবে, এত বড় ত্যাগ ব্যর্থ হয় না। তবু একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার এবং সেটা তিনিই করবেন।

করেছেন। এবং বিমর্ষ মুখে ফিরে আবার মেয়েকেই সান্ত্বনা দিয়েছেন তিনি। তাঁর হাতে ফটো দু'খানা। শিল্পীর বুড়ো বাপ-মায়ের ছবি—প্রায় বিকল মূর্তি দুটো। আর শিল্পীর রোগা বউ আর রোগা রোগা দুটো ছেলেমেয়ের ছবি। এরা সবাই গাঁয়ে থাকে, ভালো করে খাওয়া-পরাও জোটে না।

সুপার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছিল। মুক্তির স্বাদে হাল্কা বোধ করেছিল। সে যেন একটা কলে আটকে পড়ে শিল্পীর প্রেমের বলি হতে চলেছিল।

অপর্ণা ফুঁসে উঠেছিলেন।—লোকটাকে পুলিসে দেওয়া দরকার। উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

সমীরণ দত্ত বলেছেন, কিছু দরকার নেই। মেয়েকে শুধু আর ওই স্কুল-মুখো হতে দিও না।

অপর্ণা সভয়ে তাঁর উপদেশ শুনেছেন। তাঁর ধারণা সমস্ত ব্যাপারটাই সমীরণবাবুর সাজানো। এরপর সত্যিই আর মেয়েকে নাচের স্কুল পাঠাতে সাহস করেননি, বাড়িতে মোটা মাইনের শিক্ষয়িত্রী রেখে মেয়েকে নাচ শিখিয়েছেন তিনি।

পরের বারের ব্যাপারটা আরো সংকটের দিকে গড়াতে পারত। মেয়ের তখন কুড়ি বছর বয়েস, কলেজে পড়ে। আর নাচের আসরেও নাম হয়েছে। ছোট আর মাঝারি অনুষ্ঠানে নাচের আমন্ত্রণ আসে। আর মেয়ে তখন এই গুণে দুনিয়া বশ করার স্বপ্ন দেখছে। তার বাক্সয় ভক্তদের চিঠি জমেছে। এই সময়ে বরেন সোমই একদিন অপর্ণাকে শুনিয়ে এবং সমীরণবাবুকে লক্ষ্য করে রূঢ় মন্তব্য করেছিলেন সব তো কবিতার রাজ্যে আছে, মেয়ে ওদিকে আবার কার সঙ্গে মেলামেশায় মেতেছে কে খবর রাখে।

আশ্চর্য, সুপার সতেরো বছরের প্রেমের ব্যাপারটাও প্রথমে বরেন সোমের কাছেই ধরা পড়েছিল। আর মেয়ের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে তিনিই প্রথম অপর্ণাকে সচেতন করেছিলেন। এবারেও তাই। ...বড়লোকের গাড়িতে চেপে মেয়েকে প্রায়ই হাওয়া খেয়ে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে।

সুপাকে ধরে জেরা করতেই ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল। তখন আর সে সতেরো বছরের নাবালিকা নয়, নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। জিজ্ঞাসা করা মাত্র স্বীকার করল। এবং ঘোষণা করল সে বাঁধা রাস্তায় পা ফেলে চলার মেয়ে নয়। চলবেও না। যার সঙ্গে গাড়িতে বেড়ায় সেই ছেলে অবাঙালি, কিন্তু হিন্দু। ব্যবসা করে, পয়সা আছে, বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, বয়েস তিরিশের মধ্যে। শিল্পানুরাগী। একাধিকবার বাইরে গেছে। শিল্পী স্ত্রী পেলে এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়েই বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে। আরো বড় শিল্পী করে আনবে তাকে, বাইরের খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠা পেলে তবেই দেশের শিল্পীর ইজ্জত আর কদর। তা না পাওয়া পর্যন্ত এ-দেশ কাউকে মর্যাদা দিতে জানে না। ...সুযোগের প্রত্যাশায় বিদেশের কয়েকটা প্রতিষ্ঠানে চিঠিও লেখা হয়েছে।

এক মাসেরও ওপর কি ত্রাসেই না কেটেছে অপর্ণার! জানাজানি হতে মেয়ের যেন সুবিধেই হল। সে বে-পরোয়া। রাগ করে সুবিধে হবে না বুঝে মেয়েকে অনেক তোয়াজ তোষামোদ করেছেন। বকতে গিয়ে একদিন কেঁদে ফেলেছিলেন পর্যন্ত। কোনো ফল হয়নি। অপর্ণা সোম আবারও সমীরণ দত্তরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সুপা আজও এই লোককেই সব থেকে বেশি ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। পরীক্ষা এলে এই মানুষই প্রধান সহায় তার। কিন্তু সুপার স্পষ্ট কথা, মাকে তুমি এত ভাবতে বারণ করো তো কাকু, আমি এখন আর খুকিটি নই—নিজের ভাল-মন্দ বোঝার বয়েস হয়েছে। এরপর দেখো মায়েরই সব থেকে বেশি আনন্দ হবে।

নিজের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সমীরণ দত্ত মাথা নেড়েছেন। বলেছেন, খুকি কে বলে, তুই বুড়ি, আমার সুদ্ধু মা হয়েছিস!

অনেক করে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন তিনিও। কাজ হয়নি আর মায়ের কথা বা তার অভিমানও তুচ্ছ করেছে। ও তখন এক স্বপ্নের জগতে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। অপর্ণার প্রায় হাল ছাড়ার অবস্থা।

ওপরওয়ালা রক্ষা করলেন। কাগজে কাগজে শহরতলির এক নিভৃতে গণমান্য পদস্থ লোকদের মধুকুঞ্জ রচনার রসালো খবর ছড়াল একটা। সরকারের নানা বিভাগের হর্তাকর্তারা এবং বড় বড় রসিক ব্যবসায়ীরা সেই কুঞ্জের সভ্য। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের আনাগোনা সেখানে, নাচ-গান আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা। নানাভাবে টোপ ফেলে তাদের টেনে আনা হচ্ছে। স্বার্থের দিকে চোখ রেখে জনাকতক ব্যবসায়ী দেদার টাকা ছড়িয়ে এবং মেয়ে ভেট দিয়ে সরকারি সংস্থার অনেক কর্ণধারদের হাতের মুঠোয় পুরেছে। কাগজে কাগজে এই নিয়ে সম্পাদকীয় এবং চিঠি-পত্র লেখা হল।

এই সময় অপর্ণা সোম ডাকে বে-নামী চিঠি পেলেন একখানা। চিঠির বক্তব্য, তাঁর মেয়ে শ্রীমতী অমুক সোম আজকাল যে-লোকের গাড়িতে চেপে অত বেশি হাওয়া খাচ্ছে এবং যার সঙ্গে বড় বড় হোটেল রেস্তোরাঁ চষে বেড়াচ্ছে সেই লোকটি ওই মধুকুঞ্জ সংস্থার একজন সক্রিয় সদস্য, পত্রলেখক বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেই এ খবর জানাচ্ছে—এখনো সাবধান না হলে মেয়ের বিপদ আসন্ন এবং সে-বিপদ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে অপর্ণা সে-চিঠি নিয়ে তক্ষুনি সমীরণ দত্তর কাছে ছুটেছিলেন। কী করা যেতে পারে কেউ ভেবে পেলেন না। শেষে সুপাকে সোজাসুজি জানানোই ঠিক হল। কিন্তু সে-চিঠি দেখাতে সুপা ঝাঁঝিয়ে উঠল, বিশ্বাস করি না!

সমীরণবাবু মাথা নেড়ে সায় দিলেন, আমরাও বিশ্বাস করি না, বা করতে চাই না। কিন্তু খোলাখুলি যাচাই হওয়া দরকার। কারণ, এ-সব যারা করে বেড়ায় লোকের চোখে তারা অবিশ্বাস্য রকমই ধুলো দিয়ে থাকে। ধুলো দেওয়ার দুই একটা ঘটনা ফাঁপিয়ে তুললেন। অতএব যাচাই না হওয়া পর্যন্ত সুপাকে ক'টা দিন অন্তত সাবধানে থাকতে হবে। এবং ওই লোকের সম্পূর্ণ অগোচরেই যাচাই করবেন সে-প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

সুপা আপত্তি করেনি। আপত্তি করবে কী করে, কাগজের খবরটাকে তো মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। মেয়ে মুখে যত তেজই দেখাক ভিতরে ঘাবড়েছিল তাতে অপর্ণার একটুও সন্দেহ নেই।

সমীরণবাবুর স্নেহ-ধন্য এক কৃতী ছাত্রের বাবা আই. বি'র বড় অফিসার। উড়ো চিঠিটা সমীরণবাবু নিজে গিয়ে তাঁর হাতে সঁপে দিলেন। চিঠিটা পেয়ে ভদ্রলোকও খুশি হলেন এবং তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে বললেন।

এর পরে কী ঘটল কেউ জানে না। ফলাফলটুকু শুধু কানে এলো। সেই পয়সাওলা অবাঙালি ছেলে অর্থাৎ সুপর্ণার স্বপ্নসাগরের কাণ্ডারী নিঃশব্দে আকাশপথে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। যাবার যাগে তার অনুরাগিণী শিল্পীকে একটা চিঠি লিখে বা টেলিফোন করে জানানোরও ফুরসত পায়নি। কবে ফিরবে কেউ জানে না, কখনো ফিরবে কি না, তাও না!

অপর্ণার ধারণা এবারেও সমীরণবাবুই গোঁজামিল দিয়েছেন কিছু! হয়তো বা সেই আই-বি অফিসার শিল্প-রসিককে ভালোমতো কিছু ধাতানি দিয়েছেন। কিন্তু এখনো অপর্ণার বিশ্বাস মেয়ে আজও সেই মেয়েই আছে—একটুও বদলায়নি। লোকে যা বলে তাই বিশ্বাস করে। নতজানু হয়ে কেউ যদি ওর সামনে এলো তো দরদ উথলে উঠল। নিজের হিতাহিতের ব্যাপারে তখন কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য একেবারে।

সেই কারণেই ওই ছেলেটার অর্থাৎ বিকাশ সিংহর মুখোমুখি বসে ওকে কথা বলতে দেখে রেগে গেছলেন। আর তার প্রতি মেয়ের সহানুভূতির আঁচ পেয়ে জ্বলে উঠেছিলেন। সুপা অবশ্য বলেছে রঞ্জনের কড়ে আঙুলের যোগ্য নয়। অপর্ণাও তা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন। তবু ভিতরে অস্বস্তি কী একটা। নিজেকে মেয়েও ওই ছেলের অর্থাৎ রঞ্জনের কতটা যোগ্য সেই সংশয় এখনো উঁকিঝুঁকি দেয়। তাঁর ভয়, ছুরির ফলার মতো ওই ঝকঝক ছেলেটার মোহ ভাঙলেই মেয়েটা না ওর চোখে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এমন অবুঝ বিতিকিচ্ছিরি স্বভাব যে-মেয়ের। রঞ্জন ভাবী শাশুড়িকে যত আশ্বাসই দিক, ছেলেটা যে সর্বদা কঠিন বাস্তব মাটির ওপর দিয়ে হাঁটে তাতে কোনো ভুল নেই।

রঞ্জনের কথা মনে হতে আবার কী ভেবে অপর্ণা নিজের ওপরেই বিরক্ত। কিছু যদি মনে থাকত তাঁর, আর কত ব্যাপারেই বা মাথা খাটাবেন।...ওদের বাড়িতে ফোনটা করা হয়নি। ব্যস্তবাগীশ ছেলে

দেশ উদ্ধার করে এখনো বাইরে থেকে ফিরল কি না কে জানে। তখন নিরিবিলিতে ফোনটা করলেই হত, এখন তো আবার ওখানে একজন জাঁকিয়ে বসে আছেন।

দোতলায় ওঠার আগে এদিকে-ওদিকে তাকালেন একবার। সমীরণবাবু চলে গেছেন। ...খানিকবাদেই আবার ঘুরে আসবেন নিশ্চয়। সারাক্ষণ মাথায় দুশ্চিন্তা ঠেসে থাকে অপর্ণার, একমাত্র ওই একজনই আছেন যিনি সেটা ঠিক অনুভব করতে পারেন। অপর্ণাই তাঁকে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করতে বলেছেন। কিন্তু বিশেষ করে এই সময়ে চোখের সামনে না থাকলে কেমন যেন অসহায় বোধ করছেন তিনি।

ছয়

দোতলায় উঠতেই চোখে পড়ল বারান্দার ও-ধারে বর্ধমানের মেজ ননদ ধীরা আর বেলেঘাটার ছোট ননদ মীরা দাঁড়িয়ে। চাপা সুরে কিছু একটা পরামর্শ চলেছে। কাজ সম্পর্কে পরামর্শ নয় সেটা মুহূর্তে বোঝা গেল। তাঁকে দেখে দুজনেই থমকে তাকালো। তারপর ধীরা এগিয়ে এলো। গম্ভীর। পিছনে মীরাও।

বউদি, রাগ না কর তো একটা কথা বলি।

অপর্ণা তক্ষুনি নিশ্চিত জানেন ভাল কিছু শুনবেন না। শ্বশুরবাড়ির দিকের কোনো প্রাণী কখনো ভালো কিছু শোনায়নি তাঁকে। আজও ভালো কেউ কিছু বলবে না। জবাবে সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু মুখে বলে উঠলেন, মাথার ঠিক নেই এখন আমার, রাগের কথা বললে রাগ করব নিশ্চয়।

কিন্তু ধীরারও বিনয়ের সুনাম নেই! জবাব দিল, আমি তো দেখছি মাথা একমাত্র তোমারই ঠিক আছে। সুপাটার পর্যন্ত চোখের দেখা পেলাম না এখনো। যাক, তুমি রাগ করো আর যা-ই করো আমি মন্দ কথা বলছি না।...এখন দেখছি আমরা যে একদিন আগে এসে এ ভাবে চড়াও হয়ে বসব তুমি জানতেও না। দাদা তোমাকে কিছুই বলেনি। এ অবস্থায় ফাঁপরে পড়লেও তুমি বলে মাথা ঠাণ্ডা রেখেছ। শোনো, ছেলেপুলে নিয়ে আমি এখন মীরার সঙ্গে বেলেঘাটায় ওদের বাড়ি চলে যাচ্ছি, আমাদের জন্যে তুমি একটুও ব্যস্ত হয়ো না, কাল বিকেলের আগেই আমরা আসব আর ঘটা করে বিয়ে পার করে দিয়ে তবে নড়ব—

অপর্ণা চেয়ে আছেন। কান দুটো শুধু দপদপ করছে। মাথায় এক্ষুনি জল না চাপড়ালেই নয়। কিন্তু ফয়সালা না করে নড়া সম্ভব নয়।

তোমাদের এ-খবর কে দিলে?

তোমার না জানার খবর?...আমারই সন্দেহ হয়েছিল, তারপর মীরা বলল। তোমাদের বৃন্দাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে সে হকচকিয়ে গেল। কাজের ছুতোয় সামনে থেকে পালিয়ে গেল। তারপর একটু আগে আমি সোজা দাদার ঘরে গেছলাম, দাদা স্বীকার করল তোমাকে কিছু বলা হয়নি।

অপর্ণার মুখ লাল, গলার স্বরও ঠাণ্ডা নয় আদৌ।—তাহলে চলে যেতে চেয়ে আমাকে এখন বিঁধছ কেন? তোমাদের ব্যবস্থা তোমার দাদাই করেছেন, নিজে বেরিয়ে বাজার-টাজার করে এনেছেন, আলাদা বামুন ঠিক করেছেন, খেতে একটু দেরি হবে এই যা, নইলে তোমাদের আর কোনো অসুবিধে হবে না।

দেখো বউদি, রাগিও না বলছি! আমরা খাওয়ার জন্যে ছুটে আসিনি। ধীরার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।—তোমাকে কেউ বেঁধেনি বা তোমার দোষও কেউ দেয়নি। আমি আর মীরা বরং তোমার প্রশংসাই করছিলাম। কিন্তু আমাদেরও মন বলে কিছু আছে, কত আশা করে সেই তিন মাইল দূরের ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিয়ে এ-ভাবে ছুটে এসেছি শুধু খেতে? আমরা খেতে পাই না?

বলতে বলতে গলা ভেঙে এলো ধীরার। দু'চোখে জল উপচে পড়তে চাইল। পিছন ফিরে বেগেই প্রস্থানোদ্যত হল সে।

শোনো!

অনুচ্চ তপ্ত কণ্ঠস্বরে পা আপনিই থেমে গেল ধীরার। ফিরে তাকাল।

তোমরা যাচ্ছ তাহলে?

ধীরা চেয়েই রইল। জলের আভাসে দু'চোখ চকচক করছে। ভরসা করে জবাব দিয়ে উঠতে পারল না কেন যেন।

অপর্ণার এই মুহূর্তের মুখ আর কথাগুলো যেমন ঠাণ্ডা তেমন সংযত। বললেন, তোমাদের দাদা শুধু আমাকেই জব্দ করতে চেয়েছেন, শুধু আমাকে অপমান করতে চেয়েছেন। তোমরা গেলে তাঁর সে সাধ আরো বেশি পূর্ণ হবে। এ বিয়ে পণ্ড হলেও তাঁর আপত্তি হবে না। উল্টে কত খুশি হবেন তোমরা জানো না। তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে চাও তো যাও, কালও আর আসার দরকার নেই তাহলে—

হন-হন করে নিজের ঘরের দিকে চললেন অপর্ণা। একবারও ফিরে তাকালেন না। ধীরা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে।

ঘরে ঢুকে মেঝের ওপরেই বসলেন অপর্ণা। দু'চোখ জ্বলছে, দু'কান জ্বলছে, মাথার ভিতরটা জ্বলছে, সর্বাঙ্গ জ্বলছে। একটা জমাট-বাঁধা আগ্নেয় স্তূপ যেন তিনি। অপর্ণা যদি আর পাঁচটা মেয়ের মতো কাঁদতে পারতেন অঝোরে, তাহলে এই জ্বালা জুড়াত, যন্ত্রণার অবসান হত। কিন্তু তাও তিনি পারেন না।

কোনোদিন পারেননি।

...বুকের তলায় এ-আগুন আজ বাইশ বছর ধরে জ্বলছে। জ্বলে জ্বলে আগুনের পাহাড় হয়েছে।

সতেরো বছরের এক মেয়ে বিয়ের আগে হাপুস নয়নে কেঁদেছিল। অসময়ে বিয়ে দিয়ে বিদায় করতে চায় ভেবে বাবা-মায়ের ওপর অভিমান করেছিল। কিন্তু সব-কিছুর তলায় তলায় কোনো তুষ্টি কোনো কৌতূহল কোনো রোমাঞ্চের ছিটেফোঁটাও ছিল না এ কি হলপ করে বলতে পারবে?

ছিল। বিয়েটা যখন হয়েই যাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে তখন আর একটা প্রস্তুতিও চলছিল। যে-প্রস্তুতির সঙ্গে মেয়েদের নাড়ির যোগ। আর সেদিক থেকে ওপরঅলার দাক্ষিণ্যও অনুকূল। জীবনের সেই নতুন সূচনায় তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—মেয়েদের ঘর পেতে হয়, এ-ক্ষেত্রে ঘর যেন তাকে পাওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে। ছেলের মাসি, বাপ-মা আত্মীয়-পরিজন নিজেরা সেধে এসেছে, ঘটা করে তাকে পছন্দ করেছে।...তারপর জনাকয়েক বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ছেলে এসেছে। সতেরো বছরের সেই মেয়ে কি তখন ভালো করে মুখ তুলে তাকাতে পেরেছিল। পারুক বা না পারুক, অগোচর কিছু ছিল না। তেইশ-চব্বিশ বছরের এক ছেলের চোখের আওতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার তাগিদে সতেরো বছরের সেই মেয়ে ভিতরে ভিতরে ঘেমে সারা। অপর্ণার দেখা শুরু হয়েছে ছেলের দঙ্গল চলে যাবার পরে। ক'দিন ধরে একখানা সুশ্রী মুখ মনের তলায় সারাক্ষণ উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। এম. এস-সি. পাস, চাকরিতে গোড়া থেকেই বড় হবার প্রতিশ্রুতি। এমন এক ছেলের বুদ্ধিদীপ্ত সুশ্রী মুখ আর মুগ্ধ চাউনি।

মুগ্ধ? প্রতিটি খুঁটিনাটি মনে আছে অপর্ণার। তাই শব্দটা তিনি অনেক অনেক কাল আগেই বাতিল করেছেন। মুগ্ধ নয়, লোলুপ চাউনি। কিন্তু সেদিনের সতেরো বছরের মেয়ে সেটা বুঝতে পারেনি। কারণ, বুদ্ধিদীপ্ত সুশ্রীর আবরণে অনেক কুৎসিত ঢাকা পড়েছিল। কিন্তু সতেরো বছরের মেয়েটা সেদিন বোকাই ছিল বলতে হবে। কাউকে মুগ্ধ করার মতো রূপ অন্তত তার ছিল না। স্বাস্থ্য বরাবর ভাল ছিল বলে, আর সেই সঙ্গে মোটামুটি একটু শ্রী ছিল বলে আশপাশের তরুণের চোখে তখন মন্দ-নয় মেয়েটা-দেখতে গোছের কদর তার। চালাক হলে ওই চাউনি দেখেই তার সন্দেহ হতে পারত।

বিয়ের রাতটা পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষির মধ্যে বসে সারাক্ষণ এক অজ্ঞাত অস্বস্তিতে কেটেছে। বাসরের এক-ঘর মেয়ে পুরুষের মধ্যে দুটো চোখ যেন বড় বেশি ছেঁকে-ছেঁকে ধরছিল তাকে। আর নড়াচড়ার নানা অছিলায় পুরুষের হাত হাঁটু আর কাঁধের স্পর্শে গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠছিল। এমন কি চুরি করা সেই স্পর্শ এক-একবার অশোভন মনে হয়েছিল।

...তার পরের রাত্রি। শুভরাত্রি নাম নাকি তার। কিন্তু সতেরো বছরের মেয়ের অভিজ্ঞতায় অমন এক বিভীষিকার রাত্রি আর বুঝি হয় না। নতুন উৎসব-মুখরিত পরিবেশে নগ্নতার একটুকু ছায়া পড়েনি। বরং ভালই লাগছিল। আনন্দের রেশ মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

তার পরেই কী যে হয়ে গেল, সতেরো বছরের সেই মেয়ে ত্রস্ত, দিশেহারা। লোকটা যখন ঘরে এসে হাসিহাসি মুখে দরজা জানালা সব বন্ধ করল তখনো সেই সপ্রতিভ মেয়ের মনে আতঙ্কের ছায়াপাত ঘটেনি। তারপর...

তারপর ওই সুশ্রী মুখের মুখোশটা যেন হঠাৎই খসে গেল। মায়াদয়াশূন্য এক নির্লজ্জ দস্যু যেন দখল নিতে এলো। দেখতে দেখতে অপর্ণার সব আবরণ সব গোপনতা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে লাগল। ঘরের জোরালো আলোটা জ্বলছে তখনো। সতেরো বছরের মেয়ে সভয়ে প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে। ফলে পুরুষের হাতের রূঢ় হ্যাঁচকা টানে নতুন ব্লাউসটা পড়পড় করে ছিঁড়েছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেহের সবটুকু যেন তার গ্রাসের বস্তু আর নির্মম নিপীড়নের বস্তু। যন্ত্রণায় বারবার কুঁকড়ে গেছে, কাতরোক্তি করেছে, শেষে আর্তনাদ করে উঠতে চেয়েছে। তাও পারেনি। দস্যুর দাঁতগুলো তার ঠোঁটের ওপর কেটে কেটে বসেছে সর্বাঙ্গের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিতে চেয়েছে, হাড়-পাঁজর গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছে, আর সব শেষে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় চেতনা বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে। ...তারপরে, তারপরেও দয়া হয়নি, থেকে থেকে প্রবৃত্তির সেই হিংস্র তাণ্ডব চলেছে প্রায় ভোর পর্যন্ত।

সতেরো বছরের মেয়ে যৌবনের দোসরকে প্রথম থেকে ভীতির চোখে দেখেছে, বিভীষিকার চোখে দেখেছে। নির্দয় নিষ্ঠুর ভেবেছে। রাত্রি এলে বিকার-গ্রস্তের মতো সেই বাড়ি-ঘর ছেড়ে ছুটে পালাতে ইচ্ছা করেছে। দিনের বেলায় সুশ্রী মুখ সন্ধ্যার পর থেকে বীভৎস মনে হয়েছে। লোলুপ দুটো পশুর চোখ যেন তার সর্বাঙ্গ লেহন করেছে আর মিটিমিটি হেসেছে। আর রাতের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনেছে।

...এরই নাম বিয়ে? এরই জন্যে এত ঘটা এত উৎসব? সতেরো বছরের মেয়ের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়েছে। তীক্ষ্ণ চোখে সে নিজের বাবা-মাকে নিরীক্ষণ করেছে শ্বশুর-শাশুড়িকে লক্ষ্য করেছে। কেবলই মনে হয়েছে, না, এর নাম এই মিলনের নাম বিয়ে নয়। তার বেলায়, শুধু তার বেলায় নিষ্ঠুর কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। সেই ব্যতিক্রমটা সে আঁতি-পাঁতি করে খুঁজেছে।

খুঁজে পেয়েছে। পেতে সাহায্য করেছে এই মেজ ননদ—ধীরা।

বছরখানেকের ছোট তার থেকে। কিন্তু বুদ্ধিতে আর জিভের জোরে তার থেকে অনেক গুণ পাকা। বউদির সঙ্গে গলা ছেড়ে ঝগড়া যেমন করত আবার ভাবের সময় গলা জড়িয়ে ধরে আদরও করত। মাসকয়েক যেতে চুপি চুপি রহস্যটা একদিন সে-ই ফাঁস করে ফেলেছিল। এমন একটা উত্তেজনার ব্যাপার ওই বয়সের পাকা মেয়ে কতদিন আর বুকে চেপে বসে থাকবে। বোনেদের সঙ্গে দাদা যদি মোটামুটি সদয় ব্যবহার করত তাহলেও কথা ছিল। উঠতে বসতে ধমক-ধামক বকাবকি। বেশি রাগলে গায়ে হাতও উঠত।

দাদার সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার রহস্যটা সে-ই একদিন ব্যক্ত করল। রহস্য পাশের ছোট দোতলা বাড়িটা। সেই বাড়ির একটি মেয়ে। বামুনের বাড়ি, বামুনের মেয়ে। যে মেয়ে তার বিয়ের প্রায় ছ'মাস বাদে সেদিনই সকালে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে পদার্পণ করেছে। নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে সতেরো বছরের অপর্ণা সেই সকালেই দেখছেন তাকে।...মনোযোগ দিয়েই দেখছিলেন হয়ত। আর তখন ঘরের লোকের কাছ থেকে একেবারে অকারণে ধমক খেয়ে অবাক হয়েছেন।

জানালায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির দিকে চেয়ে থাকাটা কী অপরাধ বুঝতে পারেননি। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঈষৎ বিস্ময়ে মুখের দিকে তাকিয়েছেন। সেই সকাল থেকেই ঘরের লোকের কেমন একটা অস্থির ছটফটে ভাব লক্ষ্য করে ছিলেন। আর নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাপের বাড়ি ফেরা ওই মেয়েকে তিন তলায় এ-ঘরের এই জানালার দিকে অনেকবার তাকাতেও দেখেছেন। ফলে বার কয়েক চোখাচোখি হয়েছে অপর্ণার সঙ্গে।

...বছর তিনেকের বড় অর্থাৎ বছর কুড়ি হবে তখন পাশের বাড়ির ওই মেয়ের বয়েস। অপর্ণা তার থেকে ঢের সুশ্রী আর ফর্সা। তবে হাঁটুর উপর পর্যন্ত এক পিঠ চুলের বাহার আছে মেয়েটার। স্বাস্থ্যও মোটামুটি ভাল আর অপর্ণার থেকেও একটু লম্বা হবে। চোখেও এক ধরনের বুদ্ধির ছাপ আছে। ধীরার মুখে নাম শুনেছেন, স্মৃতি। স্মৃতি চাটুজ্জে ছিল, স্মৃতি চক্রবর্তী হয়েছে।

দুপুরে ঘরে ঢুকে ধীরা পাশের দোতলা বাড়ির উদ্দেশে চোখ নাচিয়ে চাপা কৌতুকে জিজ্ঞাসা করেছে, কী গো বউদি, কেমন দেখলে?

অপর্ণার বয়েস তখন মাত্র সতেরো বছর কয়েক মাস বটে। কিন্তু এই ক'মাসে তাঁর মনের বয়েস অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া বিয়ে কাকে বলে সেই জিজ্ঞাসায় তাঁর ভিতরটা সজাগ উন্মুখ তখন। নিজের ভাগ্যের ব্যতিক্রমটা বোঝার তাড়নায় সর্বদা ব্যগ্র। ফলে ধীরা টোপ ফেলামাত্র কী একটা অনুভূতি সরাসরি মগজের মধ্যে কেটে বসেছে।

কী কেমন দেখব?

ও বাড়ির স্মৃতিদেবীকে?

স্মৃতি দেবী!

তুমি একটি ন্যাকা, ধীরা হাসি চেপে মুখ মচকে বলেছিল, ওই যে সকালে বাপের বাড়ি ফিরলেন ঠাকরোন। দেখেই তো বাবা-মায়ের মুখ আমসি...দাদা দেখেছে?

বুকের তলায় আচমকা একটা ঝড়ই উঠেছিল বুঝি অপর্ণার। কিন্তু বুঝতে দিতে আপত্তি।—কী জানি।...ওদের বাড়ির মেয়ে ফিরেছে তাতে কী?

কী সেটা আর বলতে রাজি নয় ধীরা। চটুল ভনিতা শেষ হতে না হতে তার মুখ বন্ধ। এর পর দিন চারেক তোয়াজ তোষামোদ করতে হয়েছে তাকে। চাকরকে দিয়ে চুপিচুপি ওর জন্য ঝাল আচার আর চানাচুর আনাতে হয়েছে। দুপুরে তাকে ঘরে ডেকে সেই লোভনীয় সামগ্রী তার সামনে ধরা হয়েছে। ইতিমধ্যে সন্ধানী দৃষ্টি ঘরের লোকের মুখের ওপর সংবদ্ধ সর্বদা। ব্যতিক্রম দেখা গেছে বই কি। হাবভাব আচরণে খুব স্পষ্ট ব্যতিক্রম। অকারণে চঞ্চল, অকারণে ঘরের মধ্যে চক্কর খাওয়া, আর মাঝে মাঝে বাইরের দিকে সচকিত দৃষ্টি।

মুখ খোলার আগে ধীরা ঠাকুর দেবতার নাম করে শপথ করিয়ে নিয়েছে কেউ জানবে না, কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না। বিশেষ করে তার দাদা জানলে সর্বনাশ। তা ছাড়া ব্যাপারটা যখন চুকে বুকেই গেছে তখন আর কী।

কেন এত তাড়াহুড়ো করে ছেলের বিয়ে দেওয়া হল সেটা আর অস্পষ্ট থাকল না। সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছুর ওপর থেকেই পরদা সরতে লাগল। বিয়ের ব্যাপারে মেয়ের বাড়ির আগ্রহ থেকেও ছেলের বাড়ির আগ্রহ এত বেশি ছিল তার কারণ শ্বশুর বাড়ির লোকের অপর্ণাকে ভয়ানক পছন্দ হয়ে গেছল বলেই নয়। ছেলের চরিত্র সংশোধন কারণে আর মন ফেরানোর কারণে মোটামুটি সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়ে তাদের ভারি দরকার হয়ে পড়েছিল। এমন দরকার হয়ে পড়েছিল যে যাচাই বাছাইয়ের সময়ও খুব হাতে ছিল না।

কারণ, পাশের বাড়ির ওই মেয়ে—স্মৃতি চাটুজ্জে, এখন স্মৃতি চক্রবর্তী—ধীরার দাদার হৃদয় মন প্রাণ সব হরণ করতে বসেছিল। হরণ করেই ছিল বলতে গেলে। ছুটির দিনে দু'জনে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিরুদ্দেশ এক-একদিন। পাড়াশুদ্ধ লোকে তাদের কতদিন কত জায়গায় দেখেছে ঠিক নেই। এ-বাড়িতে ধীরার মায়ের কান্নাকাটি, মাথা কোটাকুটি, আর বাবার ভ্রূকুটি অনুশাসন—ও-বাড়িতেও একই অবস্থা। স্মৃতি বাপ মায়ের একটি মাত্র আদরের মেয়ে, বাপের চোখের ব্যামো, অন্ধই প্রায়—কলেজে পড়া ওই মেয়েকে বাপ-মায়ের আটকানোর সাধ্যি নেই। মাঝখান থেকে দু'বাড়ির বাবা-মা একে অপরের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন। এঁরা বলেন সব দোষ ওই মেয়ের, ওঁরা বলেন সব দোষ এ-বাড়ির ছেলের। কিন্তু যাদের নিয়ে এত কাণ্ড তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা প্রেম হাবুডুবু। তাদের চিঠি চালাচালি আর পালিয়ে বেড়ানো বন্ধ হচ্ছে না।

...অথচ ধীরার এই দাদারই অন্যের স্বভাব-চরিত্রে ব্যাপারে সজাগ চোখ। শাসন করার জন্য যেন হাত উঁচিয়েই আছে।...পাড়ার এক গরিবের মেয়ের সঙ্গে ধীরার খুব ভাব ছিল। মেয়েটার বাবা নেই, বুড়ি মা আর দাদা। তা একবার সেই মা মেয়ে দুজনেই অসুখে পড়তে ধীরা গিয়ে রান্না করে দিয়ে আসত। বন্ধুর দাদার সঙ্গে ধীরার তখনই যা একটু আলাপ পরিচয়। একদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইছিল ধীরা, কথা কইছিল মানে অসুখের খবরাখবর নিচ্ছিল। দাদা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল তখন, দেখা মাত্র ওদের মতো 'ইয়ে-টিয়ে' ভেবে বসল। বাড়ি ফিরতেই বেণী ধরে টেনে পিঠে দমাদম কিল। ধীরা প্রথম বুঝতেই পারেনি দোষটা কী। পরে বুঝে ফুঁসে উঠেছিল, নিজে কেলেঙ্কারি করে বেড়াচ্ছ তাই নিজের মতোই ভাবো সকলকে না? লজ্জা করে না তোমার?

ব্যস, সেই থেকে দাদা আর ওর সঙ্গে এ-সব নিয়ে লাগতে আসেনি।

কিন্তু দাদার কেলেঙ্কারি বাড়তেই থাকল। বেগতিক দেখে শেষে স্মৃতির অন্ধ বাপ মফঃস্বল শহর থেকে তাঁর হাকিম ভাইকে আনালেন। তিনি কড়া মানুষ। তোড়জোড় করে এক মাসের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেললেন। মেয়ের শ্বশুর বাড়ি কলকাতার বাইরে আর ধীরাদের ধারণা স্মৃতির বরটা একটু হাবাগোবা গোছের সরল মানুষ—নাদুসনুদুস চেহারা, ইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার, ইস্কুলে ছেলে ঠেঙায় আর দু'বেলা গাদা-গাদা ছেলে নিয়ে কোচিং ক্লাস করে। ও-রকম একটা লোককে স্মৃতির মনে ধরবে! হুঃ!

এ-সব ধীরা পরে মেজদা আর ছোড়দার কাছে শুনেছে। যাক, সেই স্মৃতির বিয়ের সময় দাদার সে-কি মূর্তি! যেন খাঁচায় পোরা বাঘ একখানা। সারাক্ষণ গর্জন, আর ফোঁস ফোঁস। বিয়ের তিন দিন আগেও হুলস্থূল কাণ্ড। পালানোর যড়যন্ত্র করে ধীরার দাদা ওই মেয়ের কাছে চিঠি দিয়েছে, আর পড়বি তো পড়, সেই চিঠি একেবারে মেয়ের হাকিম কাকার হাতে। পড়বে না কেন, তারা তো ওঁত পেতেই ছিল। এ-বাড়ি এসে ভদ্রলোকের সে-কি হম্বি-তম্বি। থানা পুলিশ হয়-হয় ব্যাপার।

বিয়ে হয়ে গেল। আর এ-বাড়ির ধীরার দাদা ফুঁসতে লাগল। স্মৃতি শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। দশ দিনের দিন দ্বিরাগমনে এলো, দু'দিন বাদে আবার চলে গেল। তারপর আর এলো না। সকলে ভাবল ফাঁড়া কাটল। কিন্তু মাস দুই না যেতে ধীরার দাদার মতিগতি আবার অন্য রকম। চাকুরির নাম করে মাঝে মাঝে দুই-একদিনের জন্যে বাড়ি থেকে ডুব দেয়। মফঃস্বলে যাচ্ছে বললে কে আর সন্দেহ করবে। শেষে জানা গেল ওদের মধ্যে চিঠি চালাচালি শুরু হয়েছে। একখানা চিঠি মায়ের হাতে পড়ল। আশ্চর্য মায়ের ঠিক সন্দেহ হয়েছিল। চিঠি পড়ে বোঝা গেল, ধীরার দাদা চিঠির নির্দেশমতো স্মৃতিকে দেখতে যায়। এই নিয়েও গণ্ডগোল কম হয়নি। ও-তরফেও ধরা পড়েছে। স্মৃতির হাকিম কাকা দাদার নামে রেজিস্ট্রি করে উকিলের চিঠি পর্যন্ত ঝেড়েছে।

বাড়িতে ঘোর অশান্তি আবার। শাশুড়ি অর্থাৎ ধীরার মা কান্না-কাটির রাস্তায় না গিয়ে বুদ্ধিমতীর মতো খেপে উঠলেন। আত্মহত্যা করবেনই তিনি। নিরুপায় ছেলে তখন বিয়ে করতে রাজি হতে আত্মহত্যা স্থগিত থাকল। তোড়জোড় করে মেয়ে দেখা শুরু হল। তারপর অপর্ণাকে দেখামাত্র পছন্দ।

অপর্ণার ভিতরে ভিতরে কী হচ্ছিল, মনের ওপর কত বড় আঘাত এসে পড়েছিল ধীরার ধারণা নেই। মুখ মচকে পাকা মেয়ের মতো সে বলেছিল, ঠাকরোন আবার এলো, তোমার এখন ডবল দায়িত্ব বউদি, দাদার চোখ যেন তোমার দিক থেকে নড়ে না, তা না হলেই চিত্তির আবার।

...সতেরো বছর কয়েক মাসের সেই মেয়ের বয়েসটা রাতারাতি বুঝি সাতাশে এসে ঠেকেছিল। সে বলি হয়েছে। একজনের বিকৃতি সারাতে তাকে টেনে এনে বলি দেওয়া হয়েছে। অনেক কিছুর অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেছে তার কাছে। মেয়ে দেখার সময় বরেন সোমের সে চাউনি মনে পড়েছে। মুগ্ধ নয়, লোলুপ চাউনি সেটা। পরের হিংস্র আচরণের হেতু আরো স্পষ্ট। এই ব্যর্থতার কারণেই অমন মায়াদয়াশূন্য। এই কারণেই নিভৃতের করায়ত্ত অবকাশে বিনিময়ের বদলে অপমানের ক্ষতচিহ্ন রচনার মত্ততা।

সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে ওই মেয়ের মন বিষিয়েছে, তার চোখের সমুখ থেকে সুন্দরের অস্তিত্ব ঘুচে গেছে। এই বাড়ির হাওয়া বাতাস পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে অসহ্য ঠেকেছে।

তা সত্ত্বেও ঘরের লোকের প্রতি তীক্ষ্ণ চোখ ছিল। তার বিসদৃশ আচরণ আরো বেশি চোখে ঠেকেছে। মুখে কৃত্রিম সহজতার আবরণ টেনে আনা গেছে। নিরীহ প্রশ্ন, আজকাল দু'বেলা ওই জানালার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে কী দেখ?

মানুষটা বিষম চমকে উঠেছে।—কী দেখি মানে। কী আবার দেখব?

ওই বয়সে অপর্ণা ভিতরে অমন একা জোর কী করে এসেছিল নিজেও জানেন না। কিন্তু বাইরে একটুও প্রকাশ পায়নি। জবাব দিয়েছেন, ওই যে বাপের বাড়ি এসেছে মেয়েটা...সেও প্রায়ই এ-ঘরের জানালার দিকে চেয়ে থাকে।

সন্দিগ্ধ দুটো চোখ মুখের ওপর ঘুরেছে এক প্রস্থ। রূঢ় স্বরে বলেছে, নিজের বাড়িতে দাঁড়িয়ে যেদিকে খুশি চেয়ে থাকবে, তাতে তোমার কী?

মানুষটার রাগ চোখেই পড়েনি যেন অপর্ণার।—আজ বিকেলে আবার হাত তুলে আমাকে ডাকছিল।...যাব?

না না, যেতে হবে না। তোমার ওখানে দাঁড়াবার কী দরকার? তিক্ত বিরক্ত যেন।

...সেই রাতেই মানুষটার প্রথম আদর সোহাগ গোছের একটু কিছুর মাত্রা বাড়ার উপক্রম। বুকের কাছে ঝুঁকে গল্প করতে চেষ্টা করছে, কাছে টানতে চেষ্টা করছে। কিন্তু অপর্ণার তখন ভয়ানক মাথা ধরেছে, গা গুলোচ্ছে। দ্বিগুণ তিক্ত-বিরক্ত।

...সত্যিই সেই মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই অপর্ণাকে হাত তুলে ডাকে। মিটি মিটি হাসে। পরদিনও দুপুরে ডেকেছিল। অপর্ণার কি গোঁ চাপল হঠাৎ, ইশারায় জানালেন যাচ্ছেন। তারপর সত্যিই গিয়ে উপস্থিত। স্মৃতি এক গাল হেসে তাকে আদর করে বসালো। বলল, ক'দিন ধরে ডাকছি, আজ এলে যা হোক—

জবাব শুনে অপর্ণাকে কচি-কাঁচাই ভেবে নিয়েছে মেয়েটা। ভিতরে যে বাঁকা আঁচড়ের কারিকুরি চলেছে সেটা অন্তত বুঝতে পারেনি। অপর্ণা জবাব দিয়েছিলেন, তুমি একদিন এলে না কেন?

স্মৃতি মুখে টিপে হেসেছিল, তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল, বরের সঙ্গে তোমার ভাব-সাব কেমন হয়েছে বলো দেখি।

অপর্ণার ঠোঁটের ফাঁকেও তখন হাসির রেখা পড়েছিল একটু। সেই সঙ্গে সহজ মিষ্টি বিস্ময়ও মিশেছিল।—চার মাস তো হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে, এখনো ভাব হবে না!

স্মৃতির হাসি তখন ধার-ধার লেগেছিল।—ও, খুব ভাব হয়েছে বুঝি তাহলে?

অপর্ণার মাথা না নেড়ে উপায় ছিল না যেন। অর্থাৎ খুব ভাবই হয়েছে।

কিন্তু আসলে ও-বাড়ি এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণার কেমন গা ঘিনঘিন করছিল। বেশিক্ষণ বসাও সম্ভব হয়নি। উঠে আসতে হয়েছে। বাড়ি ফিরে দেখেন গম্ভীর মুখ সকলের। বিশেষ করে শ্বশুর-শাশুড়ির। ধীরা সকলের অলক্ষ্যে ইশারা করল তাঁকে। তারপর ওপরে নিজের ঘরে আসার ফাঁকে ধীরা ফিসফিস করে বলল, এত সাহস দেখাবার কী দরকার ছিল, দাদা হঠাৎ আপিস থেকে ঘরে ফিরে এসেছে, কী মুখ করে বসে আছে, দেখোগে যাও—

আশ্চর্য, অপর্ণার একটুও ভয় করেনি তখন। বুকের তলায় বরং অদ্ভুত কিছু একটা করে বসার বাসনা জাগছিল। তাঁকে দেখামাত্র মানুষটা খেঁকিয়ে উঠেছিল, তোমাকে আমি ও বাড়ি যেতে বারণ করেছিলাম কি না?

অত করে ডাকলে না গিয়ে পারা যায় না। গেছি তো কী হয়েছে, ব্যাটাছেলে তো নয়।...তুমি আপিস থেকে এ-সময় হঠাৎ ফিরলে যে?

এমন সুরে প্রশ্নটা করা হয়েছিল আর এমনভাবে তাকানো হয়েছিল যে লোকটাকে থতমত খেতে হয়েছিল। সেই কথা শুনলে আর সেই চাউনি দেখলে কেউ বলবে না অপর্ণা পাকা মেয়ে নয়। প্রশ্ন আর চাউনির যেন সাদা অর্থ, আমার বদলে তোমার যাবার ইচ্ছে ছিল আর সেই জন্যেই তাড়াতাড়ি ফেরা হয়েছে?

ঘরের লোকের একটু তোষামোদের মুখই দেখা গেছে এরপর। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাঁচবার করে জানার চেষ্টা স্মৃতি কী বলল। যত রাগই হোক, অপর্ণার দ্বারা মিথ্যে বলা সম্ভব হয়নি—আমার খুব প্রশংসা করল, আর বলল, এই জন্যেই তোমার বর বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিব্বি বদলেছে।

স্মৃতি সত্যিই ওই কথা বলেছিল, আর তার জবাবে অপর্ণার মুখ দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন বেরিয়েছিল, কেন, আগে কেমন ছিল?

এই শেষেরটুকু ওই লোকের কাছে ফাঁস করার মতো বোকা মেয়ে অপর্ণা আর নয়।

বিয়ের মাস পাঁচ-ছয়ের মধ্যে দেহের অভ্যন্তরে বড় রকমের কিছু একটা পরিবর্তনের সূচনা। আসছে কেউ। যে আসছে তাকে সুদ্ধ নিজেকে ধ্বংস করার আক্রোশ অপর্ণার। পাশের বাড়ির মেয়ে তার অনেক আগেই স্বামীর ঘরে চলে গেছে, তবু। ঘরের লোক চুরি করে আবার তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছে মনে হয়নি, তবু।

সাত মাসের মাথায় অপর্ণাকে বাপের বাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। শরীর বেশ খারাপ তখন। সে সময়ে ঘরের লোকের প্রতি আচরণও বদলেছে। উগ্র হয়েছে। নির্বোধ নয় লোকটা। বিগত দিনের ঘটনা কিছু অজানা বা গোপন নেই সেটা আগেই বোঝা হয়ে গেছে। কিন্তু তার জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত বা লজ্জিত বা সঙ্কুচিত নয়। বরং আরো উদ্ধত আরো উগ্র। ফিরে আবার তাকে নিজের দখলে পাওয়ার প্রতীক্ষা।

বরেন সোম খানিকটা দখলে তাঁকে পেয়েছেন আরো প্রায় বছরখানেক বাদে। সেও নিজের বাড়িতে নয়, সমীরণ দত্তর নীচের তলার ফ্ল্যাটে। সুপা তখন ছ'মাসের। তারও মাস চারেক আগে ধীরা একদিন বাপের বাড়িতে তাঁকে দেখতে এসে চুপি চুপি একটা খবর দিয়ে গেছল। আসলে খবরটা দেবার জন্যেই এসেছিল ও।...পাশের বাড়ির স্মৃতির মা হঠাৎ মারা গেছে। অন্ধ বাপকে দেখে কে এখন? তাই স্মৃতি সেই যে বাপের বাড়ি এসে জমে বসেছে আর যায়নি। আর যাবেও না শুনছে। তার স্বামী ছুটি-ছাটায় আসে আমার ছুটি ফুরালে চলে যায়। এদিকে দাদার হাবভাব আবার অন্যরকম হয়ে উঠেছে। ধীরা বলেছিল, তুমি শিগগির চলে এসে বউদি, আমাদের ভালো লাগছে না।

শুধু ধীরা কেন, সুপার দু'মাসের সময় শ্বশুর-শাশুড়িও তাঁকে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। বউয়ের শরীর খারাপ দেখেও। অপর্ণার বাবা গম্ভীর মুখে জানিয়েছেন, এখন যাবে না, ওর শরীর ফিরুক আর মেয়ে একটু বড় হোক।

হ্যাঁ, অপর্ণার বাবা-মা সাত তাড়াতাড়ি ও ভাবে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য তখন মনস্তাপী। মেয়ে যে সুখের ঘরে পড়েনি, সেটা তাঁরা অনেক আগেই বুঝেছিলেন। মেয়ের অভিমানের আঘাত আগেও অনেক সময় তাঁদের বুকে বেজেছে। ধীরা নতুন করে আবার ওই খবরটা দিয়ে যাবার পর রাগে ক্ষোভে অপর্ণা মায়ের কাছে বলেছিলেন সব। মা শুনে বাবার কাছে কান্নাকাটি। তার ফলে বাবা বেদনাহত, গম্ভীর।

আরো মাস তিনেক বাদে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবার পীড়াপীড়ি যখন বাড়তে লাগল, অপর্ণা তখনই ঘোষণা করে বললেন, ওই বাড়িতে তিনি আর যাবেন না, তাঁকে নিয়ে যেতে হলে অন্যত্র আলাদা বাড়ি নিতে হবে। পাশের বাড়ির মেয়ের তখনো সেখানে অবস্থানের খবর অপর্ণা রাখতেন।

শোনামাত্র ক্রুদ্ধ উগ্র মূর্তি বরেন সোমের। মুখোশ খসে যেতে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। শাসালেন, কটূক্তি করলেন। কিন্তু উনিশ বছরের স্ত্রীটি যে তাঁর কত অনমিত সে-শুধু তখনই টের পেলেন। এর পর শ্বশুর নিজে এসে অনুযোগ দিলেন, রুষ্ট হলেন, ক্ষুব্ধ শাশুড়ি কান্নাকাটি পর্যন্ত করলেন। কিন্তু অপর্ণার এক কথা, ভালোর জন্যেই এই ব্যবস্থা চাওয়া হচ্ছে।

বরেন সোম আবার ফিরে এসে স্পষ্ট ঝাঁঝে জানালেন, তাঁর বাবার পেনসনের টাকা সম্বল, এ-অবস্থায় আলাদা বাড়ি করে দুটো সংসারের খরচ চলতে পারে না।

অপর্ণার জবাব, বাবা বলেছেন যতদিন দরকার খরচ চালাবেন, বাড়ি ভাড়া তো দেবেনই।

শেষ পর্যন্ত সমীরণ দত্তর ওই বাড়ির এক তলার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে নতুন সংসার পাততে হয়েছে। বরেন সোমের মনে সেই রাগ অনেক দিন পর্যন্ত পুঞ্জীভূত ছিল। কারো কিছু জানতে বাকি নেই বলেই

যেন দাপট বেশি। এবাড়িতে পা দিয়েই বলেছিলেন, সেখানে তো তবু চোখের ওপর থাকতে পারতে, এখন যদি ওখানে যাই আর জাহান্নামে যাই, জানবে কী করে?

অপর্ণা তেমনি ঝাঁঝালো জবাব দিয়েছেন, জাহান্নামে গেছ ধরে নিয়েই এখানে এসেছি। লজ্জা থাকলে আর মুখ নেড়ে কথা বলতে আসতে না। জানতে পারি কি না গিয়ে দেখো।

না, স্ত্রীর এই শক্তির দিকটা বরেন সোম কল্পনা করতে পারেননি। নতুন করে আবার একটা আকর্ষণ অনুভব করেছেন যে অপর্ণার তাও অগোচর নয়। কিন্তু মানুষটার উগ্র স্বভাবের জন্য খিটির-মিটির লেগেই থাকত। আর অপর্ণার দিক থেকে প্রতিরোধটাও তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠত। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, বরেন সোমকে নিভৃতের আচরণও বদলাতে হয়েছে। হিংস্র দখলের ওপর ভদ্রতার মুখোশ চড়াতে হয়েছে। অন্যথায় অপর্ণা অনেক সময় রূঢ় প্রত্যাখ্যানের আঘাত হেনেছেন। ভদ্রলোকের মতো এলে এসো, আমাকে তুমি তোমার ইয়ে পাওনি—

বাসনার তপ্ত মুহূর্তে এই প্রত্যাখ্যান রসিকতার ইন্ধনও জুগিয়েছে সময় সময়। জিজ্ঞাসা করেছেন, ভদ্রলোকের মতো না আসতে পারলে কোথায় যাব—সেইখানে?

ঘৃণায় অপর্ণা আরো বেশি ব্যবধান রচনা করতে চেয়েছেন। আর বরেন সোম আরো বেশি জ্বলেছেন। এর ওপর অপর্ণা কড়া ফতোয়া জারি করেছেন, আর ছেলেপুলে নয়, অন্তত তিনি না চাওয়া পর্যন্ত নয়। কোনো সময় বিশ্বাসঘাতকতার মতলব টের পেলেই অপর্ণার সেই অনমিত রূঢ় প্রত্যাখ্যান। সদা সন্দিগ্ধ, তাই টের পেতেনও। ফলে বরেন সোম ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন কিন্তু বাইরে অনেকখানি নিরুপায়।

নতুন সংসার পাতার পর বরেন সোমের দিক থেকে অন্তত হৃত আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাই পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। তিনি যত বেশি উগ্র, অপর্ণা তত বেশি স্থির সংযত। অনেক সময়েই ওপর থেকে বরেন সোমের চেঁচামেচি শোনা যেত। সেটা বেশি হলে সমীরণবাবু হাসি মুখে নীচে নেমে আসতেন, হাসি মুখে বলতেন, কি রে, তোদের পাগলামি শুরু হল আবার? এক-একদিন সমীরণবাবুর মা-ও এসে মধ্যস্থতায় বসতেন। সুপার সঙ্গে নাতনি আর অপর্ণার সঙ্গে মেয়ে সম্পর্ক তাঁর। অতএব গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে তিনি আগে জামাইকে ঠাণ্ডা করতেন, আর সুচতুরার মতো জামাইয়ের পক্ষ নিতেন বেশির ভাগ সময়।

ওপর তলার সঙ্গে এই হৃদ্যতার সম্পর্ক থেকেই খুব একটু একটু করে অশান্তির সূত্রপাত আবার। ছ'মাস না যেতে অপর্ণা ফিরে আবার পড়াশুনা শুরু করে দিয়েছেন। এ-উৎসাহ বা উদ্দীপনা কোথা থেকে এসেছে বরেন সোম সেটা ভালই জানেন। উৎসাহ উদ্দীপনার যোগানদার সমীরণ দত্ত। দিন মাস বছর কাটতে লাগল। অপর্ণা বি. এ. পাস করলেন, এম. এ. পাস করলেন। স্ত্রীর বিদূষী হয়ে ওঠাটা অপছন্দ হবার কথা নয়, মেধাবী ছাত্র হিসেবে বরেন সোমেরও মন্দ নাম ছিল না। কিন্তু সমীরণ দত্তর প্রতি স্ত্রীর ভক্তিশ্রদ্ধা অনেক দিন ধরে বাঁকা চোখে দেখছেন তিনি। ঘরের লোকের এই নীচ মনের দরুন অপর্ণার এম. এ. পরীক্ষা শুরু হবার আগের রাতটা আবার কি কদর্য কুৎসিতই না হয়ে উঠেছিল। দগদগে ক্ষতের মতোই তাজা হয়ে আছে প্রতিটি স্মৃতি। এম. এ. পরীক্ষা শুরু হবার আগের রাতে অপর্ণা সত্যি ঘাবড়ে গেছলেন। সমীরণবাবু অনেক করে সাহস জুগিয়েছেন, একটু আধটু হাসি ঠাট্টাও করেছেন।

...রাত এগারোটা বেজে গেছল, সমীরণবাবু অনেকবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও অপর্ণা নীচে নামতে পারেননি। তাঁর মাথায় তখনো পরীক্ষা গিসগিস করছে, এ-রকম প্রশ্ন এলে কী লিখবেন, ও-রকম এলে কী জবাব দেবেন। সমীরণবাবু হাসিমুখেই জবাব দিচ্ছিলেন, কখনো আবার তাঁকেই বলতে বলছিলেন। অপর্ণা ভেবে ভেবে সঠিক উত্তরই দিচ্ছিলেন। ওদিকের ঘরে সুপাকে বুকে নিয়ে সমীরণবাবুর মা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দিনরাতের বেশির ভাগ সময় সুপা তখন সমীরণবাবুর মায়ের কাছে থাকে।

নীচে বরেন সোম তখন একা। লোকটা যে ভিতরে ভিতরে ঈর্ষায় কতটা জ্বলছেন অপর্ণা কল্পনাও

করতে পারেননি। কারণ, তাঁর মাথায় তখন পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছু নেই। হঠাৎ চোখ তুলে অপর্ণা আর সমীরণবাবু দেখেন মানুষটা নিঃশব্দে দোতলার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

দাঁত চেপে হাসতে চেষ্টা করে বরেন সোম বললেন, রাত মাত্র এগারোটা, এখনো পরীক্ষা চলছে?

সমীরণবাবু তখন ইজি-চেয়ারে আধশোয়া, আর অপর্ণা তাঁর খাটে বসে। খাটের ওপর বইপত্র ছড়ানো ছিল। এর তিন ঘন্টা আগে বরেন সোম আর একবার দোতলায় উঠে দেখে গেছলেন, অপর্ণা ইজি-চেয়ারে বসে, আর সমীরণ দত্ত খাটে।...আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সমীরণবাবু এক একটা বই টেনে এনেছিলেন। সেগুলো উল্টে দেখার জন্য অপর্ণা কখন উঠে খাটে এসে বসেছেন নিজেরই খেয়াল নেই। আর পায়চারি করতে করতে সমীরণবাবু এক সময় ইজি-চেয়ারটায় বসেছিলেন।

ঘাড় ফিরিয়ে সমীরণবাবু হেসেই জবাব দিয়েছিলেন, পরীক্ষা কী রকম দেবে বুঝতে পারছি—তুই এবারে ধরে নিয়ে যা তো, আর পারি নে—

মুখ হিংসায় কালো, নির্লজ্জের মতোই হেসে উঠেছিল এই মানুষ।—সে কিরে, এমন ছাত্রীভাগ্য তোর, আমি হলে তো পরীক্ষার জালে আটকে রাখতুম।

সে রকম মন নিয়ে বললে এই গোছের ঠাট্টাও হয়ত শ্রুতিকটু ঠেকে না। কিন্তু শোনামাত্র অপর্ণার দু'কান বিষিয়ে গেছল।

নীচে নেমে আসতেই এই মানুষের সেই কদর্য মূর্তি। হেসে হেসে বলছেন, আমি যখন ওপরে হাজির হলাম, সেই সময় সবে বোধহয় তুমি সমীরণের বিছানায় উঠে বসেছিলে...আমি অসময়ে গিয়ে পরীক্ষা-সংকটে ব্যাঘাত ঘটিয়ে ফেললাম, না?

অপর্ণার তখনো রাতের খাওয়া পর্যন্ত হয়নি। শুনেই মাথায় রক্ত।—তুমি ভয়ানক নীচ।

দাঁত বার করে হাসতে লাগল।—তা-তো বটেই. লেখা-পড়ার কদর তো আমি বুঝলাম না, সব বুঝে ফেলেছ তুমি আর তোমার সমীরণবাবু।...রাত মাত্র সোয়া এগারোটা এখন, মেয়ে এক বুড়ীর কাছে ঘুমুচ্ছে, নীচ লোকটা নীচের তলায়—এ-রকম পরিবেশে কোন্ পরীক্ষায় কে আটকায়?

ছোটলোক! অপর্ণা আবার ঝাঁঝিয়ে উঠেছেন, তুমি এক নম্বরের ছোটলোক বুঝলে!

রাগ করে না খেয়েই শুয়ে পড়েছেন তিনি। ঘরের দুই কোণে দু'জনের শয্যা তাঁদের। বরেন সোম ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছেন।...তারপর পাঁচ মিনিট না যেতে যা কল্পনা করতে পারেননি অপর্ণা, তাই ঘটেছে। বরেন সোম নিজের শয্যায় না গিয়ে এই শয্যায় এসেছেন। টের পেয়েই অপর্ণা ফুঁসে উঠে খাট থেকেই ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছেন তাঁকে। ফেলে দিতে চেয়েছেন। পারেননি। পরীক্ষার ধকলে ক্লান্ত ক্লিষ্ট দেহটা ক্রমে সেই আগের মতোই দয়ামায়াশূন্য এক আসুরিক দখলে নিষ্পিষ্ট হয়েছে। সেই দখল নেবার কালে বিড়বিড় কণ্ঠস্বর কানে এসেছে, ছোটলোকের খিদে পেলে সে এমনি করেই ছিনিয়ে নিতে জানে।

অপর্ণা আর বাধা দেননি। বাধা দিতে চেষ্টা করেননি। অন্ধকারে দুচোখ নিঃশব্দ আগুন জ্বেলে নির্লজ্জ নির্মম মানুষটাকে দেখেছেন। বাসনার বীভৎস রূপই নতুন করে আবার দেখেছেন।...

লোকটা চলে যাবার পরেও অনেক রাত পর্যন্ত যেন বৃশ্চিক দংশনে জ্বলেছেন। সেই রাতেই ঠিক করেছিলেন পরীক্ষা আর দেবেন না। সকাল পর্যন্ত সেই রকমই সংকল্প ছিল। কিন্তু সময় হতে সমীরণবাবু একেবারে গাড়ি নিয়ে হাজির। যেতে হয়েছে। পরীক্ষা দিতে হয়েছে। একে একে সব কটা পরীক্ষা শেষ করতেও হয়েছে।

কিন্তু সেই রাতের নৃশংসতা অপর্ণা ভোলেননি।...আবার সন্তান আসতে পারত। আসেনি যে সেটা তাঁর ভাগ্য। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি ভাগ্য বরেন সোমের। সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিলে অপর্ণা নির্মমভাবেই সেটা নির্মূল করে সমস্ত সম্পর্কে ছেদ ঘটিয়ে দিতেনই।

যথাসময়ে এম. এ. পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। ভালোই পাস করেছেন। সমীরণ দত্তকে অপর্ণা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন। বি. এ. পাসের পরেও তাই করেছিলেন। বি. এ. আর এম. এ. পাসের কৃতিত্বের ডালি অপর্ণা যেন তাঁর গুরুর পায়ে অর্পণ করে কৃতার্থ। বরেন সোম অন্তত তাই মনে

করতেন। সমীরণ কিছু বললে বা কিছু পরামর্শ দিলে তার আর নড়চড় নেই। নড়চড় করতে গেলে অশান্তি।

নিজের প্রাপ্তির দিকটা ক্রমশ শূন্য ঠেকতে লাগল বরেন সোমের। তিনি সেটা বরদাস্ত করার পাত্র নন। ক'বছরে কর্মক্ষেত্রে আশাতীত উন্নতি হয়েছে তাঁর। কাজের গুণে স্বয়ং রাজ্যশাসকের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। অনেক ওপরঅলার সেটা ঈর্ষার কারণ। ভবিষ্যৎ আরো কত উজ্জ্বল স্ত্রী সেটা খবরও রাখেন না। সে তুলনায় কলেজের মাস্টার করুণার পাত্র। তাঁরই প্রতি এই শ্রদ্ধার ডালি বরেন সোম সাদা চোখে দেখবেন কী করে?

প্রায়ই টিকা-টিপ্পনী কাটতেন, ঠেস দিতেন। অপর্ণা সব সময় জবাব দিতেন না। চুপ করে থেকে বুঝিয়ে দিতেন ওগুলো ঈর্ষার সগোত্র, জবাবেরও অযোগ্য। আবার জবাব যখন দিতেন তাও বরদাস্ত করা সহজ হত না।

সমীরণ বিয়ে করছে না কেন? চিন্তাটা হঠাৎই একদিন মগজে ঘা দিয়েছিল বরেন সোমের। নিজের বাড়ি, রোজগার ভালো, ঝামেলাও কিছু নেই। ওর মায়ের তো ছেলের বিয়ের নামে জিভে জল গড়ায়, তবু এমন নিস্পৃহতা কেন?

ওর মা ছেলের জন্য কোথায় মেয়ে দেখতে গেছলেন একবার। অপর্ণাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছলেন। মেয়ে বিদুষী বটে, কিন্তু দেখতে তেমন সুশ্রী নয়। মায়ের তেমন পছন্দ হয়নি, আর পীড়াপীড়ি করতে অপর্ণাকেও বলতে হয়েছে সমীরণবাবুর জন্যে ওই মেয়ে তাঁরও তেমন পছন্দ নয়। কিন্তু গণ্ডগোলটা বাধল অন্য দিক থেকে। সমীরণবাবুর দিক থেকে। মেয়ে দেখতে যাওয়া হয়েছিল শুনে মায়ের ওপর এমন রাগ যে দু'দিন বাইরে কাটালেন ভদ্রলোক। মা কেঁদেকেটে সারা। মেয়ে পছন্দ হয়নি শুনে বরেন সোম অপর্ণার উদ্দেশে টিপ্পনী ছুড়েছিলেন, তোমার পছন্দ হবে না জানা কথাই। সেই চিন্তাটা একটু একটু করে পুষ্ট হতে থাকল। বিষক্রিয়া শুরু হলে চোখের দৃষ্টিও বদলানো স্বাভাবিক। ওই ভদ্রলোকের প্রতি স্ত্রীর সহজ আচরণ আর প্রীতিভাবটুকুর দিকে একটা সংশয়ের কীট পা বাড়াতে থাকল। রসিকতার মোটা আবরণ টেনে জিজ্ঞাসা করেছেন, সমীরণের ব্যাপারখানা কী, বিয়ে করছে না কেন, তোমার প্রেমে-টেমে পড়ে যায়নি তো?

পাছে কানে যায় সেই ভয়ে সচকিত হয়ে অপর্ণা সিঁড়ির দিকে তাকিয়েছেন। তারপর চাপা রাগে জবাব দিয়েছেন, ভদ্রলোকের মতো কথা বলো, শুনতে পেলে আবার তোমাকে বাড়ির খোঁজে বেরুতে হবে বলে দিলাম।

হ্যাঁ, একটু রাগ হলেই অপর্ণা তাঁকে অভদ্রতার খোঁচা আর রুচির খোঁটা দিয়ে থাকেন। আর তখনি স্নায়ুগুলো চিনচিন করে জ্বলতে থাকে বরেন সোমের। —কেন, তোমার সমীরণবাবু একেবারে ঋষিতুল্য মানুষ বলছ?

তোমার তুলনায় ঋষিতুল্য। তোমাকে ধরেবেঁধে বিয়ে দেবার দরকার হয়েছিল, তাঁর সময় পার হয়ে যায়নি।

বরেন সোম হেসেছেন। হাসিটা কুৎসিত ঠেকেছে অপর্ণার।

মহাভারত পড়েছ?

অপর্ণা নিরুত্তর।

মহাভারতের মহাতপা ঋষিদের সব কাণ্ডকারখানা দেখেছ?

যার যেমন চোখ সে সেই রকমই দেখে। মহাভারতের তুমি ওই সবই দেখেছ আর কিছু দেখনি।

ওগুলো তাহলে আর্ষ প্রয়োগ, না দেখাই উচিত?

নতুন করে অশান্তির সূচনা দেখা দিচ্ছে সেটা সেদিনই প্রথম অনুভব করেছিলেন অপর্ণা সোম। বিদ্বেষে ভিতরটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল।

সুপার বছর পাঁচেক বয়সে তখন। সকালের দুধ খাওয়া হলেই বইখাতা বগলে নিয়ে সে কাকুর পড়তে যায়। এক কাকু ভিন্ন এ দুনিয়ায় আর কারোর তাকে পড়াবার যোগ্যতা আছে ভাবে না। ঘণ্টাখানেক বাদে সমীরণ দত্ত তাকে সঙ্গে করে নীচে নিয়ে আসেন।

বরেন সোম তাঁর উদ্দেশেও টিপ্পনী ছুড়েছেন। প্রথমে মা পার হল, এবারে মেয়ে পার হচ্ছে। ভা চিনির বলদ হয়ে আর কত কাল কাটাবি?

হাসিমুখে সমীরণ দত্ত পাল্টা জবাব দিয়েছেন, তবু তো চিনির বলদ, তোর মতো চোখ-বাঁধা কলুর বলদ নয়।

ওতেই শান্তি তাহলে, চিনি-টিনি খাওয়ার দরকার নেই?

সমীরণ দত্ত সকৌতুকে নিরীক্ষণ করেছেন। আর অর্পণার যেন মাথা কাটা গেছে। ভদ্রলোক যে কতখানি চালাক সে-ধারণা আছে বলেই এরপর মুখ দেখানো দায় হবে মনে হয়েছে।

সমীরণ দত্ত চলে যাওয়া মাত্র মেয়েকে সরিয়ে দিয়ে অপর্ণা ঘরের দরজা বন্ধ করেছেন।—তুমি ভেবেছ কী?

কী?

ও-রকম ছোটলোকের মতো কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?

ওর সঙ্গে ও-রকম ছোটলোকের মতো কথা আমি তোমার জন্মের আগে থেকে বলে আসছি। তুমি বরং একটু মুখ সামলে কথা বলতে চেষ্টা কোরো।

আমি মুখ সামলে কথা বলব! তোমাকে আমি চিনি না, তোমার চরিত্র আমি জানি না?

মুখ না সামলালে আরো বেশি চিনবে আরো বেশি জানবে। হঠাৎ এগিয়ে এসে দুটো হাতের থাবায় তাঁর দু'কাঁধ চেপে ধরেছেন, ওকে কিছু বললেই তুমি এমন অস্থির হয়ে ওঠ কেন? এর সবটাই ভক্তি না আর কিছু?

তুমি একটা জানোয়ার!

হ্যাঁ, তোমাদের ভদ্রতার মাপে গড়া ননীর পুতুল নই আমি—আমি আস্ত একখানা জানোয়ার। এ-ভাবে দরজা বন্ধ করে শাসাতে এলে ভবিষ্যতে এ জানোয়ার কত খুশি হবে তার নমুনা দেখতে চাও?

ছিটকে সরে গিয়ে ঘরের দরজা খুলে দিয়েছেন অপর্ণা।

সমীর দত্তর মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনই যেন এক মহীরুহের নিরাপদ ছায়ার মধ্যে ছিলেন। লোকটা যত নৃশংসই হোক, ওই একজনের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। তাঁর নিছক অস্তিত্বটুকুই এই মানুষও ছোট করে দেখতে পারেনি। মহিলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝড়ের সংকেত উদগ্র হয়ে উঠতে লাগল।

মাসের মধ্যে বার দুই তিন দু'চার দিনের জন্য মফঃস্বলে বেরুতে হয় বরেন সোমকে। কবে পর্যন্ত ফিরবেন বলে যেতেন। আগে বলার সঙ্গে ফেরাটা মিলত। এখন মিলছে না। দেখা গেল নির্দিষ্ট দিনের আগেই চলে আসেন। অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলে রূঢ় মুখে ফিরে প্রশ্ন করেন, আগে ফিরলাম বলে তোমার অসুবিধা হল?

এরপর অপর্ণা জিজ্ঞাসা করা ছেড়েছেন। আপিস থেকেও এক-একদিন অসময়ে হুট করে চলে আসেন। তীক্ষ্ণ চোখে কী দেখেন কী লক্ষ্য করেন অপর্ণার সেটা বুদ্ধির অগোচর নয়। ভিতরে ভিতরে তাঁরও দ্বিগুণ ঘৃণা আর দ্বিগুণ বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। ও-দিকে ওপরের ভদ্রলোক মা মারা যেতে অসহায়—এমনিতে ঢিলে-ঢালা মানুষ, বই হাতে পড়লে সময়ে আহার-নিদ্রার জ্ঞান নেই। মায়ের তাড়না আর তাগিদে সচল ছিলেন। এখন অচল কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন। তাঁর চাকরের ওপর সব দায়িত্ব। অর্থাৎ ছন্নছাড়া অবস্থা। সামনে থেকেও অপর্ণা সেটা সহ্য করেন কী করে? কৃতজ্ঞতা বলেও তো কথা আছে। তাই সুশোভনভাবে যেটুকু পারেন, করেন। দু'বেলার খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ করেন, নীচের থেকে এটা-সেটা পাঠান, অসুস্থ হলে খবর নেন। আগেও এই সবই করতেন। কিন্তু এখন ঘরের মানুষের কাছে এ-সবই যে বিকৃত রূপ নিচ্ছে তাও স্পষ্টই উপলব্ধি করেন।

উপলব্ধি তখন সমীরণ দত্তও বেশ করছেন। কিছু করতে গেলে হাসিমুখেই বিব্রত ভাবটা প্রকাশ করে ফেললেন, আমার জন্য ব্যস্ত হবার কী দরকার, মাঝখান থেকে পাগলটা খেপে যাবে আবার।

ভদ্রলোকের এই সহজতাই অপর্ণাকে সহজ করেছে, আবার ঘরের লোকের প্রতি তাঁকে কঠিন করেছে। একজনের ভুল বোঝার সম্ভাবনা নেই তখন, আর একজন খেপলেও তিনি পরোয়া করেন না। নিজেদের মধ্যে আলোচনাও সহজ হয়েছে এই নিয়ে। একসময় জবাব দেন, খেপলে কী আর করা যাবে, নয়তো বলেন, পাগলামির চিকিৎসা করুন তো একটু।

রসিকতার সুরেই সমীরণ দত্ত একদিন বলেছিলেন, চিকিৎসা করলে তুমি মানবে?

আমার মানা না মানার কী আছে, যে পাগলামি করছে সে মানুক।

না তুমি মানলেই হবে।

কী চিকিৎসা? অপর্ণা সন্দিগ্ধ একটু।

তুমি আর দোতলার সিঁড়ি মাড়াবে না, দোতলার দিকে তাকাবেও না, আমার খাওয়া হল কি না হল তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, আর সুপার অসাক্ষাতে ওর বাপের কাছে আমার নামে নিন্দা করবে বেশ করে।

এমন অম্লান বদনে বলেছেন যে অপর্ণা হেসেই ফেলেছিলেন। তারপর গম্ভীর হতে চেষ্টা করেছেন।—বেশ, আমি রাজি। আপনি চটপট একটা বিয়ে করে ফেলুন তাহলে।

সমীরণ দত্ত নড়েচড়ে বসেছেন, বলেছেন, কেন, তার জন্যে আমাকে বিয়ে করতে হবে কেন?

অপর্ণা জবাব দিয়েছেন, তা না হলে আপনার অবস্থা যা দাঁড়াবে, আপনার মায়ের দীর্ঘ-নিশ্বাস ওপর থেকে তখন সরাসরি আমার মাথার ওপর এসে পড়বে।

হাসিমুখে প্রস্তাব ফিরিয়ে নিয়েছেন সমীরণবাবু। বলেছেন, তাহলে তুমি পাগল নিয়েই থাকো।

কথাটা একবার তুলতে পেরে অপর্ণা সহজে তাঁকে অব্যাহতি দিতে চাননি। গলায় বেশ জোর দিয়েই জিজ্ঞাসা করেছেন, কেন, আপনি বিয়ে করবেন না-ই বা কেন?

বিয়েটা তেমন সুমধুর কিছু ব্যাপার মনে হয় না বলে। তাছাড়া তোমার কথা শুনে আরো বেশি ভয় ধরেছে—এমন একটা অচল মানুষ বুঝতে পারলে যে আসবে তার কাছে মান-সম্মান ক'দিন আর থাকবে?

অপর্ণা কিছু না ভেবেই প্রতিবাদ করেছেন, বলেছেন, কেন, আমি কি আপনাকে অসম্মান করি?

চোখে চোখে রেখে মুচকি হেসেছেন সমীরণ দত্ত।—তুমি তো আর আসনি।

অপর্ণার সমস্ত মুখ লাল। নীচে পালিয়েছেন।

এম. এ. পাস করার পরে আর সমীরণ দত্তর মা মারা যাবার পরে অনেক রকমের চিন্তা যে অপর্ণার মনে আনাগোনা করত এ তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না।...যে মানুষ তাঁর জীবনে এসেছে, তার বদলে এই একজন এলে জীবনের চিত্রটা যে কত অন্যরকম হত সেটা ভাবার লোভও যে এক-একসময় না হত এমন নয়। সমীরণবাবুর বিয়ে না করাটা ভিতরে ভিতরে তাঁর একটু দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল বইকি। ভদ্রলোক যে তাঁকে কত পছন্দ করেন অপর্ণা মনে মনে অন্তত সেটুকু অনুভব না করে পারেন না। অথচ কত উদার অন্তঃকরণ তাঁর। বন্ধুর সহজ স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় এতটুকু যাতে চিড় না খায় সে-জন্য কত সজাগ দৃষ্টি।

না, অপর্ণা এই মানুষের সর্বদা মঙ্গল চেয়েছেন, শুভ চেয়েছেন, নিজের থেকে অনেক অনেক ভালো মেয়ে তাঁর ঘরে আসুক সর্বান্তঃকরণে তাই চেয়েছেন। একবার লজ্জা পাওয়া সত্ত্বেও ওই প্রসঙ্গে আরো এক দিন কথা তুলেছিলেন তিনি।

সেই দিনই বিকেলে মফঃস্বলে বেরিয়েছেন বরেন সোম। তিন দিনের মেয়াদ। টুরের সময় এলেই সকাল থেকে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে থাকে তাঁর। অপর্ণা কারণ বুঝতে পারেন, এবং মনে মনে তিক্ত বিরক্ত হয়ে থাকেন তিনিও। লোকটা যেমনই হোক, মেয়েটাকে ভালোবাসে। রওনা হবার আগে সমীরণবাবু নীচেই ছিলেন, সুপা তাঁর কোলে বসে ছিল। যাবার আগে বরেন সোম একবার মেয়ের দিকেও না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। মেয়ে ডেকে উঠতে যাচ্ছিল, পিছু ডাকা হবে বলে সমীরণবাবু এক হাতে তার মুখ চাপা দিলেন।

কিন্তু গাড়িটা চলে যেতেই মেয়ে ফোঁস করে উঠল, মা বাবা আমাকে আদর করে গেল না যে।

অপর্ণা জবাব দিলেন না। সমীরণবাবু হাসতে লাগলেন। বললেন, আদর করবে কি, তোর বাবার কি এখন মাথার ঠিক আছে!...তোরই তো দোষ, আমাকে ওপরে যেতে দিলি না কেন!

অপর্ণাও না হেসে পারলেন না। বললেন, আপনি থামুন তো, একজনের মাথার ঠিক নেই বলে আপনাকে আর টিপ্পনী কাটতে হবে না।

বৃন্দা তখন থেকেই এ বাড়িতে বহাল। সুপা তার সঙ্গে পার্কে বেড়াতে চলে গেল। সমীরণবাবু নিজের মনেই খানিক ভাবলেন। হাসছিলেন অল্প অল্প, বললেন, আমার কোনো কথায় তো তুমি কান দাও না, একটা ভালো কথা বলব, শুনবে?

ভণিতা শুনে অপর্ণা মনে মনে শঙ্কিত। মানুষটা এত উদার এত বড়ো বলে মনে মনে তাঁকে একটু ভয়ও করেন অপর্ণা। জবাব দিলেন, না শোনার মতো হলে বলবেন না।...কী কথা?

সমীরণবাবু বললেন, সুপার বাবার যখন একটু বেশি রকম দুর্বলতা আছেই তোমার ওপর—ওর বিকৃতি বাড়িয়ে লাভ কী।...মফঃস্বলে যখন যাবে, ওর ভাই বোন কাউকে একজন তখন এ বাড়িতে এনে রাখলেই তো হয়। কারো কারো চোখে একটু দৃষ্টিকটু তো ঠেকতেই পারে...

রাগে আর লজ্জায় অপর্ণার মুখ রাঙা। কিন্তু তা বলে জবাব দেবার এই সুযোগটা ছাড়েননি তিনি। মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে আন্তরিক সুরেই বলেছেন, তাতে আর কতটুকু সুরাহা হবে...কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে নিজের আর বন্ধুর দুজনেরই উপকার করতে পারেন। সত্যিই একটা বিয়ে আপনি করছেন না কেন?

তরল জবাব দিয়েছেন, তুমি বললে একটা ছেড়ে অনেকগুলো করতে পারি।

—তাহলে জেলে যেতে হবে। আপনি একটাই করে দেখান।

হালকা সুরে সমীরণবাবু বললেন, বিকৃতিটা তো শুধু পুরুষের মনোপলি নয়। যে আসবে সে যদি আবার তোমাকে নিয়ে সমস্যায় পড়ে!

অপর্ণার মুখ লাল। একটু বাদে জবাব দিয়েছেন, আমি কি আপনার কোনো সমস্যা? সে-রকমই যদি ভয় থাকে আপনার, আমি না-হয় অন্য বাড়িতে চলে যাব।

সমীরণবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন। তেমনি সহজ হাসি মুখ। বলেছেন একটা মিথ্যেকে জোড়া-তাপ্পি দেবার জন্য ঝামেলা বাড়ানোর দরকার কী।...তুমি একেবারেই সমস্যা নও এ-কথা বললে সত্যি বলা হবে না। তুমি এ-বাড়িতে থাকবে না এখন আর সেটা ভাবতে একটুও ভালো লাগে না, কিন্তু তা বলে এ-সমস্যাটা এত বড়ো নয় যার জন্য কারো এতটুকু দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে।...তোমাকে আমার ভালো লাগে, কিন্তু কী-রকম ভালো লাগে ঠিক বুঝতে পারলে ওই গাধাটার মনে মনে খুশি হবারই কথা।

চলে গেছেন। অপর্ণা তার পরেও বিমনা হয়ে বসেছিলেন অনেকক্ষণ। সহজ স্বীকৃতিতে এই মানুষটার ভিতর যে কত সুন্দর তাই যেন উপলব্ধি করছিলেন তিনি।

তুচ্ছ কথা থেকেই বড়ো রকমের গোলযোগ ঘটে গেল একদিন।

রবিবার ভিন্ন বরেন সোমের ছুটিছাটা নেই বললেই চলে। ওদিকে সমীরণ দত্তর সপ্তাহের মধ্যে দু'-তিন দিন ছুটি। কাজের দিনে বেশি হলে দু'-তিন ঘণ্টার ক্লাস। তাতেও দিনকালের হাওয়ায় আর ছাত্রদের নবচেতনার কল্যাণে প্রতিবন্ধক লেগেই আছে। তার ওপর বছরে দু'বার করে লম্বা ভেকেশান। রবিবার দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর এই নিয়েই সরস টিকা টিপ্পনী চলছিল।

রবিবারে সমীরণ দত্তর নীচে আহার বরাদ্দ একরকম। সপ্তাহের ওই একটা দিন বরেন সোম নিজে বাজারে যান। পছন্দমতো বাজার করেন। খরচের দিকে তাকানোর স্বভাব নয় কোনোদিন। অন্য দিন সমীরণবাবুর চাকর নয়তো বৃন্দা ভরসা। সেদিন আরও বাড়তি বাজার হয়েছে কারণ দু'দিন আগে সুপার জন্মদিন গেছে। মেজাজ প্রসন্নই ছিল বরেন সোমের। বাজার করতে এসে অপর্ণাকে তাগিদ দিয়েছেন, সমীরণকে বলে এলে না?

রবিবারে আবার এই বন্ধুটি পাশে না থাকলে খাওয়া জমে না। তাই নিজেই তাগিদ দেন। অপর্ণা রান্নার তদারক করতে করতে জবাব দেন, চাকরকে বলা আছে, সময়ে ডাকলেই হবে।

খুশির হাওয়াতেই আহার পর্ব সমাধা হয়েছে। তারপর ওই ছুটির প্রসঙ্গ উঠেছে। কী উপলক্ষে সমীরণ দত্তর আগামী সোম মঙ্গল বুধ তিন দিন ছুটি। শুক্র শনি অফ্ ডে। মাঝের বৃহস্পতিবারটা কোন অছিলায় ডুব দেবার কথা ভাবছেন—টানা একটা সপ্তাহ তাহলে আনন্দে কাটানো যাবে।

ছুটির ফিরিস্তি শুনেই বরেন সোমের মেজাজ বিগড়াল কি না কে জানে! মুখ মচকে জিজ্ঞাসা করলেন, এত ছুটির পরেও তোফা আনন্দের জন্য আবার একটা দিন ডুব দেওয়া দরকার! তোফা আনন্দটা কোপ্তা কালিয়া গোছের কিছু মনে হচ্ছে।

সমীরণবাবুও তরল জবাব দিলেন, তুমি কলুর বলদ, ছুটির স্বাদ কী বুঝবে বন্ধু।

তাই তো, চিনির বলদ কি ছুটির দিনে চিনির স্বাদও একটু-আধটু পাচ্ছে নাকি?

জবাব না দিয়ে সমীরণবাবু মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। আর অপর্ণা ঘরের লোকের মুখভাব দেখে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন।

বরেন সোম গলা ছেড়ে তারিফ করলেন, আহা, তোকে দেখে হিংসে হচ্ছে আমার। আসছে বারে আমি যেন কলেজের মাস্টার হয়ে জন্মাই।

কটাক্ষে একবার অপর্ণার দিকে তাকিয়ে সমীরণ দত্ত উপভোগ্য রসিকতাই করে বসলেন।—তুই একটা গাধা না হলে এমন ইচ্ছে হবে কেন! আসছে বারে আমার অন্তত বরেন সোম হয়ে জন্মাতে আপত্তি নেই।

অপর্ণা লাভের আশায়?

অপর্ণার অস্বস্তি বাড়ছিল। মুখে লালের ছোপ। সমীরণ-বাবুর জবাব দেওয়ার দরকার হল না। রসিকতার তাৎপর্য অস্পষ্ট নয় একটুও। বরেন সোমের মুখের হাসি কমছে। সেখানে যন্ত্রণা মেশানো একটা ইর্ষার ছায়া এঁটে বসেছে। হাসিটুকুও সুশোভন ঠেকছে না আর। বলে উঠলেন, বেশ বেশ, এ জন্মে তাহলে শুধু ছুটির ওপর দিয়ে চলা ছাড়া আর উপায় কী। স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, তুমিও কি এই জন্যেই মেয়েটাকে সকালের স্কুল থেকে দুপুরের স্কুলে ঠেলে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ নাকি? তোমারও দুপুরে ছুটি চাই?

মুহূর্তের মধ্যে ঘরের ভেতর একটা কদর্য বাতাস ঠেলে ঢুকল যেন। অপর্ণার ভিতরটা রি-রি করে উঠল। সমীরণবাবুর ঠাণ্ডা মুখ। একটু চুপ করে থেকে খুব সাদামাঠাভাবে বললেন, কী আর করা যাবে, আমার কলেজের ছুটির ব্যবস্থা তোর সুবিধেমতো হবে না, আর ছুটি হলে এই বাড়ির আশ্রয়েই আমাকে থাকতে হবে...খুব অসুবিধা হলে তোকেই অন্য বাড়ি দেখে নিতে হচ্ছে।

ভদ্রলোকের প্রতি অপর্ণার শ্রদ্ধা সেদিন আরো বেড়েছিল। প্রকারান্তরে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বললেন। আরো স্পষ্ট করে বললে অপর্ণা আরো খুশি হতেন। গোড়ায় যে ভাড়ায় এসে ওঠা হয়েছিল এখনো সেই নাম-মাত্র ভাড়াই চলেছে। বরেন সোমের চাকরির উন্নতির পরে অপর্ণা একবার ভাড়া বাড়ানোর প্রসঙ্গ তুলতে গেলে সমীরণবাবু বলেছিলেন, তাহলে নীচে থেকে যে-সব খাওয়া দাওয়ার জিনিস ওপরে উঠছে তারও দাম পাঠাব আমি। তারপর এ নিয়ে আর কেউ উচ্চবাচ্চ্য করেনি।

অপমানে মুখ কালো বরেন সোমের। সেদিন থেকেই বাড়ির খোঁজে নেমেছেন। প্রথমে বর্তমানের এই বাড়ির দোতলাটা ভাড়া পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, যেখানে ছিলেন তার থেকে অসুবিধে বাড়ল, মাশুলও দ্বিগুণ বাড়ল। আরো দূরে একেবারে চোখের নাগালের বাইরে বাড়ি ঠিক করার ইচ্ছে ছিল বরেন সোমের। কিন্তু তার জন্য সময় দরকার। আর বরেন সোম পারলে সেদিনই বন্ধুর বাড়ি ছাড়েন। দেখে শুনে পরে অন্য বাড়ি ঠিক করবেন।

কিন্তু পরে সে চেষ্টা করতে অপর্ণা ফুঁসে উঠেছেন। বলেছেন, ও বাড়িতে বাসের যোগ্য নই আমরা, ভদ্রলোক বার করে দিয়েছেন বেশ করেছেন। কিন্তু ফের এখান থেকে তুমি নড়াবে আমাকে? কুকুর বেড়াল পেয়েছ, কেমন?

বরেন সোম সশ্লেষে বলে উঠেছেন, এখান থেকে নড়তে চাও না কেন, তবু কাছাকাছি থাকতে পাবে বলে?

হ্যাঁ, কাছাকাছি থাকতে পাব বলে। তোমার ছোট মন, তুমি যা খুশি ভাবোগে, মাসের মধ্যে দশদিন মফঃস্বলে কাটাও, একরত্তি একটা মেয়ে নিয়ে আমি থাকব, কত রকমের আপদ-বিপদ আছে, সে সব চিন্তা তোমার মাথায় ঢোকে?

বরেন সোম হেসেছিলেন। গা-জ্বালানো কুৎসিত হাসি। বলেছিলেন, তাহলে তো কাছাকাছি থাকাই ভালো...মিথ্যে আর খরচ বাড়িয়ে লাভ কী হল, সমীরণের হাতেপায়ে ধরে ও বাড়িতেই আবার ফেরা যাক তাহলে?

অপর্ণা জবাব দেননি। এই মানুষের আর পরোয়াও করেননি। গোছগাছ সারা হতে তাঁর নাকের ডগা দিয়ে পরদিনই মেয়ের হাত ধরে সমীরণবাবুর বাড়ি গেছেন। গম্ভীর মুখে হাত বাড়িয়ে সমীরণ দত্ত মেয়েকে টেনে নিয়েছেন। ওর সঙ্গে খানিক কথাবার্তা করে সহজ হতে চেষ্টা করেছেন। তারপর অদূরে একটা ছবির বই দিয়ে ওকে বসিয়ে অপর্ণার সামনে এসে বলেছেন, আমার ব্যবহারে খুব দুঃখ পেয়েছ তো?

অপর্ণা হাসি মুখে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, কী মনে হয়? পরে আন্তরিক সুরে বলেছেন, ওই ব্যবহারটুকু আপনি করেছেন বলেই আপনার আমার দু'জনেরই সম্মান বেঁচেছে।

একটু চুপ করে থেকে সমীরণবাবু বলেছেন, অনেকবার ভেবেছি বরেনকে বলি আমার অন্যায় হয়েছে, থেকে যা—কিন্তু ওরও এই বিচ্ছিরি রোগটা সারা দরকার ভেবেই বলতে পারিনি।

রোগ সারবে কি না জানি না, কিন্তু বললে আপনার ওপর আমার সত্যিকারের রাগ হত।

এরপর রোজই বিকেলে বৃন্দার সঙ্গে সুপা কাকুর বাড়ি গিয়ে ফেরার সময় হাত ধরে তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে আসত। বরেন সোম গম্ভীর। গোড়ায় দিনকতক অভ্যর্থনা করা দূরে থাক, বাক্যালাপও করেননি। শেষে একদিন আবার তিক্ত রসিকতাই করে উঠলেন, মাঝখান থেকে আমার খরচা বাড়াই সার হল।

সমীরণবাবুরও ঠোঁটের ডগায় জবাব।—তোর মতো বোকার ক্ষতি ঠেকাবে কে?

আরো শ্লেষ মিশিয়ে বরেন সোম বলে উঠলেন, ক্ষতিটা শুধু টাকার ওপর দিয়েই হবে তো? নিজের বাড়িতে এখন তিনি কাকে পরোয়া করেন?

এই মানুষটার স্বভাব সমীরণ দত্তও তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন বলেই অপর্ণার সঙ্গে পুরনো সম্পর্কে চিড় খায়নি। বরং ভিতরে ভিতরে দুজনের সঙ্গে বোঝাপড়াটা আগের থেকেও বেশি অমলিন আর সহজ হয়ে উঠতে পেরেছে। অবকাশ পেলে মেয়ের হাত ধরে অপর্ণা আগের মতোই যান। তার চাকরকে মালিকের সুখ-সুবিধের ব্যাপারে নির্দেশ দেন। বৃন্দার হাত দিয়ে খাবার পাঠান। আর সুপার পড়াশুনাও কাকুর কাছেই চলতে থাকল।

বছর কয়েক বাদে অপর্ণাদের নীচের তলাটা খালি হল। বরেন সোমের চাকরিতে তখন আরো কয়েক ধাপ উন্নতি হয়েছে। সেই সঙ্গে সরকার থেকে প্রাপ্য বাড়ি ভাড়ার পরিমাণও বেড়েছে। অতএব নীচের তলা খালি হওয়া মাত্র সেটা দখল করেছেন। ঘরের লোকের বাঁকা হাসি গায়ে মাখেননি। বাঁকা হাসির কারণ সঙ্গতি বাড়ার পরে বরেন সোম অনেকবার বেশি ভাড়ার বাড়িতে উঠে যেতে চেয়েছেন। অপর্ণা রাজি হননি। বিনে পয়সায় সুপার অমন মাস্টার বোধহয় দুনিয়ায় আর মিলবে না।

অপর্ণার শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা অর্থাৎ দেওর দু'টি আর ননদেরা মাঝে-মাঝে ও-বাড়িতে থাকার সময়ও আসত, এ-বাড়িতেও আসে। সমীরণবাবুর বাড়ি ছেড়ে আসতে তাদের চোখেমুখে এক ধরনের কৌতূহল লক্ষ্য করেছেন অপর্ণা। তাঁর স্থির ধারণা, ঘরের লোক সমীরণবাবুর সম্পর্কে ওদেরও কানে বিষ ঢোকাতে ছাড়েনি। নইলে এখানে তাঁকে দেখলেই এমন সচকিত চাউনি কেন ওদের।...বিয়ের অনেক দিন বাদে বর্ধমান থেকে ধীরা একবার বেড়াতে এসে এ-বাড়িতে ছিল দিন দুই। তখন সমীরণবাবুকে দেখে একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, বেচারা ভদ্রলোক তাহলে বিয়ে-থাওয়া আর করলেনই না।

আর ঘরের লোক তো কোনদিনই এই একজনের বিয়ে না করাটা সাদা চোখে দেখেনি।

মোট কথা, ও-তরফের সকলেরই বদ্ধ ধারণা, সমীরণ দত্তর বিয়ে না করার নিগূঢ় হেতু কিছু আছেই। এবং সবটুকুই অপর্ণার কারণে। কারো চোখ মুখে এই সংশয় দেখলেই অপর্ণার মুখ লাল হয়, বিরক্তিতে ভিতরটা ভরে ওঠে, নীচ-মন ভাবেন। অথচ সংশয় নিজের মনেও যে উঁকিঝুঁকি দেয় না এমন নয়। বিয়ে কেন করলেনই না ভদ্রলোক এ-প্রশ্ন মনে আসে। দুঃখও হয় মানুষটার জন্য। কিন্তু সে দুঃখ সব রকমের ইতর সংস্পর্শের ঊর্ধ্বে।

বড়ো রকমের ভূমিকম্প হয়ে গেল একটা। মানসিক বিপর্যয়। তার প্রথম ধাক্কায় মনে হল অপর্ণার সংসারটাই বুঝি বরাবরকার মতো ধসে গেল।

সুপার তখন বছর এগারো বয়েস।

পাঁচদিন বাদে বরেন সোম মফঃস্বল থেকে ফিরেছেন। থমথমে মুখ, কিন্তু চোখের দৃষ্টি চকিত। এক এক সময় চিন্তাচ্ছন্ন, বিমর্ষ ঘর থেকে বেরুতে চান না সহজে। ফিরে এসে তিন দিনের মধ্যে আপিসে গেলেন না, বাড়িতে নিজের ঘরেই কাটালেন। কিছু একটা ঘটেছে অপর্ণা বুঝেছেন। কী সেটাই ভেবে পেলেন না। জিজ্ঞাসা করে ধমক খেলেন। সেও শালীনতাশূন্য কটূক্তির মতো। তারপরেই বড়ো বড়ো হরফে কাগজের প্রধান শিরোনামায় চাঞ্চল্যকর খবর একটা। উদ্বাস্তু বিভাগের এক হোমরাচোমরা অফিসারের জঘন্য কুকীর্তির খবর। আঠারো বছরের এক অনাথা উদ্বাস্তু মেয়েকে কেন্দ্র করে এক কুৎসিত ষড়যন্ত্রের খবর! সেই মেয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচারের খবর।...দু'দিন দু'রাত্রি বাদে ছাড়া পেয়ে সেই অসহায় মেয়ে নিজেই এক রাজনৈতিক দলের শরণাপন্ন হয়েছে। গোপনতার কবর খুঁড়ে তারা যে সত্য উদ্ঘাটন করেছে, স্তম্ভিত হবার মতোই ব্যাপার। সেই রাজনৈতিক দল তারস্বরে শোরগোল তুলেছে। বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, সংশ্লিষ্ট অফিসারের শাস্তি দাবি করেছে। আঠারো বছরের সেই মেয়ের ছবিও বার করা হয়েছে কাগজে।

কাগজে অফিসারের নাম লেখা ছিল না। সেটা প্রকাশ হয়েছে বিচার পর্বের সময়। কিন্তু খবরটা পড়েই বুকের ভিতরটা জমে যাবার দাখিল অপর্ণার। তিনি এখন জানেন ওই অফিসার কে, তিনি এখনই বলে দিতে পারেন কার এমন জঘন্য হীন কাজ।

রক্তবর্ণ মুখ। কাগজটা হাতে করে ওই ঘরে ঢুকেছেন, যে ঘরে তিন দিন ধরে একজন নিজেকে আটকে রেখেছেন।

তাঁকে দেখামাত্র বরেন সোম অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

অপর্ণার দু'চোখে আগুন ঝরছে। তিনি দেখছেন দেখছেন দেখেছেন। তারপর তীব্র শ্লেষে বলে উঠেছেন, মুখ ফিরিয়ে আছ কেন, খুব বেশি লজ্জা করছে?

বরেন সোম আরো একটু ঘুরে বসতে চেষ্টা করেছেন।

ঘৃণায় বিদ্বেষে অপর্ণার ভিতরটা অবিরাম জ্বলেছে ক'টা দিন। তার মুখ দেখেননি, বাড়িতে লোক আনাগোনা করেছে, তার মধ্যে পুলিসের লোকও আছে। বরেন সোম নিঃশব্দে নীচে নেমে এসেছেন, তারপর সকালে বেরিয়ে সন্ধেয় ফিরেছেন। অপর্ণা লক্ষ্য করেছেন কিন্তু মুখের দিকে তাকাননি।

...বাড়িতে সাময়িক বরখাস্তের নোটিস এসেছে জানেন। কেস শুরু হল তাও জানেন। উকিল যাওয়া-আসা করছে তাও খবর রাখেন। কিন্তু নিজে তিনি সামনে এসে দাঁড়াননি. মুখের দিকে তাকাননি।

চিন্তিত মুখে সমীরণবাবু এসেছেন, তাঁর গনগনে মুখ এড়াতে চেষ্টা করে সোজা গিয়ে বন্ধুর ঘরে বসেছেন। ঘণ্টাখানেক বাদে আবার তাঁর কাছে এসেছেন।

আর কেউ হলে তাকে দেখা মাত্র হয়তো ক্ষোভে ঘৃণায় ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকত। কিন্তু অপর্ণা তা করেননি। ভিতরটা আরো বেশি জ্বলছে তাঁর। তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন একটু, তারপর জ্বলন্ত আগুন নিক্ষেপ করেছেন যেন এক ঝলক।—বন্ধুর হয়ে একটু সুপারিশ করার ইচ্ছে মনে হচ্ছে?

আমতা আমতা করে সমীরণবাবু জবাব দিয়েছেন, না...তবে মজা দেখতে আসিনি এটুকু বিশ্বাস করতে পারো।

অপর্ণা বিশ্বাস করেছেন। একটু নির্ভরতা যেন পেয়েছেন। মনের সেই অবস্থায় এই একজনকেই আরো কাছের মানুষ মনে হয়েছে তখন। এ সময় যদি ইনি এসে তাঁর হাত ধরে বলতেন, এ পঙ্ককুণ্ডে আর নয়, অনেক দেখা হয়েছে—এসো, অপর্ণা এক মুহূর্ত দ্বিধা করতেন না বোধহয়। অস্বীকার করবেন না, মনে এই গোছের আশাও হয়ত তিনি করেছিলেন। পরে অবশ্য মেয়ের কথা ভেবে অন্য সঙ্কল্পে মন বেঁধেছেন।

একটু চুপ করে থেকে সমীরণ দত্ত আবার বলেছেন, যতদূর বুঝলাম চাকরিতেও ওর শত্রু অনেক...অনেককে ডিঙিয়ে ওপরে উঠেছে বলেই হয়তো। তারা টোপ ফেলেছে বুঝতে পারেনি, তাই থেকে ফ্যাসাদ....।

না, এই একজনকে লজ্জা করেননি অপর্ণা, প্রসঙ্গ ওটা মাত্র ঘৃণায় মুখ সেলাই করে বসে থাকেননি। উল্টে ফুঁসে উঠেছেন, কিসের টোপ—লোভের? কী টোপ—ওই মেয়েটা? টোপ না হলে আর ফ্যাসাদে না পড়লে দোষের কিছু থাকত না—কেমন?

সমীরণবাবু জবাব দিতে পারেননি। খানিক বাদে সান্ত্বনার সুরে বলেছেন, কিন্তু মাথা খারাপ করলে কিছু তো এগোবে না—

মাথা খারাপ আমি করছি না, মাথা খুব ঠিক আছে।

বরেন সোমের বিচার শেষ হতে টানা এক বছর লেগেছে। এই এক বছর সাবসিসটেন্স অ্যালাওয়েন্স অর্থাৎ চার ভাগের একভাগ মাইনে পেয়েছেন। বিচারে মুক্তি মিলেছে। দোষী সাব্যস্ত হলে চাকরি যেত, জেল হত। দেখা গেছে টোপ হিসেবে যে মেয়েটাকে ব্যবহার করা হয়েছে, তার বয়েস আঠারো নয়, বাইশ তেইশ। আর তার জীবনযাত্রাও সরল সুন্দর নয়। এবং কুটিল পদক্ষেপও এই প্রথম নয়। জেরার ফলে বরেন সোমের বাংলোয় তার দু'রাত আটকে থাকাটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে হয়েছে বিচারকের। তাঁর মন্তব্যে সংশ্লিষ্ট অফিসারের প্রসঙ্গে কটাক্ষ থাকলেও শেষ পর্যন্ত সংশয়ের অবকাশ মুক্তি মিলেছে।

চাকরিতে পুনর্বহাল হয়েছেন বরেন সোম। এক বছরের বকেয়া মাইনে পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও চাকরির খাতায় কলঙ্কের যে ক্ষতচিহ্ন পড়েছে সেটা দুরপনেয়। আর উন্নতির আশা কম। দায়িত্বও অনেক কেটে-ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে তাঁর আগের প্রতাপ নিষ্প্রভ।

এই এক বছরে অপর্ণার সঙ্গে ক'টা কথা হয়েছে এমন কি ক'টা দিন দেখা হয়েছে তাও প্রায় হাতে গোনা যায়। বরেন সোম এক চতুর্থাংশ মাসোহারা যা পেয়েছে তার দ্বিগুণ খরচ হয়েছে কেস চালাতে। এবং তাতে পুঁজিও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। তখন সংসার চলেছে অপর্ণার বাবার টাকায়। না, মেয়ে শরণাপন্ন হননি, তাঁর বাবা-মা'ই ছুটে আসছেন। মেয়ের সমস্ত অশান্তির জন্য যে মূলত তাঁরাই দায়ী অত কাল বাদে তাঁরা সেটা আবার নতুন করে অনুভব করেছেন। অতএব শুধু সংসার নির্বাহের টাকা জোগানো নয়, মেয়ের ভবিষ্যত সংস্থানের ব্যবস্থায়ও উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা।

চাকরিতে পুর্নবহাল হবার পর বকেয়া টাকা হাতে পেয়ে বরেন সোম স্ত্রীর ঘরে ঢুকেছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন এই এক বছরে শ্বশুরমশাইয়ের কাছ থেকে কত টাকা নেওয়া হয়েছে?

অপর্ণা জবাব দিয়েছেন, ভিক্ষে যাঁরা দেন তাঁরা ফেরত পাবার আশায় হিসেব রেখে দেন না। তাঁর কাছেও সে-হিসেব নেই।

মানুষটা সদম্ভে ফিরে গেছে। অপর্ণার অন্তত সে-রকমই মনে হয়েছে। নিজের সহ্যগুণ কম ভাবেন না। এরপরেও যদি সে রকম অনুশোচনা বা অনুতাপের দাহ দেখতেন, যদি আত্মশুদ্ধির আগুনে তিলে তিলে পুড়তে দেখতেন, অপর্ণার ভিতরটা হয়তো বা নরম হত কোনো একসময়। কিন্তু তা তিনি দেখেননি। উল্টে ক্ষোভ আর অসহিষ্ণুতার গনগনে আঁচ দেখছেন।...আর কখনো কখনো সেই ঘৃণা প্রবৃত্তির তাড়নায় অধিকার বিস্তারের নির্লজ্জ স্পর্শ থেকে যেন নিজেকে রক্ষা করেছেন। তাই প্রয়োজনে নির্মম হতেও বাধেনি।

মানুষটার নিষ্ফল আক্রোশ আজও টের-পান। সদম্ভে নিজের মনেই থাকতে চেষ্টা করেন। সে-রকম প্রয়োজনে সুপাকে ডাকেন, সেধে স্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলতে চান না। বন্ধু অর্থাৎ সমীরণ দত্তর সঙ্গে মানসিক বিচ্ছেদ আগেই ঘটে গেছল। এখন সামনা-সামনি মুখোমুখি দেখা হলেও কথা বলেন

না। মুখ ঘুরিয়ে চলে যান। হাবভাব আচরণে তাঁকে অপমান করতে চেষ্টা করেন। অথচ সেই দুঃসময়ে এই একটি মাত্র ভদ্রলোক যেচে তার ঘরে গেছেন। কেন গেছেন অপর্ণা তাও অনুমান করতে পারেন। গেছেন অপর্ণার মায়ায় আর সুপার মায়ায়। বন্ধুকে টেনে তুলতে চেষ্টা করেছেন পরামর্শ দিয়েছেন। গোপনে টাকাও দিতে চেষ্টা করেছিলেন তাও অপর্ণা জানেন। টাকা নেবার দরকার হয়নি। যাই হোক দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার এই ব্যবহার। সমীরণবাবু গায়ে মাখেন না। গায়ে মাখার উপায় নেই। কারণ, অপর্ণা এ-রকম ব্যবহারের সূচনাতেই তাঁকে বলে রেখেছেন, কী মানুষ আর কেমন মানুষ আপনি জানেন। আপনার অসুবিধে বুঝি, তবু আপনি আমাদের ত্যাগ করবেন কি না ভেবে দেখবেন।

ত্যাগ করেননি। আপদে বিপদে সর্বদাই সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দু-দু'বার সুপার ফাঁড়া কাটিয়ে দিয়েছেন। এই এক জন না থাকলে ওই মেয়ে কোথায় ভেসে যেত ঠিক নেই।

এই বাড়ির আবহাওয়ায় মেয়েকেও রাখতে চাননি অপর্ণা। মেয়ের স্বভাবে অনেকখানি বাপের প্রভাব দেখেন। তাকে বাংলাদেশের বাইরে কোন মেয়ে বোর্ডিংয়ে রেখে পড়ানোর কথা অনেক বার ভেবেছেন। সমীরণবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনাও কম হয়নি। সব-দিক ভেবে বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতে হয়েছে। কারণ, সমরণবাবু মত দেননি। মেয়ে সন্তান—নিজের চোখে রাখাটাই ভালো মনে করেন তিনি তাছাড়া মেয়েটার পড়াশুনার ব্যাপারে এই ভদ্রলোক যে কতখানি সহায় সেও ভাবতে হয়েছে অপর্ণাকে। এ-দায়িত্ব তাঁর কাঁধে চাপিয়ে অনেকখানি নিশ্চিন্ত। সব থেকে বড়ো কথা, যত কঠিন ব্যক্তিত্ব নিয়েই থাকুন, মেয়ে মাঝে না থাকলে একজনের সঙ্গে এই এক বাড়িতে বাস সম্ভব হবে কি না সে-চিন্তাও বারবার মনে এসেছে।

তারপর থেকে এই দীর্ঘ দশ-এগারো বছর পর্যন্ত একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে বসে আছেন তিনি। মেয়েকে লেখা-পড়া, নাচ-গান-বাজনা শিখিয়ে সুপাত্রস্থ করার অপেক্ষায়। কালকের দিনটায় অপেক্ষায়। তারপর কী হবে তিনি জানেন না।...হাত ধরার জন্য হয়তো সমীরণবাবু এগিয়ে আসবেন। এলে সেটা ভালো হবে কি মন্দ হবে এ-নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বসে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করাও অসম্ভব হবে না। মনের দিক থেকে এই গোছের পরিণতি বোঝা-পাড়ার ফলে কারো আঘাত পাওয়া বা আঘাত দেওয়ার প্রশ্নও নেই। মানুষটি যে উঁচুতে বসে আছেন সেইখানেই থাকবেন—অপর্ণার এটুকুই বিশ্বাস কাম্য। হাত বাড়ান আর না বাড়ান। কিন্তু সে-চিন্তা-ভাবনা বিচার-বিবেচনা এখন নয়। সুপার বিয়েটা হয়ে গেলে তারপরে। কালকের পরে।

সাত

পুরুতের ফর্দ মিলিয়ে জিনিসগুলো গোছগাছ করতে করতে আবার মনে পড়ল কি। বিধিমতো মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, বিধিমতোই কন্যা সম্প্রদান করতে হবে। যে প্রশ্ন উঠতে অপর্ণা বলেছিলেন তিনিই করবেন। কিন্তু পুরোহিত পূর্ববঙ্গের মানুষ, মেয়েছেলে কন্যা-সম্প্রদান করবেন সেটা খুব পছন্দ নয়। বলেছিলেন বাপ-কাকারা কেউ করলেই ভালো হয়।

অপর্ণা তখন কানে তোলেননি। প্রয়োজন হলে এ-দেশে মেয়েরা কন্যা-সম্প্রদান করেই থাকেন। কিন্তু আজ দুপুরের দিকেই কথাটা ভেবেছেন। তিনি এ-ব্যাপারে আটকে থাকলে অন্যদিকে বিশৃঙ্খলা হতে কতক্ষণ? আর একজন তো বিশৃঙ্খলা ঘটানোর ফিকিরেই থাকবে। মন সায় দিচ্ছে না, তবু দেওর দু'জনের একজনকে বলবেন কি না ভাবছিলেন। তিনি মুখ ফুটে বললে কেউ আপত্তি করবে না, তবু মনের সায় মিলছে না। সমীরণবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করবেন ভেবেছিলেন। ভুলে গেছেন।

কত কাজ পড়ে আছে কিন্তু কিছুই যেন এগোচ্ছে না। কেন রেজিস্ট্রি বিয়েতে মত দিলেন না সে জন্য নিজের ওপরেই বিরক্ত। বিয়ে হওয়া নিয়ে কথা, একজনের আর একজনকে হৃদয় মন দিয়ে গ্রহণ করাটাই আসল ব্যাপার—আচারে কী যায় আসে। বারান্দার দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল রাত্রি। হাতের কাজ ফেলে অপর্ণা উঠলেন আবার।...ও-ঘরে যাওয়া দরকার। ফোন একটা করা দরকার। দেশের কাজের বক্তৃতা সেরে ছেলে এতক্ষণে ফিরেছে নিশ্চয়। বিয়ের নামে আগের

ছেলেরাই বা কী ছিল আর এখনই বা কী। তাঁরও পরে দু-দুটো বোনের বিয়ে হয়েছে, দুই ননদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আগে পরে ওদের বরগুলোকে দস্তুরমতো হ্যাংলা মনে হয়েছে অপর্ণার। যে-কোনো অছিলায় ছোঁক ছোঁক করে আসা-যাওয়ার বিরাম ছিল না। বোনেদের বিয়ের সময় অনেক দিন বাপের বাড়িতে আর ননদের বিয়ের সময় কিছুদিন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। দেখতে না চাইলেও তখন অনেক কাণ্ড দেখতে হয়েছে।

বারান্দায় সুপার মুখোমুখি। বাপের ঘরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ফিরছে। হাসি-হাসি মুখে আলগা বিরক্তি। বলল, বাবা সেই ঘরের মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, বেরোয়ও না একবার।

কেন?

কেন আবার কী, এত কাজ এত লোকজন, দেখা-শুনা করতে পারে কথাবার্তা কইতে পারে, তা না—বসেই আছে ঘরের মধ্যে।

বেরুলেই তুই টেলিফোন নিয়ে বসতে পারিস, কেমন?

হি-হি করে হেসে সুপা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল। হাসি পেলেও অপর্ণার বিরক্তি।—ছাড়, আচ্ছা বেহায়া মেয়ে হয়েছিস তুই। ফোন আমিই করতে যাচ্ছি, কাল ঠিক ক'টায় গাড়ি পাঠাব, একটা বাস আর একটা মোটর গেলেই হবে কি না কিছুই ঠিক হল না।

ছেলের বাপের সঙ্গে আলোচনার আরো একটু বিষয় আছে যেটা সুপাকে বলা গেল না। বিয়ের আসরে অতিথি অভ্যাগতর সামনে ছেলের বাপের হাতে তিন হাজার টাকাটা গুনে দেওয়া মনঃপূত নয়। তার থেকে সকালে এক ফাঁকে গিয়ে যদি টাকাটা দিয়ে আসেন মন্দ হয় না। এই ব্যবস্থাও ছেলের বাবাকে জানিয়ে রাখা দরকার।

ঘরে ঢুকলেন। বরেন সোমের মুখের ওপর খবরের কাগজ। সেটা সরল। কোনোদিকে না তাকিয়ে অপর্ণা রিসিভার তুললেন, নম্বর ডায়েল করলেন। ও দিকের ফোন বেজেই চলল। কেউ আর ধরে না। শেষে সাড়া মিলল। ভদ্রলোকের বড় ছেলের বউ।

নিজের পরিচয় দিয়ে অপর্ণা জিজ্ঞেস করলেন, খবর সব ভাল তো?

ভাল। ও-ধার থেকে কেমন আধো-আধো জবাব।

রঞ্জন দেওঘর থেকে কখন ফিরেছে?

তেমনি বাধো-বাধো সুরে জবাব এলো, এখনো ফেরেনি....।

অপর্ণা অবাক যেমন, মনে মনে বিরক্তও তেমনি। কিন্তু মুখে আর সেটা প্রকাশ করেন কী করে। ছেলেকে সামনে পেলে বরং বকে দিতে পারতেন।—এখনো ফেরেনি! দেখো তো ছেলের কাণ্ড। আজ আর গাড়ি আছে তো, কখন ফিরবে?

জবাব এলো, গাড়ি আছে বোধ হয়, কিন্তু কখন ঠিক বলতে পারছে না।

অকারণে এমন উদ্বেগের বোঝা চাপালে কার মেজাজ ঠিক থাকে। দেওরের বিয়ে অথচ মেয়েটার কথার সুরে সে-রকম যেন গরজ নেই। সব ব্যাপারে মেয়ের তরফেরই যেন মাথাব্যথা।

জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার শ্বশুরমশাই বাড়ি নেই?

জবাব শুনলেন শ্বশুর-শাশুড়ি কেউ বাড়ি নেই।

অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাদেরও কাজ আছে, নেমন্তন্ন করা আছে।

একটু ভেবে অপর্ণা বললেন, তোমার শ্বশুরমশাই ফিরলেই আমাকে একবার ফোন করতে বোলো, মনে থাকবে?

ফোন রেখে অপর্ণা ফিরে চললেন।

শোনো।

ঘুরে দাঁড়ালেন।

কাল বৃদ্ধি সম্প্রদান এ সব কে করবে?

অপর্ণা মুখের দিকে তাকালেন একটু! সেধে জিজ্ঞাসা করা হল বলেই পাল্টা প্রশ্ন করতে ছাড়লেন না।—কেন, তুমি করবে?

রঞ্জন বোসের হাতে এই লোক মেয়ে সঁপে দিচ্ছে....উপভোগ্য কল্পনাই বটে। খুব সাদাসিধে ভাবে বললেও শ্লেষটুকু ঠিকই ধরা পড়ল। বরেন সোমের ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল।—আমার মেয়ে আমি সম্প্রদান করব না তো কি তোমার সমীরণবাবু এসে করবেন।

মুহূর্তের জন্য অপর্ণার সমস্ত মুখ লাল। কিন্তু সামলে নিলেন। বাড়ি ভরতি লোক, এতকাল সহ্য করেছেন আরো একটা দিন তিনি সহ্য করতে পারবেন। কালকের দিনটা যাক। ঠাণ্ডা দু'চোখ একবার তাঁর মুখের দিকে বুলিয়ে দরজার দিকে ঘুরলেন।

দাঁড়াও। বৃদ্ধি সম্প্রদান সবই আমি করব তার ব্যবস্থা ঠিক থাকা দরকার। বলতে বলতে শয্যায় বালিশের নীচে থেকে চাবি নিয়ে দেরাজ খুললেন। থাকে থাকে একশো টাকা দশ টাকা পাঁচ টাকার নোট। দু'হাতে জড়ো করে সব একসঙ্গে তুললেন।

এগিয়ে এসে বললেন, ধরো।

অপর্ণা বিমূঢ় কয়েক মুহূর্তের জন্য। কোন টাকা, কিসের টাকা বুঝেও অনেকটা যেন নিজের অগোচরে হাত পাতলেন। টাকার গোছা তাঁর হাতে এলো। হাতে হাত লাগল। অপর হাতের ত্বকের স্পর্শ তপ্ত ঠেকল একটু। দশ টাকার একটা বান্ডিল মাটিতে পড়ে গেল। বরেন সোম সেটা তুলে আবার হাতে দিলেন।

পণের তিন হাজার আর ফ্রিজ-এর আড়াই হাজার টাকা ধরে তুমি উনিশ হাজার লাগবে বলেছিলে—তার বেশি লাগছে না কম লাগছে?

হিসেব করিনি।

বরেন সোম বললেন, পণের তিন হাজার বাদ দিলে থাকল ষোলো হাজার। এর আগে গয়নার জন্যে চার হাজার দিয়েছি, এখানে বাকি বারো হাজার আছে—

প্রথম প্রতিক্রিয়ায় অপর্ণা ধরে নিলেন পণের টাকাটা দিতে রাজি নয়—যা দেওয়া হয়েছে এই সব। অবশ্য এও আশাতীত। হয়তো প্রভিডেন্ট ফান্ড আর লাইফ ইনসিওরেন্সের তহবিল ঝাঁঝরা করে দাপট দেখানোর জন্য এ-টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। হয়তো কেন, এ ছাড়া আর কোথা থেকে আসবে। কিন্তু তারপর মনে হল এত টাকা দেবার পর মাত্র তিন হাজার টাকা না দিয়ে আত্ম-গর্ব খর্ব করবে না।

গম্ভীর মুখে বরেন সোম বললেন, পণের নগদ তিন হাজার টাকা তাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'পণ' কথাটা খট-খট করে বার বার কানে লাগছিল। কিন্তু এ-কথা শোনার পর বিস্ময়ের অন্ত নেই। শুধু বিস্ময় নয়, চকিত অবিশ্বাস। সেটা টাকা দেওয়ার ব্যাপারে এমন অপ্রত্যাশিত আচরণের দরুনও হতে পারে।

টাকা দেওয়া হয়ে গেছে! কাকে দেওয়া হয়েছে?

ওই বৃন্দার স্বামী নিরঞ্জনকে নয়, ঠিক জায়গাতেই দেওয়া হয়েছে, তোমার বিশ্বাস না হয় টেলিফোনে জেনে নিতে পারো।

অপর্ণা মুখের দিকে চেয়ে আছেন। বিনা উদ্দেশ্যে এই লোক কিছু করে না বলেই ধারণা। অথচ এই আচরণের উদ্দেশ্য বোধগম্য নয় একটুও। ... তার পরেই মনে হল, তেজ—নিষ্ফল তেজ ছাড়া আর কিছু নয়। এই তেজেই গয়নার চার হাজার টাকা দিয়েছিল, এখন বারো হাজার দিল—আর এভাবে তাঁকে জব্দ করার তেজেই আগ বাড়িয়ে নগদ তিন হাজার টাকা দিয়ে এসেছে।

কবে দেওয়া হয়েছে?

দিনকতক আগে। শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। খোলা কাগজ মুখের ওপর উঠে এলো।

দু'হাতে টাকার গোছা নিয়ে অপর্ণা বেরিয়ে গেলেন। এতো গুলো কাঁচা টাকার স্পর্শ ছাপিয়ে আর একটা তপ্ত স্পর্শ যেন হাতের চেটোয় চিনচিন করছে।

সামনে আবার সুপা। দু'চোখে তরল খুশির আমেজ। কী বলতে গিয়েও থমকাল। মায়ের হাতের দিকে চোখ গেছে।—অত টাকা কিসের?

অপর্ণা তাকালেন শুধু। জবাব দিলেন না।

সুপা উৎফুল্ল হঠাৎ।—বাবা দিল বুঝি? বিয়ের জন্য? সব টাকা?

বিরক্তিকর লাগছে। অপর্ণা মাথা নাড়লেন শুধু।

সুপা অরো খুশি।—দেখো তো, তুমি আবার বাবার নামে বেশি বেশি দোষ দাও—বলেছিলে এক পয়সাও দেবে না—এর আগে তো গয়নার চার হাজারও দিয়ে দিয়েছিল।

বাপের প্রতি মেয়ের যে টান একটু আছেই অপর্ণা তা বিলক্ষণ জানেন। শ্রদ্ধা-ভক্তি না থাকুক, টান আছে। স্বভাবের মিল আছে যখন টান থাকবে না কেন। ঈষৎ তপ্ত সুরে বললেন, না দিলে তোর বিয়ে আটকে থাকত?

হালকা হেসে সুপা আরো জোর দিয়েই বলে উঠল, তা থাকত না, কিন্তু বাবা থাকতে দাদুর টাকায় বিয়ে হচ্ছে জানলে কোন্ মেয়ের ভাল লাগে?

এখন খুব ভাল লাগছে?

লাগছেই তো।

অপর্ণা তেতেই উঠলেন, বেইমান আর কাকে বলে, যে-সব দিন গেছে দাদুর টাকা না হলে আজ আর তোকে এমন ধিঙি-পনা করতে হত না।

রাগত মুখে ঘরের দিকে চললেন। সুপা হাসি মুখে গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ মা, টেলিফোন করেছিলে? দেশ উদ্ধার করে বাবু ফিরছে?

অন্য বাস্তবে মন ফিরল অপর্ণার। হাতে এতগুলো টাকা তাই চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে এসে দাঁড়ালেন।—না, কেমন আক্কেল বল্ দেখি ওর!

হালকা কোপে সুপা ভুরু কোঁচকাল একবার। তারপর তরল অভিব্যক্তি।—ওই রকমই স্বভাব—বুঝলে মা, ঠিক ওই রকম।

আর পাঁচজনের সঙ্গে ওই স্বভাবের মিল নেই বলেই সুপার পরিতুষ্ট মুখ। হঠাৎ কী মনে হতে সুপা হেসে উঠল, টাকা সুদ্ধু মাকে আচমকা জড়িয়ে ধরতে টাকার দুটো বাণ্ডিল মাটিতে পড়ে গেল। সুপার হাসি বাড়তেই থাকল।

ছাড়। অপর্ণা বিরক্ত, আজ বাদে কাল বিয়ে অত হাসিস না, ভাল দেখায় না।

বা রে! কাল .... কাল কেন, পরশু সকালে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় তো কাঁদব, আজ হাসব না কেন?

খুব হাস্, ছাড়!

সুপা আরো ভালো করে জড়িয়ে ধরল তাঁকে। তারপর আর এক দফা হাসি।

কী হল?

আচ্ছা মা, হাসি গিলতে চেষ্টা করে সুপা বলল, এমন যদি হয়, দেশের নামে বক্তৃতা করতে করতে ছেলে ভুলেই গেছে তার বিয়ে—হয়তো এলই না—আর এদিকে বিয়ে বাড়ি গমগম করছে, সব খাচ্ছে দাচ্ছে, আর বিয়ে করব বলে আমি সেজেগুজে বসে আছি—তাহলে।

আবার হাসি। প্রথম প্রতিক্রিয়ার শুনতে বিচ্ছিরি লাগল অপর্ণার। পরে মেয়ের অত হাসি দেখেই নিজেও হেসে ফেললেন।—তাহলে বৃন্দার ওই যে-ছেলেটার বিয়ে হয়নি তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছাড়ব তোর—ছাড়!

দু'হাতে মাকে ধরে একটু আদরের ঝাঁকুনি দিয়ে সুপা ছুটে চলে গেল। নোটের বাণ্ডিল দুটো মাটি থেকে তুলে নিয়ে অপর্ণা আলমারি খুললেন। জায়গামতো নোটগুলো রাখলেন। ভিতরে ভিতরে কী যেন বড় রকমের অস্বস্তি একটা। যেন মনের তলায় অপেক্ষা করছিল, সুপা যাওয়া মাত্র ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। টাকাগুলো হাতে নেবার পর থেকেই অস্বস্তি। ... প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পুঁজি ভেঙে আর লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি থেকে ধার নিয়ে টাকা দিয়ে তেজ দেখানো হল সন্দেহ নেই। দিলে অপর্ণা কী করতে পারেন, ও-ভাবে টাকা দিতে কেউ বলেনি—কেউ কিছু আশাও করেনি।.... ভবিষ্যতের সম্বল বলতে আর বিশেষ কিছু থাকল না হয়তো, কিন্তু এই সঙ্গে ভবিষ্যতের দায়িত্ব তো ফুরাল। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, অপর্ণাও সরে দাঁড়াবেন তারপর, কোন শর্ত বা কোন দাবি রেখে যাবেন না....চাকরিও এখনো অনেক কাল আছে, এরপর দ্বিগুণ হারে পুঁজি বাড়াতে আর সম্বল বাড়াতে বাধা কী?

.... টাকা দেবার সময় হাতে হাত লেগেছিল। হাতের পিছনের চামড়া গরম ঠেকেছিল। ব্লাড-প্রেসার বেড়ে থাকতে পারে। সুপার মুখে শুনেছে ডাক্তার ডেকে ইদানীং মাঝে মাঝে ব্লাড প্রেসার চেক করা হচ্ছে। দিন-রাত মাথায় মতলব ঘুরতে থাকলে ব্লাড-প্রেসারের আর দোষ কী। যাক্। এমন অস্বস্তি বোধ করছেন কেন নিজেই তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। .... চিন্তার বাইরে লোকটাকে অনেক কিছু করতে দেখছেন আজ। ভাইদের আর বোনেদের আগের দিন থেকে এসে থাকার নেমন্তন্ন করে এসে তাঁকে অপ্রস্তুত করতে চেয়েছে। কিন্তু নিজেই আবার আগে থাকতে ঠাকুর ঠিক করেছে, বাজার করেছে। ক'দিন ধরে খরচের স্রোত বইতে দেখেও চুপ করে ছিল, মুখ ফুটে টাকা চাওয়া হয় কি না দেখছিল, আজ নিজে থেকে দিয়ে দিল। সুমতি? সুমতির লক্ষণ এ-সব? থাক, ভেবে কাজ নেই। সুমতি কুমতির খেলা শেষ। অপর্ণার কোনোটাতে কিছু যায়-আসে না। ভাল হোক, ভাল থাক, অপর্ণা কারো মন্দ কামনা করেন না। করবেন না। শুধু নিজেকে মুক্তি দেবেন। দীর্ঘ এগারোটা বছর বুকের ভিতরটা পাথর হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। এগারো বছর কেন, প্রবৃত্তির লোলুপ যূপকাষ্ঠের বলি সতেরো বছরের সেই তরতাজা মেয়েটাকে আজও তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। এই পাথর বুকের নীচে তার অব্যক্ত আর্তনাদ স্তব্ধ হয়ে আছে।

তাঁর মনের খনি শূন্য। যতদূর চোখ যায় শূন্য। আশা করার মতো কোনো ঝিকিমিকিও সেখানে কোনোদিন দেখেননি।

মরীচিকার স্বপ্ন দেখেও কাজ নেই আর।

জোরেই শব্দ হল একটা। নিজের অগোচরে আলমারির পাল্লা দুটো একটু জোরেই বন্ধ করেছেন।

ও কিছু না। সামনে এত বড় কাজ বলেই অস্বস্তি। ও ছাড়া আর কিছু না। বিয়েটা হয়ে গেলে স্বস্তি নামবে। শান্তি আসবে ভিতর-বার ঠাণ্ডা হবে।

অপর্ণা একটু দম ফেলার সময় পেলেন যখন, রাত তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। নিজের ঘরে এসে একটু বসতে না বসতে ভিতরের সেই অস্বস্তি উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে আবার। অপর্ণা ভাবতে চেষ্টা করলেন, রাত পোহালে মেয়ের বিয়ে, দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নির্ভর করার মতো একটা লোক নেই—কাজ চুকে বুকে না যাওয়া পর্যন্ত অস্বস্তি থাকবে না তো কি নিশ্চিন্তে হাওয়ায় ভেসে বেড়াবেন তিনি! যাবার আগে সমীরণবাবু বলে গেলেন, রাতের মতো ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে। সামান্য কথা, অথচ কত ভালো লাগল। বৃন্দা সকলকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে নীচে নেমেছে—এখনো খেয়ে না নিলে সকলের ছাড়া পেতে রাত বারোটা একটা হয়ে যাবে। ওপরটা ফাঁকা তাই। অপর্ণার খুব ইচ্ছে ছিল, সমীরণবাবুকে নিজের ঘরে এনে আর একটু বসতে বলেন। ঠাণ্ডা মাথায় একটু আলোচনা করা যেত। দু'পাঁচটা নির্ভরের কথা শোনা যেত। ত্রাসে বুকের ভিতরটা কী যে ধুকপুক করছে তাঁর, তিনিই জানেন।

কিন্তু ডাকতে পারেননি। কে কখন উঠে আসবে তারপর কে কী ভাববে ঠিক নেই। অনেক কাল যাবৎ কারো ভাবা-ভাবির পরোয়া করেননি। পরেও করবেন না। কিন্তু আজকের এই দিনটা এই রাতটা একেবারে স্বতন্ত্র। কারো চোখে একটা অস্বাভাবিক পলক পড়াও যেন বরদাস্ত হবার নয়। তা ছাড়া ডেকে কী বলবেন, কী আলোচনা করবেন? সমীরণবাবু যখন বললেন, চলি আজ, কাল সকালেই আসব'খন—অপর্ণা শুধু অসহায়ের মতো মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন চুপচাপ।

ওঁর ভিতরের অবস্থাটা ভদ্রলোক ওই থেকেই বুঝে নিয়েছিলেন। চোখ থাকলে আর দরদ থাকলে মুখ ফুটে বলার কিছু দরকার হয় না। কিন্তু বুঝলেও করতে পারেন কি। শুধু বলেছেন, অত ভেবো না, রাতে একটু ঘুমুতে চেষ্টা করো, নয়তো কাল আর দাঁড়াতে পারবে না।

উনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকক্ষণের একটা ঠেকা-দেওয়া অস্বাচ্ছন্দ্য ভিতর থেকে ঠেলে এগিয়ে আসতে চাইল। নিজেকে তিনি বোঝাতে চাইলেন সেটা কালকের দিনের দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ ঠিক যেন সে-রকমও লাগছে না, এই অস্বস্তি আর অস্বাচ্ছন্দ্য যেন আর কিছুর দরুন।

সামনের আলমারিটার দিকে তাকালেন। ওটার মধ্যে অনেক টাকা এখন। ব্যাঙ্কের থেকে তুলে এনে নিজে যা রেখেছিলেন তার ওপরে আরো বারো হাজার টাকা।... আগে দিলে নিজের টাকা আর

তুলে আনতে হত না। হঠাৎ মনে হল, ওই টাকাগুলোই অস্বস্তির কারণ। ওগুলো হাত পেতে নিতে না হলেই যেন ভালো হত। তাঁকে না জানিয়ে পণের তিন হাজার টাকা দিয়ে আসাটা তো সেই থেকে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। ... নিজের মুখে ফ্রিজের কথা বলে তাঁকে জব্দ করতে চেয়েছিল, সেই টাকাও দিয়ে দিয়েছে। আসলে কীভাবে তাঁকে জব্দ করা যাবে ভেবে না পেয়ে এই সব করছে।

.... তবু নিজের ভিতরটাই তলিয়ে দেখছেন অপর্ণা। না, এই জন্যেও নয়। আসলে, মেয়ের বিয়েতে ওই একজনের নির্বাক দ্রষ্টার ভূমিকা ছাড়া আর কিছু থাকবে না ধরে নিয়েছিলেন তিনি। অথচ, নিঃশব্দে সে-ই যেন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তার দিকে চোখ পড়ছেই। অস্বস্তি সেই কারণে।... ওই মানুষকে এতটুকু তিনি বিশ্বাস করেন না, অস্বস্তি সেই কারণেও। থেকে থেকে মনে হচ্ছে অস্বাভাবিক কিছু এখনো যেন ঘটে যেতে পারে।

কান খাড়া করলেন। ওই কোণের ঘরে টেলিফোন বাজছে।...নিশ্চয় ছেলের বাড়ির খবর এলো এতক্ষণে। ধড়মড় করে উঠে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ওপরে কেউ নেই যে তাঁকে খবর দেবে, ঘরে যে আছে সে-ই ফোন ধরবে, সে-ই খবর দেবে। তিনি অপেক্ষা করছেন।

....আশ্চর্য! ফোন বেজেই যাচ্ছে। কেউ ধরছে না। মুখে রক্ত উঠতে লাগল একটু একটু করে। ইচ্ছে করেই ধরছে না। জানে কোথাকার ফোন—কারণ ফোন করার যে কথা আছে এর আগে সেটা নিজের কানেই শুনেছে .... জানে ওপরে কেউ নেই, সব নীচে নেমে গেছে খেতে — তাই ভাবছে যার ফোন সে আসুক, সে এসে ধরুক।

ফোন বাজছেই। পায়ে পায়ে কোণের ঘরের দিকে এগোলেন অপর্ণা। রাগে গা জ্বলছে। ঘরে পা দিলেন। খাটের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে চোখ বুজে। সে-দিকে এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে এগোতে গিয়েও কী দেখে যেন মুহূর্তের জন্য থমকালেন অপর্ণা। তারপর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে রিসিভার তুলে নিলেন।

হ্যালো—

ওদিক থেকে প্রশ্ন এলো, কে, সুপা?

ছেলের গলা। কিন্তু রঞ্জনের গলা নয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কার গলা হতে পারে। কঠিন মুখ।—না, আমি সুপার মা, কে কথা বলছ?

—আমি বিকাশ। সুপার বাবাকে একটু দরকার ছিল।—তিনি নেই?

কঠিন মুখেই অপর্ণা ঘুরে দাঁড়ালেন একটু। শয্যার দিকে তাকালেন। লোকটা তেমনি চোখ বুজে শুয়ে আছে। সমস্ত মুখ অস্বাভাবিক লাল। অপর্ণা নিঃসংশয়, জেগে ঘুমুচ্ছে।

গলার স্বর চাপা বটে, কিন্তু স্পষ্ট কঠিন। জবাব দিলেন, আছেন। ঘুমুচ্ছেন।

টেলিফোনের ও-ধারের থমকানিটা টের পেলেন। গলার স্বরেও সংশয়ের আভাস।—ঘুমুচ্ছেন ... ইয়ে বিশেষ একটু দরকার ছিল, বাইরে থেকে আমার বড়দা এসেছেন ... এলেই আমাকে খবর দিতে বলেছিলেন।

ধরো। টেলিফোনের মুখে হাত চাপা না দিয়ে আবার শয্যার দিকে ফিরলেন। গলার কঠিন স্বর সামান্য চড়ল।—তোমার ফোন।

ঘুমই ভাঙল যেন। বিষম চমকে উঠে বসলেন বরেন সোম। খাট থেকে নেমে একটু টলতে টলতে এগিয়ে এলেন।

এবারে রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিলেন অপর্ণা। মুখ লাল তাঁরও।—তুমি ঠিক ঘুমুচ্ছিলে না তাহলে?

হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা নেবার আগে বরেন সোম তাকালেন তাঁর দিকে। চোখও লাল। জবাব দিলেন না।

রিসিভার নেবার সময় হাতে হাত ঠেকল। অপর্ণা সচকিত হঠাৎ। তাঁর হাতে যেন গরম ছ্যাঁকা লাগল। রিসিভারটা দিয়েই চলে যাবার কথা, কিন্তু যেতে পারলেন না।

... বিকাশ?

.... এসেছেন? আমার শরীরটা ঠিক ভালো নেই। বোলো, কাল সকালের দিকে ... না, সকালে হবে না, বৃদ্ধি আছে .... বলো, যখন হয় এক ফাঁকে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব'খন। .... আচ্ছা।

রিসিভার রাখলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন। চোখে চোখ রাখলেন।—কী বলছিলে?

অপর্ণা জবাব দিয়ে উঠতে পারলেন না। এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছেন, জ্বরে বা চড়া প্রেসারের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

ভারী চাপা গলায় বরেন সোম আবার বললেন, টেলিফোন কখন এসেছে জানতে পারিনি, তবে, তোমার ডাক কানে গেছে—বুঝলে?

লালচে চোখ-জোড়া অপর্ণার মুখের ওপর। কথাগুলোতে শ্লেষ মাখানো, চাউনিতেও। যেন বলতে চাইছে, ডাকলে আগেও কানে যেত। পলকের মধ্যে অপর্ণার চোখে মুখেও রাজ্যের বিরক্তি, এ সময়ে শরীর খারাপ করাটাও যেন ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। তাঁকে জব্দ করার ফিকির। কাল কাজের দিন, এতটুকু দুশ্চিন্তা থাকলে আগে থাকতে সাবধান হয়ে ডাক্তার ডাকত যে-কোনো স্বাভাবিক মানুষ।

বরেন সোম বিছানার দিকে পা বাড়ালেন। অপর্ণা দরজার দিকে।

—আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাও।

ঘুরে দাঁড়ালেন। আলো নেভাতে গিয়ে আবার মুখের দিকে চোখ গেল। শুয়ে পড়েছে, তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। নিষ্পলক চোখ।

খট্ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। রাজ্যের বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা। ফয়সলার সময় ঘনিয়েছে এতদিনে সেটা বেশ বুঝতে পারছে, তাই ওই রকম হাবভাব, ওই রকম চাউনি।

... কিন্তু অনেক, অনেক দেরিতে বুঝেছে। অপর্ণার আর কিছু ভাবার নেই। আর তাঁকে ভোলাবার মতো কোনো মরীচিকারও হাতছানি নেই।

রাতে খেতে বসেও খেতে পারলেন না অপর্ণা। কেমন যেন রুচি নেই। বৃন্দা নিজের মনেই বলল, বাবু কিছু খেলেন না, ঘরের আলো নেভানো দেখলাম। দিদিমণিকে পাঠিয়েছিলাম, দিদিমণি বাবুর ঘর থেকে ঘুরে এসে বলল, বাবুর শরীরটা ভালো না, খাবেন না।

...মেয়ের ওপরেও কেন যে রাগ-রাগ হচ্ছে অপর্ণা ঠিক বুঝতে পারছেন না। বিয়ের পর কী যে আছে ওর অদৃষ্টে কে জানে। রঞ্জন যত ভালই হোক, স্বার্থপরতা বরদাস্ত করার ছেলে নয়। মেয়েকে হঠাৎ স্বার্থপর মনে হল কেন তাও জানেন না।

তক্ষুনি আবার ও-বাড়ির কথা মনে পড়ল। ছেলের বাড়ির। কী আশ্চর্য! একটা টেলিফোন করার কথা, তাই করল না। রঞ্জনের বাবা-মা এখনো ফেরেনি, নাকি ওই বউটা বলতেই ভুলে গেছে! আবারও যেন বিরক্তিকর বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লেন তিনি। ... এরপর যদি ফোন আসে? ... এলে ঘরে যে আছে এবারে উঠে সে নিজেই ধরবে ঠিক। তাঁকে আক্কেল দেবার জন্যেও ধরবে, আর তারপর নিজেই এসে বলবে, তোমার ফোন—

অপর্ণা এই মুহূর্তে সর্বান্তকরণে চাইছেন, আজ আর ফোন না আসুক। কথাবার্তা কালই হতে পারবে।

আট

পরদিন।

টানা এগারো বছর যে দিনের প্রতীক্ষা, সেই দিন। খুব ভোরে অপর্ণা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। উঠেছেন রাত থাকতে। দধিমঙ্গল করার জন্য পিসিরা সুপাকে ঠেলে তুলেছে। সে-কাজ চুকে যেতে সুপা আবার শয্যা নিয়েছে। আচ্ছা ঘুমকাতুরে মেয়ে।

অপর্ণা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন যখন পুবের আকাশ ফর্সা, সূর্য ওঠেনি তখনো, একটা লাল আভা ছড়াচ্ছে। ভিতর থেকে আপনিই একটা প্রার্থনার মতো উঠছে। এই দিনটা শুভ হোক, সুন্দর হোক, সুনির্বিঘ্ন হোক। এই দিনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব অসম্পূর্ণ হিসেব-নিকেশ মিটে যাক।

বাঁ-চোখের পাতা কাঁপছে থেকে থেকে। সুলক্ষণ নাকি। মেয়েদের বাঁ-চোখের পাতা কাঁপা ভাল শুনেছিলেন। ঈষৎ চকিতে পাশের দিকে তাকালেন। ও-মাথার ঘরের দরজা খোলা ছিল কি না আগে খেয়াল করেননি। ও-ঘরের মানুষও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। অপর্ণার দিকেই চেয়ে আছেন নিঃশব্দে।

চোখাচোখি হল। কয়েকটা পলক মাত্র। লাল্‌চে মুখ, অবিন্যস্ত চুল। সমস্ত রাত্রি না ঘুমালে যেমন হয় তেমনি মূর্তি। আজকের এই দিন আলাদা, সকালটা আলাদা। চেষ্টা করলে অপর্ণা জিজ্ঞাসাও করতে পারতেন রাতে একটুও ঘুম হল না? কিন্তু সেটা বেশি হবে। অপর্ণা উল্টো দিকে পা বাড়ালেন।

বাঁ-চোখের পাতা কাঁপছে কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিও বাড়ছে। ক্ষণে ক্ষণে ডাক পড়ছে তাঁর। দেওরেরা ডাকছে, ননদেরা ডাকছে, বৃন্দা ডাকছে। ডেকরেটার আর ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর কাজ গতকাল শেষ হয়েছিল, আজ কিছু বাড়তি বিন্যাসের প্রয়োজনে পরামর্শের জন্য তারাও খোঁজ করছে। কেটারারের দল এসে গেছে, তাদের কী অসুবিধের দরুন নীচে তারাও ডাকাডাকি করছে। অপর্ণার হাঁপ ধরার দাখিল। মেজাজও ঠিক থাকছে না, যেন আগে আরো তিনটে পাঁচটা মেয়ে বিয়ে সারা তাঁর, তাই সবেতে তাঁর পরামর্শ চাই।

নীচে নামতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে সমীরণ দত্তর সঙ্গে দেখা। অপর্ণা একটু জোরেই বলে উঠলেন, এতক্ষণে বুঝি সময় হল আপনার—এখন দেখুন কে কী চায়, যা ভাল বোঝেন তাই করতে বলে দিন। পাশে বৃন্দা। তাঁকে বললেন, যা দরকার এঁকে বলবি আমাকে আর ডাকবি না। আবার সমীরণবাবুর দিকে ফিরলেন, দাঁড়ান একটু—

নিজের ঘরে এসে আলমারি খুলে দশ টাকা পাঁচ টাকা এক টাকার নোট বার করলেন কিছু, সেগুলো একটা রুমালে জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন।—এটা আপনার কাছে রাখুন, যার যা লাগে দিয়ে দেবেন, আমি আর পারি না—

সমীরণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কত আছে এখানে?

লাখখানেক আছে। আপনার হিসেব রেখে দরকার নেই।

এগোতে গিয়ে থমকালেন। অদূরে মেজ ননদ ধীরা দাঁড়িয়ে। চাউনিটা সরল মনে হল না। কার মেয়ের বিয়ে আর কার ওপর ভরসা করা হচ্ছে তাই দেখছে যেন। আর বৃন্দাটাও হাঁড়ি-মুখ করে দাঁড়িয়ে। বিরক্তিকর। এরা কোনো সময় কোনো কিছু ভুলতে পারে না যেন।

বেলা গড়াচ্ছে। ওদিকে পুরুতের বৃদ্ধির আয়োজন শেষ। কর্তার অপেক্ষায় আছে। অপর্ণার ও-ঘরে যাওয়ার দরকার। কারণ সেই থেকে অস্বস্তি পুষছে। বেলা সাড়ে দশটা বেজে গেল অথচ ছেলের বাড়ি থেকে এখনো টেলিফোন এলো না একটা। কাল রাতে তারা টেলিফোন করেনি। রঞ্জন কখন ফিরল জানেন না। তারা তো একটা টেলিফোন করে জানাতেও পারত! তাঁর মেয়ের বিয়ে, তাদেরও ছেলের বিয়ে নয়? এত হেনস্থা কিসের বাপু।

ঘরে ঢুকলেন। ঘরের ওই লোকের দিকেই চোখ আটকাল একবার। দাড়ি কামিয়েছেন। চান করেছেন। গরদ পরেছেন। খালি গায়ে গরদ জড়িয়েছেন। রাতের অনিদ্রার দাগ নেই, কিন্তু অস্বাভাবিক গম্ভীর। অপর্ণার হঠাৎ মনে হল এত কালের দেখা লোকটার মুখেই যেন অচেনা কিছু উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ভাল করে তাকালে বোঝা যেত হয়তো, কিন্তু তাকালেন না। খেয়া পাড়ি দিতে বসে আর বিচার-বিশ্লেষণে কাজ নেই। বিচার-বিশ্লেষণ অনেক করেছেন।

রিসিভার তুললেন। ডায়েল করলেন। বিরক্তিকর। এনগেজড্।

রিসিভার রাখলেন। ঘরে এই লোকের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে চান না। বেরিয়ে এলেন। মিনিট দশেক বাদে আবার ঢুকলেন। রিসিভার তুলে আবার নম্বর ডায়েল করলেন। বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে গেল। আর সেই অবস্থায় ওই লোকের সঙ্গে চোখাচোখি।

এখনো এনগেজড্। শব্দ করে রিসিভারটা রেখে বেরিয়ে এলেন।

তৃতীয়বার এলেন। তারপর চতুর্থবার। এবারে বিরক্তির থেকেও বিস্ময় বেশি। টেলিফোনে কতক্ষণ কথা বলতে পারে মানুষ, কতক্ষণ এনগেজ থাকতে পারে।

ডায়েল ঘুরল। ওয়ান্—নাইন—নাইন। অপারেশন অ্যাসিস্ট্যান্স। সাড়া পেলেন। নম্বর দিলেন। তারা চেষ্টা করল। তখনো এনগেজ সিগন্যাল। একটু বাদে অপারেশন থেকে জবাব এলো, ওই নম্বরের কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, কেউ কথা বলছে না, কিন্তু রিং করলে এনগেজ সিগন্যাল আসছে।

বিরক্তি চরমে উঠল এবার। অসহিষ্ণুতাও। ওই লোক কাগজে চোখ বোলাচ্ছে। কিন্তু অপর্ণার মনে হল ঠোঁটের ফাঁকে অদৃশ্য একটু হাসির রেখা লুকিয়ে আছে। তাঁর এই উদ্বেগ আর অসহিষ্ণুতাও উপভোগ করছে যেন।

গলা একটু চড়িয়েই অপর্ণা বলে বসলেন, পুরুত ঠাকুর সেই থেকে অপেক্ষা করছেন, তোমাকে কি নেমন্তন্ন করে নিয়ে যেতে হবে!

বরেন সোম কাগজ থেকে মুখ তুললেন। উঠলেন আস্তে আস্তে। সোজা মুখের দিকে তাকালেন একবার। ঠাণ্ডা গাম্ভীর্যে বললেন, তুমি মিছিমিছি এত ব্যস্ত না হলেই ভাল হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অপর্ণার আবারও মনে হল এতকালের দেখা মুখে অচেনা কিছু দেখলেন যেন। কিন্তু কী তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই, ধৈর্য নেই। পিছনে বেরিয়ে এলেন তিনিও। কী যে করবেন এখন মাথামুণ্ডু ভেবে পাচ্ছেন না। ব্যস্ত হতে নিষেধ করা হল, যেন কত দরদ। কোথাও কিছু একটা বিভ্রাট বাধলে তো আনন্দে ভিতরটা খলখলিয়ে উঠবে।

সাত কাজের ধাক্কায় পড়ে আবার যখন একটু চিন্তার ফুরসত পেলেন, বেলা তখন একটা। কানের দু'পাশ গরম, মাথাটা ঘুরছে অল্প অল্প। ও-বাড়ি থেকে এখনো খবর আসেনি কিছু। আসবে কেন। মেয়ে যখন তাঁর, গরজও সব তাঁরই। ও-দিকে বাঁ-চোখের পাতা আরো বেশি কাঁপছে এখন। সেও অস্বস্তির মতো লাগছে।

ড্রইংরুমের ইজিচেয়ারে সমীরণবাবু গা ছেড়ে বসে। পান চিবুচ্ছেন। দেওর দু'জন, নন্দাইরা এবং আরো জনাকতক বসে সেখানে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় অপর্ণা সমীরণবাবুকে ডাকলেন।

উঠে কাছে আসতে অপর্ণা দরজার আড়ালে সরে দাঁড়ালেন।—খাওয়া হয়েছে?

এই তো হল।

আমার না হয় কোনোদিকে খেয়াল নেই এখন, খাবার জন্য বাড়িতে না ছুটে এখানে খেলেই তো হত।

সমীরণ দত্ত হাসলেন। বললেন, এখানেই খেয়েছি। আজ এতকাল বাদে বরেন আমাকে বৃদ্ধির জায়গায় ডেকে পাঠিয়ে হুকুম করেছে, দুপুরেও এখানে খাই যেন।

অবিশ্বাস্য ঠেকল কানে।—আপনার মস্ত ভাগ্য আজ। এ-প্রসঙ্গ বাতিল করে অপর্ণা বললেন, আপনাকে এক্ষুনি একবার বেরুতে হবে, সীমুর গাড়িটা বেরিয়েছে, আপনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছেলের বাড়িতে যাবেন আসবেন।

ছোট বোন অসীমার গাড়ি আজ সকাল থেকে এ-বাড়ির হেফাজতে আছে।

সমীরণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলের বাড়িতে কেন?

সেই থেকে বিচ্ছিরি একটা অস্বস্তি লেগে আছে। কাল রাত দশটায় টেলিফোন করে জেনেছি রঞ্জন তখনো দেওঘর থেকে ফেরেনি—আজ সকালে ওদের লাইনই পেলাম না, টেলিফোন খারাপ। এসেছে নিশ্চয়, তবু একটা খবর না পেলে ভাল লাগছে না। তা ছাড়া, ওদের কত লোক আসবেন তাই এখনো ভাল করে জানা গেল না, রঞ্জনের বাবাকে জিজ্ঞাসা করবেন, একটা ছোট বাস আর একটা গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে, আর দরকার হবে কি না। আর রঞ্জনকে বললেন, আমি খুব রাগ করেছি, পরে টের পাবে শাশুড়ি কত কড়া।

সমীরণবাবুকে পাঠাতে পেরে ভেতরটা সুস্থির হয়েছে একটু। ওপরে উঠে দেখেন একটা গেলাস হাতে বৃন্দা তাঁকেই খুঁজছে। এগিয়ে এসে গেলাসটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটুকু খেয়ে নাও।

কী ওতে?

নেবুর সরবত।

তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে বটে। গেলাসটা নিলেন।—কে দিতে বলল?

সমীরণবাবু। দু'-দু'বার তাগিদ দিয়েছেন, তোমাকে ধরতেই পারছিলাম না।

অপর্ণা থমকালেন একটু। তারপর ঢকঢক করে গেলাসটা খালি করে দিয়ে ওর হাতে দিলেন। ঘুরে দাঁড়াতেই পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল যেন...ও-ঘরের কোণের ছোট ঘরটা থেকে গলগল করে আর এক প্রস্থ ধোঁয়া বেরুচ্ছে, নতুন কাঠ পড়ল বোধ হয়। যজ্ঞ চলছে। একটু আগে গিয়ে দেখে এসেছিলেন, ধোঁয়া আর আগুনের তাতে লোকটা নাকের জলে চোখের জলে একাকার। সকাল থেকে প্রায় নিরম্বু উপোস চলছে ... কাপ দুই চা শুধু খাওয়া হয়েছে। দেরিতে যজ্ঞে বসার দরুন আরো কত সময় লাগবে জানেন না।— অথচ নিজের সরবত খেয়ে গলা ভিজানো হয়ে গেল। বিরক্তিটা বৃন্দার ওপরেই বেশি, বলল বলেই সাত তাড়াতাড়ি সরবতের গেলাস এনে হাজির। আর কিছু নয়, নিজের স্বার্থপরতা বরদাস্ত করতে আপত্তি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমীরণ দত্ত ফিরলেন। তার মুখের দিকে চেয়েই অপর্ণার কেমন যেন খটকা লাগল। কাছে আসতে সমীরণবাবু বললেন, ইয়ে, রঞ্জন তো এখনো ফেরেনি শুনলাম।

অপর্ণা আঁতকেই উঠলেন, এখনো ফেরেনি মানে?

অত ব্যস্ত হয়ো না, এখান থেকে এখানে—সেই রাত আটটায় তো বিয়ে, তার পরেও লগ্ন আছে। সে তার সময়মতো ঠিক ফিরবে, আজকালকার ছেলে তো—তোমার মতো অত ভাবনাচিন্তা নেই।

অপর্ণা রেগেই গেলেন, আজকালকার ছেলে বলে সবেতে বাহাদুরি করবে!

ছেলে আনা বা গাড়ি পাঠানো সম্পর্কে সমীরণবাবু যা বললেন তা শুনেও অপর্ণা যেমন অবাক তেমনি অসন্তুষ্ট! ছেলের বাবা নাকি বলেছেন এ-ব্যাপারে সমস্ত কথা-বার্তা মেয়ের বাবার সঙ্গে হয়ে গেছে—তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে এখানে ছুটে আসার কী মানে?

অপর্ণা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ভদ্রলোক যে খুব খুশি চিত্তে ফেরেননি বোঝাই যাচ্ছে। সন্দেহের আঁচড় পড়ল একটা। ছেলের বাবা হয়তো এই ভদ্রলোকের সম্পর্কে এমন কিছু শুনেছেন যার দরুন ভাল ব্যবহার করেননি।—কার কাছ থেকে শুনবেন? রঞ্জন বলেছে? ওই ছেলের এ-সব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর ফুরসত কম। —মেয়ের বাবার সঙ্গে তাঁর কখন কথা হল, কবে কথা হল, কী কথা হল? অপর্ণা দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করলেন। তাঁকে না জানিয়ে নগদ তিন হাজার টাকা দিয়ে আসা হয়েছে, আর তাঁকে না জানিয়ে ব্যবস্থা-পত্র সম্পর্কেও কথা হয়ে গেছে—স্ত্রীর ঝামেলা বাঁচানোর জন্যে লোকটার দরদ উথলে উঠেছে এ অপর্ণা একটুকুও বিশ্বাস করেন না। আস্তে আস্তে ঘুরে অদূরের ওই ছোট কোণের ঘরের দরজার দিকে তাকালেন। আগুনের আঁচ দেখা যাচ্ছে।

এগিয়ে এলেন। চৌকাঠ পেরিয়ে দাঁড়ালেন একটু। মেরুদণ্ড সোজা করে বসে পুরুতের সঙ্গে মন্ত্রপাঠ চলেছে।—দৃষ্টি আগুনের দিকে। ধোঁয়াতে আর গরমের তাতে দু'চোখ লাল!

ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে পাঁচটায় এসে ঠেকল। বাড়িতে লোক গিসগিস করছে এখন, সর্বত্র ব্যস্ততা। অপর্ণার ভিতরটা অজ্ঞাত আশংকায় যেন ভরাট হয়েই চলেছে। যত ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছেন ভিতরে ততো বেশি জট পাকাচ্ছে। বাঁ-চোখের পাতা আবার ঘন ঘন কাঁপছে। অনেকক্ষণ ধরে একটু অবকাশ খুঁজছিলেন তিনি। ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে হাতের কাজ ফেলে দ্রুত ওদিকের ওই ঘরের দিকে চললেন।

ভিতরে ঢোকার আগে ওই ঘর থেকে বেরুল সুপা। কোনো বন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইতে ঢুকেছিল বোধহয়। মুখে চাপা বিরক্তি। অস্ফুট ঝাঁঝে বলে উঠল, সেই সকাল থেকে ও-বাড়ির টেলিফোন বিগড়েছে—এখন পর্যন্ত সেটা ঠিক করে ওঠা গেল না।

অপর্ণা অবাক।—আজকেও তুই ও-বাড়িতে টেলিফোন করতে গেছলি।

কে কথা কইছি বলতাম নাকি, ওই নবাব ছেলের বউদিকে ডাকতাম—।

মেয়ের মুখেও দুশ্চিন্তার ছায়া দেখলেন। নিজেরই যত সব আজগুবি দুশ্চিন্তা ভাবছিলেন এতক্ষণ।—তাহলে কি এই পাঁচটা পর্যন্তও রঞ্জন ফেরেনি নাকি! যত সব অলক্ষুণে চিন্তা। গম্ভীর মুখে বললেন, এবারে তৈরি হ'তে যা, সাজাবার জন্য সব বসে আছে। তোর বাবা কোথায়?

দেখছি না তো।—তুমি বাবাকে খুঁজছ নাকি?

মেয়ের দু'চোখ হঠাৎ উৎসুক যেন একটু।

জবাব না দিয়ে সামান্য মাথা নাড়লেন। পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবলেন একটু। গাড়ি পাঠানো সম্পর্কে কী কথা হয়েছে জানতে এসেছিলেন। আর সেই সঙ্গে মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতেও চেয়েছিলেন। নীচে আছে কি না জানেন না। কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠাতে পারেন, কিন্তু যাকে বলবেন সে-ই মেয়ের মতোই অবাক হবে।

দোরগোড়ায় খাবারের থালা হাতে বৃন্দা। তাঁকে দেখে কৈফিয়ত দেবার মতো করে বলে উঠল, আমি কী করব, বৃদ্ধি শেষ হবার আধঘণ্টার মধ্যে খাবার নিয়ে এসে দেখি বাবু নেই, তারপর ক'বার করে ঘুরে গেলাম। খানিক আগে নীচে থেকে ওপরে উঠেছেন—এখন আবার দেখছি নেই—

কাজ শেষ হলেই বৃন্দাকে খাবার দিতে বলে রেখেছিলেন অপর্ণা। অর্থাৎ সকাল থেকে এ পর্যন্ত উপোস চলছে। এও যেন তাঁকে জব্দ করারই শামিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মিনিট পাঁচেক বাদে বৃন্দা আবার তাঁর কাছে এসে খবর দিল, মেজ পিসি বললেন একটু আগে বাবুকে তিনি জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন।

ঘড়িতে পাঁচটা পনেরো।

মাথাটা হঠাৎ কেমন ঝিমঝিম করছে অপর্ণার। মুখ লাল, কান দুটো আরো বেশি লাল। নীচে ওপরে সর্বত্র বিয়েবাড়ির চাপা শোরগোল, অপর্ণার কানে তাও যেন খুব স্পষ্টভাবে ঢুকছে না। সুপাকে নিয়ে মেয়ের দল দরজা বন্ধ করেছে। কম করে ঘণ্টাখানেক সাজানোর মহড়া চলবে।

হঠাৎ সচকিত তিনি। অদূরে দাঁড়িয়ে সমীরণবাবু তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। চোখের ইশারায় ডাকলেন। তারপর সোজা বারান্দায় একেবারে কোণের দিকে চলে গেলেন।

অপর্ণার বুকের ভিতরে ছাঁত করে উঠল হঠাৎ। অশুভ কিছু শুনবেন এই আশঙ্কা যেন। দ্রুত এগিয়ে গেলেন।

সমীরণবাবু চাপা গলায় বললেন, তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা আছে একটু, কিন্তু এখানে তো—

আসুন।

বুকের ভিতরটা কাঁপছে অপর্ণার। মাথাটাও কী রকম টলছে। কারো দিকে লক্ষ্য নেই। সমীরণবাবুকে নিয়ে সোজা ওই সামনের ঘরে ঢুকলেন—যে ঘরে বিনা প্রয়োজনে কেউ ঢুকবে না।

ঘরে ঢুকেই সমীরণ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, বরেন কোথায়?

বেরিয়েছেন শুনলাম। কেন?

জবাব শোনার ফুরসুত মিলল না। দোরগোড়ায় হাসি আর পায়ের শব্দ। বিরক্ত মুখে অপর্ণা ফিরে তাকালেন। ছোট বোন অসীমা আর তার পিছনে প্রশান্ত। বিয়েবাড়ির এত ব্যস্ততার মধ্যে এমন একান্তে দাঁড়িয়ে বড়দিকে আর সমীরণবাবুকে কথা বলতে দেখে ওরা অপ্রতিভ একটু। কিন্তু তা সত্ত্বেও সীমুর মুখে অন্তত চাপা খুশির হাসি। বলল, ও মা তুমি এখানে, আমি এসে পর্যন্ত তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!

—আয়, আমি তো এই মাত্র এখানে এলাম, তোর ছেলে কোথায়, রেখে এলি নাকি?

—না, নিয়েই এলাম, এখনো জ্বর আছে একটু, কোথায় শুইয়ে দিতে পারি বলো তো, জায়গাই তো দেখছি না।

—আচ্ছা, চল দেখি। সমীরণবাবুর দিকে ফিরে অপর্ণা বললেন, আপনি অপেক্ষা করুন একটু, আমি এক্ষুনি আসছি।

বেরিয়ে এলেন। সীমুর ছেলেকে শোয়ানোর ব্যবস্থা পাঁচ মিনিট পরে করলেও হত। অজানা ত্রাসে বুকের ভেতরটা কাঠ তাঁর। কিন্তু সেই জন্যেই যেন আরো বেশি করে ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন।

সীমুর ছেলেকে শোয়াবার ব্যবস্থা করতে না করতে পাঁচ দিক থেকে ডাকাডাকি শুরু হল। বৃন্দা ডাকছে, ধীরা ডাকছে, দেওরেরা ডাকছে—সর্ব ব্যবস্থার তালাচাবি যেন তিনি নিজের হাতে নিয়ে বসে আছেন, কপালটির কাছটা বিষম দপদপ করছে। মাথায় যেন ঝলকে ঝলকে গরম রক্ত উঠছে। চিৎকার

করে বকাবকি করে উঠতে ইচ্ছে করছে তাঁর। কিন্তু তা না করে তিনি মুখ বুজে শুনলেন, ঠাণ্ডা মুখে নির্দেশ দিলেন। তারপর আবার ওই ঘরের দিকে চললেন, যেখানে সমীরণবাবু অপেক্ষা করছেন।

প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ বাধা পড়ল আবারও। সীমু এদিকের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, তার দিকেই চেয়ে আছে, ওর চোখেমুখে স্পষ্ট চাপা হাসি। ওর পিছনে প্রশান্ত দাঁড়িয়ে, ও পিছন থেকে সীমুর আঁচল ধরে টানছে, পাছে বড়দির কাছে কিছু গোপন কথা ফাঁস করে দেয় সেই জন্যেই টানা-টানি করছে বোঝা গেল।

অপর্ণা দাঁড়িয়ে গেলেন।—কী হল?

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি বলল, না, বড়দি কিছু না, আপনি কাজে যান।

সীমুর দিকে চেয়ে অপর্ণা তবু জিজ্ঞাসা করলেন, হাসছিস কেন?

চাপা আনন্দে সীমু ফিসফিস করে বলল, ও কেমন ফাজিল আর পাজি হয়েছে দেখো, বলছিল, সমীরণবাবুর সঙ্গে বড়দিকে ও-দিকে নিরিবিলি ঘরে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করতে দেখে মনে হচ্ছিল ওঁদের দু'জনারই মেয়ের বিয়ে—

দপ করে আগুনই জ্বলল বুঝি অপর্ণার মাথায়। প্রাণপণ চেষ্টায় রাগ সামলালেন। না রাগ করবেন না, আজকের দিনে রাগ করতে নেই। ....তাছাড়া, ওদের বিয়েতে বড়দি সহায় হয়েছিল বলে ওরা আজও কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতায় বড়দির সুখের মুখ দেখতে চায়। সুখের মুখ দেখবে ওরা এখনো আশা করে।

অনুশাসনের সুরেই বললেন, দেখ সীমু, কালই টেলিফোনে বলছিলি আমাদের কাল গেছে, আর এখন দেখছি নিজে তুই সুপার থেকেও ছেলেমানুষ হয়ে আছিস।

চলে এলেন। একলা ঘরে সমীরণবাবু পায়চারি করছেন। কিন্তু অপর্ণা আগের মতো অত কাছে এসে দাঁড়াতে পারলেন না।

—কী বলছিলেন?

সমীরণবাবু থমকালেন একটু।—মুখ অত লাল কেন তোমার?

এখানে এসেই ধৈর্য গেল যেন। চাপা ক্ষোভে জবাব দিলেন, মুখ লাল অনেক কারণে হয়, আপনার কী ধারণা? যাক, কী বলছিলেন বলুন—

সামান্য ভেবে সমীরণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন. বৃদ্ধি শেষ হবার পর বরেনের সঙ্গে তোমার কোনো কথা হয়নি?

অপর্ণা মাথা নাড়লেন। কথা হয়নি। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছেন।

সমীরণবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, আমারও কেমন দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তাই ছেলের বাড়িতে আবার গেছিলাম, কী রকম যেন ভাল লাগছে না।

অপর্ণার গলা দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরুল একটা।—রঞ্জন এখনো ফেরেনি?

সমীরণবাবু মাথা নাড়লেন। ফেরেনি। তারপর বললেন, সন্ধে থেকে রাত আটটার মধ্যে আরো দুটো গাড়ি আছে, তা ছাড়া প্রাইভেট কারেও ফিরতে পারে... কিন্তু সে জন্যে নয়, ছেলের বাবার কথা-বার্তাই যেন কেমন লাগল।

শোনামাত্র অপর্ণা বিষম চমকে উঠলেন। কাছে এগিয়ে এলেন। এত কাছে যে বাড়ি ভরতি লোকের কেউ হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লে বিড়ম্বনার কারণ হত। কিন্তু অপর্ণার অন্য কোনোদিকে হুঁশ নেই!—কী বলেছেন?

সমীরণবাবু যেটুকু জানালেন তার সারমর্ম, দ্বিতীয় দফায় তাঁকে দেখে রঞ্জনের বাবা বলেছেন, এখানে খোঁজাখুঁজি করবার দরকার কী—বিয়ের কী হবে, গাড়ি পাঠানোর দরকার আছে কি নেই—এ-সব মেয়ের বাপকে জিজ্ঞাসা করলেই তো হয়—মিছিমিছি তাঁর কাছে ছোটাছুটি করা কেন? এবং সমীরণবাবুর ধারণা, টেলিফোনটাও ইচ্ছে করেই সকাল থেকে বিগড়ে রাখা হয়েছে।

অপর্ণা নির্বাক, স্তব্ধ। মাথার ভিতরে কী যেন হয়ে যাচ্ছে। পড়ে যেতে পারেন মনে হতে শয্যায় বসলেন। বসামাত্র মনে হচ্ছে শুতে পারলে ভাল হত। শক্ত হয়ে বসেই রইলেন। আর সমীরণবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ঘড়িতে ছ'টা।

এর মধ্যে বার দশেক ওপর-নীচ করলেন অপর্ণা। বারান্দার এ-মাথা ও-মাথা করলেন। বারকয়েক ওই শূন্য ঘরে এসে ঢুকলেন। রক্তবর্ণ মুখ। অপেক্ষা করছেন। প্রতি মুহূর্তের প্রতীক্ষা যুগের প্রতীক্ষা। সকলেরই চোখ পড়ছে তাঁর দিকে। সকলেই ভাবছে, উত্তেজনায় আর পরিশ্রমে ওইরকম দেখাচ্ছে।

ছ'টা বাজতে পরনের শাড়িটা বদলে নীচে নেমে এলেন। সমীরণবাবুকে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। তারপর অনেক জোড়া বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে তাঁকে নিয়ে সীমুর গাড়িতে উঠলেন। বললেন, রঞ্জনের বাড়ি যেতে বলুন।

তারপর সমস্ত পথ একটি কথাও হল না আর। নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি দাঁড়াল। অপর্ণা নামলেন। তাঁকে বললেন, আপনি গাড়িতে বসে থাকুন।

এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। রঞ্জনের বাবা সুবিমল বোস নিজেই দরজা খুললেন। তাঁকে এবং গাড়ির ভিতরের মানুষকে দেখে অপ্রসন্ন মুখ।

আসুন। বসার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভিতরে ঢুকে বললেন, বসুন।

অপর্ণা বসলেন। উনিও। অপর্ণা ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন যেন কেমন।—কী বলবেন, বলুন?

আমাকে আপনি চিনতে পারছেন বোধ হয়?

চিনতে না পারার কী আছে, কিন্তু আমার কী করার আছে বলুন—

রঞ্জন ফিরেছে?

না।

অপর্ণা অপলক চেয়ে আছেন।—আজ ফিরবে কি না তাও জানেন না বোধহয়?

ফিরতে পারে। কিন্তু যা হয়ে গেছে, তারপর আর তাকে কী দরকার?

কী হয়ে গেছে?

ঈষৎ বিব্রত অথচ গম্ভীর মুখে ভদ্রলোক বললেন, দেখুন, বরেনবাবু আপনাকে যদি কিছু না বলে থাকেন আমি কী করতে পারি—অথচ এখানে এসে ছেলের কাছে কী না বলেছেন আর কত কাণ্ড করেছেন।

অপর্ণা চেষ্টা করছেন মাথা ঠিক রাখতে, চেষ্টা করছেন বুঝতে। কী করেছেন আর কী বলেছেন, আপনার জানাতে আপত্তি আছে?

আপত্তি আবার কী। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার ছেলেকে তিনি এ বিয়েতে না এগোবার জন্য শাসিয়েই গেছেন। আমি ক্রিমিন্যাল কোর্টের ল-ইয়ার, ও-সবে ঘাবড়াই না—কিন্তু তা বলে ওখানে আর ছেলের বিয়ে দিতেও চাই না। ... তিনি ছেলেকে বলেছেন বাপের একমাত্র মেয়ে বলে লোভে পড়ে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে, কিন্তু বিয়ে হলে বাপের কানাকড়িও পাবে না। সেই সঙ্গে নিজের স্বভাব-চরিত্রের কথা বলেছেন, মেয়ে দু-দু'বার যেমন অন্য লোককে বিয়ে করার দিকে ঝুঁকেছিল, এও তেমনি ঝোঁক আর মোহ ছাড়া আর কিছু নয় বলেছেন, আর বিয়ের পর আপনি তাঁকে ডিভোর্স করে অন্য একজনকে... যাকগে, এ সব বলতে আমার রুচিতে বাধছে, মোট কথা এরপর ছেলেও সরে দাঁড়িয়েছে।

অপর্ণার উঠতে হবে। উঠলেন। গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। চললেন। কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎই কী মনে হল। ঘরের কোণের দিকে তাকালেন। টেলিফোনের রিসিভারটা পাশে নামানো .... কিন্তু কেন? এঁরা কোন্ ভয়ে সকাল থেকে টেলিফোন বন্ধ করে বসে আছেন! আরো মনে পড়ল কি। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন।—আপনি ওঁর কাছ থেকে তিন হাজার টাকা নিয়েছেন শুনেছি, সেটা কি সত্যি?

রাগত মুখ করে ভদ্রলোক জবাব দিলেন যা হয়েছে বা না হয়েছে সব ছেলের সঙ্গে—আমি কিছুর মধ্যেই নেই।

চলে এলেন। সমীরণবাবু দরজা খুলে দিতে গাড়িতে উঠলেন। বসলেন। গাড়ি চলল। সমীরণবাবু ঘুরে চেয়েই আছেন তাঁর দিকে। দু'চোখ বুজে অপর্ণা পিছনের গদিতে মাথা এলিয়ে দিলেন।

চমকে উঠলেন। কাঁধ নেড়ে সমীরণবাবু ডাকছেন। বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে। বিয়েবাড়ি। একটা বিয়ের আয়োজন চলেছে ওখানে। নামলেন। বাড়িতে ঢুকলেন। কোনো দিকে তাকালেন না পিছনে সমীরণবাবু আছেন কি না তাও দেখলেন না। সোজা ওপরে উঠে এগিয়ে গেলেন সেই ঘরের দিকে যে ঘরে এখন একজনকে পাবেন ধরেই নিয়েছেন।

পেলেন। একজনকে নয়, দু'জনকে। বাপ আর মেয়েকে। সুপার বিয়ের সাজ সম্পূর্ণ। সেই সাজেই মেয়ে বাপের বিছানায় মুখ গুঁজে কাঁদছে।

বরেন সোম মেয়েকে বলছিলেন কিছু, গম্ভীর থমথমে মুখ। থেমে গেলেন।

দু'চোখ ধক ধক করে জ্বলে উঠল অপর্ণার। মাথার ভিতরেও দাউ দাউ করে জ্বলছে। এগিয়ে গেলেন। একেবারে শয্যার ধারে। —সুপা!

মায়ের কঠিন ধারালো গলা কানে আসতে মুখ-গোঁজা অবস্থাতেই সুপর্ণা চমকে উঠল একটু। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসে তাকালো তাঁর দিকে। চোখের জলে প্রসাধনের শ্রী গেছে।

ঘরে যা!

বরেন সোম ওর কাঁধে একখানা হাত রাখলেন। অর্থাৎ উঠতে নিষেধ করলেন। তারপর অপর্ণার দিকে ফিরলেন—ও ঘরেই আছে।

এক ঝলক চোখের আগুনে ওই মুখ পুড়িয়ে দিতে চাইলেন অপর্ণা। তারপর কঠিন স্বরে মেয়েকেই বললেন আবার, তোর ঘরে যা!

বরেন সোমের গলাও তাঁর মুখের মতোই থমথমে গম্ভীর।—আমি ওকে এ-ঘরে ডেকেছি। আমার কথা শেষ হোক তারপর যাবে।

অফুরন্ত ক্রোধ ঘৃণা আর বিদ্বেষ সত্ত্বেও অপর্ণা হয়তো বা থমকালেন একটু। এমন হীন কুৎসিত আচরণের পরেও এই সুরে কথা বলে কী করে তাই দেখতে চাইলেন যেন।

বরেন সোম মেয়ের দিকে ফিরলেন। তেমনি ধীর ঠাণ্ডা গলার স্বর। বললেন, তোর মায়ের কাছ থেকে তুইও বুঝতে শিখেছিস আমি ভাল না, আমি খুব খারাপ। আমি ভাল না বলেই কে ভাল আর কে খারাপ আমি একটু সহজে বুঝতে পারি। অন্তত ওই রঞ্জন বোসকে বুঝতে পেরেছিলাম। আমি ওকে যে-সব কথা বলেছিলাম তার জবাবে ও যদি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত, আর তোদের কাছে এসে সে-সব বলত, তাহলে তোরা আমাকে আরো বেশি ঘৃণা করতিস—কিন্তু আমি বুঝে নিতাম ও-ছেলে খাঁটি—বাইরে যেমন ভেতরেও তেমনি—বুঝে নিতাম তুই সুখী হবি। তার বদলে ও আমার দেওয়া তিন হাজার টাকার টোপ গিলেছে, ওইটুকুই লাভ ধরে নিয়ে তোকে ছেঁটে দিয়ে সরে গেছে। তিন হাজার টাকার লোভে। এই যে পারে—ছ'হাজার বা বারো হাজার পেলে সে তোকে বিক্রি করে দিতেও পারে। আমি যেমনই হই তুই কার কাছে যেতে চেয়েছিলি?

সুপা চেয়ে আছে বাবার মুখের দিকে। অপর্ণাও চেয়ে আছেন। এত রাগ বিদ্বেষ ঘৃণার মুখেও ঠিক কী যে দেখছেন, কী শুনছেন, ঠাওর করে উঠতে পারছেন না।

বরেন সোমের গলার স্বর এবারও একাগ্র, কিন্তু তেমনি গম্ভীর। মেয়ের মুখের ওপর থেকে একবারও চোখ না সরিয়ে বলে গেলেন, আর ওই যে ছেলেটা আসছে তোর জন্য, ওই বিকাশ সিংহ—তাকে তুই চিনেও চিনতে চাসনি।... বাপ-মা মরা ছেলে, আধপেটা খেয়ে দু'দুটো ছোট ভাইকে নিজের সঙ্গে টেনে তুলেছে, সকালে কেরানিগিরি করেছে আর রাতে কলেজে পড়েছে। তখনো ও আমার কাজ নিয়ে বাড়ি আসত, কিন্তু আমি ওর দিকে ফিরেও তাকাইনি, ওর মধ্যে কী আছে চেয়ে দেখিনি। বি.এ., এম.এ. পাস করে প্রণাম করে গেছে, আপিসের পরীক্ষায় একটা একটা করে পাস করেছে আর প্রণাম করে গেছে, শেষে অফিসার হবার পর প্রণাম করে সামনে দাঁড়িয়েছে। বলেছে, আমি এই ছিলাম, আপনার মেয়ের জন্য, আপনার আশায় এই হয়েছি। আরো যোগ্য হতে চেষ্টা করব... আপনার মেয়েকে আমার হাতে দেবেন?

গলার স্বর আরো ধীর আরো স্থির বরেন সোমের। বলে গেলেন, সেই প্রথম আমি একটা ছেলেকে দেখলাম। মনে হল তোর সুখের ঘর তৈরি। মনে হল তোর মা ভাল ঘরে পড়ে নি, তুই ভাল ঘরে

পড়বি। কিন্তু আমি ভাল না, আমার কথা কে শুনবে? তাই ওকে কথা দিতে পারিনি, শুধু বলেছি, চেষ্টা করব। .... দু' দু'বার ওই ছেলে তোকে রক্ষা করেছে, ছায়ার মতো পিছনে থেকে তোকে আগলে রাখতে চেষ্টা করেছে। নাচের স্কুলের সেই মাস্টারের কুমতলব সম্পর্কে যখন আমাকে জানিয়েছিল তখন থেকে—পরের বারের যে পাজি লোকটা তোর মাথা বিগড়ে দিয়েছিল আর তার সম্পর্কে যে বে-নামী চিঠি ও আমাকে লিখেছিল—তখন থেকে। .... আমি যা করেছি, তোকে জানি বলেই করেছি, তোর ভাল ছাড়া আর কিছু চাইনি। থামলেন একটু। তেমনি একাগ্র চোখে মেয়েকে দেখলেন। তারপর বললেন, যা, তৈরি হয়ে নে, আটটার লগ্নেই বিয়ে হবে—বিকাশ এক্ষুনি এসে পড়বে।

সুপর্ণা কী যে করবে জানে না যেন। ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক চেয়ে রইল বাবার দিকে। প্রসাধনের ওপর দুই গালে জলের দাগ। কমনীয় মুখ। উঠল। যাবার আগে থমকে দাঁড়াল একটু। পায়ে হাত রেখে বাবাকে প্রণাম করল। সামনে মা। মাকেও প্রণাম করল। তারপর দরজার দিকে এগোল।

সুপা! একটা আর্তনাদের মতো করেই ডেকে উঠলেন অপর্ণা। সেটা রাগে, কি হতাশায়, কি কী জন্য অপর্ণা জানেন না।

সুপর্ণা ঘুরে দাঁড়াল। দুই গালে জলের দাগ, কিন্তু মুখখানা আরো কমনীয়, চাউনিও ঈষৎ উজ্জ্বল। অপেক্ষা করল একটু। কিন্তু মা আর কিছু বলছেন না। সুপর্ণাই বলল, বাবা যে ব্যবস্থা করেছে তাই হবে মা—

চলে গেল সুপর্ণা। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন অপর্ণা। ওই লোকের মুখোমুখি। মনে হল, অচেনা অপরিচিত মুখ দেখছেন একখানা।

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থামলেন বরেন সোম। অপর্ণার দিকে তাকালেন। দৃষ্টি গভীর। গম্ভীর। দেখলেন একটু চেয়ে। গলার স্বর নীরস বা কর্কশ নয় একটুও। বরং তার উল্টো। অচেনা মুখ, অচেনা গলা। বললেন, এক ব্যাপারে অন্তত তোমার সঙ্গে আমার মিল আছে মনে করি। সুপার ভালো দুজনেই চাই। সুপার সত্যিই ভালো হবে, তুমি কিছু ভেবো না।

চলে গেলেন। অপর্ণা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে। সেদিকেই চেয়ে আছেন।

নয়

সম্প্রদান হয়ে গেল।

মেয়েকে বিকাশ সিংহর হাতে সমর্পণ করলেন বরেন সোম।

বিয়ের আসরের স্বাভাবিক মুখরতাটুকুও নেই। দেখছে সকলে। স্তব্ধ-নির্বাক। অদূরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে অপর্ণাও দেখছেন। যিনি সম্প্রদান করেছেন তাঁকে। যে গ্রহণ করল তাকে। যাকে সম্প্রদান করা হল তাকেও।

সম্প্রদানের পরে কিছু আচার পালন। তারপর হোম। অনুষ্ঠান শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে। বর মন্ত্র পাঠ করছে। অদূরে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে অপর্ণা শুনছেন। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় থেমে বৃদ্ধ পুরোহিত মন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছেন। সকলে শুনছে। অপর্ণারও কানে যাচ্ছে। বাইরে স্থির নিস্পন্দ, কিন্তু ভিতরে কোথায় থেকে থেমে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

> "ওঁ সোমঃ প্রথমো বিবিদে, গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
> তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিঃ, তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ।।

—(হে বধূ), চন্দ্র তোমাকে প্রথমে গ্রহণ করেছিলেন, তাই তোমাতে চাঁদের রূপ, তারপর তোমাকে গ্রহণ করেছে বাগ্‌দেবতা গন্ধর্ব, তাই তুমি মিষ্টভাষিণী, অগ্নিদেব তোমার তৃতীয় পতি তাই তুমি পবিত্র, এবং তোমার চতুর্থ পতি এই মানুষ—আমি।

....

"ওঁ গৃভ্‌নাভি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টিযথাসঃ
ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধি-মহ্যং ত্বাদুর্ গার্হপত্যায় দেবাঃ।।

—হে বধূ, তোমার সৌভাগ্য লাভের জন্য তোমার হাত আমি গ্রহণ করছি, তোমার পতি এই আমার সঙ্গে যেন জরাপ্রাপ্তি পর্যন্ত মিলিত থাকতে পারো। ভগো অর্যমা সবিতা পূষা—এঁরা সকলে তোমাকে গৃহ এবং অপত্যধর্ম পালনের জন্য আমায় অর্পণ করুন।

....

"...ওঁ অমোহহমস্মি সা ত্বং, সা ত্বমস্যমোহহম,
সামাহমস্মি ঋক ত্বং, দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বম।
তাবেহি বিবহাবহৈ, সহরেতো দধাবহৈ,
প্রজাং প্রয়নয়াবহৈ, পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূন্,
তে মন্তু জরদষ্টয়ঃ। সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ।

—হে বধূ, আমি 'অম' এবং তুমি 'সা', তুমি 'সা' এবং আমি 'অম', অর্থাৎ অমনি অবিচ্ছেদ্য আমরাও। আমি সাম ও তুমি ঋক, আমি আকাশ ও তুমি পৃথিবী—আমরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছি যেন আমাদের মিলিত সন্তানগণ জরাপ্রাপ্তি পর্যন্ত জীবিত থাকে। আমরা যেন একে অন্যের প্রিয়, রুচিকর ও মনোরঞ্জনকারী হই। আমরা উভয়ে যেন একত্রে শত শরৎ দেখতে পাই, শত শরৎ যেন আনন্দে জীবিত থাকি এবং শত শরতের বার্তা যেন শ্রবণ করতে পারি।

সমস্ত শরীরটা হঠাৎ একবার থর থর করে কেঁপে উঠল অপর্ণার। মাথার মধ্যে কী যেন ঠাসা হচ্ছে সেই থেকে, দাঁড়িয়ে থেকেও পা টলছে। নিজের ঘরের দিকে চললেন... যেতে পারবেন কি না কে জানে।

পারলেন। ঘরে ঢুকলেন। বসলেন। বসেই রইলেন।

পরদিন সকাল।

বিদায়ী আশীর্বাদ হয়ে গেছে। পিসিরা আর মাসিরা ঘটা করে উলুধ্বনি দিচ্ছে। গাড়ি দাঁড়িয়ে। মাল-পত্র তোলা হয়েছে। ওরা জোড়ে প্রণাম করল দ্বিতীয় দফা। আগে অপর্ণাকে। পরে বরেন সোমকে। সুপা কাঁদছে। কিন্তু অপর্ণা কাঁদতে পারছেন না। অদূরের এক মানুষকে দেখছেন যাঁর নাম বরেন সোম। তাঁর দুই চোখ মেয়ের দিকে, অপর্ণার দিকে নয়। সেই চোখে জল চিকচিক করতে দেখছেন। অচেনা মুখ দেখছেন। অপরিচিত মুখ দেখছেন।

ওরা চলে গেল। ঠাণ্ডা সংহত পায়ে ওই মানুষও ওপরে উঠে গেলেন।

দুপুর।

খেয়ে দেয়ে ননদেরা চলে গেছে। মাসিরা চলে গেছে। দেওর আর জায়েরা চলে গেছে। দুপুর গড়িয়ে চলেছে।

বৃন্দার ব্যস্তসমস্ত মুখ দেখে আর কথা শুনে হঠাৎ আবার একপ্রস্থ ঝাঁকুনি খেলেন অপর্ণা। উদ্বেগ-কাতর মুখে বৃন্দা বলে উঠলেন, বাবু কোথায় চললেন মা? বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, মধুকে ডেকে বললেন স্যুটকেস আর বিছানা ট্যাক্সিতে তুলে দিতে, এ আবার কী ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে গো মা!

অপর্ণা নিস্পন্দের মতো বসে রইলেন। বৃন্দার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তুমি যাবে? দেখবে? না কি এমনি বসেই থাকবে!

অপর্ণা উঠলেন। মাথাটা বেজায় ঘুরছে। বৃন্দার কথাগুলো কানে ঢুকেছে কিন্তু মাথায় যেন ঠিক মতো ঢুকছে না।

দরজার দিকে এগোলেন আস্তে আস্তে। বারান্দা ধরে চললেন। .... সেই ঘর। চৌকাঠের সামনে দাঁড়ালেন। দেখলেন। তারপর ভিতরেও পা ফেললেন।

দেয়ালে সুপার ছোট বয়সের ছবি টাঙানো একটা। বরেন সোম সেই দিকে চেয়ে আছেন। নিষ্পলক। শেষবারের মতো একাগ্র চোখে দেখে নিচ্ছেন যেন। সকালের মতোই দু'চোখ চিকচিক করছে।

অপর্ণা চেয়ে আছেন। একখানা অচেনা, অপরিচিত মুখ দেখছেন।

কারো উপস্থিতি অনুভব করেই হয়তো বরেন সোম ফিরলেন। কয়েক মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়। শান্ত মুখে বললেন, অনেক বছর ধরে তুমি আমি দুজনেই এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। আমি যাচ্ছি। তোমার আসার দরকার ছিল না, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করেই যেতাম ....।

অপর্ণা নির্বাক। অচেনা অপরিচিতের মুখ দেখছেন।

তোমাকে জানাচ্ছি, আর সমীরণকেও বোলো এরপর তোমরা যে ব্যবস্থা ঠিক করবে আমার দিক থেকে তাতে কোনোরকম বাধা বা আপত্তি আসবে না। অনেকদিন ধরে আমি তোমাকে মুক্তি দেব বলে প্রস্তুত হয়েছি, সুপার বিয়ের জন্য আটকে ছিলাম। ... তিনটে লাইফ ইনসিওর ছিল, পেড-আপ করে গেলাম—দু'তিন বছরের মধ্যেই টাকাগুলো পাওয়া যাবে, তোমার দরকার না থাকে তো সুপাকে দিয়ে দিও। ... চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, তার আগে সুপার বিয়ের বাবদ প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যে-টাকা ধার নেওয়া হয়েছে সেটা কাটান গেলে আর বিশেষ কিছুই থাকবে না, সামান্য যা থাকবে সেটা সুপাকে দেবার জন্য লিখে দিয়েছি, আর ওই ড্রয়ারে ওর নামে একটা লেটার অফ অথরিটিও আছে... খরচ বাবদ বিকাশকে দেবার জন্য আলাদা দু'হাজার টাকা রেখেছিলাম, সেটাকা ও নিতে রাজি হল না। তার থেকে এক হাজার টাকা আমি সঙ্গে নিচ্ছি, বাকি এক হাজার ওই দেরাজে আছে—কারো কিছু পাওনা থাকে তো ওর থেকে দেবে—বেশি থাকলে তাও সুপাকে দিয়ে দিতে পারো।

থামলেন। বক্তব্য শেষ। আয়ত দু'চোখ অপর্ণার মুখের ওপর প্রসারিত।

আমাকে তোমার কি কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে?

অপর্ণা নিরুত্তর। নির্বাক। অপরিচিতের মুখ দেখছেন শুধু একখানা।

ঠোঁটের ফাঁকে বরেন সোমের সামান্য হালকা একটা রেখা পড়ল কি পড়ল না। পরক্ষণে তেমনি শান্ত, তেমনি নির্লিপ্ত-গম্ভীর। বললেন, ঠিক এতটার জন্যে তুমি প্রস্তুত ছিলে না মনে হচ্ছে, কিন্তু যা করলাম সেটা ঠিক তোমার করুণার উদ্রেকের জন্যে নয়। আমি ভাল না, আমি মন্দ আমি জানি, তবু এখানে থাকলে মাঝে মাঝে মনে হত তুমি সে-ভাবে চেষ্টা করলে এই অতি মন্দও হয়তো একটু অন্তত ভাল হতে পারত, হয়তো একদিন যা-কিছু ঘটেছে তাও না ঘটতে পারত। ....এখানে থাকলে নিজের সেই ভিক্ষের মূর্তিটা হঠাৎ হঠাৎ এক একসময় দেখতে পাই, আর সেটা সব থেকে বেশি অসহ্য লাগে। তাই এ-ব্যবস্থা। আচ্ছা...

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আর পিছন ফিরে তাকালেন না। পায়ের শব্দ কানে আসছে। .... সিঁড়িতে নামার শব্দ। তারপর ট্যাক্সির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। ... তারপর ট্যাক্সিটা ছাড়ার শব্দ।

অপর্ণা তেমনি দাঁড়িয়ে। মাথাটা বড় বেশি ঘুরছে। পড়ে যাবেন নাকি? আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে শয্যায় বসলেন। যে শয্যা বহুকালের মধ্যে তিনি স্পর্শও করেননি। ঘরটা দুলছে। খাট মেঝে সব কিছু দুলছে। দু'চোখ বুজে আসছে।

... অথচ তখনো সামনে যে অপরিচিতের মুখ দেখছেন একখানা।

বাঁ-চোখের পাতা কাল বড় বেশি কাঁপছিল। মেয়েদের বাঁ চোখের পাতা কাঁপা শুভ লক্ষণ। এখনো কাঁপছে নাকি! .... কতগুলো মন্ত্র মাথার ভিতরে আবার যেন ঠেসে বসেছে। আর এই মাত্র শোনা কতগুলো কথা। কিন্তু অপর্ণা সঠিক কিছুই অনুভব করতে পারছেন না, কিছুই উপলব্ধি করতে পারছেন না। অপরিচিতের মুখখানাই শুধু দেখছেন এখনো।

সেই কতকাল ধরে মনের ভিতরটা এক আত্মধ্বংসী শূন্যতায় ভরাট হয়েছিল। বাইশ বছর ধরে। কিন্তু আজ হঠাৎ ওটারই কোন্ সুড়ঙ্গ-তলে ধুলো মাটি মাখা এক নতুন মণি উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। .... চেনা মানুষের এক অপরিচিত মুখ।

অপর্ণা সোম তাকে না দেখে পারবেন কী করে?

প্রণয় পাশা

উৎসর্গ
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাভাজনেষু

অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে খুশি মুখে ডক্টর কেলার মাথা ঝাঁকাল। চোখের কোল দুটো একবার টেনে দেখতে দেখতে মৃদু মিষ্টি অনুযোগের সুরে বলল, ইউ নটি বয়, তুমি সকলকে ভাবিয়ে তুলেছিলে।

সারার দিকে তাকালো। ঠোঁটে তেমনি মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে অভয় দিল। ঠাট্টার সুরে বলল, সব ঠিক আছে. বাঘ-সিংহ-ঘাঁটা মেয়েও এমন ঘাবড়ে যায়—তাজ্জব ব্যাপার!

ওর কাঁধ চাপড়ে দিল একটু। ওই ট্রিট্‌মেন্ট চলবে, তোমার কালো ভূত তিনদিনের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠবে, অ্যান্ড উইল বি এ মাংকি এগেন—সো নো ওয়ারি।

আর এক দফা ওর পিঠ চাপড়ে দরজার দিকে এগলো। চার ভাগের তিনভাগ নিশ্চিন্ত হয়ে আর একভাগ সংশয় নিয়ে সারা তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমি জানি বাইরে গিয়ে ও আবার তার হাত ধরবে, অনুযোগের সুরে সত্যি কথা বলতে বলবে, আরো নিশ্চিন্ত হতে চাইবে।

ডক্টর কেলারের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। এখনো সুপুরুষ। চল্লিশ বছরের মতো ব্যস্ত-সমস্ত চাল-চলন। এ-তল্লাটে সব থেকে নামী ডাক্তার আর রোগীমাত্রেরই সব থেকে প্রিয় ডাক্তার। রসিক মানুষ। সঙ্কটজনক অবস্থাতেও রোগীর অবস্থা ফেরানোর জন্য মিষ্টি মিষ্টি হাসতে পারে, দরকারে দুই একটা রসিকতার কথাও বলতে পারে। সেই কারণেই আবার সারার সংশয়—যা বলল ঠিক বলল কি না কে জানে। সবার বিশ্বাস, চিকিৎসক হিসেবে তার বাপের বন্ধু এই মানুষটি ধন্বন্তরি বটে, কিন্তু দরকার হলে সত্যের সঙ্গে অম্লানবদনে অনেক মিথ্যেও মেশাতে পারে।

ঘণ্টা ছয়েক আগে ডক্টর কেলার এই ঘরে যখন এসেছিল, এই বিছানায় তখন আমি ভোঁদড়ের মতোই ওলট-পালট খাচ্ছি। অসহ্য যন্ত্রণায় ঘেমে নেয়ে উঠছি। সারা তখন ওর কি একটু মার্কেটিং সারতে গেছল। ওকে ডাকার জন্য আমি বোমারকে পাঠাতে পারতাম। বোমার কাছেই কোথাও ছিল নিশ্চয়। ওকে বললে ও তক্ষুনি ডক্টর কেলারকে টেলিফোনে খবর দিয়ে সারাকে যেমন করে হোক ধরে আনত। বোমারের বোধহয় ষষ্ঠ স্নায়ু বলে কিছু আছে—ঠিক দরকারের জায়গাটিতে আঙুল ফেলতে পারে।

যাক, আমি টেবিলের টাইপ-রাইটারে বসে কয়েকটা দরকারী চিঠি টাইপ করছিলাম। চিন চিন এ যন্ত্রণাটা বাড়তে থাকল। সকাল থেকেই একটু একটু টের পাচ্ছিলাম। সারাকে কিছু বলিনি। শুনলেই ভয়ে সিঁটিয়ে ও তিলকে তাল বানাবে, জামার কলার ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে আমাকে বিছানায় এনে শোয়াবে। তারপর ছোটাছুটি চেঁচামেচি শুরু করে দেবে।

যন্ত্রণাটা ক্রমে অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে লাগল। কিছুদিনের পুরনো ডিওডন্যাল আলসার। ডক্টর কেলারের ধারণা, খাওয়ার অনিয়ম করে আর খালি পেটে মদ গিলে আমি এই সম্পদটি সংগ্রহ করেছি। তার ধারণার কথা শুনে সারার সেটাই বদ্ধমূল বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অবশ্য সে-জন্য আমাকে বকাবকি ছেড়ে একটা অনুযোগও করে না। ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ফেলে, আর কোনো সময় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে, তোমাকে আর কি বলব, সব দোষ তো আমার।

ব্যথা বাড়তেই থাকল। টাইপ এগলো না, টেবিল ছেড়ে উঠতে হল। ঘরে কিছু ওষুধ মজুত থাকে তাই খেলাম। যন্ত্রণাটা এবার বুকের দিকে উঠতে লাগল। তবু বোমারকে ডাকলুম না। তার এক কারণ, আমার সহ্যশক্তি অপরিসীম। যত দোষই থাক আমার, এ-যাবৎ সহিষ্ণুতা নিয়ে খোঁটা কেউ দেয়নি। হ্যাঁ, শারীরিক যাতনা অন্তত আমি অনেক সহ্য করতে পারি। এখন সারাও তা জানে। জানে বলেই আমাকে ভয় আর অবিশ্বাস ওর। ভাবে, চোখ একেবারে উল্টে দেবার আগেও বুঝি আমি ভালোমানুষের মতো মটকা মেরে পড়ে থাকতে পারি।

বোমারকে না ডাকার আসল কারণ ভিন্ন। ও টের পেলেই সারা জানবে। তারপর ওর সেবা-যত্নের অত্যাচারে বেচারা আমি অস্থির হয়ে পড়ব। সব থেকে বেশি মুশকিল হবে পথ্য নিয়ে। এক্সরে-ফেক্সরে

করে ডাক্তার আলসার ঘোষণা করার পর থেকে এমনিতেই যে পথ্য আমার, দেখলে চোখে জল আসে। কেবল দুধ খাও আর দুধ খাও, আর সেদ্ধ খাও আর সেদ্ধ খাও। আবার যন্ত্রণার কথা জানতে পারলেই এখন টুকিটাকি যা একটু খেতে পাচ্ছি তা তো বন্ধ হবেই, সেদ্ধও বন্ধ হয়ে যাবে। সে-বেলায় সারা অকরুণ। অসুখটা হবার পর থেকে অনিয়ম বিশেষ করি না, তবু ওর অগোচরে ফাঁক পেলে লোভে পড়ে একটু-আধটু অনিয়ম করে ফেলি। দুই-একবার ধরা পড়ার ফলে এখন আর আমি একটুও বিশ্বাসের পাত্র না। একটু এদিক-ওদিক হলেই ভুরু কুঁচকে শাসাবে, কোথায় কি খেয়েছিলে?

ডক্টর কেলার বলেছিল, অপারেশন করে ফেলা যেতে পারে। অবশ্য নিয়মে থাকলে আর ওষুধপত্র ঠিক মতো চললে এ যা হয়েছে অমনিতেই সেরে যাবে। শেষের রাস্তাটাই আঁকড়ে ধরেছে সারা। অপারেশনে তার যেমন ভয় তেমনি আপত্তি। এমন কি পারতপক্ষে সে আমাকে হাসপাতালেও পাঠাবে না। বাড়িতে ডাক্তার ডাকবে, ডবল খরচা করে হাসপাতালের মতো ব্যবস্থা করবে। ওর ভয়, হাসপাতালে পাঠালেই সার্জন ছুরিতে শান দিতে থাকবে। ভয়ের কারণ আছে। ছেলেবেলায় ওর এক কাকা এই রোগের অপারেশন করাতে গিয়ে মারা গেছিল। নিজের বাবাকে তো দুচক্ষে দেখতে পারত না। সেই কাকাকে বাবার মতো ভালোবাসত। কাকা মারা যাবার পর শুনেছে ডাক্তারদের কি ভুলের ফলে অমন অঘটন ঘটেছে। ব্যস, সেই থেকেই হাসপাতাল আর অপারেশন সম্পর্কে বিভীষিকা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কি-যে হয়ে গেল জানি না। যন্ত্রণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। মনে হচ্ছে বুকের ভিতরটা কেউ যেন পাথর দিয়ে ছেঁচছে। দর দর করে ঘাম হচ্ছে। টেলিফোন ইচ্ছে করেই শোবার ঘরে রাখি না। উঠে পাশের ঘরে যাবার শক্তি নেই। দুই একবার চেষ্টা করতে দ্বিগুণ যাতনা। ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে যাবার দাখিল। বারকয়েক বোমারকে ডেকে সাড়া পেলাম না। পাশের ঘরে নেই, তার ঘর ফ্ল্যাটের শেষ মাথায়।

বালিশ পেটে চেপে আমি যখন উথল-পাতাল করছি, কয়েকটা প্যাকেট বুকে চেপে সারা ঘরে ঢুকল। হতভম্ব প্রথম। বিছানায় বসে আমি আমি কিছু সার্কাসের কসরত দেখাচ্ছি কি না ভাবল বোধহয়। বালিশ বুকে চেপে আর উবুড় হয়ে আমি ওর দিকে চেয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করলাম। হাসি ফুটল কি না জানি না।

—ও গড্! অস্ফুট আর্তনাদ! হাতের প্যাকেটগুলো মাটিতে পড়ে গেল। ছুটে এসে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার মুখটা তুলে অস্থির সঙ্কটে আমার ঠোঁটে মুখে গাল ঘষে ঘষে যন্ত্রণা মুছে দিতে চেষ্টা করল।—ও ডার্লিং ডার্লিং।

তারপরেই সংবিৎ ফিরল যেন। গলা ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল। পায়ের ধাক্কায় একটা প্যাকেট দূরে ছিটকালো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তেমনি ত্রাসে ছুটে এলো আবার। তার পিছনে কাঁচা-পাকা চুল বোমার। আমার অনেক দুঃখ আর অনেক সুখের সাথী ফ্র্যাংকি বোমার। ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে আমি জীবনের তাপ অনুভব করলাম, যন্ত্রণার উপশম হচ্ছে ভাবতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু যন্ত্রণা সত্যিই বাড়ছে বই কমছে না।

সারা আবার এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বিছানায় শুইয়ে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু শুলে আরো বেশি কষ্ট হয়। বোমারের উপস্থিত বুদ্ধির বরাবরই তুলনা নেই। তার মুখের কথা থেকে হাত দুটো অনেক বেশি তৎপর। তাড়াতাড়ি গোটাকতক বালিশ এনে জড় করল। তারপর আমাকে টেনে বসার মতো করে শুইয়ে দিল। তারপরেই জলের গেলাস মুখের সামনে ধরল।

জল খেয়ে আর উঁচু বালিশে মাথা রেখে একটু যেন আরাম পেলাম। মিনিট পাঁচেক মাত্র, তারপর আবার সেই বুক-ভাঙা যন্ত্রণা। সারা দিশেহারার মতো আমাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে, বুকে হাত বুলিয়ে সব যন্ত্রণা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে, আর থেকে থেকে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠছে, ও গড্ ও গড্...ও ডার্লিং ডার্লিং...

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। বোমারের দিকে ফিরে কান্না-ভরা বিকৃত গলায় বলে উঠল, দেখছ কি, আমার পাপের শাস্তি, আমার পাপের শাস্তি,কিন্তু তুমি তো বন্ধু—ডাক্তার আসছে না দেখেও দাঁড়িয়ে

আছ কেন? হাসপাতালে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলছ না কেন? আর কতক্ষণ দেখবে—এটা হার্টের ব্যাপার কিছু, বুঝতে পারছ না?

বোমার বলল, তুমি টেলিফোন করেছ মাত্র ন'মিনিট হয়েছে— ডাক্তার এলো বলে।

বলতে বলতে বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ডক্টর কেলার হাসিমুখে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে সারার আর্তনাদ, ও ডক্টর সেভ হিম—প্লীজ্ প্লীজ্—

রোগীর অবস্থা দেখে ভালো করে কিছু শোনার অবকাশ পেল না ডক্টর কেলার। সামান্য পরীক্ষা করেই ব্যাগ খুলল। পর পর দুটো ইন্‌জেকশন দিল। তার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমার যন্ত্রণার অবসান। ঘুমে দুই চোখ বুজে এলো। উঁচু বালিশে মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। পরে টের পেলাম চার ঘণ্টা। চোখ খুলে প্রথমে ঠাওর হল না আমি হাসপাতালে কি না। সামনে নার্স দাঁড়িয়ে, তার পাশে এক অচেনা ছোকরা—গলায় স্টেথো ঝুলছে, অর্থাৎ ডাক্তার। এক পাশে বিছানার সঙ্গে চেয়ার ঠেকিয়ে সারা বসে আছে। চোখ মেলে তাকাতে ব্যগ্র মুখখানা সামনে ঝুঁকল।—ও ডার্লিং, আর কষ্ট নেই তো?

ধোঁকা কেটেছে। ঘরেই শুয়ে আছি। পায়ের কাছে একখানা মূর্তির মতো বোমার দাঁড়িয়ে। ওর ওই গম্ভীর মুখ দেখলেই আমার হাসি পায়—অথচ প্রায় সর্বদাই গম্ভীর ও—হাজার হাজার দর্শক যখন ওর কাণ্ড-কারখানা দেখে হেসে কুটিপাটি, তখনো। এদিকের ছোট টেবিলে সারি সারি ওষুধ সাজানো। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে বটে, কিন্তু কি হয়েছিল মনে পড়ছে। হেসে অভয় দিলাম সারাকে, বললাম, একটুও কষ্ট নেই।

ছোকরা ডাক্তার এগিয়ে এলো। পাল্‌স দেখল। বুক পরীক্ষা করল। নার্সের উদ্দেশে ইঙ্গিত করতে সে একটা ওষুধ খাওয়ালো। তারপর ছোকরা ডাক্তার মৃদু ফতোয়া জারি করল, ডক্টর কেলার না আসা পর্যন্ত কোন কথা নয়।

অর্থাৎ ডক্টর কেলার আবারও আসবে। এই চার ঘণ্টায় আরো এসেছে কিনা জানি না। কত কিছুই তো হয়ে গেছে, ওষুধ এসেছে, নার্স এসেছে, সারাক্ষণ লক্ষ্য রাখার জন্য জুনিয়ার ডাক্তারও এনে বসিয়ে রেখেছে।

কষ্ট আর সত্যিই নেই। আমার ভালো লাগছে। অকারণে কেন যেন হাসিও পাচ্ছে। ঘরের সব ক'টা মুখ এ-রকম গম্ভীর বলেই হয়তো। একটু বাদে জুনিয়র ডাক্তার বলল, আমি গিয়ে ডক্টর কেলারকে খবর দিচ্ছি। সারাকে অভয় দিয়ে আর আমাকে দু'বার করে কথা বলতে নিষেধ করে সে চলে গেল। আমার মনে হল যেন আপদ বিদেয় হল। নার্সটাও এই সঙ্গে গেলে অখুশি হতাম না। তবে মেয়েটার অল্প বয়েস আর মুখখানাও মিষ্টি—অতএব বিরক্তির কারণ নয়।

আমি বললাম, খিদে পেয়েছে—

শোনামাত্র সারা সচকিত। প্রথমে বোমারের দিকে তাকালো, তারপর নার্সের দিকে। ওর ছোট মেয়ের মতো হাঁসফাঁস অবস্থা দেখে আমার হাসি পাচ্ছে। সারা বিপন্ন মুখ করে বলল, ওই ডাক্তারের সামনে বললে না কেন, এখন আন্দাজে আমরা তোমাকে কি খেতে দেব?

নার্স বলল, একটু গরম দুধ দেওয়া যেতে পারে।

আমি বাধা দিলাম।—দুধ না।

—বা রে, এখন কি তোমাকে—এই যাঃ, তুমি কথা বলছ যে, ডাক্তার না তোমাকে বার বার বারণ করে গেল!

—খিদে পেলেও বলব না?

—না বলবে না, চুপ করে থাকো, একটু আগে চোখ কপালে তুলে দিয়ে এখন এটা খাব না সেটা খাব না—ডাক্তার আসুক তারপর দেখা যাবে।

আমি চুপ খানিকক্ষণ। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওই ভালো লাগার উসখুসুনি চলেছে। একটু বাদে মুখটা সামান্য বিকৃত করে নার্সকে বললাম, সিস্টার, ও-ঘরে গিয়ে টেলিফোনে ডক্টর কেলারকে ধরতে পারো কিনা দেখো তো—পেলে কখন আসবে জিজ্ঞেস করো।

—ডক্টর লটন তো গেলেন।

—সে কতক্ষণে গিয়ে তাকে ধরবে কে জানে, তুমি দেখো একবার।

সভয়ে আবার সামনে ঝুঁকল সারা।—কেন কেন, ফের কষ্ট হচ্ছে?

আমি হ্যাঁ-না গোছের করে মাথা নাড়লাম। নার্স চলে যেতেই আমি একটু ঘুরে সানুনয়ে সারাকে বললাম, একটুও কষ্ট হচ্ছে না, আসলে ভয়ানক খিদে পেয়েছে, তুমি শিগগীর খেতে দেবে কিনা বল—

—কি মুশকিল, আমি আন্দাজে কি খেতে দেব?

হাত বাড়িয়ে ওর দুটো কাঁধই ধরে ফেললাম।—বেশ ভালো করে একখানা চুমু।

—ধেৎ! মুখ লাল। যে-ভাবে ধরেছি পাছে এই শরীরে ধকল হয় সেই ভয়ে জোর করে সরতেও পারল না। গম্ভীর মুখেই বোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকে পিছন করে ঘুরে দাঁড়াল। অর্থাৎ চক্ষু লজ্জা বর্জন করে আমার খিদে আমি মেটাতে পারি, ও দেখবে না।

ছেড়ে দিতে সারা চেয়ার ঠেলে দূরে সরে দাঁড়াল। মুখ লাল, চোখে বকুনি। বলে উঠল, তুমি এক নম্বরের শয়তান, এই নড়ানড়িতে কোনোরকম ক্ষতি হলে তোমাকে মজা দেখাব আমি—

নার্স ফিরল। কি বলতে গিয়ে থমকে তাকাল। সারা পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে, মুখ তখনো লাল। আর বোমার তখনো পিছন ফিরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল? পেলে?

—ডক্টর কেলার হাসপাতালে নেই।...ডক্তর লটন পৌঁছে গেছেন। ফোন ধরে আছেন, কি কষ্ট হচ্ছে জিজ্ঞাসা করছেন।

—কিছু কষ্ট হচ্ছে না।

—ও...আর বললেন দুধ ছাড়া এখন আর কিছু দেওয়া চলবে না।

—থাক, ব্যস্ত হয়ো না, আমি খেয়ে নিয়েছি। লটনকে ছেড়ে দিয়ে এসো।

বিমূঢ় নেত্রে নার্স একবার বোমার আর একবার সারার দিকে তাকালো। এরই মধ্যে কি খেয়ে নেওয়া হল বোধের অতীত যেন। কি বুঝল সে-ই জানে, ঘুরে তাড়াতাড়ি আবার প্রস্থান করল।

—তুমি একটা নির্লজ্জ, তুমি একটা বেহায়া!

রাগের মুখেই সারা হেসে ফেলল। বোমার আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল এতক্ষণে। তেমনি নির্লিপ্ত গম্ভীর।—তুমি একটা কইমাছ, কেটেকুটে তেলে ছাড়লেও দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি করতে পারো।

দু' দু'বার আমরা অনেক দিন করে ইন্ডিয়ায় দল নিয়ে ঘুরেছি। আমি আর সারা তো কর্তা অর্থাৎ শ্বশুরের আমলেও গেছি। বোমারের নেশার মধ্যে খাওয়ার নেশা, নিজে রাঁধেও ভালো। কইমাছ কি বস্তু জানে।

হেসে ওঠার আগেই টেলিফোন ছেড়ে নার্স হাজির আবার। জানান দিল, ডক্টর কেলার হাসপাতালে ফিরেছেন, তিনি একেবারে ব্লাড রিপোর্ট নিয়ে আসবেন...কিছু দেরি হতে পারে। এর মধ্যে তিনিও কথা বলতে বা নড়াচাড়া করতে বারণ করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাগত মুখে সারা ঘর ছেড়ে প্রস্থানের উদ্যোগ করল। তার আগেই গলা দিয়ে আমি একটা যন্ত্রণা-সূচক শব্দ বার করলাম। চকিতে ফিরল। এগিয়ে এসে নার্সের সামনেই আমাকে ধমকে উঠল, চালাকি হচ্ছে?

কথা বলা নিষেধ, অতএব বিষণ্ণ মুখে আমি আঙুল দিয়ে চেয়ারটা দেখালাম। অর্থাৎ বোস—।

নিরুপায় মুখ করে সারা আবার বসেই পড়ল।

চিঁ-চিঁ শব্দ বার করে নার্সের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, এর মধ্যে ব্লাড নেওয়াও হয়ে গেছে?

জবাবটা ঝাঁঝালো সুরে সারাই দিল।—এই চার ঘণ্টায় কত কি হয়েছে তুমি তো সবই জানো!

নার্সের উক্তি থেকে বোঝা গেল, হার্টের ব্যাপারে কিছু কিনা রক্তের এই বিশেষ পরীক্ষা থেকে বোঝা যাবে। অতএব যতক্ষণ না রিপোর্ট আসছে ততক্ষণ নড়াচড়া বন্ধ।

ডক্টর কেলারের ব্যস্তসমস্ত হাসিমুখে দেখা গেল আরো ঘণ্টা দুই বাদে। দরজা থেকেই বলতে বলতে ঢুকল, নাথিং রং, অ্যাবসোলিউটলি নাথিং। স্ট্রোক ভেবে তোমার বউই আধা অজ্ঞান, ওর ভয় দেখেই চেক্ আপ করে নিলাম। ডিওডন্যাল আলসারের সঙ্গে উইন্ডের আপওয়ার্ড অবস্ট্রাকশনের ফলে ওই কাণ্ড হয়েছিল। দু-হাতে বিছানায় ভর করে সামনে ঝুঁকল।—খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম করেছিলে?

—না তো।

—নিশ্চয় করেছিলে। সারা সজোরে বাধা দিয়ে উঠল, ডোন্ট্ বিলিভ হিম, আমি বলছি ডক্টর, নিশ্চয় অনিয়ম করেছিল।

—কি অনিয়ম করেছিল?

সারা থতমত খেল।—তা তো জানি না।

ডক্টর কেলার সশব্দে হেসে উঠল। তারপর পাশে বসে ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্র খুলল।

বিনীত মুখ করে আমি বললাম, ডক্টর...ইয়ে আমি এর মধ্যে একটু অন্যায় করে ফেলেছি...মানে একটু নড়াচাড়া করে ফেলেছিলাম, ক্ষতি হবে না তো?

হাতে কাপড় জড়াতে জড়াতে ডাক্তার মাথা নাড়ল, কিছু না, কিছু না, ব্যাট্ ইউ শুডন্ট্ হ্যাভ—

সারার মুখ লাল আবার। এই সুফলটুকু দেখার লোভেই জিজ্ঞাসা করা। ডাক্তারের আড়ালে দাঁড়িয়ে ও চোখ দিয়ে শাসাচ্ছে আমাকে। আর দু-চোখের সাদা বার করে বোমার ড্যাব ড্যাব করে দেখছে আমদের।

নিশ্চিন্ত করার পরেও ডাক্তার খুব নিবিষ্টভাবে আবার পরীক্ষা করল আমাকে। সেই ফাঁকে দু-চোখ ভরে আমি একটা দৃশ্য দেখলাম। ডাক্তার যতক্ষণ আমার প্রেসার দেখল, হার্ট দেখল, পালস্ দেখল পেট দেখল, ততক্ষণ পর্যন্ত সারার সমস্ত মুখ এমন কি সমস্ত ভেতর সুদ্ধু যেন উৎকণ্ঠিত উদগ্রীব। একাগ্র দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকেই চেয়ে আছে। ডাক্তারের মুখে অথবা ভুরুর ফাঁকে এতটুকু উৎকণ্ঠার ভাঁজ পড়ছে কিনা খুঁটিয়ে দেখছে। যেন এর ওপরেই জীবন-মরণ নির্ভর।

শেষে আবার নিরাপদ রায় শুনে নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। দৃশ্যটা বুকের তলায় একটা সুখের প্রলেপের মত।

যন্ত্রপাতি গোটাতে গোটাতে ডক্টর কেলার হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল, ব্যথাটা প্রথম টের পেলে কখন?

ভয়ে ভয়ে একবার সারার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, সকাল থেকেই চিনচিন ব্যথা করছিল—

সারার দু-চোখ বড় হয়ে উঠছে।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, তারপর?

—তারপর ভয়ানক বেড়ে গেল, ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত সে-এক বিষম অবস্থা...এ-রকমটা আগে আর কখনো হয়নি।

—এক ঘণ্টা ধরে কষ্টে উথল-পাতাল করলে অথচ কাউকে ডাকলে না! সারার যদি ফিরতে আরো এক ঘণ্টা দেরি হত?

অসহায়ের মতো বলে ফেললাম, আমার কি সর্বনাশ যে করলেন ডক্টর জানেন না।

ডাক্তার অবাক।—কেন?

—এরপর একঘণ্টা ধরে ওর কাছে আমাকে এই কৈফিয়তই দিতে হবে। ওকে বলে যান আমার বেশি কথা নিষেধ।

ডাক্তার হাসতে লাগল। সারার দিকে ফিরল একবার। ওর মুখ থমথমে হয়ে আসছিল সত্যিই। সৌজন্যের খাতিরে হাসতে চেষ্টা করল একটু। ডাক্তার আমাকে বলল, তোমাকে কষে বকাই উচিত, যে-রকম যন্ত্রণা হচ্ছিল বিপদ হতেও পারত, বাট ইউ আর এ ব্রেভ নটি বয়—

হাসিমুখে ডাক্তার দরজার দিকে পা বাড়ল। সারা সঙ্গ নিল। কি জানি, যদি আড়ালে কিছু বলে, যদি এখনো ভয়ের কিছু থেকে থাকে।

তারা ঘর থেকে বেরুতে আমি বোমারের দিকে তাকালাম। বোমার আমার দিকে। ওর চিরাচরিত ভাবলেশশূন্য মূর্তি। একটা চোখ শুধু বার বার বুজিয়ে ও আমাকে চোখের খেলা দেখাতে লাগল।

আমি ছদ্ম-কোপে চোখ পাকালাম।—ফ্র্যাংকি, আমি তোমার মনিব খেয়াল আছে?

বোমার মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করল। সারা ঘরে ঢুকল। মুখখানা এরই মধ্যে রাগে গনগন করছে। ওর রাগ আগেও দেখেছি এখনও দেখছি। আগে বীভৎস মনে হত, এখন মিষ্টি লাগে।

বোমার তার দিকে ঘুরল। একটা চোখ তেমনি বুঝছে আর খুলছে!

সারা এখন হাসবে না পণ। রাগত মুখ করেই বলে উঠল, অসভ্য কোথাকার!

বোমার আবার মাথা ঝাঁকিয়ে এই বিশেষণও স্বীকার করল।

সারা আরো রেগে গেল।—এখন যাও বলছি এখান থেকে!

বোমার ঠাণ্ডা মেরে গেল।—কেন, আবার তোমরা নড়ানড়ি করবে?

এবারে হাসি ঠেকানো দায়, তবু সারা সকোপে চেষ্টা করছে ঠেকাতে। বোমার বুক ফুলিয়ে সটান বেরিয়ে গেল।

সারা প্রস্তুত হয়ে এবারে আমার দিকে তাকালো। আমি অমায়িক হেসে ওর একটা হাত ধরতে গেলাম।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। মুখের মেঘ সত্যিই অকৃত্রিম।—তুমি আমাকে পেয়েছ কি?

—কেন, আমার বউ।

রাগে ভেংচি কেটে উঠল।—তোমার বউ! বেশি রাগ হলে ও বরাবরই ভেংচি কাটে।

—তাহলে শাশুড়ী বলব?

ঝুপ করে বসল বিছানায়।—দেখো তোমাকে একটা স্পষ্ট কথা বলে দিই। আমি ভালো মেয়ে না আমি জানি, যতদূর অসৎ চরিত্র আর খারাপ হতে হয় আমি সেই—আমাকে তুমি যে-ভাবে খুশি শাস্তি দাও, তা'বলে নিজের শরীর মাটি করে আমাকে এ-ভাবে জব্দ করতে চেষ্টা করলে আমি বরদাস্ত করব না। একদিন তোমার ওই দেরাজের রিভলভার বার করে নিজের খুলি উড়িয়ে দেব বলে দিলাম।

আবার দু'চোখ ভরে দেখছি ওকে। ভাবতে অবাক লাগে একটা মানুষের মধ্যে কত রকমের মানুষ থাকতে পারে, একটা মেয়ের মধ্যে কত রকমের মেয়ে থাকতে পারে। জীবনভোর কি আমি শুধু এই আবিষ্কারই করে যাব?...আর এ কি সেই সারা, যে আমার তাড়া রক্তে ওর সর্ব অঙ্গ ভিজিয়ে নিতে পারলে পিশাচীর মতো খিল খিল করে হেসে রডনির বুকের ওপর গড়াগড়ি খেতে পারত।

...সেই সারাই বটে। কিন্তু সে নয়। ওই খোলশে আর একজন। অদ্ভুত ভালো লাগছে। কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করছে। তা করতে গেলেই ফোঁস করে উঠবে। ঘটা করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলাম, বাঁচা গেল, নিজের মাথার খুলি ওড়াবে, আমার নয়!

—ইয়ার্কি পেয়েছ? ডাক্তার বলে গেল না বিপদ হতেও পারত?

খুনসুটি করার লোভ দমন করা গেল না। এক হাতে ওকে ধরে রেখে বললাম, বিপদ তো কতরকম ভাবেই হতে পারে...আচ্ছা ধর, বিপদ যদি একদিন হয়েই বসে, তুমি কি করবে?

রাগে মুখ লাল তক্ষুনি। ভেংচি কেটে বলে উঠল, কি করব তুমি জান না? আমাকে তুমি চেন না? আর কাউকে না পাই তো তোমার ওই অগাধ টাকাকড়ি নিয়ে হয়তো আধবুড়ো বোমারের গলাতেই ঝুলে পড়ব। বুঝলে?

বারান্দার দরজার আড়াল থেকে বোমারের গলাখানা শুধু বেরিয়ে এলো। তার উক্তি কানে আসতে দু'জনেই চমকে তাকালাম সেদিকে। চোখ পিট পিট করে ও বলছে, বড় লোভনীয়, গলা টিপে দেব ব্ল্যাকিটাকে খতম করে?

মুখের ওপরেই বোমার এক-এক সময় আমাকে ব্ল্যাকি বলে বসে। আমি মনিব, আমি ওদের শতখানেক মেয়ে-পুরুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—তবু। আর সত্যি কথা বলতে কি, শুনলে সারা এখন রেগে যায়, কিন্তু আমার ভালো লাগে। আগেও লাগত।

নাটকের এই ছন্দপতনে সারাও না হেসে পারল না। বোমারের মুখ সরে গেল। জুতোর জোরে জোরে শব্দ করে বুঝিয়ে দিল এতক্ষণে সত্যিই চলে যাচ্ছে।

আমার বুকের ওপর ঝুঁকে এলো সারা। বুকে থুতনি ঘষতে ঘষতে বলল, তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না, তোমার সব মিথ্যে, সব ছল। শরীর খারাপ হয়েছিল টের পেয়েও বেরুবার আগে আমাকে কেন বলনি? কেন, কেন...

আমি ওর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। এ কোন জাতের সুখ যে আমার মতো মানুষের চোখের কোণ, সিরসির করতে পারে! বিড় বিড় করে বললাম, সত্যি বলছি এতটা হবে বুঝিনি—যন্ত্রণার সময় আমি তো কেবল তোমাকেই খুঁজছিলাম, এক-একটা মিনিট এক-এক ঘণ্টা মনে হচ্ছিল।

ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল বার দুই টের পেলাম। আবেগ, হয়তো বা সেই সঙ্গে চোখের জলও সামলাবার তাগিদে ও আমার বুকে জোরে জোরে মুখ আর থুতনি ঘষতে লাগল।

শোয়া অবস্থাতেই আমি ঘাড় নিচু করে ওকে দেখতে চেষ্টা করছি। আমার নাকের ডগা ওর মাথায় ঠেকছে। চুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি, আর জামার ওপর দিয়ে নরম বুকের উষ্ণ তাপ। অনেক—অনেক কালের উপোসী ফাঁপা শরীরটা যেন আমার ভরাট হয়ে উঠছে। ইদানীং অনেক পাচ্ছি, তবু তৃষ্ণার শেষ নেই। মনে হয় এই প্রথম পেলাম,প্রথম ভরাট হলাম।

দেখছি, হঠাৎ কি মনে হতে একটু জোরেই হেসে ফেলে নিজের সুখে বাদ সাধলাম?

ও চমকে অর্ধেকটা উঠে বসল, আমার দু'দিকে দু'হাত।—কি?

—বোমারের সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল।

—কি কথা?

—ওই যে বলেছিল, কালির ডোবায় একখান তাজা হলদে গোলাপ সাঁতার কাটছে।

দিন দশেক আগের কথা, বুকের ওপর শুয়ে সারার আমাকে আদর করার ঝোঁক চেপেছিল। দৃশ্যটা জানালা ফাঁক করে বোমার দেখেছিল, তার পরে ওই মন্তব্য করেছিল।

সারার চোখ দুটো চকচকে, মুখে হাসি ভাঙল। বলে উঠল, বোমারের মুখ আমি একদিন ভোঁতা করে দেব বলে দিলাম, আস্কারা দিয়ে তুমি ওকে মাথায় তুলেছ। তোমাকে ব্ল্যাকি বলবে, কালির ডোবা বলবে—এ-সব কি? ও নিজে কোন্ আকাশের চাঁদখানা?

আমি হাসছি। সেই ফাঁকে ওকে আরো ভালো করে দেখছি। আর সেই পুরনো কথাই ভাবছি। আমি আমার বাঘ-সিংহগুলোকে চিনি, জানি; নড়া-চড়া দেখলে ভাব-গতিক বুঝতে পারি, চোখের দিকে তাকালে ওদের মতলব বুঝতে পারি।...কিন্তু মানুষ? সব থেকে বেশি চেনা আর জানা হয়ে গেছে ধরে নিয়ে যাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমি জন্তু-জানোয়ারদের দিকে তাকিয়েছি, যাদের কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আমি ওদের দিকে সরে এসেছি, ঢের-ঢের বেশি সৎ আর অকৃত্রিম ভেবেছি—তাই কি আমার চেনা-জানার শেষ কথা? তাহলে ইদানীং ভিতরটা আমার এমন ভর-ভরতি কেন? এত কাল তো এমন হয়নি!

মানুষ চেনা কি সত্যি শেষ হয়েছে? বিশেষ করে এই মেয়েমানুষ!

দুই

আমি টনি কার্টার, বয়েস ছত্রিশ।

আর ওই আমার স্ত্রী সারা কার্টার। বয়েস তেত্রিশ। ফ্র্যাংকি বোমার বলে, সতেরোয় যেমন দেখেছি তেইশে তার থেকে ঢের ভালো দেখছি। আর তেত্রিশে? বোলো না, বুকের ভেতরটা একেবারে জ্বলে গেল বন্ধু, জ্বলে গেল, দেখলে আমার এই সাতচল্লিশ বছরের শরীরটাতে সাতাশের যৌবন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তোমার বউয়ের যত দোষই থাক, বয়েস ধরে রাখার জাদু জানে।

আমার বউ।...আমার স্ত্রী। হ্যাঁ, আমি যখন টনি কার্টার অর ও যখন সারা কার্টার, আমারই বউ, আমারই স্ত্রী বইকি। ঠিক সতেরো বছর বয়সে সারা জেনট্রি সারা কার্টার হয়েছে। ষোল বছর আগের কথা। আমার বয়েস যখন মাত্র কুড়ি, যখন দূর থেকে আমি শুধু ওকে দেখতাম চেয়ে চেয়ে—দেখার বাইরে আর কোনো সম্ভাবনার জাল বুনতেও সাহসে কুলাতো না।

যা পাবার কথা নয় তাই পেয়েছি। আবার পাবার পর যা হবার কথা নয় তাই হয়েছে। বিশ্বাস করবেন, ছ'মাস আগে পর্যন্ত ষোল বছরের স্ত্রীকে ষোল দিনের জন্যও আমি কাছে পাইনি? দৈবাৎ পশুবলে কখনো ওর শরীরটার ওপর দখল নিয়েছি হয়তো, কিন্তু তার বদলে ও আমাকে ঘৃণার আগুনে দগ্ধেছে। শুরু থেকে ও আমাকে একটা পশু ছাড়া আর কিছু ভাবেনি। ছ'মাস আগে পর্যন্ত ভাবেনি। অবাস্তব, আমার জীবনের যা-কিছু সব অবাস্তব। বিয়ের পরের এই ষোলটা বছরও মোটামুটি আমরা একসঙ্গে ঘুরেছি, এক জায়গায় প্রায় পাশাপাশি কাটিয়েছি—কিন্তু ভিতরের এতবড় ছাড়াছাড়ি সত্ত্বেও বাইরে ছাড়াছাড়ি হয়নি—আনুষ্ঠানিক ছাড়াছাড়ি তো হয়নি। আশ্চর্য, এই ষোলটা বছর ধরেই দু'জনে আমরা দু'জনের বিরুদ্ধে ছুরি শানিয়েছি—যে ছুরি শুধু নির্মমতম সংহার ছাড়া আর কিছু জানে না—কিচ্ছু জানে না।

সারা কেন আমাকে ছেড়ে যায়নি তার অনেক কারণ থাকতে পারে। কয়েকটা কারণ স্বতঃসিদ্ধ বলে ধারণা আমার। প্রথম আর প্রধান কারণ প্রতিহিংসা। এই এতবড় প্রতিষ্ঠান, এত টাকা-কড়ি, সব-কিছুর একচ্ছত্র মালিক ওর হবার কথা। আর আমার সেখানে ক্রীতদাসের ভূমিকা। এক পাগলের পাল্লায় পড়ে সব খোয়াতে হয়েছে ওকে। (...সারার বাবা মারভিন জেনট্রি কি পাগল ছিল? কি জানি।) আর এই ক্রীতদাসের ললাটে রাজতিলকের ছাপ কি জানি।) আর এই ক্রীতদাসের ললাটে রাজতিলকের ছাপ পড়েছে। সেই সঙ্গে বন্দুকের নল বুকে ঠেকিয়ে রাজকন্যাকেও তার হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে। (তবু সারার বাবা মারভিন জেনট্রি লোকটা কি পাগল ছিল? আমি জানি না। ...উন্মত্ত পাগলামির শেষ ফসল কি এ-রকম হতে পারে?) বলির পশুর মতো কাঁপতে কাঁপতে সতেরো বছরের সারা জেনট্রি রাতারাতি সারা কার্টার হয়ে গেছে। কিন্তু ফ্র্যাংকি যা-ই বলুক, বয়েসটা তার সত্যিই এক জায়গায় আটকে নেই। বাপের প্রতি তার অপরিসীম ঘৃণা আর বিদ্বেষের পরিণাম আমি—সারা কার্টারের জীবনে আমি টনি কার্টার। আমাকে ছেড়ে ও কি পাবে? বরং আমাকে সরাতে পারলে আবার সব পাবে, সব হবে। মিস্টার কার্টার মুছে গেলে তার সব বিত্ত তো মিসেস কার্টারেরই প্রাপ্য।...মুছে যেতাম, ও মুছেই দিত আমাকে যদি না সেই গোড়া থেকেই সতর্ক সচেতন থাকতুম আমি, যদি না কুকুরের মতই আগে থাকতে বিপদের গন্ধ পেতাম। তাছাড়া, আমাকে ছেড়ে গেলে ছেলেবেলা থেকে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবার ও উচ্ছল রোমাঞ্চকর জীবনে অভ্যস্ত, আর যে অপরিমিত সচ্ছলতার মধ্যে অভ্যস্ত, আমার কাছ থেকে সরে গেলে সেই ঔজ্জ্বল্যে মরচে ধরবে।

দ্বিতীয় কারণ, রডনি। প্রতিষ্ঠানের এস্ স্টার রডনি ওয়েনস্টন। আটটা বাঘ আর আটটা সিংহকে চাবুক হাতে না নিয়েই একসঙ্গে লপটা-লপটি খাওয়ায়, এর কাঁধে ওকে চড়ায়, ওর কাঁধে একে। বাঘ আর সিংহকে একসঙ্গে গলাগলি করে শুইয়ে রাখে। আরো এত সব কাণ্ড করে যে দেখে দর্শকদের মধ্যে ত্রাস আর রোমাঞ্চ মেশানো হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সবশেষে আবার এই রডনিই তিরিশ গজ মোটর-জাম্পিং দেখিয়ে দর্শকের স্নায়ু ঠোঁটের ডগায় এনে ছাড়ে।

এমন গুণী বিরল।

সুপুরুষও বটে। অন্তত আমার পাশে তো বটেই। মর্কটের পাশে মরকত মণি।

তার মতো গুণীকে পৃথিবীর যে-কোনো প্রতিষ্ঠান আদর করে ডেকে নেবে—অবশ্য ও যদি যায়। যায়নি। যাবে না। এখানেও অঢেল টাকা পায়, কিন্তু সে-জন্যে নয়। যাবে না, সারা যেতে রাজী নয় বলে। আর, যাবেই বা কেন, আমি টনি কার্টার সরে গেলে যেখানে মালিক হবে আর মালিকানীও পাবে—সেখান থেকে চলে যায় কোন মূর্খ? মালিক না হয় দু'দিন পরেই হবে, মালিকানী তো অধরা নয়। আমার যতদূর খবর, সব তুচ্ছ করে প্রেমে হাবুডুবু সারা কার্টার এক এক সময় রডনিকে নিয়ে দূরে সরে যেতে চাইলেও—সে-ই বুঝিয়ে সুজিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করেছে। সবুরে মেওয়া ফলে বুঝিয়েছে। হিংস্র বাঘিনীর বুকেও যখন যৌবন জ্বলে তখন সে দিশেহারা। সারার বুকেও সেই যৌবন জ্বলেই আছে। আমার প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসায় সে-যৌবন আরো অনির্বাণ।

...কিন্তু সারা ছেড়ে না গেলেও এত জেনে এত বুঝেও আমি সারাকে জীবন থেকে নির্মূল করে দিইনি কেন? দেব দেব করে ষোল বছর কাটিয়ে দিলাম কি করে? আইনের রাস্তায় যেতে পারতুম। না হয় কিছু খরচা হত, লাখ খানেক টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হত। অনেক আছে। কিন্তু তাতে যে ক্ষতি

আমার হয়ে গেছে তা পূরণ হত না। নির্মম প্রতিশোধের ছুরি অমিও শানাচ্ছিলাম। ওর ওই নরম বুকের তলার উষ্ণ তাজা রক্তের স্বাদ নেবার প্রতিক্ষায় ছিলাম। আমি তো জানোয়ার (সামনে আড়ালে সারা সর্বদাই আমাকে ওই বলত)—তাই তাজা রক্ত বড় প্রিয়। বাড়ুক, বেড়ে বেড়ে আশা আর আনন্দের প্রায় চূড়ায় উঠুক; তারপর যম দেখবে, যমের অট্টহাসি শুনবে। সব জেনে সব বুঝেও রডনিকে আমি সরিয়ে দিইনি। কেন দেব? প্রথম কথা, আমি ব্যবসায়ী না? ওর দাম জানি না? কদর বুঝি না? দ্বিতীয় কথা, কার জন্যে তাড়াব ওকে, সরাব ওকে? যার জন্য, তার অস্তিত্ব তো হিসেবের খাতায় জমাই পড়ে গেছে। তার থেকে দুজনেই ওরা থাকুক, বাড়ুক, আশা আর আনন্দের চূড়ায় উঠুক।

না, রডনি আমার হিসেবের বাইরে। আমার সমস্ত লক্ষ্য সারা। রডনি উপলক্ষ মাত্র। ওই গোছের পরস্ত্রী দখলে এলে সকলেরই মুণ্ডু ঘোরে। রডনির দোষ দেব কেন? নিজেকে আমি অবিবেচক ভাবি না। আমার জীবনে শুধু একটিই লক্ষ্য, একটিই প্রতীক্ষা। লক্ষ্যের অস্তিত্ব ঘোচানোর প্রতীক্ষা।

...কিন্তু লক্ষ্যের দিকে চেয়ে চেয়ে ষোলটা বছর কেটে গেল। ষোল বছরেও প্রতীক্ষার অবসান হল না? কেন...? সুযোগ মেলেনি? যেমন চেয়েছিলাম তেমন সুযোগ মেলেনি? সে-কি হতে পারে? একদিন দুদিন পাঁচ দিন নয়, এক বছর দু'বছর পাঁচ বছর নয়—চাইলে ষোল বছরেও সুযোগ মিলবে না এ কি হতে পারে? নিজেকে ধোঁকা দিতাম, চলুক না, শেষ করলেই তো সব শেষ—অত তাড়া কিসের?—আজ বুঝতে পারছি ধোঁকাই দিতাম নিজেকে। এখন বুঝতে পারি কেন সুযোগ আসেনি, কেন একে একে ষোলটা বছর কেটে গেছে। আসলে ওই মেয়েকে আমি ভালোবাসি। ব্যভিচারিণী হবার আগেও, পরেও। ওই মেয়ের অস্তিত্ব আমার অণুতে অণুতে ছড়িয়ে আছে। ওর সেই খামখেয়ালী নিষ্ঠুর বাবা যে-দিন ওকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে—সেইদিন থেকে।...হয়তো বা তার আগে থেকেও। ও যত আমাকে ঘৃণা করেছে, বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে যত দূরে সরে যেতে চেয়েছে, আমার আকর্ষণ ততো বেড়েছে। ততো বেশি ওর জন্যে পাগল হয়েছি আমি। ওর ঘৃণায় বিদ্বেষে ষড়যন্ত্রে আমার এই আকর্ষণ এই ভালোবাসাই হিংসার আকারে পরিপুষ্ট হয়েছে। হিংসার জাল ফেলে ওকে আমার সেই অস্তিত্বের মধ্যেই ধরে রেখেছি। ও সত্যটা আগে আমি অনুভব করিনি, কিন্তু অন্তরাত্মা করেছিল বোধহয়। সে জানত, ওর বিনাশ নিজের বিনাশের সামিল।

...তাই ষোল বছরেও সময় হয়নি—সুযোগ মেলেনি।

দুনিয়ার মানুষ বলবে কুৎসিত টনি কার্টারের স্ত্রী সারা কার্টার ব্যভিচারিণী। দুনিয়ার মানুষ কেন, সারা নিজেই তো বলে। শুধু বলে না, এক-এক সময় নিজেকে সংহার করার খুন ওর চাপে মাথায়। (এখন কিছুটা কমেছে।) ওর ভয়ে আমার রিভলভার এখন কোথায় রেখেছি সে এক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। বোমার অবশ্য সান্ত্বনা দেয়, ওই গোছের অঘটন যদি ঘটে এর পরেও, তাহলে আমাকে তুমি বাঘের খাঁচায় ফেলে দিও।

তবু আমার মনে ভয়। দুনিয়ার মানুষ ওকে ব্যভিচারিণী বলে বলুক। আমি কেয়ার করি না। আমি বলব, ব্যভিচারিণী ছিল। যা ছিল সেটা সত্য। বিকৃত সত্য। আর, আজকের এই রূপটাও সত্য। ততোধিক সত্য। নিখাদ সত্য।

...সেদিনের অসুস্থ শয্যায় ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হঠাৎ যদি বিপদই হয়ে বসে কিছু, ও কি করবে।...কি করবে আমার জানাই আছে। আগে হলে বিকৃত আনন্দে জ্বলে উঠত, ব্যভিচারী আনন্দের হাট বসিয়ে দিত। এখনো জ্বলবে। সব-কিছু নিয়েই বিচ্ছিন্ন তপস্বীর মতো জ্বলবে। কারো বিরুদ্ধে এতটুকু অভিযোগ থাকবে না। প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছে ভাববে।

আমার দুটো প্রাপ্তিযোগ। এতবড় এক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, আর সারা। সারা আগে, মালিকানা পরে। কিন্তু তারও আগে অনেক কথা।

...ছেলেবেলা থেকেই নিজেকে বঞ্চিত-অভিশপ্ত ভাবতাম আমি। নাক চোখা, চোখ উজ্জ্বল, গায়ের চামড়া বাদ দিলে মুখও কুৎসিত বলবে না কেউ। কিন্তু ভেনাসের অঙ্গে আলকাতরা মাখালে ক'জন ফিরে তাকাবে তার দিকে?

গায়ের রংই সব খেয়েছে। আবলুশ কাঠের মতো ঝকঝকে কালো। নিজেকে অভিশপ্ত ভাবার সেটাই কারণ নয়। আয়নার সামনে দাঁড়ালে এরই মধ্যে একটা রূপ আবিষ্কার করতে খুব কষ্ট হত না। এই ঝকঝকে রংয়েরও এক ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে বই কি।

আমার বাবা কে, মা কে, আমি জানি না। আমি কোনো বাবা-মায়ের বৈধ সন্তান কিনা তাও জানি না। থাকতাম উরুগুয়ের এক জঙ্গলের ধারে গীর্জার আবাসে। আর জ্ঞান হতে দেখেছি গোমেজকে। গীর্জা দেখাশুনার ভার তার। সে-ও আমার মতই পলিশ-করা কালো-কুলো। বিশ্বাস, ও-ই আমার বাবা। যণ্ডামার্কা চেহারা। চড়-চাপড় যখন কষাতো, চোখে লাল নীল হলদে সবুজের মিছিল দেখতাম। তার শোবার ঘরের দেয়ালে এক রমণীর ছবি টাঙানো—পোশাক-আসাক আমাদেরই মেয়ের মতো, কিন্তু মুখের ছাঁদ-ছিরি অন্যরকম। ছবিতে গায়ের রং বোঝা যায় না, কিন্তু মুখখানা বেশ সুশ্রী। আমার কেমন মনে হত ও-ই আমার মা। বছর দশ-এগারো বয়সে গোমেজকে একদিন জিজ্ঞাসা করে বলেছিলাম, ও কি আমার মা?

জবাবটা সে গালের ওপর বসিয়ে দিয়েছিল: মাথা ঘুরে তিন হাত দূরে গিয়ে পড়েছিলাম। পরে শুনেছি, রমণীটি প্রাচ্যদেশের কোনো এক নাম-করা নেটিভ পাদ্রীর বউ। বেড়াতে এসে এখানেই থেকে গেছল দুজনে। নেটিভ পাদ্রীটি নাকি মহান পুরুষ ছিল, গৃহী হলেও ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছিল। তার টানে বহুদূর থেকেও নাকি এই গীর্জায় লোক আসত তখন।

একবার চড় খাবার পর আর কোন বে-চাল জিজ্ঞাসা আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। কিন্তু মনে সেটা অষ্টপ্রহর দাগ কাটতই। চড় খাবার পরে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল, ও-ই আমার মা। বাবা কে সে তো আগেই ধরে নিয়েছি। বয়েস একটু বাড়তে চড় খাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করেছি। অন্যের চোখে ভগবানে সমর্পিত নেটিভ পাদ্রীর বউও মহীয়সী হবে বইকি। গোমেজ সেখানে গীর্জারক্ষক। তাদের কেলেঙ্কারির ফল আমি, এ-কথা রাষ্ট্র হলে বেচারা তো ধনে-প্রাণে বধ হবে। সকলে জানে, গোমেজ আমাকে দূরের কোনো এক জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছে। মনে মনে কি জানে আমি জানি না।

আমার অনুমান যদি সত্যিও হয়, তাহলেও নিজেকে আমি ওদের ভালোবাসার সন্তান বলে ভাবতে পারতুম না। ভালোবাসার সন্তান হলে গোমেজ এক-এক সময় আমার ওপর এত নিষ্ঠুর হয় কি করে?...অবশ্য ওকে ছেড়ে আসার আগে আমার সে-ভুল ভেঙেছিল। আমার ধারণা ও আমাকে লোক দেখানো শাসন করত, যাতে না কারো কোনোরকম সন্দেহ হয় সেই জন্য। অবশ্য এমনিতেই মানুষটা অবুঝ রকমের রগচটা।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের মনে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতাম। জঙ্গলের পশু-পাখির পিছনে ছোটাছুটি করে দুরন্তপনা করতাম। গোমেজকে ফাঁকি দিতে পারলে সকালেও ঘরের খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়তাম। ফিরলে ঠেঙানি। সকালে সে আমাকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে তখনকার স্বজাতীয় পাদ্রীর কাছে পড়তে নিয়ে যেত—আবার ঠেঙাতে ঠেঙাতে নিয়ে আসত। পাদ্রী একবার বললেই হল আমার পড়াশুনায় মন নেই। বলতই। কারণ, বই দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসত।

...তখন বয়েস আমার তেরো কি চৌদ্দ। শুনলাম শহরে মস্ত এক সার্কাস পার্টি এসেছে বাইরে থেকে। চমকপ্রদ সব কসরৎ দেখাচ্ছে। তাদের সঙ্গে হাতি ঘোড়া বাঘ সিংহ কত কি আছে। শুনেই ছ'মাইল রাস্তা হেঁটে মেরে দিলাম। যা দেখলাম চক্ষু ছানাবড়া আমার। বিশাল চত্বর জুড়ে তাঁবু পড়েছে। খাঁচায় সত্যিই বাঘ ভালুক সিংহ শিম্পাঞ্জি আরো কত কি। দলে কত রকমের লোক, কত রকমের মেয়ে। তারা নাকি দড়ির খেলা দেখায়, ছোরার খেলা দেখায়—চারতলা সমান উঁচু তারের ওপর নাচে, সাইকেল চলায়।

—এই ব্ল্যাকি। ইধার আও।

ঘুরে তাকিয়ে আমি হতভম্ব। বছর চব্বিশের একটা জোয়ান লোক কুতকুত করে আমার দিকেই চেয়ে আছে, আমাকেই ডাকছে।...সাহস তো কম নয়, দেব নাকি একটা পাথর ছুঁড়ে মাথার খুলি উড়িয়ে। তারপর মনে হল ঠিক এখানকার লোকের মতো মুখের আদল নয় লোকটার।...সার্কাস পার্টির কেউ নয় তো?

এগিয়ে গেলাম। আমার হাত ধরে সামনে টেনে লোকটা খুব গম্ভীর মুখে আমার বাহুর চামড়ার ওপর বার কয়েক আঙুল ঘষল। অর্থাৎ আমার গায়ের রং খাঁটি কিনা দেখল। আমার হাত নিশপিশ করতে লাগল। এই গোছের ব্যবহারের জবাবে নাকের ওপর ধাঁ করে এক-ঘা বসিয়ে আমি চোখের নিমেষে হাওয়া হয়ে যেতে পারি। ও হাজার চেষ্টা করলেও ছুটে আমার টিকির নাগাল পাবে না...কিন্তু লোকটা কে আগে দেখাই যাক না।

—তোমার নাম কি?

—বাবা। চোখ পিট পিট করে জবাব দিল। লোকটার কানের নীচ অবধি দু'দিকে মোটা জুলফি, থুতনির নীচে ছুঁচলো এক-চাপ দাড়ি। কিন্তু গোঁপ পরিষ্কার করে কামনো।

—বাবা আবার কারো নাম হয় নাকি?

—ডাকলেই হয়। বাবা ডাকলেই বাবা, তুই ডাক, তোরও বাবা হয়ে যাব।

খুব ছেলেবেলা থেকে আমার মাথায় অনেক রকমের কু-বুদ্ধি খেলত। অন্যদিকে আমার জীবনে বাপ-মায়ের অস্তিত্ব নেই বলেই হয়তো তলায় তলায় একটা চাপা ক্ষোভ ছিল। বললাম, আমি বাবা ডাকলে আমার মা তোমাকে কি ডাকবে?

মুখের দিকে চেয়ে পিট পিট করল খানিক। বেজায় গম্ভীর অথচ রগড়ের লোক বোঝাই যাচ্ছে। জবাব দিল, তোর যে রকম পাকা রং, তোর মা-ও বাবা ডাকলেই ভালো হয়।

লোকটা কে আগে বুঝিনি, তারপর আমি কেমন ছেলে, তা বুঝিয়ে দেব।

—তুমি এই সার্কাসের লোক?

মাথা নাড়ল। সার্কাসেরই লোক।

আমি আশান্বিত।—কি করো?

—বাবাগিরি।

—এই সার্কাসের মালিক?

—না, মালিক আমার বাবার বাবা, ঠাকুদ্দার বাবা। তোর অত খোঁজে কাজ কি রে ছোঁড়া?

—কাজ আছে। তার সঙ্গে দেখা করব। তুমি আমার সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার করেছ তাকে বলব। তুমি আমার গায়ের রং নিয়ে তামাশা করেছ।

—ও-ব্বা-বা! কি নাম তোর?

—টনি। ভালো চাও তো আমাকে সার্কাস দেখাবার ব্যবস্থা করো, নইলে একশো ছেলে জুটিয়ে তোমার বাবার বাবা ঠাকুদ্দার কাছে ঠিক নালিশ করব।

বড় বড় চোখ দুটো ঘটা করে কপালে তুলল একবার।—তুই-ই যে দেখি আমার বাবা রে, অ্যাঁ? পকেটে পয়সা নেই বুঝি?

মাথা নাড়লাম। নেই।

—আর সার্কাস দেখার শখ আছে?

মাথা নাড়লাম। আছে।

—সেই জন্যে মাথায় শয়তানি গিসগিস করছে?

আমি মাথা নাড়লাম। করছে।

—আচ্ছা বাবা, রাত্তিরের শো-তে আসিস, গেটে বলিস ফ্র্যাংকি বোমারের কাছে যাব, তাহলেই তোকে জামাই-আদরে ভিতরে নিয়ে যাবে।

উত্তেজনা বুকে চেপে রাত্তিরের শো পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। শো দেখার পর চতুর্গুণ রোমাঞ্চ। মানুষ এতরকমের কসরৎও দেখাতে পারে ধারণা করা যায় না। ওরা যেন সব স্বপ্নের দেশের মেয়ে-পুরুষ। যা করতে চায় তাই করতে পারে। কসরৎ দেখে মুগ্ধ, ওদিকে গুরুগম্ভীর ফ্র্যাংকি বোমার সং সেজে সারাক্ষণ যা করে বেড়াচ্ছে—সক্কলে হেসে কুটিপাটি। ও জোকার। আরো তিনচারটে জোকার আছে, কিন্তু ওর কাছে কেউ লাগে না। একের পর এক ভণ্ডুল বাধিয়েই চলেছে। শেষে একটা মেয়ের চারদিকে গা-ঘেঁষে বোর্ডে ছোরা বেঁধানোর পর সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেই কোথা থেকে

নতুন পোশাকে ছুটে এসে বোর্ডে দাঁড়াল। খেলা যে দেখাচ্ছিল সে ধাঁ করে একটা ছোরা ছুঁড়ে মারতেই বোমারের মাথা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়। সকলে বিষম চমকে উঠল, বিকট একটা আর্তনাদ করে বোমার মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখা গেল একটা নকল মাথা বোর্ডে বিঁধে আছে, আর অক্ষত বোমার মাটিতে গড়াগাড়ি খাচ্ছে।

অনেক রাতে ঘরে ফিরতেই গোমেজের হাতে ঠেঙানি। ওটুকু প্রাপ্য হিসেবেই ধরে নিয়েছি। সমস্ত রাত ধরে কেবল সার্কাসেরই স্বপ্ন। সকালে ঘুম ভাঙার পরেও। কেবলই মনে হতে লাগল, ওই অতবড় দলটা সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে...আমিও যদি ওদের সঙ্গে একজন হতাম!

শুধু একজন কেন, একদিন এই দলের নায়ক হব বলেই হয়তো চিন্তাটা নেশার মতো পেয়ে বসেছিল আমাকে। পর পর দু'তিন দিন দুপুরে বোমারের সঙ্গে দেখা করেছি। শুনেছি, যেখানেই ওরা যায়, মজুর আর চাকরের কাজ করার জন্য সাময়িকভাবে কিছু স্থানীয় লোক নেওয়া হয়। আমি বোমারকে ধরে পড়লাম, যে-ক'দিন তারা আছে এখানে আমাকেও একটা কাজ দেওয়া হোক।

বোমার আমার একখানা হাত বগলদাবা করে নিয়ে চলল কোথায়। খানিকটা গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়াল। গজ তিরিশেক দূরের ছোট্ট একটি শৌখিন তাঁবু দেখিয়ে বলল, ওখানে আমাদের বাবার বাবা ঠাকুদ্দার বাবা আছে—তাকে গিয়ে বল, মেজাজে থাকলে কাজ পেয়ে যেতে পারিস।

বোমার সেখান থেকে কেটে পড়ল। পায়ে পায়ে তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে রুক্ষ চেহারার একটা মানুষ দিনে-দুপুরেই বসে বসে মদ গিলছে। দেখে একটুও ভরসা হল না। তবু ঈশ্বরের নাম নিয়ে ঢুকে পড়লাম। কোণের দিকের ক্যাম্প-খাটে বছর দশেকের একটা ফুটফুটে মেয়ে বসে আছে। এই লোকটারই মেয়ে হবে। আমাকে দেখেই ভয়ে ভয়ে বাপের দিকে তাকাল। তারপর ইশারায় আমাকে চলে যেতে বলল।

আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। চাপা হুঙ্কার শুনে সচকিত।

—কি চাই?

—কাজ।

লোকটা ভুরু কুঁচকে দেখল খানিক। তারপর টেবিল থেকে মদের বোতলটা নিয়ে ছুঁড়ে মারার জন্য মাথার ওপর তুলল।

আমি ছুট।

শুনে বোমার মন্তব্য করল, তুই একটা গাধা, দাঁড়িয়ে মারটা খেতে পারলে কাজ পেতিস—আমরাও মার খাই, তারপর কিছু না কিছু পাই।

নিজের নির্বুদ্ধিতায় মনটা খারাপ হয়ে গেল, আবার ওই মালিকের ওপর বেজায় রাগও হল। যাই হোক, কাজের আশায় জলাঞ্জলি। একদিন পরের কথা। দিনটা মেঘলা ছিল। পকেটে গোটা তিনেক আপেল আর বড় গুলতিটা নিয়ে (ওটাই সব থেকে প্রিয় বস্তু আমার তখন) আমি সামনের জঙ্গলে ঢুকলাম। দুপুরে ওটাই আমার অবকাশ যাপনের জায়গা।—একটা বড় গাছ বেছে নিয়ে উঁচু ডালে উঠে বসলাম। আরাম করে ঠেস দেবার মতো পিছনেও একটা মোটা ডাল আছে।

ওখানে বসার উদ্দেশ্য বুনো মুরগি মারা। ওগুলোর সঙ্গে ছোটাছুটি করে পারা যায় না। মানুষের সাড়া পেলেই কঁ-কঁ শব্দে ছুটে ঝোপের মধ্যে সেঁধোয়।

বসে আপেল চিবুচ্ছি। হঠাৎ শরীরের সমস্ত স্নায়ু টান-টান আমার। বন্দুক হাতে চারদিক দেখতে দেখতে যে-লোকটা আসছে তাকে অমি চিনি সার্কাস পার্টির মালিক মারভিন জেনট্রি। তক্ষুনি গুলতি বাগিয়ে ধরলাম আমি। ওর মাথায় বড়সড় একটা সুপুরির দানা গজিয়ে দিতে পারলে সেদিনের অপমানের শোধবোধ হবে।

লোকটা হঠাৎ কি যেন দেখল। বন্দুক বাগিয়ে একদিকে চোখ রেখে পায়ে পায়ে এগোতে লাগল।...হাত পঁচিশেক দূরে মস্ত সাপ একটা, কুলোর মতো ফণা তুলে শত্রু দেখছে।

মারভিন জেনট্রি বন্দুকের নিশানা করার আগেই সাঁ করে হাতের গুলতি ছুটল আমার। পাথরের টুকরোটা রীতিমতো জোরে ঠক করে ফণার ওপর লাগল। ফণাটা মাটিতে আছড়ে পড়ল। চকিতে

পাঁচ সাত হাত সরে গিয়ে সাহেব বিমূঢ় মুখে এদিকে-ওদিকে তাকাল একবার। ঘা-খাওয়া ক্রুদ্ধ সাপ এবারে হাত পনেরো দূর থেকে ফোঁস করে মাথা তুলল আবার। সাহেবের গুলির আগে আবার আমার গুলতি ছুটল। পাথরের ঠুকরো এবারে আরো জোরে ফণার ওপর ঘা বসিয়েছে। এবারেও সেই একই প্রহসন। ওটা ফণা নামাতেই বিমূঢ় সাহেব তিন লাফে আমার গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল। একটু বাদেই সে আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সাপটা সেখানে এসে মাথা তুলল। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের গুলি ছুটল।

ওটাতে খতম করে সে ঘুরে চারদিক নিরীক্ষণ করল, তারপর ওপরের দিকে। অমি ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু লোকটা করতে যাচ্ছে কি, বন্দুকের নলটা আমার দিকে উঁচিয়ে ধরল কেন? ভয়ে ওই উঁচু ডাল থেকেই মাটিতে লাফিয়ে পড়লাম আমি। বিলক্ষণ চোট পেলাম। উঠে দাঁড়াতে পারলাম না। বন্দুকের নল আবার আমার দিকে ঘুরল। ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমি দু'চোখ বুজে ফেললাম। মিনিট খানেক কেটে গেল। কোনরকম অঘটন ঘটল না দেখে ভয়ে ভয়ে তাকালাম আবার। বন্দুক নামিয়েছে। পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে সাহেব আমাকে দেখছে। উঠে চোঁ-চা দৌড় দেবার ইচ্ছা। কিন্তু দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের হাড়ে খচ খচ করতে লাগল। দৌড়ানো অসম্ভব। তাছাড়া লোকটার খর চোখের চাউনির মধ্যেও কি একটা বিশেষত্ব আছে। লোককে বশ বা অবশ করার একটা শক্তি আছে যেন ওই চোখে।

আরো একটু এগিয়ে এলো।—সাপের গায়ে গুলতির পাথর মেরে আমাকে বিপদে ফেলেছিলি কেন?

ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ বিপদে ফেলার জন্য মারিনি।

ভদ্রলোক সরোষে চেয়ে রইল আরো খানিক।—তোকে কোথাও দেখেছি...কোথায়?

—আজ্ঞে পরশু আপনার তাঁবুতে...কাজ চাইতে গেছলাম।

—কাজ দিয়েছি?

—আজ্ঞে না।

—কি বলেছি?

—কিছু না।...টেবিল থেকে একটা বোতল ছুঁড়ে মারতে গেছলেন।

—হুঁ। কি নাম তোর?

—টনি। টনি কার্টার।

ইশারায় অনুসরণ করতে বলে মারভিন জেনট্রি ফিরে চলল। নতুন আশা আর নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আমি পিছনে চললাম। জঙ্গলের বাইরে একটা জিপ দাঁড়িয়ে। জেনট্রি বন্দুকটা পিছনে রাখল। তারপর পিছনের সীট থেকে বোতল বার করে ঢক ঢক করে খানিকটা কাঁচা মদ গলায় ঢালল। তারপর চালকের আসন নিয়ে ইশারায় আমাকে পাশে বসতে বলল।

আমার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা সেটা।

পরে বোমারের মুখে শুনেছি আমার গুলতির টিপ দেখেই খামখেয়ালী মনিবের সুনজর মিলেছে। গোমেজ আপত্তি করেনি। এখানকার স্থানীয় মজুর বা চাকরের দৈনিক নগদ তলব মেলে। করকরে নগদ টাকা পেয়ে গোমেজ খুশি। শুয়ে বসে আর বাউণ্ডুলেগিরি না করে বাড়ির অন্ন না ধ্বংসে দুটো পয়সা যদি ঘরে আনতে পারে আনুক। খুব ভোরে চলে যাই, ফিরি সেই রাত দুপুরে, অনেক দিন আবার ফিরিও না। দু'বেলার খাওয়াটা ওখান থেকেই জোটে—গোমেজ আপত্তি করবে কেন?

দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল। তল্পি-তল্পা গোটানো শুরু হল। চৌদ্দ বছরের মধ্যে এই দুটো মাসই আনন্দ কেটেছে আমার। আবার সেই একঘেয়ে জীবনের মধ্যে ফেরার কথা মনে হলেও মেজাজ বিগড়োয়। আমি যাতে এই প্রতিষ্ঠানের একজন হতে পারি, সে-চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি। টানা দু'মাস ছায়ার মতো খ্যাপা মনিবের সঙ্গে লেগে থেকেছি, মুখের হুকুম খসার আগেই তা পালন করেছি। গা-হাত-পা টিপে দিয়ে তোয়াজ তোষামোদ করেছি। অনেক বাড়তি খেটেছি। সেই সঙ্গে পাকা খেলোয়াড়দেরও মন জুগিয়ে চলেছি। যদি তারা কেউ আমার জন্যে মনিবের কাছে একটু আধটু সুপারিশ করে।

কপাল ঠুকে নিজেই শেষে মনিবের কাছে আবেদন পেশ করেছি। মাইনেপত্র দিন বা না দিন আমি তার দলে থাকতে চাই, দলের একজন হতে চাই।

আমার দিকে চেয়ে জেনট্রি ভাবল একটু।—এখানে তোর কে আছে?

মাথা নেড়ে জানালাম, কেউ না।

—বাবা মা কেউ না?

আবার মাথা নাড়ালাম। কেউ না।

—এখানে থাকিস কোথায়?

—গীর্জেয়।

আবেদন মঞ্জুর। উড়তে উড়তে ঘরের দিকে ছুটলাম। দুনিয়ার সব থেকে সেরা ভাগ্যবান বুঝি আমি। টাকা-পয়সা এখন পাই বা না পাই কিছু যায় আসে না। আপাতত খাওয়া-পরা জুটলেই হল। একদিন না একদিন জেনট্রির দলের সব থেকে সেরা খেলোয়াড় আমি হবই। মাথায় তখন টাকার বৃষ্টি হবে।

গোমেজকে সুখবরটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা কি-রকম যেন হয়ে গেল। ঘোরালো চোখে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর আচমকা গালে এক বিষম চড়। সেই চড়ের চোটে চোখে অন্ধকার। দাঁতে দাঁত ঘষে ও বলে উঠল, নেমকহারাম বেইমান! জন্মের থেকে এত করেছি তার বদলে এই কৃতজ্ঞতা তোর? পিঠের ওপর আবার কষে লাগাল দু'ঘা।—আর এ কথা বলবি কোনদিন? শিগগীর বল নইলে মেরেই ফেলব আজ তোকে। প্রহারের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই প্রতিশ্রুতি দিলাম, আর কক্ষনো বলব না, আর কক্ষনো কোথাও যেতে চাইব না।

কি করব না করব আমিই জানি। আমাকে আটকানো আর কারো কম্ম নয়।...কিন্তু সেই রাতেই একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল আমার। মারধোর করার পর থেকে গোমেজ একটি কথাও বলেনি আমার সঙ্গে। খেয়ে দেয়ে যে-যার শুয়ে পড়েছি। তখন বিছানায় গা ঠেকানো মাত্র ঘুম হত। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কি-রকম একটা স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে পাশে বসে কেউ একজন আমার গায়ে পিঠে হাত বুলোচ্ছে আর ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ছাড়ছে। গোমেজ ছাড়া আর কে? মনে হল কাঁদছেও। এমন তাজ্জাব ব্যাপার ভাবতে পারি না। ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। আমার মন বলল ওই গোমেজই আমার বাবা।

এরপর দু'দিন ও আমাকে চোখে চোখে রাখল। ও যতক্ষণ থাকে আমি ঘর ছেড়ে বেরোই না। আমার ফিরে এসেও দেখে আমি ঘরেই বসে আছি। সে নিশ্চিন্ত হল। খানিকটা দূরের এক প্রতিবেশী ছেলের সাইকেল নিয়ে আমি যে তার অনুপস্থিতির ফাঁকে কাজ সেরে আসি জানবে কি করে?

পাঁচ দিনের দিন দলের সঙ্গে হাওয়া আমি। রাত্রিতে গোমেজের যখন সন্দেহ হবে তখন আমি অনেক দূরে। নতুন জগৎ আর নতুন জীবনে পদার্পণ আমার। আনন্দে আর রোমাঞ্চে ভরপুর আমি। তার ওপর দিয়ে গোমেজের বিষণ্ণ মুখখানা থেকে থেকে চোখে ভাসছে।

তিন

সব থেকে বেশি খাতির হয়ে গেছল ফ্র্যাংকি বোমারের সঙ্গে। রাতে তার কাছেই শুতাম। কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল, যে সুশ্রী মেয়েটাকে বোর্ডে দাঁড় করিয়ে চারদিকে ছোরা বেঁধা হয়, বোমার তার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু। এই নিয়ে সমপর্যায়ের বন্ধুরা ঠাট্টা-মসকরা করে ওর সঙ্গে। রাতে শুয়ে বোমার নিজেই কত কথা বলত। আমি একেবারে ছেলেমানুষ, বয়সে ওর থেকে দশ-এগারো বছরের ছোট, সেটা ওর খেয়াল থাকত না। প্রেম-জ্বরের ছটফটানি শুরু হলে মানুষ ঘরের দেওয়ালের সঙ্গেও কথা বলে বোধ হয়, আমি তো তার থেকে ভালো। তার ওপর বয়েস যা-ই হোক, অকালপক্কও বটে। তিন মাস না যেতে আমার কত দিকে চোখ খুলেছে ঠিক নেই।

...সেই রাতে একটু মদ গেলার ফলে গোমেজের হা-হুতাশ বেড়ে গেছল। মারজোরি দুটো ভালো কথা বলা দূরে থাক, ও কাছে যেতে নাকি একটা ছোট বাঁশ নিয়ে তাড়া করেছিল। দোষের মধ্যে বোমার তাকে একটা চুমু খেতে চেয়েছিল শুধু। আপত্তি না করার দরুন সাহসে ভর করে কাছে এগিয়েছিল। তার পরেই ওই কাণ্ড, অর্থাৎ বাঁশ নিয়ে তাড়া।

বোমারের জন্য আমার দুঃখ হল। আরো বেশি দুঃখ হল কারণ বোমার চেষ্টা করলেই খেলোয়াড়রা আমাকে একটু আধটু খেলা শেখাতে পারে। সকলের সঙ্গেই খুব খাতির তার। ওই এক দেমাকী মারজোরি ছাড়া। কিন্তু বোমারের ভিতরে যদি সর্বদাই এ-রকম হা-হুতাশ চলতে থাকে তাহলে তাকে দিয়ে আর কি হতে পারে? চট করে মনে হল, এই ব্যাপারে যদি আমার মারফত ওর একটু উপকার হয় তাহলে ওর কৃতজ্ঞতা উছলে উঠবে, তখন যে আবদার করব তাই শুনবে।

এরই মধ্যে একটু আধটু পছন্দ আমাকেও সকলেই করে। কারণ, মনিবের কাছ থেকে ছাড়া পেলে আমি খেলোয়াড়দেরও ফাই-ফরমাশ খাটি। মতলব ঠিক করে পরদিন দুপুরের নিরিবিলিতে আমি মারজোরির কাছে গিয়ে হাজির। বললাম, কাল সমস্ত রাত ধরে বোমার তোমার জন্য হাপুস-হাপুস কেঁদেছে। ও তো খুব ভালো লোক, এ-রকম কষ্ট না দিয়ে ওকে তুমি একটু একটু ভালোবাসো না?...যদি বাসো তাহলে তুমি যখন যা বলবে আমি তাই করে দেব।

মারজোরি বড় বড় চোখ করে তাকালো আমার দিকে। কিন্তু তখন কি ওর বজ্জাতি বুঝেছি! মুখখনা বরং আশাপ্রদ মনে হয়েছে।—ভালোবাসবে?

ও মাথা নেড়েছে, বাসবে।

ছুটে গিয়ে বোমারকে সুখবরটা দিয়েছি। সুখবরটা এত অপ্রত্যাশিত যে ও হাঁ করে আমার মুখে দিকে চেয়ে রইল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হাতে-নাতে দৌত্য-কর্মের ফল পেলাম। মনিবের তলব শুনে হাজির হতেই জেনট্রি জিজ্ঞাসা করল, মারজোরিকে কি বলেছিস?

আমি ভ্যাবাচাকা।

দেয়াল থেকে চাবুকটা টেনে নিয়ে সপাসপ বসিয়ে দিল কয়েক ঘা। গায়ের চামড়া ফেটে জ্বলে যাবার দাখিল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তার দশ বছরের মেয়েও সভয়ে দেখছে। আরও ক'ঘা পড়ত ঠিক নেই। কোথা থেকে বোমার ছুটে এসে আমাকে আগলালো। ফলে তার পিঠেও শপাং করে পড়ল এক ঘা।

[illegible] মনিবের বকুনি খেয়েছি অনেক। প্রহার এই প্রথম। আমার কান্না পেয়ে গেল, কিন্তু শক্ত হয়ে সেটাকে ঠেকালাম। [illegible] আমি যত করি তেমন আর কেউ না। আর সে কিনা প্রায় বিনা দোষে এভাবে মারল আমাকে!

পরে দেখলাম, তিনটে মাস যে মার খাইনি সেটাই আমার ভাগ্য। কারণ মেজাজ চড়লে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। নিজের ওই একরত্তি মেয়েকেই কত সময় মেরে বসে। একদিন পাশের ঘরে বসে মদ গিলছিল, মেয়ে এদিকের ঘরে বড় একটা কাচের জার ফেলে ভাঙল। আধ ঘণ্টা আগেই মেয়েকে ওটা ধরতে নিষেধ করেছিল। একে অবাধ্যতা তার ওপর নেশার তাল কেটেছে। চাবুক নিয়ে ঘরে হাজির। জারটা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিপদের গন্ধ পেয়েছি। সারাকে পালাতে বলে আমি তাড়াতাড়ি ভাঙা কাচ কুড়োতে লেগে গেলাম। আমাকে একলা দেখে মনিব ধরে নিল আমিই ভেঙেছি ওটা। ব্যস, শপাং করে পিঠে পড়ল এক ঘা।

মেজাজ বিগড়ে থাকলে পান থেকে চুন খসলেও প্রহার। আর মেজাজও বিগড়ে থাকলে প্রায় সর্বদাই। খাঁচায়--পোরা বাঘ-সিংহগুলোর মতই মেজাজ সর্বক্ষণ। অতএব আমার দুর্ভাগ্য খণ্ডাবে কে। কিন্তু আশ্চর্য, আমার মতো ছেলের এই মারধোর সয়ে যাবার কথা। গোমেজের হাতেও আমি কম মার খেতাম না। কিন্তু জেনট্রি মারলেই একটা অদ্ভুত ধরনের অভিমান আমাকে পেয়ে বসত। একটু স্নেহ-মমতা দিয়ে লোকটা আমাকে কিনে রাখতে পারত। কিন্তু এই লোকের কাছ থেকে সেটুকু দুরাশা। একমাত্র বাঘ-সিংহ জন্তু-জানোয়রগুলো ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুই বোধহয় সে ভালোবাসে না, আর

কোনোকিছুর ওপর তার মায়া-মমতা নেই। তবু শুধু এই লোকের কাছে মার খেলেই অভিমান হত আমার, অথচ রাগের মাথায় তার খেলোয়াড়রা কেউ চড়-চাপড় বসিয়ে দিলে সে-রকমটা হত না।

দু'মাসের মধ্যে মনিব সম্পর্কে যে চিত্রটা আমার মনের পাটে আঁকা হয়ে গেল, অনুভূতির দিক থেকে তার মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু থাকা স্বাভাবিক। কারণ বয়েস সবে তখন পনেরো আমার। পরিস্থিতির গুণে যত পাকাই হই, মগজের ধারণাশক্তি অন্যদের তুলনায় কিছুটা পরিমিত তো বটেই। ঠিক এই কারণেই সম্ভবত দলের অন্য লোকেরা মনিব সম্পর্কে যতটা নির্লিপ্ত, আমি ততটা নই। এই ক্ষ্যাপা মনিবের প্রতি আমার এক ধরনের আকর্ষণ ছিলই।

গোড়া থেকেই মনের তলার একটা জিজ্ঞাসা দানা বেঁধে উঠেছিল। সারা জেনট্রির মা নেই কেন? বোমারকে একদিন জিজ্ঞাসা করতে সে গম্ভীর মুখে চোখ পিট পিট করে জবাব দিয়েছিল, সকলেরই যে সব থাকবে তার কি মানে? তোর কোথায় কে আছে?

কি কথায় কি কথা। তক্ষুনি মনে হয়েছিল এই জবাবের পিছনে রহস্য কিছু আছে। সারার মা মরে গিয়ে থাকলে বোমার এই গোছের রসিকতা করত না। আর, মারভিন জেনট্রির ঘরে কোথাও মহিলার দু-একখানা ছবি অন্তত থাকত।

ওদের সঙ্গগুণেই আমি চট করে এতটা পেকে উঠেছিলাম। বোমারের মতই চোখ পিট পিট করে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মরেছে না ভেগেছে?

বোমার সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল।—সাবাশ! তোর মানুষ হয়ে উঠতে আর বেশি দেরি নেই।

পরে সাগ্রহে সমাচার শুনেছি। সারার মা জেসি জেনট্রি মারভিনের জীবন থেকে সরেই গেছে। সারার তখন বছর পাঁচেক মাত্র বয়েস। কর্তা-গিন্নীতে খটাখটি লেগেই থাকত। তার প্রাধান কারণ স্ত্রীর প্রতি মারভিনের উদাসীনতা। জন্তু-জানোয়ারঅন্ত প্রাণ মারভিনের। একটা বাঘ বা একটা সিংহ বা একটা হাতি বা ঘোড়ার সামান্য অসুখ হলেও তার আহার-নিদ্রা ঘুচল। জীবনটাকে চাঙ্গা করে না তোলা পর্যন্ত তার আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করার সময় নেই।

বেশির ভাগ এই নিয়েই বিবাদ স্ত্রীর সঙ্গে। বাইরে থেকে বোমার স্বকর্ণে একদিন জেসিকে বলতে শুনেছে, একটা সিংহী বা একটা বাঘিনী বিয়ে করলেই পারতে, মানুষের সমাজে ঢুঁ দিতে গেছলে কেন?

জেসি জেনট্রি রূপসী ছিল। হুবহু মায়ের মুখের আদল পেয়েছে সারা। বোমার বলেছিল, সারার মুখের বয়স আরো বিশটা বছর বাড়িয়ে দিলেই জেসি জেনট্রি। এত তুচ্ছ কারণে দুজনের ঝগড়া লেগে যেত যে দলের অন্যদের কাছে সেটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

টাকা-পয়সার ব্যাপারে মারভিন জেনট্রি বদান্য পুরুষ। জেসি প্রচুর হাত-খরচা পেত। সে-টাকা সে যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কে জমাতো কারো ধারণা ছিল না। তাছাড়া ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা এড়ানোর জন্যেও মারভিন অনেক টাকা ব্যাঙ্কে স্ত্রীর নামে সরিয়ে রেখেছিল।

...স্বামী-স্ত্রীতে একদিন তুমুল হয়ে গেল। জেনট্রিদের সে সময়ের খাস চাকরের মুখে ঘটনাটা জানা গেছল। সেদিন কোন শো ছিল না। বসে বসে সন্ধ্যা থেকেই মদ গিলছিল মারভিন। এই মদেই তার লিভার নষ্ট করেছে, এখন তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি নিজেই। যাই হোক, বারান্দায় বসে মারভিন মদ গিলছিল আর ঘরে বসে জেসি স্বামীর উদ্দেশ্যে একটানা কটূক্তি বর্ষণ করে চলেছিল।

মদ পেটে পড়লে এমনিতেই ভিন্ন মূর্তি মারভিনের। চাবুক হাতে উঠে এসে শপাশপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। জেসির কোমল অঙ্গে দাগড়া দাগড়া দাগ পড়ে গেল।

পরদিন অবশ্য নিজের ব্যবহারের দরুন অনুতপ্ত হতে দেখা গেছে মারভিনকে। স্ত্রীর কাছে নাকি রাতের ব্যবহারের দরুন ক্ষমাও চেয়েছিল। কিন্তু সেই থেকে টানা দু'মাস আশ্চর্য পরিবর্তন জেসি জেনট্রির। আর একটা দিনের জন্যেও ঝগড়া করেনি, একটি কটু কথা বলেনি। সর্বদা অনুগত মিষ্টি ব্যবহার। সকলেই জেনেছে, সুন্দরী মুখরা স্ত্রীকে মোক্ষম দাওয়াই দিয়ে টিট করেছে মারভিন জেনট্রি।

দু'মাস পরে। মারভিন জেনট্রি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কয়েকদিন বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা

ছিল না। অসুস্থতার গোড়ার দিন থেকেই জেসি নিরুদ্দেশ। মারভিনের উদ্দেশে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। সেই চিঠিও মারভিনের টেবিলের ওপরে খোলা পড়েছিল। কে দেখল না দেখল তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। জেসি লিখেছে, তোমার মতো পশুর সঙ্গে কোনো ভদ্রমহিলার জীবন-যাপন সম্ভব নয়। সারাকেও নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে তোমার বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, তাই ওকে বঞ্চিত করলাম না।

অসুখের দরুণ মারভিন বিছনা থেকে উঠতে পারে না। সেই অবস্থায় খাঁচায় পোরা জানোয়ারের মতো ফুঁসেছে শুধু। কিন্তু ভালো হয়ে একটা দিনের জন্যেও স্ত্রীর খোঁজ করেনি। তার অ্যাকাউনটেন্টের মুখে বোমাররা শুনেছে ব্যাঙ্ক থেকে নিজের নামের সমস্ত টাকা-কড়ি তুলে নিয়ে জেসি পালিয়েছে।

স্ত্রীর খোঁজ করেনি বটে, কিন্তু সেই থেকে নাকি মারভিনের মেজাজ সর্বদা আরো বেশি খাপ্পা। মদের মাত্রাও বেড়েছে। আর ওই একটি মাত্র ছোট মেয়ের প্রতিও অকরুণ। বোমার বলে, ছুঁড়িটা মায়ের মতো দেখতে বলেই কর্তা ওকে ভালো চোখে দেখে না।

ঘটনাটা শোনার পর থেকেই সারাকে দেখলে আমার কেমন মায়া হত। বাবা-মা কি জিনিস আমার জানা নেই। সারারও অনেকটা সেই অবস্থা। মা তো নেই-ই, বাবা থেকেও নেই। মায়া সম্ভব সেই কারণেই। ফাঁক পেলে আমি ওর সঙ্গে খেলা করতাম, মনিব-কন্যা জ্ঞানে একটু-আধটু তোয়াজ-তোষামোদও করতাম। সেই কারণে মনিব-কন্যাটিও আমার প্রতি সদয়ই ছিল তখন।

বরাতটাই মন্দ আমার। পরের তিন বছরের মধ্যেও সার্কাস পার্টির ছোটখাট খেলোয়াড় হবার সুযোগ পেলাম না। দোষ খানিকটা আমারই। ভবিষ্যতের আশায় মনিবের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নিজেকে প্রায় অপরিহার্য করে তুলেছিলাম। চোখের দিকে তাকালে বুঝে নিতাম কি চাই। এ-রকম সেবা পাবার ফলেই আমাকে সে প্রত্যক্ষভাবে সার্কাসের দলের সঙ্গে যুক্ত হতে দিল না। এই বয়সে তার খাস চাকর হিসেবে মাইনে অবশ্য বেশিই পেতাম। উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে খুশিই থাকার কথা। কিন্তু আমার হতাশা বাড়তেই থাকল। সারার মুখ দিয়ে দু'তিন দিন তার বাবার কাছে আবেদন পেশ করেছিলাম। সব কাজ করার পরেও যদি একটু খেলা শেখার সুযোগ পাই। শেষে একদিন দাবড়ানী খেয়ে মেয়েও আর বাপের কাথে সুপারিশ করতে রাজি হয়নি।

রিং-মাস্টারকে ধরে যা-ও একটু আধটু শিখেছিলাম তাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আমার গোপন শিক্ষানবিশির কথা মনিব জানত না। একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলাম। রিং-মাস্টার প্রচণ্ড ধমক খেল, আর আমি গোটা দুই চড়।

তখন বয়েস আমার আঠারো। আত্মসম্মানবোধ আগের থেকে বেড়েছে।...জীবনভোর এই গোলামী করব? এখান থেকে পালানোর চিন্তাটা বার বার মনে আসতে লাগল। কিন্তু পালিয়ে কোনো অনির্দিষ্টের বুকে ঝাঁপ দেবে? তবু বোমারের কাছেই মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলেছিলাম একদিন।—কিছু যখন হবেই না, এখান থেকে সরে পড়লে কেমন হয়?

বোমার সন্ত্রস্ত।—মনিব জানতে পেলে চাবকে তোর পিঠের ছাল-চামড়া তুলে নেবে—তুই তো বলতে গেলে কেনা লোক তার—

শুনে মেজাজটা আরো বিগড়ে গেল আমার।

এই সময়েই ছোটখাট একটা পরিবর্তনের সূচনা। যে লোকটা জন্তুদের খাবার দেয় তার বয়েস হয়েছে। মাঝে মাঝে কাজের একটু-আধটু গাফিলতি হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যা তো আর কম নয়। কিন্তু ও-গুলোর ব্যাপারে এতটুকু ত্রুটি বরদাস্ত করতে রাজি নয় মারভিন। ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এতটুকু গলতি হয়েছে টের পেলে মারমুখী একেবারে। আড়ালে সকলে হাসি-ঠাট্টা করে, বলে, দরদ হবে না কেন, আগের জন্মে জাত-ভাই ছিল যে।

মনিব হঠাৎ একদিন ডেকে পাঠাল আমাকে। গিয়ে দেখি সেখানে মাথা হেঁট করে আধ-বুড়ো বেনটন দাঁড়িয়ে। জন্তুদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার ভার তার ওপর! ওদিকে মনিবের গোমড়া মুখ। এক নজর তাকিয়েই বোঝা গেল এক পশলা হয়ে গেছে। আমার প্রতি হুকুম হল, আজ থেকে তুমি

বেনটনকে সাহায্য করবে—কোন্ জানোয়ার কখন কি খায়, কতটা খায়, সব ভাল করে জেনে নেবে। এ কাজের জন্য বাড়তি টাকা পাবে।

বলা বাহুল্য, আমার কিছুমাত্র আনন্দ হয়নি। আমি দলের শিল্পী হতে চেয়েছিলাম, চাকর নয়। বোমার অবশ্য বলেছে, তোর বরাত ভালো, বিশ্বাসী লোক ভিন্ন কর্তা কাউকে এ-দায়িত্ব দেয় না।

যাই হোক, মুখ বুজেই আমি বেনটনকে সাহায্য করতে লাগলাম। খুব খারাপও লাগল না। জীব মাত্রেরই জঠর-জ্বালার একটা নতুন দিক দেখতে পেলাম। সময়ে খাবার দিতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে জানোয়ারগুলো রীতিমত চেঁচামেচি করতে থাকে। মারভিনের আদরের শিম্পাঞ্জি বিল তো ঠাস করে গালে একটা চড়ই বসিয়ে দিল সেদিন। বিল অনেক রকমের খেলা দেখায়। সিগারেট টানতে টানতে এক-চাকার সাইকেল চালায়, ট্রেন চালায়, দর্শকদের সঙ্গে নানা রকম রসিকতা করে। ও নিজের কদর জানে, আমার থেকে অন্তত ওর দাম বেশি। দোষের মধ্যে ওর প্রাতরাশের সঙ্গে সেদিন আমি কলা দিতে ভুলে গেছলাম। কর্তা সামনে ছিল, বলল, বেশ হয়েছে।

আমাকে পেয়ে বেনটন আরো কাজে ঢিলে দিতে লাগল। ফলে আমার ওপর চাপ বাড়তে লাগল। হাতি-ঘোড়ার খাবার দেবার সময় ও কাছেও থাকে না। বাঘ-সিংহের খাবার শুধু নিজের হাতে দেয়। তার আসল কারণ, কর্তা প্রায়ই তখন উপস্থিত থাকে।

এই সময় থেকেই মালিকের চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছে। ওই হিংস্র জানোয়ারগুলোর সঙ্গে তার যেন নিবিড় বন্ধুত্ব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আমি তাকে বাঘ-সিংহগুলোর সঙ্গে গল্প-সল্প করতে দেখেছি। ওদের সঙ্গে কথা বলে, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। খাঁচার ফাঁক দিয়ে কপালে কপাল ঘষে সোহাগ করে। কেবল ওদের নিয়ে যখন রিং-এ খেলা দেখায় তখন অন্য রকম দাপট তার। একটু অবাধ্য হলে তখন শপাং করে চাবুক বসিয়ে দেয়। বাঘ-সিংহের খেলা দেখানোর আইটেমটা কর্তার অর্থাৎ মারভিন জেনট্রির নিজের।

আমি দিবাস্বপ্ন দেখতাম, স্নেহপরবশ হয়ে (যে বস্তুর ছিটোফোঁটাও তার মধ্যে কেউ দেখেনি) ভদ্রলোক হয়তো একদিন এই সেরা উত্তেজনার খেলাটিই আমাকে শেখাবে। স্নেহ মানুষের বেলায় নেই, কিন্তু জানোয়ারগুলোর প্রতি তো আছে। সেটা যে মানুষের বেলাতেও ঘুরবে না একদিন, কে বলতে পারে।

নতুন কাজের ছ'মাসের মধ্যে একটা অঘটন ঘটল। আমি মনে মনে এমন আশাও করতাম, মারভিন যদি ছোটখাট কোনরকম বিপদে পড়ে আর আমি যদি তার থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারি, তবে হয়তো দিন ফিরবে আমার। তার বদলে অঘটনের ঝাপটাটা নিজের ওপর দিয়েই গেল। বাঘ-সিংহের খাবার দেবার সময় ছ'মাস বেনটনের সাগরেদি করে আমারও ভয়-ডর কমে গেছল। খাবার দেয় বলে তো বাঘগুলো যেন পোষা বেড়াল বেনটনের। আর আমি তার সাহায্যকারী, ইদানীং অনেকসময় বেনটন সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি ওদের খাবার দিই—অতএব আমিও ওদের প্রিয়পাত্র নই কেন? বেনটনের উপস্থিতিতে মাঝে মাঝে খাঁচা ঘেঁষে দাড়াতে লাগলাম। তাতেও বাঘগুলোর তাপ উত্তাপ না দেখে সাহস বাড়ল। একদিন সব থেকে নিরীহ গোছের বাঘ যেটা মনে হত, সেটার গায়ে একটু হাত বুলোতে গেলাম, যুগপৎ হুঙ্কার এবং থাবার ঘা। কপাল থেকে গাল পর্যন্ত সমাংস খানিকটা চামড়া ঝুলে পড়ল। আর একটু হলে ও-দিকের চোখসুদ্ধু টেনে বার করে নিত।

তারপর দু'মাস হাসপাতালে আমি। মারভিনের একটু স্নেহ পাওয়া দূরের কথা, কর্তা যেন আরো বিরূপ। আমাকে হাসপাতালে দেখতে এসেও মেজাজ তিরিক্ষি।—বেশ হয়েছে, ওরা তোর ইয়ার্কির পাত্র, কেমন?

আমার ভয় ধরেছিল, এর পর আমাকে দল থেকেই না তাড়িয়ে দেয়। তার পনেরো বছরের মেয়ে সারা জেনট্রির মুখে বরং একটু দরদের আভাস দেখেছিলাম। ও বলেছে, তোমার ওপর বাবা ভয়ানক রেগে গেছে, আর বোধহয় তোমাকে বাঘ-সিংহের দিকে ঘেঁষতে দেবে না।

অর্থাৎ আবার যে-কে সেই ঘরের চাকর। অসহায় অবস্থা বলেই আত্মাভিমানে ফুঁশে উঠেছিলাম সেদিন। বলেই ফেলেছিলাম, তাহলে আমি কাজ ছেড়ে দেব।

মুখে সচকিত ভাব দেখেছিলাম মেয়েটার। সর্বনাশ! কাউকে বোলো না, পালাতে যদি হয় চুপি চুপি পালাবে। বাবা জানতে পারলে আগে চাবুকের চোটে আধমরা করে তারপর তাড়াবে তোমাকে। বোমারের মুখে শুনেছি,একমাত্র তুমিই বাবার কেনা লোক।

অর্থাৎ আমি ক্রীতদাস। ভিতরের যন্ত্রণায় ক্ষতমুখ দিয়ে রক্ত বেরুনোর দাখিল।

এই মেয়েও বাপকে কোন্ চোখে দেখে সেদিনই বোঝা গেছল। সে পরামর্শ দিয়েছিল, তুমি বরং বোমারকে একটু বলে কয়ে রাখো—সে বললে বাবা ঠাণ্ডা থাকবে—তার কথা তো বাবা ফেলতে পারে না।

চার বছরের মধ্যে এটা নতুন খবর আমার কাছে! বোমারের এই গোছের প্রতিপত্তির নজির কখনো দেখিনি। বরং তাকেও মালিকের কাছে অনেক সময় বিষম বকুনি খেতে দেখেছি।

—বোমারের কথা তোমার বাবা শোনে?

—শুনবে না! সে এক সময় বাবার কত কাজ করে দিয়েছে। ও সক্কলকে হাসায় বলে ওকে তো বিশ্বাস করে সকলেই, তাতেই বাবার সুবিধে। গলা খাটো করে বলছে, কাউকে বোলো না যেন, মায়ের পিছনে বাবা তো বোমারকেই লাগিয়ে রেখেছিল, মা কখন কোথায় যায়, কি করে, কত টাকা ওড়ায়, কার সঙ্গে মেশে এ-সব খবর তো বোমারই বাবাকে বলে দিত—আমি বড় হতে মদের ঝোঁকে বাবা নিজেই আমাকে একদিন বলেছে এ-সব।...তাছাড়া আমাকে তো সক্কলের থেকে বেশি ভালবাসে বোমার—তাই বিশ্বাস করে আমাকে বলেছে, জানে তো আমার পেটে থেকে কথা বেরোয় না। এই তো, মাত্র সাত-আটদিন আগে শুনলাম সব।

অর্থাৎ আমি যখন হাসপাতালে। পেটে কথা কেমন থাকে সে তো দেখাই যাচ্ছে। ও যে বড় হয়েছে এই গর্বও আছে। কিন্তু আমি অবাক অন্য কারণে। বোমার আমার সঙ্গে সমবয়সীর মতো মেশে, ইয়ারকি-ফাজলামো করে, মনের কথা বলে, অন্তরঙ্গ অবকাশে তার প্রেমিকা মারজোরির উদ্দেশ্য গাল পাড়ে আর গরম গরম নিশ্বাস ছাড়ে। বলে, চারদিকে ছুরি বসানোর খেলা দেখিয়ে দেখিয়ে ছুঁড়িটা ছুরির ফলার মতো হয়ে গেছে একেবারে। এখনো ওকে বাগে আনার জল্পনা-কল্পনা চলে আমাদের। এই বোমার কর্তার বউ পালানোর গল্প করেছে—কিন্তু নিজের ওই ভূমিকার সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি।

বোমারের ওপরেও প্রচণ্ড অভিমান হল আমার। আমার আকাঙ্ক্ষার খবর রাখে অথচ আমার জন্য কর্তার কাছে কোনদিন একটু সুপারিশ করল না! ফলে বিরস মুখে বলে উঠলাম, বোমার কি এমন যোগ্য লোক, তোমার মা-কে কি আগলে রাখতে পেরেছে? দিব্যি তো পালিয়েছে—

—বা রে, বাবার যে তখন খুব অসুখ, ও তো তখন বাবাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল! তারপরেই ঈষৎ উৎসাহে জানান দিল, আসলে মা পালাতে পেরেছে বলে ও খুশি হয়েছিল, বুঝলে? আমাকে সে-কথাও বলেছে। পালাতে না পারলে রাগের মুখে বা নেশার ঝোঁকে বাবা ঠিক একদিন মা-কে গুলি করে বসত।

মনিব কন্যার সঙ্গে এই গোছের কথাবার্তার সুযোগ বড় মেলে না। আঠেরো বছর মাত্র বয়েস আমার, ছেলেমানুষ তো বটে। আমার জীবনে বাপ-মা নেই, আর ওর থেকেও নেই। তাই জানার লোভ হল।—মা চলে যেতে তোমার দুঃখ হয়নি?

—খুব হয়েছে।...কিন্তু মা কি করবে, এই লোকের সঙ্গে কেউ থাকতে পারে!

বাপের প্রতি এমন বীতশ্রদ্ধ ভাব আর কোনদিন দেখিনি।

চিরদিনের মতো মুখে এই ক্ষতচিহ্ন নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরেছি। আয়নায় এ-মুখ দেখে নিজেরই কান্না পেত। আমার কাজ ছেঁটে দেওয়া হয়নি—আগের মতই বেনটনকে সাহায্য করছি। মনিব কেবল এক দফা শাসিয়েছে আমাকে, ওদের নিয়ে ফের ইয়ার্কি করতে যাবি তো খাঁচা খুলে একেবারে ভিতরে ফেলে দেব। শাসানোর দরকার ছিল না। প্রাণের মায়া যথেষ্টই আছে আমার।

হাসপাতাল থেকে ফিরেই বোমারকে চেপে ধরলাম একদিন। মনিব তাকে তলায় তলায় খাতির

করে একটু, অথচ আমাকে সে সামান্য সাহায্যেও করল না। এই জন্যেই হাসপাতালে ওর সঙ্গে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলিনি আমি।

চোখ পিট পিট করে গম্ভীর মুখে বোমার খানিক দেখেছে আমাকে।—মেয়েটা তোর কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছে?

—করেছে তো।

বড় নিশ্বাস ফেলে বোমার মন্তব্য করেছে, ওই ছুঁড়িও পালাবে একদিন—ঠিক মায়ের মতো চেহারা, মায়ের মতো মতি-গতি।

—চুলোয় যাক্। তুমি আমার জন্য কিছু করছ না কেন?

—কর্তার বাঘ-বশ করা চাবুকখানা দেখেছিস?

ঠিক না বুঝে মাথা নাড়ালাম।

—বউ পালানোর পর থেকে কারো ওপর কারো টান দেখলে কর্তার ওই রকম মেজাজ হয়। কেবল বাঘিনি যখন বাঘের গা-পিঠ চেটে সোহাগ জানায় সেটা শুধু বরদাস্ত হয়, দু'চোখ ভরে দেখে। এখানে কারো জন্যে কেউ কিছু বলতে গেলে উল্টে তার ক্ষতি হয়। মালিক তার ক্ষতি করে মজা দেখে, যাকে বলে রি-অ্যাকশন দেখে।

অতএব আশার সেখানেই জলাঞ্জলি।

একঘেয়ে ভাবে আবার একটা বছর কেটে গেল। আমার বয়েস উনিশ। মালিকের মেয়ে সারার ষোল। আমার চোখের সামনে সোনালী ভবিষ্যতের বর্ণ প্রায় নিষ্প্রভ। এর মধ্যে দূর থেকে শুধু ওই মেয়েটাকে দেখতে ভালো লাগে। তাও দূর থেকে দেখি। ও টের না পায় এমন করে দেখি। নিজের পরিবর্তন কতটা হয়েছে জানি না—কিন্তু মেয়েটার মধ্যে একটা নতুন ছাঁদ চোখে পড়ে। ওর শরীরটা বদলাচ্ছে। দেখতে ইচ্ছে করে। দেখতে লোভ হয়। না, ওকে নিয়ে কোন অসম্ভব স্বপ্নের জাল আমি বুনিনি। দেখতে ভালো লাগে। সুধু দেখি।

...এটুকুর অপরাধেই মালিকের কোপের মুখে পড়ে গেলাম একদিন। আর এই বিশ্বাসঘাতক বোমারটার জন্যেই মাটির নীচে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করল আমার। এখন আমরা বাইরের ক্যাম্পে। বছরের মধ্যে কম করে ছ'মাস ক্যাম্পের জীবন আমাদের। এক মেঘলা দিনে উঁচু গাছের ডালে দোলনা বেঁধে সারা জেনট্রি দোল খাচ্ছে। ওই উঁচু গাছের ডালে দোলনা আমিই বেঁধে দিয়েছি। তারপর পিছনের দিকে প্রায় পনেরো গজ সরে এসে নির্নিমেষ নয়নে ওর দোল খাওয়া দেখছি। যত দেখছি ততো ভালো লাগছে।

ওকেও বোধহয় দোলার নেশায় পেয়েছে। মেয়েটার ভয়-ডর কম। দোলনাটা একবার ওদিকের আকাশে উঠছে একবার এদিকের। গায়ের জামাটা উঠে উঠে যাচ্ছে। ইজের-পরা পিছনের গা-পিঠ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। পুষ্ট দুটো পা, পুষ্ট নরম দেহ একখানা। আমাকেও দেখার নেশায় পেয়েছে। একটু দূর দিয়ে ঘুরে সামনের দিকে এসে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম। তারপর দেখার আনন্দে আরো বিভোর।

হঠাৎ কানে হ্যাঁচকা টান একটা। ঘুরে দাঁড়াতেই দু'চোখ ছানাবড়া। একেবারে যমের মুখে। সারার বাবা মারভিন জেনট্রি। কান ধরেই হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল আমাকে। দুলতে দুলতেই সারা দৃশ্যটা দেখল। দূরে দূরে দলের আরো দুই একজনও। সকলেই অবাক।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে ঠাস ঠাস করে দু-গালে দুটো চড় বসিয়ে মালিক অন্য দিকে চলে গেল। মুখে একটি কথাও বলল না। সাধারণত গায়ে হাত পড়লেই আমার মেজাজ বিগড়োয়। কিন্তু এই দিন অপরাধীর মুখ আমার। অবচেতন মনের একটা গর্হিত লজ্জাকর অপরাধ ধরা পড়েছে যেন। রাগ বা অভিমানের বদলে সঙ্কুচিত আমি। শাস্তিটার ওখানেই শেষ কিনা আমি জানি না। মালিক এবারে না আমাকে তাড়িয়েই দেয়।

ভয়ে ভয়ে বোমারকে বললাম ঘটনাটা। শুনে তাজ্জব মুখ করে ও আমার দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর হাসতে লাগল। বলল, আমি ঠিক অমনি করে ওর মা-কে চুরি করে দেখতাম। এই

জন্যেই তার এই মেয়েটাকেও এত ভালো লাগে আমার। কিন্তু অমি তো কখনো ধরা পড়িনি...তুই একটা হাঁদা।

মনিব নতুন করে আর কিছু শাস্তি দিল না বটে, কিন্তু দিন কতকের জন্য আমার মাথা কাটা গেল। ওই হতচ্ছাড়া বোমারই সকলকে বলে দিয়েছে। তাতে কোন ভুল নেই। এমন কি সারাকেও বলেছে। চোখাচোখি হলেই সারা ফিক ফিক করে হাসে আর আমার কান গরম হয়ে যায়। আর মুখ টিপে হাসে অন্যরাও। চাউনির ভিতর দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে, একেবারে মালিকের মেয়ের দিকে চোখ—অ্যাঁ! যে মালিক কিনা মারভিন জেনট্রি!

বোমারের গদগদ মুখ দেখলাম একদিন। তার জীবনের একমাত্র সোনার দিন সেটা। দিন নয় রাত। রাতে শোবার সময়ে আমাকেই জাপটে ধরল একেবারে। ওর আনন্দের কারণ শুনে আমারও আনন্দ হল। অধ্যবসায়ের ফল মিলেছে। এ-পর্যন্ত মারজোরির কাছে অনেকবার বিয়ের বাসনা জানিয়েছে। আর জবাবে মারজোরি তাকে তেড়ে মারতে এসেছে। মালিকের কাছে নালিশ করবে বলে শাসিয়েছে।

কিন্তু বোমার নাছোড়বান্দা। আজ এতদিনে তার ভাগ্য প্রসন্ন। মারজোরি ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। ছুরির ফলার মতো মেয়ে এতদিনে প্রেমিকের মর্ম বুঝেছে। অবশ্য হঠাৎ এমন মন বদলাবার কারণও আছে একটু। ট্রেপিসের খেলা দেখায় যারা, তাদের মধ্যে একটা সুন্দর মতো ছেলের সঙ্গেই যা একটু ভাব-সাব ছিল দেমাকি মেয়ের। বিয়ে যদি করে তো ওকেই করবে ধরে নিয়েছিলাম। হঠাৎ কি কারণে তার ওপর বিরূপ মারজোরি। বোমারকে বলেছে ওটা একটা কাপুরুষ। ওটা বলতে জন, এত দিন যে ওর প্রিয়পাত্র ছিল।

এই বীতরাগের মুখে বীরপুরুষের মতো বিয়ের প্রস্তাব করেছে বোমার। মারজোরি বলেছে, তুমি একটা ভাঁড়, তোমাকে বিয়ে করব কি!

বোমার বলেছে তুমি একখানা ছুরির ফলা—একমাত্র এই ভাঁড়ই ছুরি বসানোর জন্য তোমার সামনে বুক পেতে দিতে পারে—আর কেউ দেবে না, সকলেরই প্রাণের মায়া আছে।

মারজোরি হেসেছে, পরে ঘাড় কাত করে রাজি হয়েছে। তারপর সংশয় প্রকাশ করেছে।—কিন্তু মালিক কি মত দেবে?

বোমার অবাক।—বিয়ে করব আমি, মালিকের মতামতে কি এসে যায়? আর মত দেবেই বা না কেন, আমি আজই তাকে জানাচ্ছি।

শুনে অমন শক্ত মেয়েরও ত্রাস। তক্ষুনি সাবধান করেছে, মত নিক আপত্তি নেই, কিন্তু কাকে বিয়ে করতে চায় এ-যেন কক্ষনো বলেনা। বললে বোমারকে আর বিয়েই করবে না ও। কত মেয়েই তো আছে, মালিক যা-খুশি ভেবে নিক।

সেই রাতটা সত্যিকারের আনন্দের মধ্যে কেটেছিল আমার। সেই রাতে আমার জন্যেও দরদ উথলে উঠেছিল ওর। বলেছিল, তুই যে একেবারে খোদ মালিকের মেয়ের দিকে চোখ দিয়ে বসে আছিস, ছোটখাটো কারো দিকে নজর ফেরা, আমি যতটা সম্ভব তোকে সাহায্য করব।

কিন্তু পরদিনই বিষণ্ণ অথচ ক্রুদ্ধ মূর্তি বোমারের। সমাচার শুনে আমারও মন খারাপ। মালিকের অনুমতি চাইতে গেছল বোমার। আর্জি শুনেই চোখ লাল তার। প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছে, কাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু বোমার নাম বলেনি, বলেছে ইউনিটেরই একজনকে।

—কাকে? মালিক ধমকেই উঠেছে।

কিন্তু নাম বলে কি প্রতিশ্রুতি ভাঙবে বোমার? সেই পাত্র নয়। জবাব দিয়েছে তার নাম এখন বলা যাবে না।

ব্যস্। মনিবের মেজাজ আরো তিরিক্ষি। ঝাঁঝালো জবাব দিয়েছে, বিয়ে-থাওয়া করে ঘর-সংসার পাতার জায়গা নয় এটা—ও-সব এখানে চলবে না। বিয়ে করতে হয় তো দু'জনেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে করতে পারে। সাফ কথা।

রাগে গজ গজ করতে করতে ফিরে এসেছে বোমার। সে বেপরোয়া। চাকরি ছেড়েই মারজোরিকে

বিয়ে করার সঙ্কল্প তার। বলল, হিংসে, বুঝলি না? স্রেফ হিংসে, ওর চোখের সামনে পরিবার নিয়ে সুখে থাকব, সহ্য হবে কি করে! সাধে অন্যের সঙ্গে বউ চলে যায়!...ইস ওর বউটাকে নিয়েই পালানোর কত সুযোগ পেয়েছিলাম, সাহস করে একদিন বুকে চেপে-চুপে ধরতে পারলে ঠিক আমার সঙ্গেই পালাত—আমি তার অনেক গলদ আর অনেক চুরির খবর জানতাম। ওর মতো লোকের সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা করাই উচিত ছিল আমার।

...সারার মা জেসি জেনট্রি শুনেছি ওরই সমবয়সী ছিল। সে জন্যে নয়, আমার হাসি পেয়ে গেছল রাগের মুখে বোমারের খেদের কথা শুনে। সেই সঙ্গে বিষম দুশ্চিন্তাও হয়েছিল ওর জন্যে। গোঁয়ারটা মারজোরির জন্যে যে-রকম পাগল, ঠিক চাকরি ছেড়েই বিয়ে করবে ওকে। কিন্তু চাকরি ছাড়লে ওর চলবে কি করে—বিশেষ করে বিয়ে করার পর? অন্যত্র চাকরি নিলেই বা কত আর পাবে। এখানকার অর্ধেকও পাবে কিনা সন্দেহ। কর্তার সুনজরের মানুষ বলে এখানে মাস গেলে মোটা মাইনে পায়। তা না হলে যত ভালোই হোক, জোকারের মাইনে কত আর। টাকা-পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে মালিকের দরাজ হাত সেটা কেউ অস্বীকার করে না। ওর ভাবনা ভাবতে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎটাও যেন অনিশ্চয়তায় দুলে দুলে উঠল। বোমার কাজ ছেড়ে চলে গেলে আমারই কি আর এখানে ভালো লাগবে?

ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, রাগের মাথায় কিছু করে না বসে। ক'টা দিন সবুর করো, কর্তার মত বদলাতেও তো পারে।

—নিকুচি করেছে কর্তার মতের। আমি কি তোর মতো দাস নাকি!

মারজোরি বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে-ও আমর মতই পরামর্শ দিল, এবং সেটা মেনে না নিয়ে উপায় কি। চাকরি ছেড়েও ওকে বিয়ে করবার মতো বুকের পাটা আছে শুনে খুশি হয়ে সে নাকি ওকে একটা চুমুই খেয়ে বসল। গালে আর ঠোঁটে সেই ছোঁয়া এখনো নাকি চিড়বিড় করছে। এক কথায়, মারজোরি বুঝতে পেরেছে বোমার জনের মতো কাপুরুষ নয়। কিন্তু হুট করে চাকরি ছাড়তে সেও নিষেধ করেছে। দুটো বছর দু'জনে মিলে যতটা সম্ভব টাকা জমানো যাক, তারপর মারভিনের মুখের ওপর চাকরি ছুঁড়ে দিয়ে এখান থেকে চলে যাবে।

অগত্যা সেই পরামর্শই স্থির।

এরপর বোমারের সমস্ত ধ্যানজ্ঞান টাকা। মাসের মাইনে গোটাগুটি মারজোরির হাতে তুলে দিত। দু'জনের টাকা একসঙ্গে ব্যাঙ্কে জমা পড়ত। কিন্তু পড়ত মারজোরির নামে। এ-ব্যবস্থাটা কেন যেন আমার আদৌ মনঃপূত ছিল না। দুজনের টাকা আলাদা রাখলেই তো হয়, তারপর জুড়তে কতক্ষণ। কিন্তু সে-কথা বলতেই মারমুখী মূর্তি বোমারের। বলেছে, তুই ব্যাটা ক্রীতদাস, তোর মন কত আর উঁচু হবে?

নিজের সিগারেটের টাকা পর্যন্ত রাখত না। আমি পয়সা খরচ করে ওকে সিগারেট খাওয়াতুম। কর্তার কাছ থেকে ও ফালতু কয়েকটা টাকা পেত, তাই থেকেই টেনেটুনে হাত-খরচা চালাত। খাওয়া-পরা তো প্রতিষ্ঠান থেকেই জোটে।

এমনিতেও বোমার হিসেবী মানুষ মোটামুটি। ব্যাঙ্কে এত কালের চাকরির টাকাও কম জমেনি। তার থেকে তুলে তুলে মারজোরিকে প্রতি মাসেই কিছু না কিছু উপহার দিত। কারণ মাইনের টাকা থেকে পাঁচটা টাকা খরচ করলেও মারজোরি রেগে যেত। উপহার পেয়ে খুশি হত, কিন্তু সেই সঙ্গে রাগও দেখাত, বলত, তুমি উড়োনচণ্ডে, তোমার ব্যাঙ্কের টাকাও আমি আমার নামে সরিয়ে আনছি। আমার মনটা সত্যিই ততো বড় নয় বোধহয়, শুনে খুঁত খুঁত করত কেমন। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতাম ব্যাঙ্কের আগের জমানো টাকাও মারজোরির নামে সরানো হয়েছে কিনা। বোমার তাতেও রেগে যেত।

মারজোরি কবে ওকে ক'টা চুমু খেল রাতে শুয়ে সে-খবরটা আমাকে দেবেই। শো না থাকলে দু'জনে আলাদা আলাদা বেড়াতে বেরোয়, যেন কেউ কাউকে চেনে না। তারপর দূরে এক জায়গায় গিয়ে দুজনে মেলে। ক্যাম্পের কাছে এসে আবার পৃথক দু'জনে। বোমার সেদিন হাওয়ায় ভাসতে থাকে।

ওর ফূর্তি বাড়ছে আর আমার কমছে। ওকে হারানোর দিন এগিয়ে আসছে। ছ'মাস হয়ে গেল, আর তো মাত্র দেড়টা বছর। এরই মধ্যে দুই এটা বিসদৃশ ব্যাপার চোখে পড়ল আমার। আগে হলে বিসদৃশ লাগত না, এখন লাগে। আগের প্রিয়পাত্র জনের সঙ্গেও মারজোরিকে মাঝে মাঝে খোশমেজাজে গল্প-সল্প করতে দেখি। কিন্তু সকলের সামনা-সামনি নয়, আড়ালে-আবডালে। আর, তখন আমাকে দেখলেই ও কেমন সচকিত হয়ে যায়। একদিন বোমারকে বলেই ফেললাম, আজকাল ওই জনের সঙ্গে মারজোরির বেশ ভাব-সাব দেখি যে।

শোনা মাত্র বোমার আমাকে এই মারে তো সেই মারে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, ভাব হয়েছে তোর তাতে কি? তোর বাইরেটা যেমন কালো, ভেতরটাও তেমনি কালো। আমার মনে সন্দেহ ঢোকাতে চাস, কেমন? জন কি ওর শত্রু নাকি যে মুখ দেখবে না? মারজোরি তোর সঙ্গে মেশে, সকলের সঙ্গেই মেশে—তাহলে জন কি দোষ করল?

সেই থেকে আমি চুপ। ওদের আরো অন্তরঙ্গ মেলামেশা আমার চোখে পড়েছে, কিন্তু বোমারকে কিছু বলিনি।

ঠিক এক বছরের মাথায় জন চাকরি ছেড়ে চলে গেল। সার্কাসের লাইন আর ভালো লাগে না, অন্যত্র কোথায় নাকি একটা চাকরি জুটিয়েছে। যে যেতে চায় তাকে আটকে রাখবে, মালিক সেই মানুষ নয়। বলা মাত্র বিদায় দিয়েছে। বোমারের স্বার্থেই মনে মনে আমি একটু নিশ্চিন্ত হয়েছি। ইদানীং বোমারকেও মাঝে মাঝে বিমর্ষ দেখতাম। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তক্ষুনি ভাঁড়ামি শুরু করে দিত। কিন্তু যা-ই করুক, আগের মতো অত যে হাওয়ায় ভাসে না, সে আমি ঠিকই লক্ষ্য করতাম। এতদিনে নিশ্চিন্তি।

কিন্তু সাতদিন না যেতে আমিই বিমূঢ় সব থেকে বেশি। মারজোরি নিখোঁজ হঠাৎ। কোথাও তাকে দেখলাম না, সন্ধ্যার খেলায় তার আইটেমও বাতিল সেদিন। খোঁজ নিয়ে যা শুনলাম, তাজ্জব ব্যাপার। মালিক মারভিনের কাছ থেকে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে সে-ও চলে গেছে।

সর্বক্ষণ গা জ্বলেছে আমার। রাতের খেলা শেষ হতে নাগাল পাওয়া মাত্র বোমারের ওপর চড়াও হয়েছি।—তুমি একটা আহাম্মক, তুমি একটা বুদ্ধু, কতদিন সাবধান করেছিলাম তোমাকে, তখন তো তেড়ে মারতে এসেছিলে—এখন? বেশ হয়েছে, যেমন গবেট তেমনি আক্কেল হয়েছে!

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। কটূক্তির ফলে বোমারেরও ক্ষেপে ওঠার কথা। কিন্তু তার বদলে স্বভাবসুলভ চপল গাম্ভীর্যে আমার দিকে তাকিয়ে ও চোখ পিট পিট করতে লাগল। শেষে বলল, আমি গবেট না গবেট তুই?

ওর হাবভাব দেখে আমার খটকা লাগল একটু।—কেন?

—মারজোরি আমাকে বিয়ে করবে না সেটা তুই এতদিন বুঝলি?

এই রসিকতার মর্ম উদ্ধার করা গেল না।—তুমি কবে বুঝেছিলে?

—কম করে চার মাস আগে।

—বোঝার পরেও মাইনের টাকাটা তুমি ওর হাতে তুলে দিতে?

ভালো মুখ করে জবাব দিল, ও যা খুশি করুক, আমি কথার খেলাপ করব কেন।...তাছাড়া যাকে ভালোবাসা যায় তাকে সব দিয়ে দিতেও গায়ে লাগে না। কত আর গেছে, হাজার কয়েক মাত্র, আরো দেরি হলে তো আরো যেত।

আরো যে যায়নি মুখে সেই তুষ্টির ভাব।—তুই একটা বোকারাম, ভাঁড়কে পারতে কেউ বিয়ে করে নাকি? বিয়ে নিয়ে কোন মেয়ে ভাঁড়ামি করতে চায় না, বুঝলি?

বুঝে নির্বাক আমি। আরো কিছু সমাচার শোনাল বোমার, মেয়েটা যে কত ঝানু আমি কল্পনা করতে পারিনি। মারভিন বিয়েতে মত না দেবার ফলে ক্ষেপে গিয়ে মারজোরি জনকে নিয়ে চাকরি ছেড়ে চেলে যেতে চেয়েছিল। বোমারের আগে ওরাই মালিকের কাছে অনুমতি চাইতে গেছল। জনের তখন চাকরি ছাড়তে আপত্তি। ফলে মারজোরি জনের ওপরেও মর্মান্তিক রেগে গেছল, আর সেই রাগেই বোমারের দিকে ঝুঁকেছিল। সেই কারণেই বোমার কাকে বিয়ে করতে চায় সেটা কর্তার কাছে

ফাঁস করতে বার বার নিষেধ করে দিয়েছিল। একই মেয়ে দুদিনের মধ্যে দু'জনকে বিয়ে করতে চায় শুনলে মালিক বাজে মেয়ে ভাববে না?

মারজোরির সঙ্গে বোমারের অত মেলামেশা দেখে মাস কয়েক আগে মালিক নিজেই একদিন বোমারকে ডেকে জনের কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছিল। তার মধ্যে বোমার নিজেই অবশ্য কিছু কিছু আঁচ পেয়েছে, ওদের আবার গোপন ভাব-সাব লক্ষ্য করেছে। নিজেই বলেছে ফ্র্যাংকি বোমারের চোখে ধুলো দেবে এমন শর্মা জন্মায়নি। আমি যখন প্রথম সাবধান করেছিলাম, তখন অবশ্য বিশ্বাস করেনি, উল্টে রাগ হয়ে গেছল। কিন্তু পরে নিজেই সব জেনেছে।

খানিক চুপ করে থেকে ও আবার বলল, ব্যাপার কি জানিস, ও হুট করে চলে গেল ভালোই হল, দিনের পর দিন এমনি না বোঝার ভান করে থাকতে আমার বড় কষ্ট হত—ভাঁড় বলেই কেউ টের পায়নি—এখন নিশ্চিন্ত।

কেন যেন এরপর ওকে আমি হাঁদা গবেটও বলতে পারিনি। ও যে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছে ওর হাব-ভাবে এমনও মনে হয়নি। এরপর থেকে দর্শককে বরং আরো বেশি হাসাতে পেরেছে। কিন্তু মাঝ রাতে এক-একদিন ঘুম ভেঙে দেখি ও বিছানায় চুপচাপ বসে আছে। একদিন টেনে শুইয়ে দিতে ও ছদ্মরাগে চোখ পাকিয়ে বলল, মারজোরিকে বুকে জড়িয়ে ধরার নরম-নরম স্বাদটা মনে করতে চেষ্টা করছিলাম—দিলি তো ব্যাগড়া!

চার

পরের বছর।

আমার জীবনের প্রথম স্মরণীয় বছর সেটা। আমার বয়স কুড়ি, সারার সতেরো। নিজের সঙ্গে ওই মেয়ের নামটাও পাশাপাশি রাখছি তার কারণ জীবনের এই স্মরণীয় নাটকের সে-ই নায়িকা।

কিন্তু সেই নাটক আকাশ থেকে পড়েছে। আমি উপলক্ষ মাত্র। নিয়ামক ওপরের একজন। অদৃশ্য থেকে কেউ কলকাঠি না নাড়লে এমন হয় না, হতে পারে না।

তখন আমরা প্রাচ্যদেশে ঘুরছি। নতুন দেশ দেখছি এ-টুকুই যা আনন্দের। জীবনযাত্রা তেমনিই বৈচিত্র্যহীন প্রায়। না, আনন্দের আরো একটু গোপন রসদ আছে। সারা—মনিব-কন্যা সারা জেনট্রি এই এক বছরে আরো ভর ভরতি হয়ে উঠেছে। ফলে ওকে দেখার লোভ আমার আগের থেকেও বেড়েছে। একবার বিপাকে পড়ার ফলে আমি দ্বিগুণ সতর্ক। দেখার চুরিটা কেউ টের পায় না, এমন কি বোমারও না। ওকে দেখলে দু'চোখ প্রসন্ন হয় এই পর্যন্ত —এর বাইরে আর কোন সম্ভাবনা আমার মনের কোণেও ঠাঁই পায় না। পাবে কেন, পাগল তো নই।

ঠিক জানি না, পরিবর্তন হয়তো একটু আমার মধ্যেও এসেছিল। এবারের ট্রিপে জন্তু-জানোয়ারগুলোকে খাওয়ানোর সম্পূর্ণ ভার আমার ওপর। বেনটন আসেনি। সে বুড়ো হয়েছে, মনিব তাকে মোটা টাকা দিয়ে বিদেয় করেছে।

একটু একটু করে ওই জন্তু-জানোয়ারগুলোকে প্রীতির চোখে দেখতে শুরু করেছি। মানুষের সঙ্গ যখন ভালো লাগে না তখন ওদের কাছে যাই। ওদের হাবভাব আচরণ দেখি। ওদের রাগ-অনুরাগের অনেকরকম কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করি। বেশ লাগে। হাতি ঘোড়া শিম্পাঞ্জি এমন কি বাঘগুলোও আমার বশ এখন। নির্বিঘ্নে আর নির্ভয়ে ওদের গায়ে পিঠে হাত বুলোতে পারি। ভাব হয়নি কেবল সিংহ দুটোর সঙ্গে। ওরা অপেক্ষাকৃত নতুন। যেমন হৃষ্টপুষ্ট, তেমনি মেজাজ দুটোরই। সর্বদাই যেন রাগে ফুলছে। মনিব যখন খাঁচায় ঢুকে ওদের নিয়ে খেলা দেখায় তখন ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করে আমার। প্রতি শো-তেই মনে হয় এই বুঝি দিলে থাবা বসিয়ে। কিন্তু মনিবেরও তেমনি বুকের পাটা আর তেমনি দাপট। এই মানুষটা সত্যি সত্যি পূর্বজন্মে সিংহ ছিল কিনা আমিও ভাবি সময় সময়। নইলে রক্ত-মাংসের মানুষের এত সাহস হয় কি করে!

না, সিংহ দুটো নয়, একটা সিংহ আর একটা সিংহী। লুই আর লিও নাম দুটোর। নাম দুটো মনিবের দেওয়া। চার মাস আগে এদিকে যাত্রা করার সময় পর্যন্ত বেনটনই ওদের খাবারটা দিয়েছে। এখন মনিবই বেশির ভাগ দিন নিজের হাতে ওদের দুটোকে খাবার দেয়, আমি সঙ্গে থাকি। মনিবের অনুপস্থিতিতে আমি দিই। এখনো ঠিক মনের মতো বশ হচ্ছে না বলেই হয়তো নিজের হাতে ওদের খাবারটা দিয়ে খাতির জমানোর চেষ্টা মনিবের। নতুন পশুর খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ আমি ঠিক ঠিক বুঝব না বলেও হতে পারে।

এই দুটোর সঙ্গেই শুধু আমি ভাব জমাতে চেষ্টা করিনি। মনে মনে লোভ আছে, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। কপালে আর গালে বাঘের থাবার দাগ মাটি নেবার আগে মিলাবে না। বাঘের তুলনায় এ-দুটো তো শয়তান আর শয়তানী বিশেষ। সব সময়েই মেজাজে ফুটছে। সেই কারণেই ও দুটো মনিবের সব থেকে প্রিয় কিনা জানি না। কম করে বছর দেড়-দুই না গেলে আমি ওদের ধারে কাছে ঘেঁষছি না। তারপর আস্তে আস্তে ও দুটোও বশ যে হবে জানা কথাই। মনিবের পাশে দাঁড়িয়ে মাংস ছুঁড়ে দিই বলে ওরা এখনই আমাকে অন্য চোখে দেখবে সেই ভরসা করা বাতুলতা মাত্র।

কিন্তু কর্তার মতো আমারও কেন ও দুটোকেই সব থেকে বেশি ভালো লাগে? কেন ঘুরে ফিরে দিনের মধ্যে বহুবার এই দুটোরই খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে? বনের স্বাধীনতা খুইয়ে নতুন এসেছে বলে? সেই আক্রোশের তাজা রূপ দেখতে ভালো লাগে? নাকি, স্বাধীনতা খোয়ানোর দুঃখ, অসম্পূর্ণতার একটা বেদনা আমারও নিভৃতে আছে বলে?

ঠিক বুঝি না।

নিজের এই পরিবর্তনটুকুর দরুন মনিবের সঙ্গে ইদানীং অনেক বেশি দেখা হয় আমার। তারও তো ওই স্বভাব। দিনের মধ্যে কতবার করে যে ঘুরে ফিরে দেখে সিংহ দুটোকে ঠিক নেই। আমার সঙ্গে যখন তখন দেখা হয়ে গেলে আগে বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাত। এখন আর তা করে না। আমার আকর্ষণটা টের পেয়েছে বোধহয়। মনে হয়, এই জন্যে ভিতরে ভিতরে একটু হয়তো খুশি আমার ওপর। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা তার স্বভাব নয়।

এই প্রাচ্যদেশে এসে অপ্রত্যাশিত দুটো ঘটনার সূচনা। তার একটার হদিস পেয়ে রসিক বোমারেরও দুই চক্ষু কপালে। প্রতিষ্ঠানের মালিক মারভিন জেনট্রির সঙ্গে এক মাঝবয়সী মহিলার যোগাযোগ। বছর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে বয়েস। সুশ্রী, কিন্তু বেজায় গম্ভীর। আমরা যে দ্বীপে আছি তার নাম বোর্নিও। মহিলা এখানকার অর্থাৎ প্রাচ্যদেশীয়া কিনা বোঝা গেল না। মুখের ছাঁদ ঠিক এখানকার মেয়েদের মতো নয়।

একদিন রাতের শো ভাঙতে মহিলাটি আপিস-ঘরের সামনে এসে একজনকে বলল মারভিন জেনট্রির সঙ্গে দেখা করতে চায়। নাম জিজ্ঞাসা করতে মাথা নেড়ে শুধু খবরটা দিতে অনুরোধ জানাল।

শ্রান্ত জেনট্রি নিজের তাঁবুতে সবে মদের গেলাস নিয়ে বসেছে। খবরটা জানাতে গেছলাম। শোনামাত্র মারভিন বিরক্ত।—কি নাম? কি জন্যে দেখা করতে চায়?

আমি জানালাম জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও মহিলা আর কিছু বলেনি।

—তাহলে চলে যেতে বল, এখন আমি ক্লান্ত।

ফিরে এলাম। আমার কেন যেন মনে হল খেলা দেখে যারা অভিনন্দন জানাতে আসে এই মহিলা তাদের একজন নয়। মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার মধ্যেও এক ধরনের মার্জিত গাম্ভীর্য লক্ষ্য করেছি। এখন দেখা সম্ভব নয় শুনে মহিলা মুখ তুলে অদূরের ছোট তাঁবুটার দিকে তাকালো একবার। ধীর স্থির চাউনি। তারপর কারো অনুমতির অপেক্ষা না করে সেদিকে চলল।

আমার হাঁ-হাঁ করে ওঠার কথা, বাধা দেবার কথা। কিন্তু মহিলার এমনি ঠাণ্ডা আত্মস্থ ভঙ্গি যে আমি কিছুই করলাম না। বোকার মতো তাকে অনুসরণ করলাম শুধু।

পরদা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। আমি অর্ধেক ভিতরে অর্ধেক বাইরে। আমি যে নিরপরাধ সে-কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজনবোধে আমার উপস্থিত থাকার তাগিদে। কিন্তু যে-দৃশ্য দেখলাম সেটা

বিস্ময়করই বটে। বিনা অনুমতিতে এ-ভাবে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মালিকের উগ্র মূর্তি। কিন্তু পরমুহূর্তে যেন এক বালতি বরফজলের ঝাপটা পড়ল মুখে। স্থানকালবিস্মৃত মূর্তির মতো চেয়ে রইল তার দিকে। কর্তার এমন মুখ আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

মহিলাও নিষ্পলক চেয়ে আছে তার দিকে। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস। এত সূক্ষ্ম যে লক্ষ্য করে না দেখলে চোখে পড়ে না। মনে হল, মালিকের এই অপ্রত্যাশিত বিস্ময়টুকু উপভোগ্য তার কাছে। তাই কথা বলছে না।

একটু বাদে বলল, নাম বলিনি, কারণ নাম হয়তো ভুলেই গেছ এতদিনে।...চিনতে পারছ?

ততক্ষণে যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটল মারভিনের। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, কি আশ্চর্য...তুমি!

কিছু বলার আগে মহিলা ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে মালিকের কাছে আমি যেন অপরাধী। চাপা গর্জন করে উঠল, গেট আউট!

পরদা ছেড়ে চোখের পলকে বাইরে আমি। কিন্তু বাইরে এসে পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে থাকল খানিকক্ষণ। কিন্তু কান পেতেও ভিতরের কথা শোনা গেল না।

অতঃপর আমাদের জল্পনা-কল্পনার পালা। বোমার এই প্রতিষ্ঠানের সব থেকে পুরনো লোক। অনেক ভেবেও সে এই গোছের কোন মহিলাকে আগে কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। তবে অনেক কাল আগের একটা শোনা ঘটনা তার স্মরণে এলো। শুনেছিল মারভিনের স্ত্রী জেসি জেনট্রির মুখে। বোমারের সঙ্গে জেসির খাতির ছিল, স্বামীর প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ উপছে উঠলে সেই ক্ষোভের মুখে অনেক কথাই বলত। অল্প বয়েস থেকেই তার স্বামী যে লম্পট একটি, তার নজির হিসাবে ঘটনাটা বলেছিল।

...প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। স্কটল্যান্ডে থাকতে মারভিন জেনট্রি বছর ষোল-সতেরোর একটি বড় ঘরের মেয়েকে নিয়ে দিন কতকের জন্য হাওয়া হয়ে গেছল। কিছুদিন বাদে এক সুদূর পল্লীতে হানা দিয়ে পুলিস তাদের ধরে। বিচারে মারভিনের কঠিন সাজা হবার কথা নাবালিকা হরণের দায়ে। কিন্তু ষোল-সতেরো বছরের এই নাবালিকা মেয়ে বার বার হলপ করে বলেছে, কেউ তাকে জোর করে বা ফুসলিয়ে নিয়ে যায়নি—সে নিজের ইচ্ছায় গেছে। উল্টে সেই-ই মারভিনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দূরে নিয়ে গেছে।

মেয়েটার কথা যে সত্যি নয় সকলেই জানত। সব থেকে বেশি জানত সেই মেয়ে নিজে। কারণ অতর্কিত দস্যুর মতোই মারভিন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছলো। স্ত্রীর কাছে মারভিন গর্ব করে সেই ঘটনার কথা বলেছিল। বলেছিল, ওই মেয়ে তার মধ্যে একটি সত্যিকারের পুরুষ আবিষ্কার করেছিল বলেই আদালতে মিছে কথা বলে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। নেশার ঝোঁকে জেনট্রি নাকি অনেক সময় স্ত্রীকে বলত, মেয়ের মতো মেয়ে এ-যাবৎ সে ওই একটিই দেখেছে। বলত, তার বাপ-মা ওই মেয়েকে নিয়ে হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে গেল বলেই জেসি আজ তার স্ত্রী।

সব শোনার পর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল এ-মহিলা সেই মেয়ে।

মহিলা তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এলো ঘণ্টাখানেক বাদে। তার সঙ্গে মারভিনও। এই এক ঘণ্টার মধ্যেই মারভিনের অন্যরকম মুখ। এই মুখ দেখলে কেউ তাকে রুক্ষ উগ্র মানুষ বলবে না। কি এক অব্যক্ত চাপা খুশিতে ডগমগ যেন।

অদূরের রাস্তায় প্রকাণ্ড ঝকঝকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। ওটা দেখলেই বোঝা যায় গাড়ির মালিক বেশ অবস্থাপন্ন। ড্রাইভারের আসন নিয়ে মহিলা নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে চলে গেল। হেলে-দুলে নিজের তাঁবুর দিকে চলল মারভিন জেনট্রি।

এর পরের ক'টা দিন একটা দ্রুত পরিবর্তনের জোয়ারে ভাসতে লাগলাম আমরা। প্রত্যেক দিন বেশ সকালে বেরিয়ে যায় মারভিন—ফেরে সেই বিকেলের শোয়ের আগে। সঙ্গে সেই মহিলা। মালিকের তাঁবুতে রাতের খাওয়া-পিনা সেরে ঘরে ফেরে।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমরাও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। মহিলার নাম ডরোথি—ডরোথি জেরোম। বিধবা। তিন ছেলের মা। বড়ছেলের বয়েস বছর পঁচিশ। মস্ত অবস্থা। আমাদের মালিকের

থেকেও বড় হতে পারে। মহিলার রাবারের ব্যবসা। এই বিশাল দ্বীপে তেল আর রাবার প্রধান শিল্প। এই দুই পণ্যের দরুন সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ এই দ্বীপটার।

প্রথম যোগাযোগের দিন পাঁচেকের মধ্যেই রাতের আবাস বদলালো মারভিন জেনট্রি। সব থেকে নামী হোটেলের দামী সুইট ভাড়া করল। সর্বত্রই তাই করার কথা। কিন্তু তাঁবুতে বাসই পছন্দ তার। দলের সঙ্গে থেকেও নিঃসঙ্গ।

সারা জেনট্রি তাঁবুতেই থেকে গেল, বাপের সঙ্গে দু'ঘরের সুইটএ থাকতে রাজি হল না। বাবার হটাৎ এ-রকম একটা পরিবর্তন দেখে বেচারী হকচকিয়ে গেছে। আমাদের মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায় আর ব্যাপারখানা বুঝতে চেষ্টা করে। মারভিন মেয়েকে সুইটএ নেবার জন্য একটুও পীড়াপীড়ি করেনি। বরং আমার ধারণা, এই ব্যবস্থাই তার কাম্য ছিল।

ডরোথি জেরোমের গাড়ি থেকে সেদিন একটি সুশ্রী ছেলেও নামল। বছর পঁচিশেক বয়েস। পরে জেনেছি, ওটিই মহিলার বড় ছেলে। নাম হেস্টার জেরোম। ওই মা-ই ছেলের সঙ্গে মনিব কন্যা সারার আলাপ করিয়ে দিল।

কিন্তু আলাপ যে এমন দ্রুততালে ঘন হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। হেস্টার দু'বেলা আসা শুরু করল। আর, এলে শিগগীর ফেরার নাম নেই। দূর থেকে তাকে দেখলেই সমস্ত মুখ হাসিতে ঠেসে সারা তাকে অভ্যর্থনা জানাবার আগ্রহে ছুটে বেরিয়ে যায়। আমি আর বোমার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। বোমার ঘটা করে চোখ পিট পিট করে।

মাত্র তিন দিনের পরিচয়েই আমার মনে হল ওরা যেন তিন বছরের সখা-সখী। দু'জনে হাত-ধরাধরি করে বেড়ায়, হাসা-হাসি করে, গল্প করে। আমার ধারণা, কোনো এক কালের প্রণয়ী-প্রণয়িণীর ছেলে-মেয়ে ওরা সেটা দু'জনেই জেনেছে। জেনেছে বলেই দ্রুততালের রোমাঞ্চকর ঘনিষ্ঠতা। আমি আর বোমার রীতিমতো গবেষণা শুরু করে দিলাম এর পর কি ঘটতে পারে।...

ডরোথি মিসেস জেনট্রি হবে, আর সারা মিসেস জেরোম! ভাবতে গিয়ে ভয়ানক অস্বাভাবিক লাগল আমার। ছেলে-মেয়ের বিয়েটা যদি বা হয়, ওদের বাপ-মা'র বিয়ে হতে পারে বলে আমার মনে হচ্ছে না। রাতারাতি পরিবর্তন শুধু কর্তারই দেখছি, মহিলার মিষ্টি মুখ সেই প্রথম দিনের মতই রাশভারী গম্ভীর সর্বদা। আত্মমর্যাদাবোধে ধীর ঠাণ্ডা।

সেদিন দুপুরের দিকে সারাকে না দেখে আমি এদিক-ওদিক খুঁজলাম একটু। হেস্টারকেও আসতে দেখিনি...তাহলে গেল কোথায়? চার দিকে জঙ্গল আর পাহাড়ের রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার মেয়ে নয় সারা। মনের তলায় অস্বস্তিকর সংশয় উঁকিঝুঁকি দিল আমার। অনাগত কিছুর গন্ধ পাওয়া আমার বোধহয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।

জঙ্গল-ঘেঁষা পাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। চোখ-কান সজাগ আমার।

প্রায় মাইল খানেক এগোবার পর এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালাম। জঙ্গলের পাশের নির্জন রাস্তা-সংলগ্ন উঠোনের মতো একটু পাহাড়ী জায়গায় ছোট একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। দেখেই চিনলাম। হেস্টারের গাড়ি। অন্য গাড়ি চলাচলের অসুবিধে হবে বলেই গাড়িটা ওখানে রাখা হয়েছে।

গাড়িতে কেউ নেই। শূন্য।

আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম খানিক। মাথার মধ্যে কি হতে থাকল সঠিক বলতে পারব না। আর যা-ই হোক ঈর্ষা নয়। কারণ তখনো আমি মনিব-কন্যাকে নিয়ে কোনো অবাস্তব স্বপ্নের ধারে-কাছে ঘেঁষিনি। একটা অদ্ভুত অস্বস্তি মাথার মধ্যে দাপাদাপি করতে লাগল।

...রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। নিবিড় জঙ্গল নয়। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা। সন্তর্পণে এগোতে এগোতে অমনি একটা ফাঁকা জায়গার সামনে আমার পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

—ও হেস্টার, প্লীজ প্লীজ!

একটা বিশাল গাছের নীচে ওরা দু'জন। সারা মাটিতে শুয়ে, ওর বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে হেস্টার। ঠোঁটে গালে অজস্র চুমু খাচ্ছে, নিজের বুক দিয়ে ওর বুকটা পিষছে একটা হাত বেসামাল হয়ে ওর সর্বাঙ্গ অবশ করে দিতে চাইছে। তার মতলব বুঝেই মেয়েটা ঘাবড়েছে। বুক থেকে তাকে সরাতে চেষ্টা করে মিনতি জানাচ্ছে, ও হেস্টার, প্লীজ নট দ্যাট—

হেসে উঠে হেস্টার আরো ভালো করে দখল নিতে চেষ্টা করল। হালকা অনুশাসনের সুরে বলল, আচ্ছা ভীতু মেয়ে তো! মায়ের মুখে শুনেছি তোমার বাবা একটা দুর্ধর্ষ পুরুষ ছিল, তার মেয়ে এই!

—ও হেস্টার, প্লীজ, প্লীজ!

মাথাটা ঝিমঝিম করছিল আমার। ঝোপের আড়ালে থাকা গেল না। ওদের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল হেস্টার। সারাও। ওকে ছেড়ে দিয়ে হেস্টার ঘুরে বসল। সারার সমস্ত মুখ টকটকে লাল। পলকের মধ্যে বেশ-বাস বিন্যস্ত করে নেবার চেষ্টা।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হেস্টার গর্জন করে উঠল, হু আর ইউ?

জবাব না পেয়েও বুঝল বোধহয় কে আমি। এর মধ্যে অনেকবার দেখেছে। এবারে ঘুষি বাগিয়ে দ্বিগুণ চিৎকার করে এগিয়ে এলো।—গেট্ আউট ফ্রম হিয়ার, ব্লাডি ব্যাস্টার্ড!

আমারও কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল তাতে কোনো ভুল নেই। ভয় পাওয়ার বদলে দু'পা পিছিয়ে এসেছি। তারপর কোমরে গোঁজা সর্বক্ষণের সঙ্গী ছোরাটাকে খাপ থেকে টেনে বার করেছি। ওর চোখে চোখ।—আসবে?

ছোরা দেখে হোক বা এ-রকম ঠাণ্ডা অভ্যর্থনার দরুন হোক, হেস্টার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর হন-হন করে প্রস্থান করল।

আমি ঘুরে সারার দিকে তাকালাম। এমন পরিস্থিতিতে পড়ে ও ঝলসেই উঠল হঠাৎ।—তুমি আমাকে ফলো করছিলে?

আমি নির্বাক। ওর দিকে চেয়ে আছি। এটাই বোধকরি ওর কাছে সব থেকে বেশি অস্বস্তিকর। ঘুরে হন-হন করে এগিয়ে চলল সে-ও।

—দাঁড়াও।

থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাকালো।

—বেরুবার পথ ও-দিকে নয়, এদিকে।

অগত্যা ফিরে আবার আমার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল।

গাড়ি নিয়ে হেস্টার উধাও হয়েছে। সারা আগে আগে হাঁটছে। আমি গজ দশেক পিছনে। খানিক আগে কম করে বিশ গজ পিছনে ছিলাম। অর্থাৎ আপনা থেকেই সারার হাঁটার গতি কমছে লক্ষ্য করছি।

ব্যবধান আরো কমে আসতে লাগল।...পাঁচ গজ...তিন গজ...এক গজ।

তারপর পাশাপাশি।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম। মুখখানা ফ্যাকাশে এখন।

টনি—

গলার স্বর করুণ। চাউনিটা আরো।

আমি জিজ্ঞাসু।

—তুমি ভালো লোক টনি।...বাবাকে কিছু বোলো না। বলবে না তো?

আমার মনে হল এ-রকম প্রতিশ্রুতি দেবার শর্ত হিসেবে ওকে যদি একবার বুকেও টেনে নিই, ও তাও হজম করবে হয়তো। মাথা নাড়লাম বলব না।

সারার মুখের ফ্যাকাশে ভাব কমল একটু।—ঠিক তো?

মাথা নাড়ালাম। ঠিক।

একটু চুপ করে থেকে সারা আবার বলল, তুমি এসে ভালোই করেছ, হেস্টারটা এত পাজী ভাবতে পারিনি।

আমি একটিও মন্তব্য করিনি।

রাতের শো ভাঙতে মনিবের তাঁবুতে আমার ডাক পড়ল। আর মাত্র দু'দিনের দুটো শো হলেই এখানকার পাট ভেঙে আমাদের দ্বীপের একেবারে অন্য প্রান্তে যাবার কথা। ট্রেনে গেলে মাঝে একদিন, আর ট্রাকে গেলে মাঝে দেড় দিনের দীর্ঘ পথ। ভাবলাম, মনিবের মুখ সন্ধ্যা থেকে গম্ভীর দেখছি হয়তো এই কারণেই। তার প্রিয়তমা ডরোথি জেরোমের মুখখানাও থমথমে। হয়তো বা বিচ্ছেদ জোড়বার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে দুজনের মধ্যে একটু মন-কষাকষি হয়েছে। কিন্তু তাঁবুতে আমার ডাক পড়তে চমকেই উঠলাম। তাহলে কি অন্য কিছু?

যেতে গিয়ে সামনে সারার সঙ্গে চোখাচোখি। অজানা আশঙ্কায় তার সমস্ত মুখ বিবর্ণ আবার। চাউনিতে প্রতিশ্রুতি রক্ষার করুণ মিনতি।

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম।

ভিতরে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র মারভিন চাপা হুঙ্কার ছাড়ল—আজ দুপুরে হেস্টারকে অপমান করেছিস?

জবাব না দিয়ে আমি সভয়ে একবার ডরোথি জেরোমের দিকে তাকালাম। তার স্থির কঠিন মুখ. মনিবের দিকে ফিরলাম।

আরো নির্মম আক্রোশে মনিব আবার জিজ্ঞাসা করল, হেস্টারকে ছোরা নিয়ে তাড়া করেছিলি?

এবারে জবাব দিলাম। বললাম, সে আমাকে মারতে এসেছিল।

—কেন মারতে এসেছিল?

সারার করুণ মুখখানা চোখে ভাসল। জবাব না দিয়ে আমি মাথা নীচু করলাম। এক লাফে চোয়ার ঠেলে উঠে মারভিন এক হাতে আমার চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে টেবিলের ও-পাশে নিয়ে গেল।—কেন মারতে এসেছিল?

আমি নির্বাক। কেন আমাকে এদিকে টেনে নিয়ে এলো জানি। এদিকের আলনায় তার চাবুক ঝুলছে।

ক্ষিপ্ত আক্রোশে চাবুক চলল। আমার কাঁধ পিঠ হাতে ফেটে চৌচির হয়ে যেতে লাগল। এক-একটা ঘা পড়ছে আর জ্বলে জ্বলে যাচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখছি, প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে আছি। মুখ দিয়ে একটা যাতনার শব্দও বার করছি না। এই কারণেই বোধহয় মনিবের আক্রোশ বাড়ছে। হাতের চাবুক আরো নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। চাবুক ফেলে শেষে পাগলের মতো কিল চড় লাথি।

ডরোথি জেরোম তেমনি স্থির গম্ভীর।

তাঁবুর বাইরে অনেকে এসে জড়ো হয়েছিল, বোমারও। বেরিয়ে আসতে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলল। শরীরের যাতনায় আমি প্রায় অচেতন। আত্মস্থ হয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম একবার ...সামনে সারা—তার চোখে নির্বাক ত্রাস।

রাত্রির মধ্যেই আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আর আমি মারভিন জেনট্রির দলের সঙ্গে থাকব না। না খেয়ে মরি তাও ভালো, ক্রীতদাসের জীবন এই শেষ। এর আর নড়চড় হবে না। উত্তর বোর্নিওতে দশ দিনের প্রোগ্রাম। এর মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে সেখানে থেকে জাহাজে ওঠা অসম্ভব হবে না হয়তো। তা যদি না পারি তো সকলের সঙ্গেই সমুদ্র পাড়ি দেব। মেন ল্যান্ডে পা দেবার পর মারভিন জেনট্রি আর আমার মুখ দেখবে না।

সংকল্পের কথা কাউকে বললাম না। বোমারকেও না। কারো কোনরকম বাধা দেবার রাস্তাও রাখব না।

পরদিন শয্যা ছেড়ে উঠতেই পারলাম না। সর্বাঙ্গে যাতনা। জ্বালা। জ্বরও হয়েছে একটু বুঝতে পারছি। কেন এত বড় একটা মার খেলাম, কেউ জানে না। সহানুভূতি দেখাতে এসে সকলেই উৎসুক। মারভিনের গর্জনের ফলে আমি যে ডরোথি জেরোমের ছেলে হেস্টার জেরোমকে ছোরা নিয়ে তাড়া করেছিলাম, বাইরে থেকে একথা কেউ কেউ শুনেছে। সকলের মধ্যে সেটাই রাষ্ট্র হয়েছে।

কিন্তু কেন কেন কেন? কেন আমি ছোরা নিয়ে তাড়া করলাম? আমার কাছে এসে এরই জবাব খুঁজছে সকলে।

আশা করেছিলাম সারা চুপি চুপি এসে একবার অন্তত আমাকে দেখে যাবে। এলো না। পরে যখন দেখা হয়েছে তখনো একটা কৃতজ্ঞ চাউনি দিয়েও আমাকে খুশি করতে চেষ্টা করেনি। উল্টে রাগ-রাগ ভাব। বিরক্ত মুখ করে দূরে সরে গেছে।

অনুমান, ওর সতেরো বছরের জীবনের দুর্বলতম মুহূর্তের সাক্ষী আমি—রাগটা এই কারণে। আমি গিয়ে না পড়লে ব্যাপারটা কোন চরমে পৌঁছত তাও ভাবছে না হয়তো...হয়তো বা এই ক'দিনের মধ্যে হেস্টারকে ভালোই বেসে ফেলেছে। তাই, প্রাথমিক ভয়টা কেটে যেতে এখন আমার ওপরে বিরূপ।

বোমার আমাকে খবর দিল, গত কাল রাতে মনিব তার হোটেলের সুইটে যায়নি, এখানেই থেকেছে। আজও বেরোয়নি। থমথমে মুখ সারাক্ষণ। সকাল থেকেই মদ গিলছে।

আমি নিস্পৃহ। মারভিন জেনট্রি আর আমার মনিব নয়।

সেদিন সকলেই ভালো করে লক্ষ্য করেছে, ডরোথি জেরোম একবারও তার প্রিয়-সন্নিধানে আসেনি। আর সেই রাতে খেলা দেখাবার সময় আমাদের তেজী সিংহ দুটো নাকি মনিবের হাতে বেদম মার খেয়েছে।

পরদিন। আমি খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি। বোমার যতটুকু সম্ভব আমার পরিচর্যা করেছে। গায়ে তেল দলে দিয়েছে, ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে, আর ক্ষুব্ধ স্বরে নিজের মনেই বক্ বক্ করে গেছে।—বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ালে এই রকমই ফল হয়। মনিবের মেয়ে যার সঙ্গে খুশি প্রেম মজুক তাতে কার কি, তার জন্যে হিংসা কেন—একজনকে ছোরা দেখিয়ে সরিয়ে দিলেই কি মনিব তার চাকরকে জামাই করে বসবে? যেমন কর্ম তেমনি ফল—বেশ হয়েছে, আক্কেল হয়েছে, ইত্যাদি।

আমার মুখ সেলাই। একটি কথাও বলিনি, একবারও প্রতিবাদ করিনি। বোমার মহা চতুর, কি কথা থেকে কি কথা টেনে বার করবে ঠিক নেই। সে জানালো মালিকের প্রেয়সী আজও আসেনি আর মনিবের সেই রকমই থমথমে মুখ। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তাঁবু থেকে বেরোয়নি—সমস্ত দিন কেবল মদ গিলেছে।

রাত তখন একটা দেড়টা হবে। আমার ঘুম আসছে না। পাশে বোমার গভীর নিদ্রায় [illegible] বাইরে অনেকেই জেগে আজ। ম্যানেজার তাদের নিয়ে গোছগাছে ব্যস্ত। সমস্ত রাত কাজ চলবে। আগামী কাল বেলা দশটা-এগারোটার মধ্যে উত্তর প্রান্তে রওনা হবার নির্দেশ।

নিঃশব্দে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম। যেদিকে লোকজন সেদিকে না গিয়ে পায়ে পায়ে উল্টো দিকে চললাম। এই দিকে বাঘ-সিংহের খাঁচা। বাঘগুলো কুকুরের মতো শরীর গুটিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওদের বিরক্ত না করে সিংহের খাঁচার দিকে এলাম। এ দুটোও গা ছেড়ে বিশ্রাম করছে। আমাকে দেখে সিংহটা একবার মাথা তুলে তাকালো। গলা দিয়ে মৃদুগম্ভীর গোঁ-গোঁ শব্দ বার করল একটু। অর্থাৎ মানুষ দেখে খুশি নয়।

বুকের ভিতরটা টন টন করছে কেমন। এইসব পশুগুলোকে যে কত ভালবেসে ফেলেছি নিজেও জানতুম না। বশ মানেনি বলেই হয়তো সিংহ দুটোর ওপর আরো বেশি টান আমার। খাঁচার আর একটু কাছে এসে দাঁড়াতে আবার মাথা তুলে তাকালো আমার দিকে। আবছা অন্ধকারে দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে। ওকেই বিড়বিড় করে বললাম, আমি তো চলে যাচ্ছি রে, তোদের সঙ্গে ভাব আর হলই না।

চমকে ঘুরে তাকালাম। এদিকে আসছে কে। আর একটু এগোতে চিনলাম।...পা দুটো বেশ টলছে তার। প্রতিষ্ঠানের মালিক মারভিন জেনট্রি।

তাকে দেখে নিজেকে আমি পাথরের মতো শক্ত করে তুলতে চেষ্টা করলাম।

মারভিন কাছে এলো, ঝুঁকে নিরীক্ষণ করে দেখল আমাকে। নাকে মদের গন্ধের ঝাপটা লাগল একটা। পশুগুলোর ওপর আমার টান আগেও অনেকদিন লক্ষ্য করেছে। এখন কি দেখছে জানি না।

—কি করছিস?

গলার স্বরটা ততটা রুক্ষ নয়। নেশার দরুন সম্ভবত।

—কিছু না।

—ঘুমোসনি কেন?

জবাব দিলাম না। দুকাঁধে হাত দিয়ে মারভিন আমাকে সোজা তার দিকে ফেরালো। চাপা আগ্রহে গলার স্বর আরো নরম।—হেস্টারকে কেন ছোরা নিয়ে তাড়া করেছিলি আজ বলবি?

আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে রক্ত জমাট বাঁধছে। তার দিকেই চেয়ে আছি। নিরুত্তর।

—মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও বলে হিংসেয়। ওর কথা আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না...ও অনেকটা ওর মায়ের মতো হয়ে উঠেছে...হেস্টারকে ছোরা নিয়ে তাড়া করেছিলি কেন?

আমি চেয়ে আছি। চোখে চোখ। বললাম, আপনার চাবুকটা নিয়ে এসে চেষ্টা করুন।

অর্থাৎ, আজও আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না। মারভিন ঝুঁকে ছিল, আস্তে আস্তে টান হয়ে দাঁড়াল। কোন কর্মচারীর মুখ এ-রকম উক্তি আর বোধহয় শোনেনি। তাই রাগ যেমন, বিস্ময়ও তেমনি।

ঠাস করে গালে একটা চড় পড়ল। তারপর টলতে টলতে চলে গেল। চড়ের জ্বলুনি টের পাচ্ছি। কিন্তু স্থির ঠাণ্ডা আমি। আজ যন্ত্রণার থেকে আনন্দ বেশি। মারভিন অদৃশ্য হতে ঘুরে একবার খাঁচার দিকে তাকালাম। সিংহটার সঙ্গে এবার সিংহীটাও মাথা তুলে আমাকে দেখছে।

তাঁবুতে ফিরে এলাম। ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি।...সারা জেনট্রি বাপকে বলেছে আমি হিংসেয় ছোরা বার করেছিলাম। এই বলে বাপের কোপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছে। শোনার পর থেকে একটা হিংস্র বাসনা সত্যিই আমার মাথার মধ্যে জ্বলছে। যা আগে কখনো হয়নি। যেমন করে ও হেস্টারের কবলে গিয়ে পড়েছিল, ঠিক তেমনি করেই ওকে এবার নিজের দখলে টেনে আনতে ইচ্ছে করছে।

তার থেকেও বেশি নির্মম নিষ্ঠুর দখলে।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার মধ্যেই সারি সারি ট্রাক চলল উত্তর বোর্নিওর পথে। বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে আমি শুধু যেতে দেখলাম।

মাত্র আধঘণ্টা আগে বোমার জানিয়েছে, এই দলের সঙ্গে আমি যাচ্ছি না। আমার যাত্রা আগামী কাল, কর্তার সঙ্গে। মারভিন আরো একটা দিন থাকবে এখানে। অতএব সারাও থাকবে। একজন লোক দরকার—তাই আমিও থাকব।

কিছু মালপত্র সহ সিংহ দুটোও আমাদের সহযাত্রী হিসেবে থেকে গেল। এখনো যে একরোখা স্বভাব ও-দুটোর, কর্তা ওদের নিজের তদারকের আওতায় রাখতে চায়। আমি ভিতরে ভিতরে গজরাতে লাগলাম। মালিকবিহীন আগের দলের সঙ্গে যেতে পারলে হয়তো এই একদিনের মধ্যেই সকলের অলক্ষ্যে চলে যাবার সুযোগ মিলত।

জায়গাটা ভয়ানক ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। আধখানা মাঠ জুড়ে ছিলাম এতদিন। এখন দুটো মাত্র তাঁবু। আমারটা খুবই ছোট। মালিকেরটা মাঝারি। তার তাঁবুর মাঝখানে ত্রিপলের পার্টিশনের ওধারে মেয়ে থাকে।

ট্রাকগুলো সব অদৃশ্য হয়ে মারভিন নিজের তাঁবুতে ঢুকে মদ নিয়ে বসল। আমি ভেবেছিলাম মেয়েকে নিয়ে সে হোটেলের সুইটে চলে যাবে। গেল না। আমার মনে হল সে কারো বা কোনো কিছুর প্রতীক্ষায় আছে। এক-একবার এসে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে, আবার ভিতরে ঢুকে মদ গিলছে।

সারা জেনট্রি একান্ত নিঃসঙ্গভাবে নিজের মনেই ঘুর ঘুর করছে। ইচ্ছে থাকলেও আমার দিকে ঘেঁষছে না। আমার মুখ দেখেই সম্ভবত। তাছাড়া নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন তো বটেই। চোখাচোখি হলে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে আমি চাকর বই আর কিছু নই।

...আমিও তফাতেই থেকেছি। কারণ, আমার ভয় ধরেছে। ভয় নিজেকেই। আমার বাসনার দরুনই কি ওপরঅলার এই কারসাজি, মালিকের এই মতি। নির্মম ক্রোধে ওই মেয়েটাকে যে দখলের আওতায় পেতে চেয়েছিলাম—সেই সুযোগ এগিয়ে আসছে? আমার মুখের একটু সদয় ভাব দেখলে সারা

হয়তো খুশি হয়েই কথা বলতে এগিয়ে আসত। মানুষ বোবা হয়ে কতক্ষণ থাকতে পারে? কিন্তু সদয় মুখ দেখছে না। নিজের মতিগতির ওপর এখন বিশ্বাস কম বলে মুখের ওপর ক্রুর আবরণ টেনে আমিই ওকে তফাতে সরিয়ে রাখছি।

পরদিনও সকাল দশটা পর্যন্ত আমাদের যাবার কোনো লক্ষণ নেই। মারভিনের নীরব অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, ছটফটানি বাড়ছে, মদের মাত্রা বাড়ছে—সবই আমি লক্ষ্য করছি।

খানিক বাদে মারভিন জেনট্রি তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে ইশারায় ডাকল আমাকে। গেলাম। একটা মুখ-আঁটা খাম আমার হাতে দিল। কোথায় কার হাতে চিঠিটা দিয়ে জবাব আনতে হবে বুঝিয়ে আবার ভিতরে ঢুকে গেল।

খামের ওপর ডরোথি জেরোমের নাম। তারই হাতে দিতে হবে।

ভয় ধরার কথা। মহিলা নিজের চোখের সামনে আমাকে আধমরা হতে দেখেছে। কিন্তু তার ছেলে দেখেনি। আওতার মধ্যে পেলে সে হয়তো আমাকে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু এই ক'দিনে আমারও ভিতরটা ওলট-পালট হয়ে গেছে। সমস্ত ভয়ডর উবে গেছে। ঠাণ্ডা মুখেই আমি চিঠি পৌঁছে দিতে চললাম। চিঠিটা খুলে পড়ার লোভ অনেক কষ্টে সংবরণ করা গেছে।

শহরের বুকে হাল-ফ্যাশনের মস্ত আপিস-বাড়ি জেরোম অ্যান্ড সন্স্-এর হদিস পেতে একটুও সময় লাগল না। ভিতরে ঢুকতে সামনা-সামনি দেখা যার সঙ্গে, সে হেস্টার। আমাকে দেখামাত্র দুই চোখ ঝকঝকে দুটো ছুরির ফলার মতো হয়ে উঠল।

—হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

—মিসেস জেরোমের নামে চিঠি আছে। মালিক পাঠিয়েছেন।

—দেখি?

দেখালাম। তবে হাতে দিলাম না।

ছোঁ মেরে খামটা হাত থেকে নিয়ে নিল। উল্টে-পাল্টে দেখল একবার। ক্রুদ্ধ দুই চোখ আমার মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে গটগট করে চলে গেল। অদূরের একটা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে।

একটু বাদে হেস্টার দরজা ঠেলে আবার বেরিয়ে এলো। একটু আঙুল নেড়ে কুকুর ডাকার মতো করে আমাকে ডাকল। এগিয়ে যেতে আমাকে নিয়ে দরজা ঠেলে আবার ভিতরে ঢুকল।

মস্ত টেবিলের ও-ধারে রিভলভিং চেয়ারে বসে মিসেস ডরোথি জেরোম। সেই রকম নয়, তার থেকেও বেশি ঠাণ্ডা বেশি কঠিন মূর্তি।

আমার দিকে তাকালো। দেখল কয়েক পলক।—জবাব নিয়ে যেতে বলেছে?

আমি মাথা নাড়ালাম। তাই।

চিঠিটা খামসুদ্ধু কুটি-পাটি করে ছিঁড়ল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ওগুলো কার্পেটের ওপরে ফেলে সজোরে পায়ে করে ঘষতে লাগল।

—বলোগে এই জবাব দিয়েছি।

ফিরে আবার চেয়ারে বসার আগে ছেলের দিকে তাকালো একবার। সেই ঝাঁঝালো দৃষ্টির ঘায়ে ছেলেও সঙ্কুচিত। চাউনিটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল আমার।

বেরিয়ে এলাম। পিছনে হেস্টার।—হেই!

ফিরে তাকালাম। আমাকেই ডাকছে। রাগের বদলে একটু হাসি-হাসি মুখ। এগিয়ে এসে ঈষৎ অন্তরঙ্গভাবেই আমাকে আর একদিকে নিয়ে চলল। অপেক্ষাকৃত একটা ছোট ঘরে ঢুকল। এটা তারই খাস কামরা বোঝা গেল। আমাকে বসতে বলে নিজেও বসল। আমি তক্ষুনি বুঝে নিলাম হঠাৎ মেজাজের এই পরিবর্তন মতলবশূন্য নয়।

—চা না কফি?

—কিছু না।

—ও ফরগেট্ এভরিথিং। এখন আর তোমার ওপর আমার একটুও রাগ নেই।

রাগ ছিল কিনা সেটা একটু আগের সাক্ষাতেই বোঝা গেছে। আমি নির্বাক এবং মনে মনে প্রস্তুত।

—তোমার নাম কি হে?

—টনি।

—মায়ের মুখে শুনলাম আমাকে ছোরা দেখাবার জন্য মালিক তোমাকে বেজায় পিটেছে। অত মার খেয়েও মুখ বুজে তার তাঁবেদারি করছ। তোমার দোষ কি, তুমি তো প্রভুভক্তের কাজই করেছিলে—

একটা ষষ্ঠ চেতনা দ্রুত কাজ করছে। মতলব বোঝার জন্যেই ইন্ধন যোগানো দরকার। বললাম, প্রায়ই মারে—এই দ্বীপ ছাড়ার পর এ-রকম মালিকের কাছে আর থাকব না ঠিক করেছি।

—তাই নাকি? উৎসুক এবং খুশি।—এই দ্বীপ ছাড়ার দরকার কি, কত মাইনে দেয় মালিক তোমাকে?

বললাম।

—মাত্র! ঠোঁট উল্টে দিল। তার বদলে এ-রকম মার-ধোর!...আচ্ছা, আমি যদি তার তিনগুণ মাইনে দিই তোমাকে, এখানে থাকবে? তুমি খুব বিশ্বস্ত লোক আমি একদিনেই বুঝে নিয়েছি, তাই...

টোপটা জোরালো করার জন্য মুখে খুশির ভাব ফোটালাম একটু। লোভে পড়তে পারি সেই আঁচ দিলাম।

সোৎসাহে হেস্টার আর একটু সামনের দিকে ঝুঁকল।—তোমরা কবে যাচ্ছ এখান থেকে?

না-জেনেও জবাব দিলাম, বোধহয় কাল—দলের সব তো চলে গেছে, আমরা তিনজনেই আছি শুধু।

—কে কে? আরো বেশি উৎসুক।

—মালিক, সারা, আমি।

—আর সকলে চলে গেছে?

মাথা নাড়লাম। তাই।

আনন্দে দু'চোখ চক চক করে উঠল হেস্টারের।—আচ্ছা, সারা তোমাকে বিশ্বাস করে খুব?

আবারও মাথা নেড়ে জানালাম, করে।

—আচ্ছা, এক কাজ করতে পারো? তিন গুণ মাইনের চাকরি তো দেবই, তাছাড়া নগদ হাজার পাঁচেক টাকাও দেব তোমাকে।...করবে?

—বলুন। মালিককে শিক্ষা দেবার জন্য আমি সব করতে পারি।

—সারাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সন্ধ্যার পর একবার এদিকে নিয়ে আসতে পারো? যেখানে বলব সেখানে এনে দিতে পারলেই নগদ পাঁচ হাজার টাকা।

—কেন?

—কেন জানো না! তুমি কি বোকা নাকি?

—সারাকে বিয়ে করতে চান?

—বিয়ে!...আপত্তি ছিল না, বেশ মেয়েটা, কিন্তু বিয়েতে মা রাজি হবে না। তুমি তো নিজের লোক এখন, তোমাকে খুলেই বলি ব্যাপারখানা। বাবা মারা যাবার পর মায়ের মাথাটা কেমন গণ্ডগোল হয়ে যায়। অনেক চিকিৎসা-টিকিৎসা করার পর এখন একটু ভালো বটে, কিন্তু সাঙ্ঘাতিক রাগ। মাথায় কিছু চাপলেই হল।...বহুকাল আগে তোমার মালিক ওই মারভিন মায়ের ওপর খুব অত্যাচার করেছিল, ইয়ে, যাকে বলে পাশবিক অত্যাচার। মা আমাকে নিজের মুখে বলেছে, তার তখন ওই সারার মতন বয়েস। এতকাল বাদে মারভিনকে দেখে গোঁ চেপেছে প্রতিশোধ নিতে হবে, মারভিনকে বুঝিয়ে দিতে হবে তার ছেলেও কম মরদ নয়।...এখন আমি পড়েছি ফ্যাসাদে, মা আমাকে পয়লা নম্বরের কাপুরুষ ভাবছে...মাথায় ওই রকম ভূত চাপে মাঝে মাঝে। তোমার কোন ভয় নেই, মা যদি দেখে মারভিনের

মেয়েকে আমি নিজের কবলে আনতে পেরেছি, তাহলেই হল—যা বলব তাই বিশ্বাস করবে, আসলে আমি মেয়েটার কোনোরকম ক্ষতি করব না, বুঝলে?

শুনে আমি স্তম্ভিত ভিতরে ভিতরে। দুনিয়ায় এমন পাগলও আছে জানা ছিল না। সারাকে একবার হাতের মুঠোয় পেলে এই ছেলেও ক্ষতি করবে কিনা সে-ও ভালোই অনুমান করতে পারি। জঙ্গলে যে মূর্তি দেখেছি ভোলবার নয়।

হেস্টার আবার বলল, তা ছাড়া তোমার মালিকের কিছু শাস্তিও প্রাপ্য। ওই চিঠিতে বার বার করে লিখেছে আজ সন্ধ্যার পর অতি অবশ্য মা যেন তার টেন্টে যায়। এই বয়সে সে আবার বিয়ে করার জন্য ক্ষেপেছে।

মালিকের মেয়েকে কখন কোথায় পৌঁছে দিতে হবে বুঝে নিয়ে আমি উঠলাম। হেস্টার তক্ষুনি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে দিতে চেয়েছিল। আমি বলেছি সব একসঙ্গে নেব।

ফিরে দেখলাম, মারভিন উদগ্রীব মুখে তাঁবুর সামনের উঠোনে পায়চারি করছে। আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। দুই চোখ আমার মুখের ওপর চক্কর খেতে লাগল।

আমি সামনে আসতে হাত বাড়াল। চিঠির জবাবের প্রত্যাশা। বললাম, লিখে জবাব দেননি।

উগ্র দু'চোখ আবার আমার মুখের ওপর থমকাল।—কি বলেছে?

—আপনার চিঠি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে ঘষে বলছে, তোমার মালিককে গিয়ে বল এই জবাব দিলাম।

স্তব্ধ খানিকক্ষণ। রাগে মুখটা তেলতেলে দেখাচ্ছে। ফেরার উদ্যোগ করতে আমি বললাম, তারপর তার ছেলে হেস্টার আমাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছিল।

মারভিন নিরীক্ষণ করে দেখল একটু। মারধোর করেছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু বোঝা কঠিন, কারণ ভিতরে বাইরে আমিও তেমনি ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত।

—কোথায়?

—তার অফিস-ঘরে।

লক্ষ্য করলাম, অদূরের তাঁবুর বাইরে সারা এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা কি প্রসঙ্গে কথা কইছি, অনুমান করতে চেষ্টা করছে।

মারভিন অসহিষ্ণু।—কেন? হেস্টার কি বলেছে?

—বলেছে, তার কাছে থাকলে আপনি যা দেন তার তিন গুণ মাইনে দেবে। আর একটা কাজ করে দিলে আজই নগদ পাঁচ হাজার টাকা গুনে দেবে।

মারভিনের মুখ লাল হয়ে উঠছে আবার। আরো বেশি তেলতেলে দেখাচ্ছে। ঝাঁঝিয়ে উঠল, কি কাজ?

—আপনার মেয়েকে সন্ধ্যার পর ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার হাতে পৌঁছে দিতে হবে। কোথায় তাও বলে দিয়েছে—

সঙ্গে সঙ্গে মারভিন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। উন্মত্ত আক্রোশে দু'হাতে আমার গলা টিপে ধরল।—নিমকহারাম, বেইমান! এতবড় অপমানের পর আজ মুখ বুজে থাকলি কেন, আজ তোর ছোরা বার হল না কেন?

ওদিকে থেকে সারা অস্ফুট আর্তনাদ করে ছুটে এলো।—ড্যাডি!

শক্ত হাতে মারভিনের হাত সরিয়ে গলা ছাড়িয়ে নিলাম। বললাম, এর থেকে অনেক বড় অপমানের ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছিল বলে সেদিন ছোরা বার হয়েছিল। আপনার সেটা সহ্য হয়নি।

থমকালো একটু। মেয়ের দিকে ঘুরল। থতমত খেয়ে আর সেই সঙ্গে হয়তো বা ঘাবড়ে গিয়ে সারা জেনট্রি ছুটে পালাল।

মারভিন আমার দিকে তাকালো আবার।—সেদিন কি হয়েছিল?

—আপনার মেয়েকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে গালে চড় পড়ল একটা।—বেয়াদব! আমি তোকে জিজ্ঞাসা করছি—বলবি?

চোখে চোখ রেখে আমি স্থির তেমনি। এই নিয়ে একই কারণে তিনবার মার খেলাম। বললাম, ভালো করে মেরে নিন, এ-সুযোগ আর বেশি দিন পাবেন না। এই দ্বীপ ছাড়ার পর আপনার সঙ্গে আর আমার কোনরকম সংশ্রব থাকবে না।

মালিক দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম। এ-রকম কখনো মুখের ওপর বলতে পারব ভাবিনি।...কিন্তু পারলাম।

নিজের তাঁবুতে বসে আকাশের দিকে চোখ গেল। গোটা উত্তরের আকাশটা কালিবর্ণ। বড় রকমের একটা ঝড়-তুফানের সম্ভাবনা।...আমার বুকের তলায়ও কম ঝড় বইছে না।

আধঘণ্টা বাদে বাইরে লোকজনের কথাবার্তা আর কিছু পরিচিত শব্দ কানে আসতে উঠে দেখতে এলাম। মারভিনের তাঁবু ভাঙা হচ্ছে। কয়েকজন লোক এদিকে আসছে। এই তাঁবুও তোলার নির্দেশ। অর্থাৎ মালিক আজই রওনা হবে।

আমি খেয়াল করিনি। হয়তো জিপ নিয়ে বেরিয়ে নিজেই লোক ডেকে এনেছে। ট্রাকও হাজির একটা। ড্রাইভার লোকটা পরিচিত। এখানে ঘাঁটি করার সময়ও আমাদের মালপত্র বহন করেছে এবং মালিকের কাছ থেকে মোটা বখশিস আদায় করেছে। এবারেতো দেড় দিনের লম্বা পাড়ি, অনেক মোটা লাভের আশা—কর্তার সঙ্গে যাবে বলেই আগের ব্যাচে যায়নি।

আমাকে দেখে সে এগিয়ে এলো। ঈষৎ চিন্তিত মুখ করে বলল, তোমার কর্তার খেয়াল আজই যাবে। হাজার তাড়াহুড়ো করলেও বেলা সাড়ে তিনটা চারটের আগে বেরুনো যাবে না। পথ এমনিতেই ভালো না, এ রাস্তায় লোকে সচরাচর হালকা মোটর নিয়েও বেরোয় না—সব ট্রেনে যাতায়াত করে। আমার অবশ্য সাহস আছে ঠিকই নিয়ে যাব, কিন্তু অত বেলায় বেরুলে তো রাস্তাতেই রাত হয়ে যাবে—বিশ্রাম নেবার মতো শিগগীর কোনো ভালো জায়গাও মিলবে না, তার ওপর আকাশের অবস্থা মোটেই ভালো দেখছি না...কর্তাকে একটু বুঝিয়ে বল না, কাল খুব ভোরে রওনা হলেই সব দিক থেকে ভালো হয়।

আমি মাথা নাড়লাম।—আমি না, তুমি ট্রাক চালাবে, তুমি গিয়ে বল।

—বলেছিলাম তো। কানেই তুলল না। সাফ জবাব দিলে, বিশ্রামের দরকার নেই, রাতভোর চলতে হবে।

—তাহলে চলার জন্যে প্রস্তুত হওগে, বলে কিছু লাভ হবে না, মাঝখান থেকে মেজাজ খিঁচড়ে গেলে তোমার বখশিসে টান পড়বে।

তাড়াহুড়োর ফলে বেলা তিনটের মধ্যেই গোছানোর পাট শেষ। আকাশ আরো কালো। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারো। আমারও না। আমি মনে মনে একটু বিরক্ত এবং উদ্বিগ্ন অন্য কারণে। আজ সিংহ দুটোর উপোসের দিন—ফাস্টিং ডে। সপ্তাহে একদিন উপোস বরাদ্দ ওদের। কাল কোথায় কখন ও দুটোর খাওয়া জুটবে ঠিক নেই, আগে জানলে কিছু খাবার সঙ্গেই নিতে পারতাম। মরুক গে, আমার কি। খেয়ালের খেসারত যে দেবার সে দিক।

এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মালিকের সঙ্গে অনেকবার চোখাচোখি হয়েছে। রুক্ষ লাল মুখ। সদয় নয় একটুও, কিন্তু তার মধ্যেও ব্যতিক্রম একটু। এত কালের মধ্যে এই প্রথম যেন আমাকে ভালো করে লক্ষ্য করার কারণ ঘটেছে কিছু। লক্ষ্য সারা জেনট্রিও করছে। তার চোখে শুধু বিদ্বেষ। মনে হয়, আমি চলে আসার পর মেয়ের ওপর চড়াও হয়েছে এবং যা জানবার হুমকির চোটেই ওর কাছ থেকে টেনে বার করেছে।

অতএব আপরাধী আমি বই কি।

পাঁচ

কেবল পাহাড় আর জঙ্গল, জঙ্গল আর পাহাড়।

আমরা যেন জনমানবশূন্য এক প্রেত-ভূমির ওপর দিয়ে চলেছি। একদিকে আগোগোড়া জংলা পাহাড়, অন্য দিকে কখনো গভীর জঙ্গল, কখনো বা গায়ে-কাঁটা-দেওয়া গভীর খাদ। ভয়াবহ পথই বটে। ড্রাইভারের মুখে শুনলাম, এ-পথে মাসে দশ বিশটা গাড়িও যাতায়াত করে কিনা সন্দেহ—বৃষ্টির সময় তো নয়ই।

সামনে মালিকের জিপ চলেছে। দূর-বিদেশের যাত্রায় নিজের গাড়ি সঙ্গে আনে না। যেখানে যায় সেখান থেকে ভালো অবস্থার সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কিনে নেয় একটা। সফর শেষে সমুদ্রপাড়ি দেবার আগে সেটা আবার বেচে দেয়। দূর-প্রাচ্যে এসে এবার মোটর না কিনে জিপ কিনেছে। মারভিন নিজেই চালাচ্ছে। পাশে তার মেয়ে। পিছনে মালপত্র।

আমাদের ট্রাক জিপের তিরিশ গজ পিছনে চলেছে। ড্রাইভারের পাশে আমি বসে। তার বাড়তি লোক নেবার দরকার হয়নি, কারণ মোটর বা ট্রাক আমিও চালাতে জানি। দলভুক্ত হবার পর মালিক আমাকে এই একটা জিনিসই শিখতে দিয়েছে। আমাদের ট্রাকে মাল নেই, ট্রাকের সঙ্গে মজবুত করে বাঁধা খাঁচায় শুধু সিংহ দুটো রয়েছে।

বিকেল গড়িয়েছে, সন্ধ্যা পেরিয়েছে, চারদিক নিকষ কালো। জোরালো হেডলাইট জ্বেলে আমরা চলেছি। জিপও তাই। জিপ আর ট্রাক দুটোরই গতি মন্থর। রাতের অন্ধকারে এই পথে জোরে গাড়ি চালানো আত্মহত্যার সামিল।

তা সত্ত্বেও আচমকা মৃত্যুরই হাতছানি।

দুপুর থেকে আকাশের যে সাজ চলছিল, এতক্ষণে তার তাণ্ডব শুরু। অন্ধকারের দরুন আকাশের অবস্থা আমরা ঠাওর করতে পারছিলাম না। তবে অনেকক্ষণ ধরেই বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছিল। তাই আমরা আশা করছিলাম অঘটন কিছু ঘটবে না, আমরা নির্বিঘ্নেই এগোবো।

খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা বাতাস দেবার পরেই শাঁ শাঁ শব্দ। তারপরেই ঝড়। প্রলয়। মৃত্যু যেন শ্যেনপাখির মতো এই প্রাণ ক'টা ছিনিয়ে নেবার জন্য ধেয়ে আসছে।

এ-পাশে পাহাড় ও-পাশে জঙ্গল এমনি একটা জায়গায় সামনের জিপটা থেমে গেল। গজ পনেরো তফাতে আমাদের ট্রাকটাও। আর এগনো সম্ভব নয় যখন, এ-রকম জায়গাতেই থামা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। খাদের পাশে অবস্থান ঢের বেশি বিপদজনক।

জিপ থেকে গলা বার করে মারভিন পিছনের দিকে তাকাচ্ছিল।

অর্থাৎ আমরা জায়গামতো থেমেছি কিনা দেখল।

ঝড়ের তাণ্ডব বেড়েই চলল। নিঃশেষ করবেই আমাদের। চারদিকে কড়কড় মড়মড় শব্দ। পাহাড়ের গা থেকে পাথর খসছে, গাছ ভাঙছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। বাতাসের বেগে তার ঝাপটা ছুঁচের মতো চোখে-মুখে বিঁধছে। বাতাস আর বৃষ্টি যেন পরস্পরের সঙ্গে ক্ষিপ্ত উল্লাসে পাল্লা দিয়ে চলেছে। কাছে দূরে ধস নামার বিকট শব্দ। আমাদের ট্রাক বা সামনের ওই জিপ এখনো অক্ষত কোন মন্ত্রবলে জানি না। যে-কোন মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেতে পারে—সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে—যাবেই—মারভিন জেনট্রি, সারা জেনট্রি, ড্রাইভার, আমি টনি কার্টার, পিছনের ওই সিংহ আর সিংহীটা—সব সব।

আমার পাশে ড্রাইভার গলা ছেড়ে মারভিনের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে চলল। লোভ, লোভ—এবারে যদি প্রাণে বাঁচে তো জীবনে কখনো আর লোভের ফাঁদে পা দেবে না প্রতিজ্ঞা করল। তেজী সিংহ দুটো সেই থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ করে চলেছে। বাইরের হুলস্থূল তাণ্ডবে কান না পাতলে শোনা যায় না।

স্থির স্থাণুর মতো বসে আছি আমি। মৃত্যুর কথা ভাবছি? জীবনের কথা ভাবছি? না, কিছুই না ভাবতে চেষ্টা করছি।

...এই ঝড় আর থামবে কি? থামল কিনা দেখার জন্য আমরা কেউ থাকব কি? কারো কারো বেলায় শেষের সে-দিন কি ভয়ঙ্কর সুন্দর এ-কথাটা জানাবার জন্য আমাদের কেউ একজন অবশিষ্ট থাকবে কি?

ত্রাসে চমকে উঠলাম। খুব সামনে একটা পাথর পড়ল। কিন্তু কোথায় পড়ল? শব্দটা এ-রকম কেন? তাহলে কি দু'জনের হয়ে গেল? সিংহ দুটোকে নিয়ে ছ'জন আমরা—তার মধ্যে দু'জনের হয়ে গেল?

নামলাম। ড্রাইভার আমার হাত চেপে বসিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। তার হাত ছাড়িয়ে নামলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সামনের জিপটার দিকে এগোলাম। দাঁড়ালে ঝড়ে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে ঠিক নেই।

...আশ্চর্য! আশ্চর্য বই কি। হাতে দুটো জীবন্ত মানুষের স্পর্শ। জীব আড়াল দিয়ে জড়াজাড়ি হয়ে বসে আছে।

—টনি?

—হ্যাঁ।

মেয়ে বাপের বুকে মুখ গুঁজে আছে। দু'হাতের বেষ্টনে মারভিন একটা ভীত খরগোশকে আশ্রয় দিয়েছে যেন। বলল, বেঁচে গেছি, ওই পাথরটা সামনের এঞ্জিনের ওপর পড়েছে। সামনেটা গুঁড়িয়ে গেছে, আমাদের বিশেষ কিছু হয়নি।

মারভিনের গলার স্বর যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি মোলায়েম। আমি যেন তার বন্ধুগোছের কেউ। কিন্তু দু'দিন আগে তার হাতের চাবুকে আমার গায়ের চামড়া ফেটে চৌচির হয়ে গেছে আমি তো ভুলিনি। তার পরের চড় ক'টাও না। বললাম, বিশেষ কিছু হবার সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি।

সেটা মারভিনও জানে। কারও মুখে কথা নেই, একটু বাদে ড্রাইভারও হামাগুড়ি দিয়ে উপস্থিত। একলা থাকতে সাহসে কুলোচ্ছিল না সম্ভবত। যেখানে লোক বেশি সেখানে প্রাণের আশা। মারভিনের গলায় ঠাণ্ডা রসিকতার সুর।—কেমন লাগছে?

রাগ আর চেপে থাকতে পারল না বেচারা ড্রাইভার। বলে উঠল, খুব চমৎকার! কেন, পই-পই করে বারণ করিনি? নিজের আত্মহত্যা করার সাধ, তার মধ্যে আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন!

—শাট্ আপ! মারভিন জেনট্রির মালিকের মেজাজ এখনো। আমাদের দু'জনের উদ্দেশেই হুকুম হল, জায়গায় চলে যাও, সব একসঙ্গে থেকে একসঙ্গে মরতে চেষ্টা করে লাভ কি!

আবার বুকে হেঁটে ট্রাকে ফিরে এলাম আমরা। ড্রাইভার গজ গজ করে উঠল, তোমার না হয় মনিব, আমার কি! প্রাণে বাঁচলে মেজাজ বার করছি ওর।

বললাম, ওর সঙ্গে বন্দুক আছে, রাগ হলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আপাতত নিজের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখো।

ড্রাইবার ঠাণ্ডা তক্ষুনি।

আমরা সকলেই বেঁচে আছি। কারো গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগেনি। উন্মত্ত রোষে প্রকৃতি নিজেকে সংহার করেছে, নিজেকে লণ্ডভণ্ড করেছে। আর শান্ত ভোরের আলোয় নিজের কাণ্ড দেখে যেন মিটি মিটি হাসছে।

চারদিকে তাকিয়ে আমরা স্তব্ধ। একদিকে পাহাড়, একদিকে জঙ্গল। মাঝখানে আমরা। জিপের এঞ্জিন গুঁড়ো-গুঁড়ো, পিছনের চাকা দুটো শূন্যে তুলে ওটা মুখ থুবড়ে আছে। সামনের রাস্তা অসংখ্য ছোট-বড় পাথর আর ভাঙা ডালপালায় ছাওয়া। গাড়ি ছেড়ে মানুষ চলাচলও অসম্ভব। তবু অবস্থা বোঝার জন্য আমরা যতটা সম্ভব পায়ে হেঁটে এগিয়েছি। তারপর থামতে হয়েছে। সামনের রাস্তায় বিশাল ধস।

ফিরে এসে আবার পিছন দিকটা দেখতে এগিয়েছি—যেদিক থেকে এসেছি সেই দিকটা একই অবস্থা। এদিকেও একাধিক রাস্তা জোড়া ধস।

ব্যস্। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।

রাত্রে ক' ঘণ্টা ড্রাইভ করার পর আমরা থেমেছিলাম হিসেব করে ড্রাইভার হতাশ মুখে জানালো, ধারে কাছে অর্থাৎ ষাট-সত্তর মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই।

সকাল আটটা বাজতে না বাজতে সিংহ দুটো গাঁইগুঁই শুরু করল, তাদের খাবার চাই। ক্রমে রাগ আর তর্জন-গর্জন বাড়তে থাকল ওদের। স্বাধীনতা হরণ করে ওদের খাঁচায় যখন পোরা হয়েছে, প্রকৃতির অঘটন ওরা বুঝতে চাইবে কেন?

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও জঠর জ্বলতে লাগল। কিন্তু আমাদের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা আছে। বিসকিট আছে, জ্যাম জেলি মাখন আছে, টিনের খাবার কিছু আছে, চা-কফিও আছে। ওল্‌টানো জিপ থেকে এগুলো বার করা হল। একটু খোঁজাখুঁজি করতে পাহাড়ী জলের নালাও মিলল একটা। অতএব আমাদের কয়েকটা দিন যোদ্ধার মতো রসদ আছে। কিন্তু ওদের কি হবে, ওই অবুঝ পশু দুটোর?

আমরা যা খেলাম তারই কিছু দিয়ে ওদের ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করল মারভিন। চেষ্টাটা হাস্যকর, কারণ, যা আছে তার সব দিয়ে দিলেও চার ভাগের একভাগ খিদেও মিটবে না ওদের। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে হাস্যকর বলে কিছু নেই। খাঁচার ফাঁক দিয়ে মারভিন ওই সামান্য খাদ্য রাখা মাত্র হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে এলো জানোয়ার দুটো। শুঁকে বুঝতে চেষ্টা করল কি দেওয়া হয়েছে। এই খাবার স্পর্শও করল না। রাগে গরগর করতে করতে আবার দূরে গিয়ে বসল। ওদের উদ্দেশ্যে গালাগাল করতে করতে মারভিন খাঁচার ফাঁক দিয়ে খাবারগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল।

আমাদের কি আশা এখন?

একমাত্র আশা, বাইরের লোকালয়ের মানুষ আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে যদি এসে উদ্ধার করে। যে-দল আগে চলে গেছে তারা যদি খোঁজখবর শুরু করে। কিন্তু খেয়ালী মালিককে চেনে সকলেই, হয়তো ভেবে বসে থাকবে পুরনো প্রণয়িনীর ফাঁদে পা দিয়ে মালিক মোটে রওনাই হয়নি। সেখানকার প্রোগ্রামের তারিখ এগিয়ে এলে তখন হয়তো তাদের হুঁশ হবে। আর এক আশা, যেখান থেকে আসছি সেখানকার অনেকেই জানে কোন্ দুর্যোগ মাথায় করে আমরা রওনা হয়েছি। তারা যদি তল্লাসীর ব্যবস্থা করে। কিন্তু তড়িঘড়ি চেষ্টা করলেও ক'দিন লাগবে এখান থেকে আমাদের উদ্ধার করতে?

বিকেলের মধ্যে সিংহ দুটোর ক্ষুধার্ত হাঁকডাকে কান ঝালাপালা। মারভিন বা আমাকে দেখলেই লাফিয়ে খাঁচার গায়ে এসে দাঁড়ায়। ভাবে এবার বুঝি ওদের খাবার দেব। তারপর গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বার করে আর দুই চোখে অভিযোগ নিয়ে দেখে আমাদের। একমাত্র জল ছাড়া কেন আর কিছুই ওদের দেওয়া হচ্ছে না বুঝতে পারে না।

বিকেলে বন্দুক হাতে পাশের জঙ্গলে ঢুকল মারভিন। দুরাশা, যদি কিছু মেলে। একটা পাথরে ঠেস দিয়ে আর একটা পাথরে বসে আছে সারা জেনট্রি। ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে ওর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলার লোভ হচ্ছিল। সুযোগ পেয়ে সামনে গিয়ে বসলাম। মারভিন জেনট্রি যেমন করে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠিক তেমনি হালকা সুরে বললাম, কেমন লাগছে?

ও এখনো মনিব-কন্যা। এই অন্তরঙ্গ সুরটা অপছন্দ তাই। তার ওপর সেই রওনা হবার আগে থেকেই ভিতরে ভিতরে খাপ্পা আমার ওপর। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আমি বললাম, সব যখন একসঙ্গেই মাটি নেব এখানে আর রাগ রেখে লাভ কি। সেই মাটি নেবার মধ্যে মনিব-চাকর আর মনিবের মেয়ের কোন তফাৎ থাকবে না।

ওর শুকনো মুখ দেখে দুই-একটা ভরসার কথা বলব বলে এসেছিলাম, অথচ বললাম কি! আমার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা ক্রুর স্পর্ধা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। সারা আমার দিকে ফিরল।—শয়তানী করে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

হেসে বললাম, না না ভয় কেন দেখাব, তুমি সাহসী মেয়ে, ভয়ের কি আছে!

—কেন, বাইরে থেকে কেউ আসবে না, আমরা এইভাবেই থেকে যাব?

—আসবে বৈ কি, নিশ্চয় আসবে।...তবে কতদিনের মধ্যে আসবে, এসে আমাদের কি অবস্থায় পাবে—সেটাই কথা। আমি ভাবছি পায়ে হেঁটে কালই রওনা হয়ে যাব—যা থাকে বরাতে, এভাবে ইঁদুরের মতো মরতে ইচ্ছে করছে না।

সারা অমনি ফোঁস করে উঠল, তার মানে আমাদের এ অবস্থায় ফেলে তুমি পালাতে চাও! রোসো, বাবা এলেই আমি বলে দিচ্ছি।

আমি আবারও হেসে উঠলাম।—বোলো।...তোমার বাবা আর আর যাই হোক নিজেকে এখনো মনিব ভাবার মতো বোকা নয়। তার ব্যগ-ভরতি টাকার নোট, কিন্তু সেগুলো চিবিয়ে খাওয়া যায় না। সিংহ দুটো খিদের জ্বালায় কেমন ছটফট করছে দেখছ না—ওই টাকার বাণ্ডিল দেখিয়ে কি ওদের ঠাণ্ডা রাখা যাচ্ছে?

কি বললাম বুঝল না হয়তো। মনে মনে বিলক্ষণ ঘাবড়েছে। বলে উঠল, এই বিপদের মধ্যে আমাদের ফেলে তোমার পালাবার মতলব! একটু কৃতজ্ঞতাবোধও নেই তোমার?

...তাই তো, ওর অভিযোগেই যেন সায় দিলাম।—কত পেয়েছি তোমাদের কাছ থেকে আমি, সমস্ত গায়ে চাবুকের দাগ, উঠতে বসতে গালে ঠাস ঠাস চড়—অথচ কি অকৃতজ্ঞ আমি! হঠাৎ রাগ চড়ে গেল আমার, বললাম, তোমার বাবাকে তুমি যা খুশি বলতে পারো, আমি কেয়ার করি না—বুঝলে?

সারা চেয়ে রইল। আমি আবার বললাম, এই দুর্যোগের মধ্যে না পড়লেও আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যেতাম—এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলেও চলেই যাব—বেরুবার আগে তোমার বাবার মুখের ওপর বলেওছিলাম, এখন সাধ মিটিয়ে মেরে নিতে পারে, আর বেশিদিন সে-সুযোগ পাবে না—বুঝলে?

আমি এই সুরে এত কথা বলতে পারি সারার ধারণা ছিল না। ভীত, আড়ষ্ট। বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে শুধু চেয়েই রইল।

মারভিন জেনট্রি খালি-হাতে ফিরল। জানা কথাই কিছু মিলবে না। কারো মুখে কোন কথা নেই। ক্ষিদের জ্বালায় সিংহ দুটো শুধু এক-এক প্রস্থ গর্জন করে উঠছে। তারপর ক্লান্ত হয়ে থেমে যাচ্ছে।

রাত্রি। নিথর স্তব্ধ চারদিক।

পাথরে মাথা রেখে মারভিন দিব্যি ঘুমোচ্ছে। ঘুমোবে না কেন, ঘুমের রসদ আছে তার কাছে। রসদ বাঁচাবার জন্য রাতে শুধু জল আর দুটো করে বিসকিট ছাড়া আমরা কেউ কিছু খাইনি। এই রসদের ওপর ক'দিন নির্ভর করতে হবে কে জানে? মারভিন সাদা জল খায়নি, অনেকটা মদ মিশিয়ে খেয়েছে। আমাদেরও দিতে চেয়েছিল। ড্রাইভার নিয়েছে, আমি নিইনি।

আমার পাশে ড্রাইভার ঘুমোচ্ছে। আমার চোখে ঘুম নেই। খিদের জ্বালায় সিংহ দুটো অস্থির হয়ে উঠছে এক-একবার। কাল সমস্ত দিন উপোস গেছে ওদের, উপোসের পরদিন এমনিতেই খাবার জন্য আধা-পাগল হয়ে ওঠে ওরা। আজ ভগবানের মারে উপোস চলছে। কাল কি হবে জানি না, পরশু কি হবে জানি না, তরশু কি হবে জানি না, কবে কি হবে জানি না। ওদের গোঙানি যেন খচ-খচ করে আমার পাঁজরের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে।

উঠে পায়চারি করছিলাম। থমকে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে কে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সারা জেনট্রি।

—ঘুমোও নি?

ও বলল, ঘুম আসছে না।...তুমি ঘুমোও নি যে?

—সিংহ দুটোর জন্য। তোমার বাবার দোষে দু'দিন উপোস চলছে ওদের।

—বাবা কি করে জানবে আমরা এই অবস্থায় পড়ব?

—কাল রওনা হবেই আমাকে আগে থাকতে জানালে আমি ব্যবস্থা রাখতাম। তাছাড়া, আকাশের লক্ষণ দেখে ড্রাইভার তাকে সাবধান করেছিল।

সারা চুপ খানিকক্ষণ। বাবার একরোখা স্বভাব জানে। একটু বাদে আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্যেই যেন বলল, বাবাও কি কম কষ্ট পাচ্ছে, ওই সিংহ দুটোকে বাবা আমার থেকেও ঢের বেশি ভালবাসে।

মিথ্যে বলেনি। সিংহ দুটোর জন্যে মারভিনের চোখ-মুখে একটা নীরব যন্ত্রণা আমি লক্ষ্য করছি।

—তুমি কি সত্যি কাল চলে যাবে?

আমি ভালো করে তাকালাম ওর দিকে। পরিস্থিতি বিশেষ মানুষ কত অসহায় কত দুর্বল, তাই দেখলাম চেয়ে চেয়ে। আমার অভিমান কমে আসছে, ক্ষোভ কমে আসছে। এত হেনস্থা সত্ত্বেও আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। ঈশ্বরের রাজ্যে এ শেখার মতো একটা পাঠ বটে। মাথা নাড়লাম। যাব না। বললাম, সকলে জীবন নিয়ে এখান থেকে উদ্ধার পেলে তারপর যাব। দাসত্ব আর করব না, তা বলে বেইমানী করে যাব না।

সারা বলল, উদ্ধার পেলে বাবাকে আমি বলব আর যেন কক্ষনো তোমার ওপর অত্যাচার না করে।

এটুকুই অসহ্য লাগল। গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। বক্র ঝাঁঝে বলে উঠলাম, থাক, অত করুণা সহ্য হবে না, ঈশ্বরের নাম নিয়ে নিজের ভাবনা ভাবগে যাও।

পরের রাত্রি।

সিংহ দুটোর করুণ আর্তনাদে মাথা খারাপ হবার দাখিল আমার। আমরা তবু কিছু খাচ্ছি, তবু কিছু মুখে দিচ্ছি। কিন্তু ও দুটো আমাদের খাবার স্পর্শও করছে না। আমরা পেটের জ্বালায় জংলা আগাছা সেদ্ধ করে নুন ছিটিয়ে খেয়েছি। কিন্তু বনের পশু প্রাণের দায়েও গোঁজামিল দিতে জানে না। ওদুটোর কাছে যেতে পারি না, ও দুটোর দিকে তাকাতে পারি না। বড় বড় দুটো চোখ মেলে ওরা যেন মানুষকে ধিক্কার দিচ্ছে।

ওদের জন্য মনিবের যন্ত্রণাও টের পাচ্ছি। থেকে থেকে তার চোখ দুটো ক্রূর হয়ে উঠছে। তারপরেই অসহায় দৃষ্টি ওই চোখ দেখে আমার বুকের তলায় অনাগত আশঙ্কা একটা। কিছু একটা ঘটতে পারে। নিদারুণ কিছু।

আবার রাত পোহালো। আবার দিন কেটে গেল। আমার মনে হল আমরা যেন কত যুগ কত কাল ধরে এখানে বন্দী। আমাদের রসদও নিঃশেষ। তবু আগাছা-সেদ্ধ পাতা-সেদ্ধ গলাধঃকরণ করে আর দু'চার দিন চলতে পারে। সারা এরই মধ্যে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। ড্রাইভারটা পাগলের মতো ভুল বকতে শুরু করছে।

রাত্রি।

মারভিনের দিকে যতবার চোখ পড়ছে ততবার আমি চমকে চমকে উঠছি। সেই নিদারুণ কিছু ঘটার ছায়া এখন স্পষ্ট দেখছি। সিংহ দুটো জঠরের জ্বালায় আর সর্বক্ষণ দাপাদাপি হাঁকাহাঁকি করছে না। সেই শক্তি কমে এসেছে। কেবল আমাদের কাউকে দেখলে হুম হুম শব্দে গজরাতে থাকে—আমার মনে হয় ওদের অন্তরাত্মা আমাদের ধিক্কার দিচ্ছে।

মারভিনের দু-চোখ ভয়াল, ক্রূর, স্থির। রাতে ওদের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে যা বলল শোনামাত্র নিস্পন্দ কাঠ আমি। আমি যে শুনেছি মনিব তাও জানে না। বলল, কালকের দিনটা দেখব, তারপর আর তোদের কষ্ট দেব না।

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল। রাত বাড়ছে, সকলে ঘুমে। আমি পাগলের মতো পায়চারি করছি, আর এক-একবার খাঁচার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছি। দু'দিকের অন্ধকার কোণে ওরা নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে।

...আমি কে? টনি কার্টার কে? কতগুলো হাড়-মাংসের সাজানো স্তূপ একটা? তা ভিন্ন আর কি? এর মধ্যে প্রাণ বলে কিছু আছে কিনা কেউ দেখেছে তাকিয়ে? একজনও দেখেছে? না, রক্ত-হাড়-মাংসের এই কাঠামোটা শুধু অপরের প্রয়োজনের ক্রীতদাস। তাদের স্বার্থের প্রয়োজন মেটাবে।...তাহলে? তাহলে তার থেকে আরো অনেক বড় অনেক ভয়ঙ্কর প্রয়োজন মেটাতে পারে না? পারে না?

ঈশ্বর! আমাকে শক্তি দাও!

ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে আছে। নড়তে পারলাম না। কে যেন জোর করে ধরে রেখেছে আমাকে। আমি তাকে দেখছি। সে-ও আমি। যে-আমিটা ক্রীতদাস নয়।

আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

ঈশ্বর! সকলে বলে তুমি করুণাময়, করুণা করে তুমি আমাকে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত বদ্ধপাগল করে দাও।

ঈশ্বর আমার কথা শুনল।

চাবিটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে খাঁচার সামনে দাঁড়ালাম। খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম উল্টো-মুখো হয়ে সিংহ দুটো ঘাড়গুজে পড়ে আছে। একটুও শব্দ না করে তালা খুললাম। না, ওরা টের পায়নি, তেমনি পড়ে আছে। আস্তে আস্তে ল্যাচ্‌টা তুললাম। সংকটতম মুহূর্ত এইবার। চোখের পলকে লোহার শিকের দরজাটা ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে ল্যাচ্ ফেলে দিতে হবে—নইলে একমাত্র মারভিন ভিন্ন ওদের হাতে বাকি কজনের মৃত্যু অবধারিত।

ঈশ্বর আর একটু শক্তি দাও! আরো একটু পাগল করে দাও!

মুহূর্তের মধ্যে কি হয়ে গেল জানি না।

আমি খাঁচার ভিতরে। দরজা বন্ধ। ল্যাচ্ ফেলতে পেরেছি। পরক্ষণে বিকট হুঙ্কার, বিকট গর্জন, ক্ষুধার্ত পশুর চরম প্রাপ্তির উল্লাস।

আমি প্রাণপণে চোখ বুজে ফেললাম। ঈশ্বর...!

আমার দু'কাঁধে দুটো থাবার ভার। সেই সঙ্গে কান-ফাটানো গর্জন। আর সেই মুহূর্তে খাঁচার ওপর দূর থেকে এক ঝলক চর্টের আলো, আর মানুষের আর্ত চিৎকার, ট-নি-ই-ই!

আমার গায়ের রক্ত সিরসির করে নেমে যাচ্ছে। দু'দিক থেকে দুটো পশু আমার কাঁধের ওপর থাবা তুলে দাঁড়িয়ে গেছে। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোঁ-গোঁ করছে। কিন্তু আশ্চর্য, আমাকে ওরা কষ্ট দিচ্ছে কেন? ফালা ফালা করে ফেলছে না কেন? খাচ্ছে না কেন?

টর্চ হাতে ছুটে এসেছে মারভিন। পরমুহূর্তে এই দৃশ্য দেখে বোবা পাথর।

আরো বার কয়েক হুমকি ছেড়ে কাঁধ থেকে থাবা নামিয়ে পশু দুটো রাগে গরগর করতে করতে আবার স্বস্থানে ফিরে গিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। যেন বুঝিয়ে দিল, খেতে না দিয়ে এ-ধরনের রসিকতা ওদের পছন্দ নয়।

আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে। দরদর করে ঘামছি। চোখের জল গাল বেয়ে নেমে আসছে।

ঈশ্বর! ঈশ্বর! এ তুমি কি খেলা দেখালে! এই দুটো হাতে করে ক'টা দিন ওদের খেতে দিয়েছি বলে ক্ষিদের জ্বালায় মরতে বসেও ওরা এত কৃতজ্ঞ!

—টনি! মারভিনের হুঁশ ফিরল যেন এতক্ষণে।—ইউ ব্লাডি ফুল! বেরিয়ে আয়—শিগ্‌গীর বেরিয়ে আয়!

আমি সামনে এগিয়ে এলাম। টর্চ জ্বেলে রেখেছে। দেখলাম উত্তেজনায় কাঁপছে মারভিন।

বললাম, ওদের ক্ষুধা মেটাতে এসেছিলাম, ক্ষিদে মিটিয়ে তোমার বন্দুকের হাত থেকে ওদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা আমাকে খেল না।...তুমি ওদের মারবে কেন, তোমার মতো পেটের নাড়ি ভেবেছ ওদের? চার দিন উপোসের পরেও হিস্মত দেখছ না?

মারভিন চেয়ে রইল আমার দিকে। খানিকক্ষণের জন্য বোধহয় ভুলে গেল আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। তারপর সচকিত।—বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় শিগগীর!

বেরিয়ে এলাম। ল্যাচ্ ফেললাম। তালা বন্ধ করলাম। এবারে একটু শব্দ হতে সিংহ দুটো বিরক্ত। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বার করে অন্যদিকে ঘাড় গুঁজল।

আমার একটা হাত বদলদাবা করে মারভিন হিড়হিড় করে নিজের ভূমিশয্যার কাছে টেনে নিয়ে এলো। কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। ঘাড়ে কাঁধে টর্চ ফেলে দেখল কোথাও আঁচড়-টাচড় লেগেছে কিনা। তারপর নিজে বসল। টর্চটা পাশে জ্বলছে হুঁশ নেই। মুখ ঘামে ভেজা তখনো।

চেয়ে আছে আমার দিকে।...একটু ব্র্যান্ডি খাবি? খা না, এখনো আছে খানিকটা—

আমি মাথা নাড়লাম। দরকার নেই।

নিষ্পলক চেয়েই রইল।

...যদি এখান থেকে উদ্ধার পাই, (আমার মন বলছে পাব, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমার মনে ভালো মন্দ দুইয়েরই ছায়া পড়ে—ভালোর পূর্বাভাস এ-পর্যন্ত জীবনে কম দেখেছি সেটা সত্যি।) আমি ফ্র্যাংকি বোমারকেও একটু ফুর্তির রসদ জোগাতে পারি। বোমার অপরকে হাসিয়ে মারে নিজে হাসে না। কিন্তু একটা খবর দিলে হাসবে, বলবে ওই দুর্যোগের ফাঁকে তোর কাঁধে পাহাড়ের পরী এসে ভর করেছিল।...যদি আমি বলে, মারভিন জেনট্রির চোখে আমি জল দেখেছি, আর যদি বলি, বড় বড় চোখ দুটো যখন জলে চকচক করছিল, তার রুক্ষ মুখখানা তখন প্রায় সুন্দর গোছের দেখাচ্ছিল।

মারভিন চেয়েই আছে। টর্চটা জ্বলছেই। আমার পাশেই হাতের নাগালের মধ্যে সারা ঘুমোচ্ছে। তার বুকের ওঠা-নামা চোখে পড়ছে। ভালো-লাগারও একধরনের অস্বস্তি আছে। মনিব মনিব-কন্যা দুজনার দরুনই অস্বস্তি। টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে উঠতে গেলাম।

তারপর কি যে কাণ্ড হয়ে গেল, নিজেই বিমূঢ় আমি।

...বিমূঢ় শুধু আমি কেন, সে-দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠেছিল সারা জেনট্রিও। দু'চোখ কপালে তুলে ও নিজেই বলেছে সে-কথা। কোন বিপদের মধ্যে আমরা পড়ে আছি খানিকক্ষণের মধ্যে তাও ভুলে গেছল বোধহয়।

ওর সে-বিস্ময় আমি কল্পনা করতে পারি। কারণ খুব সকালে ঘুম ভাঙতে নিজেরই প্রাণান্ত দশা। দেখি মারভিন জেনট্রির লোমশ বুকে মুখ গুঁজে আমি পড়ে আছি, আর আমাকে দিব্যি পাশবালিশ বানিয়ে সে ঘুমোচ্ছে।

পাশে সারা নেই। শরীরটা যতটা সম্ভব গুটিয়ে তার বাহুবন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করতেই মারভিন ঘুমচোখে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, নড়বি তো খুন করব, শুয়ে থাক চুপ করে।

...মারভিনের চোখে তবু রাতদুপুরে জল দেখেছিলাম, আমার চোখে যে দিনের বেলায় জল আসি-আসি করছিল এ-কথাটা বোমারকে আর বলাই যাবে না।

ঝটকা মেরে উঠে পালালাম। মারভিন বিড়বিড় করে গালাগাল দিতে দিতে পাশ ফিরে শুলো।

ট্রাকের ও-ধারে খানিকটা দূরের পাথরে সারা বসে আছে। আমাকে দেখেই সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল। ওর কাছে যাওয়ার তর সইল না, নিজে ও এগিয়ে আসতে লাগল।

—কি ব্যাপার?

বোকা-বোকা মুখ করে আমি জিজ্ঞাস করলাম, কি?

—ঘুম ভেঙে দেখলাম আমার পাশ ঘেঁষে বাবা আর তুমি জড়াজাড়ি করে ঘুমোচ্ছ!

বললাম, কি কাণ্ড, দুশ্চিন্তা আর ক্ষিদের জ্বালায় স্বপ্ন-টপ্ন দেখছ বোধহয়।

—স্বপ্ন দেখেছি? তুমি এখন কোত্থেকে উঠে এলে? পাশেই তোমাকে দেখে আমি আঁতকে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম!

আমার হাসি পাচ্ছে। বললাম, কাল রাতে ভূতে পেয়েছিল।

যে অবস্থায় দেখেছে আমাকে, সারার পক্ষে সবই বিশ্বাস করা সম্ভব। আঁতকে উঠল।—কখন? কাকে?

মাঝরাত্তিরে। আমাকে।

এখানে আবার ভূত আছে নাকি?

যে পাহাড় আর জঙ্গল, ভূতের পক্ষে নিরাপদ জায়গাই তো...।

দিনের বেলাতেই চারদিকে তাকিয়ে নিল একবার।—তারপর?

তারপর আমি ভয় পেতে তোমার বাবা আমাকে নিজের কাছে এনে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকল।

বাবার মাথা খারাপ, নইলে আমার পাশে—

শেষেরটুকু অনুক্ত থাকল। ভয়টাই প্রবল।—আবারও তো রাত্রি আসবে, তখন...?

লোভের উসখুসুনি। বলতে ইচ্ছে করল, গেল রাতের মতোই পাশাপাশি থাকব। হাজার হোক মনিব-কন্যা, বলা গেল না। বললাম, দেখো না, রাত্তিরে না-ও আসতে পারে।

কেন বললাম জানি না।

সিংহ দুটো থেকে থেকে হুমকি দিচ্ছিল। কিন্তু ওদের গলার আওয়াজ বেদনার্ত করুণ। সারা বলল, ও দুটো মরবেই, চারদিন হয়ে গেল শুধু জলের ওপর আছে।

আমার মুখ দিয়ে আবারও কথা বেরুলো—মরবে না, মরার নাটক এ-রকম হয় না, দেখো না—

ও কিছু বুঝল না। অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল।...এ কথাই বা আমি কোন্ বিশ্বাসে বললাম তাও জানি না।

ঘণ্টাখানেক বাদে মাথার ওপর গোঁ-গোঁ শব্দ। আমাদের সকলের হৃৎপিণ্ডগুলো যেন একসঙ্গে লাপিয়ে উঠে সেই শূন্যে ছুটল। আনন্দে আমরা পাগলের মতো লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিলাম।

আমাদের মাথার ওপর চক্রাকারে হেলিকপ্টার ঘুরছে। আনন্দের ধাক্কায় সারার মাথা খারাপ হবার দাখিল। হাতের কাছে আমি, আমাকেই জড়িয়ে ধরল। তারপর সামলে নিয়ে সকোপে তরল ঝাঁঝ ফোটালো মুখে, ইউ রাস্কেল?

ওপর থেকে খাবার পড়তে লাগল। আমরা ছোটাছুটি করে কুড়োতে লাগলাম। একটা জিনিসই আমি খুঁজছি।...নিশ্চয় পাব। বোমার তো জানে শুধু আমরা নই, জানোয়ারদুটোও উপোসী আছে।

পেলাম। যা বিশ্বাস করব তাই যেন পাবার দিন আজ। মস্তবড় টিনের প্যাকিংটা মাটিতে পড়েই থেঁতলে গেল। খোলার জন্য আর ধস্তাধস্তি করতে হল না। সেটা নিয়েই খাঁচার দিকে ছুটলাম আমি।

...হতচ্ছাড়া আর হতচ্ছাড়ীটা এমন থাবা মেরে খাবার ছিনিয়ে নিল যে আমার হাত দুটো ছড়ে গিয়ে রক্তাক্ত। মারভিন কাছেই ছিল। দেখে বলল, বেশ হয়েছে। তারপরেই যে কাণ্ড করল, দেখে তার মেয়ের দুচোখ ছানাবড়া। দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে দরে দু-গালে অন্তত পাঁচ-পাঁচটা ঠাস-ঠাস করে চুমু খেল তার পাগলা বাপ মারভিন জেনট্রি।

আনন্দে বাবার মাথার ঠিক নেই ছাড়া আর কি ভাববে?

ছয়

জীবনের চাকা ঘুরছে। কিন্তু তার ছন্দ বদলেছে।

সেটা এত স্পষ্ট যে সকলের চোখে বিস্ময়, সকলের চোখে কৌতূহল।

আমরা মেনল্যান্ডে ফিরেছি। এবার ঘুরতে ঘুরতে ভারতের দিকে এগোবার কথা। কিন্তু বোর্নিওর উত্তারাংশে থাকতেই মালিকের হাব-ভাব-আচরণে একটা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে সকলে। পরিবর্তনটা অনেক সময় পাগলামির মতো মনে হয়েছে। সকলে ভেবেছে, সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে বলেই মেজাজের এই রকমফের। সর্ব ব্যাপারে আগের মতোই রুক্ষ হবার চেষ্টা, কিন্তু তার তলায় তলায় যেন লাগাম ছাড়া প্রশ্রয়ের স্রোত বইছে।

কারণে অকারণে আমার দিকে চেয়ে থাকে, হাসে মিটিমিটি, কাছে ডাকে, আগে বাবা আর মেয়েই একসঙ্গে খেত শুধু, এখন দু'বেলাই আমি তাদের সঙ্গী। মেয়ে অবাক চোখে আমাকে দেখে চেয়ে চেয়ে।

বোমার আমাকে বলে, কি রে, পাহাড়ে পাঁচদিন আটকে রেখে কর্তাকে জাদু করলি নাকি? তোর যেন ভাগ্য ফিরে গেল মনে হচ্ছে?

ভাগ্য ফেরার মুখ্য কারণটা ওরা সকলেই শুনেছে তারপর। মদের ঝোঁকে মারভিন প্রথম মেয়েকে বলেছে। সারা আমার কাছে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করেছে, ওই পাহাড়ে সিংহদুটোর ক্ষিদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তুমি নাকি রাতদুপুরে ওদের খাঁচায় গিয়ে ঢুকেছিলে?

—কে বলল?

—বাবা। আমি তো কিছু টের পাইনি!

—কেন, তারপরদিনই তো তোমাকে বললাম, রাতে ভূতে পেয়েছিল।

—ও...এই ভূত! কিন্তু আশ্চর্য, সারা শিউরে উঠল, সিংহদুটো অত ক্ষিদের মুখেও তোমাকে খেল না!

বললাম, খেয়ে একেবারে শেষ করেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।

ঠাট্টা ভেবে সারা কান দিল না। বলে উঠল, এই জন্যেই বাবার একেবারে চোখের মনিটি তুমি! আমি দিনকে দিন হাঁ হয়ে যাচ্ছিলাম, বেরুবার দিনও চড় মেরে যে-লোক গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিল, .. হঠাৎ এ-রকম বদলে গেল কি করে!

—মিছে কথা বোলো না, আমার এই পালিশ করা গায়ের রঙে কোনো দাগ ফোটে না।

সারা হাসতে লাগল।

কি ভেবে আমি আবার বললাম, আগে চাবুকের চোটে গায়ের চামড়া ফেটে গেল তোমার জন্যে—পরে আবার ওই চড়ও খেতে হল তোমারই জন্য।

সারা উৎসুক, কেন, আমার জন্য চড় খেতে হল কেন?

—আগে চাবুক খেয়েছিলাম হেস্টার জেরোমকে ছোরা দেখিয়েছিলাম বলে, পরে মার খেলাম ওকে ছোরা দেখাইনি বলে।

না, লোভ সামলাতে পারিনি। ডরোথি জেরোম আর তার ছেলের পাগলামির কথা আর মতলবের কথা সারাকে বলেছি। শুনে মুখ লাল সারার। মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছে, মিথ্যে কথা, নিজের কদর বাড়াবার জন্য তুমি নিশ্চয় ..ার কাছে বানিয়ে বলেছ!

আমি প্রতিবাদ করিনি। বরং হাসতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু মনের তলায় আঁচড় পড়েছে। মনে হয়েছে ওই উদভ্রান্ত ছেলেটার প্রতি সারার এখনো ভিতরে ভিতরে একটু টান আছে।...থাকলেই বা, আমারই আগোচরের লোভ আমাকে কোন দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে?

সিংহের খাঁচায় ঢোকার খবরটা বোমার সারার মুখে শুনেছে। বোমারের কাছ থেকে অন্য সকলে। একটা চোখ বুজে আর এক চোখ দিয়ে বোমার ঘটা করে দেখেছে আমাকে—তুই দেবদূত না শয়তান রে, অ্যাঁ! এই করে মালিকের মুণ্ডু ঘুরিয়েছিস!

আমি বলেছি, শয়তান। মওকা পেলে তোমারও ঘাড় মটকাবো।

মেনল্যান্ডে এসে সকলকে আশাতীত পুরস্কার দিয়েছে মারভিন। এদিক থেকে দরাজ হাত বরাবরই। কিন্তু খুশির পুরস্কার কোনদিন কারো বরাতে জোটেনি। সফরের মোটা লাভ সব বিলিয়ে দিয়েছে—ওই দুর্যোগ থেকে দলের লোকের চেষ্টায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে তারই প্রতিদান।

সকলে পেয়েছে। শুধু আমি ছাড়া।

অথচ সবারই সব থেকে বেশি কৌতূহল আমার প্রতি। আমি কি পেলাম। কত পেলাম। না, এদিকে থেকে কিছু পাইনি বলেই আমার বুকের তলায় সারাক্ষণ কি এক অদ্ভুত অনুভূতির দাপাদাপি। সুখের প্রলেপ-মাখানো আশঙ্কাও কি যেন। কারণ গত দুটো মাস ধরে আমি কি যে পেয়েছি কত যে পাচ্ছি সারাও জানে না—অন্যেরা তো নয়ই। ভিতরে বাইরে এক নিঃসঙ্গ মানুষ হঠাৎ যেন ছেলে পেয়েছে একটা—সর্বদিকে নির্ভরযোগ্য ছেলে। সন্তান যেন সারা নয়, আমি। কোথায় কোন ব্যাঙ্কে তার কত টাকা আছে সে-সব বই আর হিসেবপত্র আমাকে দেখিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কত খরচ, এমন কি কে-কত মাইনে পায় তাও আমাকে জানতে হয়েছে। এর উন্নতির জন্য মনে মনে আরো কি কি পরিকল্পনা আছে—কাগজ-কলম নিয়ে আমাকে জানতে বুঝতে হয়েছে। এক-একসময় আমাকে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখলে আগের মতোই মেজাজ বিগড়োয়। চড়-চাপড় লাগাতে গিয়েও সামলে নিয়ে হেসে ফেলে, ইউ ফুল! আমার কথা কানে যাচ্ছে?

মেনল্যান্ডে পা দেবার দিন কতকের মধ্যে এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল আমার। তারপর হুকুম হল, রোজ সকালের দিকে ঘণ্টা দুইয়ের জন্য তার কাছে যেতে হবে। পরে জানলাম, সে আমার মাস্টার। কিছু লেখাপড়া শিখতে হবে, অ্যাকাউন্টস শিখতে হবে, ইত্যাদি।

এর পরেও বুকের তলায় আমার আশা-আশঙ্কা দাপাদাপি না করাটাই বিচিত্র।...হ্যাঁ, ভালো-মন্দ দুইয়েরই অনাগত আভাস আমার মনের তলায় দোল খেয়ে যায়। এর নাম ষষ্ঠ চেতনা কি না আমি জানি না। এখন মনের তলায় যে-সম্ভাবনা সংগোপন নিভৃত থেকে ঠেলে এগিয়ে আসতে চাইছে—তারই প্রকোপে আমার বুক দুরু দুরু সর্বদা।

বোমার শুধোয়, কর্তা তোকে কি দিল বল না?

আমি বলি, কিছু না।

আমি কিছু পাইনি বলে বোমারের বিস্ময় যেমন, অস্বস্তিও তেমনি। ক্ষ্যাপা মানুষের মতি-গতির কথা কে জানে, হয়তো দেবেই না কিছু। তাই সান্ত্বনা দেবার মতো করে বলে, কর্তা নিশ্চয় মজা করছে তোকে নিয়ে, দেখছে তুই মুখ ফুটে কিছু চাস কিনা, আসলে নিশ্চয় সক্কলের বেশিই দেবে তোকে।

আমার বুকের ভেতর কাঁপুনি কেন? বলে ফেললাম, তাই হবে বোধহয়...

অবাক মুখ করে সারাও এসে বলেছে, বাবা সক্কলকে দিল, শুধু তোমাকেই কিছু দিল না শুনলাম?

আমি মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ দিল না তো...।

—সেকি! একবার খাঁচায় ঢুকে বাজী মাত করেছ, আমি তো ভাবলাম তোমাকেই সব থেকে বেশি দেবে!

ও কাছে এলে আজকাল আমার এমন লাগে কেন? আকাশের চাঁদ হাতের নাগালের মধ্যে এমন অসম্ভব অনুভূতিও মনের তলায় তোলপাড় করে কেন?

জবাব দিয়েছি, কেনই বা দেবে আমাকে পুরস্কার, আমি তো আর বিপদ থেকে উদ্ধার করিনি, নিজেই উদ্ধার হয়েছি।

মুখখানা মনিব-কন্যার মতোই ভারিক্কি করে ও বলল, তাহলেও, সকলকে দিয়েছে তোমাকেও দেওয়া উচিত। আমি বাবাকে বলব'খন—

চিন্তার ছায়া টানলাম মুখে, তুমি বললে যদি আবার অনেক বেশি দিয়ে দেয়?

আমার দুশ্চিন্তার বহর দেখে সারা হেসে ফেলল।—সে-জন্যে তোমার ভয় করছে নাকি?

আমি মাথা নাড়লাম, ভয় করছে।

...তারপর ঘোষণা নয় তো, যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ একটা। একজন রাগে ফেটে পড়ল, বাদ বাকি সকলে বিস্ময়ে।

প্রতিষ্ঠানের মালিক মারভিন জেনট্রির একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে। বিয়ে এই প্রতিষ্ঠানেরই ক্রীতদাসতুল্য একজনের সঙ্গে, যার নাম টনি কার্টার। সারা জেনট্রি সারা কার্টার হবে।

ঠিক যেমন করে আর পাঁচটা হুকুম করে মারভিন জেনট্রি, মেয়েকে ডেকে সেই গোছেরই হুকুম করল। বলল, সে যেন বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়, তার শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না, তাই বিয়েটা শিগ্‌গীরই দিয়ে দেবার ইচ্ছে।

শরীর কেন ভালো যাচ্ছে না সকলেই জানে। মদের মাত্রা তার দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। একটু সামলেসুমলে চললেই ভালো থাকতে পারে। কিন্তু ডাক্তারের কথায় কান দেবে না। তবে লোকটা মদ খেলে আগের মতো অত ভয়াবহ হয়ে ওঠে না এটুকুই যা তফাত।

সেদিন এ নিয়ে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। দেখে সারাও হকচকিয়ে গেছল সত্যি কথাই। তার বাবা সেই থেকে মদ খাচ্ছিল, একসময় বোতল শূন্য। মেজাজ বিগড়োল। হাঁক পাড়ল, টনি—!

কাছে আসতেই বলল, আমার বোতল থেকে আজকাল কেউ মাল সটকাচ্ছে, নইলে ঝটঝট এ-রকম ফুরোয় কি করে?

আমি নিরুত্তর।

বিরক্তি বাড়ল।—হাঁ করে দেখার কি আছে, একটা বোতল চাই।

ইদানীং তার সব-কিছুর চাবিই আমার কাছে। বললাম, আর বোতল নেই।

—নেই! নেই মানে?

আমি নিরুত্তর। সারা সভয়ে আমাকে দেখছিল, ভাবছিল কপালে না জানি কি আছে আমার।

মনিব গর্জে উঠে টেবিল চাপড়ে বলল, এক্ষুনি এখানে বোতল চাই, এ ফ্রেশ্ অ্যান্ড ফুল বটল—নইলে খুন হয়ে যাবি বলে দিলাম!

আমি গম্ভীর মুখে চলে গেলাম। তারা দুজনেই ধরে নিল আমি মদের বোতল আনতে গেলাম। কিন্তু তার বদলে যে জিনিসটি এনে সামনে রাখলাম দেখে প্রথমে দুজনেই হতভম্ব।

মনিবের সেই চাবুকখানা।

মারভিন ফেটে পড়ল, হোয়াট্ ইজ্ দিস?

আমি সবিনয়ে জবাব দিলাম, খুন করবেন বললেন যে!

সারা ভয়ে তটস্থ। মনিব হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। চাবুকটা তুলে নিয়ে শপাং করে টেবিলের ওপরেই এক ঘা বসাল। সঙ্গে সঙ্গে সে কি অট্টহাসি! থামেই না আর। শেষে মেয়ের দিকে ফিরে বলল, দ্যাখ্, দেখে রাখ, মোর ডেঞ্জারাস্ দ্যান লুই অ্যান্ড্ লিও, তোর কপালে কি আছে কে জানে।

বাপের এই পরিবর্তন দেখে মেয়ে অবাক হয়েছিল। যা বলল, নেশার ঝোঁকে বলেছে ধরে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে হেসেও ছিল। তিন দিন না যেতে ওকে ঘরে ডেকে এই হুকুম।

সারা আকাশ থেকেই পড়ল।—বিয়ে! আমি করব! কাকে?

—কেন, টনিকে।

আমি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি দূরে সরে যেতে চেষ্টা করলাম। পারা গেল না, পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে আছে।

সারার মুখের সে বিস্ময় আমার বুকে মুগুরের মতো বেজে চলেছে। ওর মাথায় ভালো করে ঢুকছে না কিছু।—টনি...মানে আমাদের টনি?

—হ্যাঁ, আমাদের টনি। টনি কার্টার। তুমি মিসেস টনি কার্টার হতে যাচ্ছ।

তারপরেও সারা হাঁ করে বাপের মুখের দিকে চেয়ে আছে দিনে-দুপুরে মদ গিলে মত্ত অবস্থা কিনা বুঝতে চেষ্টা করছে। তারপর চেঁচিয়ে উঠেছে, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে বাবা?

মারভিন তেতে উঠল, ডোন্ট বি ইম্পার্টিমেন্ট্, যা বললাম তাই হবে, টনি কার্টারের সঙ্গে তোমার বিয়ে—

—না না না! মেয়ে ক্ষেপেই উঠল, তোমার মাথার ঠিক নেই, তুমি পাগল হয়ে গেছো, ছি ছি ছি, একটা ইয়ের সঙ্গে—না, কক্ষনো না, কক্ষনো না!

ছিটকে বেরিয়ে এলো। সামনে আমি। নির্বাক ঠাণ্ডা। দু'চোখে ঘৃণা আর বিদ্বেষ উপছে পড়ছে তার। আমার মুখটাও একদফা ঝলসে দিয়ে ছুটে চলে গেল।

বিকেলে একপ্রস্থ বাপ-মেয়েতে কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল। রাগে ক্ষোভে মেয়ে যা-খুশি তাই বলতে লাগল। বাপকে ডাক্তার দেখাতে বলল, আমার উদ্দেশ্যে গালাগালি ছুঁড়ল।

মারভিনের এক শাসানি। কথার অবাধ্য হয়ো না, আমি যা ঠিক করেছি তার নড়চড় হবে না—অবাধ্য হলে বিপদ হবে।

সন্ধ্যার মধ্যে অনেককেই সুসংবাদটা জানিয়ে দিল মারভিন জেনট্রি। তাদের প্রতিষ্ঠানের ভাবী কর্তা আমি টনি কার্টার—তার জামাই। শিগগীরই বিয়ে হবে, উৎসব হবে, এবং সকলে মনের সাধে আনন্দ করার সুযোগ পাবে। শুনে সকলে সারার মতোই বিমূঢ় প্রথম, অর্থাৎ, কে টনি কার্টার, আমাদের টনি...? তারপর মানুষটার মত্ত অবস্থা কিনা, ক্ষেপে গেল কিনা সেই সংশয়। তারপরেও মুখ চাওয়া-চাওয়ি। বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না। ভাগ্যের এমন ওলট-পালটও হয় কখনো!

ফ্র্যাংকি বোমারও হাঁ। চোখাচোখি হলেই এক চোখ বুজে ঘটা করে দেখছে আমাকে।

এর পর সতেরো বছরের একটা মেয়ের সে-কি হিংস্র মূর্তি। বাপের মন টলাতে না পেরে আমার উপরেই আরো ক্ষেপে গেল। চোখে মুখে ঘৃণা আর বিদ্বেষ ঠিকরে পড়ছে। বার বার ঝলসে উঠতে লাগল, তুমি একটা স্কাউন্ড্রেল, সিংহ খাবে না জেনেও বাবার মন ভুলোবার জন্য খাঁচায় ঢুকেছিলে,

বাবাকে তুমি ওষুধ দিয়ে বশ করেছো। তোমাকে আমি মজা দেখিয়ে ছাড়ব—তোমাকে আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব—বুঝলে?

মোলায়েম মুখ করে জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ের পরে তো?

—কি? এত আস্পর্ধা তোমার! বাবার মাথাটা খারাপ করে দিয়ে ভেবেছো সব হয়ে গেল? তোমার ওই জিভ আমি টেনে ছিঁড়ব, কুকুর দিয়ে খাওয়াব!

রাতে কর্তাকে বেশ খোশমেজাজে পেলাম। বোতলে মদের পরিমাণ দেখেও তেতে উঠল না। যেন গায়ে ধুলো-বালিটিও পড়েনি। বলল. কি, কি-রকম লাগছে?

জবাব দিলাম, মন স্থির করার জন্য মিস জেনট্রিকে একটু সময় দেওয়া উচিত...হঠাৎ একেবারে শকের মতো লাগছে।

গেলাসে মদ ঢালল। দুই এক চুমুক খেল। তারপর মুখ বিকৃত করে বলল, সময় দিলে কি হবে, তোমার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাবে?

সে সম্ভাবনা কম। কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। আবার দু'চার চুমুক টেনে মারভিন বলল, তখন কি-সব যাচ্ছেতাই গলাগালি করছিল শুনলাম...। একটু চুপ করে থেকে সকোপে তাকালো আমার দিকে, ঝাঁঝিয়ে উঠল—হাত দুটো কি বিয়ের নামে পঙ্গু হয়ে গেছে? ঠাস ঠাস করে দু'গালে চড় বসিয়ে দিতে পারনি?

সভয়ে ঘুরে তাকালাম। তারপর আরো বিপন্ন অবস্থা আমার। ওদিকের দরজার আড়ালে সারা দাঁড়িয়ে। বাপের কথা কানে গেছে। দুচোখে ভস্ম করেছে।

এর পরের ক'টা দিন বিকারগ্রস্থ অবস্থা সারার। রাগারাগি কান্নাকাটি গালাগালি। বাপের মুখোমুখি তর্ক করে, দশবার করে পাগল বলে। আবার অনুনয় অনুরোধও করে। আমাকে দেখলেই দু'চোখে যেন গলগল করে রাগ আর ঘৃণা উপছে ওঠে। যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি করে। দলের আর দশজনকে বলে, বাবার চিকিৎসা কর আর ওই শয়তানটাকে তাড়াও এখান থেকে—ও-ই বাবাকে তুক করেছে, পাগল করেছে।

ব্যাপার এমন দাঁড়াল যে দলের লোকের সুদ্ধ হতচকিত অবস্থা। তারাও পাঁচ-রকম ভাবতে শুরু করেছে। আমার ভিতরেও একটা আত্মাভিমান মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। মেনল্যান্ডে আসার পর থেকে মারভিনেরই সুইটের একটা ঘরে আছি। বলতে গেলে তখন থেকেই তার সর্বক্ষণের দোসর আমি। কিন্তু আজ এতদিনে সারার মনে হল, আমি মতলববাজ বলেই অন্য সকলকে ছেড়ে এখানে পড়ে আছি—বাবার মাথাটি খাবার জন্যে, আর এই চক্রান্ত করার জন্য।

দলের বাকি সকলে এ বাড়িরই নীচের তলায় থাকে। আমার ওপর সারার হুকুম হল, কাল থেকে সে যেন দোতলায় আমার মুখ না দেখে। দলের আর সকলে যেমন আছে সেইরকম থাকতে হবে। আমি জবাব দিইনি। শুধু লক্ষ্য করেছি ওকে। তারপর এত ঘৃণা এত বিদ্বেষের কারণ খুঁজেছি।—প্রথম কারণ আমার গায়ের চামড়া। কালো চামড়া। কিন্তু যতদূর ধারণা, সেটাই প্রধান কারণ নয়। আমি কালো, মুখের একদিকে আমার বাঘের থাবার ক্ষতচিহ্ন—তবু না। আমার মুখশ্রী কুৎসিত কেউ বলে না, নির্বোধ কেউ বলে না। বোমার বরং অনেক সময় বলত, ওই রঙেই তোকে বরং ভালো মানায়, বুঝলি, তুই হলি। কালোমাণিক। সারার প্রধান বাধা, আমি দাস, ওর বাবার প্রায়-কেনা ক্রীতদাস আমি। জ্ঞান-বয়েস থেকে ও তাই জেনেছে, সেই অনুভূতি নিয়েই আমাকে দেখে এসেছে। কখনো হয়তো স্নেহ করেছে, করুণা করেছে, দীর্ঘ সান্নিধ্যের দরুন অনেক সময় বা অন্তরঙ্গ ব্যবহারও করেছে—কিন্তু রক্ত-মাংসের একটা পৃথক সত্তার তাজা মানুষ হিসেবে দেখেনি কখনো। তাই এত ক্ষিপ্ত। তাই এমন মানসিক বিপর্যয়।

সেই রাতে আমি কর্তাকে জানালাম, তার এই ভালবাসার জন্য আমি চির-কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমারও আত্মসম্মান বলে কিছু আছে, তার এ-সঙ্কল্প ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। আর সেই সঙ্গে প্রকারান্তরে বিদায় প্রার্থনা করলাম।

খুব নির্লিপ্ত মুখে মারভিন বলল, মেয়েটা বড় বেশি ঝামেলা করছে আর বড় বেশি উত্যক্ত করছে—না?

আমি নিরুত্তর।

—আচ্ছা কাল থেকে আর কিছু করবে না।

যেন ফয়সালা হয়েই গেল। না বুঝে আমি মুখের দিকে চেয়ে আছি।

মারভিন পুনরুক্তি করল, বললাম, তো, কাল থেকে আর উত্যক্তও করবে না—বিয়েতে আপত্তিও করবে না। নিশ্চিন্ত?

কোন মন্ত্রবলে এটা সম্ভব, বা কোন্ আশ্বাসে সে নিজে এত নিশ্চিন্ত ঠাওর করে ওঠা গেল না। মারভিন আমার মনের খটকা বুঝে নিয়েই যেন মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। এই লোকের মুখে এমন স্নেহ-ঝরা হাসিও কি কেউ খুব বেশি দেখেছে! বলল, হ্যাঁ রে, আমার ওই মেয়েটাকে যে তুই ভালোবেসে ফেলেছিস এ তো ঠিক?

কি জবাব দেবো? ভদ্রলোক ইদানীং আমার সঙ্গে বেশ ইয়ার্কি-মস্করাও করে এক-একসময়।

তেমনি হালকা হাসি-মাখা ঠেসের সুরেই বলে গেল, ওই জেরোম ছোঁড়াটার ওপর ছোরা উঁচিয়েছিল কেন? ও অত্যাচার করতে পারে ধরে নিয়ে আমার মেয়ের পিছু নিয়েছিলি? আর, তার জন্যে চাবকে যখন পিঠ লাল করে দিলাম তার পরেও ওই ছোঁড়ার নগদ পাঁচ হাজার টাকার টোপ গিললি না কেন—চাবুক খেয়ে আমাকে ভালবেসে ফেলেছিলি বলে?

আমার গায়ের রং কালো বলেই রক্ষা, নইলে অবস্থা দেখে আরো বেশি হাসির খোরাক পেত। পরক্ষণে মুখখানা ছদ্ম-গাম্ভীর্যে ভরাট। উপসংহার টানার মতো করে বলল, অতএব বাছা, ভালো যখন বেসেছ মরদের মতো ভালোবাসতে চেষ্টা করো, মেয়েদের মতো মিনমিন করে ভালোবাসতে গেছ কি মরেছো।...নিজের চোখে সিংহের খাঁচায় ঢুকতে না দেখলে তোমার এই কথার জন্যেই চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যেতে বলতাম।

রাতে ভালো ঘুম হল না। কাল থেকে আর ওই মেয়ে গণ্ডগোল করবে না বা বিয়েতে আপত্তি করবে না ঘোষণা করল কি করে—তাই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েও কূল-কিনারা পেলাম না।

উল্টে পরদিন সকালেই এক দমকা ঝাপটা। বেলা ন'টা নাগাত নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সারা আমাকে দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল।—ইউ স্কাউন্ড্রেল! কাল তোমাকে কি বলেছিলাম আমি? রাতে কোথায় ছিলে?

চোখে চোখ রেখে জবাব দিলাম, ওপরে। আমার ঘরেই।

অস্বাভাবিক রাগে দু'চোখ ঠিকরে পড়তে চাইল।—এত সাহস, এত স্পর্ধা তোমার, অ্যাঁ? শয়তান কোথাকার, আসকারা পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছো? বাবার ওই চাবুকই তোমার মতো শয়তানের উপযুক্ত জিনিস, বাবা ছাড়লেও সেটা হাতে নেবার আর কেউ নেই ভেবেছ—কেমন?

আমি ভাবী বর। আর ওই আমার ভাবী বধূ। সম্ভাষণ শুনে আমার কান জুড়িয়ে গেল। কি যে করব ভেবে পেলাম না। সিরসির করে মাথা বেয়ে উঠছে কি। কেউ যেন আমাকে মধুরতর সম্ভাষণের জবাবের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। ওর বাপের কথায় গালের ওপর মরদের মতো ভালোবাসার নজির রাখার বাসনাটাও হাতে নিশপিশ করে উঠল একবার।

ও-দিকের ঘরে মারভিন জেনট্রি। মেয়ের কথা শুনতে পাচ্ছে নিশ্চয়। ভদ্রলোক গত রাতেই আমাকে নিশ্চিন্ত করেছিল, বলেছিল, মেয়ে তার কাল থেকে আর উত্যক্ত করবে না, বিয়েতেও আপত্তি করবে না। সকালেই এই।

ওই ঘরের দিকে তাকালাম একবার। সারা আবারও কি বলে উঠতে যাচ্ছিল। তার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। আমিও হকচকিয়ে গেলাম একটু। ঘর থেকে মারভিন জেনট্রি বেরিয়ে আসছে—হাতে বন্দুক। ঠাণ্ডা মূর্তি। রাগ বিরাগের চিহ্নও নেই মুখে। মেয়েকে বলল, নীচে আয়।

উদ্দেশ্যটা সঠিক না বুঝে মেয়ে চেয়ে রইল। আমিও। মুহূর্তের মধ্যে কারো মুখের ভোল এমন বদলে যেতে পারে তাও জানতুম না। আচমকা মেয়েকে সিঁড়ির দিকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে মারভিন গর্জে উঠল, গেট ডাউন স্টেয়ারস!

মেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল। ঘুরে বাপের দিকে তাকাবার অবকাশও পেল না। মারভিন ঠেলতে ঠেলতে তাকে নীচে নিয়ে এলো। সিঁড়ি দিয়ে পড়ার ভয়ে সারা নিজেই সত্রাসে তরতর করে নেমে এলো। মারভিনের পিছনে বিমূঢ় মুখে আমিও।

নীচের উঠোনে টেনে নিয়ে এলো তাকে, তারপরেই আবার বিষম এক ধাক্কা। সেই ধাক্কার চোট সারা সামলে নিতে-নিতেও পড়েই গেল. হাত-পা হয়তো ছড়েও গেল একটু। কিন্তু বাপের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতের হ্যাঁচকা টানে তাকে তুলে সামনের দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল আবার। দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেয়ে বিস্ফারিত ত্রাসে তার বাপের দিকে তাকালো।

ততক্ষণে যে-যেদিকে ছিল ছুটে এসেছে। তারপরেও কাঠ সকলে। আমিও। মারভিন ঠিক দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে বন্দুকের নল সোজা করে বুকের ওপর তুলল। বজ্রগম্ভীর গলায় বলল, আমি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণব, তার মধ্যে শুনতে চাই মুখ বুজে ওকে বিয়ে করবে কি না—পাঁচ গোনা হয়ে গেলে আর বলার সময় পাবে না—

...ওয়ান!...টু!...থ্রী...

—ড্যাডি!

সারার আর্ত চিৎকারে আমরা সুদ্ধ যেন একটা সম্মোহনের গ্রাস থেকে ছিটকে বেরুলাম। আমি ছুটে গিয়ে দু'হাতে সারাকে আগলে দাঁড়ালাম। চিৎকার করে সম্ভবত বলতে যাচ্ছিলাম, এ বিয়ে এমন বিয়ে আমি করতে চাই না, তার জন্যে চাও তো আমাকে মার। কিন্তু সে-অবকাশ মিলল না। তার আগেই সারা দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল, তারপর ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল।

—দ্যাট্‌স্ গুড! বন্দুক কাঁধে তুলে নিল বাপ।

আমাকে আঁকড়ে ধরে সারা মুখ গুঁজে কাঁপছে তখনো। ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকালাম। বন্দুক হাতে মারভিন চলে যাচ্ছে। আমি ঘুরে তাকাতে একবার চোখ টিপে দিয়ে গটগট করে ভিতরে ঢুকে গেল। এই পলকের রসিকতাটুকু আর কারো চোখে পড়ল না।

অন্য সকলে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে তখনো। সারার সংবিৎ ফিরতে আমাকে ঠেলে সরিয়ে পলকের জন্য পরিস্থিতিটা দেখে নিল একবার। রাগে অপমানে আর সেই কান্নার আবেগ সামলানোর চেষ্টায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

সকলে নির্বাক। আমিও। অদূরে বোমারের চোখে চোখ পড়ল। একটা চোখ বুজে ঘটা করে আর একটা চোখ পিট পিট করতে লাগল সে।

সাত

বিয়ে হয়ে গেল।

এত নির্বিঘ্নে হয়ে গেল যে সেটাই অস্বস্তিকর। সারা যেন কলের মেয়ে। নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই, সত্তা নেই।

উচ্ছল এক প্রাণবন্ত মেয়ের এই গোছের পরিবর্তনে ভিতরে ভিতরে বিচলিত আমি। একটা স্বাভাবিক অনুভূতির পীড়ন অস্বীকার করব কি করে? জন্মকাল থেকে বঞ্চিত রিক্ত আমি, তবু এত বড় প্রাপ্তির জোয়ারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্যের মতো ভেসে যেতে সঙ্কোচ। যা প্রাপ্য নয় তাই পেয়েছি, যা কল্পনা করতে পারি না তাই দখলের মধ্যে এসেছে—এই বিবেকবোধটাই সদর্পে অথবা জোর করে কিছু গ্রহণের ব্যাপারে অন্তরায় হয়েছে। তার বদলে সহজ ভদ্র পথ অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছি আমি। সারাকে সানুনয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, বাইরেটা আমার কালো হলেও ভিতরটা সাদা কিনা পরখ করে দেখতে। বলেছি, যা হয়ে গেল আমার তাতে সত্যিই কোন হাত ছিল না, কিন্তু হয়ে যখন গেলই, আমি তার যোগ্য হবই। গায়ের রং পাল্টাতে পারব না, কিন্তু আর কোনদিক থেকে তার খেদ থাকবে

না। বোকার মতো এমনও বলেছি, মানুষ তার পোষা জন্তু-জানোয়ারকেও ভালোবাসে, সেই রকম করেই না-হয় ও চেষ্টা করে দেখুক আমাকে একটু আধটু পছন্দ করা যায় কিনা।

জবাবে সারা একটি কথাও বলেনি। চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে। সে চাউনির মধ্যে যে অবিশ্বাস আর নীরব ঘৃণা আমি দেখেছি, সে যেন আমার অন্তস্তলে গিয়ে খচ খচ করে বিঁধেছে। কিন্তু ওপরওলার প্রতি তখন আমার দ্বিগুণ আস্থা বলেই আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চেয়েছি, ওর এত বড় বীতরাগেরও অবসান হবে—হবেই। তাই জোর করার বদলে আমি সবুর করার ভদ্র আর দার্শনিক রাস্তাটাই বেছে নিয়েছি।

এদিকে আমার শ্বশুরও এমন শ্বশুর যে সামনে পড়লে কোন্ দিকে পালাবে ভেবে পাইনে। বিয়ের তিন দিনের মধ্যেই খোসমেজাজে আস্ত মদের বোতল নিয়ে বসেছে। সেই সন্ধ্যাতেই ডাক্তার তাকে লিভারের অল্প অল্প ব্যথা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন করে দিয়ে গেছে। মদ ছুঁতে বারণ করেছে। গত দু'দিন উৎসবের আনন্দে দেদার মদ গিলেছে। আজ আমি বাধা দেবই সঙ্কল্প করেছিলাম, তার আগেই দেখি মিটি মিটি হাসছে আর আমার দিকে তাকাচ্ছে।—কি হে, কেমন লাগছে?

মদের বোতলটা তার কাছ থেকে টেনে নেবার মতলবে আমি গম্ভীর মুখে কাছে এগিয়ে আসতেই ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে বসল, গট হার?

উদ্দেশ্য ভুলে আমি থতমত খেয়ে তাকালাম তার দিকে।

—ইউ ফুল! হাউ ডিড ইউ লাইক হার, ইজন্ট্ সি ওয়াণ্ডারফুল?

আমার কান গরম। সেই ফাঁকে মদের গেলাস ভরাট করে সে আয়েস করে চুমুক লাগাল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, নাউ ইটস্ ইওর টার্ন টু মেক ইওরসেলফ্ ওয়ান্ডারফুল। মেক হার ম্যাড্ ফর ইউ!

পালিয়ে এসেছি। সামনে রাত্রি। আমার ধৈর্যের পরীক্ষা। লোলুপ গ্রাসের বদলে আত্মাভিমানী প্রবৃত্তির সঙ্গে নিজের যোঝাযুঝির অধ্যায়। আমার মন বলে, সেটাই পুরুষকার।

রাত্রি। হাসিমুখে সারাকে তার বাপের কথাগুলোই বললাম। কিন্তু আগেও যেমন পাথর, আজও তেমনি। সেই নির্বাক চাউনি আর স্তব্ধ ঘৃণা। প্রতীক্ষায় সে-ও আছে, ভদ্রতার মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কবে কখন আমার স্বরূপ উদ্ঘাটন হবে, কখন আমি পশুর মতো ওর ওপর পড়ব, আর প্রবৃত্তির যূপ-কাঠে ও বলি হবে—সেই অসহ্য ঘৃণ্য মুহূর্তের প্রতীক্ষা।

...পড়লে কি হবে আমি তাও জানি। এমনি নির্বাক, নিস্পন্দ কাঠ হয়ে থাকবে, আর দু'চোখের অব্যক্ত ঘৃণায় আমাকে ডুবিয়ে নির্মূল করে দিতে চাইবে।

না, আমি কাছে যাইনি, কাছে টানতেও চেষ্টা করিনি। রাত্রি বিস্বাদ হয়ে গেছে আমার কাছে।

পরে আবার একদিন শ্বশুর আমাকে প্রগল্ভ খোঁচা মেরেছে। বলেছে, এখানে সকলের মধ্যে পড়ে আছ কেন, দিনকতকের জন্য মেয়েটাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ছ না কেন, আহম্মক কোথাকার!

সেই রাতে গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটেছি আমিও। সারাকে তার বাপের প্রস্তাব জানিয়েছি। বলেছি, ভাবছি দিনকতকের জন্য কোথাও থেকে ঘুরে আসব।

পুঞ্জীভূত ঘৃণা ছাড়াও অসহায় চকিত ত্রাস দেখেছি ওর চোখেমুখে। বিপদ একেবারে এগিয়ে এসেছে দেখলে অসহায় পাখিও আঁচড় কাটে। এবারে কথা ফুটেছে। বলে উঠেছে, তোমার মতো মতলববাজকে চিনতে কারো বাকি নেই, নিজের মতলব হাঁসিল করার জন্য বাবাকে যে তুমি হাতের পুতুল বানিয়েছ, বুঝতে কারো বাকি নেই—বাবার দোহাই দিচ্ছ কেন?

ওকে কথা বলাতে পারার দরুনও খুশি হতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারা গেল না। অপমানে ভিতরটা চিনচিন করতে লাগল। তবু হাসিমুখেই বললাম, আমাকে তাহলে একেবারে চিনে ফেলেছ তুমি?

একবার মুখ ফোটার ফলে ও ক্ষেপে উঠল।—তোমাকে? তোমাকে চিনতে বাকি? তুমি নোংরা, নীচ ছোটলোক লোভী তুমি—তোমাকে আমি এ জীবনে ক্ষমা করব? তুমি আমার জীবন মাটি করেছ, তুমি আমার সর্বস্ব গ্রাস করেছ, তুমি আমার বাবাকে শত্রু বানিয়েছে—দাস ছিলে, ষড় করে এখন

আঙুল ফুলে কলাগাছ বনেছ ভাবছ। আমি সর্বক্ষণ তোমার মৃত্যু কামনা করছি, যে মৃত্যু তোমার উপযুক্ত শাস্তি সেই রকম ভীষণ মৃত্যু—বুঝলে? তারপরে আমি ঠাণ্ডা হব, তারপরে আমি হাসব—বুঝলে?

আমার ভিতরের নরম তন্ত্রীগুলো সব ও যেন টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল। দিশেহারা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম আমি। কাছে এসে দাঁড়ালাম। খুব কাছে। মাথায় রক্ত চড়ছে. চড়ছেই। সত্যিই কি আদিম হিংস্র বন্য আমি? অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে ভরপুর বলেই ভদ্রতা আর ধৈর্যের মুখোশ পরেছিলাম?

জানি না।

ওর গালের ওপর আমার আঙুলের শক্ত পাঁচটা দাগ বসে গেল। টাল সামলাবার চেষ্টায় তিন হাত সরে গেল। দুহাতের হ্যাঁচকা টানে তক্ষুনি সামনে টেনে আনলাম আবার। হিংস্র দুই বাহুর নিষ্পেষণে, দাঁত আর অধরের নিপীড়নে দম বন্ধ করে দিতে চাইলাম—তারপর তেমনি আক্রোশে শয্যায় ঠেলে দিলাম।

ও প্রাণপণে যুঝল। বিকারগ্রস্তের মতো কিল-চড়-লাথি ছুঁড়তে লাগল। আমি আঘাত পেলাম। পাল্টা আঘাত দিলাম। ওর সমস্ত শক্তি নিঃশেষে হরণ করে নিতে চাইলাম।

...নিলাম।

ঘরে আলো জ্বলছে। পুরুষের হিংস্র উল্লাসে রমণী যেন এক ভয়াবহ মৃত্যুর গহ্বরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আর, সেই অমোঘ পরিণামের মধ্যে ডুবে যেতে যেতেও সে যেন তার ঘাতককে দেখে নিচ্ছে।

কিন্তু তারপর?

একটা দুটো করে ক'টা দিন গেল। দিনের আলোয় আমি এক মানুষ। শান্ত, বিনীত, অনুতপ্ত। একজনের ভুল ভাঙব, হৃদয় দিয়ে তাকে জয় করব—সে-লক্ষ্য থেকে আমি কত দূরে সরে এসেছি আর সরে আসছি সেটা অনুভব করতে পারি। একটা মানুষের মতো তার কাছে উঠে আসা কবর থেকে উঠে আসার সামিল যেন।

ভদ্র বিনয়ের আড়ালে এই হতাশা সমস্ত দিন ধরে আমাকে কুরে কুরে খায়। এই যাতনাই একটু একটু করে আমাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। দিনের আলোয় টান ধরার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মধ্যে এক হিংস্র পশুর অধিকার বিস্তার শুরু হয়। আমি প্রাণপণে তার সঙ্গে যতক্ষণ সম্ভব যুঝতে চেষ্টা করি। তারপর হেরে যাই। হেরে না যাওয়া পর্যন্তই যাতনা। তারপর বিপরীত উল্লাস। রাতের প্রতীক্ষা। সর্বস্বান্ত মানুষ যেমন করে আত্মঘাতী নেশার অতলে ডুব দিতে চায়, তেমনি একটা তাড়না আমাকে প্রবৃত্তির অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে।

ও বুঝতে পারে। দুই চোখে ঘৃণা ঠিকরে উঠতে থাকে। আত্মরক্ষার তাগিদে ত্রস্ত হরিণীর মতোই আমার থাবা থেকে দূরে সরে যেতে চায়, পালাবার পথ খোঁজে। কিন্তু যাবে কোথায়? পালাবে কোথায়? যেখানে যে-ঘরে গিয়ে বসে থাকুক, ক্রূর ব্যাধের মতো ওকে নিজের কবলে নিয়ে আসা আমার পক্ষে তখন জল-ভাত ব্যাপার। একমাত্র ওর বাবার ঘরে পালালে হয়তো আমি থমকাব। কিন্তু সেখানে যে আশ্রয় মিলবে না, ওর থেকে ভালো আর কে জানে। তার জীবনে বাপের মতো শত্রু আর নেই।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি যে এক কানা-গলির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি সেটা সত্যি। ক্রমে দিনের আলোতেও একটা অন্ধ আক্রোশ আমাকে পেয়ে বসতে লাগল। শ্বশুর আমাকে কাজ-কর্ম বোঝাবার জন্য ডাকে। তার হাতে-গড়া এই প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী ভাবে আমাকে। তা ছাড়াও ওই নিঃসঙ্গ মানুষ হামেশাই আমার সঙ্গ চায়। কিন্তু আমি কাজে মন দিতে পারি না, তিনবার করে বললে এক কথা কানে ঢোকে না। আমার উদ্যমের অভাব তৎপরতার অভাবও লক্ষ্য করছে ভদ্রলোক। না ডাকলে নিজে থেকে তার কাছে যাওয়াও ছেড়েছি।

বিরক্ত মুখ করেই একদিন জিজ্ঞাসা করে বসল, কোন রাজ্যে বাস করছ আজকাল, কিছু গণ্ডগোল চলছে নাকি? মেয়েটাকে এখনো টিট্ করতে পারোনি?

সপ্রতিভ মুখ করে তার চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা করলাম। তার সন্দেহ কতটা সত্য জানতে পারলে মেয়ের ওপর ক্রুদ্ধ হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকে যে অপদার্থ ভাববে একটা তাতেও ভুল নেই। বললাম, না, গণ্ডগোল একটু আপনাকে নিয়ে চলেছে, যে হারে আপনি ডাক্তারকে কলা দেখাচ্ছেন, আমাদের কি করণীয় ঠিক বুঝে উঠছি না।

ভদ্রলোক হা-হা করে হেসে উঠল। অনেক দিন হল তার মদের মাত্রা কমানোর ব্যাপারে কোনোরকম সক্রিয় চেষ্টা নেই আমার দিক থেকে। অতএব সে-মাত্রা যে বাড়ছে সহজেই অনুমান করতে পারি।

কিন্তু নিজের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। তাই হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ঠিক করলাম, দিন-কতকের জন্য বাইরেই যাব। সারা? সে-ও সঙ্গে যাবে বই কি। স্বেচ্ছায় যাবে না। তাকে যেতে হবে। এটা প্রতিশোধের নেশা কি নতুন কোন পথ খোঁজার চেষ্টা, জানি না। শ্বশুরের কাছে অভিলাষ ব্যক্ত করতে সে সানন্দে রাজি।

সারা শুনল। আপত্তি করল না। আপত্তি করলে লাভ হবে না জানে। স্থির চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল আমাকে। সেই চাউনির তলায় শুধু ঘৃণা, ঘৃণার সমুদ্র।

বোমার বিদায় দিতে এসেছিল। এরোপ্লেনে ওঠার আগে সারাকে দেখিয়ে আমাকে একটা কনুইয়ের খোঁচা মেরে বলেছিল, কি ব্যাপার? তুমি যে দেখি একটা শবদেহ নিয়ে আনন্দ করতে চলেছ!

...তারপর সারার দিকে চেয়ে মনে মনে আমিও অনেক বার ভেবেছি, কোনো জাদুমন্ত্র-বলে শবদেহে প্রাণ আনা যায় না? যায় না?

পাহাড়-ঘেঁষা সুন্দর একটা খটখটে ছোট জায়গায় এসেছি আমরা। আকাশ-পথে দু'তিন ঘণ্টার যাত্রা এ-জায়গাও আমি নির্বাচন করিনি, সারার বাবা বেছে দিয়েছে। প্রাচ্যভূমির সর্বত্রই ঘুরেছে সে।

পর্যটকদের একটাই নামী হোটেল সেখানে। বেড়াবার মৌসুম নয় বলে যাত্রীর ভিড় তেমন নেই। আবার একেবারে যে নেই এমনও নয়। পয়সার জোর বুঝে হোটেলের ম্যানেজার সব থেকে দামী এবং আরামের সুইটএ এনে তুলল আমাদের। কিন্তু সারার নির্বাক যান্ত্রিক আচরণের দরুনই তার চোখে পলকের সংশয় দেখলাম কিনা জানি না। কালো মানুষের এই সুরূপা সঙ্গিনীটি যথার্থই স্ত্রী অথবা অপর কোন ঝামেলার ব্যাপার কিছু, সেই সংশয়ও হতে পারে।

রওনা হবার পর থেকেই সারা যা ভাবছে, আমি তার বিপরীত ব্যবহার করব বলে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ও ধরেই নিয়েছিল ওকে আরো বেশি করে নিজের কবলে পাবার, আর, ওর সর্বক্ষণের স্বাধীনতা হরণের ক্রূর অভিলাষ নিয়েই বেরিয়েছি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি নিজেকে উদার করে তুলেছিলাম, স্থির করেছিলাম এই ক'টা দিনের বিপরীত আচরণের ফল কি হয় দেখব। আমার কাছে রেখে, নাগালের মধ্যে রেখেও ওকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেব। অবাধ স্বাধীনতা দেব। আমার বাসনা এই ক'টা দিন অন্তত ওকে স্পর্শও করবো না।

কিন্তু মানুষ এমনি স্নায়ুর দাস যে শুরুতেই সব ওলট-পালট। সারার সেই নির্বাক স্থির কঠিন ব্যবহারে শুধু ম্যানেজার নয়, অন্যান্য বাসিন্দাদের কেউ কেউও ঈষৎ সন্দিগ্ধ। এমন কি, বিকেলে বেড়াবার সময় কেউ কেউ সংগোপনে লক্ষ্যও করেছে আমাদের। দূর থেকে ফিরে ফিরে তাকিয়েছে। ফুলের মতো দেখতে অথচ এমন পাথরের মতো নিষ্প্রাণ মূর্তি কেন মেয়েটার! সে যে এক অবাঞ্ছিত-কবলিত সেটা তার প্রতি পদক্ষেপে সুস্পষ্ট।

আমার উদার হবার সমস্ত সঙ্কল্প ধূলিসাৎ। যা ও সকলকে জানাতে চেয়েছে বোঝাতে চেয়েছে—রাতের অন্ধকারে তাই নগ্ন সত্য হয়ে উঠেছে। জানোয়ার ভিন্ন আর কিছু যখন ভাববেই না, জানোয়ার হতে আর দ্বিধা নেই। বরং দ্বিগুণ উল্লাশ। সেই উল্লাসে শুধু রাত নয়, ওর দিনও বিষিয়েছি আমি।

তিনটে দিন গেল। এ-পর্যন্ত সারা মুখ বুজেই আছে। কিন্তু ওর চোখে শুধু অব্যক্ত ঘৃণা নয়, ধিকি-ধিকি আগুনও জ্বলে উঠতে দেখেছি আমি।

চার দিনের দিন জীবনের আবার এক নতুন অধ্যায়ে আচমকা পদক্ষেপ আমার।

তখনো বেলা পড়েনি। ঘরের সামনের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছিলাম. সামনে চারদিকে দেয়ালের মতো পাহাড়। একেবারে লাগোয়া মনে হয়। পাহাড়ের ওধারে কোথাও জঙ্গল, কোথাও বা জল-ভূমি। পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো পথ আছে—আবার পথ ছেড়ে পাথর টপকেও ওপরে ওঠা যায়।

আমি চুপচাপ বসেছিলাম। চুপচাপ দেখছিলাম। না, প্রকৃতির শোভা দেখছিলাম না। ভিতরে অসুন্দরের ছায়া পড়লে বাইরের সৌন্দর্যও মুছে যায়। আমার চোখেও কোন সুন্দরের অস্তিত্ব নেই। ক্লান্ত লাগছিল। একটা শূন্য অসম্পূর্ণতা চারদিক থেকে ছেকে ধরছিল আমাকে।...মাত্র ঘণ্টা দেড়েক আগেও অশান্ত আক্রোশে নিজের টুঁটি ধরে নিজেকে আমি জানোয়ারের পর্যায়ে টেনে নামিয়েছি। তেমনি মত্ত আনন্দে সারার চোখে সেই ঘৃণার সমুদ্র দেখেছি, আর তার তলায় সেই ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলতে দেখেছি।

অনেকক্ষণ সারার সাড়াশব্দ পাইনি। অবশ্য সাড়াশব্দ এমনিতেও নেই। শুধু একটা অস্তিত্ব আছে। ঘাড় ফিরিয়ে দু'চার বার ঘরের দিকে তাকিয়েছি। শূন্য ঘর আর শূন্য শয্যা দেখে ভেবেছি ওদিকের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বা বসে ক্ষোভ জুড়োতে চেষ্টা করছে।

হঠাৎ সচকিত আমি। মনে হল সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে এক পরিচিত মেয়ে ওপরে উঠছে। খুব ছোট দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু আমার স্ত্রী সারা ছাড়া আর কে হতে পারে? উঠে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। সারাই বটে। ওর এই অশান্ত পদক্ষেপও আমি চিনি। বেড়াবার মতো করে পা ফেলছে না, এই চঞ্চল গতি কেমন অস্বাভাবিক মনে হল আমার।

পথ ছেড়ে এবারে পাথর বেয়ে উঠছে। ধকলের ব্যাপার সেটা, আর মেয়েদের পক্ষে নিরাপদও নয় খুব। আমি বিরক্ত, ক্রুদ্ধও একটু। কিন্তু আমাকে দেখছে কে?

...দেখল।

পরক্ষণে মনে হল আমাকে দেখবে বলেই ও-ভাবে ওইখানে উঠেছে। উঠে সোজা এই হোটেলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সোজা আমার দিকে।

তারপরেই বিমূঢ় আমি। সারা ডাকছে আমাকে, একটা হাত মাথার ওপরে তুলে আর সজোরে নামিয়ে বার কয়েক ডাকল আমাকে। ওর চোখ-মুখ আমার নজরে আসছে না, তবু মনে হল ওই চোখ জ্বলছে, ওই মুখ জ্বলছে—ওর সর্বাঙ্গ জ্বলছে। এ সেই ষষ্ঠ চেতনার পূর্বাভাস কিনা জানি না, কয়েকটা মুহূর্তের জন্য নিস্পন্দ পঙ্গু যেন আমি। আমার মন বলল, কিছু একটা ঘটবে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

সারা আবার হাত তুলল। আবার ডাকল আমাকে।

আমি ছুটলাম।

কিছু একটা প্রতিরোধের তাগিদে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি...জানি না কি।

বাঁধানো পথ ধরে ছুটেই ওপরে উঠতে লাগলাম। আমি শক্ত সমর্থ পুরুষ, জঙ্গলে আর পাহাড়ে ছোটাছুটি করে অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের এই পাহাড়ী পথ অসহ্য রকমের দীর্ঘ লাগছে।

যেখানে থেকে পথ ছেড়ে দিয়ে ও পাথর বেয়ে ওপরে উঠেছে সেখানে এসে থমকে দাঁড়ালাম। সভয়ে দেখলাম সারা পাথর টপকে আরো অনেক ওপরে উঠে গেছে।

—সারা?

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি। ও ঘুরে দাঁড়াল। বিজয়িনীর ভঙ্গিতে দুই বাহু বুকের ওপর তুলে দেখল আমাকে। ওর চোখে এত আগুন, মুখের এমন অগ্নিবর্ণ আমি আর দেখিনি। ও কিছু করবে—করবেই, সেটা বুঝতে আমার এক মুহূর্ত সময় লাগল না।

আবার ঘুরল। আরো উঠতে লাগল।

পাগলের মতোই আমি পাথর বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছি। কিন্তু ও তখন অনেক উঁচুতে নাগালের অনেক উর্ধ্বে।

—সা-রা!

আবার ফিরল। তেমনি করে বুকের ওপর দু'হাত তুলে দেখল। আমার মনে হল হাসছে একটু একটু। সেই হাসিতে আগুন ঠিকরোচ্ছে। ঘুরে ধীরে-সুস্থে তারপর আরো দুটো পাথর টপকালো।

—সা-রা-আ!

—শাট্ আপ্ ইউ ব্রুট্! ইউ ইনফার্নাল ডগ! এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে গলা দিয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র আগুন ছড়াল এইবার—কাম অন অ্যান্ড্ ক্যাচ মি ইউ ব্লাডি সোয়াইন!

আমি উঠছি। বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে। ও স্থির দাঁড়িয়ে আছে। অফুরন্ত ঘৃণায় দুই চোখে ধক-ধক করে জ্বলছে। আমার ওঠার দৌড় দেখছে। একটা বিকৃত আত্মধ্বংসী আনন্দে ভরপুর যেন।

—স্টপ নাউ, ইউ ব্রুট্।

আমি তখনো ওর থেকে এক-তলা সমান নীচুতে। তবু পরের পাথরটায় আর একটা পা তুলতে ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যেন জ্বলন্ত চাবুকের ঘায়ে থামিয়ে দিল আমাকে।—আই সে, স্টপ্, ইউ ডার্টি ডগ, ইউ ড্যাম ফুল! আর এক ধাপ উঠেছ কি, মজার দৃশ্যটা দু'চোখ ভরে এক্ষুনি দেখতে পাবে।

আমি পঙ্গু। নিস্পন্দ। অসহায়।

পাথরের ওপর দু'বার পায়ের আঘাত করে ও তেমনি উন্মত্ত আক্রোশে বলে উঠল, এখন তুমি কি দেখতে যাচ্ছ? আর দু'মিনিটের মধ্যে তুমি কি দেখবে বুঝতে পারছো? এই সুন্দর শরীরটা, তোমার এত লোভের শরীরটা ভেঙে গুঁড়িয়ে তাল-গোল পাকিয়ে গেলে দেখতে কেমন হবে বুঝতে পারছ না? পারবে, এক্ষুনি পারবে।...আমি তোমার স্ত্রী সারা কার্টার, না? ক্রীতদাস কুকুর কোথাকারের—তোমার স্ত্রী? তোমার স্ত্রী হবার ফল কি বাবাকে দেখিয়ে দিও, তাল-গোল পাকানো মাংসপিণ্ডটা তাকে নিয়ে দেখিও—বোলো—তার বন্দুক দেখে ভয় পেয়ে যে ভুল করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত হল। এইবার সে যেন আনন্দে নাচে। আমি দেখব আর তাকে অভিশাপ দেব আর তোমাকে অভিশাপ দেব! বুঝলে? বুঝলে?

—সারা! সারা! আমি আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম।—সারা, এই একটি বারের মতো আমাকে ক্ষমা করো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—

—শাট আপ্! তোমাকে ক্ষমা করব? তোমার প্রতিজ্ঞা বিশ্বাস করব? তোমাকে? তোমাকে?

আমি পাগলের মতো বলে গেলাম, সারা! একদিন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম, সেই ঈশ্বরের নাম নিয়ে আজ আমি শপথ করছি, আর আমি তোমার ওপর দাবি রাখব না। ঈশ্বরের নাম করে শপথ করছি, তোমার অনুমতি ভিন্ন এ-জীবনে আর আমি তোমাকে স্পর্শ করব না। সারা, বিশ্বাস করো, জীবনে এই একটা বার তুমি আমাকে বিশ্বাস করে দেখো। আমি বিশ্বাসঘাতক হলে এ-পথ তোমার চিরকাল খোলা থাকবে—বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো!

ক্রূর চোখের গভীর দৃষ্টি। ঘৃণার সঙ্গে অবিশ্বাস মিশে আছে তখনো। তবু যেন থমকেছে একটু। দেখছে। ওপর থেকে আমার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

দেখছে। দেখছেই।

দর-দর করে ঘামছি আমি। ক'টা মুহূর্তের মধ্যে একটা কল্পান্ত যেন।

—উঠে এসো!

মর্মান্তিক উত্তেজনায় পাঁচ ছ'টা পাথর উঠে গেলাম।

—থামো!

থমকে দাঁড়ালাম। হাঁপাচ্ছি। তাকালাম। ওর চোখে-মুখে সেই অবিশ্বাস আর সেই ঘৃণা।

—কি বললে?

ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমি শপথ করছি তুমি না চাইলে কোনদিন তোমাকে স্পর্শ করব না।

তেমনি গভীর বিতৃষ্ণা নিয়েই দেখছে। দেখছে দেখছে দেখছে।

—আবার বলো।

—ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করছি তুমি না চাইলে এ-জীবনে তোমাকে স্পর্শ করব না।

দেখছে। এ-দেখার কি শেষ নেই!

—ফের বাবার আসকারা পেলে?

—ঈশ্বরের দিব্যি, না না না!

উত্তেজনার অবসান। টান-টান স্নায়ুগুলো শিথিল। সারার তাই সম্ভবত। আরো খানিক বাদে আমার ওপর থেকে চোখ সরাল। এতক্ষণে যেন দেখল কোন্ সংকটের চূড়ার উঠে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল একবার। তারপর আস্তে আস্তে ওই পাথরটার ওপরেই বসে পড়ল।

নিজের দুটো পা টেনে টেনে ওপরে উঠলাম। সারা অবসাদে দু'চোখ বুঁজে ছিল। তাকালো।

চেয়ে আছে।

আমিও।

এখনো বিশ্বাস করবে কি করবে না ওর চোখে সেই সংশয়।

অনেকক্ষণ বাদে উঠল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ধরব?

মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে ও জবাব দিল, হ্যাঁ। সেই অনেক আগে দরকার হলে যে-ভাবে সাহায্য করতে, সেই রকম করে। তাতে আমার আপত্তি হবে না।

অর্থাৎ ও যখন সারা কার্টার হয়নি তখনকার মতো করে, ও যখন মনিব-কন্যা আমি ক্রীতদাস—তখনকার মতো করে।

আট

সারার নয়, মুক্তি যেন আমারই।

আমার অস্তিত্বের একটা বড় অংশ ওর মধ্যে বিকিয়ে গেছল। প্রভুত্বের নামে ক'টা মাস সে দাসত্বই করেছে। সেটা মুক্ত।

কিন্তু অবিমিশ্র মুক্তি কতদিন ভালো লাগে? আকাশের উদার মুক্তির মধ্যে যে-পাখি ডানা মেলে ভেসে বেড়ায়, সেই ভেসে বেড়ানোটা যদি অনন্ত কালের হত? মুক্তির ছেদ না থাকলে মুক্তির স্বাদ মেলে না।

আমার ছেদ নেই।

একে একে সাত বছর কেটে গেছে। আমি প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। অনেক প্রলোভনের মুহূর্তে, প্রতিষ্ঠানের একরোখা পরিচালক হিসেবে আমার এক-একসময়ের দাপট কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কিনা সেই সংশয়ে সারা অনেক সময় নিজের বিচার-বিবেচনার ভারসাম্য হারাতে বসেছে। শ্যেন-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে আমাকে, তার দু'চোখে সেই ঘৃণা আর অবিশ্বাস চিকিয়ে উঠেছে।

এখন ও নিশ্চিন্ত। এমন কি পরিস্থিতি বিশেষ সময় সময় একটু আধটু উদারও। আমাদের এই জীবনে সে-রকম পরিস্থিতি হামেশাই আসে। এই তো বছর দেড়েক আগে এক গ্রাম্য জায়গায় দড়ি ছিঁড়ে আর বাঁশ উপড়ে আমার ক্যাম্প ধরাশায়ী। (এর পিছনে বোমার ইচ্ছাকৃত কিছু হাতযশ ছিল বলে মনে মনে সন্দেহ আমার।) সারা সহজ মুখেই আমাকে নিজের ক্যাম্পে ডেকে নিয়েছিল। সাদাসিধে রসিকতাও করেছিল একটু, বলেছিল, দুটো বিছানার মধ্যে যেন কম করে চার হাত ফারাক থাকে।

দীর্ঘকালের সহ-অবস্থানে অনেক কিছু সয়। আমাদের ইউনিটের এক মেয়ে পুঁচকে বাঁদর পুষেছিল একটা। বছর পাঁচেক বাদে সে ওটাকে বুকে চেপে রেখেই দিব্যি ঘুমোত। বিশ্বাস ছেড়ে, চাইলে স্ত্রীর কাছ থেকে সেই গোছের একটু-আধটু প্রশ্রয়ও হয়তো বা মিলতে পারত। তাছাড়া, ওকে আমি যতটুকু চিনেছি, অভাববোধ একটা তারও থাকা স্বাভাবিক।...আর, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর নজিরও বিরল নয়।

না। ভিক্ষুকের মূর্তিতেও কোনদিন ওর সামনে দাঁড়াইনি।

বলতে গেলে কর্তা বেঁচে থাকতেই প্রতিষ্ঠানের আমি পরিচালক। বছর দেড়েক হল দেশে থাকতেই মারভিন জেনট্রি গত হয়েছে। তার আগে বছরের মধ্যে অনেকবার ঘুরে ফিরে তাকে হাসপাতালে থাকতে হত। তাকে একসঙ্গে বেশি দিন সুস্থ রাখা কোন ডাক্তারের কর্ম নয়। নিষেধ অমান্য করার ঝোঁক তার কাছে যেন এক কৌতুককর ব্যাপার। ডক্টর কেলার যখন গম্ভীর মুখে তাকে এটা-সেটা বোঝাত, সে-ও গম্ভীর মুখে তা বুঝে নিয়ে মাথা নাড়ত। সে প্রস্থান করা-মাত্র তার সব নির্দেশ বাতিল।

আমার ধারণা লোকটা জেনে-শুনে আত্মহত্যা করেছে। সে কারো থেকে কিছু কম বুঝত না, কারো থেকে কিছু কম জানত না। কিন্তু জেনে বুঝেও স্বেচ্ছাচারীর মতো চলত। নিজেকে ক্ষয় করত। জীবনের ওপর তার ঠিক কি অভিযোগ ছিল আমি আজও জানি না।

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বজায় থাকলেও আমার আর সারার বিচ্ছেদ সে টের পেয়েছিল। আমি বলিনি। সারা তো বলবেই না। কিন্তু বিচক্ষণ মানুষটার চোখে কিছুই এড়ায়নি। ক'দিনের হনিমুন থেকে ফেরার পরেই আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস কি-ভাবে কাজের মধ্যে আমি নিজেকে সঁপে দিয়েছি স্বচক্ষে দেখেছে। কোনরকম পিছু টান থাকলে কোন মানুষ নিজেকে এমন কলের মানুষ করে ফেলতে পারে না।...তারপর দেশে ফিরে তারই এই বাড়িতে আমাদের আলাদা ঘরের শয্যা তো দেখেছেই।

আগেও অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে কি হয়েছে, দেশে ফিরেও জানতে চেয়েছে। আমি বলিনি। বলেছি, এ নিয়ে আপনার মাথা না-ঘামানোই ভালো।

তার রাগ হয়েছে। কিন্তু তার সেই মেজাজের দিন আর নেই তাও বুঝেছে।

বছর তিনেক আগে মারভিন একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অবস্থা সঙ্কটের দিকে গড়িয়েছিল। হাসপাতালের কেবিনে এক সন্ধ্যায় আমার দু'হাত ধরে বলেছিল, হ্যাঁ রে, কি হয়েছে তোদের আমাকে বলবিই না?

সেই দুর্বল মুহূর্তে বলেছিলাম। এতটুকু গোপন না করে সবই বলেছিলাম। শুনে মারভিন জেনট্রি স্তব্ধ খানিক। তারপর ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, তুই বাধা দিতে গেলি কেন?

—বাধা না দিলে ও মরতই বলে। ওর চোখে-মুখে সেদিন আমি মৃত্যু দেখেছিলাম।

খানিক চুপ করে থাকার পর আগের সেই মূর্তি। সরোষে বলে উঠেছিল, আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করছি।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। বলেছিলাম, এ নিয়ে আপনি ওকে একটি কথা বললে পরদিন থেকে আর আমাকে এখানে দেখবেন না।

রেগে গেছল। বলেছিল, তুই জাহান্নমে যা! কিন্তু আমি ছাড়া এতবড় শক্তিমান মানুষটাও যে কত অসহায় জানতুম। সেদিন থেকে একটু ভয়ই করত মনে মনে আমাকে। বলেনি। কিন্তু এরপর মেয়ের প্রতি তার ব্যবহার অনেক সময় অকারণে রূঢ়, লক্ষ্য করেছি। আর প্রতিষ্ঠানের আমিই যে সব, আর কেউ কিছু না—মেয়ের সামনে এ-ঘোষণাও তাকে অনেকসময় বাতাসে ছুঁড়তে দেখেছি।

তার মৃত্যুর পর আমাদের বিচ্ছেদটা পাকাপোক্ত হবে ধরে নিয়েছিলাম। কারণ, ভরা যৌবনে সারার সঙ্গীর অভাববোধটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আমি চিরদিনের মতোই বাতিল, সে-জায়গা পূরণ করতে অনেকেই সাগ্রহে এগিয়ে আসতে পারে, দুই একজনকে যে সারা পছন্দও করে একটু-আধটু—সে-খবর বোমার আমাকে জানিয়েছে। এই এক বিচিত্র মানুষ আমার জীবনে। সারার ধারণা, এই লোকটা ওর মায়ের এক ব্যর্থপ্রণয়ী। এই ধারণার রসদ কে ওকে জুগিয়েছে বলতে পারব না—বোমার নিজে হওয়াও বিচিত্র নয়। সেই কারণেই ওর ওপর সারার অন্ধ বিশ্বাস আর অগাধ টান। সেই বোমার আমাকে খবর জোগাবে এ ওর কল্পনার অগম্য।

কিন্তু মৃত্যুর পরেও বিচ্ছেদে বাদ সেধে গেল মারভিন জেনট্রি। তার উইলে দেখা গেল প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা আমি টনি কার্টার—সারা কার্টার কেউ নয়। কেবল আমার অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানের অর্ধেক মালিক সারা কার্টার, বাকি অর্ধেকের মালিক হবে প্রতিষ্ঠান যারা সচল রাখবে অথবা বড় করে তুলবে

সেই প্রধান কর্মীরা। তাদেরও নামের তালিকা আমি টনি কার্টার ঠিক করে দেব। আমাদের দু'জনেরই অবর্তমানে অথবা কোনো বংশধরের অবর্তমানে বাকি অর্ধেক অংশেরও অর্থাৎ সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরই মালিকানা ওই কর্মীদের ওপরেই বর্তাবে।

বাপের উইলের মর্ম জানার পর সারার দু'চোখ আবার কিছুকাল নিঃশব্দে জ্বলতে দেখেছি আমি। সেই ঘৃণ্য আর সেই বিদ্বেষ উপছে উঠতে দেখেছি। এই উইল করার পিছনে আমার সক্রিয় কারসাজি কিছু ছিল না এ ওর পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। ঠিক যেমন করে ওকে গ্রাস করেছিলাম তেমনি করেই বাপের সম্পত্তি গ্রাস করেছি বলে ওর ধারণা।

ঝোঁকের মাথায় সেদিনই আমি ওকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। প্রথমে ঠাট্টা করেছিলাম, ক্রীতদাস সব দখল করে বসল এ বড় তাজ্জব ব্যাপার, না?

সারা তপ্ত জবাব দিয়েছিল, এ-রকম তাজ্জব ব্যাপার ঘটতে পারে সেটা বাবা যেদিন আমাকে বলি দিয়েছিল সেদিনই বোঝা গেছে।

বলি দিয়েছিল অর্থাৎ আমার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিল। আমি হেসেছিলাম। হাসতে পেরেছিলাম। বলেছিলাম, বড় আফসোসের কথা!...তা এই ক্রীতদাস আবার তার মনিব-কন্যাকে ফিরে কিছু দান করতে পারে। নেবে?

চাউনিটা আরো উগ্র আরো তপ্ত হয়ে উঠেছিল সারার। জবাব দেয়নি।

আমি বলে বসেছিলাম, তোমার বাবার উইলের শর্ত অনুযায়ী আমার অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানের অর্ধেক মালিক তুমি, বাকি অর্ধেকের মালিক প্রতিষ্ঠানের লোকেরা।...তুমি চাইলে আমি এক্ষুনি অবর্তমান হতে পারি। বল তো ব্যবস্থা করি।

এক ধরনের গোঁ যে আমার আছে এই ক'বছরে সেটা অন্তত ভালোভাবে টের পেয়েছে। বাপের সদ্য-বিয়োগের পর আমি ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান চলতে পারে ভাবেনি। বাপ বেঁচে থাকতেই শেষের ক'টা বছর সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমি বহন করেছি। তাই মুখের ওপর কথাগুলো ছুঁড়ে দিতে একটু বোধহয় ঘাবড়ে ছিল। বলেছিল, থাক, তোমার দাক্ষিণ্য কেউ চায়নি।

আমি জানি, পরে—অনেক পরে কাঁটা দূর করার এমন একটা সুযোগ হেলায় হারানোর জন্য অনুশোচনায় ও নিজের হাত কামড়েছে। অনেক পরে— প্রতিষ্ঠানের যখন জমজমাট অবস্থা। আর, যখন এই প্রতিষ্ঠানের অনন্য তারকা রডনি ওর চোখে একমাত্র পুরুষোত্তম।

রডনি ওয়েনস্টন। আমার তুলনায় সুপুরুষ যে বটে, অস্বীকার করি না।

সারা তখন অনেক সময় কথার ছুঁচে বিঁধে আমার মুখ দিয়ে প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যাবার মতো ওই গোছের গোঁ-ধরা কথা বার করে নিতে চেষ্টা করেছে কিন্তু আমার তখন কানে তুলো, পিঠে কুলো।

আজকের এই তেত্রিশের সারা কার্টারের ফর্সা মুখ রডনির নাম শুনলেই রাগে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। আর আগুন-পানা মেয়ে গার্টির নাম শুনলেও। তবু গার্টির প্রতি কৃতজ্ঞ। বলে, ও আমার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল, তোমার জন্যেই হল না। কিন্তু রডনির কথা উঠলেই ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, বলে, ও আমার শনি, আমার সব খেয়েছে।

আমার মনেরকথা জানলে আজকের এই সারা ক্ষেপেই উঠবে। আজ অন্তত আমার জীবনে ওদের আবির্ভাব আশীর্বাদ বলে মানি। সম্ভব হলে ওদের আমি আমার সর্বস্ব (এক মাত্র সারাকে ছাড়া) দিয়ে দিতে পারি।

আজকের কথা থাক।

রডনিকে এই প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসার কৃতিত্ব আমারই। এই রাজ্যে তার তখন নাম-ডাক খুব। বাঘ-সিংহর খেলা তখন আমিই দেখাই। নামও আছে। কিন্তু ওরা কুকুর-বেড়ালের মতো পোষমানা জীব আমার। ওরা আমাকে ভালোবাসে আমি ওদের ভালবাসি। খেলার মধ্যে সেটাই বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিংস্রতম প্রাণীকেও সহজে পোষ মানানোর বিদ্যেটা আমার শ্বশুরের কাছে শেখা।

কিন্তু চুপি চুপি দেখে এসেছি, রডনির খেলা চমকপ্রদ। হিংস্র প্রাণীগুলোকে ও ক্ষেপিয়ে নাচিয়ে কুঁদিয়ে অস্থির করে ছাড়ে, প্রতিমুহূর্তে রোমাঞ্চ ছড়ায়, তারপর সদর্পে ইচ্ছেমতো ওদের ওঠায়, বসায়, হুটোপুটি করায়। এর থেকেও বিচিত্র আমার মতে ওর তিরিশ গজ মোটর-জাম্পের খেলা। লাফাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ও যখন মোটরে গিয়ে বসে—মাঝের দীর্ঘ ফারাকটা দেখে মনে হয় জীবন আর মৃত্যু একাসনে গিয়ে বসল। এখন কে জেতে কে হারে।

লোকটার মেয়ে-সংক্রান্ত দুর্নাম শোনা ছিল কিছু। চেহারায় আর শৌর্যে-বীর্যে রমণী-বল্লভই বটে। ও বলে দুর্নামের খোরাক জুগিয়েছে ওর মহিলা-স্তাবকরাই। আমি অবিশ্বাস করিনি। লোকটা বেপরোয়া বলেই সমাদরের পাত্র। শুনলাম যেখানে ছিল, সেখানকার মালিকের এক মাননীয় অতিথিকে নিয়েই খটাখটি। শোনামাত্র আমি ওর কাছে ছুটে গেছি এবং টোপ ফেলেছি।

পয়সার দিক থেকে আমাদেরও কম নামী প্রতিষ্ঠান নয়। তার ওপর গুজবও রটেছিল যে কর্মচারীরাই অচিরে এর অর্ধাংশের মালিক হবে। এই উদার পরিকল্পনাও আমারই। কর্মচারীরা মিছিমিছি আমার 'অবর্তমানে'র আশায় দিন গুণবে কেন—সংগঠন জোরদার হলে আমার 'বর্তমানে'ই তাদের অর্ধাংশের মালিকানা দিতে আপত্তি নেই। আমার অবর্তমানে সারা বাকি অর্ধাংশ পাক। কিন্তু কবে পর্যন্ত এই পরিকল্পনা রূপ নিতে পারে, স্থির করিনি। ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে অ্যাটনির সঙ্গে আলাপ-আলোচনাই চলছিল শুধু।

দু'পাত্র দামী মদ পেটে পড়তে রডনি ওয়েনস্টনের মেজাজ প্রসন্ন হয়ে উঠল। আমি আরো মদের ঢালা অর্ডার দিয়ে কর্মীদের ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির দিকটাই ওর চোখে লোভনীয় করে তুলতে চাইলাম। তাছাড়া, সদ্য বর্তমানে সে যা পায় তার থেকেও আমরা বেশি ছাড়া কম তো দেবই না।

মদে চুর হয়ে রডনি ওয়েনস্টন টোপ গিলল। রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ওখানে আবার স্পর্শকাতর রূপসী মহিলা নেই তো কেউ?

আমি পাল্টা রসিকতা করেছি, আমি কেমন কালো ভূত দেখতেই পাচ্ছ, কিন্তু আমার বউটাকে মোটামুটি রূপসী বলতে পারো। তোমাকে দেখে উল্টে সে না স্পর্শলোভাতুর হয়ে ওঠে আমার সেই ভয়।

হ্যাঁ, খাল কেটে আমিই কুমীর এনেছি।

এক কথায় রডনি ওয়েনস্টন এসেছে এবং স্বভাবগত দাপটে সরাসরি সকলকে বশীভূত করেছে। আমার তাতে আপত্তি নেই। ও আসার এক বছর বাদে আমি আগের আর পরের হিসেব মিলিয়েছি—লাভের অঙ্ক ঢের মোটা। ও নিজেও তা অনুমান করতে পারে। একদিন হেসে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কর্মচারীদের প্ল্যান কি হল?

আমি বলেছি, হবে—সবুর, সবে তো এক বছর এসেছে। আর বাড়তি লাভের একটা মোটা অংশও তো তুমি একাই গিলছ।

ওর বাড়তি দাম দিতেও আমি কার্পণ্য করিনি। এ-জিনিস আমার কর্তার কাছে শেখা।

রডনি ওয়েনস্টন চালাক মানুষ। এক বছরের মধ্যে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা ভালোই বুঝে নিয়েছে। বোমারের সঙ্গেও তার খাতির খুব, কিছু আভাস তার কাছেও পেয়ে থাকবে। ক্রমে সারার প্রতি ওর একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর ওপর আমি বিরূপ হয়নি। বরং এক-ধরনের আক্রোশ চেপে সারার দিকে নজর রেখেছি।

আমার প্রতি বিদ্বেষবশতই হয়তো কোনো কর্মচারীর প্রতি সারা কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের পক্ষপাতী ছিল না। মনে মনে আমার সঙ্গে তাদের খুব তফাত ভাবত না। রডনির সঙ্গে আচরণেও সকলের মনিব-কন্যাসুলভ মর্যাদার ফারাক রেখে চলতে চেষ্টা করত। কিন্তু রডনির বেপরোয়া ব্যবহারে আর ঠাসাঠোসা কথাবার্তায় সে মর্যাদাবোধ অনেক সময় ঘা পড়ত। ক্রমে আমার মনে হতে লাগল সারার চোখেও লোকটার পুরুষকারই বড় হয়ে উঠছে। তার প্রতি ওর দৃষ্টি একটু যেন উৎসুক।

একবার আমরা দিন পনেরোর একটা ছোট ট্যুরে বেরিয়েছিলাম—মনের খেলার তখনই প্রথম সূচনা।

সে-রাতের বাঘ-সিংহের খেলায় রডনি একটা নতুন চমক দেখিয়েছে। সিংহের গলায় দড়ি বেঁধে তার পিঠে চেপে বসেছে—আর সেই দড়ি মুখে করে বাঘে টেনেছে। দেখে দর্শকদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেছল. এ-রকম অনেক কিছু ওর মাথায় আসে। সব শেষে মোটর-জাম্পের মারাত্মক খেলা তো আছেই।

খেলা-শেষে একটু রাত অবধি আমি নিজের ক্যাম্পে বসে হিসেব দেখছিলাম। ওদের তখন খানা-পিনা হৈ হুল্লোড় চলছিল। ঘটনাটা আমি পরদিন শুনলাম বোমারের মুখ থেকে।

...ওই খানা-পিনার সময় সারা অন্তরঙ্গ খুশি মুখে রডনিকে অভিনন্দন জানাতে গেছল। রডনি তখন বেশ কয়েকপাত্র গলায় ঢেলেছিল। অতএব হঠাৎ তার এত আনন্দ হল যে দুহাতে আচমকা সারাকে বুকে টেনে এনে জাপটে ধরে চুমুর পরে চুমু। পাঁচজনে মিলে টানাটানি করেও সারাকে ছাড়িয়ে আনতে পারে না—এমন চুমুর ঘটা। ছাড়া পেয়েই সারা তার গালে ঠাস করে এক চড়।

হেসে হেসে বোমার মাতালের কাণ্ড বিস্তার করেছে। শেষে একটা চোখ পিট পিট করে বলেছে, কিন্তু দোস্ত, আমার কেমন মনে হচ্ছে ও-রকম কাণ্ড করার মতো মাতাল রডনি কাল রাতে হয়নি।

শুনে আমার মাথায় কি খুন চেপেছিল? একটুও না। আমি বরং এতদিনে খুশি হবার মতো এটা হিংস্র খোরাক পেয়েছিলাম।

পরে ঈষৎ সঙ্কোচে সারা জিজ্ঞাসা করেছে, কাল রাতে রডনির কাণ্ড শুনেছো?

অনেকের চাক্ষুষ দেখা ব্যাপারটা আমারও অজানা থাকবে না, তাই বুদ্ধিমতীর মতো ও নিজেই এসে বলেছে।

—কি করল আবার, কাল তো ভালো খেলা দেখিয়েছে।

—আর বোলো না, ওটা একটা অসভ্য জানোয়ার—ওটাকে তাড়াও।

অপ্রতিভ মুখ করে জানাল কি করেছে মদের ঝোঁকে, কিন্তু বোমারের মতো করে বলল না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খুব বেশি মদ গিলেছিল?

—বেশি মানে! মদে চুর হয়েছিল একেবারে, নইলে এরকম করে!

আমি হেসে বললাম, দৃশ্যটা কেবল আমি বেচারা দেখতে পেলাম না।...আজ মাথা ঠাণ্ডা হলেই এসে মাপ চাইবে তোমার কাছে।

...সেই সূচনা খুব সংগোপনে পল্লবিত হয়েছে। সারার সব থেকে বড় অসুবিধে এই যে নিজেকে ও এক বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়ে রেখেছে। আমাকে বাতিল করার ফলে সেই মর্যাদা ওর আরো বেড়েছে ধরে নিয়েছে। অতএব ওর বিবেচনায় গোপনতা একান্তই প্রয়োজন।

বোমার মাঝে-সাঝে আমাকে দুই একটা রসের খবর দেয়। সারার সে একান্ত বিশ্বাসের পাত্র। অতএব রডনিও তার সম্পর্কে খুব বেশি সাবধান নয়। সেদিন বোমার তার পল্‌কা মেজাজের ভঙ্গিতে বলল, ভাব-গতিক সুবিধের লাগছে না বন্ধু, একটু যেন লেন-দেনের চেষ্টা চলছে।

—কি-রকম?

শুনলাম কি-রকম। সারা তখন রডনির ক্যাম্পে বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল। বোমারও কাছেই ছিল। বিকেলের খেলা দেখাবার আগে রডনি অল্প-স্বল্প মদ খায়—তাই খাচ্ছিল। আর সে জন্যে সারা তাকে ধমকাচ্ছিল। (আমার নিজের মদের মাত্রা বাড়ছে সারা জানে, কিন্তু কোনদিন তা নিয়ে একটা ভ্রূকুটিও করেনি।) রডনি হঠাৎ বলে বসল, এখানকার কাজ ছেড়ে পালাতে হবে, সেদিন ওই কাণ্ড করে বসার পর মদ মুখে দিলেই আবার আমার ওইরকম করতে ইচ্ছে করে।

বোমার উপস্থিত, তাই সারা সচকিত। ভুরু কুঁচকে ধমকেছে, তোমার জিভ আমি টেনে ছিঁড়ব—

রডনি জিজ্ঞেস করেছে, হাত দিয়ে না দাঁত দিয়ে?

নিরুপায় সারা তখন বোমারের দিকে ফিরে বলেছে, ও খেলা দেখাবে কি, এরই মধ্যে কেমন নেশা চড়িয়েছে, দেখলে?

এরপর থেকে বোমারকে আমি আমার ক্যাম্পে আসতে নিষেধ করেছি। সকলে জানুক আমি একটু একটু করে বিরূপ হয়ে উঠছি ওর ওপর। বিশেষ করে, সারা জানুক আর রডনি জানুক। তাতে আমার সুবিধে হবে, বোমার ওদের আরো বেশি বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠবে।

আমার মতলব বোমার তক্ষুনি বুঝে নিয়েছে। একটা চোখ পিট পিট করে হতাশার সুরে বলেছে, কর্তার আমলেও এই করেছি, আবার তার জামাইয়ের আমলে এই নসিব!

আগামী দিনের চিত্রটা আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করেছি? কল্পনা করতে পেরেছি। তেমনি হিংস্র আনন্দে মনে মনে আমি তাকে স্বাগত জানিয়েছি, কিন্তু সেখানে কি আমার ভূমিকা আমি জানি না।

রডনির মগজে কিছু নেই এ তার শত্রুও বলবে না। সারা সহজলভ্য হতে পারে না। এটুকু বুদ্ধি তার আছে। আরো মাস কয়েকের অন্তরঙ্গ খুঁটিনাটির পর মাথা খাটিয়ে সে হঠাৎ একদিন এমন চমকপ্রদ হতাশার কথা বলল যে, শুনে আমিও তারিফ না করে পারলাম না।

এর দিনকতক আগে থেকে মেয়েদের সম্পর্কে ওর মুখে অনেক অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের কথা শোনা যেতে লাগল। মেয়েরা ভীরু, কোন চমকপ্রদ কিছুতে তাদের টানতে গেলে আগে থাকতেই ভয়ে তাদের প্রাণ খাঁচা-ছাড়া, ইত্যাদি। আমি ওকে উসকে দিই, কেন, আমাদের ইউনিটের মেয়েরাই তো কত কঠিন-কঠিন খেলা দেখাচ্ছে।

—দূর—দূর—দূর! তার মধ্যে চমক আছে? ওরিজিন্যালিটি কিছু আছে? সব অভ্যাসের গোলামি। শেষে মনের ক্ষেদ ব্যক্তই করে ফেলল একদিন, বলল, এই দেখো না, এতদিনেও আমি মনের মতো পার্টনার পেলাম না একজন যে সাহস করে তার প্রাণটি আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারে—অথচ দিনের পর দিন নিজের চোখে দেখছে, আমি বেঁচেই আছি, মরে যাচ্ছি না।

সারা উৎসুক চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। তীর যে রডনি ওর উদ্দেশেই ছুঁড়ছে তাও বুঝতে পারছে হয়তো। আমি বুঝে নিতে চাইলাম, পুরুষ পার্টনার খুঁজছ, না মেয়ে পার্টনার?

মুখবিকৃত করে রডনি ঝাঁঝিয়ে উঠল, এসব আইটেমে দুটো পুরুষ কখনো পার্টনার হয়?

—কোন সব আইটেমে?

—আমার মোটর-জাম্পের আইটেমে। সেই একই জিনিস করছি, অথচ পাশে একটি মেয়ে বসে থাকলে ওই একই জিনিসের কি মার-মার কাট-কাট ব্যাপার হবে ভাব একবার। সাহস করে সে-মেয়ে শুধু স্ট্র্যাপ বেঁধে পাশে বসে থাকবে আর শুধু বিশ্বাস করবে আমি যখন মরছি না তখন তারও মরার কোনো কারণ নেই।...মোটর-জাম্পের খেলায় মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে নেমেছে এ কখনো শুনেছ? এই সামান্য ব্যাপারটা কেউ ভেবেছে কখনো? অথচ এই সামান্য তফাতে তোমার টাকার বাণ্ডিলটা কতগুণ মোটা হতে পারে ভাব একবার।

মিথ্যে বলেনি। ও বলার সঙ্গে সঙ্গে এই রোমাঞ্চ আমি কল্পনা করতে পারি। সারার দিকে তাকালাম। আগ্রহে আর চাপা উত্তেজনায় ওরও দু'চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। বলে উঠল, এই পার্টনার তুমি পাচ্ছ না?

জবাবের বদলে রডনি গলা দিয়ে ফু করে তাচ্ছিল্যের শব্দ বার করল একটা। হালকা করে সব থেকে বড় ইন্ধন এবারে আমিই জোগালাম। সারার দিকে ফিরে বললাম, মেয়েদের এ-রকম দুর্নাম দিচ্ছে রডনি, তুমিই চেষ্টা করে দেখো না—ভয়ের কি আছে, ও তো নিজের প্রাণের মায়াতেই বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবে। মাঝখান থেকে ইউনিটের নাম ফাটবে।

উত্তেজনা চেপে সারাও তেমনি হালকা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল, পারি না ভাবছ?

রডনি টিপ্পনী কাটল, একেবারে জল-ভাত ব্যাপার, তবে মহড়া দিতে গেলেই হার্টফেল করার ভয় আছে।

সারা তাড়া দিয়ে উঠল, মেয়েদের হার্ট সম্বন্ধে তোমার কত জ্ঞান!

উত্তেজনা ভালো মতো মাথায় ঢুকেছে সারার। এরপর মাঝে মাঝেই এ-খেলার সম্ভবনা সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ দেখা গেল। অস্বাভাবিক নয়, শুয়ে বসে দিন কাটানোর বদলে এ-রকম একটা রোমাঞ্চকর খোরাক পেলে কার না লোভ হয়? বলা বাহুল্য, আমি উৎসাহ জুগিয়েছি।

এরপর মহড়া শুরু হল ওদের। রডনি বোঝালো খুব আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ধাতে সইয়ে নিতে হবে। প্রথমে স্থাণুর মতো বসে থাকতে শিখতে হবে, তারপর স্পিড-নর্সিয়া কাটাতে হবে, তারপর

ছোট থেকে খুব ধীরে ধীরে বড় লাফে অভ্যস্ত হতে হবে। এমন অভ্যস্ত হওয় দরকার যেন মাঝের অতবড় ফারাকটাও আর চোখেই না পড়ে।

খুব স্বাভাবিক কথা। কিন্তু এই ট্রেনিং শেষ হতে যে দু'বছর কেটে যেতে পারে আমার ধারণা ছিল না। বিশেষ করে সঙ্গিনীর কাজ যখন শুধু পাশে বসে থাকা। কিন্তু রডনি চতুর মানুষ, সে জানে খেলা একবার শুরু হয়ে গেলে তখন আর মহড়ার সুযোগ থাকবে না। রমণী-চিত্তজয়ের মহড়াটি তার মধ্যে শেষ করে নিতে হবে। সে-পর্ব জমাট বাঁধছে টের পাই। সবার চোখে পুরুষোত্তমই হয়ে উঠছে রডনি। সে যে-পথে হাঁটে, সেদিকে ওকে মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকতে দেখি. মাঝে মাঝে ওদের মানাভিমান আর তারপরের অন্তরঙ্গ আপোসের সংবাদও কানে আসে।

বোমার এক বিচিত্র মানুষই বটে। অদ্ভুত অনায়াসে সে তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এমন নিখুঁতভাবে যে মাঝে মাঝে সন্দেহ হত ওদের দলে ভিড়ে ও আমাকেই ঠকাচ্ছে কি না, আসলে আমার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করছে কি না। সকলে জানে আমি ওর ওপর খড়্গহস্ত এখন। ওর কোনো কাজ ভালো দেখি না, সামান্য ফাঁক পেলে ক্ষেপে যাই।

সারার কাছে ক'দিন ওকে বিদায় দেবার প্রস্তাবও করেছি। বলেছি, ওর ভাঁড়ামি আর ভালো লাগে না, এদিকে কুঁড়ের বাদশা হয়ে উঠছে দিনকে দিন—ওকে দিয়ে আর চলবে না।

—সেকি! সারা আকাশ থেকে পড়েছে। ওকে দেখলেই তো লোকে হেসে সারা—তুমি ভিতরে থাকো টের পাও না।

—তাহলেও ওকে আমার ভালো লাগে না।

সারা ফুঁসে উঠেছে, বাবার অমন আদরের লোকটাকে মিছিমিছি তাড়াতে চাও তুমি—কেমন? রাগের মুখে সেদিন বলেই বসেছিল, কেন ওর ওপর তোমার অত রাগ আমি বুঝি না ভেবেছ? ওর কাছে ছোট হয়েছ তবু লজ্জা করে না তোমার এ-কথা বলতে?

আমার এত রাগের কারণ সারা জানে বই কি। সারা জানে, বোমারকে আমি ওদের দু'জনের ওপর চোখ রাখতে বলেছিলাম—ওর আর রডনির ওপর—আর বোমার আমার মুখের ওপর এই নোংরা কাজ করতে অস্বীকার করেছে। এ-কথা বোমারই ওদের বলেছে। তাই বোমারকে ওরা ওদের চক্রের অতি বিশ্বস্ত একজন বলেই জানে।

সেই রোমাঞ্চকর দিন এলো।

তখন আমরা পূর্ব-জার্মানীতে। কাগজের বিজ্ঞাপনে পোস্টারে সিনেমা স্লাইডে সেই অভিনব আইটেমের উদ্বোধন ঘোষণা করা হল। মনে যা-ই থাক, আমি ব্যবসা বুঝি। দর্শকচিত্তে রোমাঞ্চ যোগানার ব্যাপারে কার্পণ্য করি না।

প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল। সাফল্যের আনন্দে জীবন সার্থক সারা কার্টারের।

দামী সুইট ভাড়া করা সত্ত্বেও বেশির ভাগ দিনই আমি ক্যাম্পে থাকি। খেলার পর হিসেবপত্র দেখি। তারপর দেদার মদ খেয়ে আর নাড়া-চড়ার ক্ষমতা থাকে না। শ্বশুর তার এই স্বভাবটারও গোটাগুটি উত্তরাধিকারী করে গেছেন আমাকে।

সেই রাতে রডনি ওয়েনস্টন তার বহু প্রত্যাশিত পুরস্কার লাভ করেছে। এর আগের খবর জানি না। কারণ বোমার জানে না। বোমারের কেমন সন্দেহ হতে একটু বেশি রাতে সারার সুইটে গিয়ে হাজির। সারার আগ্রহেই সে ওর কাছাকাছি থাকে।...ঘর বাইবে থেকে বন্ধ। অর্থাৎ ভিতরে কেউ নেই। চারটে ব্লক ছাড়িয়ে তারপর রডনির সুইটে গেছে। তার ঘর ভিতরে থেকে বন্ধ।

ব্যবস্থামতো সকলের অগোচরে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়েও চট করে কিছু বলতে পারেনি। রাগে মুখ গোঁজ করে ছিল। আমার বিরক্তি দেখে শেষে ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, আমি ভেবেছিলাম এতটা রশি ছেড়েছ যখন কিছু একটা মতলব আছে তোমার, সময়ে রশি টেনে নেবে—কিন্তু এদিকে শেষ খেলা খতম—এখন কি করবে?

কি করব আমি জানি না। সেই থেকে নিজের হাতে চকচকে একটা ধারালো ছোরা দেখছি আমি। আর এক রমণীর নরম নগ্ন বক্ষ দেখছি। আর তারপর ফিনকি দিয়ে তাজা লাল রক্ত ছুটতে দেখেছি। সেই উষ্ণ রক্ত যেন আমার চোখে-মুখে এসে লাগছে।

বোমারের কাছে গোপন কিছু নেই, এই প্রণয়াভিসার আরো কিছুদিন চলার পরে সারা সেটা বুঝেছে। না, মায়ের প্রেমিকের কাছে সে অস্বীকার করেনি। বলেছে, রডনি তার কাছে দুনিয়ার একমাত্র পুরুষ, রডনি তার ধ্যান-জ্ঞান—রডনিকে ছাড়া ও বাঁচবে না—আমার মতো মানুষের ঘৃণ্য সংস্রব থেকে কি করে সে অব্যাহতি পেতে পারে সেই পরামর্শ আর সেই সাহায্য চেয়েছে।

তিনজনে মিলে অনেক দিন অনেক পরামর্শ করেছে তারপর। কূল-কিনারা মেলেনি। বোমারের ধারণা, ওদের দু'জনের সায় পেলে রডনি আমাকে এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবারও মতলব ভাঁজতে পারে। সারার সঙ্গে এরপর তুচ্ছ কারণে খিটির মিটির বাধতে লাগল আমার। আমার কোনো কাজ কোনো ব্যবস্থাই ওর পছন্দ হয় না। তর্ক বাড়লে ও গালাগালও করে ওঠে। শিক্ষা-দীক্ষার খোঁচা দেয়, কি ছিলাম আর ওর বাবার দয়ায় কি হয়েছি সে-কথা বলে। প্রতিষ্ঠান-কর্মীদের নামে অর্ধেক মালিকানা লেখাপড়া করে দিচ্ছি না কেন, এ নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া বাধে।

পরের একটা বছর ও আমাকে মদে ডুবে থাকতে দেখেছে। শরীরও মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আমার স্পষ্ট মনে হয়েছে ওরা তাতে খুশি ছাড়া দুঃখিত নয়। আমার মাথায় নানান রকম মতলব ঘোরে। নিজের হাতে সেই চকচকে ছোরা, রমণীর সেই অনাবৃত নরম বুক, আর সেই তাজা রক্ত আরো বেশি ছাড়া কম দেখি না। অথচ ভিতর থেকে কে যেন কেবল বলে, সবুর সবুর—তাড়া কিসের? আরো দেখো, আরো মজা লুটতে দেখো।

এই মজা দেখতে দেখতেই আরো দুটো বছর কাটল। কি খেয়াল হতে খুব মনোযোগ দিয়ে এবার কর্মীদের অর্ধেক মালিকানার খসড়া তৈরি করলাম। বলা বাহুল্য, সেই তালিকার সর্বপ্রধান নাম রডনি ওয়েনস্টন।

সারা বলল, আমিও এখন বিশিষ্ট কর্মীই একজন, আমার নাম বসাও।

বসালাম।

বোমারের নাম কোথায়?

বকাঝকির পর তার নামও বসানো হল—বাদ বলতে গেলে প্রায় কেউই থাকল না।

শেষে আমি বললাম, সব ঠিক হয়ে থাকল, কিন্তু সই এখন হবে না।

—কেন? কেন হবে না?

—পরে হবে।

—কত পরে?

—দেখি...

—ও? সারা ঝলসে উঠল।—তোমার লোভ আমি জানি না? ভাঁওতা দিয়ে দিয়ে কেবল সময় কাটাচ্ছ—তোমাকে আমার চিনতে বাকি?

আমার মাথায় রক্ত উঠছে। হাত দুটো নিশপিশ করছে। এতদিনে ওদের প্রণয়-কাণ্ড সকলেই আঁচ করতে পারে। মুখে কেউ কিছু বলে না। সশ্লেষে জবাব দিলাম, না, আমাকে চিনতে বাকি নেই, কিন্তু নিজেকে চিনেছ তো? রাস্তার কুকুরের প্রেম দেখার মতো যে মজা লুটছে সবাই।

—কি? কি বললে তুমি? হিংসেয় কালো মুখ কালি হয়ে যাচ্ছে—কেমন? রডনির পায়ের নখের যোগ্য তুমি?

মাথার মধ্যে কি হয়ে গেল জানি না। দুই কাঁধের ওপর দুটো থাবা বসাতেই ও ছিটকে উঠে দাঁড়াতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুকে জাপটে ধরে ওকে শূন্যে তুলে ফেললাম আমি। দাঁতে করে ওর মুখ চেপে ধরে সোড়া নিজের ঘরে নিয়ে এসে নরম শরীরটাকে শয্যার ওপর আছড়ে ফেললাম। চোখের পলকে দরজা বন্ধ করে ড্রয়ার থেকে রিভলভার বার করে সামনে ধরলাম।—টুঁ-শব্দ বেরিয়েছে কি সব খেলা আজ খতম করে দেব!

হাতের নির্মম ক্রূর টানে ওর বাইরের জামা ছেড়ে অন্তর্বাস সুদ্ধ ছিঁড়ে দু'ফাঁক হয়ে গেল। আর্ত বোবা ত্রাসে ও আবার সেই পুরনো ঘাতককে দেখল।

হিংস্র নিষ্পেষণে ও ডুকরে উঠল, ঈশ্বরের নাম নিয়ে তুমি কি শপথ করেছিলে?

—ঈশ্বরের নাম? ওই নাম মুখে আনতে তোমার লজ্জা করে না? শপথের কোন দাম তুমি দিয়েছ? এতটুকু সম্মান দিয়েছ?

সারা বলে উঠল, ঈশ্বরের নামে শপথ তুমি করেছিলে, আমি নয়। দাম তুমি দেবে, সম্মান তুমি দেবে—আমি নয়।

সেই নিদারুণ আক্রোশের মধ্যে কি-রকম ধাক্কা খেতে লাগলাম আমি। ওই বিপরীত অনুভূতিটাকে সরোষে ভিতর থেকে উপড়ে ফেলে দিতে চাইলাম। কিন্তু পারা গেল না। গেলই না।

...হ্যাঁ, শপথ আমি করেছিলাম। ঈশ্বরের নামে শপথ। ও নয়। ভিতরে কে যেন বার বার এই কথাই বলতে লাগল।

ছেড়ে দিলাম ওকে। ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালাম।

দুই চোখে এক ঝলক ঘৃণা উপছে ভয়ার্ত শশকের মতোই ও চলে গেল।

নয়

নাটকের শেষে চরিত্র গার্টি। গার্টি আলভা।

এই জীবন-নাট্যে সব থেকে নাটকীয় চরিত্রই বটে।

আগুনপানা মেয়ে।

আগুনের মতো রং, আগুনের মতো রূপ, আগুন-ঠিকরনো চোখ। ওর জিভের ডগায় আগুন, আমার মনে হয় ওর বুকের তলায়ও অনির্বাণ আগুন।

আগুনের খেলা দেখায়। জ্বলন্ত মশাল নিয়ে লোফালুফি করে, দাঁতে কামড়ে ধরে, গনগনে জ্বলন্ত আগুনের চাকতির মধ্য দিয়ে হেসে খেলে নেচে বেড়ায়। ওই মেয়েকে দেখে আর ওর খেলা দেখে দর্শক স্তব্ধ হয়ে থাকে।

দীর্ঘকাল, বলতে গেলে ছেলেবেলা থেকেই সাউথ আফ্রিকায় ছিল। আগুনের খেলা সেখানেই শিখেছে। তারপর যোগ্য হাতে পড়ে সে-শিক্ষার চমক বেড়েছে। সাউথ আফ্রিকা থেকে যে-লোকের সঙ্গে পালিয়েছিল, সে আবার একদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে সরে গেছে। টানা দেড় বছর এক মানসিক হাসপাতালে ছিল গার্টি আলভা। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে আবার কাজের সন্ধানে বেরিয়েছে এবং প্রথমেই এইখানে এসেছে।

প্রথম সাক্ষাতে ও নিজেই আমাকে এ-সব কথা বলেছে। নির্দ্বিধায়, নিঃসঙ্কোচে।

গার্টির তীক্ষ্ণ রূপের মধ্যে এমন কিছু আছে যা শঙ্কা জাগায়, আবার টানেও। ও যখন হাসে, ওর ঝকঝকে দাঁতগুলো দিয়েও যেন সাদা আগুন ঠিকরোয়।

নিরিবিলিতে আর্টিস্ট যাচাইয়ের ব্যবস্থা আছে। আমি একলাই খেলা দেখলাম ওর। দেখে সত্যিই তাজ্জব আমি। দর্শক-চোখে এরও কদর কেমন হতে পারে আমি তক্ষুনি অনুমান করে নিয়েছি।

এক সপ্তাহ বাদে আসতে বললাম ওকে। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। যা শুনলাম ভয়ের ব্যাপার বটে। সত্যিই কালো মানুষের সঙ্গে পালিয়েছিল ও জীবনের মায়া ছেড়ে। কিন্তু সেই লোকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ওর মাথায় খুন চেপে যায়। তারপর থেকে কালো মানুষ দেখলেই ও তাকে হত্যা করতে চায়। ক'টা লোক যে ওর হাতে মরতে মরতে বেঁচেছে ঠিক নেই। তার মধ্যে এশিয়া আর ভারতের লোকও আছে।

এখন সে সুস্থই বটে।

কেন যেন বেশ আগ্রহ সহকারেই ওকে আমি নিয়ে নিলাম। ভাবতে চেষ্টা করলাম, ওর খেলার চমকের দরুনই আমার আগ্রহ। তবু ঠিক যেন তা নয়। সমস্ত সপ্তাহ ধরেই গার্টি আলভার প্রতীক্ষায় আমি উন্মুখ হয়ে ছিলাম।

আসা মাত্র মোটা মাইনের চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নিলাম। ও খুশিতে আটখানা। ঝুঁকে আমার একটা হাত ধরে বলে উঠল, আমাকে তোমার খুব পছন্দ হয়েছে—না?

বললাম, তোমার খেলা ভালো লেগেছে। দর্শকদেরও যাতে ভালো লাগে সেদিকে নজর রেখো।

—ফুঃ! তারা আমাকে দেখেই পাগল হয়, খেলা দেখলে তো কথাই নেই। এত লোক পিছনে লাগবে যে শেষে আমার জন্য বডি-গার্ড রাখতে হবে তোমাকে দেখো। সব জায়গায়ই তাই হয়েছে। আরো একটু সামনে ঝুঁকল, ফিসফিস করে বলল, তোমাকেও প্রথম দেখেই আমার খুব ভালো লেগেছে—বুঝলে? কাজ আমি যেখানে যাব সেখানেই পাব, কিন্তু তোমাকে ভালো লেগেছে বলে সাতটা দিন আমি অপেক্ষা করেছি। হেসে উঠল, সুন্দর দাঁতগুলো ঝকমকিয়ে উঠল, আমাদের দেশে কালো-সাদার গণ্ডগোল জান তো—কিন্তু আমি যে কালো মানুষের সঙ্গেই পালিয়েছিলাম।

হাসপাতাল থেকে যা-ই বলুক, পাগলের পাল্লায় পড়লাম কিনা আমার সেই সংশয়।

গার্টির আবির্ভাব প্রতিষ্ঠানের লোকের কাছেও চমকের মতোই বটে। তাকে আমি বিনা প্রচারে আসরে নামিয়েছি। গার্টি একটুও অতিশয়োক্তি করেনি। প্রথম দিনেই ওর কেরামতি দেখে আসর মাত। আগুন-বরণ পোশাকে আগুনের খেলায় অনেকেরই চোখে বুক ঝলসে দিয়েছে গার্টি আলভা।

সারা সাদাসিধে ভাবেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ওকে আবার কোত্থেকে জোটালে?

আমি উৎফুল্ল।—কেন, ভালো লাগেনি?

—ভালোই তো...।

কিন্তু ওর প্রশংসায় উত্তাপ ছিল না। প্রতিষ্ঠানে এতদিন ওর থেকে সুন্দরী কেউ ছিল না। কিন্তু গার্টি আলভার রূপ একেবারে আলাদা জিনিস। পুরুষ মানুষের ভিতর-বার ধাঁধিয়ে দেয়। তাছাড়া সারাকে যত কচিই দেখাক, গার্টির তুলনায় বয়েস হয়েছে।

ছ-মাসের মধ্যে গার্টি আলভা নিজের জোরে আর দাপটে প্রতিষ্ঠানের প্রথম সারির একজন হয়ে দাঁড়াল। খাতির ওর সব থেকে বেশি আমার সঙ্গেই, সারা তাও লক্ষ্য করেছে কারণ গার্টির অন্তরঙ্গ আচরণে রাখা-ঢাকা কিছু নেই। কিন্তু সারার তাতে আপত্তি কিছু নেই, ওর আসল উদ্বেগের হেতু আমি জানি। রডনি যে-প্রকৃতির মানুষ তাতে ওই গোছের বেপরোয়া আগুন-পানা মেয়ের দিকে ওর ছোটা স্বাভাবিক। রডনির দুর্বলতা আমি টের পাচ্ছি, সারাও নিশ্চয় পাচ্ছে।

ভিতরে ভিতরে আমার উৎকট আনন্দ। ক্রুদ্ধ মুখে গার্টি সেদিন আমাকে এসে বলল, রডনিটা একটা বাঁদর, আজ আমাকে ধরে চুমু থেকে চেষ্টা করেছিল। আমি খিমচে পালিয়ে এসেছি।

আমি বললাম, বাঁদরে কখনো চুমু খায়—ও ভালো মানুষ, এখানকার সব থেকে বড় স্টার।

দুদিন বাদে সারা গজগজ করে আমাকে বলল, এই পাগলী রূপসীকে ঢুকিয়ে তুমি ভালো করোনি—মিনিয়াল গুলোকে পর্যন্ত লোভ দেখিয়ে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমি জবাব দিয়েছি, গার্টি আমাদের অ্যাসেট।

এর কিছুদিন বাদেই কর্মীদের মালিকানার তালিকায় গার্টি আলভার নাম বসিয়েছি। দেখে সারা গম্ভীর। রডনি মনে মনে খুশি। গার্টি আনন্দে আটখানা। ওর আনন্দের সেই জের সামলাতে আমি নাজেহাল।

আরো বছরখানেক গার্টিকে আমি রডনির কাছ থেকে আগলে রেখেছি। বাঘের মুখের সামনে খাবার রেখে তাকে খেতে না দেবার সঙ্কল্প আমার। বাসনায় জ্বলে জ্বলে ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক।

তাই উঠেছিল। তার পরেই গার্টির সম্পর্কে আমি উদাসীন।

ক'দিন না যেতেই তার ফল পেলাম। হঠাৎ রাত দুপুরে আমার ক্যাম্পে ঢুকে গার্টি শয্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরল আমার। বলে উঠল, তুমি ভালো, রডনিটা বজ্জাত, ওকে আমি লাথি মেরে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম।

আমি ওকে শয্যা থেকে তুলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও আমার গলা আঁকড়ে ধরল। শেষে ক্রুদ্ধ হ্যাঁচকা টানে সরালাম ওকে। বললাম, বেশি বাড়াবাড়ি করলে শাস্তি পাবে।

ও হাসতে লাগল।—কি শাস্তি?

—আমার একটা চাবুক আছে, এসব বেহায়াপানা শুরু করলে বিপদ হবে। আমি বিবাহিত মনে রেখো।

গার্টি ঝলসে উঠল।—ও! কি বিবাহিত আমার! তোমার বউ যে ওদিকে দিন-রাত রডনির সঙ্গে ঢলাঢলি করছে?

জবাবে ওকে আমি ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলাম।

হ্যাঁ, সেই থেকে ওর চোখে খুন ঝলসাতে দেখছি আমি। এক কালো মানুষের জন্য ও ক্ষিপ্ত হয়েছিল...আবারও তাই হল বুঝি।

প্রাচ্যভূমির সঙ্গে আমার ভাগ্যের যোগ।

দীর্ঘকাল বাদে সম্পূর্ণ ইউনিট নিয়ে আবার আমরা এদিকে এসেছি।...

নাটকের শেষ অঙ্ক দেখব বলে কি আমি প্রস্তুত ছিলাম? একটা চরম কিছু ঘটতে পারে সে-রকম আশঙ্কা মনের তলায় দানা বেঁধে উঠছিল বটে। দেহের সব ক'টা ইন্দ্রিয় আমি সর্বক্ষণ সজাগ রেখেছিলাম বটে। তবু ঈশ্বরের রাজ্যে যা ঘটে, মানুষ তার কতটুকু কল্পনা করতে পারে?

গার্টি আলভাকে অপমান করে তাড়াবার পর থেকে টানা দু'বছর ধরে আমি প্রত্যাশিত মানসিক বিপর্যয় লক্ষ্য করেছি। যেটুকু চোখের অগোচরে ছিল তাও যথাসম্ভব পূরণ করেছে ফ্র্যাংকি বোমার।

হতাশায় প্রায় শেষ ধাপে নেমে এসেছে আমার স্ত্রী সারা কার্টার। একটা অদৃশ্য শূন্য পাথরে যেন মাথা খুঁড়ে চলেছে।

তার সব থেকে বড় শত্রু এখন আমি নই। শত্রু গার্টি আলভা। আর গার্টির সব থেকে বড় শত্রু আমি। সুযোগ পেলেই ও আমাকে হত্যা করবে, টুকরো টুকরো করে কাটবে। ওর সম্পর্কে বোমার আমাকে বার বার সাবধান করেছে। তবু ছলে কৌশলে তাড়ানো দূরের কথা, ওকে আমি প্রথম সারির তারকাদের মধ্যেই রেখেছি।

কারণ, আমি যা চেয়েছিলাম সেই রকমই ঘটেছে। ঘটছে। আরো কত কি ঘটতে পারে আমি জানি না।

আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে গার্টি আলভা প্রথম থাবা বসিয়েছে রডনির বুকে। পতঙ্গের মতো বাসনার আগুনে ওকে টেনে এনে পাগল করেছে। বিনিময়ে তার একমাত্র শর্ত, আমাকে নিঃশেষ করতে হবে, আমাকে ধ্বংস করতে হবে। কর্মীদের মালিকানার অংশ সত্যিই আমি লিখে দেব এ-বিশ্বাস তারা আর করে না। কিন্তু কাগজপত্র সব রেডি আছে, আমাকে সরিয়ে দিতে পারলে মারভিন জেনট্রির উইলের বলেই সে-মালিকানা অনায়াসেই তাদের হস্তগত হবে।

সারার পায়ের তলা থেকে মাটি সরতে লেগেছে। প্রেমের ব্যাপারে সে সিরিয়াস মেয়ে। তার সমস্ত সত্তা বিকিয়ে আছে রডনির কাছে। রডনি ভিন্ন তার দুনিয়া অন্ধকার, বর্ণশূন্য। গোড়ায় গোড়ায় রডনি যতটা সম্ভব তার দ্বিতীয় প্রেমিকাকে আড়ালে রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু গার্টি আলভা তো আগুনের ফুলকি, তাকে আড়ালে রাখা যাবে কেমন করে?

তবু গোড়ায় ভরাডুবির এতটা বোঝেনি সারা। রডনির চাতুরী আর মোহ অনেকখানি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাকে। ক্রমশ সন্দেহ হয়েছে, ক্রমশ বুঝেছে। তাকে বুঝতে সাহায্য করেছে বোমার।

রাগে ক্ষোভে অপমানে যাতনায় ক্রমে দিশেহারা অবস্থা সারার। ওর কাছে রডনি ওয়েনস্টন একটা জীবন্ত জগত। নিজেকে এ-ভাবে বিকিয়ে দেবার পর সে-জগতে আর কোন রমণীর স্থান হতে পারে, ও কল্পনা করতে পারে না। রডনি তাকে বহুদিন আশ্বাস দিয়েছে, ওই মেয়েটা পাগল একটা, ওকে নিয়ে তুমি মাথা খারাপ করছ।

কিন্তু আমি আর বোমার জানি, পাগল সম্প্রতি রডনি নিজেই। কামনার আগুনে ফেলে গার্টি ওকে পাগল করে রাখতে পেরেছে।

সারার চোখেই বা কত কাল আর ধুলো দিয়ে কাটাবে?

সারার পাশে আমি নেই, কারণ আমাকে সে কখনো চায়নি। তখনও চায় না। কিন্তু হতাশায় দু'চোখ স্থির তার, যখন মনে হল বোমারও তার কাছে থেকে সরে যাচ্ছে। ওরা তিনজনে মিলে যেন খুব সংগোপন চক্র গড়ে তুলছে একটা—গার্টি, রডনি, আর বোমার। বোমার ছলনার আশ্রয় নিয়ে চলেছে সেটা বুঝতে পারছে সারা। ফাঁক পেলেই তিনজনে শলা-পরামর্শ আঁটে, ওকে দেখলেই থেমে যায়।

বোমারের আচরণে শুধু সারা কেন, আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম, আর ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। লোভ কখন কোন মানুষের কি সর্বনাশ করে বসে ঠিক কি! ফাঁকা পেয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কি হে, খুব ভাব দেখি যে আজকাল ওদের সঙ্গে?

চোখ পিট পিট করে ও জবাব দিল, কি করি বল, এই আধবয়সী উপোসী শরীরটার ওপর ওই আগুনের মতো মেয়ে এসে যদি হামলা করে, না মজে যাই কোথায়? একদিন রাতদুপুরে এসে গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিল—কি না, ওর কেউ নেই, ওর গার্জেন হতে হবে, আমার মতো ভালো লোক আর নাকি ও দেখেনি। আমি বললাম হব, যদি না আমার ওপর আবার হামলা কর—এই বয়সে এতটা সহ্য হয় না। ও হেসে সারা—এখন কোন কথা না শুনতে চাইলে হামলার ভয় দেখায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই হামলার খবর রডনি জানে?

—পাগল! মেয়েটার মাথায় খুন চেপে আছে বটে, কিন্তু তেমনি ছুরির ফলার মতো বুদ্ধি।...তোমার ওপর ক্ষেপে গিয়ে ও প্রথমে রডনিকে সরিয়েছে সারার কাছ থেকে, তারপর আমাকে। এখন থেকেই ওরা সমস্ত কোম্পানীটার মালিক হয়ে বসেছে এই ভাব—অবশ্য আমিও ওদের একজন।

সফরে রওনা হবার ঠিক আগে আগে বোমার ছোট একটা চিঠি আমাকে দেখাল। তার মধ্যে যে কোন্ বীজ লুকিয়েছিল আমি কল্পনাও করিনি। সারা তখনো প্রেম-জ্বরে বেহুঁশ। প্রেম খোয়ানোর জ্বরে বললেই ঠিক হবে। এই সন্তাপ ছাড়া তার মাথায় দুনিয়ার আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। এখনো সে রডনিকে ফেরানোর চিন্তায় দিশেহারা।

সারা রডনিকে চিঠি লিখেছে একটা। একবার আত্মঘাতিনী হতে গিয়ে ফল পেয়েছিল। বিভ্রান্ত অবচেতন মনে সেটাই ওকে এই চিঠি লেখার ইন্ধন জুগিয়েছিল কিনা জানি না।

'—রডনি, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। একটা শস্তা মেয়ের মোহে পড়ে তুমি প্রেমের অপমান করেছ। তুমি আমার জগৎ শূন্য করে দিয়েছ। কিন্তু আমি কোন্ স্তরের মেয়ে তুমি জান না। প্রেমের অপমানে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি ফিরবে। তোমাকে ফিরতে হবে। আমি সেই অপেক্ষায় আছি। তোমাকে ক্ষমা করার অপেক্ষায় আছি। কিন্তু না যদি ফেরো, আমি কি-যে করতে পারি তুমি ভাবতেও পার না।...দুনিয়ায় এখন তোমার সব থেকে আদরের জীব কিং. তোমার চোখ খোলার জন্য সেই হিংস্র পশু আমার এই দেহ খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়বে তাই তুমি দেখতে চাও? আমাকে চেনো না, এই শেষ বারের মতো তোমাকে সাবধান করে দিলাম।'

বোমার বলল, এই চিঠি নিয়ে ওরা দু'জনে খুব হাসাহাসি করছে। রডনি আর গার্টি। আমি বোমারকে বলেছি, চিঠি যেখান থেকে চুরি করেছ সেখানে রেখে এস, কেউ যেন টের না পায়।

কিং আমার হালের আমদানী। দলের সঙ্গে রেখে খেলা দেখানোর মতো পোষ মানেনি এখনো। সিংহটা যেমন তেজী তেমনি একরোখা। ওর স্বভাবের জন্য ওকে সঙ্গিনী পর্যন্ত দেওয়া হয়নি এখনো। মেরে বসার সম্ভাবনা। কর্তার কাছ থেকে শেখা বিদ্যের ফলে একমাত্র আমার কাছে ঠাণ্ডা মেরে থাকে। আর, একা আলাদা এনে ওকে নিয়ে খেলা দেখায় রডনি। সেটাকে ঠিক খেলা বলা চলে না—বেপরোয়া মানুষের সঙ্গে বেপরোয়া হিংস্র জানোয়ারের সে-এক বিচিত্র যোঝাযুঝি বলা যেতে পারে। দর্শক দম বন্ধ করে বসে থাকে।

কিংকে নিয়ে আবার রডনির সঙ্গে আমার রেষারেষি। আমি ওর নিঃসঙ্গ খাঁচায় ঢুকলে গোঁ-গোঁ করে অল্প-অল্প আদরের শব্দ করে, আমি আদর করলে ও আমার হাঁটুতে মাথা ঘষে। কিন্তু রডনিকে দেখলেই ওর শরীরের রক্ত গরম হয়। হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলব আঁটে। আবার পারে না বলে আরো উত্তেজিত হয়। রডনিরও তাইতেই আনন্দ, তাইতেই উত্তেজনা। রডনি ঠাট্টা করে, তোমাকে ও অবলা গোছের কেউ মনে করে, আর আমাকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে।

আমি জবাব দিই, আমাকে ও বন্ধু ভাবে আর তোমাকে মনে করে অত্যাচারী প্রভু।

কিং এখনো এত একরোখা দুর্দান্ত বলেই ওর ওপর এত টান রডনির। অন্য পশুগুলোর মতো পোষ মানলে তখন আর এত টান থাকবে না।

আমরা তখন ভারত-ভূমিতে। জায়গার নাম জয়পুর। সুন্দর খটখটে জায়গা—দূরে আকাশ-ঘেঁষা পাহাড়ের দেয়াল। আমাদের ব্যবসার বিবেচনায় এই ছোট জায়গা তেমন লোভনীয় নয়।

থেকে থেকে কেবলই আমি একটা ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখছি। অল্পেতে চমকে চমকে উঠি। আমারই অসুস্থ মস্তিষ্কের কল্পনা কিনা জানি না। মদ আমাকে পেয়ে বসেছে।

সারার মুখে সর্বদা থমথমে গম্ভীর। পরাজিত জীবনের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আছে যেন। আর, রডনি আর গার্টি বেশ হাসি-খুশি। ওরা না চাইলেও ওদের ফুর্তি যেন ভিতর থেকে উপছে উঠছে।

ক্যাম্প আছে, কিন্তু শরীরের জন্য আমি হোটেলেই থাকি বেশির ভাগ। পাশের ঘরটা সারার। তার সঙ্গে চোখাচোখি হয় বটে, কিন্তু দিনান্তে একটি কথাও হয় না।

সেদিন কোনো প্রোগ্রাম ছিল না। দুপুরের দিকে ভালো লাগছিল না বলে আমি এমনিতেই ক্যাম্পের দিকে এসেছিলাম। এদিক থেকে কর্তার স্বভাব পুরোমাত্রায় রপ্ত করেছি। পশুগুলোকে একবার না দেখলে, ওদের গায়ে পিঠে একবার হাত না বুলোলে ভালো লাগে না।

কিং-এর খাঁচার কাছে এসে আমি অবাক একটু। দুরন্ত পশুটা আমাকে দেখেই হুঙ্কার দিয়ে সামনে এগিয়ে এলো। তারপর অস্থির রাগে গরগর করতে থাকল। ঠিক এ-রকমটা কখনোই করে না। সঙ্গিনীশূন্য একলা খাঁচায় থাকার দরুন এই বিরক্তি কিনা বুঝলাম না।

চারদিক তাকিয়ে বোমার এসে চুপি চুপি বলে গেল, এটাকে আজ সমস্ত দিন খেতে দেওয়া হয়নি, রডনি নিষেধ করেছে, বলেছে ওর অসুখ। আমার কি-রকম যেন সন্দেহ হচ্ছে, ঠিক বুঝছি না—।

ওকে সরিয়ে দিয়ে যে খেতে দেয় তাকে ডাকলাম। জানোয়ারের গায়ের গন্ধের দরুন এ-সব খাঁচা থেকে স্বভাবতই ক্যাম্প বেশ খানিকটা দূরে। লোকটা আসতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিংকে খেতে দেওয়া হয়নি কেন?

সে-ও জানাল, ওর অসুখ, রডনি নিষেধ করেছে।

—কি অসুখ?

ও মাথা নাড়াল। কি অসুখ জানে না।

চলে গেলাম। মাথায় কিছু আসছে না। অথচ ভিতরে ভয়ানক অস্বস্তি কিসের। আতঙ্কের মতো কিছু যেন। আমার সেই অনুভূতিটা ইদানীং আমাকে যেন পরিত্যাগ করেছে। বিকেলের মধ্যেই মদ নিয়ে বসলাম।

একটু বাদে বোমার এসে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, কিছু বুঝছ?

আমি মাথা নাড়লাম। কিছু না।

বোমার বলল, আমিও না। ওদিকে রডনি আর গার্টির খুব ফুর্তি দেখছি। সেই দুপুরেই গাড়ি হাঁকিয়ে কোথায় বেরিয়েছে। আবার এখানে এসে দেখি সারারও খোস মেজাজ। এতদিনে যেন তার সব অশান্তি সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়েছে।

কিছুই বোধগম্য হল না।

হ্যাঁ, তারপর থেকে লক্ষ্য আমিও করলাম। সারা ভিতরে চঞ্চল, অথচ চোখে-মুখে আনন্দের ছটা ঝকঝক করছে। আমি মদ গিলে টং হয়ে আছি ভেবে আমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি নেই।

মাথায় যন্ত্রণা। ভিতরে যেন একটা পাথর নড়ছে। কিছুই ভালো লাগছে না। আমারই কোথায় যেন একটা বিষক্রিয়া চলেছে!

ফিরলাম সন্ধ্যার পর। রাস্তায় বোমারের সঙ্গে দেখা। বোমার জানালো, সারা সেজেগুজে একটু আগেই বেরিয়ে গেছে। ওকে আদর করে বলে গেছে, ফিরতে অনেক রাত হবে, তোমাকে যেন আরো একটা বোতল মদে ঠেসে রাখি। ও চলে গেল। আরো খানিকটা ঘোরাঘুরি করে ফিরবে।

আমার ঘর খোলাই থাকে। ভিতরে এসে বসতে টেবিলের ওপর মুখ-বন্ধ খাম দেখলাম একটা। ওপরে নাম নেই। কে আবার এসেছিল এর মধ্যে! খামের ভিতর হাতে-লেখা কাগজ একটা। অপরিচিত হাতের কয়েকটা আঁচড়।

পরক্ষণে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে বসলাম। চোখের সামনে ঘর-বাড়ি সব দুলে উঠল। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলসাতে লাগল।

চিঠিতে সময় লেখা ছিল রাত এগারোটা। কিন্তু রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে কে যেন আমাকে ঠেলে তুলে দিল। নিজেকে আমি বিশ্বাস করি না। স্নায়ুতে স্নায়ুতে অনেকবার আগুন জ্বলে উঠেছে। অনেকবার মনে হয়েছে, ঈশ্বর আছে, ঈশ্বরের বজ্র এমনি করেই মাথায় নেমে আসুক।

কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় তা নয়।

বেরিয়ে এলাম। ক্যাম্পের অনেকটা দূরে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে বিদায় দিলাম। আমার হাতে জোরালো টর্চ, পকেটে রিভলভার।

শহরে প্রান্তে নিরিবিলি মাঠের মধ্যে ক্যাম্প। এরই মধ্যে চারদিক অন্ধকার। যে-লোকটা খেতে দেয় জানোয়ারগুলোকে আর তার পর্যায়ের যে দুই একজন কর্মচারী আছে—তারা এরই মধ্যে মদ খেয়ে বেহুঁশ।

অন্ধকার ফুঁড়ে বোমার বেরিয়ে এলো। তার এখনো দিশেহারা বিস্ময়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিংকে খেতে দিয়েছ কিছু?

ও বলল, অল্প-স্বল্প।

—ঠিক আছে। যা বলেছি তাই কর, মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকো না।

বিস্ময়ে হাঁ হয়েই বোমার আবার অন্ধকারে মিশে গেল।

* * *

একটা ঘণ্টা দেড়টা ঘণ্টা এমন দুঃসহ দীর্ঘও হয়? প্রতিটি মিনিট অনড় পাথরের মতো এমন বুকের ওপর চেপে বসে থাকে?

...এগারোটা বেজে চার মিনিট। একটা কালো গাড়ি নিঃশব্দে কিংএর খাঁচা ঘেঁষে দাঁড়াল। রডনি নেমে এলো। চাবি দিয়ে খাঁচার তালা খুলল। কিং গোঁ-গোঁ করে উঠল, কিন্তু বেশি শব্দ করার উপায় নেই তার। ল্যাচটা না তুলে রডনি আবার গাড়িতে ফিরে গেল। পিছনে সীটে থেকে টেনে একটা ভারী কিছু পাঁজাকোলা করে নামাল। দেহে অসুরের শক্তি তার। অনায়াসে সেই ভারী জিনিসটা তেমনি পাঁজাকোলে করে খাঁচার গায়ে এসে দাঁড়াল।

কিং! অস্ফুট একটা স্ফুলিঙ্গ বেরুলো যেন রডনি ওয়েনস্টনের গলা দিয়ে।

জবাবে কিং আরো জোরে গরগর করে সাড়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ল্যাচ উঠে গেল। খাঁচা ফাঁক করে সেই ভারী জিনিসটা, যে-জিনিসটা তার বুকের সঙ্গে আটকে থেকেও উথাল-পাথাল করতে চেষ্টা করছিল, তাকে ধুপ করে খাঁচার ভিতরে ফেলে দিয়ে চোখের নিমেষে ল্যাচ টেনে দিল।

কিং প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠল এবারে।

সেই মুহূর্তে, ঠিক সেই মুহূর্তে খাঁচার ভিতর থেকে আমার বিশাল টর্চটা ঝলসে উঠল রডনির মুখের ওপর।

আমি, টনি কার্টার, খাঁচার মধ্যে বসে। আমার এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে রিভালভার। কিংকে আমি আমার দুই হাঁটুর নীচে চেপে শুইয়ে রেখে বসে আছি।

খাঁচার মধ্যে আমার সামনে মাটিতে পড়ে আছে আমার স্ত্রী সারা কার্টার। ভয়ে গাঢ় নীল-বর্ণ মুখ। অতি ত্রাসে দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। জ্ঞান আছে সম্পূর্ণ, কিন্তু একটু শব্দ করার উপায় নেই। তার মুখে একরাশ কাপড় গুঁজে তারপর একেবারে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়েছে। পা থেকে হাঁটুর অনেকটা ওপর পর্যন্ত শক্ত করে বাঁধা, আর হাত দুটো পিছমোড়া করে এমন বেঁধেছে যে একটু বোঝারও উপায় নেই। রডনি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে। টর্চের আলোয় দু'চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। ভিতরটাও। তার মাথায় কিছু ঢুকছে না। কিন্তু টর্চ ঝলসে ওঠা মাত্র খাঁচার পিছন থেকে বোমার ছুটে এসেছে, সঙ্গে দু'জন লোক রাখতে বলেছিলাম—তারাও।

আমার ঘরে আমারই শয্যায় সারা শুয়ে আছে। জ্ঞান নেই। আশ্চর্য, খাঁচার মধ্যে যখন তাকে ফেলা হয়েছিল তখনো জ্ঞান ছিল, সিংহটাকে দুই হাঁটুর নীচে চেপে টর্চ আর রিভরবার হাতে আমাকে ঠিকরে-পড়া চোখে দেখেছিল যখন, তখনো জ্ঞান ছিল। তার পরেই জ্ঞান হারিয়েছে।

ডাক্তার দেখে গেছে। অজ্ঞান অবস্থায় ভুল বকছিল। অব্যক্ত ত্রাসে দুই একবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পালাতে চেষ্টা করেছে। এখন ইনজেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

রডনিকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। ওকে ছাড়িয়ে আনার কোন রাস্তা আছে কিনা জানি না।

...বোমার একজনকে খুঁজতে বেরিয়েছে। আমি বলেছি যেখান থেকে পারো, তাকে ধরে আনো। খুনী মেয়ে, পাগল মেয়ে গার্টি আলভাকে। কিন্তু এত রাত হয়ে গেল বোমার ফিরছে না কেন? ওকে পেল না?

...সন্ধ্যার আগে সেই চিঠি ও-ই রেখে গেছল। অথবা কাউকে দিয়ে পাঠিয়েছে। ওর মেজাজের মতোই চিঠির ভাষা। পকেট থেকে চিঠিটা বার করে পড়লাম আবার।

লিখেছে, '—টনি কার্টার, তুমি জাহান্নমে যাও। কালো মানুষ আমার শত্রু। তোমার বউকে সাবাড় করার পরেই তোমাকে আমার খুন করার কথা। তখন আর অর্ধেক কেন, গোটা প্রতিষ্ঠানটাই তো আমাদের। কিন্তু যতবার মনে হয় ষোল বছর ধরে গাধার মতো তুমি নিজের বউয়ের তপস্যায় বসে আছ—ততো বারই তোমাকে সত্যিকারের কালো মানুষ ভাবতে অসুবিধে হয়েছে আমার।...পুরস্কারের লোভ আছে? রাত ঠিক এগারোটায় তোমাদের পশুরাজ কিংএর আজ মহাভোজ। ইচ্ছে থাকলে তার আগে এসো। দুনিয়ার সেরা কালো মানুষ দেখতে পাবে। তুমি আর সারা কার্টার দু'জনেই জাহান্নমে যাও। খবরদার, এই চিঠির কথা যেন আর দ্বিতীয় কেউ না জানে।—গার্টি আলভা।'

চিঠিটা আবার পড়তে পড়তে দু'চোখে কেমন ঝাপসা দেখছিলাম।...বোমার কি গার্টিকে পেলই না?

কিংকে উপোস করিয়ে রাখা হয়েছে শোনার সঙ্গে সঙ্গে সহজ ষড়যন্ত্রটা আমি বুঝতে পারিনি কেন?...রডনিকে ফেরানোর সেই এক চিঠিতে নিজের মৃত্যুবাণ তো সারা তার হাতে সঁপেই দিয়েছিল। তাকে লিখেছিল, তার সব থেকে আদরের জীব কিং ওর দেহ খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়বে এ ও দেখতে চায় কি না। এই ভয় দেখিয়ে শেষবারের মতো সারা ওকে সাবধান করেছিল। অতএব আর বাধা কোথায়, কিং ওর দেহ সত্যিই খণ্ড খণ্ড করার পর বাঁধনের চিহ্নগুলো আর মুখের কাপড় সরিয়ে এনে চাবিটা শুধু ভিতরে রেখে এলেই কাজ শেষ। পরদিন ভালোমানুষের মতো সারা সেই চিঠিখানা বার করলেই সকলে ধরে নিত সারা যা লিখেছে তাই করেছে—রডনির আদরের জীব কিংএর কাছে আত্মাহুতি দিয়েছে। ...আর তারপর এক সময় আমাকে সরাতে পারলেই ষোল আনার মালিক।

...ঈশ্বর! তুমি কার মধ্যে কি-ভাবে কাজ করো?

...বোমার এখনো ফিরছে না কেন? চোখে আগুন মুখে আগুন বুকে আগুন সেই কালো-মানুষ খুনী মেয়েটা গেল কোথায়?

ক'দিন ধরে সারার অস্বাভাবিক চাউনি, অস্বাভাবিক মুখ। কথা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে মুখের দিকে ঘোরালো চোখে চেয়ে থাকে। আমার ষষ্ঠ চেতনা এখন আবার কাজ করছে। এই চোখ আমি চিনি। আমি দেখেছি। ওর চোখে-মুখে হত্যা নাচছে—আত্মহত্যা। বিয়ের পরে সেই এক পাহাড়ে যেমন দেখেছিলাম।

সেদিন আমারই কোনো ভুলে রিভলভারটার সন্ধান পেয়ে থাকবে। ওর চোখের দিকে চেয়েই সেদিন আমার সব থেকে বেশি খটকা লেগেছিল। একটু চোখের আড়াল হতেই মনে হয়েছে কিছু অঘটন ঘটতে পারে। তক্ষুনি চুপি চুপি ফিরে এসে দেখি আমার রিভালভারটা ওর হাতে। পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছি—শক্ত হাতে ওর হাতটা তুলে ধরেছি। ওটা ছাড়িয়ে নেবার জন্য সারা পাগলের মতো ধস্তাধস্তি করেছে—আর, তখন পাগলের মতোই অন্য হাতে আমি ওকে প্রচণ্ড আঘাত করে বসেছি।

ও তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছে। তারপর চিৎকার করে উঠেছে, কেন এর পরেও তুমি আমাকে দয়া করবে? কেন তুমি আমাকে মরতে না দিয়ে আরো বেশি শাস্তি দেবে? কেন কেন কেন?

রিভালভারটা তালাবন্ধ করে ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম। মাটি থেকে জোর করে ওকে বুকে করে তুলে এনে বিছানায় বসালাম। বললাম, সারা, আজ আবার আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। তাঁর শাস্তি মাথা পেতে নাও, নিজে কিছু করতে চেও না।

ও বিকৃত মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে উঠল, না না! ঈশ্বর এই শাস্তি চায়, তুমি চাও না—তুমি আমাকে এর থেকেও কঠিন শাস্তি দিতে চাও! কিন্তু কেন, কেন এর পরেও তুমি আমাকে নেবে? আমি কি, তুমি জান না? আমি ব্যভিচারিণী তুমি জান না?

আমি বললাম, সারা তুমি কি ছিলে আমি কেয়ার করি না। কি হতে পার এখন এই ষোল বছর বাদে আমার চোখে শুধু সেই স্বপ্ন। তুমি প্রেমে বিশ্বাস কর, আমিও করি। আমি জানতুম না যে শুধু এই বিশ্বাসেই আমি ষোল বছর অপেক্ষা করেছি। এখন জেনেছি। এর পরেও কি এ-ভাবে নিজেকে শেষ করে তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে চাও?

ও দু'হাতে মুখ ঢেকে শক্ত হয়ে বসে রইল।

—সারা! জবাব দাও। আমি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি সেই ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমাকে যদি কথা না দাও, ষোল বছর পরেও যদি আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে না দাও, তাহলে কাল সকালের মধ্যে তুমি দেখবে ওই রিভলভার দিয়ে তোমার আগে আমি নিজের খেলা শেষ করেছি।

সারা চমকে উঠে দাঁড়াল। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। এক নাড়ী-ছেঁড়া বিভীষিকা থেকে ছিনিয়ে আনার মতো করে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল আমাকে। তারপর বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কান্নার সমুদ্র।

...রাত্রি অনেক। আমাকে আঁকড়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে ও ঘুমোচ্ছে এখন। পাছে ওর ঘুম ভাঙে সেই ভয়ে আমি নড়তে পারছি না। দেখছি ওকে। দেখছি আর আমার চোখের কোণ দু'টো সিরসির করছে কেমন।

দেখছি, আর ভাবতে ভালো লাগছে, ষোল বছরে এই প্রথম শান্তির ঘুমে বিভোর আমার বউ সারা কার্টার।

আনন্দরূপ

উৎসর্গ

বাবিনকে যারা ভালবাসে

খণ্ডকালের একটা চলমান ছোট পিঞ্জর থেকে হঠাৎ যেন একটা বৃহৎ মুক্তির মধ্যে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

ত্রিবান্দম থেকে আমাদের ছোট স্টেশন-ওয়াগন ছেড়েছিল বেলা একটায়। ছোটার তাড়া কিছু ছিল না। তাছাড়া সঙ্গে অসুস্থ ছেলে। ড্রাইভারকে আস্তে চালাবার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের নিজস্ব হেপাজতের স্টেশন-ওয়াগন, অন্য যাত্রীর বিরক্তি বা ভ্রূকুটির প্রশ্ন নেই।

একদিকে কখনো কাছে কখনো দূরে অনিঃশেষ পশ্চিমঘাট গিরিমালা। আর একদিকে তেমনি অনিঃশেষ ঘন নারকেল-বীথি। মাঝখানের পাকা রাস্তা ধরে গ্রাম-নগর ছাড়িয়ে ধীরে-সুস্থে একান্ন মাইল পথ ভেঙে এসেছি। সমাধিস্থ ওই পাহাড়ের সারি দেখে মনে হয়েছে মানুষের পদস্পর্শে আজও ওদের শুচিতা নষ্ট হয়নি। আমরা আসছিলাম আরব সাগরের ধার ঘেঁষে। কিন্তু সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল না, এক-একবার সব অবরোধ সরে গিয়ে সমুদ্র আত্মপ্রকাশ করেই আবার যেন গা-ঢাকা দিচ্ছিল। পাহাড় আর নারকেল বন দেখে দেখে ছেলের চোখ ধরে গেছিল, হঠাৎ এক-একবার সমুদ্রচোখে পড়লে ও উৎসাহিত হয়ে উঠছিল আর তারপর থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করছিল, আবার কখন সমুদ্র আসবে?

আমি তাকে আশ্বাস দিচ্ছিলাম, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে কেবল সমুদ্র—কত দেখবি চল্ না।

ওকে আশ্বাস দিচ্ছিলাম বটে, কিন্তু ওই অগোচরের বৃহৎ মুক্তির প্রতীক্ষায় আমাদেরও ভিতরে ভিতরে এক ধরনের ছটফটানি শুরু হয়েছিল। আমাদের বলতে আমার, স্ত্রীর আর মেয়ের। ছেলের সঙ্গী দুটির চেত-ভেদ নাই। যেখানে চলেছি, পৌঁছুবার আগেই আমি অন্তত সেই জায়গাটার সঙ্গে এক সুদূরকালের নাড়ির যোগ অনুভব করছিলাম। মেয়ে আর স্ত্রীও এই জায়গার সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে আর কিছু পড়াশুনাও করেছে। তাদের উন্মুখ হওয়া স্বাভাবিক।

আমাদের ইউনিটের বাইরে স্টেশন-ওয়াগনে মাত্র দুটি লোক। একজন ড্রাইভার, আর একজন তার সঙ্গী। বেলা চারটের কয়েক মিনিট আগে সামনে আঙুল দেখিয়ে সঙ্গীটি জানান দিল, আমরা এসে গেছি।

সামনে চেয়ে মনে হল শতখানেক গজ তফাতে রাস্তাটা একটা দালানের সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে।

...ভারতের মাটি ওখানেই শেষ। ভূগোলে পড়া সেই বহুকালের শব্দ চারটে হঠাৎ এক অদ্ভুত সুরে কানের মধ্যে বেজে উঠল, ল্যাণ্ডস্ এন্ড্ অফ্ ইণ্ডিয়া!

কন্যাকুমারী।

স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, দুই চোখে বিস্ময় ভরাট করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তিন সমুদ্র ছেড়ে তখন পর্যন্ত একটাও সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না কেন ভেবে পাচ্ছে না বোধহয়। মেয়েও বারকয়েক উসখুস করে আমার দিকে ফিরল। ভুলে কোথাও এসে হাজির হলাম কিনা সেই সংশয়। এই মুহূর্তে অন্তত ওদের কল্পনার সঙ্গে কিছু মিলছে না।

একটু বাদেই সংশয় গেল। দুমিনিটের মধ্যে স্টেশন-ওয়াগন সামনে ওই ঝকঝকে দালানটার সামনে এসে থামল। সত্যিই পথের শেষ এখানে। ল্যাণ্ডস্ এন্ড্ অফ্ ইণ্ডিয়া!

সামনের এই দালানটা শুনলাম গান্ধী-মণ্ডপ। মণ্ডপের মতোই গোল হয়ে ওপর দিকে উঠেছে। ওটার তিনতলার রেলিংয়ের সামনে তখন থেকেই জনাকতক লোক দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে আছে। সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয় দেখার ওটাই সব থেকে ভালো জায়গা। সূর্য-পাটে নামতে এখানে বিকেল প্রায় সাড়ে ছটা বাজে—লোকগুলো আগে-ভাগে জায়গা দখল করে আছে, আর সমুদ্রের শোভা দেখে সময় কাটাচ্ছে।

কিন্তু এখান থেকেও সমুদ্রের গুমগুম গুড়গুড় শব্দ কানে আসছে শুধু। গান্ধী-মণ্ডপের পাশ দিয়ে যতটুকু ফাঁকা জায়গায় চোখ চলে ছোট বড় নানা আকারের নুড়িপাথর ছড়ানো। সেগুলোর ওধারে

কাছে দূরে উঁচু পাড়ের ওপর ছবির মতো দু তিন ঘরের ছোট ছোট দালান—সেগুলোর পিছনে কয়েকটা বড় দালানও চোখে পড়ে। আর স্টেশন-ওয়াগন বা অন্যান্য বাস বা ট্যাক্সি যেখানে দাঁড়িয়ে, তার বাঁয়ে হলদে রংয়ের একসারি ঘর। ঘরগুলোর সামনে পাথুরে রাস্তা। ওটাই যে একেবারে সমুদ্রের গা-ঘেঁষা সরকারি সত্রম বা যাত্রীদের আবাস—প্রথম দর্শনে সেটা অনুভব করা যায় না। অবশ্য সমুদ্র অনেক নীচে। সত্রমের সারি যেখানে শেষ, সেখান থেকে পাথুরে সিঁড়ি সোজা নীচের দিকে নেমে গেছে। ওখানে গিয়ে দাঁড়াতে ওই রকম আরো অনেক পাথুরে সিঁড়ি চোখে পড়ল।

সামনে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। একটা দুটো নয়; তিন সমুদ্রের সঙ্গম। আরব সাগর, ভারত মহাসাগর, আর বঙ্গোপসাগর। সেই সঙ্গমস্থল দূরে। সামনে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কেবল পাথর আর পাথর। ছড়ানো বিছানো গায়ে গায়ে লাগানো অসংখ্য পাথর, ছোট বড় আর বিশাল পাথরের চাঁই। সমুদ্র এসে সেই পাথরের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলে যাচ্ছে। নিরাপদ জায়গার পাথর বেছে নিয়ে অনেক যাত্রী আর যাত্রিণী পা ঝুলিয়ে বসে আছে, ঢেউ ভাঙা সমুদ্র তাদের পা ভিজিয়ে শরীরে আর চোখে-মুখে জলের কণা ছিটিয়ে যাচ্ছে। আর আসছে, আবার যাচ্ছে।

কিন্তু এই শোভা দেখার সময় নেই আমার আপাতত। মিনিট তিনেকের মধ্যে আবার স্টেশন-ওয়াগনের কাছে ফিরে এলাম। ছেলের কারণে আমার সঙ্গে দুটি শক্তসমর্থ লোক থাকে সর্বদা। ছেলেকে পুশ-চেয়ারে বসিয়ে তারা মালপত্র নামিয়েছে। স্ত্রী আর মেয়ে ছেলের দুপাশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ আমাকে উধাও হতে দেখে তারা ঈষৎ অসহিষ্ণু।

আমি সরকারি সত্রমের তত্ত্বাবধায়কের সন্ধানে ছিলাম। স্টেশনওয়াগনের সামনেই তাঁর দেখা মিলল। ভদ্রলোক সাদর আপ্যায়ন জানালেন। আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন বললেন। অথচ দু মিনিট আগে আমি এঁর পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে চলে গেছি।

দক্ষিণ ভারতের দিকে পা বাড়াবার আগে কলকাতার কিছু পদস্থ লোকের মারফত খানিকটা যোগাযোগ সম্পন্ন করে এসেছিলাম। যেখানে বেরোই ছেলের কারণেই এই সুবিধেটুকু নিতে হয়। কন্যাকুমারী যদিও তামিলনাড়ু সরকারের অধীনে তবু কলকাতার সুপারিশের ফলাফল এখানেও খুব অপ্রত্যাশিত ছিল না।

দু সারির ঘর। এক সারি ভিতরের দিকে অর্থাৎ সমুদ্রের মুখোমুখি। দ্বিতীয় সারি বাইরের দিকে। নিজেরা বাছাই করে ভিতরের সারির একখানা প্রশস্ত ঘর বেছে নিলাম। যাত্রী আসা-যাওয়ার মৌসুম এখন। এলে দুখানা ঘরের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

ঘরে অ্যাটাচড্ বাথ, জানলা খুললেই সামনে সমুদ্র। একনাগাড়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না এত বাতাস। এ ছাড়াও লাইট আছে, পাখা আছে। তবু ঘরটা আমাদের কারোরই তেমন পছন্দ হয়নি। যে-রকম ছিমছাম আশা করেছিলাম সে-রকম নয়। সমুদ্রের দিকের জানলা সর্বদা খুলে রাখা যায় না। খোলা থাকলে বাতাসের ধাক্কায় দু মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়ানো যায় না, ঘরের জিনিস তছনছ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে চোখে-মুখে নোনা জল আর বালির ঝাপটা লাগে। জানলা বন্ধ করলে অন্ধকার। মশা। মাঝের একটা উঠোন ছাড়িয়ে রান্নার জায়গা। সেও ঠিক মনের মত নয়। তাছাড়া ছেলের ভারবাহী লোক দুটোকে ভিতরের দাওয়ায় শুতে হবে।

বেশিরভাগ যাত্রীই এক রাত দু রাতের জন্যে আসে, থাকার জায়গা নিয়ে খুব একটা মাথায় ঘামায় না। ভালো লাগলে আমাদের দশ-পনেরো দিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু এখানকার ব্যবস্থাপত্র আধুনিক কাল থেকেই অনেকটা পিছিয়ে আছে।

যাই হোক ঘর-দোর পরিষ্কার করে সব গোছগাছ করে নিতে বিকেল গড়িয়ে গেল। স্ত্রী আর মেয়ে ক্লান্ত, ছেলে তো বটেই। ঘরটা গুছিয়ে নেবার পরেই বেরিয়ে পড়ার মেজাজ নয় কারো। সঙ্গের লোক দুটো এবারে চায়ের ব্যবস্থায় উদ্যোগী হয়েছে।

ফাঁক পেয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। পায়ে পায়ে সেই গান্ধী মণ্ডপের দিকেই এলাম। মণ্ডপে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই। সূর্য পশ্চিম সমুদ্রে ডুবেছে। সমুদ্রের ধারে ধারেও সূর্যাস্ত দেখার ভিড় কম নয়। মণ্ডপে তো কথাই নেই। এখন বেরিয়ে আসার ঠেলাঠেলি।

মণ্ডপের দোতলায় বা তিনতলায় ওঠার ইচ্ছে আজ আর নেই। নীচেটা ফাঁকা মনে হল। পায়ে পায়ে সেদিকে এগোলাম। প্রথমেই ঝকঝকে তকতকে বিরাট হল একটা। আগাগোড়াই মার্বেলে বাঁধানো। সামনে গান্ধীর স্মৃতিস্তম্ভ। সেখানে একটা ফলকে তাঁর স্মরণীয় উক্তি পড়তে পড়তে অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। তিনি বলছেন, 'সমাহিত ধ্যানের একটি উপযুক্ত জায়গা। আমি যদি চিরকাল এখানে থেকে যেতে পারতাম। দেবী কন্যাকুমারীর মতই চারধারের এই জলরাশিও অকলুষিত। লাইক দি গডেস্ কন্যাকুমারী, দি ওয়াটার্স অ্যারাউণ্ড আর ভারজিন।' ইত্যাদি।

সামনের বারান্দায় এসে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। ওই উন্মুক্ত সমুদ্রের দিকে চেয়ে এমন সুন্দর কথা বোধকরি শুধু মহাত্মাই বলতে পারেন। সূর্য অস্তদিগন্তে বিলীন হলেও পশ্চিম দ্বিগলয়ে গলিত সোনার ছড়াছড়ি। ওখানে বসে কোন্ রসিক যেন তার বর্ণসুধার পাত্রখানা সমুদ্রে উপুড় করে ঢালছে। স্থলভূমি আর উত্তাল সমুদ্র বিহ্বল তার প্লাবনে।

ক্ষণকালের জন্য বিহ্বল আমিও।

সামনে উদ্দাম অকুলষিত, সমুদ্র, অদূরের মন্দিরে দেব-পুরুষের স্পর্শবর্জিত চিরকুমারী দেবী কন্যা। কনক-কাঞ্চনে বিভূষিত তাঁর সর্ব অঙ্গে বিবাহ-সজ্জা , কিন্তু নৈশ বিবাহ-লগ্ন উত্তীর্ণ, দেব-পুরুষের প্রত্যাশা ব্যাহত, বিঘ্নিত—পাষাণের মণিকোঠায় আবদ্ধ অক্ষতযৌবনা চিরকুমারী কন্যা।

ভাবতে গেলে দেবী-কন্যার ব্যথা বিরহ বেদনায় বাতাসটাই ভরাট হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু তা হয় না। অসুর-বিনাসের সংকল্পে চির-কুমারীত্বের শর্তে তাঁর আবির্ভাব। কন্যারূপিণী দেবী সেই শর্ত বিস্মৃত হয়েছিলেন। কন্যা অক্ষতযৌবনা না হলে তিনি সত্য-ভ্রষ্ট হতেন। দেব-চক্রান্তের ফলে তাই বিবাহ-লগ্ন নিস্ফল, উত্তীর্ণ। চিরযৌবনা কন্যা তাই চিরকুমারী। আর তাই বোধকরি এখানকার বাতাসে কৌমার্যের শুচিস্পর্শ, আর গান্ধীজীর চোখে 'ওয়াটার্স অ্যারাউণ্ড আর ভারজিন'।

নিজেকে আমি খুব একটা ভাবপ্রবণ মানুষ ভাবি না। কিন্তু কারণে অকারণে নিভৃতের আবেগের মুহূর্ত কখন যে কার মধ্যে দুর্বার হয়ে ওঠে সে-ও নিশ্চয় করে বলা কঠিন। সমুদ্রের দিক থেকে ফিরে কুমারী কন্যার মন্দিরের দিকে আমার পা দুটো কে যেন আপনি টেনে নিয়ে চলল। দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই মন্দিরের ছড়াছড়ি। সে-সব দেখেছি, চোখের প্রসাদ কখনো বা বিস্ময়ের রূপ নিয়েছে। কিন্তু মন্দিরের বিগ্রহরা কখনো এই দুই চোখে সজীব হয়ে ওঠেননি। যে আকুতি নিয়ে মানুষ ছোটে তাদের কাছে আমার তার স্বাদ জানা নেই। আমার এ-পথে বিচরণের বিশেষ একটা কারণ আছে। তার সঙ্গে পাপ-পুণ্যের কোনো যোগ নেই। দেবস্থানে ঘুরে ঘুরে আমি দেবতাই খুঁজি। সে দেবতা পাথরের নয় বা কোনো ধাতুর নয়। তার জন্যে কোনো মন্দিরে প্রবেশও প্রয়োজন না হতে পারে। সেই পাগলামীর পরের প্রসঙ্গ।

এখানে পা দিয়েই স্ত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে। আমাকে অনেকবার বলেছে, কাল ভোরে সমুদ্রে স্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে দেবী-দর্শনে যাওয়া হবে। এ ব্যাপারে আমার মতি-গতির ওপর পূর্ণ আস্থা তারও নেই, তাই বারবার শুনিয়ে রাখা। অথচ এই মুহূর্তে ঠিক কোন আকর্ষণে একা সেই নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় একটুও।

এটাই প্রধান পথ এখানকার। দুদিকে দোকান, যাত্রী-যাত্রিণীদের কেনাবেচার উৎসব লেগেছে যেন। শুধু দোকান নয়, সাত বছরের বালক থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধও তাদের বেসাতি বিক্রির আশায় রাস্তায় নেমে পড়েছে। কারো কাছে মালা, কারো কাছে কুটিরশিল্পের পণ্য। সব থেকে বেশি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ফোলডিং অর্থাৎ ভাঁজ করা মাদুরের কেনা-বেচা নিয়ে।

সেই মুখের রাস্তা মন্দিরের সিংহদুয়ারের সামনে এসে শেষ হয়েছে। বেসাতির চিত্র এখানেও অনুপস্থিত নয়। গো-পুরুম অর্থাৎ সিংহদরজা ছাড়িয়ে কিছুটা এগোলে বড় বড় চার দেয়ালের চাতাল ঘুরে অনেকটা ভিতরের এক রুদ্ধকক্ষে দেবীর আসন। গো-পুরমের দুদিকে যাত্রীর প্রতীক্ষায় ফুল-ফলের নানা আকারের ডালি সাজিয়ে বসে আছে যারা তাদের কাছে পুণ্যার্থীদের ভিড়। সন্ধ্যারতির সময় সেটা।

এককোণে জুতো খুলে পায়ে পায়ে এগোবার উপক্রম করতে বাধা পড়ল। আমার গায়ে জামা,

জামার নীচে গেঞ্জি। পুরুষের উর্ধ্বগাত্রে কোন বসন থাকবে না, মন্দিরে প্রবেশের এই বিধি। একজন লোক পথরোধ করে সেটাই জানিয়ে দিল।

বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে গেলাম। হ্যাঁ, পুরুষেরা আদুড় গায়েই দর্শনে চলেছে বটে, কিন্তু আমার সেদিকে খেয়াল ছিল না। দক্ষিণ ভারতের আরো কোনো কোনো মন্দিরে এই বিধির মুখোমুখি পড়তে হয়েছে। শোনামাত্র দর্শনের অভিলাষ শূন্যে মিলিয়েছে। বিরক্তি চেপে থেমে গেছি। স্ত্রী আর মেয়ে দর্শন সেরে এসেছে। মেয়েদের বেলায় কোথাও কোনরকম বিধি-নিষেধ নেই। পরে এই নিয়ে স্ত্রীকে দুই একটা পরিহাসের কথাও বলেছি। সে রাগে গজ গজ করেছে, বাড়িতে লুঙ্গি পরে উদম গায়ে পাঁচজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পার—এখানে সব পুরুষই এইভাবে যাচ্ছে, আসছে, আর এখানেই তোমার আপত্তি।

দেবতার কোপের ভয়ই যে তার রাগের কারণ সেটা বুঝতে দেরি হয়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে এখানে সেই বিধি আমাকে বিমুখ করল না, বিরক্তির কারণ ঘটিয়ে ফিরিয়ে দিল না। খানিক আগের যে অগোচরের আবেগ আমাকে এদিকে ঠেলে নিয়ে এসেছে সেটুকু এখনো মুছে যায়নি।

কি করা যায় ভেবে না পেয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলাম। পিছন থেকে অনুচ্চ অথচ ভারী মিষ্টি-গম্ভীর পুরুষের গলা কানে এল।—গায়ের জামা আর গেঞ্জি ওই ডালি-অলাদের কারো কাছে জিম্মা করে দিন, ওরা ঠিক রাখবে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মূর্তিটি দেখলাম, দু চোখ প্রসন্ন হবার মতোই বটে। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ কমই চোখে পড়ে। পা থেকে কোমর পর্যন্ত ধবধবে সাদা পাতলা থান জড়ানো। খালি গা, সাদা উত্তরীয় গামছার মতো কাঁধের ওপর ফেলা। গামছা কাঁধে দেবী সন্নিধানে আসা বিধিবিরুদ্ধ নয়। গলায় খুব ছোট আকারের রুদ্রাক্ষের মালা। লম্বা দোহারা চেহারা, টিকলো নাক, গভীর টানা চোখ, মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রং খুব ফর্সা নয়—মোটামুটি ফর্সা। দেখলেই সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে, কথা বলতে ইচ্ছে করে, কথা শুনতে ইচ্ছে করে—এমনি এক পুরুষের লাবণ্য যেন ওই দেহটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত আশ্রয় করে আছে।

প্রথম দর্শনে বয়েস তিরিশ-বত্রিশের বেশি মনে হল না। স্পষ্ট বাংলায় কথা বলল যখন বাঙালি নিশ্চয়। কিন্তু আমি কথা বলার অবকাশ পেলাম না। আঙুল তুলে একজন ডালি-অলাকে দেখিয়ে দিয়ে লোকটি সামনে এগিয়ে চলল। লক্ষ্য করলাম ডালি-অলা পিছন থেকেই তার উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালো।

জামা আর গেঞ্জি খুলে তার কাছে রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কে?

লোকটা জবাব দিল, বহৃত বড়া দিলকা ব্রহ্মচারী—হিঁয়াই রহ্‌তেঁ হ্যায়।

হিঁয়া বলতে মন্দিরে কি কন্যাকুমারীতে বোঝা গেল না।

দক্ষিণ ভারতে এসে কোন বাঙালি সাধুর সাক্ষাৎ এ-পর্যন্ত মেলেনি। কেবল পণ্ডীচেরীর সঙ্গে যা একটু বাঙালির যোগ দেখেছি। তার কারণ শ্রীঅরবিন্দ। এখানেও সেই যোগ কিছুটা থাকা সম্ভব। তার কারণ সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দ এবং বিবেকানন্দ শিলা।

জামা-গেঞ্জি রেখে এগিয়ে চললাম। ফুল-ফলের ডালি নিলাম না দেখে ডালি-অলা ক্ষুণ্ণ। গজ তিরিশেক এগিয়ে আসতে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পেলাম আবার। একটি বৃদ্ধার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। হাত নেড়ে নেড়ে বেশ একটু আকুতি নিয়ে বৃদ্ধা তাকে বলছে কিছু। কিন্তু ব্রহ্মচারীর দু চোখ সোজা তার পায়ের দিকে। শান্ত, গম্ভীর। হাত পাঁচেক দূরে আর একটি রমণী দাঁড়িয়ে। বছর সাতাশ-আঠাশ বয়েস হবে। শামলা রং কিন্তু মুখখানা সুশ্রী, বিষণ্ণ। বাঙালি মেয়েদের মতোই বেড় দিয়ে শাড়ি পরা। কিন্তু একনজরে তাকালেই বোঝা যায় বাঙালি নয়। কপালে বড় একটা খয়েরি রঙের টিপ, নাকে একটা দামী সাদা পাথর ঝকঝক করছে। মেয়েটি তার জীবনের সমস্ত আগ্রহ দুই চোখে টেনে এনে ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে অপলক চেয়ে আছে। সে যেন এক সংকট সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে, ওই ব্রহ্মচারীর কোন বিবেচনার ওপর যেন তাঁর বাঁচন-মরণ নির্ভর।

ভারী অদ্ভুত লাগল আর অবাক লাগল। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে কিছু শোনার বা বলার চেষ্টা

আরো বিসদৃশ। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বৃদ্ধার ভাঙা ভাঙা হিন্দী কানে এল। সে দেবীজীর নাম করে কিছু একটা বোঝাতে চেষ্টা করছে।

মস্ত একটা হল-ঘর দিয়ে তিন-চারটে ধাপ ওপরে উঠে গেলে সামনের খুপরি ঘরে চিত্রিত পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে চিরযৌবনা কুমারী কন্যা। ওই খুপরি ঘরের সামনে ঠাসাঠাসি ভিড়। সামনের বিশাল লোহার দরজার দুপাশে মেয়ে-পুরুষেরা বসে আছে—তাদের পাশে পাশে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিমার কাছে পুজোর ডালি পড়ছে, পুরোহিত সেই প্রসাদী ডালা তার মালিককে ফেরত দিচ্ছে, ঘৃতপ্রদীপের টিপ পরিয়ে দিচ্ছে কপালে।

ওখানে গিয়ে ভিড় বাড়াবার বাসনা নেই। হল-এর এ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে সোজা তাকালে দেবীর পূর্ণমূর্তি চোখে পড়ে। লৌহদরজার সামনে কোনো লোককে ভিড় করতে দেওয়া হয় না।...শ্বেতচন্দনে অভিষিক্ত কালো পাথর-প্রতিমার শোভা দেখছি। রূপ-ঝলমল কন্যা পাষাণের মণিকোঠায় স্মিতহাস্যে দাঁড়িয়ে। আমার মনে হতে লাগল ওই হাসিটুকু বড় সুন্দর আর বড় চেনা, এই হাসিতে ভারতীয় লজ্জা বেদনা অভিমান জিজ্ঞাসা করুণা প্রতীক্ষার ছোঁয়া লেগে আছে। কন্যার ললাটে শুকতারার মতো উজ্জ্বল একখানা হীরক-খণ্ড—কন্যার তৃতীয় নেত্র যেন।

শুনেছি, পর্তুগীজ দস্যুরা ওই হীরে অনেকবার হরণের চেষ্টা করেছে। সেই কারণেই দেবীর লক্ষ মন্দিরের মধ্যেও এই ঘোরা পথ, আর সেই কারণেই সামনে ওই বিশাল লৌহদরজা।

আমি চেয়ে আছি। দেখছি দেখছি দেখছি।

...কুমারী কন্যার যে কৌমার্য এখানকার আকাশে বাতাসে উত্তাল সমুদ্রে ছড়িয়ে আছে—ওই কালো পাষাণ-প্রতিমার দিকে চেয়ে সেইটুকু অনুভবের মধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করছি।

...যুক্তিশূন্য একটা পৌরাণিক কাহিনী মনের কোন অতলে হারিয়ে গেছিল জানি না। আর এই মুহূর্তে সেই অতল থেকে কে যে সেটাকে টেনে তুলছে তাও জানি না।

...বাণাসুরের অত্যাচারে ত্রিভুবন জর্জর। সেই চিরাচরিত প্রথায় পৌরুষ-শূন্য অসহায় দেবতারা ত্রাণের আসায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন। বিষ্ণুর উপদেশ, ত্রাণের উপায় জানেন একমাত্র মহাগৌরী। তাঁর কাছে যাও।

গেলেন। দেবী ত্রাণের প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁদের।

কুমারী কন্যারূপে বাণাসুরের নিধন সম্ভব। পার্বতী তাই কন্যারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা।

কিন্তু মরদেহ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির যোগ। শিবকে পতিত্বে বরণের সংকল্পে বিজন সমুদ্রপথে কন্যার কঠোর তপস্যার কাল কাটছে। মহযোগীর ধ্যান টুটেছে, আসন্ন প্রত্যাশায় মন চঞ্চল। দশ মাইল দূরে শুচীন্দ্রম মন্দিরে অবস্থান করছেন শিব। কন্যার সঙ্গে বিবাহের দিন ঠিক হল, মধ্যারাত্রিতে লগ্ন ধার্য হল।

...সেই দিন। সেই রাত্রি।

বিবাহ-বেশে সজ্জিতা কন্যা।

দেবঋষি নারদ দেখলেন এই বিবাহ ঘটে গেলে সর্বনাশ। দেবীর প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হবে। সত্যভঙ্গ হবে। কারণ কুমারী কন্যারূপে হত্যা করতে হবে বাণাসুরকে। কন্যার বিবাহ মানেই বাণাসুরের নতুন জীবন।

...কন্যা গ্রহণের প্রত্যাশায় শিব অনেকটা বাহ্যজ্ঞানরহিত সম্ভবত। যথাসময়ে প্রস্তুত হয়ে তিনি রওনা হয়েছেন। তিন মাইল মাত্র পথ এসেছেন। নারদ তখন কাক-রূপ পরিগ্রহ করে কা কা-কা রব তুলে সামনে দিয়ে উড়ে গেলেন। অর্থাৎ আসন্ন উষার বারতা ঘোষণা করলেন কাকরূপী নারদ।

শিব ধরে নিলেন উষা সমাগত, লগ্ন উত্তীর্ণ। আর অগ্রসর হওয়া বৃথা। তিনি ফিরে গেলেন।

এদিকে প্রতীক্ষারত কন্যার বিবাহ-লগ্ন এক সময় যথার্থই উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

বিবাহ বন্ধ। কন্যা কুমারীই থেকে গেলেন।

একই সঙ্গে বাণাসুরের শেষ সময় উপস্থিত। তাই কন্যার রূপে মুগ্ধ মোহগ্রস্ত বাণাসুর। তার

বিবাহ-প্রস্তাব কন্যা প্রত্যাখান করেছেন। কামদগ্ধ শক্তিমদগর্বে অন্ধ বাণাসুর আপন শক্তিতে কন্যা জয় করে নিতে এলো। কন্যা তখন দেবীশক্তিভূষিতা। চক্রায়ুধ দিয়ে বাণাসুর নিধন করলেন তিনি।

...তারপর পরাশক্তি তপস্যায় বসলেন আবার।

কিন্তু কন্যার তপস্যা এখানে চির-কুমারীত্বের তপস্যায় অক্ষয় অমলিন হয়ে আছে। সেই কৌমার্য আকাশ ছুঁয়েছে, বাতাস ছুঁয়েছে, এবং 'দি ওয়াটার্স অ্যারাউণ্ড আর ভারজিন!'

হঠাৎ চমক ভাঙতে কিছুটা অপ্রস্তুত আমি।

দেবী-কক্ষের সামনের লৌহকপাট বন্ধ, পুজো দিয়ে পুণ্যার্থীরা চলে গেছে। হল ফাঁকা। মন্দিরের দুই একটি লোক আমাকে নিরীক্ষণ করছে। ধ্যানমগ্ন ভেবে ডাকেনি কিনা কে জানে। পরে অবশ্য জেনেছি কক্ষের দরজা অমন অনেকবার বন্ধ হয় এবং খোলে। ভিতরের পূজারীরা নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। দর্শকেরা তখন সমুদ্রের দিকের অলিন্দে প্রতীক্ষা করেন।

কিন্তু এখনকার দরজা রাতের মতোই বন্ধ হয়েছে। আবার খুলবে সেই ভোর রাতে। হলের এই দরজাও বন্ধ থাকবে।

ফেরার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েই আবার থমকাতে হল একটু। বাইরে যাবার দরজার কাছাকাছি সেই সুন্দরকান্তি বাঙালি ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে। এদিকে অর্থাৎ আমার দিকেই চেয়ে আছে। শেষের দিকে বিমনা হয়েছিলাম সত্য, কিন্তু তার আগে একে দেবী-কক্ষের দিকে যেতে দেখিনি। আমার কেমন মনে হল ওই ব্রহ্মচারী পাশাপাশি কোথাও দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরেই আমাকে লক্ষ্য করেছে। হয়তো বা এরপর ডেকে সচেতন করত আমাকে।

আমি পা বাড়াতে সে আস্তে আস্তে ঘুরে এগিয়ে চলল। চলার ভঙ্গিটুকুও সুঠাম। আমার আলাপ করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আর একবারও সে পিছন ফিরে না তাকিয়ে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলেছ দেখে সে-চেষ্টা করা গেল না।

বাইরে এসে সিংহদরজার দিকে এগোতে লক্ষ্য করলাম ব্রহ্মচারী আমার বিশ গজের মতো আগে আগে চলেছে। তারপরেই আবার একটু সচকিত আমি। অদূরে একদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধা, তার পাশে নাকে ঝকঝকে পাথর পরা স্নেই বিষণ্ণনয়না সুশ্রী অল্পবয়সী রমণী। ব্রহ্মচারীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার হাত দুটি প্রার্থনার আকারে যুক্ত হল। পাশের রমণী নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে —অপলক দুই চোখ ওই মানুষটির ওপর নিবদ্ধ। কিন্তু অবাক লাগল অন্য কারণে। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে কথা শোনার সময় মাথা নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে থাকতে দেখেছি ব্রহ্মচারীকে। সেই দৃষ্টি এখনো সোজা মাটির দিকে; প্রায় নিজের পা বরাবর। ডাইনে বাঁয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে।

ওই বৃদ্ধা আর তার পাশের রমণীর দিকে চোখ রেখে এগিয়ে এলাম। মনে হল, ওই যে মানুষটা চলে যাচ্ছে, দুনিয়ায় এক সে ভিন্ন আর কোনো অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় তারা।

মেয়েকে সঙ্গে করে স্ত্রী সূর্যোদয় দেখে আর মন্দিরের চত্বরে ঘোরাঘুরি করে ফিরে এল যখন, তখনো আমি শয্যা ছাড়িনি। ঘরে ছেলে ঘুমুচ্ছে। তার কাছে একজনকে থাকতেই হবে।

মেয়ে বলল, কি সুন্দর সূর্যোদয় দেখলাম বাবা, ইস, তোমার দেখা হল না।

আমি আড়মোড়া ভেঙে বললাম, সূর্য রোজই একবার করে উদয় হন বোধহয়—দেখা যাবে।

কিন্তু স্ত্রী দেখলাম সোজা ঘুমন্ত ছেলের কাছে এসে হাত দিয়ে তার গা বুক কপাল পরীক্ষা করতে লাগল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার?

—রাতে গা-টা কেমন ছ্যাঁকছেঁকে মনে হচ্ছিল, একবার দেখো তো।

উঠে গায়ে হাত দিলাম। তারপর আশঙ্কটা উড়িয়ে দেবার মতো করে বললাম, কিছুই না, ঠাণ্ডা গা—কালকের ধকলে ও-রকম মনে হচ্ছিল।

মুখে বললেও ভিতরে ভিতরে খুব একটা স্বস্তি বোধ করলাম না। আমি নাকচ করলেও ওর মায়ের আশঙ্কা অনেক সময়েই সত্যি হয়ে দাঁড়ায় লক্ষ্য করেছি। একেবারে নিশ্চিন্ত না হলেও কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে স্ত্রী বললে, দশ-পনেরো দিন থাকতে হলে সমুদ্রের ওপরের এ-রকম স্যাঁতসেঁতে ঘরে এ ছেলে নিয়ে থাকা যাবে না, তুমি অন্য ব্যবস্থা করো বাপু।...ও-দিকের একটা রাস্তার ধারে কি সুন্দর ছোট ছোট সব বাড়ি দেখলাম, সামনে সুন্দর একটু বাগান—সমুদ্রের মুখোমুখি কিন্তু সমুদ্রের এ-রকম গায়ের ওপর নয়—কয়েকটার আবার তালাবন্ধ দেখলাম—ও-সব বাড়িতে কারা থাকে?

নির্লিপ্ত জবাব দিলাম, রথী-মহারথীরা নিশ্চয়। মনে মনে বললাম, ও-সব বাড়ির দিকে চোখ গেছে যখন, এ-ঘর আর মনে ধরবে কি করে। এখানে ভালো হোটেল আছে গোটাকতক খবর পেয়েছি, কিন্তু আলাদা রান্নার ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। থাকলে খোঁজ নেবার ইচ্ছে আছে। হোটেলের রান্না আর যারই হোক ছেলের পোষাবে না।

...এ কাহিনীতে এই ছেলের একটা পরোক্ষ ভূমিকা আছে। তার জন্যেই একটা মানুষকে আমি কাছে পেয়েছি, জেনেছি, চিনেছি। তাই তার ভূমিকাটুকুও এখানে অনিবার্য।

জামা-প্যান্ট পরিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিলে এই ছেলের দিকে তাকিয়ে তার দুরারোগ্য ব্যাধির হদিস কেউ পাবে না। বয়েস বারো, বাইরে সুস্থ তাজা ফুলের মতো অমলিন চেহারা। কিন্তু ব্যাধির নাম শুনলে যে-কোনো ডাক্তার আঁতকে উঠবে। মাসকুলার ডিসট্রফি—অর্থাৎ ভিতরে ভিতরে আপনা থেকে পেশী নাশ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাইরে কোনোরকম বিকৃতির লক্ষণ নেই। চোখের সামনে ওই ছেলে একদিন হেসে-খেলে লাফ ঝাঁপ করে বেড়াত। একটু একটু করে সেই পেশী নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। এখন বসে গেছে। হাত-পা সব বাইরে থেকে স্বাভাবিক, কিন্তু তুলতে নাড়তে পারে না। নিজে থেকে এ-পাশ ও-পাশ করতে পারে না, উঠে বসতেও পারে না। পুশ-চেয়ারেরও পিছনে গদীর ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিতে হয়। এ-রোগের শেষের পরিণাম ভয়াবহ। আমরা স্বামী স্ত্রী সে-চিত্র মনে না আনতেই চেষ্টা করি। সমস্ত পৃথিবীতে এ রোগ নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলেছে। কিন্তু বিজ্ঞান আজও এই ব্যাধির কার্য-কারণ নির্দেশে অসমর্থ, চিকিৎসা নির্ণয়ে ব্যর্থ।

অচল হলেও ছেলের আর সমস্ত স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি প্রখর, আচার-আচরণ কথাবার্তা সুস্থ। ওই এক পুশ-চেয়ার আর দুটি সমর্থ লোক ভরসা করে এই ছেলে নিয়েই ভারতের বহুক্ষেত্রে অনেকবার বেরিয়ে পড়েছি। আত্মীয়-পরিজনেরা ভয় পেয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করেন আর অবাক হন। ভাবেন দেব-দেবীর কৃপালাভই বুঝি আমার লক্ষ্য। কিন্তু তা নয়। আমার লক্ষ্যের খবর এক স্ত্রী ভিন্ন আর কেউ রাখেন না। তিনি বাধা দেন না বটে কিন্তু লক্ষ্যটা তিনিও খুব স্বাভাবিক ভাবেন না। যাক, এটা পরের প্রসঙ্গ।

কি ভেবে এই সকালেই সকলকে সঙ্গে করে বিবেকানন্দ শিলা এবং মন্দির দেখে আসব ঠিক করে ফেললাম। উদ্‌বেগ নিয়ে ছেলেকে বারকয়েক লক্ষ্য করেছি। ও তখন কি নিয়ে তার দিদির সঙ্গে ঝগড়ায় ব্যস্ত।...আমার থেকে থেকে মনে পড়ছে অনেক জায়গায় গেছি বটে, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তে ওই ছেলের জন্যে অনেক সময় অনেক প্রোগ্রাম ভেস্তেও গেছে। তাই সম্ভবত আজই ওখান থেকে ঘুরে আসার ইচ্ছে।

তাছাড়া ঘর থেকে বেরুবার ব্যাপারে ছেলেটার মহা উৎসাহ। সমুদ্রের দিকের রাস্তা ধরে আধমাইল এগোলে জাহাজঘাট। আগে আগে ওই লোক দুটোর একজন পুশ-চেয়ার ঠেলে নিয়ে চলেছে, আর একজন পাশে পাশে হাঁটছে। ওরা ছেলের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। শুধু মাইনে গুনে ও-রকম সঙ্গী সর্বদা জোটে না। দরকার মতো অনায়াসে তারা সামনে পিছনে ধরে পুশ-চেয়ার শূন্যে তুলে নিয়ে চলতে অভ্যস্ত। ছেলে ওদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। ওরা ওরা সহিষ্ণুশ্রোতা।

জেটি-ঘাটে উপস্থিত হলাম। সেখানে টিকিট কেনার লাইন পড়ে গেছে। এক টাকা করে টিকিট মাথাপিছু। জেটির শেষ মাথা সমুদ্রের ওপর খানিকটা এগিয়ে গেছে। সেখানে দুটো খোলা স্টীমলঞ্চ শিলামন্দিরে যাত্রী দিয়ে আসছে, নিয়ে আসছে।

টিকিট কাটা হল। সেখান থেকে এবড়ো-খেবড়ো বালির রাস্তা ধরে জেটি পর্যন্ত যেতে হয়।

সেখানে বা জেটিতে পুশ-চেয়ারের চাকা ঘুরবে না। লোক দুটো ছেলেসুদ্ধু পুশ-চেয়ার শূন্যে তুলে নিয়ে চলেছে। স্টীমলঞ্চ পর্যন্ত ওদের ওই ভাবেই যেতে হবে।

যাত্রীরা সার বেঁধে অপেক্ষা করছে। লঞ্চ এসে ভিড়ল। ফিরতি যাত্রীরা নেমে গেল। আমরা উঠলাম। মাঝখানে পুশ-চেয়ার রেখে সামনে পিছনে দুই সঙ্গী চেয়ারটা ধরে থাকল। সমুদ্র শান্ত নয় খুব। লঞ্চ এখানেই বেশ জোরে নড়ছে, দুলছে। লঞ্চের মাঝখানে একটা মোটা দড়ি বেঁধে পার্টিশনের মতো করা হয়েছে। সামনের দিকটা মেয়েদের জন্যে—ওদিকটা পুরুষদের।

মা সামনে নেই, ছেলেটা বোধহয় ঘাবড়েছে একটু। চেষ্টা করে তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, কি রে ভয় করছে না তো?

ভিতরে যা-ই হোক ও তা স্বীকার করার ছেলে নয়। বলল, না, খুব মজা লাগছে।

যাত্রীরা ফিরে ফিরে দেখছে ওকে। বাইরে সুস্থ, সুন্দর, অথচ হাঁটতে চলতে পারে না—এটুকুই দেখছে তারা। ছেলেটার জন্যে কাছাকাছি সকলেরই চোখে-মুখে সহানুভূতি। এ-রকম দেখে দেখে চোখে সয়ে গেছে আমার। ছেলেরও বোধহয়। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেও আর ভালো লাগে না।

তীর থেকে চারশো-পাঁচশো গজ দূরে অতিকায় শিলাখণ্ড। ওটা যে কত বড় সেটা এখান থেকে ঠাওর হয় না অবশ্য। লঞ্চ ছাড়ার মিনিট খানেকের মধ্যে আমরা বড় বড় ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম! প্রচণ্ড বেগে দুলে দুলে উঠছে লঞ্চ, টাল সামলাবার চেষ্টায় যাত্রীদের মধ্যে বেশ একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। লঞ্চের গায়ে তিন-চারটে বড় বড় ঢেউ আছড়ে ভেঙে আমাদের প্রায় ভিজিয়ে দিয়ে গেল। তিনজনে তিনদিক দিয়ে আগলে রাখা সত্ত্বেও ছেলেটা ভিজেই গেল। এতগুলো লোককে ভিজতে দেখে আর তাদের সকলের হুটোপুটি দেখে ভয় গিয়ে ওর সত্যিই মজা লাগছে এখন।

আমি ভেবে পেলাম না উত্তাল সমুদ্রের এত বড় বড় ঢেউ ভেঙে স্বামী বিবেকানন্দ ওই বিশাল শিলাখণ্ডে এসে উঠেছিলেন কেমন করে। নিজেও ভালোই সাঁতার জানি। কিন্তু ওই বাস্তবের মধ্যে নিজেকে কল্পনায় দেখতে চাইলেও গা সিরসির করে। সমুদ্রের এই গর্জনে আমরা নিশ্চিত মৃত্যুর আহ্বান ছাড়া আর কিছু কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু স্বামীজী হয়তো ঝাঁপ দিয়েছিলেন মায়ের মৃত্যুত্তীর্ণ আহ্বান শুনে।

বিশ্বাস, ওই দুটি অতিকায় যমজ পাথর থেকে সমুদ্রের অবস্থান একদা দূরে ছিল। কুমারী কন্যা শিবের তপস্যায় মগ্ন ছিলেন ওখানে। ওই শিলার ওপর কন্যার শ্রীপাদপদ্মের চিহ্ন পড়ে আছে। তারপর কবে সমুদ্র এগিয়ে এসেছে, কবে ওই যমজ পাহাড়ের নীচের ভাগ অতলে ডুবে গেছে, কেউ জানে না। কারো কারো ধারণা ওখানেই এককালে কুমারী কন্যার মন্দিরও ছিল।

...আঠার'শ বিরানব্বই সাল সেটা। ধ্যানশেষে তুষারধবল হিমালয় থেকে নেমে স্বামীজী এসেছেন এই কন্যাকুমারীতে। ল্যাণ্ডস্ এন্ড্ অফ্ ইণ্ডিয়ার এই প্রান্তে এসে ভারতের আর বিশ্বাসের পুনরুদ্ভবের প্রার্থনায় আবার তিনি ধ্যানমগ্ন। ...উত্তাল সমুদ্র-জঠরের ওই টুইন-রক্স-এর কোন একটার শিলাস্তরে দেবীর চরণচিহ্ন জেগে আছে এ-খবর তিনি জানতেন কিনা বলতে পারব না।

চরণ-দর্শনের আকুতি নিয়ে জীবনের মায়া তুচ্ছ করে এই উত্তাল সমুদ্র সাঁতরে ওই যমজ পাহাড়ে গিয়ে উঠেছিলেন তিনি—এ অবিসংবাদী সত্য। চরণচিহ্ন খুঁজে পেয়েছিলেন। সেখানে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। মনে হয়, তখনো এই ভারতই তাঁর ধ্যান। শিলার গায়ে খোদাই করা আছে তাঁর বাণী। লেজারাস অ্যাওয়েক! দরিদ্র ভারতবাসী জাগো!

সমুদ্রের গভীরে এই অতিকায় শিলা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে পাথরের গায়ে ওই খোদাই করা বাণীর দিকে তাকালে কি একটা অনুভূতি হঠাৎ যেন ধমনীর রক্তে তোলাপাড় ঘটিয়ে দেয়, তারপর সেটা বুক বেয়ে চোখের দিকে উঠতে থাকে। সেই সঙ্গে একটা অশ্রুত-গম্ভীর ধ্বনি কানে বাজতে থাকে—লেজারাস অ্যাওয়েক! দরিদ্র ভারতবাসী জাগো।

সমুদ্রে-জঠরের ওই জোড়া পাহাড়ের গায়ে লঞ্চ ভিড়ল। যাত্রীরা নামতে লাগল। ফাঁকা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

আমরাও নামলাম। শিলাস্তরে পা ফেলামাত্র অদ্ভুত একটা শিহরণ বোধ করলাম। এর সঙ্গে কোনো অধ্যাত্মচিন্তার যোগ নেই। অদূরে তিন সমুদ্রের সঙ্গম। চারদিকে অশান্ত সমুদ্র, তার মাঝে তেমনি গম্ভীর

যেন এই অতিকায় শিলাভূমি। তার ওপর মন্দির—আর সেখানে আমরা। সমুদ্র, সমুদ্রগর্ভের পাহাড়, মন্দির আর মানুষ—সব একাত্ম একাকার হবার মতো স্থান আর কোথাও আছে কিনা জানা নেই।

জোড়া পাহাড় যে ছিল এখানে সে-এখন আর বোঝা যায় না। সর্বত্র প্ল্যান করে একতলা দোতলা ঘর তোলা হয়েছে—ওঠা-নামার চমৎকার সিঁড়ি। ফলে ছেলের পুশ-চেয়ার নিয়ে ওঠা-নামা বা ঘোরাঘুরির অসুবিধে।

ওই চেয়ার শূন্যে তুলেই প্রথমে দেবীর শ্রীপাদমণ্ডপে উঠে এলাম। শিলাস্তরে দেবীর সেই পদচিহ্ন। মণ্ডপের মাঝে পৃথকভাবে সেই জায়গাটুকু ঘিরে রাখা হয়েছে। দেখতে অসুবিধে হয় না—শুধু সম্পর্শ বাঁচানোর জন্যেই ওই ব্যবস্থা।

যাত্রীরা নির্নিমেষে দেখছে, প্রণাম করছে। প্রার্থনা জানাচ্ছে। আমার স্ত্রীও বোধহয় তাই করছে। কিন্তু আমি কি করব? মায়ের চরণে একমাত্র ছেলের দুরারোগ্য ব্যাধির আরোগ্য কামনা করব? সেই প্রার্থনা জানাব? না। প্রার্থনার কি ফল জানি না, প্রার্থনাও জানি না। যে লক্ষ্যে ছেলেকে নিয়ে আমি এক-একসময় বেরিয়ে পড়ি সেটা দেব-দেবীর বেলায় যেমন, মানুষের বেলায়ও তেমনি। দেবতা হোক, দেবী হোক, মানুষ হোক—যে জাগ্রত সে-ই দেখবে, করার কিছু থাকলে করবে। আমি প্রার্থনা জানিয়ে ব্যর্থতার বোঝা বাড়াই কেন? অনুভূতির এই মুহূর্তের সঞ্চয়টুকু হারাই কেন?

মুখ তুলেই যে দৃশ্য দেখলাম, ভোলবার নয়। এক-একবার বাইরে বেরিয়ে পড়ে মানুষকেই নানা বেশে নানা মূর্তিতে বেশি দেখি! এখানেও দেখছি একজনকে। প্রশস্ত মণ্ডপের একদিকের দেয়াল ঘেঁষে একেবারে সাদা একখানা স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরে দেখা সেই ব্রহ্মচারী। গায়ে এখন একটা ঢোলা সাদা জামার ওপর সাদা চাদর জড়ানো। দুই চোখ বোজা। ঘরে এত মানুষের আনাগোনা, কিন্তু একেবার তাকালেই বোঝা যায় ওই একজনের স্থির নিস্পন্দ দেহটাই ওখানে দাঁড়িয়ে, তার প্রাণময় অস্তিত্বের প্রতিটি কণা অনেক দূরের কোথও নিবিষ্ট।

আজ একে এখানে দেখামাত্র মনে হয়েছে হঠাৎ এই কন্যাকুমারীতে এসে হাজির হওয়ার পিছনে কারো অঙ্গুলি-সংকেত আছে। সাধু-সন্ন্যাসী অনেক দেখেছি তবু কেন এ-রকম মনে হচ্ছে জানি না। দেবীর শ্রীপাদপদ্মের সামনে বহুলোক সন্নিধানে একটি মানুষের ওই নিশ্চল বিচ্ছিন্নতা দেখে একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেটা কল্পনার দৃশ্য অবশ্যই। তখনো সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ নদীয়ার গৌর গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মের সামনে দাঁড়িয়ে। জগতের বেষ্টনী ছাড়িয়ে এক মহানিশ্চলতার মধ্যে ওই রকমই নিস্পন্দ, স্থির। দুই গাল বেয়ে ধারা নেমেছে। টপটপ করে সেই ধারা বিষ্ণুচরণে এসে পড়ছে। কিন্তু আবার অদ্ভুত একটা অনুভূতি মনে এলো। সেই মহাতপার চোখের জলের আশ্রয় ছিল, নিবেদন ছিল। আমি যাকে দেখেছি তার বুঝি তাও নেই।

. হাজারের ভিড়েও মিশে যাবার মতো চেহারা নয় তার, তাই শুধু আমি কে, অনেকেরই চোখে পড়েছে। ফিরে ফিরে দেখছে। ওই নিবিষ্টতায় ছেদ পড়তে পারে বলে তেমন কাছে কেউ যাচ্ছে না। এর মধ্যে একটি অল্পবয়সী মেয়ের ফিসফিস উক্তি কানে এল, আর একজনের উদ্দেশ্যে বলছে, ঘণ্টাখানেক আগেও এসে দেখে গেছি উনি ওইখানে ঠিক ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন।

আমার স্ত্রী তখনো পাষাণ-পদচিহ্নের দিকে চেয়ে আছে আর মাঝে মাঝে ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কাছে এসে ও-দিকের দেয়ল ঘেঁষা ব্রহ্মচারীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সে-ও দেখলে খানিকক্ষণ ধরে। তারপর বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, কার ঘর জানি খালি করে এমন ছেলে এ পথে পা বাড়িয়েছে।

বললাম, কালও এঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, পরে বলব'খন...একটু আলাপ করার ইচ্ছে আছে যাব?

পাছে তন্ময়তাভঙ্গের অপরাধে পড়ি সেই ভয়ে স্ত্রী সচকিত। —না না এখন না, দেখছ না ভাবে একেবারে পাথরখানা হয়ে আছেন!

মুখে বললেও সামনে গিয়ে এক্ষুনি দাঁড়াতে পারা যেত না ঠিকই। যাক সমুদ্রের মধ্যে এই শিলাভূমি থেকে একটা মানুষ তো উধাও হয়ে যেতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ে স্টীমলঞ্চ এলে তবে

ফেরা। কে যাচ্ছে না যাচ্ছে নজর রাখলেই হল। স্ত্রী উৎসুক নেত্রে আরো বার কয়েক ওই স্থির মূর্তি দেখে নিয়ে আমার দিকে ফিরল। কেন আলাপ করার ইচ্ছে আমার তাই বুঝতে চায় হয়তো।

আমিই বা কি জানি কেন! মণ্ডপের চারদিক একপ্রস্থ ঘুরে দেখে নিয়ে আবার ফিরতে দেখি ব্রহ্মচারী ওখান থেকে যেন এখানেই ফিরে এসেছে এতক্ষণে। আর তার টানা দুই চোখের স্থির গভীর দৃষ্টি এখন সোজা আমার ছেলের মুখের ওপরেই প্রসারিত। পুশ-চেয়ারে বসা ছেলের ওপর মায়া-ভরা দৃষ্টি অনেকেরই পড়েছে, কিন্তু এ-চাউনিই অন্যরকম একেবারে। আমার বুকের তলায় হঠাৎ কি-রকম মোচড় পড়ল একটা। যে লক্ষ্যের তাড়নায় ওই ছেলে নিয়ে এক-একসময় বেরিয়ে পড়ি এ-কি তারই সূচনা? না, থাক, আশা করতে ভয় করে।

কেমন মনে হল ওই পুশ-চেয়ারের দিকে ব্রহ্মচারীর এগিয়ে আসার ইচ্ছে। কারণ, ছেলে এর মধ্যে বারকয়েক দেখে নিয়েছে তাকে, আর ওকেই পছন্দমাফিক একজন লোক নিরীক্ষণ করছে দেখে ঠোঁটের ফাঁকে একটু দুষ্টদুষ্টু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। ওকে যে লোকে একটু বেশিই লক্ষ্য করে সেটা ও ভালোই বুঝতে শিখেছে। আমার মনে হল, ওই ব্রহ্মচারী কাছে এগিয়ে আসছে না কারণ ছেলের পাশে আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে।...মন্দিরে একটি পরদেশিনী বৃদ্ধারও পায়ের দিক থেকে মুখ তুলতে দেখিনি তাকে।

ঘুরে ঘুরে দেখার অনেক কিছু আছে। সভামণ্ডপ, ধ্যান-কক্ষ, পাঠঘর, আপিস—এক পাহাড়ের মাথায় কত কি। ওঠা-নামা করে ঘুরে ঘুরে দেখতে বেশ সময় লাগে। বারবার পুশ-চেয়ার নামিয়ে উঠিয়ে যেটা করা সম্ভব নয়। সামনেই ঘোরাঘুরি করার জন্যে লোক দুটোর জিম্মায় ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী আর মেয়েকে ডেকে নিয়ে মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এলাম।

প্রায় আধঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে স্ত্রী আর মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। দেখার ঝোঁকে ওরা কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আমার ওই দুটো লোকের একজন আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এগিয়ে এলো। সে খবর দিল, খোকাবাবুর শরীর হঠাৎ খারাপ হয়েছে, একজন সাদা কাপড় পরা সাধুজী আপনাকে ডাকতে বললেন।

পিছন ফিরে দেখলাম স্ত্রী আর মেয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি শ্রীপাদমণ্ডপের দিকে এগোলাম।

ব্রহ্মচারী ছেলের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। কাছে এসে হকচকিয়ে গেলাম একটু। ছেলেটার সমস্ত মুখ লাল এরই মধ্যে। পুশ-চেয়ারের পিছনে মাথা এলিয়ে দিয়েছে। ব্রহ্মচারীর গায়ের সাদা চাদর হাতের মুঠোয় এখন। চাদরের একটা কোণ ভিজিয়ে নিঙড়ে নিয়ে সে জায়গাটা ছেলের চোখে আর কানের পাশে ঘষে দিচ্ছে।

আমরা এসে দাঁড়াতে মুখ তুলল। পাশে স্ত্রীকে দেখে খানিকটা আড় হয়ে সোজা আমার দিকে তাকালো—আপনার ছেলে?

মাথা নাড়তে আবার বলল, এর গায়ে তো বেশ জ্বর, আর নশিয়ার দরুন কাহিল হয়ে পড়েছে—একে নিয়ে বেরিয়েছেন!

গলায় মৃদুগম্ভীর অনুযোগের সুর।

তাড়াতাড়ি ছেলের গা পরীক্ষা করলাম। জ্বরই বটে! ওর ধাত জানি, হাতে যা লাগছে, তাপ তার থেকে বেশি ছাড়া কম নয়।

ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। লোক দুটোর সঙ্গে পুশ-চেয়ার তোলা নামানোর ব্যাপারে ব্রহ্মচারীও হাত লাগাল। তার দরকার নেই, তবু বাধা দিতে গিয়েও দিলাম না।

স্টীমলঞ্চে নির্দিষ্ট যাত্রীর সংখ্যা বোঝাই হলে তবে ছাড়ার নিয়ম। কিন্তু তখন পর্যন্ত অর্ধেক যাত্রীও এসে উঠেনি। দেখলাম, ব্রহ্মচারী একজন লোককে কি বলতে সে সসম্ভ্রমে মাথা নেড়ে তক্ষুনি লঞ্চ ছাড়ার জন্যে হাঁক দিল।

মাঝামাঝি এসেছি। ঢেউয়ের দোলায় নশিয়া বাড়তে পারে সেই আশঙ্কায় ব্রহ্মচারী তার চাদরের ভেজা জায়গাটা মাঝে মাঝে ছেলের চোখে-মুখে ঘষে দিচ্ছে। আর ঢেউয়ের ছোট ছেলের গায়ে যাতে না লাগে চাদরটা খানিকটা মেলে ধরে সে চেষ্টাও করছে।

আমি এক ফাঁকে বললাম, আপনি আবার কষ্ট করে সঙ্গে এলেন...লোক ছিল, নিয়ে যেতে অসুবিধে হত না।

মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। চোখদুটো যেন মুহূর্তের মধ্যে অনেক গভীরে ঘুরে আসতে পারে। খুব শান্ত মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল, আমি আসাতে আপনার কিছু অসুবিধে হচ্ছে?

বিব্রত বোধ করলাম। বাইরে যত মিষ্টি চেহারাই হোক, এই এক কথাতেই তার ভিতরের মেজাজের আভাস মিলল। জবাব দিলাম না। তার গম্ভীর চোখে চোখ রেখে হেসে ফেললাম।

ব্যস্ত হয়ে সবিনয়ে দু'চার কথা বলব, সেটাই স্বাভাবিক। তার ব্যতিক্রম এবং হাসি দেখে ওই আয়ত দু'চোখ মুখের ওপর স্থির একটু। বলল, সকালেও আপনার ছেলে তেমন কিছু অসুস্থ বোধ করেনি?

—না...সে রকম তো কিছু দেখিনি।

দড়ির ও-পাশ থেকে স্ত্রী চাপা বিরক্তির সুরে বলে উঠল, দেখনি আবার কি, সকালে উঠেই বললাম না গা ছ্যাঁকছ্যাঁক করছিল, পাছে পরে আর ওকে নিয়ে বেরুতে না পারো সেই ভয়ে চোখ-কান বুজে আজই বেরিয়ে পড়লে, এখন বোঝো—

হাড়ে হাড়ে বুঝছি, কারণ উক্তির একবর্ণও মিথ্যে নয়। যাকে শোনাবার জন্যে এই অনুযোগ সে শুনল, কিন্তু একটুও ফিরে তাকালো না। ভিতরে ভিতরে উতলা হলেও দুশ্চিন্তা ছেঁটে দেবার জন্যেই ব্রহ্মচারীর দিকে চেয়ে হালকা করে বললাম, ছেলের শরীরের হাল দার্জিলিংয়ের ওয়েদারের মতোই আনপ্রেডিকটেবল—এই ভালো তো এই খারাপ।

ওর কপালে হাত রাখলাম আবার। জ্বর আরো বেড়ে গেছে মনে হল। স্ত্রীর দুশ্চিন্তা-ভরা চোখ এড়াবার চেষ্টা আমার।

সঙ্গে লোক দুটো বিব্রত বোধ করলেও পুশ-চেয়ার ব্রহ্মচারীই ঠেলে নিয়ে চলেছে তর তর করে। হাতের চাদরটা আমার হাতে দিয়ে বলেছে, ওর মাথার রোদ আড়াল করুন।

পথের লোকেরা ফিরে ফিরে দেখছে। পুশ-চেয়ার যার হাতে তাকেও, ছেলেকেও। ঘরের কাছাকাছি আসতে আমি হঠাৎ সচকিত একটু। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গতকাল মন্দিরে দেখা সেই বৃদ্ধার সঙ্গে অল্পবয়সী রমণীটি। একলা দাঁড়িয়ে, নাকের সাদা পাথর দিনের আলোয় ঝকঝক করছে। কিন্তু হঠাৎ স্থান-কাল ভুলে ফ্যাল ফ্যাল করে সে এদিকেই চেয়ে আছে—ব্রহ্মচারীকে দেখছে আর পুশ-চেয়ারের ছেলেকে দেখছে।

আমার চোখ দুটো সোজা ব্রহ্মচারীর মুখের ওপর উঠে এসেছে। কিন্তু সে ওই মেয়েকে দেখেছে কি দেখেনি তাই বোঝা গেল না। তবু ধরে নিলাম দেখেছে। কারণ, আমার মনে হচ্ছে, পুরুষের গাম্ভীর্যেরও বিশেষ একটা রূপ আছে যা বিশেষ সময়ে ছাড়া চোখে পড়ে না।

সত্রমে ফিরে ছেলেকে তার বিছানায় শুইয়ে দেবার পর থার্মোমিটার লাগানো হল। ও জিনিসটা সঙ্গেই থাকে। জ্বর একশো তিন পয়েন্ট চার। সেই সঙ্গে মাথায় বেশ যন্ত্রণা। ওর অল্প-স্বল্প অসুখের চিকিৎসা আমাদের জানাই আছে। তবু ভরসা না পেয়ে ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কাছাকাছি ভালো ডাক্তার আছে?

একটি কথাও না বলে সে তক্ষুণি বেরিয়ে গেল। মিনিট পনেরর মধ্যে যে আধ-বয়সী লোকটিকে সঙ্গে করে ঢুকল, হাতে স্টেথো আর ব্যাগ না থাকলে ডাক্তার কি মোক্তার বোঝা শক্ত হত। রঙিন পা-জামার ওপর একটা ধূসর রঙের পাতলা কোট চড়ানো মানুষটি ঘরে ঢুকে সোজা রোগীর শয্যার দিকে এগোলেন।

প্রথমে নাড়ি দেখে হাতটা ছেড়ে দিতে সেটা ধুপ করে বিছানায় পড়ে গেল দেখে তিনি অবাক একটু। স্টেথো লাগিয়ে বুক দেখলেন, তারপর পিঠ দেখবার জন্যে ছেলেকে ও-পা ফিরতে বললেন। আমাকেই পাশ ফিরিয়ে পা দুটো ঠিক করে দিতে দেখে আস্তে আস্তে দুই চক্ষু স্থির ভদ্রলোকের। কাজ ভুলে ছেলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে আমার দিকে ফিরলেন। ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনভ্যালিড শুনেছিলাম...মাসকুলার ডিসট্রফি নয় তো?

ওই এক প্রশ্ন থেকেই বোঝা গেল চেহারা বা বেশবাস যেমনই হোক, চিকিৎসক অভিজ্ঞ। মাথা নাড়লাম, তাই।

...মাই গড! সশঙ্কে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সিউডো হাইপার ট্রফিক?

মাথা নেড়ে আবারও সায় দিলাম।

ভদ্রলোক সোজা মাথাটা নিচু করে বসে রইলেন মিনিটখানেক। নিবির বেদানাচ্ছন্ন মুখ। ঘরের প্রতিটি প্রাণী নির্বাক। ব্রহ্মচারী স্থির চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে আছে... পরিবর্তন লক্ষ্য করছে।

—আই অ্যাম সরি। গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে ডাক্তার তাঁর কর্তব্য পালন করলেন। পরীক্ষা শেষ করে প্রেসকৃপসন লিখে সেটা ব্রহ্মচারীর হাতে দিয়ে সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

ফী দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি আমিও বেরিয়ে এলাম, পিছনে ব্রহ্মচারী। আসার উদ্দেশ্য বুঝে বাইরের দাওয়ায় ডাক্তার দাঁড়ালেন একটু। বললেন, এই সকালেই মনটা খারাপ হয়ে গেল...তাছাড়া আনন্দের ডাকাটাই আমার ফী, অন্য ফী-এর দরকার নেই। কিন্তু এ-রকম ছেলে নিয়ে আপনি বেরিয়েছেন কি করে?

জবাব দিলাম, এ-রকম ছেলে নিয়ে প্রায় প্রতি বছরই বেরোই।...কিন্তু আপনি দয়া করে ফী-টা নিন।

—বললাম তো, ওই আনন্দের ডাক পেলে সেটাই আমি সব থেকে বড় ফী ভাবি। সে-জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

চলে গেলেন। প্রেসকৃপসন হাতে আনন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মচারীও পিছনে চলল। আধঘণ্টা বাদে ওষুধ হাতে ফিরে এল যখন—আর যেন সেই চেহারাই নয়। বিষাদে ছাওয়া মুখ আয়ত গম্ভীর দুই চোখে যেন একটা আর্তছায়া। ডাক্তারের কাছ থেকে রোগের বিবরণ আর পরিণাম জেনে এসেছে বোঝা গেল। এই মানুষের এই পরিবর্তনটুকু কেন যে ভালো লাগল জানি না। হালকা সুরে বললাম, আপনি ডাকলে ডাক্তারের ফী লাগে না, আর প্রেসকৃপশন নিয়ে গেলে ওষুধের দামও লাগে না নাকি?

আমার এই সহজতা কতটা খাঁটি আর কতটা মেকী মুখের দিকে চেয়ে তাই বুঝে নিতে চেষ্টা করল বোধহয়। জবাব না দিয়ে প্রেশকৃপশন আর ক্যাশমেমো হাতে দিল। আবার ব্যাগ বার করতে যেতে বলল, যখন দাম দেব, চেয়ে নেব। ঘুরে আধঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে গা-টা কেমন সিরসির করে উঠল আমার। মনে হল, ওই দুটো চোখ দিয়েই পারলে ছেলেটার সমস্ত রোগ টেনে নেয়। পারুক আর না পারুক এ-রকম একটা ইচ্ছে-শক্তি যেন ওই দুটো চোখের আছে।

আস্তে আস্তে আমার দিকে ফিরল আবার। —ওষুধটা খাইয়ে দিন, —আর কি দরকার হতে পারে বলুন?

—আর আবার কি দরকার, অনেক করলেন।

মেয়েরা বোধহয় সর্ব ব্যাপারে ঠিক সময়ে ঠিক-ঠিক সুযোগটুকু নিয়ে বসতে পারে। কিন্তু স্ত্রী যে সুরে যে সম্বোধন করে বসল সেটাই আমার কাছে বিস্ময়কর। বলল, ব্রহ্মচারী ভাই তুমি করে বলছি বলে কিছু মনে করো না, বয়সে অনেক বড়ই হব, তাছাড়া তোমাকে দেখলেই আপনার-জন ভাবতে ইচ্ছে করে...তুমি তো এখানকারই সকলের চেনা-জানা একজন, এর থেকে একটু ভাল থাকার জায়গা পাওয়া যায় না? যত টাকা লাগে লাগুক, ওই ছেলে নিয়ে এই একটা ঘরে আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে।

আমি সশঙ্কে মানুষটির দিকে তাকালাম। হঠাৎ এই অন্তরঙ্গতা কতটা পছন্দ হবে সেই সংশয়। কিন্তু তার দু'চোখ সোজা মাটির দিকে। স্ত্রীর দিকে তাকানো দূরের কথা, তার দিকে একটু ঘুরেও দাঁড়াল না। অনুচ্চ গম্ভীর সেই গলার স্বর। বলল, আমি ব্রহ্মচারী নই, আমার নাম আনন্দরূপ। ... এর থেকে ভালো ঘরের ব্যবস্থা আজকের মধ্যেই হবে।

আমাকে বলল, ওকে ওষুধ খাইয়ে আপনি একটু বাইরে আসুন।

স্ত্রীকে ওষুধটা খাইয়ে দিতে বলে আমি ওর সঙ্গেই বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় নেমে ও বলল, ওষুধের দামটা দিয়ে আসি চলুন, কাছেই—

—চলুন।

দু'পা এগিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, ছেলের অসুখের সবকিছু আপনার স্ত্রীও জানেন?

—স্ত্রী কেন, মেয়েও জানে।

—এই একটিই ছেলে?

—হ্যাঁ।

আর কিছু বলল না। পঁচিশ গজের মধ্যেই ওষুধের দোকান। দাম মিটিয়ে আবার একসঙ্গেই রাস্তার দিকের দাওয়ায় ফিরে এলাম।

—এ রকম অবস্থা হয়েছে কতদিন?

—একটু একটু করে পাঁচ বছর।

—তার আগে হাঁটাচলা করত।

—ছুটোছুটিও করত।

—সত্যিই কোথাও এর কোনো চিকিৎসা নেই?

—থাকলে করতাম। কিছু বাকি রাখিনি।

নিজের মনেই বিড় বিড় করে আনন্দরূপ বলল, মানুষ তাহলে কতটুকু এগিয়েছে! একটা যন্ত্রণা যেন ঠেলে বুকের তলায় নামিয়ে বলল, আপনাদের সহ্যের ক্ষমতা প্রণম্য। ...আপনি কি করেন?

বোধহয় বুঝতে চায় কোন্ কাজে ডুবে থেকে এ রকম ব্যথা ভুলে থাকতে পারি। জবাব দিলাম, খবরের কাগজের চাকরি—

—কোন্ কাগজে?

বললাম।

—আচ্ছা, খাওয়া-দাওয়া সেরে আপনার সব গোছগাছ করে তৈরি হয়ে থাকুন, বাড়ির ব্যবস্থা করে দুপুরের মধ্যেই আমি আসছি। এগোতে গিয়েও থামল, ও..আপনার নামটা জানা দরকার।

নাম বললাম।

যাওয়ার বদলে আনন্দরূপ ঘুরে দাঁড়িয়ে গেল আবার। ভাল করে আর একদফা দেখে নিল যেন।—এ-নামে তো একজন নামী লেখক আছেন!

হেসে ফেললাম। বললাম, নামী-টামি জানি না, তবে লোকটা আমিই।

মুখ এখনো গম্ভীরই, কিন্তু চোখে সত্যিকারের শ্রদ্ধা মেশানো বিস্ময় একটা।—কি আশ্চর্য, আপনার তো অনেক বই আছে, আর অনেক বই সিনেমাও হয়ে গেছে!

হাসতে লাগলাম। কিন্তু অবাক যেন আমিও। ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহিত্যের খবর, বিশেষ করে সিনেমার খবরও আপনি রাখেন।

—আপনি নয়, তুমি বলুন। এখন আর খবর রাখি না, আগে আপনার ছবি এলেই দেখতে ছুটতাম...বই অবশ্য এ-পর্যন্ত একখানাও পড়িনি, তবে মেয়েদের আপনার লেখার ওপর খুব টান দেখেছি।

শ্রীমুখের অকপট কথা শুনে খুশি হলাম মনে মনে। হেসে বললাম, তুমি তো মেয়েদের মুখের দিকে তাকাও না, টান দেখলে কি করে?

বড় বড় দুই চোখ আমার মুখের ওপর থমকে রইল। অগোচরে কিছু আঘাত করে বসলাম কিনা জানি না। একটা মানুষকে এত শিগ্‌গীর এত ভালোও লাগতে পারে! আজ তো তবু আলাপ হয়েছিল, গতকাল বিনা আলাপেই ভালো লেগেছিল। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞাসা করলাম, আনন্দরূপ তোমার কোন আশ্রম বা গুরুর কাছ থেকে পাওয়া নাম?

—আমার নাম আনন্দরূপ মিত্র। এখনো পর্যন্ত কোন আশ্রম বা গুরু বলে কিছু নেই আমার।...আচ্ছা, আমি দুপুরে আসব, আপনারা রেডি থাকবেন, আর এখুনি একবার টেম্পারেচার নিয়ে দেখুন জ্বরটা নামল কি-না—

বলতে বলতে দাওয়া থেকে নেমে গেল। তারপরেও সেদিকে চেয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম খানিক। ...আমার নাম আর পরিচয় শোনার পরে ওই দুটো চোখে যেন বিস্ময় দেখেছিলাম একটু। তারপর

আবার যে-কে-সেই। যত কাছেই আসুক, এই ছেলে ভিতরে ভিতরে দূরের মানুষ। নাম বলল, আনন্দরূপ। পুরুষের ওই রূপ আনন্দের খনি হতে পারত। কেমন একটা বদ্ধ ধারণা হল এই ছেলের মধ্যে আনন্দের লেশ-মাত্র নেই। আর বাইরে যত ধীর- স্থিরই হোক ভিতরে ভিতরে ছেলেটা অশান্ত।

হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলাম, উলটো দিক থেকে একটি মেয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে এ-বাড়ির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

নাকে ঝকঝকে সাদা পাথর পরা সেই মেয়ে।

...আনন্দরূপকে এখানে ঢুকতে বা এখান থেকে বেরুতে দেখেছে হয়তো। তাই নিজের অগোচরেই এসে দাঁড়িয়েছে বুঝি।

আমার সঙ্গে চোখাচুখি। আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল আবার। ...এই সুশ্রী মেয়েও বিষণ্ণ।

সমুদ্র থেকে কিছু দূরে অথচ সমুদ্রের মুখোমুখি বাঁধানো রাস্তার ও-ধারে ছবির মত যে বাড়িগুলো দেখে স্ত্রীর চোখ জুড়িয়েছিল, আনন্দরূপ আমাদের তারই একটাতে এনে তুলবে ভাবতে পারিনি। আমার স্টেশান-ওয়াগন ফিরে গেছে, যাবার দিন স্থির করে আগে থাকতে চিঠি লিখলে আবার এসে নিয়ে যাবার কথা। দুপুরে আনন্দরূপ কোথা থেকে একটা গাড়িও ধরে নিয়ে এসেছে দেখে কত দূরে বাড়ি ঠিক করল ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করতে শুধু বলেছিল, কাছে, চলুন।

কিন্তু গাড়িতে তিন মিনিটও লাগবে না নতুন বাড়িতে উঠতে জানব কি করে। আসলে জ্বরো ছেলেকে পুশ-চেয়ারে আর বসিয়ে আনতে রাজী নয়। মনে মনে ওর বিবেচনার তারিফ করেছি, আর এটুকু থেকেই হৃদয় বোঝা গেছে।

ছেলের জ্বর আরো একটু বেড়েছে বই কমেনি। চারের কাছাকাছি ছুঁয়ে আছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আমরা চিন্তাচ্ছন্ন ছিলাম। কিন্তু বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড়াতে দুজনেই সাময়িকভাবে দুশ্চিন্তা ভুললাম। মেয়েরও খুসি-ভরা মুখ। স্ত্রী বলে উঠল, সেই বাড়িগুলোর একটা দেখি! আনন্দ-ভাই তোমার তো ভয়ানক প্রতিপত্তি এখানে—তিন ঘণ্টার নোটিসে এ-রকম বাড়ি!

ভাই বলুক আর যত অন্তরঙ্গতাই দেখাক ওই লোকের চোখ অন্যত্র! ছেলের শিয়রের কাছে বসে খানিক আগে সম্পর্কে স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়েছে আমার। সেই বৃদ্ধা আর সঙ্গের মেয়েটির কথা বলেছি, আর রমণীর মুখের দিকে না তাকানোর কথাও বলেছি। ওই শেষেরটুকু স্ত্রী নিজেও এরই মধ্যে লক্ষ্য করেছে।

প্রশংসায় কান না দিয়ে আনন্দরূপ গম্ভীর মুখে আমাকে বলল, কথাবার্তার আগে ছেলেকে সাবধানে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া দরকার।

আমি সঙ্গের লোক দুটোর একজনকে ইশারা করতেই আনন্দ আবার বাধা দিল, ওদের দরকার নেই, আপনি গাড়ি থেকে নামান, আমি ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

কে বলবে এই মানুষের সঙ্গে আজ সকালেও আলাপ পর্যন্ত ছিল না। আমার স্ত্রী স্বভাবত সুরসিকা নয়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে এমন কি অসময়েও গম্ভীর মুখে সে যে একটা কৌতুকের ব্যাপার করতে পারে, জানা ছিল না। দিব্যি বলে বসল, তাহলে তুমিই নামাও দুবার করে হাত-বদল করতে গেলে ওর কষ্ট হবে।

ছেলে তার মায়ের কোলে বসে। আমি আবার সশঙ্কে আনন্দরূপের দিকে তাকালাম। মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে পিছনের দরজার ভিতরে ঝুঁকে দুহাত বাড়াল। তারপর অতবড় ছেলেকে বাইরে এনে অনায়াসে পাঁজাকোলে করে হন হন করে আগে আগে বাড়ির দিকে চলল। গাড়ি থেকে নামতে নামতে স্ত্রী নীরবে শুধু আমার দিকে তাকাল একবার। আমি তার আচরণে প্রীত বটে, কিন্তু মাত্র একদিনের যোগাযোগে যেমন তড়িঘড়ি ওই লোককে আপনার করে নেবার আগ্রহ তার—ও লোক আবার বিগড়ে না যায়।

দুখানা বেশ সাজানো-গোছানো ঘর। সামনের বারান্দায় শৌখিন চেয়ার-টেবিল পাতা। এখানে বসলে সামনে সমুদ্র। দুপাশে ছোট একটু করে বাগানের মতো, মাঝখানে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত রাস্তা। দুঘরেই দুখানা করে গদির খাট। জামাকাপড় রাখার হ্যালফ্যাশানের আলনা। একটা ঘরে বড় আয়না বসানো সুন্দর ড্রেসিংটেবিল। অন্য ঘরে পরিষ্কার একটা মিট্‌সেফেও আছে। দুটো ঘরেই অ্যাটচ্‌ড্ বাথ—সেগুলোও ঝকঝকে পরিষ্কার। ঘরে ইলেকট্রিক আলো, পাখা।

যেখানে ছিলাম তার তুলনায় স্বর্গ। দেখলে মনে হবে না দশ মিনিট আগেও এ-বাড়ি তালাবন্ধ ছিল।

আনন্দরূপ ছেলেকে এনে সামনের ঘরের খাটে শুইয়ে দিয়েছে। ছেলের গলা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে দিয়েছে। যে কয়েক মিনিট আমরা ঘর দেখতে ব্যস্ত, সে ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে। আমরা ঘরে ঢুকতেই বলল, জ্বরটা নামল না, আমি একবার ডাক্তারকে খবর দিয়ে আসি।

বললাম, ভেব না, বোস। ছেলের দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন দেখছ ওকে?

জবাব দিল, মুখ দেখলে অত জ্বর বোঝা যায় না।

বললাম, আর একবারও টানা ছ'সাত দিন ধুম জ্বরে ভুগেছিল, কিন্তু মুখ দেখে কারো বোঝবার উপায় নেই যে অত জ্বর বা ছ'সাত দিন জল ছাড়া আর কিছুই খায়নি। যে দেখে বা শোনে সে-ই অবাক হয়।...যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে আমি জানি, চার-পাঁচ ডোজ না পড়া পর্যন্ত জ্বর নামবে বলে মনে হয় না।

ছেলে ঘাড় বেঁকিয়ে আমার কথা শুনছে। আগেরটুকু প্রশংসা ধরে নেবার ফলে ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। হালকা সুরে ওকেই বললাম, আবার হাসি হচ্ছে, অ্যাঁ? দ্যাখ, এই কাকা কেমন সুন্দর জায়গায় নিয়ে এলেন আমাদের ...এঁকে কি কাকা বলবি বল তো? আনন্দ কাকা?

ছেলে শোয়া অবস্থাতেই মাথা নাড়ল। ঠোঁটে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। বলল, সাধুকাক—

এই প্রথম আনন্দকে হাসতে দেখলাম আমরা। কিন্তু কতটুকু সময়ই বা তাকে দেখেছি, তবু কেমন মনে হল ও যেন অনেকদিন বাদে স্থান-কাল ভুলে এ-রকম হাসতে পেরেছে। ...ছেলের দিকেই চেয়ে আছে, নিঃশব্দ হাসিতে সমস্ত মুখ ভরে গেছে, টানা দুই চোখে স্নেহ যেন উপচে পড়ছে। পুরুষের এমন সুন্দর হাসিও দেখার জিনিস। আমি স্ত্রী মেয়ে সকলেই তাই দেখছি। অসুখ ভুলে একটা হাসির ছোঁয়া যেন সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়তে থাকল।

আমি সানন্দ বিস্ময়ে ছেলের দিকে তাকালাম, সাধুকাকা তোকে কে বললে?

লজ্জা, লজ্জা মুখে ও জবাব দিল, হরিদা যে দুপুরে বলেছিল, খুব ভালো সাধু, ওঁকে বলে তোমার অসুখ ভালো করে দেবে।

হরি ওর দুই বাহনের একজন। চকিতে আনন্দরূপের দিকে তাকালাম। ওর সুন্দর হাসির ওপরেই বেদনার ছায়া পড়ল। হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল। নিঃশব্দেই আবার একটা যন্ত্রণা যেন ওঠানামা করছে। পায়ে পায়ে শয্যার কাছে এগিয়ে গেল। ওর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিড় বিড় করে বলল, আমি কিছুই পারি না বাবা—

ছেলেটা তার মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।

ঘড়ি দেখলাম, চারটে বেজে গেছে। কে জানে কেন, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে স্ত্রীকে বললাম, আনন্দকে একটু চা-টা দাও কিছু—

আনন্দরূপ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। চায়ের দরকার নেই, আমি আসি এখন, সন্ধ্যার পর খবর নিয়ে যাব।

ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। —দাঁড়াও দাঁড়াও, কার বাড়ি ঠিক করলে, আগাম টাকা দিতে হবে কিনা কিছুই তো বললে না—

সোজাসুজি তাকালো, এ-চাউনি আদৌ প্রসন্ন মনে হল না। গলার স্বরও আগের মতোই গম্ভীর!—আপনার অবস্থা তো এমন নয় যে খরচ করতে পারেন না, এই ছেলে নিয়ে ও-রকম একটা ঘরে গিয়ে উঠেছিলেন কি করে?

স্পষ্ট অনুযোগ শুনেও কৌতুকই বোধ করছি—আমার অবস্থা অমন নয় তুমি জেনে ফেললে কি করে?

জবাব দেবার দরকার বোধ করল না।

হেসেই বললাম, ওই রকম ঘর জুটবে আগে থাকতে জানব কি করে?...তা বলে এমনটাও আশা করিনি। যাক, কি দিতে হবে বলো?

—টাকা দিতে হবে না, এ বাড়ি আমার জিম্মাতেই ছিল।

সে-কি! এবারে আমার আপত্তির পালা। এ বাড়ির মালিক তুমি নাকি?

—না।

—মালিক কোথায়?

—দিন কয়েকের জন্য মাদ্রাজ গেছেন, শীগ্‌গিরই আসবেন।

—এলে আমাদের উঠে যেতে হবে?

—না, তাঁর অন্য বাড়ি আছে। কিন্তু এ-সব নিয়ে আপনি এত ভাবছেন কেন?

স্পষ্ট আপত্তির সুরে বললাম, ভাবছি এই জন্যে যে, তোমার কথা আলাদা—কিন্তু আর কারো কাছে আমাকে তুমি ঋণী কোরো না।

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলল, তিনি মাদ্রাজ থেকে ফিরলে কথাবার্তা বলে ঠিক করে নেওয়া যাবে।

খুশি হয়ে বললাম, বেশ...কিন্তু এক পেয়ালা চা-ও হবে না? আমাদের এখানে খেতে তোমার বাধা আছে কিছু?

আন্তরিকতার আবেদন একটু আছেই। তবু বিরক্তির সুরেই জবাব দিল, বলেছি তো আমি সুধা-সন্ন্যাসী কিছু নই, বাধা আবার কি থাকবে।

—তুমি বললেই তো হবে না, পালটা গাম্ভীর্যে বশ করার চেষ্টা, আমার ছেলে বলেছে, তুমি সাধুকাকা।...চা-টা আনবে কি আনবে না, বলো, আমার সত্যি খিদে পেয়েছে।

—আনতে বলুন।

যিনি আনবেন অর্থাৎ আমার স্ত্রী দু'হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে। অথচ লোকটা আর উপস্থিত সম্পর্কেও নিরাসক্ত। স্ত্রীর দিকে ফিরে বললাম শুনছ? আনতে বলেছে—

ভুরু কুঁচকে একবার আনন্দের দিকে তাকিয়ে খুশিমুখেই স্ত্রী ও-ঘরে চলে গেল। অসুস্থ ছেলের জন্যে এরকম একটা বাড়ি পেয়েই স্বস্তি বোধ করছে না শুধু, বিদেশে এ-হেন লোককে সহায় পেয়েও তার দুর্ভাবনা কমেছে! তাছাড়া ছেলের যখন তখন শরীর বিগড়নো দেখেও সে অনেকটা অভ্যস্ত এই ক'বছরে।

হরি ওরা চায়ের জল চড়িয়েই দিয়েছিল বোধহয়। মিনিট আট-দশের মধ্যেই ও-ঘরে আমাদের ডাক পড়ল।

টেবিলে দুটো ডিশে খাবার দেওয়া হয়েছে। একটা ডিশে ডবল খাবার, সেটা যে আনন্দর জানা কথাই। কারণ বেলায় খাবার ফলে আমার যে সত্যিই খুব খিদে পেতে পারে না সেটুকু বোঝার বুদ্ধি রমা, মানে আমার স্ত্রীর, আছে।

চেয়ারে বসেই আনন্দরূপ ঘোষণা করল, এত খেতে পারব না কমাতে বলুন।

রমা তখনো সামনেই দাঁড়িয়ে। আনন্দরূপের চোখ তার উলটো দিকে। গম্ভীর মুখে রমাও আমাকেই বলল, যা পড়ে থাকে থাকবে, তুমি আরম্ভ করতে বলো।

আমি হেসে ফেললাম। কিন্তু আনন্দের গম্ভীর মুখে একটাও হালকা রেখা পড়তে দেখলাম না। রমা চলে গেল আর দু'মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে চায়ের পট টেবিলে রাখল। আগে ঢাললে জুড়িয়ে যাবে।

সামনের দিকে অর্থাৎ কারো দিকে না তাকিয়েই বলল, অভয় পেলে ছেলে সাধুকাকাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম।

ছেলেটা জ্বরে পড়ে যেতে সমস্ত দিন মনমেজাজ খারাপ ছিল। ফলে এই সরস পরিবেশটুকু ভালো

লাগছে। কিন্তু হাসতে সাহস করলাম না। খাবার ডিশের দিকে হাত বাড়িয়ে আনন্দ এবার প্রত্যক্ষ অনুমোদন জানালো।—বলুন।

স্ত্রীর মুখখানাও দেখলাম ছদ্মগাম্ভীর্যে ভরাট। 'তুমি' ছেড়ে সবিনয়ে হঠাৎ 'আপনি' করে বলল। জিজ্ঞাসা করল, আপনার বয়েস কত?

খাবারের দিকে চোখ রেখেই আনন্দরূপ সামান্য ভুরু কোঁচকালো। অর্থাৎ তুমি ছেড়ে আপনি করে বলাটা লক্ষ্য করেছে এবং পছন্দ হয়নি। জবাব দিল, একচল্লিশ।

স্ত্রী তো বটেই, আমিও অবাক একটু। স্ত্রী বিস্ময় চাপতে পারল না।—ও মা, আমি তো ভেবেছিলাম সাতাশ-আটাশ!

বিনা মন্তব্যে আনন্দরূপ খাবার মুখে তুলেছে। মুখ গম্ভীর করে রমা আবার বলল, তা হলেও ছেলের সাধুকাকার থেকে আমি আট বছরের বড়, ঊনপঞ্চাশের ধাক্কা চলেছে—যাক,আমার জানতে ইচ্ছে করছে ঘেন্নায় অত বড় বউদির দিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে থেকে অপমান করতে হবে এ-রকম মন্ত্র সাধুকাকার কানে কে দিলেন?

মনে মনে আমি রমাকে একটু তারিফ না করে পারলাম না। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছি, আনন্দরূপের খাবার চিবুনো বন্ধ হয়ে গেছে। ওই মুখে বেদনার ছায়া পড়ছে। আস্তে আস্তে মুখ ফেরাল, শান্ত গভীর দুই চোখ রমার মুখের ওপর রাখল।—আপনাদের নয় বউদি, ঘেন্না আর অপমান আমি নিজেকে করি।

আমি অপ্রস্তুত। রমাও হকচকিয়ে গেল কেমন। মৃদু গম্ভীর গলার স্বরে যে বেদনা ঝরল সে শুধু অনুভবের বস্তু। সামাল দেবার জন্য রমা বলে উঠল, তুমি নিজের সম্পর্কে যত খুশি ভুল কর গে যাও, আমার দিকে না তাকালে আমি তাই ভাবব।

আনন্দর পক্ষ নিয়ে আমি বললাম, তোমার কি তাকানোর মত মূর্তি একখানা?

—বেশ। ঠাট্টায় কান না দিয়ে ও আন্তরিক সুরে আনন্দকে বলল, ছেলেটার শরীর সুস্থ নয় আঁচ করেও আজই ওই বিবেকানন্দ শিলায় ঠেলে নিয়ে গেল আর ছেলেটা জ্বরে পড়ল বলে তোমার দাদার ওপর আমি রেগে গেছিলাম—কিন্তু তারপর মনে হয়েছে ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন, ছেলের জ্বর ঘরে বসেও হতে পারত—সমুদ্রের পাহাড়ে না গেলে তোমাকে এ-ভাবে পেতাম না—ওই বারোয়ারী ঘর ছেড়ে হয়তো কন্যাকুমারী থেকেই আগে পালাতে হত আমাদের। বোসো ছেলেটাকে একবার দেখে আসি—

মনের মতো কাউকে পেলে স্ত্রীটি যে বেশ গুছিয়ে কথা কইতে পারে এও প্রায় এক নতুন অভিজ্ঞতা আমার। আনন্দরূপ নিবিষ্ট গাম্ভীর্যে খেয়ে উঠেছে। মনে হল, ও কিছু ভাবছে।

একটু বাদে ফিরে এসে রমা হাসিমুখে এবার আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল আচ্ছা আজ সকালে তো মাত্র আনন্দকে প্রথম দেখলাম, এরই মধ্যে ওকে এত আপনার জন মনে হয় কেন?

জবাব দিলাম, চেহারাখানার জন্য।

স্ত্রী হেসে উঠল প্রথম, তারপর হেসে বলল, তা সত্যি দেখলে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না—

আশ্চর্য, খুশি হওয়া দূরে থাক, আবারও একটা বেদনার ছায়া স্পষ্ট দেখলাম ওর মুখে। আমি লেখক, মানুষটার সম্পর্কে আমার কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়ছে। প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কতদিন এখানে আছ আনন্দ?

—বছর আড়াই।

—তার আগে কলকাতায় ছিলে?

—তার আগে মাস ছ'সাত এদিক-সেদিক ঘুরেছি।

—এদিক-সেদিক বলতে পাহাড়-জঙ্গলে?

জবাব দিল না, মুখ তুলে একবার তাকালো শুধু।

আমি নিরীহ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালাম।—আনন্দকে আর কিছু দেবে কিনা জিজ্ঞেস করো।

এবার ওকে সত্যিই অপ্রস্তুত হতে দেখলাম একটু। ডিশ প্রায় খালি সেটা যেন ও এই প্রথম খেয়াল করল। অল্প হেসে বলল, অনেকদিন পরে আদরের খাওয়া তো—

—খাবে বলেই তো দেওয়া হয়েছে। রুষ্ট চোখে রমা আমার দিকে ফিরল।—তুমি এমন করো লোককে! কিছু না বললে আমি চুপচাপ ঠিক এনে দিতাম—আর কি নেবে!

—না অনেক হয়েছে, চা দিন।

এবারেও ছেলের জ্বর নীচের দিকে মোড় ঘুরল পাঁচ দিনের দিন। তার আগে পর্যন্ত আনন্দরূপ দুশ্চিন্তায় অস্থির। দুবার করে ডাক্তার আনছে, ওষুধপত্র আনছে, ফল আনছে। যে দুদিন চারের ওপর জ্বর উঠেছিল, ওকে এ-ঘর থেকে নড়ানোই যায়নি। সমস্ত রাত ছেলের শিয়রে বসে কাটিয়েছে। আর এমন সঙ্গী পেয়ে ছেলেও তাকে সহজে ছাড়ার পাত্র নয়।

এখানে দিনের আর রাতের আহার, এবং সকাল বিকেলের চা-জলখাবারের ব্যবস্থাটা ওকে হাল ছেড়ে মেনে নিতে হয়েছে। এটা অবশ্যই আমার স্ত্রীর ক্রেডিট। আমার সঙ্গে কথাবার্তায় আনন্দরূপ অপছন্দের কিছু করলে বা বললে স্পষ্টই বিরক্ত হয়, এমন কি ধমকের সুরে জবাবও দেয়। কিন্তু ওর বউদি তেমন কিছু করলে বা বললে চুপ করে থাকে, আর বেশি জুলুম করলে হাল ছেড়ে হার মানে।

ওই চার পাঁচ দিন চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় সর্বক্ষণই এখানে কাটিয়েছে। রাতে ওর শোবার ব্যবস্থা শুনেছি মন্দিরের পাশে সমুদ্রের মুখোমুখি ঢাকা অলিন্দে। স্ত্রী বহুবার বলা সত্ত্বেও এখানে থাকার কথায় কান পাতেনি। কিন্তু জ্বরটা নামতে না দিয়ে রাতে যাবার ব্যাপারে ক'দিন বাদ সেধেছে ওই ছেলেই। অত জ্বরের মধ্যেও তার স্পষ্ট কথা, সাধুকাকা, তুমি যাবে না—

পাশের ঘরে যেটুকু গড়িয়ে নিয়েছে তাও মেঝেতে কম্বল পেতে। বিছানায় শোয়ানো যায়নি। অথচ এটা যে কৃচ্ছসাধন সেটা আমার চোখে ধরা পড়েছে। অন্যমনস্ক করে দিতে পারলে ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বেশ রুচি আছে। অর্থাৎ আমি নিঃসংশয়, ভালো খেয়ে আর ভালো থেকেই এই মানুষ অভ্যস্ত। ওর খাওয়ার প্রসঙ্গে আমার ধারণার কথা স্ত্রীকে বলতে সে সভয়ে থামিয়ে দিয়েছে, চুপ-চুপ, কানে গেলে রক্ষা নেই!

তৃতীয় দিনে আনন্দরূপ রেগেই গেল আমার ওপর। তিপান্ন মাইল পথ ভেঙে ত্রিবান্দম থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসার প্রস্তাব নাকচ করেছি, সেই রাগ। বলেছে, টাকার জন্যে ভাবছেন?

—দরকারের চারগুণ টাকা আমার সঙ্গে থাকে, তা ছাড়া ট্রাভ্‌লার্স চেকও আছে—টাকার জন্যে নয়, আর দুটো দিন দেখো না।

—কিন্তু বউদি বলছিলেন জ্বর থাকা মানেই আরো বেশি মাস্‌ল্‌ নষ্ট হওয়া ওর।

সায় দিতে হয়েছে। বলেছি, সেটা সত্যি কথা, কিন্তু এই অসুখ হলে আর পাঁচটা উপসর্গ লেগেই থাকে, রেজিসট্যান্স পাওয়ার কিছু নেই তো!...তবু আমার ধারণা জ্বর এবার এক-আধ দিনের মধ্যেই নীচের দিকে নামবে।

ও বিরক্ত হয়ে বলে উঠেছে, আপনি লেখক, অসুখ-বিসুখ নিয়ে আপনার ধারণা করতে যাওয়ার দরকারটা কি?

রাগ না করে হেসেই জবাব দিয়েছি, অভিজ্ঞতার থেকে বলছি, দেখোই না দুটো দিন—ইনি ঠিক চিকিৎসাই করছেন।

ডাক্তারটির সম্পর্কে সত্যিই শ্রদ্ধা বেড়েছে আমার। কতটা জানেন উনি বা রোগীর প্রতি কতটা দরদ মুখ দেখে বোঝা যাবে না। উলটে মনে হবে হাতুড়ে পণ্ডিত। কিন্তু ভুল ভাঙতে বেশি সময় লাগে না। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এ-রকম জায়গায় পড়ে থাকলেও আধুনিকতম চিকিৎসার ব্যাপারে বেশ ওয়াকিবহাল তিনি। কৌতূহলবশত এঁর সম্পর্কেও খোঁজ নিয়েছি আনন্দের কাছে। ওঁর সঙ্গে এইখানেই আলাপ তার। আনন্দ বলেছে, উনি মহীশূরের মানুষ, সেখানেই প্র্যাকটিস করতেন। দিন-রাত খাটতেন পয়সাও প্রচুর রোজগার করতেন। দুটো ছেলে আর দুটো মেয়ে ছিল, আর স্ত্রী ছিল। একটি মেয়ে আর স্ত্রী আগেই মারা গেছিল। ট্রেন দুর্ঘটনায় দু'টি ছেলে আর বাকি মেয়েটিও একসঙ্গে শেষ। এরপর ডাক্তারটি হঠাৎ অনুভব করলেন, ওই যে বয়েসকালের চারটি ছেলেমেয়ে চলে গেল তাদের সঙ্গে তাঁর যেন এ-যাবতকাল ভালো করে চেনাজানাই হয়নি—ওরা একজনও তেমন কাছের

কেউ কিছু ছিল না। এমন কি স্ত্রীও না। তিনি শুধু প্রতিষ্ঠা আর পয়সার পিছনেই ছোটাছুটি করেছেন, ফলে যারা চলে গেল তাদের জন্যে তেমন শোকাবিষ্ট পর্যন্ত হতে পারছেন না। সেই থেকেই পরিবর্তন। চিকিৎসাটাকে মোটামুটি নিঃস্বার্থ সেবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা।

রমা কখন পিছনে এসে চুপচাপ শুনছিল। বড় নিঃশ্বাস ফেলে মন্তব্য করেছে, কি বিষম দুঃখের জীবন ভদ্রলোকের...কত রকমের আঘাত পেয়ে কতজন কোথা থেকে কোনদিকে ফেরে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

আনন্দরূপের দিকে চেয়ে হঠাৎ সচকিত আমি। মুহূর্তের মধ্যে ওই সুন্দর মুখ থমথমে একেবারে। তারই মধ্যে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার নীরব নিষ্পেষণ শুরু হয়েছে যেন। আমি লক্ষ্য করছি টের পেয়েই হয়তো উঠে বারান্দার দিকে চলে গেল।

স্ত্রীও বিমূঢ় খানিকক্ষণ। ফ্যাল-ফ্যাল করে আমার দিকেই চেয়ে রইল সে।

দুদিন বাদে সত্যিই ছেলের জ্বরটা নামতে আনন্দ একটু ঠাণ্ডা। কিন্তু চোখে তখন অন্য বিস্ময়। বলল, আপনি ঠিক কথাই বলেছিলেন দাদা, এত ভুগে উঠল তার ওপর খাওয়া নেই—অথচ তাজা মুখ—একটুও বোঝা যায় না।...এ-রকম কি করে হয়!

আমি মাথা নাড়লাম, কি করে হয় আমি জানি না।

লেখক সম্পর্কে ওর ভক্তি-শ্রদ্ধা কমই ধরে নিয়েছিলাম। পাশের ঘর থেকে সেদিন বউদির সঙ্গে ওর কথা শুনে কান জুড়িয়ে গেল। অবশ্য আমারও সেদিন মেজাজপত্র ভালো ছিল। খানিক আগে এই বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে এসেছিল আনন্দ, ভদ্রলোক কিছুই নিতে চাননি, আনন্দর কথায় আমি পনেরো দিনের জন্য সাড়ে তিনশো টাকা জোর করে গছিয়ে দিয়েছি। তিনি চলে যেতে হৃষ্টচিত্তে পাশের ঘরে একটা চিঠি লিখতে বসেছি। রমার গলা কানে এলো, তোমার কল্যাণে কত দিকে সুবিধে হল ঠিক নেই—এমন বাড়ি, সাড়ে তিনশো টাকা কিছুই নয়—

আনন্দর জবাব কানে এলো, সুবিধে চাইলে তো বিনে পয়সাতেই থাকা যেত—দাদা এ ব্যাপারে কেমন লোক সে আমি প্রথম দিনেই বুঝে নিয়েছি।

রমার কৌতূহল।—কি বুঝেছ!

—প্রথম দিন কি করেন জিজ্ঞাসা করতে শুধু বললেন খবরের কাগজে চাকরি। লেখক ছেড়ে অতবড় কাগজের সাহিত্য-সম্পাদক সে-কথাও বলেননি। বাড়ির ব্যাপারে নাম না জিজ্ঞাসা করলে জানতেও পারতুম না এমন একজন লেখকের সঙ্গে কথা বলছি—আর তখনই বুঝে নিয়েছি দাদা আর যাই হোক কারো কাছ থেকে সুবিধে নেবার মানুষ নন।

আমি এ-ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলাম, আনন্দকে শিগ্‌গীর রাজভোগ এনে খাওয়া!

আমরা নয়, ছেলেই ভাল রকম আটকেছে সাধুকাকাকে। ক্ষণে ক্ষণে চোখে হারায়। বেরুবার আগে তাকে ওর অনুমতি নিয়ে যেতে হয়। কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে কতক্ষণে ফিরবে সেই ফিরিস্তি না দিলে ছুটি নেই। আমরা সানন্দে লক্ষ্য করছি ওর জুলুম আনন্দরূপ হাসিমুখেই মেনে নেয়। ওকে কথা দিলে কথা রাখে। দুজনে সমবয়সীর মতো গল্প করে। এ-বাড়িতে ওর রাতের শোবার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে ছেড়েছে। আমরা খুশি তো বটেই, কিন্তু ভিতরে তিরে চিন্তাও ধরে গেছে, পনেরো দিনের সাত দিন তো কেটে গেল, আর আট দিনও দেখতে দেখতে চলে যাবে—তারপর ছেলেটাকে সামলানো শক্ত হবে। ও-মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাঁদবে। মনের মত করে যে ওকে সঙ্গ দেয়, সে-ই ওর সব থেকে প্রিয়—কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে মনে রাখতে চেষ্টা করে। অসম বয়সের এমন অনেক হারানো বন্ধু আছে ওর—কিন্তু আনন্দের মত যেন কেউ নয়।

বিকেল তখন সাড়ে চারটে হবে। ছেলেকে সমুদ্রের দিকের বারান্দায় এনে বসানো হয়েছে। ওর দ্বিতীয় বাহন জগুয়ার সঙ্গে মেয়ে সমুদ্রের দিকে বেড়াতে গেছে। রমা ছেলের কাছে এসে বসলে আমরাও একটু ঘুরে আসব। ছেলেকে কথা দেওয়া হয়েছে আর দুদিন বাদে সে-ও সমুদ্রের ধারে যাবে। এ নিয়ে ও জুলুম করে না।

অদূরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসেছিলাম আমি, কিন্তু কানটা ওদের দিকেই ছিল। ছেলে জিজ্ঞাসা করছে, আচ্ছা সাধুকাকা তুমি পুজোও করো না, মন্ত্রও পড়ো না?

—না। তুই আমাকে সাধুকাকা বলিস কেন, শুধু কাকা বলতে পারিস না?

—তাহলে তোমার এ-রকম ধবধবে সাদা জামাকাপড় কেন, আর কাপড় এ-রকম করে পরো কেন?

—এমনি। সাধুদের তো গেরুয়া জামাকাপড় থাকে।

—ব্রহ্মচারীদের ও-রকম সাদা জামাকাপড় থাকে, হরিদ্বারে দেখেছি—তুমি ব্রহ্মচারী?

—না, আমি ব্রহ্মদৈত্য।

ছেলে হেসে উঠল। আনন্দও হাসছে। কি ভাবে ছেলে আবার জিজ্ঞাসা করল, সাধুকাকা তুমি অনেক জায়গায় হেঁটে বেড়িয়েছ?

—বেশি না। কেন?

—আমি বড় হলে আর ভাল হয়ে গেলে খুব হেঁটে বেড়াব দেখো, হেঁটে এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যাব।

—যাস। কিন্তু তুই কবে ভালো হবি?

জিজ্ঞাসা নয়, আমার কানে আনন্দর যেন একটা আকুতি বাজল।

—কি জানি। একদিন না একদিন মা তো আমাকে ভালো করে দেবেই—তখন হেঁটে হেঁটে সব জায়গায় যাব আর সকলকে মায়ের কথা শোনাব—তাই না:

আড়চোখে চেয়ে দেখি আনন্দর সমস্ত মুখ থমথমে হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সেদিকে খেয়াল না করে ছেলে বলে চলেছে, কিন্তু মা যে কেন এত দেরি করছে ভালো করে দিতে—বেশিক্ষণ বসলেও কোমরে ব্যথা ধরে এখন, আচ্ছা সাধুকাকা, ভাল ভাল লোকের তো মা-কে বললে কাজ হয়, তুমি মা-কে বলতে পারো না?

ছেলের দিকে থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছে আনন্দরূপ। বিড় বিড় করে জবাব দিল, আমি ভালো লোক নই বাবা।

ছেলে হেসে উঠল। যেন এমন অসম্ভব কথা আর শোনেনি।

রমা বারান্দায় এসে আনন্দের দিকে চেয়ে অবাক। ওর সমস্ত মুখে যেন একরাশ রক্ত উঠে জমাট বেঁধে আছে। স্ত্রী সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকাতে আমি নীরবে নিষেধসূচক ইশারা করলাম। অর্থাৎ, কিছু জিজ্ঞেস করো না।

উঠে দাঁড়ালাম, ছেলেকে বললাম, এবারে আমরা একটু ঘুরে আসি, কেমন?

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের ধারে এলাম আমরা। একটা বড় পাথর বেছে নিয়ে বসলাম, আনন্দকেও বসতে বললাম। কিছুক্ষণ তিন সমুদ্রের সঙ্গমের দিকে চেয়ে থেকে আনন্দ পাথরের আর একধারে এসে বসল। ওর সমস্ত মুখ থমথম করছে তখনো।

পুবের দিকে মুখ করে বসে আমি। সূর্য তখনো অনেক ওপরে তবে পশ্চিমের দিকে তার যাত্রা শুরু হয়েছে বোঝা যায়। আনন্দর চোখ উলটো দিকে, অর্থাৎ সঙ্গমের দিকে। একটু মাথা ঘোরালে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে পারে। কিন্তু আমার দিকেও তাকাচ্ছে না।

হঠাৎ প্রায় রুক্ষস্বরেই জিজ্ঞাসা করল, এখানে এসে কন্যাকুমারীর পুজো দিয়েছেন?

—তোমার বউদি দিয়েছেন।

আবার চুপ কিছুক্ষণ। তারপর আবার প্রশ্ন। ছেলেকে নিয়ে এ পর্যন্ত কোথায় কোথায় ঘুরেছেন?

—অনেক জায়গায়। জায়গাগুলোর নাম করলাম। বলাবাহুল্য, সবই তীর্থক্ষেত্র।

অনুচ্চ কঠিন গলার স্বরও ফেটে পড়ার মতো।—কেন ওই ছেলেকে নিয়ে-এভাবে ঘোরেন? আপনি কি আশা করেন কোন দেব-দেবী কিছু একটা অলৌকিক কাণ্ড করে ছেলে ভালো করে দেবে?

...না।

—তাহলে ও এ-রকম আশ্বাস পেল কি করে?

জবাব দিলাম, ওর মা বলে থাকবে।...কেন, তুমি কি মনে করো এর থেকে চরম সত্যটাই ওর জেনে রাখা ভালো ছিল?

—না, না না! এত বাতাসেও হঠাৎ দম বন্ধ হবার উপক্রম যেন ওর। একটু ঠাণ্ডা হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমি আপনার আর বউদির কথা জিজ্ঞাসা করছি—জিজ্ঞাসা করছি কারণ, আপনারা আমার অনেক ক্ষতি করেছেন, ঘুমের মধ্যে ছেলেটার মুখ দেখি—আপনারা কোন্ আশায় এমন রুগ্ন ছেলে নিয়ে দূর-দূরান্তের দেব-দেবীর স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

সোজা ওর মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বললাম, আচ্ছা, আগে আমার একটা কথার জবাব দিও। আমরা তোমার কেউ না, পরিচয়ও জানতে না—আমাদের দেখেও তুমি সরে গেলে না কেন? যেতে পারলে না কেন?

বিরক্তির সুরে জবাব দিল, আপনাদের দেখে নয়—ওই ছেলেকে দেখে, ও আমাকে অদ্ভুতভাবে টানল বলে।

বললাম, ঠিক এই আশাটুকু নিয়েই আমরা বেরোই।

সঠিক বুঝতে পারল না। চেয়ে রইল।

আস্তে আস্তে বলে গেলাম, দেখো আনন্দ, ওই ছেলের জন্যে আমরা নিঃশব্দে অনেক কেঁদেছি, আবার ওর ওই মুখের দিকে চেয়েই কান্না বন্ধ করেছি।...যখন দেখা গেল সমস্ত রকমের চিকিৎসা এখন পর্যন্ত এই রোগের কাছে হার মেনে আছে, স্বভাবতই আমার স্ত্রী দৈবের ওপর নির্ভর করতে লাগলেন। হাজার হাজার টাকা খরচ করার পরে তিনিও থমকে গেলেন। কিন্তু সর্বত্র আমরা একটা কথা শুনেছি—ওর ঠিকুজীতেও নাকি তাই আছে—এ ছেলের জীবনে অলৌকিক কিছু ঘটবে, দৈব অনুগ্রহে এ-রকম অসম্ভব ফাঁড়া ও কাটিয়ে উঠবে।...এই থেকেই আমার মাথায় একটা অন্য চিন্তা এলো। অলৌকিক বা মিরাকল্ যদি কিছু ঘটে তো এই দেশেই তা ঘটতে পারে—আর এই দেশের মানুষই তা ঘটাতে পারে। কিন্তু যারা দৈব নিয়ে ব্যবসা করছে, যারা দৈবশক্তির ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের কারো দ্বারা কিছু হবে না। ওকে দেখে লোকের কত সহজে মায়া পড়ে অনেক বারের সেই চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ফলেই একটা আশা বুকের তলায় চেপে আমি বেরিয়ে পড়ি—যদি সত্যিই কোনো অজানা অচেনা মহাপুরুষের চোখে ও পড়ে যায়, ওকে দেখে যদি তার মায়া পড়ে—আমি হয়তো জানতেও পারব না কে কি করে গেলেন, অথচ হয়তো দেখব ছেলে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠেছে—আমি কাউকে একথা বলি না, কারণ এ শুনলেও লোকে আমাকে পাগল বলবে।

দুজনের কারো মুখে একটা কথাও নেই আর। সামনে সমুদ্র অবিশ্রান্ত মাথা খুঁড়ছে। সাঁ-সাঁ বাতাসে আনন্দর গায়ের চাদর উড়ছে, আমার জামা-চুল উড়ছে।

অনেকক্ষণ বাদে একসময় সচকিত হয়ে দূরে পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকালাম। লালচে সূর্যটা সমুদ্রের তিন-চার হাত মাত্র ওপরে মনে হল। আকাশ আর সমুদ্র একসঙ্গে যেন রং বদলের খেলায় মেতে উঠেছে।

দেখতে দেখতে ওই সূর্য জল স্পর্শ করল, তারপর আস্তে আস্তে ডুবতে লাগল।

ডুবে গেল।

আনন্দকে একটু ভালো করে খাওয়ানোর জন্যে জগুয়াকে নিয়ে সকালে নিজেই বাজারে বেরুনোর উদ্যোগ করছিলাম। স্ত্রী কাছে এসে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, আনন্দর কি হয়েছে বল তো?

চকিত হয়ে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

—কাল বিকেল থেকেই তো ভয়ানক গম্ভীর দেখছি, রাতেও কারো সঙ্গে কথা বলল না। মাঝরাতে ঘুম ভাঙতে কেন যেন মনে হল বারান্দায় কেউ বসে আছে—উঠে গিয়ে দেখি ঠিক তাই। একখানা পাথরের মতো আনন্দ বসে। তোমার সঙ্গে কাল কিছু নিয়ে কথা হয়েছে?

কি কথা হয়েছে বললাম। তার আগে ছেলের সঙ্গে ওর কি কথা হচ্ছিল তাও জানলাম।

একটু অবাক সুরে রমা বলল, রাত্রিতে ও হঠাৎ এরকম করল কেন...

—কি করেছে?

—কিছু করেনি, আমার সাড়া পেয়ে ভয়ানক চমকে উঠল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে বলতে হবে—দাদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

ও জবাব দিল—আমার মত পাষণ্ড তাও পারে বউদি। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, আড়াই বছর ধরে কন্যাকুমারীতে আছি, সব সময় মনে হতে কিছু পেলাম না, এখন আর সে-কথা বলতে পারব না—দাদাকে পেয়েছি।

হেসে উঠে বললাম, আমার কদর বুঝে এবার থেকে তুমিও তাহলে আমাকে একটু-আধটু চিনতে চেষ্টা কর।

—আ-হা, শোনই না তারপর। ...একটা চেয়ার টেনে যেই আমি ওর পাশে বসতে গেলাম ও-যেন হঠাৎ ধমকে উঠল আমাকে, বলল, বসতে হবে না, ঘরে যান। আমি অবাক। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, আমি বসলে তোমার কি অসুবিধে? ও-ওইরকম করে বলল, অনেক অসুবিধে, আপনি ঘরে যান এখন!

—তারপর? শুনে আমি অবাক একটু।

—তারপর আর কি, সুড়সুড় করে ঘরে চলে এলাম। আরো একটু সরে এসে ফিস ফিস করে রমা বলল, আমার সেই থেকে কেবল মনে হচ্ছে ওর জীবনে মেয়ে-ঘটিত ভয়ানক কিছু একটা ব্যাপার আছে...তুমি বার করতে চেষ্টা করো না?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আজ তোমার সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার করেছে?

—আমার সঙ্গে এখনো পর্যন্ত কোনো কথা হয়নি, ছেলের সঙ্গে দিব্যি কথা কইছে। তবে কালকের থেকে আজ অনেক ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে।

রাস্তায় নেমে আনন্দর কথাই ভাবছিলাম। স্ত্রীর যেটা আজ মনে হল, আমার আগেই তাই মনে হয়েছে। কোনো মেয়ের কাছ থেকে বড় কোনো আঘাতের ক্ষত পুষছে ওই ছেলে।...কিন্তু কাল রাতে হঠাৎ স্ত্রীর সঙ্গে ওই আচরণ কেন ভেবে পেলাম না।

—নমস্তে বাবুজী।

থমকে দাঁড়ালাম। সামনে সেই বৃদ্ধা, আর তার কিছু দূরে নাকে সাদা পাথর পরা সেই অল্পবয়সী সুশ্রী মেয়েটি, সে-ও আমার দিকেই চেয়ে আছে, দুই চোখে অব্যক্ত কিছু মিনতি।

বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে নীরবে দুহাত যুক্ত করলাম।

তার ভাঙা-ভাঙা হিন্দী শুনে বোঝা গেল ওটা তার ভাষা নয়। ভয়ে-ভয়ে খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করল, বাবুজী, ওই আনন্দজী কি তোমার আপনার লোক?

কৌতূহল চেপে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন বলো তো?

সে সবিনয়ে জানালো, আনন্দজীকে কদিন ধরে আর মন্দিরে দেখা যাচ্ছে না, সমস্ত দিন এ বাড়িতেই আছে লক্ষ্য করেছে তারা, এখন আনন্দজী এখানে আমার অসুস্থ ছেলেকে ভালো করার জন্য আছেন, নাকি আমাদের কোনো আত্মীয়—সেটাই জিজ্ঞাস্য।

এমন মিনতি-মাখানো জিজ্ঞাসাও কম শুনেছি বোধহয়। জবাব দিলাম, আত্মীয় না হলেও আমার ছোটভাইয়ের মতই।

শোনামাত্র বৃদ্ধা সাগ্রহে আমার পায়ের ধুলো নেবার জন্য সামনে ঝুঁকল। আমি সভয়ে পিছু হটলাম। বৃদ্ধা তক্ষুনি পিছন ফিরে হাঁক দিল, রাধা। সঙ্গে সঙ্গে আঙুল তুলে ওই মেয়েটিকে কাছে আসতে ইশারা করল।

পায়ে-পায়ে মেয়েটি এগিয়ে এলো। বৃদ্ধা কোন্ ভাষায় কি বলল, তাকে আমার একটুও বোধগম্য হল না। বৃদ্ধা কথা শেষ হতে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো একবার। বড় মিষ্টি অথচ করুণ চোখ। অনেকখানি নত হয়ে দুহাত জুড়ে প্রণাম জানালো। একটু আগে ও-ভাবে সরে যেতে ভরসা করে পায়ে

হাত দেবার জন্য এগুলো না বোধহয়। সত্যিই সুশ্রী মেয়ে, লম্বা গড়ন, স্বাস্থ্য । নাকের ঝকঝকে সাদা পাথরটাও সুন্দর মানিয়েছে।

বৃদ্ধা হাত জোড় করে অনুনয় করল, বাবুজী আমাদের কিছু কথা আছে, তুমি দয়া করে একটু শুনবে? আমার এই নাতনির মরা-বাঁচা তোমার ওপর নির্ভর করছে বাবুজী। আমাদের সত্রম্-এ একটিবার আসবে, আধঘন্টার বেশি তোমাকে আটকাব না বাবুজী।

আনন্দরূপ এদের কিছু করুণ আবেদন উপেক্ষা করেছে জেনেও কে জানে কেন আমি তা করতে পারলাম না। জগুয়াকে বাজার সারতে বলে তাদের সঙ্গে চললাম। ওদের মুখ দেখে মনে হল ভাবছে সত্যিই বুঝি দেবী মুখ তুলে তাকিয়েছে।

কাছেই ওদের-বে-সরকারী সত্রম্। টানা একতলা দালান একটা, একখানা করে ঘরে যাত্রীদের সাময়িক আবাস। এদের ঘরখানা ছোট, কিন্তু বেশ ছিমছাম পরিষ্কার। দেয়ালে টাঙানো বড় একখানা কুমারী কন্যার রঙিন ছবি—এখানকারই কেনা সম্ভবত। ঘরের সামনে ছোট্ট এক টুকরো বারান্দা, সেখানে বসলে বা দাঁড়ালে সামনে সমুদ্র।

ঘরের দুদিকের দেয়ালে দুটো খাটিয়া। বৃদ্ধা তার একটাতে পরম সমাদরে বসালো আমাকে। নিজে সামনের মেঝেতে বসে পড়ল। নাতনি ঘর ছেড়ে ওই ছোট্ট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আমার মনে হল কন্যাকুমারীর মতো এই স্বাস্থ্যবতী কন্যাটিরও কিছু একটা দীর্ঘ প্রতীক্ষার তপস্যা চলেছে। স্থির অথচ তারই মধ্যে একটু বেঁকে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটিও সুন্দর।

বৃদ্ধা ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে এরপর ওই মেয়ের সম্পর্কে যে চিত্রটি এঁকে দিল সেটা অভিনব এমন কিছু নয়, কিন্ত মেয়েটি ওই সামনে দাঁড়িয়ে বলেই সম্ভবত মর্মস্পর্শী মনে হল আমার।

বৃদ্ধা এবং ওই কন্যা সীলোন-বাসিনী। ওই নাতনি ছাড়া বৃদ্ধার তিন কুলে আর কেউ নেই। সীলোনে ছোট একটা পৈতৃক বাড়ি আছে তাদের, আর কিছু ধানীজমি আছে। নাতনি সেখানকার বড় একটা মেয়ে-স্কুলের টিচার, নাম অনুরাধা, বয়েস এখন তিরিশ। নাতনির বিয়ে দিতে পারলে বৃদ্ধার যা-হোক করে কাল কেটে যেতে পারত, সময় এলে স্বস্তিতে চোখ বুজতে পারত। কিন্তু আজ পর্যন্ত কত ভালো ভালো ছেলেকে যে হতাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছে অনুরাধা ঠিক নেই।

...অনুরাধার একবার বিয়ে হয়ে গেছিল ন বছর বয়সে। এই বৃদ্ধা আর তার স্বামীর ভুলেই এ-রকমটা হয়েছিল। তাদের সমাজে তখনো এ-রকম বিয়ে চালুই ছিল। অনুরাধার বাবা-মা নেই, একটা সুন্দর ছেলে দেখে তারা পরের কর্তব্য আগে সমাধা করে রেখেছিল।

অনুরাধার সেই বরের তখন তেরো বছর বয়েস। বিয়ের ঠিক দুবছরের মধ্যে ছেলেটা কোথায় যে হারিয়ে গেল কেউ জানে না। মনে মনে সকলেরই আশঙ্কা, সেবারের প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের সমুদ্র তাকে টেনে নিয়েছে। দুরন্ত ছেলেটা প্রায়ই জেলে-ডিঙি নিয়ে সমুদ্রে ভাসত।

যাই হোক, আগে এ-রকম হলে অনুরাধার আবার বিয়ের কোনো প্রশ্ন থাকত না। কিন্তু তাদের জাতে আর সমাজে দ্বিতীয় বিয়ে ছেড়ে বিধবা বিয়েও চলে এখন। কিন্তু অনুরাধা পড়াশুনা করেই যেতে লাগল, ওকে আর বিয়েতে রাজি করানো গেল না। কিছু বললে জবাব দেয়, যে হারিয়ে গেছে সে ফিরে আসুক, আর নয়তো মাতাজী যদি তাকে নিয়ে থাকে, মাতাজীই আবার তার বর ঠিক করে দিক। বিরক্ত হয়ে বুড়ি অনেকবার বলেছে, এই যে ছেলেগুলো তোকে বিয়ে করার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে আছে, ওদের কাউকে মাতাজীই পাঠাচ্ছে না তুই বুঝলি কি করে?

অনুরাধা বলে, ও বুঝতে পারে, ওরা সব লোভী, কামুক।

নাতনীর বয়েস বেড়েই চলল। বুড়ি ধরে নিল আর ওর বিয়ে হবে না। অনুরাধা এত লেখাপড়া শিখেও কিন্তু ভক্তিমতী মেয়ে—মাতাজীর ওপর তার ভয়ানক নির্ভর!

...কিন্তু আজ দুবছর হল এই শান্তিটুকুও ফেল। বৃদ্ধা বলে যেতে লাগল, এই সময় একটি ছেলে ওর কিছুটা কাছে আসতে পেরেছিল। সেও অন্য এক ছেলে-স্কুলের মাস্টার। বড়লোক নয়, কিন্তু আমার বড়লোকে তো কাজ নেই—কাউকে নিয়ে ও সুখী হলেই হল। এ ছেলেটি ভদ্র সভ্য। মাঝেসাঝে বাড়ি আসে, রাধা তাকে বেশ সহ্য করে, বসে গল্প করে তার সঙ্গে। আমার খুব আশা হল এবারে সুদিন আসবে। জিজ্ঞাসা করলে রাধাও বলে, হাঁ, ভালো লোক।

কিন্তু সেই ছেলে একদিন বিয়ের কথা বলতে রাধা তার ওপরেও রেগে গেল। স্পষ্ট বলে দিলে, এই মতলবে এখানে আস তুমি আমি জানতাম না। আর এসো না—

...পাশের ঘরের আড়াল থেকে আমি দেখছিলাম, শুনছিলাম। এইভাবে বাতিল হবে ছেলেটা ভাবেনি, সে জোর করে রাধার একখানা হাত চেপে ধরে অনুনয় করতে লাগল।...কিন্তু রাধার কাণ্ড দেখে আমি হতভম্ব, ও এই কাণ্ড করতে পারে ভাবা যায় না—নিজের হাতটা ছাড়িয়ে ঠাস করে ছেলেটাকে মেরে বসল।

...আমি হা-হা করে ছুটে গেলাম। অপমানে ছেলেটা কাঠ একেবারে। আর রাধা কাঁপছে থর থর করে। সমস্ত মুখ নীল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ওকেই জড়িয়ে ধরলাম আমি। ছেলেটা মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল। তারপর থেকে অনুরাধা মাঝে মাঝে কেমন যেন হয়ে যায়। আমাকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে এক-এক সময় ভয়ানক কাঁদে। কত ডাক্তার-বদ্যি দেখানো হল, কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না।

আমি ভাবলাম, ওই ছেলেটাকে ও-রকম অপমান করে তাড়ানোর ফলে অনুশোচনায় এ-রকম করছে। জিজ্ঞাসা করতে রাধা নিজেও বলেছে, অন্যায় করেছি। আমি আবার ছুটলাম সেই ছেলের কাছে। তাকে হাত ধরে অনুনয় করে বোঝালাম, মানসিক অশান্তিতে ভুগে ভুগে রাধা হঠাৎ এই কাজ করে ফেলেছে। সেই ছেলে বলল, আমি জানি, আপনার নাতনিকে জিজ্ঞাসা করুন, সে যদি আমাকে ডাকে আমি যাব।

কিন্তু মেয়ে তাও ডাকল না। আমি অনুরোধ করতে উলটে আমার ওপর রেগে গেল। বলল, অন্যায় হয়েছে আমি তোমাকে বলেছি, তার কাছে ছুটে যেতে তোমাকে কে বলেছে?

...ওর মতিগতি দেখে ক্রমে আমার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে যেতে লাগল। তাছাড়া ওই রকমই কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান হলে তেমনি জড়িয়ে ধরে কাঁদে।

কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করল বলে, আমি জানি না কি হয়েছে। বিয়ে করার কথা তুললে রেগে আগুন হয়, সেই এক কথাই বলে মাতাজী কাউকে পাঠাচ্ছে না কেন?

এমনি বিষাদের মধ্যে দিন কাটছিল। এবারে স্কুলের ছুটি হতে অনুরাধাই প্রস্তাব করল, চলো কন্যাকুমারী—কুমারী মা-কে দেখে আসি। তোমার অনেক কালের শখ—

সত্যিই বুড়ির বহুকালের বাসনা এটা। যেমন সংকল্প তেমনি কাজ। দুজনে চটপট বেড়িয়ে পড়ল।

...এখানে আসার পর দুতিনটে দিন মেয়েটা ভয়ানক খুশির মধ্যে ছিল। বুড়ির মনে হয়েছিল মাতাজী এবারে বুঝি মুখ তুলে তাকালেন।

সেদিন সমুদ্রের মধ্যে ওই পাহাড়ে গিয়েই আবার যেন কেমন হয়ে গেল মেয়েটা। যা ছিল একেবারে তার উলটো। চারদিকে সমুদ্র দেখে ওর মাথাই খারাপ হয়ে গেল বুঝি। আর বারবার মনে হতে লাগল এই সমুদ্র ওর বরকে নিয়েছে। কিন্তু ওর মনের কথা বুড়িকে একবর্ণও বুঝতে দেয়নি। পর পর তিন-চারদিন জোর করে ওই রকের মন্দিরে গেল। বুড়িকে কুমারী কন্যার চরণের সামনে বসিয়ে দিয়ে ও এদিক-ওদিক চলে যায়। ওর মাথায় তখন কি সর্বনেশে চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, বুড়ি কি স্বপ্নেও জানত। বুড়িকে বসিয়ে দিয়ে পাহাড়ের একেবারে নির্জন ধারে চলে যেত চুপচাপ। তারপর ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করতে চেষ্টা করত। তিনতলা সমান নিচুতে উতরোল সমুদ্র—সেই সমুদ্র ভয়ানক ডাকছে তাকে, লোভ দেখাচ্ছে। একটা মুহূর্তের জন্য বুক-বেঁধে চোখ-কান বুজে ঝাঁপটা দিয়ে ফেলতে পারলেই যন্ত্রণার অবসান, চির-শান্তি।

...চার দিনের দিন মন বেঁধেছে অনুরাধা, সংকল্পটা ভিতরে ভিতরে এক ক্ষিপ্ত আকার নিয়েছে। অথচ বাইরে এতটুকু বুঝতে দেয়নি। আম্মাকে বসিয়ে নিঃশব্দে সেই নির্জন স্থানে চলে গেছে। তারপর সময়ের প্রতীক্ষা, সুযোগের প্রতীক্ষা। বারবার ফিরে তাকিয়েছে—ও চায় না, দূরের একটি মানুষও এর সাক্ষী থাকুক।

হঠাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড। ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল একটি মানুষ। মানুষ এত সুন্দর হয় না, দেবতাই হবে বুঝি। পরনে ব্রহ্মচারীদের মত সাদা কাপড় গায়ে সাদা জড়ানো।

...দেবতা সামনে এগিয়ে এলেন। একেবারে ওর কাছে। মুখের দিকে তাকালেন। শান্ত গম্ভীর গলায়

বললেন, তোমার মনে যদি কোনো খারাপ মতলব থাকে, সেটা ত্যাগ কর—এই মন্দির এই সমুদ্র আকাশ বাতাসের গায়ে কোনো কলঙ্ক মাখিও না—শুচিতা নষ্ট কোরো না।

অনুরাধা থর-থর করে কাঁপতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে দেবতার দুটো পা আকড়ে ধরল।

কিন্তু পা ছাড়িয়ে দেবতা চলে গেলেন।

তারপর কদিন সে কি কান্না অনুরাধার! বুড়ির কাছে সব স্বীকার করল আর কাঁদল। পর পর দুরাত স্বপ্ন দেখল, কুমারী মা বকছেন ওকে। আর তিন রাত স্বপ্ন দেখল ওই মানুষ-দেবতা ওকে জীবনের আলোয় টেনে নিয়ে এসেছেন, জীবনের পথে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বুড়ি খবর নিয়ে জানল, দেবতার নাম আনন্দ্জী—মায়ের মন্দিরের পাশের অলিন্দে নিজের মনে থাকেন। এরপর অনুরাধা কতদিন ছায়ার মত অনুসরণ করেছে আনন্দ্জীকে। কতবার তার দুপা জড়িয়ে ধরেছে। ওকে শুধু সঙ্গে রাখার অনুমতিটুকু ভিক্ষে চেয়েছে, শেষে অধীর হয়ে, ওকে ত্যাগ করলে ও এই জীবন ত্যাগ করবে বলে শাসিয়েছে পর্যন্ত—কিন্তু আনন্দ্জীর পাষাণের বুক একেবারে—একটিবার মুখের দিকে তাকাননি, কেবল এক কথা, তিনি সাধু নন, দেবতা নন—শুধু মানুষ। তাই শুনে অনুরাধা আরো বেশি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে তাঁকে, কিন্তু আনন্দ্জী আরো অকরুণ, আরো কঠিন।

বক্তব্য শেষ করে বৃদ্ধা দম নেবার জন্য থামল একটু। ক্ষণে ক্ষণে তার চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছিল। পরনের কাপড়ে ভালো করে চোখ দুটো মেজে নিল! সেই ফাঁকে সামনের বারান্দার দিকে তাকালাম! সামনের অলিন্দের দেয়ালে ঠেস দিয়ে তেমনি বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। সমুদ্রের সাঁ-সাঁ বাতাসে পর কপালের দুপাশের শুকনো চুল উড়ছে। মুখ না দেখেও মনে হল ও-যেন অপেক্ষা করছে। ওকে ঘরে ডাকব সেই আশায় আছে।

এবারে বৃদ্ধা সকাতরে তার আরজি পেশ করল, এখন তার আর তার নাতনি অনুরাধার আমার কাছে একটি মাত্র প্রার্থনা, আমি যদি আনন্দ্জীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অনুরাধাকে শুধু দীক্ষা আর মন্ত্র দেবার ব্যাপারে রাজী করাতে পারি, তাহলে ওইটুকু সম্বল করেই তারা দেশে ফিরে যাবে। বৃদ্ধার কান্নাভরা আকুতি, কিন্তু আনন্দ্জী যদি দীক্ষা আর মন্ত্র দিতেও রাজি না হন তাহলে মেয়েটাকে আর বোধহয় বাঁচানোই যাবে না। বৃদ্ধা পায়ের দিকে হাত বাড়াল—আমার ওই নাতনির মুখ চেয়ে এটুকু ব্যবস্থা বাবুজী তোমাকে করে দিতেই হবে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধা কাঁদছে। বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়ে অনুরাধা তেমনি মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে।

ডাকলাম, অনুরাধা, এদিকে এসো।

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। মন্থর গতিতে এগিয়ে এলো।

বললাম, তোমাকে আর তোমার আম্মাকে কথা দিচ্ছি, তোমরা যা এখন চাও সে চেষ্টা আমি করব। আনন্দ আমার ছোটভাই, আমি আশা করছি আমার অনুরোধ সে রাখবে। কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব অনুরাধা, তোমাদের আনন্দ্জীর দীক্ষা মানে উপদেশ, আর মন্ত্র মানে অভ্যাস—আনন্দ্জী যে দীক্ষা আর মন্ত্র তোমাকে দেবেন সেটা তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারবে? ...যদি পারো, আমি বলছি সত্যিই তুমি নতুন জীবন আর আলোর জীবন ফিরে পাবে—পারবে?

অনুরাধা মাথা নাড়ল, পারবে। ওর সমস্ত মুখে আশার আলো, নাকের সাদা পাথর থেকেও যেন সেই আলো ঠিকরোচ্ছে। হাঁটু মুড়ে বসল আস্তে আস্তে, পায়ে একেবারে মাথা রেখে প্রণাম করল। এবারে আমি আর বাধা দিলাম না। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, ও সুখী হোক।

ভিতরে ভিতরে আমি কতটা অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠেছিলাম বলতে পারব না। ওই বয়সের এক মেয়ের এমন অস্বাভাবিক বেদনা ভারাক্রান্ত জীবনের কথা শোনা এক, আর শুনতে শুনতে সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখা আর এক। নইলে আনন্দর হয়ে ওই দুটি রমণীকে এ-রকম একটা আশ্বাস দিয়ে

এলাম কি করে? ওদের চোখে যে মানুষ দেবতা-সদৃশ, সে আমার স্নেহভাজন অনুজপ্রতিম সেটুকু জাহির করার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু আত্মপ্রসাদ থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার কথা মতো সে যে সত্যিই ওই মেয়েকে মন্ত্র আর দীক্ষা বা উপদেশ দিতে ছুটবে এ-রকম অসম্ভব আশ্বাস আমি এদের দিয়ে এলাম কি করে?...মন্ত্র বা দীক্ষা প্রসঙ্গে চকিতে আমার মাথায় একটা সংকল্প উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছিল, মনে হয়েছে প্ল্যানমাফিক কাজ হলে মেয়েটার ভালো হতে পারে, হয়তো বা ওই আত্মধ্বংসী হতাশা থেকে তাকে টেনে তোলা যেতে পারে। সেই আবেগের মুখে বলা।

কিন্তু এখন? এখন কি করা যাবে! ওই বুড়ি আর তার নাতনি তো আশায় আশায় উন্মুখ হয়ে থাকবে। ও-রকম বাহাদুরি দেখিয়ে আসার জন্য নিজের ওপরেই রাগ হতে লাগল। কিন্তু ভিতরের মন বলছে, বাহাদুরি নয়, চেষ্টা করে দেখো, ফল হতে পারে—মেয়েটাকে জীবনে ফেরানো দরকার।

বাড়ি ফিরে দেখি স্ত্রীর বিরূপ মূর্তি। ভ্রূকুটি করে বলল, ওই দুটোকে বাজারে পাঠিয়ে এতক্ষণে ফিরলে তুমি! কি-সব ছাতামাথা নিয়ে এসেছে, ওদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে! কে দুটো মেয়েছেলে ডেকে নিয়ে গেল শুনলাম, এখানেও আবার কোন্ ভক্তরা এসে জুটল?

উঁকি দিয়ে দেখলাম আনন্দ ছেলের কাছে বসে। খেয়াল করলে রমার অসহিষ্ণু গলা কানে যাবার কথা। হাসিমুখেই ছেলেকে বলেছে কিছু, খেয়াল করেছে কিনা বোঝা গেল না। তবে হাসিমুখ দেখে ভিতরে ভিতরে একটু স্বস্তি বোধ করলাম আমি।

বিরক্তি চেপে স্ত্রীকে বললাম, চেঁচামেচি কোরো না, বাজার আজ ভালো হয়নি, কাল হবে—দুটি মেয়েছেলে আমাকে ডেকে নিয়ে গেছলো আনন্দ শুনেছে?

এটুকুতেই স্ত্রীর মুখে শংকার ছায়া।—না। ...কারা তারা?

—পরে শুনো। ...আনন্দর মেজাজপত্র একটু ভালো মনে হচ্ছে?

মাথা নেড়ে রমা এবারে হাসিমুখেই ফিসফিস করে বলল, ছেলে ওকে আজ একপ্রস্থ টাইট দিয়েছে।

আমি উৎসুক।—কি রকম?

শুনে আমারও হাসিই পেল।...বারকয়েক ডেকে সাধুকাকার সাড়া না পেয়ে ছেলে রেগে গেছলো। তারপর একসময় সে কাছে আসতে ছেলে গম্ভীর। কোনো কথার জবাব দেয় না। সাধুকাকা শেষে বলেছে, আমার সঙ্গে কথা বলছিল না আমি কিন্তু দুঃখু পাচ্ছি।

ছেলে তক্ষুনি বলে উঠেছে, নিজের বেলায় মনে থাকে না, নিজে যখন চুপ করে থাকো তখন অন্যরা দুঃখু পায় না?

সাধুকাকা হেসে বলেছে, তোর কাছে এলে আমি চুপ করে থাকি?

ছেলে ফস করে জবাব দিয়েছে, চুপ করে থাকার সময় কাছে আসই না। একটু আপোষ হতে ছেলে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা সাধুকাকা, বাব মা তোমাকে একটু একটু ভয় করে—না?

—তোর বাবা মা আমাকে ভয় করতে যাবে কেন?

—তুমি গম্ভীর হয়ে থাকলে মা যে বাবাকে জিজ্ঞেস করে। দাঁড়াও, এবার থেকে তুমি গম্ভীর হলেই আমিও ডবল গম্ভীর হয়ে যাব —মজাখানা টের পাবে।

শুনে সাধুকাকার খুব হাসি।

কিন্তু আমার মনে যা আছে সে-কথা ওর কাছে তুলব কি করে ভেবে পাচ্ছিলাম না। খাওয়া-দাওয়ার পর আনন্দ বলল, ছেলেটা অনেক দিন ঘরে বসে আছে, বিকেলের দিকে আজ ওকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে বসা যাক চলুন—

অকারণ গাম্ভীর্যের ছায়া টেনে এনে বললাম, আজ না, বিকেলে তোমার সঙ্গে অন্য দরকারী কথা আছে আমার।

মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো ও। হঠাৎ কি কারণে রমাকেই যেন দরকার হয়ে পড়ল আমার। তাঁর খোঁজের অছিলায় সামনে থেকে সরে এলাম।

...সীরিয়াস কিছু ভাবল হয়তো। ভাবুক। সীরিয়াস তো বটেই। একটা মেয়ের জীবন-সংকট। ভালোই হল, আনন্দরূপকে বাড়িতে সে-রকম নিরিবিলিতে পাওয়া সম্ভব নয়।

বিকেলে ছেলেকে ভুলিয়ে রেখে ওকে ডেকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে আগের দিনের সেই পাথরটার ওপরেই মুখোমুখি বসলাম আমরা। ভিতরে ভিতরে ও-একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে মনে হল। আমি অবাঞ্ছিত কিছু বলব আঁচ করেই এমন চুপচাপ কিনা জানি না।

ভণিতা বাদ দিয়ে প্রসঙ্গটা সোজাসুজি উত্থাপন করলাম। বললাম, অনুরাধার ঠাকুমা বুড়ি আজ আমাকে তার ঘরে টেনে নিয়ে গেছিল। সব বলল। আশ্চর্য দুঃখের জীবন মেয়েটার। ...তুমিও সবই জানো নিশ্চয়?

নির্লিপ্ত মুখেই ও মাথা নাড়ল, জানে। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এ আলোচনা আশা করেনি এবং পছন্দ করছে না।

ওর পছন্দ অপছন্দ নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ নেই আর। জিজ্ঞাসা করলাম, সমুদ্রের ওই মন্দিরের পাহাড়ে কদিন অনুরাধার আচরণ লক্ষ্য করে তোমার মনে হয়েছিল ও ঝাঁপ-টাপ দেবার মতলব আঁটছে?

—খুব বেশি রকম।

—ওখানে অত মেয়ে-পুরুষের মধ্যে তুমি ওকেই লক্ষ্য করতে গেলে কেন? সামনা-সামনি তুমি তো কোনো মেয়ের দিকে তাকাও না?

মুখ অল্প অল্প লাল হয়ে উঠতে লাগল আনন্দরূপের। অসহিষ্ণু স্বরে বলল, এ আলোচনা আমার ভালো লাগছে না দাদা।

বললাম, একটা মেয়ের বাঁচা-মরার ব্যাপারে আমিও বাজে আলোচনা করতে বসিনি তোমার সঙ্গে। যাক, অনুরাধার সমস্ত ব্যাপারটা তুমি কি মনে করো?—হতাশা, বিকৃতি, সেক্স রিপ্রেশন।

—ঠিক। কিন্তু এই রকম যে দাঁড়িয়েছে সেটা তার অপরাধ?

অসহিষ্ণু জবাব দিল, কিন্তু আমি কি করতে পারি? সে আমাকে মস্ত সাধু ভাবে, আমার শিষ্যা হতে চায়, আমার সঙ্গে থাকতে চায়, এমন কি সেবাদাসী হয়ে থাকতেও তার আপত্তি নেই।

জোর দিয়ে বললাম, এখন আর সে-সব কিছু চায় না। এখন শুধু তোমার কাছ থেকে দীক্ষা চায়, মন্ত্র চায়—তা পেলেই ঠাকুমার সঙ্গে-এ জায়গা ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যাবে—আমি, তাদের কথা দিয়ে এসেছি, আমার ভাইকে আমি রাজি করাবো, তাদের কাছে পাঠাবো।

আনন্দরূপ এবারে চাপা গর্জন করে উঠল প্রায়।—আমি দীক্ষা দেবো, মন্ত্র দেবো?

—দেবে। অনুরাধাকে আমি বুঝিয়ে এসেছি, তার আনন্দজীর দীক্ষা মানে উপদেশ, আর মন্ত্র মানে অভ্যাস। সেই উপদেশ আর মন্ত্র অক্ষরে পালন করতে হবে। অনুরাধা রাজি হয়েছে।

বিরক্তিতে ফুঁসে উঠল আনন্দরূপ।—কিন্তু আমি তাকে কি বলবো, কি উপদেশ দেবো?

—তুমি তাকে সংসারে ফিরতে বলবে, এটাই তার দীক্ষা, মনেপ্রাণে ফিরতে বলবে। সেই সংসার যতটুকু সম্ভব সুন্দর করে তোলার চেষ্টাটাই তার মন্ত্র। এও বলতে পারো, তার ঘরে গোপাল অথবা কন্যাকুমারী গোছের কেউ আসতে পারে—ভগবানের নামে তাকে লালন করাটাও তার সাধনা। এই দীক্ষা আর মন্ত্র তুমি তাকে দেবে—তাতে যদি কোনো পাপ হয় তো সে পাপ আমার। তুমি তাকে আদেশ করবে। আর, এটুকুও যদি রাজি না হও একটা মেয়ের তুমি মৃত্যুর কারণ হবে—আর সেটা আমার বরদাস্ত হবে না।

আমি আর বসলাম না, উঠে হন হন করে সোজা বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

রাত্রি।

ছেলেটা অনেকবার সাধুকাকার কথা জিজ্ঞাসা করে করে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভিতরে ভিতরে আমি ঘাবড়েছি একটু। স্ত্রীও। তাকে সব কথা বলেছি। আনন্দর প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব দুজনেই।

বেশি রাতে ফিরল। লালচে মুখ থম থম করছে। রমা জিজ্ঞাসা করল, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

বিড় বিড় করে জবাব দিল মন্দিরে। তার দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার

দিকেই এগিয়ে এলো। মুখের দিকে চেয়ে ভেতর পর্যন্ত দেখে নিতে চাইল বুঝি। তারপর হতভম্ব আমি। হঠাৎ নত হয়ে একটা প্রণাম সেরে হন হন করে পাশের ঘরে ঢুকে গেল।

একটু বাদে স্ত্রীর চোখে চোখ পড়ল। সে হাসছে।

খুশি মনে সকলে মিলে সমুদ্রের ধারে এসেছি আমরা! বালি আর নুড়িপাথরে পুশ-চেয়ারের চাকা চলবে না। সেটার ওপর ছেলেকে বসিয়ে আনন্দর সাহায্যে আলতো করে তুলে এনে হরি আর জগুয়া এখানে এনেছে। আনন্দ ছেলের সঙ্গে খেলায় আর গল্পে মেতে আছে বটে, কিন্তু আমাদের সামনে গম্ভীর। আসলে ওই দিনের পর থেকেই ক্ষণে ক্ষণে বিমনা দেখছি ওকে।

সমুদ্রতটে কত রং-বেরংয়ের নুড়িপাথর ছড়িয়ে আছে ঠিক নেই। মেয়ে বেছে বেছে পছন্দমতো পাথর তুলছে। আমি বললাম, ওগুলো পাথর নয়, আসলে ওগুলো হরেক রকমের খাবার—সে খবর জানিস?

মেয়ে আর মেয়ের মাকে অবাক হতে দেখে বললাম, কন্যাকুমারীর বিয়ের লগ্ন যখন বয়ে গেল, বর এলো না, তখন বিয়ের যত খাবার-দাবার তৈরি হয়েছিল—সব পাথর হয়ে গেল।

গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে মেয়ে আবার পাথর কুড়নোয় মন দিল। স্ত্রী ছেলের পাশে একটা পাথরের ওপর বসে তার সঙ্গে গল্প করতে লাগল। আমি আনন্দকে বিমনা দেখছি আবার।

সমুদ্রের ধারে বহু মেয়ে-পুরুষ বেড়াচ্ছে। এদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন হলেও লোকজন আসছে যাচ্ছে। হঠাৎ কি দেখে বা কাকে দেখে আনন্দ যেন বিষম চমকে উঠল। সামনে তাকিয়ে দেখি অভিজাত বেশের একটি মেয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে। গজ তিরিশেক দূরে হবে। পিছন থেকে ঠাওর হয় না, তবু বেশ একটি রূপসী রমণীই মনে হল।

আনন্দর দিকে চেয়ে দেখি সমস্ত মুখ হঠাৎ যেন রক্তশূন্য হয়ে গেছে তার। নির্নিমেষে সেদিকেই চেয়ে আছে। সম্বিৎ ফিরতে আমার দিকে তাকাল একবার, কিন্তু তার আগেই আমি অন্যত্র চোখ ফিরিয়েছি।

ও নিঃশব্দে উঠে গেল। ওই রমণীকে লক্ষ্য করেই সোজা এগিয়ে চলল। কত লোকে হাঁটছে, সে-ও একটু হাঁটছে যেন। কিন্তু আসলে ওর হাঁটার তাগিদটা অন্যরকম লক্ষ্য করছি। বড় বড় পা ফেলে সুবেশা মহিলার পাশ কাটিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর ফিরল। দুজনে দুজনকে অতিক্রম করে গেল। আনন্দ ঢিমে-তালে পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর একটু ঘোরাঘুরি করে ঠাণ্ডা মুখে পাশে এসে বসল আবার।

আমি ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম, মহিলাটি চেনা কেউ নয় তাহলে?

ধড়ফড় করে উঠল হঠাৎ। সমস্ত মুখে আলগা রক্ত উঠে এলো বুঝি। আমি আর কিছু বললাম না। শুধু লক্ষ্য করলাম, ওর আত্মস্থ হতে সময় লাগল বেশ।

সূর্যাস্তের পরে স্ত্রী ওঠার তাগিদ দিল। ছেলেকে চেয়ারে বসিয়ে আনন্দর সাহায্যে হরি আর জগুয়া সেটা আবার আলগা করে রাস্তায় নিয়ে এলো। আনন্দ বলল, আপনারা যান আমি একটু পরে আসছি —অসুবিধে হবে?

হালকা জবাব দিলাম, কিছু না, আর একটু হাওয়া খেয়ে আসার ইচ্ছে তো?

বোস গে তুমি, ওদের রেখে আমিও আসছি।

আনন্দ কিছু বলল না। শুধু মনে হল, চোখ দুটো চক চক করছে একটু, আর মনে হল সে-ও তাই চায়।

আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলাম। আনন্দ সেই বড় পাথরটায় বসে। আমি এবারও রসিকতার সুরেই বললাম, ও-পাথরটা বোধহয় কিছু একটা স্মৃতি গোছের হয়ে থাকবে আমাদের, তাই না?

আনন্দ জবাব দিল না। ভালো করে ওর মুখ লক্ষ্য করার জন্য বেশ কিছু মুখোমুখি বসলাম। আনন্দ অস্বাভাবিক গম্ভীর।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা আনন্দ, মেয়েদের তুমি ঘৃণা করো না আসলে ভয় করো?

একটু চুপ করে থেকে ও বিড় বিড় করে জবাব দিল, ভয় করি, আর তাদের ব্যাপারে নিজেকে অবিশ্বাস করি, নিজেকে ঘৃণা করি।

হেসে বললাম, আর সেটা এমনই অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে অত বয়সের বউদিও মাঝ-রাতে বারান্দায় এসে বসতে চাইলে তুমি তাকে ধমকে তাড়াও!

গম্ভীর মুখ বিবর্ণ হতে লাগল আস্তে আস্তে। অস্ফুট স্বরে বলল, তাই।... বউদি অনেক বড় বলেই তার পরেও আমাকে ক্ষমা করেছেন।

বললাম, তা না, বউদি তার এই নতুন পাওয়া ভাইটিকে ভালবেসে ফেলেছেন বলেই এ-সব পাগলামি ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। যাক, তুমি এ-ভাবে আর কতকাল কাটাবে ঠিক করেছ?

একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, তিন বছর হয়েছে, আরো চার বছর এ-ভাবে থাকার কথা।

—তারপর কি?

—মন প্রস্তুত হলে তারপর একজনকে আশ্রয় দেবার কথা।

—কার কথা, কোনো সাধকের?

জবাব দিল না।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই তিন বছরে মন একটু আধটু প্রস্তুত হয়েছে?

—না, চেষ্টা করছি।

—চেষ্টা করে আনন্দ পাচ্ছ?

—না।

—শান্তি পাচ্ছ?

—না।

খানিক চুপ করে থেকে বললাম, আনন্দ তোমার যন্ত্রণা আমি কক্ষনো অসম্মানের চোখে দেখব না, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।

ও বলল, মানুষ পশু হলে যন্ত্রণাই তার প্রাপ্য, অসম্মানের চোখে দেখবেন না কেন?

—মানুষ সত্যিই পশু হলে তার যন্ত্রণাবোধ থাকে না—অসম্মান করব না এই জন্য।

আমিও জানি ও আমাকে কিছু বলতে চায়। অনুরাধার ব্যাপারটা ফয়সালা হয়ে যাবার পর থেকেই কেন যেন এইরকম মনে হয়েছে আমার। আর আজকের ওই অভিজাত বেশ-বাসের মহিলার ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাওয়ার পরে সেটা আরো বেশি মনে হয়েছে আমার। নইলে আমার আসার প্রতীক্ষায় ও এখানে এই পাথরে বসে থাকত না।

অকপটে বলেছে।

বলতে যে চলেছে, সেটা নিজেও স্বীকার করেছে।

আমি স্তব্ধ আগ্রহে শুনে গেছি।

এবারে আমি এক চিত্র সাজাতে পারি। সম্ভাবনার দিক চিন্তা করে সেখানে চিত্রকরের রং-তুলির বিন্যাস অবশ্যই থাকতে পারে।

কিন্তু সেটা যে এক পুরুষের মর্মান্তিক জীবনের চিত্র হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই পুরুষের শেষ পরিণাম লেখার আগে এটুকু সম্পূর্ণ করে নেওয়া দরকার।

আনন্দরূপ হঠাৎ অত চমকে উঠেছিল সমুদ্রের ধারে যে মেয়েটিকে দেখে, পিছন থেকে তাকে মনে হয়েছিল শিপ্রা নন্দী। ওই রকমই সুশ্রী, ছিমছাম বেশ-বাস, সামান্য মোটার দিক ঘেঁষা গড়ন—অনেকটা ওই রকমই নিজের প্রতি, সচেতন হাঁটার ভঙ্গী।

সেই মুহূর্তে ওর মনে হয়েছিল, তবে কি খুড়তুতো ভাই দীপঙ্কর—দীপু এই বিশ্বাসঘাতকতা করল? একমাত্র সে ভিন্ন ওর এখানে অবস্থানের কথা আর কেউ জানে না। কিন্তু সে তো ঈশ্বরের নামে শপথ

করে তাকে লিখেছিল কাউকে বলবে না। অবশ্য ওকে ফিরে আসার জন্য বার বার কাকুতি-মিনতি করে লিখে-লিখে শেষে হাল ছেড়েছে। কিন্তু ফেরাবার জন্য দীপু শেষে এই রাস্তা ধরল?

নইলে শিপ্রা নন্দী এখানে আসে কি করে! মেডিক্যাল কলেজের পাস করা মেয়ে-ডাক্তার—আনন্দ সব ছেড়ে-ছুড়ে বেরিয়ে আসার আগেই মোটামুটি তার পসার জমে উঠেছিল। সে-রকম টাকা জমাতে পারলে বাইরে থেকে কিছু ডিগ্রি-টিগ্রি নিয়ে আসারও বাসনা আছে। তার কন্যাকুমারীতে হাওয়া খেতে আসার ফুরসত কোথায়?

আশ্চর্য, ভিতরের তাড়নায় এমন বিভ্রম যে ঠিকমতো লক্ষ্য করলে ভুল ধরা পড়ত। কিন্তু বসে থাকা গেল না। উঠে আনন্দরূপ দেখতে ছুটল। তারপর দেখল ভুল। সে অন্য মেয়ে। কিন্তু তার পরেই অসহিষ্ণু আন্তর্যাতনা। এই তিনটে বছর কি তাহলে একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল? সে কি কিছুই ভোলেনি, ভুলতে পারবে না?

...একটি রমণীর মন পেতে চেয়েছিল আর পেয়েও ছিল আনন্দরূপ মিত্র—সে শিপ্রা নন্দী। কিন্তু আর একটি রমণীকে সে গ্রহণ করেছিল, সে অঞ্জলি ঘোষ। অঞ্জলি স্ত্রী, সঙ্গিনী, সচিব—সহিষ্ণুতা আর ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। শিপ্রা নন্দী প্রিয়া, প্রিয়সখি। একজনকে ছাড়লে আনন্দরূপ অচল, আর একজনকে ছাড়লে তার রূপ-রস-রোমাঞ্চের জগৎ অন্ধকার। একজনের কাছে সে কৃতজ্ঞ, আর একজনের কাছে সে নায়ক। এই দ্বৈত-ভূমিকার ফলে আজ সে জ্বলছে—জ্বলছে জ্বলছে জ্বলছে।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আনন্দরূপ। চেহারার গর্ব ছিল খুব। হাজারের মধ্যে এমন চোখে পড়ে না সেই জ্ঞান টনটনে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজকে দেখত, হাসত মিটিমিটি। এই চেহারার গুণেই অবস্থাটা চিরকাল মধ্যবিত্ত থাকবে না, এটা সে স্বতঃসিদ্ধ ভাবত। ছেলেবেলায় বাবা মা দুই-ই হারিয়েছিল। কাকা-কাকীমার কাছে মানুষ। বাবা কিছু টাকা রেখে গেছিল। সেই দৌলতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেরুনো সম্ভব হল। নইলে কাকা কলেজের সাধারণ মাস্টার—নিজের ছেলেমেয়ে আছে, এতটা ব্যয়বহন তাঁর সাধ্যে কুলোত না।

খুড়তুতো ভাইদের মধ্যে দীপঙ্কর—দীপু বছর দুয়েক মাত্র ছোট ওর থেকে। আনন্দ যদি কায়া, ও ছায়া। বাড়ির মধ্যে একমাত্র ওরই চোখের মণি আনন্দ। নইলে কাকা-কাকীমা ওর চাল-চলন আচার-আচরণে আগে গলদ দেখেন। সব থেকে আপত্তি আনন্দর টাকা-পয়শা খরচের ব্যাপারে বে-হিসেবীপনা। বাপের সঞ্চিত টাকা নিঃশেষ করে এনেছে। এরপর কাকা-কাকীমার ঘাড়ে চাপবে এরকম একটা আশঙ্কা তাঁদের ছিল। আর ব্যাটাছেলের অত বাবুয়ানিও তাঁদের বিশেষ অপছন্দ। চেহারা ভালো বলে মস্ত বড়লোকের ছেলের মতই বেশভূষার চাহিদা তার—এও তাঁরা ভালো চোখে দেখতেন না। অথচ ওই ছেলের দরাজ হাতও লক্ষ্য করতেন তাঁরা—নিজের জন্য কিছু করলে বা বানালে দীপুর জন্যও ঠিক তাই করা চাই, বানানো চাই।

আনন্দরূপ যে-বছর হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দেবে সে-বছরই বাড়িওয়ালার কাছে অপমানিত হয়ে কাকাকে কাকীমার এক দূরসম্পর্কীয়া দিদির বাড়ি দোতলায় এসে উঠতে হল সপরিবারে। বাড়ির সেই দোতলা তখন সবে খালি হয়েছে। কাকীমার সেই দূরের সম্পর্কের দিদি আর ভগ্নিপতি সানন্দেই দোতলাটা ভাড়া দিলেন তাদের। তাঁদেরও অবস্থা খুব একটা ভাল নয়, ভদ্রলোক একটা বে-সরকারি আপিসের কেরানি। এটা তাঁর পৈতৃক বাড়ি। বাড়ি-ভাড়া অনেকখানি সম্বল তঁদের। কাকীমার সেই দিদির অনেককাল ছেলেপুলে হয়নি—শেষে হবি তো হ পর পর তিনটে মেয়ে। একটা মেয়েও তেমন সুশ্রী নয়, গায়ের রং কালো, আর শ্রী বলতেও তেমন কিছু চোখে পড়ে না। কাকীমার এই দূর-সম্পর্কের ভগ্নিপতি সপরিবারে একতলায় থাকেন। এঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভালোমানুষ, মেয়েগুলো ঠাণ্ডা।

ভদ্রলোকের বড়মেয়ের নাম অঞ্জলি। অঞ্জলি ঘোষ। আন্দরূপের থেকে মাত্র দু বছরের ছোট। পড়েও দু ক্লাস নীচে। কাকীমার মুখে আনন্দ শুনেছে, মেয়েটা নাকি পড়াশুনায় খুব ভালো, স্কুলে প্রথম হয় বরাবর। দীপু ও অঞ্জলি একই ক্লাসে পড়ে। আর ছাত্র সে-ও মন্দ নয়। মায়ের প্রশংসার জবাবে সে ঠোঁট উলটে বলেছিল, মেয়েদের স্কুল সেখানে আবার প্রথম-দ্বিতীয়।

না, ওই ফ্রক-পরা কালো মেয়েটাকে গোড়ায় গোড়ায় চোখ তুলে আনন্দ ভালো করে দেখেওনি

কোনোদিন। কিন্তু ঠাণ্ডা মেয়েটা যে ওকে বেশ একাগ্রভাবে লক্ষ্য করত সেটা টের পেত। কোন ছেলের এত রূপ ওই মেয়েটার কাছে সেটাই যেন প্রধান বিস্ময়। সে হাঁ করে তাই দেখত। আত্মীয়তার সুবাদে দোতলায় যাওয়া-আসা ছিল মেয়েটার। আনন্দ সামনা-সামনি পড়ে গেলে থতমত খেত। আনন্দ ওর সঙ্গে কথা কইলে পড়াশুনার খবর জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটা যেন বর্তে যেত। কিন্তু আনন্দ তখনো ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ নয় আদৌ। শুধু মনে হত, ওর চাল-চলন, হাসি-ঠাট্টা, ফুর্তি সবই এই মেয়েটার ভালো লাগে। তা এমন অনেকের লাগে। ও যেখানে—সেখানেই আলো, সেখানেই হাসি।

হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে আনন্দ শিবপুরে কেমিক্যাল এনজিনিয়ারিং পড়তে চলে গেল। ছুটিছাটায় বাড়ি আসে। দীপু ওর প্রত্যাশায় হাঁ করে থাকে। কয়েকদিন হৈ-চৈ আর ফুর্তি করে আবার কলেজ-বোর্ডিংয়ে চলে যায়। সে এলে আর একটা মেয়ের মুখেও যে হাসি ফোটে, খুশিতে কালো মুখখানা ভরে ওঠে—সেটা তখনো একটুও লক্ষ্য করার বিষয় নয়। তবে আনন্দর সেটা চোখে পড়ে না এমনও নয়।

সেবারে দীপু আর অঞ্জলি দুজনেরই হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা। দুজনেই আর্টস-এর ছাত্র। মান বাঁচানোর জন্য দীপু রেষারেষি করে পড়াশোনায় মন দিয়েছে।

বিকেলের দিকে আনন্দ এলো শিবপুর থেকে। দূর থেকে দেখে নীচের বারান্দায় অল্পবয়সী একটি শাড়ি-পড়া মেয়ে। নতুন বয়সের মেয়ে দেখলে এখন ওর ভিতরটা উসখুস করে একটু। আর একটু এগোতেই হা-কপাল। শাড়ি পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে অঞ্জলি।

কাছে এসে হাসিমুখেই বলল, তুমি! আমি ভাবছিলাম শাড়ি পরে কে না কে দাঁড়িয়ে।

কালো মুখে সেই হয়তো প্রথম খুশির ঝলক একটু বেশি লক্ষ্য করল আনন্দ। হেসে অঞ্জলি বলল, এবারে তুমি অনেক দিন পরে এলে রূপদা।

বাড়ির ভাইবোনদের মতো সে-ও ওকে রূপদা বলেই ডাকে। আনন্দ বলল, পরে না এসে করি কি, তোমাদের যে আবার পরীক্ষা পড়াশুনা হচ্ছে বেশ?

অঞ্জলি আরো বেশি হসে জবাব দিল, দীপু খুব পড়ছে।

সমবয়সী—দুজনে দুজনার নাম ধরে ডাকে দীপু আর অঞ্জলি।

রাতে দীপুর মুখে ওই মেয়ের একটা কথা শুনে বেশ একটু ধাক্কাই খেল আনন্দরূপ। হায়ার সেকেণ্ডারিতে আনন্দরূপ ফার্স্ট ডিভিশনের মধ্যেও বেশ ভালো রেজাল্টই করেছিল। অতএব তার ইংরেজি নোট খাতা দীপু বেশ নিষ্ঠা সহকারে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। আর অঞ্জলিও নাকি খুব আগ্রহ নিয়ে সেগুলো দেখেছে। সায়েন্স গ্রুপের সঙ্গে এক ইংরেজি বাংলা ছাড়া আর কোনো বিষয়ের মিল নেই এদের। না, অঞ্জলির আরো একটা বিষয়ে মিল আছে। আর্টস গ্রুপে থেকেও অঞ্জলি অঙ্ক রেখেছে। কিন্তু অঙ্কের কোনো নোট-টোটের হদিস রাখে না দীপু।

কথায় কথায় দীপু বলল, ওই অঞ্জলি দেখতে অমন নিরীহ হলে কি হবে, ভিতরে ভিতরে দেমাক আছে, বুঝলি রূপদা। তোর ইংরেজি নোট-খাতার আদ্যোপান্ত পড়ে নিয়ে শেষে কি বলেছে জানিস?

—কি বলেছে?

—বলেছে, রূপদা বোধহয় সায়েন্স সাবজেক্টগুলোতে ভালো নম্বর পেয়েছে—এই ইংরেজি লিখলে তো ফার্স্ট ডিভিশনের নম্বর পাওয়া যাবে না।

শতকরা বাহান্ন-তিপ্পান্ন নম্বরই পেয়েছিল ইংরেজিতে মনে আছে —আর সেও কম ছেলেই পায়। কিন্তু ওই মেয়ে অমন কথা বলতে পারে এ-যেন অবিশ্বাস্য।

দীপু বলল আমি চুপ করে আছি—রেজাল্ট বেরুবার পর শোনাব।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ও ইংরেজি কেমন লেখে দেখেছিস নাকি?

—ইংরেজি ছেড়ে কোনো বিষয়ই যে ভালো জানে মনে হয় না—স্কুলে কি করে যে প্রথম হয় ভগবান জানে—আমি কালও মা-কে বলেছি, নিশ্চয় টুকলিফাই করে।

সেই হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্ট বেরুতে আনন্দ মেয়েটার সম্পর্কে ভিতরে ভিতরে সজাগ হল একটু। অঞ্জলি ঘোষ সমস্ত মেয়েদের মধ্যে প্রথম আর সব মিলিয়ে বোর্ডে পঞ্চম হয়েছে আর্টস গ্রুপে। কাগজে খবরটা দেখে আনন্দরূপ হতভম্ব।

শিবপুর থেকে সেইদিনই কলকাতা চলে এসে শুনল, দীপুও ফার্স্ট ডিভিশনেই পাস করেছে, তবে অঞ্জলির ধারে-কাছে নেই। আনন্দ হেসে জিজ্ঞাসা করল, কি রে, আমার ইংরেজির নোট-খাতা দেখে অঞ্জলি তাহলে সত্যি কথাই বলেছিল?

দীপু বলল, তাই তো দেখছি, মেয়েটা যে এমন সাংঘাতিক কে জানত?

আনন্দ একরাশ মিষ্টি কিনে নিয়ে একতলার অন্দরে ঢুকল। —কংগ্র্যাচুলেশনস, অনেক কংগ্র্যাচুলেশনস, দীপু তোমাকে একটা সাংঘাতিক মেয়ে বলছিল, আর আমিও আজ তাই বলছি।

অঞ্জলির বাবা-মা খুশি। আর অঞ্জলির তো কথাই নেই; সেই প্রথম আনন্দর মনে হয়েছিল, চেহারা যেমনই হোক, মেয়েটার হাসিমাখা চোখ দুটো ভারী বুদ্ধিদীপ্ত।

দীপু আর অঞ্জলি বি.এ. পড়তে দুই আলাদা কলেজে ঢুকেছে। আনন্দর এঞ্জিনিয়ারিং পড়া চলেছে। ওদের তিনজনের মেলামেশাটা আগের থেকে আরো অনেক সহজ হয়েছে। অঞ্জলির গুণ কিছু আছে এটা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই। তার ওপরে ইকনমিক্সে অনার্স পড়ছে অঞ্জলি, আনন্দর বিবেচনায় মেয়েদের পক্ষে এ-ও একটু বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ।

সেবার হঠাৎ দিন কয়েকের ছুটি পেয়ে একটা ট্যাক্সিতে বাক্স আর বিছানা চাপিয়ে শিবপুর থেকে কলকাতার বাড়িতে চলে এলো আনন্দরূপ। বেলা তখন সাড়ে তিনটে হবে। কিন্তু বাড়ি এসে চক্ষুস্থির তার। কাকা কলেজে, কাকীমা কোথায় বেরিয়েছে। এদিকে এগারো টাকা ট্যাক্সি-ভাড়া উঠেছে, আনন্দর পকেটে এগোরো আনা পয়সাও নেই। ভেবেছে, বাড়ি এসে কাকীমার থেকে চেয়ে দিয়ে দেবে। এ-রকম খেয়ালিপনা ও-ই করতে পারে। কিন্তু এখন চিত্তির। দীপুটা পর্যন্ত বাড়ি নেই যে একটা উপকার করে দেবে।

নামার সময় অঞ্জলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ও রেলিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ডাঁসা পেয়ারা চিবুচ্ছিল। রূপদাকে হঠাৎ দেখে খুশি, পেয়ারা আঁচলের আড়াল করেছে, কিন্তু মুখ-ভর্তি পেয়ারা নিয়ে ভালো হাসতেও পারছে না।

ওর দুরবস্থা দেখে আনন্দ মুখ টিপে হেসে বাক্স বিছানা নামিয়ে দাওয়ায় তুলতে তুলতে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার জন্যে আছে না একাই সাবড়াচ্ছ?

ছিবড়ে গিলতে না পেরে অঞ্জলি হাসিমুখে শুধু মাথা নেড়েছে, অর্থাৎ নেই। ভাড়ার টাকা আনার জন্য আনন্দ তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেছে—তারপর এই বিড়ম্বনা।

নীচে নেমে এসে অঞ্জলিকেই জিজ্ঞাসা করল, কাকীমা এ-সময়ে আবার কোথায় গেল বলো তো?

একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, অঞ্জলি তক্ষুনি আঁচ করেছে। —মা আর মাসি দুজনে মিলে ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমায় গেছে। ট্যাক্সিওলা দাঁড়িয়ে আছে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে, ট্যাক্সি-ভাড়া নেই নাকি?

রূপদা এ-রকম সংকটে পড়তে পারে সে-অভিজ্ঞতা অঞ্জলির আছে। একবার দীপু আর ওকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকেছিল। পকেটে কি আছে না আছে হুঁশ নেই। বিল আসতে তখন চক্ষু চড়কগাছ। বেচারা দীপুকে তখন টাকা আনতে বাড়ি ছুটতে হল, আর ওরা দুজন বসে এটা-সেটা খেয়ে চলল।

আনন্দ বলল, আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল, কাকীমা এ-সময় সিনেমায় ঢুকে বসে আছে কে জানত—ব্যাটাকে এখন কি বলি, তোমার মা-ও তো নেই শুনছি...

অঞ্জলি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, ট্যাক্সি-ভাড়া কত?

—এগারো টাকা...

অঞ্জলি তক্ষুনি ঘরে ছুটল, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা দশ টাকার নোট আর একটা টাকা এনে তার হাতে দিল। আনন্দ সে-টাকা ড্রাইভারের হাতে দিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

—বাঁচা গেল! তুমি টাকা আনলে কোত্থেকে?

—আমার থেকেই। আমার স্কলারশিপের টাকা, বাবা তো একপয়সাও নেয় না।

সেই প্রথম আনন্দর মনে হয়েছিল নিজে সে এ-পর্যন্ত একটা টাকাও রোজগার করেনি, অথচ এই মেয়ে নিজের রোজগারের টাকা দিয়ে ওকে সংকটের থেকে উদ্ধার করল।

অঞ্জলির বারবার এক কথা, আমিও যদি বাড়ি না থাকতাম তাহলে কি হত?

এই সামান্য সমস্যায় ওর গায়ে কাঁটা দিতে দেখে আনন্দর মজাই লেগেছিল; সংকট কেটে যেতেই সে আর ও নিয়ে মাথা ঘামায় না।

বিকেলে কাকীমার কাছে থেকে এগারো টাকা নিয়ে অঞ্জলিকে ফেরত দিতে গেলে ও বলল, বোসো পরে নিচ্ছি। আনন্দর মনে হল, ওর কিছু একটা মতলব আছে, বোন দুটো আর মায়ের সামনে বলতে পারছে না।

ঠিকই ধরেছে। ফাঁক পেয়ে অঞ্জলি বলল, আচ্ছা রূপদা, এ টাকাটা যদি তুমি নিজে রোজগার করে আমাকে ফেরত দাও তাহলে কেমন হয়?

আনন্দর কেমন মনে হল, টাকাটা অঞ্জলি দিতে পেরে যত খুশি, ফেরত নেবার ব্যাপারে ততো নয়। তবু জিজ্ঞাসা করল, কেন?

কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে অঞ্জলি থতমত খেল একটু। তারপর ফড়ফড় করে বলল, তাহলে তোমার রোজগার করার আগ্রহ বাড়বে।

তার রোজগারের ব্যাপারে অঞ্জলির আগ্রহ কেন তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মেজাজ নয় আনন্দরূপের। একটা মেয়ের নিজের রোজগারের টাকা হাত পেতে নিয়েছে আর সে-টা ফেরত নিতে চায় না তাতেও পুরুষকারে লাগে। শেষে উদার অনুমোদন জ্ঞাপন করল, ঠিক আছে, নিজস্ব রোজগার শুরু হতে আমার আর খুব বেশি সময় লাগবে না, কিন্তু তখন তাহলে তোমাকে এগারো দুগুণে বাইশ টাকা নিতে হবে।

অঞ্জলি সানন্দে রাজি।

কিন্তু এমন মানুষও অঞ্জলি কম দেখেছে। বিকেলে দীপু আর ওকে নিয়ে বেরিয়ে খেয়ে-দেয়ে পকেটের এগারো টাকা ফাঁক করে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত।

টাকা নেওয়া বা খরচ করার ব্যাপারে আনন্দ কোন রকম লাজ-লজ্জার ধার ধারে না। ওদিকে কাকীমাটি নাসকাবারের আগে ওর বরাদ্দ টাকা বার করতে নারাজ। ওই ছুটির মধ্যেই আরো কম করে পনেরো টাকা হাতখরচ দরকার হয়েছে আনন্দর—তখন সে আবার সিগারেট খাওয়া ধরেছে। দীপুর যেটুকু সাধ্য যোগদানদার করেছে। কিন্তু তার দৌড় দুই বা এক টাকা পর্যন্ত। অম্লানবদনে আনন্দ অঞ্জলিকেই বলেছে, আরো পনেরোটা টাকা দিয়ে সংকট উতরে দাও দেখি, কিন্তু এটা আমি মাসের টাকা পেলেই তোমাকে নিতে হবে।

অঞ্জলি সানন্দে রাজি।

অঞ্জলি মাথা নেড়েছে, নেবে ঃ কিন্তু দেবার সময় নেয়নি। বলেছে, ডবলের লোভ কে ছাড়ে, রোজগার করলে এরও ডবল হিসেব হবে।

আনন্দর স্বভাব যত উড়নচণ্ডেই হোক, বোকা নয় একটুও। নিজের মনে ভেবেছেও একটু ওকে নিয়ে। মেয়েটা তাকে অন্যরকম চোখে দেখে এটা আঁচ করতে অসুবিধে হয় না। মন্দ লাগে না অবশ্য ভাবতে, কিন্তু ওকে নিয়ে দূরের সম্ভাবনার কোন চিত্র কেন যেন মনের কোণে ঠাঁই পায় না। মেয়েটাকে ভালো লাগে, আপনার জন ভাবতে ইচ্ছে করে, এই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু নয়।

মনে মনে অনেক বারই ঠিক করেছে, টাকা হাতে এলেই ওর টাকা জোর করেই ওকে দিয়ে দেবে। কিন্তু আনন্দর টাকা হাতে এলে সেটা পাখা মেলে উড়ে যেতেও সময় লাগে না।

অঞ্জলি যেবার বি এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকল, আনন্দ তার পরের বার কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরুলো। নানা গণ্ডগোলে একটা বছর ওদের পরীক্ষা পিছিয়ে গেছিল। দীপু সাদামাটা ভাবে বি. এ পাস করেছে। অনার্স ছাড়ার ফলে এম. এ-তে সীট পায়নি। চাকরির চেষ্টায় আছে। আনন্দ তাকে আশ্বাস দিয়েছে, কুছ পরোয়া নেই, আমার ব্যবসায় ঢুকবি তুই।

আনন্দর বরাবর সংকল্প, ব্যবসায় মস্ত একজন হবে, চাকরি কোন কালে করবে না। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরুতে পারলে ওই লাইনের ব্যবসায় টাকা ঢালার লোকের অভাব হবে? যার যেমন

ভাবনা তার তেমন সিদ্ধি। আনন্দরূপের ভাবনায় ফাঁক নেই, তাই সিদ্ধিটাও নাগালের বাইরে ভাবে না। টাকার যখন দরকার হবে টাকা আসবে—কোথা থেকে কেমন করে আসবে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কিন্তু পাস করে বেরুনোর আগে ওই একটা বছরের মধ্যে মনের রাজ্যে তারও গোটা দুই বড় রকমের নাড়াচাড়া পড়েছে। তার মধ্যে একটা উত্তেজনার ব্যাপার। নিজের বুদ্ধি আর বিবেচনা খাটিয়ে সেটা সে বাতিল করেছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়েছিল সন্দেহ নেই। চিত্ত দস্তরমতো অশান্ত হয়ে উঠেছিল।

নতুন বছরের শীতের মৌসুম। কটা দিন গেলে কলেজ ছুটি হয়ে যাবে। তারপর সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা। এ-সময়টা প্রায় দিনই আনন্দরূপ বোটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে আসে। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নয় একলা আসে। কলকাতা আর আশপাশ থেকে তখন বোটিনিকাল গার্ডেনে বেড়ানোর হিড়িক পড়ে যায়। দলে দলে ছেলেমেয়েরা আসে, স্ত্রীদের নিয়ে স্বামীরা আসে, প্রণয়ী-প্রণয়িনীরা আসে। ভিড় সত্ত্বেও এই বিশাল এলাকায় ইচ্ছেমতো বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব। দিনে দুপুরেই অনেক সময় প্রবৃত্তির হরেক রকমের মজাদার কাণ্ড-কারখানা চোখে পড়ে আনন্দরূপের। তাছাড়া দুচারটে রূপসী মেয়ের সন্ধান তো মেলেই। আর, তেমন রূপসী না হোক, মোটামুটি সুশ্রী আর সুঠাম স্বাস্থ্যের মেয়েদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চোখ চালিয়েও সময়টা ভালো কেটে যায় এখানে। এখানে এলে ঈষৎ গম্ভীর দ্রষ্টার ভূমিকা তার। কারণ সেও যে মেয়েদের দেখার মতো মানুষ একটা সে সম্বন্ধে অনেক আগে থেকেই সচেতন। হাতে বই একখানা থাকেই। একটু নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে বসে। দৃষ্টি-ভোজের রসদ নিরিবিলি জায়গাতেই বেশি মেলে।

সেদিন দিন-দুপুরে একটা কাণ্ড হয়ে গেল। এমন কাণ্ডের জন্য আনন্দরূপ আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কারণ রমণীর দুঃসাহসী বেপরোয়া দিকটা তার অজ্ঞাত।

...একটা গাছের ছায়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিল। হাতের বই হাতেই ছিল। চোখ দুটো আশপাশের চারদিকে ঘোরাঘুরি করে রসদ খুঁজছিল। সেইদিনই কলকাতা থেকে দীপুর চিঠি পেয়েছে। খুশি হবার বদলে মেজাজ একটু খিঁচড়েছে। দীপু নিজের সাদা-মাটা পাসের খবর দিয়েছে আর অঞ্জলির বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার খবর। সেই সঙ্গে হাল্‌কা করে মেয়েটার একটু দেমাকের খবর দিয়েছে দীপু। লিখেছে, তোমাকে আমাদের পাশের কথা লিখছি দেখে অঞ্জলি বলল, লিখে দাও শুধু মাথার জোরে ভালো রেজাল্ট করা যায় না, রূপদা এ-বছরটা অন্তত যেন একটু পড়াশুনায় মন দেয়।

চিঠিটা পড়ে রাগই হয়েছিল আনন্দরূপের। ভেবেচিন্তে পালটা ঠেস দিয়ে একটা জবাব দেবে ভেবেছিল। তারপর মনে হয়েছে, কটা দিন গেলে কলেজ ছুটি—যুৎসই জবাব একটা সামনাসামনি দেবে। সামনে গিয়ে পড়লে ওই দেমাকী মেয়েই কতখানি কৃতার্থ হয় সেটা আনন্দ ভালোই অনুভব করতে পারে। কিন্তু অঞ্জলির কথা মনে হলেই তার চোখ দুটোই যেন সামনে দেখতে পায় আনন্দ। রূপের বালাই কোথাও নেই, কিন্তু তাজা বুদ্ধির এমন মিষ্টি ছাপও আর বোধহয় যে কোনো মেয়ের চোখে দেখেনি। তখন আবার মনে হয়, ফার্স্ট ক্লাস ছেড়ে ওই মেয়ে নিঃশব্দে আরো অনেক ওপরে উঠে যেতে পারে। এখানে বসেই ওই মিষ্টি-মিষ্টি হাসি-হাসি বুদ্ধিমাখা চোখ দুটোই মনে এলো একবার। সঙ্গে সঙ্গে কটা চিন্তা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল।...মেয়েটা যদি আরো খানিকটা সুশ্রী হত, তাহলে? সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা ভিতর থেকে বাতিল করে দিল। ওই মেয়েকে ঘিরে কল্পনায় প্রবৃত্তির লাগাম ছাড়তে নিজেরই সঙ্কোচ।

অদূরে চোখ পড়তে বেশ অস্বস্তি বোধ করল হঠাৎ। হাত কুড়ি তফাতে একটি মহিলা এসে বসেছে। বয়েস বেশি না হলেও মহিলাই বলতে হবে। মাথায় খাটো ঘোমটা, কপালে মাঝারি সাইজের কালো টিপ একটা। এক হাতে ঘড়ি অন্য হাতে মোটা রুলি একটা। বেশ বড় ঘরের মেয়ের মতোই বেশ-বাস। অথচ ওর মতোই মাটিতে ঘাসের ওপর বসেছে। স্বাস্থ্যবতী এবং রীতিমতো সুশ্রীই বলতে হবে। পান বা সেই গোছের কিছু চিবুচ্ছে। আনন্দর অস্বস্তি বোধ করার কারণ রমণী অদূরে বসে অপলক চোখে ওর দিকেই চেয়ে আছে।

চোখাচোখি হতেও মুখ ঘুরিয়ে নিল না, চোখের পলক পড়ল না। ধীরে সুস্থে কিছু একটা চিবুনোর দরুন দুই একবার ঝকঝকে দাঁতের সারি দেখা গেল। অগত্যা আনন্দ নিজেই মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু তার পরেও থেকে থেকে মনে হল রমণী ওর দিকেই চেয়ে আছে।

একটু বাদে আবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ঠিকই তাই। অদূরে একটা বাচ্চা ফুটফুটে মেয়ে ছোটাছুটি করছে। পাশে পাশে একজন আধাবয়সী আয়া ওকে আগলাচ্ছে। আরো খানিকটা দূরে রাস্তার পাশে গাছের আধ-ছায়ায় একটা ঝকঝকে মোটর দাঁড়িয়ে।

দ্বিতীয়বার চোখাচোখি হবার পর রমণীর মুখে কৌতুকের আভাশ দেখেছিল আনন্দ। তৃতীয়বারে স্পষ্টই হাসি দেখল। এবারে রমণী একখানা হাত সামন্য তুলে আঙুলের ইশারায় কাছে ডাকল ওকে।

এ আবার কার পাল্লায় পড়ল ভেবে না পেয়ে বিব্রত মুখে আনন্দ উঠে কাছে এসে দঁড়াল।

চাপা কৌতুকে রমণী মুখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক নিমেষ। তারপর হাত দিয়ে পাশের মাটি চাপড়ে বলল, বৈঠিয়ে।

বৈঠিয়ে শুনে আনন্দ ঘাবড়েই গেল একটু। চকিতে আবার এক পলক দেখে নিল। বেশ-বাশ একেবারে বাঙালি-মেয়েরমতো। মুখের ঢলঢলে আদলও। কপালের কালো টিপটাই যা একটু ব্যতিক্রম। তাছাড়া মাথায় কাপড় আছে কিন্তু সীমন্তে সিঁদুরের রেখা নেই।

হিন্দীর দৌড় সম্পর্কে আনন্দ নিজেই সচেতন। জিজ্ঞাসা করল, কাহে?

রমণী হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সাদা দাঁতের সারি ঝকমকিয়ে উঠল। সেই হাসিমুখেই ভ্রূকুটি তারপর।

—ঘাবড়াতে কাঁহে, বয়ঠো না!

এবারে পুরুষকারে লাগল। সামনে বসেই পড়ল। তারপর রুদ্ধ বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালো। কিন্তু রমণী আর বলে না কিছু, ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ঝিলিক। সেই সঙ্গে ওকে যেন খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে।

সেই ফুটফুটে বাচ্চা মেয়েটা আগন্তুক দেখে হোক বা যে কারণেই হোক লাফাতে লাফাতে রমণীর কাছে চলে এলো, তারপর তার গায়ে ঠেস দিয়ে নতুন মূর্তিখানা দেখতে লাগল। পিছনে তার আয়াও এসে দাঁড়িয়েছে।

রমণী মেয়েটাকে একটু আদর করে আয়ার দিকে ঠেলে দিল।— যাও, খা লেও। আয়ার উদ্দেশে নির্দেশ, ইন্‌কো খানা দেও—

বাচ্চার হাত ধরে আয়া অদূরের গাড়ির দিকে এগলো। হাল্‌কা অথচ বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে রমণী আবার আনন্দর দিকে ফিরল। সেই ফাঁকে তার বুকের ওঠা-নামাটুকুও আপনি যেন চোখে পড়ল আনন্দর। ভিতরে ভিতরে সে রুদ্ধশ্বাস তখনো।

ওদিকে ঠোঁটের ফাঁকে আর চোখের কোণে চাপা হাসির ঝিলিক। ওকে আরো অবাক করে দিয়ে একেবারে বাঙালি মেয়ের মতোই স্পষ্ট বাংলায় জিজ্ঞাসা—কি নাম তোমার?

এই বয়সের কোনো অপরিচিত মেয়ে সোজা বাংলায় তুমি করে বললে কানের পরদায় অন্যরকম লাগে। নাম বলল।—আনন্দরূপ।

—বাঃ! চমৎকার নাম তো! খয়ের ছাড়া পানই চিবুচ্ছে মনে হল। হাসিমাখা চাউনিটা আনন্দর মুখে স্থির হয়ে বসে বসেছে।—ওই নাম খুব মানিয়েছে তোমাকে।...আমার নাম বীণা।

দ্বিধা কাটিয়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, বীণা কি...?

জবাব দেবার আগে হেসে উঠল একপ্রস্থ। চোখ দুটো মুখের ওপর থেকে নড়ছে না—বীণা আগরওয়ালার। সুবিধে হল কি অসুবিধে হল?

রমণীর মাথায় ছিটটিট আছে কিনা চকিতে আনন্দর সেই সংশয়। কিন্তু সেটা বাতিল করতে সময় লাগল না। তার চোখে এমন কিছু আছে যা অভিজ্ঞ কেউ হলে মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিত। আনন্দ অতটা না বুঝুক, কিছু যেন অনুভব করতে পারছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক যে কি বলবে বা কি করবে ঠাওর করে উঠতে পারছে না। ভিতরে কেমন অস্বস্তিকর অনুভূতি একটা।...ওরই বয়সী হবে মনে হল মেয়েটা, দুই এক বছরের বড়ও হতে পারে।

বীণা আগরওয়ালের মুখে এবারে ছদ্ম গাম্ভীর্যের আবরণ পড়ল একটা। বয়স্কা রমণীর মতোই জেরা শুরু করে দিল সে।—তুমি পড়ো এখানে?

আনন্দ মাথা নেড়ে সায় দিল।

—কোথায় পড়ো?

বলল।

—ইঞ্জিনিয়ারিং...কোন্ সাবজেক্ট?

—কেমিক্যাল।

—কোন্ ইয়ার?

—ফাইন্যাল ইয়ার।

—তোমার হাতে ওটা কি বই?

—পড়ার বই।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা পড়ছে আবার।—বই নিয়ে তুমি এখানে পড়তে আস?

—একটু-আধটু পড়ি।

বীণা আগরওয়াল জোরেই হেসে উঠল হঠাৎ। ঝকমকে দাঁতের সারির সবটাই দেখা গেল। শরীর দুলে উঠল একপ্রস্থ, মাথার ছোট ঘোমটা খসে পড়ল। দেহতটের কানায় কানায় কিছু যেন ভরাট হয়ে আবার তেমনি চকিতে মিলিয়ে গেল।

—তুমি একটি মিথ্যেবাদী। এক ফোঁটাও পড়ে না। দুদিন আগেও তোমাকে ভলো করে লক্ষ্য করেছি। তুমি এখানে মেয়ে দেখতে আস।

মথাটা ঝিমঝিম করছে আনন্দর আবার অদ্ভুত একটা আকর্ষণও অনুভব করছে ভিতরে ভিতরে। ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, আবার নড়েচড়ে একটু তফাতে বসতেও মন সরে না। চেষ্টা করে সপ্রতিভ মুখে এবারে একটা জবা দিয়ে ফেলল। জবাব নয়, পালটা প্রশ্ন।— তাহলে তোমাকে দেখলাম না কেন?

হ্যাঁ, কপাল ঠুকে সেও তুমি করেই বলেছে। হাসিহাসি মুখে বীণা চেয়ে রইল খানিক। একটা অনভিজ্ঞ লোক যে সাহসী হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে সেটাই বুঝেই যেন মজা পাচ্ছে। অল্প মাথা নেড়ে বলল, দেখছ ঠিকই, খেয়াল করোনি।...আমার মাথায় এর থেকে ঘোমটা ছিল, সঙ্গে আরো মেয়েছেলে আর ভুড়িঅলা লোক ছিল দুজন—তুমি দেখতে পেলেও দেখবে কেন, তোমার চোখ তো কলেজের মেয়েগুলোর দিকে—

এ কার পাল্লায় পড়েছে আনন্দরূপ জানে না। কানের কাছটা গরম ঠেকছে সেই থেকে। তার দিকেই চেয়ে রইল।

জিব দিয়ে মুখের পানের কুচি জড়ো করে জঠরে চালান করতে করতে বীণা জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ?

—ইয়ে...তুমি বাঙালি নও কিন্তু সুন্দর বাংলা বলো।

হেসে উঠল।—আমি বাচ্চা বয়েস থেকেই এখানে আছি, বাঙালির স্কুলে কলেজে পড়েছি, বাঙালি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশেছি...বাঙালি বিয়েও করার ইচ্ছে ছিল, হল না।

আবার একপ্রস্থ চাপা হাসি।

—চা খাবে?

আনন্দ এদিক-ওদিক তাকালো।—কোথায়?

জবাব না দিয়ে বীণা মুখ ফিরিয়ে অদূরের ঝকঝকে গাড়িটার দিকে চেয়ে একটু জোরেই বার কয়েক হাত-তালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে আয়া ঘাড় ফেরাতে হাতের ইশারায় তাকে জানিয়ে দিল কি চাই।

একটু বাদে এক কোমরে বাচ্চাটাকে ঝুলিয়ে অন্য হাতে একটা ফ্লাক্স নিয়ে আয়া হাজির। ফ্লাস্ক আর বাচ্চা দুই-ই রেখে আবার সে গাড়ির দিকে ছুটল। এবারে একটা পেয়ালা প্লেট নিয়ে ফিরল। চা ঢেলে দিতে হবে কিনা ভেবে ইতস্তত করছিল, মনিবানির নির্দেশ এলো, ঠিক হ্যায়, তুমি যাও।

মেয়ে নিয়ে সরে গেল। বীণা আগরওয়ালের শিথিল দৃষ্টি আবার এক দফা আনন্দর মুখের ওপর বিচরণ করল। তারপর অল্প হেসে ফ্লাস্ক-এর দিকে হাত বাড়িয়ে আলতো করে বলল, তোমার বেজায় তেষ্টা পেয়েছে মনে হচ্ছে।

আনন্দর ঠোঁট আর জিব সত্যিই কেন যেন শুকিয়ে কাঠ। কথা বলার দায়েই অদূরের বাচ্চাটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মেয়ে?

—না, আমার দেওরের মেয়ে। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল। তারপর ফ্লাস্ক-এর মুখে নিজের জন্য চা ঢেলে নিল। মুখে তোলার আগে হাসল একটু। বলল, আমার বিয়ে হয়েছে সাত বছর আগে, আর আমার দেওরের সাড়ে ছ-বছর আগে। মাত্র আড়াই বছর আগে দেওরের হঠাৎ এই মেয়ে হল।

ঠোঁটের হাসি সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বীণা আগরওয়ালের। চায়ে চুমুক দিচ্ছে কিন্তু চেয়ে আছে আনন্দর দিকেই। কথাগুলো ঠিক ঠিক মাথায় ঢুকল না আনন্দর, অথচ মনে হল বিশেষ কিছু তাৎপর্য আছে। গভীর মনোযোগে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে সেও, কিন্তু ভিতরের অস্বস্তি বাড়ছেই।

চায়ের পেয়ালা খালি হয়ে গেল। বীণার হাতের পাত্র আগেই খালি হয়েছে। সেটা সামনে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করল, এখানে হোস্টেলে থাকো তাহলে?

আনন্দ মাথা নাড়ল, তাই।

—বাড়ি কলকাতায়?

—হ্যাঁ।

—যাও না?

—ছুটি-ছাটায় যাই। সাহসে ভর করে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোন দিকে থাকো?

—হাওড়া।...কেন, যাবে নাকি একদিন? চাউনিটা শিথিল, গলার স্বরে কৌতুকের আমেজ।

থেকে থেকে নিজের ওপরেই কেমন রাগ হচ্ছে আনন্দর। চেষ্টা করেও সহজ হতে পারছে না। উলটে ওই অপরিচিতা রমণী যেন অনায়াসে অধিকার বিস্তার করছে ওর ওপরে।

দিনের আলোয় টান ধরতে শুরু করেছে। উঠে পড়বে কিনা ভাবছে। পলকা গাম্ভীর্যে বীণা আগরওয়াল আবার জিজ্ঞাসা করল, ক-গণ্ডা গার্লফ্রেণ্ড তোমার?

আনন্দ মাথা নাড়ল। নেই।

—নেই? একটাও না? তুমি রাম মিথ্যেবাদী।

এবারে পুরুষের মতোই জবাবটা দিল আনন্দ। বলল, মিথ্যে বলব কার ভয়ে।...গার্লফ্রেণ্ড জোটানো তো জল-ভাত ব্যাপার, ইচ্ছে করলেই এক ডজন জুটতে পারে—ভালো লাগে না।

রমণীর কৌতুকছটা মুখের ওপর স্থির হল এবার। বেশ মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগল। যেন এ-ভাবে দেখেই সে সত্য-মিথ্যা আঁচ করতে পারে। সোজাসুজি তাকালে ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য একটু হাসির লুকোচুরি ঠাওর হতে পারে। কিন্তু সোজাসুজি তাকানো যাচ্ছে না সেভাবে। কানের কাছটা এখন বেশি গরম ঠেকছে আনন্দর।

মাথার ঘোমটা সেই যে খসে পড়েছিল আর তোলা হয়নি। বড়-সড় একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল বীণা আগরওয়াল। ফলে উর্ধ্ব অঙ্গে বাঁকা চোরা তরঙ্গের একটু আভাস দেখা গেল। মাটি ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, এবারে ফেরা যাক...

ধূসর রঙের শাড়িটা নাইলনের হবে বোধহয়, কাঁধ পিছলে আঁচলটা খসে পড়তে বীণা সেটা ধরে ফেলে ধীরে সুস্থে আবার সেটা কাঁধের ওপর সুবিন্যস্ত করল। কিন্তু এরই ফাঁকে রমণীর সুডৌল বক্ষের আভাস আনন্দর অনভিজ্ঞ চোখে যেন বসিয়ে দিল এক দফা।

বীণা বলল, তোমার সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগল। কাল আবার আসছ?

এক মুহূর্ত না ভেবে আনন্দ জবাব দিল, না, কাল বেলা পর্যন্ত ক্লাস আছে—

—পরশু?

জবাব দিতে পারা গেল না। আনন্দ মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

ঠোঁটের ফাঁকে আবার একটু হাসির ঝলক মিলিয়ে গেল, বীণা বলল, পরশুই এসো তাহলে—

শিথিল চরণে—অদূরের গাড়ির দিকে চলল। চায়ের পেয়ালা আর ফ্লাস্ক সেখানেই পড়ে আছে। তাকে এগোতে দেখে আয়া ছুটে এসে মাটি থেকে সেগুলো তুলে নিয়ে গেল আর সেই ফাঁকে পর্যবেক্ষণের একটা তির্যক দৃষ্টিও মুখের ওপরে ছড়িয়ে রেখে গেল।

বাচ্চাটার হাত ধরে বীণা আগরওয়াল গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আনন্দ চোখ ফেরাতে পারছে না সেদিক থেকে, চোখে পলক পড়ছে না।

একেবারে গাড়ির কাছে গিয়ে বীণা ঘুরে তাকালো একবার। এত দূর থেকে আনন্দর মনে হল এবারে সত্যিই গম্ভীর সে। বাচ্চাটাকে তুলে নিজেও গাড়িতে উঠে বসল। আয়া সামনে। গাড়িটা সামনের বাঁকে গাছের আড়ালে পড়ে গেল।

সমস্ত রাত্রি ভালো ঘুম হল না আনন্দর। সেই শীতের রাতেও উঠে বারকয়েক মুখে চোখে জল দিয়েছে, জল খেয়েছে। আধা ঘুমের মধ্যেও রমণীর দুটো চোখ যেন ওর সর্বাঙ্গে বিচরণ করেছে। তারও যেন ঈষৎ উষ্ণ স্পর্শের মতো অনুভূতি আছে একটা। সেটা যন্ত্রণাদায়ক অথচ লোভনীয়।

পরদিন পড়াশুনা আর ক্লাস দুই-ই মাথায় উঠল। নিজের ওপরেই রাগ হতে থাকল, কেন মিছিমিছি বেলা পর্যন্ত ক্লাসের অজুহাত দেখাতে গেল। বিকেলে ছুটে বেরুনোর জন্য ভিতরটা উন্মুখ। তবু জোর করেই ধরে রাখতে হল নিজেকে। তাছাড়া যে জন্য যাওয়া, সে-যে আজ আসবে তার ঠিক কি?

সেই রাতে মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা। পরদিন সকালে আরো বেশি। আর সে ওই বোটানিকাল গার্ডেনের দিক মাড়াবেই না ঠিক করে ফেলল। এ সবের পরিণাম কি বুঝতেই তো পারছে। মাঝখান থেকে পরীক্ষা মাথায় উঠবে।

কিন্তু দুপর গড়াতেই না গড়াতে সংকল্প ধুলিসাৎ। একটা অদৃশ্য আকর্ষণ যেন হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে গেল ওকে।

বেলা তখন চারটে হবে। বীণা আগের দিনের সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখামাত্র আগের দিনের সেই অস্বাচ্ছন্দ্যটা শরীরের মধ্যে ওঠা-নামা করতে লাগল। তবু হাসি-হাসি মুখেই কাছে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল।

...অদূরে গাড়িটা আছে। আয়াও আছে। শুধু বাচ্চাটা নেই।

ঠাণ্ডা চোখে বীণা তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল একবার। সেদিনের থেকে আজ স্পষ্টই গম্ভীর একটু। সত্যি মেকী ঠাওর হল না।

আনন্দ কাছে আসতে বীণা সামনের দিকে পা বাড়ালো। অর্থাৎ একটু হাঁটার ইচ্ছে। রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে খুব ধীরেসুস্থে পাশাপাশি চলল দুজন। এই মুহূর্তে কেন যেন আনন্দর পুরুষের মতো সহজ হবার দ্বিগুন তাড়া। জিজ্ঞাসা করল, কতক্ষণ এসেছ, অনেকক্ষণ নাকি?

—না। তুমি ক্লাস-ট্রাস শেষ করে এলে বুঝি?

—হ্যাঁ।

ঘাড় ফিরিয়ে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি ছুঁড়ল যেন বীণা। যার অর্থ ক্লাস কি রকম করেছ আমার জানা আছে।

বৃত্তাকারে একটু ঘোরঘুরিকরে একটা ঝুপড়ি গাছের পাশে এই দাঁড়িয়ে গেল বীণা। চারদিক একবার দেখে নিয়ে সেখানেই বসে পড়ল। ওকে বলল, বোসো—।

আনন্দ বসল, বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা সত্যি কেমন ধুকপুক করে উঠল হঠাৎ। ছুটির দিন নয়, লোকের ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। সামনে ডাইনে বাঁয়ে কয়েকটা গাছের আড়ালে জায়গাটা নির্জন। গাছের ফাঁক দিয়ে অদূরে আয়াকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে।

আগের দিনের মতোই হাতের তালি বাজিয়ে ওকে কাছে ডাকল বীণা। হিন্দীতে চায়ের ফ্লাস্ক আর খাবারের বাক্স দিয়ে যেতে বসল।

আগের দিনের থেকেও দ্বিগুণ অস্বস্তি আনন্দর। কেবলই মনে হতে লাগল না আসাই ভালো ছিল। বলল, আবার খাবার কেন?

—তোমার জন্যে এনেছি। ঠাণ্ডা দুচোখ মুখের ওপর স্থির একটু।—তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন?

আনন্দ জোর দিয়ে অস্বীকার করল।—বাঃ! ঘাবড়াব কেন—ঘাবড়াবার কি আছে?

দুচোখ মুখের ওপরে আটকেই আছে। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস দেখা গেল কি গেল না।

আয়া চা আর খাবারের বাক্স রেখে গেল। বীণা ধীরে সুস্থে খাবারের বাক্স খুলে বড় ডিশে খাবার সাজিয়ে তার সামনে এগিয়ে দিল।

—তোমার?

—তুমি খাও তো আগে।

নিজেকে আড়াল করার তাগিদেই আনন্দ ডিশটা টেনে নিল। বীণা মাঝে মাঝে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। কলকাতায় কোথায় বাড়ি, সেখানে কে আছে না আছে, এখান থেকে পাস করে বেরুবার পর কি করবে না করবে ইত্যাদি।

এক কথার জবাবে আনন্দ হড়বড় করে পাঁচ কথা বলে যেতে লাগল। নিজে কথা বলার থেকে রমণী আজ শুনছে বেশি আর দেখছে বেশি আনন্দ তাও অনুভব করছে। আর মাঝে মাঝে টিফিনবক্স থেকে ওর ডিশে খাবার তুলে দিচ্ছে। কথা ফুরোলেই অস্বস্তি। আনন্দ তাই বলেই চলেছে। ফলাও করে ভবিষ্যতের ব্যবসার চিত্রটাও তুলে ধরার চেষ্টা।

তবু কথা ফুরালো একসময়। এবারে নির্বাক চোখাচোখি। আবার অস্বস্তি।

বীণা চায়ের ফ্লাস্ক খুলে পেয়ালায় চা ঢালতে লাগল। আনন্দ লক্ষ্য করল টিফিনবক্স খালি। বলে উঠল, বা রে, তুমি তো কিছুই খেলে না!

—তুমি একলাই সব সাবড়ে দিলে, খাব কি করে? চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল।

আনন্দ এতক্ষণে বীণার চোখের কোণে কৌতুক ঝরতে দেখল একটু! চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে লজ্জা পাবার মতো করে বলল, হোস্টেলে থাকি...এ-রকম খাবার তো চোখে দেখি না, মেরে দিলাম।

শীতের পড়ন্ত বেলার ছায়া এদিকটায় আরো বেশি ঘন হয়েছে এরই মধ্যে। বীণার মুখেও যেন ওই একই রকমের ছায়া। চেয়ে আছে। বলল, বেশ করেছ, তোমার জন্যেই আনা-বাড়িতে এলে আরো ভালো খাওয়াব। কবে আসছ?

প্রস্তাব শুনে চমকেই উঠল আনন্দ।—বা-বাড়িতে!

—ভয় করছে?

—না..কে কি ভাববে।

—ভাবা-ভাবি নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। কম আলোর মধ্যেও ওই দুটো চোখ আনন্দর সমস্ত মুখখানা যেন সম্পূর্ণ দখলের মধ্যে টেনে নিয়ে আসছে। আর সেই সঙ্গে দ্রুত চিন্তাও করছে যেন কিছু। বলল, কাল মঙ্গলবার..কাল দুপুরে আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে তুমি বাড়িতে এসো।

দুকথায় বাড়ির ঠিকানা বলে নিশানা বুঝিয়ে দিল। বলল, আমার ওই আয়া নীচে অপেক্ষা করবে, তোমাকে ভিতরে নিয়ে যাবে...কাল ঠিক আড়াইটে থেকে তিনটে...মনে থাকবে?

বুকের ভিতরে আচমকা একটা কাঁপুনি ধরেছে আনন্দর। ওই দুটো অদ্ভুত চোখের আওতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না। বিড়বিড় করে বলল, ও-সময়ে ক্লাস আছে...

ঈষৎ ঝাঁঝালো সুরে বীণা বলল, ক্লাস করতে হবে না।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। গাঢ়তর ছায়া ফুঁড়ে চারদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করে নিল একবার। তারপর হাঁটু মুড়ে পাশেই বসে পড়ে দুহাতে আনন্দর মাথাটা সজোরে তার পরিপুষ্ট বুকে টেনে নিল। পরক্ষণে ওই দুহাতে মাথাটা সামনে তুলে ধরল। তারপর চকিতে উষ্ণ নিবিড় দুই অধর ওর ঠোঁটের ওপর বসিয়ে দিল।

ছেড়ে দিয়ে একই তৎপরতায় উঠে দাঁড়াল আবার। চাপা হুকুমের সুরে বলল, কাল দুপুরে আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে তুমি আসছ।

দ্রুত চলে গেল।

আনন্দ বিমূঢ়ের মতো বসে। একটা উষ্ণ তাপ সর্বাঙ্গে ওঠা-নামা করছে। বুকের ভিতরে যেন ঠক-ঠক শব্দ বাজছে।

আনন্দ ভয় পেয়েছে।

একটা অদ্ভুত পিচ্ছিল ভয় যেন ছেঁকে ধরে আছ তাকে। হোস্টেলে ফেরার পরেও ওই ভয়টা পিছু ধাওয়া করেছে। সামনে এতবড় শীতের রাত্রি। এই রাত কাটবে কি করে আনন্দ জানে না। তারপর দিন। ওই দিনটা গ্রাস করবে তাকে। আনন্দ হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে না, জানে। তাকে যেতে হবে। একটা অমোঘ আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে যাবে।

পরে সেই অস্বাভাবিক ভয়ের কথা মনে হতে নিজেই হেসে সারা! মনে মনে গাধা বলেছে নিজেকে। পরের কথা পরে, সেই সন্ধ্যায় ওর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছল।

হঠাৎ শরীর খারাপের অজুহাতে সোজা কলকাতায় পালিয়ে এসেছে। ওকে এ-সময় দেখে কাকা কাকীমা অবাক, দীপু,অবাক, অঞ্জলি অবাক। সকলে জানে, আর কটা দিন বাদে ছুটি হলে একবারে মাস দেড়েকের জন্যে চলে আসবে।

অসময়ে আসার কৈফিয়ত যা হোক একটা দিয়েছে। কিন্তু এখানে আসার পরেও ভিতরটা অশান্ত অস্থির আগের মতোই। দীপুর সঙ্গে বা অঞ্জলির সঙ্গেও আগের মতো হাসিমুখে কথা বলতে পারে না, গল্প করতে পারে না।

দীপু জেরা করতে ছাড়েনি, কি হয়েছে বল্ দেখি রূপদা?

—কেন, কি হবে?

—এখানে এসেও তুই এমন চুপচাপ কেন হঠাৎ? কলেজে কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে এসেছিল নাকি?

—আরে না না সে-সব কিছু না।

মোহগ্রস্তের মতো দুটো দিন কাটিয়ে আনন্দরূপ আবার হোস্টেলে ফিরে গেল। দীপুর ভিতরটা কতখানি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে টের পেল না। রূপদার এ-রকম মুখভার নিয়ে আসা-যাওয়াটা বিশেষ ব্যতিক্রম।

এই ব্যতিক্রম অঞ্জলির চোখেও পড়েছে। দীপুকেই জিজ্ঞাসা করেছে, রূপদার হঠাৎ কি হয়েছে বলো তো?

অঞ্জলি দীপুর থেকে মাস কয়েকের ছোট, নাম ধরে ডাকলেও 'তুমি' করে বলে।

দীপু গম্ভীর।—আমার মনে হয় মেয়েঘটিত ব্যাপার কিছু।

—ধেৎ। অঞ্জলি লজ্জা পেয়েছে।

—ধেৎ নয়, হঠাৎ কোনো মেয়ের তাড়া না খেলে রূপদার মেজাজপত্র এ-রকম হবে কেন? ব্যাপারখানা টেনে বার করতে হবে।

অঞ্জলি হঠাৎ হেসেছে খুব। বলেছে, তাহলেও রূপদার দোষ কি বলো, যে-চেহারা তাড়া খেতেই পারে।

নিজেই লজ্জা পেয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে তারপর।

দীপু পরদিনই তার সন্দেহর কথা আনন্দকে লিখেছে। সেই সঙ্গে অঞ্জলির মন্তব্যও।

সেই চিঠি পড়ে কেন যে দীপুর ওপর আর সেই সঙ্গে অঞ্জলির ওপরেও রাগ হয়েছে আনন্দর, জানে না। আসলে নিজেকেই আবার কাপুরুষ ভাবতে শুরু করেছে সে তখন। হাওড়ার এক বাড়ির ঠিকানায় গিয়ে হাজির হবার লোভ মনের তলায় উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে—নিজের কাছেই সেটা অস্বীকার করার তাড়না।

...ঠিক এই কটা দিনের মধ্যেই তার তৃষিত মনের বাস্তবে আর কে সুদর্শনার আবির্ভাব। সে বীণা আগরওয়ালের মতো কেউ নয়, এই বয়েসের ছেলেদের যেমন একটি কুমারী মেয়ে দেখলে মন ভরে তেমনি একটি মেয়েই।

...বীণা আগরওয়ালের ওপর আনন্দ হঠাৎ মনে মনে কৃতজ্ঞ। ওই রমণী আর কিছু না হোক, ওকে দুঃসাহসী করেছে। নিজের চেহারার জোরটার ওপর এক বিপুল আস্থা এনে দিয়েছে। দ্বিধা সংকোচ অনেকখানি ঘুচিয়েছে।

তার নাম শ্রিপ্রা—শিপ্রা নন্দী।

আনন্দর কলেজের এক প্রোফেসারের মেয়ে। কলকাতায় থেকে মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। ছুটি-ছাটায় বাবা মায়ের কাছে এসে থাকে। বরাবরই কলকাতায় জ্যাঠার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে। জ্যাঠার অবস্থাও ভালো। তার মেয়ে নেই, ওকেই মেয়ের মতো ভালবাসে।

প্রোফেসারের বাড়িতে কদিন আনাগোনা করে তার ছোট ভাইয়ের মারফত এসব খবর সংগ্রহ করতে করতে আনন্দর ছুটি এসে গেছে। কিন্তু তখন তার মনস্তাপ। আগে আর কোনো ছুটির মুখে কেন সে পড়ার তাগিদ নিয়ে এই প্রোফেসারটির বাড়িতে হানা দেয়নি।

...প্রোফেসারের বাড়িতে ছুটির পড়া বাছাই করে নিতে এসেছিল সেদিন। হঠাৎ-ই ওই মেয়ের ওপর চোখ পড়েছে তার। মেয়েটাও দেখেছে তাকে। সামনে পড়লে কোনো মেয়ে চোখ চেয়ে না দেখে পারেনা—এ বিশ্বাস বদ্ধমূল। অতএব ছুটির আগের কটা দিনই প্রোফেসারের বাড়িতে আসার তাগিদ। একবার দুবার দেখা রোজই হল। সেই ফাঁকে খবরও সংগ্রহ করত। প্রোফেসার তো সারক্ষণ আর ঘরে ছাত্রকে আগলে থাকেন না। তাঁর ছোট ছেলের ক্রিকেট খেলার ঝোঁক খুব। অবসর খুঁজে নিয়ে বাইরের প্রাঙ্গণে আনন্দ সোৎসাহে বল করে ওই ছেলে সানন্দে ব্যাট করে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে তার দিদিও দেখে এক- একসময়।

সন্তর্পণে তার কাছ থেকেই খবর বার করল আনন্দ। দিদির নাম শিপ্রা। আনন্দর বিবেচনায় বড় সুন্দর নাম।...দিদি গেল বছর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছে—লম্বা ছুটিতে বাড়ি এসেছে। —মেডিক্যাল কলেজে পড়ে! বাঃ! আনন্দ নিজের মনেই তারিফ না করে পারে না।

আনন্দর অবাঞ্ছিত ছুটিটা এসেই গেল। হোস্টেলও বন্ধ। কিন্তু ফাইন্যাল পরীক্ষা আসছে বলে হঠাৎ তার পড়াশুনায় এত উৎসাহ যে এখানেই একটা মেসে থাকার ব্যবস্থা করে ফেলল। তারপর পড়াশুনার আগ্রহে রোজ ওই প্রোফেসারের বাড়িতে ছুটতে লাগল।

শিপ্রা নন্দী দিন কয়েকের মধ্যেই বুঝতে পারল ব্যাপারখ্যানা। এ এমনই এক ব্যাপার যে বুঝতে দেরি হয় না। তারও যেন মনে ধরেছে একটু আনন্দ তাও অনুভব করতে পারে। শেভ করতে বসে আয়নায় অনেকক্ষণ ধরে নিজেকেই দেখে।

বিকেলে বেড়াতে বেরুবার সময় প্রায়ই ওদের দেখা হয়ে যেতে লাগল। শিপ্রার দেখা পেলেই আনন্দ দাঁড়িয়ে পড়ে। হাসে একটু। শিপ্রাকেও দাঁড়াতে হয়। হাসতে হয়। শুরুতেই অবজ্ঞা দেখিয়ে দুপাঁচজন ছেলের ঘণিষ্ঠ হবার উৎসাহ নিষ্প্রভ করে দিয়েছে, কিন্তু এর বেলায় পারা গেল না। আলাপটা যথাসম্ভব দ্রুত তালেই ঘটে যেতে লাগল। বাড়িতে ছেলেটার প্রশংসা শুনেছে শিপ্রা, আর হৃদ্যতা একটু বাড়তে তার মনে হল এ-রকম মজার মানুষও কম আছে। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে কেন সে ছুটিতে বাড়ি যেতে পারল না তাও শিপ্রার কাছে প্রায় সোজাসুজি প্রকাশ হয়ে গেল।

শিপ্রা সেদিন জিজ্ঞাসা করেছে, কলেজ তো ছুটি, আপনি হোস্টেলে থাকেন না?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আছেন কি করে, ছুটির মধ্যে হোস্টেলে থাকতে দেয়?

—তা কখনো দেয়!

—ও...কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে থাকেন বুঝি?

—না। আমার আত্মীয়ের বাড়ি কলকাতায়। এখানে ছুটির কটা দিন মেসে থাকব।

—ছুটিতে বাড়ি যান না?

—প্রত্যেকবার যাই, এবারে, গেলাম না।

—কেন?

—বাড়িতে লিখে দিয়েছি, সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা, বেজায় পড়ার চাপ...কিন্তু আসল সত্যটা অন্যরকম।

শিপ্রা উৎসুক।— কি রকম?

—সেটা এখনই বলা বিপজ্জক, আর কটা দিন যাক...।

শিপ্রা নন্দী আরো অবাক।—কেন?

বিব্রতমুখে আনন্দ বলে উঠল, কি মুশকিল, আবার কেন?

শিপ্রা থতমতো খেল একটু।—বলতে অসুবিধে আছে বুঝি?

—অসুবিধে আর কি ভরসা পেলেই বলতে পারি।

ঠিক বোধগম্য হল না শিপ্রার, মুখের দিকে চেয়ে রইল। দূরের দিকে চোখ রেখে আনন্দ বলল, এক-একসময় এমন একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় যখন কেবলই মনে হয় সমস্ত জীবন ধরে আমি যেন তারই জন্যে অপেক্ষা করছি।...সেই রকমই কাণ্ড হয়েছে হঠাৎ।

—দেখা হয়েছে কারো সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—কার সঙ্গে?

—আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে। এই জন্যেই আমি ছুটির মধ্যেও এখানে পড়ে আছি আর মেসের শাক চচ্চড়ি খাচ্ছি।

শুনে শিপ্রা আরক্ত। কিন্তু এই গোছের বেপরোয়া সত্যভাষণের একটা আবেদনও আছে। সে-ও স্বভাবতই কৌতুক বোধ করে, আকৃষ্ট হয়। ওদিকে বাড়ির লোক এমন কি প্রোফেসার পর্যন্ত তার অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠাটা লক্ষ্য করেছে। এমন সুন্দর চেহারা, মস্ত বড়লোকের ছেলের মতোই তার চাল-চলন, অথচ হাসি-খুশি স্বভাব-মেয়ের বাবা-মা স্বাভাবিক কারণেই ছেলেটার ওপর বিরূপ হতে পারলেন না। ওদিকে মেয়েটার ভাবগতিকও দেখছেন তাঁরা। ওই ছেলে পড়তে এলে কেমন উসখুস করতে থাকে—হঠাৎ তার চা খেতে ইচ্ছে হয়, আর বানায় যখন বাবা আর তার ছাত্রকে এক পেয়ালা করে পাঠায়। কারণে-অকারণে ঘরে ঢুকে বাবাকে এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করে।

ফলে মেয়ের মা-ই বিশেষ করে ফাঁক মতো আনন্দর সঙ্গে, আলাপ করে নিলেন। বাবা-মা নেই আর কাকা কলেজের মাস্টার শুনে একটু বোধহয় হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু আনন্দ সেটুকু আঁচ করে নিয়ে বলেছে, তার পড়াশুনা বাবার টাকাতেই চলছে, তার ব্যবস্থা বাবাই করে গেছেন—কাকার ওপর নির্ভর করতে হয় না।

মেয়ের মা আবার উৎসাহ বোধ করেছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন বাবা কি করতেন? অম্লানবদনে সত্যের আংশিক অপলাপ করেছে আনন্দ। স্টীল ফ্যাক্টরি ছিল।

লোহা-লক্কড়ের ছোট কারখানা ছিল একটা এ অবশ্য সত্যি কথা। কিন্তু সেটাকে ফ্যাক্টরি বললে অন্য মানে দাঁড়ায়।

শিপ্রাও শুনেছে, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেরিয়ে সে মস্ত ব্যবসা ফেঁদে বসবে—চাকরি কস্মিনকালে করবে না।

এই স্বাধীন চিন্তার জোর দেখে ওই বয়েসের মেয়ের ভালো লাগার কথা ভালো লেগেছেও। তারপরেই আনন্দ আবার বলেছে, কিন্তু আমার পাস করে বেরুনোই হবে কিনা সন্দেহ।

—কেন? শিপ্রা অবাক, কারণ বাবার মুখে শুনেছে এই ছেলে পড়াশুনায়ও ভালো।

—তোমার ছুটি ফুরিয়ে এলো, আমার তো এবারে কলেজ আর হোস্টেল পালিয়ে কলকাতায় ছোটাছুটি করতে হবে।

শিপ্রা প্রথমে হেসে সারা। মাথা দুলিয়ে বলেছে, জ্যাঠা খুব কড়া মানুষ, কলকাতার বাড়িতে দেখাই হবে না।

—ও বাবা, তাহলে?

শুনেই সঙ্কটাপন্ন দশা যেন আনন্দর। শিপ্রা আবারও হেসে ফেলে বলেছে, তাহলে ভালো ছেলের মতো এখানে বসে পাশটা করে ফেলাই ভালো।

—তাহলে নির্ঘাৎ আরো ফেল। বই খুলে কেবল তোমাকেই দেখতে হবে।

নিজের সুশ্রী চেহারা সম্পর্কে শিপ্রা নিজেও সচেতন। কিন্তু এ ছেলের তুলনায় কিছুই নয় মনে হত। ফলে আকর্ষণটা ওরও কম নয়। কিন্তু চেহারা থেকেও এই ছেলের কৌতুক-নির্ঝর সঙ্গটুকও কম

লোভনীয় নয়। মেডিক্যাল কলেজের ওপরের ক্লাসের অনেক ছেলের এরই মধ্যে কত ছেলে ওর কাছে আসার চেষ্টা, কিন্তু এর ধরন-ধারণই আলাদা। এ যেন দস্যুর মতো আদায় করে নিতে জানে। এরই মধ্যে দুচারবার ফাঁকতালে হাত-টাত ধরা-টরা হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, এই অধ্যায়ের আনন্দরূপের সুতৎপর পুরুষের ভূমিকা। মাত্র দুটি দিনের মধ্যে বীণা আগরওয়াল ওর ভিতরে একটা বড় রকমের পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সেই রমণী এখনো ওকে মনে রেখেছে কিনা জানে না। রাখলেও সে নিশ্চয় ভীরু কাপুরুষ ছাড়া আর কিছু ভাবে না ওকে। তার দোষ ধরতে পারে না আনন্দ। সেই রমণী-সন্নিধানে নিজের ভীরুতার সাক্ষী সে নিজেই। অবশ্য তার ওই বিসদৃশ আমন্ত্রণের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার দরুন আগেও ক্ষোভ ছিল না, এখন তো নেই-ই। কিন্তু বুকের তলার লোভ-জড়ানো সেই ভীরু ধুকপুকুনি অস্বীকার করবে কেমন করে?

তাই এমন দ্রুততালে শিপ্রা নন্দীর হৃদয় মন-হরণের প্রতি এত ঝোঁক তার। এখানে সে অনেকখানি দুঃসাহসিক। আর দ্বিগুণ আত্মতুষ্টিতে ভরপুর। কারণ, কোথায় গোপনচারিণী বীণা আগরওয়াল আর কোথায় মুক্ত যৌবনের আলোয় ঝলমল মেডিক্যাল কলেজে পড়া মেয়ে শিপ্রা নন্দী—দুজনের তুলনাই হয় না। যেখানে জয় করে নেবার প্রশ্ন সেখানেই যথার্থ দুরন্ত পুরুষের ভূমিকা তার।

বীণা আগরওয়ালের ঘটনাটা ঝোঁকের বশে সেদিন নিজেই ফাঁস করে ফেলল আনন্দ। এরই মধ্যে শিপ্রা নন্দীর কাছে তার গোপন করার কিছুই নেই যেন। কিন্তু আসলে এই মেয়ের চোখে নিজেকে প্রবল পুরুষই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল সে! মনে হয় প্রতিপন্ন করতে পেরেছে। বেশ কৌশলেই ঘটনাটা ব্যক্ত করা গেছল। শিপ্রা দিনকয়েক বোটানিকাল গার্ডেনের দিকে বেড়ানোর প্রস্তাব করেছে, আর প্রত্যেক বারই আনন্দ যেন সভয়ে সে প্রস্তাব নাকচ করেছে।

সেদিনও উৎসুক নেত্রে মুখের দিকে চেয়ে শিপ্রা জিজ্ঞাসা করল, ওখানে যাবার নামে অমন আঁতকে ওঠার কারণ কি?

আনন্দ গম্ভীর।—ওখানে ছেলে-ধরা আছে।

— কে ছেলে-ধরা?

—প্রমীলাকুলোদ্ভবা।

শিপ্রা আরো উৎসুক।—কোনো প্রমীলা তোমাকে ধরেছিল?

—ধরে ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়েছিল, কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

শিপ্রার জুলুম শুরু হয়েছে তক্ষুনি।—কি ব্যাপার আমি শুনব।

—শুনলে বুল বোঝার সম্ভাবনা, রেগেও যেতে পারো।

—না বললে আরো বেশি রেগে যাব।

বলেছে। নিজের সুপ্ত লোভটুকু বাদ দিয়ে মোটামুটি সত্যি ছবিটাই তুলে ধরেছে।

শুনে শিপ্রা নন্দী কণ্টকিত। জোর করেই তারপর আনন্দকে বোটানিকাল গার্ডেনে ধরে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয় দিনের গাছ-ঘেরা সেই নির্জন জায়গায় গিয়ে বসেছেও দুজনে। তারপর একসময় শিপ্রা হেসে উঠেছে খিলখিল করে।

—যা-ই বলো, বীণা আগরওয়াল কিন্তু তোমাকে এক নম্বরের ভীতু ভেবেছে।

আনন্দ গম্ভীর।—ভীতু কিনা পরখ করার ইচ্ছে আছে?

—ধেৎ! মুখ লাল করে শিপ্রা উঠে দাঁড়িয়েছে।—চলো, আর বসে না।

রাতের শয্যায় নিজের মনে হেসেছে আনন্দরূপ। বীণা আগরওয়াল তাকে ঘৃণা করলে কি যায় আসে—এই একটি ঘটনা উন্মোচনের ফলে শিপ্রা নন্দীর চোখে সে আরো প্রবল পুরুষই হয়ে উঠেছে।

...ছুটি ফুরিয়ে এলো। এবারে শিপ্রা কলকাতা রওনা হবে। কিন্তু এখানে একলা মুখ বুজে পড়ে থাকার কথা ভাবতেও বিরক্তি আনন্দর। আবার ছুটি কাটিয়ে কলেজ খোলার মুখে কলকাতায় ছুটলে বাড়ির লোকই বা ভাববে কি। বিশেষ করে দীপু আর অঞ্জলি। ...অঞ্জলি অবশ্য মুখে কিছুই বলবে না, কিন্তু মেয়েটা যেন ভারী চুপচাপ মজা দেখতে জানে।

রওনা হওয়ার আগে শিপ্রা কিছুটা আশ্বাসের সুরে বলেছে, কলকাতা যাওই যদি, বাড়িতে না হোক অন্যত্র দেখা হতে পারে। কলেজে...না কলেজে না, ছেলেগুলো সব হ্যাংলার মত হুমড়ি খেয়ে

পড়বে...আচ্ছা, গেলে সন্ধ্যার পর বাড়িতে টেলিফোন কোরো, তখন বলে দেবো কোথায় দেখা হতে পারে। হাসিমুখেই তারপর আবার সাবধান করেছে কিন্তু তুমি ফেল করলে আর আমি ডাক্তার হয়ে বেরুলে, বাড়ির কেউ কিন্তু পাত্তা দেবে না তোমায় বলে দিলাম।

—তাহলে কোন্ শালা ফেল করে! কিন্তু বাড়িতে টেলিফোন করলে জ্যাঠা কিছু বলবে না?

—জ্যাঠা সে-সময় তাস খেলতে যায়, তাছাড়া মেডিক্যাল কলেজে পড়ি, ও-টুকু অ্যালাউড—কত ছেলে কত রকমের দরকারে ফোন করতে পারে।

শিপ্রা নন্দী কলকাতায় চলে আসার পরে পরীক্ষার ভাবনা সিকেয় তুলে অন্তত বার-তিনেক কলকাতায় পালিয়ে এসেছে আনন্দরূপ। শরীরের অজুহাত দেখিয়ে দিনকতক করে থেকেও গেছে।

প্রথম দফায় সন্ধ্যার টিউশনি জলঞ্জলি দিয়ে দীপু তাকে ছেঁকে ধরেছে—তোর ব্যাপারখানা কি রূপদা, অ্যাঁ?

আনন্দরূপ যথাসম্ভব নির্লিপ্ত।—কেন, কিসের ব্যাপার?

মুখখানা একটু নিরীক্ষণ করে নিয়ে দীপু জিজ্ঞাসা করল, চিঠিতে যা লিখেছিলাম সত্যি কি না?

—কি যেন লিখেছিলি?

—লিখেছিলাম মেয়ে-ঘটিত কারণে তুমি গেলবারে দুদিন অমন ছটফট করে পালিয়েছিলে। আর এখন জিজ্ঞাসা করছি, সেই কারণেই সমস্ত ছুটিটা তুমি ওখানে কাটিয়ে এলে কি না।

আনন্দরূপ ব্যস্ত হয়ে উঠল, আরে না না, দুটো একটি মেয়ে নয়—

বলতে গিয়ে নিজেই থমকালো। দীপু নিরীক্ষণ করছে।—এখন একাধিক মেয়ে নিয়ে কারবার চলছে তাহলে?

আনন্দ হেসে ফেলল।—একটা চাঁটি খাবি তুই এবারে।...আচ্ছা, বলব খন তোকে সব, কিন্তু তুই তো আবার অঞ্জলির কাছে ফাঁস করে দিবি সব!

দীপুরই যেন বড়র ভূমিকা এখন।—দিলেই বা, তুই তাকে ভয় করিস?

—আমি ভয় করতে যাব কেন! দীপুর এরকম বলাটাই কেন যেন পছন্দ হল না আনন্দর।

কি ভেবে দীপু হাসতে লাগল।

তারপর বলল, এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে। কাকা ওর বিয়ের চেষ্টায় এগিয়েছিল—

—তারপর? আনন্দ উৎসুক হঠাৎ।

—তোড়জোড় শুরু হবার আগেই ভেস্তে গেল। অঞ্জলিই ভেস্তে দিল।

ব্যাপারখানা সাগ্রহে এবং সবিস্তারে শুনল আনন্দরূপ।...মেয়ে অমন ভালো পাস করেছে জেনে মেসের একটি সতীর্থ নিজের ছেলের জন্য মেয়েটিকে দেখার প্রস্তাব করেছিলেন। ছেলে ভালো স্কলার এবং কোন্ কলেজের লেকচারার। দাবি-দাওয়া তেমন নেই আর খুব একটা রূপেরখাঁইও নেই তাদের। সুশ্রী ভালো মেয়ে চায়, এই পর্যন্ত। আশায় আনন্দে মেসো একেবারে দেখানোর দিনক্ষণ ঠিক করে বাড়িতে জানালেন। কিন্তু বিয়ের কথায় তাঁর ওই ঠাণ্ডা মেয়ে যে এমন মূর্তি ধরবে ভাবেননি। তিনি কেন, কেউ-ই ভাবেনি। তার মাকে একপ্রস্থ বকা-ঝকা করে নিজেই বাবাকে সোজা জানিয়ে দিল, এ সব চিন্তার এখন দরকার নেই, বিয়ে করবে কি করবে না এম.এ. পাশের পর ভাববে।

মেসো তবু বলেছেন, নিজে থেকে ওরা একবার দেখতে চেয়েছে —দেখে যাক না।

অঞ্জলির সাফ কথা, আগে থাকতে খবর দিয়ে বন্ধ না করলে সেদিন সে রাতের আগে বাড়িই ফিরবে না।

মেয়ের কথা শুনে মাসিমা রাগ করেছেন, মেসো চুপ। বাধ্য হয়ে তাঁকে পাঁচটা বাজে কথা বলে মেয়ে দেখানোর ব্যবস্থা বাতিল করতে হয়েছে।

...এরপর দীপু অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার বল তো, বিয়ে করবিই না ঠিক করেছিস নাকি?

ঠোঁট উলটে অঞ্জলি জবাব দিয়েছে, তা কি বলা যায়।

—তাহলে দেখতে দিতে এত আপত্তি কেন?

অঞ্জলি নাকি হেসে জবাব দিয়েছে, দেখলে পছন্দ হবে না জানা কথাই—প্রেসটিজ্ বাঁচালাম। অঞ্জলির এই গোঁয়ারতুমির কথা শুনে কেন যেন আনন্দর ভালো লাগল না। অঞ্জলি ভালো মেয়ে, তার বেশ একটা ভালো বিয়ে হয়ে গেলে আনন্দ কারো থেকে কম খুশি হত না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলার ফুরসত পেল না। তার আগেই অঞ্জলির গলা, রূপদা এসেছে শুনলাম—

বলতে বলতে হাসিমুখে ঘরে এসে দাঁড়াল। দীপু বলল, ঠিক ঠিক এসেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না—তুই দেখ্ তো।

অঞ্জলি সকৌতুকে চেয়ে রইল একটু। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আনন্দর মনে হয়েছে চোখের তারায় নিঃশব্দে এমন বুদ্ধি ঠিকরোতে আর বোধহয় কোনো মেয়ের দেখেনি—তা সে-মেয়ে যতো রূপসীই হোক না কেনো।

অঞ্জলি সরল আগ্রহেই জিজ্ঞাসা করল, সত্যি কি ব্যাপার বলো তো রূপদা, সমস্ত ছুটিতে এলেই না একেবারে—খুব পড়াশুনা করলে বুঝি?

—মোটামুটি।

দীপুর দিকে ফিরল অঞ্জলি।—দেখলে? পরক্ষণে আনন্দর দিকে।—আমি বলেছিলাম নিশ্চয় কষে পড়াশুনা শুরু করেছে— দীপুর ধারণা তুমি বাজে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাচ্ছ।

আনন্দ গম্ভীর একটু। মনোযোগী দৃষ্টিটা অঞ্জলির মুখের ওপরে। —এম.এ. পাসের পর তুমি স্কুল-মাস্টারি করবে ঠিক করেছ বুঝি?

ঈষৎ বিস্ময়ে অঞ্জলি বড় করে তাকালো।—কেন?

—ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরেই আমার পড়াশুনার খবর নিতে ছুটে এসেছ।

—ফিরেই কোথায়! এসে খেলাম-দেলাম তারপর এলাম।...তা কি কথা হচ্ছিল তোমাদের, এত গম্ভীর কেন?

দীপু জবাব দিল, তোর বিয়ে বাতিল করার খবর শুনে।

অঞ্জলি হকচকিয়ে গেল একটু। তারপর হেসে উঠল।

আনন্দর এবারে আসার মধ্যেও কোথায় যেন একটু ব্যতিক্রম অনুভব করেছে দীপু আর অঞ্জলি। বিশেষ করে ছুটি কাবার করে আসার অর্থটা তাদের মাথায় ঢুকছে না। কিন্তু একবার নয়, দিন-কতকের ফারাকে আরো দুবার এলো।

বিকেল চারটে বাজতে বাড়িতে আর তার টিকির দেখা মেলেনি সেই রাতের আগে। শিপ্রার সঙ্গে ময়দানে আর গঙ্গার ঘাটে বেড়িয়েছে, সিনেমা দেখেছে, রেস্টুরেণ্টে খেয়েছে। শিপ্রা অনেক সময় রাগ দেখিয়েছে, এবারে তুমি শিবপুরে পালাও বলছি, আমার পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে, তাছাড়া বাড়িতে কলেজের নাম করে মিছে কথা বলতে হচ্ছে।

আর আনন্দরূপ কাব্য করে উঠেছে, এই ক্ষতির সবটাই লাভের খাতায় জমা হচ্ছে, আর এই মিথ্যের থেকে সত্য-সুন্দর দুনিয়ায় আর কিছু নেই—আচ্ছা এ-সম্পর্কে কালিদাস বা রবিঠাকুর কিছু লিখে যায়নি?

—না, তুমি লেখো। শিপ্রা হেসে উঠেছে।

হ্যাঁ আমিই লিখব—ফুলের পাপড়ি দিয়ে লিখব, চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়ে লিখব, গঙ্গার কল-কল ভাষা দিয়ে লিখব—ঘোড়ার ডিমের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা একবার পাস করতে পারলে হয়।

এ-সব ব্যাপার বিশ্বস্ত তৃতীয় কানে তুলে দিতে পারলে ভোগের আনন্দ বাড়ে হয়তো। এত আনন্দ আনন্দরূপ নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারেনি। একজনকে বলতে পারে এবং তাই বলেছে, সে দীপঙ্কর। আর বলতে আরম্ভ করলে কেটে-ছেঁটে বলার পাত্র নয় আনন্দরূপ। দীপুরও সেটা শোনার আর রোমাঞ্চিত হবার বয়েস। কিন্তু রূপদার থেকে ছেলেটা অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল। তার ওপর চাকরি খুঁজে হন্যে হয়ে এখন সকাল-বিকেল দুটো টিউশনি করে হাতখরচ চালাচ্ছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সতর্কও করেছে তাকে। পাস করে ব্যবসাটা ভালো মতো ফেঁদে বসার দিকে এখন বেশি মন দাও, নইলে বড় ঘরের মেয়ে, চেহারাও ভালো বলছ, হুট করে কবে বিয়ে হয়ে যাবে ঠিক নেই।

—আরে না না না, ব্যবসায় লাল তো হবই একদিন না একদিন, তা ছাড়া ওই মেয়ের এ-জীবনে আর অন্য কাউকে মনে ধরবে ভাবিস? সে-সম্ভাবনার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি।

দীপু শঙ্কিত।—তার মানে, ইয়ে গণ্ডগোল-টণ্ডগোল হয়ে গেছে নাকি?

কি বলতে চায় বুঝে আনন্দ ওর পিঠে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে।—তুই একটা রাবিশ। মেয়েদের আসল গণ্ডগোলের জায়গা হৃৎযন্ত্রের ভিতরে, ও-দিকটা ধরে নাড়াচাড়া করে দিতে পারলেই তাদের বারোটা বেজে গেল—বুঝলি?

দীপু বুঝেছে। রূপদার ওপর তার অগাধ আস্থা। ব্যবসায় বড় যে হবেই একদিন সে-বিষয়ে ওরও কোনো সংশয় নেই। রূপদা হল গিয়ে একটা মানুষের মতো মানুষ, যেখানে গিয়ে দাঁড়াবে, আসর মাত।

কিন্তু রূপদার এই প্রণয়ের ব্যাপারটা অঞ্জলির কানেও তুলে না দিয়ে পারল না সে। অঞ্জলি এখন শুধু দূর-সম্পর্কের মাসতুতো বোন নয়, বিশ্বস্ত বন্ধুও। সময় কাটাবার দরকার হলে ওর সঙ্গেই গল্প করতে সব থেকে ভালো লাগে। অঞ্জলির সঙ্গে রূপদার বলতে গেলে আত্মীয়তার সম্পর্ক কিছুই নেই, সেটা এখন আর মনে থাকে না, সম্পর্কটা ওদের মতোই ভাবে।

অঞ্জলি শুনেছে, শোনার আগ্রহ দেখিয়েছে, কিন্তু কোনোরকম মন্তব্য করেনি। শোনার পর বলেছে, তোমার বাহাদুরি আছে, সেই কবেই তো তুমি এই সন্দেহ করেছিলে আর রূপদাকে চিঠি পর্যন্ত লিখেছিলে।

দীপুর বিব্রত মুখ। মাথা চুলকে বলেছে, সেই সেবারের সেটা শুনছি এ মেয়ে নয়, আর এক মেয়ে।...গোড়ার ওই ব্যাপারটা নাকি একদম বাজে, আর এই মেয়েটা একেবারে নির্ভেজাল ভালো।

অঞ্জলি হাঁ খানিকক্ষণ, তারপর হাসতে লাগল। সঙ্গে সঠিক মন্তব্য।—রূপদার জন্যে এভাবে মেয়েরা লাইন দিতে শুরু করলে এই মেয়ের মধ্যেও না ভেজাল বেরোয় আবার।

দীপু হাসিমুখেই রূপদার পক্ষ নিয়েছে।—ওই চেহারা দেখে মেয়েরা যদি ছোটাছুটি করে, রূপদার কি দোষ।

অঞ্জলি সায় দিয়েছে।— তা বটে। উৎসুক একটু।—গোড়ার বাজে মেয়েটার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে?

—কি জিগেস করব?

—ইয়ে, চেহারাপত্র বাজে না মেয়ে বাজে-না কি বাজে?

—জিগেস করব?

অঞ্জলি ব্যস্তসমস্ত।— থাক বাপু, আমি কোনো কথা বলেছি খবদ্দার বলবে না। রূপদাকে একটু বরং পড়াশুনায় মন দিতে বলো—

—সেটা বলা হয়েছে, কিন্তু রূপদার কানে ঢুকেছে কিনা সন্দেহ।

দীপুর সঙ্গে শিপ্রা নন্দীর একদিন আলাপও করিয়ে দিল আনন্দ —তিনজনে বেড়ালো, রেস্টুরেন্টে খেলো। দীপু চুপি চুপি অঞ্জলির কাছে সে-গল্পও সবিস্তারে করেছে আবার। তখনো অঞ্জলি হেসেছে, আর শিপ্রা নন্দীর প্রশংসা শুনে টিপ্পনী কেটেছে, দাদার ওই পাত্রীর রূপে-গুণে তুমিও মুগ্ধ হলে কিন্তু কেলেঙ্কারি।

দীপু হেসেছে, তোর যেমন কথা, ও-রকম মেয়ে আমাকে বাজার-সরকারও রাখবে না।

হবি-তো হ, সেই শিপ্রা নন্দীর সঙ্গে অঞ্জলির একদিন একেবারে মুখোমুখি দেখা। কি একটা বিশেষ দরকারে নিউ মার্কেটে যেতে হয়েছিল, ওই যুগল সামনে পড়ে গেল একেবারে। কিন্তু রূপদা ভেবাচেকা খাওয়ার পাত্রই নয়। বলে উঠল, এই যাঃ তোমার সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল শেষকালে! বোসো আগে পরিচয় করিয়ে দিই, এই হল আমাদের এক প্রোফেসরের মেয়ে, শিপ্রা নন্দী, মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে—আর, শিপ্রা—এ হল অঞ্জলি, আমার দূর-সম্পর্কের বোন হয় বলতে পারো—একই বাড়ির ওপরে নীচে থাকি আমরা—ব্রিলিয়েন্ট মেয়ে—ইকনমিক্স-এ বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট—এম.এ. পড়ছে।

না, ব্রিলিয়েন্ট মেয়ের চেহারা-পত্র দেখে শিপ্রা নন্দীর মনে এতটুকু দুর্ভাবনার ছায়া পড়েনি। অঞ্জলি তাকে দেখেছে আর অল্প অল্প হেসেছে। বলেছে, রূপদা ও-রকম বাড়িয়ে বলে, আমি একেবারে সাধারণ মেয়ে। তারপর আনন্দর দিকে চেয়েই ভ্রূকুটি করেছে একটু।—এত লুকিয়ে না বেড়িয়ে নিয়ে এসো না একদিন—

আনন্দ বলেছে, দাঁড়াও, পরীক্ষাটা হয়ে যাক আগে, এখন আমার এই মতি-গতি জানলে কাকীমা তো ঠ্যাঙানি দিতে আসবে।

সেই বিকেলে রূপদা ওকেও ছাড়তে চায়নি। কিন্তু অঞ্জলি বাড়িতে কাজের অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে এসেছে।

পরে দীপু বলেছে। দীপু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছে, বেশ সুন্দর না মেয়েটা?

—হ্যাঁ, বেশ।

প্রণয়ের ব্যাপারটা দীপু জানার ফলে আনন্দর কিছু সুবিধে হয়েছে। কলকাতায় এলেই কিছু বাড়তি খরচ। দীপু ভরসা। দুটো টিউশনি করে সে একশো টাকা পায়। অতএব চাইলে দশ-পনেরো টাকা ওর কাছ থেকে পাওয়া যায়। চাইতে এতটুকু দ্বিধাও নেই। ব্যবসায় বড় হয়ে উঠলে এর কত শত গুণ পুষিয়ে দেবে ঠিক আছে! এই টাকা নেওয়ার খবরটাও অঞ্জলি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দীপুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছে।

আনন্দরূপ শেষ পর্যন্ত পাস করবে কিনা ভিতরে ভিতরে অঞ্জলির সে-রকম একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ভালোই পাস করল দেখে ওর মনে হল, মাঝে ওই মেয়েটা না থাকলে রূপদা আরো ঢের ভালো পাস করত। কিন্তু মুখে সেটা ব্যক্ত করল না।

রেজাল্ট বেরুতে সে-ই প্রথম কংগ্র্যাচুলেট করল তাকে। জিজ্ঞাসা করল, এবারে কি, চাকরি না ব্যবসা?

—আমি চাকরির ধারে-কাছে নেই। গোলামি-টোলামি আমার দ্বারা হবে না। অর্থনীতির কড়া ছাত্রী অঞ্জলি, তার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনার উৎসাহ আছে আনন্দর।—প্ল্যান সব ঠিক করাই আছে, তার আগে কিছু ক্যাপিটাল যোগাড় করতে হবে বুঝলে?

অঞ্জলি জানতে চায়, কি ব্যবসা করবে ঠিক করেছ?

—টেলিফোন ডিসইন্‌ফেকট্যান্ট, টেলিফোনে একরকমের বীজাণু ধরে জানো?

অঞ্জলি মনে মনে ভাবে, মাথায় আসেও। হেসে জবাব দেয়, টেলিফোনই নেই, জানব কোত্থেকে?...তুমি সেটা তৈরি করবে?

—নিশ্চয়! আগে একটা ঘর দরকার, বুঝলে? রিসার্চ করে, কিছুদিন ট্রায়াল দিয়ে তবে তো সেটা বাজারে ছাড়া যাবে।

সাধ্য থাকলে অঞ্জলি ওদের নীচের তলার একখানা ঘর ছেড়ে দিত। দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ক্যাপিটাল যোগাবার লোক পেয়ে গেছ?

—নাঃ। আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। ঠিক পেয়ে যাব।

অঞ্জলি হঠাৎ সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করে বসেছে, তুমি চাকরি করো শিপ্রাও তা চায় না বুঝি?

এবারে আনন্দরূপ সচকিত একটু।—বাঃ, তার চাওয়া না-চাওয়ার ওপর আমি নির্ভর করে চলব নাকি?

—তবে কার ওপর নির্ভর করে চলবে?

হঠাৎ কি-রকম যেন অস্বস্তি বোধ করেছে আনন্দরূপ। এই নিরীহ কালো মেয়ের বুদ্ধির ছাপ সর্বদাই বেশি প্রখর মনে হয়েছে, কিন্তু তার তলায় এই প্রথম কি যেন একটু লক্ষ্য করল আনন্দরূপ। অস্বস্তি সেই কারণে। জবাব দিল, নিজের ওপরেই নির্ভর করার ইচ্ছে।

অঞ্জলি বলল, বাঁচা গেল। আনন্দর মনে হল-টিপ্পনী কাটল।

তিন-চার মাস ব্যবসার প্ল্যান মাথায় নিয়ে সোৎসাহে খুব ঘোরাঘুরি করল। কিন্তু কিছুতে আর সুবিধে হয় না। যে অবস্থাপন্ন সহপাঠীরা আগে উৎসাহ যুগিয়েছিল, তারা যে-যার চাকরির দরখাস্ত

করে চলেছে এখন। ফলে আনন্দরূপ ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। এদিকে স্বভাব বদলায়নি একটুও, কলকাতায় থাকার দরুন হাতখরচাও বেড়েছে—তার ওপর শিপ্রার সঙ্গে নৈমিত্তিক দেখা হয়। সেই কারণেও খরচ আছে। পরীক্ষায় পাস করার পর আনন্দ বুক ফুলিয়েই শিপ্রার জ্যাঠার বাড়িতে হানা দিয়েছিল একদিন। খবর পেয়েছিল শিপ্রার বাবা-মা তখন এখানে। অতএব তাঁদের পরীক্ষা-পাসের প্রণাম ঠুকতে গেলে আটকাবে কি? তাঁরা সমাদরে গ্রহণ করেছেন ওকে, শিপ্রা জ্যাঠা-জেঠির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাসও অব্যক্ত ছিল না নিশ্চয়। ফলে আন্দর কাছে জ্যাঠার বাড়ির দরজাও উন্মুক্ত।

দীপু সামান্য একটা চাকরি জুটিয়েছে। দেড়শো টাকা মাইনে। সকালের টিউশনি ছেড়েছে, রাতেরটা রেখেছে। তার এখনো দৃঢ় আশা, রূপদার ব্যবসা জমে উঠলে তারও কষ্টের দিন ফুরাবে। রূপদার হাত-খরচ আপাতত সে-ই যুগিয়ে আসছে। কষ্টের টাকার ওপর রূপদার যদি এতটুকু মায়া থাকত!

আনন্দ সেদিন বার বার বিরক্ত মুখে ওপর-নীচ করছিল। কেউ যে তাকে লক্ষ্য করছে সে-খেয়াল নেই। দীপুর অপেক্ষায় আছে সে। দশটা টাকা ভয়ানক দরকার তার। ছটার শোয়ের আগে মেট্রোর সামনে এসে দাঁড়াবে শিপ্রা। দুজনের সিনেমায় যাবার কথা। বলা বাহুল্য, টিকিট আনন্দই কাটবে। কিন্তু দীপুর কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে রাখতে ভুলে গেছে। ওর ফিরতে প্রায় ছটাই বাজে, কোনোদিন আবার আরো দেরিতে ফেরে। কাকীমার কাছ থেকে ভাঁওতা দিয়ে শেষ পর্যন্ত টাকাটা বের করতে হবে ভেবেই বিরক্তি। তবু আশা, সাড়ে পাঁচটার মধ্যেও দীপুদা যদি এসে পড়ে!

তৃতীয় দফা নীচের বারান্দায় এসে দাঁড়াতে অঞ্জলি হঠাৎ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, এত ব্যস্ততা কিসের, দীপুর জন্যে নাকি?

—হ্যাঁ...।

মুখের দিকে চেয়ে অঞ্জলি মুখ টিপে হাসতে লাগল।

—হাসছ যে?

—বেশি টাকার দরকার না হলে আমাকে বলে দেখতে পারো। কত চাই?

আনন্দ বিব্রত বোধ করল একটু।—বেশি না দশ...কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে?

অঞ্জলি হেসেই জবাব দিল, তোমার সুন্দর মুখের দিকে তাকালেই ভেতরটা ধরা পড়ে যায়।

আনন্দ সেই একদিনের মতোই অস্বস্তি বোধ করেছে। তার থেকেও বেশি। মেয়েটার চোখের তারায় প্রখর বুদ্ধির ছটা, তার তলায় যেন আর কিছু।

অঞ্জলি ঘরে গিয়ে একটা দশ টাকার নোট এনে হাতে দিল। দ্বিধাগ্রস্ত মুখ দেখে হেসেই আবার বলল, অমন কিন্তু কিন্তু করছ কেন, আমার তো ডবল লাভ, তোমার সঙ্গে সব-সময়ই আমার ডবলের হিসেব।

আনন্দ টাকা নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু অস্বস্তি থেকেই গেছে।

শেষ পর্যন্ত টাকা সংগ্রহ হল কিছু। চাকরি না পেয়ে দুটি অবস্থাপন্ন বেকার বন্ধুই আশায় আশায় হাজার কতক টাকা নিয়ে ওর সঙ্গে লেগে গেল। ব্যবসায়ের আসল মাথা আনন্দরূপের। বিরাট উৎসাহ নিয়ে কাজে মেতে গেল সে। দীপু এমন কি অঞ্জলিও ধরে নিল বড় হবার এই-ই সূচনা।

অঞ্জলির ততদিনে এম. এ. পরীক্ষা শেষ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশব্দে একটা ব্যাঙ্কিং পরীক্ষায় বসে গেল সে। আর তাতেও একেবারে গোড়ার দিকেই জায়গা করে নিল। এম.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাবে জানা কথাই—ভাইভা পরীক্ষায় সেটাও স্পষ্ট প্রত্যয়ে জানিয়ে দিল সে। চাকরি পেল। অফিসার গ্রেডের চাকরি। আপাতত পাঁচশো সাড়ে-পাঁচশো টাকা, অ্যালাওয়েন্স পাবে—ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ হলেই নশো টাকা থেকে শুরু।

হ্যাঁ, আনন্দরূপ আর দীপু আবার একটু বিস্ময়ের চোখে দেখেছে বৈকি তাকে। এই মেয়েটা খুব নিঃশব্দে যেন একটা বড় কাজ করে উঠতে পারে। অথচ বাইরে এতটুকু পরিবর্তন নেই—সেই নিরীহ সাদা-মাটা মূর্তি।

এমনকি অঞ্জলির চাকরিতে জয়েন করার আগে পর্যন্ত খবরটা জানাতে পারেনি তারা। অথচ রোজ সন্ধ্যার দিকে অন্তত একবার করে দেখা হয়ই অঞ্জলির সঙ্গে। সে-ই ঘরে আসে, সাগ্রহে ব্যবসা সম্পর্কে খবর নেয়। যেদিন বেশ আশাপ্রদ খবর থাকে, অঞ্জলি আনন্দর মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারে। আনন্দও ফলাও করে নিজের কৃতিত্বের খবর শোনায়।

নীচের তলা থেকে অঞ্জলির ছোট বোন শেফালি সেদিন এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে দোতলায় উঠে আসতে অঞ্জলির চাকরির খবর জানা গেল। ওই বোনই দু ডিশ খাবার সাজিয়ে রূপদা আর দীপুদাকে দিতে এসেছিল।

খাবার দেখে তাদের অবাক হতে দেখে শেফালি আরো অবাক।—বা রে, দিদির যে ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি হল—দিদি সে-কথা তোমাদের বলেইনি বুঝি!

ব্যাঙ্কের ভালো চাকরি বলতে তখনো বিশেষ বড় দরের কিছু ভাবেনি আনন্দ বা দীপু। কারণ তার অফিসারস্ গ্রেডে পরীক্ষা দেবার খবরও তাদের একেবারে অজানা। সন্ধ্যার পর অঞ্জলি ঘরে ঢুকতে আনন্দ হাসিমুখেই জিজ্ঞাসা করল, ব্যাঙ্কের চাকরিতে লেগে গেলে শুনলাম?

—গেলাম তো।

—কি চাকরি? দীপু উৎসুক।

—ওই হল একটা। ঘরে বসে থেকে কি লাভ?

আনন্দ মন্তব্য করল, চাকরি যারা করবে তাদের পক্ষে ব্যাঙ্কের চাকরি মন্দ কি, পরীক্ষা-টরীক্ষা আছে, কালে দিনে অফিসারও হয়ে বসতো পারো।

জবাব না দিয়ে অঞ্জলি মিটিমিটি হাসতে লাগল। দীপুর খটকা লাগল কেমন, জিজ্ঞাসা করল, কি চাকরি কেমন চাকরি বলছিস না কেন?

এবারে জবাব দিল অঞ্জলি। যেন নাচার হয়ে বলে ফেলল, ওই অফিসারই হয়ে বসেছি বাপু, এখন প্রোবেশনার অবশ্য—

আনন্দ আর দীপু দুজনেই অবাক। দীপুই জিজ্ঞাসা করল, কি করে?

—পরীক্ষা দিয়ে।

—মাইনে কত?

এখন কত এবং চার্জ পেলে কত হবে তাও বলতে হল। শুনে দীপু যথার্থ খুশি। কিন্তু আনন্দ কেন যেন তেমন খুশি হতে পারল না, বলল, রোজ এসে আমাদের খবর নাও আর আমরা বলিও, নিজের বেলায় এত গোপন কেন?

অঞ্জলি থতমত খেল একপ্রস্থ।—বা রে, চাকরিটাকে তুমি কি চোখে দেখো আমি জানি না! ভয়েই বলিনি—

জবাবটা শুনে আনন্দরূপ একটু তুষ্টই হল বটে।

একজনের টেলিফোন ডিসইনফেকট্যান্টের ব্যবসা এগিয়ে চলল, আর একজনের চাকরি। টাকার মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরূপের বেশবাস চালচলন বদলাচ্ছে। অঞ্জলি পাকা-পোক্ত অফিসার হয়ে বসেছে—তার বেশবাস চলাচলনে ব্যতিক্রম নেই।

কিন্তু চাকরি এগিয়ে চলল, ব্যবসা বেশিদুর এগোল না।

দোষ কিছুটা আনন্দরই। তার আচার-আচরণই বন্ধুদের কাছে অবিশ্বাসের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আনন্দর প্রণয়ের খবর তারাও জেনেছে। বন্ধুদের কাছে যখন-তখন হাত পেতে টাকা নেয় সে, আবার ইচ্ছেমতো ব্যবসায়ের টাকাও ভাঙে। উঠতি মুখে তার খরচের বহর দেখে তারা শঙ্কিত, বিরূপ। কিন্তু আনন্দই ব্যবসার মাথা, যতদিন সহ্য করা সম্ভব সহ্য করল। তারপর ক্ষোভ প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। তারাও ইঞ্জিনিয়ার, কাজ-কর্ম বুঝে নিতে কতদিন আর লাগতে পারে? আনন্দর তুলনায় সাহস কম বলেই অনেক দিন সহ্য করেছে।

সোজাসুজি বিচ্ছেদ হয়ে গেল একদিন।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত আনন্দরূপ আবার ঘরে এসে বসল। ওরই প্ল্যান নিয়ে কাজ শুরু করে এখন ওকেই বর্জন করল তারা—এ খবরটা আর সকলের মত অঞ্জলিও শুনল।

সত্যিই দুঃখ হল তার, চিন্তা হল। জিজ্ঞাসা করল, কি করবে এখন, চাকরির চেষ্টা?

আনন্দ ঝাঁঝিয়ে উঠল।—না, চাকরি-টাকরি আমার দ্বারা হবে না।

ছ মাস না যেতে শিপ্রার বাড়ির লোকও টের পেয়ে গেল সমাচার কুশল নয়। আনন্দরূপের আসল অবস্থা তাদের চোখে ধরা পড়েছে। শিবপুরের প্রোফেসার তাঁর প্রাক্তন ছাত্র আনন্দর সেই দুই পার্টনারের কাছে সম্পূর্ণ প্রতিকূল রিপোর্ট পেয়েছেন। মেয়েকে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি, মেয়ের জ্যাঠাকেও।

কিন্তু মেয়ে যে ওই ছেলের প্রতি ততদিনে কতটা মুগ্ধ কতটা আসক্ত তাঁরা সেই খবর রাখেন না। শিপ্রাই আভাসে-ইঙ্গিতে তাকে ওদের বাড়ি আসতে বারণ করে দিল। তার অভিমানে আরো একটু বাড়তি প্রীতি ঢেলে মুছে দিতে চেষ্টা করল। মুগ্ধ আর মোহগ্রস্ত আনন্দ নিজেও। বাড়ির বাইরে দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ মেলা-মেশা আগের মতোই চলল। তবে, বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার ব্যাপারটা শিপ্রাও পছন্দ করেনি। এতদিনে লোকটার ধাত জেনেছে বলেই সে-ও এ-ব্যাপারে তাকে হুঁশিয়ার করেছে।—খবরদার, কারো কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেবে না।

কিন্তু দীপুর কাছে হাত পেতে টাকা নিতেই হয়। বড় হবে একদিন, এ-বিশ্বাস আনন্দর তখনো অটুট। কিন্তু বড় হবার রাস্তা পাচ্ছে না বলেই অসহিষ্ণু সর্বদা।

এক ছুটির দিনে নতুন এক ব্যবসার প্ল্যানের কথা বলছিল দীপুর সঙ্গে। ঘরে অঞ্জলিও ছিল। এখনো বাড়ির একজনের মতই সে যখন-তখন আসে যায়, সমস্ত রকমের আলোচনায় যোগ দেয়। আনন্দ বলল মাত্র হাজার দুই টাকা হলে একটা নতুন জিনিসে নেমে পড়া যেত—টার প্রোডাক্টস।

দীপু জিজ্ঞাসা করল, সে আবার কি?

—কসমেটিকস্ জাতীয় জিনিস, বাজার লেগে গেলে তখন টাকা নিয়ে অনেকেও এগিয়ে আসত।

শুনে অঞ্জলি ভয়ে ভয়ে একটা প্রস্তাব দিল।—বাইরের টাকা নিয়ে তো দেখলে একবার, তার থেকে ভালো একটা চাকরি যোগাড় করে কিছু টাকা জমিয়ে তারপর ব্যবসায় নামো না!

শোনা-মাত্র আনন্দ হঠাৎ রেগে গেল কেমন।—আচ্ছা, আমাকে চাকরিতে ঢোকাবার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত কেন বলো তো?

অঞ্জলি তখন আর একটি কথাও বলেনি। পরে দীপুর অনুপস্থিতির ফাঁক খুঁজে আবার কাছে এসেছো। ভনিতা বাদ দিয়ে সোজাসুজি বলেছে, হাজার দুই টাকা হলে যদি চলে তো আর দেরি করে কাজ নেই লেগে পড়ো।

আনন্দ এবারে বিব্রত বোধ করেছে একটু। দু হাজার টাকা তুমি দেবে?

অঞ্জলি হেসে জবাব দিয়েছে, দেব কিন্তু সেই ডবল পাওয়ার হিসেবে।

—কিন্তু তোমার বাবা আপত্তি করবেন না?

—বাবার জানার দরকার নেই। এখন পর্যন্ত আমার টাকা বাবা বিশেষ নেন না, ব্যাঙ্কেই জমা হয়। হেসে জানাল, বাবা আমাকে বোনেদের বিয়ের ভার শুধু নিতে বলেছেন আর সে-জন্যে টাকা রাখতে বলেছেন। ওর বিয়ের টাকাও যে রাখতে বলেছেন সেটা অনুক্ত থাকল।

আনন্দ এবারে উৎসাহ বোধ করল একটু।—ঠিক আছে, তাহলে লাভের এক ভাগ আমার আর দু ভাগ তোমার।

অঞ্জলি হেসেই জবাব দিল, ঠিক আছে।

নতুন উদ্দীপনায় আবার শুরু হল কাজ। জায়গার অভাবে তিনতলার চিলতে চিলে ঘরটাতেই কারখানা স্টার্ট করে দিল আনন্দ। মা-কে বলে অঞ্জলিই সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মা-বাবার মনে আশা, এমন সুন্দর ছেলেটাকে যদি ধরে ফেলা যায় তাহলে নিতান্তই ভাগ্য। কিন্তু ভয়ে সে কথা প্রকাশ করতে পারেন না।

দীপু ঠিক আঁচ করে নিল টাকা কোথা থেকে এসেছে। জিজ্ঞাসাই করে ফেলল, টাকা তাহলে অঞ্জলি দিয়েছে?

—হ্যাঁ। মেয়েটার এখন থেকেই বিষয়বুদ্ধি কড়া—লাভের এক ভাগ আমার আর দুভাগ ওর এই কড়ারে দিয়েছে।

কেন যেন ব্যাপারটা মনঃপুত হয়নি দীপুর। ফিরে জিজ্ঞাসা করল, আর লোকসান হলে?

আনন্দরূপ বিরক্ত।—লোকসানের হিসেব আগে-ভাগে কে করে?

—অঞ্জলি তাহলে লাভের হিসেবই কষছে বলছিস?

—তাছাড়া আবার কি, স্রেফ একটা বিজনেস ডীল হয়ে গেছে ওর সঙ্গে।

যে-কাজ করে আনন্দ সেটা অবশ্য মাথা খাটিয়েই করে। বাজারে জিনিস ছাড়া হতে কিছু লাভের মুখ দেখা গেল। আনন্দর দ্বিগুণ উৎসাহ আর উদ্দীপনা। কিন্তু আসলে এ-ব্যবসা চালাতে হলে আরো টাকা চাই, মূলধন বাড়ানো দরকার। অঞ্জলি হাসিমুখে দু দফায় আরো চার হাজার টাকা বার করে দিয়ে শেষ বলল আর দিতে পারব না কিন্তু চট করে।

ভালোই চলছে। কিন্তু আনন্দরূপ খুশি নয় একটুও। আরো টাকা হলে আরো ভালো চলে। একজন মাত্র ক্যানভাসার আছে, দুজন নিতান্তই দরকার। দীপুকে এসে লাগতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু ওটা ভীতু, সাহস পাচ্ছে না। শেষে লোকই রাখা হল আর একটা। অঞ্জলি নিঃশব্দে মাসে চার-পাঁচশো টাকা করে তার হাতে তুলে দেয়। এক দীপু ছাড়া আর কেউ সে-খবর রাখে না। দীপু কেন যে আজকাল গম্ভীর হয়ে পড়ছে আনন্দর সেদিকেও নজর দেবার অবকাশ নেই। অঞ্জলির টাকা আর ডবল লাভ সে দিতে শুরু করবেই একদিন না একদিন। কত নিল, কড়ায়-ক্রান্তিতে তার হিসেব রাখছে।

কিন্তু শিপ্রা আর আনন্দর পরস্পরের প্রতি মোহ আরো বেড়েছে বই কমেনি। আবার সুদিনের মুখ দেখতে শুরু করার ফলে আনন্দর চালচলন আগের মতোই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বাইরের মেলামাশা তো আছেই, শিপ্রার আপত্তি সত্ত্বেও বুক ফুলিয়ে আবার সে ওর জ্যাঠার বাড়ি যাতায়াত শুরু করেছে। ট্রাম থেকে নেমে পায়ে হেঁটে নয়, সোজা ট্যাক্সি হাঁকিয়ে।

জ্যাঠার বাড়ির লোকেরা ধরে নিয়েছে, ব্যবসায় ছেলেটা আবার জাঁকিয়ে উঠেছে। কিন্তু সন্দিগ্ধপ্রবণ মানুষ তিনি। এই মেলামেশা তাঁর পছন্দ নয়। তাছাড়া মেয়েটার ফিফ্‌থ্ ইয়ার চলছে এবার—আর কিছুদিন বাদে ফাইন্যাল পরীক্ষা—এ-সময় এ-ব্যাপার আদৌ পছন্দ নয় তাঁর। বাইরের মেলামেশার খবরও তাঁর কানে আসছে—তাঁর নিজের ছেলে-মেয়ে নানা জায়গায় একাধিক দিন দেখেছে ওদের দুজনকে। তারা এসে তাদের মাকে বলেছে—তিনি তাঁর স্বামীর কানে তুলেছেন। বেগতিক দেখে জ্যাঠা শিপ্রার বাবাকে চিঠি লিখে দিলেন। সেই ভদ্রলোক শিবপুর থেকে ছুটে এসে মেয়েকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গেলেন। ডাক্তারী পাশ হয়ে গেলে মেয়ের কোন ইচ্ছেয় বাধা দেবেন না এমন কথা পর্যন্ত বলে আপাতত তাকে ওই ছেলের সংস্রব ছাড়তে বললেন।

ফলে আনন্দর আবার বাড়ি আসা বন্ধ হল শুধু। কিন্তু কোন তরফ থেকেই সংস্রব ছাড়া সম্ভব হল না। বাইরের মেলামেশা চলতেই থাকল, আর রিপোর্টও জ্যাঠার কানে আসতেই লাগল।

এদিকে ঠিক এই কারণেই দীপুর রাগ অঞ্জলির ওপরেও, রূপদার ওপরেও। রূপদার চালচলন আর খরচের বহর দেখে সে ভিতরে ভিতরে শংকিতও। মন তার কোথায় বাঁধা পড়ে আছে সে-তো জানেই, অঞ্জলিও ভালো করে জানে। তবু এভাবে টাকা দিয়ে যাচ্ছে কেন অঞ্জলি, কোন্ আশায় দিচ্ছে ভেবে পায় না।

সোজাসুজি একদিন অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসাই করে বসল, এ-ভাবে টাকা ঢেলে চলছিস কোন্ আশায়? মুখ টিপে হেসে অমনি উত্তর দিল, ডবল লাভের আশায়।

—ডবল লাভটা কি-রকম হবে দেখতে পাচ্ছিস না, চোখ নেই?

অঞ্জলি তার উষ্মা দেখে, জবাব দেয় না।

ব্যাবসার হিসেব নিতে বসলে কাগজে-কলমে লোকসান কিছু দেখা যাবে না। বছরে হাজার চার সাড়ে-চার বরং লাভই দেখা যাবে। এইসব হিসেব রাখার দায়িত্ব দীপুর। হিসেব সে যথাযথ রাখছেও।

কিন্তু লাভের কড়ি নিপাত্তা। কিছু ব্যবসায় খাচ্ছে আর বাকিটা আনন্দরূপ খরচ করছে। ওদিকে মাসে যেমন পাঁচশো টাকা করে দিচ্ছিল অঞ্জলি সেটা দিয়েই চলেছে—আনন্দ প্রতি মাসেই বলে আর বেশি দিন লাগবে না। কিন্তু লাগছেই।

বড় রকমের একটা গণ্ডগোল বেঁধে গেল আরো প্রায় বছর দেড়েক বাদে। শিপ্রা নন্দীর ফাইন্যাল এম.বি. পরীক্ষাও ছমাসের ওপর পিছিয়ে গেছল নানা গণ্ডগোলের দরুন। তারপর পরীক্ষা হল। ফল বেরুতে দেখা গেল শিপ্রা সেবারের মতো ফেল করেছে। ডাক্তারি পরীক্ষায় ভালো ভালো ছেলেমেয়েরাও এক-আধবার ফেল অনেক সময়েই করে থাকে। কিন্তু শিপ্রার জ্যাঠা আগুন হয়ে উঠলেন। ওর বাবাকে শিবপুর থেকে ডেকে পাঠালেন। স্পষ্ট বললেন, হয় ওই ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দাও, নয়তো তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও—এভাবে চলতে পারে না।

এম.বি.বি. এস. হবার আগে বিয়ের নামে শিপ্রাও রেগে গেল। এই নিয়ে বাবা আর জ্যাঠা দুজনের সঙ্গেই দস্তুরমতো একটা মনোমালিন্যের ব্যাপার ঘটে গেল তার। তাঁদের সাফ কথা, ওই ছেলের সঙ্গে এত মেলামেশা আপাতত তাহলে বন্ধ করতে হবে।

শিপ্রারও সাফ জবাব, সেটা হয় না, আমার ফেল করার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের এবারের পরীক্ষায় আঠারো পারসেন্ট-মাত্র পাস করেছে, এবারের ফেলটা অত বড় করে দেখার কারণ নেই।

জ্যাঠা আর বাবা দুজনেই বিপদ গণলেন। তাঁদের মেয়ে, বিয়ে যদি দিতেই হবে, ছেলে সম্পর্কেই পাকা খবর নিয়ে তার সঙ্গে কিছু খোলাখুলি কথা বলার দরকার বোধ করলেন তাঁরা।

আর এই সময়েই অঞ্জলির টাকা দেবার খবরটা কেমন করে যেন ওর বাবা-মা জেনে ফেললেন। এতদিন যে গোপন করা গেছিল সেটাই আশ্চর্য। হিসেব করে দেখা গেছে এ-যাবৎ অঞ্জলি হাজার বিশেক টাকা আনন্দরূপকে দিয়েছে। এ তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না। অথচ মুখ ফুটে মেয়েকে কিছু বলতে পারেন না তাঁরা। অতএব অঞ্জলির মা দীপু আর দীপুর মায়ের কাছেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুটো আশার কথা শোনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আকাশ থেকে পড়লেন দীপুর মা-ও। একমাত্র দীপুর মাথা বাইরে ঠাণ্ডা। বলল, টাকা অঞ্জলি সেধে দিয়েছে এবং দিচ্ছে, কোন্ ভবিষ্যতের আশায় সেটা জানে না। তবে ভবিষ্যৎ ভালো যাতে হয় সে- চেষ্টা ও করবে।

বলল বটে, কিন্তু এ-ও জানে ব্যবসার সামনে আবার একটা সংকট আসছে। সস্তার জাপানী মাল আসতে লেগেছে—কমপিটিশনের ব্যাপার দাঁড়িয়েছে।

এমন দিনে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক এসে হাজির তাদের বাড়িতে। রূপদার খোঁজ করলেন। সে বাড়ি নেই। তাই শুনে দীপুর সঙ্গেই কথাবার্তা কইতে বসলেন। তার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ি-ঘর-দোরের অবস্থা দেখেই যে ভদ্রলোকের মেজাজ বিগড়েছে দীপু তাও আঁচ করল। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় গোপন করলেন না, স্পষ্টই জানালেন, মেডিক্যাল কলেজে পড়া ভাইঝির বিয়ের ব্যাপারে আনন্দরূপের সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিতে এবং কথাবার্তা কইতে এসেছেন তিনি।

ঠাণ্ডা মুখে রূপদার ব্যবসার যে চিত্রটা দীপু তাঁকে দিল, শুনে ভদ্রলোকের চক্ষুস্থির। মাসে পাঁচশো টাকাও রোজগার হয় না এমন ব্যবসা, আর তারও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত! তার ওপর এই তো বাড়ি ঘরের ছিরি।

ভদ্রলোক তবু ভালো করে সব দিক বুঝে নিতে চান। আনন্দরূপের আর কি আছে না আছে, অর্থাৎ তার বাবা কি রেখে গেছেন না গেছেন, জানার বাসনা।

দীপু স্পষ্ট জানিয়ে দিল, কিছুই রেখে যাননি, সে-টাকা রূপদার পড়া শেষ হবার আগেই খতম হয়ে গেছে।

—সেকি, তাহলে ব্যবসার টাকা কে দিচ্ছে?

—দিচ্ছে একটি মেয়ে, ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি করে, আমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। লাভের তিন ভাগের দুই ভাগ তার প্রাপ্য, কিন্তু ব্যবসার এখন পর্যন্ত যা অবস্থা, একটা পয়ার মুখও সে এখনো পর্যন্ত দেখেনি।

শিপ্রার জ্যাঠা থমথমে মুখে উঠে পড়েছেন। কিন্তু আরো পাকা খবর না নেবার মতো কাঁচা মানুষ তিনি নন। কোন্ ব্যাঙ্কের কোন্ অফিসার মেয়ে এই টাকা দিয়েছে সেটাও বার করে নেবার আগে তিনি মুখ খোলেননি।

শিপ্রার বাবাকে ডেকে এনে শেষে একটা চূড়ান্ত ফয়সালাই করে ছেড়েছেন তিনি। সব শুনে শিপ্রা হতভম্ব একেবারে। এ-রকম ব্যাপার সে কল্পনাও করতে পারে না। শরীরের রক্ত মাথায় উঠে গেছে তার।

আনন্দরূপকে ডেকে পাঠিয়ে সত্য-মিথ্যে যাচাই করতে চেয়েছে সে-ও। বাড়িতে নয়, অন্যত্র।

সোজা জানতে চেয়েছে, তার ব্যবসার অবস্থা সম্পর্কে যা শোনা যাচ্ছে সেটা ঠিক কি না?

তার এই মূর্তি দেখে আনন্দরূপ হতভম্ব। আমতা-আমতা করে বলতে চেষ্টা করেছে, মোটামুটি ঠিক, কিন্তু অবস্থা যে এ-রকমই থাকবে তার কি মানে?

শিপ্রা তাকে দেখেছে, দেখেছে দেখেছে। তারপর আবার বলেছে, তাও না-হয় হল, আগের বারের ব্যবসায় বন্ধুদের টাকা নিয়েছিলে, এবারে কার টাকা নিয়েছ?

—তা-তার মানে? আনন্দরূপ দিশেহারা।

—কার কাছ থেকে টাকা নিয়েছ সে-খবরও জ্যাঠা এনেছে—তোমার কাকীমার দূর সম্পর্কের বোনের সেই ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে অঞ্জলি ঘোষের থেকে—খবরটা ঠিক?

আনন্দরূপ বিমূঢ়?

—জবাব দিচ্ছ না কেন, ঠিক খবর?

—ঠিক, কিন্তু...

আর কিন্তু শোনার জন্য দাঁড়ায়নি শিপ্রা নন্দী। জ্বলতে জ্বলতে চলে গেছে।

প্রাণের দায়ে মরীয়া হয়ে সেই সন্ধ্যেতেই ওকে বোঝাবার জন্য জ্যাঠার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে আনন্দরূপ। খবর পেয়ে শিপ্রা বলে পাঠিয়েছে, চলে যেতে বল, দেখা হবে না। ছাড়পত্র পেয়ে জ্যাঠা আর জ্যাঠার ছেলে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিতে বাকি রেখেছে শুধু।

আনন্দরূপের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরেছে। সমস্ত আক্রোশ এখন অঞ্জলির ওপর। একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলার ইচ্ছে, কি-ভাবে করবে জানে না। বাড়িতে হবে না, বাইরে কোথাও ডেকে নিয়ে যাবে।

দোতলায় উঠতে দীপুর সঙ্গে দেখা।

—শোন্। ছাতের চিলকোঠায় ডেকে নিয়ে গেল তাকে।

দীপুও অস্বাভাবিক গম্ভীর খেয়াল করল না।

টাকা দেবার ব্যাপারে অঞ্জলি কতখানি নীচে নেমেছে আর কি করেছে সেটা ঠাণ্ডা মুখে জানিয়ে দিল ওকে।

দীপু বলল, অঞ্জলি কিছু করেনি, সে এ-ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানে না এখনো পর্যন্ত।

—তার মানে? এ-সব কথা তাহলে কে জানিয়েছে ওদের?

—আমি। শিপ্রা নন্দীর জ্যাঠা সব খোঁজখবর নেবার জন্যে নিজে এখানে এসেছিলেন। খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করে আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে গেছেন।

আনন্দরূপ আর্তনাদ করে উঠল প্রায়, দীপু তুই এ কাজ করেছিস?

—কি করব? মিথ্যে কথা বলব তাঁর কাছে? তাতে ভবিষ্যতে তোর ভালো হবে না শিপ্রার ভালো হবে? তুই কি অন্ধ রূপদা? তোর চোখ-কান নেই? অঞ্জলি কেন তোকে মুখ বুজে হাজারে হাজারে টাকা দেয় সেটা তুই একবারও ভেবে দেখেছিস? এখন তুই অঞ্জলির ওপর রাগ দেখাতে এসেছিস! এত অন্যায় করলে আকাশটা ভেঙে পড়বে না তোর মাথার ওপর?

আনন্দরূপ স্তব্ধ। নির্বাক।

সমস্ত রাত আনন্দরূপ শুধু ভেবেছে আর ভেবেছে। শিপ্রাকে প্রাণপণে মন থেকে ছেঁটে দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেটা প্রাণান্তকর ব্যাপার।

সকালে দোতলার বারান্দা থেকে অঞ্জলিকে আপিসে চলে যেতে দেখল। শিপ্রার জায়গায় ওকে বসানোর কথা ভাবতে গিয়ে হাঁড় পাঁজরে যন্ত্রণা হতে লাগল। তবু, যতক্ষণ দেখা গেল ওকে, প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করে গেল।

তারপর একসময় না খেয়ে না চান করে সে-ও বেরিয়ে পড়ল। ট্রামে উঠল। কি একটা অন্ধ আবেগ যেন মেডিক্যাল কলেজের দিকে টেনে নিয়ে গেল ওকে। পায়ে পায়ে কলেজ-প্রাঙ্গণে ঢুকল।...ঠায় দুটো ঘণ্টা দাঁড়িয়েই রইল এক জায়গায়। ছেলেমেয়েরা আসছে যাচ্ছে, রোগী আসছে যাচ্ছে, ডাক্তার আর নার্সরা আসছে যাচ্ছে।

হঠাৎ দু চোখ সামনের বিশাল সিঁড়িটার দিকে আটকালো আনন্দর। ওপর থেকে তিন ধাপ নেমে থমকে দাঁড়িয়ে গেল শিপ্রা নন্দী। গায়ে ধপধপে সাদা অ্যাপ্রন, গলায় মালার মতো স্টেথস্‌কোপ ঝুলছে। নীচের ওই বিষণ্ণ উসকো-খুসকো মূর্তি দেখে তারও বোধকরি বুকের তলায় মোচড় পড়ল একটা। তাই থমকে তার দিকে চেয়ে রইল একটু। তারপরই ওই দৃষ্টির আওতা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ওপরে উঠে হনহন করে ফিরে চলে গেল আবার।

আনন্দরূপের চমক ভাঙল। সেই মুহূর্তে ফেরার তাড়া। মন স্থির হয়েছে। এবারে যত শীগ্‌গির সম্ভব আর একজনের কাছে যাওয়া দরকার।

ব্যাঙ্কের দরজায় এসে পৌঁছল যখন, সাড়ে-তিনটে বেজে গেছে। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ।

ব্যাঙ্কিং আওয়ারস্‌ নয় এটা, কিন্তু দারোয়ানের কাছে অঞ্জলি ঘোষের নাম করতেই সে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল।

এই মূর্তি দেখে অঞ্জলি অবাক। ভিতরে ভিতরে শংকিত একটু। সামনে যে দুজন স্টাফ দাঁড়িয়েছিল তাদের বিদেয় করে তার দিকে ফিরল। বসো ... টাকা চাই নাকি আবার?

অস্ফুট স্বরে আনন্দ জবাব দিল, না, তোমাকে চাই।

আশপাশে লোক রয়েছে। অঞ্জলি ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিল একবার।—কি ব্যাপার, তোমাকে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন?

—কেমন দেখাচ্ছে? খুব কদর্য? সেটাই তো আমার আসল রূপ? কিন্তু এতকাল তুমি সেটা বরদাস্ত করলে কি করে?

অঞ্জলি ফাঁপরে পড়ে গেল। আবার এদিক-ওদিক দেখে নিল। এখানে সে একজন মাননীয়া অফিসার। উঠে পড়ল।—আচ্ছা চলো, ক্যানটিনে বসে কথা বলি।

ক্যানটিনে এসে বসল দুজনে। অপেক্ষাকৃত নির্জন। তবু দূরে দূরে দু একজন করে লোক আছে।

উদ্‌গ্রীব মুখে অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বল তো?

—কিছু হয়নি। এবারে হবে? বিয়ে—

অঞ্জলি হকচকিয়ে গেল। —বি-বিয়ে ...তা এখানে...

—এখানেই। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে। আপত্তি আছে? অঞ্জলি বিষম চমকে আবার এদিক-ওদিক দেখে নিল। অস্ফুট স্বরে বলল, কি বকছ, এটা আপিস—

আনন্দরূপ অবুঝ যেন।—আপসি তাতে কি, আপিসের সব বিয়ে না করে বসে আছে? যাক, তোমার সঙ্গে কথা আছে, এক্ষুনি ছুটি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে?

অঞ্জলির অপলক দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর স্থির হল একটু। উঠে দাঁড়াল, বসো এক্ষুনি আসছি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাকী সময়টুকুর জন্য ছুটির ব্যবস্থা করে তাকে ডেকে নিয়ে ব্যাঙ্কের বাইরে পা দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু বুকের তলার কাঁপুনি থামেনি।

পাশাপাশি হেঁটে চলেছে দুজনে। হালকা হবার জন্যে মৃদু একটু শিস দিতেও চেষ্টা করেছে আনন্দ। অঞ্জলি বলল, কি ব্যাপার, হাঁটিয়েই বাড়ি নিয়ে যাবে নাকি?

জবাব না দিয়ে আনন্দ এগিয়ে চলল। আসলে শিপ্রা নন্দীর অ্যাপ্রন-পরা আর গলায় স্টেথো-ঝোলানো সরল-সুন্দর মুখখানা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। প্রাণপণে সেটা মুছে দেবার চেষ্টা।

মোটামুটি একটা শৌখিন রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেল আনন্দরূপ। জিজ্ঞাসা করল, সঙ্গে টাকাকড়ি আছে? সকাল থেকে এ-পর্যন্ত কিছু খাওয়াই হয়নি।

অঞ্জলি ধড়ফড় করে উঠল।—আছে, চলো।

কোণের একটা ক্যাবিন বেছে নিয়ে বসল দুজনে। মেনুকার্ড দেখে আন্দরূপই খাবার অর্ডার দিল। বেয়ারা চলে যেতে অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি কেন?

—হয়নি...

—কোথায় ঘুরছিলে সমস্ত দিন?

আনন্দ হেসেই জবাব দিল, কোথাও না ঠিক, আসলে নিজের মধ্যেই ঘুরে মরছিলাম।

অঞ্জলি গম্ভীর।—শিপ্রার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু হয়েছে?

—না। শিপ্রা ইজ এ ক্লোজড্ চ্যাপ্টার নাউ। তার কথা না তুলে তুমি চোখ-কান বুজে আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ কি না?

—আস্তে। অঞ্জলি শঙ্কিত।—বাবা তোমাকে টাকার কথা কিছু বলেছে?

—না, না! তুমি আমার কথার জবাব দাও।

বেয়ারা খাবার নিয়ে এলো। সাজিয়ে দিল। আনন্দ গো-গ্রাসে খেতে লাগল। অঞ্জলি দেখছে। নিজের ডিশ থেকে তাকে কিছু কিছু তুলে দিচ্ছে নিঃশব্দে। আনন্দরূপ খেয়াল করছে না।

হঠাৎ আবার আত্মস্থ সে।—খাচ্ছ না?

অঞ্জলি বলল, খাচ্ছি। তুমি খাও।

—আমার কথার জবাব দিলে না?

—কোন কথার?

—বিয়েতে তোমার আপত্তি আছে কি নেই?

—কিন্তু...

—কিন্তু-টিন্তু নেই। বলেছি শিপ্রা ইজ এ ক্লোজড্ চ্যাপ্টার—সেটা মেনে নিয়ে আমাকে বিয়ে করতে তুমি রাজি আছ কি-না?

একটু চুপ করে থেকে অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, অত টাকা দেওয়া হয়েছে ভেবে বলছ?

—না, আগে শুধু টাকার কথাই ভেবেছি, তোমার কথা ভাবিনি। তুমি ভাবার সুযোগ দাওনি। এই অন্ধ চোখদুটো গোড়া থেকে চেষ্টা করলে তুমিই খুলে দিতে পারতে, তার বদলে দীপু দিল। আই অ্যাম রাইটলি সারভ্ড।

অঞ্জলি অবাক।—দীপু তোমাকে কি বলেছে? আমি কিন্তু তাকে কখনো কি-চ্ছু বলিনি!

আনন্দরূপ খাওয়া থামাল। সোজা তাকাল তার দিকে। মুখের খাবার জঠরে চালান দিল। জল খেল। তারপর উঠে অঞ্জলির পাশে এসে দাঁড়াল।—আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

—কি মুশকিল, উঠলে কেন, বোস না?

—হ্যাঁ কি না?

—কি যে কর, বাইরে লোকজন রয়েছে। বোস আগে।

—জবাব না দিলে—দু হাতে ওর দুই গাল চেপে ধরে মুখখানা নিজের দিকে ঘোরাল—জবাব না দিলে আরো বেশি কাণ্ড করে বসব —হ্যাঁ কি না?

কালো দু চোখ আনন্দর চোখের গভীরে হারিয়ে যেতে লাগল, দুহাতে অঞ্জলির মুখখানা তার মুখের ওপর ধরা।

অঞ্জলি মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

বিয়ে হয়ে গেল।

একটা মেয়ে যে নিঃশব্দে এত ভালোবাসতে পারে কাউকে আনন্দরূপ সেটা টের পেল বিয়ের পর। ভালোবাসার এমন সমর্পণ আর এমন আকুতি দিয়ে গ্রহণ, এক-একসময় প্রায় অস্বাভাবিক মনে হয়েছে আনন্দর। সাদামাটা অথচ প্রখর বুদ্ধিমতী এক মেয়ের এই আবেগ কল্পনা করা যায় না। ও যেন সমস্ত সত্তা দিয়ে আর দেহের সমস্ত অণু-পরমাণু দিয়ে পেতে চায় ওকে, অনুভব করতে চায়।

নিজেই স্বীকার করেছে, হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার আগে যেদিন তারা এ বাড়ির দোতলায় এসে উঠল, সেইদিন থেকে অঞ্জলি তাকে ভালোবেসেছে। তারপর থেকে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে।

আনন্দরূপ ছদ্মকোপে চোখ রাঙিয়েছে, কখনো জানতে বুঝতে দাওনি কেন আমাকে?

অঞ্জলি হেসে আটখানা।—এই রূপ নিয়ে ভালোবাসা জানাতে গেলে তুমি বাড়ি ছেড়ে পালাতে-তোমাকে চিনি না?

—কোথায় চেনো, এই রূপকেই তো বিয়ে করলাম।

—দায়ে পড়ে করলে। পরে প্রস্তাবে। হেসে বুকে থুতনি ঘষতে ঘষতে আবার বলেছে, কিন্তু আশ্চর্য জানো, শিপ্রার সঙ্গে তোমার অত প্রেমের ঘটা দেখেও আমার কিন্তু ঠিক ঠিক মনে হত তুমি আমার হবে। সর্বদা মনে হত একটা ম্যাজিক-ট্যাজিক কিছু হবে—ম্যাজিকের কলকাঠি দীপু ঘোরাবে সেটা অবশ্য ভাবতে পারিনি। খিল খিল হেসে ওকে আঁকড়ে ধরে বলেছে, সব-সময় হিসেবে ডবল পাওয়ার কথা বলতাম মনে নেই?

—সেই ডবল আমি?

—না তো কি!

দুজনে পরামর্শ করে আলাদা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিল তারা। এ-ভাবে সকলের সঙ্গে লেপটে থাকা ভালো দেখায় না। তাছাড়া চালাতে হলে ঘরও আর একখানা বেশি দরকার।

এ ছাড়া ও অন্যত্র কোথাও সরে যাওয়ার তাগিদ বোধ করেছে আনন্দরূপ আরো একটা বিশেষ কারণে। সে অপ্রত্যাশিতভাবে একজনকে হারিয়েছে আর অঞ্জলি তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে একজনকে পেয়েছে। কিন্তু এখানে অঞ্জলির চোখ নিয়ে আর মন দিয়ে সকলে দেখছে না তাকে, বিচার বিশ্লেষণ করছে না। এখানে আনন্দরূপের ব্যর্থতাটাই যেন বড় সকলের চোখে—সে ব্যবসা নিয়ে এগোতে পারল না এবং যোগ্যতার বিচারে আর এক মেয়ের কাছে সে বাতিল। দুজনের সংসারে অঞ্জলির শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সে ক্ষতটা হয়তো ভুলতে সময় লাগবে না। এখানে সব থেকে বেশি অস্বস্তি দীপুর সামনে। এই ভবিতব্য সে মেনে নিয়েছে, অঞ্জলির ভিতরের রূপের ছোঁয়া পেয়ে নিজেকে সে ভাগ্যবান ভাবতেও চেষ্টা করছে, কিন্তু দীপুকে সে সহ্য করে উঠতে পারছিল না। ওর সব থেকে বড় বিশ্বাসের পাত্র দীপু, কিন্তু দরকার পড়লে সে-ই যে সব থেকে বড় আঘাতটি করে বসতে পারে এই প্রমাণ মিলেছে যেন।

নতুন ফ্ল্যাটে উঠে আসার আগে দোতলার একটা ঘর ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থাও দীপুর। অঞ্জলির মা একতলার একখানা ঘর ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। দীপু বলেছে, তা হবে না, অঞ্জলিকেই শ্বশুরঘর করার জন্যে দোতলায় উঠে আসতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দর দিকে চোখ গেছে তার। বলেছে, তবে রূপদা যদি ঘরজামাই হতে চায় তাহলে ভিন্ন কথা।

ওই একটা কথায় আনন্দর কেন অত রাগ হয়েছিল জানে না। মনে হয়েছিল এও যেন অযোগ্যতার ঠেস কিছু। বলেছে, আমার কথা ভেবে আর কি করবি, এবার তোর চাওয়ার দৌড়টা দেখব—মাসে দু শ টাকা রোজগার করে তো ধরাকে সরা ভাবছিস।

এর পর থেকেই খুব নিঃশব্দে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সেটা আর কেউ খেয়াল না করুক অঞ্জলি করেছে। একদিন বলেছিল, আচ্ছা, দীপুটা হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেছে কেন বলো তো?

আনন্দর নির্লিপ্ত জবাব।—কি করে বলব।

—তুমিও তো ওকে সে-রকম ডাকো-টাকো না আজকাল।

আনন্দর চোখে ছদ্ম কোপ।—ওকে ডাকার সময় এখন আমার?

অঞ্জলিও হেসেছে। তারপর বলেছে, আসলে দীপুর বোধহয় এখন খুব দুঃখু হয়েছে। তার রূপদার কি বউ আসতে পারত আর কি এলো—ও কিন্তু একদিন দেখেই শিপ্রার খুব প্রশংসা করেছিল আমার কাছে।

খুব নিস্পৃহ মুখে আনন্দ বলেছে, একদিন কেন, পরে আরো দিন দুই দেখা হয়েছে, আমি ডাকলে আরো হতে পারত...

কি বলতে চায় অঞ্জলি চট করে বুঝে উঠল না। হালকা ভ্রূকুটি।—তার মানে শিপ্রাকে ওরও খুব পছন্দ?

—তার মানে তোমার ধারণা ষোল আনা ভুল—তুমি ছাড়া রূপদার কাছে আর কারো আসাটা ও বরদাস্তই করতে পারত না।

অঞ্জলির খুশি হবার কথা। তবু মুখের দিকে চেয়ে কিছু যেন বোঝার চেষ্টায় ছিল। আনন্দ ব্যস্তমুখে সরে গেছে।

নতুন ফ্ল্যাটে এসে নিপুণ হাতে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিল অঞ্জলি। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে দরাজ হাতে খরচ করল। আবার ভ্রূকুটি করে আনন্দকে বলল,ডবল হিসেব তো হয়ে গেছে, এখন থেকে সব কিছুর সোজা হিসেব নেব বলে রাখছি—তোমার ও-রকম উড়নচণ্ডে স্বভাব বদলাতে হবে।

সন্তর্পণে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দরূপ হেসেই জবাব দিয়েছে, আমাকে তাহলে আত্মবিসর্জন দিতে বলছ?

শোনামাত্র অঞ্জলি পিছু হটেছে। হেসেই বলেছে, থাক বাপু থাক, স্বভাব বদলে কাজ নেই, চোদ্দ বছর বয়েস থেকে ওই স্বভাব দেখেই তো মরেছি।

শিপ্রা হঠাৎ 'ক্লোজ্‌ড চ্যাপ্টার' হয়ে গেল কি করে সে-ও অঞ্জলি খুঁটিয়ে শুনে ছেড়েছে। পরে বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, আ-হা, মেয়েটার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে।

আর কেউ হলে আনন্দরূপ ঠাট্টা ভাবত, কিন্তু অঞ্জলির বেলায় সেটা ভাবা শক্ত।

ও এত ভালো আর মনটা এত পরিষ্কার যে আনন্দর অনেক সময় ছোট মনে হত নিজেকে। কারণ শিপ্রা নন্দী সত্যিই কি ক্লোজ্‌ড্ চ্যাপ্টার? থেকে থেকে এখনো কি ওকে মনে পড়ে না? ওর জন্য বুকের ভেতর যন্ত্রণা হয় না? বিছানায় গা ছেড়ে চোখ বোজা-মাত্র ঢোলা অ্যাপ্রন-পরা স্টেথো গলায় মুখখানা অনেক সময়েই সামনে এগিয়ে আসে কেন?

কিন্তু অঞ্জলি কি মুখের দিকে চেয়ে সত্যিই টের পায়? দেখতে পায়? নইলে কথায় কথায় একদিন বলল কেন, দেখো শিপ্রার মতো মেয়েকে ভোলা অত সহজ নয়, দেখা-টেখা হয়ে গেলে তোমার দিক থেকে তুমি ভালো ব্যবহার করো—রাগ দেখিও না। তারপর আবার বলেছে আমি কিছুই মনে করব না—করব কেন, তুমি তো আমাকে ভালোবাসনি, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, আমার ভাগ্যে তুমি আমার কাছে ধরা পড়েছ, তা বলে আমি অবুঝের মতো সব-কিছু দাবি করতে যাব কেন?

অদ্ভুত লেগেছিল অঞ্জলিকে। ধরে অনেক আদরও করেছিল। আর ভিতরে ভিতরে একটু স্বস্তিও বোধ করেছিল। ইচ্ছে করলেই যে মন থেকে সব-কিছু তাড়ানো যায় না সেটাও বুঝতে পারে। নইলে শিপ্রার সঙ্গে ওর অত মাখামাখি দেখেও অঞ্জলি নিঃশব্দে তাকে ভালোবেসে যেতে পেরেছিল কি করে? মন থেকে ছেঁটে দূর করে দিতে পারেনি তো?

স্ত্রীর ভাগ্যে বিত্ত—এক জনের বেলায় খাটে আনন্দ জানে না। কিন্তু বিয়ের ছ মাসের মধ্যে আনন্দরূপের ভাগ্য অবিশ্বাস্য রকম খুলে যাওয়ার সূচনা দেখা দিল। অথচ ভিতরে একটা দুশ্চিন্তাই ছিল, কমপিটিশনের বাজারে তার কস্‌মেটিক্‌স্-এর ব্যবসা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে তখন। হাতে মালকড়ি যা আছে সব বেচে-টেচে দিলে বড়জোর পাঁচ-সাত হাজার টাকা পাবে—বাদ-বাকি এই ক বছরের সবই লোকসান। তবু আরো লোকসান বাঁচানোর তাগিদে বেচে দেওয়ার চিন্তাই করছিল। আর, অন্য কি করা যায় তলায় তলায় সেইদিকে চোখ রেখেছিল।

অপ্রত্যাশিত একটা সুযোগ এসে গেল।

ওর এক কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু তখন বিলেতে। তার বাবা সরকারী সার-দপ্তরের একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। শোনা গেল সার-বণ্টন অর্থাৎ ফার্টিলিজার ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য কিছু নির্ভরযোগ্য এজেন্ট দরকার। শত শত পয়সাঅলা লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সরকারী ব্যাপার, সরবরাহর দায়িত্ব সরকারের —শুধু ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব—লোকসানের কোনো প্রশ্ন নেই—লাভের অঙ্কও বাঁধা। বড় আশা করে না, ছোটখাট ডিস্ট্রিবিউটার হয়ে বসতে পারলে নিশ্চিন্ত। অনিশ্চয়তা বলে কোনো কথা নেই, ভবিষ্যতের কোনো মার নেই।

বন্ধুর বাবার সঙ্গে সোজা গিয়ে দেখা করল। চেহারার দরুনই লোকে চট করে তাকে ভোলে না। বন্ধুর বাবাও দেখা-মাত্রই চিনলেন। কথাবার্তা বলেও ভালো লাগল। তিনি চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন, দরখাস্ত নিলেন। আর কমিটির মিটিংয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে তারও ডাক পড়ল।

বলাবাহুল্য, বাঙালি ছেলের এই চেহারা, এই মিষ্টি অথচ সপ্রতিভ আচরণ দেখে কমিটির অন্য মেম্বাররাও ওর প্রতি নরম হলেন। বন্ধুর বাবা যেটুকু তদ্বির দরকার তাও করে রেখেছিলেন। কিন্তু মুশকিল হল, একেবারে ছোট ছেড়ে মাঝারি গোছের পেতে হলে এ লাইনে ছোট-খাট প্রতিষ্ঠা কিছু থাকা দরকার। ব্যবসায়ে যুক্ত নয় এমন অনভিজ্ঞ লোককে দায়িত্ব দিলে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠবে।

বন্ধুর বাবার ইঙ্গিত মতো আনন্দরূপ অম্লানবদনে জানাল তাও আছে। তার প্রোডাক্টস অর্থাৎ নিজের তৈরি কসমেটিক্স্-এর ব্যবসা এখনো চালু আছে, কিন্তু কমপিটিটিভ মার্কেটে সেটা এখন আর ঠিকমতো চালানো যাচ্ছে না—এই কারণেই সে আবেদন নিয়ে এসেছে।

তারা শুধালো, ফার্মের নাম কি?

মুহূর্তে যে নাম মনে এলো তাই বলে দিল।—আনন্দাঞ্জলি প্রোডাকশন্স—এ কাজ পেলে আনন্দাঞ্জলি ডিস্ট্রিবিউটার্স হবে।

বন্ধুর বাবা হাসলেন, আনন্দ তো তুমি, অঞ্জলি কে?

মৃদু হেসে জবাব দিল, ওয়াইফ।

ছোট আশা করেছিল, কিন্তু মাঝারি গোছের কাজই পেয়ে গেল। আর তারপর আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। শুধু মাল নিতে হলেই সরকারি দপ্তরে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা জমা দিতে হবে—তারপর মাল আনা-নেওয়া চালান দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে আরো হাজার দশেক অনন্ত হাতে থাকা দরকার। টাকা জমা দিয়ে মাল নেবার অর্ডার হাতে পেয়ে তার চক্ষুস্থির।

ছুটল অঞ্জলির ব্যাঙ্কে। ক্যানটিন-রুমে বসে তার সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা আলোচনা করল। ভেবে-চিন্তে অঞ্জলি বলল, এসো আমার সঙ্গে।

তাকে নিয়ে এজেন্টের ঘরে ঢুকল সে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক অঞ্জলিকে যে বিশেষ স্নেহ করেন সেটা দু মিনিটের মধ্যেই বোঝা গেল। আনন্দকে বিয়েতে দেখেছিলেন, তারপর আজ দেখলেন। আজও অঞ্জলির সহকর্মী অফিসাররা তার স্বামীর চেহারা নিয়ে প্রশংসার ছলে ওঠে ঠাট্টা করে। আর এই প্রৌঢ় এজেন্ট বলেছিলেন, তুমি তো কম মেয়ে নও, এ রকম একটি কন্দর্পকান্তির গলায় দড়ি পরিয়ে ছাড়লে।

তিনি সমস্যার কথা শুনলেন, কাগজপত্র দেখলেন। তারপর এক কথায় ব্যাঙ্কের নির্ধারিত সুদে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। স্যাংশন করে দিলেন।

অঞ্জলিকে সেদিন আর আপিসই করতে দিল না আনন্দ। বাড়িতে টেনে এনে একটা হৈ-চৈ কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল। আদর করে, চুমু খেয়ে অস্থির করে, হঠাৎ শূন্যে তুলে নিয়ে বিছানায় ফেলে তারপর জাপটে ধরে গড়াগড়ি শুরু করে দিল।

...সেই মধ্যাহ্ন একটা মনে রাখার মতো দিন অঞ্জলিরও।

সব কাজে মন দিয়েছে আনন্দরূপ। তার আহার-নিদ্রার ফুরসত নেই। বকে-ঝকে ধমকে তাকে কিছুটা নিয়মের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করছে অঞ্জলি। সেদিনও কি নিয়ে ব্যস্ত ছিল আনন্দরূপ। কাল-পরশুর মধ্যে আবাব ট্যুরে বেরুতে হবে। সপ্তাহের মধ্যে চারদিনও ডিস্ট্রিবিউশনের কাজে বাইরে বেরুতে হয়।

অঞ্জলি এসে গোমড়া মুখে সামনে বসল। আনন্দ প্রথমে ভাবল তার এত খাটুনি দেখেই মুখ ভার। কিন্তু ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে অবাক। দশটা বেজে গেছে।

—আজ ব্যাঙ্কে গেলে না?

—নাঃ।

—কেন? কি হল?

—শরীরটা খারাপ।

শরীর খারাপ শুনে আনন্দরূপ ব্যস্ত হয়ে কাছে এগিয়ে এলো? ওকে অফিস কামাই করতে দেখে না বড় একটা।—ডাক্তার ডাকব? কি হয়েছে?

—কি হয়েছে—নিজে গণ্ডগোল বাঁধিয়ে এখন সাধু সাজা হচ্ছে।

আনন্দরূপ হাঁ হঠাৎ। তারপরেই বোধগম্য হল ব্যাপারটা। আরো কাছে এসে দুই কাঁধ ধরে রাম-ঝাঁকুনি।—কি করে বুঝলে? কবে টের পেলে?

ছদ্ম-গাম্ভীর্যে হাসির ফাটল ধরেছে।—গেল মাসেই সন্দেহ হয়েছিল, এ মাসে ঠিক বুঝেছি।...কি কাণ্ড করলে বল তো...আপিসের সব টের পেয়ে যাবে..বিচ্ছিরি।

আন্দরূপও চোখ পাকালো না।—কাণ্ড আমি করলাম না তুমি?

—যাও ভালো লাগে না। অঞ্জলি হেসে ফেলল।

আর এই ভালো না লাগার রূপটা বড় অদ্ভুত মনে হল আনন্দর।

এরপর মাসাবধি দফায় দফায় ট্যুরে আনন্দরূপ ব্যস্ত ছিল খুব। তখনো সে ট্যুরে। অঞ্জলি হঠাৎই একদিন শরীরটা অসুস্থ বোধ করল কেমন। তারপর হতাশার কিছু একটা কারণ ঘটেছে নিজেই টের পেল। ব্যাঙ্ক কামাই করে নার্সিং হোমের একজন বড় ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার যথাবিধি চিকিৎসার ব্যবস্থা দিলেন।

ট্যুর থেকে ফিরেই অঞ্জলির বিষণ্ন মুখ চোখে পড়ল আনন্দর। জিজাসা করল, কি হয়েছে? শরীর কেমন?

—শরীর এখন ভালোই।

—এখন ভালো মানে? কি হয়েছে?

কাঁদ কাঁদ মুখে অঞ্জলি বলল, গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

আনন্দরূপ ব্যাপারটা শুনল সব। তারপর বলল, যা হয়েছে—হয়েছে, এখন শরীর কেমন বল?

অঞ্জলি বিরক্ত।—বললাম তো ভালো। ছাইয়ের শরীর—

এরপর সত্যিই অনেক দিন পর্যন্ত বিষণ্ন দেখেছে ওকে। মাঝে-মাঝেই জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা এ-রকম কেন হল বল তো?

ব্যবসায় এক বছরের মধ্যে কমলার প্রসন্নদৃষ্টি এই ছোট সংসারের ওপর ঝলমল করে উঠল। কত সহজে কত অনায়াসে কত টাকা আসতে পারে দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না অঞ্জলির। আনন্দরূপের কাজের শুনাম হয়েছে। কলকাতার কাছাকাছি ছেড়ে এখন কিছু দূরে দূরেও সার-বণ্টনের দায়িত্ব পাচ্ছে। এই পরিসর যত বিস্তৃত হবে তত লাভ।

ইতিমধ্যে আনন্দরূপ নিজের ছোটখাট একটা গোডাউন করেছে, একটা লরিও কিনেছে। ড্রাইভার ছাড়া লরিতে যাতায়াতের জন্য আর মাল ওঠানো-নামানোর জন্য দুটো বাড়তি লোকও রেখেছে। ওদিকে ছোট ফ্ল্যাট ছেড়ে আরো ভালো ফ্ল্যাটে বাসা বদল করেছে।

পরের বছরে নিজস্ব নতুন গাড়ি হল। ব্যাঙ্কে মোটা-মোটা অঙ্কের টাকা জমা পড়তে লাগল। আরো একটা লরি কেনা হল। টাকা আসছেই—আসছেই। নিজের একটা আপিসঘরও ভাড়া নিয়েছে আনন্দরূপ। আপিসে—বাড়িতে টেলিফোন মজুত। কিন্তু মুশকিল দাঁড়ালো একলা আর পেরে ওঠে না—ট্যুর, অফিস ম্যানেজমেণ্ট, সরকারের দপ্তর ছোটাছুটি—সব একার দ্বারা হবার নয় আর। চার-পাঁচজন লোক রাখা হয়েছে—কিন্তু তার ডান-হাতের মতো একজন বিশ্বস্ত মানুষ দরকার।

অঞ্জলি বলল, এবারে তুমি দীপুকে ডাক, ওকে নিয়ে নাও।

একটা স্মৃতির ক্ষতর ওপর নাড়াচাড়া পড়ল। দীপু এলে দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা সবই হয়। কিন্তু আগের সেই সম্পর্কটা ভিতরে ভিতরে অনেকটাই ঢিলে হয়ে গেছল। দীপু এখন শতিনেক টাকা মাইনের একটা চাকরি করে। আনন্দ আশা করেছিল, মুখ ফুটে সে-ই আসার ইচ্ছেটা প্রকাশ করবে। কিন্তু করেনি।

অঞ্জলি বলার পর উদারতা দেখানোর ঝোঁকটাই বড় হল। বলল, চলো আজই, দেখি কি করে।

দীপু গম্ভীর মুখে বলল, আনন্দাঞ্জলির মধ্যে আমি কেন?

অঞ্জলি বলল, তোমার জন্যেই আনন্দাঞ্জলি, তুই তুমি।

—কিন্তু রূপদা তো সেই রাগ আমার ব্যাপারে অন্তত ভোলেনি মনে হয়।

ভেতরটা কেমন ধড়ফড় করে উঠল আনন্দর। একটা দুর্বল সত্যের ওপর ঘা বসিয়েছে যেন। জোরের সঙ্গে বলল, না ভুললে আমি সেধে এলাম কেন রে গাধা? রূপদাকে তুই কেমন ভালোবাসিস এতদিন চুপচাপ তাই দেখেছিলাম।

দীপু হেসেই জবাব দিল, সেটা দেখতে এতদিন লাগল? আমি আশা করেছিলাম তোদের বিয়ের রাতেই দেখতে পাবো।

আবারও অস্বস্তি বোধ করেছে আনন্দ। অঞ্জলি শাসালো তাকে, বড় দেমাক হয়েছে তোমার, না? কালই তুমি সব ছেড়ে-ছুড়ে আনন্দাঞ্জলির সঙ্গে এসে লাগাবে কি না?

—না। হাসিমুখেই মাথা নাড়ল।

এবারে একটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করল আনন্দরূপ। ভাইয়ের অভিমান বুকে লেগেছে। হাত দুটো জোড় করে বলল, আচ্ছা, আমারই দোষ হয়েছে—তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি—হল?

এরপর আর আপত্তি টিকল না। মাসে আপাতত সাড়ে-সাতশো টাকা মাইনে আর আনন্দাঞ্জলির মালিকানার দুআনা অংশ লেখাপড়া করে নেওয়া হবে স্থির হল। অংশের মালিক হবার ব্যাপারে দীপু আপত্তি করেছিল, কিন্তু সে আপত্তি টেকেনি।

সেই রাতে আবার শিপ্রা নন্দীর কথা মনে পড়েছে আনন্দর। নিরিবিলি অবকাশে মাঝে মাঝে মনে পড়ে। বিশেষ করে সুদিনের মুখ দেখার পর। কিন্তু সেটা সংগোপনে। শিপ্রা ডাক্তারি পাস করেছে সে-খবর রাখে, কিন্তু তারপর আর কিছুই জানে না। জানতে ইচ্ছে করে।

অঞ্জলিরও মেজাজ প্রসন্ন সেই রাতে। আর মন ভালো থাকলেই সেই পুরনো দিনের ক্ষেদটা উঁকি-ঝুঁকি দেয়। ভাবনাও হয় তখন একটু।

হঠাৎ বুকের কাছে সরে এসে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আর হচ্ছে না কেন বল তো?

আনন্দরূপ বিষম চমকে উঠল কেন যেন। প্রশ্নটাই হঠাৎ বুঝে উঠল না।

অঞ্জলিও অবাক একটু।—চমকে উঠলে কেন, কি ভাবছিলে?

—না, দীপুর কথা...কি হচ্ছে না?

—আমি জানি না, তুমি একটা যাচ্ছেতাই।

আনন্দ বুঝল। হেসে বলল, খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ নাকি?

—না তো কি!...একজন ডাক্তার দেখাতে হবে, তুমি তো সময়ই পাও না।

মিটিমিটি হেসে আনন্দ আলো নিভিয়ে দিয়েছে। আর অতনু-সান্নিধ্যে মানুষটার সেই রাতের আবেগটুকু বেশি উষ্ণমুখর মনে হয়েছে অঞ্জলির।

টাকা অসাছেই—আসছেই। টাকা-বর্ষণের বহর দেখে দীপু নিজেই হকচকিয়ে গেছিল গোড়ায় গোড়ায়। ইতিমধ্যে আবার উত্তরবঙ্গের কয়েকটা জায়গার দায়িত্বও হাতে এসে গেল। দুই ভাইয়ে মিলে ছোটাছুটি করে কুল পায় না। কাজে লাগার তিন মাসের মধ্যে আনন্দ পুরো হাজার টাকাই মাইনে করে দিল তার। দু আনার শেয়ার তো আছেই। এবারে ফার্মের নামে আর একটা নতুন গাড়ি কেনা হল। সেই গাড়ি দীপুর হেপাজতে থাকল।

কিন্তু জীবনের এই অঙ্কে আবার এক প্রচণ্ড ঝড়ের সংকেত দেখা দিতে পারে কেউ জানত না।

শিয়ালদা স্টেশন থেকে মধ্য-কলকাতার রাস্তা ধরে নিজের গাড়িতে আসছিল আনন্দরূপ। হঠাৎ বিষম চমকে উঠল। ট্রাম-স্টপে শিপ্রা নন্দী দাঁড়িয়ে, হাতে ছোট একটা ব্যাগ। ট্রামের অথবা ট্যাক্সির অপেক্ষায় আছে।

এ গাড়ি আনন্দ এখন নিজেই ড্রাইভ করছে, নিজের ড্রাইভার। দীপুকে দিয়েছে।

বুকের তলায় অদ্ভুত একটা আলোড়ন অনুভব করল আনন্দরূপ। গাড়িটা পাশে এনে দাঁড় করাল।

ঝকমকে গাড়িতে তাকে দেখে শিপ্রা নন্দীও হকচকিয়ে গেল।

পাশের দরজা খুলে দিয়ে আনন্দরূপ শান্তমুখে ডাকল, এসো।

আশ-পাশের লোকেরা দেখছে। কি করবে ভেবে না পেয়ে উঠেই পড়ল। পাশে বসল। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করেনি আনন্দ, গাড়ি চলল আবার।

—কোথায় যাবে?

—চেম্বারে...মানে ওয়েলিংটনের দিকে। তুমি এদিকে কোত্থেকে? সহজ সুরেই কথা বলল শিপ্রা নন্দী।

মুখ ফিরিয়ে আনন্দ একবার দেখল শুধু জবাব দিল না।

শিপ্রা নন্দী হাসছে মৃদু মৃদু। চট করে কথা বলে কেউই নীরবতা ভঙ্গ করল না।

ওয়েলিংটনের কাছাকাছি এসে একটা বড় বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখাল শিপ্রা। ওই বাড়ির তিনতলার একটা ঘরে তার চেম্বার। বাড়ির পাশে গাড়ি থামাতে শিপ্রা নামল। তারপর উৎসুক নেত্রে তাকাল।—আসবে?

—তোমার অসুবিধে হবে না?

—দু চারজন পেসেন্ট আসে কি না আসে, আমি কি সেই ডাক্তার নাকি! তোমার অসুবিধে না হলে এসো।

গাড়ির কাঁচ তুলে লক্ করে আনন্দরূপ নেমে এলো। বাড়িতে ঢুকে পাশাপাশি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল। শিপ্রার আগের মতই বলিষ্ঠ সুঠাম পদক্ষেপ। কাঁধে-কাঁধে ছোঁয়া লাগল দুই একবার। আনন্দরূপ আড়ষ্ট বোধ করতে লাগল কেমন।

একটা বড় ঘরকে পার্টিশান করে দুভাগ করে নেওয়া হয়েছে। সামনের দিকে রোগিনীদের বসার জায়গা পিছনের দিকে ডাক্তারের। একজন বেয়ারা আছে, সে জানলা-দরজা খুলে দিয়ে গেল।

ভিতরের চেম্বারে নিজের আসনে বসল শিপ্রা—বসো, চা খাবে?

—খেতে পারি।

বেল বাজাল। বেয়ারাকে দু পেয়ালা চা আনতে বলল। তারপর হাসিমুখে চেয়ে রইল একটু।—তোমার চেহারার চেকনাই আরো বেড়েছে, বিয়ে করেছ মনে হচ্ছে?

আনন্দরূপ মাথা নাড়ল, করেছে।

—সেই অঞ্জলি ঘোষ এখন অঞ্জলি মিত্র হয়েছেন বোধ হয়? আনন্দরূপ মাথা নাড়ল। তাই।

—খুব ভালো। হাসল শিপ্রা, অবস্থা ফেরালে কি করে, ব্যবসা?

—হ্যাঁ।

—কি ব্যবসা।

বলল কি ব্যবসা।

হেসেই শিপ্রা বলল, আমি কিন্তু ঠিক জানতাম তুমি একদিন বড় হবে।

জবাবে আনন্দরূপের মনে অনেক কথাই এলো। কিন্তু কিছুই বলল না। চুপচাপ চেয়ে রইল মুখের দিকে।

—কি দেখছ?

—তোমাকে। আগের থেকে আরো সুন্দর হয়েছ।... তবু তোমাকে এ-রকম দেখব ভাবিনি।

শিপ্রা হেসে উঠল, কি-রকম দেখবে ভেবেছিলে, কপালে সিঁদুর, পরনে ঢাকাই শাড়ি?

কথা এগোবার ফুরসত মিলল না। বেয়ারা চা রেখে গেল দু পেয়ালা। আর তার দু মিনিটের মধ্যে ও-ঘরে দুজন পেসেন্ট এলো। চা খাওয়া হতে শিপ্রা ফিস ফিস করে বলল, তুমি ও-ঘরে বসো একটু, আমি চটপট বিদায় করছি।

কিন্তু তারা বিদায় হবার আগে একে একে আরো চার-পাঁচজন হাজির। কিন্তু আনন্দরূপের ওঠার কোনো তাগিদ নেই যেন, বসেই আছে।

যথাসম্ভব তাদেরও বিদায় করল শিপ্রা নন্দী। তাও একঘণ্টা কেটেছে। বেয়ারাকে ডেকে আদেশ দিল, বাইরের দরজার কাছে বসো, কেউ এলে বলে দিও আজ আর দেখবো না।

ওকে ডাকল, এসো।

আনন্দরূপ আবার ভিতরে এসে বসলো।—প্র্যাক্‌টিস নেই বলছিলে বেশ তো আছে দেখছি।

শিপ্রা হৃষ্টমুখে জবাব দিল, দরকারের তুলনায় কিছুই না।

আনন্দরূপ বলল, ঠিক বুঝলাম না।

—বা রে, আমি কি এখানেই বসে থাকব নাকি, বাইরের ডিগ্রী আনতে হবে না?... এখন যত পারছি কেবল টাকা জমিয়ে যাচ্ছি।

খানিক চুপ করে থেকে আনন্দরূপ বলল, কোন শুভার্থী জন যদি টাকাটা আগেই দেয়—নেবে?

শিপ্রা হাসছে, পালটা প্রশ্ন করল, তুমি কি বলো, নেওয়া যায়? তক্ষুনি প্রসঙ্গ বদলালো।—তোমার বউয়ের গল্প করো, শুনি।

—গল্প করার কিছু নেই। তার সবই ভালো।

—সেটা কম কথা নাকি!

—আমার মত মানুষের সেটাই মুশকিলের কথা।

এবারে শিপ্রা নন্দী চুপচাপ চেয়ে বসে রইল তার দিকে। আনন্দর মনে হল ওর বুকের তলায়ও একটা যন্ত্রণা ওঠা-নামা করছে—আর সেটা এতক্ষণের টের পাচ্ছে।

—উঠবে?

একটা উদ্‌গত অনুভূতি ভিতরে ঠেলে দিয়ে শিপ্রা হাসল আবার।

—উঠব, কিন্তু আমি তো তোমার উলটোদিকে।

হাসল আনন্দও। বলল, বরাবরই তাই। উঠে দাঁড়াল, চল পৌঁছে দিচ্ছি।...অসুবিধে হবে?

—অসুবিধে আবার কি, উই আর ভেরি মাচ্‌ অ্যাডালট নাউ—তাই না? তাছাড়া জ্যাঠার বাড়ি তো থাকি না, বাবা রিটায়ার করেই মারা গেছেন, দাদা আর ভাই দুটোকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে আলাদা বাড়িতে আছি।

আনন্দরূপ তাকে বাড়ি পৌঁছে দিল। শিপ্রা নেমে বলল, বাড়িতে আসতেও বাধা নেই, আসবে?

—আজ থাক।... কিন্তু আবার দেখা হতে বাধা আছে?

মাথা দুলিয়ে হাসিমুখেই শিপ্রা বলল, নেই।

আনন্দরূপ আপিসের ঠিকানার একটা কার্ড তার হাতে দিল। আর টেলিফোন নম্বরও জেনে নিল। তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। শিপ্রা নন্দী তার পরেও নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল খানিক, ব্যাক মিরের আনন্দরূপ তাও লক্ষ্য করল।

বাড়িতে ফিরতেই অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ, আপিসেও তো টেলিফোন করে পাইনি?

প্রাণপণে চেষ্টা করেও আনন্দরূপ সত্যি কথাটা বলতে পারল না—কাজের কি আর শেষ আছে... জামার বোতাম খুলতে খুলতে পাশ কাটাতে চেষ্টা করল।

—কোথায় কোথায় যে ঘোরো ঠিক নেই। দীপু ওদিকে তোমার খোঁজে বাড়িতে টেলিফোন করছিল।..আজ আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার কথা ছিল, তাও ভুলেছ?

—ও হো! অপ্রতিভ মুখ।

অঞ্জলি হেসে ফেলল, যাও মুখ-হাত ধুয়ে এসো, বিকেলে খাওয়া হয়নি বোধহয়?

জবাব না দিয়ে আনন্দরূপ তাড়াতাড়ি পাশ কাটালো আবার।

কিন্তু সেই রাতেই এই মানুষটার যেন বিশেষ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করল অঞ্জলি। চুপচাপ, ক্ষণে, ক্ষণে বিমনা। আবার কিছু জিজ্ঞাসা করলে সচকিত। রাতে পাশাপাশি শুয়েও একেবারে নির্বাক। কিন্তু মানুষটা যে বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোয়নি তার টের পেয়েছে।

...না, ব্যবসা বা কাজের প্রসঙ্গে এই গোছের ব্যতিক্রম কখনো দেখেনি। কাজ নিয়ে মাথা ঘামানোর লোক নয়। তাছাড়া সে-রকম কিছু হলে দীপু জানাত।

...অঞ্জলি কি সত্যিই ভিতর দেখতে পায় লোকটার? জানে না পায় কিনা। কিন্তু এতদিন বাদে মানুষটার এই হাব-ভাব দেখে তারও হঠাৎ শিপ্রা নন্দীর মুখখানা মনে পড়ল কেন?

এরপর দিন পনেরো পর্যন্ত একই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করল অঞ্জলি। সর্বদা বিমনা, ডাকলে চকিত। কখন কোথায় বেরিয়ে যায় আপিস ছেড়ে দীপু এ-খবর রাখে না। অঞ্জলি তীক্ষ্ণচোখে নিরীক্ষণ করে তাকে। কিন্তু আনন্দ সেটা খেয়ালও করে না।

তারই একটা ভুলে সমস্ত ব্যাপারটাই বিচ্ছিরিভাবে জানতে পারল অঞ্জলি।

আনন্দরূপ বিশেষ দরকারে মফস্বলে বেরিয়েছে হঠাৎ। কিন্তু শিপ্রাকে সেটা জানিয়ে যেতে ভুলেছে। দেখা যেদিন হয় না, শিপ্রা চেম্বার থেকে ফোন করে, আনন্দও করে। কখন সে নিজের চেয়ারে থাকে শিপ্রার সেটা জানা ছিল।

টেলিফোনে হরদম বিরক্ত হতে হয় বলে আনন্দর চেয়ারে এসে দীপু বসেছে। বিকেল ছটায় টেলিফোন এলো একটা। সাড়া দিতে ওদিক থেকে মেয়েলি গলা কানে এল।—আনন্দ? কাল এলেও না টেলিফোনও...হ্যালো?

—হ্যাঁ বলুন।

—আনন্দবাবু...

—তিনি ট্যুরে বেরিয়েছেন, আপনি কে?

—থাক। ঠিক আছে। ওদিকে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ কানে এল।

হ্যাঁ, গত পনেরো দিন ধরে রূপদার পরিবর্তন সে-ও লক্ষ্য করছিল বৈকি। অঞ্জলির সঙ্গে আলোচনাও করেছে এই নিয়ে। সন্ধ্যার পর সোজা বাড়ি চলে এল। অঞ্জলিকে বলল ঘটনাটা।

অঞ্জলি শুনে স্তব্ধ খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ হেসে উঠল। বলল, এ আর এমন কি অস্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু তুমি এ নিয়ে যেন ওকে বোলো না কিছু, আমিই কেমন মজা করি দেখো না।

দীপু গম্ভীর মুখে প্রস্থান করল।

আনন্দরূপ ফিরল তিনদিন বাদে। মোটা টাকার কাজ করে এসেছে, শিপ্রাকে না জানিয়ে আসার ব্যাপরটা তখনো মাথায় নেই। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে অঞ্জলি তার সমানে এসে দাঁড়াল।

—একটা কথা, যা-ই ঘটুক, তুমি নিজেকে ছোট করো কেন, সোজা সত্যি কথাটা বলতে পার না কেন?

আনন্দরূপ অবাক হল।

...আজ থেকে ঠিক আঠার দিন আগে শিপ্রা নন্দীর সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হয়েছিল। তারপর থেকে দেখা, ফোনে কথাবার্তা হয়। কিন্তু সেটা তুমি আমাকে জানাতে পারলে না কেন, আমি তাকে আদর করে বাড়িতে ডাকতাম?

নিমেষে বিবর্ণ পাণ্ডুর আনন্দরূপের সমস্ত মুখ।—তোমাকে কে খবর দিলে?

—যেই দিক, নিজেকে ছোট করে তুমি কক্ষনো আমাকে ছোট কোর না।

সমস্ত রাত একটা অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কাটল আনন্দরূপের। পরদিন অঞ্জলি ব্যাঙ্কে চলে যেতেই বাড়িতে শিপ্রাকে ফোন করল। তার গলা'টের পাওয়া-মাত্র অপ্রস্তুত গলায় শিপ্রা বলল, কি কাণ্ড, আমাকে বলে যাওনি, হঠাৎ তোমার আপিসে ফোন করে বিচ্ছিরি লজ্জায় পড়ে গেছলাম।

দুই এক কথার পর ফোন ছেড়ে দিল আনন্দরূপ। কি ঘটে থাকতে পারে সবই বুঝল।

...দীপঙ্কর, দীপু আবার এই কাণ্ড করেছে।

শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে আনন্দর, কিন্তু আপিসে দীপুকে ঘরে ডেকে একটি কথাও বলতে পারল না।

বেলাশেষে দীপুই ঘরে এলো। সামনে চেয়ার টেনে বসল। দেখল একটু।—দু আনার শেয়ারের এগ্রিমেণ্ট ছিঁড়ে ফেললেই হল, আর চেষ্টা করলে বেঁচে থাকার মতো কাজও একটা যোগাড় হয়ে যাবেই...চেষ্টা করব?

আনন্দ অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।—তোকে আমি বলেছি কিছু?

শুকনো মুখ দেখে অঞ্জলির হাসিই পেয়েছে কেমন। শেষে বলেছে, তুমি মুখখানা অমন করে আছ কেন?...গোপন না করলে আমি একটি কথাও বলতাম না।...শিপ্রা আজও কেন বিয়ে করেনি আমি বুঝতে পারি, তোমার মতো মানুষকে ভালোবাসলে এত সহজে ভোলা যায় না তাও জানি। আমি কাউকে দোষ দিই না, তোমার মন খারাপ করার দরকার নেই, বুঝলে?

ওই কালো চোখের গভীরেই যেন তখনকার মতো আশ্রয় পেয়ে বাঁচল আনন্দরূপ।

দীপঙ্করের মতে অঞ্জলি এখানেই সব থেকে বড় ভুলটা করেছে।

সব দিক বজায় রেখে সে উদার হতে চেয়েছে। তার মতে ভুলের ফসল উদারতায় পোরে না।

আনন্দকে নিয়ে অঞ্জলি নিজে এরপর শিপ্রা নন্দীর বাড়ি গেছে। জোরজার করে তাকেও এ বাড়িতে টেনে এনেছে। তার উদারতায় আনন্দ মুগ্ধ, খুশি।

দীপুই শুধু তার অগোচরে অঞ্জলিকে বলেছে, ভুল হচ্ছে, ভুল করছিস।

একদিকে যেমন অঢেল টাকা আসছে, কর্মপরিসর বাড়ছে, সমস্ত উত্তরবঙ্গ প্রায় তাদের দখলে এসে গেছে, আপিস চারগুণ বড় হয়েছে লরির সংখ্যা দশে দাঁড়িয়েছে, আনন্দর নতুন ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে, অঞ্জলির নিজস্ব একখানা গাড়ি হয়েছে, দীপুর ড্রইং দেড়-হাজারে উঠেছে।—আর একদিকে এইসব কিছুর নিয়ামক যে মানুষ, সে-যে এক অন্ধ তাড়নায় ঘরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেও তেমন স্পষ্ট। গোড়ায় গোড়ায় আনন্দরূপ চেষ্টাও করেছে ঘরমুখো হাতে, কিন্তু সে-চেষ্টা ব্যর্থ, নেশাগ্রস্তের মতোই প্রবৃত্তির হাতে নিজেকে সঁপেছে। অঞ্জলির দিক থেকে জোরালো বাধা এলে অন্যরকম হতে পারত, তাও আসেনি।

একদিন অঞ্জলি দেখে মানুষটা সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ি ফিরে কেমন উসখুস করছে। শেষে হাসি-হাসিমুখে বলেই ফেলল, একটা মজা করলে কি হয়, আজ শিপ্রার জন্মদিন। তোমাতে আমাতে হঠাৎ গিয়ে পড়লে কেমন হয়?

—বেশ হয়। অঞ্জলিও হাসছে বটে, কিন্তু লোকটার মুখের কৃত্রিম হাসিটাই সব থেকে বেশি হৃদয়বিদারক। জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু যেতে বলেছে তো?

—তাহলে আর মজা কি হল।...আগে এই দিনে খুব ঘটা হত ওদের বাড়িতে, এখন আর কিছুই হয় না বোধহয়।

খুব দামী একটা পাথর বসানো হার কিনে নিয়ে আনন্দর সঙ্গে অঞ্জলি হাসিমুখেই গেছে, হৈ-চৈ করে এসেছে। কিন্তু তার ভেতর কতটা পুড়েছে, একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

এর দু মাসের মধ্যে অঞ্জলির বিয়ের দিন। এই দিনেও ঘটা হয় খুব। কিন্তু একারে আর অঞ্জলি দিনটা মনে করিয়ে দিল না আনন্দকে। নিজে থেকেই মনে পড়ে কিনা লক্ষ্য রাখছে। পড়ল না। বিকেলের প্রতীক্ষা, তখন মনে পড়তে পারে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। ঝমঝম বৃষ্টি নামল। আনন্দ ফিরল রাত প্রায় দশটায়, বলল, উঃ, কি যে বৃষ্টি গাড়ি পর্যন্ত চলে না। আটকে গেলাম—

স্বাভাবিক গলায় অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, কোথায় আটকে ছিলে এতক্ষণ?

মুখ-হাতে জল দেবার অছিলায় তাড়াতাড়ি বাথরুমের দিকে চলে গেল।

...দু দিন বাদে ওই তারিখটা মনে পড়েছে অঞ্জলি মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল। ওই অপরাধী মুখ দেখেই তার তখন সব থেকে বেশি রাগ হয়েছিল। কিন্তু অঞ্জলি তাও প্রকাশ করেনি।

ফলে অঞ্জলির দাবির একটা আনন্দরূপের চোখেও তেমন ধরা পড়ে না। শিপ্রা নন্দীর চোখে তো পড়ার কথাই নয়। নিজেদের বিবেকের কাছে ওরাও কৈফিয়ত দাখিলের দায় ভুলেছে। ধরে নিতে শুরু করেছে, অঞ্জলি তার চাকরি নিয়ে, টাকা গাড়ি বাড়ি নিয়ে আর এমন এক মানুষের স্ত্রী হতে পেরেই সন্তুষ্ট। তার বেশি দাবি করে ঝামেলা বা অশান্তি সে চায় না।

না, আচরণে কোনো ঝামেলা বা অশান্তির সৃষ্টি অঞ্জলি করেনি, করে না। কিন্তু তার যে চোখের দিকে তাকিয়ে আনন্দরূপ প্রখর বুদ্ধির ছাপ দেখত, সেই চোখের দিকে তাকালে হয়তো বা সে বিচলিত হত।

এর মধ্যে আনন্দ একদিন সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরে এলো। রাগত গম্ভীর মুখ। অঞ্জলির দৃষ্টি এড়ায় না কিছু, কিন্তু সেধে জিজ্ঞাসাও করল না কি হয়েছে। কিন্তু আনন্দই আর চুপ করে থাকতে পারল না শেষ পর্যন্ত। কাছে এসে বলল, তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল—

অঞ্জলি চুপচাপ অপেক্ষা করল কয়েক মুহূর্ত। হাল্‌কা করেই বলল, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে-রকম সুখের কথা কিছু নয়।

—না। দীপুকে তুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিও তার কোনো বাড়াবাড়ি আমি বরদাস্ত করব না। আমার কোনো ব্যাপারেও যেন নাক গলাতে না আসে।

অঞ্জলি আবারও থমকে চেয়ে রইল খানিক। —তাকে আমি বলব একথা?

—হ্যাঁ।

—তার মানে ঘুরিয়ে তাকে আমি বিদেয় হতে বলব?

মুখ একটু একটু করে লাল হচ্ছে আনন্দরূপের। জবাব দিল, যদি তাই মনে করে তাহলে যাবে। এখানে এসে সে আমাদের মাথা কিনে নেয়নি।

সে-রকম কিছুই ঘটেছে অঞ্জলি বুঝতে পারছে। কিন্তু এখনো সরাসরি জিজ্ঞাসা করল না কিছু। মুখের দিকে চেয়েই মানুষটার ভিতর দেখে নেওয়ার ঝোঁক। আগের থেকেও এখন যেন বেশি পারে সেটা।

বলল, দীপু তোমার ছোট ভাই, তুমি নিজে তাকে বলছ না কেন?

—আমি বললে একটা হেস্তনেস্ত হয়েই যাবে। তার কোনো ক্ষতি চাইনে আমি—তাই।

গলার স্বর সামান্য উতলা শোনালো অঞ্জলির। কিন্তু ওটুকু যে কৃত্রিম তাও বুঝতে বাকি থাকল না বোধহয় আনন্দর। অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, কি করেছে দীপু, ব্যবসার টাকা-পয়সা সরাচ্ছে নাকি?

একটা অসহিষ্ণু উত্তাপ সমস্ত মুখে ছড়াচ্ছে যেন। —না। তুমি তাকে বললেই কি করেছে সেটা সে বুঝতে পারবে। শিপ্রা নন্দীর চেম্বারে গিয়ে ও তার সঙ্গে দেখা করেছে, তাকে একরকম অপমান করে এসেছে।

এতটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না অঞ্জলি। ভেবেছিল, বড় জোর শিপ্রা নন্দী সম্পর্কে তার রূপদার কাছে কিছু অপ্রিয় মন্তব্য করেছে, অথবা তাকে নিয়েই কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। দীপুটা যে এই গোছের ডাকাত ভাবেনি। চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে নরম করে বলল, দীপুর মাথা খারাপ, কিন্তু ও এ-রকম কেন করছে বলো তো?

—সাহস বেড়েছে তাই করেছে, ওকে নিজের রাস্তায় চলতে বলে দিও।

—বলব। এখনো সুন্দর হাসতে পারল অঞ্জলি। —কিন্তু ওকে তো তুমিই ভালোই জানো.. আসলে ওর মাথায় ঢুকেছে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ।

ঝাঁঝালো গম্ভীর স্বরে আনন্দ বলল, সেটা তোমার আমার ব্যাপার ওর কি ? তুমি বললে বুঝতাম—

অঞ্জলি তেমনি সহজ মুখ করে বাধা দিয়ে উঠল, আমি বলব কেন...তুমি কি সত্যিই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ নাকি?

আনন্দ ঘর ছেড়ে চেল গেল। রাগ সত্ত্বেও এক ধরনের অস্বস্তি এখন। একটু বাদে টেলিফোন ডায়েল করার শব্দ কানে এলো। আনন্দ উৎকর্ণ।

...হ্যাঁ টেলিফোনে দীপংকরকেই তলব করেছে। চেপেচুপে কথা বলল না, সাদা-সাপটা হুকুম, আপিস ফেরত সোজা এখানে চলে আসতে হবে—দরকার আছে।

ওদিক থেকে দীপু কিছু জিজ্ঞাসা করে থাকবে। জবাব অঞ্জলির ঝাঁঝালো গলাও কানে এলো।—আসতে বলেছি আসবে, যা শোনার এসে শুনবে, ব্যবসার মস্ত কর্তৃত্ব পেয়ে তুমি নিজেকে ভাবছ কি আজকাল?

শব্দ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আনন্দর অস্বস্তি বাড়ছে আরো। অঞ্জলির ওই বকা-ঝকা যে অকৃত্রিম নয়, আর দীপুর মেজাজ তাতে যে একটুও বিগড়াবে না আনন্দ সেটা সহজেই অনুভব করতে পারে। মিনিট-কতক ছটফট করে সে হনহন করে সিঁড়ির দিকে চলল।

অঞ্জলি বাধা দিল—। দীপু আসছে, তুমি চললে কোথায়?

—আমার থাকার কোনো দরকার নেই; তুমি ছেলেখেলা না ভেবে ওকে ভালো করে সমঝে দিও।

সিঁড়িতে শব্দ তুলে দ্রুত চলে গেল। ঠাণ্ডা মুখে অঞ্জলি সেদিকে চেয়ে রইল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দীপু এলো। বসার ঘরের শোফায় গা এলিয়ে দিতে দিতে হাসিমুখেই জিজ্ঞাসা করল, চাকরিটা আছে এখনো না নেই?

অঞ্জলি গম্ভীর।—এখনো আছে, কিন্তু আর বেশিদিন না থাকতেও পারে।

দীপু হাসছে।—কে তাড়াবে, তুই না মালিক?

—আমি আর মালিক কি আলাদা?

অঞ্জলি রসিকতার ধার দিয়ে গেল না। ভিতরে ভিতরে এক ধরনের যন্ত্রণাই হচ্ছে তার।—তুমি শিপ্রা নন্দীর চেম্বারে গেছিলে?

—হ্যাঁ...কেন, রূপদা চটেছে খুব?

জবাব না দিয়ে অঞ্জলি আবারও জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাকে অপমনা করে এসেছ?

—অপমান! দীপুর আকাশ থেকে পড়ার মুখ।—লোভে পড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে একটু পরামর্শ দিতে গেছিলাম—আর সে সেটাকে অপমান বলল?

—চালাকি না করে কি হয়েছে খোলাখুলি বলো।

—কি হয়েছে বুঝতে তোরও এত অসুবিধে হচ্ছে নাকি।...এখন তো আমি আর দু তিনশ টাকা মাইনের কেরানি নই আগের মতো...দেড় হাজার টাকা ড্রইং, দু আনা শেয়ার, নিজের গাড়ি—আগে হলে না হয় বামুন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়াচ্ছি বলতে পারতিস—

অঞ্জলির দুচোখ কপালে।—তার মানে! তুমি কি প্রপোজ-টপোজ করে বসেছ নাকি?

নির্বিকার হাসি মুখ দীপংকরের। — তা বিবেচনা করলে অনেকটা সেই রকমই দাঁড়ায়।...শিপ্রা নন্দী বুদ্ধিমতী মেয়ে, আমাকে দেখে হকচকিয়ে গেলেও হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেছে। আর, আমিও আগের বন্ধুর মতোই তার খোঁজ-খবর নিয়েছি।...টাকা জমিয়ে বিলেত যাবার ইচ্ছে শুনে প্রস্তাব করেছি, এ ব্যাপারে আমি কিছু সাহায্যের সুযোগ পেলে বর্তে যাব।

—তারপর? অঞ্জলি যথার্থ উৎসুক।

—সঙ্গে সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করেছে, আমি কোন্ স্বার্থে তাকে সাহায্য করতে যাব। সবিনয়ে জবাব দিয়েছি, ভরসা পেলে স্বার্থর কথা পরে জানাব। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এও বুঝিয়ে দিয়েছি, রূপদার বিয়েটা বিয়েই—কোনো মতেই আর সেটা বাতিল হবার নয়, অতএব....

হেসেই ফেলল অঞ্জলি।—অতএব তোমার দিকেই চোখ ফেরানো বুদ্ধিমতীর কাজ?

—দীপঙ্কর মাথা নাড়ল, তাই।

—সত্যিই ডাকাত দেখি তুমি একটা, এই কাণ্ড করে এসেছ? তারপর?

—তারপর আর কি, চোখের আগুনে ভস্ম হবার ভয়ে তখনকার মতো সটকান দিয়েছি।

না এই লোকের ওপর অঞ্জলি রাগ করতে পারেনি।

রাত্রি।

খাবার টেবিলে আনন্দ মুখোমুখি বসে। গম্ভীর। কিন্তু ভিতরের ছটফটানির আঁচ পাচ্ছে অঞ্জলি। হাসিমুখে শেষে বলেই ফেলল, দীপু এসেছিল...কথা হল। আসলে ওরও মাথাটা বিগড়েছে মনে হল—

—কি রকম? আনন্দর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

—ধরো...শিপ্রা নন্দীকে যদি ওরও মনে ধরে থাকে?

সঙ্গে সঙ্গে রাগে মুখ লাল আনন্দর।—শোনো, ও জানে শিপ্রা ওকে তার বেয়ারাও রাখবে না—ও তাকে শুধু অপমান করতেই গেছিল, বুঝলে?

...ও আমাকে হিংসে করত, তাই—আগেও হিংসে করত, তখন বুঝিনি। ওকে তুমি সাফ জানিয়ে দিও, এই সব ইয়ারকি আমি বরদাস্ত করব না।

খাওয়া শেষ না করেই টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেল।

খাওয়া অঞ্জলিরও হল না আর। অপলক সেইদিকেই চেয়ে রইল।

এরপর ওই লোকের আবার একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করতে লাগল অঞ্জলি। প্রথমে ভেবেছিল ভিতরের অনুশোচনাই বুঝি রাতের নিভৃতে কাছে টেনে নিয়ে আসে তাকে। কিন্তু ব্যতিক্রমটাই মাস তিনেক ধরে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করছে প্রায় রাতেই।

অন্ধকার ঘরে লোকটা নিঃশব্দে তার কাছে এগিয়ে আসে। আর এক অদ্ভুত আবেগ আর তৃষ্ণা নিয়ে এই দেহটার ওপর দখল নিতে থাকে। আর তেমনি নিঃশব্দ আদরে যেন ভাসিয়ে নিতে চায় ওকে। লোকটার এই তৃষ্ণা এই ক্ষুধা আর এই আবেগ যেন বেড়েই চলেছে। অঞ্জলি বাধা দেয় না তাকে, বিমুখ করে না। কিন্তু অবাক হয়।

আরো আশ্চর্য কাণ্ড, নিজের দেহের অভ্যন্তরে আবার কিছু একটা পরিবর্তন অনুভব করছে। দ্বিতীয় মাস কেটে যেতে আবার কিছু সম্ভাবনার সূচনা সম্পর্কে নিঃসংশয় সে। কিন্তু এ-খবরও আনন্দকে বলল না।

...দুদিনের জন্য বাইরে বেরুলো আনন্দ। যে-কাজ তাতে হঠাৎ-হঠাৎ এমনি বাইরে বেরুনো আছেই। কিন্তু পরদিন দীপুর টেলিফোন, সে খোঁজ করছে, রূপদা কোথায়।

মফস্বলে বেরিয়েছে শুনে স্পষ্ট ঝাঁঝে বলে উঠল, এখন তো মফস্বলে যাবার কোনো কথা নেই। তাছাড়া আমাকে না জানিয়ে গেল কি করে?

অঞ্জলি নিঃশব্দে টেলিফোন রেখে দিল।

ঘণ্টা তিনেক বাদে শিপ্রা নন্দীর চেম্বারে টেলিফোন করল। বেয়ারা টেলিফোন ধরে জানাল, ডাক্তার মিস নন্দী কলকাতায় নেই—পরশু বিকেলে আগে তাকে চেম্বারে পাওয়া যাবে না।

অঞ্জলি আবার টেলিফোনে হাসিমুখেই দীপুকে জানালো সংবাদটা। সে-রাগের চোটে টেলিফোন আছড়ে রেখে দিল। রাগ তার সব থেকে বেশি অঞ্জলির ওপরেই।

পরদিন সন্ধ্যার পরে আনন্দরূপ ফিরল। ব্যস্তসমস্ত হাবভাব। কিন্তু আড়ে আড়ে লক্ষ্য করছে অঞ্জলিকে। অঞ্জলির বাইরেটা দেখে ভেতরে বোঝার উপায় নেই।

মাঝে একটা দিন গেল। তারপরের রাত্রি। ঘর অন্ধকার। পাশাপাশি শুয়ে আছে দুজনে। লোকটা ঘুমোয়নি অঞ্জলি টের পাচ্ছে। এক সময় একটা হাত আলতো করে ওর গায়ে এসে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে মানুষটা কাছে সরে আসতে লাগল, খুব কাছে। গত তিন মাস ধরে যেমন দেখছে, তেমনি মানুষটার এক তৃষ্ণার আঁচ ছড়িয়ে পড়তে লাগল ওর ঠোঁটে, বুকে, সর্বাঙ্গে। বাধা দেওয়া দূরে থাক, অঞ্জলি বরং নিবিড় বেষ্টনে ধরে রাখল তাকে।

আদরে সোহাগে নিবিড় নিষ্পেষণে আনন্দের অস্থির আবেগ বাড়তেই থাকল। অন্য দিনের মতো নয়, তার থেকেও ঢের—ঢের বেশি উদ্‌ভ্রান্ত যেন।

...তারপর প্রত্যাশার সেই আসন্ন নিবিড়তম মুহূর্ত।

ঠিক সেই ক্ষণে আচমকা একরাশ আলোর আঘাতে ঘরটা ঝলমল করে উঠল। অঞ্জলি নিঃশব্দে বেডসুইচ জ্বেলে দিয়েছে।

ওর বুকের ওপর বিষম চমকে উঠল আনন্দরূপ।—এ কি!

দৃষ্টিটা আনন্দর দুই চোখে যেন বিঁধিয়ে দিল অঞ্জলি।—কি?

—আলো জ্বাললে কেন?

চোখে চোখ রেখে অপলক চেয়ে আছে অঞ্জলি। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির রেখা। জবাব দিল, তোমার মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করল।

বুদ্ধিদীপ্ত ওই দুটো চকচকে চোখের আলো আনন্দরূপের সমস্ত মুখখানা নিমেষের মধ্যে একেবারে পুড়িয়ে অঙ্গার করে দিল যেন। রক্তশূন্য বিবর্ণ পাংশু মুখ।

...একটি কথাও না বলে কালো মুখের গভীর কালো দুই চোখের তারার বিদ্যুৎছটায় অঞ্জলি বুঝিয়ে দিয়েছে, অন্ধকার ঘরে এই মত্ত অভিসারের কল্পনার রমণীটি কে সেটা সে জানে। ও জানে, তার কল্পনার রমণী অঞ্জলি নয়, সে আর একজন।

মুখের দিকে আর তাকাতে পারল না আনন্দরূপ। বেত্রাহতের মতো শয্যার আর একদিকে সরে গেল।

তার পরের কটা দিনও আনন্দরূপ ওর মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। দুজনের একটা কথারও বিনিময় হয়নি। অঞ্জলি নির্লিপ্ত শান্ত। আপিসে গেছে! নিজের জায়গায় শুয়েছে। ওই লোক শয্যার একেবারে ও-ধারে।

...তার পরের সেই একটা দিন।

বাপের বাড়ি থেকে কি উপলক্ষে বোনেরা নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। নেমন্তন্ন রাতে। অঞ্জলি কদিনের মধ্যে এই প্রথম কথা বলল। জিজ্ঞাসা করল, যাবে?

আনন্দরূপ মাথা নাড়ল, যেতে পারে।

—কখন যাবে, আপিস থেকে সোজা?

—হ্যাঁ, আমার একটু রাত হবে হয়তো, তুমি আগে চলে যেও। অঞ্জলি বোনেদের বলল, ঠিক আছে।

খেয়ে-দেয়ে ব্যাঙ্কে চলে গেল সে। ঠিক পাঁচটার পরে বাড়িতেও ফিরে এলো।

আনন্দরূপ শ্বশুরবাড়িতে এসে হাজির হল যখন, রাত তখন নটা। তাকে একলা দেখে সেখানে সকলে অবাক।—অঞ্জলি কোথায়?

আনন্দরূপ আরো অবাক। আসেনি?

—না তো!

দীপু বাড়িতে টেলিফোন এনেছে। অঞ্জলির বোনেরা বলল, দিদির দেরি দেখে আমরা দুবার টেলিফোন করেছি, কেউ ধরলই না। আমরা ভাবলাম, তোমার সঙ্গে বেরিয়েছে কোথাও তাই দেরি।

আনন্দ বাড়িতে টেলিফোন করল। কেউ ধরল না। টেলিফোন বেজেই গেল।

সোজা এসে গাড়িতে উঠল। দীপু জিজ্ঞাসা করল, আমি আসব?

কি এক অনাগত ত্রাসের ছায়া পড়ছে মনে। দীপু গেলে অঞ্জলিকে আনা সহজ হবে ভেবে বলল, আয়।

বাড়ি। দোতলা। সিঁড়ির মুখে চাকরটা বসে। সে জানাল, দিদিমণির ঘরের দরজা বিকেল থেকে বন্ধ। বোধহয় ঘুমুচ্ছেন।

দুজনে প্রাণপণে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকল। ঘুম ভাঙে না। চিৎকার করে ডাকল। ঘুম ভাঙল না।

আনন্দ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘর্মাক্ত কলেবরে দরজা ভেঙেই ফেলল দীপু।

...অঞ্জলি শয্যায় শুয়ে আছে।

স্তব্ধনেত্রে চেয়ে আছে ওরা। এক নজরে দেখেই বুঝেছে, এ ঘুম আর জীবনে ভাঙবে না।

পোস্ট-মর্টেমে জানা গেল, অঞ্জলি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। আর তীব্র বিষক্রিয়ায় মৃত্যু।

পুলিসের টানা-হেঁচড়া চলল। অঞ্জলি মিত্র বিষ খেয়েছে কি বিষ জোর করে তাকে খাওয়ানো হয়েছে সে ব্যাপারে নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত তারা ছাড়বে কেন?

...আনন্দরূপ মিত্র পাঁচটা পর্যন্ত আপিসে ছিল, রাত নটায় শ্বশুরবাড়ি এসেছে, মাঝের চারটে ঘণ্টা কোথায় ছিল?

তারা টেনে বার করেছে কোথায় ছিল। ডাক্তার মিস শিপ্রা নন্দীর কাছে ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে হত্যার একটা অভিসন্ধিও টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করাতে পেরেছে তারা। কিন্তু কোর্টে সেটা টেকেনি। আনন্দরূপ বেকসুর খালাস পেয়েছে।...কিন্তু আনন্দরূপ এ জীবনে সত্যিই আর খালাস পাবে কি?

কন্যাকুমারী ছেড়ে আসার আগের সন্ধ্যায় আনন্দ আবার আমাকে সমুদ্রের ধারে ডেকে নিয়ে গেল। সেই বড় পাথরটায় মুখোমুখি বসলাম দুজনে। এই কটা দিনের মধ্যে আনন্দর সঙ্গে আমার কোনো কথাবার্তা প্রায় হয়ই-নি বলতে গেলে। আনন্দ গম্ভীর। কেন যেন আমিও। এক ছেলের কাছেই পার পায়নি। সে ওকে হরদমই ডেকেছে। গল্প করেছে।

ক্ষুব্ধ গম্ভীর স্বরে আনন্দ বলল, আমি আশা করেছিলাম আপনি আমাকে কিছু বলবেন। কিছুই বললেন না।

—কি বলব?

—কিছুই বলার নেই, না?

জবাব দেওয়া গেল না। আমি নীরব।

খানিক চুপ করে ঠাণ্ডা গম্ভীর গলায় আনন্দ তিনটি পঙক্তি উচ্চারণ করল ঃ

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।'

জিজ্ঞাসা করল, এই কথাগুলোর ঠিক অর্থ কি?

অর্থ বললাম! সেই সর্বব্যাপী আনন্দ থেকে সমস্ত প্রাণীর আবির্ভব, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারা সমস্ত জীব-জীবনের প্রাণের স্পন্দন, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই তার পরিণতি অনুপ্রবেশ।

গভীর আগ্রহে কান পেতে শুনল। নিশ্চল গম্ভীর খানিকক্ষণ। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সাঁ-সাঁ বাতাস। তেমনি মৃদু অথচ ভারী গলায় বলল, তিন বছর আগে অমরনাথের পথে এক সাধকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাঁর আশ্রয়ভিক্ষা করেছিলাম। সব শুনে তিনি আমাকে এই কথাগুলো লিখিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, অঞ্জলি এই আনন্দের মধ্যেই মিশে গেছে, তার আর কোনো দুঃখ নেই, দুঃখ শুধু তোর।...বলেছিলেন, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে এই আনন্দ অনুভব করতে হবে, এই পরিণতির দিকে এগোতে হবে, তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে হবে—পারলে সাত বছর বাদে কন্যাকুমারীতে দেখা হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, পারছ?

—না।...কিন্তু কেন পারছি না?

—পারার কথা নয়।

—তিনি তাহলে ঠিক বলেননি?

—ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সেই আনন্দ আসবে কোথা থেকে সেটা বলেননি।

—কোথা থেকে আসবে?

—প্রায়শ্চিত্ত থেকে।

আবার সেই ভারী ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর।—প্রায়শ্চিত্ত করছি না?

—না।

—এই তিন বছরে আমি কি করছি তাহলে?

রূঢ় শোনাবে জানি। তবুও বললাম, পালিয়ে বেড়াচ্ছ। নিজের কাছ থেকেও, সত্যের কাছ থেকেও। নিজের কাছে নিজে আসামী তুমি, ধর্মের পথে নিজেকে আগলে রেখে দণ্ডের মকুব আশা করছ, তা হয় না। ... ধর্ম কাকে বলে তাও জানো না, ফলে আরো বাড়তি ধকল যাচ্ছে তোমার।

ভাবল একটু, তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি করতে বলেন?

বললাম, অতবড় ধাক্কাটা খাবার আগে অঞ্জলির বুকের তলার খবর তুমি রাখতে?

—না।

—আচ্ছা, তোমার ফলে আসা ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিবিউশনের অতবড় কারবার এখন কে দেখছে, দীপঙ্কর নিশ্চয়!

—হ্যাঁ।

—সে বিয়ে করেছে?

—না।

—কেন করেনি?

বলতে পারব না।

বললাম, তার মানে তার মনের খবরও তুমি ভালো রাখো না। আনন্দ চুপ।

—ওই কারবারে ছোট-বড় সব মিলিয়ে এখন কত লোক কাজ করছে?

একটু ভেবে জবাব দিল, তখন পঞ্চাশ জনের মতো ছিল। এখনকার কথা বলতে পারব না।

—এক মাইনে গুণে দেওয়া ছাড়া তাদের একজনেরও ভালোমন্দ সুখ-দুঃখের খবর তুমি রাখতে?

—না।

—তাহলে দেখো, তখনো তুমি নিজের স্বার্থ নিয়ে ছিলে, আর এখনো তুমি নিজেকে নিয়েই আছ—খুব একটা তফাত কি হল?

আনন্দ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখের দিক চেয়ে রইল।

বললাম, অঞ্জলির বুকের তলার খবর রাখতে না বলে এত বড় আঘাতটা তুমি পেয়েছ—এটাই যদি সে তোমাকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তুমি সেই রাস্তাই ধরে দেখো না? আমাদের শাস্ত্রে বলে স্বার্থের কর্মফল একমাত্র নিঃস্বার্থ কর্ম দিয়ে খণ্ডন করা যেতে পারে। নিজের কাজ-কর্ম ছেড়ে, সত্যের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে, তুমি পালিয়ে বেড়ালে সেটা কেমন করে হবে? আনন্দ আসবে কোথা থেকে?

তারপর দুজনেই চুপ।

পরদিন ঘরের দিকে যাত্রা। সকাল থেকে ছেলে ওকে বহুবার তাগিদ দিচ্ছে, সাধুকাকা, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে কলকাতায়। আনন্দ হাসতে চেষ্টা করেছে, কখনো বা চুপচাপ ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখলাম।

একবার ফিরে জিজ্ঞাসা করল, আমি তোর সঙ্গে গিয়ে কি করব?

—কেন, আমাদের সঙ্গে থাকবে। কলকাতায় তো বাবার একধার থেকে লেখা আর মায়ের কাজ আর কাজ—আমার একলা একটুও ভালো লাগে না—চলো না সাধুকাকা।

আনন্দ চুপচাপ খানিক চেয়ে রইল ওর দিকে। তারপর অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাল। আমার মনে হল ও হঠাৎ বিমনা হয়ে ভাবছে কিছু।

যাবার সময় আনন্দ ছেলেটার দিকে তাকাতেই পারল না। ছেলেরও চোখে জল আসছে বলেই হাসি দিয়ে সেটা ঢাকতে চেষ্টা করল, আর ডাকল, ও সাধুকাকা আমার দিকে তাকাও?

কলকাতায় আসার পর দিনের চাকা আবার একভাবেই ঘুরে যাচ্ছিল। পনেরো দিনের দেখা এই একজন লোকের জন্য ছেলেটা ভিতরে ভিতরে কাঁদে বুঝতে পারি। স্ত্রী বলছে, বাইরে থেকে এবার ঘুরে আসার পরে ছেলেটা যেন আরো একটু কাহিল হয়েছে। আশায় আশায় বলেছে, ওর নাম করে আনন্দকে লেখ না একটা চিঠি—যদিই এসে পড়ে।

হ্যাঁ না কিছুই বলিনি।

প্রায় মাসখানেক বাদে। লেখা নিয়ে বসেছিলাম। স্ত্রী খবর দিল, চকচকে একটা গাড়ি থেকে নেমে কে যেন তোমার খোঁজ করছে —ওপরে নিয়ে আসতে বলেছি হরিকে।

নীচে নামার ধকল পোহাতেই ইচ্ছে করে না বলে লোকজন যারা আসে এ-ঘরেই নিয়ে আসা হয়।

আমারও অপরিচিত মুখ। ঘরে ঢুকে লোকটি আমাকে দেখল, তারপর ঝুঁকে প্রণাম করতে গেল। আমি বাধা দিয়ে বসতে বললাম।

লোকটি বলল, আপনি সপরিবারে কন্যাকুমারী গেছিলেন...সেখানে আনন্দরূপ মিত্রর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল...আমি তাঁর খুড়তুতো ভাই...

আমি সানন্দে বলে উঠলাম, তুমি তাহলে দীপঙ্কর—দীপু! বাঃ, আমাদের কথা আনন্দ তোমাকে লিখেছে বুঝি?

—হ্যাঁ, অনেক কথাই লিখেছে আরো বেশি লিখেছে খোকার কথা...রূপদার এ-রকম চিঠি পাব আশাই করিনি, তাই আপনাদের একবার দেখতে ইচ্ছে হল।

হেসে বললাম, খুব ভালো, দেখ।—ওগো! শুনছ!

ডাক শুনে স্ত্রী ঘরে এলো। আমি পরিচয় দিলাম, এ আনন্দর ভাই দীপঙ্কর—দীপু। আনন্দ আমাদের কথা ওকে লিখেছে, ও তাই দেখতে চলে এসেছে।

দীপঙ্কর হেসেই বলল, আমিও আপনাদের পরিচিত দেখছি...ছেলেকেও কিন্তু একটু দেখব, দেখে রূপদাকে লিখব।

এই লোকটিকেও দেখেই ভালো লাগল বেশ। পুশ-চেয়ার ঠেলে স্ত্রীই ছেলেকে ঘরে নিয়ে এলো। ঘরে ঢুকেই ও জিজ্ঞাসা করল, সাধুকাকা কই? সাধুকাকা আসছে না কেন?

ছেলেকে দেখে সকলের মতো এ-ও একটু ধাক্কা খেয়েছে। কথা শুনে হেসে জবাব দিল, তুমি তাকে আসতে লেখ না কেন? তুমি লিখলে সাধুকাকা ঠিক চলে আসবে দেখো। লিখবে?

ছেলে হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে তাকালো। আর এই তাকানোর অর্থটা স্ত্রী ফাঁস করে দিল। বলল, এসে অবধি তো কতবার লিখতে চেয়েছে, লিখতে না দিলে লিখবে কি করে?

ঈষৎ বিস্ময়ে দীপঙ্কর আমার দিকে তাকালো।

চা-জলখাবারের পর্বের পর ওকে একা পেলাম। দীপঙ্কর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখলেন রূপদাকে?

—খুব ভালো না!

—কিন্তু আমার তো এ চিঠি পেয়ে ভালো মনে হচ্ছে। পাঁচ-দশ লাইনের মধ্যেও আপনার প্রতি এত শ্রদ্ধা দেখলাম যে আমার মনে হচ্ছিল আপনি লিখলে চলেও আসতে পারে, সেইজন্যেই আরো ছুটে এসেছি।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম স্ত্রী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে শুনছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তাকে খুব তাড়াতাড়ি আনতে চাও বুঝি?

একটু ইতস্তত করেও বলল, আপনি তো সবই জানেন মনে হচ্ছে।...সেই অঘটনের পর আমিই রূপদার ওপর সব থেকে বেশি ক্ষেপে গেছলাম। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাকে প্রায় উন্মাদের মতো হয়ে যেতে দেখে আমার চোখেই জলে এসে গেছিল। আরো আশ্চর্য, সব ছেড়ে-ছুড়ে রূপদা হঠাৎ চলে যেতে আমার কেবলই মনে হত, অঞ্জলি যেন কাঁদ-কাঁদ মুখে এদিক-ওদিক থেকে আমার দিকে চেয়ে আছে। এমন হল, যে আমি চমকে চমকে উঠতাম। ও যেন আশা করেছিল আমি রূপদাকে ধরে রাখব।...এখন আমার থেকে বেশি রূপদাকে বোধহয় কেউ চায় না।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা দীপু, তুমি বিয়ে করোনি কেন?

হেসে ফেলল। বলল, রূপদাকে নিয়ে আসুন তারপর বিয়ে করব।... মনের দিক থেকে ওদের ঝামেলা এত বেশি পোহাতে হত যে নিজের বিয়ের কথা ভাবতাম না।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, শিপ্রা নন্দী এখন কোথায়?

একটু থেমে বলল, সেই মেয়ের ওপরেও আমার প্রচণ্ড রাগ ছিল দাদা। কিন্তু সব কিছুর পর সে-ও কেমন যেন হয়ে গেল। মাঝে মাঝে রূপদার ফ্ল্যাটে এসে চুপচাপ বসে থাকত। ঘর বন্ধ, ঘরে ঢুকতে পারত না, সিঁড়ির সামনের বারান্দায় বসে থাকত। আমার রাগ দেখেও ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকত, আর মাঝে মাঝে ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপত। মাস ছয়েক বাদে শুনলাম বিলেত চলে গেছে—তারপর থেকে আর খবর জানি না।

আপনা থেকেই বড় একটা নিঃশ্বাস পড়ল। বললাম, দীপু, আমি ইচ্ছে করেই চিঠি লিখিনি বা ছেলেকে লিখতে দিইনি।...যে কারণে হোক, আমি অপ্রত্যাশিত কিছু দেখার আশা নিয়ে বসে আছি।

স্ত্রী ওদিক থেকে বলে উঠল, তোমার সবেতে বেশি বেশি—একটা চিঠি লিখতে দোষ কি!

আবার একটা মাস না যেতে স্ত্রী বিস্ময়ে আনন্দে আকাশ থেকে পড়ল একেবারে। ঘরে বসেছিলাম—সিঁড়িতে কে উঠে আসছে, গলায় কার একটা মিষ্টি গুণ গুণ স্তোত্র।

'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।'

স্ত্রী গলা বাড়িয়েই আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠল, ও মা আনন্দ যে...

হ্যাঁ, আনন্দই বটে। চোখে মুখে সর্ব অঙ্গে আনন্দ মাখা বুঝি। প্রথমেই পুশ-চেয়ারের সামনে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে ছেলেকে একেবারে বুকে টেনে নিল।

হঠাৎ খুশিতে আনন্দে ছেলেটার কেঁদে ফেলার উপক্রম।—যাও। তোমার সঙ্গে আড়ি, তোমার সঙ্গে কথা বলব না যাও! তুমি এতদিন আসনি কেন?

আনন্দ হাসছে আর আদর করছে ওকে।

স্ত্রীর দিকে তাকালাম, আনন্দে তারও চোখ ছল ছল করছে!

আনন্দর বেশও বদলেছে। পরনে মিহি থান ধুতি। কাছাকোঁচা দিয়ে পরা, গায়ে খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবী, তার ওপর পাতলা সাদা চাদর।

ছেলেকে আদর করে আর সান্ত্বনা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, দাদা এলাম।

আমিও হেসে বললাম, দেখছি।

আনন্দ বলল, আসার আগে সীলোন হয়ে এসেছি, আপনার অনুরাধা খুব ভাল আছে, বিয়ে করেছে, আর ওর ঠাকুমা বুড়ি কি খুশি!

আমি হেসে বললাম; আমার অনুরাধা না তোমার—দীক্ষা তো তুমিই দিয়েছিলে?

হাসিমাখা সকোপ দৃষ্টিটা আনন্দ আমার দিক থেকে স্ত্রীর দিকে ফেরাল।—এমন সাংঘাতিক লোক নিয়ে আপনি ঘর করেন কী করে বউদি!

দিন গেল মাস গেল, বছর ঘুরে এলো। আনন্দ সপ্তাহের মধ্যে তিন-চার দিনই এখানে থাকে। সেটা কার আকর্ষণে বুঝতে পারি। ছেলের রোগের যাবতীয় লিটারেচার ওর পড়া সারা। দেশ-বিদেশে নিঃশব্দে অনেক চিঠিও ছেড়েছি জানি।

কাজের মধ্যে, অঢেল প্রাচুর্যের মধ্যে দিনে দিনে আমরা যেন সত্যিকারের এক সন্ন্যাসীর মূর্তি দেখছি। আনন্দর খাওয়া কমেছে, ভূমিশয্যায় শয়ন এখনো, শুধু তার মুখের হাসি বেড়েই চলেছে। দীপুর মুখে শুনি, রূপদার জন্য আপিসের সমস্ত লোক পাগল এখন, তিনদিন না দেখলে সব অস্থির হয়ে ওঠে।

তিনদিন ছেড়ে দশ-বিশ দিনও না দেখার কারণও মাঝে মধ্যে ঘটছে। কোথায় দুর্ভিক্ষের খবর বেরুল আনন্দ নিপাত্তা হঠাৎ, কোথায় বন্যা-গ্রাসের খবর বেরুল কাগজে—আনন্দরও খোঁজ নেই হঠাৎ। আসামে দাঙ্গার খবর কানে আসার পরেও যে বারো দিনের জন্য নিখোঁজ হয়ে যাবে ভাবিনি। আমার ভয় ধরেছে, এবার না নাগাল্যাণ্ডের অশান্তি ঘোচাতে ছোটে।

যেমন নিঃশব্দে নিখোঁজ হয় তেমনি বিনা আড়ম্বরেই ফেরে আবার।

'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।'

চরণ কটির এক অদ্ভুত সুর করে করতে হাসিমুখে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে। আপিসের কাজ সেরে এলেও, বাইরে থেকে সাত দিন বাদে ফিরে এলেও। শুনে শুনে এমন হয়েছে যে ছেলে ওর আগেই সুর করে বলতে শুরু করে দেয়, আনন্দাদ্ধেব খল্বিম নি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দের জাতানি জীবন্তি...

আনন্দা হা হা শব্দে হেসে ওঠে, সাবাস সাবাস!

কিন্তু আবার একটি অকল্পিত ধাক্কা খাওয়ার দিন এলো আমাদের। হ্যাঁ, সব থেকে বেশি আমাদের বোধহয়। পর পর দু দিন আনন্দর দেখা না পেয়ে দীপুকে টেলিফোন করে জানলাম, আনন্দ কলকাতায় নেই, দার্জিলিংয়ের দিকে প্রচণ্ড ধ্বস নামা আর অঘটনের খবর কানে আসতে সেদিকেই গেছে বলে দীপুর ধারণা। যেখানেই যায় আনন্দ, বেশ কয়েক হাজার টাকা আর চেকবই তার সঙ্গে যায়—এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি, করতে করতে আবার এক দিন সিঁড়ি দিয়ে না ওঠা পর্যন্ত প্রতীক্ষা। কিছু জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলবে, সর্বত্রই ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিবিউশন দরকার দাদা—সার না হলে সব অসার। এর বেশি আর কিছু বলবে না।

কিন্তু এবারে সে নিপাত্তা হবার পরেই এদিকে একটু ব্যতিক্রম হয়েছে। ছেলেটা বেশ জ্বরে পড়েছে। আর সেই সঙ্গে সাধুকাকার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে। এবারে জ্বরের ফলে অন্য দিকের ক্ষতিটা যেন একটু বেশি মনে হচ্ছে।

ন দিনের দিন আনন্দ ফিরল। আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে...শুনেও ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না দেখে ভাবল অভিমান হয়েছে।

ঘরে পা দিয়েই মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ছেলের জ্বর তখন কমের দিকে অবশ্য, কিন্তু একেবারে ছাড়েনি।

নীরব ব্যস্ততায় প্রথমে হাত দিয়ে ওর বুক কপাল আর গায়ের তাপ পরীক্ষা করল। একটু স্পর্শেই ছেলেটা সত্যি কেঁদে ফেলল।

—না না তোমার সঙ্গে আর আমি কথা বলব না, তুমি খালি খালি আমাকে ছেড়ে চলে যাও—তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না—

আর তিন-চার দিন যেতে মোটামুটি সুস্থ হল। কিন্তু আগের মতো পুশ-চেয়ারে বসতে পারছে না কষ্ট হয়।

এ কদিনের মধ্যে আনন্দ আর বাড়ি থেকে নড়েনি। আর বেরুবে না এমন একটা জোরালো কথা দেবার পর দুজনের ভাব হয়েছে। কিন্তু ছেলে বিশ্বাস করে না, কথার খেলাপ অনেক বার হয়ে গেছে। তবু কথা পেয়ে ভাব না করে উপায় কি!

রাত্রিতে দুজনের কথাবার্তা কানে আসছে। অদূরে বসে রমা ছুঁচ-সুতো নিয়ে কি একটা সেলাই করছে। আমি একটা মাসিকপত্র ওল্টাচ্ছি।

—আচ্ছা সাধুকাকা, আমার কোমরটা কেমন বেঁকে গেছে দেখেছে, এখন আর ভালো করে বসতেও পারি না।

—দেখেছি। ঘন হয়ে বসে আনন্দ ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

—এ রকম হলে আমি কি করে ভালো হব বলো তো সাধুকাকা—ভালো তো একটুও হচ্ছি না—
গম্ভীর অথচ প্রায় আর্তস্বরে আনন্দ ফিরে জিজ্ঞাসা করল, কেন হচ্ছিস না বাবা?

—কি করে হব, যে আমাকে ভালো করবে সে তো আসছেই না—আচ্ছা সাধুকাকা সে কি বুঝতে পারছে না আমার কত কষ্ট?

—সে কোথায় আছে? আনন্দর প্রায় ফিস ফিস গলা।

—কি জানি। আছে তো কোথাও নিশ্চয়, তা না হলে আর ভালো হব কি করে।

আমি নিঃশব্দে স্ত্রীর দিকে তাকালাম। রমা আমার দিকে।

তারপর আনন্দের দিকে চেয়ে দেখি, সে একখানা পাথরের কঠিন মূর্তির মতো বসে আছে।

তার দিকে চেয়ে ছেলেটা পর্যন্ত অবাক একটু। হেসে উঠল, ধ্যান করছ নাকি সাধুকাকা—আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি—

আরো বেশি হেসে উঠল।

...দুদিন বাদেই আবার নিখোঁজ হঠাৎ। আশ্চর্য, একদিন বাদে এবারে দীপুই টেলিফোন করে তার রূপদা কোথায় গেল খোঁজ করছে।

আমার ভিতরে কি যেন একটা অনাগত আশঙ্কা।

চার দিন উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় কাটল। ছেলে বার বার ঘোষণা করছে, এবারে আর সাধুকাকার সঙ্গে ভাব করবেই না।

পাঁচ দিনের দিন আমার নামে ডাকে খাম এলো একটা। অপরিচিত হাতের লেখায় আমার নাম-ঠিকানা। কিন্তু সেই চিঠি হাতে নিয়েই আমার বুকের ভিতরে কেমন যেন করে উঠল।

রমাও লক্ষ্য করেছে। আমি পাশের ঘরে আসতে সে-ও এগিয়ে এলো।

খাম খুললাম।

—শ্রীচরণেষু দাদা, আসার আগে আপনাকে বা বউদিকে প্রণাম করে আসা হল না। কিন্তু প্রণাম করতে গেলে আর আসাই হত না। তাই দূর থেকে প্রণাম।...আপনার বিশ্বাস, আমাদের অগোচরে এমন আত্মিক শক্তি আমাদের দেশেই আছে, যিনি ওই ছেলেকে ভাল করে দিতে পারেন। আমি জানি না আছে কি না। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে, আছে। তাই এবার আপনার অন্বেষণের ভার আমি নিলাম। যদি কোনোদিন সেই শক্তির সন্ধান পাই তাহলেই ফিরব। আপনি আশীর্বাদ করবেন।—আনন্দ।

চোখে ঝাপসা দেখছি।

রমা গভীর আশঙ্কায় হাত থেকে চিঠিটা টেনে নিল।

আরো ঝাপসা দেখছি চোখে। দেখছি গভীর অরণ্যে, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে, ঊষর মরুভূমিতে এক মানুষ চলেছে আর চলেছে। তার কণ্ঠস্বর পাহাড়ে অরণ্যে মরুপ্রান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে ঃ

'আনন্দদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।'

রমা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, এ কি হল!

আমি নির্বাক।

দুই গাল বেয়ে নিঃশব্দে ধারা নেমেছে রমার।

অনেকক্ষণ বাদে আমি বললাম, কাঁদ কেন, তার থেকে ভাবো ওই শক্তির সন্ধান সে পাবে, নয়তো, ওই শক্তি নিয়ে নিজেই সে ফিরে আসবে একদিন।

স্ত্রীর কান্না-ভেজা চোখে আশার আলো।

ও-ঘর থেকে ছেলে বলে উঠল, বুঝেছি, চিঠি এসেছে। আসুকগে, আর আমি তার সঙ্গে ভাব করছি না।

দুজনে আমরা একসঙ্গে ছুটে গেলাম ওই ঘরে।

মেঘের মিনার

উৎসর্গ
শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

বন্ধু, একজন সাধারণ লোক অসাধারণ হয়ে উঠতে চেয়েছিল। এই চাওয়াটা রোগের মতো আর শোকের মতো কাঁধে তার চেপে বসেছিল। তাই একমনে বসে সে একটা সিঁড়ি তৈরি করে চলেছিল। অঢেল টাকার সিঁড়ি, প্রচণ্ড ক্ষমতার সিঁড়ি, অশেষ প্রতিপত্তির সিঁড়ি। এই সিঁড়ি ধরে সে লক্ষ্যে পৌঁছুবে। তারপর? তারপর নিজের বিশ্বাসের ওপর শক্ত দুটো পা ফেলে দাঁড়িয়ে সে অজস্র সুখ কিনবে আর অফুরন্ত শান্তি কিনবে। এই করে খুব সাধারণ মানুষটা অসাধারণ হয়ে উঠবে।

...কিন্তু সেই বিশ্বাসের বাসাটা ঠিক কোথায় বলতে পারো বন্ধু? আর ওই অজস্র সুখ আর অফুরন্ত শান্তির দোকান দুটো? যাক, এ নিয়ে আর আমি মাথা ঘামিয়ে মরি কেন, এখন সব তোমার কল্পনা আর আবিষ্কারের মুখে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে। তুমি তো রসদের জন্য হাঁ করে বসেই ছিলে। কিন্তু যা-ই-করো, দোহাই বন্ধু একজন সাধারণ মানুষকে তুমিও যেন অসাধারণ করে তুলো না। কেবল, সবই জ্বলে পুড়ে সত্যি ছাই হয়ে যায় কিনা, পারো তো এই সন্ধানটুকু রেখে যেও। বোধ হয় যায় না, নইলে তোমাকে এই দুর্বলতার রসদ যোগানোর তাগিদ কেন?

যাক, আর লিখব না। কেবল রাজা আহমেদ আর রমা চন্দর জন্যে যে দায়িত্বটুকু তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে এসেছি সেটুকু যথাযথ করে দিও, আর সময় পেলে আমার সেই ছানিপড়া বুড়ো শিল্পীর চোখ অপারেশনের সময় একটু খবর নিও।

—শুভ্রেন্দু নন্দী।

পড়ার পর চিঠিটা হাতে নিয়ে রমা চন্দ পাথরের মতো বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখল ওটা। আনন্দবাবুর মনে হল ওর কালো মুখে আর কালো চোখে কিছু যেন সংকল্পের আলো জমাট বাঁধছে। একটিও কথা না বলে তিনি আর এক মানুষের দিকে ঘুরে তাকালেন।

হাত তিনেক দূরে শিরদাঁড়া টান করে বসে আছে রাজা আহমেদ। ও যদি হঠাৎ একদফা হেসে ওঠে, অবাক বা বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, আনন্দবাবু একটু বোধ হয় স্বস্তি বোধ করতেন। এই রকমই বেসামাল কিছু করে বসা স্বভাব লোকটার। কিন্তু তার বদলে স্বভাববিরুদ্ধ উৎসুক গাম্ভীর্যে টেবিলের চিঠিটার দিকে তাকাচ্ছে, আর আনন্দবাবুর দিকে আর রমার দিকে। ব্যাপারটার অনেকখানি এখনো যেন বোধের অতীত ওর। রাজা নাম, আর বাঙালী মুসলমান হলেও বাংলা বা অন্য কোনো অক্ষরের সঙ্গে ওর যোগাযোগ নেই। চিঠিখানা পেলে দুমড়ে মুচড়ে গিলে ফেলে কিছু বোঝা যায় কিনা দেখতে চেষ্টা করতে পারে যেন।

চিঠিতে যে রসদের কথা লিখেছেন শুভ্রেন্দু নন্দী সে-সবও আনন্দবাবুর সামনে টেবিলের ওপর পড়ে আছে। শক্তপোক্ত লম্বা বোর্ডফাইল একটা। যে-রকম ফাইলে আপিসের কাগজ-পত্র দুটো ফুটো করে গুঁজে রাখা হয়, অবিকল সেইরকম। কিন্তু ওতে আপিসের বা টাকা পয়সার হিসেব-পত্র কিছু নেই। তারিখ বসানো ছাড়া-ছাড়া কতগুলো দিনের হিসেব আছে শুধু। পাতাগুলো সব খোলা আর দুদিক ফুটো করে গোঁজা।...যে দিনগুলো বিশেষ কিছু ছাপ নিয়ে সদ্য সদ্য পিছনে চলে গেল, হয়তো কারখানায় বসে নয়তো কোনো হোটেলে খেতে বসে সেই সব দিনের এক-একটা ভাববর্জিত কথার অক্ষরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পরপর কোনো দশটা পাতা এক রকমের নয়। আনন্দবাবু জানেন, বাঁধানো খাতায় বা ডায়রিতে নিয়মিতভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দিনপঞ্জী লেখা বন্ধুটির ধাত বা স্বভাব নয়। অত ধৈর্যও নেই।

শুভ্রেন্দু নন্দীর বাড়িতে কিছুকাল আগে ওই ফাইলের হদিশ আনন্দবাবু পেয়েছিলেন। আর ভিতরে ভিতরে ওটার ব্যাপারে একটু উৎসুকও ছিলেন। কিন্তু কি আছে ওতে কে জানে, তাই বিনা অনুমতিতে ওর দিকে হাত বাড়াতে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন। মনের ইচ্ছেটা শুভ্রেন্দু নন্দী টের পেয়েছিলেন

বোধহয়। হাল্‌কা সুরে একদিন বলেছিলেন, ওগুলো তোমার সাহিত্যের খোরাক নয় বন্ধু, ওগুলো সব ছোট বড় এক একটা আয়না, যে আয়নায় এক একদিনের শুভ্রেন্দু নন্দীকে এক-একভাবে দেখা যেতে পারে, চেনা যেতে পারে। তখন দেখতে পাইনে বলে শুধু লিখে রাখি, পরে দেখতে বেশ মজা লাগে।

ভিতরে ভিতরে আনন্দ চক্রবর্তী আরো বেশি সন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিলেন। তাগিদের সুরে বলেছিলেন, এত হেঁয়ালি মাথায় ঢোকে না, আরো একটু খোলাখুলি বলো—

সোফা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে একটা চক্কর খেয়ে নিয়েছিলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। এটা তাঁর স্বভাব, হয়তো বা ভিতরের অস্থিরতার প্রতিফলন। কথার মাঝে উঠে দুই-একবার পাক খেয়ে নেন। পকেট হাতড়ে সিগারেট না পেয়ে কোণের টেবিলে ভায়োলিনের বাক্সটার ওপর বারকয়েক টোকা মেরে আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

বনের ছাড়া বাঘ দেখেছ?

আনন্দ চক্রবর্তী হকচকিয়ে গেলেন। সঠিক না বুঝেই জবাব দিয়েছেন, সিনেমায় দেখেছি।

ওতেই হবে। কেমন নির্দয় নিষ্ঠায় তারা শিকারের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকে দেখেছ?

তাও দেখেছি বোধহয়। অস্বস্তি বোধ করলেও তেমন না ভেবেই জবাব দিয়েছেন আনন্দবাবু।

আরো একটু সামনে ঝুঁকে শুভ্রেন্দু নন্দী বলে উঠেছেন, কিন্তু সেই বাঘ যখন বাঘিনী খোঁজে বা পাল্টা শিকারের জাল গুটি গুটি তাকে ছেঁকে ধরতে আসছে টের পায়—তখন?

কি তখন?

তখন নাকের ডগা দিয়ে হরিণ লাফিয়ে গেলেও তার চোখে পড়ে না।...আমি সেই একাগ্র লক্ষ্যের নির্দয় জীব, সেটাই আমার আসল পরিচয়, আর, এই কাগজে লেখা দিনের ছবিগুলো সেই পরিচয়ের এক-একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কথাগুলো গুরুগম্ভীর চাপা প্রায় অকরুণ। চাউনিটাও অদ্ভুত স্থির।

শুনে আনন্দ চক্রবর্তীর ঔৎসুক্য আরো বরং বেড়েছিল। কাল রাত জেগে ফাইলের কাগজগুলো কতবার পড়েছেন ঠিক নেই। স্নায়ুতে ধাক্কা লাগার মতো এক একটা চিত্রও আছে বটে, তবে বেশির ভাগই ওঁর সেই 'নির্দয় নিষ্ঠার' এক-একটা ব্যতিক্রমের ঘটনা। কখনো বাঘিনী খোঁজার তাগিদের ব্যতিক্রম, কখনো বা পাল্টা শিকারের জালে জড়িয়ে পড়ার। চিঠিতে সেই নির্দয় নিষ্ঠার লক্ষ্যটাও নিজেই লিখে গেছেন—টাকার সিঁড়ি, ক্ষমতার সিঁড়ি, প্রতিপত্তির সিঁড়ি ধরে নিজের বিশ্বাসের ওপর শক্ত দুটো পা ফেলে দাঁড়াতে হবে—তারপর অজস্র সুখ কিনতে হবে আর অফুরন্ত শান্তি। এই লক্ষ্যের সঙ্গে দুনিয়ায় আর কোনো কিছুর আপোস নেই।

রমা চন্দর দুচোখ টেবিলের ওই ফাইলের দিকে ঘুরতে দেখে সংকোচ কাটিয়ে আনন্দবাবু বলে ফেললেন, তোমাকে নিয়েও দুই একটা ব্যাপার লেখা আছে ওর মধ্যে... ঠিক কি না দেখে নিতে পারো....

রমার আজ চব্বিশ বছর বয়স হলেও আনন্দবাবু সেই সাত-আট বছর বয়সের ফ্রক-পরা সময় থেকে দেখে আসছেন ওকে। আনন্দবাবুর ঊনচল্লিশ এখন, কম করে পনের বছরের ছোট। রমা বরাবরই তাঁকে কাকা বলে ডাকে, বছর তিনেক হল নিজের কাকার থেকেও বেশি আত্মজন ভাবে তাঁকে। সেই কারণেই একটু সংকোচ বোধ করেছিলেন আনন্দবাবু। কিন্তু জাত-লেখক তিনি, কারো নিভৃতের পর্দা সরাতে চাইলে সংকোচ সিকেয় তুলে রাখতে পারেন। এই মুহূর্তটা খোয়া গেলে ফিরে আবার ধরা যাবে কিনা কে জানে।

রমা চন্দর কানে কথাগুলো গেছে কিনা বোঝা গেল না। ভেবেছিলেন, শোনামাত্র ও একটু ধড়ফড় করে উঠবে। অন্তত অস্বস্তি বোধ করবে। কিন্তু তার বদলে ঘুরে চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। কিন্তু আসলে ও যেন আনন্দ কাকুকে দেখছে না, আর দৃষ্টিটাও কাছে নেই খুব। তারপর সামান্য মাথা নাড়ল, অর্থাৎ দেখার দরকার নেই কিছু। একটু থেমে অস্ফুট জবাব দিল, মিথ্যে লেখার লোক নন উনি—

আনন্দবাবুর আবারও মনে হল, কালো মেয়েটার দুই কালো চোখের গভীরে কিছু যেন আশার আলো আর সংকল্পের আলো জমাট বাঁধছে।

মোটা পাজামা আর আধময়লা হাফশার্ট-পরা আহমেদ দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ওই ঘড়ির সঙ্গে কোনো অগোচর নির্দেশের যোগ যেন।

চললে?

বিড়বিড় করে রাজা আহমেদ জবাব দিল, হ্যাঁ সার, পৌনে নটা বাজে, কারখানায় যাব।

আনন্দ চক্রবর্তী ভালো করে একদফা দেখে নিলেন ওকে, কিন্তু চোখে মুখে রসিকতার একটা আঁচড়ও খুঁজে পেলেন না। ওদের শ্রেণীর মেকানিকদের সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ঘড়ি-ধরা ডিউটি ছিল, আসতে যেতে পাঁচমিনিট সময়ের হেরফের বরদাস্ত করতেন না ওদের মালিক। সেই নটাই বাজতে চলল, তাই ওর ছোটার তাজা।

ফাজলামো করছে কিনা আনন্দবাবু নিঃসংশয় নন। বললেন, গিয়ে কি করবে?

থমথমে মুখ রাজা আহমেদের, আর ছোট ছোট চোখ দুটোর গভীরেও যেন ক্রূর খেদ একটু। বলল, তা কি জানি, এ-মাস ছেড়ে সাহেব কত মাস আর কত বচ্ছরের তলব আগাম দিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখে গেলেন, হাজিরা দিইগে—

রমা ধমকে উঠল, রাজা—!

রাগ করো আর যাই করো বহিন্‌জি, এ শালা কার পরোয়া করে? টাকা কে চেয়েছিল—তার বদলে সাহেব একটা মুখের হুকুম খসিয়ে গেলেন না কেন?

উদগত আবেগ চাপতে চেষ্টা করে ও হনহন করে ঘরের বাইরে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে কি ভেবে নিয়ে আনন্দবাবু ওকে ডেকে থামালেন রাজা দাঁড়াও, আমরাও বেরুব। রমাকে বললেন, চলো, ঘুরে আসি একটু—

দোরগোড়ায় আনন্দবাবুর পুরনো গাড়ি দাঁড়িয়েই ছিল। রঙপালিশ ওঠা ঝরঝরে দশা গাড়িটার। একদা শুভ্রেন্দু নন্দীই জলের দরে গাড়িটা গছিয়েছিলেন বন্ধুকে। রূপে নয়, গাড়িটা গুণে ভুলিয়ে ছিল আনন্দবাবুকে। নিজের হাতে একটা পুরনো গাড়ির খোল-নলচে বদলে শুভ্রেন্দু নন্দী তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। গাড়ি যখন হলই বাইরের ভোলটাও একটু বদলে গাড়িটা ঝকঝকে করে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল আনন্দ চক্রবর্তীর। বন্ধু বলেছিলেন না, ওই রকমই থাক, যে দিন পড়েছে গাড়ি চড়াটাই অপরাধ প্রায়, বাইরেটা যত দীন দশা হবে ততো নিরাপদ।

সেই দীন-দশা আরো প্রকট এখন।

ড্রাইভার নেই, নিজেই চালান। রাজা আহমেদ সোজা ড্রাইভারের আসনে গিয়ে বসল। অর্থাৎ সে থাকতে আর কারো চালাবার প্রশ্ন ওঠে না। অগত্যা আনন্দবাবু আর রমা পিছনে। এ সময়টা পথে অন্য গাড়ি আর ট্রাম বাসের ভিড় খুব। গাড়ি বেগেই চলেছে। রাজা আহমেদের নিপুণ দুটো হাত আপনি কাজ করছে, মুখে কথা নেই। পিছনের দুজনও চুপচাপ।

সামনের দিকে চোখ রেখে রাজা ডাকল সার—

বলো।

বলার আগে কান পেতে কিছু শুনল যেন।—আপনার গাড়ির ডিফারেনসিয়াল আর কাটিং শ্যাফ্‌ট-এ আওয়াজ দিচ্ছে, চেক্ করে নেওয়া দরকার। গ্যারেজে পাঠিয়ে দেবেন।

রমা চন্দ নিঃশব্দে আনন্দবাবুর দিকে তাকালো। কাজের গাফিলতির দরুন লোকটা কোনো এক মাসে পুরো মাইনে পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

আনন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো গ্যারেজে দেব? পিছন থেকে তীক্ষ্ণ চোখে লোকটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন।

নান্‌ডি অটো হাউসে, জমি তো আর কেউ খেয়ে নেয়নি...মালিক আপনার গাড়ি মেরামতের লেবার চার্জ নিতেন না, এখনো লাগবে না, পার্টস যা লাগে কিনে দেবেন।

...এক নিরক্ষর মেকানিকের ভাবলেশশূন্য কটা কথা যে বুকের এমন গভীরে প্রবেশ করতে পারে আনন্দ চক্রবর্তীর যেন জানা ছিল না।

রাস্তাটা বাঁক নিয়ে একটা বস্তির পিছনে এসে মিশেছে। সেখানে প্রায় বিঘে খানেক জমির ওপর একটা মোটর গ্যারাজের কারখানা। মস্ত বড় বড় তিনটে টিনের শেড ছিল এখানে। মোটা মোটা কাঠের খুঁটির ওপর সেগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভিতর দিয়ে তিন ঘরের একটা ছোট দালান। তার মধ্যে এয়ার কুলার লাগানো বড় ঘরটা মালিকের আপিস ঘর আর পরের দুটো কর্মচারীদের। যন্ত্রপাতি বসানো দুটো শেডের নীচে যাবতীয় মেরামতির কাজ হত, আর পাশের তৃতীয় শেড গ্যারেজ হিসেবে ভাড়া দেওয়া হত। ষাট টাকা মাস-ভাড়ায় পঁচিশটি গাড়ি থাকত সেখানে।

কারখানায় ঢোকার মুখে মস্ত দুটো লোহার থামের মাথায় অর্ধ বৃত্তাকারের মেটাল সাইনবোর্ড—নান্‌ডি অটো হাউস।...এখন এই সাইনবোর্ডটাই আছে শুধু। আর আছে মাস-ভাড়ায় গাড়ি রাখার বিচ্ছিন্ন শেডটা।

আর যা আছে তার সবটাই আগুনের ক্ষুধা নিবৃত্তির ধ্বংসাবশেষ। স্নায়ুতে ধাক্কা লাগার মতো বীভৎস, পীড়াদায়ক। কাঠের খুঁটিগুলো পুড়ে অঙ্গার, বিশাল জ্বলন্ত টিনের শেডের খানিকটা কালিবর্ণ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মেসিনগুলোর পোড়া কাঠামোর দিকে তাকালে ভিতরটা সিরসির করে।

...একটা গাড়ির শুরু থেকে শেষ—যাবতীয় কাজ হত এখানে। তিন রকমের ওয়ার্কশপ ছিল এরই ভিতরে। সামনে মেকানিকাল ওয়ার্কশপ—ছোট বড় অজস্র রকমের যান্ত্রিক গোলযোগ ছেড়ে এনজিন রিং বা বোর করার দরকার হলেও গাড়ি নিয়ে খদ্দেরের অন্যত্র ছোটার দরকার হত না। তারপর বডি ওয়ার্কশপ—এখান থেকে অ্যাক্সিডেন্টের তুবড়নো ভিতর বার দুমড়নো গাড়িও মেরামতের পর রং-পালিশ আর তক-তকে গদি সীট্-এর শোভায় ঝকমকে হয়ে বেরুতে দেখেছেন আনন্দবাবু। আর ওই কোণে ছিল মিটার সহ ইলেকট্রিকাল ওয়ার্কশপ। ...এখানে সবই ছিল, সদ্য-বর্তমানে কিছুই নেই। এখানে সবই হত, এখন কিছুই হয় না।

বিশাল কারখানার চার ভাগের তিন-ভাগ দগ্ধ একটা শব পড়ে আছে যেন।

একটু আগে রাজা আহমেদ আনন্দবাবুকে এখানে তার গাড়ি মেরামতের জন্য পাঠাতে বলছিল।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে দেখছেন আনন্দ চক্রবর্তী। তাঁর পাশে রমা চন্দ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। তাদের কাছ থেকে হাত পাঁচ ছয় তফাতে রাজা আহমেদ।

রাজা আহমেদ আনন্দবাবুর দিকে ফিরল আস্তে আস্তে। অদ্ভুত ঠাণ্ডা অথচ অদ্ভুত কঠিন মুখ। কোটরের দুই খুদে চোখে একটা ক্রুর খেদ চিকচিক করছে।

—সাহেব মুখের হুকুমটাও খসিয়ে গেলেন না, আপনি দিলেও হবে—দেবেন?

কি হুকুম?

ঠাণ্ডা নির্দয় গলায় রাজা আহমেদ বলল, এখানে এই পোড়া মাটিতে কয়েকটা তাজা মাথা নামিয়ে দিই...

আনন্দবাবু অস্বস্তি বোধ করলেন, কাদের কথা বলছ...জানো নাকি কিছু?

ও বলল, অত জানাজানির কি আছে, চারটে মাথা নামালে একটা দুটো অন্তত ঠিক হবে...

অর্থাৎ একটা দুটো দোষীর মাথা নামাতে গিয়ে বাড়তি কয়েকটা নির্দোষ মাথা যায় তো যাক। অন্য সময় হলে আনন্দবাবু হয়তো হেসেই ফেলতেন। ব্যাটা তাড়ি গিলে এসেছে কিনা সেই সন্দেহও হতে পারত।

কিছু বলার আগে চাপা গলায় রমা চন্দই ধমকে উঠল ওকে, কি যা-তা বকছ?

ক্রুর খেদ মেশানো ছোট ছোট চোখ দুটো রমার দিকে ফিরল। দুনিয়ার সকলের ওপর বিশ্বাস খুইয়ে লোকটা যেন সমস্ত যন্ত্রণা আর সমস্ত ক্ষোভ এই রমণীর মুখের ওপর উজাড় করে দিতে চাইছে। বিড়বিড় করে বলল, আমি তো আজন্ম যা-তাই বকে এলাম—তুমি বোবা মেরে আছ কেন? তুমি কিছু বলছ না কেন? এখানে এসেও মুখ সেলাই করে দেখছ কি?

রমা চন্দ চুপচাপ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। বিমনা দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে আনন্দবাবুর দিকে ফিরল তারপর। তারও একটু বাদে ওই দগ্ধ ধ্বংসাবশেষের দিকে।

আনন্দবাবুর এই তৃতীয় দফা মনে হল, কালো মেয়েটার কালো দুই চোখের গভীরে সেই দুর্বোধ্য সংকল্প আর আশার আলো তেমনই চিকচিক করছে।

আর তাইতো প্রায় শ্রী-হীনা মেয়েটার মুখখানা যেন ভারী কমনীয় দেখাচ্ছে।

নান্‌ডি অটো হাউস।

চার-চাকা গাড়ি মেরামত ইত্যাদির এত বড় কারখানা আর এ তল্লাটে নেই। শুধু এই এলাকার নয়, বৃহৎ কলকাতার বহু জায়গার গাড়ির মালিকেরা এই কারখানাটিকে চিনেছে। অনেক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মোটর, জিপ, ভ্যানও এখানে আসে। এক-একসময় এত আসে যে এই বিরাট পরিসরেও জায়গা হয় না, রাস্তার দুধারে সারি সারি গাড়ির মিছিল দাঁড়িয়ে যায়। বিকল গাড়ি যারা পাঠায় তারা জানে চার্জ এখানে কিছু বেশি লাগে, কিন্তু চুরি জোচ্চুরি বাটপাড়ির কারবার নেই, অজ্ঞ মালিককে সতের গণ্ডা ভাঁওতার জালে পড়ে ছটফট করতে হবে না। টাকার জোর থাকলে বিশেষজ্ঞ মালিকটির হাতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। ওখানকার মেমো ইত্যাদিতে ছাপা অক্ষরে লেখা 'নান্‌ডি অটো হাউস ফর কোয়ালিটি সার্ভিস'। গাড়ির মালিকেরা এই বিজ্ঞাপনে মোটামুটি বিশ্বাস করে।

বেশ কিছুদিন ধরে রমা চন্দর মনে হচ্ছিল কারখানার হাওয়ার তলায় তলায় কি একটা অদৃশ্য অশান্তি থিতিয়ে উঠছে। কলকাতা আর কলকাতার চার পাশে বহু বড় বড় কল-কারখানার মিল বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে অবশ্য এক ধরনের অশান্তি সর্বত্রই প্রকট হয়ে উঠেছে। সে-সব জায়গায় দেনা-পাওনার ফারাক আর তাই নিয়ে দলগত সংঘাত লেগেই আছে। ফলে অনেক জায়গায় অনেক মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু সেই হাওয়া অটো হাউস পর্যন্ত গড়াবার সম্ভাবনাতেই যে উতলা বোধ করছিল রমা চন্দ—ঠিক তা নয়। কারণ সেই সব শিল্পক্ষেত্রের গোলযোগ বৃহৎ ব্যাপার। দশ বিশ পঞ্চাশ হাজার থেকে শুরু করে লাখ লাখ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার সংগ্রাম সে-সব জায়গায়। এখানে সমস্ত বিভাগের কর্মচারীদের জুড়লে একশর বেশি হবে না। প্রাইভেট মোটর গ্যারাজের তুলনায় এটা বিপুল সংখ্যা বটে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কিছুই নয়। অথচ রমা চন্দর মনে হতো অদৃশ্য অশান্তির হাওয়াটা যেন এই গোছেরই। সে রকম জোরালো কারণ কিছু থাক বা না থাক, অশান্তির অজুহাত দিনে দিনে যেন একটা অদৃশ্য বুনটে জোরালো হয়ে উঠছে।

ইদানীং রমা চন্দ সব থেকে বেশি উতলা বোধ করত মালিকের মুখখানা দেখে। মালিককে সাহেব বলে ডাকে সকলে। অপরের সঙ্গে কথা বলার সময় রমা চন্দও তাই বলে। সামনাসামনি 'সার' বলে অভ্যস্ত।

সাহেবের মুখখানা সুশ্রী, কমনীয়, কিন্তু তাঁকে ভয় বা সমীহ করে না কারখানায় এমন একটি প্রাণীও ছিল না বোধহয়। যেখান দিয়ে হেঁটে চলে যেতেন, সেখানকার কর্মীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। কারো সামনে এসে দাঁড়ালে বুকের তলায় ধুকপুকুনি শুরু হয়ে যেত। রমা চন্দও তার ব্যতিক্রম নয় খুব। সুশ্রী সুপুরুষ কোনো ভদ্রলোকের এমন ঠাণ্ডা গম্ভীর মুখ আর বুঝি জীবনে দেখেনি। গোড়ায় গোড়ায় ঘরে ডাক পড়লে ভিতরে ভিতরে ঘামতে থাকত। কিন্তু ওই মুখ হামেশা তাকেই সব থেকে বেশি দেখতে হয়। ক্রমশ অহেতুক ভয়টা কমেছে। আনন্দ চক্রবর্তীর একান্ত সুপারিশে বি-এ ফেল মেয়ে পাঁচ বছর আগে টাইপিস্ট হয়ে ঢুকেছিল। মাইনেও তখন বর্তমানের তিন ভাগের এক ভাগ। লং-হ্যান্ড ডিকটেশন নিয়ে চিঠি টাইপ করে আনার পর প্রথম দিনেই তিনটে বানান ভুল বেরুল তার থেকে। শুভ্রেন্দু নন্দী সেগুলোর তলায় লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে আবার টাইপের আদেশ দিলেন। পরের দিন রমা চন্দ কাজে এসে দেখে তার টেবিলে দামী ইংরেজি ডিক্‌শনারি একখানা। লজ্জায় আর সংকোচে সেদিন আর মালিকের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে নি।

বানান ভুল আর কোনোদিন হয়নি। তিন মাস না যেতে মালিকের হুকুম হয়েছে সন্ধ্যায় শর্ট-হ্যান্ড ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে হবে, কারণ তাঁর স্টেনোগ্রাফার দরকার। রমা চন্দ পরদিনই শর্ট-হ্যান্ড ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। সেই খরচ মালিক দিয়েছেন। ভদ্রলোক সব-দিকের সমস্ত ব্যবস্থাই এই গোছের নীরবে করে থাকেন।

এক বছরের মধ্যে সে পাকা স্টেনোগ্রাফার হয়ে উঠেছিল। পারিবারিক অভাব অনটন ছাড়াও বুকের তলায় একটা চাপা ক্ষত নিয়ে এখানকার কাজে যোগ দিয়েছিল রমা চন্দ। সে জানত অযোগ্যতার দরুন এখান থেকে চলে যেতে হলে তার পায়ের নীচে মাটি থাকবে না। পড়াশুনায় মন ছিল না বটে, কিন্তু নিরেট মেয়ে নয় আদৌ। বরং চটপটে আর বুদ্ধিমতীই বলত সকলে। রূপের একটু-আধটু জোর থাকলে ও মাথা খাটিয়ে অন্য কোনো ভবিষ্যতের পথ সুগম করে নিতে পারতো।

নিজের দুপায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা ছিল, সংকল্প ছিল, কিন্তু সেই চাপা ক্ষতটা তার আস্থাও অনেকখানি কেড়ে নিয়েছিল। বাইরের চালচলনে বোঝা যেত না, কিন্তু একটা অহেতুক ভয় অনেক সময়েই ছেঁকে ধরত তাকে। সেটা পীড়াদায়ক বটে, কিন্তু সেই ভয়ই আবার অনেকখানি সফলতার দিকে এগিয়ে দিয়েছে তাকে। তাকে নিষ্ঠা শিখিয়েছে।

এই পাঁচ বছরে রমা চন্দ আর এক মেয়ে। একশ তিরিশ টাকায় ঢুকেছিল, এখন পায় আটশ'র ওপর। মাইনে বাড়ানোর কথা মুখ ফুটে কোনো সময় বলতে হয়নি। ঢোকার সময় অবশ্য আনন্দকাকু বলেছিলেন, মাইনেপত্র নিয়ে এখন মাথা ঘামিও না, শুধু লেগে থাকতে চেষ্টা করো। তুমি কাজের মেয়ে এটুকু প্রমাণ করতে পারলেই সুদিন আসবে।

এসেছে। আরো হয়তো অনেক আসবে। রমা চন্দ এখন মালিকের প্রাইভেট সেক্রেটারি, স্টেনোগ্রাফার, আর কারখানার অনেক ব্যবস্থার সুপারভাইজারও। প্রয়োজনে অ্যাকাউন্টেন্টকে সাহায্য করে, কোনো কোম্পানির বড় বিল আটকে থাকলে মালিকের নির্দেশে সশরীরে তাগিদ দিতে যায়, তেমন দরকার পড়লে ইনকামট্যাক্স আপিসেও ছোটে। বাইরের কাজে বেরুতে হলে সর্বদাই গ্যারাজের কোনো না কোনো গাড়ি মজুত তার জন্যে। নিজেই গাড়ি চালাতে পটু এখন। ওর ছেড়ে এখানকার অতি সামান্য মিস্ত্রীদেরও অবশ্য ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। রমা চন্দর মনে মনে আশা অদূর ভবিষ্যতে ওরও নিজস্ব গাড়ি হবে একটা। আশা কেন, হবেই। মালিকের দরাজ অন্তঃকরণের খবর সে এখন ভালই রাখে। কত ভাঙা-চোরা তোবড়ানো গাড়ি বা খুব পুরনো অচল গাড়ি পেলেই শুভ্রেন্দু নন্দী জলের দরে কিনে নেন সেটা। তাঁর নির্দেশ মতো মেরামতি আর খোল-নলচে বদলের পর সেই গাড়ি আবার যখন ঝকঝকে হয়ে রাস্তায় বেরোয়, পাঁচ সাত গুণ বেশি দামে অনায়াসে বিকোয় সেটা। শুধু এই করেই বছর গেলে কত লাভ হয় মালিকের সে-শুধু বুড়ো অ্যাকাউন্টেন্ট আর রমা চন্দই জানে। আনন্দকাকুর মতো এমনি একটা গাড়ি সেও চাইলেই পাবে আর মালিক ওর থেকে এক পয়সাও লাভ নেবে না।

কিন্তু রমা চন্দর তাড়া নেই। আরো কিছু দিন যাক। আরো কিছু মাইনে বাড়ুক।.....একজনের নাকের ডগা দিয়ে নিজের একখানা ঝকঝকে গাড়ি চালিয়ে যাবে আসবে একদিন। সেই একজনের বিমূঢ় মুখখানা কল্পনা করেও এ ধরনের হিংস্র আনন্দ উপভোগ করেছে। রমা চন্দ সেই দিনের অপেক্ষায় আছে।

...বছর খানেক আগের কথা। পাঁচশ পঁচিশ টাকা মাইনে পাচ্ছিল তখনো। কাজের চাপ বেড়েই চলেছে। ডিক্‌টেশন নেওয়া আর টাইপ করা ছাড়াও শুভ্রেন্দু নন্দীর সেক্রেটারির কাজও শুরু হয়েছিল তখন। অতএব তাঁর ঘরে যাওয়া আসা দ্বিগুণ বেড়েছিল। কাজের তন্ময়তার মধ্যেও ভদ্রলোক তখন অনেক সময় চুপচাপ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। অবশ্য পরে অনুভব করেছে এটা নিবিষ্ট চিন্তার ব্যাপার কিছু। কিন্তু তখনো মনে মনে ভয় ধরত। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখত মাঝে মাঝে। ইস, চেহারাটা যদি আর একটু সুন্দর হতো ওর। শুভ্রেন্দু নন্দী শিগগীরই হয়তো একজন সেক্রেটারি নেবেন। নিলে মেয়ে সেক্রেটারিই নেবেন বলে ধারণা। এ ধারণাটা কেন রমা চন্দ জানে না।... ওর বিশ্বাস, মালিক মাত্রেই সুশ্রী আর চকচকে সেক্রেটারি বহাল করে থাকে। প্রৌঢ় ছেড়ে বুড়োদের পর্যন্ত বেশির ভাগ এই স্বভাব। এই মালিক তো মাত্র কাকুর বয়সী—বড় জোর উনচল্লিশ। কানের নীচের চুলে পাক না ধরলে তাও মনে হতো না। না, শুভ্রেন্দু নন্দী একজন সুশ্রী সেক্রেটারি বহাল করলে রমা চন্দ দোষ ধরতে পারে না। কাজের সঙ্গে সঙ্গে চোখ প্রসন্ন রাখতেও সকলেই চায়। কিন্তু এই নিয়ে ভিতরে ভিতরে একটা চাপা অস্বস্তি ছিলই রমা চন্দর। কেমন ধারা মেয়ে আসবে, ওর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে কে জানে।

এর কিছুদিনের মধ্যেই শুভ্রেন্দু নন্দীর কি একটা ডিক্‌টেশন নিচ্ছিল। এয়ার-কুলার লাগানো ঘরের ভারী দরজা ঠেলে ভিতরে এলেন সুমিত্রা বোস। মহিলার বাপের পদবী এটা। মিলিটারী স্বামীর ঘরে এসে হয়েছিলেন সুমিত্রা দেব। স্বামী ছিলেন মিলিটারি অফিসার। যুদ্ধে সেই ভদ্রলোকের অকাল বিয়োগের ফলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ভালো টাকাই মহিলার হাতে এসেছিল। একমাত্র ছেলের লেখাপড়া আর যাবতীয় খরচ বহনও সরকারের দায়িত্ব। বিধবা হবার বছর দেড়েক বাদে ঘটনাচক্রে সুমিত্রা দেব হয়ে গেলেন সুমিত্রা নন্দী নান্‌ডি অটো হাউসের মালিক শুভ্রেন্দু নন্দীর স্ত্রী। কিন্তু এই বিয়েও তিন বছরের বেশি টেকেনি। কাগজে-কলমে ছাড়াছাড়ি হয়েছে। ফলে আবার তিনি সুমিত্রা বোস। আনন্দকাকুকে জেরা করে এই বিয়ের অনেক খবরই রমা চন্দ জেনে নিয়েছিল। সে পরের প্রসঙ্গ। ...বছর চৌত্রিশ হবে মহিলার বয়েস এখন, কিন্তু চেহারা আর স্বাস্থ্য এখনো বোধকরি অনেক তরুণীর ঈর্ষার কারণ।

ভদ্রমহিলা একা নন। তার পিছনে আর একটি মেয়ে। রমার বয়সীই হবে, কি ওর থেকে সামান্য ছোট। রমার চব্বিশ এখন, তখন তেইশ। রীতিমত সুশ্রী মেয়েটা, সুবিন্যস্ত বেশবাস, সপ্রতিভ হাসি-হাসি মুখ। তুলনামূলক বিচারে রমার অস্তিত্ব নিষ্প্রভ বলা যেতে পারে।

শুভ্রেন্দু নন্দীর ডিক্‌টেশন দেওয়া থামল, রমার হাতের পেনসিলও।

শ্রীমতী বোস সহজ অন্তরঙ্গ মুখে পরিচয় করিয়ে দিলেন, মিস্টার নন্দী—মিস্ শকুন্তলা চ্যাটার্জী।

সুচারু দুই হাত বুকের কাছে তুলে মেয়েটি মিষ্টি মুখে নমস্কার জানালো। শুভ্রেন্দু নন্দীর হাতে ফাইল, মাথা নেড়ে নমস্কারের জবাব দিলেন। সামনের চেয়ারটায় বসতে ইঙ্গিত করলেন। ঠাণ্ডা দুচোখ একবার মেয়েটার মুখ থেকে বুকের দিকে নেমে এলো।

শ্রীমতী বোস চেয়ার নিয়েই শুরু করলেন, শকুন্তলা ডিসটিংশনে বি-এ পাশ, এর কথাই সেদিন তোমাকে—

রমার দিকে চোখ পড়তে কথাটা আর শেষ করলেন না। ইচ্ছে করেই করলেন না। শুভ্রেন্দু নন্দীর দিকে আবার ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, খুব ব্যস্ত নাকি?

মহিলা আশা করেছিলেন হয়তো তাঁকে দেখেই রমা চন্দ উঠে চলে যাবে। সাধারণত তাই গিয়ে থাকে। সুমিত্রা বোসের এই গম্ভীর প্রশ্নের তাৎপর্য, ওকে যেতে বলা হোক।

কিন্তু মালিকটি তা বললেন না। জবাবে সামান্য মাথা নাড়লেন শুধু। তারপর রমার দিকে ফিরলেন, গো অন্—

ডিক্‌টেশন সম্পূর্ণ করতে লাগলেন। এতদিন বাদে রমা চন্দর অভ্যস্ত হাত যেন হোঁচট খেতে লাগল। মাঝে মাঝে এক-একটা শর্ট-হ্যান্ড অক্ষর কাটাকুটি করতে হচ্ছে। ভিতরে ভিতরে বেশ নার্ভাস হয়ে উঠেছে। মহিলা ওর দিকে সদয় চোখে তাকাচ্ছেন না।

চিঠি শেষ করে শুভ্রেন্দু নন্দী হুকুম করলেন, থ্রী কপিজ প্লীজ, ওয়ান ফর দি পার্টি, ওয়ান ফর দি অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যান্ড ওয়ান ফর ইয়োর পারসোন্যাল ফাইল—

রমা চন্দ উঠে চলে এলো। পারসোন্যাল ফাইলের ব্যাপারটা বোঝা গেল না—কারণ এ রকম কোনো ফাইলের হদিশ তার জানা নেই। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই, তিন কপি বলেছেন, নিজের ঘরে এসে টাইপ মেশিনে সেই অনুযায়ী কাগজ চাপালো। কিন্তু হাত আর চলছে না—রাজ্যের অবসাদ যেন। ওই রূপসী মেয়েকে এখানে আনার পিছনে সুমিত্রা বোসের উদ্দেশ্য জলের মতো স্পষ্ট।

ঠিক দশ মিনিট বাদে দরজা খোলার আভাস পেয়ে চকিতে ফিরে তাকালো।

সুমিত্রা বোসের পিছনে শকুন্তলা চ্যাটার্জীও বেরিয়ে এলো। সুমিত্রা বোসের সঙ্গে চোখাচোখি হতে নিঃশব্দে এক-প্রস্থ থতমত খেয়ে উঠল রমা চন্দ। সুমিত্রা বোসের অপ্রসন্ন চাউনি ওর মুখের ওপর যেন ঝাপটা মেরে গেল। সে হঠাৎ ওই মহিলার এই গোছের বিরক্তির পাত্রী হয়ে উঠল কি করে জানে না। মহিলা এ-যাবত মানুষের মধ্যেই গণ্য করেননি তাকে।

ঘণ্টাখানেক বাদে আবার টাইপ করা চিঠি নিয়ে ওই ঘরে ঢুকতে হয়েছে। চিরাচরিত নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে শুভ্রেন্দু নন্দী পড়ে সই করে দিয়েছেন। কপি পাঠানো বা ফাইল করা সম্পর্কে আর কোনো নির্দেশ আসেনি।

সেই রাত্রিটা প্রায় বিনিদ্র কেটেছিল রমা চন্দর। তার থেকে নিজের ওপরেই রাগ হয়েছে। যার খুশি চাকরি হোক, যে খুশি আসুক, ওর চাকরিটা আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। যা হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে, এর বেশি তার মতো বি-এ ফেল মেয়ের যোগ্যতায় হয় না।

কিন্তু ঘুম ভিন্ন বস্তু। সেধে আসে, সাধাসাধি করে তাকে আনা যায় না। অস্বস্তির বোঝা বাড়তেই থাকল, সমস্ত রাতটাই প্রায় বিনিদ্র কাটল। পরদিন কারখানায় এসে একটু-আধটু চটুল ভাব লক্ষ্য করেছিল কারো কারো। বিশেষ করে রাজা আহমেদের। ওটা শয়তানের ধাড়ী। ওকে একলা পেয়ে এক ফাঁকে বলেছিল, দুনম্বর বহিন্‌জি আসছে কারখানায়?

রমা চন্দ জবাব দেয়নি। গম্ভীর মুখে কাজে মন দিতে চেষ্টা করেছিল। বিড়ি খাওয়া কালো ঠোঁটের একটা ভঙ্গি করে রাজা আবার বলেছিল, পাঠকবাবু জিগেস করছিল, আর বলছিল, সব ডিপার্টমেন্টে মেয়ে পাওয়া যায়, শুধু আমাদের লাইনের কাজে ছাড়া—

রমা চন্দ রুষ্ট নেত্রে মুখ তুলে তাকাতেই প্রস্থান করেছিল। এক নম্বর মেকানিক বিমল পাঠকের নাম করে যা বলে গেল তা নিশ্চয় ওর নিজেরই কথা। বিমল পাঠক অত আজে-বাজে বকার লোক নয়। মেকানিকদের মধ্যে এই রাজা আহমেদের সাহস দেখে গোড়ায় গোড়ায় অবাক লাগতো। সমস্ত কর্মচারীর মধ্যে ওই একমাত্র ব্যতিক্রম যে সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বোকা মুখ করে কোনো কাজের গাফিলতির ব্যাপারে এটা-সেটা বলে দিতে পারে। এক নম্বর মেকানিক বিমল পাঠক ওদের সকলের মুরুব্বি, সে-ই আগলে রাখে ওকে। রাগ করে এ-পর্যন্ত অন্য মেকানিকরা ওকে কারখানা থেকে তাড়াতে চেয়েছে, কত সময় সাহেবের কাছে নালিশ করেছে। মালিক শাসন করেছে, মাইনে কেটেছে, গলা ধাক্কা দিয়ে এক-একসময় বার করেও দিতে বলেছে। ওর থেকেও ঢের কম অপরাধে চাকরি চলে যেতে দেখেছে রমা চন্দ—কিন্তু রাজা আহমেদ ঠিকই বহাল তবিয়তে টিকে আছে। অবশ্য তার পিছনে বিমল পাঠকের সুপারিশের জোর ছিলই।

রমা চন্দ পরে রাজার মুখে সাহেবের পুরনো দিনের গল্প শুনেছে। তখন লোকটার প্রতি অমন গুরু গম্ভীর মালিকের দুর্বলতার কারণও আঁচ করেছে।

...কাজে মন বসছিল না। ক্যাঁচ করে একটা মিষ্টি আওয়াজ হতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। দোরগড়ায় টুলে-বসা বেয়ারাকে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে দেখল। পরক্ষণে বেরিয়ে এসে ওর দিকে তাকালো। এইটুকুই যথেষ্ট। সাহেবের তলব বুঝে নিয়ে রমা চন্দ উঠে এলো। বুকের ভিতরটা অকারণেই ধুকপুক করে উঠল একটু।

শুভ্রেন্দু নন্দীর পরণে কালি-লাগা প্যান্ট, গায়ে সেই রকমই হাঁটু লম্বা আলখাল্লা একটা। অর্থাৎ মেরামতের তদারকে যাচ্ছেন, দরকার হলে নিজেও সেই কাজে হাত লাগাবেন। দরকার হামেশাই হয়। এক বিমল পাঠক ভিন্ন আর কারো কাজ চোখ বুজে পাস্ করে দেন না। সেই দায়িত্বও পাঠকেরই। কিন্তু মোটর পার্টস এর দোকানে বড়সড় সওদার কাজ থাকলে পাঠককেই বেরুতে হয়—তাছাড়া ট্রায়েলেও বেরোয়। মোট কথা পাঠকের অনুপস্থিতির সারাক্ষণই প্রায় গ্যারাজে থাকেন শুভ্রেন্দু নন্দী।

লম্বা আলখাল্লার বোতাম আঁটতে আঁটতে মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন। তারপর চেয়েই রইলেন। রমা যেন ফাঁপরে পড়ল একটু। ... সেই বিমনা গোছের চাউনি নয়, তাকেই দেখছেন, তাকেই লক্ষ্য করছেন।

ডিক্‌টেশন নেওয়া বা টাইপ করা ছাড়াও এখন আর যে-সব কাজ করছ—কোনো অসুবিধে হচ্ছে?

রমা চন্দ মাথা নাড়ল। অসুবিধে হচ্ছে না।

চালিয়ে যেতে পারবে?

ভিতরটা ধড়মড় করে উঠল কেমন। তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। পারবে।

সেক্রেটারি হিসেবে এখন থেকে কি পাবে না পাবে অ্যাকাউন্টেন্টকে লিখে দিয়েছি। দেখে নিও।

লম্বা মানুষটা ওর গা ঘেঁষেই বেরিয়ে গেলেন। রমা চন্দ নিজের জায়গায় এসে বসল। অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে যাবে কি ভিতরে যেন উত্তেজনার স্রোত বইছে একটা।

...সুখবরটা দিতে সেই সন্ধ্যাতেই আনন্দবাবুর কাছে ছুটে গেছল। কিন্তু খবরটা আনন্দকাকু আগে থাকতেই জানেন দেখা গেল। ওকে দেখে অবশ্য খুশি খুব।

আশান্বিত মুখে রমা চন্দ জিজ্ঞাসা করেছে, মিস্টার নন্দী নিজেই বলেছেন বুঝি?

না। মুচকি হেসেছেন আনন্দকাকু।—সুমিত্রা বোস বলেছেন। ...তোমার ওপর কিন্তু খুব রাগ মহিলার।

সুমিত্রা বোস বলেছেন শুনে যেমন অবাক, রাগ শুনেও তেমনিই অবাক। বলেছে, কেন, আমি কি করলাম?

তোমার জন্যেই তার বন্ধুর মেয়ের চাকরি হল না।...কাল রাতেই আমার কাছে এসেছিলেন। বললেন, ওই কাজ করে আর ওখানকার ওই সব লোকের সঙ্গে মিশে ভদ্র ব্যবহারও ভুলেছে আপনার বন্ধু। আনন্দকাকু রমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন,...কি রকম ব্যবহার করেছে তুমি জানো নাকি কিছু?

একটি মেয়েকে নিয়ে যেতে দেখেছিলাম শুধু; আর কিছু জানি না।

সেই মেয়ে দেখতে ভালো?

রমা চন্দ মাথা নাড়ল, ভালো।

তাহলে রাগ তো হবেই।

দ্বিধা কাটিয়ে রমা জিজ্ঞাসা করেছিল, কি বলেছেন?

আনন্দ চক্রবর্তী সাহিত্যিক মানুষ, খুব একটা আলগা সংকোচ নেই। তাছাড়া বন্ধুর কারখানায় বহাল হবার পর থেকে ওর সঙ্গেও কথাবার্তা আগের থেকে সহজ হয়ে এসেছে। বন্ধুর সঙ্গে শুধু গল্প করার জন্যেই অনেক সময় তিনি কারখানায় হাজির হন। তখন রমারও খবর নেন। হেসে জবাব দিয়েছেন, যা বলেছেন শুনলে আবার তুমি রেগে যাবে। মোট কথা, তোমাকে সেক্রেটারির চেয়ারে বসিয়ে দেওয়াটা মহিলা খুব সরল চোখে দেখেননি—যত সব হেড কেস-এর ব্যাপার, ও-সবে মাথা না ঘামিয়ে মন দিয়ে কাজ করে যাও।

সেক্রেটারির চেয়ারে বসানোটা রমা চন্দর নিজের কাছেই এক মস্ত বিস্ময়। কিন্তু আর এক মহিলা সেটা সরল চোখে দেখেনি শুনেই ওর কালো মুখে রক্ত উঠে আসার দাখিল হয়েছিল। ছি ছি, ভদ্রমহিলার মাথাটা খারাপ বলতে হবে। বয়সে কম করে পনের বছরের বড়ো, আর ওই রকম একটা মানুষ—তাঁর সম্পর্কে কিনা যাচ্ছেতাই কথা। ভাবতেও সংকোচ, কিন্তু রমা চন্দর এও মনে হয়েছিল, সে-রকম লোক হলে এই বয়সেও হয়তো অনেক রূপসী এসে গড়াগড়ি যেত সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে একদিনের ছোট একটা ঘটনাও মনে পড়ে গেছল। চাকরিটা তখন পর্যন্ত ছ মাসের পুরনো হয়নি। এক সন্ধ্যায় আনন্দ চক্রবর্তীর বাড়ি গিয়ে দেখে কারখানার মালিক বসে আছেন সেখানে। বাইরে সপ্রতিভ হলেও মনে মনে খুশি হয়েছিল। আনন্দকাকু হাসি মুখে ঘরে ডেকেছিলেন, এসো এসো—বস্‌কে দেখে ঘাবড়ে গেলে নাকি? আপিসে যেমন পাথরপানা গম্ভীর এখানে সে-রকম দেখেনি শুভ্রেন্দু নন্দীকে। সেই রকমই স্বল্পভাষী বটে, কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি হাসছিলেন ভদ্রলোক।

এ-রকম সুযোগ জীবনে আর কবার আসে। তাছাড়া আরো পাঁচ বছর আগের কথা, বুদ্ধি আর কত। ঘরে ঢুকে রমা বেশ সপ্রতিভ মুখেই বলে বসেছিল, ঘাবড়াব কেন, আপিসে যা-ই হোন, এখানে তো ইনিও কাকা।

কি জবাবটাই না পেয়েছিল ফিরে। রমা চন্দ জীবনে ভুলবে না। ঠোঁটের ফাঁকে তেমনি একটু হাসি লেগে ছিল ভদ্রলোকের। মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বলেছিলেন, নো ম্যাডাম, সম্পর্ক পাতিয়ে কোনো বাড়তি 'প্রি-কশন' নেওয়ার দরকার নেই তোমার—ইউ আর পারফেক্টলি সেফ অ্যাজ ইউ আর।

ওই শোনার পর একটা ছুতো খুঁজে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই পালিয়ে এসেছিল। রাগে ক্ষোভে দুঃখে চোখে জল আসার দাখিল। সম্ভব হলে চাকরিটা মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আসত। দু-তিনদিন

পর্যন্ত নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করেছে। কেন এ-ভাবে অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করেছিল—ঠিক হয়েছে, খুব আক্কেল হয়েছে। মনে থাকবে, চিরকাল মনে থাকবে। মনে আছেও।

...তারপর ওই আনন্দকাকুর মুখেই শুভ্রেন্দু নন্দীর জীবনের কিছু কথা শুনেছিল রমা চন্দ। শুনে কতক্ষণ যে স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিল সে ঠিক নেই। এমনও ঘটে মানুষের জীবনে! কোনোরকম বিতৃষ্ণা দূরে থাক, সেই থেকে এই মানুষ যেন পুরুষকারের জীবন্ত প্রতীক তার কাছে। শোনার পরে ওর নিজের নিভৃতের ক্ষতটাও যেন পল্‌কা মনে হয়েছে তুলনায়। নিজের কথা মনে হলে রমা চন্দ হিংস্র হয়ে উঠতে পারো। কিন্তু এই মানুষ তাও পারে না বলেই বিশ্বাস।

...ছ বছর হল আনন্দকাকুর স্ত্রী নেই। বাইরে বেশ সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবতী ছিলেন মহিলা। ভিতরে ভিতরে হার্ট বিকল হয়ে গেছল কেউ টের পায়নি। বলা নেই কওয়া নেই একদিন চোখ উল্টে দিলেন। ভালোরকম চিকিৎসা করারও সুযোগ পায়নি আনন্দকাকু। এই খেদের কথা অনেক দিন তাঁর মুখে শুনেছে।

ভদ্রলোককে বড়ো নিঃসঙ্গ ভাবত রমা। যদিও তাঁর একটা ছেলে আর একটা মেয়ে আছে, আর সাহিত্যে নাম-ডাক আছে। কিন্তু এতবড় কারখানা আর এত টাকা সত্ত্বেও শুভ্রেন্দু নন্দীর মতো নিঃসঙ্গ মানুষ আর বোধকরি দুনিয়ায় নেই। কেউ কাছে আসতে চাইলেও নির্লিপ্ত মুখে ইনি তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবেন। কতদিন মনে হয়েছে আইনগত ছাড়াছাড়ির পরেও তো সুমিত্রা বোস অনায়াসে ভদ্রলোকের কাছে যাওয়া আসা করেন, চেহারা-পত্র মহিলার এখনো সুন্দর, এখনো আঁট—আবার তাদের মিলন হয় না? এই চিন্তা বহুবার ওর মনে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। হলই বা বিচ্ছেদ, আবার মিলন হতে বাধা কোথায়।

হলে ও-ই বোধ হয় সব থেকে খুশি হয়। কিন্তু তা যেন তার কোনোদিনও হবার নয়, তাও কেমন করে যেন অনুভব করতে পারে। ওই মানুষ নিজের চার দিকে যেন একটা অটুট নিঃসঙ্গতার বর্ম এঁটে বসে আছেন। সেটা ভেঙে কাছে এগনোর ক্ষমতা সুমিত্রা বোসেরও নেই।

পাঁচ বছরে ভয় অনেকটাই ভেঙেছে রমা চন্দর। কোনো কাজ শুভ্রেন্দু নন্দী ঠিক করছেন না মনে হলে সাহস করে কপাল ঠুকে নিজের মতামত ব্যক্ত করে ফেলেও দেখেছে অঘটন কিছু ঘটে না। কিন্তু ভয় গেলেও সমীহ না করে পারে না। গত এক বছরে তো অনেকটাই সান্নিধ্যে এসেছে। কিন্তু ওই নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের সামনে যেন সহজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন। সে-রকম দরকার হলে ভদ্রলোক নিজের গাড়িতে ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে। ফিরতে কোনোদিন বেলা হলে বা রাত হলে কোনো বড়ো হোটেলে তাঁর মুখোমুখি খেতে বসে কত সময় অহেতুক অস্বস্তিও বোধ করেছে। তখন আবার একেবারে উল্টো অনুভূতি। মনে হয়েছে, এই লোকের বেপরোয়া দুরন্ত দিকটা এখনো চিনতে বাকি, জানতে বাকি।

সেই চেনার সঙ্গে নিজেকে জড়ানোর সুখকর অলীক কল্পনা রমা চন্দর নেই। তবু এ-রকম অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ করে কেন জানে না। ওই গোছের নিরিবিলি সান্নিধ্যে এলে মনে হয় মানুষটা বাইরে যত ঠাণ্ডা ভিতরে তার বিপরীত। মনে হয়, বাইরে যত কঠিন ভেতরে তার অনেক গুণ বেশি। মনে হয়, হঠাৎ যে-কোনো অস্থিরতার রোষে ওই অটুট নিঃসঙ্গতার আবরণটা খসে গেলে বা কোনো দুঃসাহসিকা সে-চেষ্টায় এগোলে এই মানুষই বুঝি যে-কোনো মেয়ের প্রতি নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে।...মনে হয়, বয়সের ঘাটতিটা তখন রক্ষা কবচ নয়, রূপের ঘাটতিও না।

পরে অবশ্য নিজের ওপরেই রাগ হয়, আর নিজেকে আরো তুচ্ছ আরো নগণ্য মনে হয় রমা চন্দর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই ভেঙচি কাটতে ইচ্ছে করে। ওই তো রূপের ছিরি, তা নিয়ে আবার ভয়-ভাবনা! যদিও মনে মনে জানে, রূপ যেমনই হোক, এই পাঁচ বছরে এই চেহারাতেও শ্রী এসেছে একটু, আর স্বাস্থ্য অনেকটাই ফিরেছে। এই পরিবর্তনটুকু ইদানীং বিশেষ করে অনুভব করে এক নম্বর মেকানিক বিমল পাঠকের জ্বালায়। লোকটা কাজ ফেলে দিনের মধ্যে কতবার কত ছুতোয় যে সামনে এসে দাঁড়ায় ঠিক নেই। ও ঘর ছেড়ে ওদের কাজের দিকে এলে হাসি মুখে এগিয়ে আসে।

ছুটির দিনে এখন মাঝে মাঝে আবার বাড়িতেও হানা দিচ্ছে—মুখে সপ্রতিভ দুষ্টু দুষ্টু হাসি। রমার দিক থেকে তেমনি পাল্টা আমন্ত্রণের আঁচ পেলে এই হৃদ্যতা তড়িঘড়ি কোন পথে গড়াতে পারে সেটা ভালোই জানা আছে।

ভদ্রলোকের ছেলে, মজবুত স্বাস্থ্য মাট্রিক থার্ড ডিভিশনে পাশ হলেও নিজের কাজে পাকা লোক বিমল পাঠক। ওভার-টাইম নিয়ে রমার থেকে বেশি ছেড়ে কম রোজগার করে না। দস্তুরমতো সাহসীও বটে। ওদের রাশভারী সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে দিব্বি বিনীত অথচ খোলাখুলি আলোচনা করে কারখানার লোকদের জন্য এরই মধ্যে কম আদায় করল না। না...বিমল পাঠককে ইদানীং খুব খারাপ লাগছিল না রমা চন্দর, কিন্তু ভিতরের ক্ষতটা এখনো মিলোয়নি বলেই নিজেকে যতটা সম্ভব আগলে রেখেছে। আবার ভুল করতে ভয় তার। বিমল পাঠককে কাছেও ডাকে না, এড়িয়েও চলে না।

কারখানার হাওয়া বদলাচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে প্রায় অলক্ষ্যে যেন একটা পরিবর্তন আসছে। এর মূলেও কারখানার পয়লা নম্বরের মেকানিক বিমল পাঠক। তারই ঠাণ্ডা অথচ সক্রিয় চেষ্টায় কাজের মানুষগুলো যেন নড়ে চড়ে সজাগ হয়ে উঠছে। তাদের আচরণে এক একটা দাবির জোর স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

রমা চন্দর তাতেও খুব একটা আপত্তি নেই। মেহনতী মানুষ বলেই সর্বদা মাটিতে মিশে থাকবে কেন। কিন্তু যে মানুষগুলো মালিককে এতকাল শ্রদ্ধা করত আর তার থেকে বেশি করত ভয়—তাদের কারো কারো আচরণ এখন যেন দুর্বিনীত হয়ে উঠছে। শুভ্রেন্দু নন্দীর মুখের ওপর না হোক, আড়ালে আবডালে যে-সব অশালীন উক্তি করে, শুনলে কেমন উতলা বোধ করে রমা চন্দ। মনে হয় এটা সবে শুরু, এই হাওয়া অনেকদূর গড়াতে পারে। বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানে এই হাওয়া লেগেই আছে—কিন্তু একজনের মালিকানার কারখানায় সেই হাওয়া কেউ আশা করে না।

শুভ্রেন্দু নন্দীর ঠাণ্ডা কঠিন মুখে আরো যেন কঠিন আঁচড় পড়ছে দিনকে দিন। তাঁর ধারণা কর্মচারীদের কাজের মান অবনতির দিকে নামছে ক্রমশ। তাদের পাওনা গণ্ডার দিকে যত মন কাজে মন নেই ততো, সেটা রমা চন্দও অনুভব করতে পারে। শুভ্রেন্দু নন্দী হঠাৎ-হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে দু-পাঁচ জনকে এদিক-ওদিকে দাঁড়িয়ে জটলা করতে দেখেন।

ঠাণ্ডা মুখে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালে সচকিত হয়ে ওঠে অবশ্য। আসছেন টের পেলে আগেই পালায়। এর মধ্যে তিনি অনেকের কাজের ত্রুটি ধরেছেন, অনেককে ওয়ার্নিং দিয়েছেন। তাদের হয়ে বিমল পাঠক সুপারিশ করতে আসে। মালিক বক্তব্য শোনেন চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে, কোনোরকম মন্তব্য করেন না। মুখ দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু রমা চন্দর মনে হয় বিমল পাঠকও বদলাচ্ছে ভিতরে ভিতরে।

...গত সাত মাসের মধ্যে বারকয়েক ওদের অভিযোগ আর দাবি মেনে নিয়েছেন শুভ্রেন্দু নন্দী। সেই রাগে তাঁর ক্ষোভ বাড়ছে কিনা রমা ঠিক বুঝে ওঠে না। বিমল পাঠক বলে, তাই। কর্মচারীরা কিছু চাইলেই নাকি মালিকের মেজাজ বিগড়য়। এটা নাকি চন্দ্র সূর্যের মতোই সত্যি। দাবি আদায় করতে এলেও মালিকের সম্পর্কে ঠিক একই সুরে কথা বলত বিমল পাঠক।

কিন্তু রমা চন্দ অতটা সত্য ভাবতে পারছে না। গত কয়েক মাসের মধ্যে জনাকতক লোক নিয়ে বিমল পাঠককে বার কয়েক তাদের সাহেবের ঘরে এসে দাঁড়াতে দেখেছে। সে মুখপাত্র সকলের। নিজের স্বার্থ ছেড়ে সর্বদা সে সকলের স্বার্থের কথাই বলে।

প্রথমবার এসেছিল অগ্নিমূল্যের বাজারে সকলের মাইনে বাড়ানোর দাবি নিয়ে। শুভ্রেন্দু নন্দী চুপচাপ তাকে লক্ষ করেছেন খানিক। বলেছেন, ভেবে দেখব।

দেখেছেন। যতটা দাবি করা হয়েছিল ততটা না হোক, মাইনে সকলেরই কিছু বেড়েছে।

কিছুদিন না যেতে জনাকতক লোক পিছনে নিয়ে আবার এসেছে। সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ডিউটি—এটা ছটা পর্যন্ত হওয়া উচিত আর তারও মাঝে এক ঘণ্টা টিফিন আর বিশ্রামের সময় থাকা উচিত। ছটার বেশি কাজে আটকে থাকলেই ঘণ্টা হিসেবে ওভারটাইম ছাড়া কেন কাজ করবে

তারা। আর, বছরে একটা বোনাস দিতে হবে। দাবির কথা মুখেই বলেনি শুধু, কি চায় না চায় লিখেও এনেছে।

শুভ্রেন্দু নন্দী জিজ্ঞাসা করেছেন, ওভারটাইম আর বোনাস পাওনা তোমরা? বিমল পাঠক জবাব দিয়েছে, সাতটার পর বেশি কাজ হলে ওভারটাইম মেলে—এক আধ ঘণ্টার জন্য কিছুই হয় না। আর বোনাস মালিকের খেয়ার খুশি মতো হয়ে আসছে—বিধিবদ্ধ হিসেবমতো এটা তাদের প্রাপ্য। সঙ্গে সঙ্গে কাগজে লেখা বিধিবদ্ধ হিসেবটাও দেখিয়ে দিয়েছে।

তার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী বলেছেন, কারখানা এখন থেকে ছটায় বন্ধ হবে, তার বাইরে কাজ হলে ঘণ্টা ধরে ওভারটাইম পাবে। বোনাস সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখব। দাবির কাগজ বিমল পাঠকের হাতেই থেকেছে, মালিক ঈষৎ অসহিষ্ণু পদক্ষেপে নিজের ঘরে চলে গেছেন।

সময়ে বোনাসও মিলেছে। বলা বাহুল্য সেটা চাহিদার সঙ্গে মেলেনি। কিন্তু অন্যান্য বারের তুলনায় বেশি ছাড়া কম পায়নি কেউ। তবু বিমল পাঠক বা তার অনুগত কয়েকজন তুষ্ট নয়। পাঠক ঘোষণা করেছে মালিকের কথায় বিশ্বাস করার এই ফল। সামনের বারে তারা এর ফয়সলা করবে। ব্যাপার দেখে শুনে রমা চন্দর মনে হয়েছে মালিকের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ পুষ্ট করে তোলাই যেন ওই জনাকয়েকের আসল লক্ষ।

তৃতীয় দফা যে দাবির মুখপত্র হয়ে এসেছে বিমল পাঠক, শুনে রমা চন্দ ভিতরে ভিতরে শঙ্কাই বোধ করেছে। যোগ্যতা অনুসারে সমস্ত কর্মচারীর বেতন নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে, গ্রেড আর স্কেল বেঁধে দিতে হবে, রবিবার ছাড়াও বছরের বরাদ্দ ছুটি ঠিক করে দিতে হবে—সে ছুটি ভোগ না করলে কর্মচারীকে সেই সময়কালের জন্য দ্বিগুণ বেতন দিতে হবে, আর কারখানার বাৎসরিক লাভের একটা মোটা হিসেবও পেশ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কর্মচারীদের বোনাস দিতে হবে। এ-সব ব্যবস্থা মেনে না নিলে যে অশান্তি দেখা দিতে বাধ্য তার সব দায় মালিককেই বহন করতে হবে। এ-সব ব্যাপারে শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ ফয়েসলাই কাম্য।

রমা চন্দ সশঙ্কে লক্ষ করেছে, এই ফিরিস্তি হাতে পেয়েও শুভ্রেন্দু নন্দীর ঠাণ্ডা মুখে একটা উত্তেজনার রেখা পড়েনি। তিনি যেন জানতেন এই রকম কিছু একটা আসছে। অন্যদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিমল পাঠকের মুখটাই খুব ভালো করে দেখে নিয়েছেন। সে চাউনি দেখে রমা চন্দ অস্বস্তি বোধ করেছে, কিন্তু বিমল পাঠক নির্বিকার।

মালিক জিজ্ঞাসা করেছেন, এ-রকম ব্যবস্থা কোনো মোটর গ্যারাজে আছে?

বিমল পাঠক জবাব দিয়েছে, সে-খোঁজ আমরা নিতে যাব কেন, আমাদের তো ছোটখাটো ব্যাপার নয় সার, এ তল্লাটে আর এতবড় গ্যারাজ কোথায়?

এ তল্লাটে না থাক, অন্য তল্লাটে আছে। কলকাতায় এর থেকে ঢের বড়ো গ্যারাজও আছে। কারা কি করছে খবর নিয়ে দেখি, পরে জানাব।

পাঠক বলেছে, আপনি কি করবেন সাতদিনের মধ্যে জানতে পেলে ভালো হতো।

শুভ্রেন্দু নন্দী বলেছেন, না পেলে তোমরা কি করবে সেটাও চিন্তা করে রাখ।

সেটাই যেন প্রত্যক্ষ সংঘাত। বিমল পাঠক দিনে দিনে অমন বেপরোয়া হয়ে উঠছে কেন রমা চন্দ ভেবে পায় না। সে যেন কিছুদিনের মধ্যেই এখানকার অনেকের কাছে গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠেছে। কারখানার বাইরে কারা সব তার কাছে আসে শুনেছে রাজার মুখে—আর সে তখন কাজ ফেলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে যায় তাদের কাছে, অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে। কে তারা, কোথা থেকে আসে, কেন আসে জানে না, রাজা আহমেদ শুনেছে তারা নাকি কোথাকার মস্ত মস্ত লোক সব।

মস্ত মস্ত লোকেরা নানড়ি অটো হাউসের হেড মেকানিক বিমল পাঠকের কাছে কেন আসে রমা চন্দ বুঝে ওঠে না। জিজ্ঞাসা করারও সাহস নেই বিমল পাঠককে।

...একদিন শুনল, কারখানায় দুই একদিনের মধ্যেই কর্মচারীদের কি মিটিং হবে একটা। আর তাতেও ওই মস্ত লোকেরা বক্তৃতা করতে আসবে। সেই কারণে কারখানার সর্বত্র চাপা উত্তেজনা একটা। মিটিং নাকি কারখানার কাজের সময়ের মধ্যেই হবে।

সাহেবের ঘরে ডাক পড়ল বিমল পাঠকের। রমা চন্দ সন্ত্রস্ত। সে সেক্রেটারি, কেউ এলে মালিক না বলা পর্যন্ত ঘরে থাকাই তার প্রতি নির্দেশে।

বিমল পাঠক এলো।

শুভ্রেন্দু নন্দী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মিটিং কবে?

পরশু সার।

মিটিং কোথায়?

এখানেই—

কিন্তু আমার কম্পাউন্ডের মধ্যে কোন মিটিং হবে না বা কোনো বাজে লোক এখানে ঢুকবে না।

বিমল পাঠকও স্পষ্ট সুরে বলল, বাজে লোক কেউ আসবে না। আমাদের কারখানায় আমাদের মিটিং করার অধিকার আছে কিনা তাই বলুন।

না।

কিন্তু সার একটু বিবেচনা করে দেখলে পারতেন, আমরা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

বাইরে করো। আর, সকলকে জানিয়ে দিতে পারো যে, যে যতক্ষণ বাইরে থাকবে তার ততক্ষণের মাইনে কাটা যাবে। এর নড়চড় হবে না।

বিমল পাঠক বলে গেল, ঠিক আছে, সকলকে জানিয়ে দেবো। আপনি মাইনে কাটুন।

দুশ্চিন্তায় ভিতরটা ছেয়ে ছিল রমা চন্দর। ঘণ্টাখানেক বাদে কারখানার ভিতরেই একটু নিরিবিলি জায়গায় ধরে নিয়ে এলো বিমল পাঠককে। বুঝিয়ে বললে যদি তার কথা শোনে। সে ডাকছে শুনে এই মেজাজ সত্ত্বেও বিমল পাঠক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে। মাঝের কদিন এই লোকটাকে এড়িয়েই চলেছে।

মিষ্টি উদ্‌বেগে রমা জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার বিমলবাবু? হঠাৎ কি হল বলুন তো?

হেসেই জবাব দিল, কি আর, মালিকের পাখা গজিয়েছে। উৎসুক একটু।—আপনাকে পাঠিয়েছেন বুঝি?

না না! আমার নিজেরই ভয় ধরেছে বলে এলাম—এত বছরের মধ্যে এ-রকম ব্যাপার তো কখনো দেখিনি!

বিমল পাঠকের হাসিমাখা দুচোখ তার মুখের ওপর নড়ে চড়ে স্থির হল। বলল, এখনই কি দেখলেন, সবে তো শুরু। কিচ্ছু ভয় নেই, আমাদের সঙ্গে থাকুন।...মোট কথা, আপনার প্রাপ্য থেকে আপনি বেশি পান ভাবেন না তো?

কমও তো পাইনে, বাইরের লোক এনে গণ্ডগোল পাকিয়ে কি লাভ হবে?

বিমল পাঠক হাসছে।—না পেতে পেতে আমাদের এই দশা হয়েছে, সবেতে ভয়।...এখন আপনি আমাদের দিকে আছেন কিনা সেটা বলুন দেখি?

জবাব দেবার ফুরসৎ মিলল না। মুখ তুলে বিমল পাঠককে হঠাৎ সামনের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে সেও ঘাড় ফেরালো। মুখের স্বাভাবিক হাসিটুকু মিলিয়ে গেল রমা চন্দর।

দু-নম্বর শেডের সামনে শুভ্রেন্দু নন্দী দাঁড়িয়ে। এদিকেই চেয়ে আছেন।

পরমুহূর্তে বিমল পাঠক এ-রকম একটা কাণ্ড করতে পারে কল্পনার বাইরে। সাহেবকে দেখিয়ে হাত বাড়িয়ে হাসি মুখে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না—সকলে একসঙ্গে এগোলে কারোই এতটুকু ক্ষতি হবে না। যান, পরে কথা হবে—

রমা চন্দ ফিরে চলল। এই শেষের আচরণের দরুন লোকটার ওপর রাগই হচ্ছে। মালিককে দেখিয়ে ইচ্ছে করে এই কাণ্ড করল। কি ভাবলেন উনি ভগবান জানে। আবার অস্বস্তিতে ভিতর ছেয়ে আছে। বিমল পাঠক হঠাৎ এত বদলে গেল, কি করে ভেবে পেল না—এই কিছুদিন আগেও তো মালিকের চোখের মণি ছিল! চাইলে ও কি না পেত! ঠিক সেই কারণেই অশ্রদ্ধাও করতে পারছে না আবার। নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে লোকটা সকলের স্বার্থ দেখছে।

শুভ্রেন্দু নন্দী ততক্ষণে নিজের ঘরে চলে গেছেন। একটু বাদেই তাঁর ঘরে ডাক পড়ল। অস্বস্তির ছায়াটা লেগেই আছে—মালিককে দেখিয়ে বিমল পাঠক কেন ওর পিঠ চাপড়েছে রমা চন্দর বুঝতে সময় লাগেনি। লোকটা শুধু দুঃসাহসী নয়, প্যাঁচালোও বটে। নিজেকে নিজে দেখতে পাচ্ছে না রমা, মনে হচ্ছে লালচে মুখ নিয়ে সে মালিকের ঘরের দিকে এসেছে।

কাম ইন্ ম্যাডাম! শুভ্রেন্দু নন্দী গম্ভীর, কিন্তু দরাজ গলা। —বিমল পাঠক তোমাকে পছন্দ করে শুনেছিলাম...হি ইজ এ স্ট্রং বাট মিস-গাইডেড ফেলো...যাক, ওই পছন্দের ব্যাপারে তোমার দিকের খবর কি? গাম্ভীর্য সত্ত্বেও মুখ দেখে মনে হল কিছু কৌতুকের খোরাক পেয়েছেন ভদ্রলোক।

পরিবর্তনের হাওয়া তো রমা চন্দর গায়েও লেগেছে। ভয়ের বদলে ভিতরে ভিতরে তেতে উঠল। সংযত সুরেই বলল, সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু এখন আমি আপনার সেক্রেটারি হিসেবেই ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গেছলাম।

ফানি! শুভ্রেন্দু নন্দীর চোখে মুখে আর গলার স্বরে নির্ভেজাল বিস্ময়।—একজন ওয়ার্কম্যান কারখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেক্রেটারির পিঠ চাপড়ে কথা বলে! হাউএভার সেক্রেটারি হিসেবে কি কথা ছিল তোমার?

অপমানে বিবর্ণ মুখ রমা চন্দর। জবাব দিল, সকলের স্বার্থে গণ্ডগোল এড়ানোর কথা। আমি তাকে সেই অনুরোধ করছিলাম।

তারপর?

কি তারপর?

তোমার অনুরোধ সে শুনবে আশা করো?

জানি না।

শুভ্রেন্দু নন্দী মুখের দিকে চেয়ে আছেন। তেমনি গম্ভীর, কিন্তু চোখ দুটোয় যেন কৌতুক চিকচিক করছে। বললেন, আমি জানি। শুনবে না—বাট্ ডোণ্ট ওয়ারি ম্যাডাম, গণ্ডগোল কিছু হবে না, হি উইল বি সরি বাই ডে আফটার টু-মরো। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস, হাতের পেন্সিলটা টেবিলে ঠুকছেন আস্তে আস্তে। দুচোখ তার মুখের ওপর আটকে আছে তেমনি।—আনন্দের মুখে তোমার একবারের দুর্ভোগের গল্পটা শোনা আছে, ডোণ্ট বি এ ভিকটিম সেকেন্ড টাইম—হি ইজ নট্ ইওর ম্যান, ট্রাই টু পুট ইওর ট্রাস্ট সাম-হয়্যার এল্স—দ্যাট্স্ অল্।

রমা চন্দ বেরিয়ে এলো। ভিতরটা রাগে কাঁপছে। অথচ অসহায়! একবার ভাবল ওই পাঠকের কাছেই ছুটে চলে যায়। তাকে এই কথা বলে তার সঙ্গে হাত মেলায়। কিন্তু সেটা আরো বোকামি হবে। তাছাড়া লোকটা সত্যিই প্যাঁচালো, নইলে সময় বুঝে কাঁধ হাত দিত না।

রাগ আনন্দ চক্রবর্তীর ওপরেও হচ্ছে।...ওর জীবনের সেই চরমতম অপমানের কথা বলে বন্ধুর দয়ার উদ্রেক করে তার চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে জানতো না। ও-সব না বলে শুধু অনুরোধ করলে কি এই লোক চাকরি দিত না? এই পাঁচ বছর যাবত ভবিষ্যত গড়ার ব্যবস্তায় আর সার্থকতায় যন্ত্রণা অনেকখানি জুড়িয়েছিল, কিন্তু সেই অপমান আবার যেন নতুন করে বিঁধছে ওকে। ভিতরে ভিতরে নতুন করে কাঁটা-ছেঁড়া শুরু হয়েছে।

...ও-রকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে, কিন্তু উনিশ বছরের যে-কোনো মেয়ের জীবনে সেটা এক বিপর্যয়ের ব্যাপার। আনন্দকাকুর মামাতো ভাই ছিল একজন, নাম সুখেন্দ্র। এখনো আছে। আনন্দকাকুর থেকে বছর দশ এগারো ছোট হবে। অবস্থাপন্ন ঘরের চৌকস ছেলে—কলেজে পড়তেই সাহিত্যিক দাদার ভক্ত ছিল খুব। প্রায়ই আসতো। রমা তখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। ওর বাপ গরিব, আনন্দকাকুর বাড়ির নীচের তলায় দুখানা ঘর নিয়ে রমারা থাকে তখন। সুখেন্দ্রর সঙ্গে তখন থেকেই ভারী ভাব তার। সে এসেছে টের পেলে ছুটে না এসে পারতো না। আর ওই ছেলেও সাহিত্যের ঝোঁকে অত ঘন ঘন সে-বাড়ি আসতো না অন্য কোন টানে, তাও অনুমান করতে পারতো। তখন কাকীমা অর্থাৎ আনন্দকাকুর স্ত্রী জীবিত। ওদের দুজনের এই মেলা-মেশার তাগিদটা তিনি পছন্দ করতেন না রমা সেটা অনুভব করতে পারতো।

কাকীমা মারা গেলেন। রমা তখন কলেজে পড়ছে—বি-এ ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে। আর সুখেন্দ্র নতুন চাকুরিতে ঢুকেছে। তার এ-বাড়িতে যাওয়া আসা তখন আরো বেড়েছে। আর দুজনের নির্বিঘ্ন মেলামেশাটাও। কাকু অনেক সময় ঘরে থাকতেন না বা নিজের কাজে ডুবে থাকতেন। সুখেন্দ্র ক্রমে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল। কাকার ছেলে মেয়ে দুটো আড়াল হলে মুহূর্তের মধ্যে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত। কারো দেখে ফেলার সম্ভাবনা নেই জানলে সহজে ছাড়তে চাইতো না। গোড়ায় গোড়ায় রমা ভয়ে আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপত, শেষে তারও নেশা ধরে গেছল বুঝি। ও-ছেলের অনুনয়ে এক-একদিন কলেজ কামাই করেছে।

আনন্দকাকু কিছু আঁচ পেতেন কি না কে জানে। অনেক সময় দেখতেন ওরা দুজনে গল্প করছে বা হাসাহাসি করছে। কিন্তু কিছু বলতেন না। একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, সুখেন কি বলে, তোকে বিয়ে করবে তো?

লজ্জায় অধোবদন হয়ে রমা শুধু মাথা নেড়েছিল। করবে। দুটো দিন আর কাকুর মুখের দিকে তাকাতে পারে নি।

...একদিন। সেদিনও বিকেলের দিকে ওদের দুজনকে সামনের বারান্দায় দেখে আনন্দ কাকু নিজের ঘরে ঢুকলেন। একটু বাদে টেলিফোন বেজে উঠল। সাড়া দিয়ে বেশ জোরেই কাকে যেন বললেন, আগামী কাল দুপুরের পর থেকে তিনি বাড়ি থাকছেন না, পাবলিশারের কাছে যাচ্ছেন।

সাধারণত আনন্দ কাকু টেলিফোনে অত জোরে কথা বলেন না, কারো ওপর বিরক্ত মনে হল।

পরের দিন।

রমা জানতো সুখেন্দ্র আসবে। আসবে বলেনি কিন্তু গত দিন মুখ দেখেই বুঝেছিল। আরো কি বুঝেছিল সে-ই জানে। আনন্দ কাকুর ছেলে মেয়ে দুটোই স্কুলে তখন। রমার ভয় ভয় করছিল, আবার উন্মুখ হয়ে অপেক্ষাও করছিল।

বেলা তখন তিনটে। আনন্দ কাকু দুটো নাগাদ বেরিয়ে গেছেন, রমা তখন আড়ালে। আনন্দ কাকুর ছেলে মেয়ে সাড়ে চারটের আগে স্কুল থেকে ফিরছে না।

সুখেন্দ্র এলো।

রমা তখন জানলার দাঁড়িয়ে। হাসি চেপে চোখের একটা ইশারা করে সুখেন্দ্র দোতলায় উঠে গেল। রমা এই অপেক্ষাতেই ছিল অথচ বুকের ভিতর কাঁপুনি। আগে এ-রকম কখনো হয়নি। মুখে স্বাভাবিক হাসি টেনে দোতলায় এসে রমা চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপিস পালানো হয়েছে বুঝি?

নিশ্চয়! আপিস পালানো হবে তো কালই বুঝেছ। জবাব দেবার ফাঁকে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল।

ও কি?

বন্ধই থাক না, বেড়ালটা হাঁ করে দেখছে দেখছ না! ও কি! অত ঘাবড়াবার কি আছে—

হাত বাড়িয়ে খপ করে বুকে টেনে নিল। তারপর ক্ষেপেই যেতে লাগল যেন। নিজের পা দুটোর ওপর ক্রমশ জোর হারাচ্ছে রমা। চৌকিটার ওপর বসে পড়ল। কিন্তু ও-যেন নাছোড় দস্যু একটা।

চূড়ান্ত বিপর্যয়ই ঘটে যেত কিছু। রমা বাধা দেবার শক্তিও হারিয়েছে।

দরজায় টকটক শব্দ।

ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছিটকে চৌকি থেকে নেমে এলো দুজনেই। বেশবাস ঠিক করে রমা চুলের গোছা পিছনে সরাবার আগেই দরজা খুলে গেল।

আনন্দ কাকু দাঁড়িয়ে।

রমা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন। সকালের দিকে আনন্দ কাকু বলে গেলেন, আমি ওদের বাড়ি কথা বার্তা কইতে যাচ্ছি।

ফিরে এলেন। থমথমে মুখ। খানিক বাদে ওকে দোতলায় ডেকে পাঠালেন।

সামনে আসতে আনন্দ কাকু ঠাস ঠাস করে ওর দুগালে দুই চড় বসিয়ে দিলেন।

পরে শুনেছে সুখেন্দ্রর বাবা মা প্রস্তাব শুনে ক্ষেপে উঠেছিল। আনন্দ কাকুকেই গালাগাল করেছে তারা। আর সুখেন্দ্র তাকে আড়ালে ডেকে বলেছে, একটা ফ্লার্টিং গার্লের সঙ্গে ফ্লার্ট করা যায়, তাকে

বিয়ে করা যায় না, তার ওপর ওই তো চেহারা। আনন্দ কাকুর সেই দুটো চড় আজও আশীর্বাদ ভাবে রমা চন্দ।

একটা গোলযোগের আশংকা করেই মিটিং-এর দিনে দুপুরের দিকে আনন্দ কাকুকে একবার আসতে বলেছিল রমা চন্দ।

কারখানায় পা দিয়ে রমা প্রথমে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। শুনেছে মিটিং আজ হবে না, অন্য একদিন হবে। বুড়ো অ্যাকাউন্‌টেন্টের খবর, বাইরের লোক যারা ঘোঁট পাকাতে আসত এখানে, তাদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়ে গেছে। ফলে এখানকার কর্মচারীদের মধ্যেও ভাগাভাগি। তারা কেউ মিটিং-এর স্বপক্ষে কেউ বিপক্ষে। গতকাল রবিবার সত্ত্বেও কাজের চাপে অ্যাকাউন্‌টেন্ট ভদ্রলোক আপিসে এসেছিলেন। এসে দেখেন কর্মচারীরা অনেকেই এখানে জটলা করছে, বাইরের ছেলেও কিছু ছিল—তারা তর্ক করছে, একদল আরেক দলকে শাসাচ্ছে। আর আপোসের চেষ্টায় বিমল পাঠক গজরাচ্ছে। কি নিয়ে দলাদলি অ্যাকাউন্‌টেন্ট সেটা বলতে পারলেন না। শেষে মন্তব্য করলেন, রাজনীতির হাওয়া লেগেছে তো সর্বত্রই দলাদলি আর মারামারি—এখানেই বা ব্যতিক্রম হবে কেন?

রমা চন্দর কানে অবিশ্বাস্য ঠেকছিল। রাজনীতি বোঝে না, কিন্তু মাত্র একটা দিনের মধ্যে এ-রকম ওলট-পালট ব্যাপার হয়ে যায় কি করে। তখুনি মালিকের কথা মনে পড়েছে, বলেছিলেন, ডোন্ট ওয়ারি ম্যাডাম, গণ্ডগোল কিছু হবে না, হি উইল বি সরি বাই ডে আফটার টু-মরো। ...হতেও পারে রাজনৈতিক দলাদলি, একদল তো আর এক দলকে ছিঁড়ে খাচ্ছে, কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে এর পিছনে হয়তো বা মালিকের কারসাজিও কিছু আছে—নইলে অমন কথা পরশু বলেছিলেন কি করে? কিন্তু মালিকের মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। তিনি নির্লিপ্ত নিরুত্তাপ।

গোলযোগ নেই অথচ সমস্ত কারখানা একেবারে থমথমে যেন। আর বিমল পাঠকের দিকে চেয়ে মনে হয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে সে বুঝি একটা ঝড় বইয়ে দিতে পারে। আবার তার সামনে এসে কিছু বলার বা জিজ্ঞাসা করার সাহস নেই রমা চন্দর।

একটা গাড়ির বনেট খুলে রাজা আহমেদ তার ওপর ঝুঁকে আছে আর গুনগুন করে একটা গান ভাঁজছে। সমস্ত কারখানার মধ্যে ও-ই মূর্তিমান ব্যতিক্রম। রমার মনে হল লোকটা হাসছেও আপন মনে। দিনমানেই নেশা করে কারখানায় এলো নাকি! আর একবার তো এই অপরাধে দশ হাত নাকে খৎ দিতে হয়েছিল। সাহেব শেষ পর্যন্ত হয়তো ওকে তাড়াতো কিন্তু ওর মুরুব্বি বিমল পাঠকের সদয় কৌশলে শাস্তিটা নাক খৎ-এর উপর দিয়েই গেছে। সাহেবের সামনেই বিমল ওকে কয়েক ঘা চড়-চাপড় মেরে ওই শাস্তি দিয়েছে।

রমা কাছে এগিয়ে এলো। অন্য দুই একজন দূরে দূরে কাজ করছে। রাজা আহমেদ সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আপন মনে হাসছিল ঠিকই। কাজ কিছুই করছে না।

হাসছ যে?

কারখানার ঠাণ্ডা ভাবখানা দেখে কেমন হাসি পেয়ে গেল মেমসাহেব।

রমা ভুরু কুঁচকে তাকালো। ও হঠাৎ-হঠাৎ ওকে মেমসাহেব বলে ডেকে বসত। একদিন দাবড়ানি খেয়ে নাক কান মলে প্রতিজ্ঞা করেছে আর বলবে না।

থুড়ি মেম—আ-মর—বহিনজি! এরকম আনন্দের দিনে সব ভুল হয়ে যাচ্ছে।

আনন্দ কেন?

এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, তুমি চট্ করে কিছু বোঝ না, তোমাকে মেমসাহেবই বলা উচিত—মিরজাফরের বংশধর না আমি? অ্যাদ্দিন নিজেই ভুলে মেরে দিয়েছিলাম আজ মনে পড়তে কি আনন্দ!

দ্রুত চিন্তা করছে রমা চন্দ।—মিরজাফরের কাজ কিছু করেছ তাহলে?

করিনি আবার! এই তো সেদিন সাহেবের বাড়ি বসে তাঁর কাছে পাঠকজীর রসের ব্যাপারটা বলে এলাম, আ-হা পাঠকজী আমার গুরুজি, কত সময় কত উপকার করেছে—আমাকে জাহান্নমে পচে মরতে হবে।

নেশাই করেছে মনে হচ্ছে, চোখ দুটো লাল-লাল। হাসছেও বেশি। ভালো করে আর এক দফা ওর মুখখানা দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, পাঠকজীর কি ব্যাপার বলে এলে?

হাসতে হাসতে রাজা আহমেদ সামনের দিকে ঝুঁকল একটু। সঙ্গে সঙ্গে নাকে গন্ধ এলো রমা চন্দর।—ওই যে তোমার জন্যে একটু হাঁক-পাক করছে। সেদিন পাঠকজী আমাকে বলছিল, তোর বহিনজি কালো হলেও অপছন্দের নয়, আর বেশ বুদ্ধিমতী—

রাজা আহমেদ!

একটু জোরেই ডেকে উঠেছিল রমা চন্দ, ওদিকের লোক দুটো ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। রাজা আহমেদ বোকা মুখ করে হাসি গিলতে চেষ্টা করল। বলল, বা রে, তোমার অত রাগের কি হল বহিনজি, তুমি তো কিছু বলোনি—

ঠিক তক্ষুনি ভিতর থেকে বেয়ারা এসে একটু দূরে দাঁড়িয়েই সাহেবের তলব জানালো ওকে। রাজা আহমেদের ভ্যাবাচাকা মূর্তি।—এই খেলে যা, আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন! হতচকিত করুণ চাউনি বহিনজির দিকে।

হঠাৎ সংকটটা যেন রমারই। চকিতে পিছন ফিরে দেখল বেয়ারা চলে গেছে। এই মেজাজের ওপর সাহেব ওকে এই অবস্থায় দেখলে চাবকে তাড়াবে। অস্ফুট ঝাঁঝে বলে উঠল, সরে যাও শিগগীর, দেখতে পেলে তোমার আজকেই শেষ! এতবার ওয়ার্নিং খেয়েও শিক্ষা হল না, কারখানায় মদ গিলে এলে!

ধুরন্ধর পাজি এই অবস্থাতেও বুঝে নিল কে সামাল দেবে।—তুমি সত্যিকারের মেম সাহেব বহিনজি—

ছুটে পালাল।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে ভিতরে ঢুকল রমা চন্দ। কেন যে ওকে বাঁচানোর তাগিদ বোধ করল হঠাৎ কে জানে। ওরই মুখ থেকে শুনে মালিক সেদিন বিমল পাঠকের পছন্দ করার কথা বলে ব্যঙ্গ করেছিল। বাঁচানোর বদলে ব্যাটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে একেবারে বিদায় করার ব্যবস্থা করলেই ভালো হত। কিন্তু ওর থেকেও বেশি রাগ বিমল পাঠকের ওপর। সাহেবের কানে যাবে আশা নিয়েই ওকে ওই সব কথা বলেছিল, নইলে এ-সব কথা আর যাই হোক রাজা আহমেদকে বলার কথা নয়।

ওদের ঘরের শেষে মালিকের ঘর। দরজা ঠেলে রমা চন্দ ভিতরে ঢুকল। শুভ্রেন্দু নন্দী মন দিয়ে ফাইল দেখছেন—বিমল পাঠকের ফাইল আর আরো চারজনের। ঘণ্টাখানেক আগে ওগুলো চেয়ে নিয়েছিলেন। দলাদলি করে যে কজন মাতব্বর ভাগ হয়ে গেছে বলে অ্যাকাউনটেন্টের রিপোর্ট, তাদের ফাইলগুলোই শুধু বাছাই করে নিয়েছেন শুভ্রেন্দু নন্দী। সাহেবের উদ্দেশ্য কি রমা জানে না। জানে না বলেই আরো বেশি উদ্‌বেগ।

রাজা আহমেদকে ডেকেছিলেন...সে নেই। হাত দুই তফাতে দাঁড়িয়ে রমা চন্দ জানান দিল।

শুভ্রেন্দু নন্দী মুখ তুলে তাকালেন একবার। তারপর আবার ফাইলে মন দিয়ে বললেন, আমারই ভুল হয়েছে, ও আজ আসবে না বলে গেছল।

রমা মনে মনে অবাক একটু। আসবে না বলেছিল অথচ এসেছে।...হয়তো নেশা করার পর না আসার কথাটা আর মনে ছিল না। কিন্তু মদ খেলেও এ-রকম ভুল ওর সহজে হয় না।

—নোট নিতে হবে।

রমা চন্দ বেরিয়ে এলো। নিজের টেবিল থেকে ডিক্‌টেশনের খাতা আর পেনসিল তুলে নিল। মনের তলায় একটা অজ্ঞাত আশংকা ভিড় করে আসছিল। কিন্তু পা বাড়িয়েও দাঁড়িয়েই থাকতে হল।

এদিকেই আসছেন পাশাপাশি দুজন। আনন্দ চক্রবর্তী আর সুমিত্রা বোস। আনন্দ কাকু আসবেন জানাই ছিল, অন্য জনও মাঝে-মাঝে এসে থাকেন। তবে গত তিন চার মাসের মধ্যে তাঁকে দেখেনি।

আনন্দ কাকু ওর সামনে থেমে যেতে কয়েক হাত এগিয়ে সুমিত্রা বোসও দাঁড়িয়ে গেলেন। নির্লিপ্ত অবহেলায় তাকালেন ওর দিকে। মহিলার এখানে আর্বিভাব কোনো সময় সুবাঞ্ছিত মনে হয় না রমা চন্দর। কিন্তু এলে প্রতিবারই চোখ দুটো তাঁর দিকে আটকে যায়ই। ভাবে এই বয়সেও মহিলার চেহারা আর শরীরের বাঁধুনি বটে। কমাস বাদে দেখে আজ যেন আরো তাজা মনে হল।

আনন্দ কাকু ফিসফিস করে বললেন, হাওয়া তো ঠাণ্ডাই মনে হচ্ছে?

রমা চন্দ মৃদু জবাব দিল, ঠিক বুঝছি না।

তাঁরা এগিয়ে গেলেন। তাঁদের পিছন পিছন সে-ও দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

মুখ তুলে শুভ্রেন্দু নন্দী দুজনকেই দেখলেন। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য অভ্যর্থনার হাসি দেখা গেল কি গেল না।—তোমরা জোড় বেঁধে কোত্থেকে?

আনন্দ চক্রবর্তী খুশি মুখে সরল জবাব দিলেন, ওপরঅলা জুড়ে দিলে তুমি আটকাবে কি করে? এত দিন বাদে আমার গাড়িটা বিগড়েছে, তোমার এখানে আসব বলে ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম— শ্রীমতির বিশাল গাড়িখানা আমাকে চাপা না দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে গেল, ব্যস্—

শ্রীমতির বিশাল গাড়ি কথা কটা খট করে কানে লাগল রমা চন্দর। মাস তিনেক আগে একটা ঝকঝকে ছোট গাড়ি থেকে নামতে দেখেছিল ওঁকে। আজ শুনছে বিশাল গাড়ি। অথচ তার আগে অনেক দিন ট্যাক্সিতে আনাগোনা করতে দেখেছে। চেহারায় আর হাবভাবে অবস্থা হঠাৎ বেশ ফিরেছেই মনে হয়।

বোসো। শুভ্রেন্দু নন্দী শ্রীমতির দিকে তাকালেন।—তুমিও এদিকেই আসছিলে তাহলে?

কক্ষনো না। তোমার বন্ধু, তাই সদয় হলাম।

হাসি মাখা দৃষ্টিটা রমার মুখের ওপর পড়তে মহিলা গম্ভীর একটু। সুন্দর দুই ভুরুর মাঝে সামান্য কুঞ্চন রেখা পড়ল। তাদের কথা-বার্তার মাঝে এই মেয়ের অবস্থান যেন অপরাধ। হাতের ব্যাগ দুলিয়ে সুচারু মন্থর ভঙ্গিতে এগিয়ে দেয়ালের গায়ে সোফার ওপর ধুপ করে বসলেন। শুভ্রেন্দু নন্দীর দু-চোখ তাঁর দিকেই, রমার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নন।

আনন্দ কাকু তাঁর পাশের চেয়ার নিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তোমার কারখানার হাওয়া গরম শুনছি কোনোরকম গোলযোগের আশঙ্কা নেই তো?

রমা চন্দ নিঃশব্দে ফাঁপরে পড়ল যেন। যে লোক বুদ্ধি করে গাড়ি বিগড়নোর কথা বললেন তিনি এমন বে-ফাঁস প্রশ্ন করবেন, ভাবেনি।

যা ভেবেছিল তাই। শুভ্রেন্দু নন্দী সোজা হয়ে বসলেন একটু। জবাব না দিয়ে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, হাওয়া গরমের খবর তোমাকে কে দিলে?

রমা চন্দর বাঁচোয়া। কিন্তু অবাকও একটু। ওর বদলে পিছনে আঙুল দেখিয়ে আনন্দ কাকু জানালেন, আসার সময় গল্পে-গল্পে শ্রীমতি বলছিলেন—

শুভ্রেন্দু নন্দীর মুখখানা এখনো গম্ভীর বটে, কিন্তু চোখ-জোড়া স্পষ্টই হাসছে। সুমিত্রা বসুর সমস্ত মুখখানা যেন দুই চোখে আগলে নিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই বা কারখানার গরম হাওয়ার খবর জানলে কি করে—তোমাকে খবরাখবর দেবার লোক এখানেও মজুত আছে তাহলে?

শ্রীমতি বসুর বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটি।—আমার দায় পড়েছে খবর নিতে। তোমার ওই নেশাখোর পেয়ারের মিস্ত্রী রাজা না বাদশা—কবে যেন ও-ই বলছিল নেশার ঝোঁকে—তোমার জন্য ওকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিল।

শুধু চোখে নয়, শুভ্রেন্দু নন্দীর মুখেও হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল এক প্রস্থ। আর কথাতেও কৌতুক ঝরল।—নেশার ঝোঁকে রাজা আহমেদ আজকাল তোমার ওখানে গিয়ে হাজির হচ্ছে নাকি?

মুহূর্তে ঝাঁঝালো মূর্তি সুমিত্রা বসুর। কিছু একটা জবাব দেবার মুখেও রমার দিকে চেয়ে থমকে গেলেন। এর সামনে কিছু বলতে যাওয়া মর্যাদাহানিকর।

টেক্ ডাউন প্লিজ।

আচমকা মালিকের ভারী অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর শুনে রমা-চন্দ থতমত খেল একদফা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে সামনে চেয়ার টেনে বসল। সঙ্গে সঙ্গে খাতা পেনসিল রেডি।

সেই চিরাচরিত ঠাণ্ডা কঠিন মুখ শুভ্রেন্দু নন্দীর। গড়গড় করে যা বলে গেলেন শুনে রমা চন্দর হাত থেমে যাওয়ার দাখিল। শুভ্রেন্দু নন্দী ঝড়ের বেগে বলে চলেছেন। অপরাধের লম্বা বিবরণসহ প্রধান মেকানিক বিমল পাঠকের বরখাস্তের নোটিস। যত তাড়াতাড়িই বলুন ঠেকে যাওয়ার কথা নয়

রমা চন্দর। কিন্তু ও বিশ্বাস করতে পারছে না বলেই আটকে যাচ্ছে। অজ্ঞাত আশংকায় ভিতরটা ছেয়েছিল, কিন্তু এ-রকম হতে পারে ভাবে নি।

আবেদন জানালো, রিপিট প্লিজ!

বাধা পেয়ে একটা অসহিষ্ণু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শুভ্রেন্দু নন্দী শেষেরটুকু পুনরুক্তি করে আবার তেমনি দ্রুত বলে চললেন। বিমল পাঠকের বিরুদ্ধে প্রমাণসহ তেল-চুরির অভিযোগ, মাল কেনার ব্যাপারে কারচুপির অভিযোগ, কাজে গাফিলতির অভিযোগ, অবাধ্যতার অভিযোগ, আর সব শেষে কারখানার অন্যান্য কর্মচারীদের নীতিভ্রষ্ট করার অভিযোগ।

ওয়েট্ সার...

মাথার মধ্যে একটা বিষম প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেই যথাযথ অনুসরণ করে উঠতে পারছিল না রমা চন্দ।

শুভ্রেন্দু নন্দী থমকে তাকালেন। রুক্ষ চাউনি।—হোয়াট্স ইওর স্পিড?

পারডন্ সার?

আই সে হোয়াট্স ইওর স্পিড?

ট্যু হানড্রেড।

পার আওয়ার?

মুখে এক ঝলক রক্ত উঠে এলো রমা চন্দর। চোখে চোখ রেখে সংযত স্বরে জবাব দিল, পার মিনিট সার।

গো অ্যাহেড।

চিঠি শেষ হল। তারপর আরো চারখানা চিঠি তেমনি দ্রুততালে ডিক্টেট করে গেলেন। সেই চারখানাও অন্য চারজনের বরখাস্তের নোটিশ। নির্বাক আনন্দ কাকু শুভ্রেন্দু নন্দীর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন। অন্য চারজনের বিরুদ্ধে শুধু কাজে গাফিলতি, অবাধ্যতা আর অন্য কর্মচারীদের নীতিভ্রষ্ট করার অভিযোগ। বিমল পাঠকের বিরুদ্ধেও শুধু যদি ওই কটি অভিযোগ থাকতো তা হলেও কথা ছিল—কিন্তু চুরির অভিযোগ যুক্ত হওয়ায় রমা চন্দর ভিতরটা যেন জ্বলে যেতে লাগল। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মানুষটা এই স্তরে নামতে পারে, ভাবতে পারে না।

ডিক্টেশন নেওয়া শেষ। রমা চন্দ চেয়ার ঠেলে উঠতে যাচ্ছিল, অপ্রত্যাশিত বাধা পড়ল। পিছন থেকে ছিটকে উঠে এলেন সুমিত্রা বোস। অগ্নিমূর্তি একেবারে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।—এ সবের অর্থ কি? তেল চুরি আর মাল চুরির কারচুপি তুমি প্রমাণ করতে পারবে?

রমা চন্দ হতভম্ব। আনন্দ চক্রবর্তীও।

অবিচল ঠাণ্ডা মুখ শুভ্রেন্দু নন্দীর—দেখা যাক, বিমল পাঠককে আমি জেলে পাঠাতে চেষ্টা করব।

আরো ক্ষিপ্ত ঝাঁঝে সুমিত্রা বোস বলে উঠলেন, ও! জেলখানা একেবারে হাতের মুঠোয় তোমার—কেমন? আমি জানতে চাই ওদের তুমি তাড়াবে কেন? রাগে না ভয়ে?

তুমি জানতে চাওয়ার কে?

সুমিত্রা বোসের এমন ক্ষিপ্ত বিকৃত মূর্তি রমা চন্দ কল্পনাও করতে পারে না। চোখ মুখ দিয়ে যেন জ্বলন্ত তাপ ঠিকরোচ্ছে তাঁর।—আমি জানতে চাওয়ার কে! আগুন নিয়ে খেলা করার খুব সাধ? বীরত্ব দেখাতে চাও? ওদের তুমি চেনো না? নোটিস পেলেই মুখ বুজে ওরা চলে যাবে ভেবেছ? ওরা শোধ নিতে জানে না?

শুভ্রেন্দু নন্দী চেয়ারের গায়ে শরীরটাকে একটু ছেড়ে দিয়ে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর স্পষ্ট বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার জন্যে তোমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে খুব?

হচ্ছে! তুমি একটা—

থেমে গেলেন। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা রমার মুখের ওপর ঠোক্কর খেল এক দফা। চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করলেন একটু।—তোমার কাজ শেষ হয়েছে?

রমা চন্দ বিমূঢ় মুখেই বসে ছিল বটে। পরক্ষণে সচকিত। কিন্তু ওঠার আগেই গুরুগম্ভীর বাধা আবার। জবাব দিলেন শুভ্রেন্দু।—নো! শি মে স্টে, তোমার কিছু বক্তব্য থাকে তো চট্ করে সেরে

নাও, আই অ্যাম্ বিজ্-ই।

এটুকুই শেষ আঘাত যেন। অপমানেরও শেষ। সুমিত্রা বোস আর একটা কথাও বললেন না। থমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন একটু! দুই চোখে শুধু এক পশলা আগুন ছিটিয়ে হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রমা চন্দ আর আনন্দ চক্রবর্তী স্তব্ধ নির্বাক খানিকক্ষণ। এতটুকু শব্দ না করে রমা আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠল। আনন্দ চক্রবর্তীও যেন আত্মস্থ হলেন। দ্বিধান্বিত মুখে বন্ধুকে বললেন, তুমি সত্যি ওদের ডিসচার্জ করে দেবে?

টেবিলের কাগজপত্রের দিকে চোখ শুভ্রেন্দু নন্দীর। মুখ তুললেন না, ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল একটা দুটো।...হুঁ।

এ-সব ব্যাপার সামান্য থেকে পোলিটিক্যাল গেম হয়ে দাঁড়ায়...আর একটু ভেবে দেখলে হত না?

সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু অভিব্যক্তি একটা। তাকালেন তাঁর দিকে। সংযত গম্ভীর জবাব দিলেন, আমি কেন কি করছি খুব ভালো করে জানি আনন্দ। সরোষে রমা চন্দর দিকে ফিরলেন, গো অ্যান্ড গেট্ দেম ডান, কুইক প্লিজ।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে এসে টাইপে বসল। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। খাতা দেখে দেখে টাইপ করে চলল। এখনো আশা করছে আনন্দ কাকু আরো কিছু বলবেন, আরো একটু বোঝাবেন। আশা করছে। শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে মালিক মত বদলাবেন। রাগ গিয়ে বুকের তলায় ভয় চেপে বসছে রমা চন্দর। সুমিত্রা বসু কারখানার কেউ হোক বা না হোক, মিথ্যে ভয় দেখায়নি। বরখাস্তের নোটিস এরা একজনও বরদাস্ত করবে না—মালিকের রায় মাথা পেতে মেনে নেবে না।

...কিন্তু তার কাছে সব থেকে বিস্ময় ওই এক রমণী। সুমিত্রা বোস। কিছু একটা গণ্ডগোলের আভাস পেয়েই আজ কারখানায় এসেছিলেন সন্দেহ নেই। মাঝের তিন চারটে মাস তাঁর দেখাই মেলেনি। তাঁর দিন-যাপন জটিলতামুক্ত নয়। রমা চন্দর কাছে এও স্পষ্ট। আনন্দ কাকুর কাছে শুনেছে, ডিভোর্সের পরেও মহিলা প্রায়ই যে কারখানায় আসতেন সেটা টাকার তাগিদে। বাড়িতেও যেতেন, কিন্তু বাড়িতে মালিককে পাওয়া না পাওয়া অনিশ্চিত ব্যাপার। এই কমাসের মধ্যে সেই মহিলা ছোট-বড়ো শৌখিন গাড়ি, হাঁকিয়ে চলা-ফেরা করছেন। সে যাক, কিন্তু সেই তাঁরই কিনা ওই শুভ্রেন্দু নন্দীর বিপদের আশঙ্কায় এত উদ্‌বেগ, এত ক্রোধ, এত ক্ষিপ্ততা! রমা চন্দর মনে হয়েছে উদ্‌বেগই সব থেকে বেশি। স্বচক্ষে না দেখলে এ বিশ্বাস করা যেত না। মহিলা যা-ই হোন আর যেমনই হোন, রমা চন্দ এই প্রথম মনে মনে তাঁকে একটু শ্রদ্ধা না করে পারছে না।

টাইপ শেষ। উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু পা যেন নড়তে চায় না। চিঠিগুলো নিয়ে ওই ঘরে ঢুকল আবার। আনন্দ কাকু তখনো চেয়ারে গা ছেড়ে বসে আছেন।

চিঠিগুলো ভালো করে পড়েও দেখলেন না শুভ্রেন্দু নন্দী। ঘসঘস করে সই করে দিলেন। শুধু এটুকু শেষ করার অপেক্ষায় ছিলেন যেন, কাগজগুলো ওর দিকে ঠেলে দিয়ে মুখ তুললেন।—অ্যাকাউনটেন্টকে এদের মাইনে রেডি রাখতে বলা হয়েছিল—নোটিস আর মাইনে একসঙ্গে দিয়ে দাও।

রমা চন্দ অসহায় মুখে বেরিয়ে এলো। আর কিছু ভাবার নেই। আর কিছু করার নেই।

হুকুম পালন করল। বেয়ারা দিয়ে একে একে ডেকে পাঠালো ওদের। প্রথমে বিমল পাঠককে। টাকার খাম আর নোটিসের খাম একসঙ্গে হাতে নিল।

খাম থেকে নোটিসটা বার করে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে নিল বিমল পাঠক। তারপর ক্রূর কুটিল চোখে রমা চন্দর মুখখানাই ভালো করে দেখে নিল। অথচ আশ্চর্য, রমা চন্দর মনে হলো, এতবড়ো একটা বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে এ-যেন লোকটা জানতো। সমস্ত মুখে একটা আলগা কালচে ছাপ পড়ে গেছে একদিনের মধ্যেই। দরজার দিকে পা বাড়িয়েও আবার ঘুরে দাঁড়ালো।

দাঁতে দাঁত ঘষে বলে গেল, এর ফয়েসলা হবে তাকে বলে দেবেন।

অপর চারজনেরও একই মূর্তি। তারাও শাসিয়ে গেল, দেখে নেব।

সব মিলিয়ে দশ মিনিটের ব্যাপারও নয়। রমা চন্দ শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন।

পিঠে হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে ফিরে তাকালো। আনন্দ কাকু। মৃদু স্বরে বললেন, ব্যাপারগতিক ভালো বুঝছি না, দেখ এখন কি থেকে কি গড়ায়—

চলে গেলেন।

একটু বাদে সচকিত আবার। শুভ্রেন্দু নন্দী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। পরনে সেই কালি-লাগা কাজের প্যান্ট আর আলখাল্লা। ধীর অথচ বড়ো বড়ো পা ফেলে কাজের তদারকে চললেন। ব্যক্তিত্বের এক অনড় প্রতীক যেন মানুষটা।

রমা চন্দও চেয়ার ছেড়ে উঠল আস্তে আস্তে। বাইরের আঙিনায় এসে দাঁড়ালো। ওই মানুষকে ওদিকে যেতে দেখে বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে। দূর থেকে দেখল, এক নম্বর শেডে ঘুরে ঘুরে মালিক কাজ দেখছেন। যেখানে খানিক আগেও বিমল পাঠক সর্বেসর্বা ছিল।...মোটর চলছে, ডাইনামো চলছে, ওয়েলডিং-এর কাজ হচ্ছে, হাতুড়ি আর যন্ত্রপাতি ঠোকাঠুকির শব্দ আসছে—তা সত্ত্বেও রমা চন্দর মনে হয়েছে সমস্ত পরিবেশ মূক স্তব্ধ।

হাত দুই ওপরে তোলা একটা মেরামতির গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মেকানিকদের সঙ্গে কথা বলছেন শুভ্রেন্দু নন্দী। একজন ব্যস্তসমস্ত লোককে গাড়িটার নীচে কিছু একটা পাততে দেখা গেল। মালিক এগিয়ে গিয়ে সেটার ওপর বসে পড়লেন, তার পর চিৎ শোয়া অবস্থায় গাড়ির নীচে ঢুকে গেলেন। মিস্ত্রীরা তটস্থ সব। নিঃশব্দে তারা যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিতে লাগল।

এই কবছরের মধ্যে মালিককে গাড়ির নীচে শুয়ে কখনো কাজ করতে দেখেনি রমা চন্দ। এমন কি ইদানীং বিমল পাঠকও গাড়ির নীচে ঢুকত না। নিজের অগোচরেই পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো সে। পাঁচ-পাঁচটা লোককে এ-ভাবে বিদায় করার জন্য মনে মনে অন্তত এই মানুষের ওপর রমা চন্দ সদয় নয় একটুও। তারও বদ্ধ ধারণা, ওরা চুপ করে থাকবে না, বিপদ আসছে।

...কিন্তু তবু, এই মানুষ যেন পুরুষের প্রতীক, পুরুষকারের প্রতীক। তাঁর রাগ তাঁর ক্ষোভ তাঁর অসহিষ্ণুতা আর তাঁর কাজের ধারা সবই আপোসশূন্য সবল পুরুষের।

ঠিক ছটায় বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। প্রতিদিন যেমন যান। কিন্তু আজ কারখানার গুমোট বাতাস যেন একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সেদিন আর কারো ছটায় কর্মস্থল ছেড়ে যাওয়ার তাড়া নেই। বাইরের উঠোনে সকলেই রমা চন্দকে ঘিরে আছে। এমন কি বুড়ো অ্যাকাউনটেন্ট আর ক্লার্কও যেতে পারেনি। সকলেরই প্রশ্ন, সাহেব যা করলেন তার ফল কি দাঁড়াতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কারো মনে ভয়, কারো মনে সংশয়। কেউ বলছে, ওদের সকলের পিছনেই মস্ত মস্ত পাণ্ডা আছে—গণ্ডগোল বাধল বলে। পাণ্ডারা সব কারা কেউ ভালো করে জানে না—তারা যে সহজ লোক নয় এটুকুই জেনে রেখেছে। কারো মন্তব্য ওই পাঁচজনের মধ্যে হঠাৎ মতবিরোধ ঘটল বলেই সাহেব এতটা সুবিধে পেলেন—দুজন একজনের গেলে কথা ছিল, সব একসঙ্গে চাকরি খুইয়ে এখন আবার সব একজোট হতে পারে। ওই পাঁচজনের অনুরাগীবৃন্দ যারা, তারা মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে আছে, শুনছে।

দেখতে দেখতে সাতটা বেজে গেল, তখনও পর্যন্ত কারো নড়ার নাম নেই। রমা চন্দও ঘড়ি দেখতে ভুলেছে। সে কারো কথায় সায় দেয়নি বা নিজের মতামত ব্যক্ত করেনি। কেবল শুনেছে।

হঠাৎ সচকিত সকলে। আবছা অন্ধকারে মালিকের গাড়িটাই আবার এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নেমে শুভ্রেন্দু নন্দী আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন। সকলেই অপ্রস্তুত, সকলেরই বিড়ম্বিত মুখ। রমা চন্দ কি যে করবে ভেবে না পেয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়েই রইল। এরই মধ্যে ভদ্রলোক আবার ঘুরে আসতে পারেন এ কে ভেবেছে!

একে একে অনেকের ওপর দিয়ে ঘুরে মালিকের দুই চোখ তার মুখে এসে স্থির হল। অপলক, কঠিন। সকলকে ছেড়ে আসল অপ্রত্যাশিত আসামী যেন সে-ই। গলার স্বরটুকুও ভয়াবহ গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? অ্যাকশন পলিসি ডিসকাস করছ? আর ইউ ইন ইট্ ট্যু?

শুকনো গলায় রমা জবাব দিল, না সার...এমনি আলোচনা হচ্ছিল।

হোয়াই? কিসের আলোচনা? কেন আলোচনা? লালচে দেখাচ্ছে, সমস্ত মুখ।—ভয়ানক আঘাত পেয়েছ তোমরা সকলে, কেমন? আর তুমি বোধহয় সব থেকে বেশি? নাও আস্ক্ দেম টু কুইট্ অ্যান্ড কুইট্ ইয়োরসেল্ফ প্লিজ।

কান সকলেরই আছে, কাউকে বলতে হল না। চোখের নিমেষে আঙিনা ফাঁকা। ভয়ে কি আচমকা একটা আঘাত পেয়ে জানে না, রমা সোজা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু তারপর পায়ে পায়ে পথে নেমে এলো। অপমানে আর নিষ্ফল রাগে একটু দ্রুতই হাঁটতে লাগল। ওই ব্যক্তিত্বের সামনে কেউ মুখ খুলতে পারে না, সে-ও পারেনি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আর কেউ এত জ্বলছে কিনা সন্দেহ। সুমিত্রা বোসের মতো তারও মনে হচ্ছে, ধরাকে সরা ভেবেছে লোকটা, যা-খুশি করছে, যা-খুশি বলছে। চাকরির ওপর নিজেকে এতখানি নির্ভর করতে হয় বলেই হুট করে পাঁচ-পাঁচটা লোকের এভাবে চাকরি চলে যাওয়াটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে ইচ্ছে করছে না।

থমকালো একটু, হাঁটার গতি শ্লথ হল। আবছা অন্ধকারে অদূরের বাঁকের মুখে যে লোকটা দাঁড়িয়ে তাকে চিনতে দেরি হল না। রাজা আহমেদ।

ওকে দেখেই ভিতরটা সক্রিয় হয়ে উঠল কেমন।...ও এ-সময় এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ছুটি নিয়েও সকালে মদ গিলে কারখানায় এসেছিল কেন? নিজেকে মিরজাফরের বংশধর বলেছিল কেন? মোট কথা লোকটার চালচলন একটুও সুবিধের মনে হচ্ছে না তার।

পায়ে পায়ে রমা চন্দ তার দিকেই এগোলো।

অন্ধকারে নিঝুম কারখানার দিকে চেয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন শুভ্রেন্দু নন্দী। দারোয়ান দুটো আলো নিভিয়ে তালা-টালা বন্ধ করে আড়ালে সরে গেছে। মালিকের রকমসকম দেখে বিলক্ষণ ঘাবড়েছে ওরাও। এ অবস্থায় কেউ কারো অস্তিত্ব জাহির করতে চায় না।

...মিষ্টি একটা বাজনার আওয়াজ যেন কত দূরের থেকে কানে ভেসে আসছে শুভ্রেন্দু নন্দীর। মিষ্টি অথচ করুণ, ভায়লিনের বাজনা। বাজাচ্ছে যে, অন্ধকার ফুঁড়ে যেন তার মুখখানাই খুঁজছেন শুভ্রেন্দু। ছেঁড়া পাজামা, লম্বা জীর্ণ-কালো কুর্তা গায়ে, এক-মুখ কাঁচা পাকা দাড়ি, একটি পা খোঁড়া, আধ বুড়ো মানুষ।...হ্যাঁ, অনেক—অনেকদূর থেকে লোকটা কাছে এগিয়ে আসছে যেন।

—তোমার এমন দিন থাকবে না বাবা, তুমি অনেক বড় হবে, ঢের বড় হবে, বাজনা বাজিয়ে কি অন্য কাজ করে দুনিয়াদার জানে—কিন্তু অনেক বড় হবেই তুমি—কেউ তোমাকে রুখতে পারবে না। আজকের তারিখ বসিয়ে এ-কথা তুমি লিখে রাখো—না মেলে তো শোহনলালের নামে কুকুর পুষো।

এক পা জখম এক্স মিলিটারী জোয়ান ভিখিরি শিল্পী শোহনলাল বলেছিল কথাগুলো।

...আবার কার গলা শুনছেন শুভ্রেন্দু নন্দী? অন্ধকারে আবার কোনো এক বুড়োর মুখ খুঁজছেন ?

অ্যায়সা দিন নহী রহেগা সুভেন্ বাবু, ঘাবড়াও মাৎ।...মদ খেলে সেই লোকটার মুখে হিন্দী বুলিও বেরুত।—তোমার দিল, তোমার হিম্মৎ আমি বুঝে নিয়েছি— তোমার নিজেরই মস্ত কারখানা হবে একদিন দেখে নিও, এর থেকে ঢের বড়—বহুৎ আদমিকো রোটি মিলেগা উঁহাসে...রুপয়া তুমকো লেনে হোগা, লেনেই পড়েগা—।

বুড়ো রফিক আহমেদ বলেছিল।

শুভ্রেন্দু নন্দীর এই মোটর মেরামতের কারিগরী শিক্ষার আর কাজের প্রথম আর শেষ গুরু, মেরুদণ্ড দুমড়ানো ঝাঁঝরা ফুসফুস...রাজা আহমেদের বাবা রফিক আহমেদ।

...একেবারে শিশুকাল থেকে কলকাতায় কোনো এক নামী মিশনারী স্কুলের হস্টেলে থেকে পড়ত এক ছেলে। তার নাম শুভ্রেন্দু নন্দী। শৈশবের জ্ঞানোন্মেষের আগে সে কোথায় কার কাছে থাকত স্মরণ নেই। সাধারণত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরাই পড়ত সেই স্কুলে। বাঙালীর সংখ্যা সেখানে সীমিত। হস্টেলে অত ছোট বয়সের বাঙালী ছেলে সে একাই। তাই মিশনারি স্কুলের কর্তাব্যক্তিদের একটু বিশেষ নজর ছিল তার ওপর।

ছেলেটাও জানতো তার বাপের বড় অবস্থা। নাম রমেন্দ্র নন্দী। কোনো এক মস্ত ফার্মের সেল্‌স অফিসার। ভারতবর্ষের সর্বত্র সেই সংস্থার শাখা ছড়ানো। বাবাকে সেই সব জায়গায় ঘুরতে হত। বাবার মুখে শুনেছে জন্মের বছর খানেকের মধ্যেই তার মা স্বর্গে চলে গেছে। তার ধারণা স্বর্গে চলে গেছে মানে আকাশের ওধারে কোথাও চলে গেছে। এই হস্টেলে আসার আগে বাইরের কোনো মিশনের এক বিদেশিনী মহিলার তত্ত্বাবধানে থাকতো মনে আছে।

একটু বড় হতে বাবা তাকে কলকাতায় এনে এই স্কুলে আর হস্টেলে দিয়েছে। সেই শিশুকাল থেকে ছেলেটা নিঃসঙ্গ। এখানে সমবয়সী প্রায় নেই-ই। যা-ও আছে তাদের সঙ্গে বনিবনা হয় না। সেই সময় থেকেই ভিতরটা একরোখা তার। একটু বেশি বয়সের ছেলেরা মাতব্বরি করতে এলে খটাখটি লেগে যেত। রাতে এক একদিন ঘুম আসতে চাইতো না। বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে তখন আকাশ দেখত। তারা দেখত। ভাবত ওগুলোর মধ্যে একটা হয়তো তার মা। আকাশের ওধারের ঘর ছেড়ে এসে তারা হয়ে মিটি মিটি দেখে তাকে।

একমাত্র সঙ্গী বাবা। কলকাতায় থাকলে বাবা ঘুরে ফিরে আসতেন। আর বড় ভালও বাসতেন তাকে। অভাব কাকে বলে শুভ্রেন্দু জানতো না। হস্টেলের ফাদারের কাছে বাবা টাকা দিয়ে রাখতেন। দাবি অসঙ্গত না হলে ফাদার হাসি মুখে ওর চাহিদা মেটাতেন। আর বাইরে থেকে ঘুরে এলে বাবা ওর জন্য কত কি নিয়ে আসতেন ঠিক নেই। তার জগতে বাবার মতো ভালো লোক আর নেই। অমন আর হয় না। বছরে দুবার লম্বা ছুটি হত স্কুলের। গরমের ছুটি আর এক্সমাসের ছুটি। সেই ছুটির আশায় উন্মুখ হয়ে থাকতো ছেলেটা। কারণ ছুটি হলে বাবা আসবেই আর তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবে। সেইসব ছুটিতে বাবার সঙ্গে কত নতুন নতুন জায়গায় ঘুরেছে ঠিক নেই। এই করেই ছোট বয়সে বাইরের বড় দুনিয়াটাকে সে অনেকখানি চিনে ফেলেছে। বাবার সঙ্গে একবার সিলোন আর একবার গোয়া পর্যন্ত ঘুরে এসেছে।

ছেলেটা মনের মতো একজন সঙ্গী পেয়েছিল উঁচু ক্লাসে উঠে। তার নাম আনন্দ চক্রবর্তী। লক্ষ্ণৌ না কোথায় থাকত তার বাবা মা। ছেলেকে সাহেব স্কুলে পড়িয়ে মানুষ করতে না পারলে তার বাবা-মায়ের নাকি মন ভরছিল না। ক্ষুব্ধ আনন্দ নিজেই বলত এই কথা। ক্ষুব্ধ কারণ, সেখানকার অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে ইংরেজী স্কুলে বা এই মিশনারি হস্টেলে অনেকদিন পর্যন্ত মন বসেনি এই ছেলেরও। কোনোদিন বসেছে কিনা সন্দেহ।

শুভ্রেন্দুর ভারী ভালো লেগে গেছল আনন্দ চক্রবর্তীকে। পাছে হস্টেল ছেড়ে চলে যায় সেই আশঙ্কায় সর্বদা সঙ্গ দিত তাকে, যা চাইত তাই খাওয়াতো। তখন বড় হয়েছে, তাই বাবা তার হাতেই চুপিচুপি কিছু টাকা দিয়ে রাখতেন। আনন্দর খেলাধুলায় তেমন মন ছিল না, শুভ্রেন্দু জোর-জবরদস্তি করেই তাকে খেলার আসরে টেনে নামাতো।

আনন্দর হাব-ভাব-স্বভাব দেখে মজাই লাগতো শুভ্রেন্দুর। বাবা-মা শখ করে সাহেবি স্কুলে দিয়েছেন বটে কিন্তু অমন ভেতো বাঙালী আর বুঝি দেখেনি। সর্বদাই বাড়ির জন্য মন খারাপ, ইংরেজী বই ছেড়ে বাংলা বই পড়ার ঝোঁক বেশি। চুপি চুপি বাংলা কবিতা লিখে ওকে দেখিয়ে ছোটদের মাসিক কাগজে পাঠায়। দৈবাৎ একটা দুটো কবিতা ছাপাও হয়ে গেছে। দুই বন্ধুরই তখন খুশি ধরে না। এরপরে ছোট ছোট গল্পও লিখতে লাগল আনন্দ। একমাত্র সমঝদার পাঠক শুভ্রেন্দু নন্দী। বন্ধুকে শোনানোর তাগিদে একের পর এক গল্প লিখে যেত আনন্দ চক্রবর্তী। স্কুলের একেবারে শেষ ক্লাসে পড়তে একবার যা-একটা গল্প ছাপা হয়ে গেছল।

স্কুলের পাট শেষ হতে বেদনাদায়ক ছাড়াছাড়ি। তখন আবার আনন্দ চক্রবর্তীই বেশি ভক্ত হয়ে পড়েছে শুভ্রেন্দু নন্দীর। ছেলেটার বুদ্ধি সাহস গোঁয়ারতুমি—সবই প্রশংসার চোখে দেখত সে। কোনো কিছু করব বললে করে ছাড়ত, সে যত কঠিন কাজই হোক না কেন। আর একটা বড় আর্কষণ, টাকা-পয়সার ওপর দখলটাও ওই ছেলের অনেক বেশি। ওর থেকে ঢের বেশি টাকা হাতে পেত সে। আর দিলদরিয়া মেজাজে খরচও করত। ওই বয়সে বাবার কাছ থেকে অমন দেদার টাকা হাতে পায়

শুভ্রেন্দু এ তার কাছে বিস্ময়ও আর দীর্ঘনি:শ্বাস ফেলার মতোও। বাবা তাকেও নিতান্ত কম টাকা পাঠাতেন না, কিন্তু শুভ্রেন্দুর বাবা যা দিতেন তার তুলনায় কিছুই নয়।

স্কুলের পর শুভ্রেন্দু গেল এনজিনিয়ারিং পড়তে। আর আনন্দ চক্রবর্তী শেষ পর্যন্ত কলকাতার এক সাদামাটা কলেজেই থেকে গেল। সাহেব স্কুলে পড়িয়ে ছেলেকে চৌকস বানানোর চেষ্টাটা একেবারে ব্যর্থ তার বাবার। ছেলের ঘাড়ে তখন সাহিত্য আর কবিতার ভূত ভালোমতোই চেপে বসেছে। অতদিন সাহেব স্কুলে পড়ার পরেও এ ছেলে এনজিনিয়ার ডাক্তার বা নিদেন পক্ষে ব্যারিস্টারও হতে চাইবে না সেটা তার বাবার চিন্তার বাইরে ছিল। এতদিন টাকাগুলোই জলে ফেলেছেন ভাবলেন তিনি।

ছাড়াছাড়ি হলেও সেটা একেবারে অলঙ্ঘনীয় নয়। শিবপুর থেকে শুভ্রেন্দুর যখন তখন আসার সুযোগ হত না। পড়ার চাপ খুব, নিয়মেরও কড়াকড়ি। ফুরসত পেলে আনন্দই চলে যেত তার কাছে। একজন আর একজনকে ছাড়তে চাইত না তখন। একজন আর একজনকে এগিয়ে দেওয়ার ফাঁকেও ঘণ্টা-দু ঘণ্টা কেটে যেত।

সুযোগ-সুবিধে করে নিয়ে শুভ্রেন্দুও যে এক-আধ সময় কলকাতায় চলে আসত না, তা নয়। আসার ঝোঁক চাপলে ওকে ঠেকাবে কে। তখনো আগের মতোই সেই একরোখা মেজাজ। আগের থেকে আরো বেশি বেপরোয়া বরং। সে এলে আনন্দর কলেজও মাথায় উঠত। বিশেষ করে ভেকেশনের সময় বাবার সঙ্গে বেরুনোর আগে দিন কয়েক সে আনন্দর সঙ্গে থেকে যেতই। আনন্দ মেসে থাকে, হস্টেলে থাকা পোষায় না তার—সেখানে নানারকম কড়াকড়ি—কবি সাহিত্যিকদের পিছনে ঘোরারও অসুবিধে। ছোট ছোট মাসিক সাপ্তাহিকে আনন্দর গল্প আর কবিতা কিছু কিছু ছাপা হচ্ছে তখন। বন্ধু পড়বে বলে আনন্দ সেই সব লেখা গুছিয়ে রেখে দিত। শুভ্রেন্দু পড়ত। বলত আমার ভালো লাগে না এ-সব পড়তে অথচ শুধু তোমার লেখা হলেই বেশ লাগে।

কলকাতায় এলে শুভ্রেন্দুর পকেটে অনেক টাকা থাকতো। নানা জায়গায় রসনা তৃপ্তি করে খেত দুজনে, খেলা দেখত, সিনেমা থিয়েটার দেখত।

...একবার ভেকেশনে বাবার সঙ্গে বেরুবার আগে শুভ্রেন্দু আসতে খুব বড় হোটেলে খাওয়ার লোভ হয়েছিল আনন্দর। চাইনিজ না কি বলে সেই খাওয়া। সন্ধ্যার আগে সেই রকমই এক জায়গায় খেতে ঢুকেছে।

মাঝে মাঝে বিমনা হয়ে কান পেতে শুভ্রেন্দু যেন কি শুনছে মনে হল। সেও শুনল। বাইরে কোথায় ভায়লিন বাজাচ্ছে কে—ভারী করুণ অথচ মিষ্টি রেশ ভেসে আসছে একটা। ঘরের ডিম আলোর সঙ্গে সেই সুর যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

পেট ভরে খেয়ে দুজনে নীচে নামল। তখন সবে রাত হয়েছে। কর্মব্যস্ত লোকালয় থেকে এ-জায়গাটা বিচ্ছিন্ন। বাইরে থেকে বাজনাটা আরো স্পষ্ট হয়ে কানে আসছে। বাইরেটা নির্জন, আবছা অন্ধকার। এই পরিবেশে সেই বাজনা যেন ভারী অদ্ভুত একটা মোহজাল বিস্তার করে চলেছে।

...অদূরে একটা বেদীর মতো জায়গায় বসে কালো আলখাল্লা-পরা এক মূর্তি নিবিষ্ট মনে বাজিয়ে চলেছে। আবছা অন্ধকারে ভালো করে তার মুখ ঠাওর হচ্ছে না।

পায়ে পায়ে দুজনেই সেদিকে এগিয়ে গেল। আরো অবাক তারপরে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, এক-গাল কাঁচা পাকা দাড়ি পাজামা আর কালো আলখাল্লায় তালি-মারা এমন এক শীর্ণ হতভাগা মূর্তির মানুষ বসে বসে এ-রকম বাজাচ্ছে—এ-যেন অবাক কাণ্ড। শিল্পী দেখে দুজনে দুজনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

ওরা দাঁড়াতে লোকটা ফিরে তাকালো একবার। বাঁ-হাতে আর কাঁধে ভায়লিন, ডান হাতে ছড়ি। সেটা তুলেই একবার কপালে ছোঁয়ালো তারপর, আবার বাজাতে লাগল। সামনে কেউ এসে দাঁড়ালে ওই রকম স্বল্প অভিনন্দন সেরে আবার বাজাতে থাকে। তবে লোক কমই সামনে এসে দাঁড়ায়।

বেদীর ওপর তার সামনে কিছু খুচরো পয়সা দেখা গেল। দুই একজন লোক ওই হোটেল থেকে বেরুবার মুখে টলতে টলতে এসে সিকিটা আধুলিটা ফেলে দিয়ে গেল দেখল ওরা। পেটে সে-রকম তরল পদার্থ পড়লে অনেক সময় অনেকের দয়ার উদ্রেক হয়।

ব্যাপার বুঝে শুভ্রেন্দু নন্দী বাজনাদারের গা ঘেঁসে বেদীর ওপর বসে গেল। আনন্দ ঠায় দাঁড়িয়েই আছে, দুজনের বসার মতো জায়গা নেই। লোকটা বাজিয়েই চলেছে। সমঝদার শ্রোতা পেয়ে তার বাজনা খুলছে আরো। সুর যেন উত্তাল হয়ে উঠল। আনন্দর হাই উঠছিল, কিন্তু শুভ্রেন্দু স্থাণুর মতো বসে।

থামল এক সময়। তার পরেও কারো মুখে কথা নেই খানিকক্ষণ। বাজনা থেমেছে কিন্তু সুর থামেনি যেন। আবছা অন্ধকার আর তার বাতাস যেন সুরে সুরে ভরাট হয়ে গেছে।

বাজনা ভালো লাগল বাবুজী?

শুভ্রেন্দু বলল, খুব। এমন হাত তোমার...এখানে বসে বাজাও কেন?

অনেকক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল লোকটা, তারপর টেনে টেনে বলল, আর কোথায় বাজাব। সামনের পয়সাগুলো আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করল একটু। বলল, বাবুরা যখন খেয়ে দেয়ে হালকা হয়ে ফেরে, তখন কিছু কিছু দিয়ে যায়—খোঁড়া পা নিয়ে আমি ঘুরে ঘুরে বাজাতে পারি না।

ব্যথিত বিস্ময়ে শুভ্রেন্দু তার পায়ের দিকে তাকালো। অন্ধকারে বোঝা গেল না কিছু। হঠাৎ তারপর একটা কাণ্ডই করল সে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা দশ টাকার নোট বার করে লোকটার পয়সাগুলোর ওপর রাখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

—শোহনলাল। সামনে দশ টাকার নোট দেখে সে বিস্মিত। তারপর চাউনিটা কেমন সন্দিগ্ধ। এ-রকম প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম বোধ হয়—এত দিচ্ছ কেন বাবুজী?

শুভ্রেন্দু হাসল। তার স্নায়ুগুলো যেন বাজনার রেশে ভরাট হয়ে আছে। বলল, তুমি যা ভাবছ তা নয়, আমরা খেয়েছি বটে কিন্তু হাল্‌কা হবার মত কিছু খাইনি। আমার কাছে আছে, দিচ্ছি। তুমি এ-রকম বাজাতে শিখলে কি করে?

শোহনলাল আবার ভালো করে শুভ্রেন্দুকে দেখে নিল। আস্ত একটা দশ টাকার নোট দেওয়াটা পাগলামি কিনা বুঝছে না। জবাব দিল, একসময় গুরু ছিল বাবুজী, সে অনেক দূরে—লাদাকের কাছে। তাঁর কাছে অল্পই শেখার সুযোগ পেয়েছি। এখন কিরকম বাজাই নিজেও জানি না, ভিতর থেকে যেমন আসে তেমনি বাজিয়ে যাই, তোমার ভালো লেগেছে শুনে বড় ভালো লাগল বাবুজী। কেউ তো বলে না। দিল শরিফ থাকলে ভিক্ষের মতো করে কিছু দিয়ে যায়। আস্ত বাজনা কেউ শোনে না।

শুভ্রেন্দু এক লাইনও কবিতা লেখেনি কোনোদিন, অথচ যা বলল শুনে আনন্দ পর্যন্ত অবাক একটু। শুভ্রেন্দু বলল, তোমার বাজনা শুনতে শুনতে আমার বুকের ভিতর কেমন একটা যন্ত্রণা শুরু হল, সেটা বাড়তে থাকল, তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। তুমি ভালো না বাজালে এ রকম হল কি করে?

শোহনলাল আবার একটু চেয়ে দেখল ওকে। তারপর বলল, তোমার ভিতরে কিছু চাপা যন্ত্রণা আছে বাবুজী?

জানি না। লোকটার সম্পর্কে সত্যিই জানার আগ্রহ তার—তোমার কথা বলো, লাদাকে থাকতে মানে, সে-তো একেবারে সীমান্তের পাহাড়ী জায়গা?

লোকটা মাথা নাড়ল, তাই। দশটা টাকা পেয়ে হোক বা দরদী ছেলেটাকে পেয়ে হোক, নিজের কথাই বলল।...যুদ্ধের জোয়ান ছিল। একেবারে কাঁচা বয়সে ফৌজের কাজে ভিড়ে গেছল। কিন্তু বাড়ি ঘর ছেড়ে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগত বলে একজনের কাছে এই বাজনা শিখতে শুরু করেছিল। তার বাবা ওস্তাদের আসরে ভাল তবলা বাজাতো। ছেলেবেলা থেকে তারও একটু আধটু সুর জ্ঞান ছিল।...ক্যাম্পে মন টিকত না শোহনলালের, রাতে মাঝে মাঝে পালিয়ে এদিক-ওদিক চলে যেত, ধরা পড়লে বিষম শাস্তি, তবু পালানোটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছল।

তারই ফল এই ভাঙা পা। ওপরওলা পালানোর এই সামান্য সুখটুকুও বরদাস্ত করল না। এক দুর্যোগে পা পিছলে পাহাড় থেকে পড়ে ডান পায়ের হাঁটু পর্যন্ত দুমড়ে গুঁড়িয়ে গেল। ডিউটির জখমী সৈনিক আজীবন সরকারী-ভাতা পায়, ক্যাম্প পালানো আহত সৈনিকের শেষ পর্যন্ত জেল হল না, এটুকুই ভাগ্য। শুকনো বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে শোহনলাল বলল, তারপর নানা জায়গায় ভেসে ভেসে এই যা দেখছ বাবুজী।

পরদিনও আবার সন্ধ্যায় আনন্দকে নিয়ে শুভ্রেন্দু শোহনলালের কাছে এসেছে। না, সেদিন আর হোটেলে খেতে বসেনি। শোহনলালকে ধরার জন্যেই এসেছে। আনন্দকে বলেছে, ওর বাজনা শুনে আমার বুকের ভিতর কেমন হচ্ছিল জানো না। পরের দিনও এসেই দশটা টাকা বার করে দিয়েছে।

শোহনলালের বিড়ম্বিত মুখ। জিজ্ঞাসা করল, তুমি তো ছেলেমানুষ বাবুজী, এত টাকা পাও কোথায়?

বাবার টাকা। আমাকে তুমি বাজনা শেখাবে?

কাঁচা-পাকা দাড়ি-ভরা মুখে লোকটা হাসল।—তোমার বেহালা আছে?

কিনে নেব।

শেখাতে পারি, কিন্তু শিখবে কোথায়, এখানে বসে?

সে দেখা যাবে। বাজনা শোনাও।

পর দিন আপিসে বাবার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে শুভ্রেন্দু জানিয়ে দিয়েছে, এবারে সে আর কোথাও যাচ্ছে না, আনন্দর সঙ্গে আনন্দর মেসে থাকছে। গেল না বটে, কিন্তু বেড়ানোর টাকাটা বাবার কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে এলো। একটা ভিখিরি মানুষের কাছে বাজনা শেখার এত আগ্রহ আর উৎসাহ দেখে আনন্দ চক্রবর্তী তাজ্জব। পয়সা ফেলে ইচ্ছে করলেই তো ও-ছেলে রইস বাজনাদারের কাছে যেতে পারে!

ভরপুর উত্তেজনায় নতুন দামী বেহালা কেনা হল। তারপর সেটা নিয়ে শুভ্রেন্দু ছুটল তার ভিখিরি ওস্তাদের কাছে। আর তারপরের একটা মাস আনন্দ বিকেলের দিকে প্রায় নি:সঙ্গ। আর ভায়লিন নিয়ে ট্যাক্সি চেপে রোজ যায় শোহনলালের কাছে। এক একদিন এক এক জায়গায় শেখার জায়গা বেছে নেয়। শোহনলালকে নিয়ে দূরে দূরে চলে যায়। নিজে খাবার কিনে এনে যত্ন করে খাওয়ায় তাকে। টাকা দেয়। নিতে না চাইলে জোর করে তার আলখাল্লার ভিতরে গুঁজে দেয়। আর মেসে তার বাজনা শিক্ষার দাপটে মেসের বাসিন্দাদের কান ঝালাপালা। আনন্দকে ধরে তারা পাঁচ কথা শোনায়, ঠাট্টা ঠিসারা করে। কিন্তু শুভ্রেন্দুকে নিষেধ করা বা বাধা দেবার মতো জোর আনন্দর নেই। উল্টে বন্ধুর কানে কোনো কথা না যায় এই ভাবনা তার।

কলেজ খুলতে বেহালা নিয়ে শিবপুর চলে গেল। এবারে বাবার মারফৎ কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাকা ব্যবস্থা করেই প্রতি শনিবার শুভ্রেন্দু আনন্দর মেসে চলে আসত আর সোমবার ভোরে চলে যেত। শোহনলাল তখন ওর সব থেকে বুকের কাছের মানুষ বোধহয়। মাসে খুব কম হলেও ষাট সত্তর টাকা করে দিত তাকে। আর আনন্দকে দুদিনের থাকা-খাওয়ার খরচার ঢের বেশিই পুষিয়ে দিত।

অলক্ষ্যে বসে ওপরওলা তখন ওর জীবনের তারে সম্পূর্ণ ভিন্ন মিড় টানছিলেন। এমন এক অনাগত সর্বনাশা প্রলয়ের মুখে ও দাঁড়িয়ে আছে কে জানতো! সেই প্রলয়ের সুর কেউ শোনেনি।

এনজিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বছরের পরীক্ষার জন্য তোড়জোর করে পড়াশুনা শুরু করেছিল শুভ্রেন্দু নন্দী। এদিকে একটা মাস কেটে গেল, কলেজের মাইনে বাকি, বোর্ডিং ফী বাকি কিন্তু বাবার টাকার পাত্তা নেই। না টাকা আসছে না বাবার দেখা মিলছে। বাইরে গিয়ে থাকলে একটা দুটো চিঠি অন্তত পাওয়ার কথা। তাও পাচ্ছে না। জীবনে এ রকম কখনো হয়নি। টাকা প্রতি মাসে বরং সময়ের আগেই এসে গেছে।

চিন্তিত হয়ে বাবার এখানকার আপিসে টেলিফোন করে যে খবর পেল মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার দাখিল। টেলিফোনের ওধারে রমেন্দ্র নন্দীর ছেলে কথা বলছে শুনে আপিসের লোকও অবাক। তাদের বক্তব্য চিফ সেল্স অফিসার রমেন্দ্র নন্দী পনের দিন আগে স্ট্রোক হয়ে তাঁর কলকাতার নিজস্ব বাড়িতে পরিবার-বর্গের সামনেই মারা গেছেন। এর মধ্যেই তাঁরই ছেলে এনজিনিয়ারিং কলেজ থেকে বাবার খবর নিচ্ছে এ কেমন তাজ্জব কথা!

পাগলের কথা শুনল যেন শুভ্রেন্দু নন্দী। আপিসের লোকের ভুল কোথাও হয়েইছে। কিংবা আর কোনো রমেন্দ্র নন্দী হবে। কিন্তু চুপচাপ বসেই বা থাকে কি করে? ভুল হলে টাকাই বা আসছে না

কেন? বাবার কোনো খবর নেই কেন? উদ্বেগে অস্থির হয়ে কলকাতায় ছুটে এলো। আসার সময় বুদ্ধি করে বাবার ফোটোখানা সঙ্গে নিয়ে এলো। বাবার ফটোখানা সর্বদাই তার ঘরের টেবিলে বসানো থাকতো। ফটো সঙ্গে আনার কারণ ভিতরে ভিতরে বাবার জন্য তার বিষম ভয় ধরেছে।

আপিসে খবর নিতে গিয়ে বুকে এক অভাবিত শেলের আঘাত নিয়ে ফিরে এলো। হ্যাঁ ফোটোর ওই লোকই তাদের চিফ সেল্স অফিসার ছিলেন, রমেন্দ্র নন্দী—তিনি কলকাতার নিজের বাসভবনে স্ত্রী এবং দুই ছেলের সামনে স্ট্রোক হয়ে মারা গেছেন। স্ত্রী এবং সেই ছেলেরা রমেন্দ্র নন্দীর প্রাপ্য নেবার ক্লেমও সই করে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে ধূমকেতুর মতো এ ছেলেটা কোত্থেকে এসে নিজেকে রমেন্দ্র নন্দীর ছেলে বলে ঘোষণা করছে আপিসের লোক ভেবে পাচ্ছে না। প্রবঞ্চক কিনা এমন সন্দেহও হয়েছে কারো কারো, কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে আবার তাও মনে হয়নি।

যাই হোক তাদের জেরার কবল থেকে ছাড়া পেয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী রাস্তায় নেমে এসেছে। নির্বাক, বিমূঢ়, কিন্তু বুকের তলায় কি-যেন দুর্বোধ্য যন্ত্রণা। ও কে তাহলে? শুভ্রেন্দু নন্দী কে? ও কি একটা দু:স্বপ্ন দেখছে কিছু? তার এতকালের পরিচয়টা তাহলে কি? রমেন্দ্র নন্দী যদি তার কেউ নয় তাহলে শুভ্রেন্দু নন্দীকে কে চেনে?

ঠিকানা দেখে দেখে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছে—যেটা নাকি রমেন্দ্র নন্দীর নিজস্ব বাড়ি। ছেলেদের কাউকে দেখল না, কে দেখা করতে চায় খবর পেয়ে একজন মহিলা নেমে এলেন। বিধবা। মুখে শোকের ছাপ তখনো। বেশ কমনীয় আর সুন্দর মুখ। কিন্তু আশ্চর্য, ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়েই তাঁর চাউনিটা ধার-ধার হয়ে উঠল কেমন।—কি চাই?

...রমেন্দ্র নন্দী।

তিনি নেই। মারা গেছেন।...তুমি কে?

পকেট থেকে ফোটো বার করল শুভ্রেন্দু। তার হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে তখন। জিজ্ঞাসা করল, এই রমেন্দ্র নন্দীর বাড়ি কিনা এটা এবং তিনিই মারা গেছেন কিনা।

মহিলার সমস্ত মুখ বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেল, চাউনি আরো অকরুণ ধারালো। ফোটোটা একপলক দেখে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? এখানে কেন এসেছ? কে পাঠিয়েছে তোমাকে? কে তুমি?

...আমি নিজেকে রমেন্দ্র নন্দীর ছেলে বলে জানতুম এতকাল। শুভ্রেন্দু জবাব দিল। অপলক চোখে দেখছে তাঁকে।

আর একটি কথাও না বলে ভদ্রমহিলা হন হন করে ভিতরে চলে গেলেন।

শুভ্রেন্দু নন্দী আবার রাস্তায়।

দুর্বোধ্য যন্ত্রণাটা এবারে চোখের সামনে আকার নিয়েছে। যা বোঝবার ওই মহিলাই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। এই দুনিয়া সে এক ভ্রষ্ট আগন্তুক। রমেন্দ্র নন্দী তার জন্মদাতা হতে পারে, কিন্তু তার বেশি আর কেউ নয়, কিছু নয়। কিন্তু তাঁর এতদিনের এত স্নেহ-মমতা ভালবাসা? ওকে নিয়ে বেড়ানো? ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এত উদারতা? এ কেমন করে হয়—কেমন করে হতে পারে?

টলতে টলতে আনন্দর কাছে চলে এসেছে শুভ্রেন্দু নন্দী। অকপটে সবই বলেছে তাকে।

শুনে আনন্দও স্তম্ভিত। মুখে তারও কথা সরেনি একটিও। যা শুনল বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না।

রাতটা তার ওখানেই ছিল। সকালে উঠে আনন্দ দেখে শুভ্রেন্দু নেই।

দিন দুই বাদে তার খোঁজে শিবপুর এসেছে। সেখানে ছাড়া আর কোথাও তার থাকার জায়গা নেই। কিন্তু শুভ্রেন্দু নন্দী সেখানেও নেই। শুনল, গত পরশুই জিনিসপত্র নিয়ে সে হস্টেল ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

শুভ্রেন্দু নন্দী কোথাও যায়নি। যাবার মতো কোনো জায়গা নেই তার। এই কলকাতাতেই খেলেছে, এখানেই কাটিয়েছে। কিন্তু কোনো চেনা মানুষের জগতে আর তাকে দেখা যায় নি। রীতিমতো ভালো ছাত্র ছিল। প্রোফেসররা ভালোবাসত। তাদের কাছে সব খুলে বললে কোনো দরদী হয়তো ওর জন্যে কিছু করতে পারত। বলেনি। নি:শব্দে চলে এসেছে। সে হারিয়ে গেছে।

শুভ্রেন্দু নন্দী তারপর থেকে এই দুনিয়াটাকে ঘৃণা করেছে, অথচ আশ্চর্য, যে মানুষ সব কিছুর জন্যে দায়ী সেই রমেন্দ্র নন্দীকে একদিনের জন্যেও ঘৃণা করতে পারেনি। অদৃষ্ট তাকে আর এক দুনিয়ায় টেনে নিয়ে গেছে। না নিলে জীবন এ-রকম হত না, কোনো খেদ থাকতো না—এটা সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে। জ্ঞান হবার পর থেকে এ-পর্যন্ত দেখে একটা মানুষ সম্পর্কে এত ভুল হতে পারে না। বাবা তাকে ভালো না বেসে পারে না। ওই মহিলাকে মনে পড়েছে। সেখানে বাবার জীবন সুখে কেটেছে এ সে বিশ্বাস করে না। তাই বাবার বিচারও সে করে না।

...কিন্তু তবু যন্ত্রণা। তবু দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা। নিজেকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলে তবে যেন রাগ যায়, বিতৃষ্ণার শেষ হয়।

শৌখিন জামা-কাপড় জিনিস-পত্র অনেক ছিল। বাবা তো সব-কিছুই ঢেলে দিয়েছেন। একে একে সবই বেচতে হয়েছে। কিছু চুরিও গেছে। আগলে রেখেছে একমাত্র ভায়লিনটা। তাই নিয়ে ভিখিরি শিল্পী শোহনলালের কাছে এসেছে। তার কাছেও গোপন করেনি কিছু। শুধু তার কাছেই যেন আশা করেছে কিছু। কিছু নেবার জন্য তার কাছেই হাত বাড়িয়েছে। বলেছে, আর তো আমার টাকা নেই, আর কি তুমি আমাকে শেখাবে?

তার ভিখিরি গুরু হেসে কেঁদে অস্থির। বলেছে, শেখাবো। তোর দিল্ পুড়ছে, কল্‌জে পুড়ছে—তোর মতো বাজনা কে বাজাবে! আমার সবটুকু তোকে দেবো। তুই আমার কাছে থাকবি, যতদিন দরকার আমি তোকে ভিক্ষে করে খাওয়াব। তুই অনেক বড় হবি, এত বড় দিল্ কখনো মিথ্যে হয় রে বোকা?...আর বলেছে, মানুষের জন্মের আবার দাগ থাকে নাকি রে, অমানুষ হলে তবেই দাগ থাকে।

হ্যাঁ, ওই ভিখিরি গুরুর নোঙরা বস্তিতেও রাত কাটিয়েছে মাঝে মাঝে। একবার পেলে আর সহজে ছাড়তে চায়নি। দিনে রাতে অনেকবার করে তার কথাগুলো আওড়েছে মানুষের জন্মের দাগ থাকে না, অমানুষ হলে তবেই দাগ থাকে।

জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু এক অবাঙালী মালিকের মোটর গাড়ি সারাইয়ের কারখানায়।

কিন্তু শুভ্রেন্দু নন্দীর জীবনে সেখানকার নায়ক মালিক নয়, নায়ক তাড়িখোর অকাল বার্ধক্যে কুব্জ মুসলমান মিস্ত্রী রফিক আহমেদ। রাজা আহমেদের বাবা রফিক আহমেদ।

প্রথম ছ'মাস শুধু জলখাবারের বিনিময়ে শিক্ষানবিশির সুযোগ পেয়েছিল শুভ্রেন্দু। কেউ জানে না সেই জলখাবারটুকুই তার চব্বিশ ঘণ্টার রসদ তখন। কারখানার মালিককে জানতে দেয়নি বুঝতে দেয়নি। তবে মাঝে-মাঝে রফিক আহমেদ নিজের খাবারের ভাগ দিত তাকে। সেও না জেনেই দিত। শরীরের বাঁধুনিটা এমনই ছিল যে এতবড় দৈন্যও খানিকটা ঢাকা পড়ে থাকতো। কোনো পয়সাওলা বড়লোকের ছেলে যেন শখ করে এই মেহনতীর কাজ শিখতে এসেছে।

ছ'মাস বাদে মাসে তিরিশ টাকা অর্থাৎ দিনে এক টাকা মাইনে বরাদ্দ হয়েছে তার জন্য। সেই বাজারে আর শুভ্রেন্দুর সেই অবস্থায় তিরিশটা টাকা বড় কম নয়। এও রফিক আহমেদের বিশেষ চেষ্টার ফল। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে ছেলেটাকে এত বেশি কাজ শিখতে দেখে আর তার মাথা দেখে সে অনেক সময় তাজ্জব বনে যেত। একটা এনজিনিয়ারিং পড়া ছেলে এসে এই কাজে লেগেছে এ কি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছে।

কিন্তু বরাবরই কেমন সন্দেহ হয়েছে, এ ভদ্রলোকের ছেলে, কোনো বিপাকে পড়ে এখানে এসেছে, সমস্ত রকম ভাবেই এ ছেলে ওদের থেকে স্বতন্ত্র। কতদিন তাকে ধরে খোঁজাখুঁজি করেছে, তুমি নিশ্চয় ঘরপালানো ছেলে। এত মেহনত না করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও!

অবাঙালী মনিবের চোখে পড়তেও সময় লাগেনি। কে কেমন কাজ করছে সেদিকে তার শাণিত দৃষ্টি। রফিক আহমেদ পাকা কারিগর, কিন্তু ওকে দিয়ে আর কাজ চলছে না। রাতের তাড়ির নেশা ওর সকালেও ভালো করে ভাঙতে চায় না। এর ওপর প্রায়ই জ্বর হয়। পিঠের শিরদাঁড়া দুমড়ে বেঁকে গেছে। অতএব সমস্ত রকমের দায়িত্ব নেবার মতো একটা লোক তার হয়েছে। ছেলেটার সব দিকে চোখ, সমস্ত কাজে সমান মনোযোগ।

এক বছরের মধ্যে শুভ্রেন্দুর মাইনে হয়েছিল একশ টাকা। চাপ দিলে আরো বেশি হতে পারত, কিন্তু শুভ্রেন্দু ওতেই সন্তুষ্ট তখনকার মতো। অবশ্য ভালো কাজ করলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এ আশ্বাসও মনিব তাকে দিয়েছে। ওদিকে রফিক আহমেদও যোগ্য সাগরেদ পেয়ে হাত-পা প্রায় গুটিয়ে ফেলেছে। তার প্রধান কাজ এখন উঠতে বসতে চতুর্থ পক্ষের ছেলে রাজা আহমেদকে ঠেঙানো।

দশ টাকা মাইনের বছর বারো বয়সের ছেলেটাকে এখানে ফাই-ফরমাস খাটার কাজে লাগিয়েছে রফিক আহমেদ। ওর মা রফিককে ছেড়ে চলে গেছে সেই রাগের খানিকটাও ছেলেটার ওপর বর্তেছে। আবার নিজেই বলেছে রফিক আহমেদ, তাড়ির নেশার সময় খিচ খিচ করলে চেলাকাঠ দিয়ে যে মার মারতো বিবিটাকে, সহ্যই বা করবে কি করে। আবারও একটা নিকে করার ইচ্ছে ছিল তার, ওর মতো মিস্ত্রী নাকি একবার হাত বাড়ালে তিনটে মেয়ে ধরে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু শরীরটা ভেঙে পড়ছে বলে আর সে-চেষ্টা করেনি।

বাপের হাতে রাজার পিটুনি খাওয়ার কারণ, কাজে মন নেই ওর একটুও। ও কোনোদিন ভালো মিস্ত্রী হতে পারবে না। তাড়ি খাওয়ার পরে এই শোক আরো বেশি উথলে উঠত। তখন বেধড়ক পিটুনি। ভদ্দরলোকের ছেলের এত কাজে মন আর ওই নবারের বাচ্চা কিনা—ইত্যাদি। ভদ্রলোকের ছেলে বলতে শুভ্রেন্দু নন্দী।

রফিক আহমেদ একেবারে আকাশ থেকে পড়েছিল আর তারপর একেবারে জাপটে-মাপটে ধরেছিল শুভ্রেন্দুর বাজনা শুনে। মালিকের অনুমতি পেয়ে কারখানাতেই থাকতো সে। সংকোচ কাটিয়ে রাতে প্রথম যেদিন বাজাতে বসল, তাড়ি খেয়ে রফিক আহমেদ সেখানেই পড়ে ছিল। হ্যাঁ, তাড়ির নেশাও ছুটে গেছল নাকি তার। পরদিন তাড়ি না খেয়েই বাজনা শুনেছিল। আর তারপর নতুন করে আবার ধরে পড়েছিল, ও কে, কোত্থেকে এসেছে সব বলতে হবে। শুভ্রেন্দু কিছু কিছু বলেছিল। এনজিনিয়ারিং পড়ার কথা বলেছে আর বাবা হঠাৎ চোখ বুজতে এই হাল, বলেছে। শোহনলালের মতো একেও তখন কাছের মানুষ মনে হত শুভ্রেন্দু নন্দীর।

রফিক আহমেদ তখনি মন্তব্য করেছে, তুমি অনেক বড় হবে সুভেন বাবু। বড় হওয়া বলতে ও কি বুঝেছিল শুভ্রেন্দুর ধারণা নেই। বুকের সেই তাপটুকুই বড় জিনিষ মনে হয়েছিল।

কারখানার কাজে বড় হওয়ার দিকে ওই তাকে ঠেলেছে বটে। মালিককে সব বলে ওর আরো মাইনে বাড়িয়েছে। মালিক তার এক কথায় কেন অমন দরাজ হয়ে উঠেছিলেন রফিক আহমেদ তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। একজনের উন্নতির ফলে তার যে দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে জানতো না।

প্রায় তিন বছর ছিল শুভ্রেন্দু সেখানে। রফিক আহমেদের ফুসফুস তখন ঝাঁঝরা, প্রায় বিকল অবস্থা। শুভ্রেন্দুর দুশ্চিন্তার শেষ নেই লোকটার জন্য, কিন্তু রফিক আহমেদ বেপরোয়া। তার শাসনে পড়ে ওষুধ খায়, আবার লুকিয়ে তাড়িও গেলে। রাগারাগি করলে বলে, তাড়ি না খেলে বেহেস্ত্ যে অনেক দূর দূর লাগে সুভেন বাবু—

মালিক ওকে জবাব দিতে চাইলো। শুভ্রেন্দুর কথায় ওকে অনেক টেনেছে, আর পারে না। অনেকদিন ধরেই সেই অবাঙালী মালিক এই মতলব আঁটছিল। বলেছে, ওর ছেলেটা যদি কাজ শেখে তাকে বরং দেখতে রাজী আছে। কিন্তু শুভ্রেন্দু স্পষ্ট জবাব দিয়ে এসেছে তাহলে সে-ও থাকবে না। বলেছে, ও যতদিন বেঁচে আছে তার মাইনের অর্ধেক ওকে দিলে আপত্তি হবে না।

খবরটা কারখানার লোকই রফিককে দিয়ে থাকবে। এমন দিলের মানুষও আছে দুনিয়ায় মূর্খ শ্রমিকদের কাছে এ যেন এক বিস্ময়। তাই বলেছে, আনন্দের চোটে রফিক সেদিন তাড়ি না খেয়ে পারেনি। তারপর রাতে বার বার সেই পুরনো ঘোষণায় ওর কান ঝালাপালা করেছে—অ্যায়সা দিন নহী রহেগা সুভেন বাবু—

তারপর বড় আশ্চর্য প্রস্তাব করেছে একটা রফিক আহমেদ। তার কিছু টাকা আছে। প্রায় দশ টাকা। নিজে কারখানা করবে একদিন এই আশায় তিল তিল করে জমিয়েছে। তাড়ির নেশা না থাকলে টাকা আগে ঢের বেশি জমত। আল্লার নামে শপথ করেছিল নেশা করে ওই জমানো তহবিল ভাঙবে না। কিন্তু কারখানা করা জীবনে আর হল না, অতএব এ টাকা সুভেনবাবুকে নিতে হবে, ওর কারখানা

হবেই একদিন এ সে দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে—এই টাকা তখন লাগবে। বিনিময়ে শুধু রাজা আহমেদকে কাছে টেনে নিতে হবে—তার সমস্ত ভার নিতে হবে।

শুভ্রেন্দু নন্দীকে শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়ে ছেড়েছিল রফিক আহমেদ।

আরো তিন বছর পরের কথা। শুভ্রেন্দু নন্দীর বয়স তখন ঊনত্রিশ পেরুতে চলেছে।

মোড়ের দোকানে দাঁড়িয়ে সস্তা দামের সিগারেট কিনছিলেন ছোট কারখানা নান্‌ডি অটো হাউসের মালিক শুভ্রেন্দু নন্দী। পরনের খাকী ট্রাউজার তেলকালিতে বিবর্ণ, গায়ের ছেঁড়া জালি গেঞ্জির দশাও তাই। এ ছাড়া হাত পা বাহু মুখের অনেকটাই গাড়ির তেল-কালিতে মাখা। এর থেকে আসল মানুষটাকে চিনে নেওয়া ব্যাপার নয়। কারাখনায় যতক্ষণ অবস্থান তার, মুখের এই তেল-কালিও থাকবেই ততক্ষণ। মালিকের এই কর্মময় মূর্তি অনেক খদ্দেরও পছন্দ করত।

আনন্দ চক্রবর্তী পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। কালি-ঝুলি মাখা একটা লেবারার সিগারেট ধরাতে ধরাতে তাঁর দিকে বক্র চোখে চেয়ে আছে সেটুকুই শুধু লক্ষ করেছিলেন। তিনি তখন ভিন্ন জগতের মানুষ, অন্যমনস্কের মতো ভিন্ন জগতেই বিচরণ করছিলেন।

মশাই শুনছেন?

ঘুরে দাঁড়ালেন। ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তাঁকে দেখে একটা লোক বাজে রসিকতার চেষ্টায় এগোচ্ছে মনে হল।

এগিয়ে আসতে আসতে লোকটা বলল, দুমিনিট দয়া করে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেয়ে যান না।

লোফারের ইয়ারকি ধরে নিয়ে আনন্দ চক্রবর্তী ভ্রূকুটিটা আরো জোরালো করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই হাঁ। তখনো চিনে উঠতে পারছেন না, অথচ চেনা-স্মৃতির কোনো একটা অদৃশ্য দড়িতে যেন জোর হ্যাঁচকা টান পড়েছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। আপাদমস্তক দেখলেন। বিস্ফারিত চাউনি। সত্যি দীর্ঘকালের একটা যবনিকা চোখের সামনে উঠতে যাচ্ছে কিনা ভেবে পাচ্ছেন না।

শুভ্রেন্দু?

—জি। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়াগুলো তার মুখের ওপরেই ছাড়লেন শুভ্রেন্দু নন্দী।

কি আশ্চর্য—তুমি এই বেশে এখানে! এর পরেও যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না আনন্দবাবু।

ডেকে অসুবিধে করলাম?

কি যে বলো। আবারো ও মূর্তি একবার না দেখে নিয়ে পারলেন না।

এখানে কাজ-টাজ করছ কিছু?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবুর যদি অপমান না লাগে তো একটু সঙ্গে এলে খুশি হই।

কথা শুনেও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছেন আনন্দ চক্রবর্তী। এই সেই শুভ্রেন্দু নন্দী বিশ্বাস হয় না যেন।—কোথায়? এই কাছেই কাজ করো বুঝি? চলো চলো—কি কাণ্ড, কতকাল বাদে—রাতারাতি হঠাৎ কোথায় যে উবে গেলে একেবারে—। পাশাপাশি চললেন। পুরনো আবেগ ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে অথচ সেই সঙ্গে কোথায় যেন অস্বস্তি একটু। তার পিছনে পিছনে অস্বস্তি চেপে মুখ বুজেই পথটুকু অতিক্রম করলেন।

কারখানার সামনে ছোট সাইন বোর্ডে লেখা 'নান্‌ডি অটো হাউস'। থমকে দাঁড়িয়ে দেখলেন সাইনবোর্ডটা আনন্দবাবু। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিটা যেন কমে এলো একটু। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিজেরই কারখানা নাকি?

ইয়েস সার। আই অ্যাম দ্য সোল প্রোপ্রাইটর, চিফ এনজিনিয়ার, চিফ মেকানিক, চিফ সুপারভাইজার, অ্যান্ড চিফ অফ এভরিথিং। ঘাড় না ফিরিয়ে এবং হাসি চেপে শুভ্রেন্দু নন্দী গড়গড় করে বলে গেলেন।

অদূরে একটা অল্পবয়সী লোক একটা ভাঙা ঝরঝরে গাড়ির সামনে বসে খুব মন দিয়ে লম্বামতো কি একটা পার্টস-এর ওপর ঠুক-ঠাক হাতুড়ি পিটছিল।

এই রাজা! হঠাৎ ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠলেন শুভ্রেন্দু নন্দী।—

ডিফারেনসিয়াল নিয়ে তোকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে কে বলেছে—ওই হাতুড়ি দিয়ে দেবো একেবারে মাথার ঘিলু বার করে?

লোকটা চমকে ফিরে তাকালো, তারপর উঠে অন্য একটা ভাঙা গাড়ির দিকে চলে গেল। শুভ্রেন্দু নন্দী নিজেই একটা টুল এনে সামনে পেতে দিলেন। তারপর সোজাসুজি এই প্রথম তাকালেন আনন্দ চক্রবর্তীর মুখের ওপর।—বসার সময় হবে?

আনন্দ চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন। ঢোক গিলে হাসতে চেষ্টা করে বললেন, তোমার ধরন-ধারণ বদলেছে দেখছি—ও কি, মাটিতে বসলে যে! আর একটা কিছু—

ব্যস্ত হয়ো না বন্ধু, আমার বেশ দেখছ না, আপাতত এটাই যোগ্য আসন, একটু বাদে তো ওই গাড়ির নিচে ঢুকব। তারপর বলো, সাহিত্য চলছে?

ওই কুকর্মটুকুই চলছে কেবল।

টান হয়ে বসে শুভ্রেন্দু নন্দী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, অনেক দিন তো হয়ে গেল—বই-টই ছেপেছ কিছু?

দ্বিধান্বিত হাসি মুখে আনন্দ চক্রবর্তী জবাব দিলেন, খানদশেক ছাপা হয়েছে, দুটো প্রেসে আছে...তাছাড়া একটা বইয়ের তো ছবিও হয়ে গেছে...

—বলো কি হে! সত্যি! যথার্থই খুশি। আর একটু কাছে এগিয়ে এলেন।—এ গ্রেট ম্যান দেন—অ্যাঁ?

আনন্দ চক্রবর্তীও হাসছেন। বন্ধুকে জানাতে ভালো লাগছে কারণ একসময় তাঁর সাহিত্যের প্রতি এর দরদ ছিল।...কিন্তু সেই মানুষকেই বলছেন কিনা জানেন না। জানার আগ্রহ, জানার লোভ। কিন্তু এই মূর্তি থেকে আসল মানুষটাকে বোঝার উপায় নেই।

শুভ্রেন্দু মুখের দিকে চেয়ে আছেন। তিনিও সেই পুরনো বন্ধুকেই খুঁজছেন বোধ হয়।—বিয়ে করেছ?

মাথা নাড়লেন।—একটা ছেলেও আছে।

বউ সুন্দরী?

হেসে জবাব দিলেন, নিজেই একদিন দেখবে এসো। বলার পর ভিতরে ভিতরে কেন যে একটু বিব্রত বোধ করলেন জানেন না। এতগুলো বছরের ব্যবধান চট করে যেন ঘুচতে চাইছে না।

রাজা আহমেদ দুহাতে দুভাঁড় চা এনে সামনে ধরল। হাত বাড়িয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী একটা ভাঁড় নিলেন, তারপর ওকে ধমকে উঠলেন, ব্যাটা মুখখু, ওখানে এই চা চলবে কিনা দেখে বুঝছিস না? ভাগ্!

রাজা আহমেদ সেই ভাঁড় নিয়ে প্রস্থান করল। আনন্দ চক্রবর্তী তাকে ফিরে ডাকতে পারলেন না। কিন্তু মুখে একটু জোর দিয়ে বললেন, এতকাল বাদে দেখা অথচ তুমি আমাকে এ-ভাবে ঠাসছ কেন সেই থেকে...কোনো দোষ করেছি?

ভাঁড় হাতে শুভ্রেন্দু নন্দী সকৌতুকে চেয়ে রইলেন একটু। কালিমাখা মুখখানা একটু যেন কোমল হল। বললেন, না—আমারই স্বভাব খারাপ হয়েছে। কত যে খারাপ হয়েছে সেটা এরপর যদি মাঝে মাঝে দেখা হয়, বুঝতে পারবে।

দেখা হয়েছে। বাড়িতে আসতে বলা সত্ত্বেও শুভ্রেন্দু নন্দী আসেনি। অথচ তাঁকে আনার জন্য আনন্দ চক্রবর্তী খুব একটা জোর জুলুম করতে পারেননি। কোথায় একটা অদৃশ্য বাধা। আগের মতো সহজ হবার জন্যে উন্মুখ, অথচ হয়ে উঠতে পারেন না। এই না পারাটা নিজের বিবেকে লাগে। বন্ধুকে বাড়ি আসার কথা মাঝে মাঝেই বলেন অবশ্য। শুভ্রেন্দু নন্দী বলেন, সময় হয়নি, আর সময়ও পাইনে তবে একবার যখন যাওয়া শুরু করব তখন তাড়াতে চাইবে।

তিনি কারখানায় আসেন মাঝে মাঝে। কতদিন গাড়ির নীচে শুয়ে বন্ধুকে কাজ করতে দেখেছেন। সেই অবস্থাতেই সামনে বসে গল্প করেছেন। ওই কর্মদৃপ্ত মূর্তি দেখে ক্রমে আবার একটা আকর্ষণ

অনুভব করেছেন তিনি। কারখানার দ্রুত ভোল বদলাচ্ছে দিন বদলাচ্ছে তাও অনুভব করেছেন। কাজ বাড়ছে, লোক বাড়ছে। কিন্তু বন্ধুর কাজের নিবিষ্টতার কোনোরকম ছেদ নেই।

দুবছর পরে একদিন।

আনন্দবাবু লিখছিলেন। স্ত্রী এসে বললেন, সুন্দর গাড়ি চেপে কে যেন এলেন তোমার কাছে। মনে মনে স্ত্রীটি আশা করেছিলেন, কোনো ছবির প্রযোজক হবে বোধহয়।

এসেছেন শুভ্রেন্দু নন্দী।

এ আর এক মূর্তি। হ্যাঁ, এই মূর্তিতে সেই আগের মানুষকে অনেকখানি চেনা যায়। ফিটফাট বেশবাস। পুরুষকারের অভিব্যক্তি।

আনন্দ চক্রবর্তী হৈ-হৈ করে উঠলেন। পরিচয় পর্বের পরে তাঁর স্ত্রীও অনুযোগ করলেন, কত দিন ধরে আপনার কথা শুনছি, এতদিনে সময় হল?

হাসি মাখা দুই চোখ মেলে শুভ্রেন্দু নন্দী খুঁটিয়ে দেখে নিলেন তাঁকে। এ-রকম ভাবে দেখলে যে-কোনো মহিলার অস্বস্তি বোধ করার কথা। জবাব দিলেন, নিজের এই বোকামির জন্যে বড় আফশোস হচ্ছে ম্যাডাম। আই অ্যাম সরি ফর মাইসেলফ।

মনের তলায় কেন যে আবার একটু বিড়ম্বনার আঁচড় পড়ল আনন্দ চক্রবর্তী জানেন না। এই গোছের নিখাদ সরলতার পিছনে অনেকখানি বিশ্বাসের প্রশ্ন।...একদিন দুরন্ত বেপরোয়া ছিল যে ছেলেটা, মাঝের এতগুলো অজ্ঞাত বছরের অন্ধকার ঠেলে তার ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন না বলেও হতে পারে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ছিলেন সেদিন শুভ্রেন্দু নন্দী তাঁর বাড়িতে। অনেক গল্প করেছেন, আর চলে আসার সময় বলে গেছেন তাঁর নতুন বাড়ি হয়েছে, অবিলম্বে সস্ত্রীক সেখানে না গেলে সম্পর্ক থাকবে না। আসার দিন তারিখ সময়ও ঘোষণা করে গেছেন।

চলে যেতে স্ত্রী খুশি হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, একটা মানুষের মতো মানুষ মনে হয়—আমি তো ভাবতেই পারিনি এ-রকম লোক তোমার এই বন্ধু! আনন্দ চক্রবর্তী জবাব দেননি। স্ত্রীর প্রশংসারত মুখখানা লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। আর মনে মনে একটু যেন নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন, পিছনের গ্লানির অধ্যায়টা স্ত্রীও তাঁর মুখে শুনেছেন, কিন্তু বন্ধু যতক্ষণ ছিল সে প্রসঙ্গ হয়তো তাঁর মনেও পড়েনি। মনে মনে তাই আশা করছেন আনন্দ চক্রবর্তী, বন্ধুরও সুন্দর ঘর হবে একদিন, আর যে আসবে পুরুষকারে দৃপ্ত ও মানুষটাকে নিয়েই খুশি হবে হয়তো—সব জানলেও পিছনের ওই গ্লানির অধ্যায় নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

সেই দিন তারিখ সময় মেনে নিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দীর বাড়িতে দুজনেই এসেছেন। সুন্দর ছোট্ট বাড়ি। পরিমিত আসবাব ছবির মতো সাজানো। দুজনে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, মালিকের রুচির প্রশংসা করলেন। আনন্দবাবুর স্ত্রী বললেন, এবারে বাকি কাজটুকু সেরে ফেলুন, গৃহিণী নিয়ে আসুন;

হাসি-মাখা চাউনি শুভ্রেন্দু নন্দীর। জবাব দিলেন, বড় দেরিতে দেখা হল যে ম্যাডাম, তবু এখনো রাজী আছি, ওটাকে বাতিল করে চলে এসো না!

স্ত্রীটি থতমত খেলেন। আনন্দ চক্রবর্তীও যেন ধাক্কা খেলেন একটু। তাঁর কেমন মনে হল, ঠাট্টা বটে, কিন্তু এই লোক ইচ্ছে করলে যে-কোনো বাঞ্ছিতজনকে টেনে নিয়ে আসতে পারে বোধ হয়। হা-হা শব্দে হেসেই উঠলেন তিনি।

তাঁর স্ত্রী মাত্র দুদিনের আলাপে এরকম অভ্যর্থনা বা সম্ভাষণে অভ্যস্ত নন, তবু হেসেই ফেললেন।—আপনি খুব সাংঘাতিক লোক তো!

খুব সাংঘাতিক। অমায়িক মুখে সায় দিলেন শুভ্রেন্দু নন্দী, সময় সময় নিজেও আমি নিজেকে ভয় করি ম্যাডাম। আই ফিয়ার মি বিকজ্ আই ফিয়ার হিম নট্—হিম বলতে তোমাদের ভগবানকে।

কথাটা আনন্দ চক্রবর্তীর কানে লেগে থাকলো মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি পেশা বলেই বোধ হয়। অদ্ভুত লোকটার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর স্ত্রী কি দেখলেন, জানেন না।

পাশের দিকের ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সকলে। বাড়ির পরেই রাস্তা, রাস্তার ওধারে অনেকটা ফাঁকা জমি, রাস্তাটা ওই জমি বেষ্টন করে দূরের একটা বাড়ির পাশ ঘেঁষে গেছে। দুটো বাড়ির মাঝে ওই ফাঁকা জমি সংলগ্ন বাড়ির দিকে চেয়ে আনন্দ চক্রবর্তী উৎফুল্ল হঠাৎ। স্ত্রীকে ঘন ঘন আঙুলের ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, আরে এখানে তো আমরা এসেছি আরো—ওটা সুমিত্র দেবের বাড়ি না?

বাড়িটা লক্ষ্য করে মহিলা বিস্ময়সূচক আবেগ দমন করে মন্তব্য করলেন তাই তো ...!

নিঃশব্দে আর এক মানুষের ভিতরে ভিতরে কি প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল দুজনের কল্পনার বাইরে। সেই অল্পক্ষণের জন্য দুজনের কারোই তাঁর দিকে লক্ষ্য ছিল না। পিছন থেকে শুভ্রেন্দু নন্দী বললেন, ওটা তো কোনো বোসেদের বাড়ি শুনেছিলাম—

আনন্দবাবু সায় দিয়ে জানালেন, তাই। ...ও বাড়িরই একটি মহিলা সুমিত্রা দেব, সেই দেবটি ছিলেন মিলিটারি অফিসার, বছর চারেক আগে যুদ্ধ বীর হিসেবে তিনি দেবলোকে পাড়ি দিয়েছেন—মহিলা বাপের বাড়িতেই থাকেন।

বন্ধুর মুখখানা হঠাৎ অত গম্ভীর হয়ে গেল কেন আনন্দ চক্রবর্তী অথবা তাঁর স্ত্রী ঠাওর করে উঠতে পারলেন না। কিন্তু ভদ্রমহিলার মনে তখন আরো কিছু রসালো প্রসঙ্গ উদয় হয়েছে। স্বামীর দিকে চেয়ে হেসে টিপ্পনী কাটলেন, আরো একটু বলো? এইখানেই শেষ করলে যে বড়ো—

আনন্দবাবু জবাব দিলেন, সেটা তোমার মাথা ঘামানোর ব্যাপার, তুমি বলবে।

শুভ্রেন্দু নন্দী মাঠের ওধারের ওই বাড়িটার দিকেই চেয়ে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি?

আনন্দবাবু হাসিমুখে বললেন, ওই মহিলা মানে সুমিত্রা দেব আমার একটু ভক্ত, আমার লেখা তাঁর ভালো লাগে। তাই মাঝে মাঝে বাড়ি আসেন, আলোচনা করেন, এবারে ক্লাবের থিয়েটারে আমার একটা গল্প অভিনয় করা হবে স্থির করে ফেলেছেন— কিন্তু আমার স্ত্রীর ধারণা আসলে উনি আমারই ভক্ত—লেখা-টেখার নয়। আমার বই থিয়েটার করছেন শোনার পর ধারণাটা আরো পেকে উঠছে।

আনন্দর স্ত্রী প্রতিবাদ করলেন, ধারণা কি রকম? খাঁটি সত্যি। শুভ্রেন্দুর দিকে ফিরলেন, বুঝলেন—আমি ওই মহিলার একেবারে চক্ষুশূল যাকে বলে—হাব ভাবে অনেক কিছু বুঝিয়ে ছাড়েন—এতবড় একটা লেখকের কিনা এমন একটা ভোঁতা বউ—ইংরেজি সাহিত্য পড়ে না, ইংরেজি কবিতা পড়ে না—এমন কি ছাপা হবার আগে স্বামীর লেখার ম্যানাস্ক্রিপ্ট্ পর্যন্ত পড়ে না শুনে তো মুখের দিকে চেয়ে যেন চিড়িয়াখানার জীব দেখছিলেন একদিন। স্বামীর মুখের ওপরে একটা তির্যক কটাক্ষ হেনে বললেন, আপনার মুখোমুখি বাড়ি যখন, আপনি মশাই মহিলার চোখ দুটো ওর দিক থেকে সরিয়ে নিজের দিকে টানুন তো! হেসে উঠলেন, বেশ সুন্দরী কিন্তু, ঠকবেন না।

জবাব না দিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী হাসি মুখেই ঘরে ঢুকে গেলেন। এই প্রসঙ্গ ওঠার পর থেকে তাঁর হাবভাবের পরিবর্তনটুকু এদের কারো চোখে পড়ল না।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল তখন। চা জলখাবারের পাট চুকতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হল। অতিথিদের সঙ্গে করে শুভ্রেন্দু সামনের ছোট ঘরটায় এলেন। সেখানে ছোট্ট একটা চৌকি পাতা, তার ওপর সুন্দর গালচে বিছানো। চৌকির ওপর ভায়লিনের বাক্স। এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই কেমন মনে হয় সমস্ত বাড়ির মধ্যে এই ঘরটাই গৃহস্বামীর সব থেকে বেশি প্রিয়।

ঘরের সামনে জানালা। জানালাটা খুললেই মাঠের সেই বাড়ি—যে বাড়িতে আনন্দ চক্রবর্তীর ভক্ত সুমিত্রা দেব থাকেন। জানালা খোলা থাকলেও আবছা অন্ধকারে অতিথিদের সেদিকে চোখ গেল না।

ভায়লিন দেখেই আনন্দবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, এ-পাট এখনো রেখেছ নাকি? সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষের মুখ মনে পড়েছে তাঁর।—সেই শোহনলালের সঙ্গে আর দেখা হয়?

সপ্তাহে একদিন করে দেখা হয়।

ওই হোটেলটার সামনে বসে এখনো?

হ্যাঁ, যত টাকাই পাক, ওখানে না বসলে তার ভাত হজম হয় না। বলতে বলতে চৌকিতে বসে বাক্স থেকে ভায়লিনটা বার করলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। পিছনের মোটা তাকিয়া ঠেস দিলেন।

বেশ আগ্রহ নিয়েই আনন্দবাবু তাঁর গৃহিণী শুনতে বসলেন। এই বাজনার গল্পও মহিলার শোনা ছিল।

চোখ বুজে ভায়লিনে একটু ছড়ি ঘসে টানা কয়েকটা শব্দ বার করলেন শুভ্রেন্দু নন্দী, তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন।

বাজনা শুরু হল। কোনো ইংলিশ মিউজিক হবে। কতগুলো বিচিত্র সুরের বড় একটা ঝড় যেন আত্মসংহারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে। তার অনুরণন কানের ভিতর দিকে বুকের ভিতরে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। বোঝা যাক না যাক স্তব্ধ বিস্ময়ে শোনার মতো। স্থান কাল ভুলেছেন আনন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী।

আধঘণ্টা বাদে বাজনা থামল। ছোট্ট ঘরখানা যেন সুরে সুরে ভরাট।

আলো না জ্বেলে বন্ধুর উদ্দেশ্যে ভারী গলায় শুভ্রেন্দু নন্দী বললেন, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও, তোমার ভক্ত সুমিত্রা দেবকে তাদের সামনের বারান্দায় দেখা যায় কিনা দেখো। অবশ্য তিনি এ-সময় বাড়ি থাকলে তবেই তোমার আশ মিটতে পারে।

হঠাৎ এ-রকম একটা কথা শুনে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অবাক। সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে তাকালেন, কিন্তু এখান দিয়ে সামনের বারান্দা চোখে পড়ে না। একসঙ্গেই চৌকি ছেড়ে উঠলেন দুজনে। আনন্দবাবু পাশের বারান্দায় গেলেন, পিছনে তাঁর স্ত্রী। মিনিট দুইয়ের মধ্যে দুজনেই ফিরে এলেন, আনন্দ চক্রবর্তী মুখ খোলার আগে উৎফুল্ল বিস্ময়ে মহিলা বলে উঠলেন, সত্যিই তো দাঁড়িয়ে আছে! অন্ধকারে ভালো মুখ দেখা গেল না, আমরা গিয়ে দাঁড়াতে ঘরে চলে গেল, ঘরের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম সুমিত্রা দেব!

অন্ধকারে বেহালা রেখে শুভ্রেন্দু নন্দী পাশের ঘরে চলে এলেন। হাসছেন অল্প অল্প। পিছনে বাকি দুজনও হাজির। আনন্দ চক্রবর্তী ছদ্মগাম্ভীর্যে ভুরু কুঁচকে বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছেন বন্ধুকে। তাঁর মিসেসটির আর ধৈর্য থাকলো না।—ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন নাকি! কি ব্যাপার মশাই?

শুভ্রেন্দু নন্দী সাদাসিধে জবাব দিলেন, কি আর—সুমিত্রা দেব শুধু আনন্দের ভক্ত নন সেটা তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম। এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত তো।

সে-কথা কানে না তুলে আনন্দবাবুর স্ত্রীটি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি রোজ আপনার বাজনা শোনেন?

শোনেন।

আনন্দবাবু বললেন, কিন্তু এ-সময় তো প্রায়ই ক্লাবে থাকেন তিনি! আজ তুমি বাজনা শোনানোর জন্যে ঘরে আছ জানতেন নাকি?

আমি রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটার আগে বাজাইনে। এক আধ দিন মাঝ রাতেও বাজাই, তখনো ঘুম ভেঙে তাঁকে বারান্দায় উঠে আসতে দেখেছি।

আনন্দ গৃহিণী দ্বিগুণ উৎসুক।—বাজনা শেষ করেই উঠে এসে দেখে নেন বুঝি? আলাপ হয়েছে তো?

শুভ্রেন্দু মৃদু হেসে আর সেই সঙ্গে অল্প অল্প মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, এখন পর্যন্ত ভাবালাপ চলছে।

কি রকম?

আমি বাজনা নিয়ে বসলে উনি বারান্দায় এসে দাঁড়ান। এটা প্রায় একটা নিয়মের মধ্যে বলতে পারো। এছাড়া সকালে কারখানায় বেরুবার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন—ফেরার সময়ও মাঝে মাঝে দেখি। তিনি দেখেন, আমিও দেখি। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলে আমিও তাই করি।

মহিলা বললেন, আপনি কোনো কাজের নন মশাই, চলুন এক্ষুনি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। তাঁর তর সয় না যেন, স্বামীর দিকে ফিরলেন, কি বলো, যাবে?

আনন্দবাবু বললেন, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ও নিজে আলাপ করেনি কেন?

বন্ধুর দিকে ফিরলেন, কি হে, বলবে কিছু না মুখ সেলাই করে থাকবে? তোমার স্বভাব আমি জানি বলেই এত সংযমের কারণটা জিজ্ঞাসা করছি। এ-রকম তপস্বীটির মতো ভাবালাপে খুশি থাকার মেজাজ তো তোমার নয়—গো অন্, কুইক!

শুভ্রেন্দু মাথা নাড়লেন, আজ আর কোনো কথা নয়। তার দিকে ফিরলেন।—ম্যাডাম তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, চোখ টানার কাজ আমার ছমাস আগে সারা এবং আনন্দরও মন্দ কপাল। শুধু মন্দ নয়, তুমিও এই তপস্বীটির নজরে পড়ে যাওয়ার ফলে ডবল মন্দ কিনা জানি না।

যাবার আগে বন্ধুকে আড়ালে বলে দিলেন, কাল কারখানায় এসো, কথা আছে।

আনন্দ চক্রবর্তী পরদিন দুপুরের নিরিবিলিতে হাজির। কারখানা তখন এত বড়োটা হয়নি, বড়ো হওয়ার প্রতিশ্রুতিটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অবশ্য।

তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের ফুরসৎ দিচ্ছেন না শুভ্রেন্দু। ঘরে এনে বসিয়ে এবং মুখোমুখি নিজে বসেই প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন, সুমিত্রা দেবকে কতদিন জানো?

আনন্দ চক্রবর্তী তক্ষুনি বুঝে নিলেন, কোন প্রসঙ্গ বিস্তারের তাড়নায় তাঁকে আসতে বলা হয়েছিল। জবাব দিলেন, তা বেশ কয়েক বছর হবে।

শুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, কি রকম ভক্ত তিনি তোমার—মানে তোমার স্ত্রী যা বললেন কাল, তার মধ্যে সত্য আছে? বন্ধুর মুখে পলকা চপলতার চিহ্ন নেই।

পাগল! হাসতে লাগলেন, পুরুষদের একটু নেড়ে দেখার স্বভাব আছে বটে মহিলার—সে-জন্যই আমার স্ত্রীর ও-রকম ঠাট্টা—কিন্তু সব-দিক বিবেচনা করলে আমি সেটা খুব দোষের দেখি না—পুরুষ মানুষের ওপর সুমিত্রা দেবের কিছু আক্রোশ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

কি রকম?

অতঃপর কান পেতে শুনতে গেলেন, কি-রকম।

সুমিত্রা বোস নিজে পছন্দমতো বিয়ে করে সুমিত্রা দেব হয়েছিলেন। ওই বোস বাড়িটা ভয়ানক কনজারভেটিভ--তাঁর মা আর বড়ো দাদা খুব পুজো আহ্নিক করেন। এই গোছের বিয়েতে তাঁদের তেমন মত ছিল না। যাই হোক, বাধাও দেয়নি কেউ। কিন্তু সুমিত্রার সঙ্গেই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তার মিলিটারি অফিসার স্বামীর প্রচণ্ড মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেল। তার প্রধান কারণ প্রবাসে কর্মক্ষেত্রে মিলিটারি অফিসারদের সামাজিক জীবনযাত্রা। সুমিত্রার ধারণা জন্মে-গেল, কাজের বাইরে এরা একেবারে ভিন্ন মানুষ। কেবল পার্টি আর মদ আর ফাঁক পেলে এক অফিসারের অন্য অফিসারের বউয়ের সঙ্গে বিতিকিচ্ছিরি দহরম-মহরম। সুমিত্রার স্বামী জোর করে তাঁকে মদ ধরিয়েছিল। আর বিদেশে নিজেকে আগলে রাখতে প্রাণান্ত অবস্থা হয়েছিল তাঁর। কিন্তু স্বামী সে-সব শুনলে হাসে, বলে, মেলামেশা করো না—কি আছে এতে। সে নিজেও এই মেলামেশার বাড়াবাড়ি কম করে না, বিশেষ করে অবাঙালি অফিসারদের বউদের সঙ্গে। ফলে তাদের স্বামীরাও ওঁর দিকে বড়ো বেশি ঘেঁষতে চায়। একবার এক মস্ত সুপিরিয়র অফিসার এসেছিলেন। বেশ কিছু দিন ছিলেন সেখানে। আধবয়সী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। সকলে তাঁর তোয়াজ তোষামোদে শশব্যস্ত। সুমিত্রা বুঝেছিলেন ওই ওপরওয়ালাটির বিশেষ অন্তরঙ্গ দৃষ্টি তাঁরই দিকে। সেটা টের পেয়ে তাঁর স্বামীর ভারী আনন্দ। এক পার্টিতে তিন মিনিট 'লাইট অফ'-এর খুশির মহড়া ছিল। সেই অন্ধকারে বাঘের মতো কে তাঁর আষ্টেপৃষ্ঠে দখল নিয়েছিল সেটা বুঝতে বাকি থাকেনি।

...জোর করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সে কি প্রাণান্ত চেষ্টা সুমিত্রার। মাত্র তিনটে মিনিটের মধ্যে পুরুষ কতবড় লম্পট দস্যু হয়ে উঠতে পারে ধারণা ছিল না। নখ-দন্তে ওঁর সমস্ত মুখ বিদীর্ণ করার জন্য যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল লোকটা। ওই তিনটে মিনিটের মধ্যেই আরো কি ঘটে যেতে পারত কে জানে। তাঁর হাতের মুঠোয় একগোছা দাড়ি উপড়ে উঠে আসতে তবে মুক্তি পেয়েছিলেন।

আলো জ্বলার পর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে দেখেন প্রায় দশ গজ দূরের এক সোফায় বসে আছে স্বামীর সেই পাঞ্জাবী ওপরওয়ালা। দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে আর ওঁকেই দেখছে। চাউনিটা প্রসন্ন নয় আদৌ।

সুমিত্রা আর একমুহূর্তও অবস্থান করতে চাননি সেখানে। বাড়ি ফেরার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। ছোকরা অফিসাররা সব হাঁ-হাঁ করে এগিয়ে এসেছে। তাদের পিছনে সেই পাঞ্জাবী অফিসার। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করেছেন, কি হল ম্যাডাম, শরীর অসুস্থ বোধ করছ নাকি?

জবাবে সুমিত্রা তার মুখের ওপর নিজের চোখের এক পশলা আগুন ছড়িয়েছেন।

পরদিন কাজ থেকে ফিরে থমথমে মুখে স্বামী ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাল রাতের পার্টিতে তুমি আমাদের কম্যান্ডিং অফিসারকে অপমান করেছ?

সুমিত্রা ঝলসে উঠেছেন।—সে কি করেছে সে খবর নেবার দরকার নেই—না?

না! স্বামীর সাফ জবাব, এ লাইনের লোকের স্ত্রীদের অত সামান্যয় গায়ে ফোসকা পড়লে চলে না, বুঝলে? আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছি, তুমিও ক্ষমা চাইবে, আজ রাতেই তোমাকে নিয়ে যাব কথা দিয়েছি।

ব্যস, সেই বিকেলেই সুমিত্রা কলকাতায় চলে এসেছেন। একলা কলকাতায় এসে স্বামীকে আলটিমেটাম দিয়েছিলেন, স্ত্রীকে পেতে হলে যে-ভাবে হোক ওই চাকরি ছেড়ে আসতে হবে। তিনি আসেননি। উল্টে যাচ্ছেতাই করে শাসিয়েছেন। এক বছরের মধ্যে সেই স্বামী যুদ্ধে মারা যান। কাগজে তাঁর বীরত্বের কথা ছাপা হয়েছিল, ছবিও বেরিয়েছিল। কিন্তু সুমিত্রা তার পরেও তাঁকে ঘৃণাই করেছেন। শ্বশুরবাড়ির মানুষেরাও আর তাঁর সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখেনি। রাখতে চাইলেও সুমিত্রা তাঁদের ছেটেই দিতেন।

শুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করেছেন, এসব কথা সুমিত্রা নিজে তোমাকে বলেছেন?

হ্যাঁ, এ-সব বলতে তাঁর অত সঙ্কোচ নেই, আমাকে খোলাখুলি সব বলে তিনি চেয়েছেন, মিলিটারি অফিসারের চরিত্রের মুখোশ খুলে দেবার মতো আমি যেন কিছু লিখি। ওঁর কাছ থেকে নরমগরম তথ্য পেয়ে লিখেছিও কিছু, আর ওই জন্যেই তিনি এত খুশি আমার ওপর। তাঁর মতে বাংলাদেশে একজনই আছে, যে এই সব নোঙরামি ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করতে পারে—সে আনন্দ চক্রবর্তী।

তারপর।

আনন্দবাবু হেসে জবাব দিলেন, তারপর আর কি—ক্লাব-ট্রাব নিয়ে আছেন। মেয়েও কম জোটেনি সেখানে,ফলে পয়সাওলা লোকের আনাগোনা খুব। সেটা বরদাস্ত করতে খুব অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হয় না।

চুপচাপ খানিক তাঁর মুখখানাই পর্যবেক্ষণ করে শুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, ওই পয়সাওলাদের কাউকে মনে ধরেনি এ পর্যন্ত?

আনন্দ চক্রবর্তী দ্বিধান্বিত একটু। তারপর বলেই ফেললেন, মনে এ পর্যন্ত অনেককেই ধরেছে, অন্তত আমাদের সেই রকমই ধারণা, কিন্তু ফল তো কিছু দেখি না...আর আশ্চর্য কি জানো, বাঙালির মধ্যে একমাত্র আমাকেই যা একটু-আধটু পছন্দ করে—নইলে দেবীটির অন্তরঙ্গ মেলামেশা বেশির ভাগ অবাঙালীর সঙ্গে। মোহন ভাট তো ওঁর জন্য ক্ষেপে উঠেছিল, আয়েঙ্গার দিনকতক স্বপ্ন দেখে বেড়ালো—আর এই কিছুদিন হল সব থেকে বেশি ঘা খেয়েছে কাপুর, এরা সকলেই পয়সাওলা লোক, তার মধ্যে কাপুরকে মিলিয়নেয়ার বলতে পারো, আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যা হবার ওর সঙ্গেই হয়ে গেল, নিজের স্ত্রীকে কাপুর ডিভোর্স করে-করে—কিন্তু তারপর হঠাৎ কি করে ভেস্তে গেল জানি না, বুক ঠাণ্ডা করতে লোকটা আপাতত লন্ডনে উড়ে গেছে।

শুভ্রেন্দু নন্দী জিজ্ঞাসা করলেন, এসব খবরই বা তোমাকে কে দিলে—তিনি নিজেই?

—তুমি যে জেরা শুরু করে দিলে দেখছি। আনন্দবাবু হাসলেন, ক্লাবে আমাকে আর আমার স্ত্রীকে মহিলা মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে যায়—এ-সব সুসমাচার আপনিই কানে আসে, তাছাড়া মহিলারও মনে মুখে লাগাম নেই খুব, নিজেই হড়বড় করে অনেক কথা বলেন আর হাসেন।

শুভ্রেন্দু নন্দী চুপচাপ ভাবলেন একটু তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তো মনস্তত্ত্ব টনস্তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো, হোয়াট্স্ দি রং উইথ হার?

আনন্দবাবু জবাব দিলেন, অনেক ভেবেছি কিন্তু খুব একটা হদিশ পেয়েছি মনে হয় না।...এক হতে পারে ওদের পরিবার ভয়ানক রক্ষণশীল, মেয়ের চালচলন বাড়ির কেউ পছন্দ করেন না, বাপের উইলের জোরে দুখানা ঘর নিয়ে আছেন মহিলা...হতে পারে নিজের ভিতরেও একটুখানি বংশগত সংস্কার আছে, যা শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। স্বামীর অভাবে ঘনিষ্ঠভাবে কারো সঙ্গে মেলামেশা করাটা হুট করে তাদের ঘরণী হয়ে বসার মতো ঝামেলার ব্যাপার নয়।

শুভ্রেন্দু নন্দী মাথা নাড়লেন, আই ডোন্ট থিংক্ সো। দেয়ার আর রিজনস্...

আনন্দ চক্রবর্তী বললেন, আরো একটা কারণ থাকতে পারে অবশ্য, আর সেটাই বেশি সম্ভব।...ওঁর স্বামীর ব্যাপারটা একটা রোগের মতো মাথায় থেকেই গেছে হয়তো, সেই শোধ নিচ্ছে। পুরুষদের যতটা সম্ভব এগিয়ে দিয়ে তারপর ছটফটানি দেখে, এমনও হতে পারে।...আর সেই জন্যেই বলছি, তুমিও ঘায়েল হবার জন্য পা বাড়াচ্ছ সেটা আমার খুব পছন্দ হচ্ছে না।

শুভ্রেন্দু নন্দী ঠাট্টার জবাব দিলেন না। শেষের এই কারণটা অনেকখানি সম্ভব মনে হল তাঁর। বললেন, আমি পা বাড়াব কি বাড়াব না সেটা পরের কথা, তুমি আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করে দাও তো।

—একদিনে ক্লাবে গেলেই হয়।

শুভ্রেন্দু মাথা নাড়লেন, না ক্লাবে না। তোমার বাড়িতে অ্যারেঞ্জ করো।

গত চার মাসের একটানা একটা নীরব প্রহসন নিঃশব্দে কোন স্তরে পৌঁছেছে আনন্দ চক্রবর্তীর ধারণা নেই। হোটেল ছেড়ে শুভ্রেন্দু নন্দী মোটা টাকার এই নতুন বাড়িটাতে উঠে এসেছেন যখন, তখনো বাড়ির সমস্ত কাজ শেষ হয়নি। সেখানে তাঁর বাজনামুগ্ধ এক বিবাহিতা বিদেশিনির ভাবাবেগে অতিষ্ঠ হয়েই এই বাড়িটা ভালোরকম সম্পূর্ণ হবার আগেই চলে এসেছিলেন।

সেই বিদেশিনিও এক বিচিত্র চরিত্রের মেয়ে। আসলে মাথাই খারাপ মেয়েটার, কিন্তু বেশ মাজাদার গোছের খারাপ। বছর বত্রিশ বয়েস। নাম রোসেলিন। দীর্ঘাঙ্গী এবং একটু বেশি মাত্রায় সবল মেয়ে। গায়ের রং তামাটে। বেশ সুশ্রী মুখ আর কালো টানা চোখ। সেই টানা চোখের কোণ দিয়ে পুরুষকে যাচাই বাছাই করে। স্বামীর নাম জিম ব্যাডকক। দশাসই চেহারার পুরুষ। দশ আর আট বছরের একটা ছেলে একটা মেয়ে তাদের। রাগ হলেই বা মেজাজ বিগড়ালে ওদের মা মনের সাধে পেটে ছেলে-মেয়ে দুটোকে। কিন্তু পেটার আগে আগলাতে না পারলে ছেলে-মেয়ে দুটো শুভ্রেন্দুর ফ্ল্যাটে পালিয়ে আসে। রোসেলিন সেখানেও তাড়া করে ওদের। শুভ্রেন্দু বাধা দিলে তার ওপরেও মারমুখী হয়। স্বামীটি কোন এক বড়ো ফ্যাক্টরির চিফ ফোরম্যান। মোটা মাইনে পায়। তবু ওদের অভাব লেগেই আছে, কারণ সন্ধ্যার পর কর্তা গিন্নি দেদার মদ গেলে। সেই মদের টেবিলেই নৈমিত্তিক বচসা লেগে আছে দুজনের। সেই বচসা প্রায়ই হাতাহাতিতে এসে শেষ হয়।

প্রথমে ওরা, বিশেষ করে রোসেলিন ফ্ল্যাট থেকেই তাড়াতে চেষ্টা করেছিল শুভ্রেন্দুকে। কারণ, তাঁর বাজনা ওদের নাকি ভয়ানক ডিসটার্ব করে। নেশা মাটি করে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া মারামারি জমতে দেয় না। শুভ্রেন্দুকে এ খবর দিয়েছে ওদের দশ বছরের ছেলেটা। কিন্তু এই বাজনার কারণেই শুভ্রেন্দুর অনুরাগিনী হয়ে পড়ল রোসেলিন। যত সবলই হোক মেয়েই তো। হাতাহাতি মারামারিতে তার মরদের সঙ্গে পেরে উঠত না। মারটা তাকেই খেতে হত। কিন্তু একাধিক বার দেখা গেল, স্বামীর বেপরোয়া হয়ে ওঠার মুখে ঝমঝম করে শুভ্রেন্দুর বাজনা বেজে উঠেছে! স্বামীটি প্রথমে অশ্লীল কটূক্তি করে ওঠে বাজনাদারের উদ্দেশ্যে—তারপর বসে পড়ে। সেই নেশার মধ্যেও বাজনা শোনে চুপচাপ।

এই থেকেই রোসেলিন ব্যাডককের দৃষ্টি ভালো করে আকৃষ্ট হয়েছে শুভ্রেন্দুর প্রতি। বাজনার সমঝদার হয়ে উঠেছে সে-ও। যখন তখন গল্প করতে বসে। শুভ্রেন্দুর কোনো কথায় রাগ হলে তেড়ে মারতে যায়, আর খুশি হলে জাপটে মাপটে ধরে চুমু খায়। ছেলে মেয়েরা কেউ দেখল কি দেখল না তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। ব্যাডকক শুভ্রেন্দুকে বলেছে তার স্ত্রীর মাথায় ছিট আছে। সেই ছিট-এর দাপট শুভ্রেন্দুর ওপর বেড়েই চলেছে।

রোসেলিন বলে, চারটে পুরুষ তার সর্বনাশ করেছে। প্রথম তিনজন হল গিয়ে তার অফিস-বস্। ভালো স্টেনোগ্রাফার ছিল সে, মোটা মাইনেও পেত। কিন্তু ওই পুরুষগুলো ওকে কবার করে নার্সিং হোমে অপারেশনে পাঠিয়ে সব দিক খেয়েছে। আর সর্বনাশের কারণ চতুর্থ পুরুষটা হল গিয়ে তার স্বামী জিম। সব্বার থেকে বড়ো লম্পট ওটা। রোসেলিনের এতবড়ো শরীরটা যেন ওর কাছে ছেঁড়া-খোড়ার জিনিস একটা। তিন বছরের মধ্যে দুটো ছেলে মেয়ে এনে ছাড়লে। বেগতিক দেখে রোসেলিন শেষে অপারেশনটা করিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। নইলে এতদিনে আরো পাঁচ সাতটা এসে হাজির হত।

দেখতে দেখতে শুভ্রেন্দুর গুণমুগ্ধ হয়ে উঠতে লাগল রোসেলিন। তার উৎপাতে বাজনা বন্ধ হবার দাখিল। বাজাতে বসলেই সে এসে হাজির। কোনো কোনো রাতে মদের গেলাস হাতে নিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ে। পিছন পিছন তার স্বামীও ধাওয়া করে। তার ঘরেই দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়।

শুভ্রেন্দু মেয়েটাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, এরকম কোরো না। এ-ঘরে এত বেশি এসো না। স্বামীকে নিয়ে ঝামেলায় পড়বে শেষে।

রোসেলিনের সাফ জবাব, ওকে গুলি করে মেরে ফেলার একটা ব্যবস্থা করো না।

চমৎকৃত হয়ে শুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করেছেন, তারপর?

জবাবে রোসেলিন উঠে এসে জাপটে ধরে কয়েকটা আসুরিক চুমু।—তারপর এই।

উৎপাত বাড়তেই থাকল। ওর আর ওর চুমুর ভয়ে অনেক সময় দরজা বন্ধ করে থাকতে হত শুভ্রেন্দুকে। দমাদম দরজায় ঘুষি লাথি মারবে তখন। গালাগাল করবে। দরজা খুললে হেসে আটখানা। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবে, তারপর নাজেহাল করবে।

শুভ্রেন্দু বলেছেন, ব্যাডকক কখনো এই কাণ্ড দেখে ফেললে দুজনকেই খুন করবে।

রোসেলিনের জবাব, খুন শুধু তোমাকে করবে, আমাকে নয়—দ্যাট রাসকেল লাভস মি, অ্যান্ড উই ক্যান্ নট্ গো উইদাউট ইচ আদার।

—তাহলে তাকে ছেড়ে এখানে এভাবে আস কেন তুমি?

—হাউ সিলি! রোসেলিন হেসে সারা।—আসব না তো কি, হি ইজ্ এ হাসব্যান্ড অ্যান্ড ইউ আর এ লাভার—এ লাভার ইজ্ ফার মোর চার্মিং—

সেই থেকেই মুক্তির পথ খুঁজছিলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। শেষ হবার আগেই এ বাড়ি কিনে চুপিসারে উঠে এসেছেন।

এখানেও রাত্রিতে বাজাতেন। অনেক সময় বারান্দায় বসেও বাজাতেন। বাজনা শুরু হবার খানিকক্ষণের মধ্যে দেখতেন ছোট্ট মাঠটার ওধারের বাড়ির দোতলার বারান্দায় একটি মেয়ে এসে দাঁড়ান। প্রতি রাতেই এইরকম হয়। ঘরে বাজালেও একসময় বাইরে এসে দেখেন মেয়েটি দাঁড়িয়ে। রাতের সুর যেন ওই জায়গাটিতে টেনে নিয়ে আসে তাঁকে। আবার ঝামেলায় পড়ার সম্ভাবনায় শুভ্রেন্দু নন্দী গোড়ায় কয়েকদিন বিরক্ত হয়েছিলেন। মেয়েদের ঝামেলা নেই এমন জায়গাই কি নেই দুনিয়ায়!

কিন্তু দিনের আলোয় মেয়েটিকে দেখার পর থেকেই বড় আশ্চর্যভাবে বিরক্তিটা গেল। নিজের গাড়িতে কারখানায় বেরুবার সময় প্রত্যহ ওই মেয়েকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। ওঁদের বাড়ির পাশ ঘেঁষেই রাস্তা। শুভ্রেন্দুর গাড়ির গতি আপনা থেকেই শিথিল হয় একটু। স্টিয়ারিং ছেড়ে দু চোখ আপনা থেকেই দোতলার বারান্দায় উঠে আসে। চোখাচোখি হয়। রমণীর এমন নিঃসংকোচ অথচ নির্লিপ্ত মনোযোগ আর দেখেছেন কিনা শুভ্রেন্দু নন্দী জানেন না। প্রত্যহ নিয়মিত তাই ঘটতে লাগল। সেই একই অভিব্যক্তিশূন্য মনোযোগ। ঘোর যেন একটু একটু করে উল্টে তাঁরই লাগছে। রোসেলিন আর কিছু না পারুক, একটা যন্ত্রণার লোভনীয় স্বাদ এনে দিয়েছে। নিরিবিলি রাতে বারান্দায় বসে তিনি বাজান, আর অন্ধকারে ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর একজন শোনেন। রোসেলিনের বেলায় যা কখনো মনে হয়নি, এবারে তিনি তাই করতে লাগলেন। খুব সচেতনভাবেই শুভ্রেন্দু নন্দী যেন বাজনার সেতুপথে দু বাড়ির মাঝের ব্যবধানটুকু ঘুচিয়ে ফেলতে চান। এটাই একটা নেশার মতো হয়ে দাঁড়ালো। ঠিক আগের মতো আর কাজে মন দিতে পারেন না। ফলে নিজের ওপর অসহিষ্ণু হয়ে

উঠেন। সকালে কারখানায় বেরুনোর সময় তাঁর গাড়ির গতি ওই বাড়ির সামনে এসে এত ধীর মন্থর হয় যে লোকের চোখে পড়লে দৃষ্টিকটু ঠেকবে। কিন্তু বারান্দার রমণী পরোয়া করে না, আর শুভ্রেন্দু নন্দীরও অন্য কোনোদিকে হুঁশ থাকে না।

ক্রমে ওই রমণীকে ঘিরে একটা বাসনা যেন যন্ত্রণার মতো সমস্ত সত্তায় পাক খেতে লাগল। হাড়-পাঁজর দুমড়ানো সেই যন্ত্রণা এক-একসময় দুঃসহ মনে হয়; আসল সর্বনাশটা যে তাঁর রোসেলিনই করে দিয়ে গেছে জানতেন না। যন্ত্রণার দায়ে এবার কি সেই পাগল মেয়ের কাছেই ছুটে যেতে হবে নাকি! নিজের উদ্দেশেই কটূক্তি করে ওঠেন শুভ্রেন্দু নন্দী।

...একদিন। মহিলা নিজের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে শুভ্রেন্দু নেমে এলেন। ছোট মাঠ ভেঙে হেঁটেই চললেন। ওদিকের রাস্তায় পড়তে মহিলার দৃষ্টি তাঁর দিকে ঘুরল। অপলক চেয়ে রইলেন,গাড়িতে দেখলে যেমন চেয়ে থাকেন। শুভ্রেন্দু নন্দী আশা করলেন, আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন, একটা ডাক শোনার জন্য দুই কান উৎকর্ণ। কিন্তু মহিলা ডাকলেন না। শুধু চেয়ে রইলেন। সুন্দর মুখে আগ্রহের একটা আঁচড়ও দেখলেন না তিনি। কি আশ্চর্য, মনে মনে থমকে যান, এ-ও কি রোসেলিনের মতো অস্বাভাবিক নাকি!

সেই রাতে বাজনা নিয়ে বসেছিলেন সাড়ে এগারোটায়। শেষ করেছেন রাত্রি আড়াইটেরও পরে। গোঁ-ভরে বাজিয়েই গেছেন। হাতছানি দেওয়া সুরের অনেকরকম মূর্ছনা তুলেছেন। ওই বারান্দার রমণী মূর্তিটিকে সুরের জালে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার মতোই যেন গোঁ তাঁর। মনে হয়েছিল, বেঁধে ফেলতে পেরেছেন।

মহিলা দাঁড়িয়েই ছিলেন শেষ পর্যন্ত।

ঘড়ি ধরে ঠিক ছটায় আনন্দ চক্রবর্তীর বাড়িতে এলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। সুমিত্রা বোসেরও ছটায় আসার কথা সেখানে। বন্ধু টেলিফোনে খবর দিয়েছেন, বলেছেন, ঠিক ঘড়ি ধরে এসো, তোমার রমণীটি কিন্তু সময়ের ব্যাপারে পাংচুয়াল। তাঁকে দেখামাত্র আনন্দবাবুর স্ত্রী ঠাট্টা ঠিসারা শুরু করে দিলেন। বললেন, আমার তো হাড়ে বাতাস লাগল, কিন্তু আপনার কি দশা হবে চিন্তা হচ্ছে।

ঠাট্টার জবাবে রসিকতা শুভ্রেন্দুও করেছেন। বলেছেন, পুরুষের হাতী মশা দশ দশা—সুবিধে বুঝলে মশা হতে আপত্তি নেই।

আনন্দবাবু আরো স্থূল রসিকতা করেছেন, মশা হয়ে গালে বসবে?

শুভ্রেন্দু মাথা নেড়েছেন, সেটা রিস্কি হবে, অনেকে নিজের গালে চড় বসায়, নাকের ডগায় বসব। নিজের নাক কেউ থ্যাবড়া করতে চায় না!

শ্রীমতি চক্রবর্তী মুখ লাল করে স্বামীকে ধমকেছেন, তোমরা এখন এইরকম কথা বার্তা চালাবে নাকি?

—নিশ্চয়, আনন্দবাবু জবাব দিয়েছেন, ওই মহিলাকে নিয়ে নিজের স্বামীকে সন্দেহ করেছ তুমি। সন্দেহ সহ্য হয় কিন্তু তাকে অন্য পুরুষের ঘাড়ে চাপানো অসহ্য।

ছটা ছেড়ে সাড়ে সাতটা বেজে গেল রাত, সুমিত্রা বোসের দেখা নেই। আনন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী অপ্রস্তুত। সুমিত্রা বোসের বাড়িতে টেলিফোন করা হল, ক্লাবে টেলিফোন করা হল, মহিলা নি-পাত্তা। শেষে রেগে গিয়ে আনন্দ চক্রবর্তী বললেন, তোমারও যেমন, মনে ধরার মতো আর মেয়ে পেলে না—ইচ্ছে করেই আসেনি, আমি তোমার কথা বেশ ভালো করেই বলে রেখেছিলাম। বাজনা শোনানোর লোভও দেখিয়েছিলাম।

বলেছিল, আসবে?

খুব চেষ্টা করবে বলেছিল। বিরস মুখে আনন্দবাবু মন্তব্য করলেন, নেমন্তন্ন পেলে কে আর লাফিয়ে ওঠে—এইরকমই বলে। আসতে না পারলে আগে থাকতে টেলিফোন করার কথা ছিল।

আনন্দ চক্রবর্তী নিজস্বভাবে মহিলার কাছে অনেকটাই সুপারিশ করে রেখেছিলেন বটে। বলেছিলেন, এমন বিচিত্র মানুষ তাঁর সাহিত্য জীবনে দুটি দেখেননি। বন্ধু কত ভালো ছাত্র ছিল, আর

দারিদ্র্যের কত বড়ো বিপাকে পড়ে কি থেকে আবার কত বড়োটি হয়েছেন তাও ফলাও করে বলেছেন। বলেছেন, বন্ধু নিজেকে মিস্ত্রি বলে পরিচয় দেয়, সেটা যে কত বড়ো গর্বের তা একমাত্র তিনিই জানেন। শুধু যে নিগূঢ় আর নির্মম কারণে তাঁকে পথে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল সেটুকুই বলে উঠতে পারেননি। টেলিফোন ছেড়ে সামনাসামনির আলাপেও সে-সব বলা সম্ভব নয়। শুভ্রেন্দু নন্দীর প্রশংসা আনন্দ-গৃহিণীও পঞ্চমুখে করেছেন।

সুমিত্রা বোস চুপচাপ শুনে গেছেন। তারপর নির্লিপ্ত মন্তব্য করেছেন, ভদ্রলোক সুন্দর বাজান...প্রায়ই শুনি। ঠিক আছে চেষ্টা করব যেতে।

রাত পৌনে আটটার সময় গাড়ি হাঁকিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী বাড়ি চলে এলেন। আসার সময় দেখলেন সুমিত্রা বোসের ঘরে আলো জ্বলছে। ইচ্ছে হল, সোজা ওই ঘরে গিয়ে হাজির হন। সেটা সম্ভব নয়। নিজের দোতলার বারান্দায় এসে ঘরের ভিতরে মহিলাকেও দেখতে পেলেন। ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে আধশোয়া। দেহের অণুতে অণুতে প্রায়-জিঘাংসু একটা ইচ্ছা দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলো শুভ্রেন্দু নন্দীর।

বাক্স থেকে ভায়লিনটা বার করে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছড়িতে ছাড়া-ছাড়া সুর টানলেন কয়েকটা। ওদিকের ঘরের আলোয় স্পষ্ট দেখলেন মহিলা এদিকে ফিরলেন। সোজা হয়ে বসলেন একটু। তারপর ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠলেন। তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

শুভ্রেন্দু নন্দী বাজাচ্ছেন না। কয়েক সেকেন্ডের এক-একটি সুরের মূর্ছনা তুলে আবার ছেড়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। এই রকম বাজনার স্পষ্ট এবং অসহিষ্ণু একটা ভাষা আছে।

একটু বাদে সুমিত্রা বোস ভিতরে চলে গেলেন। শুভ্রেন্দু যেন অপেক্ষা করছেন। হ্যাঁ, একটু বাদে বাইরের গেটের আলোয় মন্থর গতিতে তাঁকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখা গেল। তারপর আবছা অন্ধকার। শুভ্রেন্দু নন্দী সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করে দেখতে চেষ্টা করছেন। মাঠ বেষ্টন করে রাস্তা ধরে এদিকেই আসছেন মহিলা। খুব শিথিল পদক্ষেপ।

বাজনার তারে আর একটু সুরের ঝংকার উঠল। এই ধীর গতি যেন পছন্দ নয়।

...আবছা রমণীমূর্তি স্পষ্ট হচ্ছে একটু একটু করে। না, বাজানর ঘায়ে তাঁর এদিকে আসার গতি দ্রুত হয়নি একটুও।

শুভ্রেন্দু নন্দীর বারান্দার নিচে এসে দাঁড়ালেন সুমিত্রা বোস। শুভ্রেন্দু ঝুঁকে দেখলেন, তারপর বাজনার তারেই যেন শেষ অমোঘ আমন্ত্রণ বেজে উঠল। কোন গৎ কোন সুর বাজছে শুভ্রেন্দু নিজেও জানেন না। যে-রকম করে বাজালে এবং যা বাজালে না এসে উপায় নেই—সে-রকম করে বাজাতে চাইছেন, তা-ই বাজাতে চাইছেন।

সুমিত্রা বোস ভিতরে ঢুকলেন। সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলেন। শুভ্রেন্দু নন্দী ভায়লিন হাতে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালেন। এবারের আমন্ত্রণটা তাঁর বাজনা ছেড়ে দুচোখের গভীরে এসে ছড়াতে থাকল। মুখে কথা নেই।

ওপরে উঠে আসতে আসতে ঈষৎ বিড়ম্বিত স্মিত মুখে নমস্কার জানালেন সুমিত্রা বোস। শুভ্রেন্দুর দুহাত জোড়া, সামান্য মাথা নাড়লেন, তারপর ছড়িসুদ্ধ হাতটা দুলিয়ে তাঁকে ঘরে অভ্যর্থনা জানালেন। নিজের কণ্ঠস্বরের ওপর বিশ্বাস নেই। আনন্দ চক্রবর্তীর ওখানে না যাওয়ার সমুচিত প্রতিফলন হিসেবে এখানে টেনে নিয়ে আসতে পেরেছেন—সেই অহহিষ্ণুতা হয়তো গলার স্বরে গোপন থাকবে না।

নিজে আগে ঘরে ঢুকলেন, পিছনে সুমিত্রা। আবার ঘুরে মুখোমুখি হতে অল্প হেসে সুমিত্রা বললেন, আমার নাম সুমিত্রা বোস। আপনার নাম আপনার সাহিত্যিক বন্ধু আনন্দ চক্রবর্তীর মুখে শুনেছি। তাঁর বাড়িতে আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়ার কথা ছিল, আমারও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল...ভদ্রলোক অনেক করে বলেছিলেন, কিন্তু কিছুতে আর হয়ে উঠল না।

...কেন হয়ে উঠল না? যেন খুব কাছের কেউ না যাওয়ার কৈফিয়ৎ তলব করছে।

সোজা চোখের দিকে তাকালেন সুমিত্রা বোসও। যে সামান্য আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিল সেটুকুও গোটানো হয়ে গেল যেন। নিস্পৃহ জবাব দিলেন, শেক্সপিয়রের একটা ড্রামা নিয়ে ওরা এমন মেতে উঠল যে ছাড়া পাওয়া গেল না।...আপনি গেছলেন নাকি?

হ্যাঁ, প্রায় দুঘণ্টা অপেক্ষা করে চলে এসেছি। গভীর দুটো চোখ তাঁর মুখের ওপর অপলক তেমনি।

আই অ্যাম সো সরি! টেলিফোনে জানাতেও ভুলে গেলাম, এত ঝামেলা ক্লাবের ব্যাপারে...। এদিক ওদিক তাকালেন, সহজ কিন্তু ভারী নিরীহ অভিব্যক্তি।—আপনার স্ত্রী কোথায়?

কয়েক পলক চেয়ে থেকে সরলতার অকৃত্রিম অভিনয় দেখলেন শুভ্রেন্দু নন্দী।...

ইচ্ছে করেই আনন্দর ওখানে যাওয়া হয়নি, আর স্ত্রী আছে কি নেই জেনেই এই প্রশ্ন। অদূরের ওই বাড়িতে গত চার মাস যাবৎ এই মেয়ে চোখ বুজে কাটালেনও এ প্রশ্নটা স্বাভাবিক লাগতো না। রক্তের মধ্যে একটা ওঠা-নামা শুরু হয়ে গেল শুভ্রেন্দু নন্দীর। রোসেলিন ব্যাডকক তাকে অনেক জড়িয়ে ধরেছে, অনেক চুমু খেয়েছে, কিন্তু এ-রকম অনুভূতি এই প্রথম। ভায়লিন আর স্টিকটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন।

তার পরের যেটুকু, শেক্সপিয়রের নাটকও পিছনে পড়ে থাকবে। এটুকু বুঝি শুধু শুভ্রেন্দু নন্দীর দ্বারাই সম্ভব। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন। গম্ভীর চোখে চোখ রেখে বললেন, তিনি ছিলেন না, এই মাত্র এলেন।

জবাব শুনে থতমত খেয়ে সুমিত্রা বোস এদিক ওদিক তাকালেন। কিন্তু শুভ্রেন্দু নন্দীর হাত দুটো ততক্ষণে তাঁর দুই কাঁধের ওপর! সুমিত্রা বোস চেষ্টা করেও নড়াতে পারলেন না। একটা তপ্ত স্পর্শ কাঁধের ওপর। শুভ্রেন্দু নন্দী আবার বললেন, তিনি ওদিকে নয়, এখানে।...চার-চারটে মাস কাটাবার পরে আনন্দর ওখানে মিথ্যে সময় নষ্ট না করে আজ তিনি এখানেই চলে এসেছেন। তিনি এত স্পষ্ট আর এত বুদ্ধিমতী আমি জানতুম না।

মুহূর্তে স্তব্ধ রক্তবর্ণ মূর্তি সুমিত্রা বোসের। দুই চোখে বিস্ময়ের নীরব তরঙ্গ।...ছাড়ুন!

কিন্তু তার আগেই কথাটা ডুবে গেল। পুরুষের দুই সবল বাহু অমোঘ আকর্ষণে তাঁকে টেনে নিয়ে এত কালের সমস্ত রুদ্ধ আগল ভেঙে দিয়ে যেন তাঁর কাছ থেকেই তাঁকে কেড়ে নিতে লাগলো। সুমিত্রা বোসের বাধা দেবার শক্তি নেই।

নিজের গড়া একটা প্রতিরোধের অবসান যেন, একটা যুগের অবসান যেন। ছেড়ে দিলেন।

বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছেন সুমিত্রা বোস। সমস্ত মুখ আরক্ত। শাড়ির আঁচল খসে মাটিতে পড়ে গেছল। নিজের অগোচরে কাঁধে তুললেন সেটা। চেয়েই আছেন। বড়ো করে দম নিলেন বার দুই। কিন্তু চোখের পলক পড়ে না। সামনে যে দাঁড়িয়ে সে কেমন মানুষ জানেন না, তিনি শুধু পুরুষ দেখছেন। দেখছেন আর নিজের চোখে আগুন ঝরাতে চাইছেন। কিন্তু তাও পেরে উঠছেন না।

...যৌবন বাস্তবের এই শুভ্রেন্দু নন্দী দুর্নিবার ঝড় যেন একখানা। একটি রমণীকে তিনি অনায়াসে নিজের দুরন্ত ইচ্ছার বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।...আর সমর্পণের বন্যায় নিজেও অনেকটাই ভেসে গেছলেন। এটাই জীবনের বোধ করি সব থেকে বড়ো ভুল তাঁর। নিজেকে অনেকখানি ধরে রাখলে সম্ভবত তার পরিণামে বড়ো কোনো ক্ষত সৃষ্টি হত না।

সুমিত্রার আচরণে খটকা লাগতে শুরু করেছিল মাস ছয় বাদে। শুভ্রেন্দু নন্দীর কাজের ব্যস্ততা বরদাস্ত করতে রাজি নন তিনি। যেদিন বলে দেন অতটার সময় আসতে হবে—আসতেই হবে। না এলে যথার্থই চটে যান। শুভ্রেন্দু বোঝাতে চেষ্টা করেন, আরে আমি হলাম গিয়ে মিস্ত্রী মানুষ, আমার অত ঘড়ি ধরে সময় ধরে হুকুম তামিল করার উপায় আছে!

মিস্ত্রী শুনলেই সুমিত্রা আরো রেগে যান, এ-রকম শুনলে শিক্ষা-দীক্ষার অভাব মনে হয়।—অসভ্যের মতো ওই কথাটা বলে ভাবো বুঝি খুব বাহাদুরী হল, না?

শুভ্রেন্দু রাগ করেন না, হাসেন। সুমিত্রার রাগ ভালো লাগে, তার লাল মুখ মিষ্টি লাগে। বলেন, আলবত আমি মিস্ত্রী আর তুমি মিস্ত্রীর যোগ্য বউ—বুকের তলার দুদুটো বিকল এনজিন দুজনে কেমন ঠিক করে ফেললাম দেখলে না?

কিন্তু কথার মায়ায় সুমিত্রা ভুলতে চান না। এই পুরুষকে তিনি মায়াবদ্ধ করতে পেরেছেন সেটা পরিষ্কার। কিন্তু সেটা তাঁর দেহের মায়া কিনা নিজের কাছেই সেই সংশয়। এই দেহের প্রতি লোকটার দুরন্ত তৃষ্ণা। তাই তাঁর স্পষ্ট কথা, আগে আমি, পরে তোমার কাজ—ও ভুলেছ কি পস্তাবে বলে দিলাম।

শুভ্রেন্দু নন্দী তক্ষুনি দখল নিতে এগিয়ে আসেন—এই গোছের কোনো আমন্ত্রণের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলেন। বলেন, নিশ্চয় আগে তুমি—আমি পস্তাতে শুরু করেইছি!

কিন্তু রাগতে গিয়েও রাগ টেকে না শেষ পর্যন্ত। এমনি জোর করে কেড়ে নিয়ে দখল নেবার ব্যাপারে লোকটার অফুরন্ত ক্ষমতা। নাজেহাল হয়ে বলেন, অসভ্য কোথাকারের—

সেদিনও এই গোছের কিছু একটার পর শুভ্রেন্দু লক্ষ করলেন সুমিত্রা চুপচাপ তাঁর দিকে চেয়ে কি যেন দেখছেন। চাউনিটা হঠাৎ কেমন যেন স্বাভাবিক লাগলো না শুভ্রেন্দুর। কেমন সন্দিগ্ধ আর খরখরে চাউনি।—কি দেখছ?

তোমাকে। সোজাসুজি কিছু একটা ফয়েসলা করার জন্যেই যেন কাছে এগিয়ে এলেন, আচ্ছা একটা কথা ঠিক ঠিক বলো তো, তোমার জীবনে আমি ক নম্বর মেয়ে?

প্রশ্ন শুনে শুভ্রেন্দু হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। দু হাত বাড়িয়ে তাঁকে আরো কাছে টেনে পাল্টা রসিকতা করলেন, তোমার জীবনে আমি কত নম্বর পুরুষ?

ভুরু কুঁচকে সুমিত্রা জবাব দিলেন, দু নম্বর।

কেন, মোহন ভাট, আয়েংগার, বলরাম কাপুর—এরা? শুভ্রেন্দু যেন সহজে ছাড়বার পাত্র নন।

ও...! সুমিত্রা অপ্রত্যাশিতভাবে তেতে উঠলেন, এতেই।—তলায় তলায় এত সব খবর নেওয়া হয়েছে? তারা সব অপদার্থ, নইলে তুমি আমাকে পেলে কি করে?

মজাই লাগছে শুভ্রেন্দু নন্দীর। মুখে ছদ্ম গাম্ভীর্য।—তার মানে আমি তাদের থেকে পদার্থ?

কিছুটা। সুমিত্রা সেটা অস্বীকার করলেন না। কিন্তু নিজের প্রশ্নের উত্তরও তাঁর চাই। ফের জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি জবাব এড়ালে যে? আমি কত নম্বর?

এক নম্বর।

মিথ্যেবাদী।

মিথ্যেবাদী কেন?

তেমন কারণ হাতড়ে পাচ্ছেন না সুমিত্রা।—তোমার যা দস্যুর মতো চরিত্র, আমার বিশ্বাস হয় না।

শুনে শুভ্রেন্দু নন্দী অখুশি হননি। কিন্তু সত্যিই যে স্ত্রীর মনের পর্দায় একটা কাঁটার আঁচড় পড়েছে সে-সম্পর্কে গোড়ায় অন্তত আদৌ সচেতন ছিলেন না। টের পাবার পর ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কাঁটাটা সত্যি বিঁধেছে, ক্ষত সৃষ্টি করছে বুঝতে পারেন।

তাই তাঁর ওপর স্ত্রীর দখলের হাতটা যেন একটু একটু করে কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া জীবনের আভিজাত্য সম্পর্কে সুমিত্রার ধারণা অন্য রকম। স্বামী কারখানার মালিক সেটা মন্দ শোনায় না, কিন্তু মোটর গ্যারাজের মালিক শুনলে স্নায়ু ধাক্কা খায়। অভিজাত শ্রেণির কালচারের দিকটা তাঁকে দেখানো শোনানো বোঝানোর জন্য গোড়ায় গোড়ায় কদিন ক্লাবে ধরে নিয়ে গেছেন, কিন্তু উঁচু মহলে লোকটা যেন বে-মানান। আবার নিজে যখন-তখন কারখানায় এসে উপস্থিত হয়েও ধাক্কা খেয়েছেন সুমিত্রা। তেল-কালি মেখে যারা কাজ করছে, স্বামীও তাদের একজন—সেটা বরদাস্ত করা কঠিন। এ-জন্যে রাগ করেন, এরও একটা বিহিত করতে চান। ঝাঁঝালো স্বরে বলেন, মাইনে দিয়ে যাদের রেখেছ তারা করবে এ-সব, তুমি কেন?

একদিনের ঘটনায় মুখ লাল সুমিত্রার। লাল শুধু নয়, অপমানে একেবারে তাঁর মাথা কাটা গেছে যেন। লোকটার এত দম্ভ ভাবেন নি। বাড়ি থেকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন, বলরাম কাপুর ফিরেছেন বিদেশ থেকে, মিস্টার নন্দীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য উৎসুক—তাঁকে নিয়ে সুমিত্রা কারখানায় আসছেন। শুভ্রেন্দু খুশি মেজাজে পাল্টা অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, নিশ্চয় এসো।

ইতিমধ্যে নতুন ছোট্ট আপিস বিল্ডিং হয়েছে কারখনার, মালিকের ঘরে এয়ার কুলারও বসানো হয়েছে সুমিত্রার তাগিদে। ফলে কারখানার চেহারা অনেক সভ্য-ভব্য হয়েছে। কিন্তু প্রায়-মিলেয়নেয়ার কাপুরকে সেখানে এনে সুমিত্রার যেন মাথায় রক্ত ওঠার দাখিল। শুভ্রেন্দু নন্দী তখন সেই ময়লা আলখাল্লা গায়ে গাড়ির নীচে শুয়ে নিজের হাতে কাজ করছেন। পাশে সেইরকম বেশে দাঁড়িয়ে অন্য মিস্ত্রীরা সাহেবের কাজ দেখছেন। ছোট আর বড়ো মিস্ত্রী—এইটুকুই শুধু তফাৎ যেন।

সুমিত্রার সন্দেহ অমূলক নয়। শুভ্রেন্দু নন্দী তখন ইচ্ছে করেই ওই কাজে মগ্ন ছিলেন। কাপুরের সঙ্গে তাঁর পুরুষকারের তফাতটা স্ত্রীর চোখে পড়ুক এই হয়তো চেয়েছিলেন। কিন্তু সুমিত্রা উল্টে রাগে ঝলসাতে লাগলেন নিজেকে। তার মানসম্ভ্রম নিয়ে লোকটার এতটুকু মাথা ব্যথা থাকলে কক্ষনো এ-রকম করতে পারতো না—কক্ষনো না। পরে এই নিয়ে ভালো রকমের বচসাও হয়ে গেল দুজনের।

...প্রথম জীবনে একজনকে নিজের ইচ্ছের সুতোয় বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন মহিলা, পারেন নি। সেই সুতো এবারে শেকল করে তুলতে চাইলেন। এই চাওয়ার মধ্যে যুক্তি নেই, বুদ্ধিবিবেচনার বিচার নেই। শেকল—শেকলই। ফলে প্রতিটি স্বাধীন পদক্ষেপে হোঁচট খেতে লাগলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। স্ত্রী সর্বদাই ঘড়ি ধরে কারখানা থেকে তাঁকে নিজের দখলে টেনে আনতে চান।

শুভ্রেন্দু বিরক্ত হন। যতক্ষণ সম্ভব মুখ বুজে সহ্য করেন। কিন্তু সহিষ্ণুতা তাঁরও প্রবল নয় আদৌ। বলেন, দেখ, তোমার চাওয়ার ঢের আগে আমি নিজের শক্ত দুটো পায়ের ওপর দাঁড়াতে চেয়েছি, অর্থ চেয়েছি, প্রতিপত্তি চেয়েছি। এ-সব না থাকার অর্থ কি তোমার ধারণা নেই—এই চাওয়ার সঙ্গে আমার কোনো কিছুর আপোস নেই, তাই আমার কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করলে তুমি ভুল করবে।

জবাবে সুমিত্রা জ্বলে উঠেছেন, ভুল! আমি করছি না তুমি? তোমার থেকে ঢের ঢের অর্থ আর প্রভাবশালী লোককে আমি বাতিল করেছি তুমি জানতে না? আমি কি চাই সে-খবর নেবার দরকার বোধ করো না, কেমন?

তিক্ত বিরক্ত শুভ্রেন্দু নন্দী মুখের ওপর বলেন, তুমি কি চাও নিজেই জানো না।

একটা বড়ো রকমের সংঘাত দানা বাঁধছে শুভ্রেন্দু নন্দী সে আঁচ পেতেন। কিন্তু স্বীকার করতে চাইতেন না। ভাবতেন, স্ত্রীর মতিগতি বদলাবে, তাঁকে একটু বুঝতে পারলে আর কোনো ক্ষোভ থাকবে না। মানুষের শুভ বুদ্ধির ওপর তিনি বিশ্বাসী।

সুমিত্রাকে সঙ্গে করে একদিন তাঁর ভিখিরি গুরু শোহনলালের কাছে এলেন। শোহনলালের গল্প স্ত্রীর কাছে করেছেন অবশ্য, কিন্তু সেদিন কোথায় কার কাছে যাওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। হোটেলের সামনে সেই বেদীর ওপরেই সমাসীন শোহনলাল। কাছে আসতে সামনে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করল।

চিনতে পারছ না?

ও তুই! আয় আয়। গলার স্বর শুনেই হঠাৎ খুশিতে আটখানা। কি রকম ঝাপসা দেখছি চোখে আজকাল...কতদিন আসিস নি কেন! সঙ্গে কে?

আমার বউ!

অ্যাঁ, মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে এসেছিস এইখানে! শোনামাত্র নির্জীব মানুষটা বিষম ব্যস্ত।—তুই একটা আস্ত পাগল, মাকে এখন আমি কোথায় বসতে দিই! বেদীর কোণে সরে গিয়ে বলল, এইখানে বস মা, বস, আজ আমার কি আনন্দ—

ভিখিরি বেহালা-বাদকের সেই চেহারা দেখেই গা ঘিনঘিন করছিল সুমিত্রার। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকেই তার নোঙরা জামা কাপড়ের বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে একটা। বুড়োর খুশি বা আনন্দ আবেদন রেখাপাতও করল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হোটেলটার দিকে তাকাচ্ছেন। মত্ত অবস্থায় দুই একজনকে বেরুতেও দেখছেন সেখান থেকে। হঠাৎ সেই মিলিটারি অফিসারের স্মৃতি যেন নতুন করে আবার বিষাক্ত করে দিল ভিতরটা। চাপা রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, এইখানে খেতে এসে লোকটার সঙ্গে তোমার আলাপ বলেছিলে না?

শুভ্রেন্দু মাথা নাড়লেন, তাই। স্ত্রীর মুখ দেখে অবাকই লাগছে একটু।

তার মানে তুমি মদ খেতে?

কি থেকে কি। অবাক প্রথম। তারপর চাপা ধমকের সুরে শুভ্রেন্দু বললেন, মাথা খারাপ নাকি!

কথাটা শোহনলালেরও কানে গেছে। হাঁস-ফাঁস করে বলে উঠল, না গো মা, ও হীরের টুকরো ছেলে...অনেক দিন তো বিয়ে হয়েছে, এখনো টের পাওনি? আমার এই ছেলেকে তো একদিনেই চেনা যায়, আমি প্রথম দিনেই চিনেছিলাম—তোমার চোখ আমার থেকেও খারাপ নাকি গো, অ্যাঁ? নিজের রসিকতায় বুড়ো শেষে নিজেই হেসে উঠল।

সুমিত্রা তার কথা শুনলেন, কিন্তু একটি কথাও বললেন না। ওই লোক তাকে এখানে এমন একজনের কাছে নিয়ে এসেছে সেই রাগে জ্বলছেন। তাছাড়া ওই হোটেল, যেখান থেকে মদ খেয়ে টলতে টলতে লোক বেরুচ্ছে। ঢোকার মুখেও কেউ কেউ লোভী চোখে তাকাচ্ছে এদিকে। গটগট করে একলাই ফিরে চললেন সুমিত্রা। শোহনলাল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সেই দিকে। শুভ্রেন্দু নন্দী বিরক্ত, ক্রুদ্ধও। শোহনালকে জিজ্ঞাসা করলেন, চোখে ঝাপসা দেখছ কেন?

কি জানি, ছানি-টানি পড়বে বোধহয়। কিন্তু মা কোথায় চলল—ওকে ডাক!

সে জবাব না দিয়ে শুভ্রেন্দু বললেন, আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করে তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাব।

তা তো দেখাবি, কিন্তু মা যে চলে যায় দেখিস না? শোহনলাল আগের মতোই ব্যস্ত আর বিরক্ত।

কুড়িটা টাকা তার পকেটে গুঁজে দিয়ে শুভ্রেন্দু দ্রুত সেই দিকে এগিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, সেই রাতেই জীবনে সব থেকে বড়ো ভুলটা তিনি করে বসলেন। ওই বৃদ্ধ ভিখিরির সঙ্গে বুকের ভিতরের সম্পর্ক সুমিত্রাকে দেখানোর আগ্রহে, নিজের জীবনের সব থেকে বড়ো ক্ষতটা সুমিত্রার কাছে অনাবৃত করে ফেললেন। জন্মের যে অধ্যায় সকলের চোখে কলংক, সেটাই অনায়াসে ব্যক্ত করে ভিখিরি শিল্পীর আশ্রয় দেবার উদারতার কথা বললেন। শুধু আশ্রয় নয়, সেই সঙ্গে এই সুরসৃষ্টির আশ্রয়টুকু না পেলে কোথা থেকে কোথায় ভেসে যেতেন সে কথাও বললেন।

আবেগের মুখে বলেছেন। কিন্তু তারপরেই সচকিত। সুমিত্রা নির্বাক, স্তব্ধ। তাঁর মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত সরে গেছে। যা শুনছেন বা শুনলেন, তা যেন বোধের অতীত। সঙ্গে সঙ্গে শুভ্রেন্দুর ভিতরটাও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।—কি হল?

সুমিত্রা চেয়ে আছেন, যেন নতুন করে দেখছেন মানুষটাকে।—এ-সব তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?

চাপা অথচ কঠিন বিদ্রূপের সুরে শুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, আগে বললে তুমি আমার জীবনে আসতে না, এই তো? আমার জন্মের দাগটা তোমার কাছে খুব কুৎসিত লাগছে—না?

সুমিত্রা জবাব দিলেন না। তাঁর ফ্যাকাশে মুখে আবার রক্ত ছড়াতে লাগল।

এবারে দ্রুত সংঘাতের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছেন দুজনে, শুভ্রেন্দু নন্দী তার আভাস পাচ্ছেন। অতি তুচ্ছ কারণে বা অকারণে সুমিত্রা কটূক্তি করে ওঠেন, বকাবকি করেন। জীবনটাকে যেন তাঁর এক দুঃসহ নগ্নতার মধ্যে টেনে আনা হয়েছে। শুভ্রেন্দুরও মেজাজ ঠাণ্ডা নয় খুব, সময় সময় উল্টে গর্জে ওঠেন। কথায় কথায় সুমিত্রা বলেন, তোমাকে আমি এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না। শুভ্রেন্দু জবাব দেন, বিশ্বাস কি বস্তু তোমার জানা থাকলে তো!

এরই ওপর আর এক দিন আবার এক অপ্রত্যাশিত অঘটন। শুভ্রেন্দু নন্দী সুমিত্রাকে মার্কেটে নামিয়ে দিয়ে কারখানার কি সব কেনাকাটার ব্যাপারে বেরুবেন। কিন্তু মার্কেটে নেমে দাঁড়াতেই কোথা থেকে ছুটে এলো এক শ্বেতাঙ্গিনী মেয়ে! হোটেলে থাকা-কালীন সেই অবুঝ প্রেমিক আর বাজনার ভক্ত শুভ্রেন্দু নন্দীর। রোসেলিন ব্যাডকক এতদিন বাদে হঠাৎ তাঁকে দেখে সেই দিনমানে তাঁকে জাপটে ধরে একাকার কাণ্ড। নানডি, ও মাই ডিয়ার ডিয়ার, কতদিন বাদে দেখলাম তোমাকে, কোথায় পালিয়ে ছিলে বলো শিগগীর! আমি তোমাকে কত যে খুঁজেছি জানো না।

সুমিত্রার দিকে একনজর তাকিয়েই পরিস্থিতি বুঝে নিলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। নিজেকে ওর হাত থেকে ছাড়াতে গিয়ে ঘেমে উঠেছেন। খুব শিগগীরই দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর স্তোক বাক্যে শ্বেতাঙ্গ রোসেলিনকে সরিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গম্ভীর মুখে উঠে বসলেন সুমিত্রাও, তাঁর মাথায় তখন আগুন জ্বলছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে শুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, আবার উঠে এলে যে?

তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে সাধ হল বলে।...এর পরেও তোমাকে বিশ্বাস করতে বলো?

বলি।

আর ওই মেয়েটা?

পাগল।

পাগল তোমার জন্যেই বোধহয়?

নিজের অদৃষ্টে পাগল। তোমারও ওই ভয় আছে, একটু সাবধান হওয়া দরকার।

দুচোখে সুমিত্রা আগুন ছড়ালেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন গাড়ি থামাও!

থামল।

নেমে হন্ হন্ করে হেঁটে চললেন তিনি।

জীবনের এই অধ্যায়ও দ্রুত সমাপ্তির দিকে গড়াচ্ছে সেটা বোধহয় স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। আবার এক বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন তিনি। কারখানা থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে রাতে ফিরে স্ত্রীকে ঘরে দেখতে পান না একটা। সুমিত্রা যখন খুশি বেরিয়ে যান, যখন খুশি ফেরেন। ফিরতে প্রায়ই অনেক রাত হয় তাঁর! তার পরেও বিচ্ছিন্নই থাকেন, আলাদা ঘরে শোন। দু জনের বাক্যালাপও বন্ধই প্রায়।

পাকাপাকি বিচ্ছেদের একটা উপলক্ষ দরকার ছিল, তা সেই উপলক্ষও এসে হাজির একদিন।

আনন্দ চক্রবর্তীর স্ত্রী মারা গেলেন। ভদ্রলোক সত্যিই শোকে স্তব্ধ বেশ কিছু দিন। সেই শোক শুভ্রেন্দুকেও ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু তার প্রকাশ নেই। এই তিনটি মাসের মধ্যে লেখকের প্রতি অতিমাত্রায় দরদী হয়ে উঠতে লাগলেন সুমিত্রা নন্দী। সময়ে অসময়ে তাঁর বাড়িতে চলে যান, বহুক্ষণ কাটিয়ে আসেন, বিকেলে গেলে রাত পর্যন্ত থেকে আনন্দবাবুকে খাইয়ে-দাইয়ে নিজে খেয়ে তারপর ফেরেন।

সমাচার কুশল নয় আদৌ, বন্ধুর মুখ থেকে সে-আভাস আনন্দ চক্রবর্তী অনেক আগেই পেয়েছেন। এখন এই ব্যাপার দেখে বিড়ম্বনার একশেষ। সুমিত্রাকে কিছু বলতে গেলে তিনি ফুঁসে ওঠেন।—আমি আসি বলে আপনার অসুবিধে হয়?

আনন্দবাবু বলেন, আমার কপাল পুড়েছে, কিন্তু ও-বেচারার অসুবিধে করছেন কেন!

সুমিত্রা কঠিন জবাব দেন, আমার কপাল আরো বেশি পুড়েছে। ও-রকম লোক আপনার মতো মানুষের বন্ধু হয় কি করে বুঝি না।

আনন্দ চক্রবর্তী সত্যি বিপাকে পড়লেন যেন, শুভ্রেন্দুও ভুল বুঝছেন কিনা জানেন না। টেলিফোনে সেদিন বন্ধুকে বললেন, কি হে, তুমি কি চোখ বুজেই থাকবে, আমার যে এদিকে প্রাণান্ত দশা।

শুভ্রেন্দু জবাব দিয়েছেন, দশাটা যদি সত্যিই অসহ্য মনে হয় তো তাড়িয়ে দাও, আমি তার পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখব কেমন করে। কথা কটা বলেই রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন।

সেই দিনই আনন্দ চক্রবর্তী সুমিত্রাকে কি বলেছেন জানেন না। অগ্নিমূর্তিতে ঘরে ফিরলেন সুমিত্রা। শুভ্রেন্দু তখন নিজের মনে বাজাচ্ছিলেন, সুমিত্রা জ্বলতে জ্বলতে ঘরে ঢুকলেন। ওই বাজনাটা তাঁকে জীবনের একটা মস্ত ভুলের মধ্যে টেনে নামিয়েছে, তাই এটাও চক্ষুশূল এখন।—ভণ্ডামি রাখ, আনন্দবাবুকে তুমি কি বলেছ?

শুভ্রেন্দু বাজনা থামালেন। জবাব না দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন শুধু।

নীরবতার ফলে আরো যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সুমিত্রা। গলার স্বর অস্বাভাবিক চড়িয়ে বলে উঠলেন, আমি জানতে চাই আমার সম্পর্কে তুমি আনন্দবাবুকে কিছু বলেছ কি না?

বলেছি। তোমায় তাড়িয়ে দিতে বলেছি।

চোখের আগুনে কাউকে ভস্ম করা যায় না, তবু যেন সেই চেষ্টাই সুমিত্রা করলেন। ঘৃণা আর বিদ্বেষের এক বিকৃত মূর্তি।—ইউ ফুল,

ইউ বাস্টার্ড!

শেষের শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে কি যেন ওলট-পালট হয়ে গেল শুভ্রেন্দু নন্দীর। বাজনাটা ঠেলে সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে এসে দুই হাতের দুটো শক্ত থাবা তাঁর কাঁধের ওপর বসিয়ে দিলেন। রমণীর দুই চোখে নিজের দুটো চোখ বিঁধিয়ে দিয়ে অনুচ্চ-স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি বললে?...কি বললে তুমি?

ছাড়ো! ডোন্ট্ টাচ মি!

স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা অহস্য দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে শুভ্রেন্দু নন্দীর। ছাড়লেন না! হাতের দুই থাবা কাঁধের ওপর চেপে বসল আরো। তারপর আচমকা চৌকিটার কাছে ঠেলে নিয়ে এলেন সুমিত্রাকে, বাধা দেবার আগেই ওটার ওপর আছড়ে ফেললেন তাঁকে। সশব্দে দরজা দুটো বন্ধ করে দিলেন।

...নিভৃতে নারী পুরুষের এই মিলন নির্মম হিংস্র নিষ্ঠুর।

পরদিন বিকেলে আবার দেখা দুজনার। শুভ্রেন্দু আগেই কারখানা থেকে ফিরেছেন। সুমিত্রা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠাণ্ডা, কঠিন।—আমি ডিভোর্স সুট ফাইল করতে যাচ্ছি। তোমার কনটেস্ট করার ইচ্ছে আছে?

না।

তোমার জন্মপ্রসঙ্গ এই ক্ষেত্রে একটি মাত্র শর্তে গোপন রাখতে রাজি আছি।...তুমি মাসে দেড় হাজার টাকা করে খরচ বাবদ দেবে আমাকে—কারণ এরপর আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হবে আমাকে।

শুভ্রেন্দু নন্দীর সমস্ত মুখ বিবর্ণ প্রায়।—দেবো।

থ্যাঙ্ক ইউ।

বিচ্ছেদ হয়ে গেল। সুমিত্রা নন্দী আবার সুমিত্রা বোস।

তাঁর ভিতরটাও যেন রাতারাতি বদলে গেছে। এখন আর কথা বলতে অসুবিধে হয় না। এই একটা মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলার কাজ যেন এখনো শেষ হয়নি। আনন্দ চক্রবর্তীর কাছে গিয়েও যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি করেন.এই লোককে। আর সেই বিস্ময়, অমন লোক তাঁর মতো মানুষের বন্ধু হল কি করে। যখন খুশি ফ্যাক্টরিতে আসেন সুমিত্রা। মাসের বরাদ্দ টাকা ছাড়াও থোকে থোকে আরো টাকা আদায় করে নিয়ে যান। বলেন, আমার দরকার দিতে হবে। না নিলে আমাকে অন্য রাস্তায় টাকাটা আদায় করতে হবে।

শুভ্রেন্দু নন্দী দিয়ে দেন।

আনন্দবাবুকে মহিলা বলেন, আপনার বন্ধু আমার সব কেড়ে নিয়েছে, তাকে আমি একটা দিনের জন্যেও শান্তিতে থাকতে দেবো না।

রমা চন্দ এখানে চাকরি নেবার ফলে তাকেও বিষদৃষ্টিতে দেখেন। এ সম্বন্ধেও আনন্দবাবুকে বলেছেন, লোকটার চরিত্র জেনেও একটা মেয়েকে এ-ভাবে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিলেন? আপনাদের পুরুষ মানুষদের বিবেক বলে কিছু নেই!

আনন্দবাবু পারতপক্ষে জবাব দেন না। সেটাও পছন্দ নয় সুমিত্রার।

কিন্তু কিছুকাল হল সুমিত্রা বোসের টাকা আদায়ের ঝোঁকটা গেছে। শুভ্রেন্দু নন্দী এর কারণ অনুমান করতে পারেন। তিনি জানেন, প্রায় মিলিয়নেয়ার কাপুরের সঙ্গে রমণীটির কিছু একটা বোঝাপড়া হয়েছে। অজস্র টাকার ওপর অনায়াস দখল এসেছে তাঁর। ঝকঝকে তকতকে গাড়িতে তিনি আসেন। টাকা আর তিনি শুভ্রেন্দু নন্দীর কাছে চান না। কিন্তু মানুষটার প্রতি তাঁর আচরণ যেন আরো নির্মম, আরো হিংস্র।

..আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে সেই সন্ধ্যায় রমা চন্দ বাড়ি ফিরেছে। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তার ভিতরটা আচ্ছন্ন।

...কারখানার এক নম্বর মেকানিক বিমল পাঠককে এবং সঙ্গে আরো জনাকতককে শুভ্রেন্দু নন্দী বরখাস্ত করেছেন। বিমল পাঠক বা অন্য বরখাস্ত কর্মীরা কেউ সহজ মানুষ নয়। যদিও বিমল পাঠকের সঙ্গে ওই অন্য কর্মীদের আর সদ্ভাব নেই—তাদের আচমকা বিচ্ছেদটা সকলের কাছেই বিস্ময়কর ঠেকেছিল।

...ওদের সকলকে বরখাস্ত করার সময় শুভ্রেন্দু নন্দী ঘড়ি ধরে ছটা পর্যন্ত কারখানায় কাজ করেছেন,তারপর নিঃশব্দে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। আবার যে ফিরে আসবেন কেউ ভাবেনি—রমা চন্দ আর অ্যাকাউন্টেন্টকে ঘিরে কারখানার বহু কর্মী জটলা করছিল। সেই সময় আবার এসে কঠিন অনুশাসনে শুভ্রেন্দু নন্দী সকলকে কারখানা এলাকা থেকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছেন। সব থেকে বেশি দুর্ব্যবহার করেছেন রমা চন্দর সঙ্গে।

একটা চাপা রাগ নিয়েই রমা চন্দ পথ ভাঙছিল। মালিকের অপমানসূচক কথাগুলো জ্বলতে জ্বলতে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিমল পাঠকের সঙ্গে হাত মেলানোর কথাও মনে হচ্ছিল থেকে থেকে। মোড়ের মাথায় রাজা আহমেদকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে, তারপর তার দিকে এগিয়ে গেছে।

রাজা আহমেদও দূর থেকেই লক্ষ্য করেছে তাকে। কাছে আসতে জিজ্ঞাসা করল, কি বহিনজি? রাজা আহমেদের শুকনো মুখ। হাবভাব যেন সচকিত।

রমা বলেছে, এ দিকে এসো।

তাকে নিয়ে খানিকটা ব্যবধানে এসে বলেছে, ,সকালে তুমি নেশা করে কারখানায় এসেছিলে অথচ সাহেবকে বলেছিলে আসবে না।...ছুটি নিয়েছিলে, তার ওপর নেশা করেও তুমি কারখানায় এসেছ। ...কেন?

রাজা আহমেদ সাধাসিধে জবাব দিল, সাহেবের জন্য মনে একটু ভাবনা ছিল বহিনজি।

রমা আবার জিজ্ঞাসা করল, সকালে তুমি নিজেকে মিরজাফরের বংশধর বলেছিলে কেন?

ও জবাব দিয়েছে, বিমলবাবু আমার অনেক উপকার করেছে, কিন্তু আমিই তার চুরি ধরিয়ে দিয়েছি।

চুরি? চোখে চোখ রেখে রমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।—সত্যিই বিমলবাবু চুরি করতো নাকি।

ও আল্লার কসম খেয়ে বলেছে, চুরি করতো। গ্যারাজে যারা মাস ভাড়ায় গাড়ি রাখতো, প্রায় রাতেই তাদের সেই সব গাড়ি থেকে কিছু-কিছু তেল চুরি করে বিক্রী করা হতো। রাজা আহমেদ নিজেই বিমল পাঠকের এই তেল চুরির দোসর ছিল। সাহেবের কাছে রাজা আহমেদ নিজেই এই সত্য স্বীকার করেছে। আর মাল কেনার ব্যাপারে যে চুরি হতো সেটা মাল যারা বেচেছে তারাই সাহেবের কাছে কবুল করেছে—অবশ্য এ-খবরটাও তাদের কাছ থেকে রাজা আহমেদই আগে সংগ্রহ করে সাহেবকে জানিয়েছিল। বলেছে, বিশ্বাস করো বহিনজি, সাহেবের দিল্ জখম হচ্ছে দেখেই রাজা বান্দা আর ঠিক থাকতে পারলো না। ছোট বেইমানি অনেক করেছি, কিন্তু এ-রকম বেইমানি কি করে সহ্য করব!

রমা চন্দ স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। অপলক চোখে লোকটাকে যেন নতুন করে নিরীক্ষণ করেছে আবার। তারপর মন্তব্য করেছে, নিজেকে মিরজাফরের বংশধর বলছ কেন রাজা, তুমি খুব ভালো কাজ করেছ। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করেছে, বিমল পাঠকের সঙ্গে তার দলের বাকি ওই কজনের হঠাৎ এ-রকম ঝগড়া বেধে গেল কি করে?

একটু চুপ করে থেকে রাজা আহমেদ জবাব দেবে কি দেবে না ভেবেছে হয়তো। তারপর বলেছে, সাহেবের টাকায় কাজ হয়েছে। বাইরে থেকে যে দু তিন জন লোক মাতব্বরি করছিল, আসলে তারা ভাঁওতাবাজ। জোরদার কোনো পার্টির কেউ নয়। বিমল পাঠকই তাদের জোগাড় করে এনেছিল। সাহেবের টাকা খেয়ে তারা সরে যেতে বোঝা গেছে বিমল পাঠকের আসল মাতব্বর বা আসল মুরুব্বি ওই বাইরের লোকেরা নয়। কারখানার লোকেরা সেটা কি ভাবে বুঝেছিল রাজা আহমেদ সঠিক জানে না।

রমা চন্দ বাড়ির পথ ধরার আগে রাজা আহমেদ বলেছে বহিনজি, সাহেব ওখানে একলা থাকলো আমার একটুও ভালো লাগছে না। ছাঁটাই যারা হয়েছে তারা কেউ সহজ লোক নয়। যাক, তুমি ভেবো না বহিনজি, রাজা আহমেদের জান থাকতে কেউ সাহেবের গায়ে আঁচড় কাটতে পারবে না, সাহেব যত রাগই করুক আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।

চলে গেছে।

কিন্তু রমা চন্দর দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে।

এর পরেও কটা দিন থমথমে আবহাওয়া কারখানায়। শুভ্রেন্দু নন্দী একমনে আপিসের কাজ করেন, কারখানার প্রধান মেকানিকও তিনিই। কোনোদিন ছটায় বেরোন কারখানা থেকে, কোনোদিন সাতটা বা তারও পরে। কিন্তু প্রতিটি লোককে ঠিক ছটায় ছুটি দেন। ছুটি পেয়ে কেউ আর সাহস করে দু দণ্ডও কারখানায় অপেক্ষা করে না। তখন দারোয়ান দুটো ছাড়া আর কেউ থাকে না।

রমা চন্দ রোজই কারখানা থেকে বেরুবার আগে রাজাকে ইশারা করে দিয়ে যায়, সাহেবকে যেন একলা না ছাড়ে। সম্ভব হলে সাহেব না বেরুনো পর্যন্ত নিজেও থেকে যেত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। শুভ্রেন্দু নন্দী বোধহয় কিছু বিপদের আঁচ করছেন, নইলে রাজাকে গাড়িতে তুলে নিতে আপত্তি বা করেন না কেন?

এদিকে রমা চন্দর ভয়টা বাড়ছেই— বাড়ছেই। ভয় ওই মালিকের জন্য। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে কারখানা থেকে বেরিয়ে খানিকটা তফাতে এ-দিক ও দিকে দু-চারজন অচেনা মুখ দেখছে রোজই। মালিকের এটা চোখে পড়ে কি না কে জানে। ওরা নিজেদের মধ্যে জটলা করে, আড়ে আড়ে কারখানার দিকে তাকায়। কারখানা ছুটি হয়ে গেলে ওদের বিচ্ছিন্নভাবে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

এটা অহেতুক মানসিক ভয় কিনা জানে না। কারণ বরখাস্ত যারা হয়েছে একদিনও তাদের কারো মুখ দেখা যায়নি। তবু রমা চন্দর মন বলে, ওই অচেনা মুখগুলোতে যেন কিছু একটা অভিসন্ধি লেখা।

অভিসন্ধিটা বদ্ধমূল হল সেদিন বাড়ি ফেরার সময়। বাড়ির দরজার কাছে বিমল পাঠক দাঁড়িয়ে। দিনের আলো মুছে গেছে তখন। কে দাঁড়িয়ে আছে প্রথমে ঠাওর করতে পারেনি। চেনার পর চমকেই উঠেছিল হয়তো। আর সেটুকুও বিমল পাঠকের চোখ এড়িয়েছে মনে হয় না। সামলে নিয়ে সহজভাবেই বলতে চেষ্টা করেছে, কি ব্যাপার বিমল বাবু? এখানে দাঁড়িয়ে!

চাকরি নেই, কিন্তু বিমল পাঠকের বেশবাসের চাকচিক্য যেন আগের থেকে বেড়েছে। আর সেই সঙ্গে ছোট দুই চোখের ধারও বেড়েছে। জবাব দিল, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। ভিতরে একটু বসার সুবিধে হবে?

আসুন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডাকতে হল লোকটাকে। ঘরের দরজা খুলে বসতেও দিতে হল। বুকের তলায় কেন যে টিপটিপ করছে রমা জানে না।

বাজে ভনিতায় সময় নষ্ট না করে বিমল পাঠক সোজাসুজি বলল, সেদিন আপনাকে আমি আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে বলেছিলাম। শুধু আপনাকে নয়, সকলকেই সকলের স্বার্থে হাত মেলাতে বলেছিলাম। সেটা করলে মালিকের বাছাই করে ছাঁটাই করার মতো সাহস হত না।

মনোভাব গোপন করে রমা চন্দ বলল, আপনি কি জন্যে হাত মেলাতে বলেছিলেন? তারা আপনাকে ছাড়ল কেন?

—তারা ভুল করেছে। ভয় পেয়ে ভুল করেছে। না বুঝে ভুল করেছে। সে ভুল শুধরোবার সময় এখনো আছে। সে-জন্য আপনার সাহায্য সব থেকে বেশি দরকার।

—আমি কি করতে পারি?

—আমি যা করেছি তাই করতে পারেন। ওদের বোঝাতে পারেন। সাহস করে সাহেবকে আলটিমেটাম দিতে পারেন। মোট কথা ওই অটো হাউস ও-ভাবে চলতে দেওয়া হবে না—আপনি নিজের কোনো ক্ষতির ভয় করবেন না—ক্ষতি আপাতত যদি হয়ও তার সবটুকু পুষিয়ে দেবার দায়িত্ব নিচ্ছি।

রমা চন্দ ফস করে বলে বসল, আপনার ক্ষতি কেউ পুষিয়ে দিচ্ছে মনে হয়?

—হ্যাঁ দিচ্ছে। আপনারও দেবে। পিছনে সঙ্গতির জোর না থাকলে আমি আপনার কাছে এ প্রস্তাব নিয়ে আসতাম না।

ঠাণ্ডা মাথায় রমা চন্দ জিজ্ঞাসা করল, পিছন থেকে অতবড় জোরটা আপনাকে কে দিচ্ছে জানতে পারি?

—তার দরকার নেই। আপনি শুধু আমাকেই বিশ্বাস করতে পারেন। আজ দুদিন আমি ওখানে নেই বলে আপনার কাছে আমার বিশ্বাসের দাবিও শেষ হয়েছে এটা আমি ভাবি না। ভবিষ্যতেও কোনো আশায় আছি আমি এটুকু আপনার জানা নেই ধরে নিচ্ছি না।

রমা চন্দর কানের কাছটা গরম ঠেকছে। ভয় গিয়ে রাগই হচ্ছে তার। লোকটার ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয় একটুও। কিছুকাল আগে হলেও খুব খারাপ লাগতো না। বিপরীত বিমুখতায় ভেতরটা চিড়বিড় করে উঠল আজ। বলে উঠল, কি আপনি আশা করেন আমার কাছ থেকে বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া বিশ্বাসের কথা যে বলছেন, আপনার তো চুরির দায়ে চাকরি গেছে—সেটাই আপনার বিরুদ্ধে আসল অভিযোগ।

বিমল পাঠক থতমত খেল একটু প্রথমে। তারপর চোখের তারায় কুটিল উষ্মা ঝরল যেন একপ্রস্থ। বলল, আপনি রুখে দাঁড়ান, আপনার বিরুদ্ধেও ওই রকম অভিযোগ আসবে।

না, রমা চন্দ বিশ্বাস করল না তবু। রাজা আহমেদ নেশা করে ইয়ারকির ছলে অনেক বাজে কথাও বলে। কিন্তু এ ব্যাপারে ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে। সম্ভব হলে লোকটাকে এখন উঠে যেতে বলতে পারলে বলত। তাও পারা গেল না। তার প্রত্যাশার জবাবটাই দিল। বলল, যাক আপনাদের ব্যাপারে আমি কোনোদিন ছিলাম না, এখনো নেই, আর ক্ষমতা যতদিন আছে নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে পারব।

বিমল পাঠক বলল, ওখানকার ক্ষমতা অন্তত খুব বেশি দিন থাকবে না। আমি আপনার ভালোর জন্যেই বলছি।...ওই মালিকের আমি একদিন ডান হাত ছিলাম, এখন আপনাকে ডান হাত ভাবছেন তিনি। আপনি আর কিছু না পারেন, তার মুখের ওপর প্রতিবাদ জানিয়ে চাকরিটা ছুঁড়ে দিয়ে আসতে রাজী হলে আমি আগেই আপনাকে এর থেকে বেশি মাইনের চাকরিতে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেবো।

বলে কি লোকটা! রাতারাতি এত ক্ষমতা পেল কোথা থেকে রমা চন্দ ভেবে পেল না।

বিমল পাঠক আবার বলে গেল, আপনার জন্যে আমার দুশ্চিন্তা হয়, ওই মানুষটাকে আপনি চেনেন না। তার মতলব ভালো না। আপনি আমাদের দিকে এলে আমি আপনাকে এমন একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি যিনি আপনাকে সব বলবেন।

কে? কে এমন একজন? রমা চন্দর চোখের সামনে হঠাৎ সুমিত্রা বোসের মুখখানা এসে হাজির হল কেন? না, ওর ভুলই হচ্ছে বোধ হয়—এমন একটা বাজে লোকের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক থাকতে পারে! তেতেই উঠল এবার, বলল, দেখুন বিমল বাবু আপনি এরপর আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে মাথা না ঘামালেই খুশি হব। উঠে দাঁড়ালো।—আমি ভয়ানক ক্লান্ত এখন।

উঠে দাঁড়ালো বিমল পাঠকও। ছোট চোখ জোড়া পলকে ক্রূর হয়ে উঠল। আপনি তাহলে আমার কোনো প্রস্তাবে রাজী নন?

—না, আপনি যা বলেছেন সেটা কোনো প্রস্তাব নয়। আপনি আগে নিজের ভালো করুন তারপর আমার ভালোর কথা ভাববেন।

—ও...! ব্যঙ্গভরা মুখটা কুৎসিত হয়ে উঠল এবার।—সাহেবের প্রশ্রয় পেয়ে মেজাজ তাহলে খুশি এখন? কিন্তু আমি বলে গেলাম ওই সাহেবের দিন ঘনিয়ে এসেছে, আর প্রাণের দায়ে তখন তোমাকে এই অধমের কাছেই আসতে হবে সেটা তুমি খুব ভালো করে জেনে রেখে দিও রমা দেবী।

এক ঝটকায় ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল বিমল পাঠক।

রাগ ঠাণ্ডা হতে দুশ্চিন্তায় ছটফট করতে লাগলো রমা চন্দ। একবার ইচ্ছে হল পরামর্শের জন্য আনন্দ চক্রবর্তীর কাছেই ছুটে যায়। একটা দুরভিসন্ধি আছেই ওদের। কিন্তু আনন্দ চক্রবর্তী বাইরের

লোক তিনি এ সবের বাড়তি গুরুত্ব দেবেন কি লঘু করে দেখবেন কে জানে। তাছাড়া ঠাণ্ডা মাথায় আরো কিছু ভাবার অবকাশ দরকার।

সন্দেহটা শুভ্রেন্দু নন্দীকেও না জানিয়ে পারেনি। পরদিনই বিমল পাঠকের কথা বলেছে, কারখানার সামনে যে-সব অচেনা মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকে তাদের কথাও বলেছে।

শুভ্রেন্দু সামান্য হেসে বলেছেন, রাজার মুখে শুনেছি আমার জন্যে তোমার বিষম ভয়, আর ওই জন্যেই গোঁয়ারটাকে তুমি আমার সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছ। বাট আই হেট ফিয়ার মাই ডিয়ার, তুমিও মিথ্যে ভয় পুষো না। বিমল পাঠক ইজ প্লেইং এ লস্ট গেম, তাকে যদি চিনে থাকো ভালো কথা।

অনেকদিন বাদে যেন মানুষটার কোমল মুখ দেখেছিল রমা চন্দ, আর দরদ-ছোঁয়া কথা শুনেছিল।

কিন্তু ইচ্ছে করলেই বা চেষ্টা করলেই ভয় জিনিসটা ছেঁটে দেওয়া যায় না। উল্টে একটা অজ্ঞাত ভয় যেন পেয়েই বসেছিল তাকে। মন বলছিল হবেই কিছু একটা। ভয়ানক কিছুই হবে।

কি কারণে রাজা সেদিন ফ্যাক্টরীতে আসেনি। নেশায় ব্যাঘাত ঘটছিল বলে আচ্ছা করে নেশা করে, ডুব দিয়েছে কিনা রমা জানে না। পরে খেয়াল হল, প্রায়ই ও কারখানা কামাই করছে আজকাল। অথচ সাহেব এ নিয়ে কিছু বলেন না বা ওর খোঁজও করেন না।

রাত সাড়ে সাতটার পরে কারখানা থেকে বেরুতে গিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী থমকে দাঁড়ালেন। গেটের পাশের শেডের কাছে দাঁড়িয়ে রমা চন্দ।

কি ব্যাপার, বাড়ি যাওনি?

রমার দ্বিধাগ্রস্ত মুখ। রাজাটা আজও আসেনি সার—কি হল ভাবছিলাম...

আসবে না জানি, এক কাস্টমারের ড্রাইভার অসুস্থ, দিন কয়েকের জন্যে আমিই ওকে তার গাড়ি চালানোর জন্য পাঠিয়েছি।—কিন্তু ও নেই বলে তুমি দাঁড়িয়ে আছ নাকি?

রমা চন্দ জবাব দিয়ে উঠতে পারল না। শুভ্রেন্দু নন্দী বিরক্ত যেন একটু। আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে ওর মুখখানা ভালো করে দেখলেন। দাঁড়িয়ে থাকার যথার্থ কারণটা অনুমান করতে চেষ্টা করলেন। অল্প হাসি দেখা গেল মুখে। বুঝলেন, রাজা আসেনি তাই শুভ্রেন্দু নন্দীর জন্যেই দুশ্চিন্তা মেয়েটার, ওর অচেনা লোকগুলোর কেউ যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর।

এসো। গাড়ির সামনের দরজা খুলে দিলেন।

শুভ্রেন্দু নন্দী গাড়ি চালাচ্ছেন। রমা চন্দ চকিতে এদিক-ওদিক তাকালো। কিন্তু অচেনা মুখগুলো আজ দেখা গেল না। গাড়ির আওয়াজে অন্ধকারে কোথাও সেঁধিয়ে আছে কিনা কে জানে।

বেশ খানিকটা পথ এগোবার পর শুভ্রেন্দু নন্দীর মুখের হাসি স্পষ্ট হল। গম্ভীর ঠাট্টার সুরে বললেন, বিপদ যদি কিছু হয়ই, তুমিও আমাকে রক্ষা করতে পারো ভাবো তাহলে?

আমতা আমতা করে রমা চন্দ বলতে চেষ্টা করল, ঠিক তা না সার, কেমন মনে হচ্ছিল দুজন থাকলে তবু একটু—কি যে বলবে ভেবে পেলো না! লজ্জাও পাচ্ছে। মনে হল মানুষটা হাসছেন আর বেশ মজা পাচ্ছেন।

একটা বড় রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি থামল। ওকে সঙ্গে করে শুভ্রেন্দু নন্দী ভিতরে ঢুকলেন। রাতের পুরো খাবারের অর্ডার দিলেন দুজনার। কারখানার কাজে বেরিয়ে এরকম মুখোমুখি বসে আগেও খেয়েছে। কিন্তু নিরিবিলি কেবিনে বসে আজ হঠাৎ কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হল রমা চন্দর।

সারাক্ষণের মধ্যে মানুষটা তিনটে কথাও বললেন না। অথচ খেতে খেতে অনেকবার ওকে লক্ষ্য করেছেন। রমা চন্দর রূপ নেই, বুকের তলায় এই গোছের অস্বস্তির জন্যও ও আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

খাওয়া শেষ করে আবার ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বেশ স্পীডেই রওনা হলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। কারখানা ছাড়িয়ে খানিকটা আসার পরেই এই মানুষের জন্য অজ্ঞাত ভয়টা কেটে গেছল। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে মুখ ফুটে নিজের বাড়ি ফেরার কথাটা বললেই হতো। অথচ কেন যেন বলে উঠতে পারেননি।

ওকে নিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে চলে এলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। হাতে ধরে দোতলায় উঠে এলেন। বেশ নির্লিপ্ত স্বাভাবিক মুখ। কিন্তু রমা চন্দ ভিতরে ভিতরে ঘামতে শুরু করেছে। হঠাৎ বিমল পাঠকের কথাগুলো মনে পড়ল। সে বলেছিল, মানুষটাকে আপনি চেনেন না। তাঁর মতলব ভালো না। চেনাবার জন্য কার কাছে যেন নিয়েও যেতে চেয়েছিল তাকে।

বড় ঘরটার পাশের সেই ছোট ঘরটাতে এসে হাত ছেড়ে দিলেন। হাতটাও যেন অসাড় রমা চন্দর। অনুচ্চ সুরে বললেন, বোসো। এবারে একটু সংগীত চর্চা হোক।

চৌকির এক কোণে জড়সড় হয়ে বসল রমা চন্দ। শুভ্রেন্দু নন্দী কেস থেকে ভায়লিন বার করলেন। তিনি তখনো বসেননি।

...বাজনার শুরু থেকেই ভিতরে আবার কাঁপুনি শুরু হল রমা চন্দর।

কারখানার মালিক খুব ভালো বেহালা বাজান এটা তার শোনা ছিল। আনন্দকাকু বলেছে, রাজা আহমেদ বলেছে। কিন্তু গান-বাজনার সঙ্গে রমা চন্দর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না বলে তেমন আগ্রহ বোধ করেনি কোনোদিন।

...বাজনার শুরুতেই গা ছম-ছম করে উঠল। ছড়ির লম্বা লম্বা টানে ঘরের মধ্যে আচমকা একটা আর্তনাদ মূর্ত হয়ে উঠল। আর তারই মধ্যে যেন থেমে থেমে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছে আর একটা ধীর সুরের রেশ। একটা অস্থিরতার আবর্তের মধ্যে যেন স্থিরতার পদযাত্রা।

প্রথমে ঘুরে ঘুরে বাজাচ্ছিলেন, তারপর চৌকিতে বসেছেন। রমা চন্দর পাশ ঘেঁষে একেবারে। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলোটাও নিভিয়ে দিয়েছেন। পাশের বড় ঘরের আলো খানিকটা অবশ্য এঘরে এসে পড়েছে, কিন্তু রমা চন্দর অস্বস্তিটা আস্তে আস্তে কোথায় তলিয়ে যেতে লাগলো নিজেও জানে না। একটা তন্ময়তার মধ্যে ডুবে যেতে লাগলো সে।...ডুবেই গেল। আবছা অন্ধকারে অপলক চোখে মানুষটাকে দেখছে খেয়াল নেই।

বাজনা থামলো একসময়ে। এক ঘণ্টার ব্যবধানে কি এক যুগের ব্যবধানে জানে না। তারপরেও অনুভূতি সচেতন নয়। অভিভূতের মতো বসেই ছিল।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ।

...ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত। আবছা আলোয় মানুষটা পাশে দাঁড়িয়ে।

অপর হাতখানাও অন্য কাঁধে উঠে এলো। আরো একটু কাছে টেনে আনলো তাকে। লম্বা মানুষ, সামান্য ঝুঁকে দেখতে লাগলো। নির্নিমেষে দেখছে। একটা তপ্ত নিশ্বাস সোজা তার মুখের ওপর এসে পড়ল।

রমা চন্দ কাঁপছে থরথর করে। ভয়ানক জল তেষ্টা পাচ্ছে তার। আবছা অন্ধকারে তারও দু চোখ মানুষটার মুখের ওপর উঠে এসেছে। কিন্তু নিস্পন্দ পঙ্গু যেন। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। একটা সর্বনাশের মুহূর্ত বুঝি আসন্ন।

খুব মৃদু অথচ ভরাট একটা কণ্ঠস্বর ওকে যেন আত্মস্থ করে দিল খানিকটা। শুভ্রেন্দু নন্দী বললেন, ইউ হ্যাভ স্টার্টেড লাইকিং মি...দ্যাট্স ব্যাড...আই অ্যাম অ্যান্ ওল্ড্ ম্যান। ইউ আর এ জেম, তোমার আলোয় যার ঘর ভরে উঠতে পারে এমন কাউকে বেছে নাও, একবার দুঃখ পেয়েছ, আর দুঃখ ডেকে নিও না। নিজে না পারো আমি আনন্দকে বলে দেবো, হি উইল গেট্ ইওর ম্যান...তোমাদের সামনের পথ আমি সুন্দর করে দেবো, কিছু ভেবো না—জাস্ট গেট ইওর ম্যান অ্যান্ড লিভ এভরিথিং টু মি। রাত হল, চলো তোমাকে এবার পৌঁছে দিয়ে আসি।

আবার গাড়ি ছুটেছে।

রমা চন্দ মুখ বুজে পাশে বসে আছে। ভিতরটা তার কোনো জাদু মন্ত্রে অদ্ভুত ভরাট হয়ে গেছে। অথচ আশ্চর্য, কেন যেন আবার কান্নাও পাচ্ছে।

সকালের ভাঁজ করা কাগজটা খুলেই আনন্দ চক্রবর্তী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন, কি সর্বনাশ! তার পরেই কাগজ ফেলে তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলিয়ে গাড়ি বার করবার জন্য নিচে নেমে এলেন।

রমা চন্দর খুঁটিয়ে কাগজ পড়ার মত ধৈর্য নেই কোনোদিন। বড় হরফের বড় খবরের মাথাগুলো পড়া হলেই তার কাগজ পড়া শেষ। কিন্তু আজ কাগজখানা খুলেই সেও একটা আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠল। নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না যেন। সামনের বড় ছবিটা দেখেছে শুধু আর তার ওপরের কটা অক্ষর। তারপরেই কাগজ ফেলে পড়ি-মরি করে ছুটেছে।

রাস্তায় লোক ধরে না। সেই ভিড় ঠেলে ঠেলে সামনে এগোতে পারলে নান্ডি অটো হাউসের কারখানা এলাকা।

বৃত্তাকারের সাইন বোর্ডটা আছে। তার ও-ধারে চোখ পড়ামাত্র দেহের সমস্ত স্নায়ু একসঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে একটা।

সামনে কারখানা নয়, কারখানার বিশাল একটা ভস্মীভূত কংকাল। চোদ্দ আনা দগ্ধ হয়ে গেছে, বাকি দুআনা হয়নি বলেই যেন আরো বিকট, বীভৎস!

—যেখানে মাস ভাড়ায় লোকের গাড়ি থাকতো সেই বিচ্ছিন্ন শেডটা ছাড়া আর সব-কিছু অঙ্গার হয়ে গেছে। অর্থাৎ, আগুনের গ্রাসের লক্ষ্য ছিল শুধু ওই কারখানাটা। সেটা সে গ্রাস করেছে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী বেশ নিবিষ্ট মনে দৃশ্যটা দেখছেন। তাঁর শান্ত মুখে একটা আঁচড় পড়ছে না।

এমন সময় লক্ষ্য করলেন তাঁর পাশে বোবা মূর্তির মতো আনন্দ চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে। আর তার পাশে স্তব্ধ চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে কালো মেয়ে রমা চন্দ। ভিড়ের মধ্যে দুহাত কোমরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে রাজা আহমেদও।

...ওদের সকলের বুকের তলায় কি হচ্ছে সেও যেন দেখার বস্তু। ঘাড় ফিরিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী তাই যেন দেখতে লাগলেন।

এত বড় সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনের অবস্থা নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য প্রায়। রিক্ত সর্বস্বান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরছিলেন যখন, তখন থেকে বিত্ত বৈভব আর ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে এসেছেন। এই একটি মাত্র লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এগিয়েছেন। এরই ওপর জীবনের সুখশান্তির নির্ভর।

...সেই বিত্ত সেই বৈভব আর সেই ক্ষমতার আসনে বসেছিলেন। অথচ লক্ষ্যকেন্দ্র যেন দূরেই সরে যাচ্ছিল। আজ বিত্ত পুড়েছে, বৈভব পুড়েছে, ক্ষমতা পুড়েছে, কিন্তু একদিনের সেই রিক্ত নিঃস্ব ছেলেটার সঙ্গে আজকের এই হৃতসর্বস্ব মানুষটার কি আশ্চর্য তফাৎ। এই আগুনের সঙ্গে সঙ্গে সেই হাহাকার পুড়েছে, অসহিষ্ণুতা পুড়েছে, দম্ভ পুড়েছে, সুখস্বপ্নের মোহ পুড়েছে। আজ এই সর্বনাশের মুখোমুখি এসে এই প্রথম যেন তিনি নিজের শক্ত দুটো পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। কি এক আত্মিক বিশ্বাসে ভরপুর যেন হঠাৎ তিনি। এই বিশ্বাসের আয়নায় জীবনের অর্থ তাৎপর্য বড় বিচিত্রসুন্দর মনে হচ্ছে তাঁর।

আনন্দবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হল শুভ্রেন্দু নন্দীর। হাসতেও পারেন, কিন্তু এ-সময় এখানে দাঁড়িয়ে হাসলে লোকে পাগল ভাববে। বললেন, আমি শেষ রাতে টেলিফোনে খবরটা পেয়ে এসেছিলাম। দরোয়ান দুটোর কিছু হয়নি রক্ষা—।

আনন্দবাবু সাহিত্যিক। এই শান্ত মুখখানা অদ্ভুত নতুন ঠেকল তাঁর চোখে। দরোয়ানের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা বোধটুকুও। মুখে কথা সরে না। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, ফায়ার ইনসিওরেন্স করা ছিল?

শুভ্রেন্দু নন্দী নিরুদ্বিগ্ন মুখে মাথা নাড়লেন, ছিল না। তারপর গম্ভীর কৌতুকের সুরে বললেন, ফায়ারের আবার ইনসিওরেন্স হয় নাকি, না তাতে আগুন নেভে! রমা চন্দর দিকে চোখ গেল। কালো মুখের দুগাল বেয়ে ধারা নেমেছে। আনন্দবাবুর দিকে ফিরে শুভ্রেন্দু নন্দী বলে উঠলেন, কি কাণ্ড...তোমার খুকীর কান্না থামাও দেখি আগে!

একটু বাদেই বন্ধুকে আর পাশে দেখতে পেলেন না আনন্দবাবু! রমাকে নিয়ে সেখান থেকে তাঁর বাড়ি এলেন একসময়। সেখানেও নেই। দুপুরে বিকেলে রাতে টেলিফোন করলেন, কেউ ধরল না, টেলিফোল বেজেই গেল।

গলদঘর্ম হয়েও ছসাত দিনের মধ্যে আর ধরা গেল না। যেন হাওয়ায় মিশে গেছে লোকটা। তারপর মাত্র গত পরশু সন্ধ্যায় নিজেই টেলিফোন পেলেন, একবার এসো, খুব দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে।

আনন্দবাবু ছুটে গেলেন। আরো অবাক, লোকটা বেশ খোশ-মেজাজে আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় ছিলে এতদিন?

আমার সেই ভিখিরি গুরুর কাছে। তাকে নিয়ে একটা ছোট্ট হোটেলে কটা দিন বেশ কাটালাম হে—এখানে থাকলেই তো তোমাদের জ্বালাতনে অস্থির হতে হতো...বুড়োর চোখে ছানি পড়েছে, হাসপাতালে ভর্তি করে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে ছুটি।...অবশ্য এর মধ্যে এদিকেরও কিছু কাজ সারতে হয়েছে।

আনন্দ চক্রবর্তী হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

শোনো, আমি এবারে একটু বেরুব, তার আগে তোমাকে গোটাকতক কাজের ভার দেবো।

খট করে কানে লাগলো আনন্দবাবুর।—বেরুবে মানে?

মানে বেরিয়ে পড়ব।

কদিনের জন্য?

তা কি করে বলব?

কবে বেরুবে?

ঠিক করিনি।

কোথায় যাবে?

শুভ্রেন্দু নন্দী হাসতে লাগলেন। এই মুখে এমন হাসিও বুঝি আনন্দবাবু আর দেখেন নি। জবাব পেলেন, সেটাও অনিশ্চিত এখন পর্যন্ত।

ঈষৎ রাগত সুরেই আনন্দবাবু বলে উঠলেন, দেখ, পাগলামো কোরো না—তুমি শক্ত হয়ে দাঁড়ালেই আবার সবই ডবল হয়ে ফিরে আসবে।

শুভ্রেন্দু নন্দী হাসছেন মৃদু মৃদু। বললেন, ডবল ছেড়ে কতগুণ হয়ে ফিরে এসেছে জানো না বন্ধু।...যাক কাজের কথা শোনো। এই কাগজ-পত্রগুলোর সাক্ষীর জায়গায় তুমি সই করে রমাকে আর রাজা আহমেদকে দেবে। ভাড়ার গ্যারাজটা ঠিক আছে, ওর থেকে মাসে যা আসবে ওরা দুজন আধা-আধি ভাগ করে নেবে। ওই সমস্ত জমি আমার বিশ বছরের লিজ নেওয়া আছে, ইচ্ছে করলে ওরা দুজনে সেখানে ছোটখাট একটা কারখানাও ফেঁদে বসতে পারে।

...আর এই ড্রাফটটা রমাকে দেবে, আর তুমি ওর একটা খুব ভালো বিয়ের ব্যবস্থা করবে।

আনন্দ চক্রবর্তী নির্বাক। তাঁর সামনে রমার নামে বিশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ একটা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আনন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এসব কাণ্ড করছ কেন...এর পরেও আবার পোলিটিক্যাল হামলা কিছু হতে পারে ভাবছ—তাই সরে যেতে চাইছ?

শুভ্রেন্দু নন্দী আকাশ থেকে পড়লেন যেন। —পোলিটিক্যাল! যা ঘটেছে তার মধ্যে রাজনৈতিক হামলার নামগন্ধ আছে ভাবছ নাকি তোমরা সব?

নেই? অবাক আনন্দ চক্রবর্তীও।

একটুও না।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শুভ্রেন্দু নন্দী ছোট একটা শুকনো নিশ্বাস ফেলে অনেকটা যেন নিজের মনেই বললেন, সুমিত্রা আমাকে ছেড়েও ছাড়তে পারল না, আশ্চর্য। আমাকে না পাওয়ার বিকৃত রাগে আর যন্ত্রণায় বিমল পাঠকের মতো অমন ভালো মেকানিকটাকেও নষ্ট করে ফেলল...।

আনন্দ চক্রবর্তী স্তব্ধ বিমূঢ়ের মতো বসে।

সমস্ত দিন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ছটফট করে আনন্দ চক্রবর্তী পরদিন অর্থাৎ গত সন্ধ্যায়ও ছুটে এসেছেন আবার। বাড়িটার সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ। বাইরে তালা ঝুলছে। শুভ্রেন্দু নন্দী চলে গেছেন!

সেখান থেকে কি ভেবে আনন্দ চক্রবর্তী সোজা চলে এসেছেন সুমিত্রা বোসের ফ্ল্যাটে। তিনি সামনের ওই বাড়িতে থাকেন না, অন্যত্র থাকেন। সেই ফ্ল্যাটের মোটা ভাড়াও কাপুর দিয়ে থাকেন।

নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলেন।

...তাঁকে দেখে আনন্দ চক্রবর্তী চমকেই উঠলেন। এই ক'দিনের মধ্যে যেন এক চেনা রূপসীর প্রেত দেখলেন তিনি। বিবর্ণ মুখ, চোখের কোলে কালি, অবিন্যস্ত চুলের বোঝা—পরনের শাড়িটাও তেমন পরিষ্কার নয়। মেঝের এক কোণে মূর্তির মতো বসে আছেন।

আনন্দবাবুকে দেখে হঠাৎ যেন অতি আপনার জন কাউকে পেলেন। বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন একেবারে। উত্তেজিত বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, এ-রকম হবে আমি জানতাম না, আমি কাউকে এ-কাজ করতে বলিনি, বিমল পাঠককে আপনারা ধরুন, তাকে পুলিসে দিন—আমি সাক্ষী দেবো।

আনন্দ চক্রবর্তী চেয়ে আছেন। দেখছেন। সুমিত্রা কাঁপছেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাজ করতে বলেননি, কিন্তু কি বলেছিলেন? ...শুভ্রেন্দু নন্দীর সব শান্তি কেড়ে নিতে?

নিমেষে আবার রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখ সুমিত্রার।

খুব ধীর স্বরে আনন্দ চক্রবর্তী আবার বললেন, তার বদলে ঢের ঢের বড় শান্তি নিয়ে চলে গেছে লোকটা।...আর সকলকে কত আশীর্বাদ করে গেছে জানেন না..বোধহয় আপনাকেও।

দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হল না, পিছনের দেয়াল হিঁচড়ে আবার মাটিতে বসে পড়লেন সুমিত্রা বোস।

বাড়ি ফিরে আনন্দ চক্রবর্তী শুনলেন রাজা আহমেদ একটা চিঠি আর একটা প্যাকেট রেখে গেছে।

লেখক আনন্দ চক্রবর্তী এবারে কিছু লিখতে পারেন। সেটা কোনো সাধারণ মানুষের কথা হবে কি অসাধারণ মানুষের, তিনি জানেন না। বন্ধুর চিঠির জবাব তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এখনো দেখতে পাচ্ছেন। সুমিত্রা বোসের বুকের ভিতরটা জ্বলে জ্বলে কোনোদিন ছাই হবে না, অনির্বাণ শিখায় শুধু জ্বলবেই.

...এই মুহূর্তে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রাজা আহমেদ। সামনের দিকে চেয়ে সে অস্তিত্বের একটা অগ্নিদগ্ধ কংকাল দেখছে না, সে এইখানেই নতুন কারখানার একটা স্পষ্ট স্বপ্ন দেখছে।

কালো মেয়ে রমা চন্দর কালো চোখের গভীর থেকে আশার আলো উপছে উঠছে। সে ভাবছে, দুনিয়াটা এমন কি বড়, কত আর বড়, একটা হারানো মানুষকে খুঁজে বার করে আবার কাছে টেনে আনা যাবে—নিশ্চয় যাবে—যাবেই।

...সবই জ্বলে পুড়ে সত্যিই ছাই হয়ে যায় কিনা, চিঠিতে সেই সন্ধানটুকু শুভ্রেন্দু নন্দী রেখে যেতে অনুরোধ করেছিলেন।

এই সন্ধান আনন্দ চক্রবর্তী এখন রেখে যেতে পারেন।

ঝংকার

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত অসিত সেন

প্রিয়বরেষু

এক

আমি আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে। সামনের উঁচু আসনে বিচারক বসে। বিচারের ঘর—লোক গিসগিস করছে। সকলের জোড়া জোড়া চোখ আমার ওপর।

বিচারের এই মহড়া আগেও বারকয়েক হয়ে গেছে।

আমার চারদিকে একটা জোরালো আলোর বেষ্টনী। সেই বেষ্টনী ছাড়ালে এতবড় পরিবেশের সবটাই যেন আবছা অন্ধকার। চেষ্টা করলেও সহজে চোখ চলে না। কিন্তু তবু আমি যেন দেখতে পেতাম, অনুভব করতাম। ওই জোড়া জোড়া চোখগুলো আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরে আছে। সেই দৃষ্টিতে শালানতা নেই, লজ্জা নেই, অনুকম্পা নেই।

আমি খুনের আসামী সেটা প্রতিদিনের ক্লান্তিকর জেরায় জেরায় প্রায় প্রমাণের মুখে এসে ঠেকেছে। সুচিন্তিত এক নির্মম হীন চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত আমি। আমার রূপ আছে, যৌবন আছে, রমণী দেহের এই কাঠামোয় পুরুষের লোভনীয় কিছু সম্পদ আছে। এই আদালত ঘরে একটু একটু করে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে রমণী দেহের এই সুন্দর সহজ সরল নিষ্পাপ খোলসটার আড়ালে একটা বিষাক্ত সাপ বাসা বেঁধে আছে। সে সময়ের অপেক্ষায় ছিল, সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। একদিন সেই সময় চুপিসারে এগিয়ে এসেছে, সেই সুযোগ পুরুষের জৈবিক ক্ষুধা আর বিস্মৃতির ফাঁক ধরে হাতের মুঠোয় এসে উপস্থিত হয়েছে। আর তক্ষুনি এই মোহিনীর বুকের তলায় সেই সাপ ফণা তুলেছে, অব্যর্থ দংশনে পুরুষের অচরিতার্থ অভিলাষ চিরদিনের মতো স্তব্ধ করেছে।

সেই পুরুষ আমার স্বামী। আমার প্রেমের অন্তরায়। আমার প্রেমিকের অন্তরায়। তাই সে সদাসন্দিগ্ধ, সর্বদা নিষ্ঠুর, কঠিন। রমণীর যে দেহ আর যে মন অপরের প্রণয়াসক্ত, সেই দেহ মনের ওপর দখল নেওয়ার ব্যাপারে তার নিষ্ঠুর উল্লাস, অকরুণ আসক্তি। তার এই দুর্বলতার ফাঁক ধরেই চক্রান্তের সুচতুর বুনটে আমি তার এই জগতের কামনা-বাসনা চিরদিনের মতো শেষ করে দিয়েছি নাকি। দিয়ে নিজেকে নিষ্কণ্টক ভেবেছি। আমার সেই চক্রান্ত সমস্ত দুনিয়ার চোখে ধুলো দেবার মতোই নিপুণ বটে। কিন্তু এই সভ্য যুগে পারফেক্ট ক্রাইম সম্ভব নয় বলেই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তে হয়েছে। আমি ধরা পড়েছি। জেরায় পড়ে শেষ পর্যন্ত আমার প্রণয়ী আমার সমানে দাঁড়িয়েই স্বীকার করেছে, স্বামীর কারণে আমার জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল, যথার্থই আমি মনে প্রাণে মুক্তির পথ খুঁজছিলাম। আদালতের আশ্রয় নিয়ে বিচ্ছেদের চেষ্টা করিনি কারণ স্বামীকে আমি ভয় করতাম, তার বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে আতঙ্কের কারণ। প্রসিকিউশন কাউনসিলর এই যুক্তিও প্রায় নস্যাৎ করেছেন। বিচ্ছেদের রাস্তা নিয়ে স্বামীর বিপুল বৈভব থেকে নিজেকে বঞ্চিত না করার লোভেই ডিভোর্স চাইনি—এটাই তাঁর স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি।

আদালতে যারা উপস্থিত এ-যুক্তি তারাও অখণ্ডনীয় ভাবছে। আলোর বেষ্টনীর বাইরে খুব ভালো করে ঠাওর না হলেও সেই জোড়া-জোড়া চোখগুলো তাই অকরুণভাবে আমার দেহের সঙ্গে আটকে আছে অনুভব করছি। ক্ষমাশূন্য জনতার ওই লুব্ধ দৃষ্টি এই সুন্দর রমণী-দেহ অনাবৃত করে দেখে নেবার সুযোগ পেলে হয়তো তাই দেখে নেয়।

কাঠগড়ার মধ্যে আমার নির্বাক দ্রষ্টার ভূমিকা, মূক শ্রোতার ভূমিকা। বিচারক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি দোষী কি নির্দোষ। বলেছি, সম্পূর্ণ নির্দোষ। তারপর থেকে এই বিচারের মহড়া চলেছে। আমার উকিলের নির্দেশ প্রতিপক্ষের কোনো কথা বা কোনো জেরার একটিও জবাব দেবেন না। তার নির্দেশ মতো আমি মুখ সেলাই করে আছি। আমি রমণী, বিচারক তাই অনুগ্রহ করে কাঠগড়ার মধ্যে একটা বসার চেয়ার রাখার অনুমতি দিয়েছেন। বোবার মতো সেই চেয়ারে বসে থাকি।

কিন্তু আজ আমি বসতে পারছি না। দাঁড়িয়ে আছি। আমার পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। তবু দাঁড়িয়ে আছি। একটা চাপা উত্তেজনায় বুকের মধ্যে ঠক-ঠক শব্দ হচ্ছে। মাথার মধ্যে কিসের দামামা বেজে চলেছে। আমার অপরাধ প্রায় প্রমাণের মুখে এসে ঠেকেছে বলে নয়। বিচারক অবধারিত অন্তিম রায় ঘোষণা করবেন বলেও নয়।

...সাময়িক বিরতির পর পুলিশের হেপাজতে আবার এজলাসে ঢোকার সময় সামনের বিশিষ্টজনদের আসনে একজনকে আমি বসে থাকতে দেখেছি।

অভিজাত বেশবাস, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, পুষ্ট লম্বাটে দু'হাতের আঙুল শরীরের তুলনায় ঠোঁটদুটো একটু ভারী। মাথায় ঈষৎ অবিন্যস্ত বড় চুল। বসে থাকার ভঙ্গিটা নির্লিপ্ত শিথিল।

ওই লোক আমাকে দেখেছে কি দেখেনি জানি না। হয়তো দেখেছে। এখানে আমাকে আর না দেখেছে কে। কিন্তু দেখলেও ওই লোক চিনবে না আমাকে। আমি চিনি। সমস্ত সত্তা দিয়ে চিনি। সমস্ত রক্তকণা দিয়ে চিনি। তাকে দেখামাত্র একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা আমার বুক ঠেলে উঠে আসছে। সেই যন্ত্রণা ঘৃণার আকারে দুই চোখ দিয়ে গলগল করে ঠিকরে বেরুচ্ছে কিনা জানি না।

...প্রতিপক্ষের উকিল আঙুল নেড়ে নেড়ে আমাকে দেখাচ্ছে আর বলছে কি। ওই বসা লোকটার মুখের ওপর থেকে নিজের চোখ দুটোকে জোর করে টেনে নিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। ঠাস ঠাস করে এক-একটা শব্দ আমার কানের পর্দায় যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো বেজে চলল।

...হীন ঘৃণ্য চক্রান্ত ... বিশ্বাসঘাতিনী ...!

মার্ডার... প্রি-প্ল্যাণ্ড কোলড্ ব্লাডেড মার্ডার!

আমার চোখের সামনে দ্রুত, খুব দ্রুত এই আদালতের দৃশ্য মুছে যেতে লাগল। আর এক দিনের এক আদালতের বিচারের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেখানে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রায়-বৃদ্ধ এক মানুষ। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে সেই মানুষ তার বিচার দেখছে, শুনছে। ফ্যাল-ফ্যাল করে জনতাকে দেখছে, বিচারককে দেখছে। তারপর যেন একটু একটু করে সচেতন হচ্ছে। লজ্জায় অপমানে ত্রাসে বিবর্ণ মূর্তি তার। তার দিকে লম্বা লম্বা আঙুল নেড়ে পুরু ঠোঁট নেড়ে একটি মানুষ কথার ঝড় তুলে বলছে, এ ফার্স্ট গ্রেড ক্রাইম ... প্রি-প্ল্যাণ্ড প্রি-মেডিটেটেড কোল্ড ব্লাডেড অফেন্স...হীন ঘৃণ্য চক্রান্ত... আভিজাত্যের মুখোশ আঁটা বিশ্বাসঘাতক... তিন তিনজন মানুষ চক্রান্তের বলি হয়ে আত্মহত্যা করেছে, আর সরল বিশ্বাসে কতজন সর্বস্বান্ত হয়েছে...কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারের সঙ্গে এ রকম অপরাধের তফাৎ কোথায়? কোথায়? কোথায়?

...কাঠগড়ার সেই প্রৌঢ় কাঁপছে থরথর করে, ঘামছে দরদর করে। মাথা নেড়ে অব্যক্ত যাতনায় বলতে চাইছে কি, তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে ...

আমার চোখের সামনে থেকে প্রতিপক্ষের উকিলের মুখ মুছে যাচ্ছে, তার বদলে লম্বা লম্বা আঙুল আর পুরু ঠোঁট নেড়ে নেড়ে আর একজন ওই কথাগুলো বলছে যেন—আর এক দিনের আর এক আদালতের সেই একজন।

...চোখের সামনে সেই লম্বা লম্বা আঙুল আর পুরু ঠোঁটই যেন নড়ছে।

...হীন ঘৃণ্য চক্রান্ত... রূপের কোমল সুন্দর মুখোস আঁটা বিশ্বাসঘাতিনী ...মার্ডার ... প্রি-প্ল্যাণ্ড প্রি-মেডিটেটেড কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার।

জ্বলন্ত ক্রোধে আর ঘৃণায় আর বিদ্বেষে আর যন্ত্রণায় সমস্ত আদালত ঘর আমার চোখের সামনে দুলে দুলে উঠলো, পায়ের নীচের মাটি সরে যেতে লাগল, চোখের সামনে যেন রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসতে লাগল। জ্ঞান হারাবার আগে একটা অন্তিম আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে — না, না না! সব মিথ্যে! সব ষড়যন্ত্র ! না না না না —না না না ! মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকের উল্লাসভরা গলার সুর কানে এলো —কাট্ ...

কাট্! তারপর খানিকক্ষণ পর্যন্ত আর কিছু মনে নেই!

চোখে মুখে জলের ঝাপটা পড়তে সম্বিৎ ফিরল।

স্টুডিও ঘরে সমস্ত আলো জ্বলে উঠেছে। অনেকগুলো উদ্গ্রীব মুখ আমার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। পরিচালক আর সহকারী পরিচালক, একটু আগের উঁচু আসনে সমাসীন বিচারক, এই তিনজন একসঙ্গে আমাকে প্রায় আলতো করে তুলে আনতে চেষ্টা করছে। তাদের নিরস্ত করলাম। তবু যেন আত্মস্থ হতে সময় লাগছে একটু। মাথার ভিতরটা এখনো ঝিমঝিম করছে। উঠে চেয়ারে বসলাম। তারপর দু'—পায়ের ওপর ভর করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। সমস্ত নায়িকার জন্যে যেমন থাকে স্টুডিওর মধ্যে আমার জন্যেও তেমনি ঘর আছে একটা। সেখানে যাব। সত্যিই বিশ্রাম দরকার একটু।

পরিচালক আর সহকারী পরিচালক আমাকে ধরে স্টুডিওর কাঠগড়া থেকে বার করে আনল। আনন্দে ডগমগ তারা। এমন একাত্ম জীবন্ত অভিনয় আর বুঝি তারা জীবনে দেখেনি।

বিশিষ্ট আসনগুলোর সামনে দিয়ে যেতে যেতে আড়চোখে সেই মানুষটার দিকে তাকালাম আমি। সেই একজনের দিকে, যার অভিজাত বেশবাস, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, পুষ্ট লম্বাটে দু'হাতের আঙুল, দুটো ভারী ঠোঁট, মাথায় ঈষৎ অবিন্যস্ত বড় চুল। কমনীয় মুখ, কিন্তু লক্ষ্যস্থল বিদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়ালে ওই কমনীয় মুখের চোয়ালসুদ্ধ কত দৃঢ় কঠিন হয়ে উঠতে পারে সে শুধু আমিই জানি। চোখ ফিরিয়ে নিতে হল। কারণ ওই লোক আমার দিকেই চেয়ে আছে, শিথিল বসার ভঙ্গি সত্ত্বেও দুই চোখে ঈষৎ হাসি-মাখা বিস্ময়ভরা প্রশংসা।

এখানে সকলেই আমার দিকে চেয়ে আছে, আমাকেই দেখছে জানি। এইসব চোখের আঘাতে এরই মধ্যে আমি অনেকখানি নির্লিপ্ত নিস্পৃহ হয়ে উঠেছি। আজ তো বিশেষ আগ্রহ নিয়েই দেখবে সকলে। কারণ এমন একাত্ম অভিনয় সচরাচর কি দেখা যায় যেখানে নায়িকা অভিনয়ের ইমোশনে সত্যি সত্যি মূর্ছা যেতে পারে!

কিন্তু শুধু ওই একজনের এই স্তুতি মাথা চাউনিটা অসহ্য মনে হল আমার, দৃষ্টিটা যেন শরীরে বিদ্ধ হতে থাকলো। তাকে ছাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলাম আমি।

নিজের ঘরে এসে গদি আঁটা ইজিচেয়ারে শরীর ছেড়ে দিলাম। সত্যি অবসন্ন লাগছে। বুকের ভিতরটা এখনো যেন উত্তেজনায় ধকধক করছে। সেই আর এক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অসহায় প্রৌঢ় মূর্তি চোখে ভাসছে, আর বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে এখনো সেই সোচ্চার ধিক্কার মাখা অভিযোগের লম্বা লম্বা আঙুল আর পুরু ঠোঁট নড়ছে।

ওই আঙুল আর ওই মুখ আর ওই দুটো পুরু ঠোঁট আমার অনেক দিনের শান্তি নষ্ট করেছে, অনেক রাতের ঘুম কেড়েছে। আজও ওগুলো এক দুঃস্বপ্নের মতো আমার ভিতরে একটা ক্ষত সৃষ্টি করে বসে আছে।

অভিনয় জগতে আমি এক নবাগতা চিত্রতারকা। প্রথম আর্বিভাবেই আমি নামজাদা প্রযোজক পরিচালকের ছবিতে কাজ করছি। আমার বিপরীতের পুরুষ তারকাটিরও ভারতজোড়া নাম। তাই আমাকে নিয়ে ছায়াছবির পত্র-পত্রিকায় অনেক আলোচনা অনেক জল্পনা-কল্পনা আর অনেক ছবির ছড়াছড়ি। ওই সব কাগজে আজেকের এই ঘটনা আবার নতুন করে সাড়া জাগাবে জানি। আর্তনাদের পর সত্যিই যখন সেই সাময়িক বিস্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম, মুখের ওপর তখন ফটাফট কত ফ্ল্যাশ বালব জ্বলে উঠেছে জানি না। অভিনয়ের ইমোশনে সত্যি সত্যি ফেন্ট হয়ে যাওয়াটা ওই সব কাগজের চটকদার খবর হবেই। প্রযোজক ফ্লোরে উপস্থিত ছিল না, কিন্তু নামী পরিচালকের মুখে খুশি ধরে না দেখেছি। কতবার পিঠ চাপড়ে বলেছে, স্প্লেনডিড্ ম্যাডাম, স্প্লেনডিড্!

কিন্তু এক পেয়ালা কড়া কফি খাবার পর একটু সুস্থ হয়েও ও-সব সৌভাগ্যের কথা আমি ভাবছি না। ঘৃণা আর বিদ্বেষ মেশানো বিস্ময়ে আমি শুধু ভাবছি স্টুডিও ফ্লোরের বিশিষ্ট চেয়ারে আজ ওই লোককে দেখলাম কেন! সে এখানে কোন্ সুবাদে এসে উপস্থিত হল! তবে কি কাগজে কাগজে আমার চেহারার চটক দেখে আর পাঁচজনের মতো লোভের বশে কাউকে ধরে স্বচক্ষে শুটিং দেখতে এসেছে? ও-রকম সঙ্কল্পবদ্ধ দাম্ভিক পুরুষেরও ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্তিগত দুর্বলতা লুকিয়ে আছে?

আজ কোন্ বিতৃষ্ণায় কোন্ অবরুদ্ধ ক্ষোভে আর কোন্ যন্ত্রণায় অভিনয়ের ফাঁক দিয়ে এ-রকম একটা কাণ্ড ঘটে গেল সে একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

ও. কে. ম্যাডাম? দরজা ঠেলে পরিচালক হাসিমুখে গলা বাড়িয়েছে।

আমিও হেসেই মাথা নাড়ালাম। — ও. কে।

উৎফুল্ল গলায় পরিচালক বলল, তাহলে আমার এক বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই—এ ভেরি রেসপেকটেবল্ পারসন, কাম ইন সার! দরজার বাইরে মুখ ঘুরিয়ে একজনকে অন্তরঙ্গ আহ্বান জানাল পরিচালক।

আমি ভালো করে সোজা হয়ে বসার আগেই তার পিছনে যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখা মাত্র হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি সজোরে লাফিয়ে উঠল আমার। ধমনীর রক্তের কণায় কণায় একটা জ্বালা অনুভব করলাম। একই সঙ্গে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা আর বিতৃষ্ণা ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল।

সেই মানুষ। সত্যিকারের আদালতে দাঁড়িয়ে আসামীর দিকে লম্বা লম্বা আঙুল নেড়ে যে অভিযোগের স্ফুলিঙ্গ ছোটাতে পারে। পুরু দুই ঠোঁট নেড়ে যে ঝড় বইয়ে অভিযুক্ত আসামীকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলতে পারে। কমনীয় মুখের চোয়াল দুটো কঠিন হলে যাকে ভয়াবহ মনে হয়।

আরাম চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। আমি অভিনেত্রী। সেটাই সৌজন্য। কিন্তু চেষ্টা করেও মুখে একটু সহজ হাসি টেনে আনতে পারলাম না। তার ওই কমনীয় মুখের ওপর আমার চোখ যেন এঁটে বসতে চাইল।

পরিচয় দিতে গিয়ে পরিচালক আমার প্রশংসায় প্রগল্ভ হয়ে উঠল।

—ইনি মিস সুজাতা পাণ্ডুরং, একদিকে এম্-এ, আর একদিকে এই প্রথম ছবিতে নামার ফলেই ইনডাসট্রির একজন প্রমিসিং স্টার হয়ে বসেছেন, একটু আগে এঁর অভিনয় ক্ষমতা দেখে তোমার মতো রসকষশূন্য মানুষও মুগ্ধ।

পরিচালক হেসে উঠল। লোকটির মুখেও ছেলেমানুষের মতো লাজুক হাসি।

হাসলে ওই কমনীয় মুখ আরো মিষ্টি দেখায়। দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো। জবাবে আমি বার দুই একটু মাথা নাড়তে পারলাম শুধু। আমি প্রমিসিং স্টার, কিন্তু চেষ্টা করেও এই মুহূর্তে ঠোঁটে একটুও হাসি টেনে আনতে পারছি না কেন!

পরিচালক এবার ও-তরপের পরিচয়ের দিকে এগলো। আর ইনি হলেন ...

শুরু করার আগেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, এঁকে আমি চিনি—

পরিচালক অবাক, আর ওই মানুষ ততোধিক।

পরিচালক জিজ্ঞাসা করলো, তুমি চেনো কি করে! কে বল তো?

এবারে আমার ঠোঁটের ফাঁকে ছুরির ফলার মতো একটু ধরালো হাসি উঁকিঝুঁকি দিল বোধহয়। দু'চোখ ওই মুখের ওপরেই এঁটে বসে আছে। বললাম, মিস্টার প্যাটেল ... বিনায়ক প্যাটেল ... মস্ত ব্যারিস্টার ... মিথ্যে বলিনি। এখন সামনাসামনি দেখে মেনে হচ্ছে বড় জোর তিরিশ একত্রিশ হবে বয়েস। এই বয়সে এত নাম আর এত পসার খুব কম ব্যারিস্টারেরই হয়ে থাকে। অবশ্য এর বাবাও এই বোম্বাইয়ের একজন নামজাদা ব্যারিস্টার ছিল। সেই ভদ্রলোক মারা যেতে তার পসারও ছেলের দিকে ধাওয়া করেছে। তা হলেও এর নিজস্ব একটা ক্ষমতা আছে এ কেউ অস্বীকার করবে না। আমিও করি না।

বিস্ময়ের আতিশয্যে পরিচালক হাঁ একেবারে। ওই মানুষের অর্থাৎ বিনায়ক প্যাটেলের মুখেও কম বিস্ময়ের আঁচড় পড়েনি। পরিচালক বলে উঠলো, ঠিকই তো চেনো দেখছি, কিন্তু তুমি এত চিনলে কি করে? লোকটির চোখেও সেই জিজ্ঞাসা।

আমার চোখের কোণে কি আগুন ঝলসাচ্ছে? জানি না। ভিতরের সমস্ত বিরূপতা ঠেলে সরিয়ে সত্যিকারের অভিনেত্রী হওয়ার তাড়না আমার। আমার দুটো চোখ সেই থেকে মুখের ওপর বিদ্ধ হয়ে আছে তাই দেখেই বা কি ভাবছে লোকটা? সকলে বলে আমার টানা কালো চোখের চাউনি খুব গভীর, ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ। কাগজে কাগজে আরো কত প্রশংসা বেরিয়েছে এ দুটো চোখের। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের

এই চোখ আয়নায় দেখতে পাচ্ছি না। ঠোঁটের হাসির ওপর বরং কিছুটা দখল এসেছে। ভদ্রলোকের মুখ থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে পরিচালকের কথার জবাব দিলাম। —ওঁর কত কেস কাগজে পড়েছি। ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে উনি আপোসশূন্য লড়াই করেন, উনি রুখে দাঁড়ালে অপরাধীর মাথায় সর্বনাশের খড়্গ নেমে আসবেই।

পরিচালক হরিহর শর্মা সহাস্যে মন্তব্য করলো, এ-সবে ইন্টারেস্ট তোমার জানা ছিল না তো!

পরিতুষ্ট হাসি বিনায়ক প্যাটেলের মুখেও। কিন্তু ব্যরিস্টার মানুষ, দু'য়ে দু'য়ে চারের হিসেব মিলছে না তার। বলল, কোর্ট কেস না হয় কাগজে পড়ে বোঝা গেল, কিন্তু আমিই সেই লোক দেখেই বুঝলেন কি করে?

ভিতরটা বিতৃষ্ণায় জলে যাচ্ছে কিন্তু অভিনেত্রীর মতোই দু'চোখ বড় বড় করে ফেললাম। — বাঃ, তুমুল লড়াই যখন চলে আপনার ছবি কাগজে বেরোয় না!

লোকটা মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। একটু চিন্তা করে বলল, ইদানীং কোনো কাগজে ছবি-টবি বেরিয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না ...

সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে এলো, কেন, এই গেল বছরে বোম্বাইয়ের সবগুলো বড় কাগজেই তো দু' তিন দিন ধরে আপনার ছবির ছড়াছড়ি—লোনাভালার সেই বসন্তরাও বীরকর কেসে, জেরায় জেরায় এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সাধুতার মুখোশ আপনি টেনে ছিঁড়লেন! আসামীর দিকে আঙুল নেড়ে তার মাথায় আকাশের বাজ টেনে নামাচ্ছেন—আপনার সেই ছবিও কাগজে বেরিয়েছিল।

...হ্যাঁ এইবারে মনে পড়েছে, আর এবারে লোকটা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। আর তক্ষুনি কেন যেন আমার মনে হল লোকটা অবিবাহিত এখনো। একটা ষষ্ঠ চেতনা যেন বলে দিল, রমণীর মন এই লোকের এখনো জানতে বাকি, রমণীর হৃদয় এখনো এর স্থূল আবিষ্কারের আওতায় আওতায় আসেনি। সত্যি মিথ্যে জানি না। মনে হল। পরিচালক অকৃত্রিম তারিফ করে উঠল, অসম বয়সের বন্ধুর উদ্দেশ্যে বলে উঠল, দেখ, ট্যালেন্ট দেখ, দ্যাট্‌স হোয়াই সী ইজ সো প্রমিসিং—এক বছর আগের কাগজে দেখা ছবিও হুবহু মনে রাখতে পারে।

হ্যাঁ, ট্যালেন্ট যে আছে এবারে আর অস্বীকার করা গেল না যেন। পরিতুষ্ট মুখ। মুখের আদলে এখন কাঁচা লাজুক ভাব। চাউনিতে একটা চাপা প্রশংসা উপছে উঠতে চাইছে। বলল, কোর্ট কেসে কোনো আর্টিস্টের এত ইন্টারেস্ট থাকতে পারে জানা ছিল না ...।

মোক্ষম জায়গায় সুড়সুড়ি পড়েছে এ আর আমার থেকে ভালো কে জানে। লোনাভালার ওই বীরকর কেসই এই মানুষের পেশার জীবনে সব থেকে রোমাঞ্চকর ঘটনা। সেই কেসের জিতই রাতারাতি তাকে জনপরিচিতির তুঙ্গে তুলে দিয়েছে। সেখানে এমন এক মানুষের হীন চক্রান্ত আর অভিযোগ সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যার মান-মর্যাদা আর নিরহঙ্কার স্বভাবে কোনোদিন এতটুকু সন্দেহের আঁচড় পড়েনি।

আমার ভিতর থেকে একটা চাপা বাষ্প যেন মুক্তির পথ খুঁজছে। এবারে পরিচালকের দিকে ফিরলাম। গলার সুরে ছদ্ম বিস্ময় আমার। —এঁর মতো মানুষেরও শুটিং দেখার ঝোঁক নাকি?

হুঁ! আমার অজ্ঞতায় পরিচালক উৎফুল্ল। — ক'দিন তাগিদ দিয়ে তবে আজ সেই সেটে ধরে আনা গেছে। পরিচালকের দায়িত্ব তো আর চাট্টিখানি নয়। কোর্ট কেস্‌টা ঠিক স্বাভাবিক হচ্ছে কিনা সেটা যাচাইয়ের জন্যেই এই এক্সপার্ট ধরে আনা।

শুনে আমার গাত্রদাহ যেন বেড়ে গেল আরো। পলকা বিদ্রূপের সুরে বললাম, স্বাভাবিক লাগার বদলে এ রকম এক্সপার্টের চোখে এ-সব জোলো লাগার কথা—

না না, বিনায়ক প্যাটেল সবিনয়ে সংশয় নিরসন করতে চাইল, ভালোই লেগেছে আর সবই মোটামুটি স্বাভাবিক মনে হয়েছে, তাছাড়া আপনার অ্যাকটিং-এর তো তুলনাই নেই ... কেবল ব্যারিস্টার ভদ্রলোকের যা একটু ওভার অ্যাকটিং হয়েছে।

শোনা-মাত্র কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল আমার। এতক্ষণ ধরে যে বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা উদরস্থ করে বসে ছিলাম সেটা যেন বেগে ঠেলে বেরুতে চাইল আবার। ... অ্যাকটিং! আমার অ্যাকটিং এর তুলনা নেই! আমি কেন আজ ও-রকম অ্যাকটিং করতে পেরেছি সেই সত্যটা যদি একরাশ জঞ্জালের মতো এই লোকের মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া যেত! আমি যে অ্যাকটিং আজ আদৌ করিনি এ-কথাটা যদি বলা যেত! ব্যারিস্টারের ভূমিকায় যে পার্ট করছে তার ওভার অ্যাকটিং-এর কথা শুনে আরো রাগ হল। চোখ দুটো আপনা থেকেই আবার তার মুখের ওপর ফিরে গেল। স্থির হল। কোন্ অচপল চাউনির ধাক্কায় মার্জিত পুরুষও ঘায়েল হয় সেটা অভিনয় জগতে এসে আরো ভালো বুঝতে শিখেছি। গলার স্বর সহজ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা। বললাম, আপনি যখন আঙুল নেড়ে নেড়ে আসামীর বিরুদ্ধে মুখ দিয়ে আগুনের ফুলকি ছোটান সেটা ওভার অ্যাকটিং হয় না —এ আপনি হলফ করে বলতে পারেন?

পরিচালক হা হা শব্দে হেসে উঠল। হাসছে মৃদু মৃদু এই লোকও। প্রতিবাদ করল না। আমার অভিনয় দেখে সে অভিভূত, মুগ্ধ। এই সাক্ষাৎ আর আলাপচারির পর আরো বেশি মুগ্ধ কিনা কে জানে। কিন্তু আমার ভিতরের অসহিষ্ণু জ্বালা বাড়ছে তো বাড়ছেই। আর কতক্ষণ এই মেকি সাক্ষাৎকার চালিয়ে যাব! এ অভিনয়ের থেকে ফ্লোরের অভিনয় ঢের সহজ।

পরিচালক অব্যাহতি দিল। সঙ্গীকে ডাকল, চল, লাঞ্চ সেরে নেওয়া যাক, তারপর শুটিং। তুমিও লাঞ্চ সেরে তৈরি হও ম্যাডাম।

ওই লোক আর একবার ভব্য অভিবাদন জানিয়ে পরিচালকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণের চাপা রাগ আর উত্তেজনা ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এলো। সেই সঙ্গে কি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা। কাঠগড়ার সেই অসহায় প্রৌঢ় মানুষটা যেন আমার দিকেই চেয়ে আছে এখন। আর আমি লম্বা লম্বা আঙুল আর পুরু দুই ঠোঁট নেড়ে নেড়ে এই ঢ্যাঙা মানুষটাকে —এই বিনায়ক প্যাটেলকে ফেটে পড়তে দেখছি। অনেক অনেক রাতের বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে চোখের সামনে ওই ভয়াবহ মূর্তি দেখেছি। লম্বা লম্বা আঙুল নাড়া আর পুরু ঠোঁট নাড়া দেখেছি। সে দৃশ্য আজও আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। বিভীষিকার মতো। জীবনে এই লোকের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হতে পারে কল্পনা করিনি। দেখা হবার পর মনে হচ্ছে এত ঘৃণা জীবনে আমি আর কোনো মানুষকে করিনি। করি না।

দুপুরের খাবার নিয়ে নাড়াচাড়াই সার। খাওয়া হল না। উত্তেজনা আর বিতৃষ্ণায় ভিতরটা ভরাট হয়ে আছে, খাব কি। লাঞ্চের বিরতির পর আবার শুটিং শুরু হবে। বিশিষ্ট আসনে তখনো ওই লোক বসে থাকবে। আমার ধারণা, থাকবেই। শুধু আমার কাজ দেখার জন্যেই বসে থাকবে। বুঝতে পারছি অভিনয় আজ আর আমার দ্বারা হবে না। তাছাড়া ওই লোকের আশায় ছাই দেবার একটা সঙ্কল্পও ভিতর থেকে চাড়া দিয়ে উঠল।

ঘর সংলগ্ন কলঘরে এসে তাড়াতাড়ি মেকাপ তুলে ফেললাম। তেমনি দ্রুত আসামীর সাজ বদলে নিজের জামা কাপড় পরে নিলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিতে গিয়ে নিজের দুটো চোখের ওপর দৃষ্টি পড়ল। না, যন্ত্রণা বা রাগ বা বিদ্বেষ এই দুই চোখের কালো তারার এত গভীরে যে, কারো চট করে সেটা ধরে উঠতে পারার কথা নয়। ছোট্ট একটা চিরকূট লিখে বেয়ারাকে ডেকে পরিচালকের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। কয়েক লাইনের বয়ান—শরীরটা হঠাৎ কি রকম অসুস্থ বোধ করছি, আজ আর আমার পক্ষে সেটে যাওয়া সম্ভব নয়, আজ অন্যেরা শুটিং করুক, আমি কাল এসে পুষিয়ে দেব।

ঘর ছেড়ে বিশাল স্টুডিও প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের ইউনিটের একটা গাড়ির খোঁজে এগিয়ে চললাম। এখন পর্যন্ত আমি স্টার নই—প্রমিসিংস্টার। শুনেছি টারদের অঢেল টাকা, তিনখানা চারখানা করে বিদেশি গাড়ি এক-একজনের। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার বিদেশি ছেড়ে একখানা দেশি গাড়িও নেই। কিছুদিন আগেও যার খাওয়া-পরার সংস্থানও ছিল না, এরই মধ্যে তার গাড়ির চিন্তা বাতুলতা মাত্র। ইউনিটের গাড়িই আমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসে আর দিয়ে আসে। ... রমেশ

সামতানি অবশ্য এই শুরুতেই একটা নতুন গাড়ি আমাকে কিনে দিতে চেয়েছিল। বলেছিল, টাকাটা এখন না- হয় ধার হিসেবেই নিলে, একটা ছবি উতরে গেলে এ-টাকা শোধ করতে আর ক'দিন। এখনো এই গাড়ি কেনা নিয়ে ঝোলাঝুলি করছে সে। কিন্তু আমি রাজি হইনি। ওই লোকের কাছে কৃতজ্ঞতার বোঝা আর কত বাড়াব। যতদিন গাড়ি না কেনা নয় ততদিন তার নিজের একখানা গাড়ি আমাকে ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়েছিল রমেশ সামতানি। আমি তাতেও রাজি হইনি। জীবনের এই শুরুটা পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলুক। সফল হলে তখন সবই হবে।

... রমেশ সামতানির এত আগ্রহের কারণ বুঝতে পারি। পারি তার কারণ মানুষটার আচরণ সাদাসিধে, মনে মুখে এক, তার মধ্যে রাখাঢাকার ব্যাপার কিছু নেই। সে আমাদের অনেক করেছে, আমার তো করেইছে। আমাদের পরিবারের বন্ধু ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের এক ভয়াবহ দুর্যোগের সময় কপর্দকহীন অবস্থায় কেমন করে কার সুপারিশ নিয়ে সে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আজ আর সে-কথা মনে নেই। সে আজ এগারো বছর আগের কথা। তখন তার বয়স ছাব্বিশ আমার বারো। এখন আমার তেইশ, তার সাঁইতিরিশ —চৌদ্দ বছরের ফারাক।

প্রবল কর্মী মানুষ এই রমেশ সামতানি। জিজ্ঞাসা করলেই হেসে হেসে বলে, আই অলওয়েজ লাভ টু ডু মাই ওউন লিট্‌ল্ থিংস। পাকিস্তানে দুর্যোগ কেটে যাবার পর দেশ থেকে ছলে কৌশলে কিছু সম্পত্তি সরিয়ে আনতে পেরেছিল। তার আগে থাকতেই বোম্বাইতে নিজের পথ নিজে গড়ে নেবার জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছে। দেশের সম্পত্তি হাতে আার পর সেই পথ দ্রুত প্রশস্ত হয়েছে। এই বম্বেই তার কর্মক্ষেত্র এখন। এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ব্যবসার তাগিদে এখানে অবশ্য স্থির হয়ে বসতে পারে না একটানা দেড় মাসও। দুবাই, পোর্ট সৈয়দ, পোর্ট এডেন এমন কি আমেরিকাতেও বছরের মধ্যে ক'বার করে ছোটাছুটি করতে হয় তাকে। মাত্র এগারোটা বছরে মধ্যে নিজের এত বড় ভাগ্যখানা সে নিজে গড়েছে। এত সাফল্যের চাবিকাঠি? সেই এক কথা। নিজের ছোট্ট ছোট্ট কাজগুলি নিজে করে ফেলি—আই অলওয়েজ লাভ টু ডু মাই ওউন লিট্‌ল্ থিংস্। কিন্তু এত বড় হয়েও মানুষটার চরিত্র বদলায়নি, আচরণ বদলায়নি। আগের মতোই সাদাসিধে স্পষ্টবাদী, আর আগের মতোই গোঁ। মনে যা আসে সোজাসুজি বলেও ফেলে তা।

যাক, রমেশ সামতানি পরের প্রসঙ্গ। এখন শুধু তার কথা মনে হচ্ছে কারণ বর্তমানে সে এই বম্বেতেই আছে। আমার কেন যেন এক্ষুনি তার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। সব কথা শুনে আর আমার এই উত্তেজনা দেখে সে হয়তো হাসবে। এখনো ছেলেমানুষ ভাববে। অনেকবার যা বলেছে আজও হয়তো তাই বলবে। বলবে, বিনায়ক প্যাটেলের যা কাজ সে তাই করেছে, পেশার প্রতি আসক্তি ভিন্ন কেউ বড় হয় না, সকলকে ছেড়ে এই লোকের ওপর এখনও এত রাগ এত ঘৃণা কেন তোমার!

আমার চেনাজানার মধ্যে রমেশ সামতানি একমাত্র ক্ষমতাবান পুরুষ। টাকার জোরে আর বুদ্ধির জোরে সে অনেক কিছুই করতে পারে বলে বিশ্বাস। আট ন'মাস আগে পর্যন্ত তার এই জোরটা দাম্ভিক ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেলের ওপর নৃশংস হয়ে উঠুক, যে-করে হোক তার মাথায় একটা বজ্রাঘাত নামিয়ে আনুক এ আমি মনে প্রাণে চেয়েছি। কিন্তু আমার এই অবুঝ মনোভাব দেখে সে কখনো বিরক্ত হয়েছে, কখনও হেসেছে। বলেছে, তোমার মধ্যেও অনেক শক্তি আছে, বাজে চিন্তায় সেটা নষ্ট কোরো না। ওই লোকের আমি কোনও দোষ দেখি না, তার যা কাজ সে তাই করেছে। এভরিবডি শুড ডু দেয়ার ওউন লিট্‌ল থিংস্।

যুক্তির দিক ভাবতে গেলে সে সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে জগৎ চলছে না। পেশা বলেই মানুষ মানুষের ওপর এত নিষ্ঠুর এত নৃশংস হয়ে উঠবে সেটা আমি মানি না। সত্যিকারের অপরাধের জালে না আটকালেও হাতের মুঠোয় পেয়ে আইনের কশাঘাতে কেউ একজনকে তিলে তিলে হত্যা করবে, আর তারপর আত্মপ্রসাদে টইটম্বুর হয়ে উঠবে, এও আমার কাছে অসহ্য। তার ওপর কেউ যদি কোনো নিরপরাধ মানুষকে এই মর্মান্তিক পরিণামের দিকে ঠেলে দেয়? তাহলে?

মাথাটা আবার অসম্ভব গরম হয়ে উঠছে। আর সেইজন্যেই যে ক্ষমতাবান পুরুষ এই এত বড় দুনিয়ায় আমার একমাত্র সহায়, প্রথমেই তার কথা মনে পড়ছে। রমেশ সামতানির কথা।

ইউনিটের গাড়ির খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। পিছন থেকে একটা ডাক কানে এলো, মিস সুজাতা!

ঘুরে দেখি হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসছে আমার ছবির পরিচালক। কিন্তু সে একা নয়। তার পিছনে বিনায়ক প্যাটেল। সে ঢ্যাঙা মানুষ। তাই মনে হচ্ছে লম্বা পা ফেলে সে ধীরে-সুস্থেই আসছে।

দেখা মাত্র শরীরে রক্তকণা আবার যেন মাথার দিকে ধাওয়া করছে। প্রায় নিজের অগোচরে শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম।

উদ্বিগ্ন মুখে পরিচালক জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ কি হল ম্যাডাম?

তার পিছনের লোককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম,

বেয়ারা আপনাকে চিঠি দেয়নি?

তা তো দিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ শুটিং বন্ধ করলে ... শরীর বেশি অসুস্থ নাকি?

এই স্বাভাবিক প্রশ্ন শুনেও আমার রাগ হয়ে গেল। নামী পরিচালক, যে কোনো নতুন আর্টিস্টের তাকে সমীহ করে চলার কথা। আর কেউ হলে ও-ভাবে চিরকুট পাঠিয়ে শুটিং বন্ধ করে বাড়ি রওনা হতে পারত না। কিন্তু আমার জোরের দিকটা আমি জানি। এই ব্যাপারে রমেশ সামতানি আমার পিছনে। নইলে বোম্বাইয়ের এত বড় চিত্রজংগতের কেউ চট করে আমার দিকে ফিরেও তাকাত না। এ-জগতেও রমেশ সামতানি এমন নীরব প্রতিপত্তির খবর আমার একটুও জানা ছিল না। এত প্রভাবের সঠিক কারণ সম্পর্কে এখনও আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। প্রভাব-পরিতপত্তি যে কম নয় সেটুকুই শুধু অনুভব করতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তের রাগটা তার জোরে নয়। ভদ্রলোকের পিছনে যে দাঁড়িয়ে, রাগ তার কারণে।

তবু যথাসম্ভব সংযত জবাব দিলাম, যেটুকু অসুস্থ হলে শুটিং ভালো লাগে না, সেটুকুই। ... একটা গাড়ির ব্যবস্থা করুন।

পরিচালক থমকে তাকালো একবার। তারপর ব্যস্ত মুখে বলল, ও ... গাড়ি রেডি নেই বুঝি, এ-সময় যাবার কথা নয় তো, তাই ... আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আমার গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঘুরে দাঁড়াতেই বাধা পড়ল। স্বাভাবিক ভদ্রতার সুরে বিনায়ক প্যাটেল জিজ্ঞাসা করল, উনি কোন্ দিকে যাবেন?

সান্তাক্রুজ ওয়েস্ট ... কেন, তুমিও এক্ষুনি যাচ্ছ নাকি?

জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাই যাচ্ছে। তারপর বলল, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না দাদা, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল আমার। মনে হল, আমার শুটিং বন্ধ তাই এরও আগ্রহের শেষ। প্রায় অশোভন সুরেই বাধা দিয়ে উঠলাম, কিছু দরকার নেই, আমি এঁর গাড়িতে যাচ্ছি, আপনি ব্যস্ত মানুষ, এত কষ্ট করতে হবে না!

পা বাড়িয়েও একটু অবাক মুখেই ফিরে তাকালো সে। প্রত্যাখ্যানের সুরটা কানে লেগেছে বোধ হয়। আমার চোখে চোখ। বলল, আমার কোনো কষ্ট হবে না, রাদার এ প্লেজার, আমি পালিহিল যাচ্ছি, সেখান থেকে আপনার বাড়ি তিন-চার মাইলের মধ্যেই হবে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে অদূরে দাঁড় করানো ছোট শৌখিন গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। নিজের ভিতরের একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশে ফুটতে লাগলাম আমি। তার ওপর পরিচালকের কথায় গায়ে আরও যেন জ্বালা ধরে গেল। সে বলছে, এই বয়সেই ব্যারিস্টার কত বড় সে-তো নিজেই জানো, মানুষটাও চমৎকার, তোমার কোনো সংকোচের কারণ নেই।

...তাছাড়া তোমার অভিনয় দেখে খুব ইমপ্রেসড, বলছিল, প্রথম অভিনয় মনেই হয় না।

কানে শুনছি বটে, কিন্তু তার দিকে তাকাচ্ছি না। যত রাগ আর বিতৃষ্ণার কারণই হোক, আমার আচরণে কারও মনে কোনো রকম খটকা লাগুক সেটা চাইনি। দৃষ্টি ওই গাড়ির দিকে।

...চাবি লাগিয়ে দরজা খুলল, চালকের আসনে বসল, স্টার্ট দিল। গাড়িটা এবার আস্তে আস্তে এদিকে এগিয়ে আসছে। এলো। দাঁড়াল। লম্বা হাত বাড়িয়ে পাশের আসনের দরজাটা খুলে দেওয়া হল।

আমার মাথার মধ্যে কি-যেন এক বিষম কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে নিজেকে শান্ত সংযত রাখার চেষ্টা করছি। অভিনেত্রীর স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে গাড়িতে উঠে পাশে বসলাম। একটু শব্দ করেই দরজা বন্ধ করলাম। বেশ ছোট গাড়ি, পাশাপাশি দু'জন বসলে একটু ঘেঁষাঘেঁষি মনে হয়। আমার দিকের দরজার সঙ্গে লেগে বসলাম। ওপর অলার চক্রান্তে যেন একটা ঘৃণ্য অশুচি স্পর্শের আওতায় এসে পড়েছি আমি! গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করা হয়নি। হাসিমুখে লোকটা পরিচালকের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে রওনা হল।

স্টুডিওর বিশাল চত্বর পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম আমরা। ভিতরে ভিতরে আমার কিসের প্রস্তুতি চলছে জানি না। বোধহয় সংযম রক্ষার প্রস্তুতি। সোজা সামনের দিকে চেয়ে আছি।

গাড়ি চালানোর ফাঁকে পাশের লোকের দু'চোখ বারকয়েক আমার দিকে ঘুরল টের পেলাম। এই চোখ এই মিষ্টি মুখ আর এই চোয়াল দুটো সংকল্পের আসরে নামলে কত অকরুণ কঠিন হতে পারে সে আমি জানি। দু'কান খাড়া হল। এবারে বলবে কিছু ...।

বলল। — আপনার অভিনয় যেটুকু দেখলাম সত্যিই ভালো লেগেছে, আপনাদের ডিরেক্টরকে সে-কথা বলছিলাম ...

থ্যাঙ্কস্।

আবার নীরব একটু। তারপর মুখে নরম হাসি। —আপনারা আমাদের মতো বাইরের লোককে কিছুটা এড়িয়ে চলতে চান, তাই না?

সামান্য মাথা ফেরালাম। —কেন বলুন তো ...?

হাসছে। — লিফ্ট দেবার নামেই আপনি যে রকম বাধা দিয়ে উঠলেন, তাই ভাবছিলাম কথাটা।

এই ছবিতে নামার আগে শুধু ফোটোজেনিক টেস্ট নয়, আমার কণ্ঠস্বরের টেস্টও হয়ে গেছে। তাতেও যে আমি সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছি তাও জানি। মোলায়েম জবাব দিলাম, আপনাদের মতো বিশিষ্টজনেরা ফ্রিম আর্টিস্টদের কি চোখে দেখে সে ভয় একটু আছেই।

একটু জোরেই হেসে উঠল। আড়চোখে লক্ষ্য করলাম তার ফলে মুখখানা আরও ছেলেমানুষের মতো দেখালো। বলল, এটা ঠিক কথা হল না বোধহয়, হরিহরদার কাছে শুনেছি এই প্রথম আপনি এ-লাইনে এসেছেন আর এটাই প্রথম ছবি আপনার ... এরই মধ্যে কি নিজেকে আপনি পাকাপোক্ত একজন ফিল্ম আর্টিস্ট ভাবেন নাকি?

সামান্য একটু হাসতে পারা কি নিতান্তই দরকার? অল্প করে মাথা ফেরাতে হল আবার। —ভাবতে চেষ্টা করি বলে প্রথম ছবির অভিনয় আপনার ভালো লেগেছে।

সোজা বলে বসল, শুধু অভিনয় নয় আপনার চালচলন কথাবার্তা সবই আমার ভালো লেগেছে। আপনি অনেক ওপরে উঠে যাবেন বলেই মনে হয়।

থ্যাঙ্কস্। শরীরে রক্তকণাগুলো এত অবাধ্য হতে পারে জানা ছিল না। গাড়ি ধীর গতিতে চলেছে লক্ষ্য করেছি। আন্ধেরির স্টুডিও থেকে আমার সান্তাক্রুজের বাড়ি চার মাইলও পথ নয়। আর পালি হিল সাত সাড়ে-সাত মাইলের মধ্যে। এটুকু পথ চট করে ফুরিয়ে যাক কাম্য নয় বলেই গাড়ির এই মন্থর গতি সেটুকু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না।

...শুধু অভিনয় নয়, এক কথায় আমাকেই ভালো লেগেছে বলল। বোম্বাই শহরে পুরুষের ভালো লাগার অনেক রকম লোভাতুর দৃষ্টি এই তেইশ বছর বয়সে আমি দেখেছি। এক একজনকে এক এক রকমের জানোয়ার মনে হয়েছে। যত বড় ব্যারিস্টারই হোক সে-রকম একটা জানোয়ার কি এর মধ্যেও নেই? এত রাগ সত্ত্বেও দেখার লোভ আমায়! আচ্ছা, আপনি একজন শিক্ষিতা এম-এ পাশ মহিলা শুনেছি, আপনার হঠাৎ এই ফিল্ম আসার ঝোঁক হল কেন?

মুখ ঘুরিয়ে ভালো করেই তাকালাম এবার। আপোস-শূন্য ব্যারিস্টার কেউ বলবে না, ছেলেমানুষি কৌতূহল যেন। জবাব দিলাম, মাথার ওপর কোনো গার্জেন নেই বলে।

স্টিয়ারিং হাতে থমকে তাকালো। চোখাচোখি হতে শব্দ করেই হেসে উঠল। হাসিটা সরল নয় এ কথা আমিও বলব না। কিন্তু আমার এই দুটো কানের পর্দায় বিষাক্ত লাগছে। কথাগুলোও। —আচ্ছা জবাব দিয়েছেন, যাদের গার্জেন নেই সকলেই তারা ফিল্ম লাইনে এসে ঢুকছে নাকি! আসলে এদিকেই আপনার ন্যাক।

আমি সামনের দিকে চেয়ে আছি। স্নায়ুর ওপর এত ধকল আর যেন সহ্য হচ্ছে না। এর ওপর আবার সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার কোনো গার্জেন নেই মানে কি, বাবা মা কেউ নেই?

শোনা মাত্র ঝলকে ঝলকে রক্ত মাথায় উঠতে লাগল যেন। প্রায়-বৃদ্ধ এক অসহায় মানুষের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। ... তার দিকে লম্বা আঙুল নেড়ে ত্রাস ছড়াচ্ছে একটা লোক, পুরু ঠোঁট নেড়ে নেড়ে সেই অসহায় মানুষের মাথায় যেন বজ্রাঘাত করে চলেছে। আর তারপর দিনের পর দিন ঘুমের মধ্যে আধা-ঘুমের মধ্যে এমন কি জেগে থেকেও সেই আঙুল নাড়া আর পুরু ঠোঁট নাড়ার দৃশ্য কত দেখেছি ঠিক নেই।

দাঁতে করে ঠোঁট চেপে প্রাণপণে এখনো নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা আমার। নিজের গলার স্বরের ওপরেও বিশ্বাস নেই এই মুহূর্তে। মাথা নেড়ে জানালাম, কেউ নেই।

ভাই বোন আত্মীয় পরিজন কেউ নেই?

আবারও মাথা নাড়ালাম—নেই।

সান্তাক্রুজে আপনি তাহলে কার কাছে থাকেন?

এবারে জবাব দিতে হল। —কারো কাছে না, একজন আয়া আছে। কি কারণে সঙ্গে সঙ্গে একবার মুখ ঘুরিয়ে সোজা আমার দিকে তাকালো বলতে পারব না। তারপরেই সচেতন হল যেন, মনে পড়ল বোধহয় আমি অসুস্থ হয়ে শুটিং বাতিল করে বাড়ি চলেছি। জিজ্ঞাসা করল, আপনার শরীর কি এখন বেশি খারাপ লাগছে নাকি?

... বেশী না।

কিন্তু আপনার মুখ হঠাৎ ভয়ানক লাল দেখছি! একজন ডাক্তারকে খবর দিলে হত না?

উদ্বেগের প্রকাশ আন্তরিক। কিন্তু এর জবাবে দুই চোখের একটা ঘৃণার ঝাপটা সজোরে মুখের উপর ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছা করল। সামনের দিকে চোখ রেখেই জবাব দিলাম, তার দরকার হবে না, আপনি শুধু আর একটু স্পীড বাড়ান গাড়ির।

আই অ্যাম সো সরি। হকচকিয়ে গিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে আমার ফ্ল্যাটের সামনে এসে গেলাম। আমার ইঙ্গিত বুঝে গাড়ি থামালো। — এই ফ্ল্যাট?

দরজা খুললাম। — হ্যাঁ।

একটু ঝুঁকে ভালো করে ফ্ল্যাটটা দেখে নিল একবার। তিন ঘরের ফ্ল্যাট। সাধারণ মধ্যবিত্তের এলাকা এটা। ওই লোকপালি হিলে থাকে নিজের কানেই শুনেছি। অভিজাত পয়সা-অলা মানুষদের পশ এরিয়া সেটা। মালটিস্টোরিড আর হাল ফ্যাসানের সব বাংলো সেখানে। সেখানে বাড়ি যখন, এই লোকেরও টাকার জোর আছে নিশ্চয়। থাকারই কথা, বাপ মস্ত ব্যারিস্টার ছিল আর এই বয়সে নিজেও কম যায় না।

একটু অভ্যর্থনা-সূচক আহ্বান প্রত্যাশিত ছিল বোধহয়। সাধারণ ভদ্রতার খাতিরে এক পেয়ালা চা বা কফি খেয়ে যাবার কথা বলা উচিত। কিন্তু বিতৃষ্ণায় মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে সেই থেকে। একটি কথাও না বলে একবার শুধু ঘুরে তাকালাম।

শুনুন, আপনাকে সত্যিই অসুস্থ দেখাচ্ছে, অনুমতি করেন তো আমি সঙ্গে আসি, আর কে আপনার ডাক্তার জানলে তাকেও একটা খবর দিই...।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, একটু বাদে আমি নিজেই সুস্থ হয়ে যাব। আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে সোজা ফ্ল্যাটের দিকে চলে গেলাম। ভিতরে ঢুকে যাওয়া পর্যন্ত গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ কানে এলো না।

দোতলার তিন ঘরের ফ্ল্যাটে থাকি। একটা মানুষের স্বাভাবিক উদ্বেগ যেন পায়ে করে মাড়িয়ে মাড়িয়ে দোতলায় উঠে এলাম। সামনের ঘরে তালা ঝুলছে। এ ঘরে আমি থাকি। পাশের ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। সেখানে আয়া ঘুমুচ্ছে নিশ্চয়। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চাবি বার করে শব্দ না করে দরজা খুললাম। নিজেকে ঠাণ্ডা করার জন্যেই খানিকক্ষণ এখন একলা থাকা দরকার আমার।

ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শয্যায় এসে গা ছেড়ে দিলাম। শ্রান্ত লাগছে। অনেকক্ষণ ধরে যুঝেছি নিজের সঙ্গে। ছোট গাড়িতে দুজনে পাশাপাশি বসার ফলে মাঝে আট-দশ আঙুলও ফারাক ছিল না। ওই ফাঁক ভরাট করে একটা জ্বালা-ধরা স্পর্শ অনেকক্ষণ ধরে আমার কল্‌জে পুড়িয়েছে। কিন্তু চোখ বুজে যে চুপচাপ খানিক বিছানায় পড়ে থাকব তারও উপায় নেই। মাঝে বেশ কয়েকটা দিন ভুলে ছিলাম, কিন্তু এখন চোখ বুজলেই আবার কাঠগড়ার সেই অসহায় মূর্তি দেখছি, আর এক অকরুণ মানুষের লম্বা লম্বা আঙুল নাড়া আর পুরু ঠোঁট নাড়া দেখছি। মাথার ওপর বনবন করে পাখা ঘুরছে। কিন্তু মাথার তালুটা যেন আগুন হয়ে আছে।

আধ ঘণ্টা না যেতে টেলিফোন বেজে উঠল। এ সময় আমার বাড়ি থাকার কথা নয় ... কে আবার।

—হ্যালো?

ও-ধারে আমার পরিচালক হরিহর শর্মার গলা। উদ্বিগ্ন প্রশ্ন কানে এলো, কেমন আছ?

জবাব দিলাম, মোটামুটি। এরই মধ্যে টেলিফোন ... কি ব্যাপার?

হরিহর শর্মা বলল, ব্যাপার তো তোমার—বিনায়ক প্যাটেলের টেলিফোন পেয়ে ঘাবড়ে গেছি, বাড়ি গিয়েই ফোন করেছে, গাড়িতেই নাকি তোমার শরীর খুব খারাপ দেখেছে, সমস্ত মুখ অস্বাভাবিক লাল, এক্ষুনি ডাক্তার ডাকা উচিত আর ব্লাডপ্রেসার চেক করা উচিত—বিনায়কই ব্যবস্থা করতে পারত কিন্তু তুমি তার সে-প্রস্তাব বাতিল করেছ।

এ-রকম মানসিক অবস্থার পর একজন অভিনেত্রী এই ফোন পেলে সে কি করবে? আমি যা করলাম বা বললাম তাতে ও-ধারের ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে গেল হয়তো। প্রথমে হাসলাম একপ্রস্থ। তারপর বললাম, আপনার এক্সপার্ট ব্যারিস্টার যা দেখেছে বা বলেছে তা মিথ্যে বলি কি করে, মুখ নিশ্চয় লাল হয়েছিল আর ব্লাডপ্রেসারও হয়তো বেড়েছিল ... কিন্তু তার মতো অমন ডাকসাইটে ভক্তি শ্রদ্ধার মানুষকে হঠাৎ অত কাছে পেলে ভক্তর রক্তের তাপ আর চাপ কি আর কোনো কারণে বেড়ে যেতে পারে না।

কথাগুলো মাথায় নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল, তারপর ফোনে হা হা হাসির শব্দ। — সে কি গো! তুমি তার এত প্রেমে পড়ে আছ নাকি! দাঁড়াও এক্ষুনি আবার ফোনে জানাচ্ছি তাকে—

জবাব দিলাম, বলবেন তো, কিন্তু আমার তো শুধু মুখ লাল হয়েছিল আর রক্তের চাপ বেড়েছিল, একথা শুনে সে না মূর্ছা যায়। ... তা ভদ্রলোক বিবাহিত না অবিবাহিত?

অবিবাহিত—অবিবাহিত, তোমার কিছু ভাবনা নেই!

বললাম, তাহলেই তো সত্যিকারের ভাবনা, আপনার আর কিছু বলে কাজ নেই, এ-কথা শুনলে ব্যারিস্টারি ছেড়ে ভদ্রলোক হয়তো আপনার নায়ক বাতিল করে নিজে নায়ক হতে চাইবেন।

ফোন ছেড়ে দিলাম। আমার উলটো পালটা কথা থেকে পরিচালকের কিছু বোধগম্য হবার কথা নয়। নিছক পরিহাসই ধরে নেবে। আর সেই সঙ্গে একটু অবাকও হবে হয়তো। আজ ছ'মাস হল স্টুডিও যাতায়াত শুরু হয়েছে আমার, তার মধ্যে এই গোছের প্রগল্‌ভতা কখনো দেখেনি।

আয়াটা এখনো আয়েস করে ঘুমুচ্ছে ও ঘরে। তাতেও বিরক্তি। ব্লাডপ্রেসার বাড়া সত্যিই বিচিত্র নয়। আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভিতরের ছটফটানি ঠাণ্ডা করার চেষ্টায় মুখ এখনো লালই বটে একটু।

নিজের চোখে চোখ রাখলাম। ভ্রূকুটি করে সংযত করতে চাইলাম নিজেকে।

কি মনে হতে ফোনের রিসিভার তুলে নিলাম আবার। পর পর তিনবার তিন জায়গায় ডায়েল করেও রমেশ সামতানিকে ধরা গেল না। ব্যস্ত মানুষ, কোথায় ঘুরছে ঠিক নেই। তাকে এই সাক্ষাৎকারের খবরটা দেবার ইচ্ছে ছিল। যাক, ভালোই হল। শুনলে হেসে ঠাট্টাই করত বোধহয়। বলত, তোমার ছেলেমানুষি রাগ আর গেল না।

...রমেশ সামতানির মতে আমাদের আসল শত্রু শেখর নায়েক। সে-ই নাটের গুরু। মনে মনে তারও মরা-মুখ দেখার সাধ আমার। হাতের মুঠোয় পেলে রমেশ সামতানি হয়তো এতদিনে কিছু একটা করেও বসত। আমার ধারণা শেখ নায়েকের ওপর তার এত রাগ ভিন্ন কারণে। সেই ভয়াবহ বিপাকের দিনে শেখর নায়েক এক শর্তে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিল। সেই শর্ত আমি। আমার রূপ, যৌবন। বয়সে রমেশ সামতানির থেকেও চিন চার বছরের বড় হবে লোকটা। কম করে চল্লিশ। বিবাহিত, দুটো ছেলে মেয়ের বাপ। আমি রাজি হলে সেই বিয়ে খারিজ করবে এমন কথাও বলেছিল। আমি প্রায় মেরে তাড়াতে বাকি রেখেছিলাম তাকে। কিন্তু সমস্ত অঘটনের মূলে সে, এ-কথা তখনো মনে হয়নি। কারণ, তাহলে সে বহাল তবিয়তে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কি করে? পুলিশ তাকে আটক করেনি কেন? আজও আসল দোষী সে-ই কিনা হলপ করে বলতে পারব না। রমেশ সামতানি তখন নিজের কাজে বিদেশে। ফিরে এসে সব শোনার পর তাকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে সে। কারণ গোড়া থেকেই তাকে নিয়ে একটু খুঁতখুঁতুনি ছিল রমেশ সামতানির। সব শোনার পর প্রথমেই তার খোঁজ করেছে, শেখর কোথায়? অনেক সন্ধান করেও আর তার দেখা মেলেনি। একেবারে উবেই গেছে যেন। সন্দেহটা তখন বদ্ধমূল হয়েছে আমার। সমস্ত ফয়সলা হয়ে যাবার পরে সে এভাবে সপরিবারে নিপাত্তা হয়ে যাবে কেন?

রমেশ সামতানিকে ফোনে না পেয়ে আবার বিছানায় এসে শুয়েছি। কিন্তু চোখ বুজলেই সেই কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অসহায় মানুষটার মুখ, আর, আর এক উদ্ধত দাম্ভিক মানুষের সেই ভয়াবহ লম্বা লম্বা আঙুল নাড়া, আর পুরু দুই ঠোঁট নেড়ে অভিযোগের সেই আগুন ছোটানো। সেই ক'টা দিন আদালতে দাঁড়িয়ে কে আসল দোষী এ-কথা আমার মনে আসেনি। কাঠগড়ার সেই অসহায় মানুষের মাথায় বহু লোকের সামনে বিচারের নামে বজ্রাঘাত হেনেছে, অপমানের কশাঘাতে কশাঘাতে তার উঁচু মাথা চিরদিনের মতো মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে যে লোকটা, আমার চোখে আসল অপরাধী সে। এত বড় একটা মিথ্যেকে বুদ্ধি আর যুক্তির জালে জড়িয়ে যে নিশ্ছিদ্রভাবে সত্যি বলে প্রমাণ করেছে আমার আসল শত্রু সে।

...এই ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেল।

দুই

সুজাতা পাণ্ডুরং আমার সত্যি নাম নয়। আমি লোনাভালার বসন্তরাও বীরকর এর মেয়ে সুজাতা বীরকর। বিয়ের আগে আমার মায়ের পদবী ছিল পাণ্ডুরং। কল্যাণী পাণ্ডুরং। কত গ্লানি আর কত বড় পরিতাপ নিয়ে অত গর্বের পরিচয় ছেড়ে এই বোম্বাই শহরে সুজাতা পাণ্ডুরং হয়ে বসেছি সে শুধু আমিই জানি। আর জানে রমেশ সামতানি। আর যে জানত, সেই শেখর নায়েক নিখোঁজ।

বোম্বাই থেকে লোনাভালা মাত্র সত্তর মাইল দূরে। চোখে দেখা না থাকলে এখানে বসে ওই ছোট পাহাড়ী-শহরের চিত্র কেউ কল্পনা করতে পারবে না। নির্জন ছিমছাম জায়গা। কাছে দূরে ছোট ছোট পাহাড়। দূরে দূরে ছোট বড় বাংলো। অনেকের খামার বাড়িও আছে। এত কাছে হলেও বোম্বাইয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিলই না বলতে গেলে। এমন কি লোনাভালার সকলের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। কারণ একেবারে অল্প বয়েস থেকে আমার ছাত্রী-জীবন কেটেছে জুনাগড়ে মায়ের বাবার কাছে। বুড়ো বড় ভালোবাসত আমাকে। বম্বের হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করার চেয়ে জুনাগড়ে দাদুর কাছে আমাকে রাখাটাই বাবা-মা ভালো বিবেচনা করেছে।

স্কুল বা কলেজ পাঁচ সাত দিনের জন্যে বন্ধ থাকলেও আমি লোনাভালায় ছুটে চলে আসতাম। জায়গাটা আমার ছেলেবেলা থেকেই ভালো লাগত। সে-জায়গার সঙ্গে আমার বংশগত নাড়ির যোগ। লোনাভালায় এত বিশাল জায়গা নিয়ে এতবড় বাড়ি আর একটিও ছিল না। বাড়ি না বলে ওটাকে প্রাসাদ বলা যায়। নিজের মনে সে-বাড়ির এক মাথা থেকে আর এক মাথায় ঘুরে বেড়াতে অদ্ভুত ভালো লাগত আমার। কিন্তু সে-কারণেও নয়, ফাঁক পেলেই জুনাগড় থেকে আমি লোনাভালায় ছুটে আসতাম বাবার টানে। বাবার প্রতি যেন একটা অন্ধ আকর্ষণ ছিল আমার। বেশি বয়সেও বাবা যখন মা—মা-মণি বলে আদর করে ডাকত আমাকে, আনন্দে তখন এই রক্ত-মাংসের শরীরটা যেন গলে যেতে থাকত। একবার বাবার কাছে এলে আর জুনাগড়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করত না। ছেলেবেলায় তো মা ধমক-ধামক দিয়েই দাদুর কাছে ফেরত পাঠাত আমাকে। বলত এ রকম করলে আর তোকে আনবই না।

... এখন যে ছবিতে কাজ করছি সে ছবি বাজারে বেরুলে আমার আসল পরিচয় কতদিন গোপন থাকবে জানি না। কারণ, বোম্বাইয়ের লোক আমাকে না চিনলেও জুনাগড়ের সহপাঠী সহপাঠিনীরা তো ছবি দেখে আমাকে ঠিকই চিনবে। তাছাড়া লোনাভালারও অনেকেই চিনবে। আসল পরিচয় তখন হয়তো একভাবে না একভাবে ফাঁস হয়ে যাবেই। কিন্তু ছবি রিলিজ হতে শুনেছি বছর দুই লাগবে আরো। অত দূরের ভাবনা এখন আর ভাবি না। যে অবস্থায় পড়েছিলাম, যে দিনটা ভালো কাটল সেটাই ভালো।

যাক, যে কথা বলছিলাম।

আমার তখন বছর বারো বয়েস, ছুটিতে বাবার কাছে এসে এক নতুন মুখ দেখলাম বাড়িতে। নাম শুনলাম রমেশ সামতানি। বয়েস চব্বিশ। দুর্যোগের সময় পশ্চিম-পাকিস্তানে সর্বস্ব রেখে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু মুখে তার সম্পদ হারানোর ক্ষোভ দেখতাম না কোনো সময়। বেশ খুশি মেজাজ, মিটিমিটি হাসে। নিজের সম্পর্কে হোক বা অন্য কারো সম্পর্কে হোক পরিষ্কার কথা বলে। আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল তার। বাবাও তাকে খুব পছন্দ করত। আদর করে মিস্টার রমেশ বলে ডাকে। তার দেখাদেখি আমিও তাই ডাকতে শুরু করে দিলাম। মা অবশ্য রাগ করত, বলত, ওইটুকু মেয়ের এ কি ডাকের ছিরি!

কিন্তু রমেশ সামতানি বলত, ওইটুকু মেয়ের মুখে এই ডাকই আমার শুনতে ভালো লাগে—এই নামেই ডাকবে।

সেই আদরের ডাকটাই থেকে গেছে। রমেশ সামতানি আজও আমার কাছে মিস্টার রমেশ। মিস্টার রমেশের আগে থেকে আমাদের লোনা ভালার বাড়িতে আরো দুটি প্রিয়জন আছে। আমার জ্ঞান হওয়ার বয়েস থেকেই বাড়ি সংলগ্ন আউটহাউসে দেখে আসছি তাদের। তারা লক্ষ্মী যোশী আর মংগেশ যোশী। মংগেশ যোশী বাড়ির বাগানের তদারক করে, বাবার কাজকর্ম করে দেয়। আর অন্দরমহলের কাজকর্ম দেখাশুনা করে লক্ষ্মী যোশী। আমার একেবারে ছেলেবেলায় কাজের আরো অনেক লোকজন দেখেছি বাড়িতে। কিন্তু বারো চৌদ্দ বছর বয়সের সময় শুধু ওই দুইনজকেই টিঁকে থাকতে দেখেছি। বাবার মতো দরাজ মনের ভালো মানুষকেও বাকি লোকগুলো একে একে ছেড়ে যায় কেন তখন ভালো বুঝতাম না।

বুঝতাম না কারণ বাবা তখন পর্যন্ত আমাকে আমাদের ভিতরের অবস্থা কিছুই বুঝতে দেয়নি। বাবার পিতৃপুরুষেরা লোনাভালার জমিদার ছিল। আর এককালে বিরাট অবস্থাও ছিল তাদের। টাকা তাদের কাছে হাতের ময়লা। উড়িয়েছে ছড়িয়েছে দান করেছে। বাবারও ছেলেবেলায় ওই রকম বিলাসিতার মধ্যে কেটেছে। ওদিকে জমিদারি প্রথা উঠে গেছে। জমিদাররা অনেকেই জোতদার হয়ে বসেছে। কিন্তু লোনাভালার বীরকর বংশ ও কাজে নেই। আমার ঠাকুরদার আমল থেকেই অবস্থা পড়ে আসছিল কিন্তু তবু সেই ভদ্রলোক দানের হাত বা খরচের হাত গুটিয়ে নেয়নি। শরিকদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে বাইরের যেটুকু জমি-জমা ছিল সেটুকু তার আমলেই নিঃশেষ। বাবার ভাগে শুধু এই বাড়িটাই জুটেছিল, তার বেশি কিছু নয়। তা এই বাড়ির মধ্যেও সম্পদ কম ছিল না।

কিন্তু একটা জীবন বসে খেতে হলে তাই বা আর কদিন থাকে। অথচ বাবা ভালো লেখাপড়া জানা মানুষ। চেষ্টা করলে চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিতে পারত। কিন্তু লোনাভালার বীরকর বংশ অন্যের গোলামী করবে এ আবার একটা কথা নাকি! লোনাভালায় বসে সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া বাবা ছিল আত্মভোলা উদার মানুষ। গান-বাজনা পছন্দ করত খুব। আগে বাড়িতেই উঁচুদরের গান-বাজনার আসর বসত। দিন পড়ে আসর পরেও সে ঝোঁক কাটেনি। কোথাও ভালো গান বাজনা হচ্ছে শুনলেই বাবা ছুটত সেখানে। সুন্দর একটা মন ছিল তার। সকলে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, ভক্তি করত। অবস্থা পড়েছে, কিন্তু লোনাভালার বসন্তরাও বীরকরের মান মর্যাদা একটুও কমেনি। লেখাপড়া জানলেও এমন লোক এখানে বসে কি কাজ করতে পারে?

বাড়ির এতখানি পড়তি দশার খবর আমি অনেককাল জানতে পারিনি। মোটামুটি জেনেছি যখন এম.এ. পড়ি। তাও বাবা মা বলে নি কখনো। সংসারের অবস্থাটা চুপি চুপি আমাকে জানিয়েছে রমেশ সামতানি। ব্যবসায়ে ততদিনে বরাত ফিরেছে তার। দিনে দিনে লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাইরের আচরণে কোনোরকম আলগা জলুস নেই। দেখলে বোঝাও যাবে না কত বড় হয়ে উঠেছে সে। মুখে সেই এক কথা, আই অলওয়েজ লাভ টু ডু মাই ওউন লিট্‌ল্ থিংস। তাছাড়া কৃতজ্ঞতা ভোলেনি। তার কর্মস্থল বম্বে। কিন্তু অবকাশ পেলে দু'চার দিন লোনাভালায় বাবার কাছে কাটিয়ে আসে। আর বাবার মনে আঘাত না দিয়ে যতটা পারে সাহায্যও করে। কাজের তাড়ায় তাকে নানা দিকে জায়গায় ছোটাছুটি করতে হয়। কোনো সময় জুনাগড়ে এসে গেলে আমার সঙ্গে দেখা না করে যায় না।

জুনাগড়ে বসেই আমাদের সংসারের অবস্থাটা সে আমাকে জানিয়েছিল। বাবা লোনাভালার জমিসুদ্ধু আমাদের সেই বিরাট প্রাসাদ বিক্রি করে দেবার কথা ভাবছে। সে-রকম খদ্দের পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে বাবা তাকেই নাকি অনুরোধ করেছে।

শুনে মনটা যে কি খারাপ হয়ে গেছল আমিই জানি। লোনাভালার ওই প্রাসাদ বংশগতভাবে আমাদের গর্বের জিনিস। সকালে দরজা খুলে বারান্দায় এলেই নীল আকাশ, কাছে দূরে পাহাড়। সব মিলিয়ে যেন ছবি একখানা। সেই বাড়ি বিক্রি করে দেবার কথা ভাবা হচ্ছে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমাদের!

রমেশ সামতানিকে আমি বলেছি, আমার এম-এ পাশ করা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যায় না? আর দুটো মাসের মধ্যেই আমার এ-পাট শেষ হবে।

শুনে রমেশ মিটিমিটি হসেছে। যেমন হাসে। জিজ্ঞাসা করেছে, এম-এ পাশ করে তুমি কি করবে?

যা হোক একটা চাকরি-বাকরি খুঁজে নেব।

রমেশ সামতানি বলেছে, চাকরির যা বাজার বড় জোর একটা স্কুল মাস্টারি পেতে পারো। তা দিয়ে তোমাদের বাড়ির ট্যাক্সও দিয়ে উঠতে পারবে না।

বেশ কয়েক হাজার টাকা ট্যাক্সও জমে গেছল জানি। সে-টাকাটা রমেশ সামতানি বাবাকে ঋণ দিয়ে দায় উদ্ধার করেছে। আসলে সে কিছুটা কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছে, বাবার কাছ থেকে সে টাকা আর পাবে কি পাবে না তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। কিন্তু আবারও তো ট্যাক্স জমছে। তাই ট্যাক্সের উল্লেখ।

আমি বলেছি, কেন, স্কুল মাস্টারির থেকে আর ভালো কিছু পাব না? রমেশ সামতানি একবার আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তেমনি অল্প অল্প হেসেছে, তারপর জবাব দিয়েছে চেহারার জোরে পেতে পারো, কিন্তু মান সম্ভ্রম বজায় রেখে বেশি দিন টিকতে পারবে মনে হয় না।

ওই রকমই সাফ-সুফ কথাবার্তা রমেশ সামতানির। অন্য যে কোনো মেয়ে হলে কান মুখ লাল হত। আমাদের এই দুজনের কাথাবার্তায় মনে মুখে লাগাম নেই কারো। আমি মুখরার মতো বলেছি, কেন, তোমারই তো বিরাট বিজনেস এখন, ইচ্ছে করলে তুমিই তো আমাকে মোটা মাইনেয় বহাল করে নিতে পারো।

মুখের দিকে চেয়ে রমেশ সামতানি মিটিমিটি হেসেছে খানিক। তারপর বলেছে, আমার দপ্তরে তোমার উপযুক্ত একটা পোস্টই খালি আছে ...মাইনেও আনলিমিটেড, কিন্তু সে-কি তুমি রাজি হবে?

বারো বছর বয়েস থেকে একে দেখে এসেছি, কিন্তু এ-কথা শোনার পর সত্যি মুখ লাল হয়েছে আমার। যে পোস্টের ইঙ্গিত করল সেটা তার ঘরনীর পোস্ট। আজ বছরখানেক হল তার এই জায়গাটি খালি। সে তার এক বিশ্বস্ত সেক্রেটারিকে বিয়ে করে বসেছিল। ব্যবসায়ের শুরু থেকে এই সেক্রেটারিটি ডান হাত ছিল। তারই পুরস্কার। লীলা সামতানিকে আমি চোখে কখনো দেখিনি। কারণ স্বামীর ব্যবসার তদারকে সে তখন আরো ব্যস্ত। নানা জায়গায় ছোটাছুটি করতে হয় তাকেও।

বছর তিনেক আগে এডেনের এক শাখার ভার দিয়ে লীলা সামতানিকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। রমেশ সামতানি তখন বছরের মধ্যে অনেক বার করে এডেনে যেত। কিন্তু এক বছর হল সেই এডেন শাখার সর্বাধিনায়িকাটি নিখোঁজ, সেই সঙ্গে কয়েক লক্ষ টাকাও। সেখানে তার যে আবার এক বিদেশি প্রণয়ী জুটে যেতে পারে রমেশ সামতানির মতো পাকা লোকেরও সেটা হিসেবের বাইরে ছিল। না, পলাতকা স্ত্রীর খবর সে আর করেনি।

শুনে আমাদের কষ্ট হয়েছে। কিন্তু রমেশ সামতানির এ নিয়ে এতটুকু তাপ উত্তাপ দেখিনি। সে নির্বিকার। বলেছে, এমন যার চরিত্র, সে যে আমাকে এত অল্পেতে অব্যাহতি দিয়েছে সেটুকুই আমার সৌভাগ্য। গলায় ছুরি বসিয়েও তো সটকান দিতে পারত ...। আই অ্যাম গ্রেটফুল।

রসিকতা করে এই শূন্য পোস্টটার কথা বলেছে সে।

সেই সময় আমার জুনাগড়ের দাদু মারা যায়। তাই এম-এ পরীক্ষাটা শেষ হবার পর সেখানকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ। পাকপাকিভাবে লোনাভালায় বাবার কাছে এসে বসেছি। আর মোটামুটি জানা ছিল বলেই কিছুদিন না যেতে সংসারের হাল বুঝেছি বাড়ির চাকর-বাকরদের একে একে বিদায় করা হয়েছে। আছে শুধু আউট হাউসের ওই মংগেশ যোশী আর তার বউ লক্ষ্মী যোশী। মাইনে দিতে পারে না বলে বাবা তাদেরও ছুটি দিতে চেয়েছিল। শুনে কেঁদে কেটে সারা তারা—যে কর্তাবাবুর নিমক খেয়ে এতকাল কাটালো তারা, যার দয়ায় দু'দুটো ছেলে কিছু লেখাপড়া শিখে বোম্বাইয়ে কাজ করছে, এই দুর্দিনে সেই মংগেশ আর লক্ষ্মী এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে চলে যাবে? কক্ষনো না। শিবলিতে তাদেরও বাপের আমলের ঘর আছে, বোম্বাইয়ের দুই রোজগেরে ছেলে সেই ঘর-বাড়ি সংস্কার করে কতবার তো বাবা-মাকে সেখানে গিয়ে থাকতে বলেছিল। এ পর্যন্ত নিজেদের বাড়ি-ঘর আমাকেও দুবার নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এনেছে। ছেলেদের কথা কর্তাবাবু আর কর্তামাকে ছেড়ে যাবে না বলেই তখনো যায়নি তারা। মনিবের এই দুঃসময় দেখে এখন চলে যাবে? মাইনে-টাইনে চাইনে তাদের। শুধু দুটি খেতে দিলেই হলো আর আউট হাউসে যেমন আছে তেমনি থাকতে দিলেই হল।

এ ছাড়াও ওদের যেতে না চাওয়ার আরো একটা কারণ আছে। সেই কারণটা শুধু আমিই জানি। মংগেশের তিনটে না চারটে বোন ছিল আর লক্ষ্মীর ছিল আরো ছ'টা বোন। কিন্তু ওদের দুটোই ছেলে। একটা মেয়ের ভারি শখ ছিল তাদের। মেয়ে একটা এসেওছিল তাদের ঘরে। কিন্তু ছ'মাসও বাঁচল না। সেই খেদ আর সেই দুঃখ ওদের আর জীবনে ঘুচত কিনা সন্দেহ। কিন্তু মনিবের মেয়েকে অর্থাৎ আমাকে সেই বাচ্চা কাল থেকে পেয়ে তারা কিছুটা শোক ভুলেছে। বিশেষ করে লক্ষ্মী। সে আমাকে নিজের মেয়ে ভাবত। খুব ছোট বয়সে প্রায় সমস্তক্ষণ আগলে আগলে রাখত আমাকে। মা-বাবার চোখে ধুলো দিয়ে আমাকে আমার পছন্দসই জিনিস খাওয়াত। অল্প বয়সে আমাকে জুনাগড়ের দাদুর কাছে চলে যেতে হয়েছিল বলে যেমন কান্না কেঁদেছিল লক্ষ্মী, তেমনি আমি। ওকে আমি মাসি ডাকি, সে কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে, শেষে বাবার কাছে ধমক খেয়ে ছাড়তে হয়েছে।

তারপর থেকে ছুটি-ছাটায় বাবার কাছে এলে লক্ষ্মীরই যেন সব থেকে বেশি আনন্দ। যাবার সময় আবার সেই কান্না। তারপর উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত আবার কবে আসব। কিছুকাল কেটে যেতে কান্নাকাটি আর করত না বটে, কিন্তু বাড়ি এলে ওর যে সব থেকে বেশি আনন্দ হত সেটা আমি টের পেতাম।

যাক, বাবা-মা মংগেশ যোশী বা লক্ষ্মীকে আর যেতে বলেনি। তারা যেমন ছিল তেমনি আছে। মাইনের বদলে শুধু খেতে পায় বলে কাজে কোনো ত্রুটি নেই। মংগেশের হার্টের ব্যামো আছে তবু সর্বদাই সে বাড়ির কাজে ব্যস্ত। এই বিশাল অট্টালিকা যতখানি সম্ভব দুজনে তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

রাখতে চেষ্টা করে। আর মংগেশের জন্যেই বাড়ির চারদিকের এত জমি তখনো জঙ্গল হয়ে যায়নি। হার্টের ব্যামো-ট্যামোর ও পরোয়া করে না।

এম-এ পরীক্ষা দিয়ে পাকাপাকিভাবে এখানে এসে বসার পর ওই লক্ষ্মীমাসিই আমাকে একদিন ঘরে ডেকে চুপি-চুপি বলল, তোমার বাবা বোধহয় বাড়িটা বিক্রিই করে দেবেন, হামেশাই বাইরের লোকজন আসছে, ঘরবাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখছে। তুমি এসেছ তাই এ ক'দিন লোক আসা বন্ধ। ঠিক ঠিক দর পেলে মনিব এ-বাড়ি ছেড়েই দেবেন মনে হচ্ছে।

মায়ের মুখেরও হাসি কমেছে লক্ষ্য করেছি। আর দিনেক দিন কেমন যেন সিঁটিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ কিছু একটা অসুখ-টসুখ করেছে। জিজ্ঞাসা করলে মা বলে, না রে, তেমন কিছু হয়নি। তবে মাঝে মাঝে পেটে কেমন জ্বালা করে আর বেশ ব্যথাও হয়।

শেষে বাবাকে বলে একজন ভালো ডাক্তার এনে দেখানোর কথা বলেছি, কারণ জ্বালা যন্ত্রণা বাড়ছিলই আর মা তা মুখ বুজে সহ্য করছিল। কোনোদিন বাবাকে কিছু বলেনি। আমার কথা শোনামাত্র ঘাবড়ে গিয়ে বাবা হন্তদন্ত হয়ে লোনাভালার সব থেকে বড় ডাক্তারই ধরে এনেছে। বরাবরই কারো অসুখ-বিসুখ শুনলে বাবা খুব ঘাবড়ে যায়। সেই ডাক্তার এসে মাকে পরীক্ষা করে আর সমস্ত বিবরণ শুনে আগে এক প্রস্থ ব্লাড ইউরিন স্টুল পরীক্ষা আর বেরিয়াম মিল এক্সরের ফিরিস্তি দিল। আর, এই লোনাভালার সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র বলে বাবাকে বকাবকি করতে পারল না, কিন্তু একটা অনুযোগ করে গেল, এভাবে ভুগছেন—আপনারা এতদিন করছিলেন কি?

মায়ের এলাহি চিকিৎসাই শুরু হয়ে গেল তারপর। কারণ পরীক্ষায় দেখা গেছে পেটে ভালো রকম আলসার হয়ে বসেছে, তা ছাড়া বেশ অ্যানিমিয়া—রক্তের জোর নেই বলতে গেলে। তাই চিকিৎসার যেমন দরকার রুটিন বেঁধে ভালো খাওয়া-দাওয়ারও তেমনি দরকার।

বরাবরই আমার দরকারি কথাবার্তা যা, তা সবই বাবার সঙ্গে। তারপর এ অবস্থায় তো মায়ের সঙ্গে আলোচনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নিচের বসার ঘরে এসে বাবাকে বললাম, এখন তো বেশ খরচের ব্যাপার, কি করবে?

বাবার মান-সম্মান বোধ এমনি যে এ-ব্যাপারে নিজের মেয়ের সঙ্গেও খুব সহজ হতে পারে না। বলে উঠল, খরচের ব্যাপার খরচ হবে, তার জন্যে তোর ভাবনার কি আছে! টাকার জন্যে তোর মায়ের চিকিৎসা আটকাবে নাকি!

তবু জিজ্ঞাসা করলাম, টাকা আছে তোমার হাতে?

বাবা আরো বিরক্ত। —হ্যাঁ আছে আছে —কত টাকা চাই তোর?

তখনকার মতো কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম আমি।

তার ঘণ্টা দুই বাদে দোতলায় দাঁড়িয়ে দেখি বাইরে কোথাও বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে মংগেশ নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। বাইরে বেরুবার সময় মংগেশ দস্তুরমতো বাবু। বাবা বারান্দায় এসে তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। খানিক বাদে দেখলাম, মংগেশ চলে যাচ্ছে, বেশ যেন অসন্তুষ্ট অথচ শুকনো মুখ। আপাতত নিজের আউট হাউসের দিকেই যাচ্ছে সে।

আমার হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল। এ সময় মংগেশ বাগানের কাজ নিয়ে থাকে—হঠাৎ চলল কোথায়? আর বাবার সঙ্গে আমার ও-কথা হবার পর তারই বা ডাক পড়ল কেন? বাবা ওপরে উঠে আসতেই আমি চুপচাপ নিচে নেমে এলাম। সোজা আউট হাউসে। মংগেশ ভিতরের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ডিশে করে খেয়ে নিচ্ছে কি, তার সামনে জলের গেলাস হাতে লক্ষ্মী।

দুজনেই তাকালো আমার দিকে। মুখ দুজনেরই ভার।

আমি মংগেশকেই জিজ্ঞাসা করলাম, কোথাও বেরুচ্ছ নাকি?

খাবার চিবুতে চিবুতে মংগেশ গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল। —বেরুচ্ছি।

কোথায়?

দূরের শহরে।

বাবার কোনো কাজে?

খাবার গলায় আটকালো মংগেশের। ডিশ রেখে তাড়াতাড়ি জলের জন্যে হাত বাড়ালো। জল খেয়ে আমার দিকে তাকালো। বিপাকে পড়েছে যেন।

আমি আবার বললাম, কি কাজে দূরের শহরে যাচ্ছ?

মংগেশ জবাব দিল, মনিব শুনলে রাগ করবেন ...

মনিব শুনবে না, তুমি বল।

বিব্রত মুখে মংগেশ তার বউয়ের দিকে তাকালো। লক্ষ্মীর অত ভয়-ডর নেই। দরকার হলে মা-কেও শাসন করে। সে মাথা নেড়ে সায় দিতে মংগেশ কোর্তার ভিতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাগজে মোড়া জিনিস বার করল একটা। বলল, দূরের শহরে যাচ্ছি এটা বিক্রি করতে।

মনের তলায় এই গোছেরই কিছু একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল আমার।

কি ওটা?

তার হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে লক্ষ্মী খুলে দেখালো জিনিসটা কি। ঠাকুরদার আমলের মোটা সোনার চেন বাঁধা বড়-সড় সেই পকেট ঘড়িটা। যার কাঁটা রাতের অন্ধকারেও ঝকঝক করে। শুধু ওই সোনার চেনের ওজনই হবে কম করে আড়াই ভরি। তাছাড়া ঘড়ির চারদিকের অতবড় চাকতিটাও খাঁটি সোনার। এ-রকম জিনিস আজকাল আর চোখেও দেখা যায় না। এটা বাবার শুধু প্রিয় নয়, খুব গর্বের জিনিসও। বিশেষ কোথাও যেতে হলে সেজেগুজে ওই ঘড়ি বুক পকেটে রেখে সোনার চেন ঝুলিয়ে যায়।

আমার চোখের কোণ দুটো শিরশির করে উঠল হঠাৎ! কয়েক মুহূর্ত কোনো কথাই বলতে পারলাম না। এটা বেচতে কেন দূরে শহরে যেতে হবে তাও বুঝলাম। লোনাভালায় এ-ঘড়ি অনেকেই চিনে ফেলতে পারে। ঘড়ি চিনুক না চিনুক, লোনাভালার বীরকর বাড়ির সরকার মংগেশ যোশীকে কে না চেনে এখানে? তাই তাকে দূরে যেতে হবে যেখানে কেউ তাকে চিনবে না, কেউ কিছু বুঝবে না।

ফোঁস করে একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে লক্ষ্মী বলল, এ আর নতুন কি, কত কিছুই তো একে একে চলে গেল এভাবে। মনিবকে জানতে না দিয়ে তোর মা— এর হাত দিয়ে চুপি চুপি কত গয়না বেচেছে, আবার তোর মাকে জানতে না দিয়ে মনিব কত কি বেচেছে। এবারে তুই এসে গেছিস, নিজের চোখে দেখ কিভাবে চলছে, আমরা অনেক দেখেছি।

লক্ষ্মী বরাবরই আমাকে নিজের মেয়ের মতো তুই তুকারি করে কথা বলে। আমার তাতে আত্মসম্মানে একটুও লাগে না। কিন্তু এই ব্যাপার জানার পর এদের সামনেও আমার মাথা যেন হেঁট হয়ে গেল।

একটা গাড়ির আওয়াজ কানে আসতে সচকিত হয়ে ঘুরে তাকালাম। আউট হাউসের পাশ দিয়ে রমেশ সামতানির ঝকঝকে গাড়ি আমাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। নিজেই ড্রাইভ করে বম্বে থেকে সোজা এক এক সময়ে এখানে চলে আসে সে। আগে এলে দুটো একটা দিন থেকে বিশ্রাম করে যেত। এখন কাজের চাপে বড় একটা থাকতে পারে না। কিন্তু ফাঁক পেলে আসে ঠিকই। একবেলা বা ঘণ্টা দু'চার থেকে আবার চলে যায়। অবস্থা ফিরেছে বলে তার দেমাক বাড়েনি। বরং গোড়ার দুরবস্থার সময় বাবার সাহায্য কত পেয়েছে সে-কথাই বলে। হঠাৎ তার গাড়ি দেখে আমার বুক থেকে যেন একটা বোঝা নামল। লক্ষ্মীমাসিকে বললাম, ঘড়িটা এখন রেখে দাও তোমার কাছে, বিক্রি করার দরকার হলে পরে বলব।

মংগেশ আমতা আমতা করতে লাগল, মনিব খোঁজ করলে?

খোঁজ করলে আমার নাম করে দিও, বোলো আমি বারণ করেছি।

একই চত্বরের মধ্যে আউট হাউস থেকে আমাদের বাড়ি কম করে তিন-চার মিনিটের পথ। আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি চলেছি। এ-সময় রমেশ আসতে খুশি হয়েছি, স্বস্তিবোধও করেছি। বয়সে চৌদ্দ বছরের ফারাক হলেও আমাদের পরস্পরের আচরণ অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতোই। মনে মুখে লাগাম নেই কারোরই, সে যা মুখে আসে তাই বলে হাসি-ঠাট্টা করে আমার সঙ্গে, আর ফাঁক পেলে আমিও জব্দ করতে ছাড়ি না তাকে। এ-সময়ে যেন এই লোকেরই দরকার ছিল আমার।

বাইরে বসার ঘরে ঢুকেই চক্ষুস্থির আমার। শুধু রমেশ সামতানি আসেনি, তার সঙ্গে একগাদা ফুল-ফল আর একরাশ মিষ্টিও এসেছে।

ঘরে ঢুকে বললাম, এত সব কি ব্যাপার?

রমেশ হেসে বলল, আই অলওয়েজ লাভ টু ডু মাই ওউন লিট্‌ল থিংস।

খুশিতে আটখানা হয়ে বাবা বলে উঠল, দেখ আমি খবর রাখি না, তুই নিজে পর্যন্ত না—এদিকে রমেশ তোর এম-এ পাশের খবর জেনে এ-সব নিয়ে হাজির!

ভিতরে ভিতরে সত্যি খুব আনন্দ হল। মুখে বললাম, তার জন্যে এত সবের কি দরকার ছিল—পাশ যে করব এ তো জানা কথাই।

রমেশ টিপ্পনী কাটল, ইস, টেনেটুনে সেকেণ্ড ক্লাস তার আবার নিশ্চিন্তি কত।

ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, টেনে-টুনে!

না তো কি? ফার্স্ট ক্লাস না হলেই টেনে-টুনে।

একটা ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ফার্স্টক্লাস ক'জন পেয়েছে?

উল্টে দাবড়ানি দিয়ে রমেশ বলে উঠল, একজনও পেল না কেন? দাদুর টাকায় আর বাবার টাকায় খাবে দাবে ফুর্তি করে বেড়াবে আর রেজাল্টের বেলায় এই!

বাবা হাসতে লাগলেন। — না রে, তুই ভালো সেকেণ্ড-ক্লাসই পেয়েছিস। যাই তোর মাকে বলে আসি। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার দুঃসংবাদটাও মনে পড়ে গেল তাঁর। বিমর্ষ মুখে বললেন, ওর মায়ের খবর জানো না তো, ভালো মতো বিছানা নিয়েছে—আলসার অ্যানিমিয়া আরও কত কি—

রমেশ বলল, আমি তো কিছুই জানি না, চিকিৎসা ঠিক মতো হচ্ছে তো?

তা না হবার কি আছে, এখানকার সব থেকে বড় ডাক্তার ক'বার করে এসে দেখে গেছে, এক্স-রে ফেক্স-রে সব হয়ে গেছে, ওষুধ পথ্যও কড়া নিয়মে চলছে, টাকা এন্তার খরচ হচ্ছে তার জন্যে ঘাবড়াই না, এখন সেরে উঠলে হয়।

বাবার এই রকমই কথাবার্তা, যেন খরচের জন্যে কখনোই কোনো উদ্বেগ নেই। আমার পাশের আনন্দ গেল—ঘড়ি বিক্রির ব্যাপারটা মনে পড়ছে। মাকে খবর দেবার জন্যে বাবা দোতলায় উঠে গেল। আমি রমেশের মুখোমুখি বসলাম।

সে জিজ্ঞাসা করল, সত্যি বেশি অসুখ নাকি?

খুব কমও নয়।

আমাকে একটা খবর দিলে না কেন। ... মংগেশের কল্যাণে ভেতরের খবর তো কিছু রাখি, তা ছাড়া উনি নিজেই সেই কবে থেকে বাড়ি বিক্রির কথা বলছেন...চিকিৎসা ঠিক ঠিক হচ্ছে?

এই জন্যেই রমেশকে ভালো লাগে, রেখে ঢেকে জিজ্ঞাসা করে না। জবাব দিলাম, এখন পর্যন্ত হচ্ছে আর, কতদিন হবে জানি না। ... বাবার সেই মোটা চেন-অলা আগের কালের ঘড়িটা দেখেছ?

হ্যাঁ, খুব দামী ঘড়ি তো ...কি হয়েছে?

বিক্রির জন্যে আজ চেনসুদ্ধু সেটা মংগেশের কাছে চলে গেছে আমি জানিতে পেরে আটকে রেখেছি। ...টাকা আছে তোমার সঙ্গে?

রমেশ বলল, খুব বেশি তো নেই, হাজার দুই আছে, আরো দরকার হলে চেক দিয়ে যেতে পারি।

সত্যিকারের কাজের মানুষদের বরাত এমনি করেই ফেরে বোধহয়, রমেশ আজ দু'হাজর টাকা পকেটে নিয়ে বেড়ায় আর সে টাকাও বেশি কিছুই নয় বলে সঙ্গে চেক বই থাকে। বললাম, দু'হাজারের দরকার নেই, আপাতত হাজার খানেক হলেই চলবে।

পকেট থেকে মোটা ব্যাগ বার করে গুনে দু'হাজর টাকাই তুলে নিল। বলল, হাজর টাকায় কিছু হবে না এই দু'হাজর রাখো। আরো দরকার হলে খবর দিও, আর তোমার বাবাকে কিছু জানানোর দরকার নেই।

নিঃসংকোচে একশো টাকার ভাঁজ করা বিশখানা নোট হাত বাড়িয়ে নিলাম।

তারপর বললাম, বাবা জানলেই বা, এ টাকা কি শুধব না নাকি!

শুধবে না মানে, সুদে আসলে আদায় করে ছাড়ব, তোমার মিস্টার রমেশকে কাঁচা ছেলে ভাবো নাকি! হাসি মুখে হাত উলটে ঘড়ি দেখল। আমি বললাম এক্ষুনি ঘড়ি দেখছ মানে?

সুখবরটা দেবার জন্যে বিস্তর কাজ ফেলে ছুটে এসেছি, এখুনি যেতে হবে। তোমার মাকে একবার দেখে যাই।

আমি ধমকের সুরে বললাম, বোসো, এখুনি যেতে হবে না।

বাঃ কাজ আছে বললাম না? আই অলয়েজ...

থাক্। খেয়ে দেয়ে ও বেলা যাবে।

রমেশ মিটি-মিটি হাসতে লাগল। ওর ওই হাসিটা দুষ্টমি মাখা বলেই আমার ভালো লাগে। বলল, এম-এ পাশ করেছ বলে এখন থেকে তুমি ধমক-ধামক শুরু করে দেবে নাকি!

হেসেই মাথা নাড়ালাম আমি, অর্থাৎ তাই করব। তারপর বললাম, এখন কাজের কথা শোন, তুমি যতই আপনার জন হও এ ভাবে ধার ধোর করে তো চলবে না ... এখন কি করা যায় তাই বল।

কি করতে চাও, চাকরি?

ঠিক ভাবিনি ...

রমেশ বলল, হাই সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়েছ যখন বম্বেতে বা আর কোথাও চেষ্টা করলে মেয়ে কলেজের মাস্টারি একটা পেতে পারো।

তার মাইনে কি রকম?

একটা হাই তুলে রমেশ জবাব দিল, কত আর, হবে চার পাঁচশো ... তাই থেকে নিজের খরচ চালাবে না বাড়িতে সাহায্য করবে?

লোনাভালার বীরকর বংশের মেয়ে আমি, আমাকে কিনা চার পাঁচশো টাকার চাকরির কথা ভাবতে হচ্ছে। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ার মতোই ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকলে চলবে না এটুকু জ্ঞান বুদ্ধি আমার আছে। বললাম, এর থেকে ভালো আর কিছু যদি না পাই তো কি করব?

একটু ভেবে রমেশ বলল, আমার ফার্মে আসতে চাও যদি ব্যবস্থা করতে পারি, মাইনে-টাইনের কথা তাহলে ভাবতে হবে না।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার সেই সেক্রেটারির চাকরি না তো?

তুমি চাইলে তাও পেতে পারো।

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, দরকার নেই বাপু, মনের মতো সেক্রেটারি পেলেই তুমি একেবারে ঘরে নিয়ে তুলতে চাইবে।

লাভ কি, ঘরে নিয়ে তুললেও তো পালায় শেষে। মুখের দিকে চেয়ে সেই রকমই দুষ্টু দুষ্টু হাসতে লাগল।—ঘরে নিয়ে তোলার তাগিদ এলে আর সেক্রেটারি করার জন্য বসে থাকব না, সোজা ঘরেই টেনে নিয়ে যাব।

ইস, সাহস কত! কাজের কথা শোন, তোমার ওই সব আপিসের চাকরি-টাকরিও আমার ভালো লাগবে না।

কি মনে হতেই যেন রমেশ হঠাৎ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল আমাকে।

আমি যেন তার সামনে সাজানো সামগ্রী কিছু, নিবিষ্ট মনে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কি হল?

না ভাবছি ...

কি ভাবছ?

একটা কাজ করতে পারো, তোমাকে মানাবেও ভালো আর চেষ্টা করলে হয়তো উতরেও যাবে, আর একবার উতরে গেলে টাকা যে কত পাবে তার লেখাজোখা নেই, কিন্তু ...

উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি কাজ সেটা?

ইদানিং বোম্বাইয়ের ফিল্মলাইনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, চেষ্টা করলে ঢুকিয়ে দিতে পারি। ...কিন্তু তোমার বাবা শুনলে তো হার্টফেল করে বসবে।

বাবা কেন, ফিল্মস্টার হবার চিন্তা আমার মাথায়ও কখনো আসেনি। জুনাগড়ে থাকতে কলেজে আর ইউভার্সিটির মেয়েদের যাবতীয় ফাংসানের পাণ্ডা ছিলাম আমি। ছাত্রীজীবনের সেই ছ'বৎসরে নাটক-টাটকও কম করিনি আর দস্তুরমতো নামও কিনেছিলাম। অনেক কাপ মেডেলও পেয়েছি। রমেশ সে-খবর জানে। দুই একটা উৎসবে সে নিজের চোখেই দেখেছে আর প্রশংসা করেছে।

সে কথা ভেবেই এই সম্ভাবনার কথা বলেছে বোধহয়। কিন্তু সে-সব অভিনয়ে একটা পুরুষ মাছিরও সংশ্রব ছিল না, সব চরিত্রই মেয়ে শিল্পীরা করত। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বাবা তার মেয়ের এই প্রতিভা খুব একটা ভালো চোখে দেখত না। বাবা শুধু গান বাজনার সমঝদার, আমাকে বলত, ও সব দিয়ে কি হবে, তার থেকে ভালো করে গান শেখ।

মনে মনে রমেশের এই চিন্তাটা আমিও বাতিল করলাম। তবে মুখে বললাম, বাবার হার্টফেল করার কি আছে, ভদ্রঘরের অনেক মেয়েই তো ছবিতে নামছে আজকাল।

রমেশ বলল, তা নামছে, কিন্তু লোনাভালার বীরকরদের মতো ঘরের মেয়ে বড় একটা নামছে না।

বাইরে বাবার চটির শব্দ কানে আসতেই মুখে আঙুল তুলে ইশারায় রমেশকে চুপ করতে বললাম। দু'হাজার টাকা ধরা হাতটাও শাড়ির আড়াল করলাম।

ঘরে ঢুকে বাবা বলল, মেয়ের পাশের খবর শুনে ওর মা তো বেজায় খুশি। তোমাকে না খাইয়ে ছাড়তে বারণ করে দিল।

রমেশ তক্ষুনি বলল, না খেয়ে যাচ্ছে কে।

বাবা খুশি হয়ে আরাম করে বসল। আমার দিকে ফিরে বলল, তারপর তোদের কি কথা হচ্ছিল?

ওদিক থেকে রমেশ ভালো মুখ করে এ রকম কথা বলে বসবে ভাবিনি।

দিব্বি আলতো করে বলে ফেলল, পাশের খবর পাওয়ার পর সুজাতা এখন খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে।

বাবা তার দিকে ফিরল। —কিসের চিন্তা?

আমার ভ্রূকুটি এড়িয়ে সে জবাব দিল, এই কাজ কর্মের চিন্তা ...

আহত বিস্ময়ে আবার আমার দিকে ফিরল বাবা। — আমার মেয়ে কাজ করবে!

অগত্যা তাড়াতাড়ি সামাল দেবার চেষ্টা আমার। ধমকের সুরে অমি রমেশকে বললাম, কেন বাবার সঙ্গে লাগছ? না বাবা, আমরা অন্য ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম।

বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে না পেয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করল, কোন্ ব্যাপারে আলোচনা?

সেই মুহূর্তের মগজের মধ্যে একটা চিন্তা খেলে গেল আমার। আমতা-আমতা করে বললাম, শুনলে তুমি রাগ করবে।

তক্ষুনি প্রসন্ন মুখ বাবার। — তোর ওপর কবে আবার আমি রাগ করি। অগত্যা বলতেই হল যেন। — রমেশকে বলছিলাম এখানে এত বড় একটা ঢাউস বাড়ি নিয়ে বসে থেকে কি লাভ আমাদের। তার থেকে বাবা যদি বম্বেতে বা সেই রকম কোথাও ছোটোর ওপর একটা হালফ্যাশানের ছিমছাম বাড়ি কিনে আমাদের নিয়ে বসতেন, বেশ হত। এত বড় বাড়ির এমাথা-ওমাথা করতে হাঁফ ধরে যায়। মংগেশেরও বয়েস হয়ে গেল, এরপর কে দেখে কে শোনে।

রমেশ আমার দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইল। বাবার মতোই লোনাভালার এই বাড়ি, এ-বাড়ির বংশের গৌরব আমার কত প্রিয় সে জানে। বাবা যখন চুপি চুপি তাকে বাড়িটা বেচে দেবার কথা বলেছিল, তখন জুনাগড়ে এই নিয়ে আমাদের কত আলোচনা হয়েছে। বাবার দুর্বলতার সম্মান বজায় রেখেও তার সংকোচ ভেঙে দেবার জন্যেই যেন ঘুরিয়ে নিজের মতামতটা তাঁকে জানিয়ে দিলাম। আর যখন কোনো পথ নেই, একথা শুনে বাবা আশ্বস্ত হবেন। একটু স্বস্তি যে পেল বোঝা গেল। আমার দিকে চেয়ে রইল খানিক।

বাবা—এখানে থাকতে তোর আর ভালো লাগছে না?

এবার সত্যি কথাটা গলা দিয়ে বেরুল না। মাথা নাড়লাম, ভালো লাগছে না।

সত্যিই ভালো লাগছে না মনে হলেও বাবার ভালো লাগার কথা নয়। একটু থেমে বলল, এ রকম জায়গা হয় না রে ... যাকগে, তোর জন্যই সব, তুই যখন চাস না এখানে থাকতে তখন এ বাড়ি বেচেই দেব।

আমি মেকি আনন্দে বলে উঠলাম, তুমি এত সহজে রাজি হবে আমি ভাবিনি বাবা। রমেশের দিকে ফিরলাম, মিস্টার রমেশ, এ রকম একখানা বাড়ি কেনার মতো পার্টি আছে তোমাদের বোম্বাই শহরে?

বাবা ঘরে ঢোকার পর থেকে আমার মুখখানাই যেন পর্যবেক্ষণের বস্তু রমেশের। এবারে অল্প হেসে জবাব দিল, ঝুড়ি ঝুড়ি।

ভালো দাম চাই কিন্তু, এত জায়গা-জমিশুদ্ধ কত দাম হতে পারে বল তো?

চার সাড়ে চার লাখ তো বটেই।

সোৎসাহে বললাম, আচ্ছা চার লাখই ধর, তার থেকে দু'লাখ খরচ করলে বোম্বাইয়ে ছোটোর ওপর দারুণ একখানা বাড়ি হতে পারে, বাকি দু'লাখ হাতে থাকলে, হাই ক্লাস! তুমি আজ থেকেই লেগে পড় মিস্টার রমেশ। নিজের ছেড়ে অন্যের কাজও একটু ভালোবাসতে চেষ্টা কর।

সত্যিই বাড়ি বেচার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেল দেখে বাবা মনের ভার চেপেই উঠে পড়লেন। যেতে যেতে বললেন, তোমরা রেডি হও, লাঞ্চের সময় হল।

বাবা ঘর থেকে বেরুতেই রমেশ ঘটা করে আমাকে দেখতে লাগল। তারপর মন্তব্য করল, ফিল্ম লাইনটাই তোমার ভালো স্যুট করবে আমি বলে দিলাম।

ভিতরটা কেমন বিষণ্ণ লাগছিল আমার। জবাব দিলাম না।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার খানিক বাদেই রমেশ চলে গেল। চুপি চুপি বাড়ি কেনার পার্টি দেখার কথা তাকে আর একবার বলে দিলাম।

কিন্তু বিকেল পর্যন্তও বাবার মুখখানা গম্ভীর কেমন। ভাবলাম বাড়ির জন্যেই। কিন্তু আমার দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছে কি জানি না। হঠাৎ ডাকলেন এক সময়, শোন্ তো —

কাছে এসে দাঁড়ালাম।

মংগেশকে একটা কাজে যেতে বলেছিলাম...তাকে আটকেছিস কেন? আমার তক্ষুনি মনে হল, আমার চোখে সংসারের হালটা এভাবে ধরা পড়বে বাবার কাছে সেটাই কম প্রাণান্তকর ব্যাপার নয়। বাড়ি বেচে দেওয়ার অত উৎসাহ কেন হঠাৎ সেটাও যেন বাবা এই থেকেই বুঝে ফেলেছে। তার এই অসহায় অবস্থা দেখে আমার রাগই হয়ে গেল একটু। বললাম, আচ্ছা বাবা, আমি কি বাড়ির কেউ নয়? সংসারের অবস্থা মংগেশ জানবে লক্ষ্মী মাসি জানবে রমেশ জানবে তবু আমাকে তুমি কিছু বলবে না।

এই রাগ দেখে বাবার মুখে বিড়ম্বনার ছায়া পড়ল। থেমে থেমে বলল, ঠিক তা নয়...ও ধরনের সেকেলে ঘড়ি তো চলে না, আজকাল...তাছাড়া মিছিমিছি অতগুলো সোনা আটকে আছে...আর তোর মায়ের জন্যে টাকারও দরকার...

সেটাই আসল কথা। ও ঘড়ি তুমি মংগেশের থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দাও। মায়ের চিকিৎসার জন্যে টাকার ব্যবস্থা আপাতত হয়েছে—

নিজের ঘরে এসে সেই দু'হাজার টাকা নিয়ে বাবার হাতে দিলাম। —এই নাও।

অতগুলো টাকা হাতে নিয়ে বাবা বিমূঢ় হঠাৎ! —কত টাকা এখানে?

দু'হাজার।

বাবা মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। —এত টাকা তুই পেলি কোথায়? আমি নিরুত্তর।

বাবার ভারি মুখখানা উতলা এখন। তারপর প্রায় ভেঙে পড়ার সুরে বলে উঠল, আমার মেয়ে হয়ে রমেশের কাছ থেকে তুই হাত পেতে টাকা নিলি!

আবারও রাগই হয়ে গেল আমার।—এভাবে বলছ কেন, ভিক্ষে নিয়েছি নাকি! আপদে বিপদে মানুষই মানুষের কাছ থেকে ধার নেয়—বাড়ি বিক্রি হলে এ টাকা শোধ করা যাবে না?

বাবা চুপ হয়ে গেল।

তিন

কিন্তু ওপরঅলার ইচ্ছে অন্য রকম। অদৃষ্টের অলক্ষ্য সুতোর বুনট কে আর দেখতে পায়। বাবার মতো এমন ভালো মানুষকে সমস্ত অহংকার ছেড়ে সত্যি বাড়ি বেচে এখান থেকে পাততাড়ি গুটোতে হল না। আর তখনকার মতো সেটা ভগবানের অযাচিত আশীর্বাদ বলেই ধরে নিলাম। বাবা খুশি, অসুস্থ মা খুশি আর আমি তো খুশি বটেই।

রমেশ চলে যাওয়ার দিন দশ-বারো বাদে ঝকঝকে গাড়ি হাঁকিয়ে জনা চারেক শে অভিজাত ভদ্রলোকের সমাগম হল বাড়িতে। তারা এসে মংগেশের কাছে বাবার খোঁজ করল। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে আমি রমেশের কাছ থেকে চিঠিপত্র আশা করছিলাম। এদের দেখে ভাবলাম বাড়ি কেনার কোনো পার্টি হবে। বাবা নিচে নেমে গেল। আমিও উৎসুক চিত্তে নিচে এসে দরজার আড়ালে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে একটু উঁকি দিলে বাবার মুখখানাই দেখা যায় শুধু। ভদ্রলোক চারজন পর পর চারখানা চেয়ারে আমার দিকে পিছন ফিরে বসেছে। তাই তাদের আমাকে দেখার কোনো প্রশ্নই নেই। এ-ভাবে এসে দাঁড়ানোর আরো কারণ, আমার ভালো মানুষ বাবাকে কিছু বিশ্বাস নেই, তোয়াজ করলেই কোন্ দর থেকে কোন্ দরে নেমে আসবে ঠিক কি। তবে রমেশ সামতানি কাঁচা মানুষ নয়, এই যা ভরসা। সে যদি পাঠিয়ে থাকে এদের মোটামুটি একটা দরের আঁচ দিয়েই পাঠিয়েছি।

কিন্তু সৌজন্য বিনিময়ের পর আলোচনা শুরু হতেই বাইরে আমি যেমন অবাক, ভিতরে বাবাও তেমনি। বাড়ি কেনার খদ্দের নয় এরা, আর রমেশ সামতানিও পাঠায়নি। এরা এসেছে একটা ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে। শহর আর শহরতলিতে তাদের হাউসিং ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের স্কীম। মূল কোম্পানি বোম্বাইয়ে। তাদের চেয়ারম্যান বাবার নামে একখানা ব্যক্তিগত চিঠি দিয়েছে। চিঠি দেখার আগে তার নাম শুনেই বাবা অবাক একেবারে, তিনি তো বিরাট মানুষ একজন, নাম শুনেছি...এস আর মোদী মানে শিবরাম মোদী?

হাসি মুখে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে তাদের একজন চিঠিখানা বাবার হাতে দিল। আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম সেই চিঠি পড়তে পড়তে খুশিতে আর উত্তেজনায় বাবার মুখ লাল হচ্ছে। বড় চিঠি মনে হল, কারণ পড়তে সময় লাগছে বেশ। একবার পড়া শেষ করে বাবা আরো একবার পড়ল বোধহয় সেটা। তারপর বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করে বলল, মিস্টার মোদী এত বড় একটা ব্যাপারের মধ্যে আমাকে চাইছেন... কিন্তু আমাকে কি করতে হবে কিছুই তো বুঝতে পারলাম না!

শৌখিন পোর্টফোলিও হাতে লোকটি মৃদু হেসে জবাব দিল, আপনাকে কিছুই করতে হবে না, আমাদের মধ্যে আসতে হবে শুধু, কেন কাকে দরকার সেটা আমাদের অর্গানাইজাররা খুব ভালো করে যাচাই করে নেবার পরেই মিস্টার মোদী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বলতে বলতে ভদ্রলোক পোর্টফলিও ব্যাগ খুলে কোম্পানির ছাপা প্ল্যান প্রোগ্রাম বার করে বাবার সামনে রাখল। শহরতলির কোন্ অঞ্চলে হাউসিং ডেভেলপমেন্টের কি কি কাজ হয়েছে তার নক্শা আর ঝকঝকে ছাপা ছবি দেখালো।

বাবা তাদের চায়ে আপ্যায়ন করার জন্যে বেল বাজিয়ে মংগেশের খোঁজ করতে আমি তখনই সানন্দে ওপরে উঠে এলাম। কারণ এটা এখন আমারই কাজ। তার আগে মাকে সুখবরটা দিলাম। বললাম, খুব সম্ভব এবারে একটু সুদিন আসছে, এক মস্ত কোম্পানি থেকে কিছু প্রস্তাব নিয়ে বাবার কাছে লোক এসেছে।

মায়ের রুগ্ন মুখে আশার আলো দেখা গেল। তবু সংশয়, উনি কি এই বয়সে আবার চাকরি-বাকরিতে ঢুকবেন নাকি! বিশেষ করে এই লোনাভালায়...

সাধারণ চাকরি থেকে ঢের ভালো কিছুই হবে হয়তো। দাঁড়াও শুনি আগে সব! মংগেশের হাত দিয়ে চা জলখাবার পাঠিয়ে খানিক বাদে আবার নিচে নেমে এলাম। বাবা ততক্ষণে কাগজপত্র দেখা শেষ করেছে। সকলে মিলে আলোচনায় তন্ময় এরপর।

ঘণ্টাখানেক বাদে গাড়ি হাঁকিয়ে তারা চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, আপনি ধীরে সুস্থে দেখুন সব— তারপর চেয়ারম্যানের চিঠির জবাব দেবেন। তিনি আপনার চিঠি পেলে পাকাপাকি ব্যবস্থার জন্যে আমরা আবার আসব। ... আর এত বড় বাড়ি, আপনার আপিসও এখানেই হতে পারে। কোম্পানি তার জন্যে ন্যায্য ভাড়া দেবে, আর আপনার সুবিধে অনুযায়ী আপিস ঘরও সাজিয়ে দেবে।

তারা চলে যেতে আমি ঘরে ঢুকলাম। বাবার সমস্ত মুখ যেন আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। এ-রকম ভাগ্যোদয় এখনো যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। টেবিলের ওপর কাগজ পত্র ছড়ানো, সামনে চেয়ারম্যান মোদীর লেটার হেড-এ টাইপ করা চিঠি।

সেই চিঠিটা তুলে নিয়ে একবার পড়লাম আমি। বেশ বড় চিঠি। বক্তব্য, বোম্বাইয়ের শহর আর শহরতলিতে হাউসিং ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের দিকে-দিকে সফল অভিযানের খবর নিশ্চয় মিস্টার বীরকরের জানা আছে। পরিকল্পনা সম্প্রসারণের জন্যে তারা জনাকতক রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সব থেকে সম্মানিত এবং জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিকেই এই আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে নিয়োগ করার সঙ্কল্প। এদিকের সমগ্র অঞ্চলে লোনাভালার মিস্টার বীরকরের থেকে সর্বজনপরিচিত মানী ব্যক্তি আর যে কেউ নেই এটা সকলেরই সুবিদিত। চেয়ারম্যান তাই এই বিশেষ পদটি গ্রহণ করার জন্যে তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে। মিস্টার বীরকর যে জনসাধারণের সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হবেন চেয়ারম্যানের তাতে সন্দেহ নেই। রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টরদের ড্রইং আপাতত মাসে আড়াই হাজার টাকা করে হবে বলে স্থির হয়েছে। এ-ছাড়া আনুষঙ্গিক সমস্ত বিধি ব্যবস্থার দায়িত্বও কোম্পানির। অর্গানাইজারদের সঙ্গে আলোচনার সুবিধার্থে কোম্পানির লিটারেচার এবং প্যামফ্লেট পাঠানো হল। এখন মিস্টার বীরকর যদি যথা শীঘ্র তাঁর অনুমোদন-পত্র চেয়ারম্যানের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন তাহলে লোনাভালাতেই এই অঞ্চলের আনুষ্ঠানিক কাজের গোড়াপত্তন হতে পারে।

চিঠি নিয়ে আমি তখন দোতলায় মায়ের কাছে ছুটলাম। বাবাও এলো একটু বাদে। অনেক দিনের জমাট বাঁধা দুশ্চিন্তা যেন হঠাৎ এক খুশির হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমি আর মা দুজনেই বাবার মুখখানা দেখছি, আর বাবা তাইতে বেশ লজ্জা পাচ্ছে। বলল, এ-বয়সে আবার এক ঝামেলার মধ্যে টানাটানি—

এ-যে খুশির কথা জেনেও মা বলল, এটা তো আর সাধারণ চাকরি কিছু নয় যে মান মর্যাদার প্রশ্ন উঠবে।

বাবা জবাব দিল, তা অবশ্য নয়, মান মর্যাদা আছে বলেই ডাকছে।

...হ্যাঁ এই গোটা অঞ্চলে যদি সব থেকে মানী আর সুপরিচিত একজন মানুষকেও খুঁজে বার করতে হয়, তাহলে বসন্তরাও বীরকরের নামই সে সর্বাগ্রগণ্য হবে তাতে কারো বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

তিন চার দিন আমরা বাবা মেয়েতে লিটারেচারগুলি আর প্যামফ্লেটের ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। নানা আকারের সত্যিই চোখ জুড়ানো বাড়ির ছবি এক-একটা। আমার তাগিদে বাবা চারদিনের দিন এস আর মোদীর নামে রেজিস্ট্রি ডাকে অনুমোদন পত্র পাঠিয়ে দিল।

আর তার তিনদিনের মধ্যেই খুশি মুখে সেই অর্গানাইজারের দলটি আবার এলো। শুধু গোড়ার দিনের চিফ অর্গানাইজার আসেনি। বাবার ইচ্ছে বুঝে এবারে তাদের আরো ভালো করে আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা হল।

কাজ শুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে নিচের দুটো ঘরের ভোল বদল করা হল। দামী আসবাব-পত্র আর আলমারি এলো। আপিস ঘর সাজানো হল। স্থানীয় একজন ক্লার্ক আর একজন টাইপিস্ট নিযুক্ত হল। শুনলাম একজন সেক্রেটারিও দেওয়া হবে বাবাকে, দেখেশুনে বাবা তাকেও নিযুক্ত করতে পারে। ঠাট্টার সুরে আমি তখন বাবাকে বললাম, আমাকেই সেক্রেটারি করে নাও না।

বাবা পালটা ঠাট্টা করল, তোর অভিজ্ঞতা কোথায়?

আমি বললাম, বিনা অভিজ্ঞতায় তুমি যদি ডাইরেক্টর হয়ে বসতে পারো আমি সেক্রেটারি হতে পারি না!

বাবা হাসতে লাগল। বলল, আমি ডাইরেক্টর হয়ে আর করছিটা কি, করার যা তা-সব অর্গানাইজাররাই করবে, আমি শুধু মাথার ওপর থাকব, সই সাবুদ করব, আর গাড়ি করে তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘুরব। ছেলেগুলো ভালো আর কাজেরও। তাহলেও বেশ বোঝে টোঝে এরকম সেক্রেটারি একজন দরকার। ভাবছি কাগজে একটা অ্যাডভার্টাইজ করে দেব।

কিন্তু তার দরকার হল না। দিন চারেক বাদে একজন অভিজ্ঞ লোককে বোম্বাই আপিস থেকে তারাই পাঠিয়ে দিল। নানা জায়গায় কাজের অভিজ্ঞতা আছে তার। এর মধে রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টরের যদি যোগ্য কোনো সেক্রেটারি না নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এই লোকটিকে ইন্টারভিউ করে দেখতে পারেন—এই মর্মে প্রথম দিন যারা এসেছিল তাদের মধ্যে চিফ অর্গানাইজার এই চিঠি দিয়ে লোকটিকে পাঠিয়েছি। অবশ্যই চূড়ান্ত বিবেচনার পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়াটা সম্পূর্ণ রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টরের নিজস্ব ব্যাপার।

সুপারিশ পত্রের ফলে আর অভিজ্ঞতার কাগজ-পত্র সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেখে আর লোকটির বিনম্র কথা-বার্তা শুনে বাবার সত্যিই পছন্দ হয়ে গেল। এই নতুন সেক্রেটারির নাম শেখর নায়েক। ভদ্র আর সভ্য ভব্য মানুষ, কিন্তু লোকটিকে দেখে একটু বেশি বিনয়ী আর লাজুক মনে হয়েছে আমার।

তার কাজ দেখে বাবা দিন কয়েকের মধ্যে ভারী খুশি। বড় বড় ফাইলে দাগ মেরে রাখে কোন্ জায়গাটা দরকারী, কোন্খানটা পড়ে বিবেচনা করতে হবে। নিজেকে পাতা উল্টে সই করতে হয় না, সে-ই সামনে ধরে দেয়। হিসেবপত্র রাখার ব্যাপারেও বেশ চতুর। বাবাকে খুশি দেখলে আমারও আনন্দ। কিন্তু দু-পাঁচ দিনের মধ্যেই শেখর নায়েকের একটা দুর্বলতা আমার চোখে ধরা পড়েছিল। আমার দিকে সোজাসুজি তাকায় না কিন্তু ফাঁক পেলে চোরা চোখে দেখে। লোকটার দুর্বলতা বুঝতে আমার বাকি থাকল না। বয়েসে কম করে আমার থেকে ষোল সতেরো বছরের বড়, এক-একসময়ে আমি তার দিকে ভ্রূকুটি করে চেয়ে থাকতাম। তার ফলে আবার হাঁসফাঁস দশা! কিন্তু পরে হাসিই পেত। দিনের মধ্যে দু'-একবার বাবাকে এটা সেটা বলার জন্যে বা মায়ের ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে আপিস ঘরে আসি। আর তখন মনে হয় কখন আসব বাবার সেক্রেটারি যেন সেই অপেক্ষায় আছে। নিছক কৌতুক বশেও এক এক সময় ঘরে ঢুকি। অল্প অল্প আলাপের পর কাজের ব্যাপারে ভদ্রলোকের আমার সঙ্গে আলোচনার ঝোঁক দেখা গেল।

দশ বারো দিনের মধ্যেই পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে গেছে। বাবার নামে একরাশ কাগজপত্র ছাপা হয়ে এসেছে। ফর্ম, আবেদনপত্র সব কিছুর নিচে বাবার নাম। প্রত্যেক অঞ্চলের সর্বাধিনায়ক সেখানকার রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টর। সাধারণ নিয়ম কানুন মানা ছাড়া খোদ আপিসের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নেই। এ রকম স্বাধীনতা পেয়ে বাবা আরও খুশি।

গোড়ার ক'দিন অর্গানাইজারদের সঙ্গে প্রায় রোজই বাবাকে গাড়ি করে বেরুতে হচ্ছিল। স্থানীয় পয়সা-অলা লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় দরকার, প্রচার দরকার। বিশ তিরিশ পঞ্চাশ মাইল দূরের লোকদেরও লোনাভালার বীরকরদের নাম অন্তত শোনা আছে। তাই বাবা সঙ্গে থাকলে সুবিধে। সেই সব লোকদের সমস্ত প্ল্যান বোঝানো, আর বুঝিয়ে আকর্ষণ করার ব্যাপারে অর্গানাইজাররা সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া নতুন প্ল্যান অনুযায়ী জমি কেনা সাইট দেখার ব্যাপারেও বাবাকে বেরুতে হয়। দেখতে দেখতে লোনাভালায় বেশ একটা তৎপরতার সাড়া জেগে গেল।

রমেশ সামতানির ঝকঝকে গাড়িটা বাড়ির দোরে এসে দাঁড়াল আবার তিন সপ্তাহ বাদে, এক ছুটির দিনে। আপিস বন্ধ সেদিন, তাই ক্লার্করা আসেনি, কিন্তু ঘর খুলে শেখর নায়েক ছুটির দিনেও একটু কাজ সেরে যেতে এসেছে। আমি নিচের বাগানে ঘুরছিলাম, আর একটু বাদে শেখর নায়েক এসে হাজির হতে পারে ভেবে মন মনে বিরক্ত হচ্ছিলাম। ছুটির দিনেও তার এত কাজের ঝোঁক কেন সেটা আমি অন্তত অনুভব করতে পারি।

রমেশের গাড়ি দেখে ভিতরটা ভারী খুশি হয়ে উঠল। ছুটে এলাম। গাড়ি থেকে নেমে রমেশও হাসিমুখে বলল, তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে মায়ের খবর ভালো।

বললাম, খুব ভালো না, তবে আগের থেকে ভালো।

আমাদের নিচের বসার ঘর বদলে গেছে সে আর জানবে কি করে। ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে তাকালো। কোনো কথা ফাঁস না করে আমি হাসছি মিটিমিটি।

ঘরের মধ্যে এসে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে পাশের ঘরটার দিকে এগোল। এ ঘরেরও ভোল বদলেছে লক্ষ্য করল। শেখর নায়েক বসে কাজ করছে সেখানে। সে মুখ তুলে তাকাতে রমেশও তাকে দেখে নিল একদফা। ওদিকে শেখর নায়েক নিরীক্ষণ করে দেখছে তাকে। আমার হাসি খুশি মুখখানাই হয়তো শেখর নায়েকের অস্বস্তির কারণ। আকাশ থেকে ঝুপ করে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী এসে হাজির হল কিনা ভাবছে হয়তো।

রমেশ সামতানি সবিস্ময়ে তাকালো। —এঘর দুটো ভাড়া দেওয়া হয়েছে নাকি?

হাসি চেপে মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তাই দেওয়া হয়েছে।

কোনো আপিস টাপিস?

হ্যাঁ।

কত ভাড়া?

মাসে সাতশ'।

রমেশ সামতানি এদিকে সরে এসে মন্তব্য করল, কাজটা কিন্তু ভালো হল না।

কেন?

এরপর বাড়ি বিক্রি করা একটু শক্ত হবে। আমি একটা পার্টি ঠিক করেই এসেছিলাম, টার্মস মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছল, তাদের বাড়ি পছন্দ হলেই কাজ হত,আমার মুখে যা শুনেছে তাতেই এক রকম পছন্দ হয়েছিল—কিন্তু প্রাধন শর্ত ভেকেণ্ট পজেশান দিতে হবে। বললাম, ওপরে চল তো, তারপর আলোচনা করা যাবে।

বাবা মায়ের ঘরেই ছিল। বলা বাহুল্য রমেশকে দেখে সে-ও খুশিতে আটখানা। মায়ের কুশল সমাচার নেওয়ার পরে তাকে নিয়ে আমরা পারে ঘরে এসে বসলাম। বাবার আর সবুর সয় না। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, রমেশকে বলেছিস সব কথা?

আমি জবাব দিলাম নিচের দু'খানা আফিস-ঘর ভাড়া দেবার জন্যে মিস্টার রমেশ রেগে গেছে—ও বাড়ি বিক্রির পার্টি ঠিক করে আমাদের খবর দিতে এসেছিল। রমেশের দিকে ফিরলাম, কত টাকায় বিক্রির কথা হয়েছিল?

পাঁচ লাখ।

প্রসন্ন মুখে বাবা বলল, তার আর দরকার হবে না রমেশ, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। আসলে কি জানো, বাড়িটাকে সকলেই আমরা বড় ভালোবাসি...শেষ সময়ে একটা উপায়ও হয়ে গেল। তুই বল্ না রে সুজাতা—

ভগবান তোমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, তুমিই বলো।

রমেশ সবিস্ময়ে আমাদের দুজনকেই দেখতে লাগল।

বাবা বলল, তোমাকে অবশ্য এটা চিঠি লিখে আমাদের জানানো উচিত ছিল, ভুল হয়ে গেছে...

এরপর হৃষ্ট মুখে বাবা মোটামুটি সব সমাচার জানালো তাকে। শোনার পরেও রমেশের মুখে কি রকম যেন সংশয় মেশানো বিস্ময় দেখা গেল। সে ব্যবসায়ী মানুষ তাই হয়তো সন্দিগ্ধ মন একটু।

বলল, বোম্বাইয়ের হাউসিং ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের নামটা অবশ্য শোনা আছে ... কিন্তু এত লোক থাকতে তারা হঠাৎ আপনাকে রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টর করতে গেল কেন?

অর্থাভাবে পড়া গেছে বলে রমেশের এ রকম সংশয় বা প্রশ্ন আমার খুব ভালো লাগল না। আমি বললাম, এখানেই যদি ব্রাঞ্চ খুলতে হয় বাবার থেকে নির্ভরযোগ্য সকলের পরিচিত নামী লোক পাবে কোথায়? তুমি কি ভাবছ...?

না...অনেক রকম গজায় তো আজ-কাল, তাই হঠাৎ শুনে কি রকম লাগছিল। বাবার দিকে ফিরল, তারা আপনার সিকিউরিটি কি নিয়েছে ...বাড়ি মর্টগেজ?

এ প্রশ্ন শুনে বাবা দস্তুর মতো ক্ষুণ্ণ। জবাব দিল, তাদের গরজে তারা আমাকে নিয়েছে, বাড়ি মর্টগেজ দিতে যাব কেন, আমার নামটাই তাদের কাছে সিকিউরিটি।

আমি বললাম, অনেকরকম গজায় মানে কি, একটু আগেই তো বললে হাউসিং করপোরেশনের নাম শোনা আছে—

তা আছে ...।

এই সময় মংগেশ চা আর জলখাবার নিয়ে এলো। বাবা তাকে বলল, নিচে সেক্রেটারিবাবুর কাছ থেকে মিস্টার মোদীর চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে এস তো।

নাম শুনে রমেশের মুখ-ভাব বদলালো। —এস আর মোদী মানে শিবরাম মোদী?

বাবা হাসিমুখে মাথা নাড়ল, এবারে যেন ঘায়েল করা গেছে রমেশকে।

রমেশ জিজ্ঞাসা করল, মিস্টার মোদী এর মধ্যে কি?

বাবা বলল, বা রে তিনিই তো চেয়ারম্যান সে খবর রাখ না?

রমেশ মাথা নেড়ে জবাব দিল, অনেক রকমের বিজনেসের হেড ওই ভদ্রলোক...এর মধ্যেও আছেন জানা ছিল না।

মংগেশ চিঠি নিয়ে এলো। সেটা পড়ার পর রমেশ তখনকার মতো এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করল না কিছু।

এরপর শুনলাম মাস দুই আড়াইয়ের সফরে রমেশ সামতানি গোয়া দুবাই আর কোথায় কোথায় বাইরে যাচ্ছে। তার বাইরের সফরটা বোম্বাইয়ের এ-মাথ ও-মাথা করার মতোই ব্যাপার। সব মিলিয়ে বছরের বেশির ভাগ সময় বাইরেই কাটায়। যাবার আগে এই বাড়ি বিক্রির ফয়সালা করতে আর একবার দেখা করে যেতে এসেছিল।

চলে যাবার আগে আমাকে একলা পেয়ে রমেশ বলল, আমার কিন্তু তোমাদের এই ব্যবস্থা খুব ভালো লাগল না। আড়াই হাজার টাকা মাইনে হলেও তোমার বাবার কত কাল আর চাকরি করবেন...বয়েস তো হয়েছে। আমি তোমার কথা ভাবছি, তোমার বাবার পরে তোমাকে তো আর এ চাকরিটি দিচ্ছেনা কোম্পানি। এর থেকে পাঁচ লাখ টাকায় বাড়ি বিক্রি করে বম্বেতে লাখ দেড় দুইয়ের একটা বাড়ি বা ভালো ফ্ল্যাট কিনে বাকি টাকা তোমার আর বাবার নামে ব্যাঙ্কে মজুত রাখলে তোমার দিক থেকে অনেক ভালো হত। এরপর ডেথ ডিউটি আর ওয়েল্‌থ ট্যাক্স দিয়ে বাড়ি রক্ষা করাটাই তো প্রাণান্তকর ব্যাপার হবে তোমার পক্ষে।

খুবই বিবেচনা কথা বলল রমেশ সামতানি, কিন্তু বাবার মৃত্যুর সম্ভাবনার উল্লেখও খারাপ লাগল আমার। বললাম, অত সব সমস্যার কথা আমার মাথায়ও আসেনি, পরের কথা পরে ভাবা যাবে, আর দরকার হলে তখন না হয় বাড়ি বিক্রি করে দেব। আর ডিউটি বা ট্যাক্স-ফ্যাক্স যা দেওয়া উচিত তাই বা ফাঁকি দেব কেন।

হাসি মুখেই রমেশ সামতানি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল একবার। তারপর বলল, এর ওপর আর কথা কি আছে। ... কিন্তু এম-এ পাস করার পর তুমি কি করবে, এখানে বসে বাবার টাকায় খাবে দাবে ঘুমুবে আর মুটোবে?

এ অবশ্য এক সত্যিকারের সমস্যার কথাই বলেছে। আমি কি যে করব এখন পর্যন্ত নিজেই ভেবে

উঠতে পারিনি। বললাম, ঠিক আছে, তুমি বাইরে থেকে ঘুরে এসো, তারপর দুজনে মিলে পরামর্শ করে যা-হোক কিছু ঠিক করা যাবে।

দিনগুলো ভালোই কেটে যাচ্ছিল। কেবল মাকে নিয়ে যা একটু সমস্যা। কিছুতেই আর সুস্থ করে তোলা যাচ্ছিল না তাকে। নইলে বাবার মুখের রঙ বদলেছে, আমিও ভালোই আছি। মংগেশ আর তার বউ লক্ষ্মী মাসিও খুশি মনে আছে। মাস গেলে আড়াই হাজার টাকা আসছে বাবার হাতে, সেই সঙ্গে আপিস ঘর ভাড়ার পাঁচশো। এই ক'টি প্রাণীর দিব্বি আনন্দেই কেটে যাচ্ছে।

বাবা কাজের চাপ আগের থেকে আরো কমে এসেছে। এত দিনে কাছের দূরের বহু লোক হাউসিং ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের এই শাখার খবর জেনেছে। কোম্পানির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা পড়ছে। জমি কিনে বাড়ি আর ফ্ল্যাটের কাজ শুরু হবার কথা ঠিক এক বছরের মাথায়। কাছে দূরের অনেক জমিও দেখে রাখা হয়েছে, দুই একটার বায়নাও করা হয়েছে।

বাবার বলতে গেলে এখন নিচের ঘরে বসে সই-সাবুদ করাটাই আসল কাজ। এ নিয়েও মাথা ঘামাতে হয় না খুব, কি করতে হবে না হবে সেক্রেটারি শেখর নায়েকই বাতলে দেয়।

আমার ভিতরে ভিতরে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে রমেশ সামতানিকে নিয়ে। এবারে তিন মাস বাদে বাইরে থেকে ঘুরে এসেই হাজিরা দিয়েছে। আর তারপর আমাকে যেন বেশ ভিন্ন চোখে নিরীক্ষণ করেছে। শেষে চপল মন্তব্য, আমার বারোটা বাজালে দেখছি—

আমার দিক থেকে না বোঝার বিস্ময়। — কি ব্যাপার?

আয়নায় নিজেকে দেখ?

দেখি তো...কেন? ও, তুমি বলে গেছলে খাব দাব ঘুমুব আর মুটোব—

মুটিয়েছি বুঝি?

রমেশ নিজের কানে আর নাকে হাত দিল।

এই নাক কান মলছি আমি, আর ও কথা বলব না ...আমার ওই কথা শুনে এক্সারসাইজ টেক্সারসাইজ শুরু করেছ বুঝি?

পরিশ্রমের মধ্যে নিয়মিত দু'বেলা অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে বেড়াই আমি, কখনো একলা কখনো লক্ষ্মী মাসির সঙ্গে। জবাব দিলাম, তোমার কথা শুনে কিছু করতে আমার বয়ে গেছে।

রমেশ সামতানি ছদ্ম ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কার কথা শুনে চলছ আজকাল—বাবার সেক্রেটারি ওই শেখর নায়েকের?

এবার এসে দু'দিন থেকে গেছে রমেশ, আর সেই ফাঁকে ফাঁকে শেখর নায়েকের দুর্বলতাও লক্ষ্য করেছে। তাছাড়া ওই লোকের সম্পর্কে হাসি মুখে আমিও মন্তব্য করেছি কিছু।

এর পরের দু-তিন মাস অর্থাৎ আবার বাইরে বেরুনোর আগে পর্যন্ত মাসে অন্তত দুবার করে রমেশ এখানে এসেছে। প্রতিবারই তার হাসিঠাট্টার ফাঁকে কিছু দুর্বলতার আঁচ আমি পেয়েছি। কিন্তু আবার বাইরে যাবার আগে শেষের বার এসে মনের কথা পষ্টা-পষ্টি বলে ফেলেছে। —দেখ, আবার একটা বিয়ে করার সাধ আমার মনের মধ্যে অনেক দিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছে, ঠিক তক্ষুনি তোমাকে পড়ে যায় আর সাধটা পোস্টপোন করি। আজ যাবার আগে তোমার মন্তব্য বা বক্তব্য শোনার বাসনা।

আমার মুখের রং ধরেছিল কিনা জানি না। মনের তলায় এ রকম একটা প্রস্তাব শোনার আশংকা ছিল। বয়সে চৌদ্দ বছরের ফারাক সত্ত্বেও আমরা সমবয়সীর মতো মিশেছি। দুজনে দুজনকে পছন্দ করি। কিন্তু ওই চূড়ান্ত সম্ভাবনার কথা ভাবতে কি রকম যেন লাগে। কেমন একটা অস্বস্তি। রমেশ আপনার জন...কিন্তু ওকেই তা বলে বিয়ে করব...। আসল কথা, আমি নিজেই কিছু স্থির করে উঠতে পারিনি। তাই ওর লঘু প্রস্তাবের জবাবে আমিও পলকা বিস্ময় দেখিয়েছি। —তোমার বিয়ের সাধ হয়ে থাকে তো চটপট সেরে ফেলোগে, তোমার মতো বুড়োর সম্পর্কে আমার আবার কি মন্তব্য বা বক্তব্য থাকতে পারে।

সেও দু'চোখ বড় করে ফেলল, সবে ছত্রিশ পেরুল—আমি বুড়ো! তোমার বাবার সেক্রেটারি তো আরো বয়েস বেশি।

রাগ দেখিয়ে বললাম, ওর জিভে আমি ছ্যাঁকা দিয়ে দেব কোন্‌দিন—আমার মুখখানা প্রথমে দু' চোখে আটকে নিল রমেশ। গম্ভীর। জিভে ছ্যাঁকা অনেক রকমভাবে দেওয়া যায়, তুমি কি ভাবে দেবে?

অসভ্যের ধাড়ী! হাত তুলে মারতে এলাম ওকে।

রমেশ সরে গিয়ে হাসতে লাগল।

তারপর বলল, এবারে একটা ডেফিনিট প্রোপোজাল দিয়ে গেলাম, বাইরে থেকে মাস দুইয়ের মধ্যে ঘুরে আসছি, এর মধ্যে তুমি শক্ত পোক্ত একটা পাথরের মতো মনস্থির করে রেখ।

সে চলে যাবার পর মন উল্টে বরং আরো বেশি অস্থির হয়ে পড়ল। বারো বছর বয়েস থেকে অবাধে মেলামেশা করেছি রমেশের সঙ্গে, কিন্তু সেটা আর যা-ই হোক প্রেমিক প্রেমিকার মতো মেলামেশা আদৌ নয়। সম্ভাবনাটার কথা ভাবতে এক একবার মন্দ লাগছে না বটে, আবার ভিতরের কেউ যেন সেটা নাকচ করতেও চাইছে। দু'বছর আগেও বিয়ের সম্পর্কে আমার মনের তলায় একটা আবছা রোমাঞ্চকর চিত্র উঁকিঝুঁকি দিত। একজন কেউ আসবে, যাকে পরস্পর আমরা নতুন করে দেখব চিনব জানব আর দিনে দিনে আবিষ্কার করব। সেই চিত্রে এই অতি-চেনা রমেশের স্থান ছিল না।

...হঠাৎ বাবার কথা মনে হতে লাগল আমার। এই ভদ্রলোকই বা কি, দিব্বি মনর আনন্দে আছে, মেয়ের ওদিকে বাইশ পেরুতে চলল, একটু চিন্তা-ভাবনাও নেই। মা না হয় নিজের শরীরের জ্বালায় অস্থির, কিন্তু বাবার তো একটু ভাবনা-চিন্তা হতে পারত!

আবার বিয়ের পর এই বাবাকে ছেড়ে যাবার কথা মনে হলেও বুকের তলায় টনটনানি। মরুকগে, যা হবার হবে, পরে দেখা যাবে। ...কিন্তু পরের মাসের গোড়াতেই নীল আকাশ থেকে হঠাৎ যে অকল্পিত বিপর্যয় হুড়মুড়িয়ে মাথার ওপর ভেঙে পড়ল, তার মর্মান্তিক ধাক্কায় লোনাভালার এই গোটা বীরকর পরিবারটিরই বিলুপ্তি অবধারিত যেন। পর পর পাঁচ ছদিন বাবার সেক্রেটারি শেখর নায়েকের আর দেখা নেই। লোকটার কি হল হঠাৎ ভেবে না পেয়ে বাবা চিন্তিত। বাসে আট-দশ মাইল দূরের এক জায়গা থেকে রোজ যাতায়াত করত সে। কাজ যার ধ্যান জ্ঞান তার হল কি হঠাৎ! এ ক'দিনের মধ্যে আবার একটি অর্গানাইজারেরও টিকির দেখা নেই।

এই অবস্থায় এক সকালে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল একটা। বাড়ির দরজায় একটা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল। দুজন পুলিশ অফিসার আর জনাতিনেক কনস্টেবল নামল। বিমূঢ় মুখে বাবা নিচে নেমে এলো, পিছনে আমিও। পুলিশ অফিসার দুজন বাবার পরিচয় নিয়ে জানালো তাকে তাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে। বাবার নাম তাদের চেনাজানা, তাই বোধহয় সম্ভ্রমের সুরেই এই বক্তব্যটুকু জানালো।

বাবা হতভম্ব খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার বলুন তো, আমাকে থানায় যেতে হবে কেন?

একজন অফিসার বাবাকে বলল, ব্যাপার সীরিয়াস, থানায় গেলেই জানতে পারবেন।

তখনো বাবার আর আমার ধারণা শেখর নায়েকেরই কিছু একটা অঘটন ঘটেছে বোধহয়। চিন্তিত মুখে বাবা জামা কাপড় বদলে এলো।

অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবার সঙ্গে আমি যেতে পারি?

সে মাথা নাড়ল, শুধু বাবাকেই দরকার তাদের।

আমার মংগেশের আর লক্ষ্মী মাসির বিমূঢ় চোখের ওপর দিয়ে বাবাকে নিয়ে তারা চলে গেল। আমি দোতলায় উঠে মাকে কিছু বলতে পারলাম না। হঠাৎ এ-রকম দুশ্চিন্তার ধাক্কা তার সহ্য না হতে পারে। সকাল গড়াল, দুপুর গড়াল। বিকেলে আমি মংগেশকে থানায় খোঁজ করতে পাঠালাম। থানা আমাদের বাড়ি থেকে ন'দশ মাইলের পথ। বাসে যেতে আসতেও অনেক সময় লাগবে। সকাল থেকে বাবাকে না দেখে মা ভয়ানক ছটফট করছিল, তাকে হঠাৎ ট্যুরে বেরুনোর কথা বলে ঠাণ্ডা করেছি। কিন্তু নিজে দুশ্চিন্তায় অস্থির।

ঘণ্টা আড়াই তিন বাদে মংগেশ ফিরল। শুকনো পাংশু মুখ। বলল, ভয়ানক কিছু বিপদ হয়ে গেছে নিশ্চয়, মালিকের সঙ্গে তারা দেখা করতে দিল না, তাকে আটকে রেখেছে।

আমি সত্রাসে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন কিছু বলল না? শেখর নায়েক কোথায়?

মংগেশ মাথা নাড়ল শুধু। তারা কিছু বলেনি, শেখর নায়েকেরও দেখা মেলেনি।

এবারে আর মায়ের কাছে গোপন রাখা সম্ভব হল না। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে মংগেশের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখেছ। কানেও হয়তো গেছে কিছু। শোনার পর মা সেখানেই কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল।

বিভীষিকাময় রাতটা সেদিন কাটল কোনোরকমে। পরদিন সকালে বাড়িতে আবার পুলিশের গাড়ি। আপিস ঘর সার্চ করার পরোয়ানা নিয়ে এসেছে তারা। আমি নির্বাক, স্তব্ধ। মংগেশ দরজা খুলে দিতে ঘণ্টাখানেক ধরে তারা তাদের কাজ সারল। ছাপা কাগজ-পত্র আর অনেকগুলো ফাইল নিয়ে আবার গাড়িতে উঠল তারা। আমি ছুটে গেলাম তাদের কাছে।—কি হয়েছে? এ-সবের মানে কি? আমার বাবাকে আপনারা আটকে রেখেছেন কেন?

একজন অফিসার জবাব দিল, আপনার বাবার বিরুদ্ধে সীরিয়াস চার্জ

ম্যাডাম—

কি সীরিয়াস চার্জ?

লক্ষ লক্ষ টাকা জালিয়াতির।

তাদের গাড়ি চলে গেল। এবার আমি কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লাম। লক্ষ লক্ষ টাকা জালিয়াতির চার্জ আমার বাবার বিরুদ্ধে! আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছি। হুঁশ ফিরতে মংগেশকে নিয়ে এবারে আমি থানায় ছুটলাম। থানা অফিসারের সঙ্গে কথা বলে বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেলাম। আমাকে একটা খালি ঘরে এনে বসানো হল। একটু বাদে দুজন লোকের প্রহরায় বাবা ঘরে এলো।

তার দিকে চেয়েই আঁতকে উঠলাম আমি। একটা দিনের মধ্যে বাবার যেন পাঁচ বছর বয়েস বেড়ে গেছে। রক্তশূন্য মুখ, দু'চোখ বসে গেছে। আমাক দেখে কোনোরকমে কান্না সামলে বলল, কি হয়েছে বল্‌তো রে ...আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওই মুখের দিকে চেয়ে কি হয়েছে আমি আর বলে উঠতে পারলাম না। তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলাম, এদের সাংঘাতিক কিছু একটা ভুল হয়েছে—তুমি কিছু ভেব না বাবা, কালকের মধ্যেই আমি তোমাকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছি। ... এখানকার এরা তোমার কাছ থেকে কোনো স্টেটমেণ্ট নেয়নি?

বাবা বলল, খাতা পেন্সিল নিয়ে এরা কবার করেই তো ডাকাডাকি করছে। কিন্তু কি-যে সব জিজ্ঞেস করছে আর কি জানতে চায় আমি কিছু বুঝতেই পারছি না। আমিও কি-যে বলছি তাও জানি না।

বললাম, ঠিক আছে, তুমি কিছু ভেব না। আমি ব্যবস্থা করছি। ... কাল থেকে তোমাকে কিছু খেতে দিয়েছে এরা?

বাবা মাথা নাড়ল শুধু। দিয়েছে। কিন্তু যা-ই দিক সে খাবার যে বাবার গলা দিয়ে নামেনি মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

বাড়ি না ফিরে খোঁজ করে একজন নাম-করা উকিলের কাছে গেলাম। যতটুকু বুঝেছি তাকে বললাম। লোনাভালার উকিল যখন বাবার নাম ধাম তারও জানা আছে। সেই ভদ্রলোক আশ্বাস দিল, আজ রাতে তো কিছু হবে না, কাল খোঁজ নিয়ে দেখি কি ব্যাপার।

আরো একটা ভীষণ রাত কাটল। পরদিনের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফের একটা খবর দেখে আমার দু'চক্ষু স্থির, বুকের তলায় কাঁপুনি।

কাগজ লিখছে, দিন কয়েক আগে হাউসিং ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন নামে এক ভুয়ো প্রতিষ্ঠানের খবর পুলিশের কানে এসেছে। পুলিশের গোপন অনুসন্ধানের ফলে এক বিরাট

জালিয়াতির গ্যাং-এর হদিশ মিলেছে। দলের বেশির ভাগ লোকেই জনসাধারণের বহু লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে উধাও হয়েছে। এই জালিয়াতের দল অনেক ভুয়ো প্যামফ্লেটে নানা জায়গার শৌখিন বাড়ির ছবি ছেপে জনসাধারণের চোখে ধুলো দিয়েছে। এই ভুঁইফোড় হাউসিং ডেভেলপমেন্ট করপোরশেনের চেয়ারম্যানটির নামও জাল। কোন্ সেবক রাম মোদী এস আর মোদির নাম স্বাক্ষর করে জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়েছে এবং সেটা বিশিষ্ট শিল্পপতি শিবরাম মোদীর স্বাক্ষর বলে চালিয়েছে। এই জালিয়াতি চক্রের একজন মাত্র কর্ণধারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে। সে লোনাভালার বিশিষ্ট বীরকর পরিবারের বসন্তরাও বীরকর। নিজেকে রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টর বলে ঘোষণা করে সেই প্রবীণ ভদ্রলোক নিজের বাড়িতেই ঘটা করে আপিস সাজিয়ে বসেছিল। তার ছাপা অনেক কাগজ-পত্র স্বাক্ষরিত ফাইল ইত্যাদি পুলিশ সেই বাড়ির আপিস থেকে উদ্ধার করেছে। এই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি ওই সংস্থার একজন কর্ণধার জেনে বহু সরল বিশ্বাসী লোকের সঞ্চয় পঁচিশ তিরিশ লক্ষ টাকা ওই ভুয়ো সংস্থার নামে জমা পড়েছিল। সময় বুঝে সেই টাকা তুলে নিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে। পুলিশ এখনও সেই টাকার কোনো হদিশ পায়নি।

কাগজ হাত থেকে পড়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছি আমি। কিন্তু একটু স্থির হবার আগেই পুলিশ আবার আমাদের বাড়ি হানা দিয়েছে। সমস্ত বাড়ি ওলট-পালট করে সার্চ করেছে। এমন কি মংগেশদের আউটহাউসও বাদ পড়েনি। আমি আর মা মংগেশ আর লক্ষ্মী মাসি নির্বাক কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে কেবল দেখেছি। সকালের কাগজ পড়ার পরে আবার এসে হানা দিয়েছে তারা, কেন তাও স্পষ্ট, এবারের সার্চের নমুনাই আলাদা! তারা চুরির টাকা খুঁজছে।

তারা চলে যেতে আমি উকিলের বাড়ি ছুটলাম। সেই ভদ্রলোকের মুখ গম্ভীর। বলল, খুব শক্ত ব্যাপার। আপনার বাবাকে তারা কোর্টের কাছের বড় থানায় চালান দিয়েছে। সঙ্গে উকিল থাকায় সেখানে গিয়ে বাবার সঙ্গে সহজেই দেখা করা গেল, কিন্তু তার দিকে চেয়ে আমার চোখে জল এসে গেল। এই দুদিনে আধখানা হয়ে গেছে বাবা। কোন্ বিপাকে পড়েছে এই দুদিনে মোটামুটি বুঝেছে। আমার সঙ্গের উকিল ভদ্রলোক কিছু কথা জিজ্ঞাসা করল তাকে, আর কিছু পরামর্শও দিল। সেখানে ঘণ্টা তিনেক থেকে মোটা জামিনে খালাস করে আনার চেষ্টা করা হল তাকে। কিন্তু পুলিশ রিপোর্টের গুরুত্ব বুঝে কোর্ট জামিনের আবেদন নাকচ করে দিল।

আবার পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা বাবার সঙ্গে। বিড়বিড় করে বলল, আমার দোষটা কি, ওই অর্গানাইজারদের চাহিদা মতো শেখর নায়েক কাগজপত্র যেমন যেমন সামনে এনে ধরেছে আমি সই করে দিয়েছি। ওদের কাউকে না ধরে এরা আমাকে নিয়ে টানাটানি করছে কেন! আমি বললাম, বাবা, তুমি কিচ্ছু ভেব না, সবই আস্তে আস্তে ফাঁস হয়ে যাবে, তুমি যে কিছু করনি তাও প্রমাণ হয়ে যাবে—কেবল ক'টা দিনের দুর্ভোগ এই যা।

বললাম বটে। কিন্তু দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় আমার ভিতরটা হিম হয়ে আসছে। এই সময় আমার সব থেকে বেশি মনে পড়েছে রমেশ সামন্তানিকে। ...বাবার হঠাৎ অমন সৌভাগ্যের কথা শুনে তারই প্রথম খট্‌কা লেগেছিল। তার সন্দিগ্ধ মন দেখে আমরা বরং মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। কিন্তু সবে সে বাইরে গেছে, তার ফিরতে এখনও অনেক দেরি। এই বিপদে সাহায্য একমাত্র সে-ই করতে পারে। তাছাড়া এ সময়ে অনেক টাকার দরকার। তাকে এখন কোথায় পাব? সে যেখানে আছে এখানকার কাগজ সেখানে যায় কিনা তাও জানি না। কেবল আশা, যেখানেই থাক সে, যদি তার কানে এই অঘটনের খবর পৌঁছয় তাহলে নিশ্চয় ছুটে আসবে।

কিন্তু সবই দুরাশা।

...কোর্টে বিচার শুরু হয়ে গেল। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য, বাবাকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো হয়। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে বাবা বিচারকের দিকে আর কোর্টের লোকজনের দিকে চেয়ে থাকে। টাকা যাদের গেছে তারা আসে, তাছাড়া দ্রষ্টা হিসেবেও আসে বহু লোক। এ-রকম একটা রোমাঞ্চকর কেস এই তল্লাটে আর হয়নি বোধহয়। লোনাভালার বসন্তরাও বীরকর আসামী, সেও কম কথা নয়।

আমাদের দিকে উকিলটি বয়স্ক আর অভিজ্ঞ মানুষ হলেও বিপক্ষের বাঘা তরুণ ব্যারিস্টারটির কাছে যেন কিছুই নয়। তার নাম শুনেছি বিনায়ক প্যাটেল। কেস চালানোর জন্যে তাকে নাকি বম্বে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। তীক্ষ্ণ জেরায় আর বাক্যবাণে কেসটাকে ক্রমশ সে কোণঠাসা করে আনছে। লোকে বলাবলি করছে বাপ অমন দুঁদে ব্যারিস্টার, ছেলে তার ওপর দিয়ে যায়।

অনেক টাকার কড়ারে মংগেশ একটা গাড়ি যোগাড় করেছে। সেই গাড়িতে রোজ লোনাভালা থেকে আমরা কোর্টে যাতায়াত করছি। মা-ও এক একদিন সঙ্গে এসেছে। অসুখের দোহাই দিয়ে তাকে আটকানো যায়নি। কিন্তু ফিরে এসে একেবারে ভেঙে পড়েছে। কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বাবার সেই মুখ দেখা তার পক্ষে আরও অসহ্য। দেখতে দেখতে মা আবার বিছানা নিল। রাতে একফোঁটা ঘুম নেই চোখে। দিন কয়েকের মধ্যেই মা উত্থানশক্তি-রহিত প্রায়।

আমি আর মংগেশ কোর্টে আসি। বাবার দিকে তাকাতে পারি না আমিও। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে বাবা উকিলদের লড়াই দেখে, সাক্ষীদের জেরা শোনে। কিন্তু কিছুই তার বোধগম্য হচ্ছে বলে মনে হয় না।

হ্যাঁ, বিপক্ষের ওই ব্যারিস্টারটিকে দেখলেই আমার বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে থাকে। কথা বলার সময় বা জেরা করার সময় তার চোয়াল দুটো শক্ত হয়, পুরু দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে যেন জ্বলন্ত আগুন ঠিকরোতে থাকে। হাতের লম্বা লম্বা আঙুল কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বাবার দিকে নেড়ে নেড়ে দেখায় আর তার যুক্তিতে ঠাসা ধিক্কার সোচ্চার হয়ে ওঠে। যত ঘন ঘন আঙুল নড়ে আমার মনে হয় বাবার মাথা লক্ষ্য করে ঘাতকের হাতের খড়্গ ততই উঠছে আর নামছে।

এখানে বিপক্ষের সাক্ষী হিসেবে শেখর নায়েককে দেখা গেল। তার আগে বাবার ক্লার্ক দুটোকে জেরায় জেরায় নাজেহাল করেছে বিনায়ক প্যাটেল। শেখর নায়েক এসে দাঁড়াতে আমি ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। শুনছি, জেরার জবাবে সে যা বলছে তাও যে একেবারে মিথ্যে তা নয়। ইন্টারভিউ করে বাবাই তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে, বাবার আর অর্গনাইজারদের নির্দেশ মতো সে কাজ করেছে। বাবার স্বাক্ষরিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখাল সে। আর শেষের ক'দিন কাজে না আসার কৈফিয়ত স্বরূপ ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাল।

আমাদের পক্ষের উকিল তাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবাকে লেখা এস আর মোদীর টাইপ করা চিঠিখানা তার পারসোনাল ফাইলে পাওয়া যাচ্ছে না কেন। তার জবাবে সে জানালো সেই চিঠি মিস্টার বীরকর একদিন মংগেশের মারফত চেয়ে ওপারে নিয়ে গেছিল, তারপর মিস্টার বীরকর সে চিঠি নিয়ে কি করেছেন তার জানা নেই।

মংগেশের ডাক পড়তে সে জানালো, সেইদিনিই সে চিঠি সে আবার সেক্রেটারির টেবিলে এনে দিয়ে গেছে। আর এই থেকেও বিনায়ক প্যাটেল আঙুল নেড়ে নেড়ে বাবাকে দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাইল ওই চিঠি সরানোও একটা হীন চক্রান্ত। আসলে এস আর মোদী নাম নিয়ে যে লোকই এর সঙ্গে জড়িত থাকুক তার সঙ্গে আসামীর যোগসাজস আছে। আর এমনও হতে পারে বসন্ত রাও বীরকর নিজেই এস আর মোদীর নাম ব্যবহার করেছিল বলে সময় মতো তার নিয়োগের চিঠি সরিয়ে ফেলেছে, অন্যথায় হাতের লেখা যাচাইয়ের ভয়েই সম্ভবত সেই আষাঢ়ে চিঠি গায়েব করা হয়েছে।

সেই সন্ধ্যাতেই শেখর নায়েক বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছে। তাকে দেখা-মাত্র কেন জানি না পিত্তি জ্বলে উঠেছে আমার। তবু প্রাণের দায়ে তাকে ড্রইংরুমে এনে বসিয়েছি। সে যে বিবাহিত এবং দুই ছেলেমেয়ের বাপ কোর্টের জেরায় আজই সেটা প্রথম জেনেছি। অথচ এতদিন সে আমার কাছে নিজেকে অবিবাহিত বলেই চালিয়ে এসেছে।

প্রথম দু-চার কথায় সে বাবার এই দুর্বিপাকের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করল। কিন্তু তার মুখে দুঃখের ছিটেফোঁটাও দেখলাম না আমি। কেবলই মনে হচ্ছিল একজন শঠ আর প্রবঞ্চক আমার সামনে বসে আছে। তারপর সে জানালো, বিপক্ষকে বেগ দেবার মতো কিছু নজির তার দখলে আছে, আর তার ধারণা এস আর মোদীর সেই স্বাক্ষরিত চিঠি ওই অর্গানাইজারদের কেউই সরিয়েছে। তাদের সকলের

সম্পর্কেই মাসখানেক ধরে নানারকম সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছিল তার...নজিরসহ সমস্ত বৃত্তান্ত সে আদালতের সামনে তুলে ধরতে পারে।

আমি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলাম, তাহলে বলছ না কেন? তুলে ধরছ না কেন?

সে সোজা মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিল, ভয়ে। এরা সাংঘাতিক লোক বোঝাই যাচ্ছে, এদের সম্পর্কে কিছু কথা আমার কানেও এসেছে —তোমার দলে এলে কোন্‌দিন হয়তো দেখব বুক ফুটো হয়ে আমার লাশ কোথাও পড়ে আছে। ...কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে সমস্ত বিপদের ভয়ই আমি তুচ্ছ করতে পারি...কিন্তু এত বড় রিস্ক যে নেব, আমার পুরস্কার কি?

আমি স্থির চোখে লক্ষ্য করছি তাকে। —কি পুরস্কার চাও তুমি?

সেই বিনম্র লাজুক মানুষ নয় আর শেখর নায়েক। বলল, পুরস্কার তুমি, তোমাকে চাই ... সেই প্রথম দেখার দিন থেকেই চেয়ে এসেছি।

শুনে আপাদমস্তক জ্বলে গেছিল। —তুমি না বিবাহিত আর ছেলেমেয়ের বাপ?

তোমাকে পেলে সেই বিয়ে নাকচ করে দিতে আমার সময় লাগবে না।

দ্রুত ভেবে নিলাম। রাগ দেখানোর সময় নয় এটা। বাবার মুখ চেয়ে শঠকে শঠতায় বশীভূত করার সংকল্প আমার। —সত্যি এত ভালোবাস তুমি আমাকে?

আমার একটা হাত চেপে ধরে ও বলল, সত্যি সত্যি সত্যি—বুক চিরে দেখাতে পারলে তাও দেখাতাম।

ভাবলাম একটু। তারপর বললাম, বাবার জন্যে আমি সব পারি। তাকে নির্দোষ প্রমাণ করে ছাড়িয়ে আনতে পারলে আমার আপত্তি নেই। আমার সঙ্গে এখুনি আমার উকিলের কাছে চল, তাকে সব জানিয়ে কালই কোর্টে যা বলার বলো।

মুখ মচকে ও বলল, উকিল-ফুকিলের কাছে এখন যাচ্ছি না, স্পষ্ট করে আগে তোমার মন বোঝা দরকার—তারপর যদি তুমি আমাকে কলা দেখাও?

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হলে তুমি বিশ্বাস করতে পারো? ইচ্ছে করলেও ডিভোর্সের আগে তুমি ভয়ে করতে পারছ না।

তা পারছি না, কিন্তু তুমি বিয়েই যদি কর আমাকে, তোমার মন বুঝতে দিতে আপত্তি কি?

কি করে?

রাতটা তোমার সঙ্গে গিয়ে কোনো ভালো হোটলে কাটিয়ে আসতে পারি।

ইচ্ছে হল ঠাস ঠাস করে গালে দুটো চড় বসিয়ে দিই। আগে হলে তাই দিতাম।

চিৎকার করে মংগেশকে ডেকে লোকটাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে বললাম।

তার দরকার হল না, বেগতিক দেখে সে নিজেই হন হন করে বেরিয়ে গেল।

পরদিনই উকিলকে জানালাম, ওই শেখর নায়েককে আজও ভালো করে জেরা করুন, অনেক কিছু জানে স্বীকার করে একটা কুৎসিত প্রস্তাব নিয়ে কাল সন্ধ্যায় সে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল।

কিন্তু সেই জেরারও সুফল কিছু হল না। সেই ভ্যাবাচাকা খাওয়া বিনম্র মুখ। গত সন্ধ্যায় সে আমার সঙ্গে দেখা করার প্রসঙ্গও অস্বীকার করল না। বলল, এত বড় একটা অঘটনের দরুন সে মিস বীরকরকে সমবেদনা জানাতে গেছিল।

কেন সমবেদনা জানাতে গেলেন, আপনি মিস সুজাতার বাবাকে নির্দোষ ভাবেন?

হতচকিত মুখ করে শেখর নায়েক বলেছে, মিস্টার বীরকরের কথা সে ভাবেইনি, মিস বীরকরের জন্যে তার দুঃখ হয়েছিল তাই গেছিল।

দক্ষ কঠিন হাতে যেন একটা জাল টেনে তুলছে বিনায়ক প্যাটেল। এক সুতোর সঙ্গে আর এক সুতো জড়িয়ে কি -যে সব মারাত্মক প্রমাণ টেনে টেনে বার করছে সে তার কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। শুধু এটুকু বুঝছি, চূড়ান্ত বিপদ ঘনিয়ে আসছে। নিজস্ব কোনো স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও শুধু কেসে জেতার জন্যে একটা মানুষ কি করে এমন নিষ্ঠুরভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে ভেবে পাই না।

দিশেহারা হয়ে শেষে একটা ছেলেমানুষের মতোই কাণ্ড করলাম আমি। এই কেস করার জন্যে লোনাভালার যে হোটেলে সে আছে এক সন্ধ্যায় সেখানে ছুটলাম। আসল ব্যাপারটা যদি কোনোরকমে তাকে বোঝাতে পারি। বেয়ারার হাতে স্লিপ পাঠিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম। একটু বাদে বেয়ারা সেই স্লিপ ফেরত নিয়ে এলো। সাহেব দেখা করবেন না।

স্লিপে সুজাতা বীরকর নাম লেখা ছিল দেখেই উদ্দেশ্য বুঝেছে লোকটা। দেখা করেনি। কোর্টে এরপর এই লোকটাকে দেখলেই আমার কেমন কাঁপুনি ধরত। একজন ঘাতকের মতো মনে হত তাকে। বিচারের ধারালো অস্ত্র সে যেন আঙুলে করে নাড়াচ্ছে আর পুরু দুই ঠোঁটের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গে শান দিচ্ছে। আমি ভিতরে ভিতরে কেঁপেছি আর মনে মনে তাকে অভিসম্পাত করেছি।

কেস শেষের মাথায় রমেশ সামতানি এসে হাজির হয়েছে। মরণকালে লোকে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, রমেশ সামতানি সবল সমর্থপুরুষ একটা। সব শোনার আর বোঝার পরে আমার বা বাবার জালে পড়ার অবিবেচনার প্রসঙ্গে একটি কথাও না বলে সে বোম্বাইয়ে ছুটে গেছে। সেখান থেকে নামজাদা প্রবীণ ব্যারিস্টার ধরে নিয়ে এসেছে একজন। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার আর করার বিশেষ কিছু ছিল না। বিনায়ক প্যাটেল ততদিনে জাল এক রকম গুটিয়েই এনেছে।

...উপসংহারের মাথায় বাবার দিকে আঙুল নেড়ে নেড়ে আর পুরু ঠোঁট নেড়ে নেড়ে তার সেই জ্বালাময়ী বক্তৃতা কানের পরদা দুটো যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে একাকার করে দিচ্ছিল। এ ফার্স্ট গ্রেড ক্রাইম ... প্রি-প্ল্যাণ্ড প্রি-মেডিটেটেড কোল্ড ব্লাডেড অফেন্স...হীন ঘৃণ্য চক্রান্ত ... আভিজাত্যের মুখোশ আঁটা বিশ্বাসঘাতক, ...তিন তিনটে মানুষ এই চক্রান্তের বলি হয়ে আত্মহত্যা করেছে, আর সরল বিশ্বাসে কত জন সর্বস্বান্ত হয়েছে...কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারের সঙ্গে এ-রকম অপরাধের তফাত কোথায়? কোথায়? কোথায়?

আর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার বাবা কাঁপছে থরথর করে, ঘামছে দরদর করে, মাথা নেড়ে অব্যক্ত যাতনায় বলতে চাইছে কি। আমি বুঝতে পারছি তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

মাটি সরে গেল। বিচারক বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করে ন'বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করল।

এতদিনের এই মর্মান্তিক ব্যাপারে মায়ের ওপর দিয়ে কি যে ঝড় যাচ্ছে সেটা দেখারও ফুরসত মেলেনি। আজ বিচারের রায় বেরুবে মা জানে। দোতলার বারান্দার কার্নিশে ঝুঁকে অপেক্ষা করছিল। শ্রান্ত ক্লান্ত ভগ্ন হৃদয়ে রমেশ সামতানির গাড়ি থেকে আমি রমেশ আর মংগেশ নামলাম। ওপর দিকে তাকিয়েই দেখি মা দাঁড়িয়ে। সেখান থেকে ব্যাকুল চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, কি? কি রায় হল?

জবাব না দিয়ে আমরা নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকলাম। সিঁড়িতে পা দিয়েই মায়ের আর্ত চিৎকার শুনলাম, সিঁড়ির দিকে ছুটে আসতে আসতে বলছে, কি হল? অ্যাঁ? তোদের মুখে রা নেই কেন? সর্বনাশ হয়েই গেল?

যে ভাবে ছুটে আসছে আমি চিৎকার করে সামাল দিতে চেষ্টা করলাম, মা!

হ্যাঁ, যা কল্পনা করিনি চোখের পলকে সেই অঘটনই ঘটে গেল। ছুটে আসার তাগিদে সিঁড়ি-টিড়ি ভুল হয়ে গেছে মায়ের। বারান্দার শেষ মাথা থেকে সোজা তিন সিঁড়ি টপকে বুক দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল—তারপর উলটে পালটে আরো কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে বাঁকের মুখে তার ক্ষীণ দেহ নিশ্চল হল।

না, সে-রাতে আমাদের আর দোতলায় ওঠা হয়নি। রমেশ সামতানি আর মংগেশ মায়ের সংজ্ঞাহীন দেহ তুলে নিয়ে আবার গাড়ির দিকে চলল। নিস্পন্দের মতো আমিও অনুসরণ করলাম তাদের। মায়ের দেহ গাড়িতে উঠল। আমাদের তিনজনেরও। গাড়ি হাসপাতালের পথে ছুটল আবার। মায়ের রক্তমাখা বিবর্ণ পাণ্ডুর অচেতন মুখখানা দেখছি আমি। এক ফোঁটা জল নেই আমার চোখে। পাথর হয়ে গেছি।

ভোর রাতে মায়ের সমস্ত দুঃখ বেদনার অবসান। মা চলে গেল। পরদিন শ্মশান যাত্রার আগে রমেশ সামতানি কি-ভাবে তদ্বির করে পুলিশ হেপাজত থেকে বাবাকে বার করে নিয়ে এলো জানি না। মায়ের মুখখানা বাবা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। বাবাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে

কাঁদতে পারলে হয়তো একটু ঠাণ্ডা হওয়া যেত। কিন্তু বাবার ওই মুখ দেখে তাও পারা গেল না।

পাঁচ ঘণ্টা মেয়াদে বাবাকে আসতে দেওয়া হয়েছিল। মেয়াদ ফুরোতে বাবাকে আবার নিয়ে যাওয়া হল।

বিচারে বাবার শুধু ন'বছরের জেলই হয়নি, এই বাড়ি আর বাড়ির যাবতীয় সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। এ বাড়ি আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে দিতে হবে। রমেশ সামতানি সান্ত্বনা দিয়েছে, আমি তো আছি, ভয় কি...।

কতটুকু সান্ত্বনা পেয়েছি আমি জানি না।

মায়ের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্কল্প করেছি। রমেশ সামতানি আমাকে সঙ্গে করে বোম্বাই-এ নিয়ে এসে সান্তাক্রুজ ওয়েস্ট-এর এই ফ্ল্যাটে তুলেছে। একজন ভদ্র আয়াও সঙ্গী হিসেবে জুটিয়ে দিয়েছে। একমাত্র ছুটির দিনে সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিতে হয়। সেদিন সে তার নিজের বাড়িতে যায়। আর একটা সান্ত্বনার খবর, বাবাকে এই বোম্বাইয়ের কোনো একটা জেলেই নিয়ে আসা হয়েছে। রমেশ সামতানি আশ্বাস দিয়েছে, বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবে।

আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কিন্তু মুখে তাকে কিছু বলতে পারিনি।

ঠিক উনিশ দিনের দিন, রমেশ সামতানির টেলিফোন—বাবা অমুক হাসপাতালে ভয়ানক অসুস্থ। এক্ষুনি সেখানে চলে আসতে হবে। সেও যাচ্ছে।

এই অসুস্থতার মানেও কি আমি বুঝতে পেরেছিলাম? হ্যাঁ, মনে যা ডাক দিয়েছিল, হাসপাতালে গিয়ে সেই দৃশ্যই আমি দেখেছি। বাবার আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা। রমেশ সামতানি সেখানে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। আমি ভেঙে পড়তে পারি ভেবে সে তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরল। আমি ভেঙে পড়িনি। আমার ইচ্ছে বুঝে একজন নার্স বাবার মুখ থেকে চাদর সরাল। রমেশ সামতানি জানালো, হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে বাবা মারা গেছেন। হাসপাতালে আসার আগেই সব শেষ।

বাবার শান্ত মুখখানা চেয়ে চেয়ে দেখছি আমি। বাবার এত বড় অপমান আর জ্বালা যন্ত্রণার সব শেষ। দু'চোখ ভরে দেখার মতো এত সুন্দর মুখ আর যেন দেখিনি।

বাবার কাজও ঠাণ্ডা মুখেই শেষ করলাম আমি। আমার সেই মূর্তি দেখে রমেশ সামতানি ঘাবড়ে গিয়েছিল। উলটে আমি তাকে বলেছি, বাবা চিরশান্তির জগতে চলে গেছে, ভালোই হয়েছে।

•

এত কাজের মধ্যেও রমেশ প্রায় সন্ধ্যায় সান্তাক্রুজ ওয়েস্ট-এর এই ফ্ল্যাটে একবার করে আসে। ছুটির দিনে আয়া থাকে না বলে আরো আগে আসে। ঘণ্টা দুই আড়াই কাটিয়ে যায়। আমার এই ঠাণ্ডা ভাব দেখে সে মনে মনে ঘাবড়েছে বুঝতে পারি। সে আমাকে কাজের মধ্যে টেনে নামানোর জন্যে ব্যস্ত। সে বলে, কোন্ কাজ তোমার ভালো লাগবে বল, আমি ব্যবস্থা করছি।

আমি বলি, রোসো, ভাবি একটু।

কিন্তু আসলে তখনো আমি শুধু দুটি লোকের কথাই ভাবি। একজন ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেল। ঘুমের মধ্যে তাকে স্বপ্নে দেখি। হাত নেড়ে আর পুরু ঠোঁট নেড়ে বাবার মাথার ওপর অভিযোগের খড়্গ তুলে ধরেছে। ঘুম ভেঙে গেলেও সে দৃশ্য সরে না মন থেকে। সে-ই পয়লা নম্বরের শত্রু আমার। দ্বিতীয় জন শেখর নায়েক। যে সেই কুৎসিত প্রস্তাব দিয়েছিল।

আমার মুখ থেকে এই দুজনের কথা শুনে রমেশ সামতানি প্রথম জন অর্থাৎ বিনায়ক প্যাটেলকে বাতিল করতে চেয়েছে। বলেছে, তার কি দোষ; সে পেশাদার ব্যারিস্টার—নিজের কাজ করেছে।

আমি বলেছি, সে আমার কত ক্ষতি করেছে তুমি জানো না। কোনো স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও সে এমন কাজ করেছে যার জন্যে আমি আমার বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছি। আমি তাকে জীবনে ক্ষমা করব না, জীবনে ভুলব না।

তর্ক না করলেও রমেশ সামতানি আমার সঙ্গে একমত হতে পারেনি আমি বুঝি। সে যুক্তির পথে চিন্তা করে। আমার ক্ষোভের সবটাই এক অবিশ্বাস্য অনুভূতিপ্রবণ ব্যাপার।

শেখর নায়েকের প্রসঙ্গে অবশ্য আমার সঙ্গে সে একমত। তার সেই কুৎসিত প্রস্তাবের কথাও তাকে বলেছি। শুনে সে রাগে ফুঁসেছে। বলেছে, সবকিছুর মূলে ওই শয়তান আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি—আর এও বলছি আমি তাকে চরম শিক্ষা দেব। দেব দেব দেব।

আরো মাসখানেক বাদে সে বিমর্ষ মুখে এসে খবর দিয়েছে, বাড়ি ঘর ছেড়ে শেখর নায়েক কোথায় উধাও হয়ে গেছে খবর পাচ্ছি না। কিন্তু কোথায় কতদিন পালিয়ে থাকবে সে, আমিও দেখে নেব।

আমি মুখে কিছু বলতে পারিনি। দু'চোখ ভরা কৃতজ্ঞতা নিয়ে তার দিকে চেয়ে থেকেছি। তারপর তাকে বলেছি, এবারে তুমি একটা কাজ কর্মের ব্যবস্থা কিছু করতে পারো কিনা দেখ। এ-ভাবে বসে থেকে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

সে-ও মনে মনে এইটেই চাইছিল। উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ ধরনের কাজ তোমার ভালো লাগবে বলো?

সেটা ভাবতে ভাবতে আবার কিছুদিন কেটে গেল। আসলে তখনও কাজের জন্যে কোনোরকম উৎসাহ নেই আমার। শোক ভোলার জন্যে কাজ। অপমান ভোলার জন্য কাজ। লোনাভালার দুঃস্বপ্ন মন থেকে মুছে দেবার জন্যে কাজ। কোন্ কাজের কথা বলব আমি তাকে? কলেজে পড়াতে হলে আবার বইপত্র নিয়ে বসতে হবে। অত ধৈর্য নেই আমার। কোনো আপিসে ঢুকলেও কাজের সে-রকম একাগ্রতা আমার আসবে না। ভিতরটা এখনও বিক্ষিপ্ত।

এ-সব কাজে আর একটা সব থেকে বড় অন্তরায় আমার নাম। কে আমি? ..সুজাতা বীরকর। কাগজে কাগজে বীরকর নামটা এমনি প্রচার লাভ করেছে যেন লোনাভালার সঙ্গে এই উপাধিটি অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। কলেজে কাজ করি বা কোনো আপিসে ঢুকি—কলেজ ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটে আমি সুজাতা বীরকর। আমার সার্ভিস রেকর্ডের পরিচয়ে প্রথমে লিখতে হবে আমি বসন্ত রাও বীরকরের মেয়ে সুজাতা বীরকর। পৈতৃক ঠিকানা? লোনাভালা। আমি লোনাভালার বসন্ত বীরকরের মেয়ে সুজাতা বীরকর এই পরিচয় কি এখন আমার কাছে অপমানের সামিল? আদৌ না। আসলে এই পরিচয় শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যে-চোখে দেখবে আমাকে সেটাই আমার অপমান, তার থেকেও ঢের বেশি আমার বাবার অপমান। এই অপমান অসম্মান আমি বরদাস্ত করতে পারব না।

তাহলে কে আমি? আমি সুজাতা পাণ্ডুরং। আমার বাবা পাণ্ডুরং কি না এ-খবর কে নিতে যাচ্ছে? আর সুজাতা নামে হাজারও মেয়ে আছে দেশে। কিন্তু এ নামে আমি ডিগ্রীর সার্টিফিকেট পাব কোথায়? পরিচয়-পত্র পাব কোথায়? তাই এমন কাজ চাই আমার যেখানে ও-সবের দরকার নেই।

রমেশ সামতানির ব্যবসায়ে ঢুকে পড়তে পারি। কিন্তু মন থেকে সায় মিলছে না। এ-যেন আর কোনো রাস্তা না পেয়ে তার বউ হয়ে তার ঘরে গিয়ে ওঠার মতো। যে কাজের মধ্যে দিয়ে আমি ক্ষত ভুলতে চাই অপমান ভুলতে চাই, রমেশ সামতানি আমাকে টেনে নিলে সেটা হবে না। আর একজনের দরদের প্রলেপে ক্ষত আর অপমান ঢাকার সামিল হবে সেটা।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মিস্টার রমেশ, একদিন তুমি আমাকে ফিল্ম লাইনে ঢোকার কথা বলেছিলে, সেটা ঠাট্টা না সত্যি?

আগের মতো মিস্টার রমেশ ডাক শুনে সে খুশি। ভাবছে, হয়তো কত আর মানুষ শোক নিয়ে বসে থাকতে পারে। অনেকটা সেই আগের মতোই আমার আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। তারপর বলল, রমেশ সামতানি বাজে ঠাট্টা করে না। লোনাভালায় সেই আলোচনার পর থেকেই আমার মনে হয়েছে এ লাইনটা সব থেকে ভালো সুট করবে তোমার। ... কিন্তু কথা হচ্ছে, এই মানসিক অবস্থায় সুট করবে কি?

জবাব দিলাম, সব থেকে ভালো সুট করবে। কারণ নিজের পরিচয়ে এখন মেকি রাস্তা ধরতে হবে আমাকে, এরপর আমি কোথাও সুজাতা বীরকর নই, সুজাতা পাণ্ডুরং।

রমেশ মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর হাসিতে চিকচিক করতে লাগল চোখ দুটো। সে বুদ্ধিমান মানুষ এর বেশি কিছু বলার দরকার হল না।

রমেশ সামতানি পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে নিজের প্যাড বার করে তক্ষুনি চিঠি লিখতে বসল একটা। তিন মিনিটে লেখা শেষ। খামের মুখ বন্ধ করে ঠিকানা লিখল। তারপর বলল, অমুক স্টুডিওতে গিয়ে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কালই দেখা করে এই চিঠি তার হাতে দাও। বললাম, তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না আমাকে?

না, তাতে একটু অসুবিধে আছে, আর তার দরকারও হবে না, তুমি কাল গিয়ে দেখাটা করেই এসো না।

খামের ওপর এক মস্ত প্রযোজকের নাম লেখা দেখলাম। জুনাগড়ে বসে এর প্রযোজনার কত ছবি দেখেছি ঠিক নেই। তাই এ-চিঠির ওজন সম্পর্কে মনে একটা সংশয় আসা স্বাভাবিক। কিন্তু জুনাগড় বা লোনাভালায় থাকতে এতদিনের দেখা এই রমেশ সামতানিকেও আমি বা বাবা চিনিনি। তার প্রভাব প্রতিপত্তি বুঝতে হলে বম্বেতে আসতে হবে, আর তারপরেও তার খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে, নিজের প্রচারে চটক সম্পর্কে সে এমনি নির্লিপ্ত আর নির্বিকার।

চিঠি নিয়ে তার নির্দেশ মতো আন্ধেরির স্টুডিওতে এসেছি। এ-রকম বিরাট কিছুর মধ্যে কোনোদিন পা ফেলতে পারব ভাবিনি। প্রযোজকটি কোথায় বসে তার হদিশ পেতেই খানিকক্ষণ সময় কেটে গেল।

ঘরের সামনে দুজন বেয়ারা বসে। তাদের একজনে হাতে স্লিপ লিখে দিলাম। রমেশ সামতানির কাছ থেকে সুজাতা পাণ্ডুরং।

দু'মিনিটের মধ্যে ঘরে ডাক পড়ল। পরদা ঠেলে ঢুকলাম। আর ঘরের মধ্যে যে পাঁচ ছ'জন লোক ছিল তারা দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো। বিশাল টেবিলের ও-মাথা থেকে অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনায় প্রযোজক বলল, বসুন বসুন—

বসে হাতের চিঠি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

এ-চিঠির ফলাফল কি হবে না হবে সে-সম্বন্ধে তখনো আমি স্থির নিশ্চয় নই। বড় বড় হরফের লেখা ওই চিঠি পড়তে তার এক মিনিটও লাগল না। মনে হল দ্বিতীয় দফা পড়ছে। তারপর আমার দিকে তাকালো। এবারের চাউনিটা অন্য রকম। অস্বস্তিবোধ করছি একটু। মনে হল সামনের পণ্য সামগ্রীটি কেমন বিকোবে পলকে তাই একবার যাচাই করে নেবার চোখ।

আন্তরিকতার সুরে জিজ্ঞাসা করল, কি খাবেন বলুন, চা না কফি?

কিছু দরকার নেই, ধন্যবাদ।

অ্যাট লিস্ট এ কোল্ড ড্রিঙ্ক? অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই প্যাঁক করে বেল টিপল। বেয়ারা আসতেই হুকুম হল, কোল্ড ড্রিংক।

সে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেল্ টিপল। এবারে অন্য বেয়ারা। পর পর দুজন ভদ্রলোকের খবর জিজ্ঞাসা করল প্রযোজক। তাদের একজন ফ্লোরে, আর একজন অনুপস্থিত। প্রযোজকের মুখে বিরক্তির আভাস, রমেশ সামতানি চিঠিটা হাতে করেই উঠে দাঁড়াল। —এক্সকিউজ মি, দু'মিনিটের মধ্যে আসছি।

দু'পা এগিয়ে আবার ফিরে এসে হাতের চিঠি টেবিলে রেখে পেপার ওয়েট চাপা দিল। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। প্রয়োজকের এই ঈষৎ ব্যস্ততা চোখে পড়েছে আমার। সামনে তাকিয়ে দেখি চিঠিটা আমার দিকে মুখ করেই ফেরানো। এভাবে চিঠি পড়ার মতো হালকা মেয়ে আমি নই। তাছাড়া দরকার বুঝলে রমেশই আমাকে পড়ে শোনাত কিংবা খামের মুখ বন্ধ করত না। তবু এই একটা মুহূর্ত যখন কৌতূহল নিষেধ মানে না। চিঠির ওই বড় বড় হরফগুলো যেন চোখ দুটোকে আপনা থেকেই টানছে। বাচ্চা ছেলের মতোই বড় বড় হাতের লেখা রমেশ সামতানির।

দেখব না দেখব না করেও সেই দিকে দু'চোখ আটকে গেল—যে মেয়েটি এ চিঠি নিয়ে যাচ্ছে তার নাম সুজাতা পাণ্ডুরং, এম-এ পাস। চেহারাপত্র নিজেই দেখবে। কোন্ রোলে সুট করবে দেখে নিও। শুধু একটা কথা, হেঁজিপেজি কিছুর মধ্যে দিও না, এর স্টার হবার গুণাবলী আছে আর সেইজন্যেই তোমার কাছে পাঠাচ্ছি—আর, এস্।

বেয়ারা কোল্ড ড্রিংক সামনে ধরেছে। গেলাস তুলে নিলাম। গলাটা সত্যিই শুকিয়ে এসেছিল।

একটু বাদে যে ভদ্রলোককে সঙ্গে করে প্রযোজক ফিরে এলো সে এই বর্তমান ছবির পরিচালক হরিহর শর্মা।

ঘরে ঢুকেই প্রযোজক প্রথমে রমেশ সামতানির চিঠিখানা টেবিল থেকে তুলে পকেটে পুরলো। তারপর পরিচয়ের পালা। কিন্তু এই পর্বে রমেশ সামতানির নামটা অনুক্ত থাকল। পরিচালক হিসাবে হরিহর শর্মার নামও আমার শোনা আছে আর তার কিছু ছবিও দেখা আছে।

সব-কিছুই যেন ভারী সহজে হয়ে গেল এরপর। দু-চার কথার পর প্রযোজকের ইঙ্গিত মতো পরিচালক হরিহর শর্মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলল। তারপর নানা রকমভাবে স্টিল ফটোগ্রাফ নেওয়া হল আমার। গোড়ার দিকে আমি আড়ষ্ট নিজেই বুঝেছিলাম। শেষে যেন চাবুক মেরে সজাগ করলাম নিজেকে, এই যাচাইয়ে ফেল করলে চলবে?

এরপর সহজ হওয়া গেল। কম করে পঁচিশ থেকে তিরিশবার ফ্ল্যাশ বাল্‌ব ঝলসে উঠেছে আমার মুখের ওপর। দাঁড়ানো ছবি বসা ছবি ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দেওয়া ছবি, খুশি মুখ গোমড়া মুখ রাগত মুখের ছবি, মৃদু হাসি চাপা হাসি আর অঢেল হাসির ছবি। ...প্রথম তিনচারটে ছাড়া আর সবই ভালো উৎরেছে বলে আমার ধারণা।

ছবি তোলার পর ভয়েস টেস্ট। এ ব্যাপারে অত বেশি বেগ পেতে হল না। পরিচলাক হরিহর শর্মা আবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাকে নিয়ে প্রযোজকের ঘরে ঢুকল। তার টেবিলের ওপর ততক্ষণে সারি সারি ভেজা আর্ট পেপারের ছবিগুলো ছড়ানো পড়ে আছে। আমাকে দেখেই খুশির অভ্যর্থনা জানালেন। —আসুন মিস পাণ্ডুরং, আই অ্যাম সিওর ইউ উইল ডু ভেরি ওয়েল।

তখনকার মতো শোক-টোক সব ভুলেছি, ভিতরে শুধু এক ধরনের উত্তেজনা। হরিহর শর্মা টেবিলে বিছানো ছবিগুলো নিরীক্ষণ করে দেখে নিল। সে-ও অখুশি নয় বোঝা গেল। —হাউ ইজ ভয়েস? প্রযোজক জানতে চাইল।

পরিচালক ঘাড় কাত করে অনুমোদন জানালো। প্রযোজকের মতো এই পরিচালকটির গোড়াতেই অত উৎসাহ লক্ষ্য না করার কারণ পরে অনুমান করা গেছে। একজন নবাগতাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তার ছবির নায়িকা হিসেবে। তার খুঁতখুঁতুনি থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রযোজকের সিদ্ধান্ত পাকা। সে বলল, মিস্টার শর্মা দুই এক মাসের মধ্যেই তার নতুন ছবি শুরু করছেন। ইউ ইউল স্টার্ট অ্যাজ এ গ্রেট স্টার মিস পাণ্ডুরং, সো ইউ মাস্ট জাস্টিফাই ইওর ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স। মিস্টার শর্মার কাছ থেকে আপনার রোল বুঝে নেবেন —হি উইল ট্রেন ইউ আপ। ... আপনার ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট কি রকম হবে না হবে একটু ভেবে নিই, ইউ উইল গেট ইওর কণ্ট্রাক্ট সাইণ্ড নেক্সট উইক্ —ও কে?

দুজনকেই ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। এত বড় এক জগতে এ-রকম সহজে কেউ ঢুকে যেতে পারে এ যেন কল্পনার বাইরে। শুধু ঢোকা নয়, নায়িকার ভূমিকায় প্রথম পদার্পণ। কি মানুষ এত কালের দেখা এই রমেশ সামতানি সেটাই যেন এক মস্ত বিস্ময় আমার কাছে।

সন্ধ্যায় এসে সে জিজ্ঞাসা করল, কাজ হল?

হবে যে সে তো তুমি জানতেই। ...সামনের উইকে কনট্রাক্ট সই হবে।

আমার মনে হল, ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট কি-রকম হবে না হবে প্রযোজক সেটা তোমার সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন।

রমেশ হাসতে লাগল। বলল, আলোচনা করুক আর যা-ই করুক প্রথম ছবিতে তুমি স্টার ভ্যালু পাচ্ছ না—সেটা দৃষ্টিকটু হবে।

আমি বললাম, না, দৃষ্টিকটু হয় এমন কোনো কাজ তুমি কোরো না।

কন্ট্রাক্ট সই হয়েছে। পারিশ্রমিকের এই অঙ্ক দেখেও আমার চক্ষু স্থির হয়েছে। ...একটা ছবির জন্যে পঁচাত্তর হাজার টাকা। তার মধ্যে পঁচিশ হাজার এমনি পাব, বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা যখন যেমন পাব তেমনি রিসিট দিতে হবে। ছাড়টুকু যে ইনকাম ট্যাক্স এড়ানোর চালু রীতি এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে। স্টার ভ্যালু কাকে বলে সেটা কিছুদিনের মধ্যেই জেনেছি। ...একটা ছবির জন্যে পাঁচ—সাত—দশ—লক্ষ টাকা যার যেমন বাজারে নাম আর চাহিদা। কিন্তু আমার কাছে এই পঁচাত্তর হাজার টাকাই বিপুল ঐশ্বর্যের মতো। এ ছবি বাজারে চালু হতে যদি দুটো বছরও সময় লাগে, এ-টাকায় সেই দুটো বছর আমার হেসে খেলে চলে যাবে।

সই করার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজক দশ হাজার টাকা আগাম দিয়েছে আমাকে, তার মধ্যে চার হাজার টাকা নগদ, বাকি ছ'হাজারের চেক। একসঙ্গে ওই টাকা নিতেই হাত কেঁপেছে আমার।

এই প্রথম ছবির গল্পও আমার মনের মতো হয়েছে। আগে হলে এই এম-এ পাশ মেয়ে সেটা অবাস্তব আর আজগুবি বলে হেসে উড়িয়ে দিত। ...নায়িকার বিয়ে হয়েছে নিষ্ঠুর প্রকৃতির এক মানুষের সঙ্গে, কিন্তু গোড়া থেকেই আর এক সাধারণ মানুষের প্রণয়াসক্ত সে। শেষে স্বামী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত সে। কিন্তু আসলে সে নির্দোষ। ...নির্দোষ কেউ কি চরম শাস্তির যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেয় না? দেয় কিনা আমার থেকে ভালো আর কে জানে? ছবির পরিণামে অবশ্য নায়িকা নায়ক-প্রেমিকের এক আশ্চর্য তৎপরতায় দায়মুক্ত হতে পেরেছে। মনে মনে সেটুকুতেই আমার যত আপত্তি। নির্দোষ নিষ্পাপ একটা মেয়ে বিচারের নামে ফাঁসীকাঠে গেলেই বা ক্ষতি কি ছিল?

কিন্তু ছবির রাজ্যে তা হয় না।

আমি নবাগতা অভিনেত্রী। পরিচালক হরিহর শর্মা প্রয়োজককে বলে বুদ্ধিমানের মতো দু-দুজন নামজাদা অভিনেতাকে আমার বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের আমার নিষ্ঠুর নির্মম স্বামীর ভূমিকা, আর একজনের প্রণয়ীর। কিছুদিন শুটিং-এর পর ওই দুই প্রতিষ্ঠিত নায়কই আমার অভিনয়ের প্রশংসা করেছে। আর ছ'মাস না যেতে পরিচালকের সংশয়ে বিপরীত জোয়ার এসেছে। প্রযোজকের কাছে ভদ্রলোক প্রভূত প্রশংসা করেছে আমার। কালে দিনে আমার জুড়ি থাকবে না এমন কথাও বলেছে। সেই সব প্রশংসা প্রযোজকের মারফত রমেশ সামতানির কানেও এসেছে। সে আনন্দে উৎফুল্ল। — ঠিক লাইনে ঢুকে গেছ, এরপর আর তোমাকে পায় কে?

আমি নিরীহ মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করি, কেউ পাবে না বলছ?

হাসি মুখে সে তাড়াতাড়ি সামাল দেয়। —না, একটি মাত্র লোকের পাবার আশা আছে। কিন্তু এক্ষুনি পেতে চেয়ে সে তোমার বর্তমানের একাগ্র নিষ্ঠায় ফাটল ধরাবে এমন বোকা তাকে ভেব না। সে সবুর করতে জানে।

জানে বলেই মনে মনে আরো বেশি কৃতজ্ঞ আমি। সত্যিই মনে-প্রাণে তখন এই ছবির সাফল্য ছাড়া আর আমি কিছুই চাই না।

ন'মাসের ছবির আধাআধি অবস্থায় স্টুডিও ফ্লোরে এই অকল্পিত যোগাযোগ। আমার সমস্ত সত্তার গভীরে যে শত্রুর মুখ ক্ষতর মতো খোদাই হয়ে আছে, সেই ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেলকে ফ্লোরে ধরে আনা হয়েছে এক্সপার্ট হিসেবে। কি ভাবে কাজ করলে স্বাভাবিক হয় তার কাছে সেই মতামতের প্রত্যাশা!

চার

টেলিফোন বেজে উঠল। সাড়া দিতে ওধারে রমেশ সামতানির গলা। তার কথা শোনার আগেই চাপা উত্তেজনায় বলে উঠলাম, কাল বিকেলে কোথায় ছিলে, ক'জায়গায় কতবার টেলিফোন করলাম, কোথাও তোমার পাত্তা নেই!

খুব দরকার ছিল?

খুব। কাল স্টুডিওতে হঠাৎ একজনের সঙ্গে দেখা, যার কথা তোমাকে না বললেই নয়, আজ সন্ধ্যায় আসছ?

আসব'খন...কিন্তু বল তো, কোনো নতুন প্রোডিউসার নাকি?

না, না, তার থেকে ঢের বড় দরের লোক আমার কাছে। টেলিফোনে বলব না, সন্ধ্যায় এস তখন বলব।

ওদিক থেকে রমেশ ঠাট্টা করল, কি রকম বড় দরের লোক আবার, আমাকে পথে বসাবে নাকি!

না, শুনলে উলটে তুমি খুশি হবে।

ঠিক আছে। আজ শুটিং আছে?

আছে।

আচ্ছা শোন, পরশু দিন আবার আমাকে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে...লম্বা পাড়ি।

কোথায়?

আমেরিকার এ মাথা ও মাথা। সেখানে ব্যবসা ঢেলে সাজাতে হবে। কম করে চার ছ'মাসের ধাক্কা। যদি হঠাৎ দরকার পড়ে তাই পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা তোমার নামে কোনো ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে যেতে চাই।

আমি জোর দিয়ে বললাম, কিচ্ছু করতে হবে না, আমার প্রোডিউসার এর মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ টাকা দিয়ে দিয়েছে, তার বেশির ভাগই ব্যাঙ্কে জমা আছে। টাকার ভাবনা নেই, সন্ধ্যায় তোমার আসা চাই। হেসে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

টাকার ভাবনা সত্যিই ভাবি না আর। প্রথমেই নায়িকা হিসাবে এত বড় এক ছবিতে কাজ করছি দেখে আর সিনেমা মাসিক সাপ্তাহিকের প্রচারের দাপটে এরই মধ্যে জনাকতক ছোটখাটো প্রযোজক আমার দরজায় হানা দিয়েছে। তাছাড়া স্টুডিও মহলের নাড়ির খবর'এ লাইনের লোকে রেখেই থাকে। পরে পাঁচ সাত গুণ মাশুল দেওয়ার থেকে নাম ফেটে পড়ার আগেই চুক্তিবদ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ ভাবে। এতে প্রথম ছবির পঁচাত্তর হাজার টাকাটা বড় জোর সোয়া লাখ হবে। নাম একবার হয়ে গেলে এ টাকা কিছুই নয়। রমেশকে জিজ্ঞাসা করতে সে সোজা নিষেধ করে দিয়েছে। ওসবে মাথা দিও না, তোমার দর কোথায় উঠবে তুমি নিজেও ধারণা করতে পারো না।

ঠিক এই গোছের ইঙ্গিত আমার প্রতি বেজায়-খুশি বর্তমানের নামজাদা প্রোডিউসারটিও করে রেখেছে। স্টুডিওর মিনিয়েচার শোর পর্দায় সে তো পনেরো বিশ দিন পর পরই এখন আমার কাজ নিজের চোখে দেখে নিচ্ছে। খুব ভালো লাগছে বলেই এত ঘন ঘন দেখছে সে খবরও আমার কানে এসেছে। সেই ভদ্রলোকও বলেছে, এখন তোমার কাছে অনেকে আসতে পারে, কিন্তু হুট করে কারো সঙ্গে নতুন কোনো কনট্রাক্ট-এ ঢুকো না...তোমার ফিউচার ভালো, এ ছবিটা উতরে গেলে আমিই সব দিক পুষিয়ে দেব। ...তাছাড়া মিস্টার রমেশ সামতানি তোমার পিছনে আছেন যখন তখন তোমার ভাবনা কি।

রমেশ সামতানি পিছনে থাকার ফল কি সে তো নিজের চোখেই দেখছি। এ লাইনে তার এতখানি প্রতিপত্তির সঠিক কারণ এখনো আমি জানি না। জিজ্ঞাসা করলে রমেশ হাসে। তবে এটুকু আঁচ করেছি এই শিল্পটিতেও তার অনেক টাকা খাটছে। কত হতে পারে তার পরিমাণ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

যাক। মোট কথা, টাকার দুশ্চিন্তা এখন আর আমার মাথায় নেই।

খানিক বাদে আবার টেলিফোন। রিসিভার তুলতে পরিচালক হরিহর শর্মার গলা।—আজ শরীর কি বলছে ম্যাডাম?

এখন পর্যন্ত মোটামুটি ভালোই। হঠাৎ যে! আমি কেমন যেন সন্দিগ্ধ একটু।

ব্যারিস্টার প্যাটেল ফোন করেছিল, আজও সে সেটে আসছে, তুমি আসছ তো?

নিশ্চয় নিশ্চয়! আজ আমার কাজ কেমন?

আজকের প্রোগ্রামে তোমার খুব বেশি কাজ ছিল না...কিন্তু প্যাটেলের মতো লোককে তো বেশি দিন পাওয়া যাবে না, বল তো প্রোগ্রাম বাড়িয়ে দিতে পারি।

উৎফুল্ল জবাব দিলাম, দেবেন। কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে যাওয়াই ভালো।

জবাবের তাৎপর্য কি বুঝল জানি না, হেসেই ফোন নামিয়ে রাখল পরিচালক।

চটপট স্নান সেরে নিয়ে এবারে আমার তৈরি হবার কথা। কিন্তু ফোন নামিয়ে আমি সোজা বিছানায়। না, আজ আর আমার কোনো তাড়া নেই। আজ আমি স্টুডিওতে যাচ্ছি না। আয়নায় গিয়ে দাঁড়ালে দেখব চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো হয়েছে আমার। ... প্রোগ্রাম বাড়ানোর বদলে যেটুকুও প্রোগ্রাম ছিল, পরিচালককে তা বাতিল করে কাজ এগোতে হবে। আর তার সেই এক্সপার্ট বিনায়ক প্যাটেল অনেকক্ষণ পর্যন্ত উসখুস করবে আর এদিক-ওদিক তাকাবে আর অপেক্ষা করবে। আমার ষষ্ঠ চেতনা প্রখর, আমি জানি অপেক্ষা করবে যত বড় ব্যারিস্টারই সে হোক, কাজের গণ্ডীর বাইরে সে অপ্রাকৃতিক মানুষ কিছু নয় এ-ধারণা আমার কালই হয়েছে। পরিচালকের সাদর আমন্ত্রণে কাল সে এসেছিল, আজও সেই আমন্ত্রণ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজ আসার পিছনে আর কিছু আকর্ষণ আছে, অপরিচিত জগতের একটা আলো হঠাৎ তার চোখ দুটোকে কিছুটা ঝলসে দিয়ে গেছে, আমার ষষ্ঠ অনুভূতি এ-কথাও আমাকে বলল।

সেটের দর্শকের আসনে বসে তাহলে কতক্ষণ উসখুস করবে ওই লোক? কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? নিষ্ফল প্রতীক্ষা যত দীর্ঘ হয় ততো যেন আনন্দ আমার।

সহেলি! আয়াকে ডাকলাম। সে ঘরে এসে দাঁড়াল।

স্টুডিওর গ্যারাজে ফোন করে জানিয়ে দাও আজ আমার জন্যে গাড়ি পাঠানোর দরকার নেই। ট্যাক্সি করে এক জায়গা হয়ে আমি স্টুডিও চলে যাব।

সহেলি নির্দেশ পালন করল।

শোনো। একঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমার কাছে স্টুডিও থেকে ফোন আসবে। তুমি ধরবে। যে-ই ফোন করুক, তুমি বলে দেবে, একটু অসুস্থ শরীর নিয়ে খানিক আগে আমি ট্যাক্সি করে বেরিয়ে গেছি, এক জায়গা হয়ে সেখান থেকে স্টুডিও যাবার কথা।

মাথা নেড়ে সায় দিল। কিন্তু তার খানিক বাদে স্নান খাওয়া সেরে ধীরে সুস্থে আবার আমাকে একটা ম্যাগাজিন হাতে শয্যায় উঠতে দেখে সে অবাক।

বললাম, যে রকম বলে রেখেছি তা-ই করবে।

ছবির মেয়েদের মতিগতি বোঝা ভার ধরে নিয়ে সে প্রস্থান করল।

আমি বাইরে ধীর, ঠাণ্ডা। ভিতরে ছটফট করছি। আর মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে দেখছি।

প্রায় প্রত্যাশিত সময়েই টেলিফোন বেজে উঠল। সহেলি ধরল। জবাব দেবার ফাঁকে একবার আমাকে দেখে নিল। তারপর যেমন শিখিয়ে রেখেছিলাম তেমনি বলে দিয়ে রিসিভার নামালো।

আমি উঠে বসলাম। —স্টুডিও থেকে?

হ্যাঁ, ডিরেক্টর শর্মা না কি নাম বলল।

ঠিক আছে। শোনো, এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার মধ্যে আবার এইখান থেকেই টেলিফোন আসবে। এবারও তুমি ধরবে। বলে দেবে, অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি খানিক আগে ফিরে এসেছি, ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছি—এখন ডাকা চলবে না। হাঁ করে চেয়ে আছ কি, শুনছ যা বলছি? ব্যস্ত হয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল। শুনেছে।

দেড় ঘণ্টা নয়, এবার টেলিফোন এলো দু'ঘণ্টা বাদে। সহেলি ধরল। এতগুলো মিথ্যে বলতে তার একবারও ঢোক গিলতে হল না। ফোন রেখে আমার দিকে তাকালো। মাথা নেড়ে বললাম, ঠিক আছে। ইংগিত বুঝে সহেলি চলে গেল।

কিন্তু আমার ভিতরটা অশান্ত। ঘড়ি দেখলাম। বেলা এখন আড়াইটে। আমার ওই ষষ্ঠ অনুভূতি আবার, যেন বলছে কিছু। হ্যাঁ, আমি ওষুধ খেয়ে শুয়েছি তাই চারটের আগে আর আমাকে কেউ বিরক্ত করবে না। মনে হল ঠিক সেই সময় এ পথ ধরে গাড়ি হাঁকিয়ে এই পথ দিয়ে অভিজাত পালী হিলের রাস্তা ধরবে ওই লোক। বাড়ির দরজায় থামার সম্ভাবনা। যদি হিসেবে ভুল না হয়ে থাকে, একটা খবর নেবার বাসনা ছাড়তে পারবে না।

সহেলি!

মাঝের দরজা খোলা। হাঁক শুনে সহেলি দ্রুত এগিয়ে এলো। তার মনিবের মাথা আজ সুস্থ ভাবছে না হয়তো। সজাগ থেকো। কেউ আসতে পারে। কলিং বেল্ শুনলে নিচে গিয়ে দেখবে কে। অচেনা লোক হলে ওপরে এনে বসানোর দরকার নেই, পরিচয় জেনে নিয়ে আমাকে খবর দেবে।

সহেলি বছর সাত আট বড় হবে আমার থেকে। কথা বেশি বলে না। কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুঝে নিয়ে চলে গেল।

...ঘড়িতে তিনটে...সাড়ে তিনটে...চারটে...চারটে কুড়ি তিরিশ...পঁয়ত্রিশ...ভিতরে ভিতরে এমন উত্তেজনা শিগগীর অনুভব করেছি? ... লোনাভালায় ওই একজন দেখা না করেই আমাকে হোটেল থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আজ ন'মাসের বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু টাটকা ক্ষতটা যেন মাত্র সেই দিনের।

...চারটে পঁয়তাল্লিশ।

নিচে কলিং বেল বেজে উঠল। আমি লাফিয়ে উঠে বসলাম।

সহেলি দ্রুত নিচে নেমে গেল। একটু বাদেই উঠে এলো। —মিস্টার প্যাটেল নামে এক ভদ্রলোক...

দু'চোখ ঝলসে উঠল আমার।—বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে? থতমত খেয়ে সহেলি বলল, হ্যাঁ।

হুকুম করলাম গিয়ে, বল কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে আমি বাড়িতে দেখা করি না। দরকার থাকলে যেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে স্টুডিওতে দেখা করেন। যে কথাগুলো বললাম ঠিক তাই বলবে একটুও এদিক ওদিক হয় না যেন। তারপর আর কোনো কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা না করে সোজা দরজা বন্ধ করে দেবে। মনে থাকবে?

নীরবে সায় দিয়ে সহেলি আবার নিচে নেমে গেল। আমি কান পেতে আছি।—একটু শব্দ করে দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে এলো।

সহেলি দোতলায় উঠে আসতে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। চোখ দিয়েই আমি ভিতরে টেনে আনলাম তাকে। —কি বলেছ?

বলেছি, কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে আপনি বাড়িতে দেখা করেন না, সে রকম দরকার থাকলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে স্টুডিওতে দেখা করতে পারেন।

তারপর?

একথা শুনে ভদ্রলোক বেশ অবাক হয়ে কিছু একটা বার করার জন্যে পকেটে হাত দিলেন। আমি ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।

ঠিক আছে।

সহেলি চলে যেতে আমি ঠিক করলাম মাসকাবারে এবার ওর কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেব।

এতক্ষণ বাদে ভিতরের একটা উত্তেজনা শান্ত হল যেন। যেটুকু অপমান বিনায়ক প্যাটেলকে করতে পেরেছি তার থেকে সহস্র গুণ বেশি রাগ আর ঘৃণা আর বিদ্বেষ আমার। কিন্তু এর থেকে বেশি কিছু করার সুযোগ নেই আপাতত।

এক ঘণ্টারও বাদে আবার টেলিফোন এলো—বিকেল ছ'টা তখন।

এবারে ধীরে সুস্থে নিজেই টেলিফোন তুলে নিলাম। —হ্যালো।

আমার নাম বিনায়ক প্যাটেল।

মুহূর্তের মধ্যে একটা উষ্ণ স্রোত মাথার দিকে উঠতে থাকল। ডাইরেক্টরীতে আমার টেলিফোন নম্বর নেই। আনলিস্টেড নম্বর। পরিচালকের কাছ থেকে নম্বর সংগ্রহ করে থাকবে।

বিনয়...প্যাটেল...ও ব্যারিস্টার মিস্টার প্যাটেল? ঘৃণার ওপর দিয়ে গলায় এবার বিস্ময় মেশানো আগ্রহের সুর ফুটল।

ওদিক থেকে ভারি গলায় সাড়া এলো, হ্যাঁ...।

কি খবর বলুন।

আপনার শরীর কেমন?

টেলিফোনের রিসিভার আছড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল।—এখন একটু ভালো। আজও স্টুডিওতে গেছিলেন?

গিয়েছিলাম। যাব যে হরিহরদা সে-কথা আপনাকে বলে রেখেছিলেন শুনলাম।

হঠাৎ শরীরটা খারাপ লাগল, গিয়ে উঠতে পারলাম না। হ্যাড টু মিস ইউ...

ওধার থেকে আবার ঠাণ্ডা গলার স্বর কানে এলো।—অসুস্থ শুনে ঘণ্টাখানেক আগে স্টুডিও ফেরত আপনাকে একবার দেখে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। নাম পাঠানো সত্ত্বেও আপনার আয়া এসে জানালো অচেনা কোনো লোকের সঙ্গে বাড়িতে আপনি দেখা করেন না...তারপর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল।

ও...আপনি এসেছিলেন! বিতৃষ্ণায় ভিতরে ভিতরে মুণ্ডুপাত করছি আমি তার। আই অ্যাম সো সরি...অনেক বাজে লোক এসে বিরক্ত করে...আপনি এসেছিলেন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি...রিয়েলি সো সরি...শরীরটাও ভালো ছিল না।

কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি।—কাল বিকেল পাঁচটায় ওই সেট সম্পর্কে আলোচনার জন্যে আপনাদের পরিচালক মিস্টার শর্মা আমার বাড়ি আসছেন...আপনারও তখন আসার সুবিধে হবে?

জবাব দিলাম, সেট-ফেট সব ডাইরেক্টরের ব্যাপার, এর মধ্যে আমি কেন!

এলে খুশি হতাম।

গলায় যতটুকু সম্ভব বিনয় ঢেলে বললাম, কিছু মনে করবেন না...আমি কোথাও যাই না। আপনি যখন যেতে বলেছেন তাতেই খুশি...আচ্ছা নমস্কার।

ফোন নামিয়ে রাখলাম। এটুকু অভিনয় করতে গিয়ে আমার দু'কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভিতরের চাপা আক্রোশ একটু যেন মুক্তির পথ পেয়েছে। আগের দিনের সাক্ষাতে আমাকে মস্ত একজন ভক্ত ভেবে ভিতরটা ডগমগ করে উঠেছিল তার, কোর্ট-কেসে কোনো মেয়ের এত ইন্টারেস্ট ভাবতে পারে না বলেছিল। আজ কি ভাবছে? স্টুডিওয় এত ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর বাড়িতে খবর নিতে এলে নাকের ডগায় দরজা বন্ধ হতে দেখে কি ভেবেছে ওই প্রবল-প্রতাপ ইয়ং ব্যারিস্টার?

...ওই লোকের সঙ্গে গোড়া থেকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত কাল যা-যা কথা হয়েছিল সব এখনও আমার মগজে ঠাসা। কতটা ভালো লেগেছে বোঝাই গেছে। মুখেও বলেছিল, শুধু অভিনয় নয়, আমার চালচলন কথাবার্তা সবই তার ভালো লেগেছে। ... আজ কেমন লাগছে?

সন্ধ্যার একটু পরে রমেশ সামতানি এলো। এই একজন মাত্র লোকের কাছে আমি যেমন সহজ তেমনি স্বাভাবিক। এসেই আমাকে নিরীক্ষণ করে দেখল একটু।—ভালোই তো আছ দেখছি, শরীর খারাপ বলে স্টুডিও যাওনি শুনলাম?

বাবা! সত্যিই অবাক আমি, তোমার কানেও সে-কথা পৌঁছে গেছে। অনেক দিনের জন্যে বাইরে চলে যাচ্ছি বলে তোমার প্রোডিউসারের সঙ্গে একটু বৈষয়িক আলোচনা ছিল, সে-ই খবরটা দিল, শরীর খারাপ বলে আজ তুমি সেটে আসনি। ...কি হয়েছিল?

কপট গাম্ভীর্যে জবাব দিলাম, শরীর নয়, মেজাজ খারাপ হয়েছিল, হঠাৎ ছ'মাসের জন্যে তুমি বাইরে যাচ্ছ মানে?

শুনে খুশি হল।—বাইরে যাচ্ছি মানে যাচ্ছি।

কেন যাচ্ছ? জীবনে আর কত টাকা দরকার তোমার?

হাসতে লাগল।—আই অলওয়েজ লাভ টু ডু মাই ওউন লিট্‌ল থিংস। তাছাড়া এটা একটা নেশার মতো, নিজের মাথার কসরতে যা কিছু, এ যত ফুলে ফেঁপে ওঠে ততো আনন্দ। হাত পা ছড়িয়ে ইজিচেয়ারে বসল। —কাল কে একজন খুব দামী লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলেছিলে ...কে?

এই প্রসঙ্গে আসার জন্যেই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। উত্তেজনা চেপে জিজ্ঞাসা করলাম, কে অনুমান কর তো?

ভাবল একটু। তারপর মাথা নাড়ল।—পারলাম না, তুমি বল।

বিনায়ক প্যাটেল।

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল। —সে আবার কে?

লোনাভালা বীরকর কেসের হীরো ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেল।

মনে পড়ল এবারে। ওই একটা মানুষকে আমি কত ঘৃণা করি এই একজনই জানে সে কথা।—তার সঙ্গে দেখা হল মানে সে কি তোমাকে চেনে নাকি?

না, সে আমাকে ছবির জগতের খুব এক প্রমিসিং স্টার সুজাতা পাণ্ডুরং নামেই চিনেছে। বয়সে অনেক ছোট হলেও আমাদের ডাইরেক্টর হরিহর শর্মার খুব বন্ধু, কোর্টসীন স্বাভাবিক হচ্ছে কিনা যাচাইয়ের জন্যে তাকে এক্সপার্ট হিসেবে আনা হয়েছে। ...আজও সেটে এসেছিল।

তারপর?

কাল থেকে আজ বিকেল পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব বলে গেলাম। বলার মধ্যে আমার ঘৃণা আর উষ্মার ঝাঁঝ বুঝতে বাকি থাকল না রমেশ সামতানির। সব শোনার পর প্রথমে হেসেই বলল, তুমি এখনও একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি, আজ পর্যন্ত ওই লোকটার ওপর এত রাগ পুষে বসে আছ! কতবার তোমাকে বলেছি, ও একজন পেশাদার ব্যারিস্টার পেশাদারী কাজ করেছে, ফি দিয়ে তুমি বহাল করলে আবার তোমার জন্যেও ওই রকম লড়বে।

আমি ঝাঁঝ দেখিয়ে বললাম, লোনাভালা কেসে জেতার পর তার সম্পর্কে কত ব্যক্তিগত সুখ্যাতি কাগজে বেরিয়েছিল তুমি জানো না। তার বিবেচনায় ক্লায়েন্ট দোষী বুঝলে সে নাকি অজস্র টাকার বিনিময়েও কেস হাতে নেয় না। আবার নির্দোষ বুঝলে টাকা পয়সার জন্যে কেয়ার না করে সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়ে তার জন্য।

রমেশ সামতানির হালছাড়া বিরক্তিকর অভিব্যক্তি একটু।—সেই এক পুরনো কথা আবার। কাগজ যখন যাকে তোলে ওই রকম করেই তোলে। ওই একটা লোকের কথা ভেবে একদিন হাফ-ডে আর একদিন ফুল ডে'র শুটিং নষ্ট করলে তুমি, প্রোডিউসারের তাতে কত লোকশান হল জানো?

এই এক ব্যাপারে সায় বা সমর্থন না পাওয়ার দরুন আমারও ভিতরটা তিক্ত হয়ে গেল। জবাব দিলাম, তেমন কিছুই ক্ষতি হয়নি, ডাইরেক্টর ওই সেটে অন্য লোকের কাজ সেরেছে। ...ওই লোকের জন্যে আমার মা গেছে বাবা গেছে আর বংশের ওপর এত বড় কলঙ্কের বোঝা চেপেছে যে নিজের পুরো নামটা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারি না, সেই লোককে চোখের সামনে দেখেও আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে যেতে বলছ?

আমাকে এতটা উত্তপ্ত হতে দেখে রমেশ সামতানি হাসিমুখে সামাল দিতে চেষ্টা করল।—আচ্ছা বাবা, যা করেছ বেশ করেছ, কিন্তু ও নিয়ে আর বেশি মাথা গরম কোরো না। তাতে শুধু তোমার নিজের ক্ষতি, আর কারো কিছু না। এরপর উপদেশের সুরে বলল, অনেক দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, তুমি এর মধ্যে বেশ ভালো করে একমনে নিজের কাজটি সেরে নাও। তোমার প্রোডিউসারের সঙ্গে কথা হলেই সে আগে তোমার প্রশংসা করে নেয়, বলে ইউ উইল বি এ গ্রেট আর্টিস্ট। আমিও

তোমাকে গ্রেট আর্টিস্ট দেখার অপেক্ষাতেই বসে আছি—মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি, নইলে এবারের লম্বা সফরে তোমাকে নিয়েই হাওয়া হয়ে যেতাম। আমি কম ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছি?

আমি থমকে তাকালাম। ওর কথায় আবার অনেক দিন আগের সেই হালকা সুর। চাউনিটাও আগের মতোই ইঙ্গিত মাখা। দু-দুটো অত বড় অঘটনের ফলে আমার ও রকম মানসিক অবস্থা দেখে এই ন' মাসে একটা দিনের জন্যেও তার কথা বা চাউনিতে কোনো ব্যক্তিগত অভিলাষ চোখে পড়েনি। এই একজন না থাকলে আমি কোথায় যে ভেসে যেতাম তাও জানি না। সেদিক থেকে তার প্রতি যত শ্রদ্ধা ততো কৃতজ্ঞতা আমার। কিন্তু এ কথা শোনার পর আর এই চাউনি দেখার পর থমকালাম অন্য কারণে। ...বিগত ন'টা মাসের মধ্যে তাকে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ভাবার অবকাশ আমার হয়নি। মনের সেই অবস্থা ছিল না। কিন্তু এতদিন বাদে আবার সেই পুরনো ইঙ্গিত শুনে আর দেখে হঠাৎ নিজেরই মনে হল ওর সম্পর্কে আমি আজও সেই পুরনো অনিশ্চয়তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছি। আমার জীবনবাস্তবের পুরুষ এই মানুষটাই—অনেক শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও এ রকম একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যয় এখনো আমার মধ্যে দানা বেঁধে ওঠেনি। ন'মাস আগে যেমন ছিল আজও সেই সম্ভাবনাটা আগের ওই একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। সেটা দূরে না সরুক কাছে এগিয়ে আসার ফুরসত পায়নি।

আরো কিছু হালকা উপদেশ দিয়ে সে চলে যেতে ওই চিন্তাও মন থেকে সরে গেল। অশান্ত ক্ষুব্ধ মনের দর্পণে ফিরে আবার যে দাম্ভিক মানুষের ছায়া পড়ল, সে বিনায়ক প্যাটেল। সে আমার চির শত্রু। আমার গ্রেট আর্টিস্ট হওয়ার ব্যাপারে এই শত্রুতাকে আমি কোনোরকম বাধা মনে করি না। রমেশকে আমি দোষ দিই না, আমার মানসিক অবস্থা জানে বলেই সে উতলা হয়, ওই শত্রুকে তুচ্ছ করতে বলে, ভুলে যেতে বলে।

...সেই রাতে আবার আমি স্বপ্ন দেখলাম। উলটো পালটা স্বপ্ন। মায়ের চিতা জ্বলছে, বাবার চিতা জ্বলছে। তারপর আবার সেই বাবাকেই দেখলাম আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। একটা মানুষ তার দিকে লম্বা লম্বা আঙুল নেড়ে আর পুরু দুই ঠোঁট নেড়ে নেড়ে ঘাতকের মতো বলে চলেছে কি। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার বাবা কাঁপছে থরথর করে আর ঘামছে দরদর করে, মাথা নেড়ে অব্যক্ত যাতনায় বলতে চাইছে কি, আর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

পাঁচ

শুটিং না থাকলে আমি বিকেলে বাড়ির ধারে-কাছে একটু বেড়াই, সন্ধ্যা না হতে আবার বাড়ি চলে আসি। আজ আর রমেশ আসবে মনে হয় না, কাল লম্বা ট্যুরে বেরুবে, তার কাজ থাকাই স্বাভাবিক। এমনিতেই রোজ আসার সময় পায় না। একই সময় বাড়ি ফিরলাম তবু।

দোতলার বসার ঘরে যে মূর্তি বসে তাকে আমি আশা করিনি। পরিচালক হরিহর শর্মা। ভদ্রলোক সুরসিক হলেও কোনো আর্টিস্টের বাড়ি আসে না বড় একটা। এ লাইনের সম্মানী মানুষ। আমার প্রথম ছবির পরিচালক, আমার কাছে সম্মানী তো বটেই। আমাকে দেখেই বলে উঠল, তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি...সত্যি অসুখ করেছিল?

চকিত একবার সহেলির কথা মনে হল। কিন্তু সে কাঁচা মেয়ে নয়। হেসেই বললাম, সত্যি না হলে এই ন'মাসের মধ্যে ক'দিন কামাই করতে দেখেছেন?

দেখিনি বলেই তো ঘাবড়েছি...কিন্তু তোমাকে দেখে কিছু মনে হচ্ছে না...এখন কেমন?

ভালো।...আপনার তো আজ কোর্ট সীন্ সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক্সপার্টের কাছে যাওয়ার কথা ছিল?

সেখান থেকেই তো সোজা তোমার এখানে। ভদ্রলোক হাসতে লাগল। কিন্তু আলোচনা সে-রকম জমল না। তুমি ভায়ার মনে বড় দাগা দিয়েছ—

কার মনে? বুঝেও বুঝতে চাইছি না।

ওই ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেলের কথা বলছি। তাকে আমি নিজের ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসি, ওরকম সৎ আর গুণী ছেলে বড় একটা দেখা যায় না, যারা ওকে জানে সকলেই শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে। ... আর তুমি সরাসরি তার নেমন্তন্নটাই বাতিল করে দিলে? নাই যাবে তো অন্য কোনো অজুহাত দেখাও, সোজা বলে দিলে কোথাও যাও না! বিশেষ করে যেখানে আমি থাকছি!

কানের পর্দা দুটো যেন কড়কড় করছে। তবু সহজ সুরেই বললাম, নেমন্তন্নটা আপনি জানালে অত অসুবিধে হত না...আপহি বলুন, একদিনের সামান্য আলাপে কেউ বাড়িতে ডাকলেই হুট করে চলে যাব?

একদিনের আলাপে কি গো! সে না হয় তোমাকে চিনত না, কিন্তু তুমি তো তাকে আগে থেকেই চিনতে জানতে, পরশু তো নিজের মুখেই কত কি বললে, কত কেস কাগজে পড়েছ, ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে আপোসশূন্য লড়াই করে...ও রুখে দাঁড়ালে অপরাধীর মাথায় সর্বনাশের খড়্গ নেমে আসবেই...একান্ত ভক্তের মতো কাগজে ছবি দেখেই মানুষটাকে চিনেছ, বেচারাকে ওভাবে ঘায়েল করার পরে কিনা তোমার এই ব্যবহার!

এটা কোর্ট নয় যে মুখে লাগাম বেঁধে রাখতে হবে। কপট কৌতুকে একটু উচ্ছল আমি।—ভদ্রলোক ওতেই ঘায়েল হয়ে গেছেন বলছেন?

ঘায়েল বলে ঘায়েল! ফ্লোরে আমাকে যেমন দেখে সে-রকম দেখছে না বলেই হরিহর শর্মা আরো খুশি। একটা সত্যি কথা ফাঁস করে দেওয়ার মতো করে বলল, ওই সীরিয়াস মানুষগুলোকে নিয়ে বিপদই এই, বুঝলে? চোখ বুজে ধ্যানে বসল তো বসলই, আবার চোখ খুলে কাউকে মনে ধরল তো তক্ষুনি শরাহত। ও ছেলে কত সীরিয়াস খুব ভালো করে জানি বলেই বলছি, নইলে কল্পনা দেশাই কবে ওর গলায় ঝুলত, কিন্তু—

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কল্পনা দেশাই কে?

ওর এক দূর সম্পর্কের ভগ্নিপতির বোন আর আমারও দূর সম্পর্কের আত্মীয়া, একই পেশার মেয়ে, মানে সে লইয়ার। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়, প্যাটেল ওকে বিয়ে করবে সেই আশায় আমাকে পর্যন্ত কত ভাবে তোয়াজ করে, ছেলেবেলা থেকে ভাবসাব দু'জনের, কিন্তু বাবুর ধ্যানভঙ্গের নাম নেই, অথচ একদিন মাত্র তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে আলাপ করে আর নিজের গাড়িতে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ফাঁকে কি কথা-বার্তা হয়েছে, তাইতেই সে ধ্যানের জগৎ থেকে একেবারে অন্য জগতে পাড়ি দিয়েছে। যাকে বলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সেকেণ্ড অ্যাণ্ড থার্ড সাইট, প্রথম শুটিং-এ তারপর স্টুডিও ঘরের আলাপে আর তারপর গাড়ির লিফট-এ।

নিজের রসিকতায় বেশ জোরেই হেসে উঠল হরিহর শর্মা। তাকে চা দিতে বলার অছিলায় আমিও হাসিমুখে পাশের ঘরে চলে এলাম একবার। এক বিজাতীয় আক্রোশে আমার দু'কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কানে মুখে জল দিয়ে ভালো করে মুখ মুছে আর সহেলিকে চা পাঠাবার কথা বলে আবার হাসিমুখেই ঘরে ঢুকলাম। ... একটা দিনের আলাপ খুব কম সময় নয়, জুনাগড়ে দেখেছি আর বিকেলে বেড়াবার সময় এই বোম্বাই শহরেও দেখছি, বিনা আলাপেই সভ্যভব্য কতজন সামনে পিছনে ঘুরঘুর করে। আমার ধারণা, সুরসিক হরিহর শর্মাও নিছক শরীরের খবর নেবার জন্যেই এখানে আসেনি, ছোট ভাইয়ের মতো মানী বন্ধুর মন বুঝে একটু সুপারিশের ইচ্ছেও মনের তলায় আছে তার। সুবিধে এই, মনের তলায় কোনো কথা তার চাপা থাকে না।

—তারপর বলুন, আমারও ভালো লাগছে শুনতে। এতবড় একজন ব্যারিস্টারকে নিয়ে আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টাই করছেন মনে হচ্ছে—

ঠাট্টা! হাসি মাখা দু'চোখ গোল হরিহর শর্মার। —সেদিন লিফ্‌ট্ দেবার পর টেলিফোনে সে কি উচ্ছ্বাস আর তোমার জন্যে সে কি দুশ্চিন্তা ছেলেটার! এত লেখাপড়া শিখে এ লাইনে আসা কেন জিজ্ঞাসা করতে তুমি নাকি জবাব দিয়েছ, মাথার ওপর গার্জেন নেই বলে—আর সত্যিই ভালো লাগছিল বলে সে নাকি আস্তে চালাচ্ছিল গাড়ি, তোমার শরীর বেশি খারাপ ভেবে তক্ষুনি ডাক্তার

দেখানোর কথা বলতে তুমি জবাব দিয়েছ, তার দরকার হবে না, আপনি শুধু আর একটু স্পীড বাড়ান গাড়ির। এই থেকেই সে ফোরকাস্ট করেছে অদূর ভবিষ্যতে আর কোনো আর্টিস্ট তোমার ধারে কাছে থাকবে না।

হাসি ভরা চোখ দুটো আমার মুখের ওপর একবার বুলিয়ে নিল হরিহর শর্মা। —তারপর তোমার লাল মুখ দেখে বিষম ভাবনা তার, আমাকে তাগিদ, শিগ্‌গীর টেলিফোনে খোঁজ নাও, ব্লাড প্রেসার চেক-আপ করতে বল।...তোমার টেলিফোনে ঠাট্টার কথাও বলে দিয়েছি, অমন ভক্তি শ্রদ্ধার মানুষকে হঠাৎ অত কাছে পাওয়ার ফলে রক্তের তাপ আর চাপ বাড়ার কথা শুনে প্যাটেল হেসে বাঁচে না, বলে সী ইজ রিয়েলি সো ইনটেলিজেন্ট! আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন আরো পুলকিত হরিহর শর্মা, মুখ যে এখনো বেশ লাল দেখছি গো, বোথওয়েজ নাকি!

সহেলি চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢোকার ফলে জবাব দেওয়া থেকে অব্যাহতি পেলাম। হরিহর শর্মা একটা পেয়ালা হাতে নিল, আমারও পেয়ালা তুলে নিয়ে মুখ আড়াল করে চোখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা। সহেলি চলে যাবার ফাঁকে পেয়ালায় দু-তিনটে চুমুক দিয়ে ঘটা করে একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল হরিহর শর্মা।—কিন্তু কাল সকাল থেকে সবকিছুর ওপর তুমি একেবারে বাসন-মাজা জল ঢেলে দিলে, বেচারা হকচকিয়ে গেছে একেবারে।

আমি আবার কি করলাম?

তুমি আবার কি করলে? স্টুডিওয় আসছ বলেও এলে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসে থেকে শেষে উঠে যাচ্ছে দেখে প্রোগ্রাম শর্ট করে তাকে মিনিয়েচারে এনে তোমার এতদিনের অ্যাকটিং দেখালাম। তাই দেখে আবার এক দফা মুগ্ধ সে, হন্তদন্ত হয়ে অসুস্থতার খবর নেবার জন্যে তোমার বাড়ি ছুটে এলো, আর তারপরেই একেবারে মোক্ষম ঘা খেয়ে বাড়ি ফিরল। প্যাটেল নামে কাউকে তুমি চিনতেই পারলে না—আয়াকে দিয়ে বলে পাঠালে কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে তুমি বাড়িতে দেখা কর না, সে-রকম দরকার হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেন স্টুডিওতে দেখা করা হয়। শুধু তাই নয়, ওকথা বলেই তোমার আয়া নাকি তার নাকের ডগায় ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল!...কাল অবশ্য তারপর সে টেলিফোন করতে তুমি অ্যাপোলজি চেয়েছ কিন্তু ঠাণ্ডা মেজাজে তার নেমন্তন্ন নাকচ করেছ। আমাকে বলেছে, তোমার আর্টিস্ট সুজাতা পাণ্ডুরং আমার ভক্ত হলেও বড় কঠিন ভক্ত দাদা—সত্যিই কতটা কি অসুখ দেখে এসো।

হাতের পেয়ালা নামিয়ে আমি শুধু বললাম, কি লজ্জা—

আমার দিকে চেয়ে হরিহর শর্মা মুচকি হাসল একটু। বলল, এই লজ্জায় সুফল ছাড়া কুফল নেই, তোমার আচার আচরণ দেখে ছেলেটার কৌতূহল বরং চারগুণ বেড়েছে আরো। আর আমিও এক ঘণ্টা ধরে তোমার ঢালা প্রশংসা করে সেটা তুঙ্গে তুলে দিয়েছি।

খুব হয়েছে, আর বেশি বলবেন না।

হাসছে হরিহর শর্মা। —আরো একটা কথা তোমাকে চুপি চুপি বলে যাই। সময়ের মাপটাই বড় কথা নয়, এ রকম হঠাৎ দুনিয়ায় অনেক কিছু ঘটে। তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমার জানা নেই, কিন্তু ওই রকম ছেলেও হাজারে দশহাজারে একটাই মেলে, হি ইজ রিয়েলি এ জেম্।

জেম্ প্রসঙ্গে আমার মুখে আরক্ত ছটা দেখেই সম্ভবত খুশি চিত্তে বিদায় নিল পরিচালক হরিহর শর্মা। কিন্তু সত্যিই এক দুর্বার আক্রোশে খুশি আমিও। মন বলছে আরো কিছু ঘটবে। মন বলছে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ আমি পাব। তক্ষুনি আহার সেরে ডবল ডোজের ঘুমের ওষুধ খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। আজও আমি আধা ঘুমের মধ্যে একজনের লম্বা-লম্বা আঙুল নাড়া আর পুরু ঠোঁট নাড়ার বিভীষিকা দেখতে চাই না।

পরের দিন বিকেল পাঁচটার ফ্লাইটে রমেশ সামতানিকে বিদায় দিয়ে সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। বাইরের দিকের লাউঞ্জে সেই লোক। ...ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেল। লম্বা শরীরটা সোফায় ছেড়ে দিয়ে যেন কারো প্রতীক্ষায় এদিকে চেয়েই বসে আছে। চোখাচোখি হতে মুখে

কাঁচা হাসি ছড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। দেখামাত্র বিতৃষ্ণায় ভেতর ছেয়ে গেল আমার। প্রথমেই হাতের লম্বা আঙুল আর পুরু ঠোঁটের দিকে চোখ গেল। কোনোটাই বেমানান কুৎসিত নয়, কিন্তু আমার চোখে বীভৎস।

রক্ত ঠাণ্ডা রাখার জন্যেই গতি মন্থর আমার। হাসিমুখে বিনায়ক প্যাটেল বলল, অ্যাটর্নি জেনারেলকে সী-অফ্ করতে এসেছিলাম, আপনাকে তাড়াতাড়ি ঢুকতে দেখে বসে গেলাম।

অর্থাৎ আমার অপেক্ষাতেই বসে আছে। অনেক চেষ্টার ফলে স্বাভাবিক দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর টেনে তুললাম। সে আবারও হেসে জিজ্ঞাসা করল, আজও প্যাটেল নামে কাউকে চিনতে আপনার অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

যতখানি সম্ভব মিষ্টি হাসলাম আমি, আর মাথাও নাড়ালাম। — চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে নিজেকেই শাসন করছি, সুজাতা বীরকর আজ তুমি অভিনেত্রী সুজাতা পাণ্ডুরং...ভবিষ্যতে আরো ঢের বড় অভিনেত্রী হবে, শত্রু দেখেই এ রকম বিচলিত হওয়া তোমার সাজে না। বরং ঠাণ্ডা সহজ স্বাভাবিক থাকলে অনেক বেশি জোর পাবে।

জিজ্ঞাসা করল, আপনি কাকে সী-অফ্ করতে এসেছিলেন?

আমার এক বন্ধুকে, রমেশ সামতানি—

বন্ধু শুনেই চাউনিটা মুখের ওপর ধাক্কা খেল। রমেশ সামতানি...নামটা শোনা শোনা লাগছে। বিজনেস ম্যাগনেট?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তাই।

চলুন। এখন বাড়ি যাবেন তো?

হেসে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, লিফ্‌ট্ দেবেন?

মুখে আবার সেই কাঁচা হাসি। ভিতরে বিতৃষ্ণা বাসা বেঁধে না থাকলে হয়তো মন্দ লাগত না। উৎফুল্ল জবাব দিল, আমার বরাত আপনি খণ্ডাবেন কি করে, এখান থেকে সোজা আপনার বাড়ি যাব ঠিক করেছিলাম, প্যাটেলকে আজও চিনতে পারেন কিনা দেখার ইচ্ছে ছিল, তার বদলে সশরীরে এখানেই পেয়ে গেলাম আপনাকে। আসুন—

আমি নিজেও বেশ লম্বা গড়নের মেয়ে, কিন্তু এই লোক পাশে পাশে আসতে মনে হল তার কাঁধের কাছে পড়ে আছি। এয়ারপোর্ট থেকে আমার সান্তাক্রুজ ওয়েস্ট-এর ফ্ল্যাট খুব দূরের পথ নয়। মিষ্টি করেই বললাম, রোজ অনেকটা হাঁটা অভ্যেস আমার, হেঁটেই বাড়ি ফিরব ভেবেছিলাম...।

থমকে দাঁড়িয়ে সোজা ঘুরে তাকালো।—আপনি আমাকে এড়াতে চান কিনা ঠিক বলুন তো?

আহত বিস্ময়ে বলে উঠলাম, এ কথা কেন?

স্টুডিওতে সেদিন এত খাতির কদর করলেন, খবরের কাগজের পুরনো ছবি দেখেই আমাকে চিনে ফেললেন, গাড়িতে একসঙ্গে গল্প করতে করতে এলাম, অথচ বাড়িতে গিয়ে খবর পাঠানোর পরেও প্যাটেল নামে কাউকে চিনতে পারলেন না, তার ওপর আয়াকে দিয়ে বলে পাঠালেন অচেনা লোকের সঙ্গে বাড়িতে দেখা করেন না, আজ অসুস্থ শরীর নিয়ে বলছেন আপনার হাঁটতে ইচ্ছে করছে—

নিজের ওপর দখল ফিরে আসছে। মুখের দিকে চেয়েই মৃদুমৃদু হাসছি আমি। বললাম, অসুস্থ শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যেই হাঁটা, ঠিক আছে চলুন..সেদিন ঘুম চোখে ও-রকম বলে ফেলেছিলাম বোধহয়।

এটুকু শুনেই খুশি আবার। চলতে চলতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হরিহরদাও এই কথাই বলছিলেন...আজও টেলিফোনে তিনি আপনার অনেক প্রশংসা করছিলেন, কাল সন্ধ্যায় তিনি আপনার বাড়িতে অনেকক্ষণ কাটিয়ে এসেছেন শুনলাম।

হ্যাঁ, আর আপনারও অজস্র প্রশংসা করে গেছেন।

হাসতে লাগল।—তাঁর প্রশংসায় তো দেখছি বিশ্বাস নেই তাহলে!

এই হাসি দেখলে কেউ বলবে না, কোর্টে সংকল্পের খড়্গ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালে এই মানুষই অত নির্মম, অমন ভয়ঙ্কর হতে পারে।

লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে চাবি লাগিয়ে গাড়ির দরজা খুলল। তারপর পাশের দরজা খুলে দিয়ে সাদর আহ্বান জানাল, আসুন—

স্টার্ট দিয়েই ঘাড় ফেরালো, স্পীড বেশি হবে কি কম?

যেমন খুশি। চেষ্টা করে হাসা আর জল ঢেলে গায়ের জ্বর ছাড়ানোর চেষ্টা দুইই যেন সমান পণ্ডশ্রম।

এয়ার-পোর্ট চত্বর ছাড়িয়েই ছেলেমানুষি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা সত্যি বলুন তো, আমার কোর্ট কেস অত আগ্রহ নিয়ে পড়েন আপনি?

আগে পড়তাম...এখন অত সময় পেয়ে উঠিনে।

কি দুর্ভাগ্য! অথচ মজা দেখুন, আমি এক আইনের বই ছাড়া আর কোনো কিছুই পড়তাম না, সেদিন স্টুডিওতে আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে সিনেমার যে পত্র-পত্রিকাগুলোতে আপনার ছবি থাকছে বা আপনার সম্পর্কে আলোচনা থাকছে তার সবগুলোই আমি কিনে ফেলছি আর পড়ছি।

...সুজাতা বীরকর তুমি আগামী দিনের যশস্বিনী চিত্রতারকা সুজাতা পাণ্ডুরং, তুমি চেষ্টা করলে ঠিক হাসতে পারো, চেষ্টা করে ঠোটের ফাঁকে একটুখানি লাজুক-লাজুক হাসি অন্তত ধরে রাখতে পারো।

পাশের লোকটার প্রশ্ন শুনে সচকিত একটু।—আপনার কি হয়েছে বলুন তো...মুখ তো এখনো বেশ লাল দেখছি!

দেখবেন না। কেউ গাড়ি চাপা পড়তে পারে।

স্টিয়ারিং হাতে ভালো করেই ঘুরে তাকালো আর জোরেই হেসে উঠল। —ঠিক আছে, চাপা পড়বে না, আপনি বলুন কি অসুখ।

অসুখ কিছুই না, মাথা একটু আধটু রীল করে...।

ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?

না...।

ব্লাড প্রেসারও চেক আপ করা হয়নি?

না...।

তাহলে কার প্রেসক্রিপশনে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিলেন সেদিন? নিজের প্রেসক্রিপশনেই...।

মাথাটা আবারও আমার দিকে ঘুরল একবার। তারপর গাড়িটার হঠাৎ স্পীড বেড়ে গিয়ে সামনের বাঁকের রাস্তায় চলল। আমার বাড়ি সোজা পথে। এবার নীরব জিজ্ঞাসায় আমি তাকালাম তার দিকে। সে জানান দিল, মিনিট পাঁচেকের জন্যে একজায়গায় হয়ে তারপর যাচ্ছি।

জবাব দিছি শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। তবু নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করেই বললাম, আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন তাহলে—ঘাবড়াবেন না, আসুন।

দু'মিনিটের মধ্যে গাড়ি একটা বড় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গেল। সামনের প্রশস্ত ঘরের দরজা খোলা। বিনায়ক প্যাটেল নেমে সরাসরি ঘরে ঢুকে গেল। আধ-মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে দরজার কাছে এলো আবার। তার পাশে টাক-মাথা একজন ভদ্রলোক। সেখানে দাঁড়িয়েই বিনায়ক প্যাটেল ডাকল, নেমে আসুন—

তুমি সুজাতা বীরকর নও আর, তুমি অভিনেত্রী সুজাতা পাণ্ডুরং, অপরিচিতের সামনে সীন ক্রিয়েট কোরো না, সহজ সপ্রতিভ মুখে নেমে যাও।

নেমে এলাম। টাক-মাথা ভদ্রলোক সাদরে ঘরে এনে বসালেন আমাকে। ঘরের দিকে একবার তাকাতেই বোঝা গেল ডাক্তারের চেম্বার এটা। আর এই ভদ্রলোকই ডাক্তার, কারণ প্যাটেল তাকেই বলল, চটপট্ ডক্টর—

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, মাথা রীল করে কেন, হজমের কি কোনো ব্যাঘাত হয়?

রাগে রি রি করছে ভিতরটা, আমার স্বাস্থ্য দেখে এমন কথা মনেও আসা উচিত নয়। মাথা নাড়লাম, ব্যাঘাত হয় না।

মাথার পিছনে ব্যথা হয়?

না।

উঠে এসে চোখ টেনে দেখল, জিভ দেখাতে বলল, পালস্ দেখল। তারপর বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরে ব্লাড প্রেসারের ফেটি জড়াল। মেসিনে বার দুই রক্ত চাপের ওঠা-নামা দেখে ফেটি খুলে নিতে নিতে জিজ্ঞা করল, বয়েস কত?

তেইশ?

এবারে প্যাটেলের দিকে তাকালো ডাক্তার। ব্লাড প্রেসার নরম্যাল, পালস্ নরম্যাল, এভরিথিং নরম্যাল, তোমার দুশ্চিন্তার তো কিছু দেখছি না। ওভার স্ট্রেনে ওরকম হয়।

থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর। আমাকে ডাকল, চলুন—

ডাক্তারটি তার বন্ধুস্থানীয় বোঝা গেল। আমার উদ্দেশ্যে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে তার দিকে চেয়ে একটু অর্থপূর্ণ খুশির ইশারা করল যেন।

গাড়ি চলতে আমি বললাম, আপনার এতটা ব্যস্ত হওয়ার দরকার ছিল না।

সামনের রাস্তার দিকে চোখ রেখেই জবাব দিল, আমি বড় একরোখা মানুষ, যখন যা মাথায় আসে তাই করে ফেলি। আপনার কোনো সঙ্কোচের কারণ নেই, এ ডাক্তার আমার পুরনো বন্ধু।...স্টুডিওর অত গরমে আর অত আলোয় আপনাদের খুব স্ট্রেন হয়, তাই না?

কিছু একটা উলটা পালটা বলে বসার ইচ্ছে আমার। সামান্য মাথা নাড়লাম কি নাড়লাম না।

গাড়ি আমার বাড়ির দরজার কাছে এসে থামল। দরজা খুলে নেমে দাঁড়ালাম। যে-রকম চেয়ে আছে, ভব্যতার প্রশ্নটা আপনিই মুখে এসে গেল।—আসবেন?

খুশি মুখে নেমে এলো। বলল, এ সময় বাড়ি ফিরলে আমার সময় কাটানো খুব ভার হত। আমার পার্ট-টাইম বেয়ারার শুধু মুখ দেখতে হত।

কলিং-বেল টিপতে সহেলি দরজা খুলে দিল। যে মূর্তিকে সঙ্গে করে ঢুকলাম তাকে দেখে ওর চোখ বড় বড়। রূঢ় আচরণে এই লোকেরই নাকের ডগায় দরজা বন্ধ করেছিল মনে আছে।

ওপরের ড্রইংরুমে বসালাম।—বসুন। কি খাবেন বলুন, চা না কফি?

যা খাওয়াবেন তাই খাব। চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু হলেও আপত্তি নেই। হাসি মুখে একটা সচিত্র জার্নাল টেনে নিল।

দু'মিনিটে আসছি।

আমার ঘরের অ্যাটাচড় বাথে এসে চোখে মুখে ভালো করে জলের ঝাপটা মেরে বিতৃষ্ণার তাপ ঠাণ্ডা করার চেষ্টা আমার।...আবার ও-ঘরে যেতে হবে, অভিনয় করতে হবে। তারপর রাতে বোধহয় আজও ঘুমের ওষুধ গিলতে হবে।

...জীবনের সব থেকে বড় শত্রু এখন আমারই ঘরে বসে। আমারই খুশির আপ্যায়নের আশায় বসে। কিন্তু আমাকে ঠাণ্ডা থাকতেই হবে। যতদিন না অস্ত্র ঠিক হয় আর সুযোগ হাতের মুঠোয় আসে ততদিন বেসামাল কাজ করা ঠিক হবে না। কি অস্ত্র কি রকম সুযোগ আসতে পারে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। অতএব অভিনেত্রী সুজাতা পাণ্ডুরং, তুমি ধৈর্য ধর, ভুল কোর না।

ভুল করিনি। হাসিয়েছি। নিজে হাসতে পেরেছি। চা জলখাবার খেয়ে, সিনেমা জগতের প্রসঙ্গে অনেক কৌতূহল মিটিয়ে, আর তার জগৎ সম্পর্কে আমার অজ্ঞতার বহর দেকে খুশি হয়ে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে হাওয়ায় ভেসে বিদায় নিয়েছে। একটা দুটো জটিল কেসের অবতারণা করেও আমার কোর্ট কেস সম্পর্কে পুরনো আগ্রহ আবার ঝালিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। যাবার আগে নিজেই হাসি মুখে বলেছে, কোর্টের বাইরে আমি নিঃসঙ্গ মানুষ, বাড়ির সঙ্গী কেবল আইনের বই, যে রকম লোভ দেখালেন, আমি প্রায়ই এসে হানা দেব—আমার চক্ষুলজ্জার বালাই নেই বুঝতেই পেরেছেন বোধহয়।

ভিতরে যা হচ্ছিল, হচ্ছিল। বাইরে বোধহয় হাসি মুখেই সায় দিয়েছি। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করতে তখনই আবার বাথে ছুটে গেছি।

মুখে যা বলে গেলে কাজেও তাই করবে আর সেটা এত ঘন ঘন হবে ভাবিনি। পরের বিশ দিনের মধ্যে কম করে পাঁচদিন দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। শুধু দেখা নয়, ভিতরের সমস্ত জ্বালা আর বিতৃষ্ণা নিয়ে সেই একই হৃদ্যতার অভিনয় করতে হয়েছে আমাকে। পাঁচদিনের মধ্যে প্রথম একদিন আবার স্টুডিওর সেটে এসেছিল। পরিচালক হরিহর শর্মার কৌতুক মাখা হাসি মুখ দেখেই বুঝেছি আমাকে নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে একাধিক বার আলোচনা হয়ে গেছে। আমার বাড়িতে নিজের সেই চুপি চুপি কথার ফল দেখছে হয়তো হরিহরবাবু, বলেছিলে, সময়ের মাপটাই বড় কথা নয়, এরকম হঠাৎ দুনিয়ায় অনেক কিছু ঘটে।... আর বলেছিল, হি ইজ্ রিয়েলি এ জেম।

পরের দেখা হরিহর শর্মার বাড়িতেই। ছবির এক জায়গায় আমার গলায় সুরেলা স্তোত্রের পার্ট আছে একটু। ছুটির দিনের সঙ্গীত পরিচালক এসেছে তাঁর বাড়িতে। গান আর সুরের মহড়া পরিচালক বা সঙ্গীত পরিচালকের বাড়িতেও হয়ে থাকে। হরিহর শর্মা তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে। কাজ শেষ করে ফিরে আসার আগেই দেখি সেখানে ওই মানুষ...। আমি আসছি সেটা হয়তো হরিহর শর্মাই টেলিফোনে বলে থাকবে তাকে। সেদিনও তার গাড়িতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে আমাকে। আর দু'কানে কিছু স্তুতিও শুনতে হয়েছে, যেমন, এত কাল ফিল্ম আর্টিস্টদের সম্পর্কে তার যে ধারণা ছিল, আমাকে দেখা আর জানার পর থেকে সেটা একেবারে বদলেছে।

তৃতীয় আর চতুর্থ বারের দেখাটা আবার আমার বাড়িতে। বেল বাজতে সহেলি দরজা খুলে দিতে আমি আছি জেনে নিয়ে তার পাশে কাটিয়ে সোজা দোতলায় উঠে এসেছে। নিজেই চা বা কফির হুকুম করেছে। সহেলি কি রকম কড়া আয়া সে-কথা বলে নিজেই হেসেছে। ওঠার আগে একদিন তার ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্যে বারবার আন্তরিক জুলুমের সুরে অনুরোধ করেছে।

...পঞ্চম বারের দেখা, একজন মস্ত শিল্পীর অভিনয়ের পঁচিশ বছর পূর্তির জাঁকজমকের অভিনন্দন উৎসবে। এখানে অন্তত ওই আইনজীবী মানুষটা প্রত্যাশিত নয় আদৌ। কিন্তু উৎসব পরিচালনার পাণ্ডাদের একজন যখন হরিহর শর্মা, নেমন্তন্ন পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমার তক্ষুনি মনে হয়েছে, এ-ধরনের আমন্ত্রণে যোগ দেওয়ার আকর্ষণ আমি। ধারণাটা যে সত্যি দশ মিনিট না যেতেই সেটা বোঝা গেল। জনাকয়েক বিশিষ্ট পরিচালক আর প্রযোজকের সঙ্গে পরিচিত হবার পর যেই একটা টেবিলের সামনে বসেছি, তক্ষুনি ওই মূর্তি সহাস্যে মুখোমুখি চেয়ারখানা দখল করে বসেছে। আর তারপর নির্লজ্জের মতোই সরল স্বীকৃতি।—আপনি আসছেন শুনেই এলাম, নইলে এ-পরিবেশে হাঁসের সভায় বকের দশা আমার।

প্রতিবারের সাক্ষাতে ভিতরে ভিতরে আমার সেই রাগ সেই ঘৃণা সেই বিদ্বেষ সেই বিতৃষ্ণা। এই একজনকে দেখলেই আমার চোখের সামনে মায়ের রক্তাক্ত মরা মুখ আর বাবার কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সেই যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখ ভেসে ওঠে।

এই লোক, এই মেজাজী জাঁদরেল তরুণ ব্যারিস্টার আর আমার সঙ্গে সহজে ছাড়বে না, সুযোগ পেলে আরো অনেক বেশি আকৃষ্ট হবে সেটা আমার পক্ষে বোঝা জলের মতো সোজা এখন। হ্যাঁ, ওপরওয়ালা একটা সুযোগ যেন ক্রমে সামনে ঠেলে দিচ্ছে, কিন্তু কখন আঘাতের কোন্ অমোঘ অব্যর্থ অস্ত্রটা আমি হাতে তুলে নেব ঠিক করে উঠতে পারছি না বলেই যত ক্ষোভ আর অসহিষ্ণুতা আমার। তার সান্নিধ্যমাত্রে এমন একটা বিষাক্ত বাষ্প আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে কোনো একটা স্বচ্ছ চিন্তা পর্যন্ত মাথায় আসে না। ফলে আমি স্বাভাবিক থাকার তাড়নায় শুধু অভিনয়ই করে যাই।

খানিক আগে ফিরেছি। মুখ-হাত ধুয়ে সবে ঠাণ্ডা হয়ে বসেছি। টেলিফোন। বিরক্তির একশেষ। এ-সময়ে কে আবার।—হ্যালো!

পরমুহূর্তে কানের পর্দা কিরকির করে উঠল।— বিনায়ক বলছি। বিরক্ত করলাম না তো?

না...বলুন। রাগের চোটে এখন জিভ ভেংচালেও দেখতে পাবে না।

আজ একটায় হঠাৎ কোর্ট ছুটি হয়ে গেল, সেই থেকে বাড়িতে বসে বসে আর ভালো লাগছিল না।

গলা একটু শানিয়ে জবাব দিলাম কোর্ট নেই, কেস নেই, আসামী নেই আপনার তো খারাপ লাগারই কথা।

তার মানে! ওধার থেকে হাসি এবং প্রতিবাদ।—আমি কি কেবল আসামী খুঁজে বেড়াই নাকি?

রক্তের তাপ বাড়ছে। গলার স্বরের তারতম্য নেই।—সেই রকমই তো ভেবে বসে আছি আমি!

খুব অবিচার করেছেন। আসামী সত্যিকারের দোষী হলে আমি ছাড়ি না অবশ্য, কিন্তু মানুষকে আমি ভালোবাসি।

রাগে মনে মনে আবারও ভেঙচি কাটলাম একটা।—খুব তাজ্জব কথা, যাক, কি বলছিলেন বলুন।

অনুমতি করেন তো আজ নিজে গিয়ে আপনাকে এই অধমের ডেরায় নিয়ে আসি।

ঠেলে-ওঠা বিতৃষ্ণা আবার ভিতরে চালান দিলাম। হাসলাম। আজ হল না, বেরুতে হচ্ছে।

তাহলে কি আর বলব, দুর্ভাগ্য আমার। আজ ছাড়ি তাহলে, আবার একদিন ট্রাই নেব।

টেলিফোনটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে কি যেন হয়ে গেল আমার। বিদ্যুৎ চমকের মতো ভিতরটা ঝলসে গেল এক প্রস্থ। তারপর কি একটা অশ্রুত গুণগুণ প্রস্তাব ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল। প্রতিশোধের একটা পথ বুঝি হাতছানি দিচ্ছে। অব্যর্থ অমোঘ একটা অস্ত্র হাতে উঠে আসতে চাইছে।

তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম। নিজের তপ্ত লাল মুখের ওপর নিজেরই চোখ দুটো ঝলসে উঠল। ভিতরের সেই গুণগুনানি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আয়নায় নিজের দিকে চোখ রেখেই কান পাতলাম।

...নয় কেন? নয় কেন? নয় কেন? কেন নয়...?

আয়নায় নিজের মুখ টকটকে লাল দেখছি। *...নয় কেন? কেন নয়...?*

নিজের মাথাটাই ওই অমোঘ অব্যর্থ সঙ্কল্পে ঠাসা হয়ে যাচ্ছে। *...কেন নয়? নয় কেন?*

আয়নার কাছ থেকে সরে এলাম। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে। নিস্পন্দের মতো বসে থাকলাম খানিক। তারপর উঠে এলাম। টেলিফোন ডাইরেক্টরি হাতে নিয়ে পাতা ওল্টালাম। অনায়াসেই টেলিফোন নম্বরটা চোখের সামনে স্থির হয়ে গেল। টেলিফোনের রিসিভারে হাত রাখলাম। আবার নিস্পন্দ কয়েক পলক। চোখের সামনে মায়ের মরা মুখ ভেসে উঠল। তারপর বাবার মরা মুখ। এক ঝটকায় রিসিভার তুলে নিয়ে নম্বর ডায়েল করলাম।

হ্যালো? সেই ভারী গলা।

আমি...সুজাতা।

হাউ লাকি! এরই মধ্যে আপনি আবার...কি ব্যাপার?

আপনার ইচ্ছেটা বাতিল করতে শেষ পর্যন্ত আর মন সরল না। চলে আসুন।

টেলিফোনের তারের মধ্য দিয়েই বিনায়ক প্যাটেলের আনন্দ উপছানো মুখখানা যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। গলার স্বর আরো উৎফুল্ল, বিস্ময়াপ্লুত।—থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, আমি ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই উড়ে চলে যাচ্ছি।

বারো মিনিট করুন, কাউকে চাপা দিয়ে বসলে কোর্টের হাত থকে আপনিও রেহাই পাবেন না।

ছয়

সেই শুরু। সত্যিকারের অভিনয়ের সেখানেই শুরু।

এক মানুষের রুদ্ধ আবেগ আমার যৌবন তটে যত বেশি আছড়ে পড়তে চেয়েছে, আমি ততো সহিষ্ণু, ততো বেশি উদার প্রসন্ন শক্তির আধার। আমার আচরণে রমণীর পরিতুষ্ট প্রশ্রয় আছে, চপল প্রগল্‌ভতা নেই। আমার ঠোঁটের কোণে আর চোখের কোণে হাসি ঝিলিক দেয়, কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রভাব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। আমি সদয় বটে, কিন্তু হাত বাড়ালেই সহজলভ্য নই।

ওই লোককে আমার পাগল করে দেবারই ইচ্ছে, উচ্ছৃঙ্খল হতে দেব না।

...হ্যাঁ, দিনে দিনে ছেলেমানুষ হয়ে উঠছে আর পাগল হয়ে উঠছে। একে একে চারটে মাস কেটে গেছে। দিনে দিনে সে কাছে এসেছে, আরো কাছে আসতে চেয়েছে। আমি তাকে বাধা দিইনি, আবার দু' হাত বাড়িয়ে একেবারে শেষের গণ্ডীটুকু পার হয়ে আসার মতো প্রশয়ও দিইনি।

...কোর্ট থেকে একটু আগে বেরুতে পারলে গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা স্টুডিওতে এসে আমাকে তুলে নিয়ে যায়। হোটেল রেস্তোরাঁয় একটু খাওয়া-দাওয়া সেরে যেদিকে খুশি গাড়ি ছোটে। কখনো মেরিন ড্রাইভ, কোনোদিন মালাবার হিল্‌স, কখনো জুহু বীচ, কোনোদিন পাওয়াই লেক, কখনো চার্চগেট থেকে বোরিভিলিতে লম্বা পাড়ি, কোনোদিন বা ভিক্টোরিয়া টারমিনাস থেকে বান্দ্রায়। ঠিক পরিকল্পনা মতোই হিসেব করে পা ফেলে তাকে টেনে আনছি আমি। আরো অনেক অনেক কাছে আসতে দিতে হবে তাকে এটা জানি বলেই। যেদিন তার একতলার চমৎকার বাংলোয় ধরে নিয়ে যায়, সে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে হাঁস-ফাঁস করতে থাকে। কারণ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তেমন নেই। হোটেলে লাঞ্চ ডিনার সারে। একটা মাত্র পার্টটাইম বেয়ারা। আমি তখন সামনের সুন্দর ছোট্ট বাগানটুকুর ধারে বসে থাকি। পিছনে এসে সেও চুপ করে দাঁড়ায় একসময়। বাগানের ফুল দেখে কি আমাকে দেখে তাও পিছন ফিরে না তাকিয়েই আমি অনুভব করতে পারি।

এই চার মাসের মধ্যে রমেশ সামতানির কথা এক এক সময় আমার মনে হয়নি এমন নয়। কিন্তু কোনো দুর্বলতা বিবেকের কোনো দংশন আমি ধারে কাছে ঘেঁসতে দিই না। এর মধ্যে তাকে বঞ্চিত করার কোনো প্রশ্ন নেই। তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা বোধ আছে। আমি শুধু একটা সুপরিকল্পিত কাজ নিয়ে আছি, যেটা সফল হলে আমার ধারণা, আমার মায়ের শান্তি আমার বাবার শান্তি। সব থেকে বেশি আমার শান্তি তো বটেই।

এর মধ্যে একদিন সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, হরিহরদা বলছিল, এই ফিল্মলাইনে এসে একেবারে হিরোইন হয়ে বসার পিছনে তোমার কে একজন নাকি খুব শাঁসালো মুরুব্বি আছে?

চোখে চোখ রেখে আমি নেড়েছি, আছে।

তার স্বাভাবিক কৌতূহল।—কে বল তো?

রমেশ সামতানি।

ভাবল একটু।—সেই যাকে এরোড্রামে সী-অফ করতে গেছিলে?

হ্যাঁ। ... আমার বাবার আমলের লোক। বয়সে বছর চৌদ্দ বড় আমার থেকে, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, তার স্নেহ ভালোবাসা না পেলে আজ কোথায় দাঁড়াতাম ঠিক নেই।

আমার দিকে চেয়ে অকৃত্রিম সরলতাই দেখেছে বিনায়ক প্যাটেল। নিশ্চিন্ত হয়েছে।

...তারপর একদিন। স্টুডিও থেকে ঘরে ফিরে দেখি আগে ভাগে সে এসে বসে আছে। গম্ভীর রাগ রাগ মুখ। খুশি মেজাজে থাকলে ওই মুখই কাঁচা আর তাজা দেখায়। কিন্তু রাগলে বা সঙ্কল্পবদ্ধ হলে চোয়াল থেকে চিবুক পর্যন্ত শক্ত কঠিন হয়ে ওঠে। সেই ভয়াবহ মুখ আমার দেখা আছে। কিন্তু এখন মানুষটার মনের অবস্থা টের পেলেও ভিতরে আমার ভয়-ডরের লেশমাত্র নেই।

কি ব্যাপার?

উঠে দাঁড়াল।—এসো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আমার বাড়ি।

হল কি?

গেলেই দেখবে। এসো।

জামাকাপড় বদলাবার অবকাশ দিল না। টেনে নিয়ে চলল। তার বাড়িতে। তারপর তার নিজের ঘরে। বিছানার ওপর দুটো শস্তা মার্কা সিনেমা পত্রিকা পড়েছিল। পাতা খোলা আর উপুড় করা। একটা টেনে নিয়ে আমার চোখের সামনে ধরল। কেচ্ছা ছড়িয়ে দু'পয়সা কামায় সেই রকম কাগজ এ দুটো।

নবাগত সুন্দরী চিত্রতারকা সুজাতা পাণ্ডুরংয়ের সঙ্গে কোন্ নামী তরুণ ব্যারিস্টারের সঙ্গে দহরম-মহরম চলছে সেই মুখরোচক খবর। দ্বিতীয় কাগজটার খবরও তাই। বোম্বাই শহরের হরেক-রকম জায়গায় দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায়। তার সঙ্গে একটু টিপ্পনী, অমুক তরুণ ব্যারিস্টারের সঙ্গে সুন্দরী চিত্র-তারকা এরকম ঘনিষ্ঠতা দেখে ও লাইনের কোনো পয়সাওলা বিশিষ্ট-জনের বুক ফাটছে কিনা সেটাই এখন ছবির জগতে গবেষণার বিষয়।

পড়া শেষ করে আমি তাকালাম তার দিকে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ফাটল দেখা গেল কি গেল না।

কাগজ দুটো বিছানায় আছড়ে ফেলে সে বলে উঠল, এদের নামে আমি ডিফার্মেশন স্যুট্ করব।

জিজ্ঞাসা করলাম, স্যুট ফাইল করে ঘনিষ্ঠতা আছে সেটা অস্বীকার করবে?

তা না, এদের এই নোঙরা ইঙ্গিতগুলো মানহানিকর। তোমার রাগ হচ্ছে না?

মুখের দিকে চেয়ে হাসছি অল্প-অল্প। মাথা নাড়লাম, রাগ হচ্ছে না।

স্কুলের গোঁয়ার ছেলের মতো সে জিজ্ঞাসা করল, কেন রাগ হচ্ছে না?

আমাদের নিয়ে এ-রকম লেখা হয়েই থাকে। তুমিও এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোর না, কাদা ছোঁড়াছুঁড়িই সার হবে, তখন এ লাইনের বড় বড় কাগজগুলোও আমাদের দিকে ঘুরে তাকাবে।

ঘরের মধ্যে একদফা অসহিষ্ণু পায়চারি করে নিয়ে আবার সামনে দাঁড়াল।—তুমি বুঝছ না, সৎ ব্যারিস্টার হিসেবে আমার এত নাম যে সামনের তিন চার মাসের মধ্যে গভর্নমেণ্ট খুব সম্ভব আমাকে স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল হিসেবে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেবে, কিন্তু নৈতিক চরিত্র নিয়ে এ-ভাবে আলোচনা হতে থাকলে মুশকিলে পড়ে যাব।

ব্যাপারটা স্পষ্ট হল না।—স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল কি জিনিস?

এ লাইনে একটা মস্ত সম্মানের পোস্ট। গভর্নমেণ্ট রিটেনার্স ফী দেবে আবার প্রত্যেক কেসে আমার যেমন ফী তেমনি দেবে—কেবল সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কেসে দাঁড়াতে পারব না। এ-রকম সম্মানের পোস্ট পেতে হলে যোগ্যতার আর সুনামের প্রশ্নটাই বড়, নীতিগত আদর্শে দাগ পড়লে মুশকিল।

আমি দেখছি। চোখে পলক পড়ে না।—তাহলে সময় থাকতে সরে পড়।

সরে পড়ব মানে! পছন্দমতো কাউকে ভালোবাসার অধিকার নেই নাকি আমার!

ফিল্ম আর্টিস্টকে ভালোবাসার অধিকার আছে?

হাজার বার আছে?

তাহলে তুমি ভাবছ কেন...রটনার সুযোগ দিচ্ছ কেন?

বা রে, কাগজে ছাপলে আমি আটকাব কি করে, সেই জন্যেই কেস্ ঠুকে দেবার কথা ভাবছি।

তেমনি অপলক চেয়ে আছি। আমার ঠোঁটের ফাঁকের হাসি আরো স্পষ্ট। দু'হাতে তার দুই বাহু ধরে নিজের দিকে ফেরালাম।— লোকে কতদিন আর রটিয়ে মজা পায়, ওদের মুখ বন্ধ করার রাস্তাটা তোমার চোখে পড়ছে না?

কি বললাম মাথায় ঢুকছে যেন এতক্ষণে। চোয়াল আর চিবুকের কঠিন রেখাগুলো নরম হতে হতে মিলিয়েই গেল। চোখে হাসির আভাস চিকচিক করতে লাগল। নতুন করে আবিষ্কারের আনন্দ যেন।

তারপর...তারপর দু'হাতের যে লম্বা আঙুলগুলোকে অনেকদিন ধরে ঘৃণা করেছি, সেই আঙুলগুলো আমার দুদিকের পাঁজরের পাশের লোহার মতো চেপে বসতে লাগল। যে দুটো পুরু ঠোঁট আমার অনেক রাতের দুঃস্বপ্ন সেই দুই ঠোঁট অফুরন্ত তৃষ্ণায় আমার দুই অধরে এঁটে বসতে লাগল।

...আর আমি? মেয়ে মাকড়সার মতো একজনকে জালে আটকেছি। আমার চোখে মুখে বুকে দুই বাহুতে আর দু'হাতের দশ আঙুলে প্রশ্রয়ের নিবিড় জাল বিছানো। তাই যতখানি তৃষ্ণা তার নিবিড় আকর্ষণে এই নিথর দীর্ঘ মুহূর্তগুলোকে তার থেকে বেশি ভরাট করে দিতে চেয়েছি।

প্রাপ্তির এক অনিঃশেষ গভীরে ডুব দিয়ে অনেক, অনেকক্ষণ বাদে যেন নিজের মধ্যে ফিরে এলো সে। ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর কাঁধের ওপরে আবার দু'হাত রেখে পরম যত্নে নিজের

বিছানার ওপর বসাল আমাকে। ঝুঁকে আবার ঠোঁটে আর দুই গালে পাঁচ সাতটা ছোট ছোট চুমু খেয়ে নিল।

তারপর আবার দেখতে লাগল। মুখে সেই কাঁচা লাজুক-লাজুক হাসি। যে কোনো মেয়েরই ভালো লাগার কথা, সুন্দর লাগার কথা।

বলল, এই প্রথম ছবিটা শেষ হওয়ার আগে তুমি বিয়েতে রাজি হবে আমি ভাবিনি, আর কোনো চিন্তা ভাবনা নেই আমার।

আমাকে আবার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে বাতাস সাঁতরে ফিরে গেছে সে।

আমি দোতলায় এসে সোজা স্নানের ঘরে ঢুকেছি। সেই জামা-কাপড় পরা অবস্থাতেই মাথার ওপরে শাওয়ার পুরোদমে খুলে দিয়েছি। কতক্ষণে সেই স্নান শেষ হয়েছিল আমার হিসেব নেই।

বিনায়ক প্যাটেলের বাবা নেই, মা আছে। সেই মা বোরিভিলিতে তার এক বড় বোনের কাছে থাকে। সেই মাসিও বিধবা এবং নিঃসন্তান। শহর ছড়িয়ে সেই দূরের উপকণ্ঠে মস্ত বড় বাড়ি তার। তারও অবস্থা ভালো, টাকা পয়সা আছে কিছু। ওইসব কিছুরও ভবিষ্যৎ মালিক তার আদরের বোনপো বিনায়ক প্যাটেল। মা প্রায় বারো মাসই সেই বড় বোনটির কাছে থাকে। সপ্তাহের ছুটি-ছাটাতে ছেলে মা আর মাসির কাছে যায়। কাজ থাকলে সেই দিনই ফিরে আসে নয়তো পরদিন। মা ক্বচিত কখনো ছেলের বাড়িতে আসে, কিন্তু থাকে না বড় একটা। শহরে তার হাঁফ ধরে যায় নাকি।

বিনায়ক প্যাটেলই বলেছে, তার মা আর মাসি একাত্ম হলেও স্বভাবে বিপরীত। মা গম্ভীর একটু, কিন্তু মাসিটি সুরসিকা।

এই মা আর মাসিকে দেখানোর তাগিদে গাড়ি হাঁকিয়ে আমাকে নিয়ে চলেছে। যাওয়া আরো দরকার এই কারণে যে আসন্ন বিয়ের ব্যবস্থাও পাকা করে আসতে হবে। এ ব্যাপারে মা-মাসি যেমন বলবে সেই রকমই ব্যবস্থা হবে।

ছুটির দিনের উপকণ্ঠের নির্জন রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটেছে। আকাশ মেঘলা একটু, ফলে এই ট্রিপ আরো উপভোগ্য হবার কথা। আমি আড়চোখে থেকে থেকে দেখছি তাকে। আনন্দে টইটুম্বর মুখ। একসময় জিজ্ঞাসা করলাম, একজন অভিনেত্রীকে বিয়ে করতে যাচ্ছ শুনলে তোমার মা-মাসি কি বলবেন?

কিছুই বলবে না। দেখবে চেয়ে চেয়ে।

আপত্তি হবে না?

জবাবে টুক করে একটা চুমু খেয়ে নেওয়ার চেষ্টায় স্টিয়ারিং ঘুরে যাবার ফলে গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে মাঠে ওঠার উপক্রম। সামলে নিয়ে হাসতে হাসতে জবাব দিল, আমার মা আর মাসি আমার বউই শুধু দেখবে, আর কিছু দেখবে না। এ ব্যাপারে আমার ওপর তাদের অটুট আস্থা।

মস্ত বাড়ির দরজায় গাড়িটা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে লোনাভালার বাড়িটার কথা মনে পড়ে গেল আমার। সে-বাড়ি এর থেকে ঢের বড় হলেও অনেকটা এই রকমই স্নিগ্ধ নির্জ পরিবেশ। সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক বিস্মৃতির রেশ কাটল। বাইরে প্রকাশ না পেলেও ভিতরের নরম মনের ওপর একটি কঠিন আবরণ পড়ে গেল।

আমাকে সঙ্গে করে ভিতরে পা দিয়েই ছোটছেলের মতো চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল লোকটা।—মা! মাসি! জলদি! দু'জন মহিলা ঘরে এসে দাঁড়াতেই ঝুপ ঝুপ প্রণাম সারল। তারপর আঙুল তুলে আমাকে দেখিয়ে বললে, যা দেখার খুব ভালো করে দেখে নাও—এর পর আর টুঁ শব্দটি করলে চলবে না! বাতিল করতে হয় তো এক্ষুনি কর। হেসে আমার দিকে ফিরল, এই মাসি আর এই মা।

নম্র বিনয়ে দুজনকেই একে একে প্রণাম করলাম। দুজনেই তারা নির্বাক খানিক। দেখছে আমাকে।

মাসিরই বাকস্ফুরণ হল প্রথম। —খাসা জিনিস দেখি যে রে, অ্যাঁ! কার মেয়ে রে? কোথা থেকে জোগাড় করলি?

তার মায়ের মুখেও মৃদু হাসি।—দিদির কথার ছিরি দেখ। এগিয়ে এসে আমার চিবুক তুলে ধরলেন। খুব সুন্দর, নাম কি তোমার মা?

সুজাতা।

মাসির তরল উচ্ছ্বাস আবার।—সুজাতাই বটে! তুই তো দেখি কম নোস ছোঁড়া, আমাদের এত তাগিদের পরেও এ-রকম একজন ধরে আনবি লে ঘাপটি মেরে বসে ছিলি!

মা-টি আবারও হাসি মুখেই সতর্ক করল তাকে, আসা মাত্র তুমি এমন করে বলছ দিদি, মেয়েটা না ঘাবড়ে যায়।

হ্যাঃ তোরও যেমন, মাসিরও তক্ষুনি হালকা প্রতিবাদ, আমাদের এই ছেলেকে ঘায়েল করতে পেরেছে যে মেয়ে সে আবার এত সহজে ঘাবড়াবে। এগিয়ে এসে হাত ধরে টানল, এস গো মেয়ে, মুখ হাত ধুয়ে আগে কিছু খেয়ে নাও, তারপর নিজের ঘরদোর বুঝে নাও, তারপর যত খুশি ভক্তিশ্রদ্ধা করগে তোমার ওই শাশুড়িকে, আমি বাপু কি করে ও ছেলের ধ্যানভঙ্গ হল শুনে তবে ছাড়ব।

তাদের ছেলে আমাদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে ভুরু নাচালো একটু। অর্থাৎ মাসির কথা বলেছিলাম কি-না?

এত বড় বাড়িতে দুটি মাত্র প্রৌঢ়া প্রাণী, জনা দুই ঝি আর একটা বয়স্ক চাকর। আমরা আসার খানিকক্ষণের মধ্যে এই নির্জন বাড়িতে যেন আনন্দের হাট বসে গেল। ওই মা-মাসি দুজনকেই আমার ভালো লেগেছে।...ভালো লেগেছে বলেই ভিতরে কি একটা অস্বস্তির বোঝা। আমার নির্মম সংকল্পের জগতে কারো কোনো মা-মাসির অস্তিত্ব ছিল না। এখনো দুনিয়ায় আর কারো ওপরেই এতটুকু রফা নেই আমার। যত ক্ষোভ আর যত বিদ্বেষ শুধু একজনের বিরুদ্ধে।

আমার মধ্যে মানুষ বশ করার কোনো সহজাত প্রবণতা আছে কিনা জানি না। দুপুরে ওই দুই মহিলার খাওয়া-দাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছ ছেড়ে নড়লাম না। তাদের জন্যে দুই একটা ব্যঞ্জনও রাঁধলাম। রান্নার হাত আমার খারাপ নয়। মা-টি'র প্রসন্ন মুখ। আর মাসি বলল, অমৃত খেলাম।

তাদের ছেলেটি চতুরও বটে। ঠিক এই প্রসন্ন মুহূর্তটিতে বলল, তার ওপর যদি শোন বউ তোমাদের জুনাগড় ইউনিভার্সিটির হাই সেকেণ্ড ক্লাস এম.এ?

মায়ের মুখে খুশির ঝিলিক লক্ষ্য করলাম। মাসির বিস্ময়াপ্লুত উচ্ছ্বাস। —তাই নাকি, কিন্তু কি আশ্চর্য, এত পাস দেখে বোঝার উপায় নেই! রয়ে সয়ে ছেলে এবারে দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটাল—আরো খবর আছে। মা শোন, মাসি শোন, শুধু এম.এ. পাস নয়, ওর অভিনয়ের ঝোঁকও খুব। এই প্রথম একটা ছবিতে অভিনয়ে নেমেছে...খুব ডিগনিফায়েড রোল, ...আর মাসির কথায় আমিও তাই দেখেই প্রথম, যাকগে, আর বলব না—

মা থমকে তাকালো, মাসির গলায় অস্ফুট উক্তি, ও মা, বলিস কি রে!

একটু থেমে মা জিজ্ঞাসা করল, কোন্ ছবিতে নেমেছে?

ছেলে ছবির নাম বলল।

এ ছবি শেষ হলে বিয়ের পরেও আবার ছবিতে নামবে?

একটু থমকে ছেলে জবাব দিলে, আমার মনে হয় মা এ-ব্যাপারটা ওর ওপরেই দেওয়া ভালো, ভালো লাগে করবে, না লাগে করবে না।

মাসি বলে উঠল, সেই ভালো, ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই।

এরপর বিশ্রামের জন্যে আমাকে আর এক ঘরে পাঠিয়ে তারা বিয়ের আলোচনায় বসল। খানিক বাদে তার ফলাফলও জানা গেল। ছেলে আচমকা ঘরে ঢুকে বেশ বড়সড় একটা চুমু খেয়ে অনেকক্ষণের তৃষ্ণা মেটাল যেন। তারপর ব্যবস্থার কথা শোনাল। মা-মাসি দু'জনের কেউ ছেলের ইচ্ছেয় আপত্তি করেনি। রেজেস্ট্রি বিয়ে হবে। তারপর এখানে ফুলশয্যা। বোম্বাইতে ফিরে এসে বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণের ব্যবস্থা। মা-মাসি দু'জনেরই তো ব্লাডপ্রেসার, শেষের ওই হৈ-চৈয়ের মধ্যে তারা থাকতে পারবে না।

বিকেলে জলযোগের পর ফেরার কথা আমাদের। বেশ-বাসের উদ্দেশ্যে একটা ছোট ঘরে ঢুকতে পিছনের বারান্দা থেকে মাসি আর বোনপোর একটু সরস আলোচনা কানে এল আমার।

মাসি বলছে, যা হয়েছে বাপু চমৎকার হয়েছে, ওই যে এক উকিল মেয়ে এনে দাঁড় করিয়েছিলি, কল্পনা দেশাই, তার থেকে বলব ঢের ঢের ভালো হয়েছে।

বোনপোর প্রতিবাদ, বা রে, আমি আনলাম কোথায়, তোমাদের বশ করার জন্যে বরং সে-ই আমাকে ধরে এনেছিল!

মাসি বলল, যা-ই হোক এনেছিলি তো, আমরা ভাবলাম সেখানেই মজে গেলি।

যাক বাবা, তুমি এখন থাম, কি শুনতে কি শুনে ফেলবে, তোমরা খুশি, ব্যস।

...কল্পনা দেশাই, নামটা কার মুখে শুনেছিলাম? মনে পড়ল হরিহর শর্মা।

ফেরার পথে বিনায়ক প্যাটেল জিজ্ঞাসা করল, মা-মাসিকে কি রকম লাগল বল।

জবাব দিলাম, খুব ভালো এত ভালো ভাবিনি।

মনে মনে সত্যিই এদের কথাই ভাবছিলাম আমি। এত ভালো বলেই ভিতরে ভিতরে সেই অস্বস্তি। এমন কি পাশের লোককেও যা দেখছি তার সঙ্গেও বাবার সেই দুঃসহ ঘটনার যোগ না থাকলেই যেন ভালো হত। বাবার কথা মনে হতেই আমার কোমল দিকটা কঠিন আবার।

...হ্যাঁ, শত্রুতা আমার এই একজনেরই সঙ্গেই। কোনোদিন একে আমি ক্ষমা করতে পারব না। কোনোদিন না।

বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। বোম্বাইয়ের স্টুডিও মহলে খবরটা গোপন থাকল না। প্যাটেল হরিহর শর্মাকে এত বড় খবরটা না জানিয়ে থাকতে পারে কি করে? আর হরিহর শর্মা জানলে কারো আর জানতে বাকি থাকবে না।

চলতি ছবির চৌদ্দ আনা কাজ শেষ প্রায়। পরিচালক আর প্রযোজক প্রায়ই ছবির প্রোজেকশান দেখে। হরিহর শর্মা আমার পিঠ চাপড়ায়—সুপার সুপার হিট ছবি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

এই সুপারহিট ছবির খবর বম্বের আরো প্রযোজকের কানে গেছে। ফলে এরই মধ্যে দু-দুটো ব্যাপার ঘটে গেল। প্রথম, একজন নামী প্রযোজক আমার কাছে এসে হাজির, তার একটা ছবির জন্যে কনট্রাক্ট সই করিয়ে নিতে চায়। আগে যা তুচ্ছ করা গেছিল এখন আর তা পারা গেল না। যে ব্যাপারে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে কি আছে আমার অদৃষ্টে কে জানে। এমন কি রমেশ সামতানিও ফিরে এসে আমাকে ভুল বুঝতে পারে। তাছাড়া এই প্রযোজকটিও নামী। দু' লাখ টাকা পর্যন্ত দেবে এই সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিল, আমার সঙ্গে আধঘন্টা কথাবার্তার ফলে অনায়াসে সেই অঙ্ক তিন লাখে উঠে গেল। কনট্রাক্ট সই হল, নগদে আর চেকে বেশ মোটা টাকা অ্যাডভান্স করে গেল সে। দ্বিতীয় ব্যাপারটাও প্রায় অনুরূপ। আমার বর্তমান প্রযোজকটি আমার বিয়ের কথা শুনে একটু চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। রমেশ সামতানি এখানে নেই, এদিকে বিয়েটা হয়ে গেলে আর আমাকে ছবির জগতে পাওয়া যাবে কি যাবে না। অতএব সে বাড়িতে এসে হাজির, তার পরের ছবির জন্যে একটা সস্তার কনট্রাক্ট সেরে নেবার জন্যে। বিনায়ক প্যাটেলও তখন আমার ঘরে বসে। প্রযোজক আসা মাত্র আমি তার উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েছি। তার ইতস্তত ভাব দেখে বিনায়কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, আপনার যা বলার এঁর সামনে অনায়াসে তা বলতে পারেন।

অগত্যা বিনায়কের সামনেই প্রযোজক তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। শুনে আমি হাসতে লাগলাম, এত তাড়ার কি আছে, এ ছবি রিলিজ হোক না।

ছবি রিলিজ হয়ে গেলে দাম কত চড়বে সেটা তার থেকে ভালো আর কে জানে। একটা অন্তত কনট্রাক্ট সই করার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

নিরুপায় মুখ করে বিনায়কের দিকে ফিরলাম আমি।—তুমি কি বল?

বিনায়ক জবাব দিল, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।

অগত্যা প্রয়োজককেই জিজ্ঞাসা করলাম, কততে সই করতে বলছেন?

প্রযোজক এবার নড়ে চড়ে বসল, তুমি বল।

একটু ভেবে আমি বললাম, সাড়ে তিন লাখ।

শুনে প্রযোজকের থেকেও বিনায়ক বোধহয় বেশি চমকে উঠেছিল।

প্রযোজক বলল, এ ছবির ফেট তো এখনো জানো না, এত চাইলে হবে কি করে?

তেমনি হেসেই আমি জবাব দিলাম, ছবির ফেট তাহলে দেখেই নিন না, আর রমেশ সামতানিও ততদিনে এসে যাবে নিশ্চয়।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আর বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়ে পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে কনট্রাক্ট ফর্ম বার করল।—সই কর।

সই হল। এখানেও নগদে আর চেকে মোটা টাকা অ্যাডভান্স হাতে এলো। ভদ্রলোক চলে যাবার পরেও বিনায়ক নির্বাক কিছুক্ষণ। টাকাটা চোখের সামনে দেখেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।—এ লাইনে এই ব্যাপার?

আমি হেসে মাথা নাড়লাম।—এই ব্যাপার।

সাত

দিন যত এগিয়ে আসছে আমার ভিতরটা তত কঠিন হয়ে উঠছে। চেষ্টা করেও আগের মতো ওই লোকের সামনে হাসি ছড়াতে পারি না, খুশি ছড়াতে পারি না। নিজের আনন্দে বিভোর ওই একজন, তাই টের পায় না। তাছাড়া বিয়ের পর বোরিভিলিতে মা-মাসির কাছ থেকে ফিরে এসে এখানকার উৎসবের ব্যবস্থাটা সেরে রাখার চিন্তায় ব্যস্ত। কোর্টের কেসের চাপে বেশি দিনের ছুটি নেবারও উপায় নেই।

তারপর সেই দিন...। যেদিন আমি সুজাতা প্যাটেল।

বেলা এগারোটার মধ্যে রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেল। আমরা দুজন সেখান থেকেই গাড়িতে বোরিভিলির দিকে রওনা হয়ে গেলাম। সহেলির ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে আসে। পাশের লোক বলা সত্ত্বেও আমি আনি নি। দিন কয়েকের ছুটি দিয়ে তাকে তার গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে বলেছি।

গাড়ি ছুটেছে। পাশের লোকের উদ্ভাসিত মুখ বার বার আমার দিকে ঘুরছে। আমার সব থেকে কঠিন কাজ এখনো বাকি। অথচ অদ্ভুত অবসন্ন লাগছে ভিতরটা। ভয়ংকর রকমের একটা ধকলের পর যে-রকম অবসাদ আসে। সামনের দিকে চোখ রেখে আমি স্থির বসে আছি।

কি ভাবছ বল তো, অত গম্ভীর কেন?

শরীরটা ভালো নেই।

স্টিয়ারিং হাতে ঘুরে দেখল একটু।—আসলে তোমার মন ভালো নেই।

কি ভাবছ সত্যি করে বল...বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ছে বোধহয়? এতক্ষণের অবসন্ন স্নায়ুগুলো সব এক লহমায় টান টান হয়ে উঠল বুঝি। রক্তকণাগুলো আগুন হয়ে উঠতে চাইল। মুখ ঘুরিয়ে সোজা তার মুখের দিকে তাকালাম। অনুচ্চ গলায় বললাম, খুব মনে পড়ছে।

আজকের দিনে মনে পড়ারই কথা, আমারও নিজের বাবাকে মনে পড়ছে খুব।

মাথার মধ্যে কি যে হতে থাকল আমার জানি না। কি করব এখন? এই মুহূর্তের মধ্যে সব কিছুর ফয়সলা করে ফেলব?

কিছুই করলাম না। ভিতরটা ধারালো ছুরির ফলার মতো হয়ে উঠছে।

পৌঁছুলাম। মা-মাসি বউ বরণ করল। রেজিস্ট্রি বিয়ে হোক আর যাই হোক, তাদের অনুষ্ঠানে তারা ত্রুটি রাখবে কেন? যত সময় নেয় তত যেন ভালো।

দিনটা তাদের হৈ-চৈয়ের মধ্যে কাটল এক-রকম করে। এখন রাতের চিন্তা। কিন্তু আজকের রাতের চিন্তা থেকে মাসি অব্যাহতি দিল আমাকে। ভ্রূকুটি করে তাদের ছেলেকে বলল, পিছন পিছন অত ঘুরঘুর করছিস কি, আজ কালরাত্রি খেয়াল আছে? বউ আজ আমাদের কাছে থাকবে, কাল একেবারে ফুলশয্যের রাতে পাবি—যা ভাগ্ এখান থেকে।

ভয়ানক অসবন্ন লাগছে কেন তবু? নিশ্চিন্ত বলে? কাল ফুলশয্যা...তবু কালই বা অত দুশ্চিন্তা কিসের। পুরুষকে দু-চার দিনের মতো নিরাপদ ব্যবধানে রাখার অব্যর্থ অজুহাতে মেয়েদের কিছু আছে। এখানে না, সঙ্কল্পের চরম ফয়সলা যা হবার পালি হিলের বাংলোয় গিয়ে হবে। সেখানকার বড়-আশার উৎসবের আগেই হবে। এই মা-মাসিকে এতটুকু আঘাত দিতে চাই না।

পরদিন। সকাল দুপুর বিকেল গড়িয়ে ফুলশয্যার রাতও এল।

ফুলে ফুলে ঘরের দেয়াল দেখা যায় না, শয্যাও ফুলে আর ফুলরেণুতে একাকার।

কিন্তু আমার মগজের ছকে-বাঁধা পরিকল্পনাটার আকস্মিক দিন-বদল হয়ে গেল।

ঘর থেকে মা আগেই চলে গেছিল, মাসিও যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে থামল। বলল, তোর বোম্বাইয়ের পার্টি-ফার্টি শেষ হলেই পনেরো বিশ দিনের জন্যে বউকে নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আয়।

আমি পালঙ্কের একটা ফুল মোড়া বাজু ধরে দাঁড়িয়ে। মাসির কথা শুনে ওই একজন হাসি মুখে মাথা নাড়ছে। বলল,-এখন হবে না, কাজের চাপ খুব।

কাজ-কাজ করেই গেলি তুই, বিয়ের খাতিরেও ছুটি নিতে পারিস না?

এখন হবে না, পরে ছুটি নিয়ে বেরুব। হাসছে।—এখন সরে পড় তো।

মাসিরও হাসি মুখ।—যাচ্ছি, যাচ্ছি, আচ্ছা বেহায়া তুই বাপু।

ঘর ছাড়তেই সে দরজা বন্ধ করল।

আর সেই মুহূর্তেই মাথার মধ্যে কি যেন হয়ে গেল আমার, শরীরের রক্ত যেন দাপাদাপি করে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। চোখাচোখি হতেই অনুচ্চ কঠিন সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন বেরুনো হবে না কেন?

বা রে, মাথার ওপর একটা ইম্‌পর্ট্যান্ট কেস্ ঝুলছে বলেছিলাম না?

কেসটা কার কাছে ইম্‌পর্ট্যান্ট?

সকলের কাছেই।

তুমি আসামীর পক্ষ না উলটো পক্ষ?

উলটো পক্ষ। সুর বদল আর ভোল বদল দেখেও অভিনেত্রী বউয়ের নতুন ধরনের রসালাপ ভাবছে। আমার দু'চোখে আগুন ঠিকরোল কিনা আমি জানি না।—তোমার আসামী দোষী না নির্দোষ?

আমার বিবেচনায় দোষী তো বটেই। নির্দোষ মনে হলে আমি সর্বদা তার হয়েই লড়াই করে থাকি।.. কিন্তু তোমার হল কি হঠাৎ?

তখনো দু'চোখে তার কাছে আসার লোভ চিকচিক করছে। ক্ষিপ্ত হাতের টানে মাথার ঘোমটা খসে গেল আমার। গলার স্বর এখনো চাপা কিন্তু তীক্ষ্ণ।—বিবেচনা! তোমার বিবেচনা? কতটুকু বিবেচনার শক্তি তোমার? কি দেখে বিবেচনার ওপর এত নির্ভর তোমার?

বিষম হকচকিয়ে গেল। —সুজাতা! আজকের দিনে আবার কি হল তোমার?

হ্যাঁ আমি সুজাতা। সুজাতা বীরকর ছিলাম, তোমার বিবেচনার দাপটে মায়ের পদবী আঁকড়ে সুজাতা পাণ্ডুরং হয়েছিলাম, আর আজ সুজাতা প্যাটেল।

বিমূঢ় মুখে চেয়ে আছে। এক বর্ণও মাথায় ঢোকেনি এখনো। —তার মানে?

পাগলের মতো রাগ চড়ছে আমার।—তার মানে তোমার দাম্ভিক বিবেচনার ওই লম্বা লম্বা আঙুল নেড়ে আর মোটা ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কোনো অসহায় মানুষকে যুক্তির জালে আটকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দাওনি তুমি?

কপালে ঘাম দেখা দিচ্ছে একটু একটু। এ কাকে দেখছে ভেবে পাচ্ছে না যেন। ব্যাকুল মুখে সামনে পা বাড়ালো। —সুজাতা, কি হয়েছে তোমার? আজকের দিনে এসব কি বলছ তুমি?

ডোণ্ট টাচ্ মি! দু'পা সরে গিয়ে ছুরির ফলার মতোই আবার একটা কোপ বসালাম।—আই হেট ইউ, আই অলওয়েজ হেটেড্ ইউ! আর সেইজন্যেই আজকের এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম আমি। লোনাভালার বসন্তরাও বীরকরকে জেলে পাঠিয়ে গর্বে আর আনন্দে খ্যাতির চুড়োয় ওঠনি তুমি?

কপালের ঘাম আরো বাড়ছে।...তুমি, তুমি তাহলে লোনাভালার সেই বসন্তরাও বীরকরের মেয়ে?

হ্যাঁ, খুব ভালো করে শুনে নাও, আমি সেই লোনাভালার বসন্তরাও বীরকরের মেয়ে। তোমার জয়ের বিচারের রায় শুনে সেদিনই আমার অসুস্থ মা হাহাকার করে ছুটে আসতে গিয়ে দোতলা থেকে সিঁড়ি টপকে পড়ে সেই সন্ধ্যাতেই রক্তাক্ত মৃত্যু ডেকে এনেছে, আর আমার নিরাপরাধ বাবা তোমাদের বিচারেই ওই বুক-ভাঙা আঘাতে অপমানে উনিশ দিনের মধ্যে সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা গেছে! দু'দুটো মানুষকে হত্যা করেছ তুমি—তোমার বিচার কে করে? কোন্ ফুলশয্যার জন্যে আমি তৈরি তুমি বুঝতে পারছ না?

শয্যায় বসে পড়ল আস্তে আস্তে। চেয়ে আছে। রক্তশূন্য মুখ—তোমার বাবা নিরপরাধ তোমাকে কে বলল? তিনি তোমাকে জানিয়ে শুনিয়ে এত বড় জালিয়াতির মধ্যে ঢুকবেন এ তুমি আশা কর কি করে?

শ্যাট আপ! আমার বাবাকে আমি চিনি না তুমি চেনো? তাকে চেনাবার জন্যে দিশেহারার মতো তোমার হোটেলে গেছিলাম, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে মনে নেই? আজ সেই তোমার সঙ্গে ফুলশয্যা হবে বলে মিসেস প্যাটেল হয়েছি—কেমন?

বিবর্ণ মুখের চোয়াল শক্ত হয়েছে, চিবুক শক্ত হয়েছে। আমি কেয়ার করি না, তাই দেখে আরো ফুঁসছি আমি।

সে বলল, সেই জবাব দেবার জন্যেই তাহলে অসুখের নামেও স্টুডিও কামাই করেছ তুমি...ঝি দিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছ, তারপরে এই শোধ নেবার জন্যে এতদিন ধরে এই অভিনয় করে গেছে...আমি যখন আদর করে কাছে টেনেছি ভিতরে ভিতরে তুমি তখন ঘৃণা ছিটিয়েছ আর ছুরি শানিয়েছ?

হ্যাঁ, খুব বুঝেছ। সব শুধু সেইজন্যেই, শুধু এই রাতটার জন্যেই।

ইউ ফাইন ডার্টি অ্যাকট্রেস!

ইউ প্রাউড স্লেভ অফল! এখন কোর্টে যাও, কোর্টে অ্যানালমেণ্ট চাও, আমি যা করতে চেয়েছিলাম করেছি, এখন তুমি কি করবে তাই ভাবো।

কপালের ঘাম মুছছে। মুখ বিবর্ণ পাণ্ডুর এখন। চেয়েই আছে। দেখছে। চোয়াল শক্ত। চিবুক শক্ত। দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে। হয়তো আমারও।

...ফুলশয্যার রাত ভোর হয়ে এলো। সে শয্যায় বসে। এক-একবার উঠে দাঁড়িয়েছে ঘুরেছে, আবার এসে বসেছে।

আমি ঘরের কোণে একখানা চেয়ারে বসেই আছি।

আবার উঠল। শয্যার দিকে চেয়ে দেখল। ফুল ছড়ানো তেমনি। কেউ শোয়নি দেখলেই বোঝা যাবে। এক হ্যাঁচকা টানে বালিশ সুদ্ধ বিছানার চাদরটা তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলল। দু'বার পায়চারি করে চাদরটা তুলে হেলাফেলা করে বিছানায় ছড়াল। বালিশ ক'টাও তুলে বিছানায় ছুঁড়ে মারল।

রাগে একটা দুরন্ত দুর্দান্ত ছেলের মতোই তছনছ করে ফেলতে চাইছে সবকিছু।

বেলা যত বাড়ছে মুখ তত ঠাণ্ডা কিন্তু তত কঠিন।

এক সময় দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই মা আর মাসি এলো। তাদের আদর যত্ন শুরু হয়ে গেল। এখানেই আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি। কোনো আপনার মা মাসির সঙ্গেই তফাৎ নেই তাদের।

প্রাতরাশের সময় মাসির গজগজ উক্তি শুনে কান খাড়া হল। ছেলের মাথায় ঢুকেছে আজই দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর রওনা হতে হবে, নইলে ওদিকের সব কাজকার্য পণ্ড। কেন রে বাপু, আর একটা রাত থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতিস, আগে তো সেই রকমই কথা ছিল।

আমি লক্ষ্য করলাম ছেলে ধারে কাছে নেই। দুপুরেই যাওয়া হবে শুনে স্বস্তি পেলাম একটু। ছেলের কাছে নয়, এদের কাছে যেন অপরাধী আমি।

যাবার আগে মাসি আমার হাত ধরল। প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে আসতেই হবে। অভিনেত্রী হয়েও ঠোঁটে সলাজ হাসি দেখাতে পারছি না আমি। বিনায়ক প্যাটেল মা মাসির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠল। তারপর আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ হেসে বলল, পড়লে তো ফ্যাসাদে? এখন সত্যি কথা বল—না মাসি, প্রত্যেক সপ্তাহে আসা হবে না, ওর ছবির শেষের দিকের কাজ চলছে—ক'টা মাস এখন আমিই কতক্ষণ দেখা পাই কে জানে। চল, আর দেরি না—

গাড়ি ছুটেছে। পাশাপাশি বসে আছি। এবারে ঘাড় মুখ ফিরছে না একবারও। সামনের দিকে চোখ। চোয়াল শক্ত চিবুক শক্ত।

ওখানকার পার্টি হবে কি হবে না?

আমি জানি না।

তোমার জানা দরকার। এই নোঙরা খেলা তুমিই শুরু করেছ। আমি মিথ্যে কথা বলি না, তোমার জন্যে মা-মাসির কাছে মিথ্যে বলতে হয়েছে।

এই রাগ আর এই অসহিষ্ণুতা দেখে আনন্দ পাচ্ছি। বললাম, মিথ্যে বলা আমারও অভ্যেস ছিল না—তোমার জন্যে শিখতে হয়েছে।

তোমার সবটাই মিথ্যে, সবটাই অভিনয়। শোন, তোমার আমার দু'জনের স্বার্থেই পার্টি হবে—দুজনে সর্বত্র একত্র হয়ে দু দিকের নেমন্তন্ন সারা হয়েছে। ভবিষ্যতের রাস্তা তারপর ঠিক হবে।

প্রতিশোধ নেওয়াটাই লক্ষ্য ছিল। কাম্য ছিল। পরের কথা মনে ঠাঁই পায়নি। স্টুডিও মহলেও এক্ষুনি আমাকে নিয়ে সাড়া না পড়তে দেওয়াটা আমারও স্বার্থ বটে। তারপর ঝাঁঝের উত্তরে আমি নির্লিপ্ত জবাব দিলাম হ্যাঁ, পার্টি হতে পারে।

সেখানে আমাদের আচরণে কেউ বুঝবে না কেউ কিছু জানবে না। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বাইরের কারো জানার দরকার নেই। আর একটিও কথা হল না। পালি হিলের বাংলোয় এসে উঠলাম। একটা সকালের মালী আর একজন পার্টটাইম বেয়ারা শুধু এখানে—বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখার ব্যাপারে কোনো অসুবিধে নেই। বাংলোয় পাশাপাশি তিনখানা বড় ঘর। সামনের বিশাল্ল হল ঘরটা লাইব্রেরি সহ বসার ঘর। তার পিছনে পর পর দু'খানা বেডরুম, দু'ঘরের মাঝে দরজা। বাইরে দিয়েও দরজা আছে। আর একদিকে ডাইনিং স্পেস। কালই সহেলির এই ঠিকানায় চলে আসার কথা। ডাইনিং স্পেসের ওপাশে আর একটা খুপরি ঘর আছে। সেখানে তার থাকার অসুবিধে হবে না। আজ থেকে তিন দিন পরে পার্টি। তারপর ভবিষ্যতের চিন্তা। সান্তাক্রুজের ফ্ল্যাট ছাড়িনি আমি।

পার্টির দিন আলোয় আলোয় বাংলোয় ঝলমল করে উঠল, বাগানের রূপ খুলল। বসার ঘরের আর লাইব্রেরি হলের আসবাবপত্র আগে থেকেই বদলানো হয়েছিল। সেগুলোও ঝকমক করতে লাগল।

সন্ধ্যার পর থেকেই অভ্যাগতরা আসতে লাগল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা তাদের উচ্ছল আপ্যায়ন জানালাম। এদিকে স্টুডিও মহলের বাকি থাকল না কেউ, ওদিকে বার এবং কোর্টের। যারা আগে দেখে নি আমাকে, তারা প্রকাশ্যেই পঞ্চমুখে কংগ্রাচুলেট করতে লাগল বিনায়ক প্যাটেলকে। সবুরের অর্থাৎ এতদিন বিয়ে না করার সুফলটা সে নাকি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সকলকে, এমন রসিকতাও করে গেল অনেকে।

বিনায়ক মিটিমিটি হেসেছে, বলেছে, দেখলে? তুমিই সব, আমি যেন কিছুই না। আমিও পরিতুষ্ট মুখেই সব গ্রহণ করেছি। আজই সব থেকে একাগ্র মনে সাজসজ্জা করেছি। তারপর আয়নায় যাচাই করেছি সহজে কেউ মুখ ফেরাতে পারবে কিনা। একজন অতিথি আসার আগেও ঘরের এই লোকই ফিরে ফিরে তাকিয়েছে অনেক বার। আমার মনে হয়েছে বুক থেকে তখন নিশ্বাস ঠেলে উঠেছে। সর্বনাশ যে দু'দিকেরই হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই।

...দূর সম্পর্কের ভগ্নিপতির বোন কল্পনা দেশাইও নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছে। মোটামুটি সুশ্রীই বটে মেয়েটা। চশমা দেখে চোখের পাওয়ার বেশি মনে হল। হাসিমুখে দু'জনকেই অভিনন্দন জানাল সে। কিন্তু আমাকে দেখে চশমার ওধারের চোখ দুটো খুশি হয়েছে মনে হয়নি। আমি সানন্দে তার হাত থেকে উপহার নিয়েছি, প্রচুর আদর যত্ন করেছি। বলেছি, তোমার কথা অনেক শুনেছি।

কল্পনা দেশাই জবাব দেবে কি দেবে না ভেবেছে। বলেছে, তোমাকে পাশে পাওয়ার পর আমার কথা কারো মনে হতে পারে বলে তো মনে হয় না।

শুনে বিনায়ক প্যাটেল মুখখানা কাঁচুমাচু করে ফেলেছে।

রাত এগারোটার মধ্যে সমস্ত অভ্যাগত বিদায় নিয়েছে।

আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত। একটা সোফায় বসে আছি। অদূরের একটা সোফায় সে। ধকল তারও আমার থেকে বেশি ছাড়া কম যায়নি। আমাদের মাঝের দু-তিনটে বড় টেবিল জুড়ে উপহারের জিনিসপত্র জমে আছে। বাড়ির আর বাগানের আলোগুলো তেমনি জ্বলছে।

...ভাবছে কিছু। এক একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। উঠে কাছে এলো।

সুজাতা!

আমি চেয়ে আছি।

যা হয়ে গেছে তারপরেও আমি সব ভুলে যেতে রাজি আছি। এই রাত থেকে যা শুরু তা সত্যি হোক। এর আগের যা কিছু সব ভুলে যাওয়া সম্ভব কি না?

চোখে চোখ রেখে জবাব দিলাম, আগের যা কিছু তা আমার কাছে অনেকখানি।...তুমি কতটা অনুতপ্ত?

আমার কোনো অনুতাপ নেই।

সোজা হয়ে বললাম, আইনের জালে ফেলে একজন নির্দোষ মানুষকে জেলে পাঠিয়েছ এ তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না তাহলে?

না। কিন্তু আমি এ প্রসঙ্গই ভুলে যেতে বলছি।

ছিটকে উঠে দাঁড়ালাম।—তুমি জাহান্নামে যাও! ঘরে চলে এলাম। এই সাজসজ্জা, গয়নাপত্র সব যেন গায়ের মধ্যে জ্বলছে এখন।

পরদিন বিকেলে আবার চূড়ান্ত ফয়সলার জন্য মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে। চোয়াল কঠিন, চিবুক শক্ত।

প্রতিশোধ নেওয়াটাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাহলে?

হ্যাঁ।

তারপর এখন? তুমি কি করবে আর আমিই বা কি করব?

ভাবিনি।

এত বড় সর্বনাশ ডেকে আনার আগে ভাবা উচিত। এতে শুধু আমার ক্ষতি, তোমার ক্ষতি নেই? আজ আমি তোমাকে সান্তাক্রুজের বাড়িতে সরিয়ে দিয়ে অ্যানালমেণ্ট চাইলে তোমার ছবির জগতে সুনাম বাড়বে? জবাব দেওয়া গেল না। চরম আঘাত হানতে পারাটাই সঙ্কল্পের শেষ ভেবে রেখেছিলাম।

শোন, আইনের দিকটা আরো একটু ভালো করে জানা থাকলে তুমি আর একটু ভাবতে। তবু তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি না, সত্যি কথা বলার দুর্জয় সাহস তোমার আছে। সেজন্য ধন্যবাদ।

অসহিষ্ণু ক্ষোভে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে নিল। তারপর আবার সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াল।—এবারে বেশ বুঝে নাও, কোর্টে তুমি অ্যানালমেণ্ট চাইতে পারো না, কারণ তোমার কোনো যুক্তি নেই। ঘৃণা করে প্রতিশোধ নেবার জন্যে কাউকে বিয়ে করলেও বিয়েটা আইন অগ্রাহ্য করবে না। তাছাড়া আমি কনটেস্ট করব, আর আমি কোনো অভিনয়ের ওপর দাঁড়িয়ে নেই বলে জিতবও।

আমি অ্যানালমেণ্ট চাইলে তুমি কনটেস্ট করতে পারছ না, কারণ, করলে আমি হার স্বীকার করে তোমার ওপর দখল নেব। যে ভাবেই হোক, তুমি আমার দখল ছাড়াতে পারছ না। পরিষ্কার বুঝেছ?

হ্যাঁ। বল।

কিন্তু এভাবে দখল নিতে আমার রুচিতে বাধে ভদ্রতায় বাধে, এইটুকু বিশ্বাস করে একটা বছর এখানে এই বাড়িতে থাকতে হবে, ঠিক এখন যেমন আছি সেই রকম। তুমি অভিনেত্রী না হলে এই একটা বছর তোমাকে মায়ের কাছে রাখা যেত, কোনোদিক থেকে কোনো কথা উঠত না।

আমি শুনেছি। সমস্যা আছে অস্বীকার করতে পারছি না। পালটা প্রতিশোধ নেবার জন্যে আইনের আশ্রয়ে এই লোক যে আমার এই দেহটার ওপর দখল নিতে পারে বুঝছি। কিন্তু এই স্তরে তাকে নামালাম না, বিশ্বাস করলাম।

সে আবার একটা পাক খেয়ে সামনে দাঁড়াল।—আমি মিথ্যে বলিনে, তাই সত্যি কথাটা শুনে রাখ, এক্ষুনি আমি অ্যানালমেণ্ট চাইব না তার দুটো কারণ। এক আমার মা আর মাসি, তাদের একটু একটু করে প্রস্তুত করতে হবে। দ্বিতীয় কারণ, আর দু' আড়াই মাসের মধ্যে আমি সিনিয়র স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল হতে যাচ্ছি, এ সময়ের মধ্যে আর তার পরেও কিছুকাল আমাকে নিয়ে কোথাও কোনোরকম আলোচনা হোক বা কাগজে কোনোরকম রিপোর্ট বেরুক এ আমি চাইব না। আমাদের ভিতরের সম্পর্কটা বাইরের কাক-পক্ষীতে জানবে না, বরং উলটো জানলে ভালো হয়। এই শর্ত মেনে একটা বছর তুমি এখানে সসম্মানে থাকবে। এর অন্যথা হলে তুমি আমার কাছে কোনোরকম দয়া মায়া ক্ষমা আশা কোর না। এক বছর বাদে আমরা ডিভোর্স স্যুট ফাইল করব। আমিই করব, তুমি বাধা না দিলে কোনো অসুবিধে হবে না।

প্রস্তাবটা শুধু তার দিক থেকে নয়, আমার দিক থেকেও সমানই বাঞ্ছনীয়। কালকের ওই উৎসবের পর দু' দিনের মধ্যে বা দু' পাঁচ মাসের মধ্যে আমাকে নিয়েও কৌতূহলে সরগরম হয়ে উঠুক সকলে, ভাবতেও বিতৃষ্ণা। না, শুধু প্রতিশোধ নেওয়া ভিন্ন এসব চিন্তা আমার মাথায় আসেনি আগে।

বললাম, আমি কারো দয়া মায়া ক্ষমা প্রার্থী নই। সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারার শর্তেই রাজি আছি। তোমার লাঞ্চ স্টুডিওতে হয়, আমারও আগের মতো বাইরেই হতে পারে। সকালের ব্রেকফাস্ট আর রাতের ডিনারের ব্যবস্থা বাড়িতেই হওয়া দরকার।

সহেলি করবে।

ভুরু কুঁচকে ভাবল একটু।—সহেলি রোববারে দেশে চলে যায়, আমার জন্যে চিন্তা নেই, আমি সেদিন মায়ের কাছে বা অন্য কোথাও যাই, তোমার ব্যবস্থা?

একটা দিন আমারও বাইরে ব্যবস্থা হতে পারে, নিজেও করে নিতে পারি।

ঠিক আছে। কাছের ব্যাঙ্কে তোমার নামে একটা অ্যাকাউণ্ট খুলে দিচ্ছি, তোমার টাকার জোর আছে আমি জানি, কিন্তু আমার সংসারে তার একটা পয়সাও খরচ হবে না।

একথার জবাব নিষ্প্রয়োজন। লম্বা পা ফেলে আর জোরে জোরে মাটি মাড়িয়ে সে মাঝের দরজা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

বিচিত্র সংসার যাত্রা আরম্ভ হল আমাদের। বাইরে কেউ কিছু টের পেল না। এমন কি ভিতরের সহেলিও না। দুদিকের কারো বন্ধু বান্ধব এলে অন্তরঙ্গ হাসিমুখে দুজনেই তাদের আদর অভ্যর্থনা করি। দুজনে জুটি বেঁধে চোখে-মুখে খুশি ছড়িয়ে বাইরের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাই। যে কেউ দেখলে বলবে, সুখী দম্পতি বটে। বলেও কেউ কেউ। কিন্তু ভিতরের ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি দুই ঘরের দু'জন অজানা অচেনা বাসিন্দা যেন আমরা। সে তার ঘরে ঢোকে, ভিতরের দরজা দিয়ে আমি আমার ঘরে।

দুজনের দরকারি কথাবার্তা যা কিছু সব সকালের চায়ের টেবিলে নয়তো ডাইনিং টেবিলে। আর তা না হলে লাইব্রেরি হলে। সকালে আমি স্টুডিও চলে যাই, সে কোর্টে। সন্ধ্যার পরে বা রাতের আগে কারো দেখাও হয় না। কোনো সামাজিক অ্যাপয়েন্টমেণ্ট থাকলে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

একটু বিব্রত বোধ করি শুধু বোরিভিলির মা-মাসির টেলিফোন এলে। আমাদের টেলিফোন দু'ঘরের সামনের বারান্দায়। দু-একদিন পরে পরেই সেখান থেকে টেলিফোন আসে। মা'টি যদি তিন মিনিট কথা বলে মাসিটি দশ মিটি। কথাবার্তা সবই ভিতরের ঘর থেকে শোনা যায়। বিশেষ করে তাদের ছেলে যদি তখন শোবার ঘরে থাকে। ওই মা-মাসির সঙ্গে অভিনয় চালাতে গিয়েই যা একটু অস্বস্তি বোধ করি। তবে সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে প্রথম দু-তিন সপ্তাহ আমি তার সঙ্গে বোরিভিলিতে তাদের কাছেও গেছি। সে প্রস্তাব করেছে, আমি তক্ষুনি সম্মতি দিয়েছি।

এক বছরের এই ঘরকন্না স্বাভাবিক রাখতে আমার দিক থেকে আমি ত্রুটি করিনি। ঘর-দোর আসবাবপত্রের দিকে চোখ রেখেছি। মস্ত লাইব্রেরি ঘরটা নতুন করে সাজিয়েছি। বইয়ের র‍্যাকগুলোর সামনে বেশ বড়সড় একটা পার্টিশান এনে বসিয়েছি। ফলে এত বড় ঘরটার চেহারাই বদলে গেছে। ওই লোক মনে মনে তারিফ করেছে কিনা জানি না, মুখে কিছু বলেনি।

একে একে বিয়ের তিন সপ্তাহ পার হল। সকালে চায়ের টেবিলে বা রাতের ডিনার টেবিলেও দরকারি কথাবার্তা কমে আসছে। গত পাঁচ দিনে পাঁচটা কথাও হয়নি বোধহয়। সেদিন শনিবার। সকাল সাড়ে নটার মধ্যে সে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে দেখলাম। আমাদের দু'ঘরের মাঝের দরজা সকালে খোলা হয়, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বন্ধ হয়। অন্যথায় সহেলি বা পার্টটাইম বেয়ারাটা কিছু ভেবে বসতে পারে।

আমার শুটিং নেই সেদিন। তবু একবার স্টুডিও যাব কিনা ভাবতে ভাবতে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকলাম। এ ঘরটাই আমার সব থেকে ভালো লাগে। হল্ ঘরের চারিদিকে র‍্যাকে যে আইনের বই তা নয়, আরো বহু রকমের বই আছে। কিছু পড়ার আগ্রহ থাকলে এখানে বসেও সময় কেটে যেতে পারে। সামনের দিকে সব আইনের বই, পার্টিশনটার ওধারে অন্যান্য বই। আগে এলোমেলো ছিল, আস্তে আস্তে আমিই গোছগাছ করেছি সব।

বাইরে ভারী পায়ের শব্দ। এই অসহিষ্ণু পদক্ষেপ আমার চেনা হয়ে গেছে।

সে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি ঘুরে তাকালাম।

মিস্টার রমেশ সামতানি।...এখানে পাঠিয়ে দেব?

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরের প্রতিক্রিয়া সে কি টের পেল? জবাব না দিয়ে মাথা নাড়লাম শুধু।

চলে গেল। আমি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। নিজের বুকের ধুপধুপ শব্দ শুনতে পাচ্ছি যেন।

আট

না, থমথমে মুখ নয় রমেশ সামতানির। এত বড় ঘরে আর বলতে গেলে বাড়িটাতেও আমাকে একলা দেখে ফেটে পড়ল না। অপরিসীম ধৈর্য বটে মানুষটার। সমস্ত মুখে একটা অপরিসীম বিস্ময় যেন টসটস করছে।

বোসো। কবে এলে?

চেয়ার টেনে একেবারে আমার মুখোমুখি বসল। কাল রাত বারোটায়। বাড়ি ফিরেই অত রাতে তোমাকে টেলিফোন করলাম। না পেয়ে অপারেটারকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তোমার লাইন ডিসকানেক্টেড। সকালে তোমার ফ্ল্যাটে এসে দেখি সেখানে অন্য ভাড়াটে। তারপর তোমার প্রোডিউসারকে ফোন করতে চিচিং ফাঁক। ঝুঁকে একটু ভুরু কুঁচকে ভালো করে দেখে নিল আমাকে। দেন...ইউ আর রিয়েলি মিসেস প্যাটেল নাও, মিসেস সুজাতা প্যাটেল?

হ্যাঁ। এক বছরের জন্য।

...শর্ত ছিল কাক-পক্ষীতেও জানবে না, কিন্তু রমেশ সামতানি কাকপক্ষীর মধ্যে পড়ে না। তার জানার সঙ্গে আমার জানার কোনো তফাৎ মনে করি না।

এবারে মুখে একপ্রস্থ বিস্ময়ের ওপর আর একপ্রস্থ বিস্ময় চাপল যেন। এক বছরের জন্য মানে? চা-কফি কিছু খাবে?

হ্যাং ইওর চা-কফি। আমি দেখতে এসেছিলাম তোমার মাথা কতখানি খারাপ হয়েছে—এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না...এত যাকে ঘৃণা করতে সেই প্যাটেলকে তুমি বিয়ে করলে! এক বছরের জন্য মানে কি, তারপর খুন-টুন করবে তাকে?

এখানে কথা নয়, তোমার কাজ নেই তো কিছু এখন?

তোমাকে বোঝাটাই এখন আমার আসল কাজ। গেট রেডি—

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। একটু বাদে সমুদ্র ঘেঁষা একটা নির্জন রাস্তায় গাড়িটা থামিয়ে পাশের দরজায় পিঠ দিয়ে আমার দিকে ঘুরে বলল, নাও হোয়াট্‌স দ্য বিগ জোক?

বললাম সব। স্টুডিওতে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে বিয়ে, ফুলশয্যার রাত, এখানকার পার্টি আর তারপরে লোকের চোখে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে এক-বছরের জন্য বসবাসের শর্ত, কোনো প্রসঙ্গই বাদ দিলাম না।

রমেশ সামতানি প্রথম থেকেই হাঁ করে শুনছিল, দু'ঘণ্টা নিশ্চুপ বসে গত ছ'মাসের সমস্ত ঘটনা শোনার পরেও হতবাক খানিকক্ষণ। তারপর মন্তব্য করল, একটা এম-এ পাস মেয়েও যে এ-রকম অবুঝ রাম-বোকা হয় আমার ধারণা ছিল না।

আমি রেগেই গেলাম।—তুমি তো বলবেই, আমার যন্ত্রণা তুমি জানবে কি করে?

তোমার যন্ত্রণার মূল কারণ যে সে তো পোর্ট সৈয়দ থেকে ভবসমুদ্র পাড়ি দিয়েছে, আর মাঝখান থেকে তুমি এই লোকটাকে নিয়ে পড়লে।

তুমি কার কথা বলছ?

তোমার সেই শেখর নায়েক। ফেরার সময় পোর্ট সৈয়দে দিনকতক ছিলাম। একদিন শুনলাম, বোম্বাইয়ের কে একজন সেখানকার হাসপাতালে মরে পড়ে আছে, সৎকারের ব্যবস্থা হচ্ছে না। গিয়ে দেখি শেখর নায়েক।

শোনার পরেও আমার অনভূতির খুব একটা রকমফের হল না। যে কাজ করে বসেছি, তারপরে ভিতরের সেই উত্তেজনা যেন অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ভুরু কুঁচকে রমেশ সামতানি আমাকে লক্ষ্য করল একটু। তারপর বলল, আমারই ভুল হয়েছে, নিজের ছোট্ট কাজটুকু সেরে রেখে যাওয়াই উচিত ছিল।

কি কাজ?

তোমাকে বিয়ে করে যাওয়া। ...আমি বোকার মতো ভাবলাম, বাজারের এক সেরা অভিনেত্রীকে নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে যাবার পর বিয়েটা করলে নিজের কদর বাড়বে। যাক্, এখন চট্‌পট ছাড়াছাড়ির ব্যবস্থা কর তো, আর এক বছর টেনে কাজ নেই।

মনঃপুত হল না।—সেটা করতে গেলে হার অনিবার্য, তাকে ব্যারিস্টার ছোট ভেব না—তখন উলটো বিপদ হবে।

মাথা ঝাঁকিয়ে রমেশ সামতানি বলল, কিন্তু এক বছর ধরে তুমি অন্যের ঘর করবে আর আমি দেখব চেয়ে চেয়ে?

হেসেই জবাব দিলাম, যেমন ছিলাম তেমনই পাচ্ছ, তফাৎ তো শুধু এক বছরের।

ঘটা করে আবার এক দফা হাঁটু থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল সে।

বলল, মাত্র তো তিন সপ্তাহ গেছে পাশাপাশি ঘরে আছ, বক-ধার্মিকের মতো ব্যারিস্টার সাহেব শুধু বসেই থাকবে, ভবিষ্যতেও তোমার ওপর হামলা হবে না তার বিশ্বাস কি?

খুব না ভেবেই জবাব দিলাম, যতটা চিনেছি ওটুকু বিশ্বাস করা যেতে পারে।

শুনে ব্যারিস্টার সাহেবের সম্পর্কে একটা অশ্লীল মন্তব্য করল সে, অর্থাৎ তাই যদি সত্যি হয় তাহলে লোকটা সত্যিই পুরুষ কিনা সেই সন্দেহ থেকে যায় তার।

সেই সকালে বেরিয়েছিলাম, রাতে একটা হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার পরে রমেশ সামতানি বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে গেল আমাকে। ভিতরে ভিতরে আমার কেমন হাঁপ ধরে গেছিল, অনেকটা হালকা হাওয়া গেছে এখন।

কিন্তু ভিতরে পা দিয়ে খারাপ লাগল একটু। ডিনারের সময় পার হয়ে গেছে, বিনায়ক পাটেল তার ঘরে বসে। দ্বিধা কাটিয়ে বললাম, আমি খেয়ে এসেছি।

সেই গম্ভীর মুখ, কঠিন চোয়াল আর শক্ত চিবুক। —সেটা ঠিক সময়ে টেলিফোন করে জানানো উচিত ছিল।

আমার দ্বিধা-ভাব কেটে গেল। সোজা নিজের ঘরে পা দিয়ে মাঝের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

পরদিন রবিবার। সকালে একলাই বোরিভিলিতে মা-মাসির কাছে চলে গেল। আমি যাব কি যাব না জিজ্ঞাসা করল না। জিজ্ঞাসা করলে যাওয়া হবে না-ই বলে দিতাম। বলা থেকে অব্যাহতি পেলাম।

খানিক বাদে রমেশ সামতানি এলো। আসার কথা ছিল। লাইব্রেরিতে বসে গল্প করলাম কিছুক্ষণ, তারপর বেরিয়ে পড়লাম। আজ আরো নিশ্চিন্ত। সহেলি রবিবারের ছুটিতে তার গ্রামে চলে গেছে। কাল ভোরের আগে ফিরবে না। আর পাশের ঘরের লোকও কাল ন'টার আগে ফিরছে না।

সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা রমেশের সঙ্গে কাটিয়ে রাতে একটা নামী হোটেলে খেতে ঢুকেছি। আলাদা ঘর। এর মধ্যে রমেশ আমাকে হঠকারিতার জন্যে অর্থাৎ মিসেস প্যাটেল হয়ে বসার জন্যে অনেকবার বোকা, ভাবাবেগের দাস ইত্যাদি বলে কম গঞ্জনা দেয়নি। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর যে কাণ্ডটা করে বসল সে তার জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। দরজা ঠেলে দু'জনে একসঙ্গে বেরুবার আগেই তার দু'হাত আমার কাঁধের ওপর উঠে এলো। কিছু বোঝবার আগেই সজোরে বুকে টেনে নিল সে। তারপর দম ফেলার অবকাশ না দিয়ে উপর্যুপরি চুমু খেয়ে চলল।

আত্মস্থ হবার পর বেশ জোর করেই ঠেলে সরালাম তাকে। একটু কঠিন সুরেই স্থির চোখে তাকিয়ে বললাম, কাজটা তুমি ভালো করলে না।

কেন ভালো করলাম না? গলার স্বর নীরস তারও।

বললাম, আমি একজনকে শর্ত দিয়েছি, এক বছরের জন্যে সে-শর্ত রাখব। আবার যদি এ-রকম কর, তোমার সঙ্গে একলা কাটানো আমার পক্ষে মুশকিল হবে।

তারও অসহিষ্ণু চাউনি—ঠিক আছে, মনে রাখতে চেষ্টা করব।

বাড়ি ছেড়ে দিয়ে গেল যখন রাত দশটা। কিন্তু পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়ালাম আমি। আমার পাশের লোকের ঘরে আলো জ্বলছে।

দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। বন্ধ করেও-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালাম। ও-ঘরের ভিতর দিয়েই নিজের ঘরে যেতে হবে।

পরদা সরিয়ে ভিতরে এলাম। ...নিবিষ্ট মনে একটা আইনের বই পড়ছে। হঠাৎ মনে হল জিজ্ঞাসা করি রাতের মধ্যেই বোরিভিলি থেকে ফেরার কারণটা কি। ...কিন্তু রমেশ যে-কাণ্ড করেছে, কিছুই বলা গেল না। বই থেকে মুখ তুলে সে তাকালোও না। আমি নিজের ঘরে এসে মাঝের দরজা বন্ধ করলাম।

একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি রমেশের, যেন অত কাজ নেই এখন হাতে। শুটিং শেষ হবার আগেই আমার জন্যে স্টুডিওতে এসে বসে থাকে। তারপর তার পাল্লায় পড়ে বাড়ি ফিরতে দেরি হয় প্রায়ই। অবশ্য বেশি দেরি হবে বুঝলে ডিনারের আগেই টেলিফোনে জানিয়ে দিই। ও-ধারে টেলিফোন নামিয়ে রাখা ছাড়া একটি শব্দও কানে আসে না। শনিবার বা ছুটির দিনে রমেশ বাড়ি এসে আড্ডা জমায় খানিকক্ষণ, তারপর আমাকে টেনে বার করে।

মাসখানেক কাটল এইভাবে।

সেদিনও একটু রাত হয়েছে ফিরতে। নিজের ঘরে যাচ্ছি, বাধা পড়ল।

—শোন!

ফিরে দাঁড়ালাম। সেই ঋজু কঠিন মুখ।

একবছর বাদে ওই রমেশ সামতানিকে তুমি বিয়ে করবে?

হতে পারে।...কেন?

হলেও সেটা এক বছরের আগে হচ্ছে না নিশ্চয়?

সেই রকমই তো শর্ত।

হ্যাঁ সেই রকমই শর্ত। তুমি রূপসী ফিল্ম আর্টিস্ট, বাইরের একজনের সঙ্গে এত বেশি বাইরে মাখামাখি করে বেড়ালে সেটা খবর হয়ে ওঠে। তাতে আমার অসুবিধে আছে। লাইব্রেরি ঘরে বসে যত খুশি গল্প কর কিছু বলব না।

শুনে রাগ হল বটে, কিন্তু জবাব দেওয়া গেল না। রমেশ সামতানির জুলুম চেষ্টা করেও ঠেকানো সহজ নয়।

পরদিন খোলাখুলিই ব্যারিস্টার সাহেবের আপত্তির কথাটা তাকে জানালাম। বললাম, বাইরে অত মেলামেশা সত্যিই আর চলবে না।

রমেশ সামতানি ঠাণ্ডা মেজাজে বলল, তোমাব আপত্তি না থাকে তো ওর মাথাটা আমি গুঁড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করি।

বাজে বোকো না।

এরপর বেশির ভাগ সময় লাইব্রেরি ঘরে বসেই আড্ডা হয় আমাদের। বাইরে বেরুলেও তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করি।

আরো মাসখানেক বাদে স্টুডিও থেকে বাড়ি ফিরেই হঠাৎ টেলিফোন পেলাম একটা। মেয়ের গলা। চেনাগলা। কল্পনা দেশাই। গোড়ায় দু-চার দিন বাড়ি এসেছে। এখন আর আসে না। তবে মাঝে মাঝে টেলিফোন করে।

ব্যারিস্টার সাহেব খোঁজ করল। বাড়ি নেই শুনে আমাকেই বলল, দুদিন ছিলাম না এখানে তাই তোমার কর্তাকে অভিনন্দন জানাতে দেরি হয়ে গেল।

অভিনন্দন কেন?

বা রে, তুমি জানোই না নাকি। কতজনকে টপকে স্ট্যাণ্ডিং সিনিয়র কাউনসেল হয়েছে—কত বড় সম্মান!

একটা ধাক্কা সামলে হাসতে চেষ্টা করলাম।—পুরনো খবর, ভুলে গেছি।

ও-দিক থেকে টিপ্পনির সুর, ছবির জগৎ নিয়ে আছ, ভুলবেই তো।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমার আর সবুর সইল না। চাপা ঝাঁঝে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার সঙ্গে আমার শর্তটা কি একতরফা নাকি?

গম্ভীর জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো।

তুমি সিনিয়র স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল হয়েছ, কল্পনা দেশাই তাই তোমাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য টেলিফোন করেছিল। আমি বুঝতে পারিনি কেন। তাই দেখে সে ঠাট্টা করেছে আমাকে, কিছু সন্দেহ হওয়াও বিচিত্র নয়।

জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখেই সে জামা কাপড় বদলাতে গেল।

তার সঙ্গে দু-তিনটে অভিনন্দন সভায় যোগ দিতে হল আমাকে। সকলের চোখে সেখানে আমরা আদর্শ দম্পতি।

এরপর ক্রমশ দেখা যেতে লাগল বাড়ি ফিরতে তারই রাত হয়। গোড়ায় গোড়ায় আমি ভাবতাম নতুন কাজের চাপ। কিন্তু এরপর ডিনারের আগে মাঝে মাঝে তার টেলিফোন আসতে লাগল, সে খেয়ে আসবে, অপেক্ষা করার দরকার নেই। সেই টেলিফোন এক-আধদিন কল্পনা দেশাইও করল। তখন বুঝলাম সন্ধ্যাটা তার কোথায় কাটছে। আর, ইদানিং প্রায়ই টেলিফোন করে কল্পনা দেশাই—কিন্তু আমি টেলিফোন ধরলে কাঠ কাঠ দুটো কথা বলে কিংবা বাড়ির মালিক নেই শুনলে নামিয়ে রাখে। আমি নিঃসংশয় আমাদের ভিতরের অবস্থাটা সে জেনেছে। জেনে খুশি হয়েছে।

রাগের মাথায় আবার বোঝাপড়ায় নামলাম আমি।—রমেশ সামতানির সঙ্গে আমি বেশি ঘোরাঘুরি করলে সেটা খবর হয়, কল্পনা দেশাইয়ের সঙ্গে তুমি প্রায়ই সন্ধ্যা থেকে অত রাত পর্যন্ত কাটালে সেটা খবর হতে পারে না?

না। তার সঙ্গে আমার কেসের আলোচনা থাকতে পারে।

তুমি সিনিয়র স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল আর সে উকিল, আলোচনার দরকার থাকলে তারই আসার কথা তোমার কাছে।

সে গম্ভীর এবং নিরুত্তর।

শোন, তুমি তো মিথ্যে বল না। আমি যদি বলি, আমাদের ভিতরের অবস্থাটা তোমার দোষেই সে বুঝে নিয়েছে?

হতে পারে। আর আমি যদি বলি আমাদের ভিতরের অবস্থাটা তোমার দোষে রমেশ সামতানিও ভালো করেই বুঝে নিয়েছে?

এবারে আমি নিরুত্তর।

কিন্তু দিন যত যাচ্ছে ক্রমশ আমার ধৈর্য কমছে কেন জানি না।

দিন যাচ্ছে। মাস যাচ্ছে। এর মধ্যে একদিন বোরিভিলির থেকে খবর এলো, মায়ের হঠাৎ রক্তচাপ খুব বেড়ে স্ট্রোকের মতো হয়েছে এক্ষুনি আসা দরকার।

খবরটা পেয়েই সে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। বরাত ভালো দিন-কতক আমার এখন শুটিং-এর ডেট নেই। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বললাম, আমিও যাব।

গেলাম। অসুখ বেশিই বটে। সেখানকার সব থেকে বড় ডাক্তার আনা হল। চিকিৎসা আর সেবা শুশ্রূষা চলল। দুটো দিন থেকে তাদের ছেলেকে চলে আসতে হল। কাজের চাপ। আমি স্বেচ্ছায় থেকে গেলাম। যে দু'দিন সে ছিল, আমি তার মায়ের শিয়রে বসেই রাত কাটিয়েছি।

রোজ টেলিফোনে খবর নেয়। আমি বলি, ভালোর দিকে যাচ্ছে, চিন্তা কোরো না। সাতদিন বাদে আবার এসে মাকে দেখে গেল। অনেকটা ভালো। শুটিং কামাই করে তারপরেও সাতদিন থেকে গেলাম আমি। এবারে এসে প্রায় সুস্থই দেখল মাকে। এ-ঘরে থেকে শুনলাম, মাসি শত মুখে প্রশংসা করছে আমার। বলছেন, এম-এ পাশ মেয়ে, তায় ছবি করে, কিন্তু এ-মেয়ে যে এমন অক্লান্ত সেবা করতে জানে তা কি একবারও ভেবেছি! মেয়ে নয়তো রত্ন, যত্নআত্তি করিস বাপু একটু, দিনরাত নিজের কাজে ডুবে থেকে হেলাফেলা করিস না।

এবারে সঙ্গে ফিরতে হল আমাকে। আর শুটিং কামাই করা চলে না। গাড়িতে সে বলল, মাসি খুব প্রশংসা করছিল তোমার, মায়ের অক্লান্ত সেবা করেছ।

জবাব দিলাম, আমি পাকা অভিনেত্রী সে-তো তোমার জানাই আছে। মাসির কথায় বিশ্বাস করার কি আছে।

তোমাকে আগেও বলেছি, তোমাকে বিশ্বাস করি কারণ তোমার সত্যি বলার সাহস আছে। তাই মাসির কথাও অবিশ্বাস করছি না। শুধু একটা অবসেশনই তোমার বিকৃতি।

আমার কথায় আমার বাবাকে বিশ্বাস না করাটা তোমার শুধু বিকৃতি নয়, দম্ভও।

আর কোনো কথা হল না।

এর পর কৃতজ্ঞতা বোধে কিছুটা ঠাণ্ডা হবার বদলে দিনে দিনে মানুষটার যেন ক্ষোভ বাড়ছে মনে হল। খাওয়া ভুলে অনেক সময় বিমনা হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। চোখোচোখি হলে নিজের ওপরেই দ্বিগুণ বিরক্তি।

বিয়ের আট মাস হয়ে গেছে। আর চার মাস বাদে আমার এই খেলার শেষ। কিন্তু আমিও যেন শ্রান্ত ক্লান্ত। বর্তমানের এই ছবি শেষ হয়ে গেছে, ভালো হাউসে রিলিজ পেতে কিছু দেরি। বর্তমান প্রোডিউসার আর সেই নতুন প্রোডিউসার দুজনেই তাদের নয়া ছবির কাজ শুরু করার জন্যে ব্যস্ত। কিন্তু আমার যেন কোনো কিছুতেই উৎসাহ নেই আর।

সেদিন। রাত তখন আটটা। আমার ঘরের মাঝের দরজা বন্ধ। বাইরের দিকের দরজাও। ঘরের আলো নিভানো।

...একজন আমাকে, প্রাণপণে বুকে আঁকড়ে ধরেছে। আমি প্রায় আর্তনাদ করছি, ছাড়ো ছাড়ো, আমাকে ছাড়ো! আমার স্বামী আছে, তার আসার সময় হয়েছে, আমাকে বিপদে ফেলো না, ছাড়ো! দোহাই তোমার, ছাড়ো!

...কিন্তু ওই পুরুষ বড় অবুঝ। আরো শক্ত করে বাহু বন্ধ করেছে আমায়। বলছে, কেন ছাড়ব, তুমি আমাকে ভালোবাস আমি তোমাকে ভালোবাসি আসুক সে, তুমি এত ভয় পাও—কেন? এভাবে আর কত অপেক্ষা করব আমি!

বাইরে কার পায়ের বেদম আঘাতে সশব্দে দরজা দুটো খুলে গেল। তখনও ঘর অন্ধকার, তখনও আমি ওই পুরুষের বাহু বন্দী।

শব্দ করেই আলোটা জ্বালা হল।

পরক্ষণে নির্বাক বিমূঢ় বাড়ির মালিক বিনায়ক প্যাটেল।

শয্যায় একলা আমি বসে। আমার সামনে সাউণ্ড ফিট করা একটা যন্ত্র। দেয়ালে মিনিয়েচার প্রজেকশনে আমি আমার সদ্য সমাপ্ত ছবি দেখছিলাম।

ফিরে তাকালাম তার দিকে।

চোখাচোখি হতে নিঃশব্দে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ব্যাপারখানা কি আমার বুঝতে দেরি হয়নি। হাসি পাবার কথা। আনন্দ পাবার কথা। এত জব্দ ওই লোক বুঝি জীবনেও হয়নি। কিন্তু হাসা গেল না। ভিতরটা ইদানীং সর্বদাই কেমন ভারাক্রান্ত আমার। মনে হয়, অভিনয়ের থেকেও জীবনের এই খেলাটা আরও বেশি অসহ্য। এ-যেন এখন শেষ হলে বাঁচি।

নয়

রমেশ সামতানিরও কাজের চাপ বেড়েছে। রোজ আসছে না। এলেও বেশিক্ষণ আড্ডা জমাতে পারছে না। সেদিনও রাত আটটার আগে উঠি উঠি করছে।

বাইরে গাড়ি আসার শব্দে বুঝলাম বাড়ির মালিক ফিরল। তার পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে সহেলি হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, সাহেব এক্ষুনি একবার ডাকছেন।

এ রকম কখনও ঘটেনি। আমি যথার্থই অবাক। আমার এই বিস্ময় রমেশও সকৌতুকে লক্ষ্য করল। চোখাচোখি হতে বলল, আমিও চলি, কি বল?

কিছুই না বলে আমি বেরিয়ে এলাম। ...তার ঘরের আলো নেভানো। ভিতরে পা দিতেই অন্ধকারে মৃদু গম্ভীর ফিসফিস শব্দ।—চুপ, জোরে কথা বোলো না। আলো জ্বালতে হবে না, এদিকে এস, লাইব্রেরি ঘরে কেউ আছে?

হঠাৎ হকচকিয়ে গেছি আমি।—মিস্টার রমেশ ছিল, উঠবে বলছিল ...কেন?

দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাকে বিদায় দিয়ে এসো। খুব দরকার। আর শোন, সহেলিকে কোনো কাজের ছুতোয় মিনিট দশেকের জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দাও।

সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে এটুকু বুঝেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে দেখি রমেশ চলেই গেছে। সহেলিকেও কাজের ছুতোয় বাইরে পাঠিয়ে দু'মিনিটের মধ্যে ফিরলাম।

চলে গেছে?

হ্যাঁ।

সহেলি?

বাইরে।

ঠিক আছে। লাইব্রেরি ঘরে এসো। সে আগে আগে চলল। আমি পিছনে। আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আর একটা চেয়ার কাছে টেনে সে মুখোমুখি বসল। এই লোকের কঠিন চোয়াল আর শক্ত চিবুক অনেক দেখেছি, কিন্তু এ রকম চিন্তাচ্ছন্ন গম্ভীর মুখ বড় দেখিনি।

চোখে চোখ রেখে সামনে ঝুঁকল।—শোন, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যা-ই হোক, তোমাকে আমি কখনও অবিশ্বাস করিনি। করেছি?

জবাব দিলাম, অবিশ্বাস করার মতো কোনো কাজ আমি করেছি বলে মনে পড়ে না।

না, কর নি। করলে আমি বুঝতে পারতাম। আজ যে কথাটা বলব, তোমার আর আমার বাইরে পৃথিবীর কোনো দ্বিতীয় লোক জানবে না। জানলে একজনের প্রাণ যেতে পারে।

তাহলে আমাকে বলছ কেন?

কারণ বিশ্বাস করার মতো একজনকে আমার দরকার। এটা তোমার আমার ব্যাপার নয়, দেশের স্বার্থের ব্যাপার।

বল।

প্রাণের ভয়ে অর্ধ উন্মাদ একটি মেয়েকে কয়েকটা দিন লুকিয়ে রাখতে হবে। তাছাড়া সে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, মাদক ওষুধ খাইয়ে বা ইনজেকশন করে দিন রাতের বেশির ভাগ সময় তাকে বেহুঁশ করে রাখা হয়। তাইতেও সমস্ত স্নায়ু এখন বিকল প্রায়। বাইরের এক বিরাট র‍্যাকেটের দল থেকে হঠাৎ কি করে সে বম্বে চলে এসেছে। তাকে সুস্থ করে কোর্টে নিয়ে আসতে পারলে সেই গ্যাং ধরা পড়বে। সোনা আর হাসিস চোরাই চালানোর গ্যাং—হাসিস হল ভয়ানক রকমের একটি মাদক। এই চোরাই চালানে কোটি কোটি টাকার কারবার চলছে। গভর্নমেন্ট চেষ্টা করেও তাদের হদিশ পাচ্ছে না।

শোনার পর আমারও উত্তেজনা বাড়ল—সেই মেয়েটি কোথায়?

তোমার ঘরে।

আমি আঁতকে উঠলাম।—সর্বনাশ! কেউ দেখে ফেলেনি?

না, আমি আগে দেখে-শুনে সাবধান হয়ে তাকে ঘরে ঢুকিয়েছি। এখন প্রায় বেহুঁশ অবস্থা তার।...শোন, এই রাতেই তাকে এখান থেকে সরাতে হবে। একেবারে নির্ভয়ে খুব ঠাণ্ডা মতো থাকতে পারে এমন কোনো জায়গায়। আমি তাকে মায়ের কাছে বোরিভিলিতে রেখে আসতে পারতাম, কিন্তু সেটা একটুও নিরাপদ হবে না, কারণ আমি স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল...কেস সাজানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার চেনা-জানা চারদিকে তারা সেই মেয়েকে খুঁজে বেড়াবে। তোমার জানা এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে তাকে দিনকতক রাখতে পারি? সী মাস্ট বি অ্যাবসলিউটলি ইন্ সেফ হ্যাণ্ডস—

আমি একাগ্র চিত্তে ভাবতে লাগলাম। ওপরঅলা যেন মুহূর্তের মধ্যে জায়গায় হদিশ দিয়ে দিল। লক্ষ্মীমাসি আর মংগেশের মুখ মনে পড়ল আমার—আছে। শিবলিতে—সেখানে আমার এমন দু'জন লোক আছে যারা আমাকে ছোট থেকে মেয়ের মতো মানুষ করেছে—নিজের ছেলেদের থেকেও আমাকে বেশি ভালোবাসে।

শিবলি...কতদূর এখান থেকে?

পঁচিশ তিরিশ মাইলের মধ্যে।

ঠিক আছে। এবার সে উঠে দাঁড়াল।—সহেলি ফিরলে তাকে বল, আমরা একটু কাজে বেরুচ্ছি, রাত সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে ফিরব। আমার বেশবাস দেখে নিল। বদলাবার দরকার নেই, যদিই বেরুতে হয় ভেবে প্রসাধন আর বেশবাস সেরেই রেখেছিলাম।—তুমি সহেলিকে কিচেনে আগলে রেখ খানিক, মেয়েটিকে নিয়ে আমি গাড়িতে উঠলে বেরিয়ে আসবে। রাত করে দেখতে পাবে না, তবু সে এসে বাইরের দরজা বন্ধ করার আগে তুমি গাড়িতে উঠবে।

লঘু ব্যস্ত পায়ে চলে গেল। আমিও বেরিয়ে এলাম। মিনিট খানেকের মধ্যে বাইরের কাজ সেরে সহেলি এল। আমি তাকে সঙ্গে করে কিচেনে ঢুকলাম। তক্ষুনি আবার একটা রান্নার ফরমাশ করলাম তাকে। ঘড়ি ধরে সাত মিনিট সেখানেই অপেক্ষা করলাম। সহেলি তখন আমার ফরমাশ মত বাটনা

বাটছে। ঘণ্টা আড়াই তিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি শুনে মাথা নাড়ল। আমি বেরিয়ে দালানের মাঝামাঝি এসে চেঁচিয়ে বললাম, বাইরের দরজা বন্ধ করে দিও।

আধ মিনিটের মধ্যে বাইরের দরজা ভেজিয়ে গাড়িতে তার পাশে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটল। আমি সভয়ে পিছন দিকে তাকালাম একবার।

কোণে স্তূপের মতো পিছনে মাথা রেখে পড়ে আছে একজন।

রাত সোয়া ন'টার মধ্যে আমরা শিবলিতে পৌঁছে গেলাম। দু'বার এসেছি, বাড়িটা চিনতে ভুল হল না।

লক্ষ্মী মাসি আমাকে দেখে আকাশ থেকে পড়ল প্রথম। তারপর আনন্দে খুশিতে হাউমাউ করে জাপটে ধরলো আমাকে। পিছনের লোককে দেখে থমকালো একটু, তারপর ডবল আনন্দ।—এ কে? জামাই?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললাম, খুব একটা দরকারে তোমার কাছে এসেছি মাসি, আজ বেশি কথা বলবার সময় নেই, মংগেশ কোথায়?

লক্ষ্মী মাসি কপাল চাপড়ালো।—হা রে আমার পোড়া কপাল, তুমি আর জানবে কি করে—লোনাভালা ছেড়ে এখানে এসে বসার দু'মাসের মধ্যেই তো সে চোখ বুজেছে!

বড় সড় একটা ধাক্কা সামলাতে হল।

পরে তাকে বক্তব্য বোঝালাম। শুনে প্রথমে হাঁ সে। তারপর বলল, ঠিক আছে, আমার এখানে কেউ টের পাবে না—নির্ভয়ে রেখে যাও।

বিনায়ক জিজ্ঞাসা করল, খুব জানাশোনা ডাক্তার আছে এখানে?

আছে।

সে রকম দরকার পড়লে তাঁকে এনে দেখাতে হবে। কিন্তু কিছু বলা চলবে না, শুধু বলতে হবে একজন আত্মীয়, মাদক ওষুধ খেয়ে খেয়ে এই দশা হয়েছে, এখন সর্বদাই তার প্রাণের ভয় আর আতঙ্ক, ভালো করে কথাও বলতে পারে না।

বিনায়ক আবার গিয়ে প্রায় টেনে হিঁচড়েই নিয়ে এল রমণীটিকে। ভিতরের একটা ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল। ওই প্রথম ভালো করে তাকে দেখলাম আমি। বয়স ঠাওর করা গেল না। পঁয়তিরিশ হতে পারে। পঞ্চাশও হতে পারে। নিষ্প্রভ বিকৃত মুখ। সর্বাঙ্গে কাল্‌চে ছোপ। চোখ টান করে তাকাতে চেষ্টা করল। টেনে টেনে বিড়বিড় করে বলল, ওরা আমাকে ঠিক ধরবে...খুন করবে...

কানের কাছে মুখে নিয়ে বিনায়ক বলল, কোনো ভয় নেই, এটা আমাদের নিজেদের বাড়ি, এখানে কেউ আপনার খোঁজ পাবে না।

দু-চারবার মাথা নেড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে। পকেট থেকে একটা ট্যাবলেটের শিশি বার করে বিনায়ক লক্ষ্মী মাসির হাতে দিল। বলল, জাগলেই খুনের ভয় পাচ্ছে দেখবে, আর মাদক ওষুধ চাইবে। বেশি কষ্ট পাচ্ছে দেখলেই এই ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেবে। সমস্ত দিনরাতে চারটে পর্যন্ত ট্যাবলেট দিতে পারো, তার বেশি দরকার হবে না।

এরপর লক্ষ্মী মাসির হাতে জোর করেই কতগুলো নোট গুঁজে দিল সে।

আবার গাড়ি ছুটছে। দুজনেই চুপচাপ খানিকক্ষণ। একসময় জিজ্ঞাসা করলাম, একে ওরা একেবারে শেষ না করে জিইয়ে রেখেছিল কেন?

স্টিয়ারিং ধরা হাত, সামনের দিকে চোখ রেখেই সে জবাব দিল, ঠিক জানি না, তবে আমার যা অনুমান পরে বলব। মেয়েটা একটু সুস্থ হোক। মেয়েটার নাম কি?

তাও জানি না, আধা বেহুঁশ অবস্থায় ছ'টা সাতটা নাম বলেছে। কোন্‌টা ঠিক কে জানে, হয়তো একটাও ঠিক নয়।

আর কোনো কথা হল না। কিন্তু এই লোকের এ-ভাবে সাহয্যে আসতে পেরে কেন যেন ভালো লাগছে।

বাড়ি পৌঁছে কলিং বেল টেপার আগে দরজা ঠেলতেই দরজা দুটো খুলে গেল। বিরক্তি চেপে ভিতরে ঢুকলাম। বিনায়ক চিন্তিত মুখে নিজের ঘরে চলে গেল।

শাসনের সুরে সহেলিকে বললাম, বাইরের দরজা বন্ধ করে রাখতে পারনি?

আকাশ থেক পড়ার মতো সহেলি বলল, বন্ধ করেছিলাম মনে হচ্ছে!

রাগত মুখে চলে এলাম। মুখের ওপর এ-রকম মিথ্যে কথা আগে বলত না।

এতদিনের অভ্যেস মতোই মাঝের দরজা দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। কি ভেবে ঘুরে তাকালাম জানি না।...আমার দিকেই চেয়ে আছে সে। চোয়াল আর চিবুক কঠিন নয় একটুও, চাউনিটাও নরম।

পরদিন সকালের দিকে নতুন ছবির মহরত ছিল আমার। পুরনো প্রযোজকের সঙ্গেই আগে দ্বিতীয় ছবি শুরু হবে। বিকেলের আগেই ফিরলাম। সন্ধ্যায় রমেশ সামতানি এল। তার সঙ্গে নতুন ছবি নিয়ে খোশ গল্প হল কিছুক্ষণ। তারপর সে চলে গেল। বিনায়ক ফেরেনি তখনো। সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন কল্পনা দেশাইয়ের কথা মনে হল আমার। আর তক্ষুনি একটা চাপা বিরক্তি।

তারপর দিন। শনিবার। সকাল তখন সাতটা সাড়ে সাতটা হবে।পাশের ঘর থেকে একটা উত্তেজিত চিৎকার।—সুজাতা! শীগ্‌গীর এদিকে এসো।

ছুটে এলাম। তার সামনে খবরের কাগজ। মুখ থমথম করছে। চোয়াল চিবুক শক্ত। ঘোরালো চোখে তাকালো আমার দিকে।—তোমার শিবলির সেই লক্ষ্মীর নাম কি? লক্ষ্মী যোশী?

হ্যাঁ কেন? আমি চমকেই উঠলাম।

সর্বনাশ হয়েছে। তাকে কেউ খুন করেছে।

আমি আঁতকে উঠলাম।—কাকে? লক্ষ্মী মাসিকে?

হ্যাঁ। এই দেখ।

রুদ্ধশ্বাসে খবর পড়লাম। গতকাল বেলা তিনটের সময় রাস্তার ধারের এক দুধের ক্যানটিন থেকে শ'খানেক গজ দূরে ফাঁকা মাঠের এক গাছের আড়ালে লক্ষ্মী যোশী নামে শিবলীর প্রায়-বৃদ্ধা এক রমণীকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ক্যানটিনের মহিলা কর্মী জানিয়েছে, লক্ষ্মী যোশী দুটো দুধের বোতল নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আধ মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে আসে। বোতল একটু বাদে নিচ্ছে জানিয়ে সে বেরিয়ে যায়। আর তার দশ মিনিটের মধ্যেই এই ব্যাপার।

আমি কাঁপতে কাঁপতে বসেই পড়লাম।

সে ঝাঁজিয়ে উঠল, দশ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নাও, এক্ষুনি বেরুতে হবে।

গাড়ি ছুটছে। আমি নির্বাক স্তব্ধ। শিবলি পৌঁছুলাম। বাড়িতে লোক দেখলাম। লক্ষ্মী মাসির দুই ছেলেই এসে গেছে। তারা আমাকে চিনল। আমি কিছু বলার আগেই প্যাটেল জানান দিল, আমরা সকালের কাগজ পড়ে এসেছি। তার চোখে চোখ পড়তে ইশারা বুঝলাম। আমি চুপ। না, বাড়িতে সেই একজনের কোনো অস্তিত্ব নেই। কেউ তার খবরও জানে না।

গাড়ি বাড়ির দিকে ছুটল আবার। দু'হাতে শক্ত করে স্টিয়ারিং ধরা। ভয়াবহ কঠিন মুখ। বার দুই তিন আমার দিকে ফিরল। গলার স্বরও যেন ইস্পাত কঠিন।

—তাহলে পরশু রাতের সেই অ্যাডভেঞ্চারের গল্প তুমি কারো কাছে করেছ?

শোনামাত্র আমি তীব্র প্রতিবাদ করলাম।—কক্ষনো না। আমি কাউকে বলিনি।

সহেলিকে?

না।

রমেশ সামতানিকে?

না না।

স্টুডিওর কাউকে?

না না না! কাউকে না! তুমি বিশ্বাস করছ না কেন?

পৃথিবীতে একমাত্র আমি তুমি তোমার লক্ষ্মী মাসী ছাড়া আর কেউ এই মেয়েকে এখানে এনে রাখার খবর জানে না। তুমি কাউকে না বলে থাকলে এ-রকম ব্যাপার ঘটল কি করে?

দু'চোখ দিয়ে যেন ঘৃণা ঠিকরে পড়ছে। আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, আমি কাউকে বলিনি বলিনি বলিনি! আর যেভাবে হোক কেউ যদি জেনেই থাকে, ওই মেয়েটাকে খুন না করে তারা লক্ষ্মীমাসিকে খুন করতে গেল কেন?

হিস হিস জবাব এল, একটু মাথা খাটালেই সেটা বোঝা সহজ। ওই মেয়ের নামে ছ-সাতটা ব্যাঙ্কে টাকা রেখে স্মাগলাররা তাদের ব্যবসা চালাচ্ছিল। দরকার মতো তাকে খুনের ভয় দেখিয়ে সই করিয়ে নেয়, তারপর ওষুধ খাইয়ে বেহুঁশ করে রাখে। সব টাকা সরানোর আগে তাকে মারলে হয়তো লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি তাদের, তার সই ভিন্ন ব্যাঙ্ক টাকা দেবে কেন!

বুকের ভিতরটা কাঁপছে আমার। মানুষ এমন পশুও হয়!

বাড়ি ফিরলাম। ভিতরটা রাগে আর গ্লানিতে ভরে যাচ্ছে। পাশের ঘরের এই লোক আমাকে বিশ্বাস করেনি ঘৃণা আর রাগ তার চোখে মুখে। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ যখন জানে না তখন সন্দেহ আমারই ওপর।...কিন্তু আশ্চর্য, এ-রকম ঘটনা ঘটল কি করে!

বিকেলে রমেশ আসতে বলে দিলাম, আজ শরীর মন কিছুই ভালো না, বেরুনো হবে না, আর বসতেও পারব ন, শুয়ে থাকতে ইচ্ছে।

সকৌতুকে ও আমার দিকে চেয়ে রইল একটু।—মুখ তো শুকনোই দেখছি, কিছু নিয়ে আবার ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে একপ্রস্থ হয়ে গেছে নাকি?

না, কাল এসো, কাল কথা হবে।

কাল তো রবিবার, কখন আসব?

বিকেল চারটে নাগাদ এসো।

সে চলে গেল। আমি একলা ঘরে ছটফট করতে লাগলাম। আমাদের জন্যেই লক্ষ্মীমাসির প্রাণটা গেল, ঘরের এই লোক সে-কথা একবারও ভাবছে না।

রাতে ভালো ঘুম হল না। নানারকমের দুঃস্বপ্ন দেখলাম।

পরদিন সকালে থমথমে মুখে বিনায়ক গাড়ি হাঁকিয়ে বোরিভিলি চলে গেল। সকালের ব্রেকফাস্ট খাইয়ে সহেলিও তার গ্রামের বাড়িতে ছুটি ভোগ করতে গেল। আমার দুপুরের রান্নাটাও সে সেরে রেখে গেছে। পাট টাইম বেয়ারা বা মালী রবিবার আসেই না।

আজ মনে হল বাংলোটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। লক্ষ্মীমাসির কথা বার বার মনে পড়ছে। বিনায়কের ঘৃণা মাখা চাউনিটা যেন আমার গায়ে লেগে আছে।

মাথার মধ্যে একটা চিন্তার জট পাকাতে লাগল। আমরা দু'জনে যখন মাত্র জানি তখন কি করে কি হতে পারে? সেই প্রাণভয়ে ভীত আধমরা মেয়েটাকে যেদিন এখান থেকে সরানো হল, সেই দিন বিকেল থেকে সব কিছু খুঁটিয়ে ভাবতে লাগলাম আমি। এই ভাবনা যেন পেয়েই বসল আমাকে। দুপুরের খাওয়াও হল না ভালো করে। ভেবেই চলেছি। ভাবনার মধ্যে কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।... বিনায়ক প্যাটেল...আমি...রমেশ সামতানি...সহেলি...সেই আধমরা মেয়েটা...লক্ষ্মীমাসি...দুধের ক্যানটিন...বোতল নিয়ে আবার ফিরে এসে রেখে যাওয়া...একশো গজ দূরের মস্ত গাছের ওধারে খুন...পুলিশের রিপোর্টে একেবারে কাছের থেকে খুন, পাঁজরের সঙ্গে রিভলবার ঠেকিয়ে।...আগের মেয়েটাকে রেখে বাড়ি ফেরা...দরজা খোলা...দরজা বন্ধ করার সম্পর্কে সহেলির মিথ্যে কথা বলা...

কি যে আমার মাথায় আসছে আমি নিজেই সঠিক বুঝছি না। যা আসছে সেটা আবার জোর করেই ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু তত বেশি যেন সেটা মগজে চেপে বসতে চাইছে। হঠাৎ বিদ্যুতস্পৃষ্টের

মতো চমকে উঠলাম আমি। একটা ষষ্ঠ চেতনার ঘায়ে যেন কয়েক মুহূর্ত অসাড় হয়ে থাকলাম আমি। তারপর ছুটে লাইব্রেরিতে এলাম। তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে তাকালাম।

তারপরেই ছুটে বেরিয়ে এলাম।—সহেলি! সহেলি! কিন্তু সহেলিকে কোথায় পাব? সে তো এতক্ষণে তার গাঁয়ের বাড়িতে। কিন্তু তাকে যে ভয়ানক দরকার আমার। চেনা থাকলে তক্ষুণি আমি ট্যাক্সি করে তার বাড়ি চলে যেতাম।

অস্থির চিত্তে নিজের ঘরে এসে বসলাম। আবার উঠে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। মাথার মধ্যে পাকানো জটটা খুলে যাচ্ছে। আমার সমস্ত মুখ উত্তেজনায় রক্তবর্ণ। খুব সঙ্কটের মুহূর্তে আমার ষষ্ঠ অনুভূতি সর্বদাই আমাকে কিছু যেন বলে দেয়। তার যা ইঙ্গিত তাতে শরীরের রক্ত হিম হওয়ার দাখিল আমার।...কিন্তু এ-ছাড়া আর কি হতে পারে?

আর হতে পারে কি?

ঘড়ি দেখলাম, তিনটে পনেরো।

ছুটে গিয়ে বোরিভিলিতে ফোন করলাম। মাসির গলা। প্রাণপণ শক্তিতে গলার স্বর সংযত করে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের ছেলে কোথায়?

এই এদিক-ওদিক হাঁটতে বেরিয়েছে একটু। কেন বল তো, বিনুর মন মেজাজ আজ খুব খারাপ মনে হচ্ছে!

হবারই কথা। শুনুন, সে ফেরা-মাত্র তাকে জানাবেন আমি ফোন করে বলেছি, হদিশ মিলেছে। শুধু এই কথা বললেই সে বুঝবে। তাকে ধরার জন্যে আপনি কাউকে পাঠিয়ে দিন। খবর পাওয়ামাত্র সে-যেন আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টারের মধ্যে বাড়ি চলে আসে। আমাকে আর টেলিফোন করার দরকার নেই, তবে আসতে দেরি হলে আমি মুশকিলে পড়ে যেতে পারি। একটুও দেরি করবেন না, আর ফোন করবেন না, শুধু দেখুন সে কোথায়।

রিসিভার রেখে দিলাম। এবারে যে ভাবেই হোক সহজ স্বাভাবিক হতে হবে। আমি অভিনেত্রী। এটুকু পারব না?

মুখে চোখে জল দিয়ে আগে একটু ঠাণ্ডা হলাম। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে নিলাম। তারপরে একটা সিনেমার পত্রিকা হাতে করে লাইব্রেরিতে এসে বসলাম। ঠিক চারটেয় রমেশ সামতানি লাইব্রেরিতে এলো। আমি হাসি মুখে সিনেমা-পত্র রাখলাম।

সামনে বসে রমেশ বলল, আজ তো বাড়িতে একলা তুমি, চল বেরিয়ে পড়া যাক।

বললাম, বেরুতে ভালো লাগছে না, মাথাটা ভয়ানক ধরেছে। তাছাড়া মনটাও বেজায় খারাপ। ঘরে বসেই গল্প করা যাক।

বেশ। মন খারাপ কেন? দিব্বি তো নতুন ছবিতে আবার কাজ শুরু করছো। আর এদিকে বছর কাবার হতে মাস চারেকও বাকি নেই।

তারপর বিয়ে?

তারপর বিয়ে?

হাসলাম। চা বা কফি কিছু খাবে?

নাঃ থাক্।

খাও না, তুমি খেলে আমিও একটু খাই।

কে করে দেবে, বাড়ি তো ফাঁকা।

ওমা, এটুকু আমি করতে পারব না। ব'সো, করে আনছি।

ইচ্ছে করেই একটু বেশি সময় নিলাম। ঘড়ি দেখছি। চারটে পনেরো। সোয়া তিনটেয় ফোন করেছিলাম খবর পেয়ে থাকলে এতক্ষণে অনেকটা পথ চলে আসার কথা।

কফি আর বিস্কিট নিয়ে ঢুকলাম। সামনের টেবিলে ট্রে রেখে বড় টেবিলটার দু'দিকে দু'জনে বসেছি। কফি খেতে খেতে টুকটাক গল্প চলল। রমেশ আবার বলল, চল বেরিয়ে পড়া যাক, মাথা ধরা ছেড়ে যাবে।

না, সত্যি ভালো লাগছে না। বেশ তো গল্প করছি। আমাকে বাইরে নিয়ে বেরুলেই তোমার কেবল দুষ্টুমি বুদ্ধি মাথায় চাপে।

হাসতে লাগল।—দেখ, বাড়িয়ে বোলো না, সেদিনের পর থেকে লোভে হাড় পাঁজর দুমড়ালেও নিজেকে সামলে চলছি।

হাসছে বটে। কিন্তু চোখে লোভ চিক চিক করছে। ওর অলক্ষ্যে হাতঘড়ি দেখে নিলাম। চারটে পঁয়ত্রিশ। এবারে শুরু করা যেতে পারে। আচ্ছা মিস্টার রমেশ...

বিয়ের পরেও কি আমাকে তুমি মিস্টার রমেশ বলে ডাকবে নাকি!

কেন, এ ডাক তো তোমার ভালোই লাগে।

ঠিক আছে, বল।

আমার এই প্রোডিউসারের কাছে তোমার অনেক টাকা খাটছে...না?

এ-খবর তোমাকে আবার কে দিলে?

নিজেই বুঝি। অনেকদিন তো হয়ে গেল।

হৃষ্ট মুখে জবাব দিল, খুব অনেক নয়, লাখ পঞ্চাশ ষাট খাটছে।

ও বাবা, এ-টাকাও তোমার কাছে অনেক নয়, তাহলে কত টাকা আছে তোমার! ভালো কথা, মহরতের দিন প্রোডিউসার তো নিশ্চয় নেমন্তন্ন করেছিল তোমায়, তুমি যাওনি কেন?

ও-সব ভালো লাগে না...তাছাড়া একটু কাজও ছিল।

ও। এত আনন্দে কাটলো দিনটা, কিন্তু পরদিন কি যে মন খারাপ হয়ে গেল কাগজ পড়ে।...আচ্ছা, শিবলির লক্ষ্মী যোশীকে তো তুমি চিনতে, তাই না?

কে লক্ষ্মী যোশী?

বা রে, মংগেশ যোশীর বউ, সেই লোনাভালার আউট হাউসে থাকত!

হ্যাঁ মনে পড়েছে। কেন তার কি হয়েছে?

কাগজে পড়নি? শিবলিতে একটা বড় গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়ে কে তার পাঁজরে রিভলবার ঠেকিয়ে গুলি করে মেরেছে।

আ-হা তাই নাকি। আমার অত খুঁটিয়ে কাগজ পড়া হয় না।

তোমার আর সময় কোথায়। কিন্তু সেই থেকেই ব্যাপারটা ভাবছি আমি। ক্যানটিন থেকে লক্ষ্মীমাসি দুটো দুধের বোতাল নিয়ে বেরিয়ে ছিল, তারপর বেরিয়ে এসে হয়তো গাড়িতে চেনা কাউকে দেখেই বোতল দুটো আবার ক্যানটিনে রেখে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে মাঠ ভেঙে সেই বড় গাছটার দিকে গেছে। চেনা লোক, তাই তার একটুও সন্দেহ হয়নি। সেই লোক আচমকা পাঁজরে রিভলবার ঠেকিয়ে তাকে গুলি করে মেরেই ফিরে এসে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছে। এ ছাড়া আর কি হতে পারে বল তো?

রমেশ সামতানি হাঁ করে খানিক চেয়ে রইল আমার দিকে।—কিন্তু হঠাৎ ওই বুড়িকে মারার স্বার্থ কি?

স্বার্থ বুড়ির বাড়ি থেকে প্রাণের ভয়ে অর্ধ উন্মাদ একটি মেয়েকে সরিয়ে আনা। ...এক বিরাট গোল্ড আর হাসিস স্মাগলারের দলের সঙ্গে সে যুক্ত ছিল। প্রাণের ভয়ে কোনোরকমে আধমরা অবস্থায় পালিয়ে আসে। তার অনেক নাম—এক-একটা নামে-এক-এক মোটা টাকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অপারেট করত বোধহয়। প্রাণের ভয় দেখিয়ে আর মাদক ওষুধ খাইয়ে বা ইনজেক্ট করে তাকে প্রায় শেষ করে আনা হয়েছিল। রমেশ সামতানির তখনো হাসি-হাসি মুখ। কিন্তু চাউনি বদলাচ্ছে।—হাউ ইন্টারেস্টিং! তা সে শিবলিতে যোশির বাড়িতে গিয়ে উঠল কি করে?

আমি আর তোমাদের ব্যারিস্টার সাহেব নিজেদের গাড়ি করে তাকে সেখানে রেখে এসেছিলাম। আমরা দু'জন ছাড়া দুনিয়ায় কারো সে-কথা জানার কথা নয়।...সেই রাতে, যেদিন আমি আর তুমি এখানে বসে গল্প করছিলাম, সহেলি এসে বলল, সাহেব ডাকছে আর আমি চলে গেলাম—মনে আছে?;

হ্যাঁ..তুমিও গেলে আমিও গেলাম।

না, আমি আগে গেলাম। একটু বাদে ফিরে এসে দেখলাম তুমি নেই। তারপর তোমাদের ব্যারিস্টার আর আমি এই লাইব্রেরিতে বসে সেই অপ্রকৃতিস্থ মেয়েটাকে শিবলিতে সরাবার পরামর্শ করলাম।...আমাদের দুজনের বাইরে একটি প্রাণীরও তা জানার কথা নয়, তবু একজন সে খবর জানলো।

তাই নাকি! কে জানলো?

তুমি! তীক্ষ্ম স্বরে আমি বলে ফেললাম।

আমি! আমি কোথায় তখন?

তুমি তখন ওই পার্টিনেশনের আড়ালে আমরা দেখে ফেললে দেখতাম একটা বই-টই খুঁজছো। কিন্তু ওদিকে আমাদের তখন যাবারই কোনো কারণ নেই। ওই মেয়েকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম। ফিরে এসে দেখলাম বাইরের দরজা শুধু ভেজানো, অথচ সহেলি বলল সে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করেছে। অর্থাৎ, সে আবার কিচেনে ফেরার পর তুমি লাইব্রেরি ঘর থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে চলে গেছ।...সমস্ত ব্যাপারটা কেমন লাগছে, রমেশ?

ওয়াণ্ডারফুল!

ভেরি ওয়াণ্ডারফুল। পরদিনের মহরতে তুমি আসনি কারণ তখন তুমি শিবলিতে সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছ। দুপুরে লক্ষ্মী বেরিয়ে যেতেই তুমি সেই মেয়েকে অজ্ঞান করে স্ক্রীন লাগানো গাড়ির পিছনে তুলেছ। কিন্তু ক্যান্টিনের সামনে লক্ষ্মী দেখে ফেলল তোমাকে। আনন্দে হয়তো চিৎকার করে উঠল। তার সঙ্গে তোমার শিবলিতে দেখা হবার খবর আমাদের কানে আসবেই। তাই কিছু দরকারী কথা বলার জন্যে তাকে মাঠের ভিতর দিয়ে গাছের ওধারে নিয়ে গেলে।...তারপর আর বলার দরকার আছে কিছু?

না না কিছু না। এই আষাঢ়ে গল্পটা ব্যারিস্টার সাহেবও শুনেছেন তো?

তিনি আসছেন, এসে শুনবেন।

সেই মুহূর্তে মনে হল কি প্রচণ্ড একটা ভুল করে ফেললাম।

দু'চোখ চিকচিক করছে রমেশ সামতানির। ঠোঁটে হাসি। উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা শিশি বার করে রুমালে কি ঢাললো। চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে আমি তিন পা সরে দাঁড়ালাম।—কি করছ?

আমি কিছুই করতে চাইনি, কিন্তু কেন যে তোমার এত বুদ্ধি...কেন যে এত জানতে গেলে। অথচ আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি...সেই কবে থেকে ভালোবেসে আসছি। এত ভালোবাসি বলেই লীলা সামতানির এই আধা-উন্মাদ অবস্থা এখন..তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অপারেশন শেষ হলেই আমার জীবনে তার প্রয়োজন ফুরাত—তুমি আসতে।

সে একটু করে এগোচ্ছে। বিবর্ণ মুখে আমি সরে যাচ্ছি।...তোমার জন্যেই আরো কত না মেহনত করেছি, অবশ্য টাকাও দরকার ছিল... আমিও তোমার বাবাকে নিখুঁত জালে ফেলার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে বোম্বাই ছেড়ে চলে গেছি।...আর তুমি কি আমার এত পরিশ্রমের এই প্রতিদান দিলে—

আরক ভেজানো রুমাল হাতে সে হাসিমুখেই এগিয়ে আসছে। আমার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। এখনও সে আসছে না কেন?

কিচ্ছু ভয় নেই। তোমাকে আমি ভালোবাসি—বেশি কষ্ট দেব না। একটু বাদেই অজ্ঞান হয়ে যাবে তুমি। তারপর আর কিছু টেরও পাবে না—দু'মিনিটের মধ্যে আমার কাজ শেষ করে চলে যাব।...আমার কি দোষ, এত জানা কি ভালো? তুমিই বল।—

আরো এগিয়ে আসছে। পার্টিশনে আমার পিঠ ঠেকে গেল। আমি তীব্রস্বরে একটা চিৎকার করে উঠতে চাইলাম। কিন্তু চিৎকারটা বেরুবার আগেই রুমালসুদ্ধ হাত মুখে চাপা দিল। তখনো বলছে, ডোন্ট্ ওয়ারি, আমার কাছে রিভলবার আছে, বাট ইট্ উইল বি পিসফুল—আই লাভ টু ডু মাই ওউন লিট্‌ল থিংস দি কুইকার দি বেটার।

লোহার মতো হাতে রুমালটা মুখে আর নাকে চেপে ধরে আছে। প্রাণপণ শক্তিতে আমি ছাড়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শরীর অবশ হয়ে আসছে।...জ্ঞান হারাচ্ছি। চোখে রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসছে।

...বাইরে কতগুলো পায়ের শব্দ, তারপর একটা গুলির শব্দ, তারপর আর মনে নেই। মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হল, আমি হাসপাতালের একটা কেবিনে। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে বিনায়ক প্যাটেল। এত কোমল এত উদ্বিগ্ন চাউনি কেন...।

কেমন আছ?

বললাম, ভালো।

সে কোথায়?

রমেশ সামতানি?...

সে ফাঁকি দিয়েছে আমাদের। আমি পুলিশের লোক সঙ্গে করে এনেছিলাম। হাত তুলে দাঁড়াতে বলার ফাঁকেই সে পকেট থেকে রিভলবার বার করে নিজেকে গুলি করেছে।

...বিকেলের দিকে আরো একটু সুস্থ হয়ে তার আসার আগের মোটামুটি ব্যাপারটা বলতে গিয়ে আবার শ্রান্ত আমি।

সে আমার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে থামালো।—আর নয় সব বুঝেছি। মুগ্ধ কোমল নরম চাউনি। একটু বাদে আবার সামনে ঝুঁকে বলল, আমরা মিথ্যেই অনেক সময় নষ্ট করেছি, আর নষ্ট করার দরকার আছে?

আমি চেয়ে আছি। চোখের কোণ দুটো শিরশির করে উঠল। তারপর জলে ভরে গেল। ঝুঁকে পড়া মুখটা ঝাপসা লাগছে। তবু মনে হল এত সুন্দর কোমল নরম একখানা মুখ জীবনে দেখিনি।

মাথা নাড়লাম। দরকার নেই।

হৃদয়ের পথে খুঁজো

উৎসর্গ

অজিতকৃষ্ণ বসু

প্রিয়বরেষু

এক

সমস্ত পশ্চিম আকাশ জুড়ে একটা লালের খেলা চলছিল। তার নীল ত্বকের ঠিক নীচ দিয়ে বিদায়ী সূর্য লালের আভা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

বই হাতে গৌরী সিদ্ধান্ত অনেকক্ষণ আগে ছাদে উঠে এসেছিল। মস্ত ছাদ। এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করতে করতে যেমন পড়ে তেমনি পড়তে চেষ্টা করছিল। কিন্তু বইয়ের অক্ষরগুলোর সঙ্গে দৃষ্টির যোগ বার বার ব্যাহত হচ্ছিল। আসলে মনটাই বিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেই থেকে। শেষে পড়ার চেষ্টা ছেড়ে কার্নিশের সামনে দাঁড়িয়ে লালে-নীল মেশা পশ্চিমের ওই ঘোলাটে আকাশের দিকে চেয়েছিল।

এখানকার মানুষগুলো রঙের স্তাবক। এখনো যেন তারা ইতিহাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে—যে ইতিহাসের শিরায় শিরায় রঙের ছড়াছড়ি। তার উত্থান আর পতনের রঙ, তার সৃষ্টির আর ধ্বংসের রঙ, তার সংস্কৃতি-সৌষ্ঠব-মিতাচার আর বিলাস-ব্যসন-ব্যভিচারের রঙ, তার দয়া-দাক্ষিণ্য-উদারতা আর দীনতা-হীনতা-ক্রূরতার রঙ—সবই বড় আশ্চর্য রকম স্পষ্ট ছিল সেদিন। মূলত নবাবী দেশের সেই ইতিহাসের মানুষগুলো ছিল অদম্য ভোগ আর, অবাধ রসের কারবারী। নবাব-বাদশা থেকে তাদের দাস-দাসীরা পর্যন্ত। এই ভোগ আর রস কখনো তাদের মাধুর্যের শিখরে টেনে তুলেছে, কখনো বা কবরের তলায় ঠেলে পাঠিয়েছে।

ইতিহাসের সেই জীবন্ত সূর্য অস্ত গেছে অনেক দিন। কিন্তু আজকের মানুষগুলোর মনে পশ্চিমের ওই নীলে মেশা ঘোলাটে লাল আকাশের মতো স্মৃতির আভা ছড়িয়ে আছে এখনো। গৌরী সিদ্ধান্ত ঠিক এই নবাবী মাটির মেয়ে নয়। কিন্তু ঠাকুরদার বাবার আমল থেকে উত্তরপ্রদেশের এই ইতিহাস-ঠাসা শহরে বাস তাদের। ঠাকুরদার বাবা ছিলেন ফৌজী অফিসার—সেদিনের ইংরেজ শাসকদের নেক-নজরের এবং দিশী মানুষদের কু-নজরের মানুষ। কবে কোন্ কোন্ ঘটনায় সেদিনের সেই মায়া-মমতা শূন্য দুর্ধর্ষ ইংরেজ শাসকদের সহায় হয়েছিলেন ঠাকুরদার ফৌজী বাবা, সে গল্পও গৌরীর শোনা আছে। ইংরেজের দেওয়া অস্ত্র তাঁর হাতে কত সময় কতবার দেশের মানুষের মাথায় বজ্র হেনেছে—খুঁজলে তারও একটা রেকর্ড মিলবে বোধহয়। গৌরী এমনও শুনেছে ইংরেজের সেই নেক-নজরের মানুষটির ওপর ইংরেজের থেকেও বেশি রাগ ছিল ইউ, পি-র মানুষদের। তাঁকে হত্যা করার অনেক চেষ্টা হয়েছে, অনেক রকমের ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু সেই ফৌজী নায়ক আগে থাকতে নাকি বিপদের ঘ্রাণ পেতেন। তাই বিপদের জাল বিছোতো যারা নিজেরাই তারা সেই জালে আবদ্ধ হত। শাস্তি পেত।

এ-সবই অতি পুরনো কথা। প্রায় ইতিহাসের কথা। আজ আর সে কথা কেউ মনে করে বসে নেই। কালে-জলে সে ইতিহাস ধুয়ে মুছে গেছে। গৌরী এ-সব গল্প যখন শুনেছে, চোদ্দ-পনের বছর মাত্র বয়েস তখন। শুনে ভয়ানক খারাপ লাগত তার। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করত না। অথচ অবিশ্বাস করার মতো মনের জোরও খুব একটা ছিল না। চোখ বুজলেই ইতিহাসের সেই মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তির দৃশ্য তার চোখে ভাসত। গায়ে কাঁটা দিত। কালের সেই রক্তাক্ত মঞ্চে এই বংশেরই কোনো মানুষের দোর্দণ্ড পদক্ষেপ কল্পনায় এলে ভিতরটা মুষড়ে পড়ত।

জ্যাঠামণিকে তখন প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত, তোমার ঠাকুরদা সত্যিই এ-রকম ছিলেন জেঠু, সত্যিই এই এই কাণ্ড করেছেন?

জ্যাঠামণি হাসতেন। হেসেই ওর মনের তলার অস্বস্তি মেশানো যন্ত্রণা দূর করে দিতে চেষ্টা করতেন। বলতেন, তোকে এ-সব গল্প কে বলে, আর এত মন দিয়ে এ-সব শুনতেই বা যাস কেন?

—বা রে, পুরনো দিনের কথা উঠলে দাদারা যে এ-সব বলে—দাদুর খুব সুখ্যাতি করে, আর তার বাবার যাচ্ছেতাই নিন্দে করে।

জ্যাঠামণি হেসে সায় দিতেন, বলতেন, হ্যাঁ দুজনকেই তো ওরা স্ব-চক্ষে দেখেছে, জেনেছে, বুঝেছে—

জ্যাঠামণি একদিন মাত্র অন্যরকম কথা বলেছিলেন। কত বছর আগের কথা, গৌরীর আজও স্পষ্ট মনে আছে। বলেছিলেন, আমাদের কোনো না কোনো পূর্ব পুরুষ তো কাঁচা মাংসও খেত—তাতে কি প্রমাণ হল? তারপর খানিক চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন, ওই ঠাকুরদাকে আমরা চোখেও দেখিনি, তোদের মতোই তাঁর গল্প শুনেছি। ... কিন্তু বাবাকে দেখেছি, তাঁকে অনেকটা জেনেছি, বুঝেছি— আর তাঁকে দেখেই মনে হয়েছে তাঁর বাবার সম্পর্কে যা শুনেছি তার সবটা হয়তো সত্যি নয়। আমাদের সেই ফৌজী অফিসার ঠাকুরদা নিজের বিশ্বাসে অটল ছিলেন, আর মনিবের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন—সেই বিশ্বাস আর কৃতজ্ঞতা তাকে হয়তো লোকের চোখে অনেকখানি নির্মম করেছে। ...তাঁর বিচার বুদ্ধির ভুল হতে পারে, কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ ছোট ছিল বাবাকে দেখে অন্তত সেকথা একটুও বিশ্বাস হয় না।

জ্যাঠামণির এ-কথা শুনে সেদিনের সেই কিশোরী মেয়ে অথৈ জলের মধ্যে একটা যেন অবলম্বন পেয়েছিল। জ্যাঠামণির যখন ওই বিশ্বাস, ওর বিশ্বাসে আর ঘুণ ধরায় কে?

তারপর থেকে এ প্রসঙ্গ একটু একটু করে সয়ে গেছে। ধীরে, ধীরে মুছেও গেছে। সকাল হলে আগের রাতের অন্ধকারটুকু পর্যন্ত মনে থাকে না, এ তো কোন্ এক কালের ইতিহাস প্রসঙ্গ। কাঁচা-মাংস খাওয়া সেই প্রাচীন পূর্ব-পুরুষের মতোই পুরনো প্রায়।

...কিন্তু দীর্ঘকাল বাদে গৌরী সিদ্ধান্তর বুকের তলায় সেই বিস্মৃত সংশয়ের ওপর নতুন করে যেন একটা থাবা বসিয়ে গেছে কেউ। অজানা অদেখা বংশের সেই পুরনো ঘা-টাকে নৃশংস উদ্দীপনায় কেউ বুঝি খুঁড়ে খুবলে তাজা করে তুলতে চেয়েছে। প্রমাণ করতে চেয়েছে ইতিহাসের রক্ত শুকোয় না।

...আপোসশূন্য এই নির্মম উদ্দীপনা যার, সে বোধহয় এখনো গৌরীর সব থেকে কাছের মানুষ। এই কারণেই দ্বিগুণ দাহ, দ্বিগুণ যাতনা। ...গতকাল লালবাগের মিটিং-এ সহস্র শ্রোতার উৎসুক কানে যে আগুন ঢেলেছে কমল চ্যাটার্জী, তার সবটুকু গৌরীর কানেও এসেছে। ও সবই শুনেছে।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে এই বংশের মুখে কালি ঢেলে একজন কালো আর আলোর তফাত বুঝিয়েছে শ্রোতাদের। কিন্তু যে বুঝিয়েছে সেই লোকও ভালো করেই জানে, ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে মসিলিপ্ত সত্য যদি কিছু থেকেও থাকে, পরের অধ্যায়ে তারই থেকে জ্যোতির আলো ঠিকরেছে। বংশের সত্যমিথ্যে সমস্ত দুর্নাম সমস্ত কালিমা মুছে দিতে পেরেছিলেন সেই ফৌজী পুরুষের প্রথম সন্তান, অর্থাৎ গৌরীর ঠাকুরদা। অনেক লেখাপড়া শিখেও ইংরেজেরে গোলামী করতে ছোটেননি তিনি। স্বাধীন ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছিলেন।

আমদানি রপ্তানির সেতু ধরে এ-সংসারে কমলার পদার্পণ ঘটেছিল। ঠাকুরদা যখন হঠাৎ চোখ বোজেন গৌরী তখন সাত-আট বছরের ফ্রক-পরা মেয়ে। বাবা তখন বিলেতের কোন্ হাসপাতালে হাত পাকাচ্ছেন। বাড়িতে গার্জেন বলতে শুধু জ্যাঠা ছিলেন।

অল্প বয়সে হারালেও ঠাকুরদাকে আজও স্পষ্ট মনে আছে গৌরীর। বাবার ঘরে তাঁর মস্ত একখানা ছবি টাঙানো আছে বলে নয়, পনের-ষোল বছর আগের সেই মুখখানা আপনা থেকেই চোখে ভাসে তার। অমন একখানা উঁচু মাথার জ্বল জ্বলে মূর্তি গৌরী আর বোধহয় দেখেনি।

ব্যবসায় অঢেল টাকা ঘরে আনলেও বিত্তের নেশা ছিল না ঠাকুরদার। ছোট গৌরী তখন অত-শত জানত না বা বুঝত না। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকের মুখে শুনে-শুনে জেনেছে, বুঝেছে। শুনেছে সঞ্চয়ের ব্যাপারে একেবারে বিপরীত স্বভাবের মানুষ ছিলেন ঠাকুরদা। গৌরীর বাবা কথা কম বলেন, তাছাড়া সদাব্যস্ত মানুষ তিনি। গৌরী আর তার দাদারা ঠাকুরদার গল্প শুনত জ্যাঠার মুখে। ঠাকুরদার কথা উঠলে জ্যাঠার চোখে-মুখে এখনো আলো ঠিকরোয়। তাঁর বাবার এত টাকা ছিল যে ইচ্ছে করলেই তিনি নাকি এই গোটা লক্ষ্মৌ শহরের দশ ভাগের এক ভাগ কিনে রাখতে পারতেন।

তখন তো জলের দর ছিল সব কিছুর। কিন্তু সে-রকম ইচ্ছে কখনো হয়নি তাঁর। প্রকাশ্যে আর অপ্রকাশ্যে কত যে দান ছিল তাঁর বাবা-জ্যাঠার মা-ও না কি খবর রাখতেন না। সেই জানা গেল ঠাকুরদা চোখ বোজার পর। মাস গেলে কত জায়গায় কত লোকের কত টাকা সাহায্য বরাদ্দ ছিল তোরঙ্গ থেকে তার একটা লিস্ট বেরিয়েছিল না কি। কম করে হাজার চারেক টাকা হবে তার যোগফল। গৌরীর এখনো শুধু মনে আছে ঠাকুরদা মারা গেছে খবর পেয়ে কত অচেনা মুখ বাড়িতে এসে ভিড় করেছিল আর কান্নাকাটি করেছিল ঠিক নেই। পরে অনুমান করেছে সেটা দ্বিতীয় দফা আশ্রয় খোয়ানোর শোক তাদের।

জ্যাঠার মতে ঠাকুরদার সব থেকে বেশি দরদ ছিল স্বদেশী অলাদের প্রতি। গোপনে গোপনে তিনি তাদের বহু টাকা দিতেন। শুধু টাকা কেন, নিজেকে বিপন্ন করে এক স্বদেশী ফাঁসির আসামীকে পর্যন্ত আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি। অনেক চেষ্টার পর তাকে বিদেশের নিরাপদ ভূমিতে চালান করে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছিলেন। ধরা পড়লে সেদিনের শাসন-যন্ত্র ঠাকুরদাকে ক্ষমা করত না। এ-বাড়ির সকলেই জানে ঠাকুরদা তাঁর বাপের কলঙ্ক মুছে দিতে চেয়েছিলেন। মুছে দিয়ে গেছেনও। সেদিন এই গোটা অখণ্ড দেশটার যাঁরা কর্ণধার ছিলেন, অর্থাৎ পরাধীনতা ঘোচাবার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন যাঁরা, ঠাকুরদার আমলের সেই প্রথম সারির মানুষদের প্রায় সকলেই কোনো না কোনো সময়ে এ-বাড়িতে পদার্পণ করে গেছেন।

সে এক মস্ত গৌরবের স্মৃতি। আর কেউ না হোক জ্যাঠা অন্তত মনে করেন এ-বাড়ির ধূলিকণা বাতাসও শুচিশুদ্ধ।

গৌরীর ধারণা, ঠাকুরদার স্বভাবের সেই আবেগের দিকটা এক মাত্র জ্যাঠা পুরোমাত্রায় পেয়েছেন। বাবা প্রধানতম সরকারি ডাক্তার এখানকার। একমাত্র চিকিৎসা জগত ভিন্ন তাঁর বিচরণের পরিধি সংকীর্ণ। অবকাশও কম। স্বাস্থ্যগত বিষয় ভিন্ন দেশ বা দেশের মানুষ সম্পর্কে তিনি নিজস্ব কোনো মতো পোষণ করেন কি না কেউ জানে না। স্বল্পভাষী গম্ভীর মানুষ। অসুখ-বিসুখ না হয়ে পড়লে কেউ তাঁর নাগাল পায় না। এমন কি জ্যাঠাও তাঁর ভাইটিকে বেশি ভালোবাসে কি সমীহ বেশি করে বলা শক্ত।

গৌরীদের তিন ভাই-বোনের জগত গড়ে উঠেছে মা আর জ্যাঠাকে কেন্দ্র করে। মা অমিয়া কলকাতার মেয়ে। বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু একমাত্র উনি। তিন পুরুষের এই প্রবাসী পরিবারের মধ্যে এসে পড়ে মায়ের আশঙ্কা ছিল, এ-সংসারে বাঙালিয়ানার অস্তিত্ব থাকে কি থাকে না। মায়ের মুখে শুনেছে, স্থানীয় কোনো অন্তরঙ্গজন বাড়ি এলে বাবা আর জ্যাঠা তাঁর সঙ্গে হিন্দিতে গল্প করেছেন, কিন্তু ভদ্রলোক উঠে যাবার পরেও নিবিষ্ট মনে দু' ভাই নিজেদের মধ্যে হিন্দীতেই কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ-রকম না কি অনেক দিনই হয়েছে। আর মা কলকাতায় থাকলে বাবা তাঁর কাছে ইংরেজিতে চিঠি লিখতেন বলে মাসিরা হাসাহাসি করত।

অতএব এ-সংসারে বাঙালিয়ানা বজায় রাখার ব্যাপারে মা গোড়া থেকে সচেতন ছিলেন। রাখতে যে পেরেছেন তার সবটুকু কৃতিত্বের দাবিদারও তিনিই। মা কলকাতার কলেজে পড়তেন, কবিতা-টবিতাও এককালে লিখতেন নাকি। সচ্ছল ঘর থেকে আরো সচ্ছল ঘরে এসেছেন। নিশ্চিন্ত অবকাশে তাঁর দিক থেকে যে-কোনো উপলক্ষে আমন্ত্রণ এলেই তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতার গাড়িতে চেপে বসতেন। ছেলেবেলায় গৌরীরা বছরের মধ্যে পাঁচ-ছ' বারও কলকাতায় মামাবাড়িতে এসেছে। ওরা অনেকটা বড় হবার পর এই যাতায়াত কমেছে। আর ইদানীং তো বছরে দু'বছরে একবার যাওয়া হয় কি না হয়। এখানে ওদের স্কুল-কলেজে পড়াশুনার ব্যাপারেও মায়ের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। হিন্দী আবশ্যিক সাবজেক্ট যখন পড়ো আপত্তি নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে অপশন্যাল সাবজেক্ট হিসেবে বাংলা না পড়লে অব্যাহতি নেই, দাদাও ডাক্তার। এখানে ডাক্তারি পড়তে ঢোকার আগে দাদা বলেছিল, মেডিক্যাল কলেজে পড়া-টড়া হবে না।

মা অবাক। কেন?

ভালো মুখ করে দাদা জবাব দিয়েছিল, আর তো তাহলে বাংলা পড়া হবে না। মা হেসে ফেলে বলেছিলেন, ধরে দেব এক থাপ্পড়।

গৌরীরা শুনেছে স্কুল-কলেজের লেখাপড়ায় বাবার থেকেও ভালো ছেলে ছিলেন জ্যাঠা। ঠাকুরদার জীবদ্দশায় বারকয়েক স্বল্পমেয়াদি জেল খেটেছেন। তাঁর দেশপ্রীতিতে ঠাকুরদার উৎসাহ ছিল না, নিষেধও ছিল না। লেখাপড়ার পাট চুকতে জ্যাঠা কিছুদিন বেসরকারি কলেজে মাস্টারি করেছেন। যে ক'টা টাকা পেতেন দান-খয়রাতিতে যেত। চাকরি করার ধাত নয়, মাস্টারি বেশি দিন পোষাল না।

মাস্টারি ছাড়ার পর ঘর থেকে হাজার বারো টাকা বার করে এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসায় নেমেছিলেন জ্যাঠা। বাপের চালু ব্যবসায় নাক গলালে তাঁর কৃতিত্ব কেউ স্বীকার করবে না। সেই কৃতিত্ব দেখাবার ঝোঁকে ঘরের বারো হাজার টাকা জলে। সেটা যে বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার ফল এ জ্যাঠা কোনোদিন স্বীকার করেননি। ঠাকুরদাই এরপর নিজের ব্যবসায় টেনে নিয়েছেন তাঁকে। হেসে হেসে জ্যাঠা নিজেই গল্প করেছেন, বাবা ডেকে বললেন, আর কেন, যে ব্যবসা আছে সেটাকে লাটে তুলতে সময় লাগবে, নিশ্চিন্ত মনে ঢুকে পড়ো।

এই সময়েই না কি ঠাকুরদা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর। কিন্তু এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে জ্যাঠা তাঁর স্বাধীন সঙ্কল্প, অর্থাৎ বিয়ে না করার সঙ্কল্প অটুট রাখতে পেরেছেন। নিজের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে তাঁব আত্মাভিমান ছিল না একটুও। ঠাকুরদা মারা যেতে এতবড় ব্যবসা নিয়ে অথৈ জলে পড়েছিলেন তিনি। বিলেত থেকে চলে আসার জন্য বাবাকে ঘনঘন তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু বাবার জীবনের লক্ষ্য মোটামুটি স্থির। জ্যাঠার সেই ভাবপ্রবণ তাগিদে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। হলে জ্যাঠামণি নিজেই পস্তাতেন এখন। মস্ত সার্জন হয়ে ফিরে আসার পর বাবা ব্যবসায় নাক গলাবেন এটা কেউ আশা করেননি। তবু তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে জ্যাঠা আরো বছর দুই টেনেছিলেন ব্যবসাটাকে। তারপর হাল ছেড়েছেন।

বাবাকে জোর করে ধরে একদিন হিসেব বুঝিয়েছেন। প্রতি তিন মাসে কত করে লোকসান যাচ্ছে সেই হিসেব। আর বলেছেন, এই হারে চললে আর পাঁচ-সাত বছর বাদে ব্যবসার অ্যাসেট বলতে কিছু থাকবে না, আপিস-বাড়ির ইঁট-কাঠ পর্যন্ত তলিয়ে যাবে। তার থেকে সময় থাকতে বিক্রি করে দিলে কয়েক লক্ষ টাকা ঘরে আসতে পারে। ক্রেতা তাঁর হাতেই আছে।

বাবা আপত্তি করেননি। পৈতৃক ব্যবসা বেচে যে টাকা পাওয়া গেছে, সমান দু'ভাগ করে দু'ভাইয়ের নামে সে-টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়তে দু'জনেই নিশ্চিন্ত। বাবা খরচে মানুষ, মা আরো বেশি। তাছাড়া এ সংসারের প্রত্যক্ষ দায়িত্বও সব তাঁদেরই। ফলে গোড়ার দিকে অন্তত বাবার আয়ের থেকে ব্যয় বেশি গেছে। তখন মজুত টাকা ভাঙতে হয়েছে। তাছাড়া কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে মোটা খরচায় বাবা বিলেত থকে অনেক রকম ডাক্তারি সরঞ্জাম আনিয়েছিলেন। মোট কথা, বাবার টাকা কমেছে, আর জ্যাঠার টাকা সুদে আসলে বেড়েছে। ছেলেবেলায় জ্যাঠার একদিনের একটা ঠাট্টার কথা আজও মনে আছে গৌরীর। হেসে বাবাকে শুনিয়ে মাকে বলেছিলেন, খরচের ব্যাপারে তোমাদের দুজনেরই যে-রকম হাত-যশ দেখছি, শিগগীরই না ওকে আমার কাছে হাত পাততে হয়।

শুনে বাবা হেসেছিলেন। মা ঠিক হাসতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়নি।

জ্যাঠার নিজের সংসার না থাকলেও গৌরীর, এমন কি দাদাদেরও ধারণা, এ-সংসারের প্রতি জ্যাঠার টান বাবার থেকেও বেশি ছাড়া কম নয়। শুরু থেকেই ওদের তিন ভাই-বোনের ভবিষ্যত জ্যাঠার হাতে ছেড়ে দিয়ে মা-বাবা দু'জনেই নিশ্চিন্ত। দাদা-গৌরাচাঁদ, খুব ফর্সা, বছর চারেক হল ডাক্তার হয়েছে। পসার এখনো জমেনি তেমন। দাদার ধারণা এর জন্যে বাবা দায়ী। বাবার নামের চটকে তার প্রতিভা আচ্ছন্ন। চটক সংগ্রহের জন্য জ্যাঠা তাকে বাইরে চলে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু দাদার ঘরকুনো স্বভাব। তাছাড়া একমাত্র গৌরীই জানে এ বছর যে অবাঙালি মেয়েটি ডাক্তারি পাস করে বেরুবে, অনুপমা ভার্গব, তার প্রতি দাদার বিশেষ একটু দুর্বলতা আছে। মেয়ে বাঙালি হলেও এত দিনে জানাজানি হয়ে যেত। নয় বলে মায়ের ভয়ে গোপন। এর পরে কি করে সামলাবে দাদাই জানে। কিন্তু মা আঘাত পেলেও গৌরী দাদার দোষ দিতে পারবে না। অমন মেয়েকে দেখেও

পুরুষের মুণ্ডু যদি না ঘোরে তো তার পুরুষকার সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হবার কথা। দাদা বলে, মেডিক্যাল কলেজের মাঝবয়সী মাস্টাররাও মন দিয়ে পড়াতে পারে না। পড়ানোর দায়িত্ব দাদাই নিয়েছে। পড়ানো কতটা এগিয়েছে গৌরী বলতে পারবে না, মন দেওয়াটা যে অনেকখানি সম্পূর্ণ তাতে সংশয় নেই। ...খবরটা প্রথমে তাকে দিয়েছিল কমল চ্যাটার্জি। কিন্তু গৌরী প্রথমটা বিশ্বাস করেনি। দাদাকে জিজ্ঞাসা করতে রেগেই গেছিল। তাতেই গৌরীর সন্দেহ হয়, পরে দাদার ড্রয়ার থেকে অনুপমা ভার্গবের ফটো আবিষ্কার করেছে একখানা। এরপর দাদা ওর কাছে অন্তত আর গোপন করতে চেষ্টা করেনি। উল্টে একটু আগ্রহ নিয়েই তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে।...রূপ বটে। পটে আঁকা মূর্তি যেন একখানা। আর তেমনি হাসিখুশি। ওকে দেখে বইয়ে-পড়া এখানকার নবাব বাদশাদের হারেমের কথা মনে পড়েছে গৌরীর। দাদার অগোচরে তারপর একদিন হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল, এই চেহারা নিয়ে অক্ষত অবস্থায় তুমি মেডিক্যাল কলেজের এই লম্বা দেউড়ি পার হতে চলেছ কি করে?

অনুপমা ভার্গব হেসে সারা।

সেই থেকে দাদা একটু খাতিরই করে গৌরীকে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাকে সাহায্য যদি কেউ করতে পারে—একমাত্র মানুষ জ্যাঠা। তাঁর বিবেচনার প্রতিকূলে বাবা অন্তত একটি কথাও বলবেন না। আর জ্যাঠাকে বশ করতে হলে গৌরীর থেকে যোগ্য দূত আর কে? ছোড়দার হিসেবে জ্যাঠার যোলআনা আদরের মধ্যে আটখানার ভাগীদার গৌরী, বাকি চার আনার ওরা দু'জনে।

ছোড়দা—গৌরাঙ্গ, দাদার মতো অত ফর্সা না হলেও মোটামুটি ফর্সাই। বছর দুই হল লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে গেছে। দাদার মতো ছোড়দার ফিরে এসে কিছু খোয়াবার ভয় নেই, তাই জ্যাঠার উৎসাহ মেলা মাত্র মনস্থির। বাবার কানে গেল যখন, ব্যবস্থা তখন মোটামুটি পাকা। ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বাবা অনুযোগ করেছিলেন, আমাকে আগে থাকতে বলবি তো। কত টাকা লাগবে হিসেব করেছিস?

জবাবটা মা-ই দিয়েছেন। বলেছেন, ওদের লেখাপড়ার খরচা নিয়ে কবে আবার তুমি মাথা ঘামিয়েছ? যিনি দেন তিনিই দিয়েছেন, যা লাগবে সে-টাকা ওর নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়ে গেছে।

ছেলেমেয়ের ব্যাপারে বাবার এতটা উদাসীনতা মায়ের মনঃপূত নয় খুব। তাই সুযোগ পেলে একটু ঠেস দিতে ছাড়েন না। অনেক টাকা খরচা করে জ্যাঠা বাজারের রাস্তায় দাদার চেম্বার সাজিয়ে দিতে মা ঠেস দিয়ে বলেছিলেন, ওই একজন না থাকলে তোদের যে কি হত আমি খালি তাই ভাবি।

শুনে বাবা জবাব দিয়েছিলেন, একটা লোক থাকতে নেই-বাবার দরকার কি?

দুই দাদা গোরাচাঁদ আর গৌরাঙ্গের পর গৌরী। গৌর, গৌরাঙ্গ, গৌরী। নামটা অনেক সময় নিজের কানেই ঠাট্টার মতো লাগত গৌরীর। দাদার তো কথাই নেই, ছোড়দার পাশেও ওর গায়ের রঙ দস্তুর মতো চাপা। বাইরে যদিও মোটামুটি ফর্সা বলে চলে যেতে পারে, দাদাদের পাশে দেখলে ওই বিশেষণ কেউ দেবে না। স্কুলের ওপর ক্লাসে পড়তে অনেক সময় বলেছে, অত ঘটা করে দাদাদের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখার কি দরকার ছিল—কালী রাখলেই হত!

শুনে জ্যাঠাই সব থেকে বেশি হাসত। —কেন, তাকে কেউ কালো বলে না কি?

ছোড়দা তখুনি ফোড়ন দিত, আমাদের পাশে দেখলে বলে।

জ্যাঠাও ছাড়ার পাত্র নয়।—তোরা তাহলে ওর পাশ থেকে দূর হ।

আর একবার কলেজে পড়তে গৌরী মায়ের সামনেই বলে বসেছিল, বুঝলে জ্যাঠামণি, আমার পরে আর একটা ভাই বা বোন থাকলে সেটা নিশ্চয় নিগ্রো হত—বাই ল অফ্ ডিমিনিশিং রিটার্ন।

কলকাতা থেকে এক অল্পপরিচিত ভদ্রলোক এসে দাদাদের দু'জনকে বাবার ছেলে আর ওকে জ্যাঠার মেয়ে ভেবে নিয়েছিল। জ্যাঠা বিয়েই করেননি। ভদ্রলোক জানত না, আর বাবার তুলনায় আবার জ্যাঠার রঙ চাপা। সেই হাসির ব্যাপারের প্রসঙ্গে গৌরীর ওই মন্তব্য। মা মুখ লাল করে প্রস্থান করেছিলেন। আর জ্যাঠামণি হেসে চোখ পাকিয়ে ছিলেন। —আমার মেয়ের এত নিন্দে করবি তো তোর মুখে আমি দোয়াতের কালি লেপে দেব!

জ্যাঠার বয়েস বাষট্টি এখন। চুলগুলো সব ধপধপে সাদা। অথচ সে তুলনায় মুখখানা কাঁচা এবং তাজা। এ জীবনে নিজের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, কিন্তু রাজনীতি নিয়ে দস্তুরমতো মাথা ঘামান। এ

ব্যাপারে ক্লান্তি নেই, আহার নিদ্রার সময় অসময় নেই। চল্‌তি শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক এবং প্রিয়পাত্র। ঠাকুরদার সুনাম ভাঙিয়ে বড়দরের মন্ত্রী-টন্ত্রী কিছু হয়ে বসতে পারতেন। ইলেকশনে দাঁড়াবার জন্যে দিল্লির উঁচুমহল পর্যন্ত অনেকবার অনুরোধ করেছেন তাঁকে। কিন্তু জ্যাঠার সে-লোভ নেই। যোগ্য ব্যক্তিকে সামনে এগিয়ে দেওয়া বা প্রতিষ্ঠিত করার দিকে ঝোঁক বেশি। তার হয়ে এই বয়সেও সক্রিয় কর্মীর মতো মিটিং করবেন, বক্তৃতা করবেন, দরকার হলে গাঁটের পয়সা খরচা করে দিল্লি পর্যন্ত ছোটাছুটি করবেন। এ-হেন নিঃস্বার্থ মানুষকে দলের লোক মুরুব্বির স্থানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে সেটাই স্বাভাবিক। পরামর্শের দরকার হলে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যপালও সাদরে বাড়িতে ডেকে পাঠান তাঁকে। আরো মজার কথা, বিপক্ষের অন্তরঙ্গ জনেরাও অনেক সমস্যায় জ্যাঠার পরামর্শ নিতে আসে। এবং বিশ্বাসও করে। অতএব স্বপক্ষের হোক বা বিপক্ষের হোক, জ্যাঠাকে চেনে না শহরে হেন লোক নেই।

রাজনৈতিক তৎপরতার বাইরে জ্যাঠার সময় কাটে বই পড়ে আর গৌরীকে নিয়ে। পড়তেও পারেন। কোন্ বিষয়ে যে তাঁর মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা নেই গৌরী জানে না। এই তো সেদিনের কথা, গৌরীর তখন বি, এ, ফাইন্যাল পরীক্ষা। পরীক্ষার ব্যাপারে দাদাদের থেকে ওর অনেক বেশি ঠাণ্ডা মাথা। তবু সেবারে কেমন হয়ে গেল, অনার্সের পাঠ্য সব কণ্ঠস্থ এক-রকম, কিন্তু পাস-সাবজেক্ট ইকনমিক্স-এর বই খুলে চোখে ধোঁয়া দেখতে লাগল। সময়ে বই উলটে পাশ নম্বরটা তুলে নিতে পারবে ভেবেছিল, কিন্তু কেন যেন আত্মবিশ্বাসে সেই একবারই ফাটল ধরেছিল। ফলে চূড়ান্ত নার্ভাস।

জ্যাঠামণিরও নিজস্ব বিষয় ইতিহাস। গৌরীর অবস্থা বুঝে পাস-পরীক্ষার আগের রাতে ঘরে ডাকলেন ওকে, আয় দেখি কি করা যায়। তারপর চার-পাঁচ ঘণ্টার জন্য পলিটিক্স আর ইকনমিক্স-এর গল্পের রাজ্যে ঘুরে বেড়ালেন ওকে নিয়ে। এ বিষয়গুলোও যে এমন চিত্তাকর্ষক হতে পারে গৌরীর ধারণা ছিল না। জ্যাঠামণি তারপর বলেছিলেন, কপাল ঠুকে এবার পরীক্ষা দিতে বোসগে তো—পাসে তিরিশটা নম্বরের তো মামলা।

সে মামলায় যে-নম্বর পেয়েছিল গৌরী সেটা তার নিজের কাছেও বিস্ময়। জ্যাঠামণির মস্ত শোবার ঘরখানা যেন বইয়ের গুদোম একখানা। দেয়ালের চারদিক জুড়ে প্রায় ছাদ পর্যন্ত সারি সারি স্টীলের তাক। তাতে বই ঠাসা। একমাত্র গল্প কবিতা আর উপন্যাস ছাড়া দুনিয়ার আর সর্ব বিষয়ের বই দুই একখানা অন্তত মিলবে এখানে।

গৌরী এম. এ. পড়ছে এখন। এবারেই পরীক্ষা। বিষয় ইতিহাস। বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। এম. এ-তেও এ-সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে আশা। জ্যাঠা নিজেই বলেন, উনি কোনোকালে ফার্স্ট-ক্লাসের ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেননি। অতএব গৌরী তাঁর থেকে ঢের ঢের ভালো ছাত্রী। কিন্তু যা-ই তিনি বলুন, গৌরী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ইতিহাসের সত্যিকারের গুরু বলে যদি কেউ তাঁর থেকে থাকে তো এই একজন। ইতিহাসের বড় বড় বইয়ের সংশ্রবে আসার অনেক আগে থেকেই ওর মধ্যে এই বিষয়বস্তুর ভিত রচনা শুরু হয়ে গেছল। ইতিহাস-ভরাট এই নবাবী দেশে বাসের ফলে সেটা আরো সহজ হয়েছে। ইতিহাসের গল্প নাটকের মতোই জমজমাট হয়ে উঠত জ্যাঠার মুখে। নবাবী আমলের প্রতিটি বাড়ি, পুরনো রাস্তা, রেসিডেন্সির প্রতিটি স্মৃতিফলক আর কবরের মানুষ, নবাবী বিলাস ভবন, ছোট বড় ইমামবাড়া, দিলখুশা প্রাসাদ, সিকান্দরবাগ, শা নফাজ, মতিমহল, খুরশিদ মন্‌জিল, কায়সার বাগ, বেগম কোঠি, ছতর মন্‌জিল—ইত্যাদি অজস্র স্মৃতি জ্যাঠামণির চোখের দর্পণে যেন জীবন্ত একবারে। এখানকার ইতিহাসের সুতো ধরে জ্যাঠা একটু একটু করে গোটা ভারতবর্ষের চিত্রটা ওর চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তারপর আস্তে আস্তে সাগরপারের ইতিহাসের দিকে পাড়ি দিয়েছেন।

এক কথায় ইতিহাসের নেশা গৌরীকে উনিই ধরিয়েছেন।

এখানকার যে মানুষগুলো রঙের স্তাবক, এখনও স্মৃতি-ঠাসা ইতিহাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে যারা, গৌরীর মনটা এতদিন তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না খুব। কান পেতে সেও ইতিহাসের কাকলি

শুনত; পশ্চিমের ওই নীলে-মেশা ঘোলাটে লাল আকাশের মতো স্মৃতির আভা তার মধ্যেও ছড়িয়ে ছিল।

...কিন্তু আজ?

আজ ওই নীলে-মেশা লাল আকাশটাকে ছাল-চামড়া ছাড়ানো একটা দগদগে ঘায়ের মতো মনে হচ্ছে তার।

দুই

দিদিজী, কমলবাবু বোলাতে।

গৌরী চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। বাড়ির পুরনো ঝি মতিবাঈ। গৌরী মুখে কিছু বলল না। সামান্য মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ ঠিক আছে। মতিবাঈ চলে গেল। গত সন্ধ্যা থেকেই দিদিজীর মন-মেজাজ ভালো দেখছে না ও।

খবর শোনার পরেও গৌরী মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। মুখে একেএকে গোটাকয়েক কঠিন রেখা পড়তে থাকল।

পায়ে পায়ে দোতলায় নেমে এল। সিঁড়ির ওধারে জ্যাঠার ঘর। সামান্য এগিয়ে উঁকি দিল। বাড়ি নেই। বই হাতেই গৌরী একতলায় নেমে এলো। ঠাণ্ডা, গম্ভীর।

কৌচে গা এলিয়ে সিগারেট টানছিল কমল চ্যাটার্জী। প্রতি পাঁচ-সাত-দশ মিনিট অন্তর সিগারেট খায়। তেমন দামি সিগারেট নয় তাও। ডান হাতের দু'আঙুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত হলদে। বছর আড়াই তিন আগে এই ঘরে জ্যাঠা এর সঙ্গে প্রথম আলাপ করতে এসে এমন জমে গেছিলেন যে আর ওঠার নাম নেই। মা তখন নবাগত অতিথির জন্য চা খাবারের ব্যবস্থা দেখতে গেছেন।

কথার মাঝখানে হঠাৎ কি-রকম একটু ছটফট করে কমল চ্যাটার্জী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। —চলি।

জ্যাঠা ব্যস্ত। গৌরীও অবাক একটু, কারণ মা চায়ের কথা বলেই গেছেন। জ্যাঠাই বিস্ময় প্রকাশ করলেন, সে কি! বোসো বোসো—ওর মা চা আনতে গেলেন যে!

বিড়ম্বিত মুখে সেদিন ওই ছেলে যা জবাব দিল শুনে গৌরীরই চক্ষুস্থির। বলল, ইয়ে—মুশকিল হয়েছে, আমার একটা বিচ্ছিরি রোগ আছে, সিগারেট না খেয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না, অথচ আপনার সামনে।...

জ্যাঠা সকৌতুকে নিরীক্ষণ করেছিলেন তাকে। তারপর হা-হা শব্দে হেসে উঠেছিলেন। বোসো, বোসো, নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরাও তুমি, আমি কিছু মনে করব না। আছে, না আনিয়ে দেব?

আছে। হাসি মুখে বসে পড়ে পকেট থেকে প্যাকেট আর দেশলাই বার করে প্রথমে জ্যাঠার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। খান না শুনে নিজে নিঃসঙ্কোচে সিগারেট ধরিয়েছিল।

দৃশ্যটা গৌরীর সেদিন একটুও ভালো লাগেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে অবাকও হয়েছিল বটে। ভিতরে জ্যাঠা যত নরমই হোন, বাইরে বেশ স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ তিনি। তাঁকে এভাবে বলা বা তাঁর সামনে বসে সিগারেট টানা ও বয়েসের কোনো ছেলের পক্ষেই সহজ বা স্বাভাবিক নয়। শুধু বখাটে ছেলেরাই পারে তা। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে-রকমও লাগছিল না। সিগারেট ঠোঁটে ঝোলাবার পরেও দিব্বি সহজ, অন্তরঙ্গ আচরণ। যেন সমবয়সী দু'জনে। ঘরে ঢুকে মায়েরও একই অবস্থা। হাসি মুখে জ্যাঠাই তখন তার হয়ে সুপারিশ করেছেন। মাকে বলছেন, ওর ছটফটানি দেখে আমিই পারমিশন দিয়েছি। তুমি লজ্জা পেলে ও পালাবে।

অতএব লজ্জা পরিহার করে মা-ও হাসিমুখে সামনে বসেছিলেন। এ-ছেলের প্রতি তাঁর একটু বাড়তি দরদের হেতু জ্যাঠাও জানেন, গৌরীও জানে। আরো নিঃসঙ্কোচ হবার জন্যে কৃত্রিম অনুযোগের সুরে মা বলেছিলেন, তুমি বুঝি খুব সিগারেট খাও?

জবাব দিয়েছিল,আমার মা গালাগাল দিতেন, অত খাস কেন? কিন্তু ঠিখ খুব বেশি খাই কি না আমার খেয়াল থাকে না।

জ্যাঠা এবারে বলেছিলেন, খাও তাতে কিছু না, কিন্তু নিজেই দেখ অভ্যাসের একটা দাসত্ব করে খুব ভালো করনি।

হাসি মুখেই মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল, অর্থাৎ ভালো যে করেনি সেটা ঠিক। কিন্তু ওঠার আগে শূন্য অ্যাশপট্‌টা প্রায় আধা-আধি ভরাট হয়ে গেছল।

তারপর একটানা আড়াই বছর ধরে এই মানুষকে গৌরী ভালো-মন্দ অনেক রকমের পরিস্থিতিতে দেখে আসছে। নির্জনে দেখেছে, জনতার মধ্যে দেখেছে। অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে দেখেছে, আবার দূরে সরিয়ে রেখেও দেখেছে। মহত্ব দেখেছে আবার অবিশ্বাস্য ক্ষুদ্রতাও দেখেছে। তার একটা গুণ অনস্বীকার্য। তার বচনে বা আচরণে অস্পষ্ট কিছু নেই। সেটা পরিচ্ছন্ন না হতে পারে কিন্তু প্রচ্ছন্ন আদৌ নয়। এ স্পষ্টতা কখনো চিত্তাকর্ষক কখনো ব তীক্ষ্ণ আপোসশূন্য।

মা তার এই গুণে মুগ্ধ। কথা উঠলেই তিনি বলেন, ছেলেটার মধ্যে রাখা-ঢাকা কিছু নেই। তার চলনে-বলনে-আচরণে মা অনাড়ম্বর সরলতা ভিন্ন আর কিছু দেখেন না।

মুগ্ধ গৌরীও হয়নি কখনো, এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। বরং অনেক ক্ষেত্রে অনেক পরিস্থিতিতে মায়ের থেকে অনেক বেশি মুগ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছে সে। কিন্তু আপোসশূন্য ওই স্পষ্টতার আঘাতও তাকে বিড়ম্বিত করেছে মায়ের থেকে ঢের বেশি। তবু, গতকাল বিকেল পর্যন্ত এই মানুষ ওর ভিতরের অনেকখানি জায়গা দখল করে বসেছিল। এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে-দখল একেবারে বরবাদ হয়ে গেছে এমন কথাও জোর করে বলা যায় না।

কিন্তু গতকালের বিকেল থেকে আজকের এই বিকেল কত যে তফাৎ সে একমাত্র গৌরীই অনুভব করতে পারে।

ঘরে ঢুকে শিথিল আলস্যে সিগারেট টানতে দেখে আজ হঠাৎ তার এমন কিছু মনে হল যা আগে আর কখনো হয়নি। মনে হল, আড়াই বছর ধরেই ও ভুল করেছে, মা ভুল করেছে। আর পাঁচজন আত্মগোপনকারী মানুষের মতো এই একজনও একটা আড়াল নিয়ে বসে আছে। স্পষ্টতার আড়াল। এটা তার স্বভাব নয়, এটা মুখোশ, খোলস। এর আড়ালে মাথা উঁচিয়ে বসে আছে এক আত্মগর্বী অসহিষ্ণু দাম্ভিক মানুষ। অপরের উঁচু মাথা হেঁট করে দিতে পারলে যার অপরিসীম আনন্দ। যার কাছে বয়সের কোনো সম্মান নেই, মানীর কোনো মর্যাদা নেই।

আড়ালটা এত স্পষ্ট বলেই এতদিন চোখে পড়েনি।

কমল চ্যাটার্জী হাসি মুখেই নড়ে-চড়ে বসল। কোথাও সামান্যতম চিড় খেয়েছে কি না সে খবরও রাখে না যেন।

কি ব্যাপার, কোথায় ছিলে?

ছাদে।

মুখ থেকে দু' চোখ হাতের দিকে নেমে এলো। —হাতে বই দেখছি, এ সময় পড়ছিলে না কি?

চেষ্টা করছিলাম।

ও-ব্বাবা! আচ্ছা এত মেহনত করে ধরলাম না হয় ফার্স্ট ক্লাস পেলে, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্টই হলে, তাতে কি লাভ হবে?

ঘরের লাইটটা জ্বেলে দিয়ে ধীরে সুস্থে পাশের সোফাটায় বসল গৌরী। চোখে চোখ রাখল।— না পেলে বা না হলে তার থেকে কি বেশি লাভ হবে?

হেসে উঠল। —এবার জব্দ করেছ। আচ্ছা, তর্ক জমিয়ে দিচ্ছি, আগে চা আনতে বল, বেশ কড়া—

গৌরী জানে উঠে গিয়ে বলে আসতে হবে না, কে এসেছে মতি জানে যখন, চা আপনা থেকেই আসবে। এবং কড়া খাবে কি লাইট্ খাবে তাও মতির জানাই আছে।

অনুমান মিথ্যে নয়। মুখের কথা শেষ হবার আগেই পিছনের দিকের ভারি পরদা ঠেলে চায়ের ট্রে হাতে পুরনো বাঙালি ঠাকুর ঘরে ঢুকল। আর তাই দেখে হালকা আনন্দে কমল চ্যাটার্জী বলে উঠল, এই তো, ঠাকুরমশায়ের জয় হোক!

এই কারণেই এ বাবুর প্রতি বাড়ির ঝি-চাকর-ঠাকুর অন্যের অপেক্ষা বেশি তুষ্ট। সাধারণ মেহনতী মানুষের প্রতি বাবুটিকে খুব সদয় ভাবে ওরা। মতিকে ডাকে মতি-জী, ঠাকুরকে ঠাকুরমশাই। বিহারী ছোকরা চাকর আছে একটা, নাম ছোকন—তাকে ডাকে ছোকন-সাব।

আপ্যায়ণে পরিতুষ্ট ঠাকুরমশাই চায়ের ট্রে রেখে হাসি মুখে প্রস্থান করল। পট থেকে দুটো পেয়ালার একটাতে চা ঢালল গৌরী।

তোমার?

ইচ্ছে করছে না।

খুব ভালো, আমিই দু'পেয়ালা মেরে দেব। ... যা বলছিলাম, আমার জিজ্ঞাস্য ছিল, অত পরিশ্রম করে ভালো রেজাল্ট করে কি হবে—বড় চাকরি-টাকরি করবে?

ভাবিনি। পেলে করব।

ভেরি গুড। কিন্তু মেজাজ-পত্র আজ তোমার খুব সুবিধের দেখছি না কেন?

কথা-বার্তার এই ধরনটাও গৌরীর চেনা। কথা টেনে টেনে তর্কের বা বক্তৃতার রসদ পেলেই এই লোকের মুখ খুলবে। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, সুবিধের নয় বলে দেখছ না।

চোখ মুখে বিস্ময়ের হালকা প্রলেপ। হাতের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে ওটা ট্রেতে রাখল। গৌরী আবার পট তুলে নিতে বাধা দিল, থাক্, আর না। চোখে কৌতুক, ঠোঁটের ডগায় হাসির আভাস। —মেজাজের খবর একটু শুনতে পাই না?

গৌরী চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। চোখে পলক পড়ল না।— কাল তোমাদের লালবাগের মিটিংয়ে জ্যাঠামণিকে তুমি যাচ্ছেতাই করে অপমান করেছ?

অপমান! লোকটা হতভম্ব যেন। কেন, তিনি কিছু বলেছেন না কি?

না। অতটা মর্যাদা তিনি তোমাকে দেননি। আমি বলছি।

অর্থাৎ মর্যাদা তুমি দিচ্ছ?

গৌরী জবাব দিল না, অপলক চেয়ে রইল।

কমল চ্যাটার্জী আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি জানলে কি করে, ছিলে না কি সেখানে?

গৌরীর বলতে ইচ্ছে করল, ও উপস্থিত থাকলে এই লোক হাজার লোকের মধ্যেও তাকে খুঁজে বার করত—ছিল কি না সেটা খুব ভালো করেই জানে।

না। বিশ্বাস করা চলে এমন কেউ সেখানে ছিল।

কমল চ্যাটার্জী হাসতে লাগল। তারপর বলল, পার্টির মিটিং, পার্টির লড়াই—এর মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের নাম অপমানের জায়গা কোথায়?

জায়গা আছে। তুমি ব্যক্তিবিশেষকেই টেনেছ। তাঁর পূর্ব-পুরুষকে গাল দিয়েছ, বিশ্বাসঘাতকের বংশধর বলেছ! আর শেষে জ্যাঠামণিকে তুমি ভণ্ড বলেছ, চোর জোচ্চোর বলেছ।

ওর দিকে চেয়ে কমল চ্যাটার্জী হাসছে-তেমনি। অনভিজ্ঞ আর অবুঝ কোনো ছোট মেয়ের বিতর্ক শুনছে আর রাগ দেখছে যেন। শেষে হতাশার অভিব্যক্তি।—উঃ! এতদিন ধরে রাজনীতির পাঠ নিয়ে শেষে এই পরিণাম তোমার! ...শোনো, উদ্দেশ্য সাধনের দিকে চোখ রেখে রাজনীতির খেলায় জনসাধারণকে তুমি যত বেশি ভাবের বন্যায় ভাসাতে পারবে ততো ভালো, কিন্তু তার বদলে নিজে ভাবপ্রবণ হয়েছ কি সব মাটি। তোমার জ্যাঠামণি ব্যক্তিগতভাবে কেউ নন, মিউনিসিপ্যালিটির এই ইলেকশনে যাকে এগিয়ে দিয়ে ওঁদের বাজী মাত করার চেষ্টা—তিনি তার প্রতীক—শত্রুপক্ষের ঘাঁটি বলতে পার। আমি সেই ঘাঁটি আক্রমণ করেছি। হাসছে। —আর ভাষার কথা যদি বলো আমি নাচার, সাধারণ মানুষ ওই রকম সাদা-সাপটা ভাষার ঝাপটা ভিন্ন রি-অ্যাক্ট করে না। তাতে যদি গায়ে ফোস্কা পড়ে তো রাজনীতি থেকে ওঁর সরে দাঁড়ানই ভালো।

গৌরী নিজেকে ঠাণ্ডা সংযমে বেঁধে রেখেছিল এতক্ষণ। কিন্তু আর পেরে উঠছে না। ভিতরটা উগ্র হয়ে উঠেছে। বাইরে তার তাপ ছড়াচ্ছে। ওঁর ভালো-মন্দর ব্যাপারে উনি তোমার কাছ থেকে পরামর্শ

নিতে আসবেন না। কিন্তু আমার নেবার ইচ্ছে আছে। তোমার বিবেচনায় তাহলে রাজনীতির খেলায় এ রকম নোংরা ছিটনো দোষের নয়?

না। নাথিং রং ইন্ পলিটিক্স্।

এ রকম পলিটিক্সএ তুমি আমাকে পাবে আশা করো?

আশা কেন, এতদিন তো পেয়েই ছিলাম। এটা তোমার ঘরের ব্যাপার বলে লাগছে, আর অভ্যস্ত নও বলে লাগছে। পরে দেখবে সঙ্কল্প যদি ঠিক থাকে তাহলে জ্যাঠা ছেড়ে বাবার সম্পর্কে বললেও লাগবে না। আমার অন্তত লাগে না।

হয়তো সত্যি। যা বিশ্বাস করে তাই বলেছে। মায়ের মৃত্যু আসন্ন জেনেও এই লোক নির্লিপ্তভাবে জেলে কাটাতে পেরেছে। কিন্তু তবু বরদাস্ত হল না। চাপা ঝাঁঝে গৌরী বলে উঠল, তুমি মহান ব্যক্তি, কিন্তু জ্যাঠামণির অপমানকে আমি আমার নিজের অপমান বলেই মনে করি এবং ভবিষ্যতেও করব—এটা তুমি জেনে রাখতে পারো।

তেমনি নির্লিপ্ত হাসি মুখে কমল চ্যাটার্জী জবাব দিল, আবারও ভুল রাস্তা ধরলে। আমাদের মূল প্রিন্সিপাল্টাই তুমি গণ্ডগোল করে বসে আছে। এ-ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষ উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নয়। এরমধ্যে তুমি বা তোমার জ্যাঠামণি কেউ নয়। উনি একটা কায়েমী স্বার্থের প্রতীক আর আমি প্রতিবাদ। ... এ মাইনরিটি, রিচিং মেজরিটি, সীজিং অথিরিটি, হেট্স্ এ মাইনরিটি—এই হল ওঁদের রূপ। এরই সক্রিয় জীবন্ত প্রতিবাদ আমরা। এর মধ্যে কে কার জ্যাঠা-কাকা-বাবা সে-প্রশ্ন নেই।

ঠিক এমনি করে কথার খই ফুটিয়ে আসর মাত করতে গৌরী আগেও বহুবার দেখেছে। এরা তর্কের জাল ফেলে। সে-জালে কেউ পা দিলে আরো সহজে তাকে ঘায়েল করতে পারে। এই বিতর্কের চমকে অনেক সময়ে ও নিজেও অভিভূত হয়েছে। কিন্তু আজ ঝলসে উঠল। মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে স্পষ্ট বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞাসা করল, এই বড় বড় কথাগুলো সবই তোমার না আর কারো? আমি যতদূর জানি রবিনস্ না কে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ওই মাইনোরিটির কথা বলে গেছেন—

এই প্রথম কমল চ্যাটার্জী তেতে উঠল একটু। ধার করা কথাও এমনি অনায়াসেই নিজের বক্তব্যের সঙ্গে মিশিয়ে অভ্যস্ত সে। তাতে কথার ধার বাড়ে। কিন্তু এ-রকম বিড়ম্বনার মধ্যে বড় একটা পড়তে হয় না। স্পষ্টতার আড়ালের ওই উঁচু মাথায় ঘা পড়েছে। অসহিষ্ণু জবাব দিল, যে-ই বলুন সত্যি যা সেটা সকলের কাছেই সত্যি ছাড়া আর কিছু নয়।

গৌরী চেয়ে রইল। কমলও।

কয়েক নিমেষ মাত্র। তারপর বুদ্ধিমানের মতোই হেসে উঠল কমল চ্যাটার্জী। —আমাদের মেয়েরা পলিটিক্স্এ নামলেও হাতের মুঠো ঢিলে করতে চায় না।...মরুক গে, এলাম নিরিবিলিতে তোমাকে একটু দেখব বলে, এ-ভাবে এতক্ষণ সময় নষ্ট করার মানে হয়!

এই গোছের অন্তরঙ্গ আপোসের চেষ্টায় গৌরী আজকাল আর তেমন ভোলে না। ভোলা মানেই নিজের ওপর দখল হারানো। এরই বিরুদ্ধে কখনো গোচরে কখনো বা নিজের অগোচরে সে একটানা যুঝছে। ইদানীং প্রায়ই মনে হয় এই লোকের সম্পর্কে কোথায় একটা ভুল হয়ে গেছে। তবু এ-ধরনের কথা শুনলে আগে হাসত। আজ হাসতেও পারা গেল না। গত সন্ধ্যা থেকে ভেতরটা তার চিন চিন করে জ্বলছিল। আজ এত কথার পরেও সে-জ্বলুনি বেড়েছে বই কমেনি।

দেখতে অসুবিধে হচ্ছে?

খুব। মতিজীকে একটা আয়না আনতে বলব? তাহলে তুমিও বুঝতে কত অসুবিধা হচ্ছে?

গৌরী হাসি মুখ করেই বলল, সেই সঙ্গে নিজের মুখখানাও দেখে রাখো তো আয়না আনতে বলি।

আমার মনের সঙ্গে মুখের কোনো বিরোধ নেই।

হাসিমুখেই এর একটা কঠিন উত্তর দিতে গিয়েও গৌরী থেমে গেল। বলতে যাচ্ছিল, এই তফাতটুকুই আমার আবিষ্কারের বস্তু।

জবাব দিল, যে-ভাবে দেখতে চাও তাই বা দেখবে কি করে, আমাকে দেখার মধ্যে তো আমার বাবা-কাকা-জ্যাঠার প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

নিশ্চয় থাকছে না! গলার স্বরে বাড়তি জোর পড়ল একটু।—কারণ, আমি যে দেখার কথা বলছি তার মধ্যে পলিটিক্স থাকছে না।

না, এ পরিবর্তনও গৌরী নতুন দেখছে না। দুই চোখে হঠাৎ হঠাৎ অমনি তৃষ্ণা উপছে উঠতে আগেও দেখেছে। এর থেকেও ঢের ঢের বেশি দুরন্ত আবেগের মুখে পড়তে হয়েছে একাধিক বার, তার ধকল সামলে বেশ বুদ্ধিমতীর মতো মাথা খাটিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে হয়েছে। কিন্তু তখনো রাগ করতে পারেনি, রাগ করে সংশ্রব ছেঁটে দিতে পারেনি। কারণ তখনো মানুষটার ঠিক এমনিই স্পষ্টতার ছটায় ও বিভ্রান্ত। তখনো মনে হয়েছে সব ব্যাপারে যে মানুষ কোনো হিসেব না করে বেপরোয়া হতে পারে, এ তাদেরই একজন। তার হাত থেকে নিজেকে সন্তর্পণে রক্ষা করার দায় শুধু নিজেরই। বেগতিক দেখলে তাকে এড়ানো চলে, বাতিল করা চলে না। ... এ যাবত গৌরী এড়াতেও কি পেরেছে? দুস্যর মতো সে এসে ওর নিজের কাছ থেকেই ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে।

কিন্তু আজ অন্তত বাতিল করারই ঝোঁক গৌরীর। চোখে চোখ রেখে তাই আবারও হাসতে পারল একটু। এই লোকের কাছে যে-কোনো পরিস্থিতিতে হাসতে পারাটাই জোরের দিক। বই হাতে সোফা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সময় তাহলে সত্যিই নষ্ট করেছ। এখন গিয়ে পড়তে না বসলে আমাকে রাত জাগতে হবে।

অগত্যা কমলও উঠে দাঁড়াল। ঠোঁটের হাসি চাপা দিয়ে গলার স্বর রীতিমতো করুণ করে বলল, আমার ওপর একটু বেশি অবিচার করা হয়ে গেল না?

কেন? ঠোঁটের ফাঁকে এখনো একটু হাসি ছুঁইয়ে রেখেছে গৌরী। দু' চোখ তার মুখের ওপর।

কমল চ্যাটার্জীর চাউনিটা ওর মুখ ছেড়ে গলা বেয়ে নীচের দিকে নামার উপক্রম করেও আবার ওপরের দিকে উঠে এলো। তৃষ্ণার দিকটা স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিল। এখনো সেই স্পষ্টতার অভিনয়। ঠিক এই মুহূর্তে একদিনের কথা মনে পড়ে গেল গৌরীর। গোমতীর এক নিরিবিলি ধারে বসেছিলেন দু'জনে। একটা অল্পবয়সী ছেলে বার-কয়েক ওদের পাশ ঘেঁষে আনাগোনা করল আর প্রতিবার আড়চোখে গৌরীকে দেখে গেল। শেষে ওই ছেলেটার দিকে চেয়ে কমল চ্যাটার্জী হেসে উঠতে আর এলো না। গৌরী ভ্রুকুটি করে বলেছিল, তুমি আচ্ছা অসভ্য তো!

আমি অসভ্য, আর ওই ছেলেটা?

ও কি করেছে?

কমল হেসেই জবাব দিয়েছিল, কোন মেয়েকে মনে ধরলে ছেলেরা দেখবেই তাকে, এটা খুব স্বাভাবিক কথা, আমি বারো বছর বয়েস থেকেই তাই দেখতাম। কিন্তু ও একেবারে ছিঁচকে চোরের মতো দেখছিল তোমাকে।

তেমনি ভ্রুকুটি করে গৌরী প্রশ্ন করেছিল, তাছাড়া আর কেমন করে দেখবে।

কেন, দেখতেই যদি হয়, সোজা সামনে এসে দাঁড়াবে—যেমন দাঁড়ানো বিলিতি ছবিতে অনেক সময় দেখা যায়। তারপর একেবারে ডাকাতের মতো লুটেপুটে দেখে নিয়ে চলে যাবে।

আজ আবার হঠাৎ দেড় বছর আগের সেই কথা মনে পড়ল কেন গৌরী জানে না। এই মুহূর্তের ওই চাউনির স্পষ্টতার ধাক্কায় সম্ভবত। এরই নাম হয়তো সদর্পে কাছে এসে ডাকাতের মতো লুটেপুটে দেখে নেওয়া।

অনুভূতিটা স্মিত হাস্যে আঁচ করে নিতে চেষ্টা করল কমল চ্যাটার্জী। তারপর, অবিচার কেন সেই প্রশ্নের জবাবে বলল, আসামাত্র জ্যাঠার কথা তুলে তুমিই এক-গাদা সময় নষ্ট করলে, এখন আবার সাত তাড়াতাড়ি নিজেই তাড়াচ্ছো।

কি করব বলো, তোমার মতো করে আমিও জ্যাঠামণিকে আমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যাবার মানুষ ভাবতে পারছি না। সে সকম ভাবতে সময় লাগবে আর তোমারও সময় নষ্ট হবেই। যাক্, পালাও এখন, আমার সত্যিই দেরি হয়ে গেল।

তথাস্তু। হাসিমুখে এবং সবিনয়ে একবার মাথা নত করে কমল ঘুরে বাইরে দরজার দিকে এগোলো। আর গৌরী বিপরীত দিকের ভিতরের দরজার দিকে।

তারপর নিমেষ কয়েকের মধ্যে অভাবিত প্রসহন ঘটে গেল একটা।

নীচের এই সাজানো গোছানো বসার ঘরটাই বাড়ির মধ্যে সব থেকে বড় ঘর। মেঝের আগাগোড়া পুরু কার্পেট বিছানো।

চলতে ফিরতে শব্দ হবার কথা নয়, হয়ও না। তবু কি অনুমান করে গৌরী হঠাৎই এক কাণ্ড করল। যা করল, সে চিন্তাটা তার মুহূর্তের মধ্যে মাথায় এসেছে। ধীরে সুস্থে ভিতরের দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়েই আচমকা একেবারে ঘুরে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের দরজার কাছে থেকে ওর গায়ে বেঁধা আর দুটো লোলুপ চোখ যেন বিষম হোঁচট খেল এক-প্রস্থ। এরজন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না লোকটা। বাইরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে খুব নিঃশব্দেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো কমল চ্যাটার্জী। প্রস্থানরত রমণী দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবার মতোই একটা উগ্র অনাবৃত বাসনা ঠিকরে পড়ছিল ওই দুটো চোখ থেকে। ঠিক সেই ক্ষণে ভিতরের বারান্দা-লগ্ন দরজার কাছ থেকে গৌরী আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

নিষ্পলক মুহূর্ত গোটাকতক। গৌরীর মুখ দিয়ে যে-কথাগুলো বেরিয়ে আসছিল, একেবারে ঠোঁটের ডগা থেকে ফিরিয়ে নিল। জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, এর নাম চোরের মতো দেখা না ডাকাতের মতো। বলল না। বলবে না। বললে এগিয়ে আসবে, তারপর যে-করেই হোক আর খানিক আটকাতে চেষ্টা করবে ওকে। আত্মসমর্পণ গোছের গোটাকতক কথা বলে নিজেকে ঢাকতে চাইবে। স্পষ্টতার অভিনয় শুরু হবে আর এক দফা।

আজ অন্তত গৌরী তাকে সে-সুযোগ দেবে না। আর যাই হোক এই লোককে নির্বোধ কেউ ভাবে না। যা বোঝবার ঠিকই বুঝে নিয়েছে।

গৌরী সৌজন্যসূচক বিস্ময় প্রকাশ করল শুধু একটু। —কি হল, দাঁড়িয়ে যে?

এটুকুর আশ্রয় পেয়েই স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টতার আড়াল নেবার চেষ্টা। বলল, যেতে ইচ্ছে করছে না।

থাকো তাহলে দাঁড়িয়ে। আর এক মুহূর্তও না অপেক্ষা করে গৌরী দ্রুত প্রস্থান করল।

তিন

এই প্রথম বোধ করি নিজের আত্মস্থ জোরের দিকটা মনের মতো খাড়া করে তুলতে পেরেছে গৌরী। চিনচিন জ্বালাটা অনেকখানি কমেছে এতক্ষণে। কিন্তু পড়া দু-লাইনও এগোয়নি। গৌরী বই-ই খোলেনি

গত সন্ধ্যায় জ্যাঠামণির অপমানের খবরটা দিয়েছিল দাদা। সেই খবর দেবার মধ্যে তার অসহিষ্ণু চাপা রাগটুকু অস্পষ্ট ছিল না। বেড়াতে বেড়াতে লালবাগের দিকে গেছল। লালবাগের দিকে বেড়ানোর আকর্ষণের হেতু গৌরীর জানা আছে। ওদিকটায় অনুপমা ভার্গবের মা আর দিদির বাড়ি। অনুপমা তাদের কাছেই থাকে।

কিছুদিন আগে মিউনিসিপ্যালিটির একজন সদস্য বিগত হয়েছেন। তাঁর শূন্যস্থান পূরণের নির্বাচন আসন্ন। ওই আসনের দু'জন মাত্র প্রার্থী। একজন চালু শাসক গোষ্ঠীর—জ্যাঠাই তার প্রধান মুরুব্বি। ছেলেটার জন্য যেটুকু চেষ্টা করার করে যাচ্ছেন। আর একজন বিপক্ষ দলের কমল চ্যাটার্জী যাদের হোমরাচোমরা পৃষ্ঠপোষক। দল থেকে কমলকেই দাঁড়ানোর জন্য সাধাসাধি করা হয়েছিল, গৌরী তা স্বচক্ষে দেখেছে স্বকর্ণে শুনেছে। কমল চ্যাটার্জী সে-প্রস্তাব নাকচ করেছে। সকলেই বুঝেছে অত ছোট ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়তে চায় না।

মজা দেখার জন্যেই হোক বা যে কারণেই হোক ঘরোয়া বৈঠকে ওই দলের মাতব্বর গোছের একজন হঠাৎ তখন গৌরী সিদ্ধান্তর নাম প্রস্তাব করে বসেছিল। সকলে তখন হৈ-হৈ করে উঠেছে।

তাই হোক, তাই হোক! গৌরীর সঙ্গে এই দলের যোগাযোগ একটু বিচিত্র বই কি। বিপক্ষে যে গণ্যমান্য মানুষটি সকলের পিছনে বড়সড় খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে আছেন, সেই প্রিয়রঞ্জন সিদ্ধান্তর আদরের ভাইঝি গৌরী সিদ্ধান্ত একই বাড়ির ছাদের নীচে বাস সত্ত্বেও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিপরীত মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে উঠছে—এ এক রোমাঞ্চকর ব্যাপারই বটে। তাদের মতো 'সী ইজ্ এ প্রেশাস্ কন্‌ভার্ট'। তার এ-দিকে আকৃষ্ট হওয়ার পিছনে প্রধান আকর্ষণটা কি তাও অবশ্য জানে সকলেই। আকর্ষণ কমল চ্যাটার্জী দলের তরুণ গোষ্ঠীর চোখে সে আগুনের ফুল্‌কি একখানা। গৌরী সিদ্ধান্তকে দলে টানার মতো অসম্ভবকে সম্ভব করতে সে-ই শুধু পারে। পেরেছে।

প্রস্তাব শুনে গৌরীর দুই চোখ কপালে। কমলের দিকে চোখ পড়তে দেখে সেও তার দিকে চেয়ে হাসছে মিটিমিটি। মাথা ঝাঁকিয়ে আপত্তি জানিয়ে গৌরী শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়েছিল, তারপর বেশ জোর দিয়েই বলে উঠেছিল, আমি তাহলে আর এই রাস্তা মাড়াব না বলে দিলাম। আমি বাপু এখনো তোমাদের কাগজে কলমের মেম্বারও নই।

যাক্, এই নির্বাচন নিয়ে বাড়িতে ক'দিন ধরে বেশ একটু রসালো উত্তেজনা চলছিল। দিন চারেক আগেও গৌরী হাসিমুখে জ্যাঠাকে বলেছিল, আমি কিন্তু তোমাদের বিপক্ষে ক্যাম্পেন করছি জেনে রেখো।

জ্যাঠামণিও হেসেই জবাব দিয়েছিলেন, আমার সর্বনাশ যে শেষ-পর্যন্ত তুই-ই করবি সে আর আমার জানতে বাকি! কিন্তু হারলে আবার আমার ওপর রেগে যাবি না তো?

গৌরীও তেমনি জবাব দিয়েছে, হারা অত সস্তা নয়। ওরা তো আমাকেই দাঁড় করাতে চেয়েছিল, তোমার মুখ চেয়ে পারা গেল না।

মোট কথা, এই নির্বাচন প্রসঙ্গে বাড়িতে এ-যাবত হাল্‌কা হাসি ঠাট্টাই হয়েছে।

গতকাল ওই নির্বাচনের বড় মিটিং চলছিল লালবাগ পার্কে। উঁচু মঞ্চ থেকে কমলকে জোরালো বক্তৃতা করতে দেখে দাদা দাঁড়িয়ে গেছল। গৌরী নিঃসংশয়, দাদা একা নয়, সেই সঙ্গে তার পাশে অনুপমা ভার্গবও দাঁড়িয়ে গেছল। সেই কারণেই দাদার চাপা রাগ আর চাপা ক্ষোভ। এতদিনে কমল চ্যাটার্জীর সঙ্গে এ-বাড়ির সম্ভাব্য সম্পর্কের আভাস দাদার মারফত অনুপমা ভার্গবও পায়নি সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অতএব এই কমল চ্যাটার্জী জ্যাঠার দলের বিরুদ্ধে কি বলে হাসি-খুশি মেয়েটার পক্ষে তা শোনার আগ্রহ স্বাভাবিক। বিপক্ষের প্রার্থীকে ছেড়ে জ্যাঠামণির সম্পর্কে গলা ফাটিয়ে যে-অশ্রাব্য কটূক্তি আর গালাগাল করছিল সে, দাদার কানে আঙুল দেওয়ার দাখিল। জ্যাঠামণির ওই চরিত্রই গোটা বিপক্ষ দলের মূল চরিত্র বলে ঘোষণা করেছে সে।

কি গালাগাল আর কি কটূক্তি করেছে দাদা তাও বলেছে। মা-ও সামনে ছিলেন। শুনে অপ্রস্তুত তিনিও। গৌরীকে বাদ দিলে বাড়ির মধ্যে কমল চ্যাটার্জীকে একটু বেশি প্রশ্রয় মা-ই দিয়েছেন। তাঁর মতে ছেলেটার ভিতরটা একখানা দামী আয়নার মতো ঝকঝকে পরিষ্কার। মা কখনো পলিটিক্স্ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন শোনেনি। কিন্তু ইদানীং ওই ছেলের প্রতি স্নেহবশত একটু-আধটু ঘামাচ্ছেন। সেদিনও বলছিলেন, ওই ছেলেগুলো একজনকে দাঁড় করিয়েছে জেনেও তোর জ্যাঠামণি উলটো দিকে নাক গলাতে গেলেন কেন, এ বয়সে আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ না তাড়িয়ে এখন সরে দাঁড়ালেই তো হয়।

স্ স্ স্! গৌরী ভ্রূকুটি করেই মাকে থামিয়েছিল।

গত সন্ধ্যায় দাদার মুখে এই খবর শুনে মুখ লাল করে নিজে ঘরে চলে এসেছিল গৌরী। বহুক্ষণ ধরে ছটফট করেছে তারপর। বেশ কিছুদিন হল এই একজনের সম্পর্কে মনের তলায় কি রকম যেন উল্টো-পাল্টা অনুভূতির আঁচড় পড়ছিল গৌরীর। খুব সঙ্গোপনে একটা দ্বিধা-দ্বন্দের কারিকুরি চলছিল। বাইরে ওই মানুষকে যত স্বচ্ছ যত স্পষ্ট দেখায়, ভিতরটাও ঠিক তেমনি কি না ইদানীং সেই প্রশ্নও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। অধুনা কেবলই মনে হয়, এক প্রবল ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ কমল চ্যাটার্জী। ওই ইচ্ছার বলি লোকটা নিজেও, অপরেও। মানুষকে চুম্বকের মতো টেনে এনে নিজের ইচ্ছের বোঝা অনায়াসে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে—এখানেই তার কৃতিত্ব। কিন্তু তার এই ইচ্ছাশক্তির

প্রয়োগের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ কতখানি গৌরীর সেই সংশয়। আর, সর্বদাই সেটা মহৎ এবং বৃহৎ কি না সেই দ্বিধা, সেই দ্বন্দ্ব।

জনতার সামনে দাঁড়িয়ে হিংস্র উত্তেজনায় জ্যাঠামণিকে ওই ভাবে আর ওই ভাষায় গালাগাল করেছে শোনার পর লোকটার স্বরূপ যেন অনেকখানি অনাবৃত হয়ে গেছে ওর কাছে। তার সম্পর্কে কাল কিছু কথাও হয়েছে জ্যাঠামণির সঙ্গে। গৌরী স্থির থাকতে পারেনি, কারণ সব থেকে বড় সমস্যাটা ওর নিজেরই। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজের ঘরে ছটফট করার পর হঠাৎ এক রকম ঝোঁকের মাথায়ই জ্যাঠামণির ঘরে ঢুকে পড়েছিল। অন্যদিনের মতোই তিনি একখানা বই নিয়ে শুয়েছিলেন। বেশ মন দিয়েই পড়ছিলেন মনে হয়েছে। ও ঢোকার পরেও চট করে টের পাননি। না, ওই ঠাণ্ডা শান্ত মুখে সামান্য বিরক্তির আঁচড়ও চোখে পড়েনি গৌরীর।

কিন্তু গৌরী খুব ভালো করে জানে যে-খবর দাদা এনেছে সে-খবর তাঁর কানেও গেছেই। খবর কানে দেবার মতো চর দুই দলেরই আছে। ওই বক্তৃতা কমল চ্যাটার্জী করেছে বলে ও-খবর আরো তাড়াতাড়ি তাঁর কানে এসেছে। বিপক্ষের ওই লোকের সঙ্গে এ-বাড়ির অন্দরমহলের ঘনিষ্ঠতার সমাচার জ্যাঠামণির লোকেরা ভালোই জানে।

গৌরী একেবারে শয্যার পাশে এসে দাঁড়াতে জ্যাঠামণির বই পড়ার তন্ময়তায় ছেদ পড়েছিল। মুখ দেখেই কিছু অনুমান করেছিলেন সম্ভবত। —কি রে? আয় বোস্।

ও খুঁচিয়ে না জিজ্ঞেস করলে জ্যাঠামণি যে কারো প্রসঙ্গে একটা নিন্দের কথাও বলবেন না জানা কথা। তাই আরো বেশি রাগ হয়ে গেছল গৌরীর।

শুনেছ?

ব্যস্ত হয়ে জ্যাঠামণি উঠেই বসেছিলেন।—কি হয়েছে? কি শুনব?

লালবাগের মিটিং এর কথা?

কি কাণ্ড! জ্যাঠামণি হেসে ফেলেছিলেন। তোর এই মুখ দেখে আমি ঘাবড়েই গেছলাম, কি সাংঘাতিক কাণ্ড না জানি হয়ে গেছে। বোস্। হাত ধরে টেনে পাশে বসালেন ওকে। —তুই শুনলি কোথা থেকে, ছিলি না কি সেখানে?

না। দাদা ছিল।

জ্যাঠামণি অবাক। হাল্কা কৌতুকের সুরে বলেছেন, কি সর্বনাশ! কমল কি ওকেও ফুসলেছে না কি?

না ওখান দিয়ে যাচ্ছিল, তোমাকে গালাগাল করতে শুনে দাঁড়িয়ে গেছে। তোমাকে কি-কি সব বলেছে, শুনেছ?

জ্যাঠামণি হাসতে লাগলেন। হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। ঠাট্টার সুরে পালটা প্রশ্ন করলেন, ওই জন্যেই বুঝি অত রেগে গেছিস তুই?

জবাব না পেয়ে একটু থেমে আবার বললেন, কমলকে বলে দেব তোর দ্বারা কি-চ্ছু হবে না, রাজনীতির খেলায় নামলে ও সব গায়ে মাখলে চলে না, ও-রকম একটু-আধটু লোকে বলেই। ও জন্যে আমি কিছুই মনে করিনি।

তুমি ভদ্র তাই কিছু মনে করোনি। তা বলে ওরা অমন অভদ্র ইতরের মতো গালাগাল করবে?

ওর দিকে চেয়ে জ্যাঠামণি যেন মজা দেখছিলেন। তারপর একসময় অনেকটা নিজের মনেই বলেছিলেন, ওদের চিন্তা-টিন্তার মধ্যে অনেক কিছুই ভালো...কিন্তু ওই এক দোষ, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে মাত্রা-জ্ঞান ছাড়িয়ে আঘাত করতে চায়... যাকে তোরা বলিস হিটিং বিলো দি বেল্ট।

গৌরী গুম হয়ে বসেছিল খানিক, তারপর হঠাৎই একটা প্রশ্নে সচকিত করে তুলেছিল ভদ্রলোককে।—আচ্ছা জ্যাঠামণি, ওই কমল চ্যাটার্জীকে তুমি ঠিক-ঠিক কি মনে করো?

প্রশ্নটা করেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল তাঁকে। দেখতে ভুল হয়নি গৌরীর, ওই মুখে একটা অস্বস্তির ছায়া পড়ে পড়েও যেন পড়েনি। উনি পড়তে দেননি। মুখের দিকে চেয়ে হেসেই জবাব দিয়েছেন, কেন, বেশ চালাক-চতুর চটপটে ছেলে তো...তোর মা তো তার কত প্রশংসা করেন।

মায়ের কথা ছেড়ে দাও, তুমি সত্যি-সত্যি কি মনে করো? বুঝে নেবার সংকল্প যেন চোখে-মুখে এঁটে বসছে গৌরীর। গলার স্বরও কাঁপছে না।—আমার মোটা বুদ্ধি নিয়ে আমি ওদের রাজনীতিতে ভিড়ি বা না ভিড়ি, আমার ভালো-মন্দের আসল দায় তোমার। এম.এ. পরীক্ষাটা হয়ে গেলে ভিতরে একটুও দুশ্চিন্তা না রেখে ওই কমল চ্যাটার্জীর সঙ্গে নিশ্চিন্ত আনন্দে তুমি তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে কি না?

হ্যাঁ, জ্যাঠামণিকে স্পষ্টই ফাঁপরে পড়তে দেখেছিল গৌরী। এ-রকম আর কখনো দেখেনি। সামনে বসে এমন কথা এক ও ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। দাদারাও না। চোখে-মুখে বিস্ময় টেনে এনেছিলেন জ্যাঠামণিও।

তুই তো আচ্ছা ঠোঁট-কাটা মেয়ে হয়ে উঠেছিস দেখি, অ্যাঁ?

কিন্তু গৌরী চুপচাপ চেয়েই ছিল। জবাবের অপেক্ষায় ছিল। ফাঁকি ধরার অপেক্ষায়ও। জ্যাঠামণিকে কতখানি কঠিন সংকটে ফেলা হয়েছে সেটা সে অনুভব করতে পারে।

খানিকক্ষণ ধরে জ্যাঠামণি ওর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই স্পর্শে তাঁর স্নেহ যেন গলে গলে পড়ছিল। তারপর হাসিমুখে হাল্‌কা সুরেই বলেছিলেন, আমি তো তোর বাবার মতো বিলেত-ফেরত ডাক্তার নই রে, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ...একটু-আধটু ভগবান-টগবান মানি। তাই আমি বিয়ে দেব, আমি ভালো করব এ-সব ভাবতে একটু অসুবিধে হয়। ব্যবস্থা সব ওপর থেকেই হয়ে আছে। তবু তোর ভালো-মন্দ একটু-আধটু না ভেবে পারিনে, কমলের সঙ্গেও বিয়েটা হতে পারে মনে হলে তার জন্যেও ওপর অলার কাছে প্রার্থনা করি, তুই যেন সুখে থাকিস, ছেলেটা যেন সত্যিকারের ভালো হয়। তার বেশি কিছু আমি সত্যিই ভাবি না, বুঝলি?

অপলক চোখে চেয়ে থেকে সঙ্গে সঙ্গে গৌরী বলে উঠেছিল, লোকে অনায়াসে যা পায় বা যে-ব্যাপারে সন্দেহ থাকে না, তার জন্যে প্রার্থনা করে না। সন্দেহ থাকলে, পাবে কি পাবে না ভাবলে, প্রার্থনা করে। ওই লোক সত্যিকারের ভালো কি না সে-রকম সন্দেহ না থাকলে তুমি প্রার্থনা করো কেন?

কপট রাগে জ্যাঠামণি ওর পিঠে চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন একটা।

—বেশ ডেঁপো হয়ে উঠেছিস, কেমন? তারপর হেসেই বলেছিলেন, এক কাজ কর, তোর ছোড়দাকে বিলেত থেকে চলে আসতে লিখে দে, ওর বদলে তুই ব্যরিস্টারি পড়তে চলে যা।

বহুজনের সামনে কাল ওইবাবে বংশ তুলে গালাগাল আর ওই সব অশ্রাব্য কটূক্তি করার পর আজই তার দর্শন মিলবে গৌরী ভাবেনি। যে-দলেই ভিড়ুক, জ্যাঠামণির প্রতি ওর অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার টানটাও ভালোই জানা আছে কমল চ্যাটার্জীর। জেনেও এই রকম অপমান করেছে, ওই সব বলেছে। আর তার পরেও এমনি অনায়াস দম্ভে আজই বাড়িতে এসে হানা দিতে পেরেছে।

স্পষ্টতার মুখোশ ধারণে সুপটু বলেই পেরেছে। সেটার ওপর অপরিসীম আস্থা, তাই পেরেছে। কিন্তু সে মুখোশ গৌরী আজ বলতে গেলে ছিঁড়ে খুঁড়েই দিয়েছে। যেটুকু জানবার জানিয়ে দিয়েছে।

পড়ার বই সামনে ফেলে রেখে গৌরী সিদ্ধান্ত চুপচাপ বসে আছে তেমনি। লোকটা আহত হয়ে চেলে গেছে বটে, কিন্তু গৌরীর নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ হয়নি। বোঝাপড়ার সবে শুরু যেন। পিছনের দরজার কাছে জ্যাঠামণি চুপচাপ খানিক দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে চলে গেলেন টের পেল না। তার আগে মা-ও এসে মেয়েকে ও-রকম অন্যমনস্ক দেখে ফিরে গেছেন।

সন্ধ্যার ওই ঘটনার সময় জ্যাঠা বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু অমিয়াদেবী ছিলেন। কমলের আসার খবর তিনিই প্রথম পেয়েছিলেন। আর গৌরীকে খবর দেবার জন্য মতিবাঈকে তিনিই ছাদে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভরসা করে নীচের বসার ঘরে নেমে আসতে পারেননি। গতকাল থেকে মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর কেবল মনে হয়েছে কিছু একটা গণ্ডগোলের ব্যাপার আসন্ন। সেই থেকে বেশ একটু ভয়ে-ভয়েই আছেন তিনি। বাড়ির অথবা বাড়ির বাইরের অনেক ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে এই মেয়েরই সব থেকে

বেশি তর্ক-বিতর্ক হয়। ফাঁক পেলে তিনি কড়া ধমক-ধমকও করেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মা-টি এই মেয়েকেই সমঝে চলেন সব থেকে বেশি। ছেলেদের তিনি কেয়ারও করেন না।

ভিতরে ভিতরে গৌরীর সত্যিই বড় রকমের বিশ্লেষণ চলেছে একটা। গতকাল থেকে আজ এ পর্যন্ত ও নিজের ভিতরের একদিকটায় তাকায়নি। কমল চ্যাটার্জীকে সামনে ধরে রেখেছে— তারই বিচার করেছে। সেই বিচারে নিজে সে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিছুদিন ধরে ওই একজনের স্বরূপ সম্পর্কে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর সংশয়ের আঁচড় পড়ছিল ওর মনে, গতকালের ব্যাপারে ওগুলোই ক্ষতর আকার নিচ্ছিল, জ্বালা ছড়াচ্ছিল। কাল রাতে জ্যাঠামণির সঙ্গে কথাবার্তার পর এই লোককে এক-রকম বাতিলের পর্যায়ে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছিল ও। আর আজকের এই একঘণ্টার প্রসহনেও ওর মধ্যে অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনার লেশমাত্র ছিল না।

কিন্তু সব মিলিয়ে কি দাঁড়াল?

তাকে চেনার বা না চেনার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় আজ অনেকখানি ঘুচে গেছে। যে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ সর্বদা মহৎ বা বৃহৎ নয়, তার প্রায় স্বেচ্ছাচারী গোছের সেই প্রবল ইচ্ছাসম্পন্ন মূর্তিখানা আজ অনেকখানি অনাবৃত হয়ে গেছে। আর, সব থেকে যেটি বড় অস্ত্র লোকটার, সেই স্পষ্টতার আড়াল থেকে সামনে টেনে এনে তার আসল রূপখানাও গৌরী আজ খুব ভালো করে দেখে নিতে পেরেছে।

কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল?

সর্ব কৃত্রিমতা, সকল আতিশয্য খসিয়ে যে লোকটাকে সে সামনে দেখতে পাচ্ছে, তাকেও নিজের জীবন থেকে একেবারে ছেঁটে দেওয়া সম্ভব কি? বাতিল করা সম্ভব কি?

না, অচল ভাবা যাচ্ছে না তাকেও। ভাবতে গেলে বরং বর্ণশূন্য লাগছে। ভিতরের কোনো একটা দিক খালি-খালি লাগছে। উল্টে ঠিক এইভাবে জানার পর, এই-রকম করে চেনার পর ওই লোকের প্রতি আজ এই প্রথম যেন একটা মোহশূন্য বিভ্রমশূন্য আকর্ষণ অনুভব করছে গৌরী সিদ্ধান্ত।

চার

ওই মোহ আর ওই বিভ্রম গৌরীর সত্তাসুদ্ধু দখল করে বসছিল একটু একটু করে। একটানা আড়াই বছর ধরে। গৌরীর তাতে আপত্তি, তাতে অস্বস্তি। ঘরে বাইরে সর্বত্র বরাবর নিজেকে নিজের দখলে রেখে অভ্যস্ত সে। এরই নাম ব্যক্তিত্ব। সমবয়সী কোনো ছেলে বা মেয়ে সে ব্যক্তিত্বকে কখনো তুচ্ছ করতে পারেনি। কিন্তু বন্যার তোড়ে যেমন কাঁচা বাঁধ ধসে পড়ে, একজনের দুরন্ত ইচ্ছার বেগে ওর সব আপত্তি আর অস্বস্তিও ঠিক তেমনি করেই ভেসে যাচ্ছিল।

সেই একজন কমল চ্যাটার্জী।

তাকে নিয়ে অনেক দিন অনেক সঙ্কট গেছে, অনেক ত্রাস গেছে গৌরীর। ভয়ানক অসহায় বোধ করেছে। সেই অসহায়তা নিজের কাছে অন্তত ধরা পড়েছে। কিন্তু এ যাবৎ গৌরী আত্মরক্ষা যে করতে পেরেছে, সেটা ওর নিজের সত্তার জোরে নয়। জোরের অভিনয় ছিল বটে, কিন্তু জোর ছিল না। আসলে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে ওই একজন অনেক সময় তাকে দয়া করেছে বলে, আর অনেক সময় ওর জোরের অভিনয় বিশ্বাস করেছে বলে। ভিতরে যত অসহায় বোধ করত, বাইরের জোরের দিকটা ততো বেশি স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করতে গৌরী।

বয়সে কমল চ্যাটার্জী তিন সাড়ে তিন বছরের মাত্র বড় ওর থেকে। পড়তও ওর থেকে তিনি ক্লাস ওপরে। বি.এ. পড়ার সময় এবং বি. এ. পাশ করে এম. এ. পড়তে পড়তে রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় পদাপর্ণের ফলে এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। মধ্যে অনেকবার জেল খেটেছে। তারপর এম.এ. পাশের সঙ্কল্পে জলাঞ্জলি দিয়ে রাজনীতির পাকা সড়কে নেমে পড়েছে।

গৌরীর জীবনে ধূমকেতুর আবির্ভাব তার। এর আগের যে যোগাযোগ তাকে ঠিক আবির্ভাব বলা যায় না। মাঝখানে অনেকগুলো দিন গেছে মাস গেছে বছর গেছে। একটা রমণীয় স্মৃতির ওপর

বিস্মরণের ধূলিকণা জমেছে। তারপর এই দেখা। গৌরীর তখন বি. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়। ইতিহাসে অনার্স পড়ছে। মাস আট নয় মাত্র বাকি তখন ডিগ্রী পরীক্ষার।

হ্যাঁ, এরও ঢের আগে থেকে গৌরী তার মুখ চিনত, পরিচয় জানত। একটু-আধটু আলাপও ছিল। যখন ও স্কুলে পড়ে আর ফ্রক বা সালোয়ার কামিজ পরে, তখন থেকে। মুখ ভালো-রকম ওই ছেলেও চিনত বইকি তখন, কিন্তু দেমাকে ডগমগ করত বলে চিনতেও চাইত না, পাত্তাও দিত না। গৌরী সেই রকমই ভাবত তখন। কিন্তু দেখা তখন খুব কমই হত। গৌরীরা থাকে শহরের এ মাথায়, আর ওদের বাস শহরের একেবারে উল্টো মাথায়—মাঝে মাইল ছয় ফারাক।

একই শহরে বসবাস সত্ত্বেও কমলের মা সুলতা চ্যাটার্জীকে হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করেছিলেন গৌরীর মা। সেই আবিষ্কারের দৃশ্যটা গৌরীর এখনো মনে আছে। সেই স্মৃতি নিখাদ সুন্দর। মনে হয় এই সে-দিনের কথা।

কিন্তু ওই পূর্বকথার আগেরও একটু পূর্বকথা বলে না নিলে আবিষ্কারের রোমঞ্চ টুকু সম্পূর্ণ হবে না। গৌরীর মা অমিয়া কলকাতার স্কুল কলেজে পড়েছেন। তারই ফলে বিলেত ফেরতের ঘরে পদার্পণ সহজ হয়েছে। মায়েদের স্কুলটা মেয়েদের বেশ নাম করা স্কুলই ছিল। সেই স্কুলের একটি মাত্র মেয়েকে মনে মনে একরকম ঈর্ষাই করতেন অমিয়া। আর তেমনি ভালোও বাসতেন। সেই মেয়ে সুলতা। সুলতা চাটুজ্জে নয় তখন, সুলতা মুখুজ্জে।

বছরের পর বছর স্কুলের সেরা প্রাইজগুলো বরাদ্দ ছিল সেই সুলতা মুখুজ্জের। পরীক্ষার ফল বেরুলে দ্বিতীয় স্থান থেকে অমিয়ার যেন ওঁকে ঘাড় উঁচিয়ে দেখতে হত—এমনিই তারতম্য ঘটে যেত নম্বরের। এতটা তফাত অমিয়ার বরদাস্ত করা সহজ হত না। স্কুলের সর্ব রকমের উৎসবেও ওই মেয়েরই প্রধান ভূমিকা। উনি না থাকলে যথার্থই যেন যজ্ঞ পণ্ড। সর্বব্যাপারে হাসি-খুশি একখানা জীবন্ত মেয়ে। অথচ বাড়ির অবস্থা তেমন সুবিধের নয়, অনেকগুলো বোন। ভালো এবং যোগ্য ছাত্রী হিসেবে প্রতি বছর ফ্রী-শিপ না পেলে সুলতার অমন নামী স্কুলে পড়ারও সঙ্গতি ছিল না।

অমিয়ার সঙ্গে ওঁরই সব থেকে বেশি খাতির ছিল বটে, কিন্তু ওই নাম-করা ভালো মেয়ের প্রতি হেড মিসট্রেস থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষয়িত্রীর তুলনা-মূলক পক্ষপাতিত্ব অনেক সময়ই ক্ষোভের কারণ হত। এ ছাড়া স্কুল সোশ্যালের সুলতা লিডার, স্কুল ডিবেটের উনি একদিনের প্রধান প্রবক্তা, স্কুল ড্রামার প্রধান চরিত্রটি যেন রসগোল্লার মতো টুপ করে ওঁরই মুখে পড়ার জন্য ব্যগ্র। একবার তো ড্রামার রোল সিলেকশন নিয়ে রীতিমতো মন কষাকষি ব্যাপার। চতুর সুলতা অবশ্য সেটা বুঝে প্রধান ভূমিকাটি নিজে না নিয়ে ওঁকেই পাইয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অন্য মেয়েদের আর টিচারদের আপত্তিতে সে-চেষ্টা ভেস্তে গেল, মাঝখান থেকে অমিয়ার দ্বিগুণ রাগ গিয়ে পড়ল বেচারী সুলতার ওপরেই। দিনকতক বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ।—সকলের চোখের মণিটি হয়ে আছিস তো আছিস, আমার জন্যে দরদ কে দেখাতে বলেছে তোকে!

কিন্তু রাগ বা রেষারিষির ব্যাপার যা-ই ঘটুক, সেটা সাময়িক। মেয়েদের মধ্যে আসলে অমিয়ারই সব থেকে বেশি টান ছিল সুলতার ওপর। মনে মনে অন্তত নিজের থেকে ওঁকে অনেক বড় বলে স্বীকার না করে পারতেন না। এমন কি খুব সন্তর্পণে সুলতার কিছু কিছু চাল-চলন অনুকরণও করতেন তিনি। সুলতার কথাবার্তা আর আচরণে এমন একটা অনাড়ম্বর সহজতা ছিল, যা চোখে পড়তই। ফলে বোকার মতো অনুকরণ করতে গেলে ধরা পড়ার আশঙ্কা।

স্কুল ফাইন্যালের রেজাল্ট বেরুবার আগেই একদিন খবর পেলেন সুলতার বিয়ে। বাড়ির যা অবস্থা, বাপ ভালো সম্বন্ধ পেয়েই ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। ক'দিন আগেও একসঙ্গে এক কলেজে পড়া নিয়ে ওঁর সঙ্গে কত জল্পনা-কল্পনা। তার মধ্যে কি না বিয়ে! আরো শুনলেন সুলতার ভাবী শ্বশুরবাড়ি পর্যন্ত এখানে নয়, শাহারাণপুর না কোথায়।

সুলতা নিজে যেদিন ওঁকে বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এলেন, তাঁকে দেখামাত্র অমিয়ার সেদিন রাগই হয়ে গেছল। রাগ হবে না, বিয়ে তো বিয়ে, এসেই অত হাসার কি আছে! তারপর উল্টো কাণ্ড। ঘরের

দরজা বন্ধ করে দুই সখিতে গলা জড়াজড়ি করে সে কি কান্না। তারপর বিয়ের দেড় বছরের মধ্যে একবার মাত্র দেখা হয়েছিল দু'জনার।

সুলতার বর যে কারণেই হোক শাহারাণপুর ছেড়ে এখানে ওকালতি করতে এসেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই স্থিতি হয়েছেন। কিন্তু অমিয়া তা জানবেন কি করে। একে শহরের উল্টো মাথায় বাস ওঁদের, তাছাড়া ছেলেমেয়ের গ্রীষ্মের ছুটি, পূজার ছুটি বা আর যে কোনো সুযোগ পেলেই অমিয়া তো কলকাতায় বাপের বাড়ি ছুটতেন। কখনো কি কল্পনা করতে পেরেছেন তাঁর ছেলেবেলার বান্ধবী সুলতা চাটুজ্জে এই শহরেই আর এক মাথায় বসে আছেন।

একেবারের পুজোর ছুটিতে কলকাতায় যাওয়া হল না। ছোড়দার কি একটা শক্ত অসুখ হয়ে বসতে ছুটিটা এখানেই থেকে যেতে হল। খানকতক মাত্র প্রতিমা পুজো হয় এখানে। এর মধ্যে সব থেকে বেশি হৈ-চৈ আনন্দ উৎসব হয় বাঙালি ক্লাবের পুজোর অনুষ্ঠানে। গান-বাজনা হয়, থিয়েটার হয়। মেয়েকে সঙ্গে করে অমিয়া সেই প্রথম পুজো দেখতে এসেছিলেন সেখানে। গৌরী তখন ক্লাস এইটে পড়ে।

ঝকঝকে গাড়ি থেকে নামতে অনেকেরই চোখ গেছল তাদের দিকে। অবশ্য ভিড় বেশি ছিল না, সবে দুপুর গড়িয়েছে তখন। নবমীর দিন সেটা। কোন্ বাড়ির গাড়ি চেপে কে এলেন কর্মকর্তারা তা অন্তত বুঝেছিলেন। ওই বাড়ির গিন্নির কোনোবার দেখা মিলুক বা না মিলুক, ও-বাড়ি থেকে মোটা চাঁদা মেলে। তাঁরা সাদর অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলেন। সেই সময় অমিয়ার মনে হল অদূরে দাঁড়িয়ে একটি মহিলা যেন মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করছেন তাঁকে। প্রতিমা দর্শন করে ফিরে এসে গাড়িতে উঠতে যাবেন, পায়ে পায়ে সেই মহিলাটি এগিয়ে এলেন।

তার একটু বাদে বেশ একটা রমণীয় দৃশ্য দেখতে পেল গৌরী। দ্বিধা কাটিয়ে মহিলা মা-কে খুঁটিয়ে দেখলেন একটু, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, অমিয়া—অমিয়া না?

ঈষৎ বিস্ময়ে মাথা নাড়তে গিয়ে মা যেন বিমূঢ় হঠাৎ—আপনি ....ও-মা। তুই সুলতা? এ কি কাণ্ড তুই? তুই আমাদের সেই সুলতা—অ্যাঁ!

তারপরেই স্থান-কাল বিস্মৃত দু'জনে। দু'জনার হাত ধরে ছোট মেয়ের মতো সে-কি ঝাঁকা-ঝাঁকি। থামতেই চায় না, থামতেই চায় না। শুধু গৌরী নয়, অনেকেই হাঁ করে সেই উচ্ছ্বাস দেখেছে।

টানা উনিশ বছর বাদে এই সাক্ষাৎ। গৌরীর বয়স তখন চোদ্দ। মায়ের এমন একখানা খুশি মুখ আর বোধহয় দেখেনি। মহিলাও খুশিতে আটখানা যেন।

মায়ের পুরনো বান্ধবী ঠিকই অনুমান করেছে। ওরা এখানেই থাকে আর কোন্ বাড়িতে থাকে শুনে তাঁর চোখ আবার কপালে উঠতে দেখেছ।—বলিস কি রে! ওই অত বড় ডাক্তারের বউ তুই! তাঁকে আর এখানকার কে না জনে! এতকাল ধরে এখানেই আছিস, অথচ একবার দেখা পর্যন্ত হয়নি! দেমাকে বুঝি পা পড়ে না—অ্যাঁ?

মা বলেছেন, আমিও তো তাই বলব, তুই এখানে আছিস জানব কি করে!

আজ আছি? বিশ বছর ধরে আছি। গৌরীর দিকে চোখ ঘুরল মহিলার।—এটা তোর মেয়ে? বাঃ, বেশ মিষ্টি মেয়ে তো! দু'হাত বাড়িয়ে খপ করে ওকে কাছে টেনে নিয়ে খাবলা-খাবলি করলেন একপ্রস্থ।

দু'জনে মিলে একটা দৃশ্য রচনা করেছেন এ বোধহয় খেয়াল হল। খানিক বাদে মা তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে লা-মার্টিনের ফাঁকা মাঠে এসে বসলেন। এত আনন্দ যেন কোনো বদ্ধ জায়গায় ধরবার নয়। মাঠে বসে মা গৌরীকে বললেন, আমরা গল্প করি তুই বেড়া একটু—কতকাল বাদে কাকে দেখছি তুই জানিব কি করে।

গৌরী কাছাকাছিই ঘোরাঘুরি করছিল। কেন যেন ও দূরে সরে থাকতে পারছিল না। ওঁদের অনেক কথাই কানে গেছে। বেশ মজাই লাগছিল ওর। একবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোর বর এখানে কি করেন বল—।

হাসি মুখে মহিলা কটাক্ষে একবার গৌরীকে দেখে নিয়েছেন। তারপর অল্প ভ্রূকুটি করে গলা নামিয়ে বলেছেন, এই বুড়ো বয়সে আর বর-বর করিস না বাপু—ওই মেয়েটা শুনে ফেললেও হাসবে। তা তোরটির তুলনায় কিছু না, ছা-পোষা উকিল, আমি বলি ভাঁওতাবাজীর ব্যবসা। মেয়েকে তো দেখছি, আর ছেলেপুলে কি তোর?

ওর বড় দুই ছেলে। তোর?

তোর থেকে এগিয়ে আছি, আমার চার-চারটে অকাল-কুষ্মাণ্ড ছেলে। প্রত্যেকটা গাছে থাকার যুগ্যি—ওদের বাপ বলে ছেলেরা মায়ের মতো হয়েছে। তারপর আবার গলা খাটো করে যা বলেছেন, অন্যদিকে মনোযোগের ছলে তাও শুনেছিল। আর, কেমন লজ্জাও পেয়েছিল। মুখ ঘুরিয়ে আর এক দফা গৌরীকে দেখে নিয়ে মহিলা বলেছেন, আমার কর্তার একটা মেয়ের শখ ছিল বুঝলি, তা কপালে নেই কি আর করা যাবে, চার নম্বরেরটাও ছেলে হতে আচ্ছা করে শাসিয়ে দিয়েছি, ফের ছেলে-মেয়ের নাম করবে তো ঝাঁটা।

মায়ের বিস্ময়, সে কি রে, ভদ্রলোককে তুই ওই রকম করে বলিস না কি!

এর থেকে ঢের বেশি বলি, উকিলেরা সব থেকে বেশি ভাঁওতা দিতে চেষ্টা করে তাদের বউকে, তেমনি মজাও টের পায়। আগে তো প্রায়ই ডিভোর্স করব বলে শাসাতাম, বয়েস হয়ে যাবার পর আর বলতে ভরসা পাই না।

মা হেসে বলেছিলেন, তুই একটুও বদলাসনি, একেবারে ঠিক আগের মতোই আছিস।

আগের খবর গৌরী আর জানবে কি করে। মায়ের মুখে পরে অবশ্য অনেক গল্পই শুনেছে, কিন্তু প্রথম দিন থেকেই সুলতা মাসিকে ওর খুব ভালো লেগেছে। প্রথম মাস-কতক তো খুবই আনাগোনা গেছে। মা-ই আগে ওদের বাড়ি ছুটেছেন। সুলতা মাসি স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন, তুই বড়লোক, আগে তুই আমার বাড়ি যাবি—তোর রকম-সকম দেখে পরে আমি যাব। মহিলা যত ছা-পোষা বলে জাহির করেছেন নিজেদের, ততটা মোটেই না। শহরের বাইরে ফাঁকার ওপর বেশ ছিমছাম ছোট বাড়ি নিজেদের।

মায়ের সঙ্গে প্রথম দিন এসেই গৌরীর মনে হয়েছে মাসিটি মায়ের থেকেও অনেক সুপটু গৃহিণী। নিজের হাতে রান্না-বান্না করেন, বাড়ির সামনের ছোট বাগানটুকুও নাকি তাঁর নিজের হাতে করা। হেসে বেলেছেন, সকালে ঘুম ভেঙে সুয্যির মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসার যাত্রা শুরু—শেষ সেই রাত বারোটায়।

শুধু নিজে আসা নয় গাড়ি পাঠিয়ে মা তাঁকেও বহুবার বাড়িতে আনিয়েছেন। আর কারো সম্পর্কে মায়ের এত আগ্রহ গৌরী দেখেনি। যতই তড়বড় করুন, গোড়ায় বড়লোকের বাড়িতে আসতে মাসির দ্বিধা একটু ছিল। মায়ের রাগ দেখে না এসে পারেননি। শেষে আসা যাওয়া অনেক সহজ হয়েছে। দেখা হলেই আদর করে গৌরীকে কাছে টেনে নেন, আর মাকে বলেন ভারী মিষ্টি মেয়েটা রে তোর।

এ-রকম তোয়াজে কে না খুশি হয়। মা যখনই সুলতা মাসির বাড়ি যেতেন গৌরীকে নিয়ে যেতেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, মাসির ছেলেদের দেখা কমই মিলত। বড় ছেলেকে তো বড় জোর দিন কয়েক পেয়েছে। রীতিমতো মাতব্বর-মাতব্বর ভাব তার। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকায়, হাসি পেলেও মান খোয়া যাবার ভয়ে যেন হাসতে চায় না। গৌরীর দিকে এমনভাবে তাকাত যেন শুধু দুধ-ভাত খাওয়া একটা ছোট মেয়ে ও। মা তার ছেলেদের খোঁজ করলে, মাসি বলতেন, সব ক'টা হাড় বজ্জাত, বাড়ির সঙ্গে ওদের শুধু খাওয়া আর ঘুমুনোর সম্পর্ক।

হাড়-বজ্জাত ছেলেদের মধ্যে ওই বড় ছেলের দুষ্টুমির নমুনা গৌরী একটু-আধটু পেয়েছে। একদিন ওদের বাড়ি এসে দেখে সিঁড়ির দাওয়ায় বসে ছেলে একটা ডাঁশা পেয়ারা চিবুচ্ছে। মাসি তখন তাঁর ছোট বাগানে। দূর থেকে তাঁকে দেখেই মা হাসি মুখে সেদিকে এগোলেন। ঘাড় বাঁকিয়ে ছেলেটার দিকে চোখ রেখেই গৌরীও সেদিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল। ছেলেটার মাতব্বর হাবভাব ওর পছন্দ নয়। ভালো করে গোঁফের রেখাও পড়েনি, আর সবে স্কুল ফাইন্যালের বেড়া টপকাতে যাচ্ছে—অথচ ভাবখানা এমন যেন বয়সের গাছ পাথর নেই।

গৌরীর বাগানের দিকে অর্থাৎ মা-মাসির দিকে এগনো হল না। তার আগেই ওই ছেলে আঙুল তুলে ডাকল ওকে। হুকুম করে ডাকার মতো। গৌরী কাছে আসবে কি আসবে না ভাবল একবার। ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কেউ ডাকলে না আসাটা অভদ্রতা। আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়াল। পেয়ারা দিতে চাইলে নেবে না ঠিক করেই ফেলেছে।

মহারানীর নাম কি?

বাক্যালাপের বহর দেখে গৌরীর দু'চোখ কপালে।—নাম গৌরী। মহারানী বলছ কেন?

ঠোঁটের ডগায় তির্যক হাসি দেখল একটু।—অমন একখানা মস্ত ঝকমকে গাড়ি থেকে নামলে, মহারানী বলব না! গাড়ি থেকে নেমে মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাটিশুদ্ধু ধন্য হয়ে গেল। ... তা মহারানীরা কি পেয়ারা খায়?

মহারানী শুনে রাগ হচ্ছিল বলেই গৌরী সঙ্কল্প বদলে ফেলল। জবাব দিল, পেলে খায়।

জামার পকেট থেকে আর একটা পেয়ারা বার করে ওর হাতে দিল। জিজ্ঞাসা করল নিজে চিবুতে পারবে না চিবিয়ে দিতে হবে।

গৌরী থমকে তাকালো তার দিকে, তারপর রাগ করে হাতের পেয়ারাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। হনহন করে বাগানের দিকে যাচ্ছিল, ছেলেটা খপ করে পিছন থেকে এসে ধরল।

ছাড়ো বলছি!

গোস্তাকি মাফ কীজিয়ে শাহাজাদী, ম্যায় আপকি বান্দা হুঁ।

গলায় চিনি ঢেলে এমন ইনিয়ে বিনিয়ে বলল যে থতমত খেয়ে গৌরী ঘুরে তাকালো। তারপর লাল মুখের ওপরেই হাসির ছোপ ধরল। হিড়হিড় করে ছেলেটা আবার ওকে সিঁড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। তারপর নিজেও পাশে বসল। গম্ভীর।—আর পেয়ারা নেই, গাছ থেকে পেড়ে দেব?

গৌরী জবাব দিল না।

দুষ্টু ছেলে ওর চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা একটু তুলে ধরল। তেমনি গম্ভীর মুখে নিরীক্ষণ করল একটু। —মা আজই সকালে বাবাকে বলেছিলেন, ভারী মিষ্টি মেয়েটা অমিয়ার। এখন দেখছি, বেশ মেজাজী মিষ্টি। আমাকে চেন?

রাগের মাথায় ডাঁশা পেয়ারা ছুঁড়ে ফেলার ফলে গৌরীর তপ্ত মেজাজ তখনো। জবাব দিল না।

তাতেই যেন আঁতে ঘা লাগল ছেলের। আরও গম্ভীর।— আমার নাম কমল চ্যাটার্জী। পাড়ার ছেলেরা আর স্কুলের ছেলেরা এক ডাকে চেনে। স্কুলের বাংলা মাস্টার বলে ওই নাম বদলে কণ্টক চ্যাটার্জী রাখা উচিত ছিল। মা-কে বলতে মা বলল, তোর নাম বিছুটি চ্যাটার্জী রাখা উচিত ছিল। নয়তো হনুমান চ্যাটার্জী।

চোখ বড় বড় করে আত্মপরিচয় শুনছিল গৌরী। শেষটুকু শুনে ফিক করে হেসেই ফেলল।

বাঃ! মিষ্টি মেয়েই তো দেখি! কি পড়ো?

পরিচয় শোনার পর আর কেন যেন অবাধ্য হতে ভরসা পেল না গৌরী।—এবারে ক্লাসে এইটে উঠলাম।

ফুঃ! একেবারে খুকী—

তুমি তো সবে টেস্ট দিয়েছ, এখনো স্কুল ফাইন্যাল বাকি। মাসি বলেছে তাতেও ঘোল খাবে।

মা ঠিক বলেছে। আমি জ্ঞানী মূর্খ। পরীক্ষা-টরীক্ষার ধার ধারি না। তোমাকে পেয়ারা পেড়ে দিই চলো। হাত ধরেই টেনে তুলল ওকে। তারপর বাগানের দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল, তোমার আর কি গুণ আছে বলো, গাড়ি চেপে তো বেড়াতে পারো খুব, গাছে উঠতে পারো?

গৌরী জবাব দিল, ছোট গাছ হলে পারি বোধহয়।

কমল হাসতে লাগল। দু'জনে বাগানে এলো। যেদিকে মা আর মাসি ও-দিক ফিরে গল্প করছে তার থেকে হাত চল্লিশ-পঞ্চাশ দূরে বাগানের কাঁটা তার ঘেঁষা পেয়ারা গাছ। বেশি বড় নয় গাছটা। ওইটুকু গাছে অত পেয়ারা দেখে গৌরীর যেমন লোভ হল তেমনি আনন্দ হল।

ওঠো—

ভয়ে-ভয়ে গৌরী তার মুখের দিকে তাকালো একবার। গাছের ডালাপালা দেখে মনে হল ওঠাটা শক্ত হবে না। তাছাড়া মানের প্রশ্ন আছে। ভয় পেয়েছে বুঝলে ওই ছেলে হাসবে। টিপ্পনী কাটবে। অতএব হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে সাহসও বাড়তে থাকল। অপেক্ষাকৃত একটা সুর ডালের দিকে ঝুঁকে হাত বাড়ালো। কিন্তু পেয়ারাগুলো আধ-হাতটাক দূরে তখনো। ডালটার ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে গৌরী নাগাল পেতে চেষ্টা করল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওই পাজি ছেলে লাফ দিয়ে ডালটা ধরে ঝুলে পড়েই ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গৌরী একটা আর্তনাদ করে পড়ে গেল। কিন্তু মাটিতে পড়ল না, ওই ছেলে প্রস্তুতই ছিল, লুফে নেবার মতো করে ধরে ফেলতে চেষ্টা করল ওকে। তারপর দুজনেই মাটিতে লুটোপুটি। কমল নীচে, গৌরী ওর ওপরে।

চিৎকার শুনে মা আর সুলতা মাসি একসঙ্গে ছুটে এসেছেন। তারপরের দৃশ্য দেখে হতবাক দু'জনে। ক্রুদ্ধ গৌরী নীচের ছেলেটার ওপর কিল-চড়ের বৃষ্টি শুরু করেছে।

মা চিৎকার করে উঠলেন, এই মেয়ে ভালো হবে না, এ কি করছিস!

সুলতা মাসি বলে উঠলেন, বেশ করেছে, ও নিশ্চয় বাঁদরামো করেছে।

গৌরী উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। সমস্ত মুখ লাল। কমল মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে সুলতা মাসি খপ করে তার চুলের মুঠি ধরে ফেলেছেন।—কি করলি? মেয়েটাকে গাছ থেকে ফেললি?

পরক্ষণে রাগ ভুলে দু' চোখ বিস্ফারিত গৌরীর। ওই দামাল ছেলে দু হাতে তার মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে লাট্টুর মতো বন বন করে ঘুরতে লাগল আর হাসতে লাগল। ঘুরছেই, ঘুরছেই। মাসির কাহিল দশা। ছাড় শিগগীর, খুন করব, ইত্যাদি বলে শাসাচ্ছেন। ছেলে তাকে ছেড়ে দিয়েই হাসতে হাসতে ছুটে পালাল। মাসি মাটিতে বসে পড়ে নিজেকে সামলালেন। গৌরী অবাক হয়ে দেখল, রাগের মুখেই মাসিও হেসে সারা।

সেই থেকে আর এ-বাড়ি এলেই গৌরী আগে ভয়ে ভয়ে দেখে নিত দুষ্টু ছেলেটা বাড়ি আছে কি না। থাকলে মাসির কাছ থেকে নড়ত না।

বছর দেড়েক পরের কথা। মাসি প্রায়ই আসেন তখন। সামনে পেলে ওকে আগের থেকেও বেশি আদর করেন, মিষ্টি মেয়ে বলেন। নিজের হাতের তৈরি খাবার-টাবারও মাঝে মাঝে নিয়ে আসেন ওর জন্যে।

ছুটির দিন সেটা। দুপুরে নিজের ঘরে বসে গৌরী অঙ্ক করছিল। নিয়ম করে পড়তে বসার ব্যাপারে ওকে কখনো তাগিদ দিতে হয় না। প্রতিবার ফার্স্ট হয় বলেও পড়ার ঝোঁক আর উৎসাহ আছে। একটু আগে সুলতা মাসি এসে প্রথমেই ওর ঘরে ঢুকেছেন। পিঠ চাপড়ে, গালে গাল ঠেকিয়ে আদর করে তারপর মায়ের ঘরে গেছেন।

একটু বাদেই গৌরীর অঙ্কে মন বসল না আর। মা-মাসির আলাপ শুনতে মজাই লাগে তার। দেখা হলে দু'জনার বয়সই যেন অর্ধেক হয়ে যায়। আর ছেলেবেলার কত রকমের গল্প ফেঁদে বসে ঠিক নেই। ভাবে মা-মাসিও একদিন কম ছেলেমানুষ ছিল না। সুলতা মাসি ওকে মিষ্টি মেয়ে বলেন, কিন্তু গৌরীর মনে হয় সুলতা মাসির থেকে মিষ্টি আর কেউ নয়। যাই হোক, মাসি আসার দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই উসখুস করে গৌরী উঠে পড়ে মায়ের ঘরের দিকে গেল। কিন্তু ঘরে ঢোকার আগেই ওঁদের বাক্যালাপ শুনে পা থেমে গেল। মায়ের বিছানায় জানালার দিকে মুখ করে বসে কথা কইছেন দু'জনে।

সুলতা মাসি বলছেন, তোর ওই মেয়েটাকে কত যে ভালো লাগে—ওটাকে দিয়ে দিবি আমাকে?

মা অবাক।—মেয়ে দিয়ে দেব কি রে!

সুলতা মাসির ছদ্ম অভিমান, ও বড়লোক বলে নাক সিটকোচ্ছিস বুঝি? আমার ছেলে একটা কেউকেটা লোক না হয়ে ছাড়বে না জানিস? এখন থেকে স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। পরে পস্তাবি বলে রাখলাম।

বাইরে গৌরীর মুখ লাল। মায়েরও বোধগম্য হল এবার। জোরেই হেসে উঠলেন, তাই বল্! তোর শাশুড়ী হওয়ার সাধ এখনই?

সুলতা মাসি তরল সুরে জবাব দিলেন, এখন কে বলছে, এখনই বায়না করে রাখলাম, পরে কোন্ বড়লোক এসে টুক করে গিলে বসবে আর আমি হাঁ করে থাকব।

গৌরীর ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছিল, আবার যেতেও পারছিল না। ওদিকে মা-ও হাসছেন খুব। —বায়না করবি কি, এতদিনে তো তোর ছেলেটাকে সে-রকম দেখলা৺ ও না ভালো করে।

সঙ্গে সঙ্গে সুলতা মাসির হালকা তর্জন, দেখ অমিয়া, বড়লোক বলে তোর বড় দেমাক বেড়েছে। কোথায় আমি ছেলের মা এ-প্রস্তাব করছি বলে কৃত-কৃতার্থ হয়ে যাবি তা না আবার ভালো করে দেখতে হবে! দেখবি আবার কি, আমার ছেলে একটা আস্ত বাঁদর সবাই জানে। কালে দিনে ঠিক হনুমান হয়ে বসবে দেখে নিস।

হাসির দমকে গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়ে যাবার ভয়ে গৌরী নিজের মুখে হাতচাপা দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে সেখান থেকে। তারপর যতবার সুলতা মাসির কথা মনে পড়েছে, ও হেসে গড়িয়েছে। আর বার বার ওই ছেলের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, অনেকটা তার মায়ের ছাঁদের সপ্রতিভ মুখ। তবে সুলতা মাসির থেকে তো বটেই, গৌরীর থেকেও একটু কালো। নিজের ছেলেকে মাসি সর্বদাই বাঁদর আর হনুমান বলে, গৌরীর সেটা শুনতে একটুও খারাপ লাগে না। দেড় বছর আগে পেয়ারা গাছে তুলে দিয়ে যে পেল্লায় আছাড় খাইয়েছিল, সেটা আজও ভুলতে পারে না। মনে মনে গৌরীও যে কতবার ওকে বাঁদর আর হনুমান বলেছে ঠিক নেই। কিন্তু মাসির মুখে এ-কথা শুনলে একেবারে অন্যরকম লাগে আর মিষ্টি লাগে। ওই ছেলের সঙ্গে বিয়ের সম্ভাবনাটা গৌরী মনে মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছে। না, বর হিসেবে সেই দাম্ভিক ছেলেকে সে-রকম কিছু মনে ধরেনি। কলেজে ঢোকার পর থেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাবটা আরো যেন বেড়েছে। কিন্তু সুলতা মাসিকে শাশুড়ী ভাবতে ওর মজাই লেগেছে।

এরপর গৌরী অনেকদিন লক্ষ্য করেছে মা আর সুলতা মাসি ওর দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসে। মাসি ওকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে, কি রে আমার বাড়ি যাবি? গৌরা কিছু না বোঝার ভান করে কিন্তু ঠিকই বোঝে ওকে নিয়ে তাদের মধ্যে বেশ একটা মজা চলেছে। কি মজা কেন মজা তাও ভালোই অনুমান করতে পারে।

মাস পাঁচ ছয় বাদে একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় রাস্তায় দেখল একটা মিছিলের আগেভাগে পার্টির নিশান হাতে ওই ছেলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে চলেছে। বেশির ভাগই অল্পবয়সী ছেলে সব। কি ওদের অভিযোগ, কেন এই ক্রুদ্ধ আস্ফালন গৌরী জানে না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল, জ্যাঠামণি যে-দিকে আছেন সেই দলেই নিপাত ঘোষণা করছে ওরা। বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি গালাগাল দিতে দিতে চলেছে। তাইতেই খুব খারাপ লাগছিল, ওকে দেখেও ছেলেটা যেন ইচ্ছে করেই চিনতেও পারল না। পরে এ-রকম আরো দুই একবার দেখেছে। ওই গোছের অবজ্ঞাও।

এরপর একদিন মায়ের সঙ্গে সুলতা মাসির বাড়ি গিয়ে হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসেছিল, ওরা সব আমার জ্যাঠামণিকে ও-রকম গালাগাল করে কেন?

মা এই প্রসঙ্গের উত্থাপন চান না। গৌরী আগে তাঁর কাছেও নালিশ করেছে। সুলতা মাসি তক্ষুনি সুন্দর ভ্রূ-ভঙ্গি করে জবাব দিয়েছেন, ও মা গালাগালি করবে না, ওদের যেন নতুন পাখা গজিয়েছে! ওরা মা-কেও এরপর মা বলবে কিনা অমার খুব সন্দেহ আছে। পরে একটু আদর করে জিজ্ঞাসা করেছেন, জ্যাঠামণিকে গালাগাল করলে তোর তো কষ্ট হবারই কথা—দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি মজা। হাঁক দিলেন, কমল! এই হনুমান!

গৌরীর দু'চোখ কপালে। ওই ছেলে বাড়ি আছে তাই জানত না, এদিকে মা-ও অপ্রস্তুত। তিনিও আর বাধা দেবার সময় পেলেন না। ছেলে ঘরে হাজির।

সুলতা মাসি ডাকলেন, এদিকে আয়।

কিছু না বুঝেই ছেলে কয়েক পা এগলো, তারপর বিপদের গন্ধ পেয়েই যেন থমকে দাঁড়াল।—কেন?

এদিকে আয় বলছি! মাসির চোখে মুখে ছদ্মকোপ।

ছেলে একটুও ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না। ঠোঁটে হাসির রেখা।—এদের সামনেই মার ধ'র করবে না কি?

ভালো হবে না, তুই আয় বলছি এদিকে!

মা তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন, কি করিস! না বাবা যাও তুমি।

ছেলেরও গম্ভীর-গম্ভীর মুখ।—আমাকে কি ভীতু পেয়েছেন? সোজা মায়ের কাছে এসে এক হাতে তার মাকে জড়িয়ে ধরে পাশে বসে পড়ল।

শাসন দেখে গৌরী হতভম্ব। একটা হাত কোনোরকমে ছাড়িয়ে নিয়ে মাসি তার পিঠে চড় চাপড় বসাতে লাগলেন। ছেলে হাসছে। আনন্দ করে মায়ের আদর খাচ্ছে যেন। শেষে মাসি হসে ফেলে হাল ছাড়লেন না।—যা ভাগ এখান থেকে, ফের যদি ওর জ্যাঠামণিকে একটিও খারাপ কথা বলিস, তোকে আস্ত রাখব না বলে দিলাম!

—বলব তো বটেই, আগের ভাগেই মেরে নাও তাহলে। বলে আর একদফা মা-কে ধরে খাবলা-খাবলি করে ছেলে হাসতে হাসতে প্রস্থান করল। গৌরীর মা-ও হাসছেন তখন। আর গৌরীরও কেন যেন দৃশ্যটা ভালো লাগল।

সুলতা মাসি হাসি মুখেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, ওকে শাস্তি দেব কি, মার খাবার লোভে ও আমাকে নিয়ে এই কাণ্ড করে।

গৌরীর সেবারে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। পড়ার চাপ খুব। একটুও ফুরসত নেই। নিজের উৎসাহেই পড়াশুনা নিয়ে আছে, পরীক্ষায় কারও পিছনে পড়ে থাকতে রাজি নয় ও। সুলতা মাসির সঙ্গেও ইদানীং দেখা সাক্ষাৎ কম। হঠাৎ একদিন মায়ের মুখে শুনল তাঁর খুব অসুখ। মনটা একটু খারাপ হল বটে, কিন্তু পড়ার চাপে আবার ভুলেও গেল তাঁর কথা।

কিন্তু ক'দিন বাদেই বিষম চমকে উঠল। মা অস্বাভাবিক গম্ভীর। সেই মুখ দেখেই গৌরী বুঝে নিল খবর ভালো নয়। সেদিন সকালেই সুলতা মাসিকে দেখতে গেছলেন, খানিক বাদে ফিরে এসে বাবা যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই তাঁকে টেনে গাড়িতে তুলে আবার বেরিয়ে গেলেন।

ফিরলেন আরো ঘণ্টাখানেক বাদে।

ত্রাসে আর আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু গৌরীর। সুলতা মাসির কিছু হতে পারে ভাবতে পারছে না! কিন্তু মায়ের সমস্ত মুখ যেন আলগা কালি লেপে দিয়েছে কে। মাসি কেমন আছে সাহস করে গৌরী তাও জিজ্ঞাসা করতে পারল না।

আরো তিন দিন বাবাকে নিয়ে মা দু'বেলা ও-বাড়ি ছোটাছুটি করলেন। গৌরীরও যাবার ইচ্ছে, সুলতা মাসিকে দেখার ইচ্ছে। কিন্তু সাহস নেই। চার দিনের দিন গাড়ি থেকে নেমেই মা কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন। ওকে দেখে অস্ফুট আর্তনাদ, ও রে গৌরী, তোর সুলতা মাসি চলে গেল!

না, গৌরী মায়ের মতো কান্নাকাটি করেনি বা শোকে স্তব্ধ হয়ে থাকেনি। বরং মায়ের জন্যেই উতলা হয়েছে। দিনকয়েক সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর শোক লাঘব করতে চেষ্টা করেছে। মা কত ভালোবাসত সুলতা মাসিকে গৌরী অনুভব করতে পারত। তাঁর শোক স্বাভাবিক। কিন্তু, শোক কি না জানে না, গৌরীর ভিতরে ভিতরেও একটা বিষণ্ণ প্রতিক্রিয়া চলছিল। সেটা সুলতা মাসিকে কেন্দ্র করেই। থেকে থেকে ওর কেবলই মনে হচ্ছিল, সুলতা মাসির মৃত্যুতে সব থেকে বড় কিছু ক্ষতি ওরই হয়ে গেল।

দিন দুই বাদে মা সখেদে বললেন, বড় ছেলেটাকে হতভাগী একবার চোখের দেখাও দেখে যেতে পারল না, কত বার যে নাম করছিল—

দেখে যেতে না পারার কারণও শুনল। বড় ছেলে কমল চ্যাটার্জী তখন জেলে। দেশের জন্য জেল খাটছে। মায়ের অসুখের খবর সেখানে পৌঁছেছিল, কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ও এসে পৌঁছুতে পারেনি।

হ্যাঁ, প্রচণ্ড রাগই হয়ে গেছল গৌরীর। অমন মা চলে গেল, খুব দেশের সেবা করছে। সামনে পেলে গৌরী দু'কথা শুনিয়ে দিত। এখন আর সে ছোটটি নেই। কিন্তু তারপর যে কথা-শুনল তাতে রাগটা গিয়ে পড়ল জেল-অলাদের ওপর। সুলতা মাসি না কি মাকে বলেছিলেন, বাড়ির মধ্যে ওই বড় ছেলেই তার মাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসত। গৌরী অবিশ্বাস করেনি। ভালোবাসার নমুনা সে নিজেই স্বচক্ষে দেখেছে কিছু। রাগের মাথায় গৌরী সোজা গিয়ে জ্যাঠার ওপরে চড়াও হয়েছিল। জ্যাঠামণি, এ কি রকম ব্যবস্থা তোমাদের, মায়ের বন্ধু মারা গেল, আর তার ছেলে একবার দেখেও যেতে পারল না?

সেই উগ্র মূর্তি দেখে জ্যাঠামণি অবাক। বললেন, আমি কি সরকার চালাচ্ছি না কি রে।... সময়মত দরখাস্ত-টরখাস্ত করা হয়েছিল কি না...আচ্ছা আমি খবর নিচ্ছি।

খবর নেবার আর দরকার হল না। পরদিনই স্থানীয় কাগজে সরকারি গড়িমসির নজির হিসেবে একটা খবর বেরুল। খবরটা পড়ে গৌরীর গায়েই যেন হুল ফুটল। জ্যাঠামণির দলের ওপর আরো চটে গেল সে। কাগজে লিখেছে, মৃত্যুশয্যাশায়িনী মাকে দেখতে চেয়ে রাজবন্দী অমুক চট্টোপাধ্যায় ছ'দিন আগে দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত দপ্তর ঘুরে শর্তাধীন সাময়িক মুক্তির অনুমতি যখন এলো, মা তখন স্বর্গে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় সরকারের এই উদারতা প্রত্যাখ্যান করে জেলেই আছেন।

ঠিক করেছে। গৌরী নিজে হলেও তাই করত।

হ্যাঁ, সেই প্রথম জ্যাঠামণির দলপুষ্ট সরকারের প্রতি বিষম বিরূপ গৌরী সিদ্ধান্ত।

কয়েকটা বছর কেটে গেছে। গৌরী সেবার বি.এ. পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষার আর মাস পাঁচ ছয় বাকি। সে যে এখন নামকরা ভালো ছাত্রী একটি এ-খবর অনেকেই রাখে। বি.এ. পরীক্ষায়ও সেই সুনাম বজায় রাখার তাগিদ আছে। সে-সুনাম পেলে তার স্বাদ আলাদা। সেই স্বাদ স্কুল ফাইন্যাল আর আই.এ. পরীক্ষায় পেয়েছে। ইতিমধ্যে সুলতা মাসিকে প্রায় ভুলেই গেছে। ওই পরিবারটির সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন।

সেই সময় ওর জীবনে কমল চ্যাটার্জীর নাটকীয় পদার্পণ আবার। এর পিছনে এতটুকু মানসিক প্রস্তুতি ছিল না।

গৌরীদের বাড়ি থেকে ইতিহাস অধ্যুষিত রেসিডেন্সি মাত্র মাইলটাক পথ। সিপাহী বিদ্রোহের এক রক্তাক্ত পটভূমি রেসিডেন্সি। প্রবাসী আর পরদেশীদের অবশ্য-দ্রষ্টব্য স্থান এটি। বিদ্রোহীদের সেই জ্বলন্ত রোষ এই বিশাল এলাকার প্রাচীরে ঘরে ভগ্নস্তূপে এখনও চিহ্নিত হয়ে আছে। তার ইতিবৃত্ত যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি মর্মান্তিক। ছেলেবেলা থেকে জ্যাঠামণির সঙ্গে গৌরী এখানে কতবার যে এসেছে তার হিসেব নেই। এখন ইচ্ছে করলে ও-ই রেসিডেন্সির গাইডের কাজ করতে পারে। এখানকার কোনো স্মৃতি-নিদর্শন, কোনো দালান ঘর, কোনো সমাধি-ফলকের রোমহর্ষক তথ্য তার জানতে বাকি নেই। আর বরাবরই এখানকার এই সমাহিত নির্জনতা ওকে ভয়ানক টানে।

কি একটা গোলযোগের দরুন কলেজে টানা ছুটি চলছিল তখন। কলেজে পড়ানো হোক না হোক, কোর্স শেষ করতেই হবে গৌরীর। তার তো শুধু পাসের সমস্যা নয়। কিন্তু দুপুরে বাড়ি বসে পড়াশুনায় তেমন মন বসত না। তাই প্রায় রোজই দুপুরে একটা দুটো বই নিয়ে-সাইকেল রিকশায় চেপে রেসিডেন্সিতে চলে আসত। শীতকাল তখন, রোদটা মিষ্টি লাগত। ইতিহাসের রোমাঞ্চকর পরিবেশে ইতিহাস পড়ার এমন জায়গা আর বুঝি নেই। বইয়ের পাতায় খানিক চোখ রাখলেই অনায়াসে সুদূর অতীতে পাড়ি দিতে পারে। ভিজিটারদের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলোর দিকে না গিয়ে দূরের নিরিবিলিতে জীর্ণ দেয়ালের আড়ালে কোনো একটা পাথরে বসে পড়ত। তারপর বেশ নিবিষ্ট মনেই পড়াশুনা চলত। ভালো না লাগলে উঠে একটু এ-দিক ও-দিক বেড়াত, তারপর আবার এসে বসত। অবশ্য ভিজিটার দু' চারজন যে ছিটকে ছটকে এদিকে না এসে পড়ত এমন নয়। একটা মেয়েকে এমন জায়গায় বসে পড়াশুনা করতে দেখে তাদের কৌতূহল হত। ...একদিন তো এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক কাছে এসে জিজ্ঞাসাই করে বসল, তুমি কে?

প্রশ্ন শুনে গৌরীর মজাই লেগেছিল। সপ্রতিভ মুখে জবাব দিয়েছিল, একটি মেয়ে—এ গার্ল।

সাহেব অপ্রস্তুত একটু। হেসে বল, ও সিওর...আই মিন হোয়াটই আর ইউ ডুইং হিয়ার? আজ নিয়ে আমি তিন দিন এখানে এলাম, তিন দিনই দেখলাম তুমি বই নিয়ে এখানে বসে আছো।

গৌরী সকৌতুকে ফিরে প্রশ্ন করল, রেসিডেন্সি দেখতে এসে আমাকে দেখবার কারণ?

সাহেব খুশি মুখে হাসতে লাগল। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি পড়ছ?

ইতিহাস পড়ছি।

এখানকার ইতিহাস?

না, এখানকার ইতিহাস আমার জানাই আছে।

ওকে একটু জব্দ করার মতলবেই সম্ভবত সাহেব মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল, এক্সকিউজ মি, এখানে এই যে এতগুলো ব্রেভ ইংরেজের রক্তপাত ঘটে গেছে, তোমাদের দেশের লোকের হাতে, সেটা কি কলঙ্কজনক মনে করো না?

গৌরীর রাগই হয়ে গেছিল। জবাব দিয়েছিল, তার আগে ওই ব্রেভ ইংরেজরা যে অসাধু উপায়ে দেশটা দখল করে আমাদের ব্রেভ মানুষগুলোর রক্ত শুষে খাচ্ছিল সেটা কি আরো কলঙ্কজনক মনে করো না?

জবাব শুনে সাহেব হাসিমুখে মাথা নেড়ে চলে গেছল।

গৌরী জানত এখানকার ছেলে-ছোকরাগুলো ওর এখানে নিয়মিত আসাটা টের পেলে উৎপাত শুরু হবে। হয়তো বইখাতা নিয়ে এখানে এসে সারি সারি পড়তে বসে যাবে সব। কলেজের এক একটা ছেলে ফাঁক পেলে কম জ্বালাতন করে না ওকে। তাই এখানে এলে যতটা সম্ভব নির্জন আড়াল বেছে নিত। তবু এই গতকালই গুটি পাঁচেকের একটি দলের সঙ্গে দেখা। স্থানীয় লোকই, তবে পড়ুয়া বলে মনে হল না। দুই এক-জনের মুখ চেনা, হয়তো জ্যাঠামণির কাছে আসতে দেখে থাকবে।

তারা সামনা-সামনি এসে জ্বালাতন করল না বটে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক ধরে আশেপাশেই ঘুরঘুর করতে থাকল। যেন এদিককার এই ভাঙা দেয়াল, ভাঙা ইঁট আর গাছগাছড়াই একমাত্র দর্শনীয় সামগ্রী ওদের। সেই সব সামগ্রী দেখার ফাঁকে ফাঁকে আসলে ওকেই দেখছিল ওরা। আর নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছিল। গৌরী শেষে ওদের দেখিয়ে ঝপ করে হাতের বইটা বন্ধ করে ফেলল, তারপর উঠে ওদের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে প্রস্থান করল।

ওরা অপ্রস্তুত।

গৌরী পরের দিন অন্য জায়গা বেছে নেবে কি না ভাবছিল। মনে হল, গতকালের সেই ছেলের দঙ্গল কলেজের ছাত্র নয় যখন আজ আর না-ও আসতে পারে। আর সে-রকম অভদ্রও নয় ছেলেগুলো, নইলে ওর ব্যাপারে অতটা অপ্রস্তুত হত না। অতএব সেই একই জায়গায় বসল।

কিন্তু পড়ায় ভালো করে মন বসতে বসতে ওদের বদলে হঠাৎ প্রায় শূন্য থেকে যে-মানুষের আবির্ভাব, ও-রকম সম্ভাবনা গৌরী কল্পনাও করেনি। প্রথমে নির্বাক বিমূঢ় খানিক, তারপর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার দাখিল তার।

সুলতা মাসির বড় ছেলে কমল চ্যাটার্জী। সামনে হাত তিনেকের মধ্যে দাঁড়িয়ে। ঠোঁটের ডগায় টুকরো হাসি, যেন ও এখানে আছে জেনেই এসেছে।

কয়েক বছর পর হলেও গৌরী দেখামাত্র চিনেছে। আগের মতো অতটা না হোক, প্রায় তেমনিই ছিপছিপে লম্বাটে গড়ন, গায়ের রঙে আরো একটু কালোর ছোপ পড়েছে। তবে আগের থেকেও তাজা আর গলার স্বর আগের থেকে অনেকটা ভারী।

জিজ্ঞাসা করল, বসতে পারি

গৌরীকে সকলে চালাক চতুর এবং সপ্রতিভ মেয়ে বলে জানে। দিন কয়েক আগে সাহেব জব্দ করার গল্প শুনে জ্যাঠামণি ওর পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, তুই একটা মেয়ের মতো মেয়ে! কিন্তু কয়েকটা মুহূর্তের এই গৌরীকে দেখলে সে-কথা কেউ বলবে না। কি জবাব দিবে তাও ভেবে পেল না। বিমূঢ় মুখে চেয়ে রইল শুধু।

ওটুকুই সম্মতি ধরে নিয়ে একেবারে মুখোমুখি দু'হাত দূরের পাথরটায় বসে পড়ল কমল চ্যাটার্জী। তারপর পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করল। সিগারেট ধরাল। একটা ধোঁয়ায় ঝাপটা ওর নাকে এসে লাগল। ঠোঁটে সেই আগের মতোই সামান্য হাসির আভাস। যা দেখে গৌরী আগে মাতব্বর ছাড়া আর কিছু ভাবত না। হঠাৎ ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল গৌরী। মনে হল সামনের পাথরটা বড় বেশি কাছে।

কমল জিজ্ঞাসা করল, আমাকে চিনতে পেরেছ?

গৌরী হাসতে চেষ্টা করে মাথা নাড়ল। পেরেছে। সেই কত বছর আগে সুলতা মাসির বাড়িতে যখন দেখা হত এর সঙ্গে, তখন দু'জনেই দু'জনকে 'তুমি' করে কথা কয়েছে। অবশ্য দেখা বা কথা তখন খুব কমই হয়েছে। এই ছেলে তো তখন রীতিমতো তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই করত তাকে। এখন আপনি বা তুমি কিছুই বলা গেল না।

বলো তো কে?

গৌরী বেশ চেষ্টা করেই আবারও হাসল একটু। জবাব দিল না। অবশ্য, বলতে যে পারে ওটুকুতেই বোঝা গেল। এ-রকম বেপরোয়া আবির্ভাবের হেতু বুঝতে চেষ্টা করছে।

বারকয়েক সিগারেটে টান পড়ল। সেই ফাঁকে দু'চোখ ওর মুখের ওপর আটকে আছে। এত কাছ থেকে এ-রকম চেয়ে থাকাটা পুরুষের পক্ষেও সহজ নয় খুব। কিন্তু এর কাছে সহজ বা কঠিনের সমস্যাই নেই যেন কিছু। গৌরীর মনে হল, নিশান উঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে রাস্তায় চলত যখন, তখন যে ফ্রক-পরা মেয়েটাকে অবজ্ঞায় দেখেও দেখত না, এই সেই মেয়ে—ওই দুটো চোখে এ বিস্ময়টুকুই যেন বেশি স্পষ্ট। দেখা শেষ করে কমল চ্যাটার্জী সিগারেটে বড় করে টান দিল একটা। বলল, ওদের মুখে না শুনলে আমি বোধহয় তোমাকে চিনতেই পারতুম না। অনেক বদলেছে...।

এবারে গৌরী অবাক। কার মুখ থেকে কি শুনেছে ঠাওর করতে পারল না।

কমল বলল, কাল আমাদের জনাকয়েক ছেলে এসেছিল এখানে, ওদের কেউ কেউ চেনে তোমাকে। তারাই বললে, ডক্টর বিভুরঞ্জন সিদ্ধান্তর মেয়ে গৌরী সিদ্ধান্তকে দেখলাম রেসিডেন্সীতে বসে পড়াশুনা করছে। বলছিল ওই পরিবেশে মেয়েটিকে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিল, বই খুলে যেন ইতিহাসের রাজ্যে চলে গেছে। তুমি ইতিহাস পড় সে খবরও একজন রাখে দেখলাম। ...অন্য কোনো মেয়ের কথা শুনলে এখানে এসে পড়াশুনা করাটা আত্মপ্রচার ভাবতুম, কিন্তু তোমার নাম শুনে হঠাৎ অনেকদিন বাদে আবার আমার মায়ের কথা বেশি মনে পড়ল। ওদের চোখ রাঙালাম, খবরদার আর ওদিক মাড়াবে না বা কোনোরকম ডিসটার্ব করবে না। ওদের ধমকে দিয়ে আজ চুপি চুপি নিজেই তোমাকে দেখতে চলে এলাম।

হাসি ঠিক নয়, ঠোঁটের ডগায় হাসির আভাস একটা। বলছে আর সেই সঙ্গে পুরনো দিনের কথা কিছু চিন্তা করছে যেন। সিগারেট টানছে। চোখ দুটো সোজা গৌরীর মুখের ওপর।

গৌরী কি করবে বা কি বলবে ভেবে পেল না। শুধু মুখের ছাঁদ নয়, কথার ধরনও অনেকটা সুলতা মাসির মতো। তবে এ ধরনের কথা শেষ করে সুলতা মাসি নিজেই হেসে গড়াতেন, এর গম্ভীর থাকার চেষ্টা। হাসির আভাসটুকু মুখের থেকেও চোখে বেশি ছড়ায়। আগের মতোই আবার আগের থেকে অন্য রকমও যেন।

কমল চ্যাটার্জী বলল, তোমার পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটল, হঠাৎ একটা উপদ্রবের মতো এসে জুটলুম—না? বলল বটে কিন্তু কথার সুরে ব্যাঘাত ঘটানোর সঙ্কোচের লেশমাত্র নেই।

গৌরী ভেবে বলার অবকাশ না পেয়ে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। ব্যাঘাত ঘটেনি বা উপদ্রবের মতো এসে জোটেনি। মিথ্যে নয়, ব্যাঘাত বা উপদ্রব ভাবছে না। অথচ এত কাছ থেকে চেনা পুরুষ মানুষেরও এই ধরনের সোজাসুজি চাউনি রীতিমতো অস্বস্তিকর লাগছে।

ওর প্রতি কমল চ্যাটার্জীর মনোযোগ এবারে আরো একটু বাড়ল যেন।—তুমি কথা বলছ না কেন একটাও, ঠিক ঠিক চিনেছ তো? ... না কি মার্কা-মারা লোক বলে কথা কইতে অসুবিধে হচ্ছে?

সঙ্কোচ কাটিয়ে গৌরী এবারে একটু হেসেই পাল্টা প্রশ্ন করল, মার্কা-মারা লোক কি রকম?

কমল চ্যাটার্জী গড়গড় করে বলে গেল, মার্কা-মারা মানে আমি কালোকে কালো বলি, সাদাকে সাদা বলি, লালকে লাল বলি। এই অপরাধে জেলে যাই আর জেল থেকে বেরিয়ে আবারএই অপরাধই করি। কিন্তু আশ্চর্য, বছর দেড় দুই হল ওই বোষ্টমরা আমাকে কেমন ক্ষমা-ঘেন্না করে চলেছেন। আর টানা-হেঁচড়া করছেন না। এক একবার সন্দেহ হয়, তোমার মায়ের অনুরোধে হয়তো তোমার জ্যাঠামাশাই-ই ভিতর থেকে কিছু সুপারিশের কলকাঠি টিপে রেখেছেন। মুখের ওপর চাউনিটা স্থির হল। —তোমার জ্যাঠামশাই কিছু বলেন না?

সুলতা মাসি চোখ বোজার পর থেকে ও-দিকের কারো প্রসঙ্গে আর একটা কথাও যে হয় না কখনো, গৌরী সেটা বলবে কি করে। সামান্য মাথা নাড়ল।—শুনিনি কখনো।

কমল চ্যাটার্জী এই জবাবই প্রত্যাশা করছিল হয়তো। সায় দিয়ে বলল, শোনার কথা নয় অবশ্য, উনি আবার বড্ড বেশি ভদ্র।

কথাটা খট করে কানে লাগল গৌরীর। জ্যাঠামণির সম্পর্কে কারো শ্লেষ বরদাস্ত করার পাত্রী নয়, এই এক ব্যাপার নিয়ে ছেলেবেলায় সুলতা মাসিব কাছে নালিশ করেছিল মনে আছে। একটু চুপ করে থেকে হালকা করেই জিজ্ঞাসা করল, তার মানে উনি একটু বেশি বোষ্টম?

পুরনো সিগারেট থেকে একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, না উনি সত্যি ভালো লোক—আমার সঙ্গে সামনাসামনি আলাপ পরিচয় না থাকলেও জানি।...তবে সর্বত্র জনাকতক করে ওই রকম ভালো লোক না থাকলেই ভালো হত, লোকের আরো তাড়াতাড়ি চোখ খুলত। ওই রকম দু'চারজন লোক দেখে মানুষ ডুবতে বসেও আশা করে আর তার ফলে আরো বেশি ডোবে।

এইবার ঠিক সুলতা মাসির ধাঁচের মতো লাগছে না কথাগুলো। একটু বেশি স্পষ্ট আর ধার-ধার। সুলতা মাসি এই গোছের গম্ভীর ব্যাপারে মাথাই ঘামাতেন না কখনো। একটু বাদে ও-প্রসঙ্গ বাতিল। দুই চোখের মনোযোগ ওর দিকে জড় হল আবার, জিজ্ঞাসা করল, কি পড়ছিলে?

হিস্টি?

কাদের হিস্ট্রি?

ওয়ার্লড।

ও ব্বাবা! সভয়ে ওর হাতের মোটা বইটা দেখে নিল একবার; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই হাল্কা উচ্ছ্বাস স্তিমিত করে অনেকটা যেন নিজের মনেই আওড়ে গেল,'হিস্ট্রি ইজ্ বাট্ দি আন্‌রোল্‌ড স্কোল্ অফ প্রোফেসি'। দৃষ্টি উৎসুক একটু।—আমি ইতিহাস কিছু জানি না, ইতিহাস পড়লে কতটুকু ঠিক পড়া হয় জানতে ইচ্ছা করে।... ইতিহাসের যারা নিয়ামক, আই মিন, দি মেন হু মেক্ হিস্ট্রি, হ্যাভ্ নো টাইম টু রাইট ইট—তাহলে তোমাদের এই সব ইতিহাস কতটুকু সত্য?...রাদার, হাউ মাচ ইজ ট্রুথ লায়েব্‌ল টু বি লেফট হ্যাণ্ডেড?

গৌরী তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। জবাব দেবে কি, কি যে বলছে ওর মাথায় ঠিক মতো ঢুকছেই না।

সেটা অনুমান করেই কমল আবার বলল, আচ্ছা, আরো সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করছি। মুখখানা আলোচনার উপযোগী গম্ভীর করে তোলার চেষ্টা সত্ত্বেও ঠোঁটের ফাঁকে আর চোখের তারায় কৌতুক আটকে আছে।—আমি বলতে চাইছি মরে যারা ইতিহাস হয়েছে, ইতিহাস পড়ে তাদের তোমরা সত্যি সত্যি কতটা চেন? আর মরার আগে তারা কি নতুনের, অর্থাৎ যারা ওদের জায়গা জুড়তে আসছে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পেত?

গৌরী এবারেও নির্বাক। বললে তো কত কথাই বলা যায়। যীশুখ্রীষ্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেক বড় বড় সংগ্রাম আর বিপ্লবেরই তো আগে ভাগে পায়ের শব্দ শোনা গেছে বলেই সেটা দমনের চেষ্টায় এত অত্যাচার এত রক্তপাত। আরো বলতে পারতো, ইতিহাস মানেই নজিরসহ দর্শন-শিক্ষা। কিন্তু এই সহজ কথাগুলোও গৌরী বলে উঠতে পারল না। মনে হল, কিছু বললেই নিজের জব্দ হবার রাস্তা খোঁড়া হবে।

তৃতীয় সিগারেট ধরানো হল। তারপর কমল চ্যাটার্জী হাসল নিজেই। —মুখ্খুর কচকচি শুনে মনে মনে হাসছ বুঝতে পারছি। থাক, ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করব না। হাসি-মাখা চাউনি উৎসুক একটু।—এতদিন বাদে তোমাকে দেখে ছেলেবেলার কিছু কথা মনে পড়ছে আর তার ফলে গোটাকতক কথা বলতেও ইচ্ছে করছে। আর ইচ্ছে একবার হলে সেটা চেপে রাখা আমার স্বভাবে নেই, তবু মনে হচ্ছে কিছু বলার আগে একটু ভাবা দরকার। তুমি কি কালও এখানে আসছ? না-না, তোমার উতলা হবার মতো কিছু নয়, খুব সাদামাটা কথা—আসছ?

অগত্যা গৌরী মাথা নাড়ল। আসবে।

ঠিক আছে। আর তোমার সময় নষ্ট করব না।

উঠে চলে গেল। পিছন থেকে যতক্ষণ দেখা গেল, গৌরী চেয়েই রইল। তারপর পড়ার চেষ্টা সেদিনের মতো ওখানেই খতম। বই আর খোলাই হল না। এ যেন 'এলো, জয় করল, চলে গেল'—অনেকটা সেইগোছের দশা ওর। ঠিক জয় করা না হলেও অনেক রকমের অনুভূতি আনাগোনা করতে থাকল ওর ভিতরে। ওর মনের তলা থেকেও ছেলেবেলার কিছু চিত্র হুড়মুড় করে সামনে হাজির। এমন কি মনে হল, সুলতা মাসিই যেন মৃত্যুর ওধার থেকে আবার জীবনের কাছাকাছি এসে হাজির।

মাকে খবরটা দেবার জন্য অনেক অগেই উঠে পড়ল। কিন্তু বাড়ি পৌঁছনোর সময়টুকুর মধ্যেই অন্য রকম প্রতিক্রিয়া শুরু হল। মাকে আজ অন্তত কিছু না বলা সাব্যস্ত করল। বললে মা আগামী কালেরজন্য একটা কৌতূহল নিয়ে বসে থাকবে। তাছাড়া এভাবে বলে-কয়ে কাল আবার মায়ের নাকের ডগা দিয়ে বেরুবেই বা কি করে? সেই এক দুপুরের নিরিবিলিতে দুই সখির হাসির কথাগুলো মনে আসছেই—আসছেই।

কিন্তু কাল ও সত্যি বেরুবে কি? কথা দিয়ে এসেছে অবশ্য, কিন্তু কথা দিয়েছে বলেই কৌতূহল সত্ত্বেও অস্বস্তি। কাল এসে আবার কি বলবে, কোন্ বিপাকে ফেলবে ওকে কে জানে। খুব সাদামাটাই কিছু বলবে আশ্বাস দিয়েছে অবশ্য, কিন্তু ওই লোকের কাছে যেন সিগারেটের ধোঁয়ার মতোই সাদামাটা সব কিছু। বড় হবার পর এই একদিনের আলাপেই বিলক্ষণ চমক লাগিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া মায়ের কাছে মাসির সেই রঙ্গ-রসের প্রস্তাব এরই মধ্যে আরো ক'বার যে মনে পড়ে গেল ঠিক নেই।

নাঃ কি বিড়ম্বনার মধ্যে যে পড়েছে সে শুধু গৌরীই জানে। মাকে আজ অন্তত কিছু বলে কাজ নেই।

রাতেও পড়ায় মন বসল না, ঘুরে ফিরে ওই ছেলের সমস্ত কথাগুলোই মনে পড়তে লাগল। সুলতা মাসির থেকেও বচনপটু যে তাতে কোনো ভুল নেই। ...কেন ডাকল? কি বলবে? জ্যাঠার বিপক্ষ দলে সর্দারি করছে সেটা বোঝা গেছে। নিজেই বলল, অনেকবার জেল খেটেছে। রাজনীতির আলোচনা বা প্রস্তাব কিছু ফেঁদে বসবে নাকি? কিন্তু ভিতর থেকে সে সম্ভাবনার সায় মিলছে না। সিগারেট টানার ফাঁকে চাউনিটা অনেকবার উৎসুক হতে দেখেছে।

পরদিন সকালেও পড়াশুনায় অন্য দিনের মতো অন্তত মন বসল না। আর দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ভিতরটা তো রীতিমতো চঞ্চলই হয়ে উঠল।

অন্য দিন অপেক্ষা বেশ দেরি করেই রেসিডেন্সিতে পদার্পণ করল গৌরী। পায়েপায়ে সেই নির্জন দিকে এগলো।

যা ভেবেছিল তাই। আগে ভাগেই এসে বসে আছে। বসে সিগারেট টানছে। পাশের মাটিতে আরো ছ'-সাতটা খাওয়া সিগারেটের শেষাংশ পড়ে আছে। ওগুলো যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার নজির। গতকালের ছোট পাথরটাতেই বসেছে, সামনের বড় পাথরটা ওর জন্য খালি।

ওকে দেখে মৃদু হেসে আপ্যায়ন জানাল কমল চ্যাটার্জী।— এসো, আমি আসব বলেই আজ এত দেরি তোমার। ঠিক কি না বলো? বোসো—

গৌরীর কানের দু'পাশ লাল একটু। সত্যি হলেও মুখের ওপর এমন কথা ক'জন বলে। ঠোঁটে সামান্য হাসি ছড়িয়ে নিজের জায়গায় বসল। হাতের বই কোলের ওপর রেখে তার দিকে তাকালো। লোকটার দু'চোখ ওর মুখের ওপর এক চক্কর ঘুরে একেবারে ওর দুটো চোখের তারায় এসে স্থির হল।—কাল তোমার সঙ্গে নতুন করে একদফা আলাপ পরিচয় হল শুনে তোমার মা কিছু বললেন?

শুরুতেই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল গৌরী। দ্বিধা কাটাতে চেষ্টা করে জবাব দিল, মা জানেন না।

জানেন না...ও তুমি বলিনি। হাসছে অল্প অল্প, দু'চোখ ওর মুখের ওপর থেকে নড়ছে না।—দেখো, মানুষ একটু থেকেই কেমন বেশি বেশি আশা করে। আমি ভাবছিলাম তোমার মা শুনেছেন, শুনে খুশি হয়েছেন, আর বলেছেন ছেলেটাকে অনেক দিন দেখিনে, একবার আসতে বলিস। না, তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই, এটা সত্যিই তাঁকে বলার মতো কোনো ব্যাপারই নয়। আমি মানুষের আশার কথা বলছিলাম।

গৌরী অপ্রস্তুত যে-টুকু হবার হয়েছে। মা-কে কিছু না বলার সত্যিই কোনো মানেই হয় না। তা বলে একেবারে বোবা হয়ে বসে থাকার মতো লাজুক মেয়েও নয় সে। সঙ্কোচ কাটিয়ে সপ্রতিভ জবাব দিল আশা না করে একদিন এলেই তো হয়।

ওর দিকে চেয়ে নিঃশব্দে আরো বেশি হাসতে লাগল কমল চ্যাটার্জী। সিগারেটে বড় করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকেও হাসছে। নতুন কোনো কৌতুকের খোরাক মিলেছে যেন। বলল, আগে, অর্থাৎ মাসিমার সঙ্গে তুমি যখন ফ্রক পরে আমার মায়ের কাছে আসতে, তখন দেখা-টেখা হলে আমাকে 'তুমি' করে বলতে...এখন একটু আগের ওই কথা ক'টা ভাব বাচ্যে বললে লক্ষ্য করলাম।

অগত্যা হাসি মুখে গৌরীও আত্মপক্ষ সমর্থন করল, আর সেই সঙ্গে একটু দুষ্টমিও করে বসল। বলল, মাঝে অনেকগুলো বছর চলে গেছে তো, তাছাড়া এখন আমিও আর ফ্রক পরি না, তুমিও হাফ-প্যাণ্ট পরো না। এত অল্প সময়ের মধ্যে আজ এতটা সহজ হতে পেরে নিজেরই ভালো লাগছে।

সিগারেট মুখে নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল কমল চ্যাটার্জী। তার নিজের ভালো লাগাটুকু বিস্ময়ের আড়ালে চাপা দিতে চেষ্টা করল। চোখ দুটো বড়ো করে ওর মুখের ওপর রাখল।—আমাকে আবার তুমি হাফ-প্যাণ্ট পরতে কবে দেখলে, আমি তো তার অনেক আগেই এঁচড়ে পেকে ধুতি ধরেছি!

কৌতুকের ওপর রং চড়াতে গৌরীও জানে একটু-আধটু। চিন্তা করার মতো করে জবাব দিল, আমাকে যখন পেয়ারা গাছ থেকে ফেলেছিলে তখন তো হাফপ্যাণ্টই পরতে মনে হচ্ছে।

কমল চ্যাটার্জী এবারে জোরেই হেসে উঠল।— সে কথাও তোমার মনে আছে! কিন্তু তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে ব্যথা তো নিজেই পেয়েছিলাম। তুমি দিব্বি আমার ঘাড়ের ওপরে পড়েছিলে আর তারপর রাগের মাথায় দমাদম কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়েছিলে। তার ওপর আবার মায়ের শাসন।...কিন্তু সেই ফ্রক-পরা আদুরে মেয়েটাই যে তুমি এখন সেটা চেষ্টা করলেও ভাবা যাচ্ছে না।

উত্তর না দিয়ে গৌরীও হাসছে অল্প-অল্প। অনেক কাল আগের একটা সুপ্ত প্রতিশোধ নেওয়া গেল যেন—সামনে দেখলে যখন অবজ্ঞা করত সেই সময়ের।

মানুষটার একটানা ভালো-লাগার আমেজটুকু গৌরী ঠিকই লক্ষ্য করেছে। ওরও মন্দ লাগছে না খুব। পুরনো সিগারেট ধরানো হল। এই বয়সেই সিগারেট খায় বটে, কালও অল্পক্ষণের মধ্যে অনেকগুলো খেতে দেখেছে। আগে কখনো খেতে দেখেছে মনে পড়ল না। এর পর যে প্রসঙ্গের অবতারণা শোনামাত্র গৌরী সচকিত একটু।

নতুন সিগারেট পর পর কয়েকটা টান দিয়ে একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে নিল। তারপর বেশ হৃষ্ট অথচ আধা-নির্লিপ্ত মুখে প্রসঙ্গের দিকে এগলো।—কাল যে-কথা তোমাকে বলব কি বলব না ভেবে একটা রাত সময় নিয়েছিলাম সে-সম্পর্কে আমার ভাবা হয়ে গেছে। অবশ্য আর না বললেও চলে বোধহয়, তবু কিছু একটা চিন্তা মগজে ঢুকলে সামনা-সামনি তার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত মাথায় ভূত চেপে থাকে। কেবল মনে হয় মানুষের ভিতরের কথা কে জনে, আমি যা ভাবছি তাই যে একমাত্র ঠিক তারই বা ঠিক কি।

ভনিতা শুনেই গৌরী অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ করছে কেন জানে না। জিজ্ঞাসু নেত্রে চুপচাপ চেয়ে রইল।

সিগারেটে আবার দুটো টান দিয়ে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, স্কুল ফাইন্যালে তুমি মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলে আর বোর্ডে ফোর্থ—না?

এ আবার কি দরকারি কথা। প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝেই গৌরী সামান্য মাথা নাড়ল। তাই।

কমল আবার জিজ্ঞাসা করল, ইন্টারমিডিয়েটে মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট আর বোর্ডে সেকেণ্ড?

দুর্বোধ্য বিস্ময়ে গৌরী আবারও মাথা নাড়ল। এতটা খবর রাখে দেখে খুশি হবার কথা। খুশি একটু হয়েছেও। কিন্তু খুশির থেকে যেন শঙ্কা বেশি ওর।

আর বি.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস যে পাবে সে-তো এক রকম জানা কথাই—না?

বিব্রত মুখে একটু হাসি টেনে গৌরী জবাব দিল, আশা তো করি।

নিশ্চয় আশা করব। কমল চ্যাটার্জী হাসতে লাগল।—কিন্তু আমার আর আশা করা উচিত হবে না বোধহয়। আমি দুটো লেটার পেয়ে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছিলাম, ইণ্টারমিডিয়েট সেকেণ্ড ডিভিশনে, বি.এ-তে অনার্স ছেড়ে কোনোরকমে পাস কোর্স-এ, আর এম.এ.তো পড়াই হল না—জেলের পাঠ নিতে নিতেই ধৈর্য শেষ। হাসছে।—তোমার ঠিক উলটো, ভেরি স্টেডি ফল্! অবশ্য আমার কাছে এই সব ইউনিভার্সিটির পড়াশুনা বা পরীক্ষার কোনো দাম নেই, কিন্তু সেটা নিতান্ত ব্যক্তিগত মত আমার। অন্যের কাছে তার দাম তো নিশ্চয় আছে। যাক আমার মাকে নিশ্চয় মনে আছে তোমার?

গৌরীর বুকের তলায় কি রকম একটা ধুকপুকুনি শুরু হয়েছে। মাথা নাড়ল। আছে।

তেমনি হালকা সুরে কমল চ্যাটার্জী বলে গেল, মা তোমাকে খুব ভালোবাসত। সে-জন্যেই একটা লোভনীয় চিন্তা মাথায় ঢুকেছিল তার। অবশ্য মা আজ বেঁচে থাকলে আর তোমার এই উন্নতি আর আমার এই অধোগতি দেখলে তার ওই লোভের ওপর আপনা থেকেই চড়া পড়ে যেত। থাক্ সে-কথা, আমি যখন বি.এ. পড়ি তখনো মা আমাকে বাঁদর-টাদর ছাড়া আর কিছু ডাকত না। একদিন বেশ খুশি মুখে আমাকে ডেকে বলল, এই বাঁদর শোন, তুই যদি বেশ ভালো পাস-টাস করিস আর বেশ ভালো মতো দাঁড়াতে পারিস, তোকে আমি একটা খুব ভালো প্রাইজ দেব—এমন প্রাইজ যে তোর বন্ধুরা সব হিংসা করবে তোকে।

থামল একটু। হাতের সিগারেট শেষ হতে টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এই দফায় আর নতুন সিগারেট ধরাল না। হাসি মাখা দু'চোখ ওর মুখের ওপর আটকে আছে। ভিতরে ভিতরে গৌরী এখন ঘামছে বোধহয়। অথচ আশ্চর্য, একজনের এই বলার আগ্রহ থেকে তার শোনার আগ্রহ বোধ করি একটুও কম নয়।

তারপর শোনো, আমার মা খুব মজা করে কথা বলতে পারত। তাছাড়া নিজের মা বলে বলছি না, ও রকম বুদ্ধিমতী মেয়েছেলেও আমি বেশি দেখিনি। মায়ের গল্প তোমার মায়ের কাছে নিশ্চয়ই শুনেছ। আমার বাবা পর্যন্ত উতরে গেছে ওই মায়ের হাতে পড়েছিল বলে। কথার ফেরে ফেলে আমাকে দিয়ে মায়ের কিছু একটা সঙ্কল্প নিয়ে নেবার মতলব কি না, আমার সেই সন্দেহ। তাই ও-কথা শুনে মাকে নিয়ে পড়লাম। তার গলা জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম, কি প্রাইজ না বললে পড়াই ছেড়ে দেব বলে শাসালাম। ...যেমন ছেলেই হই, মা ভালোবাসত একটু। না বলে পারল না, আর সেই প্রাইজের কথা শুনে আমি হাঁ।

আবার থামল। গৌরীর যেন অন্তিম অবস্থা। বুকের ভিতরে ধুকপুকুনি ছেড়ে ধপ্ ধপ্ করছে এখন। যা বলছে বা এরপর যা বলবে সে-ও যে কান পেতে শোনার মতো এত সহজে বলা যায় ওর কল্পনার বাইরে।

ঠোঁটের হালকা হাসি সত্ত্বেও মানুষটার দু'চোখ যেন আরো গভীর হয়ে ওর মুখের ওপর এঁটে বসেছে। সেই রকম চেয়ে থেকে পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট আর শলাই বার করল। কিন্তু ধরানো হল না। ইচ্ছে করেই সময় নিচ্ছে। মিটিমিটি হেসে বলল, সেই প্রাইজটি হল একটি বউ। ভালো

পাশ করলে আর ভালো মতো দাঁড়াতে পারলে লোকের চোখ জুড়োবার মতো আর বন্ধুদের হিংসে হবার মতো একটি বউ এনে দেবে মা আমাকে...আর সেই লোভনীয় পুরস্কারটি হলে তুমি!

প্রস্তুতি সত্ত্বেও রক্ত উঠে এলো গৌরীর মুখে, চেষ্টা করেও ঠেকানো গেল না। সেটুকু লক্ষ্য না করার ভান করেই হাসিমুখে কমল বলে গেল, বোঝো আমার অবস্থাখানা, আমি তখন ডিগ্রী ক্লাসের দস্তুরমতো একটা মাতব্বর ছেলে, দেশবিদেশের পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামাই, জেলে যাবার ফাঁক খুঁজি, বক্তৃতা করি—তোমার জ্যাঠা ছেড়ে বড় বড় নেতাদেরও গালাগালি করি—সেই ছেলের সামনে কি না এই টোপ। বিশেষ করে যে ফ্রক-পরা মেয়েকে তখন আমি একটা মেয়ে বলেই গণ্য করি না।

এই পর্যন্ত বলে চোখে মুখে নিখাদ বিস্ময়ের পালিশ এঁটে চেয়ে রইল খানিক। তারপর আবার হাসিমুখে প্রসঙ্গের দিকে ফিরল।—আমার সেই মুখ দেখে মা ভাবল এমন সৌভাগ্য আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। তাই আরো নিশ্চিন্ত করার জন্যে জানালো তোমার মায়ের সঙ্গে তার কথা হয়েই গেছে, একেবারে পাকা কথা—তবে এক শর্ত যদি আমি মানুষ হই। অবশ্য মা আমার কথা শুনে হকচকিয়েই গেছল তারপর। আমি বলেছিলাম, শুনে তোমার বাঁদর ছেলের এত লাফাতে ইচ্ছে করছে যে সেটা থামাতে হলে কালই বাজার থেকে একটা দড়ি আর একটা কলসি কিনে আনাও!

গৌরীর সমস্ত মুখ লাল তখনো, এই শেষের কথা শুনে তার ওপরেই ফিক করে হেসে ফেলল। সুলতা মাসিও ওই রকম কথা বলতে পারে আর তার এই ছেলেও ওই রকম জবাবই দিতে পারে। কমল এবারে ধীরেসুস্থে প্যাকেট খুলে সিগারেট ধরাল একটা, হাসি-মাখা চোখ দুটো ওর মুখের ওপর নড়ে-চড়ে বেড়াতে লাগল। তারপর তেমনি অনায়াস সহজেই বলে গেল, আমার মায়ের কতখানি দূরদৃষ্টি ছিল সেটা এখন অবশ্য বুঝছি। এখন বলতে কাল তোমাকে এখানে দেখা মাত্র। যাক সে কথা, আমার জিজ্ঞাস্য হল, মায়ের ওই রকম আশার অনুকূলে তোমার কোনোরকম মত বা মন্তব্য থাকতে পারে কি না, অথবা থাকা সম্ভব কি না?

মুখে লালের আভা ছড়াচ্ছে আবার। গৌরী বিপদেই পড়ল যেন। এমন কথাও এত নিঃসঙ্কোচে কেউ বলতে পারে! এত বছর বাদে এমন অল্প সময়ের মধ্যে! এই লোকের তুলনায় ও এত বেশি লজ্জা পাচ্ছে বলেই যেন আরো বিড়ম্বনা। দুষ্টমি ঢেকে দু'চোখে সাদা-সাপ্টা প্রশ্ন এঁটে ওর দিকে চেয়েই আছে লোকটা। অগত্যা গৌরীও প্রাণপণে চেষ্টা করল সহজ হতে। দৃষ্টিটা এক রকম জোর করেই ওই মুখের ওপর তুলল।—তার মানে এই দু'দিন দেখে আমাকে একটা মেয়ে বলে ভাবা যাচ্ছে?

অপ্রত্যাশিত কিছু পাওয়ার মতোই খুশির সরল অভিব্যক্তি একটা। দু'হাত ফারাকের পাথর থেকেই সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকল আরো।—বললাম যে, দু'দিন নয়, একদিন মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত দেখেই। কাল তুমি যখন নিবিষ্ট মনে পড়ছিলে, আর আমি ওই দশ হাত দূর থেকে তোমাকে দেখতে দেখতে আসছিলাম—সেই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই।...মা আমাকে যখন তখন বাঁদর বলত। কিন্তু কাল আমার মনে হয়েছে এই এক ব্যাপারে অন্তত মা তার ছেলেকে একটু বেশি সম্মান করে গেছে—গাধা বলা উচিত ছিল।

অনাড়ম্বর সহজতার বিশেষ একটা রূপ আছে। লজ্জা-সঙ্কোচ আর বিড়ম্বনা সত্ত্বেও গৌরী হাসছিল। আবার অবাকও কম হচ্ছিল না।

তেমনি হাল্কা সুরে কমল চ্যাটার্জী তাগিদ দিল, কথার ফাঁকে অন্য দিকে সরে যাচ্ছি আবার। আমার কথার জবাব কিন্তু মেলেনি এখনো। একেবারে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারে, রাজনীতিতে কায়েম হবার পর থেকে হাঁ আর না দুটোতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তাছাড়া, আমার চামড়া ভয়ানক পুরু, নইলে এ রকম অস্বাভাবিক ভাবে এসে চড়াও হতে আর বোধহয় কাউকে দেখনি।

গৌরী কি বলবে, সে-কি সত্যি এ-রকম সম্ভাবনা নিয়ে কখনো মাথা ঘামিয়েছে! তবু জবাব দিতে হল।—আমি কি বলব, মা জানেন।

ঠিক এই জবাব যেন আশা করেনি।—ইয়ে, তোমার এ ব্যাপারটাও মায়ের বিবেচনাসাপেক্ষ না কি?

তাছাড়া আর কার!

ও, অমি ভেবেছিলাম তোমারই। সিগারেটে দুটো টোকা দিয়ে হেসেই বলল, তাহলে আমার বোধহয় সরে পড়াই ভালো। কারণ, এই সম্ভাবনার মধ্যে মায়ের একটা শর্ত ছিল যদি আমি মানুষ হই। তা দলের লোক অবশ্য আমাকে মস্ত মানুষই ভাবতে শুরু করেছে, কিন্তু যে-মানুষ হয়েছি তাতে তোমার মা ছেড়ে বেঁচে থাকলে বোধহয় আমার মা-ও ক্রেম বাতিল করে দিত।

সঙ্কোচ কমে আসছে গৌরীরও। ভালো যে লাগছে অস্বীকার করবে কেমন করে। একেবারে অচেনা গোছের ভালো লাগার স্বাদ একটা। বলল, মা কি করবে না করবে জানার জন্যে তাহলে একবার বাড়ি আসা দরকার।

কার, আমার?

গৌরী অল্প মাথা নেড়ে সায় দিতে গিয়েও দিল না। দুষ্টুমি করে বলল, তোমার দলের লোককেও পাঠাতে পারো।

সাগ্রহে কমল বলে উঠল, বললাম যে আমি একটা আস্ত গাধা। কবে যাব? আজ?

গৌরী হেসে ফেলল।—আগে আমি মাকে বলি।

ওয়াণ্ডারফুল! কি বলবে? আমি এই প্রস্তাব করেছি?

না। বলব তুমি আসছ।

তার মানেই তুমি আমাকে ভরসা দিচ্ছ?

বা, ভরসা কোথায় দিলাম!

বলল বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে ভরসা যে একটু দিয়েই ফেলেছে সেটা এই লোকের কাছে অন্তত গোপন থাকল না। কি-যে বিপাকে পড়েছে গৌরীই শুধু জানে। উৎফুল্ল মুখে আবার কি বলতে গিয়ে হঠাৎ যেন প্রতিকূল কিছু চিন্তা মাথায় এলো কমল চ্যাটার্জীর।

আচ্ছা ধরো তোমার সুপারিশের জোরে মা ডাকলেন আর আমি গেলাম। কিন্তু তারপর যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কি করো তুমি? যদি কেন, করবেনই তো।

এ আলোচনা এড়াতে পারলে বাঁচা যেত। হাসি মুখেই জবাব দিতে হল।—জিজ্ঞাসা করলে বলবে।

কি বলব, রাজনীতি করি! আমার মায়ের ভাষায় সে তো বাঁদরামি করি বলার সামিল হবে!

বিড়ম্বনা সত্ত্বেও গৌরীর মজাই লাগছে। দীর্ঘকাল বাদে মাত্র দু'দিনের দেখা তাও মনে থাকছে না। হেসে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কি বলবে?

মুখ কাঁচুমাচু করে কমল চ্যাটার্জী জবাব দিল, এক শব্দের একটা কথা অবশ্য বুক ফুলিয়ে বলতে পারি —ব্যবসা। কিন্তু সে-যে একেবারে খাঁটি সত্যি কথা হবে না।

কি রকম?

হাতের সিগারেটটা তাক্ করে অদূরের একটা ছোট ঝোপের ওপর ছুঁড়ল কমল চ্যাটার্জী। তারপর হৃষ্ট মুখে তরতর করে বলে গেল, জীবিকার জন্যে আমার বাবাও গোলামী করেনি, আর আমাদের চার ভাইয়ের কারো দ্বারাও সেটা সম্ভব হবে না বুঝে মা চোখ বোজার পরেই বাবা চারভাইয়ের নামে হজরতগঞ্জে একটা ওষুধের দোকান করে দিয়েছিল—সুলতা ড্রাগ স্টোরস। বাবার ধারণা, মায়ের নামের ছোঁয়া থাকলেই সোনা ফলতে বাধ্য। মিথ্যে ভাবেনি ভদ্রলোক, ভায়েরা এরই মধ্যে ব্যবসাটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে। এখন ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার দুশ্চিন্তা ওদের। বড় হিসেবে ওই ব্যবসা আমারই দেখার কথা কিন্তু আসলে ওটা চালাচ্ছে মেজ আর সেজ ভাই। আমি থাকলে ওদের বরং অসুবিধে, আমার দলের লোকদেরও তখন অবিরাম আনাগোনা চলতে থাকে সেখানে। ভায়াদের হাব-ভাবে বেশ বুঝতে পারছিলাম ওরা খুশি হচ্ছে না। দোকানে বসা ছেড়ে দিতে খুশি হয়ে ওরা আমার সিগারেটের বরাদ্দ দিয়েছে।

পাঁচ

কথার জাদু বলে একটা আছে। মা অথবা গৌরী নিজে সেই জাদুর ফেরে মুগ্ধ কি না জানে না। রেসিডেন্সি পর্বের পরে একটা দীর্ঘ দিনের ছেদ অতি দ্রুত তালে ভরাট হয়ে গেছে। এত দ্রুত যে গৌরীর ফাঁপরে পড়ার দাখিল এক-একসময়। ওর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই যেন। প্রতিরোধ করতে চেয়েছে কি না তাতেও সন্দেহ।

অবশ্য এর পিছনে স্বর্গতা এক রমণীর স্মৃতির প্রভাব অনেকখানি কাজ করেছে। মা-তো নয়ই, গৌরী নিজেও সুলতা মাসিকে ভোলেনি। ছেলের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু ধরে ওই মহিলা যেন আরও তরতাজা হয়ে ফিরে এসেছে। গৌরীর কাঁচা বয়সে এক দুপুরে মায়ের কাছে মাসির সেই প্রস্তাবের ছাপ বুকের তলায় একটা পাকা দাগ রেখে গেছে। রেসিডেন্সিতে ওই ছেলেকে প্রথম দেখামাত্র নিজের ভিতরে তাকিয়ে গৌরীর সেই দাগ চোখে পড়েছিল। এই দ্রুত-গতি হৃদ্যতার ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময় মনে হত সুলতা মাসি যেন অদৃশ্য থেকে দেখছেন আর মুখ টিপে হাসছেন।

কিন্তু ওটুকুই সব নয়। সেই স্মৃতিটুকুই সব নয়। ওই মায়ের থেকেও তাঁর এই ছেলের নিজস্ব অস্তিত্ব ঢের বেশি জোরাল। সেটা এত স্পষ্ট এত স্বচ্ছ বলেই এত জোরাল। বিস্ময়ে চোখে ধাঁধাঁ লাগার মতোই জোরাল। গৌরী কোথায় যেন পড়েছিল, আউট্‌উইট ইওর হ্যাণ্ডিক্যাপস্ অ্যান্ড ইউজ্ দেম্ অ্যাজ ইন্‌সেন্টিভ্‌স্। ইফ্ ইউ ক্যান, পিপ্‌ল উইল্ লাইক্ দেম, অ্যাণ্ড উইল্ লাইক ইউ বিকজ্ ইউ হ্যাভ্ দেম। এ-ছেলে যেন ওই মন্ত্রেরই সাধক। নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে নিজের দোষ ত্রুটিগুলো নিয়েও কেউ এভাবে খেলা করতে পারে এমন মানুষ গৌরী আগে আর দেখেনি। ওই স্পষ্টতাই তার প্রধান আকর্ষণ।

কিন্তু শুধু কথার জাদু আর স্পষ্টতার ছটায় মুগ্ধ হয়েই কি গৌরীর মতো মেয়ে অচিরে নিজের ওপর দখল হারিয়ে বসেছিল? তাও না।

নইলে প্রথম দিন বাড়ি এসে জ্যাঠামণির সামনে আর মায়ের সামনে একের পর এক ফরফর করে সিগারেট টানতে দেখে গৌরী বিরক্তই হয়েছিল। আর, রীতিমতো ধাক্কা খেয়েছিল জ্যাঠামণির সঙ্গে দেশ সম্পর্কে তার আলাপ আলোচনা শুনে। এই দেশের যাবতীয় ভবিষ্যত যেন তার চোখে সামনে ভাসছে। জ্যাঠামণির সঙ্গে আলাপের তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে তার ভবিষ্যদ্বাণী শুনে গৌরী হতভম্ব। আমন্ত্রণ জানাতে হয়নি, নিজে থেকেই ঘনঘন আসছিল। কোনোরকম দ্বিধা-সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না বলেই তার আসাটা গৌরী বা তার মায়ের চোখেও সহজ হয়ে উঠেছিল। সেই তপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী শোনার ইন্ধন অবশ্য জ্যাঠামণিই জুগিয়েছিলেন। দেশ প্রসঙ্গ তিনিই তুলেছিলেন। ফলে একেবারে পষ্টাপষ্টি চাঁছা-ছোলাভাষায় কমল চ্যাটার্জী যা বলেছিল তার সারমর্ম, দেশ নামে একটা শব-দেহকে নিয়ে মাতামাতি লাফালাফি করে জনতাকে আজও অনেকখানি ভুলিয়ে রেখেছেন জ্যাঠামণিরা। কিন্তু সেটা আর খুব বেশিদিন পারা যাবে না। তখন সব ছেড়ে দেহের ছাল-চামড়া বাঁচানোর জন্যেই কুকুর বেড়ালের মতো বিদেশে পালাতে হবে আজকের কর্ণধারদের। সেদিন খুব দূরে নয়। অতএব জ্যাঠামণিদের মতো হাতে গোণা যায় এমন বিদ্বান বুদ্ধিমান এবং নিঃস্বার্থ মানুষ যে ক'জন আছেন, তাঁদের উচিত সময় থাকতে সরে দাঁড়ানো।

ওই সিগারেট টানা দেখে আর ওই সব কথা শুনে গৌরীর মনে মনে শুধু রাগ হয়নি, দুঃখও হয়েছিল। এই লোককে আর বেশি পাত্তা দেওয়া ঠিক কিনা তাও ভেবেছে। কিন্তু এই ছেলে কারো পাত্তা দেওয়া না দেওয়ার ওপর নির্ভর করে না। তারপরেও যখন খুশি এসেছে, যখন খুশি গেছে। আর গৌরী চাক বা না চাক, এক-একদিন কলেজে বা রাস্তায় বা যত্র-তত্র ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে।

করেছে, কিন্তু অনুগ্রহভাজনের মতো নয়। এমন অনায়াস অধিকার বিস্তারের সবলতা অগ্রাহ্য করা যেন দুরূহ। যে প্রশ্ন বা যে প্রস্তাব নিয়ে রেসিডেন্সিতে তার আবির্ভাব, সে প্রসঙ্গ আর তোলেনি। এরপর ওটা অবান্তর যেন। ওটা ধরা-বাঁধা পরিণাম একটা। সেটুকু হাতের মুঠোয় আনার জন্য কোনরকম সুললিত ছলাকলার ধার ধারে না।

গোড়ায় গোড়ায় বিব্রত বোধ করলেও এই সাহচর্যটুকু সহজ হয়ে আসছিল গৌরীর কাছেও। আর লোকটা ও-রকম স্পষ্ট বলেই নানা রকমের তর্ক বিতর্কের মধ্যে নিজেদের অগোচরে এই যোগাযোগ অন্তরঙ্গও হয়ে উঠছিল।

অনেক দিন ওমনি অনায়াসে তার দরকারি কাজও পণ্ড করেছে এই লোক। হয়তো জ্যাঠামণির সঙ্গে কথা আছে কলেজ ফেরত কোথাও যাবে, নয় তো মায়ের সঙ্গে—বেরিয়েই দেখে গেটের সামনে ওই মূর্তি দাঁড়িয়ে। গৌরী তাকে এখানে সকলের চোখের ওপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে নিষেধ করেছে। ছেলেগুলো টিপ্পনী কাটে। কিন্তু কথা কে শোনে। উলটে বলে, এই সামান্য রসের আনন্দ থেকেও ওদের বঞ্চিত করতে চাও কেন?

বাড়িতে কাজ থাকলে গৌরী তাকে এড়াতে চেষ্টা করেও পারেনি। দূর থেকে তাকে দেখে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে কাছে আসা মাত্র আগে ভাগে এই ছেলেই যেন ধমকে উঠেছে তাকে।—উঃ, এইভাবে তুমি ক্লাস করা শুরু করলে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙবে বলে দিলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পায়ে ব্যথা ধরে গেছে।

চেষ্টা করেও গম্ভীর থাকা সম্ভব হয়নি।—তোমাকে এমন ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে কে বলেছে?

—না দিলে ছুটির পর তুমি আমাকে পাবে কোথায়?

যেন গৌরীরই মহা সমস্যা সেটা একটা। হাসি গোপন করার চেষ্টায় অল্প ঝাঁঝ দেখিয়ে বলেছে, তাহলে আরো কিছু ধৈর্যের পরীক্ষা দাও—পালাও এখন, আমি বাড়ি যাব, জ্যাঠার সঙ্গে কাজ আছে।

কমল চ্যাটার্জী গম্ভীর।—কাব্যে এ-রকম কথা লেখে না।

গৌরীর জিজ্ঞাসা করার লোভ, কোন্ কাব্যে? রসনা সংযত করতে হয়। ইন্ধন পেলে অম্লানবদনে এমন কিছু বলে বসবে যে উলটে গৌরীরই মুখ লাল হবে।

কমল চ্যাটার্জীর মুখ গম্ভীর, ঠোঁটের ফাঁকে হাসির দাগ।—রিকশ ডাকি তাহলে?

গৌরী সাইকেল রিকশতেই যাতায়াত করে। অদূরে অনেকগুলো রিকশ দাঁড়িয়ে আছে, একটাতে উঠলেই হল। কিন্তু এই লোকের কোনো কথাই সহজ অর্থে নিতে পারে না। —ডাকতে হবে না, আমি গিয়ে উঠছি। ...তুমি তাহলে কোথায় যাবে এখন?

তোমার সঙ্গে, রিকশয় তোমার পাশে বসে। তোমার জ্যাঠামণির নাকের ডগায় গিয়ে উপস্থিত হবার পরেও তিনি যদি আমার পাশ থেকে তোমাকে ডেকে নিতে পারেন তাহলে বুঝে নেব জ্যাঠার সঙ্গে কাজটা জরুরী। আর কোনো অজুহাতে আমাকে সরানো যাবে না।

সত্যিকারের কাজ থাকলেও এই মুখের দাপটে সেটা এমনি করে ভেসে যায়। কিন্তু একটা অল্প বয়সের ছেলে এক অল্প বয়সের মেয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে সাধারণত যে ভাবের আবেগে ভাসে সেটা বিশেষভাবেই অনুপস্থিত এই ছেলের মধ্যে। ভাবের আলাপও তার রসনার বাস্তব আঘাতে অনায়াসে অদ্ভুত জোরালো আর ধারালো হয়ে ওঠে।

নবাবের দেশের প্রায় সর্বত্র ইতিহাসের স্মৃতি ছড়ানো। জ্যাঠার কল্যাণে গৌরীর মনের তলায় অন্তত সে-সব স্মৃতি তাজা এখনো। অনির্দিষ্টের মতো পথ চলতে গৌরী কোনো একটা নিদর্শন দেখে হয়তো সেই প্রসঙ্গ তোলে। নইলে সারাক্ষণ কি নিয়েই বা কথা বলবে। কমল চ্যাটার্জী মন দিয়ে মুখ বুজে শোনে খানিক। তারপর ফস করে এমন কিছু বাস্তব অথচ রূঢ় মন্তব্য করে বসে যে তার জবাব দিতে গিয়ে গৌরী ফাঁপরে পড়ে যায়।

সেদিনও পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। তার সঙ্গে এক রিকশয় উঠতে গৌরীর আপত্তি। ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি হয়ে বসা, দূরে কোথাও যেতে হলে বরং টঙ্গায় উঠতে রাজি ও।

কমল বাধা দিতে চেষ্টা করে, টঙ্গায় ডবল পয়সা লাগে না?

গৌরী জবাব দেয়, পয়সা না হয় আমি দেব।

কমল টিপ্পনী কাটে, বাপের পয়সা কিনা, নিজের রোজগারের হলে বুঝতে।

গত একমাসের মধ্যে সঙ্গগুণে মুখ গৌরীরও মন্দ খোলেনি।—তাতো বটেই, ফরফর করে সিগারেট উড়িয়ে ভাইদের রোজগারের পয়সার কদর তো তুমি কত বুঝছ।

অতএব বেশির ভাগ দিনই পায়ে হেঁটে বেড়ানো চলছিল। প্রায়ই গোমতীর দিকে যায়, কখনো আবার কমল ওকে শহরের দিকে টেনে নিয়ে আসে। বলে, নদীর হাওয়া ছেড়ে মানুষ দেখো—মানুষ দেখায় নেশা চড়লে আর কোনো নেশা লাগে না।

সিগারেটও না?

কমল হাসি মুখেই নেড়ে জবাব দেয়, মানুষ দেখার নেশার উত্তেজনায় সিগারেট বেশি পোড়ে, ওটার নিজস্ব কেরামতি কিছু নেই।

খানিক আগে কি একটা ব্যাপার নিয়ে এখানকার জনা দুই মন্ত্রীর আদ্য-শ্রাদ্ধ করে উঠেছে কমল চ্যাটার্জী। ঝাঁঝটা এবারে ওর ভালো-মানুষ জ্যাঠামণির দিকে ঘুরবে কিনা গৌরীর সেই শংকা। সেই সম্ভাবনা দূরে হটাবার চেষ্টাতেই হেসে হাল্‌কা মন্তব্য করল, আগের দিন হলে এ-দেশ থেকে তোমাকে নির্বাসন দেওয়া হত।

কমল জিজ্ঞাসা করল, কেন?

গৌরী ফিরে প্রশ্ন করল, 'নজাকৎ' মানে জানো?

কমল মাথা নাড়ল, জানে না।

'নফাসৎ'?

আবারও কমল মাথা নাড়ল, জানে না।

আর 'বলাকৎ'?

বলাৎকার টলাৎকার কিছু নাকি?

ধ্যেৎ। গৌরীর মুখ লাল।—নজাকৎ মানে হল কোমলতা, নফাসৎ মানে জীবনের সর্ব-পরিপূর্ণতা, আর বলাকৎ মানে উদারতা। এই তিন গুণের জন্য এই নবাবী দেশের মানুষ ফেমাস—আগের দিন হলে তোমার এই দেশে জায়গা হত?

আড় চোখে তাকিয়ে মনে মনে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গৌরী। আগের অপ্রিয় প্রসঙ্গ বাতিল করা গেল বোধ হয়।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কায়সার বাগের দিকে এসেছিল।

নবাব ওয়াজিদ আলি শা'র তিনশ পঁয়ষট্টিটি বেগমের সোনার বরণ হারেম মহলের অনেকটাই এখনো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। সংস্কারের অভাবে সোনার বর্ণ কালচে তামাটে হয়ে এসেছে। সেদিনের আশি লক্ষ টাকা খরচ করে নবাব এই চতুর্বাহু বিলাসভবন তৈরি করেছিলেন।

পাশের লোককে একটু তাতিয়ে তোলার লোভেই গৌরী বলল, এখানে কী আনন্দের স্রোতই না বইত একদিন—এখন তার কি দশা। ভাবলেও কষ্ট হয়।

কমল জিজ্ঞাসা করল, কি-রকম আনন্দের স্রোত বইত?

গলার স্বর শুনেই গৌরী বুঝল এই স্মৃতির উদ্দেশ্যে কটু-কাটব্য করার জন্য জিভ সুড়সুড় করছে। তাই আরো রসিয়ে জবাব দিল, জানো না বুঝি, নবাব যেমন কবি মানুষ ছিল তেমনি রসিক মানুষও। বেগমদের সঙ্গে সে এখানে নাচত গাইত, কোনোদিন আবার সখ করে নিজেও বেগমের পোশাক পরত। প্রত্যেক বছর আবার একটা করে প্রহসনেরও অভিনয় হত, তার নাম 'ঘাইজালা'। সুন্দরী বেগমদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত, কে ঘাইঝালা হবে—নবাব সেই রাতে যার সাজ-পোশাক সব থেকে সুন্দর দেখবে আর যাকে সব থেকে মনে ধরবে সে হবে ঘাইজালা—অন্য বেগমরা তখন রূপোর ডানা বেঁধে পরী সেজে নবাব আর ঘাইজালাকে ঘিরে নাচবে—আবার প্রহসনের দিকটা ঠিক

রাখার জন্য কালো ডানা-অলা পরীও সাজতে হবে কোনো কোনো বেগমকে—স্বর্গরাজ্যে অশুভ পরীর উৎপাত হবে না? যে বেগমদের কালো পরী সাজাতে হত তারা দুর্ভাগিনী ভারত নিজেদের। হীরা মুক্তো মণির ছটায় সেই ঝলমলে নাচের আসরের কথা বইয়ে পড়লেও যেন চোখ ঠিকরে যায়। কি সুখের দিনই ছিল!

অলস ঠাণ্ডা দু'চোখ ওর মুখের ওপর একবার বুলিয়ে নিল কমল চ্যাটার্জী। তারপর নির্লিপ্ত সুরে বলল, এই বাড়িগুলোর দিকে তাকালে আমি সুখের স্রোতের বদলে রক্তের স্রোত দেখতে পাই—যে সুখের কথা তুমি বলছ তার পরিণাম। সিপাই মিউটিনির সময় এখানে সেই সুখের বদলা নেওয়া হয়েছিল—ওই হারেমের মাঝখানের উঠোন রক্তে ভেসেছিল আর প্রত্যেক দেয়ালে দেয়ালে সেই রক্তের ছোপ লেগেছিল, বুঝলে? হাসল একটু, আর তারপরে যে মন্তব্য করল, শোনামাত্র গৌরীর ভিতরটা বিরূপ হয়ে উঠল একটু। বলল, অসলে পূর্বপুরুষের স্বার্থ-ভরা সুখের রক্ত তোমার মধ্যেও বইছে—তাই সুখের চিত্রটাই আগে চোখে ভাসে।

গৌরী ধাক্কা খেয়েছে কারণ, পূর্ব পুরুষ বলতে বাবা-জ্যাঠার ঠাকুরদার ছবিটাই তার মনে এসেছে। এই লোক তাকেই টেনে আনল কিনা বোঝা গেল না।

আর একদিন ইতিহাস স্মৃতির ভিন্ন প্রসঙ্গে গৌরী মনের মতো একটু জবাব দিতে পেরেছিল। বিকেলের বেড়ানোটা প্রায় নৈমিত্তিক আসছিল। আগের দিন বাড়ি ফেরার আগে কমল বলে দেয়, ওমুক জায়গায় থাকব, এসো। গৌরী না আসার সম্ভাবনার কোনোরকম অজুহাত দেখালে ও বলে, ঠিক আছে, আমি বাড়ি থেকে ডেকে নেব'খন তোমাকে। গৌরীর যেন তাতে আরো বেশি ফ্যাসাদ। কোনোদিন হয়তো সত্যিকারের কিছু কারণ দেখিয়েই আসেনি। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখে ওই মূর্তি বসে মায়ের সঙ্গে গল্প জমিয়েছে। ওকে দেখামাত্র মায়ের অনুযোগ, তুই বাড়ি থাকবি না কমলকে আগে বলে দিসনি কেন, দু'ঘণ্টা হয়ে গেল অপেক্ষা করছে—

এ-রকম ফ্যাসাদে পড়ার থেকে নির্দেশ মতো বিকেলে বেরিয়েই পড়ে সে। আর সত্যি কথা বলতে কি, দেখা হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে এই গোছের জুলুমের জন্যে এতটুকু ক্ষোভ থাকে না। সব কিছুতে মানুষটার স্পষ্ট কথা আর স্পষ্ট আচরণের আকর্ষণ কিছু আছেই।

বেড়াতে বেড়াতে সেদিন মুসাবাগের দিকে এসে গেছল দু'জনেই। চার দিকের দেয়ালের পাশের জমি ঢালু হয়ে শেষে গোমতীতে গিয়ে মিশেছে। সব থেকে উঁচু নিরাপদ জায়গায় মঞ্চ সাজিয়ে বসে সপারিষদ নবাব জন্তু-জানোয়ারের যুদ্ধ দেখত।

এখানে এসে হঠাৎ ইতিহাসের গল্প একটা কমল চ্যাটার্জীই ফেঁদে বসল। বলল, তোমাদের কবি-নবাবের সুখের রক্ত গরম রাখার জন্য এখানে যে ভয়ঙ্কর রকমের হাতির লড়াই হয়ে গেছে একটা—সে খবর রাখো?

জবাব না দিয়ে গৌরী সকৌতুকে তাকালো তার দিকে। জানে কি জানে না মুখ দেখে বোঝা গেল না। টিকা-টিপ্পনী সহযোগে কমল চ্যাটার্জী হাতির লড়াইয়ের যে চিত্রটা ব্যক্ত করল, সেটা গায়ে কাঁটা দেবার মতোই।

—একশ পঞ্চাশটা হাতি ছিল নবাবের। আজকের কর্ণধারদের মতোই হাতি-পোষা নবাব ছিলেন তো—থাকবেই। ওগুলোর মধ্যে অতিকায় একটা মর্দা হাতি ছিল তার সব থেকে প্রিয়। হাতি নয় তো, কালো সচল পাহাড়ের স্তূপ একখানা—নাম মল্লার। মল্ল যুদ্ধে ওস্তাদ বলেই ওই নাম বোধহয়—বহু লড়াই জেতা সোনা-রূপোর চাকতি তার গলায় ঝোলে। প্রকাণ্ড একটা মাত্র ভাঙা দাঁত—সেই দাঁতের প্রতাপেই অন্য হাতি ঘায়েল হয়ে যায়। হাতিটার তখন বয়েস হয়ে আসছিল।

কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ এসেছে লক্ষ্ণৌয়ে। মহামান্য অতিথির অভ্যর্থনায় সরগরম খেলা কিছু দেখাতে হবে। মল্লারকে মরণ অথবা মারণ যুদ্ধের লড়াইয়ে নামতে হবে আর এক দফা। কিন্তু আধবুড়ো হলেও ওই এক-দেঁতো মল্লারের সঙ্গে যুঝবে কে? অনেক চেষ্টা করে আর একটা ওই রকম সচল পাহাড় সংগ্রহ করা হল—সেটাও এই মরণ বা মারণ যুদ্ধে কম অভ্যস্ত নয়।

সাজগোজ করে দুই মাহুত ডাঙশ হাতে দুই হাতির ঘাড়ের ওপর উঠে বসেছে। যে হাতি জিতবে তার মাহুতও প্রচুর পুরস্কার পাবে। আধ-বুড়ো হলেও মল্লারের অনেক কালের মাহুতও জেতার সঙ্কল্পে অটুট। হাতি দুটো দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা আর একটার দিকে চেয়ে রাগে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। একজনকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে তারাও জানে।

নিশানা বেজে উঠতেই একটা আর একটার দিকে তেড়ে এলো। তারপর শুরু হল সেই মারাত্মক জীবন-মরণ লড়াই। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হল বার কতক, তারপর দুটো হাতির দুটো মাথা যেন এক হয়ে সেঁটে রইল—একজোড়া শুঁড় আকাশের দিকে সোজা উঁচিয়ে আছে। চারজোড়া থামের মতো পা যেন মাটির সঙ্গে শিকড় গেঁড়ে আটকে আছে। একটা আর একটাতে নড়াতে চেষ্টা করছে আর থেকে থেকে হুঙ্কার ছাড়ছে। মাহুত দু'জনের ডাঙশের ঘায়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, যে যার হাতির মাথায় মেরে মেরে ও দুটোকে আরো উত্তেজিত আরো মরিয়া করে তুলছে। আর সেই উত্তেজনায় দর্শকদের বুকের ধুকপুকুনি থেমে আছে যেন।

বহু মরণ-যুদ্ধের আধ-বুড়ো নায়ক মল্লারের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বী এঁটে উঠতে পারল না শেষ পর্যন্ত। তার সামনের পা দুটো থেকে থেকে ওপরে উঠতে লাগল। আর তাই দেখেই মল্লার বুঝে নিল আবার একটি জয়ের মাল্য তার গলায় ঝুলবে। আরো ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ চালালো সে। মাথায় উত্তেজিত মাহুতের ডাঙশ আরো ঘনঘন পড়তে লাগল। প্রতিদ্বন্দ্বী হাতিটা একটু একটু করে পিছু হটতে লাগল, মাথায় মাথা লেগে আছে তখনো, বিপুল মল্লার ওটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল, তার মত্ত হুঙ্কারে আকাশ ভরাট। ডাঙশ মেরে মেরে তার মাহুত প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংসের ইন্ধন যোগাচ্ছে।

খুব অল্প অল্প করে পিছু হটতে হটতে মল্লারের প্রতিদ্বন্দ্বী গোমতীর কাছাকাছি চলে এলো। ওটার মতলব তখনো কেউ বোঝেনি, সকলেই ভেবেছে যুঝতে না পেরে পিছু হটছে। তারপর অতর্কিতে নিজের মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ঘুরে গোমতীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটা। মল্লারের মাথায় তখন খুন চেপেছে, তার উত্তেজিত মাহুত তখনো ডাঙশ মেরে ওকে জলে নেমে বিজিতকে সংহারের নির্দেশ দিচ্ছে। মল্লারও এখন ধ্বংসই চায়, সংহারই চায়—যে-কোনো শিকারের খোঁজে ক্ষিপ্ত আক্রোশে আচমকা ঘুরে দাঁড়াল। হঠাৎ সেই টাল সামলাতে না পেরে তার পিঠ থেকে মাহুতটা নীচে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মল্লার তাকেই পা দিয়ে চেপে ধরল। মহূর্তের মধ্যে জীবন্ত মানুষটাকে একেবারে দলা পাকিয়ে দিল। তার ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে বাতাস কাঁপছে, সকলে ভয়ে দিশেহারা। মাহুতকে হত্যা করেও মল্লারের ধ্বংসের নেশা কমল না—তার হাত-পা টেনে টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আকাশে ছুঁড়ে দিতে লাগল আর তেমনি হুঙ্কারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিতে লাগল।

ঠোটের ডগায় হাসির আভাস, কমল চ্যাটার্জী সিগারেটে লম্বা লম্বা টান দিলে গোটাকতক।

উৎসুক গৌরী জিজ্ঞাসা করল, তারপর?

...তারপর যা সে-সব সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার। আসল কথা হল, সেই হাতির খেলাই খেলাচ্ছে এখনো আমাদের কর্ণধাররা, তাদের মাহুতের ভূমিকা—মাথায় ডাঙশ মেরে মেরে জনতা নামে হাতিটাকে তার নিজের নিরীহ জাতভাইয়ের দিকে লেলিয়ে দিচ্ছে—শেষে দেখবে ওই জনতার হাতেই ওদের মরণ অবধারিত।

ভারী কথাগুলোকে গৌরী হেসেই হালকা করে দিতে চাইল প্রথম। তারপর বলল, তোমার গল্পের শেষটা তাহলে আমার কাছে শোনো—কেউ যখন সেই ক্ষ্যাপা হাতির কাছে এগোতে পারছে না, তখন পাগলের মতো ছেলে কোলে ছুটে এলো একটা মেয়ে—ওই মাহুতের বউ। মল্লারের একেবারে শুড়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, মল্লার এ কি করলি তুই, এবার তুই আমাকে মার আর এই ছেলেকে মার—মার—মার—মার বলছি!

সকলে স্তব্ধ হয়ে দেখল, হাতিটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে মাথা নিচু করে নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছেলেটা খিলখিল করে হাসছে আর তার শুঁড় টেনে টেনে খেলা করছে। নবাবের ধড়ে প্রাণ এসেছে তখন—মাহুতের বউয়ের উদ্দেশ্যে হুকুম হল, মল্লারকে সে-ই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাক। মাহুতের বউ আদেশ শিরোধার্য করে মল্লারকে ধমকে হুকুম করল, বোস্—!

মল্লার বসল। মাহুতের ছেঁড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর দেহ প্রথমে তার পিঠে তুলে দিল। তারপর ছেলে নিয়ে নিজে উঠে বসল। মল্লার উঠে ধীরে ধীরে ফিরে চলল।

এটুকু বলে কমলের দিকে চেয়ে গৌরী হাসতে লাগল অল্প অল্প।

কমল জিজ্ঞাসা করল, তাতে কি হল?

তেমনি হেসেই গৌরী জবাব দিল, তাতে এই প্রমাণ হল তোমাদের এই ক্ষ্যাপামি সারাবার লোক আছে।

নিজের মুখখানাই লাল হতে লাগল একটু একটু করে। প্রকারান্তরে ও কমলকেই সেই ক্ষ্যাপা হাতি বলেছে, আর তাকে ফেরাবার মতো লোক ও নিজে ছাড়া আর কে? এতদিনের মধ্যে গৌরী নিজের মনোভাব প্রকাশের ধারে কাছে ঘেঁষেনি কখনো। কমল তার দিকেই চেয়ে আছে—সব ছেড়ে চোখ দুটোই যেন বেশি হাসছে।

কথার মুখে কথা বলতে গিয়ে এই উপমা দিয়ে বসেছে গৌরী। কিন্তু আসলে নিজের মনোভাব সম্পর্কে এতদিনেও নিঃসংশয় নয় সে। মানুষটার মধ্যে জোরদার আকর্ষণ কিছু আছেই, চেষ্টা করলেও তাকে এড়ানো যায় না। কিন্তু তার স্পষ্ট ধারালো যুক্তির আঘাতে ভিতরটা অনেক সময় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তখন মানুষটার মধ্যে প্রাণের উত্তাপ হৃদয়ের উত্তাপ কতটুকু আছে সেই সংশয় জাগে।

কমল চ্যাটার্জীর প্রথম বাড়িতে পদার্পণের মাস দুই পরের ঘটনা। চেষ্টা করেই গৌরী দেখা সাক্ষাতের হার কমিয়েছে একটু। এই হারে দেখা হওয়াটা বাঞ্ছনীয় কি না গৌরী নিঃসংশয় নয় তখনো। যদিও তার কথার জাদু আর স্পষ্টতার ছটায় এখনো অনেক সময়ই বিস্মিত হয় সে, আকৃষ্ট হয়—তবু।

সেদিন স্নান-উৎসব ছিল একটা। স্কুল কলেজে ছুটি সেই কারণে। এই দিনে অবস্থানির্বিশেষে মেয়ে-পুরুষের স্নানের হিড়িক পড়ে যায় গোমতীতে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই স্নান চলে। অনেকটা এগিয়ে ভিড় ছেড়ে গোমতীর এক নির্জন দিকে বসে ছিল গৌরী। বিকেল তখন পাঁচটা। এদিকেও দূরে দূরে দু'দশ জন করে স্নান করছিল। গৌরী নিজের অগোচরে বারকয়েক ঘড়ি দেখেছে।

...কমল চ্যাটার্জী আসছে। দূর থেকেই গৌরী দেখল তাকে। আসবে জানাই ছিল। গত সন্ধ্যায় জিজ্ঞেস করেছিল, আজ বিকেলে কোথায় থাকবে। পড়াশুনার অজুহাতে দিনকতক নিজেকে ঘরে আটকে রেখেছিল গৌরী। তার থেকেও পড়ার আকর্ষণটা বেশি হবে এই লোক সেটা বরদাস্ত করার পাত্র নয়। নানা কথার ফাঁদে ফেলে একরকম জোর করেই তাকে টেনে নিয়ে গেছে। অথচ তার মন বলে এভাবে নিজের ওপর দখল হারানো কোনো কাজের কথা নয়। তাই জোর করেই নিজেকে শাসন করেছে। বলেছে, পরীক্ষা আসছে, আর আড্ডা নয়। কিন্তু সেদিন নাকচ করা গেল না, ছুটির দিনে সমস্ত সকাল দুপুর হাতে পেয়েও ওই অজুহাত দেখালে সেটা টিকবে না। গৌরী বলেছিল, গোমতীর দিকে থাকতে পারি। কিন্তু এখানে আসার আগে ও অনেকবার ভেবেছে আসবে কি না, পরে বলে দিলেই হবে অন্য কারণে অন্যত্র কোথাও ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না এসেও পারেনি।

হাসি মুখে এগিয়ে এসে একেবারে হাত দেড়েকের মধ্যে বসে পড়ল কমল চ্যাটার্জী। ফারাকটা আর একটু বেশি হলেই যেন মনঃপূত হত গৌরীর। চেনাজানা অনেকেই অনেকদিন একসঙ্গে দেখেছে ওদের। এখানেও দেখতে পারে।

সিগারেটের খোঁজে পকেটে হাত ঢুকিয়ে কমল বলল, তোমার সঙ্গে মিশে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বেশ একটা ধারণা হয়ে গেছে আমার। ঠিক ধরেছি ওদিকের ভিড়ের মধ্যে তোমার দেখা মিলবে না, তাই সটান এদিকে চলে এলাম।

গৌরীর তক্ষুনি মনে হল ওই ভিড়ের দিকে থাকলেই হত। ... হয়তো ভাবছে তার আশাতেই এই ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়েছে।

সেটা একেবারে মিথ্যে নয় বলেই তেতে উঠতে ইচ্ছে করল। তার হাতের প্যাকেটটার দিকে এক

নজর তাকিয়েই বলে উঠল, নাকের ডগায় বসে ধোঁয়া ছাড়তে থাকলে আমি কিন্তু এক্ষুনি উঠে পালাব।

শশব্যস্তে কমল যেন অনেকখানি সরে বসার ভাব করল, কিন্তু শরীরটাই নড়ল-চড়ল, আসলে চার আঙুলও সরল কি না সন্দেহ। উলটে আরো একটা এগিয়ে আসার ইচ্ছেটাই দুই চোখে ব্যক্ত করল। তারপর সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে হেসেই বলল, আচ্ছা, এ-বস্তুটা কি করে ছাড়া যায় বল তো....?

বচন-পটু মানুষটার মুখোমুখি হলেই গৌরীর সত্তাবোধ ঠিক এমনি সহজতার মধ্যেই যেন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে যায়। সেটা অস্বীকার করতে চায় বলে নিজেরও সহজ হবার তাগিদ। হাত বাড়িয়ে তার ঠোঁটে থেকে ফস্ করে সিগারেটটা টেনে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল!—এই করে।

পরক্ষণে চাপা অস্বস্তি। লোকটাকে যেন মুহূর্তের মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে আসার পরোয়ানা দেওয়া হল। দু'চোখে ওর মুখাখানাতে যেন একটা স্পর্শ বুলিয়ে দিতে লাগল। হাসছে একটু একটু। বলল, এই করে ছাড়তে হলে তো দিন রাত তোমাকে আমার সঙ্গেই থাকতে হয়, কিন্তু তোমাকে আর পাচ্ছি কতক্ষণ? জবাবের আশায় চেয়ে রইল খানিক, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করে বলল, এক ভদ্রলোককে এই নেশা ছাড়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল, বলল, একমাত্র উপায় এর থেকে আরো জোরাল কোনো নেশা ধরা। এত দিন আমি সেই জোরালো নেশাটাই হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম।... এখন মনে হচ্ছে মিলেছে।

ওই দুটো হাসিমাখা চোখের স্পর্শ মুখের ওপর আরো নিবিড় হয়ে উঠল যেন। অস্বস্তি সত্ত্বেও খারাপ লাগছে না। এই গোছের উক্তির নিভৃত প্রতিক্রিয়া একটু আছেই। ছদ্মকোপে চোখ রাঙাল গৌরী।—কি? আমি তোমার নেশা?

পাগল, তুমি আমার গঙ্গা-জল—থুড়ি, তুমি আমার গোমতীর জল! তোমার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের সম্পর্কটা টানলে উত্তরাধিকার সূত্রে সে-রকমই দাঁড়ায়!

গৌরীও হেসেই ফেলল।

সিগারেট ধরিয়ে কমল বলল, আজ সকালে কায়সারবাগে তোমার জ্যাঠামণির সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, আমার গত সন্ধ্যার তর্কের আসরের কথাগুলো গভীরভাবে চিন্তা করছেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্বীকারই করেছেন গত বিশ বাইশ বছরের শাসনের অপ-ব্যবহারই তাদের শত্রু সৃষ্টির প্রধান কারণ। এই করে তারাই শত্রুপক্ষকে সব থেকে বেশি মদত দিয়েছেন। ব্যস, তারপরেই মিউচুয়্যাল অ্যাডমিরেশন সোসাইটি—আমিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অনেক প্রশংসা করে ফেললাম। অতএব দেবী, তোমার কালকের রাগ আজ শুধু 'অনু'-যুক্ত হোক।

ক্রমশ ভালোই লাগছিল গৌরীর। এই রকমই হয়। ক্ষোভ যদি কিছু জমাও হয়ে থাকে, এই গোছের কথাবার্তায় সেটুকু মুছে যেতে সময় লাগে না। কিন্তু গত সন্ধ্যায় তার সত্যিই রাগ হয়েছিল। সেটা জ্যাঠামণির সঙ্গে তর্কের দরুন নয়, ওর মনে হয়েছিল, এই লোক ভিতর থেকে কাউকে যথার্থ সম্মান করতে জানে না। তারমধ্যে উষ্ণ প্রাণ নামে বস্তুটির পরিমাণ বেশি নয়। হৃদয়ের উত্তাপের ধার ধারে না, তার নির্মম স্পষ্টতাই যেন অনেকখানি গর্বের জিনিস।

বাড়িতে থাকলে নিছক কৌতুকের লোভেও জ্যাঠামণি অনেক সময় তর্ক জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কমলকে সামনে পেলে তো করেনই। গতকাল শত্রু-সৃষ্টির বিতর্কের পর সোশ্যালিজ্‌ম্ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র নিয়ে কথা উঠেছিল। জ্যাঠামণির সেই নরম মুখ গৌরীর একটুও ভালো লাগছিল না। ভাবখানা এইরকম যেন তিনিই নাবালক শিক্ষার্থী। তর্ক একটু জমে উঠতে জ্যাঠামণি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার সুযোগ আর ক্ষমতা পেলে তুমি কি করো শুনি।

কমল তক্ষুনি জবাব দিয়েছিল, সদ্য বর্তমানের যে সব বক্তৃতাসর্বস্ব সমাজতান্ত্রিকরা গিরগিটির মতো আর বহুরূপীর মতো ক্ষণে ক্ষণে রং বদলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দিনকে রাত বোঝাচ্ছেন রাতকে দিন, আগে তাদের কবরের নীচে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

শুনে গৌরী বেশ ধাক্কাই খেয়েছিল একটা। বলার ধরনে স্পষ্ট মনে হয়েছিল জ্যাঠামণিকেও সে ওই গিরগিটি আর বহুরূপীর দলে ফেলেছে। কিন্তু জ্যাঠামণি হাসি মুখেই অবাক হতে চেষ্টা করেছিলেন।—সে-কি হে! ওই বক্তৃতার কারবারে আর রং বদলাবার কারবারে তো তোমাদেরই একচেটে অধিকার সকলে বলে? যার নাম অ্যাবসলিউট মনোপলি—

সকলে বললেও আপনি বলবেন কি না ভেবে দেখুন। হাসছিল কমলও। কিন্তু সেই হাসি ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ। তারপর বলেছিল, আমার বিবেচনায় একটা সমাজে চার পর্যায়ের লোক বাস করতে পারে। এক প্রেমিক, দুই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তিন দ্রষ্টা, আর চার মুখ্যু নির্বোধের দল। এই শাসনে তার প্রথম তিন দল প্রায় অনুপস্থিত—আপনাদের সমাজতন্ত্রে ওই মুখ্যু আর নির্বোধের বিশাল দলটিই শুধু পরম সুখে আছে।

জ্যাঠামণি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন কি না মুখ দেখে বোঝা যায়নি। হবারই কথা। কিন্তু রাজনীতির ব্যাপারে বহুকালের পোড় খাওয়া মানুষ তিনি। হাসি মুখে আর হালকা সুরে তিনি গৌরীকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোর কি মত?

গৌরী অনেকক্ষণ ধরে তেতে ছিল। এই লোকের সম্পর্কে অনেক বার তার যে ধারণা হয়েছে, শ্লেষের সুরে সেটাই ব্যক্ত করে ফেলেছিল। জবাব দিয়ে বসেছিল, ওঁরা মাথা দিয়ে জনতার হৃদয় জয় করতে চান, কিন্তু জনতা যদি মাথা ছেড়ে হৃদয়ের খোঁজ করে তারা মুখ্যু আর নির্বোধ ছাড়া আর কি?

জ্যাঠা তার জবাবের তারিফ করেছিলেন। আর এই লোক যুৎসই জবাব দেবার খোরাক পেয়ে নড়েচড়ে বসেছিল। কিন্তু গৌরী সে-সুযোগ দেয়নি—পড়ার নাম করে রাগত মুখেই উঠে চলে গেছল। সেই প্রসঙ্গে আজকের এই উক্তি।

কিন্তু ওপরওয়ালা যে অদৃশ্য থেকে এই হৃদয়ের ব্যাপার নিয়েই এই দিনের জন্য একটা প্রহসন মঞ্চস্থ করে রেখেছিলেন, জানত না।

হঠাৎ সামনের দিক থেকে অর্থাৎ গোমতীর দিক থেকে একটা আর্ত চিৎকার এবং কলরব কানে আসতে দু'জনেই সচকিত। সামনেই পনের ষোল বছরের জনাপাঁচকে ছেলে নদীতে হুটোপুটি করছিল। ওদেরই একজনের আর্তনাদ এবং বাকি ক'জনের সত্রাস কলরব।

গৌরী ভালো করে কিছু বোঝার আগেই গলা দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বার করে কমল চ্যাটার্জী উঠে দাঁড়াল। উত্তেজনা আর উদ্বেগভরা দুই চোখ নদীর দিকে। কি অঘটন ঘটতে যাচ্ছে দেখে নিল। তারপর চোখের পলকে গায়ের জামাটা খুলে ফেলে ছুটে গিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হ্যাঁ, গৌরী এবার দেখতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে।...ওই...ওই যে ছেলেটা ডুবে যাচ্ছে। সাঁতার জানে, কিন্তু নীচের জলের ঘূর্ণী স্রোতে পড়েছে তাতে কোনো ভুল নেই। গোমতীর এই সংকট সকলেই জানে। প্রায় প্রতি বছরই দু' চারটে অঘটন ঘটে। অসহায়ের মতো সকলে চিৎকার করছে, ধারে কাছে একটা নৌকাও নেই।

ত্রাসে শঙ্কায় গৌরী কখন উঠে দাঁড়িয়েছে, কখন একেবারে নদীর ধারে চলে এসেছে জানে না। কাঁপছে থরথর করে। ঘামছে। বাঁচার চেষ্টায় ছেলেটা কি মর্মান্তিক যোঝাই যুঝছে। বাঁচাও—বাঁচাও বলে তখনো চিৎকার করছে। কিন্তু আর পারছে না, তলিয়েই যাচ্ছে।

কিন্তু এ-কি! এ কি হল? এ-কি হতে যাচ্ছে? গৌরীর দু'পা অবশ। বুকের তলায় ঠক-ঠক হাতুড়ির ঘা। একটার বদলে এখন দুটো আসন্ন মৃত্যু দেখছে গৌরী। অনুমানের ওপর নির্ভর করে সাঁতরে গিয়ে ছেলেটাকে ঠিক ধরেছে কমল চ্যাটার্জী। তারপরেই গৌরীর শরীরের সমস্ত রক্ত হিম একেবারে। ঘূর্ণী স্রোত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ওই ছেলেটাকে নিয়ে প্রাণপণে যুজছে সে। আসতে পেরেছে হয়তো, ...কিন্তু মৃত্যুর মুখে অবলম্বন পেয়ে ছেলেটা আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছে তাকে, আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে। ফলে দু'জনেই মুহুর্মুহু ডুবছে আর ভাসছে, ডুবছে আর ভাসছে, শেষে ডুবছেই বেশি। পারের লোক গেল-গেল রব তুলেছে।

...তবু আশা, অন্তিম আশা। গৌরীর গলা দিয়ে অব্যক্ত আর্তনাদ বেরিয়ে আসছিল একটা। সেই মুহূর্তে আশার ফুলকি একটু। কোথা থেকে তর-তর করে ছোট একটা নৌকো ছুটে আসছে...কিন্তু কি হবে, ওটা কি পৌঁছুতে পারবে? ওরা যে ডুবেই যাচ্ছে। পারবে? পারবে না? পারবে? হে ভগবান, কি হবে?

পারল। পেরেছে। মৃত্যু থেকে জীবনকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছে। কমল চ্যাটার্জী নৌকোটা ধরে ফেলেছে, অন্য হাতে ছেলটা ধরা। নৌকোর লোকেরা টেনে তুলল দুজনকেই।

গৌরী অবসন্নের মতো বসে পড়ল সেখানেই।

অজ্ঞান অবস্থায় দু' জনকেই হাসপাতালে আনা হয়েছে। ছেলেটার সঙ্কট কাটেনি, তবে বাঁচবে। কমল চ্যাটার্জী অনেকটা সুস্থ। বাঁচার দিশেহারা তাড়নায় আঁকড়ে ধরে ছেলেটা তাকে প্রচুর জল খাইয়েছিল।

দুর্ঘটনার খবর পরদিনের কাগজে বেরিয়েছে। গৌরী একখানা কাগজ সঙ্গে করে এনেছিল। একটু আগে বাবা, জ্যাঠামণি আর মা চলে গেছেন। মা-ই তাগিদ দিয়ে বাবাকে হাসপাতালে ধরে এনেছেন। জ্যাঠামণি নিজের থেকেই এসেছেন। চোখের ইশারায় কমল গৌরীকে থাকতে অনুরোধ করেছিল।...না করলেও থাকত।

কাল অনেক রাতে গৌরী হাসপাতাল থেকে বাড়ি গেছে। ভয়ের কারণ নেই শুনে তবে গেছে। কিন্তু প্রায় সমস্ত রাতই ছটফট করে কাটিয়েছে। সেই মারাত্মক দৃশ্যটা থেকে থেকে চোখে ভেসেছে। কি ঘটে যেতে পারত তাও বার বার মনে হয়েছে। এই লোককেই কি না হৃদয় নেই বলে খোঁচা দিয়েছিল আর সেই সংশয়েই নিজের সঙ্গে কত না যোঝাযুঝি।

বাবা চলে যেতে গৌরী কাগজ খুলে তার দিকে এগিয়ে দিল। খবরের ওপরে বীর মহত্ত্বের শিরোনামা দেখেই কমল চ্যাটার্জী কাগজ সরিয়ে রেখে হেসে ওর দিকে তাকালো। ভালো লাগছে। গৌরীর দুই চোখে এখনও যেন একটু ব্যাকুলতার আভাস দেখছে।—কাল তুমি খুব ঘাবড়ে গেছলে বুঝি?

না আনন্দে হাততালি দিচ্ছিলাম। যে-কাণ্ড করলে, কি না হতে পারত?

কমল হাসছে তেমনি। জবাব দিল, হল না যে সেটাই আশ্চর্য।...আমি ধরেই নিয়েছিলাম সব খেলা খতম হয়ে গেল। ছেলেটাকে আগলে শেষ বারের মতো একবার তোমাকেই দেখতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু চারদিক তখন অন্ধকার।

তার চোখে চোখ রেখে গৌরীও হাসছে বটে একটু-একটু। ভিতরে ভিতরে ওর যেন কান্নাই পাচ্ছে। কিন্তু সেটা নিরানন্দের নয়। যে কথাগুলো ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে তাও না বলে পারল না। একসময় বলল, তোমার উপর আমি খুব অবিচার করেছিলাম, তাই বোধহয় এ-রকমটা ঘটল।

এবারে অস্ফুট শব্দ করেই হেসে উঠল কমল চ্যাটার্জী। —মেয়েরা এমনি ভাবপ্রবণ বলেই ছেলেদের এত সুবিধে। তারপর তেমনি হালকা সুরে যে-কথা বলল, সহজ সরলতার অমন নজিরও বোধহয় গৌরী আর দেখেনি। বলল, ওই খবরের কাগজের লোকের মতো তুমিও বুঝি ভাবছ আমি খুব মহৎ আর হৃদয়বান লোক একটা? আসলে ওটা একটা হঠাৎ-আবেগ, যাকে তোমরা বল সাডেন্ ইম্‌পালস্ —সেই ব্যাপার। আর আমার মনে হয় তুমি পাশে ছিলে বলেই ওটার আধিক্য ঘটে গেল। নইলে চোখের সামনে অঘটনে মরতে আমি আরো অনেক দেখেছি, কিন্তু ও-ভাবে আর কখনো ঝাঁপিয়ে পড়েছি বলে তো মনে পড়ে না।

গৌরী চেয়েছিল তার দিকে। শুধু দেখছিল। দেখার মতোই একটা মানুষ যেন।

ছয়

বি.এ. পরীক্ষা হয়ে গেল।

কমল চ্যাটার্জীরই একটা দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান যেন। পরীক্ষার শেষদিন ইউনিভার্সিটিতে এসে হাজির। একগাল হেসে বলল, বাঁচা গেল, ক'টা মাস এখন তোমাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে। এরপর তো এম.এ. পড়বেই আবার, না?

গৌরীর মজাই লাগছে, কি-রকম পরীক্ষা হল না হল সে-সম্পর্কে একটি কথাও না, আগেই এই চিন্তা। কপট ভ্রূকুটি করে গৌরী জবাব দিয়েছে, না পড়ে কি করব, তোমার ভরসা কতটুকু?

তা বটে। তোমার তো সামনে সমুদ্র! কমলের মুখেও কপট গাম্ভীর্য। এম.এ. পাশ করে চাকরি করবে, স্বামী প্রতিপালন করবে, কত দায়িত্ব তোমার।

টানা তিন মাসের অবকাশ এরপর যে-ভাবে কাটতে লাগল, গৌরী নিজেই অস্বস্তি বোধ করেছে এক-একসময়। দু'বেলার খাওয়া-দাওয়া আর রাতে ঘুমের সময় ছাড়া বাদ বাকি সময়টুকুর সবই যেন ওই মানুষের জবরদস্ত দখলে। সুলতা মাসির ছেলে না হয়ে আর কেউ হলে মা-ও বোধ হয় এতটা মাখামাখি বরদাস্ত করত না। গৌরী যে পর্যায়ের ছাত্রী, এখন থেকেই এম.এ. পড়ার বই-পত্র সংগ্রহ করে বা কিনে একটু নেড়েচেড়ে দেখার কথা। সব পরীক্ষার পরেই তাই করেছে। কিন্তু এবারে আর সে ফুরসত মেলেনি বা মিলছে না। জ্যাঠামণি খানকতক বই এনে দিয়েছিলেন তাও উলটে-পালটে দেখার সময় হয়নি। একদিন খেয়াল হতে দেখে বই ক'টা টেবিলে নেই। জ্যাঠামণিকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, লাইব্রেরির বই তো...আচ্ছা আবার এনে দেব'খন।

গৌরী লজ্জা পেয়ে সরে গেছে।

অন্যের দোষ দিয়ে লাভ নেই, গৌরী নিজেই যেন কি একটা ঘোরের মধ্যে চলেছে। দেশ কাল সম্পর্কে ওর এতদিনের অভ্যস্ত চিন্তা ভাবনার বিপরীত স্রোতের দিকে চলেছে বুঝতে পারে। কিন্তু তাতে যেন সত্যিকারের চোখ খুলছে। কমল চ্যাটার্জী ওকে তাদের দলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে, দলের আপিসেও টেনে এনেছে, সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তারা ওকে নিজেদের একজনই ভাবে এখন। ওদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যেও অনেক সময় মুখ বুজে বসে থাকতে হয়েছে, শুনতে হয়েছে।

গোড়ায় গোড়ায় ওদের মন বুঝত না, মতবাদ বুঝত না, লক্ষ্য বা আদর্শের সঠিক হদিসও পেত না। যেটুকু পেত বা বুঝত, তাতে উলটে ধোঁকা লাগত, ধাক্কা খেত। কিন্তু একটু একটু করে সে-ভাবটা কেটে আসছে, অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ ব্যাপারে ওর উৎসাহ বা উদ্দীপনা জুগিয়েছে ওই একজনই। কমল চ্যাটার্জী। সে ওকে অনেক বই-পত্রও পড়িয়ে ছেড়েছে। এ-সব বই পড়ার সময়ের অভাব হয়নি বা তার জন্য তাগিদ দিতে হয়নি। এই থেকেই ওদের কাজ লক্ষ্য আর আদর্শ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মেছে বটে, কিন্তু গৌরীর আসল পরিবর্তনটা এসেছে ওই একজনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে—তার অদ্ভুত অদ্ভুত সহজ স্বচ্ছ স্পষ্ট অথচ ধারালো কথা শুনে। কোন ইজ্‌ম্ নিয়ে কখনো গুরুগম্ভীর বক্তৃতা ফেঁদে বসেনি কমল চ্যাটার্জী। তার টুকরো টুকরো কথা বা মন্তব্য শুনে তার থেকে ঢের বেশি কাজ হয়েছে। কান পেতে শোনার মতো আর পরে চুপচাপ বসে বিশ্লেষণ করার মতোই এক একটা কথা বলে কমল চ্যাটার্জী। শোনে যখন, খুব স্বচ্ছ খুব স্পষ্ট, পরে মনে হয় ওই নিয়ে আরো কিছু ভাবার আছে, আরো কিছু চিন্তা করার আছে।

ঝাঁঝের সঙ্গে কৌতুক মিশিয়ে কমল বলে, আমরা এত নীচে তলিয়ে আছি যে, যদি কোনো মানুষের সংস্কার চাও তো তার ঠাকুমাকে দিয়ে শুরু কর।

সে বলে, একটা দেশের সভ্যতার মাপকাঠি তার জন-সংখ্যায় নয়, তার বড় বড় শহরের আয়তন বিচারে নয়, তার ফুল-ফল ফসলে নয়, তার সভ্যতার আসল বিচার কোন্ পর্যায়ের মানুষ সৃষ্টি করছে

সে, তাই দিয়ে। মানুষের আয়নায় দেশ। আমাদের বৃহৎ মানুষ গোষ্ঠির সেই রূপখানা কেমন তুমি দেখেছ, না তোমার জ্যাঠামণিরা দেখেছেন?

ও বলে, তুমি-আমি খুব একটা অভিজাত এলাকায় একটা শৌখিন বাড়িতে বাস করতে পারি। সুখে সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে থাকতে পারি। কিন্তু আমাদের চোখ থাকলে দেখতাম সেই সুখ আর সেই সম্পদের কোথাও না কোথাও বস্তি-ঘরের কালো ছায়া পড়ে আছে। চোখে খোঁচা দিয়ে রক্ত বার করে না দেখালে আমরা তা দেখতে চাইব আশা করো?

ও বলে, দাসত্ব সর্বসমাজের মূলনীতির পরিপন্থী, কিন্তু জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে আমরা ক্রীতদাস নই, বলতে পারো?

ও বলে, Words without actions are the assassins of idealism' —আমাদের বড় বড় নেতারা এই কথার তুবড়ি ছুটিয়ে আদর্শের হত্যা-কর্মটি বেশ সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করে চলেছেন।...আমরা কি চাই? বংশানুক্রমে সন্তান-সন্ততিদের সুসম্পূর্ণ মুক্তির উত্তরাধিকার করে যেতে পারাটাই একটা স্বাধীন জাতির সব থেকে বড় কাজ, সব থেকে বড় গৌরব। আমরা এইটুকুই চাই। কিন্তু এতেও যারা বাধা দেয় তারা কাদের বুকে ছুরি বসাচ্ছে বুঝতে পারো না?

এ-রকম অনেক দিন অনেকে বলেছে, অনেক দিন অনেককথা শুনেছে গৌরী। শুনেছে আর ভেবেছে। নিজের অগোচরে ওর চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটছে একটু একটু করে।

কিন্তু দিনগুলো তা বলে এই সব গভীর তত্ত্ব বা গভীর চিন্তায় মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। গৌরীর মনের তলায় অনেক অন্তরঙ্গ মুহূর্তের এলোমেলো ছাপও কম পড়ছে না। এই এক ব্যাপারে ওর চাপা অস্বস্তিও কম নয়। অন্তরঙ্গ জনেরা এখন আর বক্র কটাক্ষে লক্ষ্য করে না ওদের। আগে করত। করাই স্বাভাবিক। এই ক'টা মাসের মধ্যে পাশাপাশি দু'জনকে তারা কত দেখেছে ঠিক নেই। পথে দেখেছে, গোমতীর ধারে দেখেছে, রেসিডেন্সিতে দেখেছে, কফি হাউসে দেখেছে। দেখে দেখে এখন একটা অবধারিত পরিণতির প্রত্যাশায় আছে তারা।

এই সেদিনও কম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েনি গৌরী। বিকেলের দিকে প্রায়ই গোমতীর ধারে বেড়ানোর প্রোগ্রাম ওদের। লোকের ভিড় ছাড়িয়ে অনেকটা দূরের এক নিরিবিলি জায়গায় বসেছিল দু'জনে। এতটা নিরিবিলি পছন্দ নয় গৌরীর। কিন্তু মুখ ফুটে আবার বলতেও পারে না সে-কথা। বুঝতে পারলে আরো বেশি খুনসুটি শুরু করবে।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে গৌরী যে যুগল মূর্তি এদিকে আসছে দেখল, তাদের অন্তত কখনো আশা করিনি। দাদা আর তার পাশে অনুপমা ভার্গব। ওদের দেখেছে, দেখেই এদিকে আসছে। দাদার বিব্রত হাসিমুখ, মনে হয় মেয়েটা জোর করেই তাকে এদিকে টেনে এনেছে। চাপা শংকায় কমলের উদ্দেশ্যে গৌরী বলল, ওই দেখো কারা আসছে।

তাদের দেখে কমল চ্যাটার্জী খুশিতে উঠে দাঁড়াল। দাদার সঙ্গে তার আলপটা তেমন অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেনি এখনো। অনুপমা ভার্গবের সঙ্গে আলাপই নেই। তবু উজ্জ্বল আনন্দে দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো কমল চ্যাটার্জী।—আসুন আসুন, গোমতীর জলেও রং ধরেছে দেখুন।

দাদা কমলের সঙ্গে অনুপমার আলাপ করিয়ে দেবার উদ্যোগ করতে অনুপমাই হেসে বাধা দিল, ওঁকে এ-রাজ্যের সকলেই চেনে, তার ওপর শত্রুপক্ষের মেয়ে জয় করে উনি আরো ফেমাস হয়ে গেছেন।

ঠোঁট কাটা কমল চ্যাটার্জী জবাব দিল, জয় করার কথাই যদি বলেন তো দাদার বাহাদুরী আমার ডবলেরও বেশি। আমার কম্পিটিটর নেই, কিন্তু দাদার কম করে পঞ্চাশটি তরুণ হৃদয় বিধ্বস্ত করে আপনাকে ছিনিয়ে নিয়েছেন—সেই বিধ্বস্তদের মধ্যে আমিও একজন।

অনুপমা হাসিমুখে ঝুঁকে গৌরীর হাত ধরে টানল, তোমার ভদ্রলোকের মুখের সুনাম নেই, চলো আমরা ওদিকে বেড়াই একটু। ওকে সঙ্গে করে কয়েকপা এগিয়ে অনুপমা আবার বলল, এখানে ধরব বলে তোমার দাদাকে নিয়ে আজ জোর করেই এদিকে এসেছি—আসতে কি চায়! তুমি রাগ করলে না তো?

হাসছে গৌরীও।—কি মনে হয়?

তোমার দাদা বলেন তুমি চাপা মেয়ে, যা মনে হয় তাই যে ঠিক বুঝব কি করে? যাক্ এসে গেছি তো গেছিই—তুমি তো আর একদিনও আমাদের বাড়ি এলেন না।

সময় হলেই যাব—তোমরা কদ্দুর এগোলে বলো দেখি।

গৌরীর হাতখানা অনুপমার হাতে ধরাই ছিল, সেই হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জবাব দিল, তুমি তোমার নিজের তালে আছ, আমরা এগবো কি করে, এদিকে তোমার দাদা বলেন তুমিই ভরসা—এই জন্যই তো চড়াও হতে এলাম আজ।

গৌরী যথার্থই অবাক যেন, আমি ভরসা কি রকম?

তুমি তোমাদের জ্যাঠামণির চোখের মণি, তাই তুমি দূতিয়ালি করলে তিনি সদয় হবেন, আর তিনি সদয় হলে তোমাদের মায়ের হাত থেকে ঝাঁটা খসতেও পারে।

গৌরী হাসতে লাগল। প্রথম দিনের আলাপেই ভালো লেগেছিল, আজ আরো ভালো লাগছে। এখনও মনে হল, এই মেয়ে মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালে মায়ের সাধ্য নেই ওকে নাকচ করে।—এই ভরসায় আছ তোমরা, অ্যাঁ? কেন, দাদার মুণ্ডু ঘোরাবার আগে এ-সব চিন্তা মাথায় আসেনি?

একটা ভালো মেয়েকে দেখে মুণ্ডু যদি ঘোরেই সেটা তোমার দাদার দোষ না আমার দোষ! আমি তো কতবার বলেছি, বিলেতে চলে যাও, বাবার মতো বড় ডাক্তার হও, তারপর দেখা যাবে। তা তোমার দাদা বিশ্বাসই করে না আমাকে।

কি বিশ্বাস করে না, তুমি ততদিন তার জন্যে জিয়নো থাকবে কি না?

অনুপমা ভার্গব তরল খুশিতে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, আসলে ব্যাপারখানা কি জানো একটা ছেলেকে আমার দিদির বড় পছন্দ ছিল, আমার সঙ্গে তাকেই জুড়ে দেবার মতলব ছিল দিদির। আমি তখনো তোমার দাদার পাল্লায় পড়িনি আর ঐ ছেলের সম্পর্কে হাঁ না কিছুই বলিনি। সেই ছেলের দিদিকে অত তোয়াজ করাটাও আমার খুব ভালো লাগত না। মরুকগে, সেই ছেলে চাকরিতে বড় প্রমোশন পেয়ে দিল্লীতে বদলী হয়ে গেল, দিদি তাকে আশ্বাস দিয়ে নতুন চাকরিতে জয়েন করতে বলেছিল, বছর খানেক বাদে আমার ফার্স্ট এম.বি. পরীক্ষা হয়ে গেলেই বিয়েটা দিয়ে ফেলা যাবে। দিদি এতটা এগিয়ে গেছে আমি আবার অতশত জানতুম না। এরমধ্যে দিব্যি তোমার দাদার জালে আটকে গেলাম। বছরখানেক বাদে সেই ছেলে এসে দেখে আমি হাতছাড়া হয়ে গেছি। এদিকে দিদি নিজের রোজগারের ধান্ধায় থাকে, বোনের মতিগতির খবর রাখে না। জানল যখন, রেগে আগুন। বেগতিক দেখে আমি দিদিকে জড়িয়ে ধরে তার কাজে বেরুনো পণ্ড করার উপক্রম করতে মন নরম হল। দিদি সেই ছেলেকে তখন সাফ জানিয়ে দিল, বোন নিজের বর নিজে ঠিক করেছে, তার কোনো হাত নেই। সেই ছেলে বিবাগী হয়ে আবার চাকরি করতে চলে গেল।...আমি বোকা মেয়ে তো, তাই বোকার মতো তোমার দাদাকে একদিন এই গল্প শুনিয়ে বসলাম। ব্যস, তারপর থেকে বিলেত যাবার কথা তুললেই খোঁচা দেয়, ফিরে এসে দেখবে আমি আর একজনের দখলে চলে গেছি। বুদ্ধি দেখো—

তড়বড় করে অথচ এমন সহজ সুন্দর করে বলে গেল কথাগুলো যে গৌরীর শুনতে মজাই লাগছিল। তরল হাসি আর সরল কথাগুলো যেন বাজনার মিষ্টি ঝংকারের মতো। দাদার পক্ষ নিয়ে গৌরী কোপ প্রকাশ করল, একজনের বুকে দাগা দিয়েছো, চোখের আড়াল হলে আর একজনের বুকেও যে দেবে না বিশ্বাস কি?

পাতলা ঠোঁটে হাসি ঝরল অনুপমার, ভুরু কুঁচকে জবাব দিল, দাদার মতই বুদ্ধি দেখি তোমার, দাগা যদি দিই তাহলে অমন মেয়ের খপ্পরে পড়তে হল না বলে তো নিজের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেবার কথা। আমাকে যাচাই করার এ সুযোগ বোকা ছাড়া কেউ ছাড়ে!

অনুপমা হেসে ফেলল! সাদাসাপটা যুক্তি বটে।—দাদাকে বলেছ এ কথা?

একবার! দশবার করে বলেছি। আসলে ব্যাপারখানা কি জানো...থাক্ বাবা বলব না, তোমার নিজের তো আছে একজন, ঠিকই বুঝছ।

মুহূর্তের জন্য বিমনা হল গৌরী। অনুপমার অনুক্ত ইঙ্গিত বুঝেছে। অনুপমার তুলনায় ওরও একজন থাকার মধ্যে কোথায় যেন বড় রকমের পার্থক্য একটা। পার্থক্যটা গোচরের নয় বলেই কি রকম অজ্ঞাত অস্বস্তি একটু।

পিছনে হালকা গলা-খাঁকারি শুনে দুজনেই ফিরে তাকালো। কমল চ্যাটার্জী। দাদা দূরেই দাঁড়িয়ে। অনুপমার উদ্দেশে গম্ভীর অনুযোগের সুরে কমল বলল, একসঙ্গে দু'দু'টো লোককে কষ্ট দেবার কোন অধিকার নেই আপনার।

অনুপমা মিষ্টি হেসে জবাব দিল, অধিকার নিয়ে গলাবাজী করা আপনার রোগে দাঁড়িয়েছে।

কমল সেটা স্বীকার করে নিয়ে সবিনয়ে বলল, সেই জন্যেই মহিলা ডাক্তারের কাছে এলাম।

থাক, আপনি আপনার অধিকার নিয়ে যত খুশি গোমতীর হাওয়া খান, আমি চললাম। গৌরীর দিকে ফিরে অনুপমা বলল, ওদিকে চেম্বারের সময় হয়ে গেছে বোধহয়, চলি, বড় ভাল লাগল—

সহাস্যে প্রস্থান করল, গৌরীর ওকে আটকে রাখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে-চেষ্টা করল না!

হাত দশেক এগোতে আবছা অন্ধকারে আর দেখা গেল না তাকে। কমল সেখানেই বসে পড়ে সিগারেট ধরানোর উদ্যোগ করে বলল, বোসো—

আর বসে কি হবে, সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কমল হেসেই জবাব দিল, সন্ধ্যে হয়ে গেল বলেই তো বসতে চাইছি।

পলিটিক্স ছেড়ে এই গোছের কথা শুনলেই গৌরী অস্বস্তি বোধ করে কেন জানি না। সেটা বুঝতে না দিয়ে হাত তিনেক তফাতে বসল। সিগারেটে গোটা কয়েক টান দিয়েকমল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, অনুপমা ভার্গবের দিদিকে তুমি দেখেছ?

গৌরী মাথা নাড়ল—না...কেন?

একটা কথা ভেবে কি-রকম অবাক লাগে, এই মেয়েটার কেমন দুধে-আলতা রং, অথচ ওর দিদি রীতিমতো কালো—অবশ্য যতটুকু দেখা যায় সেই রকমই মনে হয়, সেই মহিলা আবার বাইরের লোককে মুখ দেখায় না, সর্বদা বোরখা পরে থাকে। দু'বোনের এতটা রঙের তফাত হয়?

তা হবে না কেন, আমার সঙ্গে দাদারই তো রঙের কত তফাত। ...কিন্তু হিন্দু মেয়ে বোরখা পরে থাকে কেন? আর তুমিই বা তাকে কোথায় দেখলে?

দেখেছি...স্টাইল করে অনেক সময় হিন্দু মেয়রাও বোরখা পরে এখানে। তা ছাড়া গোপন প্রণয় পর্বে অনেক মেয়ের বোরখা ভরসা। কিন্তু অনুপমার দিদি কেন পরে বুঝতে পারি না।

একটু অবাক হয়েই গৌরী জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু হঠাৎ তোমার অনুপমার দিদির চিন্তা মাথায় এলো কেন?

মুচকি হেসে কমল বলল, কারণ আছে।...আমার যতদূর ধারণা, অনুপমার ওই দিদিটির ওপর একজন ভদ্রলোকের চোখ আছে—রং কালো আর কিছু বয়েস হলেও মহিলার স্বাস্থ্য টাস্থ্য দিব্বি ভালো—আমি অবশ্য সেই লোকটাকে ঠিক ভদ্রলোক মনে করি না, তার টাকা আছে, আর সে-টাকার ওপর পার্টির জন্য আমরা মাঝে মাঝে থাবা বসাই...মহিলা তার ভয়েই সর্বদা বোরখা চড়িয়ে থাকে কিনা জানি না... সে রকমও ঠিক মনে হয় না।

শুনতে ভালো লাগল না গৌরীর। অনুপমার দিদির প্রসঙ্গে মানুষটার এই কৌতূহলও। বলল, অন্যের দিদিকে নিয়ে তোমার অত মাথা ঘামিয়ে কাজ কি!

ঠিক বলেছ। হেসে মুখোমুখি ঘুরে বসল।—মিথ্যে সময় নষ্ট, মাথাটা আপাতত তোমাকে নিয়েই ঘামানো যাক—

কমল চ্যাটার্জী আর গৌরী সিদ্ধান্তের ইদানীং কালের মেলা-মেশা দেখে পরিচিত জনেরা অচিরে একটা শুভ ঘোষণা আশা করছে। কিন্তু গৌরীর সেটা ভাবনার কারণ নয়। ওর দুর্ভাবনা নিজেকে নিয়েই। স্বচ্ছ স্পষ্ট ওই মানুষের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যটুকুই বিড়ম্বনার কারণ। নিরিবিলিতে পাশাপাশি চলতে চলতে পুরুষের একখানা হাত আজকাল অনায়াসে ওর কাঁধের ওপর উঠে আসে। এত অনায়াসে সে সজাগ হতেও সঙ্কোচ। আলাপ বিশেষে কাঁধে ওই হাতের মৃদু চাপও অনুভব করে অনেক সময়।

তখনো ওকে খেয়াল না করার ভান করতে হয়। সামনে বা পিছনে লোক দেখলে কাঁধ থেকে এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দেয়। বলে, সরো দেখি, লোকে কি ভাবছে ঠিক নেই।

কিন্তু এই মানুষ কারো কোন ভাবা-ভাবির ধার ধারে না। নদীর ধারে বসলে সন্ধ্যার পরেও বেশ খানিকক্ষণ ধরে রাখবেই ওকে, আর তখনো একখানা হাত অথবা একদিকের কাঁধ তার হাতের দখলে থাকবে। এমন কি ফেরার সময় বাড়ির কাছাকাছি এসেও কাঁধ থেকে হাত সরাবার কথা মনে থাকে না। আর সেটা যে নিতান্তই মনের ভুল, গৌরীর তাও মনে হয় না।

আর সেদিনের কাণ্ডটা মনে পড়লে গৌরীর সর্বাঙ্গ সিরসির করে এখনো। দিন-দুপুরের কাণ্ড। রেস্তরাঁর একটা ছোট্ট কেবিনে বসে চা খাচ্ছিল দু'জনে। আর নিছক কৌতুকে গৌরী তার মতবিরুদ্ধ তর্ক জুড়ে দিয়েছিল একটা। তাকে একটু তাতিয়ে তুলতে চাইলে এই রকমই করে থাকে। রাজনীতি যারা করে আজকাল তারা কতটা দেশ আর দেশের মানুষের দিকে চেয়ে করে, আর কতটা নিজেদের দল পুষ্ট করার উদ্দেশ্যে—এই নিয়েই তর্ক তুলেছিল গৌরী। হঠাৎ মনে হল লোকটা শুনছে না কিছু, শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। চাউনিটা কি-রকম অস্বস্তিকর লাগল গৌরীর।

কি হল? কি দেখছ?

মানুষটা একটু যেন সচকিত।—না, ভাবছিলাম একটা কাজ করলে কি হয়...।

কি কাজ?

জবাবে কমল উৎসুক যেন একটু।—জোরে বলা যাবে না। মাথা নেড়ে কাছে আসতে ইশারা করল। কিছু না বুঝেই গৌরী টেবিলের ওদিক থেকে সামনে ঝুঁকল। নিজের পেয়ালাটা এক ধারে সরিয়ে কানে কানে বলার মতো করেই কাছে ঝুঁকেছে কমল চ্যাটার্জী। তারপরে চোখের পলকে ওই কাণ্ড। তার অধরে দুটো ঠোঁটের চকিত স্পর্শ।

থতমত খেয়ে গৌরী এত জোরে পিছনে সরেছে যে চেয়ারসুদ্ধ উলটে পড়ার দাখিল। কেলেঙ্কারিই হত তা হলে। অনেক কষ্টে টাল সামলেছে। সমস্ত মুখ টকটকে লাল। দরজার সবুজ পাতলা পর্দাটা বাতাসে নড়ছে। ও-দিক থেকে যে কেউ দেখে ফেলতে পারত। এ-সময় ওদিকটা ফাঁকা তাই রক্ষে।

লোকটা মিটিমিটি হাসছে।

প্রায় রাগত সুরেই চাপা গলায় গৌরী বলে উঠল, চালাকি পেয়েছ—কেউ দেখে ফেললে!

ও...দেখে না ফেললে আপত্তি নেই বলছ? হাসছে।—আর এ-রকম বাজে তর্ক করবে আমার সঙ্গে?

তুমি একটা অসভ্য! এবার থেকে তোমার সঙ্গে সাবধানে মিশতে হবে।

কেন?

আবার কেন?

এবারে নির্লিপ্ত মুখ করে কমল চ্যাটার্জী জবাব দিয়েছে, এখন মনে হচ্ছে এই সহজ আনন্দটুকু আরও অনেক আগেই আমার পাওয়া উচিত ছিল। প্রাকৃতিক বিধানকে যারা আষ্টেপৃষ্ঠে শিকলে বেঁধে রাখে আমি তাদের দলের কেউ নই—অত সাবধান টাবধানের ধার ধারি না।

ধার ধারে না যে, গৌরী তাও অনুভব করতে পারে। লোকটার যৌবনবাস্তবে সত্যিই যেন কলঙ্ক বলে কোন কথা নেই। মাস দুই পরের আর এক রাতের ঘটনা মনে পড়লে গৌরীর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

গৌরী সবে তখন এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। বি. এ-তে ফাস্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, কাগজে ওর ছবি বেরিয়েছে। এবারে অন্তত নতুন উৎসাহে গৌরীর পড়াশুনায় মেতে ওঠা উচিত। কিন্তু সে ফুরসত এখনো মিলছে না। কমল চ্যাটার্জী এখনো ওর অনেকটা সময় দখল করে রেখেছে। কিছু বললেও হেসে উড়িয়ে দেয়। তার পাশে থেকে ঘুরে ঘুরে দলের কাজ করে বেড়ানোটা সে এর থেকে অনেক বেশি দরকারী বলে মনে করে।

এই সময়ে গৌরীর প্রায়ই মনে হয়েছে, ওই লোকের কাছ থেকে এবারে আচমকা বিয়ের প্রস্তাব আসবে একটা। কারণ সর্ব-কর্মে ইদানীং ও পাশে না থাকলে মন ওঠে না। ডাকলে গৌরী পাশে থাকে

প্রায়ই কিন্তু না থাকার জোরটাও বজায় রাখতে চেষ্টা করে। তার ফলে মন কষাকষিও হয় একটু আধটু। বিয়ের প্রস্তাব-সম্ভাবনায় গৌরীর আশা যত না, তার থেকে আশঙ্কা বেশি। কেন, ও নিজেও ঠাওর করে উঠতে পারে না।

কিন্তু সে-রকম প্রস্তাব এখনো আসেনি।

সেদিন সকালের রোমাঞ্চকর খবর শুনে একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে গৌরী ছুটেছিল হুসেনাবাদে জমা মসজিদের দিকে।...মৃত্তিকা গর্ভে নবাবের সেই বিপুল ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের প্রায় সঠিক হদিস মিলেছে নাকি। যে ঐশ্বর্য পেলে সমগ্র ইউ.পি সোনা দিয়ে মুড়ে রাখা যেতে পারে বলে প্রবাদ। তাই সরকারি খননকার্য চলেছে সেখানে। বলাবাহুল্য গৌরী ঐশ্বর্য ভাণ্ডার দেখতে ছোটেনি, মরা ইতিহাসের বুক থেকে একটা যবনিকা ওঠার সম্ভাবনা ওকে টেনে নিয়ে গেছে।

গায়ে কাঁটা দেবার মতোই সে ঐশ্বর্যের অভিশপ্ত কাহিনী। সে-কাহিনী গৌরী অনেক দিন আগেই জ্যাঠামণির মুখে শুনেছিল। বইএও পড়েছে।

মাটির নীচের কোন্ গুপ্ত গহ্বরে সেই বিপুল ঐশ্বর্যের কোষাগার সে-খবর নবাব-বাদশাদেরও জানার অধিকার ছিল না। না জানাটাই রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছলো। জানা মানেই বিপদ ডেকে আনে। কারণ বিলাস ব্যসনের ফাঁকে দিনের কতটুকু সময় আর আত্মস্থ থাকত তারা। সেই গুপ্ত কোষাগারের হদিস জানত একমাত্র কোষাধ্যক্ষ। তার কাছেই সে কোষাগারের অবস্থানের সাঙ্কেতিক নিশানা থাকত আর ভাণ্ডারের চাবি থাকত। সেই অতুল ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের শেষ কোষাধ্যক্ষ মিফ্‌তা-উদ্-দৌল্লা। শোনা যায়, নবাব ওয়াজিদ আলি শা জীবনে একবার মাত্র তার সেই ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার স্বচক্ষে দেখেছিল। কিন্তু দেখার পরেও নবাব জানে না কোথায় সে রাজকোষ। কারণ, মিফ্‌তা-উদ্-দৌল্লা নবাবকে নিয়ে গেছিল সম্পূর্ণ একা এবং চোখ দুটি বেঁধে।

সিপাই বিদ্রোহের পর সেই বিপুল ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার হাতে পাবার লোভে ইংরেজরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের লোভের সে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। সভ্যতার ইতিহাসে এমন হিংস্র লোভের নজির বোধ করি আর বেশি নেই।

বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষ মিফ্‌তা-উদ্-দৌল্লাকে তারা বন্দী করেছিল। কিন্তু ভাণ্ডারের চাবি নেই তার কাছে। কয়েক পুরুষ ধরে এই দায়িত্ব পালন করে আসছে, বিপদের সংকেত তারা সকলের আগে পায়। সেই দুর্যোগ আসন্ন অনুমান করে অনেক আগেই সেই চাবির গোছা গোমতীতে বিসর্জন দিয়েছিল শেষ কোষাধ্যক্ষ মিফতা-উদ-দৌল্লা। আর সংকেত চিহ্ন? তার হদিস কে পাবে। আচকান আর কুর্তার নীচে গলায় ঝোলানো কাপড়ের মোড়কটাতে তো কাগজের ওপর কতকগুলো হিজিবিজি পশু-পাখি আঁকা শুধু। এর থেকে কে কি হদিস পাবে?

অমানুষিক অত্যাচার করেও ইংরেজ সেই গুপ্ত-ভাণ্ডারের হদিস বার করতে পারেনি বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে। কিন্তু চেষ্টা করেছে। সমস্ত নখদন্ত মেলে শীর্ণ বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষের দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চেয়েছে তারা। শেষে ক্রুদ্ধ ইংরেজ তাকে হাতির পায়ের সঙ্গে বেঁধে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে মাইলের পর মাইল হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে। বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষ রক্ত-স্নান করেছে তবু কবুল করেনি কোথায় সেই গুপ্ত-ভাণ্ডার।

ক্ষিপ্ত ইংরেজ তখন রেসিডেন্সিতে টেনে এনে ধূমায়িত কামানের সামনে দাঁড় করিয়েছে। যে রেসিডেন্সি তখন ইতিহাসের মরা মিউজিয়াম নয়, অগ্নি উদগিরণের খেলায়, জীবন্ত। এক্ষুনি অবাধ্য বৃদ্ধের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বলে শাসিয়েছে তারা।

বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষ তখনো মূক, তখনো বধির।

কিন্তু সত্যিই শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করেনি ইংরেজরা। স্বার্থের ব্যাপারে তাদের ধৈর্যশূন্যতার অপবাদ কেউ দেবে না। হত্যা করলে তো ফুরিয়েই গেল। মনে হয়, তার ওপর নজর রাখার জন্যই তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে ১৯০৩ সালে তার মৃত্যু হয়েছিল। দেশের বৃহত্তম ভাণ্ডারের ঠিকানা যে মানুষের দখলে, অনশন এবং অর্ধাশনে জীবন পাতন তার বিধিলিপি। যারা জানে, তারাই শুধু

জানে, মৃত্যুর আগে গলায় ঝোলানো কাপড়ে বাঁধা সেই পশুপাখি আঁকা কাগজের মোড়কটা সংগোপনে পুড়িয়ে ফেলেছিল বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষ মিফ্‌তা-উদ-দৌল্লা।

তারপর থেকে শুরু সেই মরীচিকার পিছনে আনুষ্ঠানিক হানাদারি। কুবেরের ভাণ্ডার উদ্ধারের আশায় আরো বারকয়েক অমনি ঘটা করে মাটি খোঁড়া হয়েছে। ঐশ্বর্য আছে কি নেই এ সংশয় কারো মনে কখনো রেখাপাত করেনি। আছেই। এই উদ্ধারের চেষ্টা গৌরী আগে দেখেনি, এই প্রথম দেখছে।

বেশ সরগরম ব্যাপার। জমা মসজিদের সামনের বিস্তৃত এলাকার একাংশ পুলিশ ঘিরে রেখেছে। ওদিকে খননের কাজ চলছে। এদিকে উন্মুখ জনতার ভিড়। যেন কুবেরের ভাণ্ডার এক্ষুনি তাদের চোখ ঝলসে দিল বলে। এই ভাণ্ডারের আলোচনায় মগ্ন মানুষগুলো যেন সব ইতিহাসের রাজ্যে চলে গেছে। গৌরী নিজেও অনেকটা তাই গেছে।

পিছনে কোমর ঘেঁসে পিঠের দিকে আঙুলের খোঁচা খেয়ে গৌরী চকিতে ঘুরে দাঁড়াল।

কমল চ্যাটার্জী। পিছনে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাসছে মৃদু মৃদু। হাসিটা বিদ্রুপের কি কৌতুকের বোঝা ভার।—তুমি যে!

তুমি এসেছ ঐশ্বর্য উদ্ধার দেখার লোভে, আমি তোমার লোভে। ...বাড়ি গেছলাম, তোমার জ্যাঠামণি বললেন তুমি এখানে। চলো আর দেখে না—

দাঁড়াও, দেখি একটু।

দেখবে আবার কি, সাত দিন ছেড়ে সাত বছর খুঁড়লেও কিছু বেরুবে না। আর বেরোয় যদি কিছু, সেগুলো রক্তের ডেলা ছাড়া আর কি? সে সব কার ভোগে লাগবে, সে-কি আবার নতুন করে বোঝাতে হবে নাকি তোমাকে! হাত ধরে এক-রকম জোর করেই টেনে আনল তাকে। খানিক বাদে পাশাপাশি চলতে চলতে বলল, দরকারেই এসেছিলাম, আজ একবার মালিহাবাদ যাব—

প্রস্তাবনার ইংগিত বুঝতে সময় লাগল না একটুও। অতএব সঙ্গে সঙ্গে গৌরী বাধা দেবার সুরেই বলে উঠল, আমি যাব কি করে ক্লাস আছে তো।

কমল চ্যাটার্জীর ঠোঁটের ডগায় নির্ভুল হিসেব।—মঙ্গলবারে তোমার আড়াইটে পর্যন্ত ক্লাস, আমরা যাব চারটেয়, ফিরব আটটা নাগাদ। তুমি রেডি থেকো।

আপত্তি করার আর যেন কোনো প্রশ্নই নেই। দলের কাজের ব্যাপারে এই রকম সাদা-সাপটা জুলুম তার।

আপত্তি করলেই অ-খুশি। গৌরী তবু বললে, আমি না গেলে হয় না...আটটার পরে বাড়ি ফিরে আর বই নিয়ে বসতে ইচ্ছে করবে? সত্যি পড়াশুনার বড় ক্ষতি হচ্ছে।

হাল্‌কা টিপ্পনীর সুরে কমল চ্যাটার্জী বলল, সকালে এই যে ঐশ্বর্য খোঁড়া দেখতে এসেছ তাতে পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে না? নিজেরাই আমরা এর থেকে ঢের ঢের বড় ঐশ্বর্য খোঁড়ার কাজে লেগেছি ভাবলেই তো হয়।

এ রকম কথা শুনে শুনে গৌরীর দু'কান অভ্যস্ত, তবু কেন যেন আজকাল ভালো লাগে না খুব। তার ইচ্ছেটাই যেন সব, ওর নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো দাম নেই। সময় নেই অসময় নেই এসে বললেই হল যেতে হবে। না গেলেই মেজাজ চড়ল। এই বাড়াবাড়ি বাড়ির লোকের চোখেও হয়ত বিসদৃশ ঠেকছে এখন। বাবার কোনদিকে চোখ মেলে দেখার ফুরসত নেই, তিনিও নাকি সেদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মেয়ে ওখানেই বিয়ে করবে কিনা আর করলে এম.এ পরীক্ষার আগেই করবে কিনা। মা-ই সেদিন বলছিলেন কথাটা। গৌরীর ধারণা, এ নিয়ে মা-ও একটু দো-টানার মধ্যে আছেন। আজ মুখ বুজে থাকা গেল না, গৌরী বলে উঠল,লেকচার দিয়ে দিয়ে ওই এক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তোমার... আমার বাপু এখন থেকে পড়াশুনা নিয়ে পড়তে হবে, স্পষ্ট কথা।

কমল থমকে দাঁড়িয়ে গেল।—আজ তুমি মালিহাবাদ যাচ্ছ না তাহলে?

আজ যাচ্ছি। আমি ভবিষ্যতের কথা বললাম।

কমল হাসতে লাগল। ওর গম্ভীর মুখখানা সকৌতুকে দেখে নিল একটু।—আমার খপ্পরে একবার যখন পড়েছ, ভবিষ্যৎখানা কেমন ঝরঝরে তোমার তাও বুঝতে পারছ না!

গৌরী সকোপ ভ্রূকুটি করল বটে, কিন্তু ইচ্ছের জোরটা এই একজনের ওর থেকে যে অনেক বেশি মনে মনে তাও উপলব্ধি না করে পারল না। এই জোরের সঙ্গে সে যুঝতে পারে মাত্র, তার বদলে পালটা জোর খাটাতে পারে না।

ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার খানিক বাদে মতিবাঈ খাবারের থালা হাতে ঘরে ঢুকল। তার পিছনে মা। নতুন কিছু নয়, এ সময় রোজই আসেন। মেয়ের খাওয়া দেখেন। সংসার সম্পর্কে দু'এক কথা বলার দরকার হলে এই সময়েই বলেন। অন্য সময় মেয়ে হয় পড়ছে নয়তো বেরিয়েছে কোথাও। মতিবাঈ চলে যেতে থালা কাছে টেনে নিয়ে গৌরী বলল, আজ একটু মালিহাবাদ যাচ্ছি মা, রাত ন'টা নাগাত ফিরব।

ইচ্ছে করেই গৌরী হাতে একটু বেশি সময় রাখল। কারণ যে লোকের সঙ্গে যাচ্ছে তার সময়ের জ্ঞানের ওপর খুব আস্থা নেই। মা জেনেও জিজ্ঞাসা করলেন, কমলের সঙ্গে?

খেতে খেতে গৌরী মাথা নাড়ল শুধু।

একটু বাদে ওর মনে হল মায়ের যেন কেমন দ্বিধাগ্রস্ত মুখ। কিছু একটা বলি বলি ভাব। গৌরী জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতে তিনি কাছে এগিয়ে এলেন। হ্যাঁ রে, তুই কি ঠিক করলি বল্ তো, আর কমলই বা কি বলে?

গৌরী অবাক একটু।— কি ঠিক করব? কি ব্যাপারে কি বলবে?

তোরা বিয়ে থা করবি, না কি ওই রকমই হুটহুট করে কাটাবি? সেদিন তোর বাবা ওই রকম বললেন, আবার আজ তোর জ্যাঠামণিও বলছিলেন—

জ্যাঠামণির নাম শুনে গৌরী আরো বেশি সচকিত।—জ্যাঠামণি কি বলছিলেন?

ওই কথাই।... বিয়ে যদি হয়ই তো হয়ে যাওয়া ভালো।

জ্যাঠামণি এরকম কথা বলেন কেন গৌরী ভালোই অনুমান করতে পারে। তবু বিরক্তি।—আমাকে না বলে জ্যাঠামণি তোমাকে বলতে গেলেন কেন?

বেশ! বিয়েটা না-হয় তুই করবি, তা বলে নিজের বিয়ে তুই নিজে দিবি না আমরা দেব?

বিরক্তি গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কৌতুক চিকিয়ে উঠল। মায়ের সমস্যা গৌরী ভালোই জানে। কৃতী মেয়ের বর বলতে মায়ের মস্ত আশা। আবার সুলতা মাসির ছেলের প্রতি দুর্বলতাও কম নয়। কমল চ্যাটার্জী সুলতা মাসির ছেলে না হলে মা কবে তাকে নাক সিঁটকে নাকচ করে দিতেন। বান্ধবীকে কথা যখন দিয়েছিলেন, তখন তাঁর ছেলের এই ভবিষ্যত জানা থাকলেও কি করতেন বলা যায় না।

গম্ভীর মুখেই গৌরী জিজ্ঞাসা করল, তাহলে দিচ্ছ না কেন বিয়ে?

বাঃ, তোরা মন স্থির করবি তবে তো।

খাওয়া শেষ করে গৌরী মায়ের চোখে চোখ রাখালো। —তোমার মনস্থির হয়েছে?

কি জানি বাপু, তোর সঙ্গে কথায় পারিনে আমি। যা করবি ভেবে চিন্তে ঠিক কর।

গৌরী হেসে ফেলেছিল। মাকে আরো একটু বাজিয়ে দেখার লোভে আবার গম্ভীর।—আমার ঠিক করাই আছে, সুলতা মাসিকে যখন কথা দিয়েছিলে তখন তো আর আমাকে জিজ্ঞাসা করে দাওনি, মাঝখান থেকে আমি কথার খেলাপ করি কেন। তুমি লাগিয়ে দাও বিয়ে। এম.এ. টা না-হয় বিয়ের পরেই পাশ করব, ফার্স্টক্লাস পাব জানা কথাই, আর তারপরে—

মা সশঙ্ক নেত্রে চেয়ে রইলেন। মুখ টিপে হেসে গৌরী বলে গেল, তারপরে আর কিছু না হোক কলেজের মাস্টারি একটা পাবই।... আমি আমার মনে চাকরি করব, আর তোমার জামাই পার্টি করে বেড়াবে, নির্ঝঞ্ঝাট ব্যাপার।

মায়ের আসল দুর্ভাবনার জায়গায় ঘা পড়ল। বলে উঠলেন, খুব নিশ্চিন্ত তুই একেবারে, আর এই চিন্তাতেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়। তোকে বলিনি, তোর বাবাও সেদিন জিজ্ঞাসা করছিলেন, ছেলেটা কাজকর্ম কিছু করবে না ওমনি কাটাবে। আমার কথা তো ও কানেই তুলবে না, কিন্তু তুই নিজেই তো জিজ্ঞেস করতে পারিস এ-ভাবে কতকাল চলতে পারে।

বাবার কথা শুনে থমকালো একটু, কিন্তু আর কথা না বাড়িয়ে গৌরী হাসি মুখে চটপট উঠে পড়ল। —সময়ে সব হবে, ভেবে আমার জন্যে তোমাকে একটুও মাথা গরম করতে হবে না। এম.এ. পাস করার আগে কিছু ভাবতে রাজি নই।

একটা আধা পুরনো গাড়িতে চলেছে দু'জনে। মেঘলা আকাশ। রোদের ছিটে ফোঁ ও নেই। গরমের দিনে এই ঠাণ্ডার আমেজটুকু ভালো লাগছে। গাড়িটা কমলের একজন অবাঙালি বন্ধু । সেই বন্ধু মালিহাবাদ ছাড়িয়ে আরো আট-দশ মাইল দূরে কি কাজে গেছে। গাড়িটা তখন ঠিক ছিল না, তাকে ট্রেনে যেতে হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছে, কমলদের মালিহাবাদে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলেযাবে তার মালিককে আনতে। ফেরার সময় সে আবার মালিহাবাদ থেকে ওদের তুলে নেবে।

গাড়ির ড্রাইভার খাস ইউ.পি-র লোক, বাংলা এক বর্ণও বোঝে না। অতএব ওদের মন খুলে কথা কইতে বাধা নেই। গাড়িতে উঠেই ছদ্মকোপে গৌরী চোখ রাঙিয়ে বলে উঠেছে, তুমি যেখানে যাবে আমাকেও এ-ভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে কেন?

কমলের ঠোঁটের ফাঁকে হাসি আটকে আছে, দু'চোখ ওর মুখের ওপর।—জাহান্নামে তো আর যাচ্ছো না।

জাহান্মামে যাই বা সগ্‌গে যাই, তুমি জুলুম করবে কেন?

উৎফুল্ল মুখে কমল জবাব দিল, সুশ্রী একটা মেয়ে সঙ্গে থাকলে সর্ব ব্যাপারে সুবিধে। লোকের চোখ প্রীত হয়, তাই কাজও খুব সহজে হাসিল হয়।

কি? সকোপে গৌরী আর একটু ঘুরে বসল তার দিকে।—গাড়ি থামাতে বলো, আমি নামব।

কমল বলল, এগারো মাইলের মধ্যে মাত্র সাত মাইল এসেছি, এই জংলা রাস্তায় তোমাকে একা দেখলে অনেকে আরো বেশি প্রীত হবে বোধহয়।

ইংগিতটা বোঝামাত্র গৌরীর মুখ লাল।—তুমি একটি আস্ত অসভ্য। যাই বলো, তোমার সঙ্গে আর আমি কোথাও যাচ্ছি না। এত মেশামিশি দেখে লোকের চোখ করকর করছে।...জ্যাঠামণির পর্যন্ত। ইচ্ছে করেই বাবা বা মায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করল না।

বেচারা জ্যাঠামণি। কমল হাসছে মুখ টিপে।—কি-ই বা বয়েস এমন। এখনো তো সময় আছে, চুপিচুপি একটা বিয়ে-থা করুক না। ব্যাঙ্কে টাকা থাকলে পাত্রীর অভাব হয় না।

জ্যাঠামণিকে নিয়ে এমন ঠাট্টাও কেউ করতে পারে গৌরীর কল্পনার বাইরে। হকচকিয়ে গেল একটু। তারপর হয়তো ওইসম্ভাবনাটা ভাবতে গিয়েই হেসে ফেলল। ভ্রূকুটি করে সামলালো, মুখে কিছু আটকায় না কেমন? দাঁড়াও, বলছি জ্যাঠামণিকে, তোমার বড় বেশি বাড় বেড়েছে।

এমনি লঘু চপলতার মধ্যেই তারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছল। ওদের মালিহাবাদে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে গেল। মাটিতে পা দিয়েই আকাশের দিকে চোখ গেল গৌরীর। জমাট মেঘে আকাশের আধখানা কালীবর্ণ একেবারে। পূব-কোণে ঘন কালো মেঘের নীচে ঘোলাটে লালের আভা।

সশঙ্কে আঙুল তুলে কমলকে আকাশের ওই দিকটা দেখাল গৌরী-ওই দেখ।

ঝড় জল হবে মনে হচ্ছে। এইটুকু মন্তব্য করেই কাঁচা রাস্তা ধরে সামনের ওই পুরনো বিশাল বাড়িটার দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল কমল চ্যাটার্জী। তার মাথায় কাজ ছাড়া এখন আর কিছু ঢুকবে না।

গৌরী ধীরে-সুস্থে অনুসরণ করল তাকে। কি জন্যে এখানে আসা সে সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে। মাস কয়েক আগেও একবার মালিহাবাদে এসেছে। কমলের সঙ্গেই এসেছিল। মোটামুটি পরিচিত জায়গা। ওই বিশাল ভাঙা বাড়িটার সামনের প্রকাণ্ড বারান্দায় মিটিং হয়। আগের দিনের কোনো জমিদার-বাড়ি হবে। জীর্ণ ভগ্নদশা এখন চারদিক ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সামনে পিছনে বিস্তৃত কম্পাউন্ড। এককালে শৌখিন বাগান ছিল, দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে এখন ঘন জঙ্গল। একলা ওই বাড়িতে ঢুকতে হলে দিন দুপুরেও গা ছমছম করবে। এ-দিকটায় লোক বসতি খুবই কম। অনেকটা দূরে দূরে এক একটা বাড়ি দেখা যায়।

জং-ধরা লোহার গেট পেরিয়ে দু'ধারে জঙ্গলের মাঝের রাস্তা ধরে গৌরী দালানের দিকে এগোলো। ঠাণ্ডা বাতাসের জোর আগের থেকেও বেড়েছে। একটু উতলা চোখে গৌরী আকাশের দিকে তাকাতে মনে হল ওই দূরের দিকটা আরো যেন কালি মেরে গেছে। অনেকগুলো মেঘ একসঙ্গে জড় হবার জন্য চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে।

সামনের বিশাল বারান্দায় কম করে দু'শ লোক জড়ো হতে পারে। গেল বারে শতখানেক লোক হয়েছিল, এবারে সমর্থকের সংখ্যা আরো বেশি হবে আশা করেছিল কমল চ্যাটার্জী। কিন্তু এখন পর্যন্ত জনা পঞ্চাশেকও হয়নি। আরও লোক আসার সময় অবশ্য পেরিয়ে যায়নি এখনো। অনেকেই দূর থেকে আসে, আকাশের অবস্থা দেখে হয়তো ভরসা করে বেরুতে পারছে না।

এ-সব কৈফিয়তে কমল চ্যাটার্জী আদৌ নরম হবার মানুষ নয়। বিরক্ত বিরক্ত মুখ। অস্ফুট মন্তব্য করেছে, আকাশের অবস্থা দেখে দেশের কাজে বেরুবে সব—চমৎকার! বারান্দার এক মাথায় একটা কাঠের চেয়ার, আর একটা কাঠের টেবিল। সেখানে বসে কমল কাগজ-পত্র ওলটাচ্ছে। গত দু'মাসে কত কাজ এগিয়েছে তার ফিরিস্তি। কাজ বলতে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে খুব সাধারণ মেহনতী মানুষদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ রক্ষা করা, তাদের সুবিধে অসুবিধে সুখ-দুঃখের কথা শোনা, কেউ অসুস্থ বা বিপন্ন শুনলে তার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া, ছোটদের বই-পত্র বিলনো আর পড়ানো, বড়দের দেশের অবস্থা বোঝানো, ইত্যাদি।

দু'মাসের কাজের ফিরিস্তি দেখে কমল চ্যাটার্জী আদৌ খুশি নয় বোঝা যাচ্ছে। আটি-দশটি অল্পবয়সী ছেলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কাজ কেন আরো বেশি এগোয়নি তার সঙ্গত কৈফিয়ৎ দাখিলের চেষ্টা করছে।

দেখতে দেখতে আকাশের অবস্থা যা দাঁড়াল আর কেউ আসবে মনে হয় না। কমলের মতে এখানকার মেহেনতী মানুষগুলো লোক ভালো, কিন্তু তাদের উদ্যম আর উদ্দীপনার বড় অভাব। আর অপেক্ষা না করে যারা এসেছে তাদের নিয়েই মিটিং শুরু করে দিল কমল চ্যাটার্জী। প্রথমে মামুলি বক্তৃতা একটু, তবে বলার গুনে মামুলি মনে হয় না। এই দুনিয়ায় কেউ ছোট নয়, কেউ কাউকে পায়ের নীচে রাখার পরোয়ানা নিয়ে আসেনি। এ যারা স্বীকার করতে চায় না তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাদের একমাত্র দাওয়াই সঙ্ঘবদ্ধ জনতার হাতিয়ার, ইত্যাদি। এ-রকম বক্তৃতা গৌরী এত শুনেছে যে, ইচ্ছে করলে সেও এখন এ-রকম দু'পাঁচ মিনিট বলতে পারে। তাই বক্তৃতার থেকে তার আকাশের দিকে চোখ বেশি।

যারা এসেছে তাদের মধ্যে থেকেই নতুন মেম্বার সংগ্রহ করা হল জনাকতক। তারপর কর্ম-পরিধি বাড়ানো এবং তার প্ল্যান আর প্রোগ্রামের খসড়া করা হল। এর মধ্যেও চমকপ্রদ বৈচিত্র্য কিছু নেই।

চমক এলো অন্য দিক থেকে। আকাশ থেকে। বারকয়েক বিকট গর্জন করে গোটা আকাশটাই বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। ভেঙে পড়তেই থাকল।

দেখতে দেখতে একটা প্রলয় শুরু হয়ে গেল বুঝি। ঝড়ের তাণ্ডব, মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝলক আর প্রবল বৃষ্টি। পাঁচ মিনিটও বারান্দায় তিষ্ঠনো গেলনা। বাতাসে বৃষ্টির ছাঁট তীরের মতো গায়ে বিঁধতে লাগল। এই ঝড়ে মানুষ ছেড়ে বাড়ি ঘরও উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে বুঝি।

পাশের মস্ত হল ঘরটার মধ্যে আশ্রয় নিল সকলে। নীচের এই একটা ঘরও স্থানীয় কর্মীদের দখলে। অবশ্য বিধিবদ্ধ বা আইনগত দখল কিছু নয়। অব্যবহারের দরুন ভিতরে ভ্যাপসা গন্ধ একটা। কিন্তু ঝড়ের দাপটে একটা বই আর অন্য দরজা জানালা খোলার উপায় নেই। তাছাড়া এই ঝড়ে পুরনো দরজা জানালা ভেঙে পড়তেও পারে।

রাতের আগে মিটিং সচরাচর শেষ হয় না, তাই ঘরে তেল-ভরা দুটো হারিকেন মজুত থাকে। দরজা জানলা বন্ধ থাকার দরুন ঘরের ভিতরটা আরো বেশি অন্ধকার। সেই অন্ধকার হাতড়ে লণ্ঠন দুটো বার করা হল, জ্বালা হল। ঘরে একটা মাত্র চৌকি, গৌরীকে সেখানে এনে বসাল ছেলেরা। এ-ধার ওধারে বয়স্কারও কেউ কেউ কেউ বসল। বাদ বাকি সব জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে।

না, স্মরণীয় কালের মধ্যে এমন প্রলয়ঙ্কর ঝড় গৌরী আর দেখেনি। আর কেবলই মনে হচ্ছে ওদের বাড়িটা কত দূরে ঠিক নেই।

অদূরে একখানা মুখের ওপর দু'চোখ থমকালো তার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, আর ওর দিকেই চেয়ে আছে কমল চ্যাটার্জী। হারিকেনের আলোয় ভালো দেখা যাচ্ছে না, তবু গৌরীর মনে হল এত লোকের মধ্যে শুধু ওই একজনের ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস দেখছে। সিগারেট টানতে টানতে সে যেন ওর বিড়ম্বনাটুকু সকৌতুকে উপভোগ করছে। চোখাচোখি হতে ঠোঁটের হাসি আর একটু স্পষ্ট হল।

গৌরী প্রায় রাগ করেই মুখ ঘুরিয়ে নিল।

টানা দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টিরও বিরাম নেই, ঝড়েরও কম্‌তি নেই। তারমধ্যে কড়াক্কড় শব্দে কান ফাটানো আর বুক কাঁপানো বাজ পড়ছে এক একটা, বড় বড় গাছ ভাঙার মড়মড় শব্দও কানে আসছে। বাড়ির এই বিস্তৃত এলাকার মধ্যেই কটা গাছ ভাঙল ঠিক নেই।

দেড় ঘণ্টা বাদে দুর্যোগের ভোল বদলাল একটু। বৃষ্টি কমছে। তো শাঁ-শাঁ বাতাস বাড়ছে, আবার বৃষ্টি বাড়ছে তো বাতাস কমছে। এর মধ্যে ফাঁক বুঝে বুঝে দু'জন চারজন করে লোক চলে যেতে শুরু করল। এখানে আসার উদ্দেশ্য ভুলে নিরাপদে ঘরে ফেরার অধীর প্রতীক্ষা বাকি সকলেরও।

রাত তখন দশটা প্রায়। ওই বড় কাঠের চৌকিটার একধারে গৌরী আর একটু ফাঁক রেখে কমল আর ছেলেদের চারজন মাত্র বসে। এই জায়গারই ছেলে ওরা, বাকি সব চলে গেছে। ওই ছেলে ক'টাই কমল চ্যাটার্জীর অনুরাগী কর্মী। ওদেরও বাড়ি খুব কাছে নয়। কারো আধ মাইল কারো বা মাইলটাক দূরে। বাড়ি যাবার ইচ্ছে, কিন্তু এই অবস্থায় কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। দলের অগ্রজ ভাজনকে জলে ফেলে তারা যায় কি করে।

সিগারেট টানতে টানতে কমল এক একবার গল্প জমাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু গল্প আদৌ জমছে না আর সকলেই আধ বোবা যেন। গৌরী তো বটেই।

যে গাড়িতে চেপে এখানে এসেছিল এই দুর্যোগে সেই আধপুরনো গাড়ি ওদের নিতে আবার আসবে সে-আশা বাতুলে করে। তাছাড়া গাছ-টাছ ভেঙে রাস্তার কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে কে জানে। তবু রাত প্রায় ন'টা পর্যন্ত গৌরী ওই গাড়ির আশায় উন্মুখ হয়েছিল। গাড়ির মালিক ভদ্রলোক তো জানে ওরা এখানে আটকে আছে। সম্ভব হলে আসবে, নিশ্চয় আসবে। কিন্তু ন'টা বেজে যেতে হাল ছেড়েছে। এখন দশটা। মনে হচ্ছে মাঝ রাত।

তবু, এখানেই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই আর। গাড়ির মালিকও এদিকেই কোথাও না কোথাও আটকে আছে, এইটুকু মাত্র ভরসা। দুর্যোগ কমলে মাঝরাতেও যদি আসে গাড়ি তো এখানেই আসবে। তখন কোথায় আবার খুঁজতে বেরুবে ওদের? আর, আসুক না আসুক, কোথায়ই বা যেতে পারে ওরা? দু'দুটো মানুষকে থাকতে দিতে পারে এই ছেলেগুলোর একজনেরও বাড়ি-ঘরের সেই অবস্থা নয়। ওদেরমুখ দেখে মনে হচ্ছে গৌরীর কথা ভেবে ওরা যেন আরো বেশি বিপাকে পড়েছে।

তোড়ে না হোক বৃষ্টি এখনো পড়ছে, শন শন বাতাস দিচ্ছে থেকে থেকে, অন্ধকার ফুঁড়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সেই সঙ্গে বিরামহীন গুড়গুড় মেঘের ডাক।

তবু এরই মধ্যে যে ছেলে দুটোর বাড়ি একটু কাছে, তারা উঠল। বাড়ি থেকে কিছু খাবার সংগ্রহ করা যায় কি না সে চেষ্টায় বেরুল তারা।

ফিরল প্রায় চল্লিশ মিনিট বাদে। কাগজের মোড়কে খানকতক রুটি আর কলাই করা মাটিতে খানিকটা তরকারি। রাস্তার যে অবস্থার কথা শোনাল তারা, মাঝরাতে গাড়ি আসার সম্ভাবনাও নির্মূল।

খাবার নিয়ে ফিরে আসার দশ মিনিটের মধ্যে ওদের চারজনকেই বিদায় করল কমল চ্যাটার্জী। আর কাঁহাতক ধরে রাখা সম্ভব। দলপতির হুকুম মেলা মাত্র ওরা যেন হাঁপ ফেলে বাঁচল। এই দুর্যোগে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত ওদেরও বাপ-মা-বউ অস্থির হয়ে আছে। বয়েস কম হলেও অবিবাহিত কেউ নয়।

অতএব ওদের যেতে বলাই স্বাভাবিক। তবু ওদের চলে যেতে দেখে গৌরীর বুকের তলায় কি এক ত্রাস যেন। জোর করেই ওদের ধরে রাখার আকুতি তার। কিন্তু বাধা দেওয়া দূরে থাক, মুখ দিয়ে একটা শব্দও বার করা গেল না। নীরবে তাকিয়ে ওদের চলে যেতে দেখল শুধু।

রুটির মোড়কটা খুলে আর তরকারীর বাটি দু'জনের মাঝখানে রেখে কমল টান-টান হয়ে বসল। —খাও। মুখখানা সেই থেকে এমন করে আছ যে তাকাতে ভয় করে।...এত চিন্তা ভাবনার কি আছে।

গৌরী সোজাসুজি তাকালো তার দিকে। জবাব দিতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু মুখ বুজে থাকলে আরও অস্বস্তি।—বাড়িতে ভাবছে না?

তা একটু আধটু ভাবছে হয়তো, কিন্তু তারা তো জানে তুমি কোথায় এসেছ, কার সঙ্গে এসেছ। এর চার ভাগের এক ভাগও ঝড় জল যদি ওদিকে হয়ে থাকে তাহলেও তারা ধরে নেবে এই রাতে ফেরা সম্ভব নয়।

নিরুদবিগ্ন মুখে খাওয়ার ব্যাপারে মন দিল কমল চ্যাটার্জী। অনেক কষ্টে গৌরী দু'খানা মাত্র রুটি চিবুল। গলা শুকিয়ে কাঠ, নামতে চায় না। উঠে ঘরের কোণের সুরাই থেকে জল ঢেলে খেয়ে আবার এসে দেয়ালে পিঠ ঠেস দিয়ে চৌকিতে বসল। সামনে এতবড় রাতটা যেন ভারী পাথরের মতো ওর বুকে চেপে বসে আছে। বার বার চেষ্টা করছে সহজ হতে, দুর্যোগকে দুর্যোগ বলেই মেনে নিতে। কিন্তু পারা যাচ্ছে না।

অনুরোধ সত্ত্বেও ও আর খেল না দেখে কমল একাই রুটি সংহারে মন দিল। লোকে খেতে পায় না, তার মধ্যে খাবার ফেলে দেয় কি করে। ছেলেগুলো হয়তো নিজেদের বরাদ্দ আহার থেকে ওদের জন্য একটু সরিয়ে এনেছে। গৌরী দেখছে, এই লোকের অভিদানে যেন অসুবিধে বলে কোনো কথা নেই।

খাওয়া চুকতে বেশ হৃষ্টচিত্তে সিগারেট ধরাতে ধরাতে কমল বলল, যাক জঠর দেবতা ঠাণ্ডা, এখন মুশকিল হয়েছে রাতটা কাটাবার মতো এরপর সিগারেট কোথায় পাব...দু'প্যাকেট এনেছিলাম, দেড় প্যাকেট খতম।

গৌরীর সত্যিই রাগ হচ্ছে, এই বিপাকের মধ্যেও একমাত্র দুর্ভাবনার বিষয় সিগারেট যদি ফুরোয়। এই প্রসঙ্গেই ভ্রূকুটি করে একটা তর্ক জুড়ে দিতে পারলেও সহজ হওয়া যেত। কিন্তু কেন যেন তাও পারা গেল না। চুপচাপ চেয়ে রইল শুধু।

কি দেখছ?...আচ্ছা তুমি কি সত্যিই এত অল্পে ঘাবড়ে যাবার মতো মেয়ে নাকি?

অগত্যা পালটা ধমকের সুরে গৌরী বলল, এর নাম অল্পেতে!

কমল শব্দ করেই হেসে উঠল। সিগারেট টানছে। দু'চোখে কৌতুক উপছে উঠছে। এই চাউনি যেন চোখে মুখে বিঁধছে গৌরীর। তার থেকে লোকটা যদি হড়বড় করে কথা বলে যায় তাহলে স্বস্তি। তাও বলছে না। গৌরীর মনে হল ইচ্ছে করেই বলছে না।

রাত কত তখন, জানে না। শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে দেয়ালে ঠেস দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল গৌরী। হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখেই বুঝি ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করল। পারা গেল না। তারপরেই অবশ নিস্পন্দ একেবারে। স্বপ্ন নয়।.. এক অমোঘ আকর্ষণে লোকটা ওকে নিজের বুকে টেনে নিচ্ছে। এমন হতচকিত যে বাধা দেবারও শক্তি নেই। টেনে নিল। একটা হাত ওর পিঠের ওপর দিয়ে যেন লোহার বেষ্টনে আঁকড়ে ধরে নিজের বুকের সঙ্গে ওর বুকটা পিষে দিতে লাগল। তারপর দুই বাহুতে অর্ধশয়ান অবস্থায় ধরে রেখে মুখের ওপর ঝুঁকল। সিগারেটের গন্ধ মাখা দু'টো পুরু ঠোঁটের নির্মম অধর নিপীড়নে সমস্ত বাধা ছিন্ন-ভিন্ন করে ওকে যেন একটু একটু করে সম্পূর্ণ গ্রাসের আওতায় টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

কি এক অন্তিম মুহূর্ত বুঝি কাছে এগিয়ে আসছে।

গৌরীর সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠল বারকয়েক, তারপর প্রাণপণে সমস্ত লুপ্ত চেতনা একত্র করে এই একবার আর শেষবারের মতোই নিজেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করল সে। বাহুবেষ্টন ছিন্ন করে অধরের আক্রমণ থেকে জোর করে মুখ ঘুরিয়ে নিঁয়ে সবলে তাকে ঠেলে সরিয়ে উঠে বসল। মুহূর্তের

মধ্যে দেয়ালের দিকে সরে গেল। হাঁপাচ্ছে। সমস্ত শরীরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ওটা-নামা করছে। ত্রস্ত শাড়ির আঁচল চকিতে বুকে-গলায় জড়িয়ে নিল। বিহ্বল বিস্ফারিত দু'চোখ লোকটার মুখের ওপর।

...ঈষৎ লালচে মুখ কমল চ্যাটার্জীর হারিকেনের অল্প আলোয় তেল-তেলা দেখাচ্ছে। আর একটা লণ্ঠন কখন নিভিয়ে রাখা হয়েছে গৌরী জানে না। ঠোটের ফাঁকে হাসির আভাস, চেয়ে আছে ওর দিক, প্রচ্ছন্ন কৌতুকে ওর অবস্থাখানাই দেখছে যেন।

গৌরী জানে, আবার যদি এগিয়ে আসে, আবার যদি হাত বাড়িয়ে কাছে টানে, আর ওরা বাধা দেবার শক্তি নেই, সমর্পণের অতলে ডুবে যাওয়া ভিন্ন আর ওর নিষ্কৃতি নেই। মনে হল কাছে এগোবে। মনে হল আবার হাত বাড়াবে।

কিন্তু লোকটা তা করল না। আর এগোল না। আর হাত বাড়াল না। ঠোটের ফাঁকের হাসিটুকু আর একটু স্পষ্ট হল শুধু। ওকে দয়া করল। দয়া যে করল নিজেই জানে যেন।

কি হল, ভয়ানক ঘাবড়ে গেলে যে!

গৌরী জবাব দিল না। আরো সরে দেয়ালে ঠেস দিল আবার। নির্বাক দৃষ্টি তার মুখের ওপর আটকে আছে। নীরব ভৎর্সনার চেষ্টাটুকুও করে উঠতে পারছে না।

ওর চোখে চোখ রেখে শব্দ করেই কমল হাসতে চেষ্টা করল একটু। বলল, এই কাণ্ড করে বসব নিজেও জানতুম না, সিগারেটের প্যাকেটটা বড্ড তাড়াতাড়ি শেষ হতেই কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল... মাথায় দুষ্টুমি চাপল।

গৌরী তেমনি নির্বাক। তেমনি নিষ্পলক চেয়ে আছে।

ভয় করছে?

এবারে জবাব দিল, হ্যাঁ।

আমাকে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা ভীতু তুমি। আর ভয় করতে হবে না, নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে ঘুমোও। নিজে উঠল। যে কাঠের টেবিলটা ঘরে আনা হয়েছিল, সেটা টেনে আবার বাইরে নিয়ে গেল সে। ওতে বসে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেবে।

ঝড়ের তাণ্ডবকমলেও অল্প অল্প বৃষ্টি যে পড়ছে ঘরে বসেই টের পাচ্চে গৌরী। বাইরে জলো বাতাস। কবজির ঘড়িতে দেখল রাত মাত্র আড়াইটে তখন। সকালের আলো ফুটতে আরো ঘণ্টা তিনেক বাকি।...ওই জলো বাতাসে বাকি রাত বাইরে বসে কাটালে মানুষটার অসুখ-বিসুখে পড়া বিচিত্র নয়। গৌরীর মনে হল উঠে গিয়ে ডেকে আনে, ঘরেই থাকতে বলে।

কিন্তু পারা গেল না।...বুকের তলার কাঁপুনি থামেনি এখনো। ঠোট দুটো এখনো জ্বালা জ্বালা করছে। সিগারেটের কটু গন্ধ এখনো নাকে লেগে আছে। একটা পিচ্ছিল যন্ত্রণার স্পর্শ এখনো যেন সর্বাঙ্গে ছেয়ে আছে। অবশ লাগছে এখনো। সিগারেটের অভাব মেটেনি, ডেকে আনলে আবার যদি মাথায় দুষ্টমি চাপে...আর দয়া না-ও করতে পারে। ডেকে আনার অন্য অর্থ করে নিতে পারে।

সাত

এই একটি ঘটনা থেকেই অন্তরঙ্গ মেলা-মেশায় ছেদ পড়ে গেল। গৌরী যেন হঠাৎই একেবারে গুটিয়ে নিল নিজেকে। পরের তিন চার মাসের মধ্যে এক বাড়ি আর ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভিন্ন আর কোথাও দেখা মিলছে না তার। আর তাইতেই কমল চ্যাটার্জী ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। ক্রমে এই অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

গৌরীর এ-পরিবর্তন মা লক্ষ্য করেছেন, জ্যাঠাও করেছেন কিনা জানে না। না, মা ওকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেননি। কিন্তু গৌরীর তবু মনে হয়েছে, তিনি যেন কিছু অনুমান করার চেষ্টায় আছেন।

কোথাও যাবার কথা তুললে গৌরী পড়াশুনার দোহাই দেয়। কিন্তু ওটুকুই একমাত্র কারণ ভাবার মতো নির্বোধ নয় কমল চ্যাটার্জী। বিরক্ত মুখে একদিন সোজাসুজি বলেছিল, মালিহাবাদের ওই রাতের ব্যাপারটা অমন মাথায় চেপে আছে কেন তোমার?

মাথায় চেপে আছে তোমাকে কে বলল?

তুমি নিজেই। মনে হচ্ছে ওই থেকেই আমার চরিত্রটি তোমার একেবারে পাঠ করা হয়ে গেছে।... তোমাকে আগেও বলেছি, সর্বরকমের ক্ষুধার মতো ওঠাও একটা ক্ষুধাই—একে তার থেকে বড় করে দেখার কি আছে!

গৌরী জবাব দেয়নি। তর্ক করেনি। জবাব দিতে পারত, তর্ক করতে পারত। বলতে পারত, তার ক্ষুধা অন্তত পরিস্থিতির সুযোগ নিতে উদ্যত হয়েছিল। বলতে পারত, মেয়েদের নিয়ে কাজে বেরিয়ে তার দলের আর পাঁচজনের এ-রকম ক্ষুধার উদ্রেক হলে অবস্থাখানা কি রকম দাঁড়ায়। কিন্তু কিছু না বলে গৌরী বরং হাসতে চেষ্টা করেছে। কারণ এই মানুষ স্বতন্ত্র ভাবে নিজেকে। অন্যেরাও ভাবে। এই স্বতন্ত্র মানুষের বিবেচনায় ওটা ক্ষুধার থেকে বড় কিছু নয়, গৌরী তাও অবিশ্বাস করে না। বড় হলে সেই রাতে তাকে দয়া করত না।...ওর ভয় দেখে ক্ষুধা দমন করেছে, এই মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।

কমলের অসহিষ্ণুতা বাড়তেই থাকল। ঠিক যে-সময়ে গৌরীকে আরো বেশি দরকার, সে সময়েই আরো দুর্লভ হয়েছে ও। দলীয় কাগজ বার করেছে একটা তারা, নাম ভারত সমাচার। হিন্দী কাগজ। এই কাগজ বার করা নিয়ে আগে অনেক সমারোহ অনেক জল্পনা কল্পনা অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। গৌরীও তখন সক্রিয় অংশ নিয়েছিল তাতে। সেই কাগজের আত্মপ্রকাশ ঘটল। রোজ বিকেলে বেরোয়। তার আগে কমল চ্যাটার্জীর সাঙ্গোপাঙ্গরা এসে বাড়ি চড়াও করেছিল। তাদের দাবি সম্পাদকের স্থলে তারা যে সম্পাদিকা চায় তার নাম গৌরী সিদ্ধান্ত।

এর পিছনে কল-কাঠি কে নেড়েছে গৌরী অনুমান করতে পেরে হাসি মুখেই জোরালো আপত্তি জানিয়ে বলেছে, আমি সম্পাদনার কি জানি!

ওরা বলেছে কিছু জানার দরকার নেই, যা করার তারাই করবে, ওকে শুধু তাদের সঙ্গে থাকতে হবে, ইউনিভার্সিটির পর নিয়মিত আপিসে যেতে হবে।

গৌরী কিছুতে রাজি হয়নি। এম. এ. পাশ করার আগে তার কোন-কিছুর মধ্যে থাকা সম্ভব নয়, এম. এ. পরীক্ষার পরে না-হয় ভাববে। যে যুক্তি দেখিয়েছে সেটা যে সবল নয় তেমন নিজেও জানে। বলেছে, স্কুল ফাইন্যাল থেকে বি. এ. পর্যন্ত ভালো রেজাল্ট করেছি, এম-এতে খারাপ হলে খুব মুশকিলের কথা।

গৌরী ওদেরকে কমল চ্যাটার্জীর নামে কাগজ বার করতে পরামর্শ দিয়েছে। হতাশ হয়েই ফিরে গেছে তারা। তারপরে দলের অন্য একজনের সম্পাদনায় ভারত সমাচার বেরিয়েছে। কমল চ্যাটার্জীর নামে নয়, সে এ-সবের উর্ধ্বে। কাগজ দেখে গৌরীর চক্ষু স্থির। আগাগোড়া বর্তমান সরকারের এবং সরকারি শাসনের কেচ্ছায় ভরাট। শুধু তাই নয়, গণ্যমান্য মানুষের সম্পর্কেও এমন সব চটকদার আর চমকপ্রদ সংবাদ কি করে সংগ্রহ করেছে গৌরীর কাছে সেটাই বিস্ময়।

অবাক হয়ে গৌরী জ্যাঠামণিকে জিজ্ঞাসা করেছে, এ-সব খবর সত্যি নাকি?

জ্যাঠা সাদাসিধে জবাব দিয়েছেন, কিছু সত্য থাকতেও পারে, দোষ ত্রুটি আর কোন্ মানুষের না আছে। তবে বেশির ভাগই অনুমানের পর ঢিল ছুঁড়ে থাকে এ-সব কাগজ। যেটা লাগল সেটা লাগল।

মিথ্যে হলে কেস্ হয়ে যাবে না?

তাও হয়। সেটাই তো নাম করার টোপ ওদের। অনেকেই ওই টোপ গিলে কাদা ঘাঁটতে চায় না। তাতেও এদের সুবিধে হয়, লোকে আধা-সত্যি খবর পুরো সত্যি ভাবে।

আপাতত সম্পাদিকা হতে অস্বীকার করলেও নিজেকে যে একেবারে গুটিয়ে নেবে গৌরী, কমল চ্যাটার্জী তা ভাবেনি। নতুন কাগজ, ইচ্ছে করলেই অনেকভাবে সাহায্য করতে পারে। সেটুকুও করছে না বলে ক্ষোভ তার।

সিক্সথ ইয়ারের গোড়ার দিক সেটা। গৌরী সত্যিসত্যি পড়াশুনায় জোর দিয়েছে। ফার্স্টক্লাস না পেলে এর পর মুচকি হাসির লোক আছে। ও দুর্লভ হয়ে উঠেছে বলেই হঠাৎ এক সন্ধ্যায় এসে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল কমল চ্যাটার্জী। এতদিনের মধ্যে এই প্রথম সরাসরি প্রস্তাব।

...আর এই থেকেই ছোট-খাট একটু বিচ্ছেদের সূচনা। এ সময় এমন প্রস্তাবের জন্য গৌরী একটুও প্রস্তুত ছিল না।

এসেই পলকা গাম্ভীর্যে কমল বলল, মাকে ডাকো, খুব সীরিয়াস কথা আছে তাঁর সঙ্গে।

মুখের দিকে খানিক থেকে সীরিয়াস কথার একটু আঁচ পেতে চেষ্টা করল গৌরী। পেল না।—মা তো খানিক আগে গাড়ি নিয়ে বেরুলেন দেখলাম।...কি ব্যাপার?

খাওয়া সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজতে গুঁজতে হেসেই জবাব দিল, ব্যাপার সাংঘাতিক। বিয়ে—।

গৌরী হঠাৎই থতমত খেল একটু। তারপর বুঝল। তবু অবাক হবার মতো করেই জিজ্ঞাসা করল, কার?

বেশ আয়েস করে সোফায় বসল কমল।—তোমার আর আমার। মানে তোমার সঙ্গে আমার।

গৌরীর দু'চোখ তার মুখের ওপর থমকে আছে। মানুষটার এই স্পষ্টতা আজ কেন যেন খুব অকৃত্রিম মনে হল না।—কবে?

হাতে ধরে টেনে পাশে বসিয়ে দিল ওকে।—আজ হলে আজ, কাল হলে কাল, মোট কথা আর দেরি নয়।

গৌরী চেয়ে আছে। দু'চোখে কৌতুকের আভাস। ঠোটের ফাঁকে হাসিও ঝরল একটু।—এত তাড়া কেন, দোকানে আজকাল সিগারেট পাওয়া যাচ্ছে না?

প্রথম দুর্বোধ্য লাগল। তারপরেই হা হা শব্দে হেসে উঠল কমল। মালিহাবাদে সেই রাতের ঘটনা মনে পড়েছে। ...ও বলেছিল সিগারেটের প্যাকেটটা শেষ হতে কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল, মাথায় দুষ্টুমি চাপল।

হাসি থামিয়ে কমল বলল, সিগারেট পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তোমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। যাক, তোমার আপত্তি নেই তো?

ভিতরে ভিতরে গৌরী বিড়ম্বনা বোধ করছে। সেটুকু গোপন করার তাগিদেই হাসছে অল্প অল্প। যে চিন্তাটা হঠাৎ মাথায় এসেছে সেটা প্রকাশ করলে তার প্রতিক্রিয়া কি-রকম হতে পারে ভেবে নিল। জবাব এড়িয়ে একটু বাদে বেশ হালকা সুরেই বলল, আচ্ছা একটা কথা আমার মাঝে মাঝে মনে হয়। ধরো বিয়েটা হয়েই গেল।...তারপর?

প্রশ্নের তাৎপর্য চট করে ধরতে পারেনি হয়তো।...কিংবা পেরেছে বলেই চোখে মুখে এই পল্‌কা বিস্ময়। পাল্টা যে প্রশ্ন করে বসল, শুনে গৌরীর মুখ লাল। ঘাবড়ে যাবার মতো করেই লোকটা বলে উঠল, কি তারপর? তারপরেও মাথায় দুষ্টুমি চাপলে তুমি কি সে রাতের মতো আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে নাকি!

নিজেকে সংযমে বেঁধে গৌরী বলল, আমি জিজ্ঞেস করছি বিয়ের পরে তুমি তোমার এই সব কাজ-কর্ম নিয়ে থাকবে, আর আমি যাহোক একটা চাকরি-টাকরি করব?

নতুন সিগারেট ধরিয়ে ধরিয়ে জোরেই মাথা ঝাঁকালো।—না, ও চাকরি-টাকরি আমি পছন্দ করি না।

তাহলে? তোমার ভাইদের সঙ্গে তোমাদের ওষুধের ব্যবসায় লেগে যাব?

প্রশ্ন শুনে কমল অবাক যেন। তারপর ঈষৎ বিরক্ত।—কি তোমার মাথায় ঢুকেছে বুঝতে পারছি না, ওষুধের ব্যবসায় লাগতে তোমাকে কে বলেছে, তোমার আর কাজ নেই?

কি কাজ?

আমার সঙ্গেই তো কত কাজ!

ঠোঁটের হাসিটুকু আবারও চেষ্টা করে ধরেই রাখল গৌরী। চুপচাপ চেয়ে রইল একটু, তারপর বলল, তার মানে দু'জনেই আমরা এই কাজ করে বেড়াব, আর খেটেখুটে আমাদের সব প্রয়োজন মেটাবে তোমার ভাইয়েরা?

ওই বিরক্তির চিহ্ন আরো সুস্পষ্ট। এই গোছের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ভাবেনি হয়তো। গলার স্বর একটু চড়িয়েই জবাব দিল, তুমি এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাও কেন বুঝি না। তাই যদি হয়, কারো দয়া তো নিচ্ছি না, ওই দোকানের আমিও একজন মালিক।

ঠোঁটের হাসিটুকু আর ধরে রাখা গেল না। তবু নরম সুরেই গৌরী বলল, নিষ্ক্রিয় মালিকানা তোমার চক্ষুশূল জানতাম।...যাক, বিয়ের জন্যে এত তাড়া কেন, আমি পাশে না থাকলে তোমার কাজের অসুবিধে হচ্ছে?

কমল গম্ভীর। যে-ভাবেই হোক এই মেয়ে যেন অনেকখানি কোণ-ঠাসা করে ফেলেছে তাকে। সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশপটে গোঁজার বদলে বাইরে ছুঁড়ল। বেশ স্পষ্ট করেই জবাব দিল, হ্যাঁ।

সহজ নির্লিপ্ত মুখ গৌরীর, যেন নিগূঢ় কিছু একটা আলোচনা করছে।—ধরো, বিয়ের পরে তোমার ওই কাজের মধ্যে যদি আমাকে না পাও তাহলে?

না পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তার মানে তোমার কাজের থেকে বিয়েটাকে তুমি আলাদা করে দেখতে পারছ না?

মুখ তেমনি গম্ভীর কমল চ্যাটার্জীর। আবার একটা সিগারেট ধরানো দরকার হল। তারপর মুখ তুলে সোজাসুজি চেয়ে রইল খানিক। বলল, তুমি কি বলতে চাইছ আমার বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।...কিন্তু এতদিন বাদে তুমি এই প্রশ্ন তুলতে পারো সেটা মনে হয়নি। যাক্ শোনো, এটা আমার কাজ নয়, তোমার আমার সকলেরই কাজ। মিথ্যে বলা আমার স্বভাব নয়, তুমি যা বলতে চাইছ সেটা অনেকখানি সত্যি। শুধু বিয়ে কেন, এ-কাজের থেকে অনেক কিছুই আমি আলাদা করে দেখি না।

কিন্তু আমার তাতে আপত্তি থাকতে পারে। ঠিক তেমনি স্পষ্ট করে গৌরী বলল, তোমার এ কথা শোনার পর আমাকে একটু ভাবতে হবে।

কথাটা এখন শুনলেও এ তোমার আগে জানা ছিল না বলতে চাও?

...ঠিক বলতে পারব না, এক আধ সময় মনে হয়েছে বটে, তখন ভেবেছি পরে চিন্তা করা যাবে। আজ তুমি স্পষ্ট করে কথাটা তুললে বলেই বললাম।

স্থির হয়ে বসে থাকাও সম্ভব হল না। সোফা ছেড়ে উঠে কমল ঘরের মধ্যেই পায়চারি করল একবার। তারপর বেশ কাছে এসে দাঁড়ালো আবার। হাসতেও চেষ্টা করলো একটু, জিজ্ঞাসা করল, তোমার রকমসকম যা দেখছি, ভেবে আমাকে বাতিল করতেও পারো বোধহয়?

গৌরী হাসি মুখেই জবাব দিল, তোমার মেজাজ বিগড়চ্ছে। ...না, অতটা পারা খুব সহজ হবে না, তবে তার আগে তোমার সঙ্গে খোলাখুলি একটু বোঝাপড়া করে নেওয়া দরকার হবে।

কমল চেয়ে আছে। নতুন করে কিছু দেখছে যেন। গলার স্বরে ঈষৎ বিদ্রূপের আভাস।—তা ভাবতে কি-রকম সময় লাগবে মনে হয়, তোমার এম. এ. পরীক্ষা পর্যন্ত বোধহয়?

হ্যাঁ।

কিন্তু তার এখনো বছরখানেক দেরি।

গৌরী মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। মানুষটার ভিতরে অসহিষ্ণুতা অনুভব করতে পারছে। জবাব দিল, রাগ না করো তো আমিও আর একটু স্পষ্ট করে বলি। কাজের সুবিধের জন্যে বিয়ে...তোমার কাছে ওটা তাই খুব বড় ব্যাপার কিছু নয়। আগের মতো আমাকে পাশে পেলে আরো ক'টা বছর চোখ বুজে কাটিয়ে দিতে পারতে বোধহয়। পাচ্ছে না তাই তোমার এত তাড়া। এতটা জেনে একটা মেয়ের প্রস্তুত হবার পক্ষে এক বছর খুব বেশি সময় নয় বোধহয়।

নীরব মুহূর্ত গোটাকতক। আপাতত আর কথা কিছু থাকতে পারে না। কমলের দু' চোখ ওর মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল খানিক তারপর আস্তে আস্তে বুকের দিকে নেমে এলো। শেষে আবার মুখের ওপর উঠে এসে থামল।—আচ্ছা, গুড্ নাইট।

চলে গেল।

সেদিকে চেয়ে গৌরী বসে রইল চুপচাপ।

গৌরীর মনে হল ওই লোকের দু' চোখের নামা-ওঠার ফাঁকে ও নিজেও কিছু দেখে উঠল।...একদিন এক দুর্যোগের রাতে সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয় পেয়েও সে ওকে দয়া করেছিল, ওই দুটো চোখে সেই খেদটুকুই যেন আজ স্পষ্ট দেখতে পেল গৌরী সিদ্ধান্ত।

চুপচাপ বাইরের ঘরেই বসেছিল তখনো। ভাবছিল কিছু। নিজের সত্যিকারের সমস্যাটা কি তাই ভাবতে চেষ্টা করছিল। ...ধরা যাক, কমল চ্যাটার্জী পাঁচশ সাতশ বা হাজার টাকার মাইনের চাকরি করে। তাহলেই কি গৌরীর সমস্ত সমস্যা ঘুচে যেত? চাকরি করা বা না করার তফাতটুকুই শুধু তফাত, আর কিছু না? মানুষটাকে শুধু কি এই জন্যেই আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দিল আজ? নিজেকে এই যোগ্যতার বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাতেও ভালো লাগছে না ওর।

সচকিত একটু। মা পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকলেন। কখন ফিরেছেন টের পায়নি। ওদের দেখে ও-পাশের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছেন নিশ্চয়। মায়ের দিকে এক নজর তাকিয়েই গৌরীর কেমন মনে হল বাইরে দাঁড়িয়ে মা ওদের কথাবার্তা শুনেছেন। তাঁর উতলা মুখ দেখেই বিরক্ত বোধ করল না।

হ্যাঁ রে, কমল যেন রাগ করে চলে গেল মনে হল?

জবাব না দিয়ে গৌরী জিজ্ঞাসা করল, কখন এলে?

এই তো খানিকক্ষণ।

রাগ করে গেল কিনা বুঝতেই তো পারছ। ...সব কথা শুনেছ?

বিব্রত মুখ করে মা বললেন, কি জানি বাপু, ছেলের রকম-সকম বুঝি না। ...তুই যা বলেছিস সত্যি কথাই বলেছিস, ওর ভেবে দেখা উচিত।

গৌরীর হঠাৎ হাসি পেল কেন জানে না। জিজ্ঞাসা করল, ভেবে না দেখলে আমারও ওকে বাতিল করা উচিত বলছ?

...তা না, তুই শক্ত থাকলে একটা কিছু করবেই, এ-ভাবে আর কতকাল কাটাবে?

কিন্তু ধরো, এই ভাবেই যদি কাটায়, তাহলে কি করবে? ...সুলতা মাসিকে যে কথা দিয়েছিলে ফিরিয়ে নিতে পারবে?

শোনামাত্র মা ফাঁপরে পড়লেন যেন।—কথা আবার কি দিয়েছিলাম ...আসল কথা ছিল ছেলেটা যদি মানুষ হয়, এমন বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়ালে কথা আর কি!

গৌরী সরাসরি মায়ের মুখখানা নিরীক্ষণ করে দেখছে।

একটু ক্ষোভের সঙ্গেই তিনি আবার বললেন, সে সব কথা তুই জানলি কি করে, আর সেটা তোকে ধরে বসে থাকতেই বা কে বলেছে! তুই নিজে বিচার বিবেচনা নিজে করবি। ...আমার এখনো মনে হয় ছেলেটা ভালো, ওকে শক্ত হাতে ধরে ফেরাতে হবে। ফেরে যদি খুশি হবো, না ফিরলে তোর দোষ কি!

মা চলে গেলেন। গৌরী আবারও ভাবতে লাগল। ...সুলতা মাসিকে কথা দেওয়া হয়েছিল বলেই কি ও এতটা এগিয়েছে? ওই লোকের নিজস্ব কোন আকর্ষণ ছিল না?

ছিল এবং এখনো আছে যে সে সত্যটা নিজের কাছেও অস্বীকার করতে পারল না।

এর দিন পনের বাদে বেশ একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে গেল।

বিভুরঞ্জন সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জ্যাঠামণির অনেকটা পথ হাঁটা অভ্যেস রোজ। সেদিন সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মাংকি ব্রিজের দিকে হাঁটছিলেন। জোরে ঘোড়া ছুটে আসার শব্দ কানে আসতে ফিরে দেখেন একটা টংগা খুব জোরে ছুটে আসছে। এত জোরে ছোটাটা কেমন অস্বাভাবিক লাগল তাঁর। জ্যাঠামণি তখন মাংকি ব্রিজের ওপর। ব্রিজটার রাস্তা একটু উঁচুতে বলে হোক বা ব্রিজের দু'দিকে উঁচু রেলিং নেই বলেই হোক, সেখান দিয়ে যেত গিয়ে টংগার গতি একটু শিথিল হল।

বচাইয়ে! বচাইয়ে!

টংগার ভিতর থেকে আচমকা রমণী কণ্ঠের আর্তনাদ। জ্যাঠামণি আর সঙ্গের ভদ্রলোক চমকে ঘুরে দাঁড়ালেন। টংগাটা তখন মাত্র হাত দশেক তফাতে। মুহূর্তের মধ্যে জ্যাঠামণি সেই তাগড়াই ঘোড়ার লাগামটা ধরে ঝুলে পড়লেন। হঠাৎ বাধা পেয়ে আর হয়তো বা ভয় পেয়ে ঘোড়াটা সামনের দু'পা তুলে দাঁড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল। আর সঙ্গে সঙ্গে সহিসের ছপাটির একটা ঘা এসে পড়ল জ্যাঠামণির মুখের ওপর।

সেই মুহূর্তে টংগার ভিতর থেকে একটা মেয়ে মাংকি ব্রিজের ওপর লাফিয়ে পড়ল। যে-ভাবে পড়ল হাতে-পা ভাঙতে পারত! টংগা থেকে তক্ষুনি আর একটা লোক নেমে এসে তাকে ধরতে এলো। কিন্তু লোকটা বদ্ধ মাতাল হয়েছিল। জ্যাঠামণির হাতের একটা ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ল। জ্যাঠামণি মেয়েটিকে তুলতে গেলেন। সেই ফাঁকে লোকটা আবার টংগায় উঠে চম্পট। টংগায় আরো লোক ছিল মনে হয়।

মেয়েটির বেশ আঘাত লেগেছে। তার বয়স কত হবে জ্যাঠামণি ঠাওর করতে পারেননি। পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে হতে পারে। অপূর্ব সুন্দরী। এমন সুন্দর চেহারার মেয়ে লক্ষ্ণৌ শহরেও বেশি দেখা যায় না। মেয়েটি রাগে কাঁপছিল কি ভয়ে কাঁপছিল বোঝা গেল না। জ্যাঠামণিকে অনুরোধ করল, একটা রিকশায় তুলে দিতে। তার মুখ থেকে যেটুকু জানা গেল তার সারমর্ম, মেয়েটি এক জায়গায় কাজ করে, সেদিন মায়ের অসুখ দেখেও কাজে আসতে হয়েছিল, মায়ের মরণাপন্ন অবস্থা জানিয়ে ছোট বোন একটা টংগা পাঠিয়ে দেয় দিদিকে নিয়ে যাবার জন্য। কোন কিছু চিন্তা না করেই মেয়েটি টংগায় উঠে বসে, খানিকটা ফাঁকায় আসতে এক জায়গায় টংগাটা থামে এবং দু'দুটো পরিচিত শয়তান লোক টংগায় উঠে বসে। মেয়েটি তখন বিপদ বুঝতে পারে। তারপর যা ঘটেছে তাই।

একটি রিকশা ডেকে জ্যাঠামণি মেয়েটিকে তুললেন। তাকে নিয়ে থানায় আসতে চাইলেন। মেয়েটি হাঁ না কিছু বলল না। রিকশায় ওঠার আগে জ্যাঠামণির পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। রিকশাঅলাকে জ্যাঠামণি সঙ্গে সঙ্গে আসতে বললেন। আর একটা রিকশা পেলে তাঁরা উঠবেন এবং থানায় যাবেন।

আর একটা রিকশায় ওঠার ফাঁকে ওই রিকশাটা খানিক এগিয়ে গেল। এদিকটায় আসতে একে লোকের ভিড় তার ওপর রাত্রি। সামনের রিকশার দিকে সঠিক নজর রাখা যাচ্ছিল না। এক সময় কেমন করে যেন চোখের আড়াল হয়ে গেল সেটা। জ্যাঠামণি ধরে নিলেন সোজা থানায় গেছে ওই রিকশা। কিন্তু থানায় এসে দেখেন ওই রিকশা বা মেয়েটির পাত্তা নেই।

থানা অফিসারকে ঘটনাটা জানালেন জ্যাঠামণি। আর সেই সঙ্গে যে তথ্যটি জানালেন, সেইটুকুই রহস্য। ওই মাতাল লোকটাকে তিনি একাধিক দিন দেখেছেন কোথাও। যতদূর মনে পড়ে কমল চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখেছেন। অতএব পুলিশ তার সঙ্গে দেখা করলে হয়তো কিছু হদিস মিলতে পারে।

সব শুনে গৌরী হতভম্ব। জ্যাঠামণি জোর দিয়েই বললেন, ওই লোকটার গাড়িতে কমল চ্যাটার্জীকে একাধিক দিন দেখেছেন তিনি। লোকটা গুজরাটি এবং পয়সাঅলা।

সঙ্গে সঙ্গে অনুপমা ভার্গবের দিদি বিমলা ভার্গবের কথা মনে পড়ল গৌরীর। গোমতীর ধারে বসে কমল একদিন বলছিল, পয়সাঅলা একজন গুজরাটির বিশেষ চোখ আছে অনুপমার দিদির দিকে। কিন্তু গৌরী এও শুনেছে, ওই দিদিটি সর্বদা বোরখা পরে বেরুলেও যতটুকু বোঝা যায় তার গায়ের রং দিব্বি কালো। অমন ফর্সা বোনের দিদি অমন কালো কি করে কমল চ্যাটার্জী সেই বিস্ময়ও প্রকাশ করেছিল।

যাই হোক, গৌরী ধরে নিল, সেই পাজি লোকটাই অন্য কোনো রূপসী মেয়ের জন্য ওই ফাঁদ পেতেছিল। ওই রকম লোকের সঙ্গে কমল চ্যাটার্জীর যোগাযোগটাও গৌরীর কাছে অস্বস্তির কারণ একটু।

পরদিন ভারত সমাচার খুলে গৌরী হাসবে কি রাগবে, ভেবে পেল না! প্রথম পাতায় বড় বড় শিরোনামায় লেখা, বাষট্টি বছরের যুবকের কেরামতি! তারপর রসিয়ে ঘটনা বিস্তার। লিখেছে, ভারত সমাচার তৎপর হলে অচিরে সম্ভবত সেই দুজনের নাম ধামও প্রকাশ করে দিতে পারবে—সমাচার পাঠকেরা সেই আশা করতে পারেন। লিখেছে রূপসী রমণীটির নাম ধাম অনিবার্য কারণে অপ্রকাশিত

থাকল। শেষে উদ্ধার কর্তা সম্পর্কে বিবরণ। নাম বিভূরঞ্জন সিদ্ধান্ত—শাসক গোষ্ঠীর নেতা, স্থানীয় নিঃস্বার্থ কর্মী। সবশেষে সঠিক মন্তব্য, রূপসী রমণীটির ত্রাণকর্তাটি আজও অবিবাহিত এবং রমণীটিও স্বামী বিরহিতা। এমতাবস্থায় মহান ভদ্রলোকের উদ্ধার কার্যটি এখনো যদি সুসম্পূর্ণ হয়ে না থাকে, ভারত সমাচার তার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণে প্রস্তুত!

মা পর্যন্ত কাগজখানা লুকিয়ে পড়েছেন এবং হেসেছেন। গৌরীর খটকা লেগেছে কেমন, দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা, অনুপমার দিদি বিমলা ভার্গব দেখতে কেমন?

দাদা বলেছে, মুখ দেখিনি, তবে গায়ের রং কালো।

নিশ্চিন্ত হয়ে গৌরী ছোকনকে দিয়ে সেই বিকেলেই কমলকে একবার দেখা করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। এতদিনের মধ্যে একবারও আসেনি। গৌরীর মেজাজ তার ফলে অনেকটা নরম। ছোকন এসে জানিয়েছে, কমল সাহেব সময় পেলে আসবেন বলছেন।

গৌরী জানে সময় পাবে এবং আসবে! এলো। গৌরী নীচেই ছিল। দেখামাত্র রাগত মুখ করে বলল, কেউ কোনো ভালো কাজ করলেও তোমরা এমন নোঙরা ছিটোবে, অ্যাঁ?

কমলের ঠাণ্ডা মুখ।—কি হল আবার?

কি হল! এই রকম করে এই ভাষায় কেউ লেখে?

কমল হাসল, একটু আধটু রসকস সকলেই পছন্দ করে! ...যাক, তলব কেন?

এই জন্যেই। ওই শয়তানটাকে তুমি চেনো?

চিনি। রূপসী মেয়েটিকেও চিনলাম। আজ কাগজের আপিসে এসেছিল শুনলাম। সম্পাদককে শাসিয়ে গেছে ও-রকম লেখার জন্য তাকে চাবুক মারা উচিত।

গৌরী খুশি মুখে বলে উঠল, ঠিক বলেছে, মেয়েটি সত্যিকারের ভালো বলতে হবে। যাক ওই শয়তানটাকে চেনো তো পুলিশের কাছে নাম বলে দিচ্ছ না কেন?

নির্লিপ্ত মুখ করে কমল বলল, নামটা গোপন রাখলে আমাদের কিছু প্রাপ্তি যোগ ঘটতে পারে, দেখা যাক—

গৌরী রেগে বলে, তার মানে তোমরা ব্ল্যাকমেল করবে?

ওই লোকের কাছে টাকা আগেও পেয়েছি, এখন কিছু বেশি আশা করছি—হাঁ ব্ল্যাকমেলও বলতে পারো...তবে মেয়েটি নিজেই কেন নাম বলছে না সেটা ভেবে দেখলে আমাদের অপরাধ অত গুরুতর মনে হবে না।

সেই প্রথম চা না খেয়েই চলে গেল কমল চ্যাটার্জি।

হ্যাঁ, দুর্জনকে শায়েস্তা করার জন্য সেই রূপসী মেয়েই এগিয়ে আসছে না কেন, এও ভাবার মতো কথা বটে।

দিন কয়েক না যেতে কৌতূহলের অবসান। দাদার মুখে যে সমাচার শুনল গৌরী, বিস্ময়ের অন্ত নেই। ...কোন সত্যিকারের রূপসী মেয়ে বোরখার আড়ালে কুরূপার সাজে ঘুরে বেড়ায় এমন আশ্চর্য কথা আর কি কখনো শুনেছে?

অনুপমা ভার্গবের দিদি বিমলা ভার্গব। বোরখার আড়ালে কালো কুৎসিত সাজে বাইরে বেরোয় সে-ই। যে-রমণীটির দিকে কমল চ্যাটার্জীর এক পয়সাঅলা গুজরাটি বন্ধুর অনেক দিনের চোখ। গৌরী অনুপমার সেই দিদিকে আজও দেখেনি, কিন্তু দাদার মুখে যেটুকু শুনেছে, অবাক হবার মতোই দিদিটি অনুপমার থেকে অনেক বড়, বছর তিরিশ হবে বয়েস। দাদার মতে ছোট বোনের থেকেও সুন্দরী সে এবং মেরে কেটে একুশ বাইশের বেশি বয়েস কেউ বলবে না। দাদা বলে, আগুনের ফুলকির মতো মেয়ে একখানা। নিজের চোখে দেখে এসেছে। ছোট বোনের ডাক্তারি পড়ার সব খরচ সে-ই চালাচ্ছে। বিমলা ভার্গব লেখাপড়া জানে না, জানে হাতের কাজ, চিকনের কাজ, জরির কাজ। এ-কাজে নিপুণ শিল্পী সে। অকালে স্বামী মারা যায়, তার কিছু টাকা-কড়িও পেয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিন্তে দিন যাপনের মতো যথেষ্ট নয় সে টাকা।

তাই রোজগারের চেষ্টায় নামতে হয়েছে। কিন্তু এই রূপ আর এই যৌবন প্রধান বাধা। পায়ে পায়ে বিপদ। তাই মাথা খাটিয়ে নিরাপত্তার এক বিচিত্র উপায় বার করেছে বিমলা ভার্গব। বোরখা পরার অভ্যেস আগেই ছিল, সমস্যা দুটো হাত আর দু'খানা পা নিয়ে। বাইরে বেরুবার আগে ওই হাতের খানিকটা আর পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সে নিখুঁতভাবে শামলা-কালো রঙে পেন্ট করে নেয়। তারপর আপাদমস্তক কালো বোরখা চাপিয়ে বেরোয়। শুধু দু'খানা হাত আর পায়ের নীচের অংশ দেখলে সুন্দর ছেড়ে লোকের বরং কুৎসিতই মনে হবে।

তার কাজ দেখে ব্যবসায়ীরা খাতির করে তাকে। ডেকে ডেকে কাজ দেয়। আসল রমণীটি কেমন আজও তারা কেউ কল্পনা করতে পারে না। কাজের চাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে বিমাল ভার্গবের, দিবা-রাত্র ফুরসত মেলে না।

দুর্জনের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও কেন আত্মপ্রকাশ করেনি বিমলা ভার্গব সেটা এরপর সহজ অনুমানসাপেক্ষ। রূপের খবর প্রচার হলে, তার নিষ্কলুষ মেহনতী উপার্জনের পথ ব্যাহত হবে। এ-সবই অনুপমা খুব সংগোপনে দাদাকে বলেছে। আর দাদাও একমাত্র গৌরীকে না বলে পারেনি।

দাদার তো বটেই, গৌরীর কাছেও রমণীটি সত্যিকারের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠল। তক্ষুনি ছুটে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করছিল তাকে। এম. এ. পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই গৌরী তার সঙ্গে আলাপ করবে।

আট

বাড়ির সামনে ঢাক-ঢোল ক্যানেস্তারা বাজিয়ে আর বিচ্ছিরি হৈ হল্লোড় করে ওরা জ্যাঠামণিকে রীতিমতো অপমানই করে গেল। যারা এসেছিল তাদের অনেকেরই মুখ চেনা। মোটামুটি শিক্ষিত সকলেই। এদের উল্লাসের এই নগ্ন চিত্রটা গৌরীর কল্পনার বাইরে। নেচে কুঁদে খিস্তি খেউর করে বাতাস সুদ্ধ যেন বিষিয়ে রেখে গেল। না, ওদের সঙ্গে কমল চ্যাটার্জী ছিল না। থাকবে না জানা কথাই। কিন্তু তার প্রশ্রয় ভিন্ন এ-রকমটা হতে পারে গৌরী বিশ্বাস করে না।

মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের ব্যাপারটা মর্যাদার লড়াই গোছের হয়ে উঠেছিল। ফলে বেশ একটু হালকা উত্তেজনাও দেখা গেছল। তার মধ্যে আর যাই থাক নোঙরামির লেশমাত্র ছিল না। দিন তিনেক আগেও গৌরী জ্যাঠামণিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমরা হারবে না জিতবে?

জ্যাঠামণি হেসেই ফিরে প্রশ্ন করেছিলেন, তোর মুখখানা দেখে হারতেই তো ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমার ইচ্ছেয় তো কাজ হবে না, জিতলে কি তোর খুব বেশি দুঃখ হবে?

পরে বলেছিলেন, আরো বছর কতক যাক, হারা-জেতাটা তখন চিন্তার বিষয় হয়ে উঠতে পারে—লক্ষণ খুব ভালো না, ঠিকই। অর্থাৎ জেতার ব্যাপারে জ্যাঠামণির একটুও সন্দেহ ছিল না।

গত সন্ধ্যায় ভোটের ফল বেরিয়েছে। অপ্রত্যাশিতই বটে। জ্যাঠামণিদের ক্যান্ডিডেট হেরেছে। মর্যাদার লড়াইয়ে নগরের মানুষ উল্টো রায় দিয়েছে। ভারত সমাচারে বিজিত দলের উদ্দেশ্যে হুল ফোটানো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছড়াছড়ি। গৌরীর তাই দেখেই রাগ হয়েছিল। তার ওপর সকালে এই।

না, রাজনীতির ব্যাপারে গৌরীর তেমন কিছু মতের পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ, কমল চ্যাটার্জীর মতবাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেনি। তার মতবাদের ধারের দিকটা বরাবরই প্রভাব বিস্তার করেছে মনের ওপর। ফলাফল দেখে এই মতবাদের ছটা বরং আরো উজ্জ্বল মনে হয়েছিল। জিতেছে শুনে অপ্রত্যাশিত আনন্দে হেসেই উঠেছিল। আর তক্ষুনি জ্যাঠামণির ঘরের দিক ছুটেছিল। কিন্তু তিনি তখন বাড়ি ছিলেন না।

আজকের এই ব্যাপারটা একেবারে নোঙরামি মনে হল ওর। জিতেছে বলে ওদের বরং ঢের ঢের বেশি উদার হওয়া উচিত ছিল। তার বদলে কিনা এ রকম অসভ্যতা। হৈ-চৈ করে ওরা চলে যেতে পায়ে পায়ে গৌরী জ্যাঠামণির কাছ এসে দাঁড়াল।

কিন্তু জ্যাঠামণির হাবভাবে রাগের লেশ মাত্র নেই। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, খুব আনন্দ হয়েছে তো?

আনন্দ হয়েছিল বলেই যেন গৌরীর লজ্জা এখন। জবাব দিল, হ্যাঁ হয়েছে। কিন্তু তা বলে এ-রকম ব্যবহার করবে ওরা?

গায়ে না মেখে জ্যাঠামণি বললেন, বেশি আনন্দ হলে ছেলে-ছোকরারা ওরকম একটু-আধটু করেই থাক। ...জেতাটা অভ্যস্ত হয়নি তো এখনো, হলে এতটা করত না। যাক, কমল আসছে কখন, ওকে কন্‌গ্র্যাচুলেট করতে হবে। আসলে ওরই জিত।

গৌরী সে কথার জবাব দিল না। কমল চ্যাটার্জীরই জিত সত্যি কথা, আর এদিকে জ্যাঠামণির হার। কি ভেবে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা হারবে একটুও আশা করোনি না?

জ্যাঠামণি অস্বীকার করলেন না। এরকম ফলাফল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতই বটে।—না।...আমি ওদের বলে দিয়েছি লক্ষণ ভালো নয়, এই ছোট্ট ব্যাপার থেকে যেন শিক্ষা নেয়, যেন নিজেদের গলদ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে। এতকাল চোখ বুজে নিশ্চিন্ত থাকার ফল...।

দাদা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। ইদানীং প্রেমে এমন হাবুডুবু, নিজের পেশা নিয়েও তেমন মাথা ঘামায় কিনা সন্দেহ। সেদিনও জ্যাঠামণি তাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, সন্ধ্যার পর তোর চেম্বারে গিয়ে তালাবন্ধ দেখলাম কেন রে? তবু এই নির্বাচনে একটু উৎসুক দেখা গেছল দাদাটিকে। সেদিনই তার মুখে একটা খবর শুনল গৌরী। কমলের প্রশংসার ছলে দাদা বলল, লোকটার বাহাদুরী আছে বলতে হবে। বড়াই করে বলত, ঘায়েল করবে, সেই ঘায়েল করেই ছাড়াল। একটু থেমে হাসি চেপে আবার বলেছে, তবে ওদের এই জেতার পিছনে একটি খুব সুন্দরী মহিলার কৃতিত্ব আছে। সে-রকম করে কাজে লাগাতে পারলে একটি মাত্র সুন্দরী রমণী দুনিয়ায় অনেক কাণ্ড ঘটাতে পারে। কমল চ্যাটার্জীর বাহাদুরী এইখানে যে তেমনি একটি অস্ত্র এখন সম্পূর্ণ বশ তার।

দাদাকে এই গোছের দার্শনিক হয়ে উঠতে দেখে গৌরী অবাক।—কে, তোমার অনুপমা ভার্গব নয় তো?

চাপা আনন্দে দাদা ঠোঁট উল্টে দিয়েছে, হুঃ। সে আমার মতোই পলিটিক্স বোঝে।

তাহলে?

জবাবের অপেক্ষা করতে হল না। তক্ষুনি নিজেরই মনে হল আর কে হতে পারে। উৎসুক নেত্রে তাকালো দাদার দিকে। জবাব লেখাই আছে যেন।—বিমলা ভার্গব?

মুচকি হেসে দাদা মাথা নাড়ল, তাই। বলল, মহিলা এবারে বোরখা খুলে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারের কাজ চালিয়েছে, কমলের সঙ্গে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরছে। শাসন বদল হওয়া কত দরকার সেটা কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, এমন এক রূপসী মহিলা কি চায় সেটা সকলেই বুঝেছি।

কিন্তু এ-হেন রমণীর সন্ধান কমল চ্যাটার্জী পেল কি করে বা এ-ভাবে তাকে বশীভূত করলে কি করে, সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার গৌরীর কাছে আর তার দাদার কাছে। দাদা বলছে, কমল চ্যাটার্জী এভাবে কলকাঠি কি করে ঘোরালো অনুপমাও জানে না। অনুপমা দিদিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দিদি নাকি বলেছে, সে উচিত কাজ করছে, ব্যস আর কিছু না।

আগের মতো ঘন ঘন না হোক কমল চ্যাটার্জী এ বাড়ির সংশ্রব ত্যাগ করেনি। এখনো, মাঝে মাঝে আসে। তার সহজতায় বা স্পষ্টতায় চিড় খায়নি এখনো। খেলেও বাইরের আচরণে অন্তত কিছুই বোঝা যায় না। তবে কোন কিছু নিয়েই আগের মতো জুলুম করে না। গৌরীকে বাড়ি থেকে টেনে বার করতেও চেষ্টা করে না। সে যেন ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে। দশ বিশ মিনিট কথাবার্তা বলে চলে যায়। এম. এ. পরীক্ষাটা হয়ে গেলে এই আসা-যাওয়া আবার আগের মতো ঘনিষ্ঠ হবে গৌরী তাও অনুমান করতে পারে।

সেই সন্ধ্যাতেই এলো কমল চ্যাটার্জী। গৌরীর মনে হয়েছিল আসতে পারে। সকালে ঢাক ঢোল ক্যানেস্তারা বাজিয়ে জ্যাঠামণিকে জব্দ করা হয়েছে—হারের প্রতিক্রিয়া দেখতে আসবে না? গৌরীও যেন এরই অপেক্ষায় ছিল।

সাদা-সিধে মুখেই কনগ্র্যাচুলেট করল তাকে। জ্যাঠামণিও এই জন্যেই খোঁজ করছিল তাও জানালো। ঠোঁটে জলন্ত সিগারেট, কমল মুখ টিপে হাসল।—তুমি খুশি হয়েছ তো?

হ্যাঁ। তবে তোমার সাঙ্গোপাঙ্গদের অসভ্যতা দেখে খুশি হইনি। যতটা সম্ভব সংযত মুখেই গৌরী জবাব দিল, কেউ হারলে প্রতিপক্ষকে এই ভাবেই অপমান করা রীতি নাকি তোমাদের?

কি ব্যাপার! কি করেছে? নিখুঁত বিস্ময়।

জ্যাঠামণির নাকের ডগায় ঢাক ঢোল ক্যানেস্তারা বাজিয়ে আর নাচানাচি করে আর যা তা অভদ্র রকমের ছড়া পাঁচালি কেটে তাঁকে অপমান করে গেছে।

ও...। গৌরীর চাপা উষ্মা আঁচ করেও কমল চ্যাটার্জী গায়েই মাখল না, বলল, জনতার উল্লাস এ-রকমই হয়ে থাকে।...এতকাল ধরে তো এর হাজার গুণ বেশি অপমান বরদাস্ত করেছে।

উষ্ণ স্বরে গৌরী জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তোমার মতে ওরা যা করেছে ঠিকই করেছে?

ঠিক বেঠিক ভাবিনি, তোমার জ্যাঠামণি নিশ্চয় তোমার মতো রাগ করেননি?

গৌরী অস্বীকার করতে পারল না। তবু ঠেস দিয়ে বলল, তিনি মন্তব্য করেছেন, জেতাটা তোমরা তেমন হজম করতে পারোনি এখনো, তাই এই গোছের আনন্দ।

কমল হাসি মুখে জবাব দিল, তাঁরা হজম করতে পারলেই হল। ... হজম শক্তি তো ওঁদের এখন অনেক বাড়াতে হবে, আরো দুর্দিন আসছে।

গৌরীর ভিতরে ভিতরে অন্য কৌতূহল। তাই এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না। একটু চুপ করে থেকে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল। জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের জেতার ব্যাপারে একটি রূপসী মহিলা খুব সাহায্য করেছেন না কি ... বিমলা ভার্গব?

ঠোঁটের সিগারেট আঙুলের ফাঁকে নিয়ে কমল সকৌতুকে তাকালো তার দিকে।—তোমার দাদার কাছে শুনলে?...হ্যাঁ, সী ইজ এ জেম্।

জেম্ জোটালে কি করে?

কমল হাসতে লাগল—জুটে যায়, বিপ্লবের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবে, শত্রুপক্ষের অন্দর মহল থেকেই কত সেরা অস্ত্র সংগ্রহ হয়েছে। জোরেই হেসে উঠল, তোমাকে দেখেও তো কতজনে অবাক, অত বড় ডাক্তারের এমন বিদুষী মেয়েকে জোটালাম কি করে—বিশেষ করে জ্যাঠা যার পয়লা মার্কা শত্রু-পক্ষের মাতব্বর মানুষ।

উক্তি ভালো মতো হৃদয়ঙ্গম করার জন্যেই যেন সময়ের দরকার হল একটু। তারপর নিরীহ মুখ করে গৌরী জিজ্ঞাসা করল, তাকেও আমার মতো একই রাস্তা ধরে জুটিয়েছ তাহলে?

এবারে কমল বেশ জোরেই হেসে উঠল। বলল, না, অতটা বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। তাঁর সঙ্গে গোড়াতেই দিদি সম্পর্ক পাতাতে হয়েছিল...আমাদের দেশে এই এক ডাকের মন্ত্রগুণ কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। দিদিজি বলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই সম্পর্কটা গঙ্গাজল। সেই দিদিজিকে যদি তারপর মক্ষীরাণীর ভূমিকা নিতে হয় তাহলেও ওই ডাকের জোরে দোষ কেটে যায়।

তোমার খপ্পরে পড়ে এই দিদিজিও মক্ষিরাণীর ভূমিকাই নিয়েছেন তাহলে?

তিনি নেননি অবশ্য।...তবে লোকে দিদিজির আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে মুগ্ধ হয়ে তার বক্তব্য শোনেনি, একথা হলপ করে বলতে পারব না।...বিমলা ভার্গবের আসল চেহারার রহস্য শুনেছ নিশ্চয়?

গৌরী মাথা নাড়ল, শুনেছে। জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাহলে তাকে টোপ হিসেবেই ব্যবহার করেছ?

...তা ঠিক নয়, টোপ পেয়ে আমি বাস্তব রাস্তা ধরে একটু মাথা খাটিয়েছি মাত্র। আসলে ওই টোপটা দিয়েছিল আমার সেই পয়সাঅলা গুজরাটি বন্ধু, লোকটা এক-নম্বরের শয়তান—

এরপর যে বৃত্তান্ত শুনল, গৌরী যথার্থই হতভম্ব। ব্যবসায়ীদের চোখে রূপ আড়াল করলেও বিমলা ভার্গব সকলের চোখে ধুলো দিতে পারেনি। এই গুজরাটি বন্ধুটি তাকে আগে থেকেই জানত। নিজের দখলে পাবার জন্য এ-পর্যন্ত অনেক লোভনীয় প্রস্তাবও দিয়েছে তাকে। বিমলা ভার্গব তাকে অপমান করে তাড়িয়েছে। লোকটা শেষে ক্ষেপে গিয়ে শাসিয়েছে, রঙ মেখে রূপ ঢেকে উপার্জনের রাস্তা সে

বন্ধ করে ছাড়বে, সক্কলকে বলে দেবে। কিন্তু লোকটা নির্বোধ নয় বলেই এখনো তা করেনি, কারণ উপার্জনের পিচ্ছিল রাস্তাই যদি ধরে বিমলা ভার্গব, সব থেকে বেশি আক্রোশ গিয়ে পড়বে তার ওপর। তখন তাকে যে পাত্তা দেবে না জানা কথাই।

...মাসকয়েক আগ পার্টির কাজে কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল। এই ইলেকশনটার জন্যেও টাকা দরকার। কমল তখন ওই গুজরাটি বন্ধুর কাছে হাত পাততে গেছিলো। ওই লোকের কাছ থেকে টাকা আগেও কিছু কিছু মিলেছে। বিনিময়ে যা করতে হত সেটাকে নির্জলা সাধু কাজ বলা যায় না যদিও। যাক, বন্ধুর তখন মানসিক অবস্থা বেশ খারাপ। বিফল বাসনায় দগ্ধ একেবারে। বাঞ্ছিত রমণী লাভের চেষ্টা করতে গিয়ে গৌরীর জ্যাঠামণির কাছে ঘা খেয়েছে। নাম ধাম গোপন রাখার ব্যাপারেও তখন তার কাছ থেকে কিছু টাকা হাতানো গেছল। ফের টাকা চাইতে বিরক্ত হয়েছিল। তার পরেই কি মনে হতে দ্বিগুণ উৎসাহী। টাকা দেবে। যা চাই তার ডবল দেবে কিন্তু বিনিময়ে একটা কাজ করে দিতে হবে। সেই এক মেয়ের জন্যে সে প্রাণে মরে যাচ্ছে! যে কাজ সে নিজে করতে গিয়ে পেরে ওঠেনি সেই কাজটুকুই সমাধা করে দিতে হবে। কৌশলে হোক বা জোর করে হোক তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বিশ মাইল দূরের অমুক জায়গার অমুক বাড়িতে এনে ছেড়ে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ—কড়কড়ে ডবল টাকা সে গুনে দেবে তক্ষুনি, তার ওপর খরচা যা লাগে তাও। বন্ধুর বিশ্বাস কমলের দলে অনেক বেপরোয়া গুণ্ডা আছে, এ কাজ তাদের কাছে জল-ভাত—আরো জল ভাত এই জন্যে যে মেয়েটা কাজ-কর্ম সেরে প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফেরে, অনেক পথ তখন নির্জন। একটু চেষ্টা করলেই সুযোগ মিলবে।

মহিলার সম্পর্কে আরো কিছু শুনে কমলের কৌতূহল হয়েছিল। ওই রমণীর সম্পর্কে ঔৎসুক্য তো ছিলই। একে ডাক্তার-ছাত্রী আর গৌরীর দাদা গোরাচাঁদের প্রিয়পাত্রী অনুপমা ভার্গবের বড় বোন। তার ওপর রূপ সম্পর্কে এমন জোর গুজব। না, টাকার প্রয়োজন বলে গুজরাটি বন্ধুর মতলব হাঁসিল করার উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না। তবে টোপ টোপই—সেটা যে অন্য কোনোরকম ভদ্র কাজে লাগবে না কে বলতে পারে?

কমল সরাসরি একদিন তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছিল। নিজের পরিচয় দিয়েছিল। গোরাচাঁদকে বিমলা ভার্গব ভালই চেনে জানা কথা, তাই তার নামও করেছিল—বিশেষ বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছিল। তারপর বলেছিল, দিদিজি, আমি তোমার স্বার্থে এসেছি, সেটা বিশ্বাস করে মুখ থেকে ওই বোরখা সরাতে হবে।

শুনে মহিলা নিশ্চল খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বোরখা সরিয়েছে। হাতে বা পায়ে তখন কালো পেন্ট করাও ছিল না। সেই রূপ দেখে আর পাঁচ মিনিট তার সঙ্গে কথা বলেই কমলের মনে হয়েছিল এ-রকম একটি বুদ্ধিমতী রূপসী মহিলাকে পেলে দলের বিশেষ উপকার হতে পারে। অতএব সেই প্রথম দিনই বার কতক তাকে দিদি বলে ডেকেছিল আর তাকে বিপদের বার্তা শুনিয়েছিল। গুজরাটি বন্ধুটিকে বিমলা ভার্গব বেশ ভয়ই করে মনে হয়েছিল। তাইতেই কমলের সুবিধে হল খুব। এরপর একদিন ভাঁওতা দিয়ে গুজরাটি বন্ধুটিকে তার সামনে এনে প্রথম এবং শেষ বারের মতো সাবাধান করে দিল। দিদির এতটুকু অসম্মান হলে তার জান থাকবে না। আর ব্যবসায়ী মহলে দিদির কাজের এতটুকু অসুবিধে হলেও তার জান থাকবে না।

সেই থেকে বিমলা ভার্গব অনেকটা নিশ্চিন্ত, অনেকটা নিষ্কণ্টক। আর কৃতজ্ঞ তো বটেই। তার বাড়িতে কমলের যাতায়াত বেড়েছে। দলবল নিয়েও দিদিজি—দিদিজি করে বাড়িতে চড়াও হয়েছে। শেষে কমল তাকে নিজেদের লক্ষ্যের কথা বুঝিয়েছে। নিজেদের লক্ষ্য বলতে সমস্ত মেহনতী মানুষের লক্ষ্য। সেই সঙ্গে বর্তমানের কুশাসনের প্রসঙ্গেও অনেক ধিক্কার দিয়েছে—যে শাসনের পক্ষপুটে থেকে পয়সাওলা লোক গৃহস্থ মেয়ের অন্তঃপুরের অর্গল ভাঙতে চায় সেই শাসনের অবসান কাম্য কিনা তাকেই জিজ্ঞাসা করেছে। ফলে মেহনতী মানুষদের হয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো মাত্র দিদিজি সাগ্রহ সাড়া দিয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি, সমস্ত ব্যাপারটা শোনার পর গৌরীর একটুও খারাপ লাগেনি। বরং ভালো লেগেছে। মহিলাকে দেখার লোভ আগেও হয়েছিল, এখনো হচ্ছে।

কিন্তু এর পরেই হাসি মুখে কমল যে-প্রশ্নটা করল, খট্ করে কানে লাগল কেমন। এই সুরে এই প্রশ্ন গৌরী আদৌ আশা করেনি। কমল বলল, তা অনুপমা ভার্গবের সঙ্গে তোমার দাদার মাখামাখি তো চলছে বেশ, কিন্তু ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত বিয়েটা করবেন তো ওকে?

গলার স্বরে বক্রাভাস স্পষ্ট। হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন বোঝা তো গেলই না উল্টে সুচারু ভব্যতায় ঘা লাগার মতো লাগল। কৌতূহল সত্ত্বেও গৌরী নিস্পৃহ। জবাব দিল, কি করবে তারাই জানে, সে সমস্যা আমারও না তোমারও না।...কিন্তু তোমার হঠাৎ এ-কথা মনে হল কেন?

কমল জবাব দিল না, এ প্রসঙ্গে আর কথাও বাড়াল না, কিন্তু তার মুখের হাসি তেমন প্রাঞ্জল মনে হল না গৌরীর। পাছে দাদার প্রসঙ্গে সংশয়টা নিজের দিকে ঘোরে সেই আশংকায় গৌরীও চুপ করেই গেল।

ওই হাসির তাৎপর্য বোঝা গেছে মাস কয়েক বাদে। হঠাৎ একটা বড় চমকে এই বাড়ির ভিতসুদ্ধু যেন নাড়া-চাড়া খেল একপ্রস্থ।

গৌরীর তখন এম. এ. পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। তার নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। কয়েকটা পেপার শেষ, আরো কয়েকটা বাকি। মাঝে একদিন দু'দিন করে ছুটি পড়েছে।

এই ব্যস্ততার মধ্যেও গৌরীর কেমন মনে হল বাড়িতে যেন কি একটা চাপা উত্তেজনার ব্যাপার চলেছে। সেদিন বাবার সঙ্গে মায়ের রাগারাগির আভাসও পেল। মায়ের মুখ লাল আর থমথমে। জ্যাঠামণিও কি রকম চিন্তাচ্ছন্ন। ওর পরীক্ষা না থাকলে তিনি হয়তো বলতেন কিছু। সব থেকে বিষণ্ণ মূর্তি দাদার। ভালো করে খায় না, কথা বলে না। নিজের ঘরে পায়চারি করে, কাজেও বেরোয় না বিশেষ। হঠাৎ যেন তার ওপর দিয়েই একটা ঝড় বয়ে গেছে।

সেদিন সকালেই মায়ের ঘরে দাদার গলার আওয়াজ শোনা গেল। দাদা যেন মাকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু মায়ের গলা তার ওপর দিয়ে চড়ছে। তার ঘণ্টা দুই বাদে শুকনো মুখে দাদাকে জ্যাঠামণির ঘর থেকে বেরুতে দেখল গৌরী। আধ ঘণ্টা আগে তাকে ঢুকতেও দেখছিল।

দাদা শোনো—। কৌতূহল আর সেই সঙ্গে উদ্বেগ চেপে রাখতে না পেরে গৌরী ডেকে বসল তাকে। ওর এম. এ. পরীক্ষাটা হয়ে গেলে ফাঁক বুঝে গৌরী জ্যাঠামণিকে সব জানিয়ে অনুপমা ভার্গবের সঙ্গে দাদার বিয়ের প্রস্তাব তুলবে, এই রকম কথা ছিল। জ্যাঠামণিকে বোঝাতে পারলে মাকে বশ করা খুব কঠিন হবে না, এই রকমই আশা করেছিল ওরা। মা খুশি হবে না, কিন্তু তা বলে এই মূর্তি ধরবে তাও ভাবেনি গৌরী। তিন চার দিনে বাড়ির হাওয়া দেখে নিঃসংশয়, এই ব্যাপার নিয়েই কিছু একটা বিভ্রাট হয়ে গেছে।

দাদা ঘরে এলো। ওর দিকে চেয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু হাসিটা ঠিক হাসির মতো লাগল না গৌরীর। লক্ষ্য করে দেখল, দুশ্চিন্তায় মুখ শুকনো, চোখের কোলে কালি। ডাক্তার ছেলের এমন দুর্বল হাবভাব দেখে রাগই হল একটু। না হয় মায়ের অমতেই হবে বিয়ে, বৌ নিয়ে আলাদা বাড়িতে থাকবে, তার জন্যে অত কি ভাবনা! সামনের খোলা ইতিহাস বইটা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার?

মুখ দেখে মনে হল দাদাও ওকে কিছু বলার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু বলতে দ্বিধা। হয়তো পরীক্ষার আগে ওকে কিছু বলতে মা-ই নিষেধ করে থাকবে। নইলে সর্ব ব্যাপারে দাদা তো আগে ওর সঙ্গেই পরামর্শ করে থাকে। এর মধ্যে এমন কি ঘটতে পারে যা মা-ই আগে ভাগে জেনে বসে থাকল!

কর্তব্যজ্ঞানের খাতিরে দাদা বলল, তুই তো ব্যস্ত এখন...পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর শুনিস।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে গৌরী বলল, তুমি বোসো তো ওখানে। তোমাদের এই ফিসফিস ব্যাপার দেখে আমার পড়া-শুনা সিকেয় উঠেছে। তার থেকে শুনে নিশ্চিন্ত হওয়া ভালো। মা রাগে

গজগজ করছে, বাবা ভাবছে, জ্যাঠামণি ভাবছে—কি হয়েছে, মা অনুপমা-সংবাদ জেনেছে, এই তো?

হ্যাঁ। দাদা সামনের চেয়ারে বসল।

এ বিয়ে হবে না বলছে?

হ্যাঁ।

তুমি কি বললে?

আমিও হবে না-ই বলেছি।

গৌরী বিমূঢ় হঠাৎ। এই জবাব আশা করা দূরে থাক, কল্পনাও করেনি। তক্ষুনি মনে হল, ও যেটুকু বুঝেছে তার থেকে আরো বেশি কিছু বোঝার আছে। ওর অগোচরে তেমন কিছুই ঘটেছে নইলে দাদাকে ঠিক অতটা দুর্বল ও এখনো ভাবতে পারছে না। কিন্তু ঠিক এই সময়েই মায়ের পদার্পণ। হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়েছেন গৌরীর তাও মনে হল না। তাঁকে দেখা-মাত্র দাদা সচকিত একটু। ঈষদুষ্ণ স্বরে মা বললেন, ওর সময় নষ্ট করতে বসলি এখন?

দাদার এই ব্যাজার মুখ দেখে গৌরীর রাগও হচ্ছে হাসিও পাচ্ছে। ধমকের সুরে তাড়াতাড়ি সামাল দিল, দাদা আসেনি, আমিই ডেকেছি। তুমি যাও এখন!

কেন, এসব নিয়ে তোর এখন মাথা ঘামাবার দরকার কি—পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ করে ওই ছাই-ভস্ম শুনলে হত না? সব ফুরিয়ে যাচ্ছে?

বিরক্তি চেপে গৌরী বলে উঠল, তোমার থেকে আমার পরীক্ষার মাথাটা ভালো মা, কিচ্ছু না ভেবে তুমি পালাও তো এখন—যতক্ষণ এখানে দাঁড়াবে ততক্ষণই আমার সময় নষ্ট।

অপ্রসন্ন মুখে মা চলে যেতে গৌরী দাদার দিকে ঝুঁকল। সত্যি তুমি মাকে বলেছ বিয়ে হবে না?

মিনমিন করে দাদা জবাব দিল, না বলে কি করব...ভিতরে এমন কাণ্ড কি করে জানব। চিঠি পড়ে আমারই মাথা খারাপ হবার দাখিল, মায়ের কি দোষ।

চিঠি! গৌরী হতভম্ব।—কিসের চিঠি?

এর পর যে খবর শুনল গৌরী, তারও হাত পা অবশ। পাংশু বিমূঢ় সে-ও।

...চিঠি একখানা নয়, একদিনে একই বয়ানের তিনখানা চিঠি এসেছে। এসেছে গুজরাট থেকে। গুজরাটের এক ভদ্রলোক দীর্ঘ দিন এই স্থানে প্রবাসী ছিল, সম্প্রতি তল্পি-তল্পা গুটিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে নিতান্ত কর্তব্যবোধে ওই চিঠি লিখেছে গুজরাটের সেই ভদ্রলোক কে হতে পারে গৌরী তক্ষুনি অনুমান করে নিতে পেরেছে। ইংরেজিতে টাইপ করে তিন জনের নামে তিন কপি চিঠি পাঠিয়েছে সে। একটা মা অমিয়া সিদ্ধান্তের নামে, একটা বাবা ডক্টর বিভুরঞ্জন সিদ্ধান্তের নামে, আর একটা জ্যাঠামণি প্রিয়রঞ্জন সিদ্ধান্তের নামে।

চিঠির সারমর্ম, এ বাড়ির ছেলে ডক্টর গোরাচাঁদ সিদ্ধান্ত যে রূপসী মেয়ের প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ এবং বিবাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেই অনুপমা ভার্গবের সঠিক পরিচয় জানা আছে কি না সেই সংশয়ে এই পত্রাঘাত। পত্র প্রেরকের ধারণা, জানা নেই। কারণ, জানা থাকলে তাঁদের মতো বনেদী নামী পরিবার ঘৃণায় ওদের পরিহার করেই চলতেন। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মান-সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদে সে অনুপমা ভার্গবের আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে বাধ্য হচ্ছে।

অনুপমা ভার্গবের মা কুলত্যাগিনী বারবনিতা।

পতিতা-বৃত্তি নিরোধ আইন পাস হবার আগে পর্যন্ত চকের দেহজীবিনী এলাকায় থাকত সেই মা। সরকার সে এলাকা উচ্ছেদ করে দেবার পর তাদের ভদ্রপাড়ায় বসবাস শুরু। ওই রমণীর বড় মেয়ে বিমলা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার মায়ের সঙ্গে থেকেছে, মায়ের পথেই চলেছে। মেয়ের যৌবন বিক্রি করে সে এক সময় মোটা টাকা উপার্জন করেছে। মেয়ের এতটুকু ক্ষোভ বা অবাধ্যতা দেখলে ওই মা তার সঙ্গে নির্মম নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে। তারপর রূপমুগ্ধ এক দরদী ভদ্রলোক বিমলাকে সেই নোঙরা পরিবেশ থেকে তুলে এনে বছর দুই আড়াই নিজের কাছে রেখেছিল, ঘটনাক্রমে সেই লোক পত্রলেখকের বন্ধু। বলা বাহুল্য, সেই ভদ্রলোকও তপস্বিনী বানাবার জন্য নিয়ে আসেনি, সে-ও

বিমলার একজন রূপমুগ্ধকর স্তাবক ছিল। বিমলা এবং তার মা তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে। ভোগের আসর সাজিয়ে মেয়ে তার সে মোহ ভাঙতে দেয়নি। লোকটি অবিবাহিত এবং তার কিছু পয়সা ছিল। যে লোকের স্ত্রী বলে বিমলা এখন নিজের পরিচয় দেয়, সে ওই লোক। বছর আড়াইয়ের মধ্যে সে মারা যাবার আগে টাকাকড়ি যা ছিল বিমলাকেই দিয়ে যায়। কিন্তু তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। ওই লোক মারা যেতে বিমলা এখন মুসলমান মেয়ের মতো বোরখা চাপিয়ে মস্ত সতী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আরো লিখেছে। লিখেছে, অবশ্য এ কথা ঠিক ছোট মেয়ে অনুপমা ভার্গবকে খুব অল্প বয়েস থেকেই কাছে রাখতে পারেনি তার মা। বড় মেয়ের জন্যেই পারেনি। এই এক ব্যাপারে বিমলা মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। নইলে মায়ের চোখে ওই লেখাপড়া জানা রূপসী মেয়ে উপার্জনের আরো লোভনীয় টোপ। কিন্তু বড় মেয়ে তাকে জোর করে তফাতে রেখেছে। এক ছেলের সঙ্গে তার বিয়েও ঠিক করেছিল। আরো সম্ভান্ত অর্থাৎ সিদ্ধান্ত পরিবারের ছেলের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে অনায়াসে তারা সেই ছেলেকে ছেঁটে দিতে পেরেছে। এখনো অনুপমার ডাক্তারী পড়ার খরচ চলছে বিমলা যার কাছে থাকত তার টাকায়। মা অথবা বড় বোনের পথে না গেলেও অনুপমা কোন্ সংশ্রবের মেয়ে জানার পরে সিদ্ধান্তদের মতো এক শিক্ষিত মার্জিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে স্থান পাবার যোগ্য কি না সেটা এখন তাদের বিবেচনাসাপেক্ষ।

গৌরী স্তব্ধ, নির্বাক। ওরই বুকের ভেতরটা যেন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, দাদার কি হচ্ছে সহজেই অনুমান করতে পারে। দাদার সঙ্গে যোগাযোগের আগে যে ছেলের সঙ্গে বোনের বিয়ে ঠিক করেছিল বিমলা, সেই ঘটনা অনুপমা নিজেই গৌরীকে বলেছিল। সে-ব্যাপারে কোনরকম হীনতার ছিটে ফোঁটাও দেখেনি। খানিক বাদে অবিশ্বাসের ঝাপটায় সংশয় নির্মূল করে দেবার মতো করেই বলে উঠল, ওই লোকটা কেমন তা তো জান, যা লিখেছে সব যে মিথ্যে নয় কে বলল? খোঁজ নিয়েছ?

মুখ কালো করে গোরাচাঁদ মাথা নাড়ল। খোঁজ নিয়েছে। চিঠি নিয়ে সোজা বিমলার সঙ্গেই দেখা করেছিল। মোটামুটি সবই সত্যি, তবে চিঠিতে শুধু একটা সত্যের উল্লেখ নেই। ওরা ভদ্রঘরের ভদ্র পরিবারেরই মেয়ে ছিল। মাতাল স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মা দুই মেয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল, বিমলার তখন সাত বছর বয়েস, আর অনুপমার এক বছর। টাকার লোভে সেই স্বামী বহুবার তাকে ব্যভিচারের পথে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছে। মহিলা নিজেকে রক্ষা করার জন্যেই পালিয়েছিল। যে আত্মীয়ের ওপর নির্ভর করেছিল, হায়নার মতো সে-ই প্রথমে গ্রাস করেছে তাকে। তারপর অভাবের তাড়নায় ক্রমশ ওই পরিণতি।

ভিতরে ভিতরে গৌরীর কি-যেন যন্ত্রণা শুরু হয়েছে একটা। শুনতে চাইলে আরো অনেক কিছুই হয়ত দাদা বলতে পারত। কিন্তু যেটুকু শুনেছে তাইতেই বিষ-বিষ লাগছে। খানিক চুপ করে থেকে গৌরী জিজ্ঞাসা করল, এই সবই অনুপমা জানত?

দাদার বিমর্ষ মুখে অস্বস্তির ছায়া। মাথা নাড়ল, জানত। গৌরীর মনে হল আরো কি বলি-বলি করেও দাদা বলে উঠতে পারল না যেন।

এই প্রথম অনুপমার ওপর সহানুভূতিতে চিড় খেল গৌরীর। সব জেনেও এই গোপনতার আশ্রয় কেন নিল সে? কেন এতটা এগোল? কেন সরে দাঁড়াল না? অথচ আশ্চর্য, সেদিন সন্ধ্যায় গোমতীর ধারে দেখা অনুপমার যে হাসিখুশি মুখখানা চোখের ওপর ভাসছে, এত সব শোনার পরেও ওই মুখখানা ঘৃণায় তফাতে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। এর পরেও মনে হচ্ছে কোথায় যেন মস্ত একটা মিথ্যে লুকিয়ে আছে।

দাদা চলে গেল। গৌরী স্থাণুর মতো বসেই রইল। আবার কি মনে পড়তে সচকিত সে।...কমল চ্যাটার্জীর সেদিনের সেই হাসির অর্থ সুস্পষ্ট। সেই তির্যক প্রশ্নের অর্থও। জিজ্ঞাসা করেছিল, ভদ্রলোক এত যে মাখামাখি করছে মেয়েটার সঙ্গে, শেষ পর্যন্ত বিয়েটা করবে তো। সংশয় দাদার প্রসঙ্গে, তার মানেই অনুপমাদের এই সব বৃত্তান্ত সে আগেই জানত।

গৌরীর তক্ষুনি ইচ্ছে করল কমল চ্যাটার্জীর কাছে ছুটে যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করে কেন সেদিন সে ওই কথা বলেছিল। সে যদি জানে তো কতটা জানে। এবং জেনে থাকলে আগে ওকে অন্তত বলে সাবধান করে দেয়নি কেন।

কিন্তু গৌরীর মন বলল, থাক্। গেলে ভুল হবে।

দিন কয়েক পরের ঘটনা। আগামীকালের পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই গৌরীর এ-পর্ব শেষ। মনের অবস্থা এমন যে পরীক্ষা কি রকম হল না হল সে সম্পর্কেও নিস্পৃহ। বিকেলের দিকে মাথাটা কেমন ধরেছিল। তাই খোলা হাওয়ায় হাঁটতে বেরিয়েছিল একটু। সন্ধের আগে আগেই ফিরেছে।

বাড়িতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল। বসার ঘরে মায়ের ঈষৎ উত্তেজিত গলা। বাইরের ঘরে বসে মা-কে এই সুরে কথা কইতে কখনো শোনেনি।—তাহলে তোমার কি ইচ্ছে, সব জানার পরেও বরণ-কুলো সাজিয়ে ওই মেয়েকে ঘরে এনে তুলব?

ঘরের ভিতরে উঁকি দিল গৌরী। মায়ের মুখোমুখি বসে কমল চ্যাটার্জী সিগারেট টানছে। মনে হল মায়ের রাগ দেখে মুখ টিপে হাসছে লোকটা। গৌরী তার পিছনের দিকে, কমল ওকে দেখতে পেল না। মা দেখেছে।

মায়ের উষ্ণ কথার জবাবে নির্লিপ্ত মুখ করে কমল যা বলল, শোনা-মাত্র পিত্তি জ্বলে যাবার দাখিল গৌরীর। ধীরে সুস্থে সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজতে গুঁজতে মাকে বলছে, আমার মতে ওটুকু করাই আপনার একমাত্র উচিত কাজ হবে।

মায়ের মুখ লাল। রাগ চাপার চেষ্টা, কিন্তু চাপতে পারলেন না। উঠে দাঁড়ালেন।—ওই এসেছে, ওকে শোনাও তোমার মতামত। মেয়ের দিকে তাকালেন।—কমল এসেছে গোরার বিয়ের কথা বলতে, ওই মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে না দিলে নাকি আমাদের ভয়ানক অন্যায় হবে। কি অন্যায় হবে ইচ্ছে থাকে তো তুই বুঝে নে, এ-সব কথায় আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে চাইনে।

মা রাগত মুখে চলে গেলেন। কমল চ্যাটার্জী ঘুরে তাকালো। চোখে কৌতুক চিকচিক করছে এখনো। গৌরী আস্তে আস্তে তার সামনে এসে দাঁড়াল। বসল। আগামীকাল শেষ পরীক্ষা, তার মধ্যে আজই বাড়ি এসে এই অনধিকার চর্চার দরুন আরো বেশি বিরক্ত। তার মুখের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে কমল হাসি মুখেই গলা দিয়ে বিস্ময়ের সুর টানল, এ-সময় বেড়িয়ে ফিরলে, পরীক্ষা শেষ নাকি?

শেষ কিনা ভালই জানে। ঠাণ্ডা জবাব দিল, কাল হলে শেষ ...মাকে কি বলছিলে?

উনি নিজেই তো বলে গেলেন...শোনোনি?

শুনেছি। গৌরীর গলার স্বর আরো সংযত, আরো ঠাণ্ডা কারণ, সে স্থির জানে এই লোক এতটুকু দরদ নিয়ে আলোচনা করতে আসেনি।—আমাদের কি উচিত বা কি অনুচিত তাই নিয়ে তোমার মতামত কে জানতে চেয়েছে?

হালকা হেসে ওর মুখের ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে কমল জবাব দিল, কেউ না। আমি সর্ব ব্যাপারে নিজেকে বঞ্চিত দলের একজন মনে করি। এ বিয়েতে আর তোমাদের মত নেই বিমলার মুখে সেটা শোনার পর নিজেই এসেছি।

গৌরীর একটুও তর্ক করার ইচ্ছে ছিল না, তবু রাগ হচ্ছে বলেই বলে ফেলল, নিজেকে তুমি বঞ্চিত দলের একজন ভাবলে আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার মাস্টারি সকলের বরদাস্ত না-ও হতে পারে চোখে চোখ রেখে থামল একটু, ও-দিকে নতুন সিগারেট ধরানোর ফাঁকে হাসি চাপতে চেষ্টা করছে। সিগারেটে ঘনঘন টান পড়ছে, চোখ দুটো মনোযাগী শ্রোতার মতো। শ্লেষের সুরেই এবারে গৌরী বলল, অন্যের বেলায় এ রকম কর্তব্য করতে আসা খুব কঠিন নয়, কিন্তু তোমার নিজের হলে কি করতে?

আমার! কমল অবাকই যেন একটু। তারপর অ্যাশপটে সিগারেটের ছাই ঝাড়ার ফাঁকে হেসেই উঠল।—বছর কয়েক হয়ে গেল আমাকে দেখছ, অথচ আমাকে তোমার এখনো চিনতে বাকি। আমি

কোনোদিন কারো জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে মাথা ঘামাই না। সমস্ত জন্মই একভাবে এক রীতিতে হয়ে থাকে। আমার কাছে তোমাদের এ-সব সমস্যা এই সিগারেটের ছাইয়ের মতো অতি তুচ্ছ।

হয়তো সত্যি কথাই বলেছে, ও-ধরনের সমস্যা নিয়ে এই লোক মাথা ঘামায় না। তবু তপ্ত মুখ গৌরীর।—সকলে তোমার মতো উদার আর মহৎ নয় তাহলে। মায়ের মত শুনলে তো এখন এ প্রসঙ্গ থাক। বঞ্চিত দলের মুরুব্বি হিসেবে বলার যদি কিছু থাকে বিমলাকেই বোলো—

কমল চেয়ে আছে ওর দিকে, ঠোঁটের কোণে তির্যক হাসি। সিগারেটের ধোঁয়া তার নিজের মুখের সামনেই কুণ্ডলি পাকাচ্ছে। এ চাউনির তলায় তলায় একটা অসহিষ্ণু অভিলাষ চিকচিক করছে যেন সত্যি হোক বা না হোক, মুখের ওপর ওই চোখ দুটো আটকে থাকতে দেখলেই গৌরীর ও-রকম মনে হয়। কিন্তু গলার স্বরে সহিষ্ণুতা মাখা, সিগারেটের ধোঁয়াও জাল ছিঁড়ে কথাগুলো কানের পর্দায় ঘা বসিয়ে গেল যেন। বলল, এটা উদারতা বা মহত্ত্বের কথা নয়, দৃষ্টিভঙ্গির তফাতের কথা।...কিছুদিন আগেও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মেয়েটার সঙ্গে অত যে মাখামাখি করছে তোমার দাদা, শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবে কি না। তোমার শুনতে ভালো লাগেনি কিন্তু তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানা আছে বলেই আমার একটু দুশ্চিন্তা ছিল।

গৌরী সচকিত। তার অনুমান মিথ্যে নয় তাহলে। জিজ্ঞাসা করল, তোমার তখন এত সব জানা ছিল?

ছিল। ওই গুজরাটি বন্ধু আমাকেও লোভে জড়াবার চেষ্টায় সবই বলেছিল। সে কার ভয়ে এখানে থেকে পালিয়ে গিয়ে দূর থেকে ওই চিঠি লিখে উদারতা দেখিয়েছে সেটা একটু ভাবলেই তোমরা বুঝতে পারতে—

সে কথায় কান না দিয়ে গৌরী উষ্ণস্বরে বলে উঠল, অত সব জানার পরেও তুমি আমাদের তা জানাবার দরকার মনে করোনি।

না। বললাম, তো, ওই সব সমস্যার অস্তিত্ব আমার চিন্তায় নেই। জানালে এই পরিমাণই যে হবে সেটা আমার খুব ভালো করে জানা ছিল। সেটা আমি চাইনি, বিয়েটা হয়ে যাক আমি তাই চাইছিলাম। এখনো হয় যাতে তুমিও সে-চেষ্টা করো, মেয়েটা ইমোশন্যাল টাইপের, এ-বিয়ে না হলে তার ক্ষতি হবে।

এরপর ঠাণ্ডা মেজাজে কথা বলা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই মানুষের কাছে তার চাওয়া না চাওয়াটাই সব, অন্যের বিবেচনার বিষয় দুনিয়ায় কিছুই নেই। সবেতে যেন তার মাথা গলানোর অধিকার, চাওয়ার দাবি পেশ করার অধিকার। গৌরী সশ্লেষে জবাব দিল, ক্ষতির কথা আরো কেউ ভাবতে পারে এ তোমার মাথায় না ঢুকলে কি আর করা যাবে।...সব গোপন করে অনুপমা ক্ষতির রাস্তায় এলো কেন, আমার হয়ে তাকে এ কথাটা জিজ্ঞেস কোরো।

জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, ওর বড় বোন নিজেই আমাকে বলেছে। অনুপমা তোমার দাদাকে জানাতে চেষ্টা করেছিল। বলেছে, ওদের পরিবার সম্পর্কে তার কিছু শোনা দরকার, শুনলে হয়তো সে সরেই দাঁড়াবে। কিন্তু রূপেগুণে মুগ্ধ তোমার দাদা তখন উদারতার জোয়ারে ভাসছে, বলেছে, তাহলে না শোনাই ভালো। অনুপমা সত্যি সত্যি তোমার দাদাকে ভালোবাসে, সেই জন্যেই ওর মনে সত্যিকারের ভয় ছিল। তাই তারপরেও সে কিছু জানাতে চেষ্টা করতে তোমার দাদা হাত জোড় করেছে। বলেছে, পিছনে যা আছে থাক, তোমার-আমার যোগটা এ জীবনে আর বিয়োগ হবার নয়, মাঝখান থেকে দুঃখ পেতে পারি এমন কথা না শোনাই ভালো।...তোমার দাদাকে আমি কোনোদিন খুব একটা শক্ত সবল মানুষ মনে করিনি, কিন্তু এতটা মেরুদণ্ডশূন্যও ভাবিনি।

দাদার সরল মন, ওকথা অনুপমাকে বলে থাকতে পারে। পরিবারের অমন কদর্য ইতিহাস কে কল্পনা করতে পারে? সে জন্যেই শেষের এই উক্তি অসহ্য। অনুচ্চ স্বরে গৌরী প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠল, দাদার মাথার চুল তোমার কাছে বিকিয়ে নেই, তার সম্পর্কে আর একটু সংযত হয়ে কথা বলতে চেষ্টা করো।...আর ব্যাপারটা যখন ছেলে-খেলা নয়, দাদা যা-ই বলুক, তাকে অনুপমার জানানো উচিত ছিল।

আগের সিগারেট থেকে নতুন সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে গলায় একটু যেন বেশি জোর দিয়েই কমল চ্যাটার্জী বলল, সে উচিত কাজও অনুপমা করত হয়তো, কিন্তু তোমার দাদা সে সুযোগ দেয়নি। তার আগেই তাকে যৌবন-বাস্তবে টেনে এনেছে—এর থেকে ভালো শব্দ মনে আসছে না... আমার কথা বুঝতে পারছ বোধহয়? দু'চোখের ঝকঝকে দৃষ্টিটা আচমকা গৌরীর মুখে বিঁধিয়ে দিল যেন লোকটা। প্রতিক্রিয়া দেখল। ব্যঙ্গ-ঠাসা গলার স্বর আরও নির্লিপ্ত।—তারপর বলা না বলা সমান বলেই অনুপমাও আর ও নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তোমার দাদা অস্বাভাবিক কিছু করেছে বলছি না, কিন্তু এরপর বিয়ে হবে কি হবে না সে-কথা ওঠে কি করে?...যাক, এ বিয়ে হবে, এখন কবে কেমন করে হবে, সেই চিন্তা করো।

কমল চ্যাটার্জী চলে গেল। গৌরী নিস্পন্দের মতো বসে।

পাঁচ ছ'দিন পরের কথা। পরীক্ষার পর অখণ্ড অবকাশ সত্ত্বেও গৌরী দাদাকে এক-রকম এড়িয়েই চলেছে। দাদাও অতিরিক্ত গম্ভীর। সময়ের ঢের আগে চেম্বারে বেরিয়ে যায়, ফেরেও অনেক পরে। দেখা হলে গৌরী দূর থেকে লক্ষ্য করে থাকে। এক এক সময় ভয়ানক রাগ হয়ে যায়। কমল চ্যাটার্জী জোর দিয়ে যে-কথা বলে গেছল, সেটা অন্যায় কিছু নয়। সে বলেছিল এ বিয়ে হবে! হওয়া যে উচিত গৌরীও সেটা অস্বীকার করতে পারে না। তার রাগ, দাদার দুর্বলতার সুযোগে ওই লোক এমন জোরের সঙ্গে অনধিকার চর্চায় এগিয়ে আসার ছুতো পেল বলে।...দাদার মাথায় কিছু একটা সঙ্কল্প ঘুরছে মনে হয়। বাড়ির মধ্যে একমাত্র জ্যাঠামণির ঘরেই তাকে মাঝে-মাঝে আনাগোনা করতে দেখা গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পর দাদা চেম্বার থেকে অসময়ে ফিরে সোজা ওর ঘর চলে এলো। গম্ভীর শুধু নয়, ভিতরটা বেশ উত্তেজিতও মনে হল। বলল, কমল আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য আজ চেম্বারে এসেছিল। ও নিজেকে কিভাবে জিজ্ঞেস করিস তো, আর সবেতে ও মাথা গলাতে এলে একটু মুশকিল হবে এও বলে দিস।

গৌরী চুপচাপ চেয়ে রইল একটু।—কি হয়েছে?

ও চেম্বারে এসেছিল আমাকে আলটিমেটাম দিতে, অনুপমার সম্পর্কে আমি কি স্থির করেছি তিন দিনের মধ্যে ওকে জানাতে হবে। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এও বুঝিয়ে দিয়েছে, বিয়ে না করলে এখানে আমার পক্ষে প্র্যাকটিস করা শক্ত হবে...কারণ ওর দলের ছেলেরা বিমলাকে এখন এত ভালোবাসে যে এ বিয়ে না হলে তারা ক্ষেপেই যাবে।' বিমলা বা অনুপমা ওকে এভাবে মাতব্বরি করতে বলেছে আমি বিশ্বাস করি না। এটা ওর স্বভাব।

কিন্তু দাদার লাল মুখ দেখেও গৌরী অবিশ্বাস করতে পারল না। ওই লোককে তারা এখন সহায় ভাবতেও পারে। কিন্তু মুখের ওপর সে-কথা না বলে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বললে?

আমি বললাম, ফের এ-ভাবে এসে কথা বললে আমার বোনের মুখ চেয়েও তোমাকে খাতির করা আমার পক্ষে শক্ত হবে। সে যেন এ-সব কথা বলার জন্যে আমার চেম্বারে না আসে।

গৌরী আবারও তেমনি চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। কমল চ্যাটার্জীকে যা বলা হয়েছে তার জন্য একটুও ক্ষুণ্ণ বা অখুশি নয়। কিন্তু দাদার এই রাগত মুখে দুর্বলতা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কিনা দেখছে। ঠিক ঠাওর করা গেল না। গৌরী বলল, বেশ করেছো।...কিন্তু আমার কানেও কিছু কথা এসেছে, তুমি সত্যি কি ঠিক করলে?

দাদাকে এরই মধ্যে ঈষৎ বিমনা মনে হল। ওর কানে কি কথা এসেছে খেয়াল করে সেটা আর জিজ্ঞাসা করল না। জবাব দিল, এফ. আর. সি. এস. করতে লন্ডন যাব ঠিক করেছি, জ্যাঠামণি রাজি হয়েছেন।...চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি হয়।

গৌরী অবাক। চেয়ে আছে। ভিতরে ভিতরে আর একটুও খুশি হতে পারছে না। কি-রকম যেন বিতৃষ্ণা বোধ করছে। অনুচ্চ কঠিন স্বরে বলেই ফেলল, অর্থাৎ পালাবে ঠিক করেছ।...মা জানে?

চকিতে নেত্রে দাদা তাকালো তার দিকে। এই অপ্রসন্ন মুখ কেন সেটা হয়ত সেই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে। আমতা-আমতা করে জবাব দিল মা-ই প্রথম এ-পরামর্শ দিয়েছিল।

চলে গেল। গৌরীর মনে হল পালিয়ে গেল। তবু ইচ্ছে হল তাকে ডেকে ফেরায়। ফিরিয়ে আরো কঠিন কিছু বলে। পারা গেল না। চোখের বার হলে মনের বার, মা এই আশাতেই ছেলেকে বাইরে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত। মায়ের দিক থেকে এ-রকম চিন্তা করাটা অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু দাদা এ-ভাবে পালাতে রাজি হল শেষ পর্যন্ত।

...জ্যাঠামণিকে সব জানাতে পারলে ভালো হত। পারবেই বা না কেন? ঝোঁকের মাথায়ই জ্যাঠামণির কাছে এসে উপস্থিত। সব জানার পর জ্যাঠামণি এভাবে দাদাকে পালাতে দেবেন না এ বিশ্বাস তার আছে। কিন্তু গৌরী ঘরে পা দিতে হাসি মুখে উনি বলে উঠলেন, দেখ, তোর সম্পর্কে একটা কথা দু'দিন ধরে ভাবছি...এ-বারে আই. এ. এস. পরীক্ষা দিয়ে ফেল না। তুই যা মেয়ে, একটু চেষ্টা করলেই ঠিক বেরিয়ে আসবি।

এ-প্রসঙ্গে উৎসাহ বোধ করার মতো মেজাজ নয় এখন গৌরীর। কিন্তু জ্যাঠামণির এ-কথা শুনে মনে মনে অবাক একটু। এম. এ. পরীক্ষার পর বিয়ের চিন্তাটাই মনে আসার কথা তাঁর। কিন্তু তার বদলে এই প্রস্তাব। বলল, তুমি তো তোমার মেয়েকে একটা মস্ত কিছু ভাবো।...যাক্, দাদাকে বিলেতে পাঠাচ্ছো শুনলাম?

হ্যাঁ, তোর মায়ের ইচ্ছে যখন যাক।

ধীর ঠাণ্ডা মুখে গৌরী বলল, সব ঠিক করার আগে তুমি আমার সঙ্গে একটু কথা বলে নিতে পারতে।...দাদার এ-ভাবে যাওয়া ঠিক নয় বোধ হয়।

এতক্ষণে যেন জ্যাঠামণি ভালো করে মুখখানা দেখলেন ওর। তারপর অল্প অল্প হাসতে লাগলেন। হাসিটা কেন যেন অদ্ভুত ভালো লাগল গৌরীর।

বললেন, তাহলে যে-ভাবে যাওয়া ঠিক সে-ভাবেই যাবে, তুই কিছু ভাবিস না। কিন্তু বুড়ো বয়সে ফতুর হলে জ্যাঠামণিকে খাওয়াতে হবে মনে থাকে যেন!

মুহূর্তের মধ্যে কি একটা সম্ভাবনার চিন্তা গৌরীর একেবারে মগজে এসে আগাত করল বুঝি। দু'চোখ চকচক করে উঠল। —তাহলে কি আমি ধরে নেব তোমার টাকায় বিলেতে দু'জন যাচ্ছে...?

সত্রাসে জ্যাঠামণি এগিয়ে এসে বাঁ হাতখানা ওর পিঠে রেখে ডান হাত দিয়ে ওর মুখটা চেপে ধরলেন।—চুপ, চুপ! তোর মা শুনলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না! তারপর আবার হাসতে লাগলেন।—তুই কেমন মেয়ে আমার জানতে বাকি। সাধে আই. এ. এস. পরীক্ষা দিতে বলছি তোকে—অ্যাঁ?

গৌরীর খুব ইচ্ছে করছিল জ্যাঠামণিকে একটা প্রণাম করে ফেলতে। আনন্দে চোখের কোণ দুটো সিরসির করছে।

ঠিক পাঁচ দিন বাদে আবার যা ঘটল, এ-বাড়ির একটি মানুষও তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সব থেকে বেশি স্তব্ধ গৌরী।

ভারত সমাচারের প্রথম পৃষ্ঠায় শ্লেষ বিদ্রূপ ও টিপ্পনীসহ ফলাও করে খবর ছাপা হয়েছে একটা। মানুষের ঘৃণা এবং অবিচার কোন্ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে তারই সরগরম নজির উদ্ঘাটন করেছে তারা। লিখেছে, সরকার না কি পতিতা-বৃত্তি উচ্ছেদ করেছিল মানুষের নীতির মান উঁচুতে তোলার জন্য। কিন্তু অনটন নিপীড়িতা মায়ের অবাঞ্ছিত জীবন-যাত্রার অপরাধে তার নিষ্পাপ বিদুষী মেয়েকেও এক মানী ঘরের শিক্ষিত ছেলে কোন্ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে পারে তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই ঘটনাটি। সেই নীতি পরায়ণ পুরুষটি এখানকার মস্ত এক ডাক্তারের ছেলে, এবং সে নিজেও ডাক্তার। একটি রূপসী মেয়ের সঙ্গে তার নিবিড় প্রণয়, সেই মেয়েরও এবারেই ডাক্তারি পাশ করার কথা। তার ডাক্তারি পড়ার বিপুল ব্যয় বহন করে আসছে তারই জ্যেষ্ঠা ভগ্নি, অভাব এবং অনটনের তাড়ানায় যাঁকে একদিন মায়ের মতোই পতিতাবৃত্তির নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু এই বৃত্তি উচ্ছেদের পর মহীয়সী বড় বোনটি বোরখার আড়ালে নিজের রূপ গোপন করে এবং হাতে-পায়ে কালো পেন্ট করে মানুষের অসংযত ক্ষুধা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রমে সসম্মানে জীবিকার্জন করে চলেছেন আর দারিদ্র্য বরণ করেও বোনকে তার শিক্ষা-সমাপ্তির শেষ প্রান্তে টেনে এনেছেন।...সেই বোনের

সঙ্গে সম্ভ্রান্ত ঘরের নীতিবান পুরুষটির প্রণয়পর্ব যত দূর গড়িয়েছিল— বিবাহ তার একমাত্র শোভন পরিণতি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার মা-বোনের অতীত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ত ওই প্রেমিকের নীতির অভিমান এমন উথলে উঠেছে যে, নিষ্পাপ মেয়েটিকে বর্জন করা ভিন্ন আর কোন উপায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। দেশের শিক্ষিত ছেলেদের নীতি-পরায়ণতার কি অপার মহিমা!

সর্বাঙ্গ জ্বলে যাবার মতো এমনি অনেক হুল ফুটিয়েছে। নাম কারো নেই, কিন্তু একবার পড়লেই অচেনা লোকও বুঝবে কোন বাড়ির ঘটনা এটা।

বাড়ির প্রতিটি মানুষ নির্বাক। এমন কি গৌরীর সদা ব্যস্ত ডাক্তার বাবাও। কাগজটা গৌরী পড়েছে সকলের শেষে। ওর আগে সবাই পড়েছে সেটা বোঝা গেছে।...দাদার ঘরের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল গৌরী। ক্রুদ্ধ মুখে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে দেখল তাকে। মুখোমুখি হতে মুখ ঘুরিয়ে নিল। অর্থাৎ ওর কারণেই সে যেন অসহায়। পায়ে পায়ে মায়ের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। মায়ের মুখখানা রাগে জ্বলছে, বাবা চুপচাপ তাঁর সামনে বসে। মেয়ের দিকে তাকালেন তাঁরাও। হ্যাঁ, গৌরীর অসহায় মনে হল তাঁদেরও।...ওর মুখ চেয়েই অসহায়। তাঁদেরও কিছু না বলে গৌরী চলে এলো। জ্যাঠামণির ঘর। শয্যায় বসে নিজের গালে হাত বুলোচ্ছেন। গৌরী ঘরে ঢুকতে ফিরে তাকালেন। হাসতে চেষ্টা করলেন। বললন, আয় যত সব পাগলের কাণ্ড...।

গৌরীর জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল, আমি মাঝে না থাকলে এই পাগলের কাণ্ড দেখে তোমরা কি করতে?

জিজ্ঞাসা করল না। ও মাঝে আছেই। ওকে বাদ দিয়ে কমল চ্যাটার্জীর কথা এদের কারো পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব নয়।

ফিরে এসে নিজের ঘরেই বসল আবার।

ভিতরে ভিতরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করছে গৌরী। রাগ বিতৃষ্ণা দুঃখ সব মিলিয়ে একটা যন্ত্রণা। কাগজটা হাতে নিয়েই উঠল এক-সময়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরনের শাড়ি জামাটা দেখে নিল এক-নজর। তারপর মাথায় একটু চিরুণি বুলিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

বাড়িটা চিনতে খুব বেগ পেতে হল না। দাদার সঙ্গে একবার এসেছিল। তখন বিমলা ছিল না। সাইকেল রিক্‌শাটাকে অপেক্ষা করতে বলে গৌরী পায়ে পায়ে বাড়ির দিকে এগোল। হাতে ভারত সমাচার।

ভিতর থেকে অনুপমা ছুটে এলো। কি করবে বা কি বলবে ভেবে না পেয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল শুধু। তারপরেই হাতে ভারত সমাচার দেখে সঙ্কুচিত।

তোমার দিদি কোথায়?

আছেন, এসো।

ভিতরে নিয়ে গেল। রং-বেরঙের সূতো, কাপড়, ছুঁচ, এমব্রয়ডারি ফ্রেম, ডিজাইন বই ইত্যাদি সামনে ফেলে রেখে বিমলা কি ভাবছিল। বোনের সঙ্গে নতুন মুখ দেখে সচকিত একটু।

অনুপমা পরিচয় করিয়ে দিতে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আইয়ে বহিন্ আইয়ে, বহুত মেহেরবান আপ কি...বৈঠিয়ে।

গৌরী তার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। এই নোংরা কাগজটাতে একে মহীয়সী বলা হয়েছে। গৌরীর মনে হল এটুকুতে অন্তত অতিশয়োক্তি নেই। এমন আত্মস্থ সংহত রূপ আর দেখেছে কি না জানে না।

বসল। তাদের আপ্যায়ণের চেষ্টায় বাধা দিয়ে বলল, আমি দুটো কথা বলে এক্ষুনি চলে যাব, ব্যস্ত হতে হবে না। বিমলার দিকে তাকালো।—বসুন। এই কাগজে আজ একটা খবর বেরিয়েছে, দিদিজি কি দেখেছেন?

বিমলা দাঁড়িয়েই রইল। ওর হাতের কাগজটার দিকে এক নজর তাকিয়ে সামান্য মাথা নাড়ল। দেখেছে।

গৌরীর ভেতরটা তেতেই ছিল তবু সংযত স্বরে বলল, শুনেছি দিদিজি এই কাগজ যাঁদের তাঁদের হয়ে অনেক কাজ করছেন, কিন্তু কাগজে এই খবরা বেরুবার পর তাঁর কিছু বক্তব্য নেই?

অনুপমা নির্বাক, শঙ্কিত নেত্রে তার দিদির দিকে তাকালো। একটু চুপ করে থেকে বিমলা আস্তে আস্তে বলল, ওরা আমার আর তোমাদের দু'দিকেরই খুব ক্ষতি করেছে! এত বড় ক্ষতি ওরা করবে জানলে আমি আমার ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে বসে থাকতাম। এত সব ঝড় ঝাপটায় আমারই মাথার ঠিক ছিল না। আপনার জন ভেবে কমলবাবুকে দুঃখু করে বলেছিলাম, এ বিয়ে না হলে বোনটার আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না। সে বলেছিল, আমার বোনের রূপ আছে তার ওপর এমন শিক্ষিতা...বিয়ের ভাবনা কি।...বোনের ওপর রাগ করেই আমি বলে ফেলেছিলাম সে রাস্তা আর নেই, সর্বনাশী সব খুইয়ে বসেছে। দোষ সব আমার বহিনজি...তোমরা কত মহৎ সে আর আমাদের থেকে বেশি এখন কে জানে।... আমার ক্ষতি আমি সহ্য করব, তোমাদের ক্ষতির জন্যে আমি মাফ চাইছি, এ-ছাড়া আমি আর কি করতে পারি বলো।

না, গৌরী আর একটা কথাও বলতে পারেনি। কাগজ পড়ার পর থেকে নিজেদের মান-সম্ভ্রমের কথাই শুধু ভেবেছে, সেই রাগেই জ্বলতে জ্বলতে চলে এসেছে, এই বিচিত্র রমণীর ক্ষতির কথা চিন্তা করেনি। ব্যবসায়ীদের কৌতূহলে এরপর হয়তো তার উপার্জনই বন্ধ হয়ে যাবে।

একে একে তিন দিন গৌরী অপেক্ষা করেছে। একজনের প্রতীক্ষায় থেকেছে। চতুর্থ দিনে সে এলো। আসবে জানত।

সেই রকমই সহজ স্বাভাবিক। মুখে সিগারেট। ঠোঁটের কোণে অল্প-হাসি। গৌরী ঘরে ঢুকতেই বলল, এখানেই শেষ তো না কি আবার কোনো পরীক্ষা-টরীক্ষা আছে?

তার মুখোমুখি একটা সোফায় বসল গৌরী। আজ সে-ও ঠিক অমনি সহজ আর স্বাভাবিক হতে পারছে।—পরীক্ষার কি শেষ আছে, জীবনটাই পরীক্ষা।...তোমার খবর কি?

এতটা সহজতা খুব প্রত্যাশিত নয় যেন।—ভালো। খুব ভলো। পরীক্ষা শেষ যখন তুমি নিজেও তো একটু খোঁজ-খবর নিলে পারতে। ক'টা দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম—

কি জন্যে ব্যস্ত ছিলে, ভারত সমাচারের জন্য আরো কিছু চটকদার সমাচার মেলে কি না সেই চেষ্টায়?

কমল চ্যাটার্জী বিস্মিত যেন একটু, আর তার পরেই মনে পড়ল যেন কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি। হেসেই জবাব দিল, ও সেদিনের ওই রিপোর্টটার কথা বলছ। না, সে জন্যে নয়, কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সিগারেটে গোটা দুই টান দিয়ে নিল।...ভালো কথা, ওরা জিজ্ঞাসা করছিল, এবার তুমি কাগজে জয়েন করবে কি না।

এবারে অবাক যেন গৌরীও। প্রায় তরল সুরেই সেটুকু প্রকাশ করল।—তোমাদের ওই নোংরা কাগজে! রক্ষে করো। তোমাদের আশাও তো কম নয়!

সিগারেটে আবার গোটা দুই টান পড়ল। ঠোঁটের হাসি মেলায়নি। বলল, সেদিনের কাগজের ওই খবরটাতেই তোমার মেজাজ বিগড়েছে দেখছি।...বাস্তব কথা বলি, যার যেটুকু প্রাপ্য ঠিক সেটুকুরই দাম দিতে হয়, তার বেশি দিতে গেলেই লোকসান। ওই কাগজের ওই রকমই ক্যারেকটার, অমনি চটকদার খবর ছেপেই ওটা দাঁড়াচ্ছে, কোনো বুদ্ধিমান মানুষ ও-সব গায়ে মাখে না।...আর ও পলিসি যদি নিতান্তই অপছন্দ হয়, নিজে ভার নিয়ে ভোল বদলে দাও, বাধা তো কিছু নেই।

গৌরী আর কতক্ষণ সহজতা বজায় রাখতে পারবে জানে না। চেষ্টা করছে। নাঃ, আমি জঞ্জালের মধ্যে থেকেও অভ্যস্ত নই, জঞ্জাল সাফ করেও না।

কমল চুপ একটু। চেয়ে আছে।—এটাই একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত তা হলে?

হ্যাঁ।

দু'চোখ ওর মুখের ওপর স্থির কয়েক নিমেষে। তারপর ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে মন্তব্য করল, সিদ্ধান্তটা

এই গোছের হবে আমি দু' বছর আগেই আঁচ করেছিলাম।...তারপর আরো একটা সিদ্ধান্ত বাকি ছিল। সেটা আমার প্রসঙ্গে। আমিও ওই জঞ্জালের মতো বাতিল বোধ হয়?

বাতিল নয়, তোমার অযোগ্য বুঝে নিজেই আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। আমাদের সম্ভ্রান্ত ঘরের মুখোশ খুলে দিয়ে তুমি তোমার নিজের আর আমার ভারী উপকার করেছ।

কমল চ্যাটার্জী চেয়ে আছে। ঠোঁটের হাসির দাগটুকু এখনো লেগে আছে। কিন্তু চাউনিটা ঈষৎ রূঢ় ঈষৎ ক্রুর।—তোমার এ সিদ্ধান্তও ফাইন্যাল বোধ হয়?

হ্যাঁ।

কমল চ্যাটার্জী তেমনি চেয়ে আছে। তেমনি হাসছে। তেমনি মৃদু তির্যক কণ্ঠস্বর।—এ-ও বোধহয় আমি দু'বছর আগেই জানতুম। ...এর পর আমাদের যোগাযোগ থাকারও নিশ্চয় কোনো মানে হয় না?

তুমি কাজের লোক সময় নষ্ট করে কি লাভ?

ভেরি গুড। উঠল আস্তে আস্তে।—চলি তাহলে?

হ্যাঁ, এসো।

চলে গেল।

আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণই গৌরীর বশে ছিল। শুধু এটুকুর জন্যেই তিনি দিন ধরে প্রস্তুত করছিল নিজেকে। সেই প্রস্তুতি খুব সহজে সফল হয়েছে। এত সহজে যে নিজেরই বিস্ময়।...তবু লোকটা চলে যেতে ভিতরে ভিতরে একটা জ্বালা অনুভব করছে গৌরী সিদ্ধান্ত।

এরপর দিন গেছে, মাস গেছে, বছর ঘুরছে।

দাদা অনেক আগেই বিলেত চলে গেছল। অনুপমা পরে গেছে। ওদের রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছল। সব ব্যবস্থা করে দাদা অনুপমার নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা করে রেখেছিল। অনুপমা ভালোভাবেই ডাক্তারি পাস করে মাস দুই হল রওনা হয়ে গেছে। মা আজও কিছুই জানে না।

গৌরী জ্যাঠামণির অভিলাষ পূর্ণ করেছে। আই. এ. এস্. পরীক্ষা দিয়েছে এবং প্রথম দশ জনের মধ্য দাঁড়িয়েছে। সমস্ত কাগজ বাইশ বছরের বাঙালি মেয়ের এই কৃতিত্বের প্রশংসা করেছে। ভারত সমাচারও তার চরিত্র বজায় রেখেছে। আনুষ্ঠানিক প্রশংসার পরে তারা গোটাকতক বক্র প্রশ্ন তুলেছে! যেমন, দিল্লীতে ভাইভা পরীক্ষার সময় গৌরী সিদ্ধান্তর সুপরিচিত জ্যাঠামশাই শ্রীঅমুকও দিল্লী গেছলেন কি না? বোর্ডের কারো-কারো সঙ্গে উক্ত ভদ্রলোকের অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে কি না? এবং উক্ত ভদ্রলোক তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুরনো হৃদ্যতা নতুন করে ঝালিয়ে নিয়েছেন কি না?

যে ভাবে লিখেছে, মানহানির কেস্ করা যেতে পারত। কিন্তু গৌরী ভ্রূক্ষেপ না করতেই চেষ্টা করেছে।

যথা সময়ে মুসৌরীতে ট্রেনিং-এর পর বাইরে পোস্টিং পেয়েছে। এখানেই যাতে হয় জ্যাঠামণির সে-চেষ্টা করার ইচ্ছে ছিল। গৌরী নিষেধ করেছে। শুরুতে তদ্‌বিরের দরকার নেই।

নয়

...আপাতত বাইরেই থাকতে চায় ও।

মাঝে চারটে বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে গৌরী টের পায়নি। চার বছরের মধ্যে দু'বার মাত্র পুজোর সময়ে কিছু বাড়তি ছুটি নিয়ে বাবা মায়ের কাছে থেকে গেছে। আর দু'বার মা আর জ্যাঠামণি গেছে ওর কাছে।

চার বছর বাদে প্রমোশন সহ এখানেই বদলি। তার কাজের রেকর্ড ভালো। এখানে এসেছে এ. ডি. এম. হয়ে।

কিন্তু দেশের চারিদিকে তখন দুর্দিনের ছায়া। সর্বত্র অসন্তোষ, সর্বত্র আন্দোলন। পশ্চিম বাংলায়, উড়িষ্যায়, মাদ্রাজে, কেরালায়, এমন কি দিল্লীতেও।

দেশে আকাল। খাদ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি। নানা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের হিড়িক পড়ে গেছে। সব রাজ্যেই ঘন ঘন হরতালের ডাক পড়ছে। কেন্দ্রীয় আর রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের ভ্রূকুটি ঘোরালো হয়ে উঠছে। তাদেরও প্রস্তুতির চাপা হুমকি শোনা যাচ্ছে।

সমস্ত দেশব্যাপী ওই সন্তোষ আর আন্দোলনের ঢেউ এখানেও ছড়াল। স্ফুলিংগ এখানেও জমাট বাঁধতে লাগল। এবং একটা বড় রকমের অগ্ন্যুৎপাদন ঘটে গেল গৌরী এখানে এ. ডি. এম. হয়ে আসার ঠিক ছ'মাসের মধ্যে।

দাবির আন্দোলনটা সর্বত্র যেমন রাজনৈতিক দলের দখলে চলে যায়, এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। সরকারি কর্মচারিদের ধর্মঘট শুরু হল। দিল্লী থেকে কঠোর নির্দেশ এলো কঠিন হাতে ধর্মঘট বানচাল করে দিতে হবে।

ফলে যুদ্ধে অবতীর্ণ যারা তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বিশ্বাসঘাতকতা করে যারা কাজে যোগ দিতে চেয়েছে তাদের মধ্যে কারো কারো আপিসের বদলে আগে হাসপাতালে যেতে হল।

দেখতে দেখতে সংঘাত জমাট বাঁধল, পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠল।...এই আন্দোলনের হাল এখন কাদের হাতে, এ. ডি. এম. গৌরী সিদ্ধান্ত খুব ভালো করেই জানে। তাদের প্রত্যেকের আই. বি. রিপোর্ট ওর টেবিলে। রিপোর্টে সব থেকে ফলাও করে যার সম্পর্কে লেখা সে কমল চ্যাটার্জী।

কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির ছাত্রদেরও এর মধ্যে টেনে এনেছে সে। সক্রিয় সহযোগিতা দানে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ক'দিন ধরে তাদের ক্লাস-ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। আগামী কাল ছাত্র দল, সরকারি কর্মচারির দল এবং ওই রাজনৈতিক উদ্যোক্তার দল এক বিপুল সমাবেশে একশ চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করে অ্যাসেমব্লি চড়াও করবে বলে উদ্দীপ্ত ঘোষণা সকাল থেকেই বার বার শোনা গেছে।

পরদিন যথাসময়ে সরকার পক্ষও মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত।

দুপুরে সেই বিপুল সমাবেশ সমবেত আগুন ছড়াতে ছড়াতে হজরতগঞ্জ ধরে এসে জি. পি. ও-র সামনে থমকে দাঁড়াল।

সামনে সশস্ত্র পুলিশের অবরোধ। পর পর অনেক সারি বন্দুক উঁচিয়ে প্রস্তুত। শুধু হুকুমের প্রতীক্ষা।

সামনের দিকের আইন অমান্যকারীরা ঝুপ ঝুপ রাস্তার ওপরই বসে পড়ল। বন্দুক দেখাও আর যাই কর, তারা নড়বার পাত্র নয়। পিছন থেকে জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুরু হল, আর মুহুর্মুহু শেম-শেম রব উঠতে লাগল। আর মাঝে মাঝে দু'চারটে ঢিলও এসে পড়তে লাগল।

পুলিশের গাড়ির পাশে নিজের সরকারি গাড়ির দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে পরিস্থিতি দেখছে গৌরী সিদ্ধান্ত। চোখে নীল গগল্‌স্! ডি. এম. রাজধানীতে অর্থাৎ দিল্লীতে—তাই তার গুরুদায়িত্ব।

থমথমে মুখে ডি. এস্. পি. দু'বার এসে জানিয়ে গেছে পরিস্থিতি ভালো না, ফায়ারিং-এর অর্ডার দিতে হবে। প্রথমে অবশ্য টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে ওদের হঠাতে চেষ্টা করা হবে, তাতে কাজ না হলে গুলি। শহরের প্রধান সড়ক ওরা আর বেশিক্ষণ এ-ভাবে আগলে থাকলে পিছনের জনতা বাড়বে, অবস্থা আয়ত্তে আনা আরো কঠিন হয়ে পড়বে।

এ. ডি. এম্. গৌরী সিদ্ধান্ত আরো একটু অপেক্ষা করতে বলেছে তাকে।

তীক্ষ্ণ চোখে সামনে জনতার দিকে চেয়ে আছে গৌরী সিদ্ধান্ত। ঠিক জনতার দিকেও নয়। একজনকেই দেখছে সে। কমল চ্যাটার্জীকে। ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করে জনতার উত্তেজনা চড়িয়ে রাখছে সে।...এবারে সামনে যারা বসে আছে তাদের কাছে এলো। পুলিশের বন্দুকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ নেড়ে কি বলছে সে। আর জনতা রুদ্র রোষে সায় দিচ্ছে।

ডি. এস্. পি. তৃতীয়বার এসে হুকুম চাইল, আর দেরি করা যায় না।

গৌরী বাইরে নিশ্চল, স্থির। কিন্তু ভিতরে কি যেন তোলপাড় চলেছে একটা। এতকাল বাদে থেকে থেকে বারবার সুলতা মাসির হাসি-খুশি মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

অনুমতির বদলে আঙুল তুলে কমল চ্যাটার্জীকে দেখিয়ে দিয়ে গৌরী সিদ্ধান্ত বলল, ওই ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে আসুন, আমি কথা বলব।

বিরক্ত মুখ করে উত্তেজিত পুলিশ অফিসার জবাব দিল, হি ইজ দি রিং লিডার, ডাকলে আসবে কেন?

আসবে। আপনি গিয়ে বলুন।

চারজন সশস্ত্র পুলিস নিয়ে ডি. এস. পি. এগিয়ে গেল। তাদের দেখে জনতা হঠাৎ স্তব্ধ একটু। নীল চশমার ভিতর দিয়ে গৌরী তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ করছে।...ডি. এস. পি. বলছে কি। কমল চ্যাটার্জী ঘুরে দাঁড়াল। দূর থেকে ওর দিকে তাকালো। তারপর এগিয়ে আসতে লাগল।

তাই দেখে ওই জনতা আরো স্তব্ধ। গৌরী সিদ্ধান্ত তেমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে। কমল চ্যাটার্জী সামনে এসে দাঁড়াল। সমস্ত মুখ, এমন কি গায়ের জামাটা পর্যন্ত ঘামে জবজব করছে। ঠোঁটের কোণে সেই পরিচিত বিদ্রূপের হাসি। ঘটা করে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল।

গৌরী সামান্য একটু মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। স্পষ্ট ঠাণ্ডা গলায় বলল, আর দশ মিনিটের মধ্যে ওই রাস্তা ছেড়ে ওদের চলে যেতে হবে। না গেলে তার ফলাফলের জন্যে আপনাকে দায়ী হতে হবে। যাতে ওরা উঠে যায় সেই ব্যবস্থা করুন।

স্পষ্ট বিদ্রূপের সুরে কমল চ্যাটার্জী বলল, আপনার চোখে নীল চশমা কেন, সাদা চোখে ফলাফল দেখতে লজ্জা করবে?

পাশে যারা আছে, ডি. এস. পি. বা আর কেউ বাঙালি নয়। তারা বিদ্রূপের আভাসই পেল শুধু, কি কথা হল সঠিক বুঝল না।

অনুচ্চ কঠিন স্বরে গৌরী সিদ্ধান্ত আবার বলল, আপনি ওখানে ফিরে যাবার ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত রাস্তা আমি ফাঁকা দেখতে চাই। তা না হলে আমাদের যা করার তাই করব।

জবাবে গলার স্বরে আরো ব্যঙ্গ ঢেলে কমল চ্যাটার্জী বলল, অতটা উদার না হয়ে আপনাদের যা করার এখনি করে ফেলুন তাহলে—দশ মিনিট ছেড়ে দশ ঘণ্টার মধ্যেও একটি প্রাণী যাতে না নড়ে আমি সে চেষ্টাই করব।

অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই ফিরে চলল। গৌরী কঠিন চোখে চেয়ে আছে সেইদিকে। বিশ গজ না যেতেই পুলিস অফিসারকে নির্দেশ দিল, ওকে অ্যারেস্ট করুন, ইমিডিয়েটলি!

সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান ছুটল। জনতার দিকে আধা-আধি পথ এগোবার আগেই কমল চ্যাটার্জীকে অ্যারেস্ট করে ভ্যানে তুলে নেওয়া হল।

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই নরক।

ক্ষিপ্ত জনতার কাছে এটা বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তারা। ইট-পাটকেল বর্ষণ শুরু হল। সেই উন্মত্ত জনতার ভিতর থেকে অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে এগোতে চাইল।

ডি. এস. পি. যথাবিধি নির্দেশ নিয়ে ছুটে এগিয়ে গেল। গুলি চালানোর নির্দেশ। এই নির্দেশই দিতে হবে—গৌরী সিদ্ধান্ত অনেক আগেই জানত।

পরদিন স্থানীয় সব ক'টা কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে পুলিশের গুলি চালানোর খবর বেরুল। এগারো জন নিহত, একশ দশ জন আহত, তার মধ্যে আরো চৌদ্দজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। প্রায় সমস্ত কাগজেই পুলিশের প্রয়োজনাতিরিক্ত নৃশংসতার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কিন্তু সব থেকে চাঞ্চল্যকর খবর ছাপা হয়েছে ভারত সমাচারে। পুলিশের নৃশংস বর্বরতার বহু নজির দেখিয়ে গাল-মন্দ করার পর তারা প্রশ্ন তুলছে, গুলি চালানোর আগের মুহূর্তে বিক্ষোভের অন্যতম নেতা কমল চ্যাটার্জীকে ডেকে নিয়ে তারপর অ্যারেস্ট করা হল কেন? ওই বিশাল জন-সমুদ্রের মধ্যে গুলি চালানোর আগে বেছে বেছে অ্যারেস্ট মাত্র ওই একজনকেই করা হল কেন?

নেতাদের মধ্যে আরো অনেকেই তো উপস্থিত ছিলেন সেখানে! তবে কি ধরে নিতে হবে মাত্র কমল চ্যাটার্জীকে গ্রেপ্তার করাটা তারই নিরাপত্তার কারণে? তাঁরা জানেন, এ. ডি. এম. শ্রীমতী গৌরী সিদ্ধান্ত স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, এবং ক্ষুধার্ত জনতার ওপর গুলি চালানোর আনুষ্ঠানিক হুকুম তিনিই দিয়েছেন (মায়ের জাতের কি অপরিসীম তেজ!)। আর তাঁরা এও জানেন, বিক্ষোভের ওই অন্যতম নেতা কমল চ্যাটার্জীর সঙ্গে ওই মহিলা দীর্ঘকাল গভীর প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ওই বৃহৎ জনতার ভিতর থেকে কৌশলে একমাত্র তাঁকে অ্যারেস্ট করে বিপদভূমি থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদারতা কি সেই দুর্বল স্মৃতির কারণে?...রমণীর মন কে-বা জানে, কিন্তু রক্ত-পিপাসু সরকার কি একটু জানতে চেষ্টা করবেন?

এরপর দু'তিন দিন ধরে অন্য স্থানীয় কাগজগুলিও ওই একই ব্যাপারে কটাক্ষ করে গেল। আর, দেখতে দেখতে আসল গোলযোগ ছেড়ে এই ব্যাপারটা নিয়েই শোরগোল পড়ে গেল। সরকারি দপ্তরে বহু চিঠি-চাপাটির ঘা পড়ল, আর খবরের কাগজেও চিঠির আকারে পাঠকের নানা-রকমের তির্যক মন্তব্য ছাপা হতে লাগল।

শেষে বড় বড় হরফে কাগজে আবার দেখা গেল, হোম সেক্রেটারি স্বয়ং এই ব্যাপারে তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

...তদন্ত করেছেন ঠিকই। এ. ডি. এম. গৌরী সিদ্ধান্তের কাছে লিখিত স্টেটমেন্ট চাওয়া হয়েছে।

গৌরীর যে ডাক্তার বাবা এক চিকিৎসা ভিন্ন আর কোনো কিছুতে মাথা গলান না, তিনিও উতলা।

গৌরী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে, কিছু ভেব না।

মা আরো বেশি উতলা। গৌরী হাসি মুখে তাঁকেও বলেছে, এমন কিছুই হয়নি তোমরা ভেব না তো?

ফাঁকি দেওয়া মুশকিল জ্যাঠামণিকে। তিনি এসে চুপ-চাপ ওর পিঠে খানিক হাত বুলিয়েছেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেছেন, এখন কি করা যায় বল দেখি!

গৌরী বলেছে, দোহাই জ্যাঠামণি, তুমি কিছু করতে যেও না, এ নিয়ে কিছু ভাবতেও যেও না। তোমার মেয়ে এত সহজে ঘাবড়াবার মেয়ে নয়, কি করব দু'দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে।

দশ

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার এই সাতাশ বছরের জীবনে উপকার ছাড়া কখনো তুমি অপকার কিছু করনি। তোমার আয়নায় এ যাবৎ নিজেকে আমি অনেকভাবে দেখেছি, অনেকভাবে যাচাই করে নিতে পেরেছি। আমার এ চিঠি পেয়েও তুমি হাসবে জানি। হয়তো এটাও তুমি তোমাদের ভারত সমাচারে একখানা জোরালো অস্ত্রের মতোই ব্যবহার করবে। কিন্তু আর আমি পরোয়া করি না। নিজের এই শক্তিটুকু চেনার ব্যাপারেও তোমার কাছে ঋণী, তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

শুনে খুশি হবে হয়তো, আমি চাকরি ছাড়ালাম। কিন্তু তুমি এই চেয়েছিলে বলে নয়, বা তোমার ভারত সমাচারের তৎপরতায় একটা তদন্তের প্রহসন হতে যাচ্ছিল বলেও নয়। এসব তদন্ত কোন তুচ্ছতায় গিয়ে শেষ হয় সে আমার জানা আছে। তবু চাকরি ছাড়ছি তার কারণ আছে। সেদিন রক্ত যারা দিল আর রক্ত যারা নিল তাদের মধ্যে কে ভালো কে মন্দ, বা কে ঠিক কে ভ্রান্ত সে বিচারে আমার নয়। সেদিন আমি একখানা যন্ত্রের মতোই সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আর সেখানেই আমার আপত্তি। আমি কোনো দিকেরই হাতিয়ার হতে চাইনে—এদেরও নয়, তোমাদেরও না।

...হ্যাঁ, তোমার কাগজে তুমি ঠিক টোপটিই ফেলেছ। সেই দিন সেই মুহূর্তে আমি পুরোপুরি যন্ত্র হয়ে উঠতে পারিনি শুধু তোমার বেলায়। পারিনি বলে আজও আমার একটুকু খেদ নেই। ...সেইদিন দূর থেকে তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে বারবার চোখের সামনে একজনকে দেখছিলাম আমি। তোমার

মাকে, আমার সুলতা মাসিকে। সেই হাসি-খুশি মুখ। কিন্তু বড় অবাক যেন। তিনি যেন অবাক বিস্ময়ে আমাকে বলছিলেন, এ কি হচ্ছে রে সব, চারদিকে এ কি কাণ্ড!

...তোমার ওই মাকেও চেননি তুমি, তোমার দুর্ভাগ্য আমি ঘোচাব কি করে। যাক, নিজেও আমি সরে দাঁড়াচ্ছি, লেখাপড়া যেটুকু শিখেছি তাতে তোমাদের কারও যন্ত্র না হয়েও জীবিকা অর্জনের একটা সহজ সাধারণ পথ খুঁজে পাব এটুকু বিশ্বাস আছে।

সম্ভবত আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তাই আর দুটো কথা বলি।...একশ' দু'শ তিন শ' চারশ' বছরের ইতিহাসের পাতা খুললেও দেখবে সেখানেও আজকের মতোই কত অশান্ত গর্জন কত চেঁচামিচি স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু আজ সে-সব একেবারে নিরর্থক মনে হয় না তোমার? সেদিনের হৃদয়শূন্য, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা-শূন্য একটি অস্তিত্বও কি তোমার মনে সাড়া জাগায়? আবার বেশি নয়, আজ থেকে পাঁচ-সাত যুগের সামনের জগতের ছবিটাও দেখতে চেষ্টা করো, যেখানে আজকের তুমি নেই, আজকের আমি নেই, আজ যারা আছে তারা কেউ নেই। সেদিন সেই মানুষেরা যারা হামেশা চাঁদে যাচ্ছে, অবলীলাক্রমে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছে—তারা তোমাদের আজকের দিনের এই অশান্ত গর্জন আর এই চেঁচামেচির কি দাম দেবে ভাবো? সেদিনের মানুষেরাও কি হৃদয়শূন্য, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা-শূন্য একটি অস্তিত্বও স্বীকার করবে মনে করো?

...যদি করে তাহলে তোমার কাছে যেমন, সেদিনের সেই সার্থক মানুষদের দলেও তেমনি জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমি অনুপস্থিতই থাকতে চাইব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তা হবে না, তা হবার নয়। প্রাণ পুড়িয়ে ভস্ম সঞ্চয় করে কেউ সার্থক হয় না। বরং বিশ্বাস, সেই অনাগত সার্থক মানুষদের কাছেও কেউ যদি আমার মত ঘোষণা করে, আমার হৃদয় আমার প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার জন্য আমি বিব্রত নই সঙ্কুচিত নই লজ্জিত নই—তারা হাসবে না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে না, তোমার মতো সেটা তারা এমন হৃদয়শূন্য স্বার্থের কাজেও লাগাবে না ।"—গৌরী সিদ্ধান্ত।

সাবরমতী

উৎসর্গ
শ্রীরবি বসু
প্রীতিভাজনেষু

লিখতে বসে এক সে বিদেশী বিদেশী মনে পড়ে গেল। সেই গল্পের নায়িকা কোনো রাজনন্দিনী। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত, সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে রাতে ফিরে আবার ঘুমনো পর্যন্ত, তার প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত নিয়মের সাড়ম্বর শৃঙ্খলায় বাঁধা।

কিন্তু রাজকুমারীর মাঝে মাঝে মনে হয়, শিকলে বাঁধা।

সোনার শিকল। জলুস আছে, ছটা আছে। তবু শক্তপোক্ত শিকলই বটে। ভাঙে না, ছেঁড়ে না। এ শিকল দেখে লোকের চোখ ঠিকরয়, বেদনার দিকটা কারো চোখে পড়ে না। রাজনন্দিনীর চলা-ফেরা ওঠা-বসা, তার বেশ-বাস সাজ-সজ্জা আহার-বিহার আরাম-বিরাম তার হাসি-আনন্দ শোক-তাপ—এক কথায় তার গোটা অস্তিত্ব এক সুমহান রাজকীয় ঐতিহ্যের ধারায় সুনির্দিষ্ট। কোনো ফাঁক নেই, কোনো ব্যতিক্রম নেই। ফাঁক কেউ খোঁজে না, ব্যতিক্রম কেউ চায় না। এমন কি অনেক-অনেকদিন পর্যন্ত রাজকুমারীও খোঁজেনি, চায়নি। চেতনার শুরু থেকে সে-যেন একটানা ঘুমিয়ে ছিল। সেই ঘুমের ফাঁকে তার চেতনা কখনো সুদূরপ্রসারী হতে চায়নি। কোনো নিভৃতের রহস্যতলে মাথা খোঁড়েনি। সেই নিয়মের ঘোরে কোনো বেদনা গুমরে উঠতে চায়নি।

কিন্তু রাজকুমারীর ঘুম হঠাৎ একদিন ভেঙে গেল। তলায় তলায় এই ঘুম ভাঙার প্রস্তুতি চলেছিল কবে থেকে তা জানে না।

সেটা রাজকুমারীর যৌবনকাল।...আশ্চর্য, নিয়মের ছকে বাঁধা সেই শান্ত যৌবনে সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ লাগে কেমন করে। শান্ত যৌবন দুলে ওঠে ফুলে ওঠে ফেঁপে ওঠে গর্জে ওঠে। হঠাৎ এ কি হল রাজকুমারীর! এ কি দারুণ যাতনা আর দারুণ আনন্দ! ঐতিহ্যের বাঁধগুলো সব ভেঙে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। সেই যৌবন মুক্ত হতে চায়, বন্য হতে চায়, সমুদ্র হতে চায়।

কিন্তু শুধু চায়। পারে না। পাল ছেঁড়ে না। হাল ঘোরে না।

শত শতাব্দীর নিয়মের বনিয়াদে ফাটল ধরে না। সত্তার আর এক দিক অটুট আভিজাত্যের নিশ্চিত বন্দরে বাঁধা। নিয়মের বন্দরে। অভ্যস্ততার বন্দরে। দিশেহারা দিকহারা হবার ঘোর কাটে একসময়। তাড়না সরে যায়। বহুদিনের বন্দী পাখি খাঁচা খোলা পেলে যেমন তার ডানা উসখুস করে ওঠে, বাইরে বেরিয়ে আসে—অথচ খাঁচার অলক্ষ্য বন্ধন আবার তাকে ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। ঠিক তেমনি করে নতুন অনুভূতির উত্তেজনা কাটিয়ে বিনা প্রতিবাদে আবার সে নিশ্চিন্ত শান্তির নৌকায় উঠে বসে। এ নৌকোর নোঙর ছেঁড়ে না।

রাজকুমারীর ভোগের উত্তেজনা আর ভোগের ক্লান্তি সম্বল।

কিন্তু একদিন...

রাজকীয় আভিজাত্যের সুতোয় গাঁথা মালা থেকে খসে-পড়া একটি দিন। সমস্ত হিসেবের বাইরের মুক্ত দিন একটা।

মাত্র একদিনের জন্য মুক্তি পেয়েছিল রাজকুমারী। রাজরীতির ছক-কাটা গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। অফুরন্ত মুক্তির বাতাসে ভাসতে পেরেছিল, হৃৎপিণ্ড ভরে নিতে পেরেছিল। সেই একদিনের জন্য রাজকুমারী ঐতিহ্যের শৃঙ্খল-মুক্ত, রাজটিকার ছাপমুক্ত, পরিচয়শূন্য সাধারণ রমণী একটি। বৈশাখের মেঘের মত মাত্র একদিনের জন্য সেই রমণী নিরুদ্দিষ্ট হতে পেরেছিল। সহস্র সাধারণের জীবনের স্রোতের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পেরেছিল, সেই এক মুক্ত দিনের প্রতিটি পল প্রতিটি মুহূর্ত যেন আস্বাদনের বস্তু। শুধু তাই নয়, ওই একটি দিনের মুক্তির মধ্যেই সেই তৃষাতুর রমণীর যৌবন নামশূন্য রাজটিকাশূন্য আর এক অতি-সাধারণ পুরুষ-যৌবনের সন্ধান পেয়েছিল, স্পর্শ পেয়েছিল। তাদের হৃদয়ের বিনিময় ঘটেছিল—যে বিনিময়ের জন্য নারী আর পুরুষের শাশ্বত প্রতীক্ষা।

. দুটি হৃদয় দুটি হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছিল।

কিন্তু একটা দিনের পরমায়ু কতটুকু আর? .

দিন ফুরিয়েছে। রাজকুমারীর মুক্তির মিয়াদও। পরদিনই আবার তাকে রাজসম্মানের সেই পুরনো জগতে ফিরে আসতে হয়েছে। আগের দিনটা যেন স্বপ্ন। স্বপ্ন, কিন্তু সত্যি। যে পুরুষ-হৃদয়ের সঙ্গে তার অন্তরতম বিনিময় ঘটেছিল, এই সাড়ম্বর রাজকীয় বেষ্টনীর মধ্যে সে অনেক দূরের মানুষ। দূরেই থেকেছে। দূরে সরে গেছে। হৃদয়-আকাশের দুটি ভাসমান মেঘ কাছাকাছি এসেছিল কেমন করে। মিলনমুখী হয়েছিল। কিন্তু মেলেনি। মিলতে পারলে ফলপ্রসূ হত, মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তার আগেই তারা থমকেছে। পরস্পরকে দেখেছে। চিনেছে। তারপর আবার যে যার দুদিকে ভেসে গেছে।

আর দেখা হয়নি। হবেও না।

রাজকুমারীর জীবনে আবার সেই প্রাণশূন্য পারম্পর্যশূন্য রাজ-আভিজাত্যে মোড়া একটানা দিনের মালা গাঁথা হতে থাকে। কিন্তু সেই মালার মাঝখানে দুলছে একটি মাত্র কক্ষচ্যুত দিনের স্মৃতি। হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ্য নিটোল শুচিশুভ্র একফোঁটা অশ্রু হয়ে মধ্যমণির মত দুলছে সেখানে।

কাহিনীটা মনে পড়তে লেখনী দ্বিধান্বিত হয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। আমার চোখের সামনে দুটি নারী-পুরুষের জীবন যে ছাঁদে যে ছন্দে ভিড় করে আসছে, দেশ-কাল-পাত্র হিসেবে ওপরের ওই কাহিনীর রমণীর সঙ্গে তাদের সহস্র যোজন তফাত। তবু কোথায় যেন মিল।

সাবরমতীর ধারে বসে সেই মিলের হিসেব মেলাতে গিয়ে বিস্ময়ের অন্ত নেই আমার। সেই বিস্ময়ের ঢেউয়ে দ্বিধা সরে গেছে। মানুষের নিভৃততম হৃদয়ের খবরে খুব বেশি রকমফের হয় না বোধহয়। হৃদয়ের তন্ত্রীতে আর এক হৃদয়ের স্পর্শ মুখর হয়ে উঠলে একই সুর বাজে বুঝি, একই ঝঙ্কার ওঠে। বিশ্ববেদনার একই সুর, বিশ্ব-হৃদয়ের একই রূপ। এই সত্যের নতুন পুরনো বলে কিছু নেই। যে সূর্য রোজ উঠছে, তার প্রথম আবির্ভাবের রূপটা চির-পুরাতন, কিন্তু চির-নতুন। রাতের রজনীগন্ধা যে বারতা পাঠায় সেটা প্রত্যহের বারতা হলেও পুরনো বলে কে কবে তার প্রতি উদাসীন হতে পেরেছে?

হৃদয়ের কথা এমনি কোনো সত্যেরই প্রতীক হয়তো।

কিন্তু হৃদয়ের ঠিক এই কথার জাল বিস্তারের আগ্রহ নিয়ে আমি এই সাবরমতীর দেশে আসিনি। বস্তুত, এখানে আসার পিছনে উদ্দেশ্য বলতে কিছু ছিল না। উপলক্ষ ছিল। সেও নিতান্ত গতানুগতিক। উপলক্ষ সাহিত্য-সম্মেলন। উদ্যোক্তারা বাংলার বাইরে এ-ধরনের সম্মেলনের আসর সাজানোর ফলে বহু সাহিত্যিরসিক কাব্যরসিক নাট্যরসিকের সমাবেশ ঘটে। এই সমাবেশের পিছনেও সাহিত্যরসাহরণ প্রধান আর্কষণ কিনা সঠিক বলতে পারব না। আমার দিক থেকে অন্তত আরো গোটা কতক জোরালো আকর্ষণ আছে। কোথাও থেকে আমন্ত্রণ এলেই সিঙ্গল্ ফেয়ার ডাবল্ জার্নির হাতছানিটা প্রথম চোখে ভাসে। দ্বিতীয়, সম্মেলনের চার-পাঁচটা দিন কোথাও রাজ-অভ্যর্থনা, কোথাও রাজসিক। বলা বাহুল্য, এটা নি-খরচায়। তৃতীয়, নতুন জায়গা দেখার সুযোগ।

তবু গুজরাটের এ-হেন জায়গায় বাংলা সাহিত্য অধিবেশনের ব্যবস্থার কথা শুনে একটু অবাক হয়েছিলাম। শুনেছিলাম, এই রাজ্যের ছেলেমেয়েরা প্রথম জ্ঞান-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বুঝতে শেখে। এই দেশ লক্ষ্মীর চলা-ফেরার একেবারে সদর রাস্তা। ভারতের সব রাজ্যে বিত্তবানের সংখ্যা কিছু আছেই—কিন্তু এখানকার মতো আর কোথাও নেই নাকি। ছেলে-বেলায় ভূগোল বইয়ে পড়েছিলাম বস্ত্র-শিল্পে গোটা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে রেখেছে এই একটি জায়গা। এই দেশ বলতে আমার চোখে শুধু ভাসত তুলোর চাষ, তুলোর গাছ, সুতোর কল, আর কাপড়ের কল।

অবশ্য এই ধারণার সবটাই অজ্ঞতা-প্রসূত। জানার তাগিদ থাকলে অনেক জানা যেত। একেবারে যে কিছুই জানতুম না তাও নয়। কিন্তু সেটা ভাসা-ভাসা জানা। শরতের হালকা মেঘের মতো একটা

অগভীর ধারণা শুধু মনের আনাচে-কানাচে ভাসছিল। এখানে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তার অনেকটাই সরে গেছে। শহরের বুকের ওপরেই সুতোর কল আর কাপড়ের কল অনেক আছে বটে। কিন্তু তুলোর চাষ, তুলোর গাছ নেই। তুলো আসে অনেক দূর থেকে। আসে পশ্চিমঘাট উপত্যকার সমতল ভূমি সহ্যাদ্রির কালো মাটির অঞ্চল থেকে, আর বহু দূরের সাতপুরা হিল্‌স্ থেকে।

এখানে এসে প্রথম যে জিনিসটি ভাল লেগেছিল, তা এখানকার মানুষদের অন্তরঙ্গ আতিথেয়তা, অমায়িক অথচ সহজ সৌজন্যবোধ। এ যাবৎ বিত্তবানের দু'রকমের আতিথ্য লাভের সুযোগ ঘটেছে। এক, খানদানী আতিথ্য। সেখানে গৃহস্বামী আর অতিথি যত কাছে আসে ততো ব্যবধান বাড়ে। তাদের আতিথ্যের চটকের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে হাঁপ ধরে আর ভিতরের এক ধরনের দৈন্য নিভৃতের নানা জটিলতার বিবরে আত্মগোপন করতে চায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের আতিথেয়তা নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ তুষ্টির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেবার মতো। উদ্বেগ নেই, মান খোয়া যাবার শঙ্কা নেই, হিসেব করে পা ফেলে চলার অদৃশ্য তাগিদ নেই। ঐশ্বর্য সেখানে চোখের ওপর সরাসরি সূর্যের আলো ফেলে দৃষ্টি অন্ধ করে না। উদয়ের প্রথম অথবা অস্তের শেষ আভার মত স্নিগ্ধ স্পর্শ ছড়ায়। স্মৃতিপটে সেটুকু লেগে থাকে। বিত্তবান ব্যক্তিবিশেষের এ-রকম আতিথ্য বেশি না জুটলেও জুটেছে। কিন্তু সমবেত বিপুল অভ্যাগতসমষ্টির প্রতি এখানকার সামগ্রিক আতিথ্যের রূপটাই এই দ্বিতীয় পর্যায়ের। এই জায়গাটার সম্পর্কে আগের ধারণা বা অজ্ঞতার জন্য মনে মনে নিজেই লজ্জা পেয়েছি। বিত্ত যেখানে প্রসন্ন দৃষ্টি ফেলে তার রূপ আলাদা।

শুকনো বাদামী বালির দেশ। কিছুটা টানের জায়গা। অঙ্কের হিসেবে মরুভূমির দূরত্ব এখান থেকে খুব দুস্তর নয়। কিন্তু মরুভূমি এখানকার কোনো কিছুতে টান ধরাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। একটা ভৌগোলিক অস্তিত্ব নিয়ে কোনো এক পাশে পড়ে আছে যেন। এখানকার মানসিকতা থেকে মরুভূমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

তার কারণ বোধহয় এখানকার হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে বইছে সাবরমতী। শহরের প্রায় মাঝখান দিয়ে গেছে। তার দু'কূলে শহর। একই শহর। স্বভাবতই মাঝে মাঝে সেতুবন্ধ চোখে পড়বে। মনে হয়, এই নদীর সঙ্গেই এখানকার মানুষদের নাড়ীর যোগ। জন্মের পর চোখ খুলেই যারা নদী দেখে তাদের সত্তাও সেইভাবেই পুষ্ট হয় বলে বিশ্বাস। এখানকার মানুষদের আমোদ-প্রমোদ ধর্মাচরণ অনেকটাই এই নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। ছিল বলি কেন, আজও নেই এ-কথা জোর করে বলতে পারিনে। দিন বদলেছে বলে হয়তো ধারা বদলেছে কিছুটা। পুরনোর উপর নতুনের আলো সর্বত্র যেমন পড়ে তেমনি পড়েছে। কিন্তু সেটা বহিরঙ্গের ব্যাপার।

দেশের সতেরোটি পবিত্র স্থানের মধ্যে বেশির ভাগেরই অস্তিত্ব এই সাবরমতীর তীরে। চোখে দেখিনি, গল্প শুনেছি—তিন বছর অন্তর মলমাসের উৎসবানুষ্ঠানে আজও হাজার হাজার রমণী খালি পায়ে এই সব পবিত্র স্থানে উপাসনান্তে নগর-প্রদক্ষিণ করে। অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সংস্কারান্ধ গরিব ঘরের মেয়ে নয় সকলেই। গরিবের সংখ্যা এমনিতেই কম এখানে, শিক্ষারও দ্রুত বিস্তার ঘটছে। রমণীদের বিশ্বাস তারা নগর প্রদক্ষিণ করলে নগরের কল্যাণ হবে। কেন হবে তা তারা জানে না বা জানতে চেষ্টাও করে না। শিক্ষার গর্ব বা বিত্তের ছটা প্রাচীন বিশ্বাসের শিকড় কেটে দেয়নি। কল্যাণ হোক না হোক কল্যাণ তারা চায় এটাই বড় কথা। নগর প্রদক্ষিণের এ-দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলেও নদীর ধারের আর এক উৎসব প্রত্যক্ষ করেছি। কার্তিকের শুক্লা-একাদশীর মেলা। শুধু মেলা দেখলে হয়তো এমন কিছু বৈচিত্র্য চোখে পড়বে না। বহু দর্শনার্থী বহু জন-সমাগম বহু পণ্যের চিরাচরিত দৃশ্য। কিন্তু মেলার অদৃশ্য মানসিকতাটুকু মনোগ্রাহী। দেবোত্থান একাদশীর মেলা—দেব-উঠি আগিয়ারস্।

শীতারম্ভের এই সময়টায় সাহিত্য-সম্মেলন ব্যবস্থার দরুন উদ্যোক্তাদের মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়েছি। নইলে দেখা হত না এই দেব-উঠি-আগিয়ারস্। আমি একালের মানুষ। স্বভাবতই একালের মন, একালের দৃষ্টি, একালের হৃদয় নিয়ে বসে আছি। শুধু আমি কেন, সকলেই। তবু এমনি সমাবেশে এলে মনে হয়, আমাদের এই দৃষ্টি মন হৃদয়ের একটা দিক বুঝি কবেকার কোন সাধক ভারতের

চতুষ্পথে বসে আছে। সেই ভারত বা সেই অতীতের সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তবু সুদূর অতীতের কোনো অনাবিল পুষ্টির সঙ্গে সত্তার একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ থেকেই গেছে। নইলে দেবতা উঠবেন শোনামাত্র একালের এই অশান্ত মন-সমুদ্রের তলায় তলায় নিঃশব্দ একটা ঢেউ ওঠে কেন? বহুকালের হারানো অথচ প্রায়-চেনা পথের স্মৃতি বার বার পিছনপানে টানে কেন?

—আর ক'টা দিন থেকে যান। শুক্লা-একাদশীর উৎসব দেখে যান। রমণীর সদয় মিষ্টি আতিথ্য বড় লোভনীয়ভাবে প্রসারিত হয়েছিল। এখানকার যে রমণীটি সকলের মধ্যমণি, তার প্রস্তাব।

—সেটা কি ব্যাপার? আমি উৎসুক হয়েছিলাম।

—দেব-উঠি-আগিয়ারস্—দেবোত্থান একাদশী।

—কি হয়?

মহিলা হেসে বলেছিল, হয় না কিছু। নদীর ধারে সকাল থেকে মেলা বসে।

বাংলাদেশের ছেলে, মেলা শুনে অভিভূত হবার কারণ নেই। তবু নতুন জায়গায় সব আকর্ষণ ছেড়ে মেলা দেখে যাবার প্রস্তাব শুনে বলেছি, দেশে মেলা দেখে দেখে এখন মেলার কথা শুনলে ভয় করে। এটা কি-রকম মেলা?

মেলার আলোচনা উপলক্ষ। লক্ষ্য, অবকাশ যাপন। সেটা মনের মতো হলে সবই ভালো লাগে। সামান্য আলোচনাও বৈচিত্র্যশূন্য মনে হয় না। মহিলা তেমনি হেসেই বলেছিল, কি-রকম আর, সব মেলা একই রকম। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ মেলে, আবার মন চাইলে দু'একজন মানুষেরও সন্ধান মেলে।

মহিলার হাসিমাখা মিষ্টি মুখে বাড়তি একটু লালিমা চোখে পড়েছিল কিনা ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু কথা ক'টা আমার কানে লেগেছিল। আজও লেগে আছে।

আজ যদি শুনি, কোনো কুবেরাধিপ সার অমুকের মেয়ে অথবা সার তমুকের বউ স্বল্প-পরিচয়ের অতিথিকে দেশের কোনো মেলা দেখে যাবার জন্য আপ্যায়ন জানাচ্ছে, কানের পর্দায় একটা নাড়াচাড়া পড়ে যাবে বোধ করি। যে মহিলার কথা বলছি এখানে তার মর্যাদা আরো বেশি ছাড়া কম নয়। কোনো পুরুষের গৌরবে গরবিনী নয়, নিজেই সে ভাগ্যের তুঙ্গশিখরাসীনা। তার লক্ষ্মীর প্রসাদ-ভাণ্ডারের দিকে তাকালে অনেক ভাগ্যবানের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়বে। শুনেছি এই লক্ষ্মীর প্রসাদ-ভাণ্ডারের দিকে তাকালে তা তো বটেই। ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের সঠিক হিসেব সে নিজেও রাখে না। বড় বড় কাপড়ের কলের সংখ্যা এখানে পঁচাত্তরের উপরে। তার দু'একটার মালিক হওয়া খুব বড় কথা নয় এখানে। এই দেশে লক্ষ্মীর সমুচ্ছল পদক্ষেপ বস্ত্রশিল্পের পথ ধরেই। কিন্তু বড় মিলগুলোর মধ্যেও যদি শুধুমাত্র একটিকে সবগুলোর চূড়ো হিসেবে বেছে নেওয়া যায়, দেখা যাবে সেই মিলের অধিশ্বরী এক মহিলা। যে রমণী এখানকার কটন্ চেম্বারের অধিনায়িকা—এ বছরের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট।

সেই রমণী। সেই মহিলা। আমাকে সাবরমতীর দেবোত্থান একাদশীর মেলা দেখে যাবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

...যশোমতী পাঠক।

এই নাম এখানকার সর্বস্তরের মেয়ে-পুরুষের সুপরিচিত।

হ্যাঁ, এখানকার সব থেকে বড় কটন্ মিলের মালিক, কটন্ চেম্বারের প্রেসিডেন্ট যশোমতী পাঠক সেই এক সন্ধ্যায় বলেছিল এই কথা। বলেছিল, কি-রকম আর, সব মেলা একই। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ মেলে। আবার মন চাইলে দুই-একজন মানুষেরও সন্ধান মেলে।

আমি হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। তাতে অভব্যতা ছিল না, বিস্ময় ছিল। কারণ, মনে মনে আমি তার দিন কতক আগে থেকেই দুটি নারী-পুরুষের জীবন-চিত্রের একেবারে অন্তঃপুরে বিচরণের চেষ্টায় ছিলাম। সেটা এই মহিলা জানে। শুধু জানে না, এই একটি কারণে আমার কিছু লাভ হয়েছিল। সে রকমটা আর কোনো অভ্যাগতর কপালে অন্তত জোটেনি। মহিলার পরোক্ষ প্রশ্রয়ের ফলে এই সাবরমতীর দেশে আসাটা আমার সার্থক মনে হয়েছিল।

শোনামাত্র সেই মুখের দিকে চেয়ে আমি কিছু দেখতে চেষ্টা করেছিলাম। মনে হয়েছিল, সাবরমতীর ওই মেলার সঙ্গে তার কোনো একটা নিরবচ্ছিন্ন মেলার ধারা মিশে আছে। যশোমতীর মন কাউকে চেয়েছিল, খুঁজেছিল। কারো সন্ধান মিলেছিল।

হতে পারে, দেবতা উঠেছিলেন।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গ পরের বিস্তার সাপেক্ষ। সাহিত্য-অধিবেশন উপলক্ষে সদ্য-আসা এই দুই চোখ তখন শুধু এই জায়গাটা আর তার মানুষগুলোকে দেখে বেড়াচ্ছিল। যশোমতী সম্পূর্ণ অপরিচিতা তখনো। নামটাই শুধু শোনা ছিল! সম্ভাব্য কোনো কাহিনীর গতি যে এই পথে গড়াবে, সেটা কল্পনার বাইরে। আমি তখন শুধু সাবরমতী চিনতে চেষ্টা করছিলাম।

নদীর কথায় যশোমতীর কথা এসে গেছে।

নদীর জল নীলাভ। নীল আভার সঙ্গে মানুষের ধমনীর রক্তের অদৃশ্য কি যোগ কে জানে। চারদিনের সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে এই প্রায়-অপরিচিত মানুষদের উদ্যম দেখেছি, উৎসাহ দেখেছি, উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছি। আমরা, বিশেষ করে খাস বাংলার সাহিত্যিকরা যেন ভারি প্রিয়জন তাদের। প্রিয়জনের প্রতি অন্তরঙ্গতার আতিশয্য যেটুকু, সেটুকুও অন্তরের। তাদের ঐশ্বর্যের ছটা থেকেও ছোট বড় নির্বিশেষে অন্তরের এই সামগ্রিক খুশির ছটাটুকুই বেশি টেনেছিল আমাকে।

কাপড়-কলের দেশে সাহিত্য-সম্মেলনের আড়ম্বর হবে শুনে মনে মনে যারা মুচকি হেসেছিল তারাও ভিতরে ভিতরে আমার মতই অপ্রস্তুত হয়েছে হয়তো। টাকা আছে অথচ সাহিত্য-প্রীতি নেই, এই দিনে সেটা মানহানিকর ব্যাপার প্রায়। সাহিত্য-সম্মেলনও সেই গোছেরই হবে ধরে নিয়েছিল সকলে। কিন্তু ঐশ্বর্যের সঙ্গে মার্জিত রুচি তার সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের দিকটা যে কত সহজভাবে মিশে আছে, এখানে এসে গোড়াতেই সেটা উপলব্ধি করতে হবে। লক্ষ্মী-সরস্বতীর চিরন্তন বিবাদের কথা মনে হবে না।

বিশেষ বিত্তবানদের প্রতি বিপরীত অবস্থার মানুষের এক ধরনের মানসিক বিরাগ আছেই। এই বিরাগের প্রধান হেতু বোধ করি বিত্তবানের হৃদয়শূন্যতা, পারিপার্শ্বিক মানুষের প্রতি তাদের নির্লিপ্ত উদাসীনতা। বিত্ত তার চারদিকে একটা বৃত্ত টেনে দেবেই। কিন্তু সেই বৃত্তটা ছোট বা সংকীর্ণ হলে যতটা চোখে লাগে, বড় হলে ততটা লাগে না বোধহয়। আমাদের চোখ ছোট বৃত্ত দেখে অভ্যস্ত। সেখানে স্বার্থ আর আত্মচেতনা আর মর্যাদাবোধ যেন সর্বদাই একটা ধারালো ছুরি হাতে পাহারায় বসে আছে। সেখানে হৃদয়ের কারবার নেই।

হৃদয়ের কারবারের খবর এখানেও খুব রাখিনে। কিন্তু এখানকার বৃত্তটা যে বড় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বড় বৃত্তের সঙ্গে পুরুষকার মিশলে তার চেহারা অন্যরকম। আর তার মধ্যে মানসিক সবলতা প্রতিফলিত হলে তার চেহারা আরো অন্য রকম। এই সামগ্রিক বিত্তের দেশে পথে-ঘাটে যে একটিও ভিখিরি চোখে পড়ল না সেটা নিশ্চয় চোখ বা মনের দিক থেকে অবাঞ্ছিত নয়। এ-হেন জায়গায় হঠাৎ বড়লোক হবার নেশায় পাগল হয়ে ছুটবে এমন একটিও রেসকোর্স যে নেই, এও নিশ্চয় এক সামগ্রিক মানসিক পুষ্টির লক্ষণ। এই পুষ্টির চেহারাটা সর্বত্র চোখে পড়ে না। না পড়লে আমাদের অভ্যস্ত চোখে তেমন ধাক্কা বা খোঁচাও লাগে না। কিন্তু পড়লে ব্যতিক্রম মনে হয়। এখানকার শিক্ষার ব্যবস্থাও সাবরমতীর মতো বহু ধারায় এঁকে-বেঁকে গেছে। প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান এখানেই। এর অধীনে শুনলাম বাহাত্তরটি কলেজ, আর তার মধ্যে একুশটি নাকি আছে এই শহরেই। কত রকমের কলেজ তার ফিরিস্তি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু অর্থ আর রুচি এখানে বিপরীত রাস্তায় চলছে না কেন, সেই প্রসঙ্গে এই উক্তি।

বিদেশে এসে সেখানকার একজন লোককেও দেশের ভাষায় কথা বলতে শুনলে আপনার ভালো লাগবে। কিন্তু এসে যদি শোনেন এবং দেখেন আপনার দেশের ব্যাপক সাহিত্যচিন্তার এক বৃহৎ সমজদারগোষ্ঠী আছে সেখানে—তাহলে সেই ভালো লাগাটা বুকের একেবারে কাছাকাছি কোথাও

পৌঁছতে বাধ্য। শরৎবাবু যে এখানে সমষ্টিগতভাবে এমন এক হৃদয়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত কখনো কল্পনাও করিনি। ঘরে ঘরে তাঁর ছবি, ঘরে ঘরে তাঁর অনুবাদ-সাহিত্য। ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারে এখানকার ছাত্রছাত্রীদের সব থেকে বেশি ভিড় বাংলা ক্লাসে। এর পিছনে একটাই কারণ। আমাদের কবি আর আমাদের লেখককে তাদের জানার আগ্রহ। এই আগ্রহ কল্পনার বস্তু নয়, বাস্তব সত্য। এতে তাদের জাতীয় বৈভবের কোনো খাদ মেশেনি। অল্পবয়সী এত ছেলেমেয়ে ছোটাছুটি করে এসে বাংলায় কথা বলবে, বাংলায় অভ্যর্থনা জানাবে—বাংলা সাহিত্য-সম্মেলনে এসেও এ আর কে আশা করেছিল?

বিলাস-ব্যসনের অনুষ্ঠান বলতে নাটক নাচ আর গান। এখানকার আবালবৃদ্ধ-বনিতা এই তিন কলার ভক্ত। প্রচুর খরচও হয় এতে। সম্মেলনে তিনের ব্যবস্থাই ছিল। নাটক একদিন, নাচ আর গান প্রতিদিন।

কমলা-তনয়া যশোমতী পাঠকের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ এক সন্ধ্যার গানের আসরে। কিন্তু এ কাহিনী বিস্তারের মত অনুকূল নয় সেটা আদৌ।

সাহিত্যের আসরে আগেও ক'দিন দেখেছি মহিলাকে। শুনেছি, আমাদের আপ্যায়ন এবং অভ্যর্থনার ব্যাপারে তারই উদার হাত সব থেকে বেশি প্রসারিত। অবশ্য সেটা প্রকাশ্যে নয়। সে-ও খুব অভাবনীয় মনে হয়নি, কারণ অপ্রকাশ্য উদারতা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হয়েই পড়ে আর তাতে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের চটক বাড়ে। মহিলা অধিবেশনে আসা মাত্র স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের একটু বেশি মাত্রায় সচেতন হতে দেখেছি। এক পাশের একটা নির্দিষ্ট আসনে বসে ঈষৎ কৌতুকমেশা গাম্ভীর্যে তাকে অধিবেশনের আলোচনায় মনোনিবেশ করতেও দেখেছি!

দেখেছি, তার কারণ মহিলার সম্বন্ধে এখানকার বাঙালী বাসিন্দাদের মুখে নিজের পেশাগত কিছু রসদের সন্ধান পেয়েছি। অবশ্য তখনো সম্পূর্ণই অগোচরের রসদ সে-সব। অর্থাৎ মহিলাকে দেখার আগের রসদ। সেটা সব থেকে বেশি যুগিয়েছে ত্রিপুরারি ঘোষ। বস্তুত, আমার এখানে আসাটা সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের আগ্রহের দরুন যতটা না, তার থেকে অনেক বেশি ত্রিপুরারির তাগিদে। না এলে জীবনে আর মুখ দেখবে না, চিঠিতে এমন হুমকিও দিয়েছিল সে। লিখেছিল, তার প্রাণের দায়—না এলেই নয়।

যশোমতী প্রসঙ্গে এই ত্রিপুরারির মুখখানা উদ্ভাসিত হতে দেখেছি কতবার ঠিক নেই। অথচ স্বভাবের দিক থেকে বরাবর ওকে নীরস গদ্যাকারের মানুষ বলে জানি। ছোট একটা কবিতা মুখস্থ করতে গলদঘর্ম হয়ে উঠত, কিন্তু লাভ-লোকসানের দুরূহ অঙ্কের ফল মেলাতে ওর জুড়ি ছিল না। ছেলেবেলা থেকে হিসেব করে চলত, উচ্ছ্বাসের মুখেও হিসেবের রাশ টেনে ধরত, পাছে কাউকে পাওনার অধিক দিয়ে বসে। সে টাকা-পয়সাই হোক বা নিন্দা-প্রশংসাই হোক। হস্টেলের ও ছিল ম্যানেজার। বাজার সরকারের মোটা চুরি ধরা পড়েছিল একবার। কিন্তু সরকার এমন নিখুঁত হিসেব দিয়েছিল যে তাকে বরখাস্ত করার বদলে দু'টাকা মাইনে বাড়ানোর সুপারিশ করেছিল ত্রিপুরারি।

কলেজে ঢুকেও এই হিসেবের রাস্তাই ধরেছিল সে। কমার্স পড়েছে। পাঠগত ঐক্যে সেই প্রথম বিচ্ছেদ। তারপর কর্মের অধ্যায়ে সঙ্গবিচ্ছেদ। নিষ্ঠা সহকারে ত্রিপুরারি সেই হিসেবের রাস্তা ধরেই গিয়েছে। এম. এ. কমার্স পাস করেছে, অ্যাকাউন্টস্-এর আরো দুই একটা কি বাড়তি পরীক্ষাও দিয়েছে শুনেছিলাম। তাতেও ভালো করেছে। কিন্তু উপরওয়ালা অনেকদিন পর্যন্ত তার চাকরির ব্যাপারে হিসেবের গরমিল করেছেন। কোনোটাই মনের মত হয় না। কর্মজীবনে নানা ঘাটের জল খেয়ে এক সময় ওই কাপড়ের কলের দেশে গিয়ে স্থিতি হয়েছে সে। দু'তিন বছর অন্তর দেখাশুনা হয় ও কলকাতায় এলে। কোন্ এক কটন্ মিলের চিফ অ্যাকাউন্টেন্টের পোস্টে প্রমোশন পেয়েছে—ওর সম্পর্কে আমার শেষ খবর এইটুকু।

এই ত্রিপুরারির অপ্রত্যাশিত পত্রাঘাতে একটু অবাকই হয়েছিলাম। পত্র একটি নয়, পর পর কয়েকটি। সব ক'টারই সারমর্ম এক। আসা চাই। আসা চাই-ই চাই। না এলে ওর প্রেস্টিজের হানি। ফার্স্টক্লাসের যাতায়াতের ভাড়া পাঠাতেও সে প্রস্তুত।

সেই কাঠখোট্টা চিঠির কোনো কোনো অংশ হাসি উদ্রেক করার মতো। লিখেছিল, আমাদের সাহিত্য-ফাহিত্যের কানাকড়ি দামও সে কোনো দিন দেয়নি। আজও এর মর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু এখন বুঝছে ঘামালে ভালো করত। অন্তত কখন কি লিখছি আমি, তার একটু-আধটু খবর রাখলেও মন্দ হত না। কারণ, জীবনের এই নতুন অভিজ্ঞায় সে দেখছে অকাজের কাজও কখন যে কত বড় হয়ে ওঠে তার ঠিক নেই। লিখেছে, আমার বোধহয় জানা নেই, যে বিশাল কটন্ মিলের সে চিফ্ অ্যাকাউন্টেন্ট এখন, তার একেশ্বরী অধিশ্বরী এক রমণী। রমণীর সাহিত্যপ্রীতি সম্পর্কে বিশদ কোনো ধারণা ছিল না ত্রিপুরারির। এর থেকে যে এমন বিপদজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে তাও কখনো কল্পনা করেনি। সংস্কৃতির সর্ব ব্যাপারে মহিলাটির মোটামুটি এক ধরনের প্রীতির যোগ দেখে অভ্যস্ত সকলে। এটা বাইরের বস্তু বলেই ধরে নিয়েছিল ত্রিপুরারি। কারণ এতবড়ো কোম্পানির যাবতীয় হিসেব দেখতে এবং বুঝে নিতে চেষ্টা করে যে মহিলা, সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে তার সময় নষ্ট করার মতো সময় আছে বলেই সে ভাবতে পারত না।

ত্রিপুরারির যত ফ্যাসাদ এই ভাবতে না পারার দরুন।

আসন্ন সম্মেলনের আগে কর্ত্রীর ঘরে তার ডাক পড়েছিল মোটা অঙ্কের কিছু নগদ টাকা যোগানোর জন্য। মোটা অঙ্ক বলতে দু'দশ লাখ টাকার চেকও অনায়াসে মহিলা নিজেই কাটতে পারে। কিন্তু সচরাচর তা করে না। করে না তার কারণ সে বুদ্ধিমতী। গণ্যমান্য সমাবেশের খরচটা যদি কোম্পানির কোনোরকম প্রচারের খাতে চালিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে মোটা অঙ্কের আয়কর বাঁচে। ব্যাঙ্কের ব্যক্তিগত তহবিলও নড়চড় হয় না। এ-সব ব্যাপারে মহিলার পাকা মাথা অনেক সময় বিড়ম্বনার কারণ, অনেক সময় বিস্ময়ের।

কথা-প্রসঙ্গে এখানেই ছেলেবেলার পরিচিত বন্ধু হিসেবে আমার নামটাও সাত-পাঁচ না ভেবেই ছুঁড়ে দিয়েছিল ত্রিপুরারি। কর্ত্রীর ঘরে বসে আরো কারা দু-চারজন চেনা-জানা সাহিত্যিকের নাম করছিল। কে আসতে পারে না পারে। মুখ খুলে এমন ফ্যাসাদে পড়বে ত্রিপুরারি ভাবতেও পারেনি। শোনামাত্র মহিলার আগ্রহ দেখে সে অবাক যেমন, বিব্রতও তেমনি। এক কথায়, আমাকে সম্মেলনে আনার দায়িত্ব ওর ঘাড়েই পড়েছে। এখন আনতে না পারলে ওর ঘাড় বাঁচে না। এর পরে দেখা হলেই কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, আপনার বন্ধু আসছেন তো?...অতএব, সম্মেলনের কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণের অপেক্ষায় আমি যেন বসে না থাকি। এ যাত্রায় ওর মুখরক্ষার ব্যবস্থাটা আমাকে করতেই হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানে আসার পর অবশ্য এই বিশেষ আমন্ত্রণের আনন্দটুকু কিছুটা নিষ্প্রভ হয়েছিল। কারণ, শুনলাম মহিলার এ-ধরনের আগ্রহের নায়ক আমি একলা নই। বাংলাদেশের যে সাহিত্যিক বা কবির নামই এই স্থানে একটু-আধটু পরিচিত—তাকেই সম্মেলনে আনার জন্য কোনো না কোনো বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। আসল উদ্দেশ্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি জমজমাট করে তোলা। বিশেষ আমন্ত্রণ-ব্যবস্থায় লেখকরা অনেকেই আমার মতো পরিতুষ্ট দেখলাম। অতএব নিজেকে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি মনে করার খুব কারণ নেই।

স্টেশনে নিতে এসেই ত্রিপুরারি ঠাস ঠাস কথা শুনিয়েছে। সে-কথা থেকে ওর বক্তব্য উদ্ধার করা সহজ নয়।—দুটো প্রেমের গল্প বাতাসে ছেড়ে দিয়ে কি মজাই লুটছ বাবা তোমরা, এমন জানলে কোন্ শালা অ্যাকাউন্টস্ নিয়ে মাথা খুঁড়ত! মাঝবয়সে এখন সাহিত্যের পিছনে ছোটাছুটি—

—ছোটাছুটি কি রকম? আমি ঘাবড়েই গেলাম, তুমিও সাহিত্য চর্চা শুরু করেছ নাকি?

অবাঙালি ড্রাইভারকে ওর বাড়ির দিকে চালাতে নির্দেশ দিয়ে ভুরু কুঁচকে ঘুরে বসল।—শুরু করেছি মানে? একের পর এক শেষ করছি। প্রথম তিন পাতা, মাঝের তিন পাতা, আর শেষের তিন পাতা। একদিনে একখানা বই তিনবারে ফিনিস। গেল এক মাসে কম করে তোমার দশখানা বই লাইব্রেরি থেকে ইস্যু করতে হয়েছে, জানো?

হেসে বাঁচি না।—সে কি হে! তোমাকে এ-রকম শাস্তির মধ্যে কে ফেললে?

—হাসো, খুব হেসে নাও, বে-কায়দায় পড়লে সকলেই হাসে—বউও হেসেছে। আমার হাতে নভেল দেখে তো প্রথমে ভয়ই পেয়েছিল, ভেবেছিল মাথাটাই বুঝি গেছে খারাপ হয়ে। চোখ-কান বুজে তোমার সব থেকে গাবদা রাবিশ বইটাকে পর্যন্ত খতম করেছি, জানো?

—সত্যি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে প্রাণ বেঁচেছে ওই শর্ট-কাট বার করে। প্রথম, মাঝের আর শেষের—তিন তিরিক্কে ওই ন'পাতা। তাও কি হয়! এক একটা অ্যাকাউন্টস্ মেলাতে গিয়ে কতবার পর পর তিন রাত চার রাত চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেছে—সেই ঘুম পোড়া চোখের সামনে যেই তোমাদের ওই ছাইভস্ম গল্পের বই খোলা, অমনি কে যেন সাঁড়াশি দিয়ে ধরে চোখের পাতা টেনে নামিয়ে দেয়। শেষে ওই শর্ট-কাট বার করে বাঁচোয়া। দিনে তিন পাতা করে তিন দিনে ন'পাতা—একখানা বই শেষ। চরিত্রের নাম জানা গেল, কে কোন্ হাওয়ায় ভাসছে একটু-আধটু বোঝা গেল, আর শেষ ওলটালে বিচ্ছেদ কি মিলন সে তো দয়া করে তোমরা জানাবেই। ব্যস্, আলোচনায় একটু-আধটু মুখ নাড়ার পক্ষে ওটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু তাও কি ফ্যাসাদ কম! তিনটে বই শেষ করতে না করতে সব মিলে-মিশে জগাখিচুড়ি,—এই বইয়ের নায়ক ওই বইয়ের নায়কের ঘাড়ে চাপল, এর ঘটনা ওর কাঁধে। এক নায়িকার মিলন আর এক নায়িকার বিরহের সঙ্গে ঘুলিয়ে গেল—রাবিশ! গোড়া থেকে একটা চার্ট করে পড়লে হয়তো কিছুটা মনে রাখা সম্ভব।...কি বিপাকে না পড়েছিলাম সেদিন! তোমার কোন্ উপন্যাসের কি এক চরিত্র মনে ধরেছে আমাদের লেডির, প্রশংসা কচ্ছিল —চোখ কান বুজে আমিও দু'দশ কথা জুড়ে দিলাম, যেন আমার পরামর্শ নিয়েই তুমি লিখেছ। তারপর দেখি ভদ্রমহিলা হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছে। তক্ষুনি বুঝলাম মিসফায়ার হয়ে গেছে। মুখ টিপে হেসে লেডি বলল, আপনার সব ঘুলিয়ে গেছে, কার সঙ্গে কি জুড়ছেন ঠিক নেই।

আমার শ্রোতার ভূমিকা। শুনতে ভালো লাগছিল। কিন্তু ত্রিপুরারি আবার বাড়িয়ে বলছে কিনা সেই খটকা লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম,এ-সব বই তো অনুবাদ হয়নি, উনি বাংলা পড়তে পারেন নাকি?

—বাংলা এখানে অনেকেই লিখতে পড়তে পারে—আমাদের লেডি বাংলায় ভাবতে পর্যন্ত পারে। তার লাইব্রেরি বাংলা বইয়ের সমুদ্র একখানা। দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে। কলকাতা থেকে বই আসে না এমন মাস যায় না।

অবাক হবারই কথা। কাপড়ের কলের সঙ্গে সাহিত্য বস্তুটার কতটা মেশা সম্ভব—সেই সংশয়। বললাম, ওঁর তো মস্ত কটন্ মিল শুনেছি?

—হ্যাঁ। বিগেস্ট্।

—উনিই চালান?

—সব তার নখদর্পণে।

—লেডির লর্ড কি করেন?

মুচকি হেসে জবাব দিল, আইনত লর্ড নেই।

তেমন প্রাঞ্জল ঠেকল না কানে। জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলে-পুলে কি?

তুমি একটি গণ্ডমূর্খ। ছেলে-পুলে থাকতে হলে একটি স্বামীর দরকার হয়।

আমি অপ্রস্তুত।—কেন, বিধবা নন?

—না। অধবা।

শোনামাত্র যে অনুভূতিটা প্রবল হল, তার নাম কৌতূহল। এই কাহিনির সূত্রপাত তখনি ঘটে গেল কিনা জানি না। ত্রিপুরারির গাম্ভীর্যটুকু খুব অচপল মনে হল না।

—বয়েস কত?

—গোটা চল্লিশ হতে পারে।

সম্ভাব্য কাহিনিটা একটু নিষ্প্রভ হবার দাখিল। তবু বললাম, একেবারে হতাশ হবার মতো নয়, চেহারা স্বাস্থ্য-টাস্থ্য কেমন?

ত্রিপুরারি ঘুরে বসল।—কি মতলব?

—কিছু না। কেমন?

ত্রিপুরারি কাব্য করতে জানে না। তবু যা বলল, খুঁজলে একটু কাব্যের ছোঁয়া মিলতে পারে।—সামনে এসে দাঁড়ালে হিসেব-পত্র ভুল হবার মতো। দেখলে চল্লিশ বছর বয়সের থেকে গোটা পনেরো বছর অন্তত ঝেঁটিয়ে বাদ দিতে ইচ্ছে করবে। তোমাদের তো করবেই, চল্লিশ নিয়ে কবে আর কারবার করো তোমরা—ও বয়েসটা কেবল মাসি পিসির ঘাড়ে চাপিয়ে বেড়াও।

অ্যাকাউন্টেন্ট যেন আমিই, বললাম, চল্লিশের হিসেব নিয়ে এগনোর ব্যাপারেও অনভ্যস্ত নই খুব। মোট কথা তুমি তাহলে লেডিকে চল্লিশ মাইনাস পনের ইজ্ ইকোয়াল্ টু পঁচিশের চোখে দেখো?

—আমি? আমি তাকে দেখলে চোখে শুধু সর্ষেফুল দেখি।

—তোমার সঙ্গে ভাব-সাব কেমন?

জবাব দিল, ভাব-সাব বলতে সুনজর খুব। এতবড়ো ব্যবসার চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট একজন বাঙালি হবে এটা কেউ চায়নি। সতেরজনে সতের রকম পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু আগের বুড়ো চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট রিটায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে কাউকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করে লেডি যা করা উচিত তাই করলে, চোখ-কান বুজে সরাসরি আমাকে তার জায়গায় বসিয়ে দিলে।

গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, একেবারে বসিয়ে দিলে, না কিছু বাকি আছে?

খটকা লাগল, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠল না। বোকার মতো জিজ্ঞাসা করল, কি বললে?

বললাম, তোমার আশা কি? বক্তব্য আরো প্রাঞ্জল না করলে ওর হিসেবী মাথায় ঢুকবে না।—ঘরে তো সেই কবে একটিকে এনে বসে আছ—তার মারফত আরো কটি এসেছে খবর রাখিনে—ছেলে-পুলে কি তোমার, তিনটে না চারটে?

হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক, তারপর আস্তে আস্তে বোধগম্য হল যেন। ড্রাইভার বাংলা বোঝে না, তাও সচকিত। মুখখানা দেখার মতোই হল তারপর। কোনো দেবী অথবা দেবী-সদৃশাকে স্থূল রসিকতার মধ্যে টেনে আনতে দেখলে ভক্ত যেমন বিচলিত হয়, ত্রিপুরারির মুখের সেই অবস্থা। চুপচাপ খানিক চেয়ে থেকে মন্তব্য করল, তুমি একটা রাসকেল! হেসে ফেলল।—একটু আগে বলেছিলাম, আইনত লেডির কোনো লর্ড নেই, সেটা কানে গেছে?

—গেছে।

—কিন্তু আইনের বাইরে একজন আছে। সে-খবর রাখে না ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষের মধ্যে এমন একজনও পাবে না। জেনেও সকলে শ্রদ্ধাই করে তাদের। চাপা রসিকতায় বলার ধরন তরল হয়ে আসছে ত্রিপুরারির।

—লর্ডটি কে?

—শঙ্কর সারাভাই—সে-ও মস্ত কটন্ মিলের মালিক, ব্যবসায়ে আমাদের লেডির সঙ্গে কি-স কম্‌পিটিশন। সেই রেষারেষি দেখলে তুমি ভাববে একজন আর একজনকে ডোবাবার ফিকিরে আছে কেবল। এই দুদিন আগেও লেডি তার মিলের একজন ভালো মেসিনম্যান ভাঙিয়ে আনতে পেরে মহা খুশি। পরে জানা গেল সেই ভাটিয়া ভদ্রলোক দিনের বেলাতেও হোম-মেড্ নেশা করত বলে শঙ্কর সারাভাই তিনবার ওয়ার্নিং দিয়ে তাকে বরখাস্ত করেছে।

—হোম-মেড নেশা কি রকম?

—এখানে নেশার বস্তু দুর্লভ।

—আগ্রহ বোধ করার মতো কিছু রসদের ঘ্রাণ পাচ্ছি মনে হল। জিজ্ঞাসা করলাম, শঙ্কর সারাভাইয়ের বয়েস কত?

ভুরু কুঁচকে ত্রিপুরারি ভাবল একটু। হিসেব ভুল করা তার রীতি নয়। জবাব দিল, লেডির সঙ্গে আরো বছর পাঁচেক যোগ দাও।

—বিবাহিত?

চাপা কৌতুকে টসটস করে উঠল ত্রিপুরারির মুখ। সেই মুখ দিয়ে আধা কাব্য নিঃসৃত হল।—না, ওই এক রমণীবল্লভ।

এই প্রেমের সঠিক হদিস মিলল না। জিজ্ঞাসা করলাম তাদের মিলন-পর্বটি সমাধা হবে কবে—শ্মশান-যাত্রার আগে?

প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরে যেতে ত্রিপুরারির উৎসাহ বাড়ল। বলল, তাও হবে না, আবার হয়েও গেছে বলতে পারো। তোমরা সাহিত্যিক রাসকেলরা মিলন-পর্ব যাকে বলো, সে সম্বন্ধে সঠিক খবর দিতে পারব না। যা লেখো, পড়লে একা ঘরেও কান গরম হয়। মোট কথা, এ-ক্ষেত্রে আত্মার মিল, জাতের অমিল। সারাভাই বামুন নয়, যশোমতী পাঠক নিখাদ ব্রাহ্মণ-কন্যা...আজকালকার দিনে এখানে এ-রকম বাধা ঘোচেনি এমন নয়, কিন্তু ওদের ব্যাপারটা ঠিক সে-রকম নয়।

ত্রিপুরারির প্রাথমিক রিপোর্ট অভিনব কিছু নয়, তবে মোটামুটি কৌতূহলোদ্দীপক। জিজ্ঞাসা করলাম, তা ব্যবসায় রেষারেষি খুব?

—খুব। আবার মিলও খুব। কোনো ব্যাপারে পরামর্শ দরকার হলে লেডি একমাত্র তার ওই লর্ডের শরণাপন্ন হয়। তা এতবড়ো কারবার চালাতে পরামর্শের তো হামেশাই দরকার। লর্ডটি সে ব্যাপারে উদার এবং মুক্ত-মস্তিষ্ক।

দুই

দুজনকেই দেখেছি। যশোমতী পাঠককে সম্মেলনের প্রতি দিনই। শঙ্কর সারাভাইকে একদিন। কিন্তু সেই একটা দিনের চিন্তা অজ্ঞাত অনেকগুলো দিনের মধ্যে প্রসারিত হতে চেয়েছে।

মূল সভাপতি একজন। শাখা সভাপতি এবং প্রধান অতিথির সংখ্যা অনেক। কিন্তু সভানেত্রীও একজন। যশোমতী পাঠক। অবশ্য সেটা স্থানীয় সম্পাদকের উদাত্ত ঘোষণায় জানা গেছে। সভানেত্রীর নীরব উপস্থিতি ছাড়া আর কোনো কাজ আছে বলেই মনে হয়নি আমার। বক্তৃতা করা দূরে থাক সভাপা[illegible]দের সঙ্গে উঁচু ডায়াসে গিয়েও বসেনি। সামনের সারির শ্রোতাদের এক পাশে একটা নির্দিষ্ট আসনে প্রত্যহ চুপচাপ বসে থাকতে দেখা গেছে তাকে। ত্রিপুরারি তার হয়ে সুপারিশ করেছে, বলেছে কর্মী যে যত প্রবল তার দুই ঠোঁট অতো বেশি সেলাই করা, বুঝলে? ওই মহিলা একদিন না এলে এমন জম-জমাট সভা-ঘর নীরস লাগত সকলের। এসে যখন ঢোকে, কেমন লাগে বল তো?

শেষের উক্তিতে আতিশয্য ছিল না। এই বিশাল হল্-ঘরে মহিলার পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার কর্মকর্তাদের চোখে-মুখে এক ধরনের নীরব অথচ উৎফুল্ল তৎপরতা লক্ষ করেছি। আর সমবেত স্থানীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাদের সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেও দেখেছি। অভ্যস্ত সহজ সৌজন্যে এই শ্রদ্ধা গ্রহণ করে হাসিমুখে সহস্রজোড়া চোখের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে সে মঞ্চের সামনের আসনটি গ্রহণ করেছে। সেই আসনও তার জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। প্রথম দিন স্থানীয় উদ্যোক্তারা শশব্যস্তে তাকে মঞ্চের আসনে নিয়ে বসাতে চেয়েছিল। হাসিমুখে মহিলা শুধু একবার হাত নেড়ে দিয়ে সামনের আসনটিতে বসে পড়েছিল। তারপর রোজই সেই আসনে বসছে।

লক্ষ শুধু আমি নয়, সকল অতিথিবর্গই করেছে।

ত্রিপুরারি চল্লিশ বছর বয়েস বলেছিল মহিলার। আর তারপর পনেরোটা বছর ছেঁটে নিতে বলেছিল তার থেকে। অতিশয়োক্তি করেনি।...আর তার চেহারা প্রসঙ্গে আমার কৌতূহলের জবাবে বলেছিল, সামনে এসে দাঁড়ালে হিসেব-পত্র ভুল হবার মতো। সেই কাঠখোট্টা উপমা শুনে রূপসী বোঝা গিয়েছিল। সুখের ঘরে এই রূপের বাসা অভাবনীয় কিছু নয়। অর্থও রূপ বাড়ায়। সেই রূপ কিছুটা দেখা আছে। সেই রূপের থেকে চিত্তে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আমার চোখে সব থেকে বেশি লোভনীয় যেটুকু মনে হয়েছে, সেটা মহিলার ঐশ্বর্যের ছটাও নয়, রূপের ছটাও নয়। সেটা রমণী-মুখের প্রায়-নিরাসক্ত কৌতুক-মাধুর্য। শুধু সেইটুকু লক্ষ করে দেখলে অ-শিল্পীরও শিল্পী হতে

সাধ হতে পারে। সারাক্ষণ সেই কৌতুক যেন নিঃশব্দে একটু হাসি হয়ে চোখের পাতায় আর ঠোঁটের ফাঁকে টলমল করছে।

ত্রিপুরারির মুখে এত কথা শোনা না থাকলে আমি এভাবে দেখতুম কিনা জানি না। সমস্তক্ষণের মধ্যে কতবার চোখদুটো ওই মুখের দিকে ধাওয়া করেছে, পাশে বসেও চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট ত্রিপুরারি ঘোষ তা খেয়াল করেনি। খেয়াল করলে আমার লজ্জার কারণ হতে পারত। কারণ অভিযোগটা সকলরবে সে তার গৃহিণীর কাছে পেশ করত।

আলাপ ঠিক নয়, তবে প্রথম দিনের অধিবেশনেই পরিচয় হয়েছিল মহিলার সঙ্গে। উদ্যোক্তাদের মারফত নিতান্ত আনুষ্ঠানিক পরিচয়। মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত জোড় করে অভিবাদন গ্রহণ করেছে এবং জানিয়েছে। অন্যদের বেলায় এটুকুতেই শেষ হয়েছে, আমাকে শুধু বলেছে, আপনার কথা ঘোষবাবুর মুখে শুনেছি।

বলা বাহুল্য, আমি খুব কৃতার্থ বোধ করিনি। ত্রিপুরারিকে ঘোষবাবু না বলে মিস্টার ঘোষ বললে কানে একটু অন্যরকম লাগত কিনা বলতে পারি না। অস্বস্তিকর অনুভূতিটা গোপন করা সহজ হচ্ছিল না খুব। ত্রিপুরারি আমার বন্ধু। আর ঘোষবাবু এর বেতনভুক কর্মচারী। তুলনা দিতে হলে কুবের-নন্দিনীর দ্বাররক্ষী উপমাটাই মনে আসে। বন্ধুকে ভালোবাসি, কিন্তু ঘোষবাবুর মতো অনুগ্রহভাজন হতে চাই না।

অবশ্য এটা নিতান্ত ব্যক্তিগত একটা বে-খাপ্পা অনুভূতির ব্যাপার। বিশ্লেষণ করতে বললে অনেক রকম ব্যাখ্যা করে নিজের দুর্বলতা চাপা দেওয়া যেতে পারে। সে চেষ্টা করব না। সেই মুহূর্তে আমি মহিলার ঘোষবাবুর কথা ভাবিনি, নিজের কথাই ভেবেছি। আমার আসন শ্রোতাদের সঙ্গে। কিন্তু ওই ডায়াসের ওপরেও হতে পারত। কর্মকর্তাদের অনেক টানা-হেঁচড়া সত্ত্বেও কোনো শাখার ভার নিতে আমি রাজি হইনি। এখানে আসার সেটাই শর্ত ছিল—শ্রোতা হব, বক্তা নয়। সেজন্যে অবশ্য খেদ নেই এখনো, কিন্তু তবু মানুষের নিভৃতের কারিকুরি বড়ো বিচিত্র। মহিলার মুখে ঘোষবাবু শুনেই কেমন মনে হল, আমার আসনটা আর একটু উঁচুতে, অর্থাৎ ওই ডায়াসের ওপরে হলে মন্দ হত না।

তৃতীয় অধিবেশন-শেষে বিকেলের দিকে শঙ্কর সারাভাইয়ের দর্শন মিলল। ইতিমধ্যে ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে কৌতূহল আরো একটু বেড়েছে। কেন, সেটা পরের প্রসঙ্গ। হল্-ঘরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে অনেককে ঘাড় ফেরাতে দেখে বোঝা গেল গণ্যমান্য কেউ এলো। ত্রিপুরারি আমার পাঁজরে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, শঙ্কর সারাভাই!

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসিমুখে অনেকের অভিবাদনের জবাব দিতে দিতে এগিয়ে এলো। সৌম্যদর্শন লম্বা-চওড়া মূর্তি। গায়ের রং কালোর দিক ঘেঁষা। মাথার ঝাঁকড়া চুলের দু'দিকে পাক ধরেছে। কপালের চামড়ায় গোটা দুই ভাঁজ পড়ে আছে। সেটা বয়সের নয়, প্রাজ্ঞ গাম্ভীর্যের নিদর্শন। অবশ্য, ত্রিপুরারির হিসেব ধরে ভদ্রলোকের বয়েস ঠিক পঁয়তাল্লিশ মনে হয় না, আরো কিছু বেশি মনে হয়। পরনে ঢোলা পা-জামা, গায়ে লম্বা ঝুলের গরদের পাঞ্জাবি।

সব মিলিয়ে এক জোরালো পুরুষের মূর্তিই বটে।

কিন্তু এই মূর্তি পর্যবেক্ষণে আমি বেশি সময় অপচয় করিনি। আমার দু-চোখ ধাওয়া করেছে ও-পাশের দু'সারি আগের রমণীর মুখের দিকে। এই একজনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ওই মুখের রং বদল দেখব এমন আশা অবশ্য করিনি। তবু, ত্রিপুরারির সকল বচন সত্য হ'লে দৃষ্টি আপনা থেকেই ওদিকে ছুটবে। না, ব্যতিক্রম কিছু চোখে পড়েনি। কৌতুক-মাধুর্য মেশা মুখখানা আরো একটু নির্লিপ্ত মনে হয়েছে শুধু। কে এলো না এলো সে সম্বন্ধে সচেতন নয় যেন। ...তবে এও নিজের কল্পনা হতে পারে।

ভদ্রলোকের অর্থাৎ শঙ্কর সারাভাইয়ের আজই সভার এই শেষ মাথায় হাজিরা দেবার পিছনে অন্য কোনো আকর্ষণ আছে কিনা, সে-কথা পরে মনে হয়েছে। পরে, অর্থাৎ ঘণ্টাখানেক পরে। আজই এই একজনের শুভাগমন হতে পারে সে-কথা ত্রিপুরারিও বলেনি, অর্থাৎ, তারও জানা ছিল না।

হাল্‌কাগোছের সাহিত্য-প্রোগ্রাম ছিল সেদিন। তারপর গানের আসর। নিছক অনুমান কিনা জানি না, মনে হল এই গানের আসরই তাকে টেনেছে।

এই অনুষ্ঠানে প্রথমেই যে নামটি ঘোষণা করা হল, সেই নাম যশোমতীর। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অভ্যাগতদের বিপুল করতালি। এ-রকম অভ্যর্থনা গানের খাতিরে কি গায়িকার খাতিরে পাশে ত্রিপুরারি থাকলে জিজ্ঞাসা করতাম হয়তো। কিন্তু ত্রিপুরারি পাশে নেই, শঙ্কর সারাভাইকে দেখেই সেই যে 'আসছি' বলে উঠে গেছে, এখনো ফেরেনি। এই পরিতোষণও চাকরির দায়ে কিনা জানা নেই।

মহিলা আসন ছেড়ে উঠল। জোরালো আলোয় মুখখানা আরো মিষ্টি, আরো একটু হাসি-হাসি দেখাচ্ছে। তকে আপ্যায়ন করে নেবার জন্য দু'জন ভলান্টিয়ার দৌড়ে এলো। ঈষৎ মন্থর পায়ে যশোমতী ডায়াসে উঠে গেল। মানুষের মাথায় ঠাসা বিশাল হল্‌-ঘরটার মেজাজই বদলে গেছে যেন। অনেক সজাগ, অনেক সজীব। নিজের অগোচরে এবারে আমার দুচোখ শঙ্কর সারাভাইকে খুঁজছে। কিন্তু ভদ্রলোক যে কোন্ দিকের কোন্ সারিতে বসেছে ঠিক্ ঠাওর করা গেল না।

গান হল। শ্রোতাদের সরব সনির্বন্ধ অনুরোধে পর পর তিনটে গান।

একটা ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পাইনি। আসরে বসে গান অজস্র শুনেছি। সে-দিক থেকে একেবারে মোহিত হবার মতো কিছু শুনলাম, এমন বলব না। বিশেষ করে পাঁচ-মিশালি শ্রোতার আসরের গান খুব গভীর পর্যায়ের না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ক'দিন ধরে সাহিত্যের নানা ধারায় ক্লান্তিকর জটিলতা বিস্তারের পর হঠাৎ যেন কানে ভারী মিষ্টি একটা স্পর্শ এসে লাগল। তাই, শুধু ভালো লাগল বললে অবিচারই করা হবে।

এত ভালো লাগবে আশা করিনি। কান পেতে শোনার মতোই মিষ্টি পরিপুষ্ট কণ্ঠস্বর। সহজ, স্বচ্ছন্দ।

গানের সঙ্গে শিল্পীর একটা বিশেষ যোগ আছেই। অন্তত, আমার মতো অ-গায়কদের সেই রকমই মনে হয়। সেই যোগটা শিল্পীর চেহারার কি পরিবেশন-মাধুর্যের—ঠিক জানিনে। প্রসঙ্গত কোনো এক বিখ্যাত মহিলা-শিল্পীর গানের আসরে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম একবার মনে পড়ে। গান শুনেছিলাম। সেই গানের তুলনা নেই, তা হয়তো সত্যি। কিন্তু তবু কেন যেন মন ভরেনি। তার কারণ সম্ভবত আগাগোড়া বেশির ভাগ চোখ বুজে শুনতে হয়েছিল বলে। না, সেই মহিলাও রূপসী না হোক একেবারে কুরূপা নয়। তা ছাড়া, গানের আসরে শিল্পীর যে রূপ সেটা আর এক বস্তু, জানি। তবু চোখের প্রসন্নতার বার বার ব্যাঘাত ঘটেছিল তার কারণ, শিল্পীর সংগীত-তরঙ্গের প্রতিটি ঢেউ অস্থির অভিব্যক্তির আকারে শ্রোতার নিবিষ্টতা চঞ্চল করে তুলেছিল। পুরুষ শিল্পীদের বেলায় এই ব্যাপারটা ততো বিসদৃশ ঠেকে না যত মেয়েদের বেলায় ঠেকে।

কিন্তু এখানে চোখ-কান-মন ভরে ওঠার মতো সবটুকুই গান। কোনো আবেগের মুখে স্থির শিল্পী হয়তো কখনো একটু দুলে উঠল, কোনো হাল্‌কা রসাবেদনের মুখে হয়তো মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, কোনো দ্রুত বিন্যাসের মুখে তবলচির আসুরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে গানের মধ্যেই ফিক করে হেসে উঠল কখনো। এই আসরে শোনার থেকেও সংগীতের এক মূর্তিমতী রূপ সুসম্পূর্ণ।

গান শেষ। আবার অনুরোধের সুযোগ না দিয়ে মহিলা সোজা উঠে পড়ল। প্রস্থানের ভঙ্গী দ্রুততর। এবারে দ্বিগুণ হাত-তালি। আবার আমি নীরবে সারাভাইকে খুঁজলাম একপ্রস্থ। চোখে পড়ার আগে পিঠে খোঁচা।

ত্রিপুরারির উদ্ভাসিত মুখ।—কেমন শুনলে?

কৃতিত্বটা যেন তারই।

জবাব দেবার অবকাশ পেলাম না। অনেকের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরারিরও সামনের দিকে দৃষ্টি ঘুরছে। আগের মতোই পরিচিতদের উদ্দেশ্যে হাত তুলে নমস্কার জানাতে জানাতে হাসিমুখে ডায়াসের লাগোয়া সারি থেকে এদিকে আসছে শঙ্কর সারাভাই। বলা বাহুল্য, এই আসা এবং এই নমস্কার বিদায়সূচক।

যশোমতী পাঠক তার পূর্বাসনে। তার পাশ দিয়েই শঙ্কর সারাভাই এগিয়ে এলো। দেখলাম, সে একনজর তাকালো মহিলার দিকে। কিন্তু মহিলার দৃষ্টি সামনের ডায়াসের দিকেই। সেখানে যন্ত্র-সংগীত, অর্থাৎ সেতার-বাদনের তোড়জোড় চলেছে। রমণীর হৃদয় যন্ত্র গোটাগুটি নির্লিপ্ত।

—সার!

ত্রিপুরারি তখনো পাশে দাঁড়িয়েই ছিল। তার বিনয়-বিগলিত আহ্বানে আমার রমণীর রীতি দেখার একাগ্রতায় ছেদ পড়ল। ঠিক পথ আগলে নয়, একটু পথ ছেড়ে দিয়েই কাজের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরারির এই সসম্ভ্রম আহ্বান।

মিলিয়নেয়ার মিল-ওনার শঙ্কর সারাভাই দাঁড়িয়ে গেল। ব্যস্তসমস্ত ত্রিপুরারি এবারে শশব্যস্তে আমার হাত ধরে এক টান। তারপরেই গড়গড় করে আমার পরিচয় দিয়ে গেল। সেই পরিচয় শুনলে যে-কোন লেখক ওকে প্রচার-সচিবের পদে বহাল করার ইচ্ছেটা মনে মনে অন্তত পোষণ করবে। সারাভাইয়ের সঙ্গে ত্রিপুরারি কথা বলল হিন্দীতে। এরই ফাঁকে আমি যে ওর ছেলেবেলার একান্ত বন্ধু—সেই সমাচারও অব্যক্ত থাকল না। আর অবশেষে লেডি অর্থাৎ যশোমতী পাঠকের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং একান্ত আগ্রহে আমার এখানে পদার্পণ—এটুকুর মধ্যে সেই অতিশয়োক্তিও অনুক্ত রইল না।

ত্রিপুরারির বেপরোয়া প্রশংসা বচনে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার একটা হাত ভদ্রলোকের পুষ্ট দুই হাতের থাবার মধ্যে চালান হয়ে গেল এবং গোটা দুই ঝাঁকুনি পড়ল।

—সো গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

আমার পাল্টা বিনয়োক্তি। কিন্তু ভদ্রলোকের তুলনায় সেটা অনেক ক্ষীণ। হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে শঙ্কর সারাভাই তড়বড় করে বলে উঠল, কত দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন, উই আর রিয়েলি সো হ্যাপি। আপনারা গুণী লোক, কিন্তু বড়ো আফসোস এই গুণের খবর আমি কিছুই রাখি না। রাখেন যিনি তিনি ওই যে—উনিই আপনাদের রিয়েল অ্যাডমায়ারার।

আঙুল দিয়ে অদূরবর্তিনী মহিলা, অর্থাৎ যশোমতীকে দেখিয়ে দিল। ত্রিপুরারিকে জিজ্ঞাসা করল লেডির সঙ্গে আমার এক আধ দিন সাহিত্য-চর্চা হয়েছে কিনা। হয়নি শুনে একদিন নিয়ে যেতে পরামর্শ দিল, তারপর শুভেচ্ছা জানিয়ে হাসিমুখে প্রস্থান করল।

মনের আনন্দে ত্রিপুরারি কি বলে যাচ্ছে কানে ঢোকেনি। আমার দৃষ্টি এই সামনের দিকে দু'সারি আগের আসনের দিকে। একটানা এতক্ষণ গানের পর মহিলার বসার শ্রান্ত ভঙ্গিটুকুও মিষ্টি। গান শেষ হতেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি যে প্রস্থান করল সে সম্বন্ধেও তেমন সচেতন মনে হল না। ত্রিপুরারি বকেই চলেছে। আমার অভিলাষ নিজের কাছেই প্রায় অগোচর তখনও।

যন্ত্র-সংগীতের কদর কণ্ঠসংগীতের তুলনায় কম-বেশি সর্বত্রই একরকম। শুধু শঙ্কর সারাভাই নয়, অনুষ্ঠানের তোড়জোড় শেষ হবার আগেই অনেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, অনেকে চলে যাচ্ছে। যশোমতীর পাশের আসনে বসে ছিল এক স্থানীয় বৃদ্ধা। কে জানি না। সে-ও উঠল এবং দরজার দিকে পা বাড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে দম ফুরানো যন্ত্রের মতো ত্রিপুরারির মুখের কথা অসমাপ্ত থেকে গেল। কারণ, আমি আর তখন পাশের চেয়ারে নেই।

কেন উঠলাম, বলা নেই কওয়া নেই প্রস্তুতি নেই—কেন সামনে এসে দাঁড়ালাম, কেন অভিনন্দন জানানোর লোভ সংবরণ করা গেল না, তার সঠিক বিশ্লেষণে অক্ষম। এই গান শোনার পর সামনে আসতে বা অভিনন্দন জানাতে মনে হয়তো অনেকেই চেয়েছে। কিন্তু মনে মনে চাওয়া আর সরাসরি উঠে আসার মধ্যে তফাত আছে। শিল্পী যদি বয়েসকালের কোনো রমণী হয়(যদিও এ-ক্ষেত্রে বছরের হিসেব ধরে বয়েসকালের বলা চলে না) সাধারণত একটু বাড়তি প্রশংসা তার প্রাপ্যর মধ্যেই গণ্য। সেই রমণী যদি সুরূপা হয়, প্রশংসা তাহলে স্তুতির আকার নিয়ে থাকে। আর সেই গুণবতী সুরূপা রমণী যদি অফুরন্ত বিত্তের অধিকারিণী হয়, তাহলে তার আকর্ষণ বোধকরি এমনিই দুরতিক্রম্য। এমন কেন হয় আমার জানা নেই।

মহিলা ঈষৎ সচকিত। কিছু একটা তন্ময়তায় ছেদ পড়ল যেন। সোজা হয়ে বসে তাকালো।

সবিনয়ে বললাম, আপনার গান শোনার পর মনে হচ্ছে এখানে আসা সার্থক হল।

যশোমতী পাঠক বিব্রত মুখে হাসল একটু। অস্ফুট সৌজন্যে বলল, ধন্যবাদ...

কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি কি-রকম ধাক্কা খেলাম একটু। এরকম সাদা-মাটা প্রায় নির্লিপ্ত ভব্যতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমার স্পষ্টই মনে হল, তিন দিন আগের সেই এক মিনিটের পরিচয় মহিলা ভুলে গেছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ দর্শক বা শ্রোতার আসনের অভ্যাগত আমি। তাছাড়া, আরও কতজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সেদিন। সকলকে মনে করে না রাখতেও পারে। কিন্তু তা হলেও ত্রিপুরারির এত আগ্রহ করে আমাকে এখানে টেনে আনার সঙ্গে সুদর্শনার এই মাপা সৌজন্য ঠিক যেন মিলছে না। ত্রিপুরারি লিখেছিল, লেডি আমাকে প্রত্যহ তাগিদ দিচ্ছে তুমি আসছ কি না...। ফলে এ রকম ভুল আমার বিবেচনায় অন্তত খুব বাঞ্ছিত নয়। তাছাড়া ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি দেখেও, আর আসা সার্থক হয়েছে শুনেও খেয়াল হবার কথা।

আমি কি আশা করেছিলাম? ওইটুকুই আশা করেছিলাম হয়তো। আশা করেছিলাম আর পাঁচজনের থেকে আমার এই প্রশংসার একটু মূল্য বেশি হবে, মহিলা খুব খুশি হবে। আর হয়তো আশা করেছিলাম, পাশের শূন্য আসনটি দেখিয়ে আমাকে বসতে বলবে। তার বদলে আধা-ভাঙা আসরের যন্ত্রসংগীত যে বেশি মনোযোগের বিষয় হবে, ভাবিনি।

অতএব আমি কি করলাম, পাঠক সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন। পাঁচ-সাত-দশ সেকেন্ড বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। সেটুকুই দীর্ঘ এবং অশোভন মনে হতে বোকার মতো হাসলাম একটু। তারপর আবার নমস্কার জানিয়ে পিছনে ফিরে ত্রিপুরারির পাশে এসে বসলাম। তারপর মনে মনে নিজের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করতে থাকলাম। মর্যাদা-বোধ আহত হলে কখনো কখনো সেটা ঠুনকো বস্তুর মতোই ভেঙে পড়তে চায়।

কিন্তু ত্রিপুরারির সবুর সয় না, ফিরে আসা মাত্র সাগ্রহে চড়াল হল আমার ওপর।—তুমি হঠাৎ উঠে কি বলে এলে?

রাগটা অকারণে ত্রিপুরারির ওপরেই ঝাড়তে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু নিজের দোষে বোকা বনেছি, ওর দোষ কি। বললাম, গানের প্রশংসা করে এলাম।

খুশি হল খুব? কি বলল?

—ধন্যবাদ দিল।

নিজেকে সান্ত্বনা দেবার দায়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছি—বাংলা সাহিত্যের অধিবেশন বলে আমার মতো ধুতি-পাঞ্জাবির সংখ্যাই বেশি, অতএব মহিলার চিনতে না পারাটা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু অনুভূতি সব সময় যুক্তি ধরে চলে না। ভিতরে ভিতরে অস্বস্তিজনক কিছু একটা বিঁধছেই। কেবলই মনে হচ্ছে মস্ত ধনী কন্যাকে গায়ে পড়ে প্রশংসা করতে যাওয়ার মতো হয়েছে ব্যাপারটা।

ত্রিপুরারি তার লেডির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠার খোরাক পেয়েছে যেন। বাজনা শোনাটা ওর কাছে বিলাপ শোনার মতো। সাগ্রহে ঘুরে বসে বলল, শুধু গান? ও-দিকে এম-এ পাস, জানো? আজ না হয় এখানে মেয়েদের মধ্যে বি-এ এম.-এ'র ছড়াছড়ি—বিশ বছর আগে তো হাতে গোণা যেত। তাছাড়া, আরো অনেক রকমের গুণ আছে মহিলার, বক্তৃতা করে চমৎকার।—কিছুদিন থেকে যাও যদি তোমাকে শোনাব। তারপর এখানকার লেডিস ক্লাবের সে-ই ফাউন্ডার-প্রেসিডেন্ট—বিশ বছর আগে তারই চেষ্টায় হয়েছিল। গোড়ায় অনেকে আপত্তি করেছিল, এখন লেডিস ক্লাব জম-জমাট। আর এবারে তো পুরুষদেরও টেক্কা দিয়ে একেবার চেম্বারেরে প্রেসিডেন্টই হয়ে বসেছে।

আমি বাজনায় মন দিয়েছি। দিই না দিই বাজনা শেনায় গুরুগম্ভীর নিবিষ্টতা আনতে চেষ্টা করেছি। মনে মনে নিজেকে যে প্রত্যাখ্যাত গোছের ভেবে আহত, এত গুণের ফিরিস্তি তার কানে আরো পীড়াদায়ক। অন্তত তখনকার মতো। জিজ্ঞাসা করলাম, এ-রকম শিক্ষিতা হয়েও তোমাকে ঘোষবাবু বলে কেন?

ত্রিপুরারি জবাব দিল, এখানে সকলেই ওই রকম বলে।

পরদিন সুন্দর একটি ছাপা কার্ড পেশ করল ত্রিপুরারি। আমন্ত্রণলিপি, সোনা-রঙের ছাপার নিচে সোনালী অক্ষরে যশোমতী পাঠকের নাম। পাঁচ দিনের অধিবেশন-শেষে প্রবাসী অতিথিবর্গের সম্মানার্থে পার্টি। শ্রীমতী পাঠক তার বাড়িতে ব্যক্তিগত ভাবে এই পার্টি দিচ্ছে। স্থানীয় প্রধান বা প্রধানার তরফ থেকে এ-ধরনের পার্টি ব্যবস্থা নতুন কিছু নয়।

এও যে আর একটা বাড়তি অবজ্ঞার মতো লেগেছে সেটা ত্রিপুরারিকে বুঝতে দেবার ইচ্ছে ছিল. না। আমন্ত্রণ-লিপি দেখে নিয়ে খুব সাদাসিদেভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কর্ত্রীর হয়ে তুমিই নেমন্তন্ন করে বেড়াচ্ছ বুঝি?

একটা সুবিধে, আয়-ব্যয় জমা-খরচের জটিলতায় ত্রিপুরারির যত মাথা খোলে, এ-সব সামাজিক ব্যাপারে ততো নয়। এই প্রশ্নের ফলে ওর মনে এতটুকু ছায়াপাত হোক, সেটা চাইনি তার ভিন্ন কারণ। আমার মেজাজের আঁচ পেলে সেটা ওর পক্ষে বিড়ম্বনার ব্যাপার হবে। হয়তো বোঝাতে বসবে আমিই ভুল করেছি। তাই কিছু খেয়াল না করার মতো করেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ত্রিপুরারি খেয়াল করলাও না।

জবাব দিল, বাড়ির গায়ের গেস্ট কোয়ার্টার্সের সব সাহিত্যিকদের নিজেই বলেছে, আর এদিককার দু-দশজন যাদের বলা হচ্ছে, তাদের ভার আমার ওপর। চিঠি নিয়ে এখন ক' জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে, ঠিক নেই।

যাক, নিশ্চিন্ত। মনের তলায় শুধু একটা অস্বস্তি, আমার কোনো আচরণে ত্রিপুরারি না আঘাত পায়। যার জন্যে ছোটাছুটি করে তার আনন্দ, তার সঙ্গে ওর রুটির যোগ, চাকরির যোগ, ভবিষ্যতের যোগ। আমার আচরণে ও এদিক থেকে কিছুমাত্র সচেতন হলে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না। মহিলার গেস্ট কোয়ার্টার্সে আমি থাকিনি ত্রিপুরারির অন্তরঙ্গতার টানাপোড়েনে পড়ে। কিন্তু আমি যে এখানকার দু-দশজনের একজন নই, আমিও যে বহিরাগত অতিথি—সেটা ত্রিপুরারির মনে না থাকুক, ওই মহিলার মনে না থাকাটাও ঠিক বরদাস্ত হবার কথা নয়। গত দিনের ব্যবহারের পর এই নিজে নিমন্ত্রণ না করাটা শুধু কর্মচারীর বন্ধু বলে, এ-ছাড়া এই অবজ্ঞার আর কোন কারণই মনে আসেনি আমার।

অতএব শরীরটা সেই দিনই আমার খারাপ হল একটু। কর্ত্রীর বাড়ির নেমন্তন্ন দুদিন পরে, তাই ত্রিপুরারির কিছু আঁচ করা সম্ভব হল না। পরদিন স্ব-ঘটিত শরীর-খারাপের মাত্রা আরো একটু বাড়াতে হল। ত্রিপুরারিকে জানালাম, মাথা ভার, গা ম্যাজ ম্যাজ করছে—অতএব সাহিত্য-সম্মেলনের সেটা শেষ দিন হলেও যাই কি করে। ত্রিপুরারি নিজেই ডাক্তারী করল, ডায়েটিংয়ের ব্যবস্থা করে দিল, মাথা ধরার বড়ি রেখে গেল। ওকে তো বেরুতেই হবে, মাথার ওপর অনেক দায়। খাওয়ার ওপর যেমন অত্যাচার চলেছে ক'দিন ধরে ডায়েটিংয়ে আমার আপত্তি নেই। মাথা ধরার ওষুধ অবশ্য কাজে লাগানো গেল না। মাথা কিছু খাটাতে হচ্ছে, তাই মাথা একটু-আধটু ধরা বিচিত্র ছিল না। কিন্তু না ধরলে কি আর করা যাবে।

আর তার পরদিন অর্থাৎ পার্টির দিন তো শরীর একটু বেশিই খারাপ। বেশি কি? পেটের গোলযোগ? কোনো ভদ্রমহিলার কাছে, বিশেষ করে যশোমতী পাঠকের মতো মহিলার কাছে রিপোর্ট করার মতো ভদ্রগোছের অসুখ নয় ওটা। ওদিকে দশবার করে গায়ে হাত দিয়ে দেখছে ত্রিপুরারি। জ্বরও বলতে পারি না। তাহলে বাকি থাকল বুকের দিকটা। ত্রিপুরারি জানল বুকে একটু-আধটু ব্যথা, যা নাকি আমার মাঝে-সাজে হয়, আর একটানা চব্বিশটা ঘণ্টা বিশ্রাম নিলেই আবার বিনা ঝামেলায় আপনা থেকেই দিব্বি সেরে যায়।

...ওষুধ!

ত্রিপুরারির ব্যস্ততা ঘন হবার আগেই তাড়াতাড়ি বলতে হল, ও একটু-আধটু ওষুধ আমার সঙ্গেই থাকে, ঘাবড়াবার মতো কিছু নয় বলছি তো। তুমি আর দেরি কোরো না, পালাও এখন।

না ঘাবড়ালেও ত্রিপুরারির মন যে খারাপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পার্টিতে আমার যাওয়া সম্ভব হল না বলে ঘুরে ফিরে বহুবার খেদ প্রকাশ করেছে। তার আগে মুহুর্মুহু বুকের খবর নিয়েছে। গাড়ি

করে আধঘণ্টার জন্যে ঘুরে আসা যায় কিনা সেই প্রস্তাব অনেকবার করছে। সঙ্গে ডাক্তার থাকলে যাওয়া চলে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে। শেষে ওর বউয়ের কাছে চাপা ধমক খেয়ে হাল ছেড়েছে। মনিবদের এ-ধরনের অনুষ্ঠানে ওদের ব্যস্ত থাকতেই হয়, অতএব শেষ পর্যন্ত একাই যেতে হল তাকে।

বিকেলে নিশ্চিন্ত মনে বাগানে ঘোরাঘুরি করছিলাম। ত্রিপুরারি-গৃহিণী এমনিতেই মিতভাষিণী, তার ওপর এই দ্বিতীয়বার মাত্র সাক্ষাৎ। মহিলা অতিথিপরায়ণা, কিন্তু তার সঙ্গে আড্ডা জমানো শক্ত। বহুবার শরীরের খবর নেওয়ায় অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বিকেলের দিকে বেশ ভালো আছি এবং বাগানে একটু বেড়ালে আরো ভালো লাগবে শুনে সে নিশ্চিন্ত মনে ঘরের কাজে মন দিয়েছে। আর, একটু বাদেই পার্টি প্রসঙ্গ বা নিজের অসুস্থতার প্রসঙ্গ আমার মন থেকেও সরে গেছে।

বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড়াল একটা।

গাড়ি থেকে একজন স্থানীয় অপরিচিত লোক নামল। তার হাতে ছোট ব্যাগ আর স্টেথোস্কোপ। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপর এগিয়ে এলো। আমি হতভম্ব। তাকে দেখা মাত্র মনে হল আমিই তার শিকার।

এগিয়ে এসে ভদ্রলোক ইংরেজিতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করল, অর্থাৎ আমিই ওমুক কিনা। বোকার মতো ঘাড় নাড়তে চিকিৎসকের চোখে একটু নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে আপনার? বুকে হঠাৎ কি-রকম ব্যথা বোধ করছেন শুনলাম? মিস পাঠক টেলিফোন করে এক্ষুনি আপনাকে একবার দেখে যেতে বললেন...

এ রকম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হবে কে ভেবেছিল? বাংলা দেশের বাসিন্দা, চিকিৎসককে এত অবাঞ্ছিত আর বোধহয় কখনো মনে হয়নি। ওদিকে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে দরজার কাছে ত্রিপুরারির স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছে। অতিথি এবং স্বামীর অন্তরঙ্গ অসুস্থ বন্ধুর প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধ কিছু আছে। পরিস্থিতিগুণে আমি অসহায়।

মিথ্যার সতেরো জ্বালা। কি সব বলে গেছি বা বলতে চেষ্টা করেছি সঠিক মনে নেই। মোট কথা, ডাক্তারকে বোঝাতে হয়েছে শরীর খারাপ হয়েছিল বটে কিন্তু এখন সুস্থই বোধ করছি। এখানে এসেই একটু অনিয়ম করা হয়েছে, একটু বেশি ছোটাছুটি করা হয়ে গেছে, খাওয়া-দাওয়ারও বেশি চাপ গেছে—দু'দিন একটানা বিশ্রাম নিয়ে এখন ভালোই লাগছে। শুধু ভালো না, এখন আর কোনো গোলযোগের লেশ মাত্র নেই। ওঁদের এভাবে বিব্রত করার দরুণ লজ্জিত, তাঁকে ধন্যবাদ, মিস পাঠককে ধন্যবাদ, ইত্যাদি, ইত্যাদি—।

কিন্তু শুধু ধন্যবাদ পকেটে পুরে ভদ্রলোক বিদায় নিল না। কারণ, সে আমার অথবা আমার অসুখের তাগিদে আসেনি। এসেছে যার নির্দেশে ফিরে গিয়ে তাকে রিপোর্ট করতে হবে। অগত্যা বাগানের বেঞ্চে বসেই শরীরটাকে দু'পাঁচ মিনিটের জন্য অন্তত তার হেপাজতে ছেড়ে দিতে হল। ত্রিপুরারি-গৃহিণীও পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। গুরুগম্ভীর পর্যবেক্ষণ পর্ব শেষ করে প্যাড বার করে খসখস করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে ডাক্তার বলল, এটা খেলে কালকের মধ্যেই আরোগ্য হয়ে যাবেন।

ডাক্তার বিদায় নিতে ত্রিপুরারি-গৃহিণীর মুখোমুখি হবার পালা। সাদা-মাটা মহিলা মৃদু মন্তব্য করল, খানিক আগেও যা ছিলেন তার থেকে তো অনেক ভালো মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, এক্ষুণি ওই ওষুধ-টষুধ আনাবার দরকার নেই...।

চোখের আড়ালে বা অধর কোণে কৌতুকের আভাস দেখলাম কি? একটু চুপ করে থেকে ত্রিপুরারি-গৃহিণী বলল, কিছু হয়ইনি বোধ হয়...। চলে গেল। আমার সন্দেহ হল কেমন, যতটা সাদাসিধে একে ভেবেছিলেন ততোটা যেন নয়।

আরো কিছু বাকি ছিল।

সন্ধ্যায় আর পরদিন সকালে সতীর্থরা অনেকেই আমাকে দেখে যাওয়া কর্তব্য বোধ করল। কিন্তু তাঁদের সহৃদয়তায় মুগ্ধ বলেই প্রায় নির্বাক আমি। বুঝলাম, কর্ত্রীর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার

মতো অসুখটা মোটেই খুব ছোট করে প্রচার করেনি ত্রিপুরারি। পার্টির সাহিত্যিক বন্ধুরা সকলেই জেনেছে আমি বে-খাপ্পা রকমের অসুখে পড়ে গেছি। অতএব দলে দলে তারা এসেছে, দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছে, আর উপদেশ দিয়ে গেছে।

এ-ধরনের সাহিত্য-অধিবেশনে অভ্যাগতদের আসার পিছনে যেমন উৎসাহ, যাবার বেলাতেও তেমনি তাড়া। এলো, অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে অনুষ্ঠাতাদের রুটিনমাফিক ব্যবস্থা অনুযায়ী হুড়মুড় করে দেখার যা আছে দেখা হয়ে গেল—অধিবেশন শেষ তো অমনি ফেরার তাগিদ। কটা দিন জীবনটাকে তাড়াহুড়োর মধ্যে রাখার বৈচিত্র্য থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চায় না। কেউ স্বস্থানে প্রত্যাগমন করবে, কেউ বা তেমনি দ্রুত তালে কাছাকাছির আরও দু'একটা নতুন জায়গা হয়ে ফিরবে। কাজেই আমার কাছে সতীর্থদের অবস্থান বা আমার শরীরের জন্য তাদের উদ্‌বেগ দীর্ঘস্থায়ী হল না—এই যা রক্ষা।

যাই হোক, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে সতীর্থদের এই শশবস্তে কর্তব্যের পালাও শেষ হল একসময়। হাঁপ ফেলে এরপর ত্রিপুরারিকে নিয়ে পড়লাম আমি। পাছে ওর কোনোরকম সন্দেহ হয় এ-জন্যে সেটাই নিরাপদ মনে হল। ওর স্ত্রীর সেই কথা ক'টা কানের পর্দায় অস্বস্তির কারণ হয়ে আছে এখনো। বললাম, বেশ করে ঢাক পিটিয়ে সকলের কাছে প্রায় এখন-তখন অবস্থা আমার বলে এসেছ মনে হচ্ছে?

আমতা-আমতা করে ত্রিপুরারি জবাব দিল,...না মানে, অসুখ শুনে মিস পাঠক একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে।

গম্ভীর মুখে বললাম, বড়োলোকের ব্যস্ততার ধকল সামলানোও মুশকিল—ব্যস্ততার চোটে একেবারে ডাক্তার এসে হাজির হয়েছিল।

—হ্যাঁ, অসুখ শুনে পাঁচবার করে জিজ্ঞাসা করল কি অসুখ তারপর উঠে গিয়ে নিজেই ডাক্তারকে ফোন করে দিলে।

মুখের গাম্ভীর্য এবারে নিরাপদে একটু তরল করা যেতে পারে মনে হল।—সে-জন্যেই তো বলছি, পার্টিতে যেতে না পারার কৈফিয়ৎ দেবার দায়ে তুমি আমাকে প্রায় শেষ করেই এনেছ।

ত্রিপুরারি লজ্জা পেল।—কি যে বলো! গেলে না দেখে ভদ্রমহিলা দুঃখ করতে লাগল। শুনলে এক্ষুণি তোমার গিয়ে দেখা করতে ইচ্ছে করত। এর পর ত্রিপুরারি উল্টো দোষারোপ করল।—সাধে লোকে বলে বাঙালি বাবু, বাংলাদেশে থেকে থেকে তোমরা যা হয়েছ! এখানে ওটুকু শরীর খারাপ আমরা কেয়ারই করি না—আর দু'দিনের মধ্যে তুমি বাড়ি থেকেই নড়লে না, পার্টিতেও গেলে না—জিজ্ঞাসা করলে তেমন কিছু হয়নি বলি কি করে? ভদ্রমহিলা যদি ভেবে বসে ইচ্ছে করেই কাটান দিলে!

আর বেশি ঘাঁটানো যুক্তিযুক্ত নয় মনে হতে সরব হাসির গর্ভে আলোচনার বিলুপ্তি ঘটাতে হল। কিন্তু হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত নয় এখনো, ওর বউ এরপর আবার কিছু মগজে না ঢোকালে বাঁচি।

তিন

পরের দিনটা ছুটির দিন।

ত্রিপুরারির সঙ্গে বেড়াতে বেরুব আগেই স্থির ছিল। ও একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করে রেখেছে।

কিন্তু মিথ্যের খেসারত এত সহজে মেটে না। ত্রিপুরারির বেরুবার কোনো উদ্যোগ বা লক্ষণ নেই। জিজ্ঞাসা করতে রায় দিল, এই শরীর নিয়ে বেরিয়ে কাজ নেই, আরো দু'চারদিন বিশ্রাম করে নাও। আছ তো এখন, তাড়া কি—

বিরক্তিকর। গত দু-দিনের অচলাবস্থা কোনরকমে বরদাস্ত করা গেছে, তার ওপর আজও এই কথা। প্রবল প্রতিবাদের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গতি নেই। বললাম, যথেষ্ট বিশ্রাম নেওয়া হয়েছে, আর বিশ্রামে কাজ নেই। আর বিশ্রাম করতে বললে আমি একাই বেরিয়ে পড়ব বলে দিলাম। তাছাড়া

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার তো নেই, মোটরে ঘুরব—কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। তোমার ছুটি তো আবার সেই সাত দিন পরে।

ত্রিপুরারি অনিচ্ছার কারণ দর্শালো, কিন্তু বউ যে বারণ করে দিল, অসুস্থ মানুষকে নিয়ে বেরুতে হবে না, বন্ধুকে শুয়ে ঘুমুতে বলো।

অগত্যা ওর সুপারিশ না করে ত্রিপুরারি-গৃহিণী সকাশে উপস্থিত আমি। যুক্ত হস্তে নিবেদন করলাম, বাংলা দেশের মেয়ে স্বামীর বন্ধুর প্রতি অকরুণ হয়েছে এমন নজির বড়ো চোখে পড়েনি, বন্ধুটি আপনাকে যত নিরীহ মনে করে ঠিক ততটাই আপনি নন বলে আমার ধারণা। দয়া করে আপনি ওর মাথায় কিছু ঢোকাবেন না, আর আরো একটু দয়া করে তরতাজা মানুষ দুটোকে একটু চরে বেড়াবার অনুমতি দেবেন, এই প্রার্থনা।

লজ্জা পেয়ে ত্রিপুরারি-গিন্নি হাসতে লাগল। আমি সেটাই ছাড়পত্র ধরে নিয়ে ফিরে এলাম। আর তারপর সন্দেহ উদ্রেক না করে ওকেও রাজি করানো গেল। যদিই দরকার হয় এ-জন্যে সঙ্গে দরকারী ওষুধ-পত্র নিতে পরামর্শ দিল ত্রিপুরারি।

সম্মেলনের অতিথিদের কাছের বা দূরের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সেই আনুষ্ঠানিক দেখার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া আদৌ সম্ভব হয় না। দেখার তাড়াতেই সেই দেখার পর্ব শেষ হয়ে থাকে। ওই আনুষ্ঠানিক দেখার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিনি। কারণ আমার এখানে থেকে যাওয়ার বা এখানকার এই দেখার পিছনে উদ্দেশ্য কিছু আছেই। এই দেখার সঙ্গে একটা মানসিক যোগ স্থাপন করাই বিশেষ উদ্দেশ্য।

প্রথম দর্শনে জায়গাটা যে ভালো লেগেছিল তার প্রধান কারণ সম্ভবত সাবরমতী। সাবরমতীর নীলাভ জল। শহরের মাঝখান দিয়ে সাবরমতীর ধারা দেখতে দেখতে মনটা কখনো সুদূর অতীতে উধাও হয়েছে, কখনো বা সদ্য বর্তমানে ঘোরা-ফেরা করেছে। আর ছোট-বড়ো এত সেতু-বন্ধ দেখে দেখে ভিতরে ভিতরে কি এক সেতু রচনার প্রচ্ছন্ন উদ্দীপনা উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছে।

লিখব কিছু। কিন্তু কি লিখব সেটা নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় একটুও। ঘুরতে ঘুরতে কখনো ইতিহাস চোখ টেনেছে, কখনো বা সদ্যগত অতীত। এই দেখার মধ্যে আজকের বর্তমানটি শুধু একপাশে সরে দাঁড়িয়ে আছে। এই বর্তমানটাকে সাবরমতী যেন আমারই মতো দেখছে চেয়ে চেয়ে। না, আমার মতোও নয়, আমার থেকেও শান্ত নির্লিপ্ত।

সাবরমতীর দু-ধারের এই জন-জীবনের কূল স্থাপন সুদূর অতীতের কাহিনি। প্রায় সাড়ে বারশ' বছর আগের এই অরণ্য অঞ্চল ছিল ভীলদের দখলে। ভীলপ্রধান আসা ভীল—তার নামে জায়গার নাম আসাওয়ল। তখন থেকে সাবরমতী এখানকার মানুষদের কৃষি বাণিজ্য শিখিয়েছে—সমৃদ্ধির আসন বিছিয়ে বসতে শিখিয়েছে।

এর পর মুলসমান কালের ইতিহাস। স্মরণীয় ইতিহাস নয়, কিছুটা রক্তপাতের ইতিহাস, কিছুটা বা ভাস্কর্য-শিল্পের ইতিহাস। গুজরাট-শাসক মজফ্‌ফরের বিদ্রোহী পুত্র দুর্ধর্ষ তাতার খাঁ পিতাকে বন্দী করেছিল এই আসাওয়লে। তারপর দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজসিংহাসনে বসেছিল তাতার খাঁ।

কিন্তু ক্ষমতা-অন্ধ নবীন বিদ্রোহী জানত না, মৃত্যু হাসছিল তার পিছনে দাঁড়িয়ে। তার হিসেবের সঙ্গে ওপরওলার হিসেব মেলেনি। ওই সিংহাসন তখন আসলে প্রস্তুত মজফ্‌ফর-পৌত্র আহমদ শাহকে গ্রহণ করার জন্য। তারই কাছে রক্তের বিনিময়ে নতিস্বীকার করবে প্রতিবেশী রাজপুত আর মালবরাজ—আহমদ শাহ প্রতিষ্ঠিত করবে স্বাধীন গুজরাট—পরের ইতিহাসের এই বিধিলিপি।

কিন্তু বিধিলিপিরও পরমায়ু আছে। ষোল শতকে গুজরাটের ভাগ্যবিধাতা বদলেছে। মোগল-রাজ আকবরের ভ্রূকুটি-শাসনগত হয়েছে এই দেশ। আর জাহাঙ্গীরের সময়ে গুজরাটের এই অঞ্চল দেখেছে রমণীর শাসন। ভাবতে ভালো লাগছে, একটি নয়, এই শহরের ওপর দিয়ে দুটি প্রতিস্পর্ধী রমণীর লীলাধারা উচ্ছল হয়ে উঠেছিল সেদিন। এক রমণী নদী সাবরমতী—দ্বিতীয় রমণী জাহাঙ্গীর-মহিষী নূরজাহান।...লিখতে বসে হঠাৎ প্রতিস্পর্ধী শব্দটাই কলমে এলো কেন জানি না। এই দুই রমণীর যৌবনধারায় কতটা মিল ছিল সেদিন আর কতটা অমিল, কল্পনা করতে ইচ্ছে করে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি আবার ক্ষমতা-বদলের পালা। সমগ্র গুজরাট নয় গুজরাটের এই অঞ্চলটি তখন মারাঠার-শক্তি করতলগত। আর উনিশ শতকের গোড়ায় ইংরেজের।

ইংরেজের!

যে ইংরেজ এখান থেকে নড়বে বলে কেউ ভাবেনি।

কিন্তু ঠিক একশো বছর বাদে এই ইংরেজের পাকা ভিত ভাঙার সাধনায় এখানে আসন পেতে বসল আর একজন। দেশ তার কানে মন্ত্র দিল, তুমি জাতির জনক, জাতিকে বাঁচাও।

মহাত্মা গান্ধী। সাবরমতীর কূলে একদিন দেখা দিল তার আশ্রম। জাতীয় আন্দোলনের পীঠস্থান।

এই ইতিহাস আর এই অতীতের মধ্যে গত ক'দিন ধরেই বিচরণ করছিলাম আমি। আজও।

মন্দির-মসজিদের রাজ্য থেকে যখন শাহীবাগে এলাম, তখনো বিকেল ঘন হয়নি। মেঘলা দিন, খাওয়া-দাওয়ার খানিক পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম!

সম্রাট শাহাজাহানের শাহীবাগ। একান্ত নিরিবিলি জায়গা। আগে আরো নিরিবিলি ছিল শুনলাম। শাহীবাগের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুটো প্রাসাদ ভেসে উঠবে চোখের সামনে। প্রবাদ অনুযায়ী এক প্রাসাদের সঙ্গে আর এক প্রাসাদের যোগ দুইয়ের মাঝের ভূগর্ভের সুড়ঙ্গপথে। এই নির্জনে এসে দাঁড়ালে দু-কান আপনা থেকে উৎকর্ণ হতে চায় কেন?

পাগলা মেহের আলীর গর্জন কানে আসবে—তফাৎ যাও, সব ঝুঁট হ্যায়?

ইংরেজ আমলে এখানে চাকরি করতে আসে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন এই শাহীবাগ ছিল তার বাসভবন। বিলেত যাবার পথে সে-সময়ে এই প্রাসাদে অবস্থান করেছিল রবীন্দ্রনাথ। ক্ষুধিত পাষাণের পটভূমি সেই শাহীবাগ প্রাসাদ!

আশ্চর্য! সে কোন্ যুগের কথা। সাতাশিটা বছর পার হয়েছে মাঝে। মাত্র আঠারো বছর বয়স তখন রবি ঠাকুরের। তার চিন্তার রাজ্যে সেই তখন জন্মগ্রহণ করেছে পাগলা মেহের আলীর কণ্ঠস্বর। আজও সেটা তেমনি অটুট তাজা।

—তফাৎ যাও! সব ঝুঁট হ্যায়!

নিবিষ্ট মনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। মন দিয়ে দেখছিলাম, চোখ দিয়ে দেখছিলাম, কান দিয়ে দেখছিলাম। এই তন্ময়তার ফাঁকে ত্রিপুরারি কখন সরে গিয়ে কোন্ জায়গায় বসে গেছে, খেয়াল করিনি। হঠাৎ সব ক'টা ধমনীর সবটুকু রক্ত একসঙ্গে নাড়া খেল বুঝি। বিষম চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

—তফাৎ যাও! সব ঝুঁট হ্যায়!

না, পাগলা মেহের আলীর বুক-কাঁপানো গলা নয়। রমণীর কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ এমন এক অকল্পিত বৈচিত্র্যের ধাক্কায় আমার মুখে কথা সরল না খানিকক্ষণ। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছি। রমণীর কণ্ঠস্বর না, রমণীই বটে।

দু'হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাসছে মুখ টিপে।

যশোমতী পাঠক। সহাস্যে যুক্তকরে নমস্কার জানালো।

আমার অবস্থা দেখে মহিলা আরো একটু জোরে হাসতে হুঁশ ফিরল যেন। ওদিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে ত্রিপুরারি ছুটে এলো। অদূরে আমাদের গাড়িটার পাশে মস্ত আর একখানা ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে।

ত্রিপুরারিকে দেখে হোক, অথবা প্রায়-অপরিচিত একজনের কাছে এই লঘু বিস্ময় সৃষ্টির দরুন হোক, উৎফুল্ল হাসিটুকু মহিলা আর বাড়তে দিল না। ফলে, সপ্রতিভ হাসির আভাসটুকু সমস্ত মুখময় ছড়িয়ে থাকল। সবিনয়ে বলল, আপনি খুব মন দিয়ে দেখছিলেন। চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালাম বোধহয়।

ত্রিপুরারি খুব হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে আছে। পারলে আমার হয়ে সে-ই মাথা নেড়ে দেয়। চিন্তার ব্যাঘাত ঘটুক না ঘটুক, মহিলার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে বিব্রত বোধ করছি কেন, সে শুধু আমিই জানি। যুক্তকরে আনত হলাম, এবং ততোধিক বিনয়ে জবাব দিলাম, ব্যাঘাত কিছু ঘটাননি।...আপনিও বেড়াতে বেরিয়েছিলেন নাকি?

হাসিমুখে মাথা নাড়ল। আমার মুখের ওপর দু'চোখ নড়াচড়া করল একটু। হাসিটুকু হালকা গাম্ভীর্যের পর্দায় ঢাকতে চেষ্টা করে বলল, আমি এসেছিলাম রোগী দেখতে। এসে শুনলাম, রোগী ভরদুপুরেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছেন। তারপর সাবরমতীর ধারেও তাঁকে না দেখে ভাবলাম এখানেই আছেন।

ত্রিপুরারি হেসে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ তার কর্ত্রীর নির্ভুল ভাবনার তারিফ করল। আমার প্রচ্ছন্ন শঙ্কা ঠিক-ঠিক হাসি-চাপা দেওয়া গেছে কিনা বলতে পারব না। মহিলার পরের স্বাভাবিক প্রশ্নটা আরো অস্বস্তিকর। দু'চোখ তেমনি মুখের ওপর রেখেই জিজ্ঞাসা করল, এখন কেমন আছেন?

জবাব দেবার আগেই বিপাকে পড়ার ভয়ে ত্রিপুরারি ফস ফস করে বলে উঠল, খুব ভালো না, তবু কিছুতে বাড়িতে রাখা গেল না, বেরিয়ে তবে ছাড়ল।

যশোমতী বলল, ভালো করেছেন, আমি তো ভালোই দেখছি এখন, কাল আপনি ঘাবড়ে দিয়েছিলেন প্রায়। এই উক্তি ত্রিপুরারির উদ্দেশ্যে। তারপর আমার দিকে ফিরে আবার বলল, ডাক্তারবাবু অবশ্য দেখে গিয়ে জানিয়েছেন তেমন কিছু হয়নি, তবু কালই আসা উচিত ছিল আমার, গেস্ট্রা ছিলেন বলে হয়ে উঠল না। আজ চারটের গাড়িতে শেষ গেস্ট্ বিদায় নেবার পর কর্তব্য করতে বেরিয়েছিলাম। আপনি এত ভালো আছেন দেখে অবশ্যই আরো বেশি খুশি হয়েছি।

হাসিমুখের এই আন্তরিক কথাগুলো কানে কেন যেন খুব সরল ঠেকল না। কেবলই মনে হল, মহিলা বুদ্ধিমতী, এই সাদাসিধে উক্তির পিছনে কিছু একটা কৌতুক প্রচ্ছন্ন। অবশ্য, শারীরিক অসুস্থতার মিথ্যাচার প্রসঙ্গে নিজে আমি সচেতন বলেও এ-রকম মনে হতে পারে।

দু'চার কথার ফাঁকে আরো খানিকক্ষণ শাহীবাগ দেখা হল। যশোমতী জিজ্ঞাসা করল, এর ওপর লিখবেন নাকি?

—ভাবিনি কিছু...।

ঠোঁটের ফাঁকে সকৌতুক হাসি দেখা গেল আবার। বলল, এখানে এসে সব লেখকই খুব ইন্সপায়ার্ড হয়ে শাহীবাগ দেখেন, দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান এখানে, মনে হয় ফিরে গিয়েই বড়ো গোছের কিছু একটা লিখে ফেলবেন। কিন্তু শেষে ক্ষুধিত পাষাণের ভয়েই আর কিছু লেখেন না বোধহয়।

অযোগ্যতার খোঁচা কিনা বোঝা গেল না। মন্তব্য করলাম, ক্ষুধিত পাষাণের পর লেখা তো খুব সহজ নয়।

স্বীকার করে নিয়ে তক্ষুনি মাথা নাড়ল।—তা বটে।

ফেরার সময় মহিলা তার গাড়িতে ওঠার জন্য আপ্যায়ন করল। কোনোরকম আপত্তি করার অবকাশ না দিয়ে ত্রিপুরারিকে বলল, আপনি আপনার গাড়ি নিয়ে চলে যান, আপাতত এঁকে আমার বাড়িতে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

নিজে বাড়ি বয়ে দেখতে এসেছিল, তারপরে সাবরমতীর ধারে খোঁজাখুঁজি করে এই পর্যন্ত এসেছে—আমার আপত্তির যথার্থ কোনো কারণ নেই আর। তা'ছাড়া এই রমণীসঙ্গ অবাঞ্ছিত নয়। কিন্তু ত্রিপুরারিও আপত্তি করল না দেখে ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করলাম একটু। অসুখের ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ুক ক্ষতি নেই, কিন্তু তার গুরুত্বও না এরপর ফিকে হয়ে যায়।

তাই মৃদু দ্বিধা প্রকাশ করলাম, আজ থাক্ না, আর একটু তাজা হয়ে পরে না হয় একদিন যাব'খন। আছি তো এখন দিন কতক।

মুখের দিকে দুই এক পলক চেয়ে থেকে যশোমতী জিজ্ঞাসা করল, কেন, শরীরটা এখনো তেমন ভালো লাগছে না?

প্রশ্নটা নয়, চোখের চাপা হাসিটা আমাকে বিব্রত করেছে। তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে বাঁচার চেষ্টা, বললাম, না, শরীর এখন ভালোই আছে।

—তবে আর কি, আসুন। আর কথা না বাড়িয়ে নিজের হাতে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

অতঃপর বিনা বাধায় আমাকে উঠে বসতে দেখে ত্রিপুরারিরই দায় বাঁচল যেন। গাড়ি ছাড়তে ও-পাশের দরজার কোণে ঠেস দিয়ে মহিলা হাসিমুখে বলল, আপনি এখাননে আসছেন শোনার পর থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করার বিশেষ ইচ্ছে ছিল। এ ক'দিনের মধ্যে হয়েই উঠল না...কিন্তু সে-জন্যে আমার থেকেও ঘোষবাবু বেশি দায়ী—তিনি আমাকে বললেন, বন্ধু আমার ঘরের লোক, তার জন্য আপনাকে একটুও ব্যস্ত হতে হবে না, আপনি এদিকের অভ্যাগতদের দিকে মন দিন।

এ আবার কোন ধরনের উক্তি! মহিলার ঠোঁটের ফাঁকে সহজ মিষ্টি হাসিটুকু লেগে আছে। কিন্তু আমার ঘেমে ওঠার দাখিল। একটু আগে ত্রিপুরারির সামনে মহিলার আচরণে বা মুখের সামান্য হাসিতে যে কৌতুক প্রচ্ছন্ন মনে হয়েছিল, এখন সেটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠার আশঙ্কা। জবাব না দিয়ে বোকার মতো আমি তার কথার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করলাম যেন।

গাড়িতে বসার শিথিল ভঙ্গিটুকুও চুরি করে দেখার মতোই লোভনীয়। কিন্তু এর পরের উক্তি কোন্‌দিকে গড়াবে আপাতত সেই সশঙ্ক প্রতীক্ষা আমার। যশোমতী বলল, গান শুনে সেদিন আপনি প্রশংসা করে গেলেন, কি লজ্জা, এত লোকের মধ্যে আমি ঠিক খেয়ালই করতে পারলাম না—একদিন তো মাত্র দেখেছিলাম। পরে মনে হয়েছে। তার ওপর আবার ঘোষবাবুর কথায় পড়ে নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করলাম না, আমার ভদ্রতাজ্ঞান আর অতিথিপরায়ণতার বহর দেখে আপনি তো একেবারে অসুখই বাঁধিয়ে বসলেন। খুব লজ্জা পেয়েছি।

সুবিনয়িনী যথার্থই লজ্জা কতটুকু পেয়েছে জানি না, কিন্তু গাড়ি থামালে আমি বোধহয় পালিয়ে বাঁচতুম। যে মহিলা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চালাচ্ছে, কটন্ চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হয়েছে—তার বুদ্ধির প্রতি আমার খুব যে অনাস্থা ছিল তা নয়। শুধু এমন এক রমণীর এই সুচারু হৃদয়ের দিকটাই আমি হিসেবের মধ্যে আনিনি। অসুখ শুনে ব্যস্ত হয়ে বাড়িতে ডাক্তার পাঠাবে, আর তারপর ফাঁক পেয়েই স্বয়ং রোগী দেখতে চলে আসবে—এ সম্ভাবনার কথা কে ভেবেছিল।

এই পরিস্থিতিতে যে কাজ সব থেকে সহজ এবং শোভন আমি তাই করলাম। আরো আগেই যা করা উচিত ছিল। হাসতে চেষ্টা করলাম আর তারপরে হাতজোড় করে বললাম, আমি একটি মূর্খের মতো কাজ করেছি, অপরাধ নেবেন না।

—কি আশ্চর্য, মহিলা হেসে উঠল, অপরাধ তো আমার, আপনার রাগ করাই তো স্বাভাবিক—কি ভেবেছিলেন বলুন তো, এ রকম অভ্যর্থনা জুটবে জানলে কলকাতা ছেড়ে আসতেন না বোধহয়?

এমন সঙ্কটে এই মুখের দিকে চেয়ে এই চোখে চোখ রেখে জবাব দেওয়া যে কত কঠিন, তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। মিথ্যার খোলস আগেই ছেড়েছি, এবারে গোটাগুটি সমর্পণ ভিন্ন গতি নেই। বললাম, দেখুন, এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরারির মুখে, আর আরো দু-চারজন বাঙালির মুখে আপনার এতবড়ো পরিচয় পেয়েছি যে মনে মনে বোধহয় হিংসেই হয়েছিল। আর সে-জন্যেই হয়তো নিজের ঠুনকো আত্মসম্মানের দিকটা মাথা উঁচিয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, ত্রিপুরারি আপনার কর্মচারী বলেই তার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে আপনি অবহেলার চোখে দেখলেন।

মহিলার সমস্ত মুখখানাই কমনীয় হাসিতে ভরে উঠছিল এবার। কিন্তু শেষের কথায় লজ্জা পেয়ে বলে উঠল, ছি, ছি, ঘোষবাবু আমাদের আপনার লোক, তাঁকে আমি বন্ধু মনে করি। কিন্তু আপনার একটুও অন্যায় হয়নি, আপনি শিক্ষাই দিয়েছেন। আপনার বই-টইগুলো আমার পড়া আছে যখন এ-রকম ভুল করার আমার উচিত হয়নি। বলতে বলতে আবারও হেসে উঠল।

যুক্ত কর করে বললাম, আর লজ্জা দেবেন না।

তক্ষুনি তরল জবাব দিল, দেব, যদি না আপনি আমার ভুল সংশোধন করার সুযোগ দেন। দিন সাতেক অন্তত এখন আপনি খুব লক্ষ্মী ছেলের মতো আমার গেস্ট্ হয়ে থাকুন তো। চিন্তা নেই, বাড়ি গিয়েই আমি টেলিফোনে ঘোষবাবুকে জানিয়ে দিচ্ছি আপনি দিনকতক এখন ফিরছেন না।

অস্বীকার করব না, এই নতুন জায়গা, নতুন জায়গার মানুষেরা, এই সাবরমতী গত ক'দিন ধরে আমাকে যত না আকৃষ্ট করেছে, স্বল্প আলাপে সূচ্যগ্রবুদ্ধি এই সুদর্শনা মহিলা আমাকে তার থেকে

অনেক বেশি টেনেছে। অন্তরঙ্গ আমন্ত্রণও লোভনীয় মনে হয়েছে তাই। কোনো অবিবাহিতা রমণীর পক্ষে এ-ধরনের দ্বিধাশূন্য আমন্ত্রণ সঙ্গত কিনা, সে সমস্যা মনের কোণেও উঁকিঝুঁকি দেয়নি।

তবু অভ্যাসগত ভব্যতার দিক আছে একটা। বললাম, এতখানি অপরাধের পরেও আমার ভাগ্য প্রসন্নই ধরে নিলাম।...কিন্তু আজ থাক, পরে আপনার আতিথ্য সানন্দে মাথা পেত নেব।

মহিলা সহজ আন্তরিকতায় মাথা নাড়ল। বলল, উঁহু, আজই, মানে আজকের থেকেই। আসলে আপনি লজ্জা পাচ্ছেন। রাজি না হলে আমার হাতে অস্ত্র আছে—ঘোষবাবুর কাছে আপনার অসুখের কথা ফাঁস করে দেব। তাঁর এখনো ধারণা আর একটু হলেই অসুখটা আপনার বেশ খারাপের দিকে গড়াতো। কালও বলেছিলেন সে কথা।

এরপর সানন্দে এবং শশব্যস্তে বশ্যতা স্বীকার। বললাম, ওর স্ত্রীর হাতে প্রায় ধরা পড়েছি, তার ওপর আপনার এই অস্ত্র ঘাড়ে পড়লে এ-জায়গা ছেড়েই পালাতে হবে আমাকে।

যশোমতী পাঠক খুশি হয়ে হাসতে লাগল। আলাপ আরো সহজতর করার চেষ্টা আমার। বললাম, খুব খুশি-চিত্তে আপনাকে ইচ্ছেমতো অতিথি-সৎকারের সুযোগ দিতে রাজি, কিন্তু আমার দিক থেকেও সামান্য একটুখানি শর্ত থাকবে।

রমণীমুখের চকিত কারুকার্য নয়নাভিরাম। সভয়ে বলে উঠল, কি শর্ত, আপনার গল্পের মেটিরিয়াল জোগাতে হবে না তো?—এমনিতেই তো আমাকে নিয়ে শহরে টি-টি।

ঠিক এই মুহূর্তেই, এই উক্তির পরেই কি নিয়ে লিখব সে-চিন্তাটা আমার অবচেতন মন থেকে ঘুচে গেছল কিনা সঠিক বলতে পারব না। হয়তো তাই। কিন্তু মহিলার ওই কথা আর ওই হাসির সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের ভিতরটা তলিয়ে দেখার অবকাশ তখন ছিল না। হেসে জবাব দিলাম, এইটুকুর মধ্যে অত বড়ো লাভের দিকে হাত বাড়াতে সঙ্কোচ—আমি গান শোনার বায়না পেশ করতে যাচ্ছিলাম।

প্রসন্নবয়ানে মহিলা তৎক্ষণাৎ রাজি। বলল, এ আবার একটা শর্ত নাকি! সাহিত্যিককে গান শোনাব এ তো ভাগ্যের কথা, ভালো লাগলে যত খুশি শুনবেন।

মস্ত ফটকের ভিতর দিয়ে গাড়ি ঢুকে গেল। চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা। সামনে লন্, পিছনে বাগান। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলা যেতে পারে। দূর থেকে আগেও একবার দেখেছিলাম। কিন্তু দূর থেকে ঠাওর হয় না।

না, এ-হেন আবাসে অতিথিকে ডেকে আনার ব্যাপারে রমণীরও সঙ্কোচের কারণ না থাকাই স্বাভাবিক। মহিলা সংসারী নয় বটে, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে এখানে অনেকগুলো সংসারের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। প্রাসাদ-সংলগ্ন হাল-ফ্যাশানের গেস্ট্-হাউস। ম্যানেজার, সেক্রেটারি, কেয়ার-টেকার আর দাস-দাসী—সব মিলিয়ে এখানকার বাসিন্দার সংখ্যা কত, আজও সঠিক বলতে পারব না। বাড়ির পিছনদিকে একসারি পাকা সার্ভ্যান্টস্ লজ্। সামনের দিকে গেস্ট্-হাউস, আর ও-ধারের একপাশ জুড়ে ম্যানেজার, সেক্রেটারি আর কেয়ারটেকারের আলাদা আলাদা কোয়ার্টার্স।

এ-রকম এক জায়গায় এসে পড়ে আমার প্রতি মুহূর্তে বিব্রত বোধ করার কথা। ত্রিপুরারির বউয়ের নীরব তদারকেই কত সময় বিব্রত বোধ করেছি। এখানে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে দু'জন করে লোক দৌড়ে আসে—কিছু চাই কি না। অথচ চাওয়ার অপেক্ষায় যে এখানে থাকতে হয় না, সে বোধহয় ওরাও জানে। যে ব্যবস্থা তার ওপরেও কিছু চাইতে হলে গবেষণা করে বার করতে হবে। প্রথম আধঘণ্টা একঘণ্টা এই পরিবেশে নিজেকে ভয়ানক বে-খাপ্পা লাগছিল বটে। কিন্তু আশ্চর্য, তারপরে সেভাবটা কেটে যেতে সময় লাগেনি।

ঐশ্বর্যপুরীই বটে, তবু অতটা সহজ নিঃসঙ্কোচ হতে পেরেছিলাম কি করে ভাবলে অবাক লাগে। পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তো সাত দিন থাকতে হবে ভেবে উতলা হয়ে পড়েছিলাম। মনে হয়, ঐশ্বর্য এখানে সীমিত নয় বলেই সঙ্কোচ আপনিই সরে গেছে। কৃত্রিম হ্রদকে বহু রকমে সাজিয়ে গুছিয়ে চোখ ঠিক্‌রে দেওয়া যায়। কিন্তু সমুদ্রের আর এক রূপ। সমস্ত উচ্ছলতা নিয়েই সমাহিত রূপ তার। এও

যেন অনেকটা তাই। প্রথমে তাক লাগে বটে, পরে মনে হয় ঐশ্বর্য এখানে ধ্যানে বসেছে। কোন রকম হঠাৎ-চমক নেই, দৃষ্টিকে পীড়া দিয়ে ঈর্ষা জাগানোর ঠমক নেই। যা আছে, তা থাকলেই যেন মানায়।

নিজস্ব ঐশ্বর্য বলতে যশোমতী সাগ্রহে প্রথমে আমাকে যে জিনিসটি দেখাল, সেটা তার লাইব্রেরি! লাইব্রেরি অনেক দেখেছি, কিন্তু এত বড়ো অথচ এমন সুচারুশৃঙ্খলাবদ্ধ নিজস্ব পাঠাগার কমই চোখে পড়েছে। শুনলাম এটি তদারক করার জন্য একজন এক্সপার্ট লাইব্রেরিয়ানও আছে। বাংলা ছেড়ে বিশাল ইংরেজি সাহিত্যের ধারা নিয়েও কেউ যদি গবেষণা করতে চান, মনে হয় এখানে বসেই তিনি মোটামুটি রসদ পেয়ে যেতে পারেন।

লজ্জা পেলাম, যখন আধুনিক লেখকদের সারি থেকে যশোমতী হাসিমুখে আমার লেখা প্র[illegible] বই টেনে টেনে দেখাতে লাগল। কিন্তু প্রশংসার বদলে অনুযোগের সুরটাই স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করল। বলল, আপনার কোনো কোনো লেখা, বিশেষ করে ট্র্যাজেডিগুলো এত বেশি আপত্তিকর যে পড়তে পড়তে মনে হত আপনাকে সামনে পেলে তর্ক তো করবই, ঝগড়াও হয়ে যেতে পারে। অথচ এখন দেখুন কিছুই মনে পড়ছে না।

লেখক মাত্রেই প্রীত হবার কথা, আমিও ব্যতিক্রম নই। তবু বললাম, আমার লেখার ওইটেই বোধহয় বড়ো গুণ, পড়ার পর আর মনে রাখার বালাই থাকে না।

যশোমতী হেসে ফেলেও একটু জোর দিয়েই বলল, না, অতটা নিন্দে অবশ্য করছি না, কিন্তু বেশিরভাগটাই ট্র্যাজেডি লেখার দিকে আপনার অত ঝোঁক কেন? আর ট্র্যাজেডি নয় যেগুলো, তারও তলায় তলায় কিছু-না-কিছু ট্র্যাজিক এলিমেন্ট থাকবেই।

হেসে সমালোচনা যথার্থ মেনে নিয়েই জবাব দিলাম, আচ্ছা, আপনার খাতিরে একটা বই অন্তত পরের সংস্করণে অন্যরকম করে দিতে রাজি আছি—যে-কোনো একটা বইয়ের নাম করুন, বদলে স্ট্রেইট্ কমেডি করে দেব।

বিপদাপন্ন মুখশ্রী যশোমতীর। প্রায় হার মেনে মন্তব্য করল, আপনি আচ্ছা জব্দ করতে পারেন।

খুশি মুখে প্রসঙ্গ বদল করলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, এত বই আপনি পড়ার সময় পান কখন?

—কেন, বই পড়েই তো সময় কাটাই কোন রকমে। আর কি কাজ?

—এত বড়ো একটা ব্যবসা চালাচ্ছেন—ত্রিপুরারি তো বলে আপনার মতো এতবড়ো ব্যবসা এখানে আর কারো নেই।

হেসে জবাব দিল, নিজের জিনিস সবাই বড়ো দেখে,ঘোষবাবুর তো কথাই নেই। তা ছাড়া ব্যবসা খুব বড়ো হয়ে গেলে আপনিই চলে। চালানোর একটা শো রাখতে হয় বটে, কিন্তু আসলে তেমন কিছু করতে হয় না।

ভালো লাগছিল। প্রতিটি কথা ভালো লাগছিল। হাসি ভালো লাগছিল। হাসির আভাসটুকুও ভালো লাগছিল।

শহর দেখার জন্য আর লেখার রসদ সংগ্রহের জন্য পরদিন থেকে ঝক্‌ঝকে একটা গাড়ি আমার হেপাজতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সাত দিন ছেড়ে বাকি পনেরো দিনই এখানে আমি অতিথি হয়ে ছিলাম। যশোমতী অনুরোধ করেছে। আমার যেটুকু সঙ্কোচ তা ত্রিপুরারির জন্য। ওর বউও ভাবতে পারে বড়লোকের আতিথ্য পেয়ে ওদের ভুলেছি। কিন্তু আপত্তি করা দূরে থাকুক, বরং সাগ্রহে সায় দিয়েছে। আড়ালে উৎসাহ দিয়েছে। ওখানেই থেকে যাও বন্ধু, অনেক মনের মতো মাল-মশলা পেয়ে যাবে—তাছাড়া আমার সঙ্গে দেখা তো রোজই হচ্ছে, বললে দু'বেলাই আসতে রাজি আছি। সাহিত্যিকের বন্ধু হলেও যে এত খাতির মেলে এ বাপু এই প্রথম জানলাম। গলা খাটো করে আর সেই সঙ্গে কনুইয়ের একটা গুঁতো দিয়ে আবার বলল, একটুও ঘাবড়াবার দরকার নেই, যা জানার ইচ্ছে শপাং করে মুখের ওপর জিজ্ঞাসা করে বসবে। তোমাকে দেখার আগে থেকেই তোমাকে পছন্দ যে হে, নইলে অত করে বলত না।

সকালের দিকে আমার হোস্টেসের অবকাশ কম। চায়ের টেবিলে দেখা হয়। তখনই যেটুকু কথাবার্তা হয়। তারপর সে কাজ নিয়ে বসে, আমি হয় গাড়ি নিয়ে বেরোই নয়তো লাইব্রেরিতে থাকি।

এরপর দেখা হয় দুপুরে খাবার সময়। ফ্যাক্টরি থেকে এই সময় ঠিক ঘড়ি ধরে ফিরে আসে। আমার ধারণা ছিল এই রীতিতেই বুঝি অভ্যস্ত কর্ত্রীটি। কিন্তু পরে একজন পরিচারকের মুখে শুনলাম তা নয়, বাড়িতে অতিথি আছে বলেই ফিরে আসে, নইলে তার দুপুরের খাবার ফ্যাক্টরিতেই নিয়ে যেতে হয়।

শুনে খুশি হয়েছি আবার সঙ্কোচও বোধ করছি। একটু এ-দিক ও-দিক হলেই অতিথি বিগড়ায় ভেবেই ভদ্রমহিলা কষ্ট করে আসে কিনা কে জানে। সেদিন বললাম, আপনি তো ফ্যাক্টরিতেই লাঞ্চ করেন শুনেছি, আমার জন্যেই কষ্ট করে আসতে হচ্ছে আপনাকে—এর কিচ্ছু দরকার নেই, যারা আছে তারা আদর যত্ন কম করছে না।

যশোমতী তক্ষুনি বলল, আপনি আমার ঘরের খবর নিতে গেছেন কেন? তরল কৌতুক-ভরা প্রসন্ন মুখ, আমার বার কতক শরৎবাবু পড়া আছে মশাই—সামনে বসে না খাওয়ালে আপনাদের মেজাজ ঠিক থাকে না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলাম, শরৎবাবুর যুগ গেছে, মেয়েরা বসে এখন শুধু বিষম খাওয়ায়।

চোখ পাকালো, মিথ্যে কথা, শরৎবাবুর যুগ যে একেবারে যায়নি সেটা আপনারও দুই একখানা বই থেকে প্রমাণ করে দিতে পারি।

গল্প জমে বিকেল বা সন্ধ্যার পর। আমি সেই প্রতীক্ষায় থাকি। সেদিন গাড়ি নিয়ে বহুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ফেরার পর প্রথম সাক্ষাতে মহিলা জিজ্ঞাসা করল,আজ কি দেখলেন?

—বিশেষ কিছু না। ঘুরলাম শুধু।

ঈষৎ কৌতুকে আবার প্রশ্ন করল, আপনি এখানকার কি নিয়ে লেখার কথা ভাবছেন?

—লিখবই যে এ আপনাকে কে বললে?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দিল, ঘোষবাবু বলছিলেন লেখার জন্যেই নাকি আপনি থেকে গেলেন এখানে, নইলে সাহিত্য-অধিবেশন শেষ হলেই পালাতেন।

স্বীকার করলাম, বললাম, বাসনা সেই রকমই ছিল বটে। কিন্তু কি লিখব এখনো ঠিক করা হয়ে ওঠেনি। কখনো পুরাণ হাতড়ে বেড়াচ্ছি, কখনো ইতিহাস, কখনো বা এখানকার বিগত রাজনীতি। লেখা হয়তো শেষ পর্যন্ত হবেই না, কারণ ওগুলোর একটার ওপরেও নির্ভরযোগ্য দখল নেই।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে যশোমতী হাসল মুখ টিপে।—কেন বর্তমান পছন্দ হচ্ছে না?

আশায় আশায় বড়ো লোভনীয় বাসনার দিকেই বেপরোয়া হাত বাড়িয়ে ফেললাম। কনুইয়ে গুঁতো দিয়ে ত্রিপুরারি শপাং করে বলে বসার পরামর্শই দিয়েছিল। ওর কল্যাণে আর এখানকার প্রবাসী বাঙালি আলাপীদের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার ফলে গল্পে গল্পে যে রসদের সন্ধান পেয়েছি, সেটা সত্যিই আরো কতগুণ লোভনীয় হয়ে উঠেছে এই ক'দিনে তা আর কে জানে?

বক্তব্যের ভূমিকস্বরূপ ঘটা করে বড়ো নিঃশ্বাস ফেলতে হল একটা, বললাম, বর্তমান বড়ো কৃপণ, নিজেকে কেবল আগলে রাখে। ফলে কেউ তার সম্পর্কে বাড়িয়ে বলে কেউ কমিয়ে। সঠিক হদিস কেউ দিতে পারে না, লিখি কি করে বলুন?

মহিলা যথার্থ অবাক।—আপনি কার কথা বলছেন?

আমি হাসতে লাগলাম। সেই হাসি থেকেই তক্ষুনি বুঝে নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখে রক্ত-কণা ছোটাছুটি করতে লাগল যেন। তারপর সামলে নিয়ে দু'চোখ কপালে তুলে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—এই মতলব আপনার, অ্যাঁ? আপনি কোথায় কি শুনেছেন শুনি?

সরলতার একটা সহজ ফল আছেই। সবিনয়ে জানালাম, শোনার ব্যাপারে প্রথম সহায়তা আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি, শাহীবাগ থেকে ফেরার পথে সেদিন আপনিই বলছিলেন, আপনাকে নিয়ে শহরে টি-টি।

মুখ থেকে লজ্জার আভা মিলাতে সময় লাগল। জিজ্ঞাসা করল, আর সেই শুনেই আপনি কি নিয়ে টি-টি খোঁজ-খবর করতে লেগে গেলেন?

মাথা নাড়লাম। তাই।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি চেপে চুপচাপ চেয়ে রইল একটু।—আমি এই শহরের একজন মহা গণ্যমান্য ব্যক্তি বে-ফাঁস কিছু লিখে ধরা পড়েছেন কি মানহানির কেস করব, খুব সাবধান।

আমি বিনয়াবনত আরো নির্দ্বিধায় আরো এক ধাপ এগোলাম।—সেই জন্যেই তো আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

লজ্জা গোপনের সুচারু প্রয়াস আবারও।—আপনি ভয়ানক লোক, আমি খাল কেটে কুমির এনেছি।

কি একটা অছিলায় তখনকার মতো উঠে গেছে। খানিক বাদে গানের বায়না পেশ করতে সহজ আন্তরিকতায় সম্মতি-জ্ঞাপন করেছে। গান আগেও দু'-তিন সন্ধ্যায় শুনেছি। কিন্তু এই দিনে সর্বরকমে ভাগ্য প্রসন্ন মনে হল। কারণ, মুখ বুজে বসে এই দিন গান আমাকে শুনতে হয়নি। দোসর পেয়েছিলাম। সব থেকে সুবাঞ্ছিত দোসর বোধ হয়...

বাইরে থেকে, অর্থাৎ ত্রিপুরারির মুখে এবং বাঙালি ভদ্রলোকের রসালো জটলা থেকে যে রিপোর্ট পেয়েছিলাম, তাতে মনে মনে প্রতিদিনই এখানে আমি একজনকে আশা করেছি।

কিন্তু আমার আসার সঙ্গে তার আসাটা এ-পর্যন্ত বড়ো বেখাপ্পা রকমের অমিল হচ্ছিল।

সে শঙ্কর সারাভাই।

এই রাত্রিতেই তার সাক্ষাৎ মিলল।

যশোমতী পাঠক দু'চোখ বুজে গানে তন্ময় তখন। মেঝেতে পুরু গালচে, কারো আসা-যাওয়া টের পাবার কথা নয়, পেলও না। ভদ্রলোক এলো। আমার তন্ময়তায় ছেদ পড়ল, নিভৃতের একটা অনুভূতি আনন্দে চঞ্চল হল। শঙ্কর সারাভাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে গায়িকাকে দেখল একটু। তারপর দু'হাত জোড় করে আমার উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালো। তারপর তেমনি নিঃশব্দে পাশের আসনে বসল। সপ্রতিভ মুখের অল্প অল্প হাসিটুকু আজ আরো অনেক বেশি ভালো লাগল আমার।

গানের মাঝেই একটু বাদে চোখ মেলে তাকালো যশোমতী পাঠক। আমার পাশে দ্বিতীয় আগন্তুক দেখার ফলে গানের তাল কাটল না বটে, কিন্তু মুখে পলকের লালিমার ছোপ স্পষ্টতর হল বোধ করি। আমার দিকে তাকালো একবার। দু'চোখ বুজেই গাইতে লাগল আবার। শঙ্কর সারাভাই গান শুনছে কি তন্ময় হয়ে কিছু চিন্তা করছে বোঝা ভার। তার দু'চোখ অদূরের দেয়ালের ছবিটার দিকে। আমার ধারণা, যে সময়ে গান শেষ হতে পারত, তার থেকে কিছু দেরিই হল।

তবু শেষ খানিক বাদে হলই। এরপরেও চোখ বুজে থাকা সম্ভব নয়। যশোমতী তাকালো। হাসল। নিজেই আগে কথা বলে প্রশংসা এবং আবার গানের অনুরোধ একসঙ্গে বাতিল করল হয়তো। আমাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে শঙ্কর সারাভাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, আলাপ আছে?

আমার দিকে চেয়ে শঙ্কর সারাভাই আর একদফা পরিচয়সূচক মাথা ঝাঁকালো। কিন্তু যশোমতী আমার নাম বলেনি বা পরিচয় দেয়নি। হাসিমুখে ভদ্রলোক সম্মুখবর্তিনীর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল তারপর। নিজেদের ভাষায় বলল, আলাপ হয়েছিল বোধহয়, তাছাড়া মাননীয় অতিথিকে নিয়ে তুমি খুব ব্যস্ত সেটা আগেই শুনেছি।

কেন জানি না, তাড়াতাড়ি নিজেকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আমার। বললাম, ওনার ব্যস্ততার জন্য আমি নিজেই খুব লজ্জিত।

ঝুঁকে চলা আর মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলা ভদ্রলোকের স্বভাব বোধহয়। সানন্দে মাথা ঝাঁকালো। —আপনার লজ্জার কিছুমাত্র কারণ নেই, ওঁর কাছে আপনারা প্রিভিলেজ্‌ড্ ক্লাস্, লেখকদের সাত খুন মাপ করে দিতে পারেন—এ তো মাত্র একটা খুন।

ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, মহিলাকে ব্যস্ত রাখার দরুন সেই একটা মাত্র খুন যাকে করা হয়েছে সেই ব্যক্তিটি উনি। এতবড়ো ঘরটাকে সচকিত করে হা-হা শব্দে হেসে উঠল। জোরালো পুরুষ, জোরালো হাসি। এ-রকম হাসিতে স্বল্প পরিচয়ের সমস্ত সঙ্কোচ ধুয়ে মুছে যাবার মতো। হাসি মিলাতে সাগ্রহে মহিলাকে লক্ষ করছি আমি। সেই মুখে ছদ্ম ভ্রূকুটি।—অত হাসার কি হল?

মুখখানা কাঁচুমাচু করে ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরল।—হাসি পেলে মেপে হাসা যায়, আপনি বলুন?

আমি মাথা নাড়লাম। যায় না।

যশোমতী পাঠক নিজেই হাসতে লাগল এবার। বলল, লেখককে আমি তোমার কাছে পাঠাব ভাবছিলাম, ভদ্রলোক বেশ মুশকিলে পড়েছেন। গল্পের প্লট খুঁজছেন—পাচ্ছেন না। হতাশ হয়ে দেশে ফেরার মতলব করছেন, তুমি দাও না কিছু ব্যবস্থা করে।

চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, মন দিয়ে রসদ আমি নিজেই সংগ্রহ করেছি। শঙ্কর সারাভাইয়ের পরিচয় যশোমতী আমাকে দেয়নি। এটা যে ভুল তা আমার মনে হয়নি। কিন্তু ভদ্রলোককে যে আমি চিনি সেটা সে বুঝেছে। তবু কোনো রকম বিড়ম্বনা বা সঙ্কোচ দেখিনি। অতিথির হয়ে এই সুপারিশও খুব সাদাসিধেভাবেই করল। এর আড়ালে যে কৌতুক প্রচ্ছন্ন সে শুধু উপলব্ধির বস্তু। নির্লিপ্ত চোখে মুখে ওই কৌতুক চিকচিক করছে কিনা দেখার জন্য আমার অবাধ্য দৃষ্টি ওই মুখখানাকেই চড়াও করেছিল।

দু'চোখ বড়ো বড়ো করে প্রায় আমার মুখোমুখি ঘুরে বসল শঙ্কর সারাভাই।

—আপনার নামটা কি মিস্টার...?

নাম যশোমতীই বলে দিল।

আরো একটু সহানুভূতি নিয়েই যেন শঙ্কর সারাভাই আমাকে নিরীক্ষণ করল। তারপর বলল, মহিলার অনুরোধ আমি সচরাচর রক্ষা করে থাকি। আমাদের দেশে এসে আপনি এরকম সমস্যায় পড়েছেন সাহায্য তো করাই উচিত। কিন্তু—আমি জমিজমার প্লট বুঝি, গল্পের প্লট—সে আবার কি?

জবাব দিলাম, খুব তফাৎ নেই, গল্পেরও তো কিছু জমি-জমা দরকার, নয়তো দাঁড়াবে কার ওপর?

হাসিমুখে যশোমতী পাঠক সেতারে রিন-রিন শব্দ করতে লাগল। ছদ্ম বিরক্ত মুখ করে শঙ্কর সারাভাই বাধা দিল, আঃ, ব্যাপারটা বুঝতে দাও ভালো করে। আবার আমার দিকে ফিরল, তা আপনার কি রকম প্লট চাই, নরম মাটির না শক্ত মাটির? আই মিন, ঠিক কোন্ রকম প্লটে কি ফসল ফলাতে চান না বুঝলে ব্যবস্থা করি কি করে?

জবাব দেওয়ার ফুরসৎ মিলল না। বেগতিক দেখে যশোমতী ধমকে উঠল তাকে, তোমাকে আর ব্যবস্থা করতে হবে না, থামো।

—দেখলেন? একেই বলে অস্থিরমতি রমণী-চিত্ত। শঙ্কর সারাভাইয়ের আর এক দফা সেই জোরালো হাসি।

গল্পে গল্পে রাত মন্দ হল না। আর রাত হওয়ার দরুন এক সময় এই আসর ভাঙল বলে ঘড়ি বস্তুটার ওপরেই রাগ হতে লাগল আমার। যাবার আগে আন্তরিক সৌজন্যে শঙ্কর সারাভাই তার বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করল আমাকে। যার খাতিরে এই আমন্ত্রণ তাকে কিছু বলল না দেখে ঈষৎ বিব্রত বোধ করেছি।

কিন্তু মহিলা নেমন্তন্নের ধার ধারে বলে মনে হল না। যথা দিনের যথাসময়ে যশোমতীই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। শঙ্কর সারাভাই বাংলা বোঝে, বলতে পারে না। আমিও হিন্দী বুঝতে পারি প্রকাশে বিভ্রাট। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাসি-খুশির মধ্যেই সময় কেটেছে। মনে হয়েছে, শঙ্কর সারাভাই তেমনি এক পুরুষ, অনায়াসে যে সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে যেতে পারে। ভাষার অন্তরায় সেখানে তুচ্ছ।

লেখার প্রসঙ্গে মহিলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমার হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছে, লিখুন তো মশাই, দুনিয়ার সব থেকে সেরা অকরুণ কোনো মহিলার গল্প লিখুন দেখি। সে-রকম গল্প দুনিয়ায় কেউ লিখেছে কিনা জানি না। যদি পারেন একটা মস্ত কাজ হবে, ব্যট্ বি কেয়ারফুল, পাথরের থেকেও শক্ত নারী-চরিত্র চাই—যে নিজের প্রতি অকরুণ, অন্যের প্রতি অকরুণ, অথচ সকলে তাকে করুণাময়ী ভাবছে।

রমণীর ভুরুর শাসন সত্ত্বেও হা-হা শব্দে সেই হাসিই হেসে উঠেছে শঙ্কর সারাভাই।

নিচের পাথরের ওপর উঁচু পাহাড়ী জলপ্রপাত ভেঙে পড়তে দেখেছি আমি। সেই আঘাতে পড়ন্ত জলের বেগকে ভীমগর্জনে শতধা হয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে একলক্ষ মুক্তার হাসির মত ছড়িয়ে পড়তে দেখেছি। কিন্তু সেদিন এই সরব হাসি দেখে মনে হয়েছিল, জলপ্রপাতের সেই দৃশ্যের সবটুকুই কি হাসি? সবটুকুই সুমহান বিশাল বটে, নিছক হাসি কি সবটুকু?

আরো দু'চার দিন এসে গল্প-গুজব করে গেছি ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে। কি পেয়েছি বা কতটুকু পেয়েছি, সেটা সে-সময় খেয়াল করিনি। এদিকে অবকাশ সময়ে যশোমতীর সঙ্গে বসে গল্প তো করেইছি। আমাকে রসদ জোগানোর আগ্রহে সে একটা কথাও বলেনি কখনো। সহজ অন্তরঙ্গতায় সে তার বাবা, মা আর বড় দাদার গল্প করেছে, ব্যবসার গল্প করেছে, এমন কি কৌতূহল প্রকাশ করলে শঙ্কর সারাভাইয়ের বেপরোয়া স্বভাবের গল্পও করেছে। সেই গল্প করার মধ্যে কোনো উচ্ছ্বাস ছিল না। কোনোরকম আবেগের আতিশয্যও না। কিন্তু তবু আমি যেন কিছু একটা উদ্দেশ্যের মোহনার দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছি। পেরেছি যে, সেটা পরের অনুভূতি। তখন উদ্দেশ্য ভুলে কান পেতে শুনেছি শুধু। ঐশ্বর্য-বিলাসে মগ্ন হয়েও সহজতার এই রূপ কোনোদিন ভোলবার নয়।

সম্ভাব্য কাহিনীর উচ্ছ্বাস এবং রোমাঞ্চের দিকটা ভরাট করে তোলার লোকের অভাব নেই। ত্রিপুরারি আছে। আর প্রবাসী বাঙালী বন্ধুরা তো আছেই। তাদের কাছে তিল কিছু নেই, সব তাল।

মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিয়েছি। দিয়েছি এই জন্যে যে বোকার মতো অসুখের সেই মিথ্যে আশ্রয় না নিলে, আর ঠিক তেমনি অসহায়ভাবে ধরা না পড়ে গেলে মহিলার মনটিকে ঠিক এমন করে এমন সুরে ধরার সুযোগ পেতাম কিনা জানি না। আর আরো একটা কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, প্রায় জ্ঞাতসারেই যশোমতী পাঠক আমাকে কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছে, অর্থাৎ নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার তাগিদ ভুলেছে। গোচরে হোক বা অগোচরে হোক, সমস্ত পরিপূর্ণতারই একধরনের বেদনাভার আছে। সেটা হয়তো আপনিই প্রকাশের পথ খোঁজে। প্রশ্রয় হয়তো এই কারণে।

আজকের যশোমতী পাঠকের পরিপূর্ণতার আড়ালে এই বেদনার দান কতটুকু, সেটা শুধু কল্পনাসাপেক্ষ কিনা বলতে পারব না। মোট কথা, যে দুটি নারী-পুরুষের হৃদয়চিত্র আমি আঁকতে চলেছি, তাতে কতখানি রঙ ফলানো হয়েছে, সে-সম্বন্ধে আমার নিজেরই কোনো ধারণা নেই। যদি হয়েও থাকে রঙ ফলানো, সে রঙ আমার নিজস্ব নয়। সেই রঙের জন্য আমি ঋণী ত্রিপুরারির কাছে আর প্রবাসী বাঙালী বন্ধুদের কাছে তো বটেই, হয়তো শঙ্কর সারাভাই আর যশোমতী পাঠকের কাছেও।

চার

যশোমতী পাঠক একবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিল।

আজকাল ছবিতে গল্পে যে-রকম পালানো দেখা যায়, ঠিক সেইরকম পালানো। আর ছবিতে পালানোর যে সব কারণ দেখা যায়, সেই গোছের পালানো। যশোমতী পাঠক সেই পালানোর মহড়া দিয়েছে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে। বয়স যখন তার টেনে-টুনে এক কুড়ির বেশি নয়—তখন।

সে-দিনের সেই যশোমতীকে নিয়ে কল্পনার অভিসারে গা ভাসায়নি শহরের অভিজাত ঘরের বয়সকালের এমন একটি ছেলেও ছিল কিনা সন্দেহ। সেই রোমান্স নিয়ে যে বড় রকমের হৃদয়বিদারক অঘটন কিছু ঘটে যায়নি, সেটাই আশ্চর্য। শহরের সর্বত্র তখন এমন আধুনিকতার ছাপ পড়েনি। মেয়েরা বেশির ভাগই তখন বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে অন্তরীণ। তারা লেখা-পড়া শিখছে বটে, স্কুলে কলেজেও যাচ্ছে—কিন্তু সেটা যতটা সম্ভব পুরুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে দৃষ্টি বাঁচিয়ে। আর তাদের সংখ্যাও নামমাত্র। কারণ পনেরো না পেরুতে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় তখন। বাইরের দিকে একটু তাকাবার অবকাশ যখন মেলে তখন তারা পাকাপোক্ত মায়ের আসনে বসে।

এমন দিনেই তরুণ মেয়েদের এক বিশেষ অস্তিত্বের জোরালো ঘোষণার রোমাঞ্চ জাগিয়েছিল যশোমতী পাঠক। সেই ঘোষণা প্রাণ-সম্পদ হয়ে দেখা দেবে কি প্রগতির বিকার হয়ে, রক্ষণশীল পরিণত বয়সের মহোদয় বা মহিলারা নিঃসংশয় নয় আদৌ। তবু কেউ উৎসাহ দিয়েছে, কেউ বা খুব

সন্তর্পণে একটু উপদেশ দিয়েছে—কিন্তু বাধা কেউ দিতে পারেনি। মেয়েদের ক্লাব হয়েছিল, মেয়েদের গান-বাজনা শেখার কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। মেয়েদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে বছরে দু-তিনবার অন্তত গোটা শহর মেতে উঠেছিল।

এই সমস্ত পরিকল্পনা আর উদ্দীপনার মূলে যশোমতী পাঠক। ইচ্ছে থাকলেও বাধা দেওয়া সম্ভব হয়নি এই কারণেই।

পনেরো বছরে স্কুলের পড়া শেষ করেছে যখন, তখন সকলে তাকে লক্ষ্য করেছে। উনিশ বছরে কলেজের পড়া শেষ করেছে যখন, তখন বহু তরুণের বুকের তলায় আগুন জ্বলেছে। কুড়ি বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে যখন, তখন সে বলতে গেলে শহরের সমস্ত প্রগতি-পন্থী রমণী-কুলের মুরুব্বি।

এই সবই সম্ভব যে জিনিসটি অঢেল পরিমাণে থাকলে—সেই বস্তুটি টাকা। যশোমতীর বাবা চন্দ্রশেখর পাঠকের সেই পরিমাণ টাকা ছিল, যে পরিমাণ টাকা থাকলে স্বর্গের দরজা আর নরকের দরজা দুই-ই অক্লেশে খোলা যেতে পারে। দ্বিতীয় দরজার প্রশ্ন এখানে নেই কারণ, নিজের উপার্জনের টাকা চেনার মতো চোখ লোকের সচরাচর থাকেই। বিশেষ করে সে যদি ব্যবসায়ী হয়। চন্দ্রশেখরও টাকা চিনত, টাকার সম্মান করতে জানত, টাকার জাল ফেলে টাকা তুলতে পারত।

সুতো আর কাপড়ের কলের ব্যবসা এখানে সুদূরকালের। কিন্তু সেই যুগে ম্যাঞ্চেস্টার-ফেরৎ চন্দ্রশেখরই বস্ত্রশিল্পের অগ্রগণ্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, অনুরাগীদের মুখে এমন কথাও শোনা গেছে। ব্যবসার স্বর্ণ-শিখরে আরোহণের তাগিদে একবার নয়, একাধিকার সে সাগর -পাড়ি দিয়েছে।

এই মানুষের সুরূপা কন্যা বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকলে লোকের চোখে কাঁটা ফোটে না । প্রায় তুলনীয় অভিজাত ঘরে এই ব্যতিক্রম বরং অনুকরণীয় বলে গণ্য হয়। বাপ বা অভিভাবকের তাড়ায় বিয়ে যাদের হয়ে গেছে, একটু বেশি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার চটক দেখে অনেকে তাদের মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু প্রায় সমতুল্য ঘর সেদিন খুব বেশি ছিল কিনা সন্দেহ। চন্দ্রশেখরের কট্‌ন্ মিল যখন জাঁকিয়ে উঠেছে—তার সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী তখন একজনও ছিল কিনা সন্দেহ।

গর্বিত, রাশভারী মানুষ চন্দ্রশেখর। সমালোচনা বরদাস্ত করতে পারে না, কোনোরকম প্রতিবাদও সহ্য করতে পারে না। নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়েছে—নিজের শক্তিতে চলে ফেরে ওঠে বসে। নিজের মগজের ওপর অফুরন্ত আস্থা তার। ফলে, অনেকে তাকে দাম্ভিক স্বেচ্ছাচারী ভাবে, ভয় তো করেই। কিন্তু বিপুল বিত্তের অধিকারী এই মানুষটি ভিতরে ভিতরে লোক খারাপ ছিল না। প্রবল ব্যক্তিত্বের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রেখে লোকের উপকার ছাড়া অপকার কখনো করেনি। কোনো কিছু দৃষ্টি এড়াতো না, কিন্তু ঘরের মেয়েটি যে তার আচার আচরণে সর্বতোভাবে তারই উত্তরাধিকারিণী হয়ে উঠেছিল, সে-সম্বন্ধেই খুব সচেতন ছিল না ভদ্রলোক।

সচেতন হয়েছিল কিছু দেরিতে।

সকলে সমীহ করত তাকে। মনে মনে স্ত্রী কমলাদেবীও একটু ভয়ই করত। ভয় করত বলেই সাড়ম্বরে সেটা অস্বীকারও করত সর্বদাই। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের শুরু থেকে চেনা বলে ভদ্রলোকের খিটির-মিটির বাধত এই একজনের সঙ্গেই।

চন্দ্রশেখর সেটা এড়াতে চেষ্টা করত, কিন্তু পেরে উঠত না সব সময়। এত অর্থ আর এতবড় ব্যবসার একটা আনুষঙ্গিক উৎপাতও শরীরে দেখা দিয়েছিল। সেটা ব্লাডপ্রেসার। চুপ করে থাকবে ভাবলেও সর্বদা হয়ে ওঠে না। ফলে চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করে তোলে, যখন মেজাজ চড়ে। বাড়ির শান্তি বজায় রাখার জন্য একটা স্বাধীনতা বরাবর দিয়ে এসেছে। টাকার স্বাধীনতা। ব্যাঙ্কে স্ত্রীর নামে, ছেলের নামে, আর মেয়ের নামে অঢেল টাকা জমা করে রেখেছে। টাকা অন্যায়ভাবে তছনছ করা হচ্ছে কিনা সেটা শুধু খোঁজ-খবর করত ছেলে গণেশ পাঠকের বেলায়। ছেলেরা যত সহজে টাকা নষ্ট করতে পারে, মেয়েরা তার সিকিও পারে না বলে তার ধারণা। টাকা নষ্ট হলেও আক্ষেপ নেই খুব, কিন্তু ছেলে বিপথে পা বাড়ালে সেটা সহ্য হবে না। মেয়ে অথবা মেয়ের মায়ের খরচ নিয়ে ভদ্রলোক একটুও মাথা ঘামাত না। তাদের খরচ বলতে তো শুধু শাড়ী-গয়না-পার্টি আর পার্টির চাঁদা। কত আর খরচ করবে?

তবু স্ত্রীর সঙ্গে যে এক এক-সময় ঝগড়া বেধে যেত, তার একটা কারণ আছে। কমলাদেবী মহিলাটি একেবারে যে নির্বোধ তা নয়। কিন্তু স্বামীর বুদ্ধি আর চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে চলা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। অথচ এমন একজনের ঘরণী সে, সর্বদা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেই বা কি করে। নিজের যথাযোগ্য মর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে, অর্থাৎ সমান তালে বুদ্ধি আর চিন্তা খাটাতে গিয়েই যত গণ্ডগোল। মহিলা এমন কাণ্ড করে বসে এক-একসময়, বা এমন কিছু বলে যে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা দায়। বাইরের অনেক আচার-অনুষ্ঠানে শুধু মাত্র স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়েই ভদ্রলোকের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। আর তাই নিয়েই তুমুল হয়ে যায় এক-একদিন।

বাবা-মায়ের এই ঝগড়াঝাটি যশোমতী বেশ উপভোগ করে। মায়ের হেনস্থা দেখে তার স্বাধীনচেতা মন এক এক সময় ভ্রূকুটি করে ওঠে। আবার বয়স্কদের ছেলেমানুষী দেখে হেসে গড়ায়। তবু বাইরের দিক থেকে বাবার চেয়েও মায়ের ওপরেই তার টান বেশি। তার কারণ, বাবার মেজাজ যে তার নিজেরও। ফলে, মেজাজ যে বেশি দেখায় তার ওপরেই তার মেজাজ চড়তে চায়।

কিন্তু বাড়িতে একদিন গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠল যশোমতীকে নিয়েই। অর্থাৎ, তার বিয়ে নিয়ে। যশোমতী তখন এম-এ পড়ছে। যশোমতী ততদিনে মেয়েদের ক্লাব করেছে। যশোমতী ততদিনে অনেক আসরে গানের খ্যাতি কুড়িয়েছে। যশোমতী এমন অনেক কিছু করেছে যা তার বয়সে কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। ফলে যশোমতী তখন নিজের থেকে বেশি বুদ্ধিমতী আর কাউকে মনে করে না।

কিন্তু তার বিয়ে নিয়ে বাড়িতে বাবা-মায়ের একটা বিবাদের প্রহসন অনেকদিন ধরেই তলায় তলায় জমাট বেঁধে আসছিল। যশোমতী তা লক্ষ্য করত আর উপভোগ করত। বাবা-মা আর দাদার ত্রিমুখী ধারা দেখে তার বেশ মজাই লাগত। বাবা কারো সঙ্গে পরামর্শ করার মানুষ নয়। তার সব থেকে প্রিয়পাত্র গোঁফওলা বিশ্বনাথ যাজ্ঞিক। চোখে পড়ার মতো প্রশ্রয় বাবা সচরাচর কাউকে দেয় না। কিন্তু বিশ্বনাথের ব্যাপারে তার পক্ষপাতিত্ব যশোমতীর চোখে অন্তত পড়ত। বাড়ির যে-কোনো অনুষ্ঠানে ওকে নেমন্তন্ন করা চাই। কোথাও বেড়াতে যাওয়া হবে ঠিক হলে বাবা তক্ষুনি বলবে, বিশ্বনাথকে খবর দেওয়া যাক, ও সঙ্গে থাকলে নিশ্চিন্তি।

যশোমতীর মতেও হয়তো লোকটা খুব মন্দ নয়, অনেক ব্যাপারে তার খুঁত ধরতে চেষ্টা করেও সামনাসামনি বিদ্রূপ হবার মতো কোনো বড় গোছের ত্রুটি দেখতে পায়নি। তার ওপর লোকটা ধীর-স্থির বিনয়ী স্বল্পভাষী। বাড়িতে সর্বদাই যাওয়া-আসা। কিন্তু ওই গোঁফ চক্ষুশূল যশোমতীর। সে মুখের কথা খসালেই বিশ্বনাথ গোঁফ নির্মূল করে ফেলবে, তাতে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে বলতে যাবে কেন? ওই গোঁফ থেকেই ভিতরের রুচি বোঝা যায়। আসলে গোঁফের এই ত্রুটি আবিষ্কার যে উপলক্ষ মাত্র, যশোমতী নিজেও তা ভালো জানে না। ছেলেটার আসল অপরাধ, সে তার বাবার নির্বাচিত ব্যক্তি। বাবার ব্যবস্থা নাকচ করে দেবার মতো সাবালিকাত্ব যশোমতী অর্জন করেছে। বাবার আদরের মানুষ বলেই তার ওপর রাগ। বাপকে বশ করে যে মেয়ে ধরতে চায়, তার দিকে তাকাতেও রাজি নয় যশোমতী।

অথচ বাবার দুনিয়ায় এক মাত্র বিশ্বনাথই তার মেয়ের যোগ্য ছেলের মতো ছেলে। বাবার এক-নম্বর সেক্রেটারী। বাবার সঙ্গে বার-দুই বিলেত ঘুরে এসেছে। সৎ ব্রাহ্মণবংশের ছেলে। বনেদী বড় ঘর। কর্মঠ। এরই মধ্যে ব্যবসার নাড়ী-নক্ষত্র সব বুঝে নিয়েছে। তাদের নিজেদের বাড়িতে টাকার ছড়াছড়ি, শুধু বাবার আকর্ষণেই নাকি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। দরকার পড়লে এই এতবড় ব্যবসাটা সে নিজের হাতে চালাতে পারে এখন, এই বিশ্বাসও বাবার বদ্ধমূল।

আর সেই দরকার একদিন-না-একদিন তো পড়বেই। কারণ, ক'বছর আগেই দাদার জন্য বিরাট একটা আলাদা মিল কিনেছে বাবা। সেই মিলের একচ্ছত্র মালিক দাদা। দাদা সেটা চালাচ্ছে এখন। বাবা তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, নিজের মিল যত পারে বড় করে তুলুক—বাপের মিলের কোনো অংশ সে যেন আশা না করে। অর্থাৎ বাবার অবর্তমানে এই মিলের মালিক হবে মেয়ে। এই থেকেই মেয়ের

প্রতি বাপের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতিত্বটুকু বোঝা যাবার কথা। কিন্তু তখন বোঝার মতো চোখ কারো ছিল না। যশোমতীর তো ছিলই না, কারণ, ব্যবসা চালানোর ব্যাপারে বিশ্বনাথের মুখাপেক্ষী না হলে অথৈ জলে হাবু-ডুবু খেতে হবে মেয়েকে—বাবার এই ধারণার বিরুদ্ধেই যশোমতী মনে মনে ভ্রূকুটি করে এসেছে সর্বদা।

যাই হোক, নিজের মিল বাবার সাহায্যে দাদা ভালই দাঁড় করিয়েছে। দাদা বয়সে সাত-আট বছরের বড় যশোমতীর থেকে। দাদাটি বিয়ে করেছিল বাইশ বছর বয়সে। মস্ত বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছিল তার। স্বভাবতই এই ভ্রাতৃবধূটিও বড় ঘরের মেজাজ নিয়েই এসেছিল এ-বাড়িতে। প্রথম দু'চার বছর ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হোক সে মানিয়ে চলেছে। তার পরেই তার হাব-ভাব চাল-চলন বাপের বাড়ির ধারায় বদলাতে শুরু করল। এক পরিবারে দুই কর্ত্রীর আধিপত্য টেঁকে না। মায়ের সঙ্গে বউয়ের একটু-আধটু মন কষাকষির সূত্রপাতেই দাদার আলাদা বাড়ি হয়েছে। ভালো জমি বাবা আগেই কিনে রেখেছিল, দাদার বাসনা বুঝে বাড়িও বাবাই তুলে দিয়েছে। সেই বাড়িতে সর্বাধুনিক হাল-ফ্যাশনের ব্যবস্থাগুলো শুধু দাদার টাকায় হয়েছে। অতএব ষোল বছর বয়স না হতেই যশোমতী জানে, বাবার এই বাড়ির একচ্ছত্র ভাবী মালিক সে-ই।

যাই হোক, বাবার মগজে চেপে বসে আছে বিশ্বনাথ যাজ্ঞিক। তার সঙ্কল্প, ফুরসত মতো বিয়েটা দিয়ে দেবেন। আর তারপরেও মেয়ে-জামাই চোখের আড়াল হবে না। এখানেই থাকবে তারা। সঙ্কল্পের কথা বাবা মুখ ফুটে কখনো বলেনি অবশ্য। অন্তত, এখন পর্যন্ত যশোমতী নিজের কানে বলতে শোনেনি। কিন্তু বাবার মনে কি আছে বোঝা একটুও কঠিন নয়।

দাদা আলাদা বাড়িতে আছে বলেই তার সঙ্গে প্রীতি এবং সদ্ভাব সম্পূর্ণ বজায় আছে। সে নিয়মিত আসে, বাবা-মায়ের খোঁজ-খবর করে। খোঁজ-খবরটা যশোমতীর আরো বেশি নিতে শুরু করেছে ইদানীং—সোজা তার কাছেই আসে, গল্প করে। যশোমতী এবং তার মায়েরও ছেলের বাড়িতে যাওয়া-আসা আছে। এই হৃদ্যতার ফলেই বোনের ওপর কিছুটা জোর আছে ধরে নিয়েছিল দাদা। মনে মনে তাই যশোমতীর জন্যে সে-ও একটি পাত্র স্থির করে বসে আছে। অবশ্য নিজের তাগিদে করেনি, করেছে স্ত্রীর তাগিদে—আর শ্যালকের তাগিদে। শুধু শ্যালক নয়, শ্যালক বন্ধুও বলা যেতে পারে।

এই শ্যালকটি স্বয়ং দ্বিতীয় পাত্র—বীরেন্দ্র যোশী। দাদার নিজের শ্যালক, অর্থাৎ বউদির ভাই। দাদার থেকে বছর দুই ছোট হলেও তারা পরস্পরের গুণমুগ্ধ ভক্ত। দাদার ব্যবসায়ের সে ডান হাত। বিশ্বনাথ যাজ্ঞিক বাবার যেমন ডান হাত, সে-রকম নয়। তার থেকে অনেক বেশি। বাবার ধারণা, ডান হাত দিয়ে সে আর একটি ডান হাত গড়ে তুলেছে, কিন্তু দাদার বিশ্বাস এই শ্যালক বন্ধুর একাগ্র নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের ফলেই তার ব্যবসা এমন চট করে ফুলে ফেঁপে উঠতে পেরেছে।

যশোমতী ধরেই নিয়েছে তাকে বিয়ে করার ইচ্ছেটা সে-ই সঙ্গোপনে দাদার কাছে প্রকাশ করেছে। আর তারপর দাদা-বউদি মেতে উঠেছে। এই মাতামাতিটা আজকাল একটু বেশিই করেছে তারা। দাদার বাড়ি গেলেই তার দেখা অবধারিত মিলবে। বউদিই হয়তো আগে থাকতে খবর দিয়ে রাখে ভাইকে। বীরেন্দ্র যোশীর ইচ্ছেটা তার হাব-ভাবে অনেক আগেই যশোমতী বুঝে নিয়েছিল। তার দিক থেকে উৎসাহ বোধ করার মতো কোনোরকম সদয় আভাস না পেয়ে শেষে দাদাকে মুরুব্বি পাকড়েছে। লোকটির প্রতি দাদা এত নির্ভরশীল যে হয়তো তাকে আশ্বাসই দিয়ে বসেছে, কিছু ভাবনা নেই, ব্যবস্থা হবে।

যখন-তখন দাদা তার শ্যালক-বন্ধুকে নিয়ে এ বাড়িতে হানা দিচ্ছে আজকাল। পরম স্নেহভরে হাঁক-ডাক করে বোনকে ডাকে। আর ফাঁক পেলেই বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। ছদ্ম বিস্ময়ে যশোমতী এক একসময় হাঁ করে চেয়েই থাকে বীরেন্দ্র যোশীর দিকে—অর্থাৎ এত গুণ কোনো এক মানুষের থাকে সেই বিস্ময়েই যেন তার চোখের পলক পড়ে না।

আনন্দে পুলকে বীরেন্দ্র যোশী ঘামতেই থাকে বোধহয়। এখানে বিয়ে হলে এই দিকের বিশাল সম্পত্তিও নিজেদের মধ্যেই থেকে গেল...দাদার কানে বউদির এই মন্ত্র ঢোকানও বিচিত্র নয়।

কিন্তু এই পাত্রও যে আদৌ পছন্দ নয়, সে শুধু যশোমতীই জানে।

মায়ের হাতেও তার বিশেষ পছন্দের পাত্র আছে একটি। তৃতীয় ক্যান্ডিডেট। রমেশ চতুর্বেদী। বড় মিল-মালিকের ছেলে সে-ও। রমেশ চতুর্বেদীর মায়ের সঙ্গে যশোমতীর মা কমলা দেবীর ইদানীং খুব ভাব। ভাবের সমস্ত রাস্তা রমেশের মা-ই প্রসারিত করেছে। সেটা ছেলের মুখ চেয়ে। রমণীমহলে মহিলাটি কমলা দেবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে চেষ্টা করা দূরে থাক , উল্টে তাঁর কথায় সর্বদা সায় দিয়ে চলে। মায়ের বিচারবিবেচনা বুদ্ধির প্রশংসা তার মুখে যত, আর কারো মুখে ততো নয়। আর ছেলের তো কথাই নেই, মাসি বলতে অজ্ঞান। সে যে অনুষ্ঠানের মাতব্বর, মাসি অর্থাৎ যশোমতীর মায়ের সেখানে সর্বাগ্রগণ্য মর্যাদা। যশোমতী দেখে আর হাসে আর ভাবে এমন ভাবী শাশুড়ী ভক্ত মানুষ সচরাচর দেখা যায় না বটে।

অতএব মায়ের মতে রমেশ চতুর্বেদী হীরের টুকরো ছেলে। বিয়ে না হতেই যে ছেলে তাকে এতটা মর্যাদা দেয়, বিয়ে হলে সে কি করবে? অভিজাত মহলে একটু বিশেষভাবেই গণমান্য হয়ে ওঠার ইচ্ছেটা মায়ের একটু বেশিই। তার ধারণা জামাই হলে রমেশ এ ব্যাপারে সকলের থেকে কাজের হবে। বছরে দু'তিনটে বড় ফাংশানের মাতব্বর সে বটেই, তার জামাই হলে ভবিষ্যৎটা আরো উজ্জ্বল তো হবেই। যশোমতী মায়ের বাসনা বুঝে মনে মনেই শুধু হাসে, বাইরে নির্বোধের মতো থাকে। কারণ, তার বিবেচনায় রমেশ চর্তুবেদীও বাতিল। কেন বাতিল, সেটা অত তলিয়ে ভাবেনি, নির্বাচনটা মায়ের বলেই হয়তো নির্দ্বিধায় বাতিল।

সকলকে বাদ দিলেও ক্যান্ডিডেট তার নিজের হেপাজতেও জনা দুই অন্তত আছে। প্রত্যাশীর সংখ্যা তার ঢের বেশি, কিন্তু তাদের মধ্যে এই দু'জন আর কোনো সুপারিশের ওপর নির্ভর না করে বুদ্ধিমানের মতো নিজেরাই এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। শিবজী আর ত্রিবিক্রম। এরাও মস্ত ঘরের ছেলে। কুল-মান-যশে কারো থেকে ফেলনা নয়। অন্যদের মতোই রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। লেখা-পড়ায় তো ভালই আবার পাঁচ কাজে চটকদার উদ্ভাবনী শক্তিও আছে। বিশ্বনাথ বাবার মুখ চেয়ে আছে, রমেশ চতুর্বেদী মায়ের—আর বীরেন্দ্র যোশী দাদার। এদের তুলনায় শিবজীর চালচলন শিবজীর মতোই সুতৎপর, আর ত্রিবিক্রমের রসিকতার বিক্রম অন্তত তিনগুণ বটে। এই দুজনের একজনকেই যে একেবারে স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রহণ করে বসে আছে যশোমতী, এমন নয় আদৌ। তবে ঘরের কল্পনা যদি কখনো-সখনো করতে হয়, এই দুজনের একজনকে নিয়েই করতে চেষ্টা করেছে। কখনো ভাল লাগেনি, কখনো বা একেবারে মন্দ মনে হয়নি। তবে অন্য সকলের থেকে এই দুজনের প্রতি যশোমতীর একটু অনুকম্পা বেশি, কারণ, তারা শুধু তারই ওপর নির্ভর করে আসছে। তাদের সুপারিশ সরাসরি তারই কাছে।

দাদা বলে, যোশীর শিকারে বেরুবার ইচ্ছে, আমরাও যাব ভাবছি, তুই যাবি?

অবধারিত ভাবেই যশোমতীর দু' চোখ কপালে উঠবে। কারণ, দাদা এক-এক সময় যোশীর এক-একটা গুণ আবিষ্কার করে থাকে। তারপর চোখের নীরব বিস্ময় চৌচির হয়ে গলায় এসে ভাঙে।—...কি আশ্চর্য, তার আবার শিকারের শখও আছে নাকি!

—শখ মানে? নেশা! ক'টা বছর ব্যবসা নিয়ে মেতেছিল বলে, নইলে কোন্ গুণ না আছে তার? এ-রকম একটা ছেলেও তো আজকাল আর দেখা যায় না। দেখা যায় না সেই খেদে দাদার দীর্ঘনিঃশ্বাসই পড়ে।

চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই যশোমতীর, মাথা নেড়ে সায় দেয়, সত্যি...ভদ্রলোক গান-বাজনায় ভালো, খেলাধুলোয় তো কথাই নেই, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ছেড়ে না দিলে লেখাপড়াতেও তার জুড়ি ছিল না শুনেছি, ব্যবসায়ও এত মাথা, এখন আবার শুনছি শিকারেও ওস্তাদ। আর আজকালকার ছেলেগুলো যা হয়েছে, কিছুতে পাকা হতেই মেরুদণ্ড বেঁকে যায়।

দাদার উদ্দীপনা চতুর্গুণ। গলা খাটো করে বলে, সেই জন্যেই তো বলছি, ওই রকম একটা ছেলেকে আত্মীয় করে নিতে পারা ভাগ্যের কথা—

যশোমতীর বোকা বোকা বিস্ময়, তোমার নিজের শালা...আত্মীয়ই তো!

ফলে বোনকে বোকাই ভাবে দাদা, এই এক ইঙ্গিত যে কতবার কত ভাবে করেছে, ঠিক নেই। কিন্তু ওর মাথায় কিছু ঢুকলে তো, বাবার টাকায় হৈ-চৈ করে, লোকে ভাবে বুদ্ধিমতী। ফলে মাথায় ঢোকানোর চেষ্টায় সেই অগূঢ় ইঙ্গিতের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। শুনে যশোমতী লজ্জা পায় প্রথম, পরে চিন্তিত মুখে বলে, কিন্তু বাবার যে আবার অন্যরকম ইচ্ছে।

—দূর দূর দূর! বিতৃষ্ণায় নাক-মুখ দেখার মতোই কুঁচকে ওঠে দাদার।—কোথায় যোশী আর কোথায় বিশ্বনাথ। আত্মসম্মানবোধ থাকলে কেউ সেক্রেটারির কাজ করে! নিজেদের একটা কর্মচারীকে বিয়ে! বংশের কে কবে রাজা-উজীর ছিল বাবার কাছে সেটাই বড়। তুই জোর দিয়ে আপত্তি কর, লেখাপড়া শিখেছিস, অন্যের কথায় বিয়ে পর্যন্ত করতে হবে নাকি? আর বাবা তো তোকে একটু ভালোই বাসে, তোর আপত্তি শুনলে এগোবে না।

দাদার বরাবরই বিশ্বাস তার থেকেই বাবার চাপা স্নেহ এই বোকা বোনটার প্রতি অনেক বেশি।

নিরীহ এবং চিন্তাচ্ছন্ন মুখে যশোমতী প্রস্তাব করে, আমার হয়ে বাবার কাছে আপত্তিটা তুমিই করে দাও না?

দাদা তিক্ত বিরক্ত, বিয়ে করবি তুই আর আমি যাব আপত্তি করতে? তাছাড়া বাবা অমনি ধরে নেবে আমার শালার টানেই ব্যাগড়া দিতে গেছি।

যশোমতী আরো কাতর মুখ করে জবাব দেয়, ধরলেই বা, সেটা তো আর সত্যি নয়, তুমি তো আমার মুখ চেয়েই বলতে যাচ্ছ। তা যদি না পারো তাহলে থাকগে, আমার কপালে যা আছে তাই হবে।

প্রায় হাল ছেড়েই দাদা আবার নতুন করে বোঝাতে বসে তাকে, সাহস দেয়, উদ্দীপনা সঞ্চার করে। যশোমতী শেষে তাকে ভরসা দিয়ে বলে, আচ্ছা, মনে মনে কিছুদিন আগে জোর গলায় আপত্তি করি, শেষে ঝপ করে বাবাকে একদিন বলে ফেলতে পারব।

সুযোগ পেলে মা-ও তার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়। তবে মা দাদার মতো অত বাঁকা রাস্তা ধরে এগোয় না। সোজা ব্যাপার ছাড়া মাথায় ঢোকে না, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতেও পারে না। মা সোজাসুজি বলে, মিসেস চতুর্বেদী তো মুখের কথা পেলেই কাজে নেমে পড়ে, আমাদের দিক থেকে আর দেরি করা উচিত নয়, রমেশের মতো ছেলের জন্য কত মেয়ের মা তো হাত বাড়িয়েই আছে।

আবার সেই নির্বুদ্ধিতার পুনরাভিনয়।—মেয়ের মা হাত বাড়িয়ে আছে কি মা?

—আঃ! কমলা দেবী বিরক্ত, কিছু যদি বুঝিস—হাত বাড়িয়ে আছে মানে রমেশের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে।

—ও...। তা দিচ্ছে না কেন?

—কতবার বলব তোকে, তারা যে আমাদের সঙ্গেই কাজ করতে চায়!

যশোমতীর মুখখানা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেই এবার। মাকে তাতিয়ে তোলার মোক্ষম উপায়ই জানা আছে তার, অতএব হেসে ফেললে মুশকিল। তাই তার মতে সায় দেবার মতো করেই সমস্যাটা ব্যক্ত করবে। বলবে, দাদা যে আবার তার শালার কথা বলে?

—কি! মায়ের মেজাজ চড়বে তৎক্ষণাৎ।—এখনো বুঝি সে সেই মতলবে আছে? এক মেয়ে এনেই খুব আক্কেল হয়েছে, আবার ওইখানে! আস্পর্ধার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। সাফ না বলে দিবি। তাছাড়া বীরেন্দ্রও ছেলে আর রমেশও ছেলে...কার সঙ্গে কার তুলনা।

একজনের তুলনায় আর একজন ছেলে কিনা মায়ের প্রায় সেই সংশয়। মেয়েকে বোকার মতো চেয়ে থাকতে দেখে তার অস্বস্তি বাড়ে, আবার তোকে কি বলেছে শুনি?

করুণ অবস্থা যশোমতীর মুখের, বলছিল, যোশীর মতো এত গুণের ছেলে অর্ডার দিলেও আর মিলবে না, ভগবানের হাত ফস্কে ওই একজনই এসে গেছে।

রসিকতার ধার দিয়ে না গিয়ে মা রেগে লাল, ও বলল আর তুই অমনি ভুলে গেলি?

—ভুলব না বলছ?

—দেখ্ তোর বয়স হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছিস, একটু বুদ্ধি রেখে চলতে চেষ্টা কর। এই সব ওই বউয়ের কারসাজি, একজনকে তো কেড়েছে আবার তোর দিকে চোখ পড়েছে। রমেশের পাশে ওই যোশী একটা বাঁদর—যাকে বলে একটা কাক—বুঝলি?

মায়ের রাগের মুখে এই গোছেরই উপমা বেরোয়। যশোমতীর দু'চোখ কপালে, উচ্ছ্বসিত হাসির দমক আর ঠেকাতে পারেই না বুঝি।

এদিকে শিবজী আর ত্রিবিক্রম চুপ করে বসে নেই। তারা বিশ্বনাথ যাজ্ঞিককে চেনে রমেশ চতুর্বেদীকে চেনে। আর তাদের খুঁটির খবরও রাখে। ওরা নিজেরা দু'জনে আবার একাত্ম বন্ধু। ফলে রেষারেষিটা বাইরের থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। রমেশ বা বীরেন্দ্রর জন্য তাদের চিন্তা নেই। খোদ কর্তার ক্যান্ডিডেট বলে তাদের যা কিছু দুর্ভাবনা বিশ্বনাথকে নিয়ে আর পরস্পরকে নিয়ে। যখন আসে, প্রায়ই একসঙ্গে আসে দু'জনে। আর বৈচিত্র্যের আশায় দু-একটা প্রস্তাব তারাও করে, অনেকদিন একঘেয়ে কাটছে, একটু এক্সকারশনে বেরুলে হত...

যশোমতী চোখের কোণে দু'জনকেই লক্ষ্য করে নির্লিপ্ত জবাব দেয়, বীরেন্দ্র যোশী শিকারে যাবার কথা বলছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখে আঁচড় পড়ে ওদের। শিবজী বলে, হুঃ! বাপের আমলের বন্দুকে মরচে পড়ে গেছে শুনেছি—

ত্রিবিক্রম নড়ে-চড়ে বসে বিতৃষ্ণার আবেগ সংযত করে হাল্‌কা সুরেই জিজ্ঞাসা করে, কোথায় শিকারে যাবে, চিড়িয়াখানায়?

এই সবই উপভোগ করে যশোমতী। ছেলেদের নিয়ে খেলা করে যে মেয়ে, যশোমতী তাদের একজন নয়। সে কাউকে ডাকে না, কাউকে কোনো রকম চটুল আশায় বা আশ্বাসে ভোলায় না। নিজের স্বভাব কৌতুক ছাড়া কারো সঙ্গে রঙ্গ-রসে মেতেও ওঠে না। তবু আসেই যদি সব, ও কি করতে পারে? তাই বাস্তবিকই মজা লাগে তার। বাবাই শুধু কিছু বলে না। অর্থাৎ তার বিবেচনার ওপর কথা বলার কেউ নেই—এই ভাব।

কিন্তু এ-ধরনের পারিবারিক অথবা বাইরের মানুষদের নিয়ে প্রহসন যত কৌতুককরই হোক, শুধু এই নিয়ে দিন কাটানো শক্ত। তার সান্নিধ্যে আসার রেষারেষি যাদের, সকলেই তারা বিত্তবান। তাদের ঘিরে অনেক মেয়ের বাবা মায়ের আগ্রহ। কিন্তু বিত্তের মোহ আর যারই থাক যশোমতীর থাকার কথা নয়। সে যে কোন্ বিত্ত খোঁজে, নিজেও ভালো করে জানে না। এক-এক সময় কেমন ক্লান্তি অনুভব করে। এ ক্লান্তি ঠিক বাইরের নয় তাও অনুভব করতে পারে। বিলাস-প্রাচুর্যে ভরা জীবনের এই বাঁধা-ধরা ছকের মধ্যে কি যেন ফাঁক খোঁজে একটা। পড়াশোনা করে, গান করে, ক্লাব নিয়ে মেতে ওঠে। কিন্তু তবু ওই অগোচরের ফাঁকটা যেন ভরাট করে তোলা যায় না।

এমন দিনে, বাবার সঙ্গে মায়ের তুমুল বেধে গেল। বাধল মেয়ের বিয়ে নিয়েই। আলোচনার গোড়ায় দাদাও উপস্থিত ছিল, মনে মনে সে অনেক শক্তি সংগ্রহ করে অনেক ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল। বাপ-মায়ের মুখের উপর এক বীরেন্দ্র ছাড়া আর সকলকে বাতিল করার সঙ্কল্প মনের তলায় দানা বেঁধে উঠেছিল। সম্ভব হলে আর ফাঁক পেলে নিজের ইচ্ছেটা যশোমতীর ইচ্ছে বলে চালিয়ে দিতেও আপত্তি নেই। কিন্তু চেষ্টার মুখেই বেগতিক দেখে পালিয়েছে।

প্রশ্নটা মা-ই তুলেছিল।—মেয়ে এম-এ পাস করতে চলল, বিয়েটা আর কবে হবে?

বাবা বলল, দিলেই হয়, চমৎকার ছেলে তো হাতের কাছে রয়েছে।

মা জেনেশুনেই আকাশ থেকে পড়ল।

—কে চমৎকার ছেলে, বিশ্বনাথ? সেক্রেটারির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে! কি-যে উদ্ভট চিন্তা তোমার মাথায় আসে... লোকে বলবে কি? আমি তো ভাবতেও পারি নে—তার থেকে রমেশ অনেক ভাল ছেলে, তাদেরও খুব ইচ্ছে।

যশোমতী ও-ঘরের আড়াল থেকে দেখছে, শুনছে, হাসছে। মায়ের দিকে বাবা এমন করে তাকালো যাতে ভরসা পেয়ে দাদা বলল, আমার বিবেচনায় বিয়েটা বীরেন্দ্রর সঙ্গে হলেই সব থেকে ভালো হয়, তাদেরও খুব আগ্রহ।

—বীরেন্দ্র কে? বাবার গম্ভীর দৃষ্টিটা সরাসরি দাদার মুখের ওপর।

আর দাদার এই মুখ দেখে দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে যশোমতী হাসি সামলাচ্ছে। মাথা চুলকে দাদা জবাব দিল, ইয়ে...আমাদের বীরেন্দ্র।

—তোমাদের বীরেন্দ্র! ও...তোমার সম্বন্ধী বীরেন্দ্র?

—আজ্ঞে।

—তা খুব আগ্রহটা কার?

—ওদের বাড়ির সকলেরই...।

নিশ্বাস রুদ্ধ করে দেখছে যশোমতী, শুনছে। মা ঝলসে ওঠার আগে বাবাই গম্ভীর মুখ করে জবাব দিল, তোমার বোনকে বিয়ে করার বা ঘরে নেবার আগ্রহ অনেকেরই হতে পারে। অন্যের আগ্রহের কথা ভেবে কাজ নেই, তোমার বোনের বিয়ে আমাদের আগ্রহ অনুযায়ী হবে।

ব্যস, দাদার আর কথা বলার সাহস নেই। মনে মনে বোনকে তাতানোর সঙ্কল্প নিয়েই প্রস্থান করতে হল তাকে। ঘরে পুরো দমে পাখা ঘুরছিল, তা সত্ত্বেও ঘেমে নেয়ে একাকার। দাদা চলে যেতে বাবা আবার বলল, রমেশের সঙ্গে নয়, বিয়ে বিশ্বনাথের সঙ্গেই হবে। আমি অনেক ভেবেই স্থির করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মর্যাদায় ঘা পড়ল যেন। দাদার মতো মা-ও যে নিজের ইচ্ছেটাকে যথাস্থানে তুলে ধরার কত-রকম জল্পনা-কল্পনা করেছে আর কতবার কতরকমভাবে মন স্থির করছে সে শুধু যশোমতীই আঁচ করতে পারে। বাবার এক কথায় সব ধূলিসাৎ যেন। বলে উঠল, মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দাও না তার থেকে—

বাবা রাগলেও গোড়ার দিকে খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা মুখেই কথা বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু বচন কদাচিৎ মোলায়েম হয়ে থাকে। বলল, তোমাদের মেয়েদের যেখানেই ফেলা হোক, হাত-পা বেঁধেই ফেলতে হয়। জলে না ফেলে আমি ভালো জায়গাতেই ফেলছি। যা বোঝো না, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।

বাবার এই অবজ্ঞার কথা শুনে এ-ঘরে যশোমতী ভুরু কোঁচকাল। কিন্তু ও-ঘরে মায়ের গোটাগুটি মানহানি ঘটে গেছে। মোটা শরীর নিয়ে ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে মা ফুঁসে উঠল, কি বললে? আমাদের হাত-পা বেঁধে ফেলতে হয়? আমার মেয়ে আমি বুঝি না, আর তুমি দিনরাত ব্যবসায় ডুবে থেকে সব বোঝো? আমার মেয়ের বিয়ে কোথায় দেবে আমাকে জিজ্ঞাসা করারও দরকার মনে করো না, কেমন? আমাদের মান-মর্যাদা বলে কিছু নেই—রমেশের মাকে আমি আশা দিয়েছি সেটা কিছু নয়?

বাবার মন্থর পায়চারি করা থেমে গেল। স্নায়ু তেতে ওঠার উপক্রম হলেই ও রকম পায়চারি করে থাকে। চাপা গর্জন করে উঠল, মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা শাড়ি গয়না দেওয়া নয়, কে তোমাকে আশা দিতে বলেছে?

মায়ের পাল্টা জবাব, কেন দেব না? আমি মেয়ের ভালো-মন্দ বুঝি না?

এই থেকেই বিবাদ চড়চড় করে অন্তরায় একেবারে। বাবা অজস্র কথা বলতে লাগল। মায়ের প্রিয়পাত্রের প্রতি অর্থাৎ রমেশ চতুর্বেদীর প্রতি যশোমতীর এতটুকু টান নেই, কিন্তু তবু গোটা মেয়েজাতটার প্রসঙ্গে বাবার অপমানকর উক্তিগুলি যেন তপ্ত গলানো সিসের মতো যশোমতীর কানে ঢুকতে লাগল। যা বলে গেল তার সারমর্ম, ভালো-মন্দ বোঝা দূরের কথা, অন্যের ওপর নির্ভর না করে দুনিয়ায় এক পা চলার মুরোদ নেই মেয়েদের। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা হাতের ওপর এনে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে বলেই আজ মান-মর্যাদার কথা। টাকায় মুড়ে রাখা হয়েছে বলেই দুনিয়াটা কি তারা টের পায় না—শো-কেসের পুতুলের মতো নিরাপদ আভিজাত্যের কাচ-ঘরে সাজিয়ে না রাখলে নিজেদের ক্ষমতায় দু'দিন যাদের বেঁচে থাকার সামর্থ্য নেই দুনিয়ায়, তাদের আবার মতামত, তাদের আবার বিবেচনা। আরো বলেছে বাবা। বলেছে পায়ে হেঁটে একদিন রাস্তায় নেমে দেখে এসো কেমন লাগে,

কত ধানে কত চাল—তারপর মান-মর্যাদার কথা বোলো। আর বলেছে, এই বাড়ি-ঘর এই ঐশ্বর্যের বাইরে গিয়ে দশ পা মাটিতে ফেলে হেঁটে দেখে নাও মাটির দুনিয়াটা কেমন, তারপর ভালো-মন্দ বোঝার দম্ভ দেখিও। হুঁঃ, ভালো-মন্দ বোঝে, মান মর্যাদার বড়াই—কে ফিরে তাকায় তোমাদের দিকে আগে একবার বুঝে আসতে চেষ্টা করলে ওই লম্বা লম্বা বুলি আর মুখে আসত না।

মায়ের এক একটা ক্রুদ্ধ জবাবের ইন্ধন পেয়ে বাবা এ-রকম অজস্র কথা বলে গেল। কথা নয়, এক এক প্রস্থ গলানো আগুন ঝরলো যেন। প্রতিটি রোষোক্তিতে সমস্ত নারী জাতির মান-সম্ভ্রম একেবারে যেন আঁস্তাকুড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

মা তখনকার মতো কান্না জুড়ে দিতে বাবা ক্ষান্ত হল। কিন্তু যশোমতী কাঁদবে কি, তার দু'চোখ ধকধক করে জ্বলছে। সে এম-এ পড়ে, সে গানের স্কুল করেছে, সে মেয়েদের ক্লাব করেছে, সে যেখান দিয়ে হেঁটে যায় পুরুষের সঙ্গোপন অভিলাষ তার সঙ্গে ছোটে—এই নিয়েই পরম আনন্দে ছিল সে। কিন্তু বাবা এ-সব কি বলছে? বাবাও পুরুষ, পুরুষের চোখে আসলে তাহলে কতটুকু মর্যাদা তাদের? বাবার এই উক্তি যেন সমস্ত পুরুষেরই উক্তি। আজ যারা আশায় আশায় যশোমতীর দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে, তারাও একদিন ওই কথাই বলবে। না যদি বলে, টাকার লোভে টাকার খাতিরে বলবে না। কিন্তু মনে মনে বাবা যা বলল তাই বলবে। বাবা যা ভাবে তাই ভাববে। বাবার তাহলে এই ধারণা? এই বিশ্বাস? তার টাকা আছে বলেই এই অভিজাত সমাজে তাদের যেটুকু দাম যেটুকু খাতির, যেটুকু মর্যাদা! তারা শো-কেসের পুতুল, আভিজাত্যের কাচ-ঘরে লালন করে কোনো রকমে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়, নিজের পায়ের নির্ভরে দুনিয়ায় দুটো দিন তাদের বেঁচে থাকারও ক্ষমতা পর্যন্ত নেই! এত তুচ্ছ এত অক্ষম এত কৃপার পাত্রী তারা? বাবার এমন কথা!

সমস্ত রাত ধরে আগুন জ্বলল যশোমতীর মাথায়। কিছু একটা করতে হবে তাকে, জবাব দিতে হবে। সমস্ত মেয়েজাতের ওপর পুরুষের এত অবজ্ঞা এত অপমান সে বরদাস্ত করবে না। যশোমতী জবাব দেবে। দেবেই। সমস্ত রাত ধরে সঙ্কল্প দানা বেঁধে উঠতে লাগল।

পরদিন মা গম্ভীর, কিন্তু যশোমতীর মুখ পাথরের মতো কঠিন। জীবনে কিছু একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে তার। রাতের সঙ্কল্প দিনের আলোয় আরো বেশি আঁট হয়ে বসেছে মুখে।

যশোমতী প্রতীক্ষা করছে।

সকালে খুব ভালো করে চান করে উঠেছে। তারপর আবার প্রতীক্ষা করছে। এই বাড়ির কোনোদিকে সে তাকাতে পারছে না, কোনোদিকে চোখ ফেরাতে পারছে না—সর্বত্র শো-কেস দেখছে। আভিজাত্যের নিরাপদ শো-কেস। এই শো-কেস যোগায় বলে পুরুষের এত গর্ব এত দর্প আর তাদের প্রতি এত অবজ্ঞা।

যশোমতীর দম বন্ধ হবার উপক্রম।

দশটা না বাজতে বড় গাড়ি নিয়ে বাবা অফিসে বেরিয়ে গেল। যশোমতী আগেই ঠাণ্ডা মাথায় খেয়ে নিয়েছিল কিছু। কোনো ব্যাপারে ছেলেমানুষি করবে না। শো-কেস ভাঙতে চলেছে, ছেলেমানুষী করলে দ্বিগুণ হাসির ব্যাপার হবে। সে বাস্তবে নামতে যাচ্ছে, বাস্তব দেখতে যাচ্ছে, বাস্তব বুঝে চলতে হবে।

বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাকে বলল, এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে, ফিরতে দেরি হবে।

এটুকু মিথ্যার আশ্রয় না নিলেই নয়। যাই হোক, এই মিথ্যার পরমায়ুও বেশি হবে না নিশ্চয়। সত্য যা, তার আলমারির দেরাজে লেখা আছে। মাকে লেখেনি, তার জ্বালা আর যাতনা মা বুঝবে না। কতখানি অপমান বাবা করেছে মা জানে না। তাই আলমাবির দেরাজে খামের চিঠি বাবার উদ্দেশ্যে লেখা। লিখছে, শো-কেসের পুতুল হয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই, মাটির দুনিয়া দেখতে চললাম, এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সামর্থ্য যদি না-ই থাকে, তখন নিজেই তোমার শো-কেসে ফিরে আসব আবার, আর তোমার সব অপমান মাথায় তুলে নেব। তার আগে দয়া করে খোঁজ করো না।—যশোমতী।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ্কে এলো প্রথম। বাস্তব বুঝে চলতে হবে, তাই টাকা কিছু লাগবেই। দ্বিতীয় একখানা শাড়ি শুধু শৌখীন বড় ব্যাগটার মধ্যে পুরে নিয়েছে। ওই ব্যাগ ছাড়া সঙ্গে আর কিছু নেই।

প্রথমেই টাকা তুলতে হবে ব্যাঙ্ক থেকে। বলতে গেলে শূন্য হাতে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। ব্যাঙ্কে এলো। চেকে টাকার অঙ্ক বসানোর আগে ভাবল কত টাকা তুলবে। পঞ্চাশ হাজার, ষাট হাজার, সত্তর হাজার—যা খুশি তুলতে পারে। কত যে আছে সঠিক হিসেব রাখে না, আছে যে অনেক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার নামে থাকলেও কার টাকা তুলবে? বাবারই টাকা। যে-বাবার মতে তারা শো-কেসের পুতুল, নিজের পায়ের ওপর ভর করে যারা দাঁড়াতে শেখে নি। অতএব যত কম তোলা যায়, কারণ যা তুলবে তা ধার হিসেবেই তুলবে। সেই ধারও একদিন শোধ করবে। করবেই। ভেবেচিন্তে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা তুলল। এতকালের প্রকৃতি ডিঙিয়ে পাঁচ হাজার টাকার থেকে নগণ্য অঙ্কের টাকা আর ভাবা গেল না। টাকা চেক-বই কলম ব্যাগে পুরে আবার বেরিয়ে পড়ল।

কোথায় যাবে বা কি করবে এখনো ভাবা হয়নি। ভাবতে হবে। কিন্তু এখানে বসে নয়, বেশ দূরে কোথাও গিয়ে ভাবতে হবে। যেখানে গেলে কেউ তার হদিস পাবে না। তারপর ভেবেচিন্তে আরো অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। এই আভিজাত্যের শো-কেস থেকে অনেক দূরে।

পাঁচ

শঙ্কর সারাভাইয়ের মাথা আর চিন্তা আর দূরদৃষ্টির ওপর কারো যদি বিশেষ আস্থা থেকে থাকে —সেটা ছিল তার মেসো মহাদেব সারাভাইয়ের।

কিন্তু মগজের ওপর আস্থা যত ছিল, তার চাল-চলন কাজকর্মের প্রতি বিশ্বাস ততো ছিল না। নইলে এতবড় কটন্ চেম্বারের সে সুপারিনটেনডেন্ট, কত লোককে এখানে ঢোকাল, কতজনের সংস্থান করে দিল, কতজনকে ওপরে তুলল, ঠিক নেই। মানুষ করতে পারল না শুধু স্ত্রীর আদরের বোনপোটিকে। তার মতো বি. এসসি. পাস করে সাত বছর ধরে ছোকরা ভ্যারেণ্ডা ভাজছে। তার অফিসে চাকরি করার জন্য কতদিন সাধাসাধি করেছে, কিন্তু এখনো হতভাগা আকাশ-কুসুম কল্পনা নিয়ে আছে। চিন্তা করলে কাজের চিন্তা করতে পারে সেটা তার থেকে বেশি আর বোধহয় কেউ জানে না। কিন্তু সেদিকে না মাথা না মন।

বাপের যা ছিল কুড়িয়ে কাচিয়ে ব্যবসায় ঢেলেছে। সেও শহরে নয়, এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে মৌলায় গিয়ে। ব্যবসা বলতে ভাঙাচোরা মেশিন একটা, নিত্য অচল হয়, আর গোটাকতক তাঁত। বিধবা বড়বোনকে নিয়ে সেখানেই থাকে—হাঁড়িতে জল ফোটে, দোকানে চাল। তবু ব্যবসা করার গোঁ যায় না। ওদিকে মূলধনের অভাবে মাসের মধ্যে দশদিন ফ্যাক্টরি বন্ধ। চলুক না চলুক গাল-ভরা নাম না হলে মন ওঠে না—চাল নেই, চুলো নেই, তবু ফ্যাক্টরি। আজ যন্ত্র বিগড়ল, কাল সুতোয় টান পড়ল—এমনি একটা না একটা লেগেই আছে।

মেসো নিঃসন্তান। অতএব বোনপোর প্রতি স্ত্রীর স্নেহ ঠেকাবে কি করে। টাকার দরকার হয়ে পড়লে মাসি-অন্ত প্রাণ ছেলের। মাসিও টাকা চেনে না এমন নয়। কিন্তু একবার যদি হুকুম হয়ে গেল, দাও, তো দাওই। কম করে দু-তিন হাজার টাকা এ পর্যন্ত তাকেও শ্রীমানের ওই ব্যবসায় ঢালতে হয়েছে। সেই টাকা সব জলে গেছে। বার কয়েক ঘা খেয়ে তবে স্ত্রীর একটু টনক নড়েছে। ভদ্রলোকের রোজগার ভাল, খরচ কম। তাই হাতে আছেও কিছু। কিন্তু কৃপণতার ধাত। শঙ্করকে মনে মনে পছন্দ করে, কিন্তু তাকে দেখলে অস্বস্তি বোধ করে। ভয়, এই বুঝি খসাতে এলো কিছু।

কিন্তু তবু এই ছেলেটাকে পছন্দ করারও একটা কারণ আছে। ভদ্রলোকের টাকার ওপর লোভ খুব। আগে আগে এই লোভে শঙ্কর ভালই ইন্ধন যুগিয়ে এসেছে। যে বিশ্বাসের ফলে টাকার মুখ দেখা যায়, সেই বিশ্বাসটাকে সকলেই আঁকড়ে ধরতে চায়। ম্যাজিকের মতো হাতে-নাতে সেই ফল দেখিয়ে ভদ্রলোককে ঘায়েল করেছে সে। তাই তার ওপর ক্ষোভও যেমন তলায় তলায় আশাও তেমন।

ব্যবসায় দুর্বুদ্ধি মাথায় চাপার আগে কিছুকাল শেয়ার-বাজারে ঘোরাঘুরি করেছিল আর সেখানে থাকতে ছোকরার মাথাও ভালো খুলেছিল। সেখানকার কিছু মাথাওয়ালা লোকের সঙ্গে খাতিরও হয়ে

গিয়েছিল। তাদের পরামর্শের সঙ্গে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বেশ দু'পয়সা বাড়তি রোজগারের সহায়তা করেছিল মেসোর। দুশো টাকা হাতে নিয়ে পনেরো-বিশ দিনের মধ্যে চার পাঁচশো টাকা এনে দিয়েছে—এমন বার কতক হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্বাস বাড়তে বাড়তে মেসো এক-একবার হাজার দু-হাজার টাকাও তুলে দিয়েছে শঙ্করের হাতে। দেবার সময় তার হাত অবশ্যই কেঁপেছে আর সে টাকা ফিরে না আসা পর্যন্ত রাতে ভালো ঘুম হয় নি। তারপর আবার যে পরিমাণ টাকা ফিরেছে, তাতেও ঘুম হয়নি। শঙ্করকে এই নিয়েই থাকতে বলেছে সে, দিন-কাল সম্পর্কে অনেক গুরুগম্ভীর উপদেশ দিয়েছে। এমন কি উদার চিত্তে তার আর তার দিদির ভারও নিতে চেয়েছে। কিন্তু সুবুদ্ধি থাকলে তার এই দশা হবে কেন, তাহলে তো তার অফিসে চাকরিই করত একটা। মাথা দিয়ে কাজ করলে উন্নতিও যে সহজেই করতে পারত কোনো সন্দেহ নেই। তার ওপর আপনার জন যখন আগেই মাথার ওপর। চাকরিটা করলে মেসোর দুর্ভাবনা থাকত না, হাতের মুঠোতেই রাখা যেত ওকে। আর মন দিয়ে তখন বাড়তি রোজগারের চেষ্টায়ও লাগা যেত। লাভ তাতে দু'জনেরই হত। কিন্তু চাকরির নাম মেসো আর মুখেও আনবে না। কারণ খোদ মালিককে বলে সেবারে চাকরি একটা ঠিক করেই ফেলেছিল। যেদিন জয়েন করার কথা সেদিন থেকে দু'মাসের মধ্যে আর তার টিকির দেখা নেই। তারপর তার অনুপস্থিতিতে লুকিয়ে লুকিয়ে মাসির কাছে আসা হয়েছে।

তার আগে মাসির ছটফটানি, বাউণ্ডুলেটা কোথায় উবে গেল, মৌলায় চিঠি দিয়েও জবাব পায় না। শেষে একদিন চুপি চুপি এসে নালিশ, চাকরি নেয়নি বলে মেসো আর মুখ দেখবে না ধরে নিয়ে আসা বন্ধ করেছে।

আর যায় কোথায়, আপিস থেকে মেসো বাড়ি ফিরে দম ফেলতে না ফেলতে মাসি মারমূর্তি।—নিজে তো গোলাম হয়েইছে এখন সক্কলকে ধরে ধরে গোলামি না করাতে পারলে আর মুখ দেখবেন না। ব্যবসা করে ছেলেটা যা-হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, কোথায় উৎসাহ দেবে তা না, ছেলেটার বাড়ি আসা বন্ধ করেছে। এ-রকম লোকের নিজেরই মুখ দেখাতে লজ্জা করা উচিত,ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অথচ, আপিসে বোনপোর একটা ভাল চাকরি হোক দু'দিন আগেও স্ত্রীটির সেই আগ্রহ তার থেকে একটুও কম ছিল না।

শঙ্করের হাতে টাকা দিয়ে জীবনে প্রথম মার খেয়েছিল মহাদেব সারাভাই মাস ছয়েক আগে। ভালো একটা ফাটকার টিপ আছে শুনে মাত্র চারশো টাকা দিয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা ছেলে হারিয়ে বসল। টাকার খাম কি করে নাকি পকেট থেকে পড়ে গেল জানে না। চারশো টাকা কি করে হারায় মহাদেব সারাভাইয়ের ধারণা নেই। টাকার খাম পকেট থেকে পড়ে গেলে জানতে পারে না কি করে তাও ভাবতে পারে না। বিশ্বাস করবে কি করবে না সেটা পরের কথা। নির্লিপ্ত মুখ করে যে-ভাবে চারশো টাকা খোয়ানোর খবরটা দিল, চার লক্ষ টাকা থাকলেও সে-রকম পারা যায় কিনা জানে না। শুনে তার রাগ করতেও ভুল হয়ে গেছে, মাথায় হাত দিতেও। হাঁ করে খানিকক্ষণ পর্যন্ত ওই মুখখানাই দেখতে হয়েছিল।

—কি বললি, চারশো টাকা হারিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, সতের ধাঁধায় থাকি, কখন যে...

—পকেট থেকে পড়ে গেছে?

—হ্যাঁ, কিছু ভেব না, চারশোর বদলে চোদ্দশো পুরিয়ে দেব'খন শিগ্‌গীরই।

ব্যস, ওটুকুতেই সব আক্ষেপ সব খেদ শেষ ছোকরার।...চারশোর বদলে হাজার টাকা অর্থাৎ ছাঁকা ছ'শো টাকা ঘরে তোলার লোভে টাকাটা বার করেছিল ভদ্রলোক।

শঙ্কর তখনো শেয়ার-বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে শুনেই খুশি হয়ে হাতে যা ছিল চাওয়ামাত্র দিয়েছিল। যে হারে টাকা ফিরবে বলে তাকে নিশ্চিন্ত করা হয়েছিল, সে-তুলনায় চারশো টাকার চারগুণ বেশি দেওয়ার লোভই হয়েছিল। স্ত্রী সদয় থাকলে হয়তো তার থেকেও বেশি দিত। কারণ তখন আর অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই। অনেকবারই দিয়েছে আর অনেকবারই তার অনেক বেশি

ফিরেছে। কিন্তু স্ত্রীটি বাড়তি রোজগার হলে হাত বাড়িয়ে সেটা আদায় করে নিতে যেমন পটু, টাকা বার করে দেবার বেলায় তেমনি নির্মম। বিশেষ করে জুয়াখেলায় টাকা খাটানো হবে শুনলে। ফাটকা বাজারে টাকা খাটানো আর জুয়াখেলার মধ্যে একটুও তফাত দেখে না রমণীটি। তার ওপর বোনপো নিজের ব্যবসা নিয়ে সরে দাঁড়াতে এরই মধ্যে ভদ্রলোক নিজের বুদ্ধিতে ফাটকা-বাজী করে কিছু টাকা খুইয়েছে। সেই থেকে স্বামীর ওপর খড়্গহস্ত মহিলা। তারপর থেকে টাকার কন্ট্রোল গোটাগুটি তার হাতে। হাত-খরচের টাকাও সেই থেকে ভদ্রলোককে হাত পেতে স্ত্রীর হাত থেকে নিতে হয়।

এই দুরবস্থার সময় শঙ্কর এসে মেসোকে সরাসরি বলেছিল, দু'শো পাঁচশো যদি পারো চটপট বার করো, ভালো খবর আছে একটা—অন্যের লাভ যুগিয়েই গেলাম।

অনেক দিন বাদে ভদ্রলোকের নির্জীব রক্ত চনমনিয়ে উঠেছিল। কিন্তু হাত শূন্য। অতএব গেল বারের চারশো টাকা মেসো শঙ্করের হাতে দিয়েছিল অ্যাকাউন্টস বিভাগ থেকে ধার করে। আর সেই টাকা খোয়া গেছে। পকেট থেকে চারশো টাকা গলে গেল আর লাটসাহেব তা টেরও পেল না। স্ত্রীর অগোচরে সে টাকা যে কি ভাবে শোধ হয়েছে, তা শুধু সে-ই জানে। শোধ করার পর মনে মনে স্থির করেছিল, এই ছোকরার সঙ্গে আর কোনো দিন কোনো সম্পর্কই রাখা চলবে না, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে থাক।

মাস ছয় বাদে সেদিন দুপুরে সম্পর্কচ্যুত এই শঙ্কর আবার এসে হাজির তার কাছে। বাড়িতে নয়, একেবারে তার অফিস-ঘরে।

এসেই মেসোর পাশে চেয়ার টেনে বসল। হাব-ভাবে কোনো রকম সঙ্কোচের লেশমাত্র নেই, দুনিয়ায় যেন বিব্রত বোধ করার মতো কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনো ঘটেনি। তাকে দেখে মহাদেব সারাভাই ছ'মাস আগের চারশো টাকা লোকসানের জ্বালাটা নতুন করে অনুভব করল। কাজের ফাইলে চোখ রেখে বক্রদৃষ্টিতে তাকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি খবর?

ভণিতা বাদ দিয়ে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, মোটা কিছু টাকা রোজগার করার ইচ্ছে আছে?

সঙ্গে সঙ্গে রাগে মুখ লাল মেসোর। ফিরে জিজ্ঞাসা করল, গেল বারের মতো?

পকেট থেকে কিছু কাগজপত্র বার করে পরীক্ষা করতে করতে শঙ্কর জবাব দিল, পকেট থেকে সেবারে তোমার টাকার খামটা পড়েই গেল তার আর কি করা যাবে—তা সেটা ভুলতে ক'বছর লাগবে তোমার? নিজের কাছে থাকলে কিছু না জানিয়ে ওটা দিয়েই দিতাম।

দেখা গেল তার এই কাগজপত্রের সঙ্গেও একশো টাকার তিনখানা নোট বেরিয়ে এসেছে। মেসো কাজ ভুলে আর বিগত টাকার শোক ভুলে রেগে গিয়ে বলে উঠল, এই টাকাও তো যাবে দেখছি, বাজে কাগজের সঙ্গে না মিশিয়ে টাকাটা আলাদা রাখা যায় না? টাকার ওপর কোনো দরদ আছে তোর!

কাগজে লেখা কি হিজিবিজি হিসেব দেখতে দেখতে শঙ্কর জবাব দিল, যাবে না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এটা একজনের কাছে চালান হয়ে যাবে। এই তিনশো টাকায় কম করে ছশো টাকা ঘরে আসবে—একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর। রোদে ঘোরাঘুরি করে আর পা চলছিল না। তোমার এখানে একটু বিশ্রাম করে আবার বেরুব।

মেসো মুখ গোঁজ করে বলল, তা বেরোও, কিন্তু তোমার হাতে আর এক পয়সাও দিচ্ছি না আমি।

—দিও না। মুখে আগ্রহের চিহ্ন মাত্র নেই, হিসেবের ওপর চোখ—কিন্তু পরে যেন আবার বলো না আগে বললি না কেন। চা আনতে বলো।

বেল্ বাজিয়ে মেসো বেয়ারাটাকে চায়ের হুকুম করল। কিন্তু ভিতরটা উসখুস করছে কেমন। মুখ দেখে মনে হল না আর সাধবে বা কি ব্যাপার খোলসা করে বলবে। চারশো টাকা খুইয়েছে বলে, কিন্তু এ-যাবৎ দিয়েছে যা সেটা মনে পড়লে চেষ্টা করে রাগ করে থাকা যায় না। মেসো লক্ষ্য করছে ছোকরা মনোযোগ দিয়ে কি একটা অঙ্ক কষছে এখন। একশো টাকার নোট তিনখানা টেবিলের কাগজপত্রের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে তখনো। কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, ওই টাকা কার?

—আমার। যা ছিল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে এসেছি।

—তুই নিজে ফাটকায় খাটাবি?

মুখ তুলে তাকানো বা ভালো করে বুঝিয়ে জবাব দেবারও ফুরসত নেই যেন।—হ্যাঁ, কপাল ভালো থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে ওর ডবল ঘরে ফিরবে। তা না হলে পনেরো দিনের মধ্যে।

নিজের টাকা খাটাতে যাচ্ছে শুনে ভদ্রলোকের লোভ যত অস্বস্তিও ততো। জিজ্ঞাসা করল, ডবল না ফিরে উল্টে তোর এই সামান্য টাকা যদি সব যায়?

—যাবে না। গম্ভীর মুখে নিতান্ত আত্মীয় বলেই যেন আর একবার প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখার কথা বলাটা কর্তব্য বোধ করল। —যদি পারো হাজার দুই বার কর। যাবে মনে হলে নিজের যথাসর্বস্ব নিয়ে আমি মৌলা থেকে ছুটে আসি?

অকাট্য যুক্তি। ফলে দুর্বার প্রলোভন। কিন্তু দু'হাজার শুনে মেসোর চোখ কপালে। আবার দু'হাজার শুনেছে বলেই লোভটাও প্রবল। সে-রকম খবর কিছু না থাকলে দু'পাঁচ শো চাইত। বলল, দু'হাজার টাকা কোথায় পাব আমি। ব্যাঙ্কের পাস-বই তো তোর মাসির হাতে।

শঙ্কর নির্লিপ্ত।—থাক তাহলে।

কিন্তু থাক বললেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। নিশ্চিত লাভের উৎসটা কোথায় সে সম্বন্ধে মেসো খোঁজ-খবর করতে লাগল। ফলে মেসোর প্যাড টেনে নিয়ে শঙ্কর হাতে-কলমে তাকে বোঝাতে বসল। গাছের ফলের মতো কোথায় কোন রহস্যের ডালে টাকা ঝুলছে, কাগজ-কলম হাতে পেলে শঙ্কর সেটা যত পরিষ্কার করে বোঝাতে পারে মুখে ততো না। মেসোর তখন মনে হয় ওই কাগজ-কলম যেন ছেলেটার হাতে টাকার ফল পাবার একখানা আঁকশি।

কিন্তু বাধা পড়ল। এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে প্রায় চোখ রাঙিয়েই গেল মেসোকে। তার বক্তব্য দু'দিন ধরে ওমুক দরকারী ফাইল আটকে বসে থাকলে কাজ চলে? তিন দিন ধরে ফাইল খুঁজে খুঁজে হয়রান সকলে, শেষে জানা গেল ফাইল এখানে ঘুমুচ্ছে।

অনুযোগ শুনে মেসোর বিড়ম্বিত মুখ। আমতা-আমতা করে আগন্তুককে নিশ্চিন্ত করতে চেষ্টা করল—পরদিনের মধ্যেই ফাইল পাঠাচ্ছে সে। একসঙ্গে অনেক ফাইল জমে গেছল বলে পেরে ওঠেনি।

লোকটি চলে যেতে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, তোমার অফিসার নাকি?

মেসো তেমন খেয়াল না করে জবাব দিল, না, আমার আন্ডারে কাজ করে। তারপর বলো—

আন্ডারের লোকের দাপট দেখে মুচকি হেসে শঙ্কর আবার প্যাডের হিসেব বিশ্লেষণে মন দিল। লাভের রহস্যটা যখন প্রায় বেরিয়ে আসার মুখে ঠিক তক্ষুনি আবার ব্যাঘাত। ঘরের হাফ-দরজা ঠেলে আর একটি সুদর্শন মাঝবয়সী লোকের আবির্ভাব।

এসেই ভারিক্কি চালে বলল, আপনি কি অফিস লাটে তুলে দেবেন নাকি? একসঙ্গে চারজন ক্লার্ককে হুট করে ছুটি দিয়ে বসলেন, ডিপার্টমেন্ট চালাবে কে?

বিব্রত মুখে মেসো কৈফিয়ত দিল, কেন, ওরা তো কাজ মোটামুটি করে রেখে গেছে শুনলাম, তা ছাড়া খুব দরকার বলল যে—

ভদ্রলোকের মুখে এবং গলার স্বরেও রাজ্যের বিরক্তি। —দরকার তবে আর কি, গোটা অফিসটাই ক্লোজ্ করে দিন তাহলে। এক্ষুনি রিজার্ভের লোক পাঠিয়ে দিন, ছুটি যারা নেয় তারা কাজ সেরে রেখে ছুটি নেয় না।

লোকটা দরজা ঠেলে বেরিয়ে যেতে শঙ্কর আবার জিজ্ঞাসা করল, ইনি বুঝি তোমার অফিসার?

মেসো বিরক্ত।—অফিসার হতে যাবে কেন, আমার আন্ডারে ক্লিয়ারেন্স ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ—

শঙ্কর হেসে উঠল, বলল, সব থেকে নিচের কেরানী হওয়া উচিত ছিল তোমার। নিচের লোককে এই রকম আশকারা দাও তুমি! তোমার অধীনের লোকেরা ওপরওলার মতো এসে মেজাজ দেখিয়ে যায়, লজ্জাও করে না তোমার?

ক্ষুব্ধ মুখে মেসো বলল, এই রকমই ইম্‌পার্টিনেন্ট হয়েছে সব আজকাল। সেদিনের ছেলে সব, রাগ করলেও পরোয়া করতে চায় না, উল্টে তর্ক করতে আসে।

শঙ্কর অভিজ্ঞ ওপরওলার মতোই পরামর্শ দিল, দরজা ঠেলে হুট হুট করে এভাবে ঢুকতেই বা দাও কেন সকলকে, এই জন্য তো এত প্রশ্রয় পায়! বেয়ারাকে দিয়ে খবর পাঠালে তবে ঢুকতে দেবে। তা না, যে খুশি এসে চোখ রাঙিয়ে যাচ্ছে।

মর্যাদা বজায় রাখার জন্য মেসো তক্ষুনি তার কথায় সায় দিয়ে বলল, সব টিট করে দেব একদিন—আমি রাগলে সাঙ্ঘাতিক অবস্থা। তারপর এদিকের কি ব্যাপার তুই বল্ ভালো করে।

ব্যাপার প্রায় শেষ করেই এনেছিল শঙ্কর সারাভাই। শেষ লাভের অঙ্কটা যা ছক কেটে দেখাতে বাকি। চৌকোস মাস্টারের সহজ করে দুরূহ আঁকের ফল দেখানোর মতো শঙ্কর তাও দেখিয়ে দিল। এটুকু শেষ হতে মহাদেব সারাভাই এক ধরনের যাতনা বোধ করতে লাগল যেন। লাভের যাতনা। বলল, কিন্তু টাকা পাই কোথায়?

শঙ্কর চুপ। এ সমস্যার সমাধান তার হাতে নেই। মেসো আর কোনো পথ না পেয়ে শেষে তারই শরণাপন্ন যেন।—তুই-ই না হয় তোর মাসিকে যা-হোক কিছু বলে দেখ্ না চেক-বইটা বার করতে পারিস কিনা। তোকে তো ছেলের মতোই দেখে, মাথা থেকে একটা কারণ-টারণ যদি বার করতে পারিস, দিলে দিতেও পারে। আমি বললে কানেও তুলবে না।

চেক-বই কি করে বার করা যায় সেই চিন্তা শঙ্কর সারাভাই করেই এসেছে। তবু ধীরে-সুস্থেই উপায় বাতলালো সে। বলল, এমনিতে চেক-বই চাইতে গেলে মাসি আমাকেও ছেড়ে কথা কইবে নাকি—সতের রকমের জেরা করে শেষে ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া করবে।...এক কাজ করা যায়, আমার ফ্যাক্টরির খুব একটা অর্ডার পেয়েছি বলা যেতে পারে। মোটা টাকা লাভের আশা আছে জানিয়ে যদি তাকে বুঝিয়ে বলি দিন সাতেকের জন্য হাজার খানেক টাকা দরকার—পার্টির পেমেন্ট পেলেই টাকাটা দিয়ে দেব, আর লাভের অংশও দেব—তাহলে?

মেসোর চোখে-মুখে সমস্যা সমাধানের উদ্দীপনা। স্ত্রীর চোখে এত সহজে ধুলো দেবার রাস্তাও আছে কল্পনা করতে পারেনি। শুধু ধুলো দেওয়া নয়, একেবারে নিজেকে বাঁচিয়ে ধুলো দেওয়া। কিন্তু সমর্থনসূচক আনন্দটা ব্যক্ত করার মুখেই আবার বাধা। সামনের হাফ্-দরজার ওধারে দুটো পা দেখা গেল—দরজা ঠেলে কেউ প্রবেশোদ্যত। শঙ্করের আগের কথায় হোক বা টাকা পাওয়ার সম্ভাবনার গরমে হোক, মেসো দরজার দিকে চেয়ে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল।—হু ইজ্ দেয়ার? সময় নেই অসময় নেই যতসব—বেয়ারা!

গর্জনটা যে এমন জোরালো হয়ে উঠবে শঙ্কর ছেড়ে মহাদেব সারাভাই নিজেও ভাবেনি বোধকরি। আচমকা হুঙ্কারে ঘরের বাতাসসুদ্ধ ভারি হয়ে গেল বুঝি। কিন্তু হাফ-দরজা খুলেই গেল তবু। আর ঘরে এসে যে দাঁড়াল তাকে দেখামাত্র ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল মেসো। তারপরেই বিবর্ণ পাণ্ডুর সমস্ত মুখ। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দে বলতে চেষ্টা করল, সা সা-সা—সার!

ঘরে ঢুকেছে চেম্বারের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর পাঠক। কিন্তু শঙ্কর তাকে চেনে না। মেসোর আর্ত মুখভাব দেখে সে-ও বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে রইল শুধু।

চন্দ্রশেখর পাঠক সামনে এগিয়ে এলো। মন্থর গতি। হাত দুটো প্যান্টের পকেটে। চোখের কোণ দিয়ে একবার সামনের লোককে অর্থাৎ শঙ্করকে দেখে নিল। তারপর টেবিলের এধারে মেসোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃদু গম্ভীর স্বরে বলল, এত গরম কিসের, ভেরি বিজ্‌ই?

আবারও শুধু সা-সা ভিন্ন আর কোনো আওয়াজ বেরুলো না মেসোর গলা দিয়ে। যাবার পথে অফিস-সংক্রান্ত কিছু একটা কাজের কথা বলার জন্যই ঘরে ঢুকে পড়েছিল চন্দ্রশেখর পাঠক। বাইরের লোক দেখে তা আর বলা গেল না। প্যান্টের হাত দুটো কোমরে উঠল, আবার ফিরে দেখলেন একবার। তবে উপস্থিতিতে এ-ভাবে চেয়ারে বসে থাকার লোক বেশি দেখেনি।—হু ইজ্ হি?

শঙ্করকে চেয়ারে আরাম করে বসে থাকতে দেখে মেসোর দ্বিগুণ অস্বস্তি। বলল, আমার...মানে আমার ভাইফের....মানে আমার শালীর ছেলে সার।

বলা বাহুল্য, শালীর ছেলে দেখে বড়কর্তা আদৌ মুগ্ধ হল না। উল্টে তার চোখ পড়ল প্যাডের হিজিবিজি ছক্‌টার ওপর—শেয়ারের দাম ফেলে আঁক কষে শঙ্কর যা এতক্ষণ ধরে বুঝিয়েছে মেসোকে। তুখোড় বুদ্ধিমান মানুষ বড়সাহেব, তার কেরামতিতে শেয়ার-বাজার ওঠে নামে—এক পলক তাকিয়েই কিছু যেন বুঝে নিল। মহাদেব সারাভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু অথচ বক্র শ্লেষে জিজ্ঞাসা করল, ডিড্ আই ডিসটার্ব ইউ?

মহাদেবের মুখ পাংশু, তার পিছনের একটা হাত ক্রমাগত শঙ্করকে ইশারা করছে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু হাঁ করে শঙ্কর অভিব্যক্তিসম্পন্ন আগন্তুকটিকে দেখছে। আগন্তুক অফিসের হোমরা-চোমরা একজন বুঝেছ, কিন্তু কে-যে ঠিক ধরে উঠতে পারছে না। শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট ঘষে মহাদেব সভয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ একটুও ডিসটার্ব করা হয়নি। বড়োসাহেবের মেজাজ জানে, কাগজে কি হিসেব হচ্ছিল যদি আঁচ করে থাকে, অর্থাৎ কোনো তন্ময়তা ভঙ্গের ফলে সুপারনিটেনডেন্টের ক্ষণকাল আগের ওই গর্জন সেটা যদি টের পেয়ে থাকে, বড়োসাহেবের রোষাগ্নিতে সত্যি সত্যি কাউকে পড়তে হয়নি কিন্তু পড়লে কি হবে সেই-ত্রাসে শঙ্কিত সকলে।

বড়োসাহেব আর এক নজর দেখে নেবার আগেই টেবিলের টেলিফোন বেজে উঠল। এই টেলিফোন যে মুশকিল আসান, জানে না। তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে মহাদেব শুকনো গলায় সাড়া দিল। পরক্ষণে শশব্যস্তে বড়োসাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিল ফোন।

—আপনার সার...

হাত বাড়িয়ে রিসিভার নিয়ে এবারে বড়োসাহেব সাড়া দিল। পরক্ষণে দুই ভুরু কুঁচকে যেতে দেখা গেল তার। অপ্রত্যাশিত কিছু যেন শুনল। তারপরেই ব্যস্ত হয়ে ওধারের রমণীর উদ্দেশ্যে বলল, আচ্ছা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। রমণী...কারণ মহাদেব বামাকণ্ঠই শুনেছিল মনে হল। ঝপ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে দ্রুত ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল বড়োসাহেব। শঙ্কর সারাভাইয়ের মনে হল, ভদ্রলোক যেন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে চলে গেল।

কিন্তু মহাদেব সারাভাইয়ের কিছুই লক্ষ করার ফুরসত হয়নি। ভালো করে কাঁপুনিই থামছে না তার। ঘামে সমস্ত মুখ ছেড়ে জামা পর্যন্ত ভিজে গেছে। বড়োসাহেব ঘর ছেড়ে চলে যেতে আর তারপর তার ভারি পায়ের শব্দও নিঃসংশয়ে মিলিয়ে যেতে অবসন্নের মতো ধুপ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল। তার অবস্থা দেখে শঙ্কর কি করবে বা কি বলবে ভেবে না পেয়ে উঠে রেগুলেটার ঘুরিয়ে পাখার স্পিড বাড়িয়ে দিল।

এই মুহূর্তে তার ওপরেই তিক্ত বিরক্ত মহাদেব সারাভাই। এই ছোঁড়া না এলে তো আজ এ-রকম বিভ্রাটে পড়তে হত না তাকে। আর এ-ভাবে তাতিয়ে না দিলে অমন স্বভাব-বিরুদ্ধ গর্জনও করে উঠত না। তারপরেও নবাবপুত্তুরের মতো চেয়ারে বসে থেকে এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে কম নাজেহাল করেছে তাকে! মুখবিকৃত করে বলে উঠল, বড়োসাহেবকে দেখেও চেয়ারটা ছেড়ে একবার উঠে দাঁড়ালি না পর্যন্ত, বোকার মতো হাঁ করে বসেই রইলি!

মেসোর অবস্থা দেখে সন্দেহ আগেই হয়েছিল, তবু খোদ বড়ো সাহেবই যে মেসোর ঘরে এসে হাজির হয়েছে সেটা ধরে নেওয়া কঠিন। নিঃসংশয় হওয়া গেল। নাম-ডাকের মতোই রাশভারী চাল-চলন বটে। তবু নির্লিপ্ত মুখেই জবাব দিল, কে তোমার বড়োসাহেব আর কে তোমার নিচের, কি করে বুঝব বলো—সকলেরই তো সমান হম্বি-তম্বি তোমার ওপর। ...যাকগে, কি আর হয়েছে।

—কি হয়েছে! যথার্থ অসহায় বোধ করছে মহদেব সারাভাই, কাগজের এসব লেখা দেখে গেল না! আড়ে আড়ে ক'বার ও প্যাডটার দিকে তাকিয়েছে তুই লক্ষ করেছিস? কি মুশকিলেই যে ফেললি আমাকে—

কেউ দেখে গেল বলে নয়, মনে মনে অন্য কারণে শঙ্কা বোধ করছে শঙ্কর সারাভাই। তার আসার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে গেল কিনা বুঝছে না। আপাতত মেসোকেই আগে ঠাণ্ডা করা দরকার। বলল, দেখে গিয়ে থাকলে তোমাকে এরপর খাতিরই করবে দেখো, এ-সব ব্যাপারে তারও লক্ষ লক্ষ টাকা খাটছে।

বিস্ময় সত্ত্বেও একটু যেন জোর পেল মেসো। তারও লক্ষ লক্ষ টাকা খাটছে! এই সব ফাটকা-টাটকার ব্যাপারে? আঃ, এদিকে তাকা না! তোকে কে বলল?

এ লাইনে যারা ঘোরে সকলেই জানে, অম্লানবদনে মিথ্যার আশ্রয় নিল শঙ্কর, আজকের এই মওকার খবরও তার অজানা আছে ভাবো নাকি! আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে না কেন, তোমার সামনেই জিজ্ঞাসা করতাম এই ডিল্‌টার প্রসপেক্ট কি-রকম।

যাক, মেসো অন্ধকারে যেন আলো দেখল একটু, মহাজনগত পন্থা অনুসরণের ব্যাপারটা ধরা যদি পড়েও থাকে—ফলাফল অকরুণ না হবারই কথা। বলল, যা হবার হয়েছে, এখন চল, দেখি কি করা যায়।

শঙ্কর সারাভাইয়ের ভিতরটা চঞ্চল হয়ে আছে। মেসোকে হাত করা গেছে যখন, মাসির কাছ থেকে টাকা বার করতে খুব বেগ পেতে হবে না হয়তো। নিঃসন্তান মাসি তাকে ভালোইবাসে। তবু টাকা হাতে না আসা পর্যন্ত স্বস্তি বোধ করার কথা নয়। তা ছাড়া একটা নৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে বিলক্ষণ যুঝতে হয়েছে। যা বলা হবে সেটা সত্যি কথাই। কিন্তু মেসোর বেলায় গোটাগুটি মিথ্যের আশ্রয়ই নিতে হল তাকে। ...অশ্চর্য পরিস্থিতি, সত্যি যা মাসি তাই জানবে অথচ মেসো সেটা ছলনা ভাববে! ছলনা ভাববে বলেই সায় দেবে তার কথায়। সত্যি জানলে বাড়িতে ঢুকতে দিতে চাইত না।

কিন্তু এই অস্বস্তির ফাঁকে ফাঁকেও চেম্বারের বড়োসাহেব চন্দ্রশেখর পাঠকের মুখখানা চোখে ভাসছে তার। ভদ্রলোককে দেখার ইচ্ছে ছিল, আজ দেখা হয়ে গেল। ব্যবসায়ী জীবনে তার একাগ্র নিষ্ঠা আর সহিষ্ণুতার গল্প কত শুনেছে ঠিক নেই। শঙ্করের মতো সংগ্রামী জীবন যাদের, তাদের চোখে বিরাট সফল মানুষ চন্দ্রশেখর পাঠক। নিজের চেষ্টায় এত বড়ো হয়েছে, নিজের বুদ্ধির বলে আজ দেশের একটা প্রধান শিল্পের উপর তার অপ্রতিহত প্রতাপ।

ভদ্রলোকের কীর্তির সব থেকে বড়ো নজির সম্ভবত বর্তমানের এই কট্‌ন্ চেম্বার। ভিন্ন নামে মিল-মালিকদের এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আরও আছে। কট্‌ন্ চেম্বারের পাশে সে-সব নিষ্প্রভ এখন। চন্দ্রশেখর পাঠক নিজে এই চেম্বারের স্রষ্টা, ফলে নিজেই সর্বেসবা। এখন সব থেকে বড়ো বড়ো মিলগুলো এই চেম্বারের আওতার মধ্যে এসে গেছে। নতুন মিল মালিকেরা স্বপ্ন দেখে কবে ওই চেম্বারের সভ্য হবে। তাই চন্দ্রশেখর পাঠকের শুধু নিজের ব্যবসার নয়, সমস্ত দেশের বস্ত্রশিল্পের ব্যবসায় নীতি এই চেম্বারের দখলে।

প্রতিষ্ঠানটিকে জনপ্রিয় করে তোলার ফন্দি-ফিকিরও ভদ্রলোক কম জানে না। এখানকার সমস্ত ব্যবসায়-মহলে সাড়া জাগিয়ে মহা সমারোহে চেম্বারের বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সেই অনুষ্ঠানের প্রধান লক্ষ যেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উৎসাহ উদ্দীপনা আর প্রেরণা যোগানো। কিন্তু আসলে এটাই বোধহয় চেম্বারের সব থেকে বড়ো প্রচারানুষ্ঠান। সেই প্রচারই বড়ো প্রচার যে দেশের সর্বসাধারণের চোখ টানে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের তৈরি সেরা কাপড়ের স্যাম্প্‌ল্ নিয়ে মস্ত এক-জিবিশন হয় প্রতিবার। সেই সব স্যাম্প্‌ল্ নিয়ে এক্সপার্টরা বিচারে বসে।—কার কাপড় সব থেকে ভালো। কাপড় বলতে সবই অবশ্য শাড়ি। পাড় নক্সা ফিনিশিং ইত্যাদির বিচারে যে শাড়ি প্রথম হবে, সেই শাড়ির নির্মাতার ভাগ্যে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার। এইভাবে জাঁকজমক করে আর মর্যাদা দিয়ে ছোটো ব্যবসায়ীকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার প্রেরণা যুগিয়ে থাকে চেম্বার।

শঙ্কর সারাভাইয়ের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, তার খেলনার মতো কাপড়ের ব্যবসাও একদিন মস্ত বড়ো হবে, এই সব মিল-মালিকদের মতো নিজস্ব মিল হবে তারও। শঙ্কর সারাভাইয়ের এখন অনেক নাম মুখস্থ, যারা তার মতোই নগণ্য ছিল একদিন—যারা ছোটো থেকে বড়ো হয়েছে। ওই চন্দ্রশেখর

পাঠকের জীবনেই কি কম ঝড়-ঝাপটা গেছে। অতএব একটা আশার আলো সামনে রেখেই এগোতে চেষ্টা করছে শঙ্কর। কিন্তু তার আশার আলোটা জোনাকির আলো। ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে। এই আশা নিজের কাছেই শূন্যে প্রাসাদ গড়ে তোলার মতো অবাস্তব মনে হয় এক-একসময়। তবু এই আশা নিয়েই বেঁচে আছে। এটুকু আশা গেলে পায়ের নিচের মাটিও সরে যাবে জানে বলেই চোখ-কান বুজে একেই আঁকড়ে আছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কট্‌ন্ চেম্বারের এক লক্ষ টাকার প্রাইজের সিকেটা কোনদিন তার ভাগ্যে ছিঁড়বে এমন আশা সে কখনো করে না। তার প্রথম কারণ, মৌলা থেকে ট্রেন ভাড়া গুণে এখানে এসে একজিবিশনের কাপড় সে প্রতিবারই পরখ করে দেখে থাকে। কোনো একটা কাপড়ও দৃষ্টি এড়ায় না, সব খুঁটিয়ে দেখে। এই সব কাপড় যারা পাঠায় তারা অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হলেও তার তুলনায় অনেক বড়ো। তাদের সরঞ্জাম আছে, যন্ত্রপাতি আছে। সেকেন্ডহ্যান্ড কি থার্ডহ্যান্ড কেনা শঙ্করের একটা মাত্র ছোট ভাঙা কল্ মাসে কম করে দশদিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। আর এটা-ওটা বদলে নিজের হাতে মেরামত করে যে কাপড় তৈরি হয় সেটার সাহায্যে, তার মান কোন্ স্তরের সেটা নিজেই সে খুব ভালো জানে। যে শস্তার কাপড় বা শাড়ি সে নিজের হাতে তৈরি করে, তার খদ্দের তারই মতো অবস্থার লোক। বিশ-ত্রিশখানা করে এই কাপড় তৈরি করার উপকরণও সব মাসে হাতে থাকে না। কাপড় ছেড়ে তখন শুধু গামছা তৈরি করতে হয়। আর মেশিন বিগড়ালে তো তাও হয়ে গেল। অতএব, একজিবিশনে স্যাম্প্‌ল্ পাঠানোর চিন্তাটাই তার কাছে হাস্যকর।

কিন্তু পাঠাবার মতো হলেও শঙ্কর সারাভাই তা পাঠাত না নিশ্চয়। কারণ তার ধারণা, চেম্বারের বিচারকের মান যাচাইয়ের পর্বটা প্রহসন মাত্র। এ যাবত অনেকবার সে একজিবিশনে গিয়ে স্বচক্ষে সব স্যাম্প্‌ল্ পরখ করে এসেছে। তার বিবেচনায় যে কাপড়ের পুরস্কার পাওয়া উচিত, তা একবারও পায়নি। অতএব তার বিশ্বাস ধরপাকড় তদ্‌বির-তদারক আর সুপারিশের জোর যার বেশি—পুরস্কার শুধু সে-ই পেয়ে থাকে। আর, চেম্বারের দিক থেকে ওই ঘটা করে পুরস্কার দেওয়ার একমাত্র লক্ষ শুধু যে আত্মপ্রচার, একজিবিশন এলাকার মধ্যে দাঁড়িয়েই সে অনেক সময় নির্দ্বিধায় সেই মতামত ব্যক্ত করেছে। সমস্ত কাগজে বড়ো বড়ো হরপে প্রতিষ্ঠানের উৎসবের বিজ্ঞপ্তি বেরোয়, অনুষ্ঠানের বিবরণ ছাপা হয় ক'দিন ধরে, পুরস্কার-সভার বড়ো বড়ো ছবি বেরোয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের প্রতি চেম্বারের দরদের কথা ফলাও করে লেখা হয়। এই প্রচার-গত সুনামের মূল্য এক লক্ষ টাকার পুরস্কার মূল্যের অনেক গুণ বেশি।

এই কারণেই শঙ্করের নিস্পৃহতা। কিন্তু তা হলেও প্রতিষ্ঠানের নিয়ামকটির অর্থাৎ চন্দ্রশেখর পাঠকের শক্তির বুদ্ধির আর বিচক্ষণতার প্রশংসা না করে পারে না সে। মানুষটি ব্যবসার ধারা আমূল বদলে দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সামান্য অবস্থা থেকে শিল্পপতিদের মধ্যে ভদ্রলোক আজ সর্বাগ্রগণ্য যে তাতেও ভুল নেই। আজ তাকেই দেখল।

অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল শঙ্কর। সমস্ত পথ মেসো কি বলল আর কি উপদেশ দিল কানেও ঢোকেনি ভালো করে। মনটা মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল। দুই একবার মনে হয়েছে, থাক্ কাজ নেই মাসির বাড়ি গিয়ে, মেসোকে যা-হোক দুই এক কথা বলে এখান থেকেই চলে গেলে হয়। কিন্তু অদৃশ্য একটা টানে এসেই গেল শেষ পর্যন্ত। মৌলার বাড়ি থেকে বেরুবার আগে পর্যন্ত অনেক ভেবেছে, সমস্ত পথ ট্রেনে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে এসেছে। এখন ফেরাও শক্ত। না, ফিরতে সে চায় না। ফ্যাক্টরির কথা মনে হলেই অটুট সঙ্কল্পে চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে যায় তার, এক-একটা সঙ্কটে সমস্ত নীতিবোধ আর বিবেকের যাতনা দু'হাতে ঠেলে সরিয়েই সে যেন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। ব্যবসাটা তার চোখে যেন বিকলাঙ্গ অপুষ্ট শিশু একটা। সরঞ্জাম যোগাতে পারলে আর পুষ্টির ব্যবস্থা করলে সেটা শক্ত সমর্থ পরিণত রূপ ফিরে পেতে পারে।

শঙ্কর সারাভাই কোনো ব্যবস্থাই করতে পারছে না। চোখের সামনে ওই শিশুর তিলে তিলে ক্ষয় দেখছে সে। এই পরিতাপের শেষ নেই। তাই আজ সে বিবেক নামে বস্তুটার একেবারে বিপরীত দিকে মুখ করে মৌলা থেকে রওনা হয়ে পড়েছে।

তাকে দেখামাত্র মাসি অনুযোগ করল একপ্রস্থ। দু'মাসের মধ্যে দেখা নেই এমন আপনার জন এলেই বা কি না এলেই বা কি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষে বোনপোর প্রস্তাব শুনে মাসির দু' চোখ কপালে। এক হাজার টাকা চাই! এ আবার কি সাঙ্ঘাতিক কথা! এক হাজার টাকা কি দুই একশ টাকা নাকি সে চাইলেই বার করে দিতে পারবে!

মাসি মহিলাটি বাইরে রুক্ষ ভিতরে নরম। একটা ব্যাপারে তার খটকা লাগতে পারত, কিন্তু লাগল না। বোনপো সাধারণত টাকা গয়না চাইতে হলে মেসোর আড়ালে চায়। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে দু'জনে একসঙ্গে এসেছে আর হাজার টাকা চাওয়া সত্ত্বেও ঘরের লোকটার মুখ বিকৃত হল না। টাকার অঙ্কটা বড়ো বলে মাসির নিজেরও একটু ধাক্কা লেগে থাকবে হয়তো, তাই মেসোর মুখ ভার বা মনোভাবের প্রতি তক্ষুনি সচেতন হতে পারেনি। শঙ্কর বলল, টাকা না দিলে এবারে মরেই যাব মাসি—মস্ত একটা বায়না নিয়েছি, কাজ শেষ হলেই এই প্রথম মোটা কিছু ঘরে আসবে—ব্যবসা দাঁড় করানোর ধকলও কিছুটা সামলে যেতে পারব হয়তো। মাত্র সাত দিনের মতো চাই, লাভের চার আনা অংশও না হয় আসলের সঙ্গে ফেরত দিয়ে যাব—কিন্তু টাকাটা না দিলেই নয়।

মাসি তক্ষুনি রেগে গিয়ে জবাব দিল, তোর লাভের টাকা তুইই ধুয়ে জল খাস, আমাকে আর লোভ দেখাতে হবে না। কিন্তু আমি টাকা পাব কোথায়, বড়ো জোর পঞ্চাশ ষাট টাকা দিতে পারি।

মাসির মনে মনে ধারণা এই করে বড়ো জোর একশ টাকার মধ্যে রফা করে ফেলবে। কিন্তু ধারণাটা গণ্ডগোলের দিকে টেনে নিয়ে গেল ঘরের লোকটাই।

ঈষৎ সহানুভূতির সুরে মহাদেব বলল, মুশকিল হয়েছে এটাকে এক রকমের বিপদও বলা যেতে পারে আবার সুদিনের আশাও বলা যেতে পারে। অর্ডার ক্যানসেল করতে হলে বিপদ, সাপ্লাই করতে পারলে আশা!...দিন রাত ফ্যাক্টরিটাকে নিয়ে এত খাটছে এত পরিশ্রম করছে, হাজার খানেক টাকায় দিন যদি ফেরে...দিলে হত।

এবারে অবশ্য একটু অবাক হবারই পালা মাসির। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা উল্টো ধারণাও জন্মালো আবার। হাজার টাকারই দরকার তাহলে, আর সেটা এমনই দরকার যে ঘরের লোক পর্যন্ত সদয়। বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে মহিলা বলে উঠল, কিন্তু অত টাকা আমি পাব কোথায়, ঘরে থাকে নাকি?

মাথা চুলকে মেসো জবাব দিল, তাই তো ঘরে আর এত টাকা কোথায়।

চকিত ইশারাটা শঙ্করের বুঝে নিতে একটুও বেগ পেতে হল না। বলল, ঠিক আছে, মেসো চেক্ দিন একটা, কাল প্রথম দিকেই ভাঙিয়ে নিয়ে কাজ সারব।

মাসি কিছু বলার আগে মেসো মন্তব্য করল, তাতে যদি হয় তোর সে ব্যবস্থা অবশ্য করা যেতে পারে নইলে ঘরে কার আর অত টাকা মজুত থাকে...।

মেসোর এত উদারতায় পাছে মাসির সন্দেহ হয় সেই ভয়ে শঙ্কর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ঠিক আছে। এবার আমাকে শিগগীর কিছু খেতে দাও মাসি, সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কিছু খাওয়াই হয় নি।

ছয়

এক হাজার টাকা মাসি ঘরের বাক্স থেকেই বার করতে পেরেছিল। বলেছে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে হয়ে গেল দেখছি, আবার ব্যাঙ্কে যাবি, চেক্ ভাঙাবি—তোর সুবিধেই হল।

সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে মেসো বার পাঁচেক তাকে সাবধান করেছে আবার যেন টাকাটা খোয়া না যায়। কোথায় কোন্ পকেটে রাখল, অন্য কাগজ-পত্রের সঙ্গে মিশে গেল কিনা দেখে নিয়ে আর এগিয়ে দিতে এসে শেষ বারের মতো আরো বার দুই সতর্ক করে তবে ভদ্রলোক ছেড়েছে তাকে।

আবারও মনটা খিঁচড়ে গেছে শঙ্কর সারাভাইয়ের। টাকাটা মেসোর পকেটে গুঁজে দিয়ে পালাতে ইচ্ছে করছে। না পেরে নিজের ওপরেই দ্বিগুণ আক্রোশে জ্বলছে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়েছে তার।

ফ্যাক্টরি বাঁচানো নিজে বাঁচার সামিল। ওটার সঙ্গে তার সত্তার যোগ। সে শেষ দেখবে। শেষ দেখার আগে এই যোগ ছিঁড়তে দেবে না।

কি-কি চাই তার লম্বা লিস্ট একটা করাই ছিল। নগদ টাকা ফেললে মাল তুলতে কতক্ষণ আর। মস্ত একটা সুতোর মোট আর অন্যান্য বহু টুকিটাকি উপকরণের তেমনি বড়োসড়ো একটা বোঁচকা নিয়ে প্রায় গলদঘর্ম হয়ে স্টেশনের বাসে উঠল শঙ্কর সারাভাই।

ওঠার মুখেই ছোটখাট অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে গেল একটা। সেদিনের অর্থাৎ কুড়ি বছর আগের পাবলিক বাসের অবস্থা আজকের মতো ছিল না। লোক গুণে তোলা হত না। ঠাসাঠাসি ভিড় হত, যার শরীরের তাগত বেশি সে-ই উঠে পড়ত। আর স্টেশনের বাসে ভিড় তো লেগেই আছে।

পর পর দুখানা বাস ছাড়তে হয়েছে। সঙ্গের মোট দেখে ড্রাইভার বাধা দিয়েছে। তা'ছাড়া ভিড়ও খুবই বেশি ছিল। মেজাজ এমনিতেই বিগড়ে ছিল শঙ্কর সারাভাইয়ের। মাসির হাত থেকে টাকা নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা সেই যে তেতে আছে এখনো ঠাণ্ডা হয়নি। ফাঁক পেলেই ভিতর থেকে কে যেন চোখ রাঙাচ্ছে এ-রকম মিথ্যা আর ভাঁওতাবাজির ওপর ক'দিন চলবে? পরক্ষণে নিজের ওপরে দ্বিগুণ বিরক্ত, মাসির কাছে তো একেবারে মিথ্যে বলতে হয়নি, আধা-সত্যি যা তাই জেনেছে মাসি। টাকা ব্যবসার জন্যেই নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে টাকা ফেরত দেওয়া যে সম্ভব হবে না সেটা শঙ্করের থেকে বেশি আর কে জানে? তা'ছাড়া শিগগীর আর এই শহরে আসা হবে না। এলেও মেসোর কাছ থেকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। মাসিকে অবশ্য মেসো কখনোই বলতে পারবে না কোন্ মতলবে সে-ও দরাজ মুখে টাকা বার করে দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। ফলে বাড়িতে অন্তত মেসো প্রকাশ্যে রাগারাগিও করতে পারবে না। কিন্তু মনে মনে তাকে ভস্ম করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। টাকা হাতে এলে বা দিন ফিরলে মেসোর টাকা সে কড়ায়-ক্রান্তিতে শোধ করে দেবে কেবল একটু সময় চাই। আবার এ-ও মনে হল, তেমন দিন কোনোদিন আসবে এমন ভরসা শঙ্কর সারভাই করে কি করে?

এর ওপর দু'দুটো বাস ছাড়তে হওয়ায় মেজাজ আরো গনগনে হয়ে আছে। ওপরওলার কিছু চক্রান্ত ছিল বলেই শঙ্কর সারাভাই তৃতীয় বাসখানায় উঠতে পারল।

বাস-কন্ডাক্টর বাধা দেবার অবকাশ পেল না। পেল না বলেই তার রাগ। ভিড়ের মধ্যে মাল নিয়ে ওঠার জন্য গজগজ করতে লাগল। তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে শঙ্কর সারাভাই যতটা সম্ভব ভিতরে সেঁধিয়ে যেতে চেষ্টা করল। তাতে লোকের অসুবিধে হল বটে কিন্তু নিজে সুফল পেল। ঠিক সামনের সিটটির থেকেই একজন উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে একে-ওকে ঠেলে শঙ্কর সারাভই সে জায়গাটি দখল করল।

ঘেমে নেয়ে গেছে। ঘাম মুছে ঠাণ্ডা হতে না হতে কন্ডাক্টর টিকিটের জন্য হাত বাড়াল। তারপরেই তুমুল বচসা।

কন্ডাক্টর মালের জন্য দু'খানা বাড়তি টিকিট নেবে, শঙ্কর সারাভাই একটার বেশি বাড়তি টিকিট করবে না।

কন্ডাক্টর না-ছোড়, মালের জন্য দুটো টিকিট কাটতে হবে। শঙ্কর সারাভাই তিরিক্ষি মেজাজে প্রতিবাদ করল, কেন, দুটো টিকিট কাটব কেন?

তা'হলে নেমে যান।

কি? আবদার নাকি? একটা মাল তো বেঞ্চির তলায় ঢুকিয়েছি—একটা টিকিট দিচ্ছি এই বেশি।

ঝগড়া বেধে গেল। কন্ডাক্টরও ছাড়বে না, সে-ও দেবে না। যাত্রীরা অনেকে বিরক্ত, অনেকে দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। বচসাটা একজনের মুখ থেকে আর একজন লুফে লুফে নিতে আরম্ভ করল। এদিকে পাশের লেডিস সিটে বসে কোনো সুদর্শনা রমণী যে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে দুনিয়ার তাজ্জব কাণ্ড দেখছে কিছু—শঙ্কর অন্তত তা আদৌ লক্ষ করেনি। দশ পয়সার একটা টিকিটের জন্য যে জগতে এ-রকম কাণ্ড হয় হওয়া সম্ভব, মেয়েটির ধারণা নেই।

ওপরওলার চক্রান্ত জটিল বলেই বাসের এই মেয়ে যশোমতী পাঠক। জীবনে এই প্রথম সে বাসে উঠেছে। ওঠার পর থেকে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম। ঠাসাঠাসি ভিড়। ওপরের রড থেকে হাত ফসকালে একসঙ্গে পাঁচ সাতটা লোক তার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া বিচিত্র নয়। উঠেই ভেবেছিল নেমে গিয়ে ট্যাক্সি করলে হয়। এ-ভাবে মানুষ যায় সেটা আগে সে চোখে হয়তো দেখেছে কষ্টটা অনুভব করেনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন চোখ রাঙালো তাকে। সে মাটির ওপর দিয়ে চলবে বলেই বেরিয়েছে। মাটির ওপর দিয়ে হাঁটবে বলেই বাবার আভিজাত্যের শো-কেস থেকে বেরিয়ে এসেছে। না, আরামের প্রশ্রয় দেবে না, এত লোক যাচ্ছে কি করে!

কিন্তু দশ পয়সার বাড়তি টিকিটের এই নাটকটা ভয়ানক বিস্ময়কর মনে হল তার। স্থান-কাল ভুলে সামনে উপবিষ্ট লোকটাকেই হাঁ করে দেখছে সে। দশটা পয়সার জন্য একজন এ-রকম করছে বলে সঙ্কোচ যেন তারই। দেখল লোকটারই জিত হল, বাড়তি দশটা পয়সা শেষ পর্যন্ত দিলই না। কন্ডাক্টর হাল ছাড়ল বটে, কিন্তু তার মুখ রাগে কালো।

কন্ডাক্টরকে ছেড়ে যশোমতী সামনের বিজেতা মূর্তিটি নিরীক্ষণ করতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর প্রচণ্ড ধাক্কা। আচমকা একটা সঙ্কট বুঝি গ্রাস করতে আসছে তাকে। লোকটার মুখের সামনে খবরের কাগজ—বাস চলার বাতাসে কাগজের একটা কোণ উড়তে ভিতরের পাতাটা দেখা যাচ্ছে। বার বার দেখা যাচ্ছে। সেই পাতায় কি দেখল যশোমতী পাঠক?...একবার...দু-বার...তিন বার দেখা গেল ভিতরের ছবিটা। নিজের ছবি নিজের কাছে এমন বিপদের কারণ হতে পারে সে-কি কল্পনা করাও সম্ভব? কাগজের তলার কোণটা বাতাসে ওপরের দিকে উঠলেই ছবিটা দেখা যাচ্ছে—তারই ফোটো।

যশোমতী কি যে করবে ভেবে পেল না। মুখ লাল, কান গরম, দম বন্ধ করে ছটফট করতে লাগল সে। ধরা বুঝি পড়েই গেল। এই মুহূর্তে দুনিয়ায় ওই কাগজটা ভিন্ন আর বুঝি কোনো সমস্যা নেই তার সামনে। ইচ্ছে করল লোকটার হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

টিকিট?

যশোমতী চমকে উঠে আত্মস্থ হল। তারই টিকিট চাইছে কন্ডাক্টর। এতক্ষণ ভিড় ঠেলে আসতে পারেনি বলে টিকিট হয়নি। তাড়াতাড়ি পাশের বড়ো শৌখিন ব্যাগটার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালো যশোমতী। কিন্তু হাতে কিছু না ঠেকতে সবিস্ময়ে পাশের দিকে মুখ ফেরালো।

ব্যাগ নেই।

যশোমতী প্রথমে বিমূঢ়, তারপর রাজ্যের বিস্ময়। সে ঠিক দেখছে কিনা বা ম্যাজিক দেখছে কিনা, বুঝছে না। পাশে ব্যাগ রেখে সে নিশ্চিন্ত মনে এই অভিনব গণ-যাত্রার কষ্ট আর রোমাঞ্চ অনুভব করছিল। তারপর সামনের লোকটার এই দশ পয়সার ঝগড়া দেখতে দেখতে কিছুই আর খেয়াল ছিল না। আর তারপর ওই ছবির ধাক্কা। পাতা ওল্টালে যে ছবি চোখে পড়বেই, আর তারপর...ধরণী দ্বিধা হও...

টিকিট? বিরক্ত কন্ডাক্টর দ্বিতীয়বার তাড়া দিল।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙেছে যশোমতীর। এ-দিক ও-দিক আর বেঞ্চির নিচেটা দেখল একবার। নেই। নেই কেন তখনো মাথায় আসছে না। তখনো বুঝতে পারছে না পাশ থেকে ব্যাগটা কোথায় উড়ে যেতে পারে। যশোমতী জেগে আছে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেবল বিপদের স্বপ্ন দেখছে!

সুদর্শনা রমণীর মুখের এই বিমূঢ় সঙ্কট-কারু অনেকেই লক্ষ করল। চোখ পড়লে চোখ ফেরানো শক্ত। যেন চাপ রক্ত এসে জমছে মুখে। কিছু একটা হয়েছে সেটা অন্তত বোঝা গেল। একজন যাত্রী জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

আমার ব্যাগটা...!

কোথায় ছিল? কোথায় ছিল? কি ব্যাগ? কেমন ব্যাগ? অনেকে মুখর, অনেক উৎসুক।

যশোমতী পাশের চার আঙুল শূন্য জায়গাটার দিকে অসহায় চোখে তাকালো শুধু।

কতবড়ো ব্যাগ? এই ভিড়ে ব্যাগ কেউ পাশে রাখে। এক মুখেই কৌতূহল আর উপদেশ।

আর একজন মন্তব্য করল, নিয়ে সরে পড়েছে কেউ, উপকার করেছে—

অন্য একজনের মন্তব্যে প্রচ্ছন্ন সংশয়, ব্যাগ সত্যি সত্যি ছিল তো, না উনি আনতে ভুলে গেছেন?...হাতের ওপর থেকে ব্যাগ টেনে নিলে টের না পাবার কথা নয়। এক কথায়, ব্যাগ হারানোটা অজুহাত কিনা এও বিবেচনার বিষয়।

যশোমতী জবাব দেবে কি, সে অকূলে পড়েছে। সমস্ত মুখ ঘেমে লাল। অসহায় দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাকাতেই চোখাচোখি হল যার সঙ্গে, সে শঙ্কর সারাভাই। মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে সে ঘটনাটা বুঝতে চেষ্টা করছে।

এই মুহূর্তে ভিতরের পাতার ছবি চোখে পড়ার সঙ্কট থেকে যশোমতী বাঁচল বটে, কিন্তু তপ্ত কড়া থেকে জ্বলন্ত আগুনে পড়ার মতো অবস্থা তার।

কন্ডাক্টরের মেজাজ এখনো প্রসন্ন হয়নি, তাছাড়া পথে-ঘাটে এ-রকম অনেক আধুনিকার চাল-চলন তার জানা আছে। পয়সা ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে অতি আধুনিকারা ছেলেদের থেকে কোনো অংশে কম যায় না বলেই তার ধারণা।

সুন্দর মুখ দেখে সে ভুলল না, গম্ভীর মুখে বলল, তাহলে নেক্সট্ স্টপে নেমে যান।

অমনি শঙ্কর সারাভাইয়ের পুরুষকার চাড়িয়ে উঠল। কন্ডাক্টরের অকরুণ উক্তি বরদাস্ত করা সম্ভব হল না। প্রতিবাদ করল, ব্যাগ চুরি গেছে মহিলার, এ-ভাবে বলার অর্থ কি?

কন্ডাক্টর তার দিকে ফিরল, গম্ভীর মুখে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, ব্যাগ চুরি গেছে আপনি দেখেছেন?

—আমি দেখব মানে! দেখলে চুরি যাবে কেন?

—তাহলে চুপ করে থাকুন।

—কেন চুপ করে থাকব, শঙ্কর সারাভাই গর্জন করে উঠল, একজন মহিলার ব্যাগ চুরি গেছে শুনেও তুমি এ-ভাবে কথা বলবে কেন? ভদ্রতাজ্ঞান নেই?

ব্যস, দ্বিতীয় প্রস্থ শুরু হল। যশোমতী পাঠক নির্বাক দর্শক। ভিড়ের ওধার থেকে একজন টিপ্পনী কাটল, একটু আগে তো নিজের স্বার্থে দিব্বি এক-প্রস্থ লড়েছেন। এখন কন্ডাক্টর তার ডিউটি করছে তার মধ্যেও আপনার অত শিভালরি দেখাবার কি হল মশাই?

মুখ আড়াল করে ওধার থেকে আর একজন প্রায় অভব্য টীকা ছুঁড়ল, আ-হা, আপনারই বা কি কাণ্ডজ্ঞান মশাই, শিভালরি দেখাবার মতো সিচুয়েশন যে!

রাগে শঙ্কর সারাভাই ভিড়ের মধ্য থেকে বক্তা দুটিকে তক্ষুনি আহ্বান জানালো, কারা বলছেন এদিকে এগিয়ে আসুন মশাই সাহস করে, আড়াল থেকে কেন—

বাসের কোন কোন ভদ্রলোক রমণীর প্রতি অনুকম্পা বশত ছি-ছিও করে উঠল। যশোমতীর সমস্ত মুখ টকটকে লাল। খানিক আগের বচসার পর এই লোকটাই অর্থাৎ শঙ্কার সারাভাই আবার বিনা টিকেটের যাত্রিণীর পক্ষ নিয়েছে বলেই হয়তো কন্ডাক্টরের গোঁ চাপল। বলে উঠল, আমার ডিউটি পয়সা আদায় করা, টিকট চেয়েছি তার মধ্যে অত কথার দরকার কি? ব্যাগ হারিয়েছে বলে আপনার অত দরদ হয়ে থাকে তো আপনিই দিয়ে দিন না ভাড়াটা—টার্মিনাস পর্যন্ত দশটা পয়সা তো ভাড়া এখান থেকে!

—আমি দিয়ে দেব! পয়সা দেবার নামেই শঙ্কর সারাভাইয়ের গলা শমে নেমে এল।—বা রে, ভদ্রমহিলা হঠাৎ বিপদে পড়েছেন তাই বলছিলাম, আমি—আমি দিতে যাব কেন?

কন্ডাক্টর বলল, তাহলে আর বেশি সহানুভূতি না দেখিয়ে চুপ করে বসে থাকুন।

ওদিক থেকে রসালো উক্তি, দিয়েই ফেলুন দাদা—দশ পয়সায় হিরো হবার মওকা ছাড়বেন না।

আবার হাসির রোল, আবারও ভদ্রলোকদের কারো কারো ছি-ছি। বাসটা থামলে যশোমতী নেমে পড়ে বাঁচত। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে সামনের লোকটার কি হল কে জানে। শঙ্কর সারাভাই মুহূর্ত থমকালো মুখের দিকে চেয়ে। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, একটা হাত আপনা থেকেই নিজের পকেটে গিয়ে ঢুকল, তারপর পকেট থেকে ব্যাগ বার ক'রে দশটা পয়সা কণ্ডাক্টরকে দিয়ে বলল, একটু ভদ্রতা শিখতে চেষ্টা করো? বুঝলে কন্ডাক্টরের কাজ আর কশাইয়ের কাজ এক জিনিস নয়—এই নাও তোমার টিকিটের দাম।

স্বাস্থ্যের দিকে চেয়েই হোক বা যে কারণেই হোক, কন্ডাক্টর বিনাবাক্যে টিকিট কেটে সেটা শঙ্করেরই হাতে দিল।

—এই নিন। টিকিটটা যশোমতীর দিকে বাড়িয়ে চাপা রুক্ষ মেজাজে শঙ্কর বলল, বাসে উঠলে ব্যাগ খোয়া যায়, পথে-ঘাটে একা বেরোন কেন আপনারা!

আর মনে মনে বলল, দশ-দশটা পয়সা গচ্চা, কি কুক্ষণে মুখ খুলতে গেছলাম—

যশোমতীর মনে হল, তার বাবার মতোই কেউ যেন আবার একপ্রস্থ বিদ্রূপ করল। রাগ হচ্ছে, আবার অসহায়ও বোধ করছে। টিকিটটা লোকটার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে নেমে গেলে হয়। কিন্তু নেমে যাবে কোথায়? হঠাৎ বুঝি দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। পরক্ষণে বিরক্তমুখ লোকটা আবার কাগজে মন দিতে যাচ্ছে দেখে ত্রাসে চমকে উঠল। কোন্ দিক সামলাবে যশোমতী?

নষ্ট করার মতো সময় নেই, ফোটো চোখে পড়লেই হয়েছে। কি মনে পড়তে তাড়াতাড়ি টিকিটটা আবার তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করল, এতে আপনার ঠিকানাটা লিখে দিন দয়া করে।

কেন?

কেন বুঝতে পারছেন না? দু'চোখ একটু বেশি স্পষ্ট করেই তার মুখের উপর তুলে ধরল।

পয়সা ফেরত দেবেন? বাসের মধ্যে আমি কলম নিয়ে বসে আছি?

বিরক্ত মুখেই অন্য দিকে ফিরল শঙ্কর সারাভাই। এদিকে বাসের মধ্যে আবার একটা লঘু রসের সূচনা হতে যাচ্ছে দেখে যশোমতী চুপ করে গেল। কিন্তু যেটুকু হল, তাতেই লোকটার কাগজের প্রতি মনোযোগ কমেছে মনে হল। উসখুস দৃষ্টিটা দুই-একবার ফিরল এদিকে। সদ্য-সঙ্কটে এর থেকে বেশি আর কিছু কাম্য নয়, তাই দুই একবার পাল্টা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পুরুষের রূঢ়তায় অপমানিত বোধ করার মতোই মুখ করে বসে রইল যশোমতী।

স্টেশন।

মোটের বোঝা নিয়ে লোকটা নামল। পিছনে যশোমতী। স্টেশনে যাবে বলেই বাসে উঠেছিল সে-ও। তারপর কোথায় যাবে ঠিক করেনি। সবার আগে এই জায়গাটাই ছাড়তে চেয়েছিল সে। সবার আগে বাবার কাছ থেকে দূরে সরতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে দূর-পাল্লার যে-কোনো একটা ট্রেনে উঠে পড়বে, তারপর বেশি রাতে যে-কোনো একটা স্টেশনে নামবে। তারপর যা হয় হবে।

কিন্তু মাথায় আকাশ ভেঙেছে এখন। ব্যাগ চুরি যাবার দরুন নিজের ওপরেই ভয়ানক রাগ হচ্ছে তার। সকলের ওপর রাগ হচ্ছে। এমন কি ওপরওলার ওপরেও। তাকে জব্দ করার জনাই এ যেন চক্রান্ত একটা। জব্দ কি সোজা জব্দ! পঙ্গু অবস্থা। যশোমতী কি করবে এখন? ওই রকম চিঠি লিখে কাল বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, আর আজ নিজেই ফিরে যাবে? বাবা কিছু বলবে না, কিন্তু মনে মনে হাসবে। প্রাণ খুলে হাসবে। সে-হাসি যশোমতী যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। মেয়েরা কত অসহায় আর কত অপদার্থ, সেই নজিরই পাকা-পোক্ত হয়ে থাকবে বাবার মনে। দুনিয়া দেখতে বেরিয়ে একদিনেই এ-রকম নাজেহাল হয়ে ফিরে যাবে? আভিজাত্যের শো-কেস্ই যে তাদের উপযুক্ত জায়গা, ফিরে গিয়ে এটাই ঘটা করে প্রমাণ করবে?

তার থেকে মরে যাওয়া ভালো। রাগে দুঃখে ক্ষোভে মরে যেতেই ইচ্ছে করছে যশোমতীর। কিছুটা নিজের গোচরে কিছুটা বা অগোচরে স্টেশনেই এসে দাঁড়াল সে। আর সেই মুহূর্তেই স্থির করল নিজে থেকে সে কিছুতে বাড়ি ফিরবে না, এর থেকে বাবার তল্লাসীর জালে ধরা পড়ে বাড়ি ফেরা ভালো। কাগজে ছবি তো ছাপিয়েইছে আরো কতভাবে খোঁজাখুঁজি চলেছে কে জানে। ধরা পড়েই যদি তাতে সম্মানটা অন্তত বাঁচবে। কেউ বলবে না অযোগ্য বলে ফিরে এলো। বাবা রাগ করতে পারে, হাসবে না।

আর ধরা যদি না পড়ে, যা কপালে থাকে হবে। গায়ে যা গয়না আছে তারও দাম নেহাত কম হবে না। অবশ্য বেশি ভারী গয়না সে পরে না। তবু হাতের হীরে-বসানো বালা দুটোর দামই তো যা খোয়া

গেছে তার থেকে ঢের বেশি। তার ওপর হার আছে, দুল আছে—আঙুলে মুক্তোর আংটি আর কব্জিতে দামী ঘড়িও আছে। দেখা যাক—

সামনেই সেই লোকটা। অর্থাৎ সারাভাই। মোটগুলো রেখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কুলি আসতে মুখ ঘুরিয়ে নিল, অর্থাৎ দরকার নেই। তখনই তাকে যশোমতী দেখল। দেখল শঙ্কর সারাভাইও। একটু লক্ষ করেই দেখল যেন।

আপনি কি এই মৌলা প্যাসেঞ্জারে যাবেন?

জায়গার নাম অথবা গাড়ির নাম জীবনে এই প্রথম শুনল যশোমতী। কিন্তু ভাবার সময় নেই, মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাই যাবে।

এই মালগুলো দু'মিনিট দেখবেন দয়া করে, আমি টিকিটটা কেটে নিয়ে আসি, যাব আর আসব।

বাসের টিকিট কেটে দিয়েছে যখন, এটুকু উপকার দাবি করতে তার দ্বিধা নেই। যশোমতী মাথা নাড়ল। দেখবে।

শঙ্কর সারাভাই হনহন করে চলে গেল। কিন্তু কাউন্টারে ভিড়, ফিরতে দেরিই হল একটু। ঘেমে সারা। ব্যস্তসমস্ত হয়ে মোটগুলো তুলতে তুলতে বলল, ভিড়ের ঠেলায় প্রাণান্ত, তার ওপর নড়তে চড়তে দিন কাবার। গাড়ি ছাড়তে আর খুব বেশি দেরি নেই—

বড়ো মালটা এক হাতে নিল, অন্য সব ক'টা মাল অপর হাতের আয়ত্তে আনতে একটু অসুবিধেই হচ্ছিল। যশোমতী তাড়াতাড়ি মাঝারি সাইজের ঝোলাটা তুলে নিয়ে বলল, সব একলা পারবেন কেন, এটা আমি নিচ্ছি—চলুন!

এই সৌজন্যটুকু প্রত্যাশিত নয়। শঙ্কর সারাভাই থমকে মুখের দিকে তাকালো একটু, তারপর এগিয়ে চলল। এও বাসের টিকিট কাটার প্রতিদান ধরে নিল সে।

খানিকটা এগিয়ে আসার পর কি মনে পড়তে ফিরে তাকালো আবার। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোন্ ক্লাসে যাবেন?

যশোমতীর ভাবতে সময় লাগল না একটুও, এত মোট নিয়ে একটা কুলি পর্যন্ত করল না যে, সে কোন্ ক্লাসে যাবে জানা কথাই। মোটের জন্য বাসের একটা বাড়তি টিকিট কাটা নিয়ে কণ্ডাক্টরের সঙ্গে ঝগড়াও এরই মধ্যে ভোলবার নয়।

থার্ড ক্লাস—

লোকটা নিশ্চিন্ত হল যেন একটু। মনে মনে হাসিই পাচ্ছে যশোমতীর। জীবনে দুর্ভাবনা করার অবকাশ এ পর্যন্ত হয়নি বললেই চলে। তাই এ-রকম দুর্বিপাকে পড়া সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে কৌতুক বোধ করতে পারছে। অসুবিধে বোধ করা মাত্র সেটা দূর হতে সময় লাগে না এ-রকম দেখেই অভ্যস্ত সে। এই প্রথম এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে সে যেখানে সুবিধে অসুবিধের কোনো প্রশ্নই নেই।

ঢোকার মুখে গেটে চেকার দাঁড়িয়ে। কিন্তু ভিড়ের জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক নির্বিঘ্নে ঢোকা গেল। লোকাল গাড়ির ভিড়ে অত কড়াকড়ি নেই হয়তো। তবু একটু ভয়-ভয়ই করছিল যশোমতীর।

লোকটা তার সামান্য আগে আগে চলেছে। তার বগলের খবরের কাগজটা হাতের মালের বোঝা সামলাতে গিয়ে দুই-একবার পড়-পড় হয়েছে। ওই কাগজটা চক্ষুশূল যশোমতীর। তার সমস্ত ত্রাস আপাতত ওই এক জায়গায় পুঞ্জীভূত।

আবার ফ্যাসাদে পড়ার ভয়ে প্রথম সুযোগে পিছন থেকে কাগজটা টেনে নিল সে। শঙ্কর সারাভাই ফিরে তাকাতে মিষ্টি করে হেসে বলল, আপনার অসুবিধে হচ্ছিল, আমার কাছে থাক।... আপনি যাবেন কোথায়?

এই সুতৎপর জিজ্ঞাসার হেতু আছে যশোমতীর। একটু বাদেই হয়তো লোকটা তাকে প্রশ্ন করবে, তার গন্তব্য স্থান জানতে চাইবে। প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পর কাতারে কাতারে এত অচেনা মুখ দেখে একটু যে অসহায় বোধ করছে যশোমতী তাতে সন্দেহ নেই। ভরসা যদি একটুও কারো ওপর করতে হয়, যার সঙ্গে এই যোগাযোগ, তার ওপরে করাই ভালো।

শঙ্কর সারাভাই জবাব দিল, একেবারে শেষপর্যন্ত—মৌলা। আপনি?

যশোমতী মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, এক জায়গাতেই যাচ্ছে। পাছে আর কিছু জিজ্ঞাসা করে সেই ভয়ে ভিড়ের দরুনই যেন একটু তফাতে পড়ে গেল সে।

ঠাসাঠাসি ভিড়। এগোতে এগোতে আর জায়গার খোঁজে কম্পার্টমেন্ট দেখতে দেখতে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে শঙ্কর বলল, এই ঘণ্টার গাড়িতে ভিড় লেগেই আছে—

যাই হোক, গায়ের জোরেই ঠেলাঠেলি করে একটা কামরায় আগে উঠল সে। মালের ঠেলায় অনেকে এদিক-ওদিক সরে যেতে বাধ্য হল। বলতে গেলে বেশির ভাগই আধাভদ্র আর নিম্নশ্রেণির যাত্রীর ভিড়। অবশ্য ভদ্রলোকও দু'পাঁচজন নেই এমন নয়। নিজে উঠে হাত বাড়িয়ে যশোমতীর হাতের ঝোলাটা নিল শঙ্কর সারাভাই। তারপর দু'হাতে ভিড় ঠেলে সরিয়ে তাকে ওঠাবার চেষ্টা করতে করতে বার কয়েক হাঁক দিল, এই ভাই সরো না, মহিলা উঠতে পারছেন না দেখছ না!

ভিড় ঠেলে ওঠার অভ্যেস থাকলে যশোমতী উঠতে পারত। নেই বলেই পেরে উঠছে না। এক হাতের মুঠোয় কাগজ, অন্য হাতে হ্যান্ডেল ধরেছে কোনো রকমে। কিন্তু তারপর লোক ঠেলে ওঠা আর সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এরই মধ্যে তার চকিতে মনে হল কি। এক বিপদের ফাঁকে আর এক বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আশা। মুহূর্তে শঙ্কর সারাভাইয়ের দিকে একবার চোখ চালিয়ে সকলের অলক্ষ্যে অন্য হাতের খবরের কাগজটা টুপ করে ফেলে দিল সে।

ওদিকে সবিক্রমে দু'হাতে ভিড় সরিয়ে শেষে একহাতে প্রায় তাকে টেনেই তুলল শঙ্কর সারাভাই। তবু দু'দিকের চাপাচাপিতে যশোমতীর মুখ লাল। ঘেমেই উঠেছে। শঙ্কর সারাভাই এবারে একে মিষ্টি কথা বলে, ওকে রূঢ় কথা বলে নিজের মাল রাখার জায়গা করল আগে।

ওদিকে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

যশোমতী বসার জায়গা পায়নি তখনো। গা বাঁচিয়ে একটু সরে দাঁড়াবে কোথাও, এমন ফাঁকও নেই। বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত সে এই জগতেই বিচরণ করে এসেছে কিনা ঠাওর করতে পারছে না। যাদের দেখছে, তাদের যেন আর কখনো সে দেখেনি।

মাল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পর এবারে বসার চিন্তা শঙ্কর সারাভাইয়ের। একজন মেয়েছেলে ভিড়ের মধ্যে এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতেও বিসদৃশ। শঙ্কর এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে দেখল, ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতে পারলে বসার ব্যবস্থা হতেও পারে। ও-দিকটায় হাত-পা ছড়িয়েও বসে আছে কেউ কেউ। অতএব আবার চেষ্টা।

ইশারায় যশোমতীকে আসতে বলে ভিড় ঠেলে সে এগোতে লাগল—ও-দিকের লোকগুলো একটু সঙ্কুচিত হলে একজনের মতো বসার জায়গা অনায়াসে হতে পারে। কিন্তু দরজার দিক থেকে ভেতরে ঢোকাই মুশকিল।

—মেয়েছেলে ওদিকে যাবে, একটু জায়গা দাও না ভাই। এই একটু একটু করতে করতে যশোমতীকে নিয়ে সত্যি একপ্রান্তের দুই বেঞ্চির মাঝে এসে দাঁড়াল।

বুড়ো মতো এক ভদ্রলোকের উদ্দেশে সবিনয়ে আবার বলল, একটু সরে সরে বসুন না সার দয়া করে, মেয়েছেলে বসবে—

বার বার মেয়েছেলে মেয়েছেলে শুনে যশোমতীর লজ্জাই করছে। বিতিকিচ্ছিরি ভিড়ের দরুন তার গা-ও ঘুলোচ্ছে। এর ওপর আবার অস্বস্তিতে ফেললে ওই বুড়ো মতো ভদ্রলোক। সরি বলা সত্ত্বেও তার মেজাজ প্রসন্ন থাকল না। ঠাস করে বলে বসল, এ-রকম ভিড় দেখেও মেয়েছেলে নিয়ে ওঠেন কেন মশাই! একটা গাড়ি ছেড়ে উঠলেই তো হয়—

সঙ্গে সঙ্গে জবাব শুনেও দুই চক্ষু বিস্ফারিত যশোমতীর। শঙ্কর সারাভাই হাসিমুখে সাদা-সাপটা জবাব দিল, ভুল হয়ে গেছে, আপনার সঙ্গে আগে দেখা হলে পরামর্শ করেই উঠতাম। উঠে যখন পড়েছি, মেয়েছেলে সঙ্গে থাকলে তাকে ফেলেই বা উঠি কি করে। দোষ-ত্রুটি না ধরে আপনি এখন দয়া করে একটু চেষ্টা করে দেখুন, ব্যবস্থা হয় কি না।

বুড়োর রুক্ষ মুখ বিকৃত হল। বচন শুনে এপাশ-ওপাশের কেউ কেউ হাসছে। লোকটার কথায় না হোক, যশোমতীর দিকে চেয়ে অনেকেরই একটু জায়গা করে দেওয়ার আগ্রহ হল। ফলে জায়গাও

হল। যশোমতী বসে বাঁচল। তার দু'হাত দূরে শঙ্কর সারাভাই দাঁড়িয়ে। নিজের জায়গার জন্য আর ঝগড়া-ঝাঁটি করার ইচ্ছে নেই বোঝা গেল। পকেট থেকে তোয়ালের মতো একটা রুমাল বার করে ঘাম মুছছে।

ছোট লাইনের লোকাল ট্রেন। কাছাকাছি স্টেশন। দুটো স্টেশন পার হয়ে গেল। কিছুলোক নেমে গেল। দাঁড়িয়ে যারা ছিল তারা কেউ কেউ বসতে পেয়ে গেল। যশোমতীর উল্টোদিকের বেঞ্চিতে শঙ্করও বসার মতো জায়গা পেল একটু। মনটা তার ভালো নেই খুব। গাড়িতে উঠে নিশ্চিন্ত হবার পর মনে পড়েছে কিছু। নিরুপায় হয়ে মেসোর কাছ থেকে যেভাবে টাকা আনতে হল সেটাই ভিতরে খচখচ করেছে। বসতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিবেকের খচ-খচানি বাতিল করে দিয়ে পকেট থেকে ছোট হিসেবের বই বার করল। মন দিয়ে কেনা-কাটার হিসেবটা সেরে ফেলতে লাগল সে।

যশোমতী এক-একবার আড়চোখে দেখছে তাকে, আবার বাইরের দিকে মুখ করে বসে থাকছে। এদিকে ফিরবে কি, আবার কার হাতে খবরের কাগজ চোখে পড়বে—মনে মনে এখন সেই অস্বস্তি। আজই কাগজে ছবি বেরিয়ে গেছে যখন, তার চিঠিখানা প্রত্যাশিত সময়ের আগেই বাবা-মায়ের হাতে পড়েছে। লিখে আসা সত্ত্বেও এ-ভাবে ঢাক পিটিয়ে খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়ে তাকে বিব্রত করার দরুনও বাবার ওপর রাগ হতে লাগল। তাকে ধরার জন্য আরো কি করেছে আর করছে, কে জানে। সত্যি সত্যি শো-কেসের পুতুল ভাবে বলেই এত ভাবনা, তার কাছে মেয়েদের একটুও মর্যাদা থাকলে দু'দিন অন্তত সবুর করে দেখত।

—এঁর টিকিট? একটু ঘুরে ইঙ্গিতে যশোমতীকে দেখিয়ে তার টিকিট চাইল চেকার।

—আমি কি জানি! বলতে না বলতে হঠাৎ কোন্ অস্পষ্ট চেতনার ঘায়ে শঙ্কর সারাভাই বিমূঢ় যেন। যশোমতীর দিকেই তাকালো সে। চোখাচোখি হওয়া-মাত্র বিপদ স্বতঃসিদ্ধ মনে হল। তবু জিজ্ঞাসা করল, আপনার টিকিট কোথায়?

যশোমতী নিরুত্তর। ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ার সুযোগ থাকলে সে লাফিয়েই পড়ত।

শঙ্কর আরো রুক্ষ মেজাজে বলে উঠল, কি আশ্চর্য, টিকিট আছে না নেই?

নিরুপায় যশোমতী সামান্য মাথা নাড়ল শুধু।

সঙ্গে সঙ্গে তার পাশের সেই বুড়ো ভদ্রলোক বক্র মন্তব্য ছুঁড়ল, মেয়েছেলের টিকিট তার হাতে দেওয়া কেন, নিজের সঙ্গে রাখলেই হত!

তিক্ত-বিরক্ত শঙ্কর সারাভাই তাকেই ঝাঁঝিয়ে উঠল প্রথম, আপনি থামুন তো মশাই!

যশোমতীর দিকে ফিরল আবার গলার স্বর সংযত রাখা দায়। —টিকিট নেই তো গাড়িতে ওঠার সময় সেটা মনে পড়ল না—বিনা টিকিটে দিব্বি গাড়িতে উঠে বসলেন? আমার কাছে কি টিকিট গজাবে এখন! আরো কি বলতে যাচ্ছিল, যশোমতীর নিষ্প্রভ পাংশু মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। চেকারকে সবিনয়ে বলল, দেখুন, স্টেশনে আসার সময় বাসে ওঁর ব্যাগটা চুরি হয়ে গেছে, সে জন্যেই আর কি—

বাস-কন্ডাক্টরের সঙ্গে টিকিট চেকারের খুব একটা তফাত নেই। শুনে ঠাণ্ডা মুখে বলল, আপনি টিকিট করে নিন এখন, গার্ডকে বলে ওঠেননি, কিছু ফাইনও লাগবে। মৌলা তো?...টিকিট একটাকা দশ আনা আর ফাইন দেড় টাকা—তিনটাকা দু-আনা দিন—

যাঃ কলা! শঙ্কর সারাভাই প্রথমে বিমূঢ়, পরে তিক্ত-বিরক্ত। —আমি দিতে যাব কেন?

একটা মজার সূচনা দেখে অনেকেরই দৃষ্টি এদিকে এবারে। চেকারও ঈষৎ বিস্মিত!—তাহলে কে দেবে? উনি আপনার সঙ্গে নন?

—আমার—মানে—আমার সঙ্গে আবার কি!

সঙ্গের মহিলা বিব্রত বোধ করছে দেখেও শঙ্কর সারাভাইয়ের এ-রকম ব্যবহার মনঃপূত হল না অনেকেরই। ভিড়ের মধ্যে মালপত্র লটবহর সমেত মেয়েটিকে সুদ্ধু টেনে গাড়িতে তুলে কি ভাবে জায়গা করে নিয়েছে—এরই মধ্যে সেটা কারো ভোলার কথা নয়। সেই বুড়ো লোকটিই চুপ করে

থাকতে না পেরে তিক্ত মুখে ফোঁড়ন কাটল আবার।—টিকিট নেই যখন চুপচাপ টাকাটা গুণে দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে দিন না, টাকাটা বাঁচানো গেল না যখন কি আর করবেন—উনি আপনার সঙ্গের কেউ কিনা সেটা আমরা সকলেই জানি।

অর্থাৎ, সঙ্গিনীর টিকিট না কেটে টাকা বাঁচাতে চেষ্টা করা হয়েছিল—ধরা পড়ার পরে সুড়সুড় করে টাকা বার করে দেওয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ।

সীট ছেড়ে শঙ্কর সোজা উঠে দাঁড়াল একেবারে। ফলে জোড়া চোখ তার মুখের দিকে ধাওয়া করল। সশঙ্ক ব্যাকুল চোখে তাকালো যশোমতীও।

ধীর গম্ভীর মুখে বুড়ো লোকটাকে ভাল করে দেখেই যেন নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করল শঙ্কর সারাভাই। কিন্তু পেরে উঠল না। আগে সহ্য করেছে বারকয়েক, কিন্তু এই উক্তি বরদাস্ত করার মতো নয়। বলল, ফের আপনি মুখ খুলবেন তো ওই জানলা দিয়ে আপনাকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব, বুঝলেন?

বুড়োর মেজাজও তেমনি। রুখে গর্জে উঠল তৎক্ষণাৎ, কি? কি করবে তুমি! মগের মুলুক এটা, কেমন? এক-গাদা লোক ঠেলে বিনা টিকিটে মেয়েছেলে নিয়ে উঠে আবার—

শঙ্কর কি করবে? সাদা চুল দেখল, দাঁত নেই দেখল। না, কিছু করার নেই। বুড়োটা অতি বুড়ো, সেটাই তার জোর। রুদ্ধ রোষে এক ঝটকায় যশোমতীর দিকে ফিরল। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়েও থমকে গেল। যা বলতে যাচ্ছিল বলা হল না। চেয়েই রইল একটু। তারপর চেকারের দিকে ফিরল।

—কত দিতে হবে বললেন?

—তিন টাকা দু আনা।

—ফাইনও দিতে হবে?

—হবে।

—আচ্ছা রিসিট লিখুন।

মানিব্যাগ টেনে নিয়ে টাকা বার করল। একগোছা নোটই আছে বটে এখনো, তবে সবই হিসেবের টাকা।

টাকা গুণে দিয়ে রিসিট নিল। নিয়েই রাগের মাথায় সেটা যশোমতীর দিকে বাড়িয়ে দিল। যশোমতী ভয়ে ভয়ে তাকালো তার দিকে। কি ভেবে শঙ্কর সারাভাই পরক্ষণে আবার হাত টেনে নিয়ে রিসিটটা নিজের ব্যাগেই রাখল।

চেকার চলে গেল। শঙ্কর নিজের আসনে গুম হয়ে বসল। যশোমতী ওদিকে ফিরে জানলার বাইরে মুখ আড়াল করেছে আবার। অপমানের চূড়ান্তই হয়ে গেছে যেন। তিন টাকা দু আনার জন্য এ-রকম পরিস্থিতিতে কেউ পড়ে এ যশোমতীর স্বপ্নেরও অগোচর। এরপর সে কি করবে, পরের স্টেশনে নেমে গিয়ে বাড়িতে টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা করবে একটা? তারপর বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলবে, দুনিয়া দেখতে বেশিদিন লাগল না—একদিনেই দেখা হয়ে গেছে? বলবে তুমি ঠিকই বলেছ, নিজের জোরে বাঁচার শক্তি নেই আমাদের—আমরা শো-কেসে থাকারই উপযুক্ত?

তার থেকে গলায় দেবার মতো দড়ি জুটবে না একটু? কিংবা ডুবে মরার মতো একটু জল? আর রেললাইন আর রেল গাড়িও তো আছেই। বাবারই মেয়ে বটে সে, সে রকমই গোঁ। যত অপদস্থ হল, ততো বেশি গোঁ চাপল তার। বাড়ি ফেরার চিন্তা সমূলে ছেঁটে দিল, আর আত্মহত্যার পর নিজের চেহারাটা কল্পনা করতে একটুও ভাল লাগল না। সেটা ভয়ানক বীভৎস ব্যাপার। মনে মনে ভাবল, যত নষ্টের মূলে ওই চোর হতভাগা—বাস থেকে যে তার ব্যাগ নিয়েছে। তাকে হাতে পেলে আর ক্ষমতা থাকলে এই মুহূর্তে তাকে ফাঁসি দিত বোধহয়।

স্টেশন আসছে, যাচ্ছে। কামরার লোক কমছে।

একটা প্রশ্ন কানে ঢুকতেই আবার সচকিত কণ্টকিত হয়ে উঠল যশোমতী। এদিকে ফিরল না। লোকটা জিজ্ঞাসা করছে, আমার কাগজটা—কাগজটা কি করলেন?

প্রাণপণে বাইরের দিকে ঝুঁকে মাটি দেখছে যশোমতী। কিন্তু রেহাই পেল না।

—ইয়ে, শুনছেন? আমার কাগজটা আপনার হাতে ছিল, কোথায় রাখলেন?

অগত্যা নিরুপায় যশোমতী মুখ ফেরালো। আবারও বিপদের সম্মুখীন। তবে লোকজন নেমে যাওয়ার ফলে ওদিকের আসন অনেক ফাঁকা, এ-দিকে কারো চোখ নেই, আর সেই বুড়ো লোকটাও কখন নেমে গেছে।

—আমার কাগজটা? তিনবার একই কথা জিজ্ঞাসা করতে হল বলে শঙ্কর সারাভাইয়ের বিরক্তি।

যশোমতী কি আর জবাব দেবে, অসহায় চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কাগজ বলে একটা বস্তুর অস্তিত্ব এই যেন প্রথম শুনল।

সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ চড়তে লাগল শঙ্কর সারাভাইয়ের। যশোমতীর এ-পাশ ও-পাশ আর বেঞ্চির তলায় চোখ চালিয়ে সে-ই খুঁজে নিল একটু। তারপর রুক্ষস্বরে বলে উঠল, এটাও হারিয়েছেন? বলি এ-ভাবে একা স্টাইল করে আপনারা বেরোন কেন? আপনার কি ত্রিভুবনে কেউ নেই? সেই—সেই বাসে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে আমার কত লাভ হয়েছে বুঝতে পারছেন? দেখছেন কি? আমার অসুবিধা হচ্ছে বলে কাগজখানা আপনি টেনে নিয়েছিলেন—সেটা কি করলেন?

কি যে হল যশোমতীর কে জানে। একটু দূরে দূরে যারা ছিল তারাও এবারে সবিস্ময়ে ঘুরে বসেছে। ঠিক বুঝতে পারছে না হয়তো কি নিয়ে লোকটার মেজাজ চড়েছে—কিন্তু কথাবার্তার সুর তাদের কানে বেসুরো লাগছে নিশ্চয়ই।

সমস্ত মুখ লাল যশোমতীর। অনুচ্চ কঠিন প্রায় রূঢ় জবাব দিয়ে বসল, ফেলে দিয়েছি।

—ফেলে দিয়েছেন! জবাবটা অথবা জবাবের এই সুরটাই হয়তো ঠিক বোধগম্য হয়নি শঙ্করের।—মানে আমার কাগজটা আপনি ফেলে দিয়েছেন?...কেন ? কেন?

—আমার খুশি।

শঙ্কর অবাক। এতক্ষণ যে মেয়ে দুই ঠোঁট সেলাই করে বসে ছিল, তার এই জবাব শুনে এতগুলো ক্ষতির হিসেব পর্যন্ত ভুল হবার দাখিল। নইলে এতখানি লোকসানের পর এ-রকম উক্তি বরদাস্ত করার লোক নয় সে।

হঠাৎ ভিতরে একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি গুড়গুড় করে উঠতে লাগল শঙ্করের। মাথায় গণ্ডগোল নেই তো কিছু! যে ভাবে এখন মুখের দিকে চেয়ে আছে, মনে হল আর কিছু বললে সে-ও ঠাস করে মুখের ওপর জবাব দেবে।

অতএব আর কিছু না বলে শঙ্কর অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালো, কিন্তু আড়ে আড়ে বার-কতক লক্ষ্য করল মেয়েটাকে। পরনের বেশ-বাস এমন কি পায়ের জুতোজোড়া পর্যন্ত দামী মনে হয়। হাতের হীরে-বসানো মোটা বালা-দুটো আর আংটি ঝকমক করছে। কানের ঝোলানো দুল দু'টাও। গলার হারও কম দামী নয়, হাতে দামী লেডীস রিস্ট-ওয়াচ। মেসোর থেকে ও-ভাবে টাকা আনার দরুন, আর সেই বাস থেকে একের পর এক ব্যবসায়ের পয়সা অকারণে খোয়া যাবার দরুন মেজাজ বিগড়ে ছিল বলেই হয়তো খুব ভাল করে লক্ষ্য করা হয়নি এতক্ষণ। পয়সার ব্যাপারে শঙ্করের কড়াক্রান্তি হিসেব তার ওপর এ তো বলতে গেলে প্রাণের দায়ে চুরি করা বহু কষ্টের পয়সা।...কিন্তু এই প্রথম মনে হল শঙ্কর সারাভাইয়ের, দেখলে দেখার মতোই বটে মেয়েটি। মুখখানা যে ভারী ভারী মিষ্টি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

...অথচ একলা বেরিয়েছে। কিন্তু একলা বেরিয়ে যে অভ্যস্ত সে-রকম একটুও মনে হয় না।

ওদিকে একের পর এক নাজেহাল হয়ে যশোমতী সত্যিই রেগে গিয়েছিল। রাগে ক্ষোভে তার চোখে জল আসার উপক্রম হয়েছিল। আর কিছু বললে সেও চুপ করে থাকত না ঠিকই। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যা মুখে আসে তাই বলে বসত হয়তো। কিন্তু লোকটার হাব-ভাব হঠাৎ এ-ভাবে বদলে যেতে আত্মস্থ হল। ফলে শুধু লজ্জা নয়, সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল। বক্রনেত্রে সেও বার-কতক লক্ষ্য করল তাকে।

দুই একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। যশোমতীর মনে হল, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ির জন্যেই বেশি রুক্ষ লাগছে লোকটাকে...শেভ করলে বেশ ভব্য-সভ্যই দেখাবার কথা। স্বাস্থ্য রীতিমতো ভাল, গায়ের

জোরের দেমাকেই লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়ায় বোধহয়। কিন্তু অন্য লোকের সঙ্গে ঝগড়ার বেশির ভাগ তার জন্যেই করেছে—এ সত্যটাও মনে মনে অস্বীকার করতে পারল না যশোমতী। ইচ্ছে করে লোকটার কাগজ ফেলে দেবার পরেও সেই কিনা উল্টে চোখ রাঙিয়ে বসল। আর তার ফলে ভদ্রলোক...ভদ্রলোকই তো মনে হচ্ছে...এভাবে চুপ করে যাবে আশা করেনি। করেনি বলেই যশোমতীর চিন্তা কিছুটা সঙ্গত পথে চলল। মানুষটার রুক্ষ হাব-ভাব আচরণের তলায় একটা যেন দরদী মনই আবিষ্কার করে ফেলল সে। ব্যাগ চুরি যাবার ফলে এখন তো বিপদের পাহাড় যশোমতীর মাথার ওপর। কেউ সামান্য সহায় হলেও সেটা সামান্য ভাবার কথা নয়। ভাবল না। এতবড় বিপদে এত লোকের মধ্যে এই নিতান্ত অপরিচিত একজন ছাড়া কে আর তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। আর তো কেউ ফিরেও তাকায়নি। টিকিট-চেকারের হাতে ধরা পড়ার ফলেই তো এতক্ষণে সব ফাঁস হয়ে যাবার কথা। তাকে টেনে নামিয়ে জেরা শুরু করলেই ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে বাবার কাছে খবর না পাঠিয়ে করত কি? আর তারপর...তারপর কেলেঙ্কারি হাসাহাসি, ঢি-ঢি।

এ-পর্যন্ত এই অপরিচিত মানুষটাই সর্বভাবে তার মান-মর্যাদা রক্ষা করেছে। নইলে কি-যে হত কে জানে।

বক্র কটাক্ষে তাকালো আবার। আবারও চোখোচোখি হয়ে গেল। ধমক খাবার পর এই মুখ দেখে প্রায় হাসিই পাচ্ছে যশোমতীর। এত চিন্তা-ভাবনার ফাঁকে ফাঁকেও মনের তলায় কোথায় যেন একটু ভাল লাগার অনুভূতি উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। শুধু সামান্য পয়সা—যে পয়সাকে কোনোদিন পয়সা বলে ভাবার দরকার হয়নি যশোমতীর তাই নিয়ে লোকটার ও-ভাবে মাথা গরম করাটা ভাল লাগে নি।...হতে পারে গরীব, তাই বলে এমন তুচ্ছ লোকসান নিয়ে এ-রকম হিসেব-নিকেশ করার মন কেন? তার একটু প্রীতির আশায় কত জনে কত টাকা বাতাসে উড়িয়ে কৃতার্থ হবার জন্য প্রস্তুত ঠিক নেই।

মেয়েটাকে এক-একবার দেখেছে আর ভাবছে শঙ্কর সারাভাইও। সেই গোড়া থেকে অর্থাৎ বাসের যোগাযোগের শুরু থেকে তলিয়ে ভাবছে। ...না, যত দেখছে আর যত ভাবছে, মাথায় ছিট আছে বলে মনে হচ্ছে না তার। আচরণে অসঙ্গতি কোথাও দেখেনি বাসে, বাসের থেকেও অনেক গুণ বেশি এই ট্রেনে—টিকিট না থাকার দরুন যে অসহায় মূর্তি লক্ষ্য করেছে, তাতে কোনোরকম বিকৃতির লক্ষণ ছিল না। বিকৃতি নয় মনে হতেই ভিতরে ভিতরে আবার রাগ হতে লাগল শঙ্করের। স্টাইল করে একা বেরিয়েছে, তার ওপর কাগজ হারিয়ে উল্টে আবার চোখ রাঙিয়েছে তাকে। ...দেখতে সুন্দর, ভেবেছে সকলে শুধু মুখ দেখেই ভুলে যাবে। সুন্দর মুখ দেখেই সে একের পর এক এতগুলো লোকসান বরদাস্ত করেছে কিনা মনে হতে নিজের ওপরেই উষ্ণ হয়ে উঠল। কেন অত করতে গেল? বাসের টিকিট দিতে গেল কেন, কেনই বা বিনা টিকিটে ট্রেনে ওঠার খেসারত দিতে গেল?...আশ্চর্য।

ট্রেন থামল। দিনের আলোয় টান ধরেছে। সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। মৌলা। লোকাল ট্রেনের যাত্রা শেষ।

কামরার যে সাত-আটজন লোক ছিল তারা আগে নেমে গেল। শঙ্করের তাড়া নেই। ধীরে-সুস্থে মালপত্র গুছিয়ে সে নামার উদ্যোগ করল। এবারে আবার চোখ টান করে তাকে দেখছে যশোমতী। স্টেশনের দিকে এক নজর তাকিয়েই তার ভিতরটা দুমড়ে গেছে। দু'দণ্ড নিশ্চিন্ত হবার মতো কিছুই কি বরাতে জুটবে না আজ? খোলা স্টেশন, মাথার ওপর ছাদ নেই। ওদিকে খুপরির মতো ছজনের ছোট ছোট অফিস-ঘর গোটা দুই-তিন, ওয়েটিংরুম আশা করা দুরাশা বোধহয়। স্টেশনের এদিক-ওদিক যতদূর চোখ যায় ধু-ধু মাঠ।

আগে মালগুলো সব নামিয়ে আর একবার উঠে বেঞ্চির তলায় উঁকি দিয়ে দেখে নিল শঙ্কর, টুকিটাকি জিনিস কিছু থলে থেকে গাড়িতে পড়েছে কিনা। তারপর নেমে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

যশোমতী বসে আছে। শুধু বসে আছে নয়, তার দিকেই চেয়ে আছে। মেয়েটার এই দৃষ্টি আবার যেন কেমন অসহায় মনে হল শঙ্করের।

তবু আর বোধহয় মাথা গলাতো না সে, সেই থেকে অনেক শিক্ষা হয়েছে—কিন্তু মেয়েটির টিকিটের রসিদও যে তারই কাছে। তাছাড়া, এভাবে বসে থাকতে দেখে অবাকও কম হয়নি। হাব-ভাব গোলমেলেই লাগছে।

দাঁড়িয়ে দেখল একটু। গম্ভীর মুখে জানান দিল, এটা মৌলা স্টেশন।

জবাব নেই।

—আপনি নামবেন কি এখানে? খানিক বাদে গাড়ি আবার ফিরে যাবে।

অগত্যা যশোমতী উঠল। তার পিছনে পিছনে নামল। স্টেশন না এলে, এই পথ এত শিগগীর না ফুরোলেই বাঁচত বুঝি। আবার এক সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত হতে চেষ্টা করেছে প্রাণপণে।

শঙ্কর সারাভাই মালপত্রগুলো দু-হাতের দখলে আনতে চেষ্টা করল। আসার সময়ের মতো স্বাভাবিক সৌজন্যবশতই হোক বা একটু সাহায্য করার তাগিদেই হোক, সেই ঝোলাটা নেবার জন্য হাত বাড়ালো যশোমতী।

তার আগে শঙ্কর তাড়াতাড়ি ওটা দখলই করল যেন। বলল, থাক এটা খোয়া গেলে আবার আমাকে এই গাড়িতেই ফিরতে হবে।

টিকিট দিয়ে বাইরে এলো। যশোমতী কি করবে এখন জানে না। দিনের আলোয় যে সাহসে বুক বেঁধেছিল, আসন্ন রাতের ছায়া নামতে তা যেন উবে গেছে। এর থেকে গাড়িতে বসে থাকলে ভাল হত বোধহয়। গাড়ি আবার ফিরে যেত অবশ্য। গেলেও বড় স্টেশনে রাত কাটানো যেত। দিনের আলোয় আবার ভাবা যেত কি করা যায়।

বাইরে আসার পর লোকটা যেন আর চেনেই না তাকে। ও-ধারের আঙিনা ছাড়িয়ে রাস্তায় নেমেই রিকশায় মালপত্র তুলতে লাগল। যশোমতী কি করবে? কেমন লোক—ভাল কি মন্দ কিছুই জানে না। কিন্তু এ-রকম দিশাহারা অবস্থায় পড়ে তার মনে হল, এতক্ষণের এই চেনা লোক যেন নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরের মতো তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে যাচ্ছে।

যশোমতী সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়েছিল। রাস্তায় নামেনি। লোকটা তার দিকে আর ফিরে তাকাবে কিনা জানে না, আর একবারও তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে কিনা জানে না। তবু দাঁড়িয়ে আছে যশোমতী, তবু প্রতীক্ষা করছে। সাধারণ স্থলে এ-রকম বেখাপ্পা পরিস্থিতিতে এই বয়সের কোনো মেয়ের আলাপ-পরিচয় ঘটলে পুরুষের দিক থেকে অন্তত একটু ঘনিষ্ঠ হবার কথা। আর কিছু না হোক, তার একটু কৌতূহল হবার কথা। কিন্তু এ-রকম নীরস গদ্যাকারের পৃথিবী যশোমতী আর দেখেনি। চলে যেতে দেখে লোকটার ওপর এখন রীতিমতো রাগ হচ্ছে তার—পাঁচ টাকাও খরচ হয়নি ওর জন্যে, কিন্তু সেই লোকসানের শোকেই অস্থির।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেল না, ফিরে তাকালো। আর, তক্ষুনি প্রাণের দায়ে যশোমতী কিছু বলবে এ-রকম কিছু আভাসই প্রকাশ করল হয়তো। বিস্ময়ের আঁচড় পড়তে লাগল লোকটার মুখে। সে যে এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তাও এতক্ষণ খেয়াল করেনি বোধহয়।

যশোমতীর রাগ হবারই কথা।

যাক্, ফিরে আসছে।

যশোমতী জিজ্ঞাসা করল, এখানে রাতে থাকার মতো কোনো হোটেল-টোটেল বা সে-রকম কিছু নেই?

জবাব না দিয়ে শঙ্কর সারাভাই অবাক চোখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। মেয়েটিকে আবার নতুন করে দেখল একপ্রস্থ। শুধু দেখা নয়, বুঝতেও চেষ্টা করল।—আপনি যাবেন কোথায়?

যশোমতী নিরুত্তর।

—এখানে আপনার চেনা-জানা কেউ নেই?

সুবোধ মেয়ের মতো তক্ষুনি মাথা নাড়ল। নেই। শঙ্কর সারাভাই দেখছে। রাগ নয়, একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। মনের তলায় দুর্বোধ্য জটিলতার ছায়া পড়ছে।

—আপনি এখানে এসেছেন কেন?

এই প্রশ্নের একটাই জবাব হতে পারে। যশোমতী তাই বলল। —চাকরির খোঁজে...

—চাকরি! কি চাকরি?

—কোনো স্কুল-টুলে—

—স্কুলে চাকরি! মেয়েদের স্কুল বলতে তো এখানে একটা পাঠশালা আছে শুধু।

যশোমতী সাগ্রহে বলল, সেখানেই একটা কা-কাজ পাওয়া যেতে পারে শুনেছিলাম...

শঙ্কর সারাভাই হাঁ করে তবু মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। আবার একটা গণ্ডগোলে পড়ে যাচ্ছে ভেবেই চিরাচরিত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল কিনা কে জানে। বলে উঠল, চাকরি পাওয়া যেতে পারে শুনেছিলেন তো সকালের গাড়িতে এসে দেখাশোনা করে যাননি কেন? এখানে কি হোটেল-রেস্তরাঁর ছড়াছড়ি যে মনে হল আর একা মেয়েছেলে ভর-সন্ধ্যায় হুট করে চলে এলেন? দৃষ্টি ঘোরালো হল পরক্ষণেই।—সঙ্গে তো টাকাকড়ি কিছু নেই, হোটেল থাকলেই বা আপনার কি সুবিধে হত?

যশোমতী কি জবাব দেবে? তবু মরিয়া হয়েই বলল, ভদ্রলোকের হোটেল হলে কোনো মহিলা বিপদে পড়েছে শুনলে সাহায্য করতেন বোধহয়। আমি ফিরে গিয়েই আবার টাকা পাঠিয়ে দিতুম। গয়না বেচে দেনা শোধ করে যেত সেটা আর বলতে পারল না।

শঙ্কর সারাভাইয়ের নিজেরই যেন বুদ্ধিসুদ্ধি সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে কেমন। হাঁ করে আবার ও মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। অস্বস্তি বাড়ছেই। কেন যেন আর মাথা গলানো ঠিক নয় মনে হল তার। তিরিক্ষি মেজাজে পকেট থেকে ব্যাগ টেনে একটা টাকা বার করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, একটা রিকশা নিয়ে যেখানে যাবার কথা চলে যান, রাত করে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য তো পাঠশালা খুলে বসে আছে সব! মোটকথা, যা ভাল বোঝেন করুন। ভাল দিন পড়েছে আজ আমার—

যশোমতী চেয়ে রইল শুধু। হাত বাড়াল না, বা টাকা নিল না। বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণীর এই দুরবস্থা সে যেন নিজেই এখনো কল্পনা করতে পারছে না।

—কই, নিন! এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

—থাক, আপনি যান।

কি করে বলল, সত্যিই চলে গেলে কি হবে যশোমতী জানে না। তবু মুখ দিয়ে এই কথাই বেরুল তার।

ব্যাগের টাকা আবার ব্যাগে পুরে হনহন করে এগিয়ে গিয়ে রিকশায় উঠে বসল শঙ্কর সারাভাই। রিকশাওয়ালা এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিল তাদের। এবারে রিকশা তুলে নিল। দু'চার গজ এগিয়েই শঙ্কর পিছন ফিরে তাকালো।

যশোমতী দাঁড়িয়ে আছে। স্থির, নির্বাক। এদিকেই চেয়ে আছে।

আরো পাঁচ-সাত গজ গেল। আবারও ফিরে তাকালো শঙ্কর সারাভাই।

যশোমতী তেমনি দাঁড়িয়ে।

অস্বস্তির একশেষ। শঙ্করের কেবলই মনে হল, মেয়েটি বিপদে পড়েছে। এই চেহারার...এই গয়না আর সাজ-পোশাকের মেয়ে পাঠশালার চাকরির খোঁজে এসেছে শুনে সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিয়েছে বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে আসন্ন সন্ধ্যার টান-ধরা আলোয় এই মুখের দিকে চেয়ে কেন যেন বিপদে পড়া ছাড়া আর কিছু ভাবা গেল না। যেমন অসহায়, তেমনি করুণ....আবার তেমনি সুন্দর।

রিকশা ফেরাতে বলল।

সিঁড়ির পাশে রিকশা থামতে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

যশোমতী নিশ্চল দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করছে আবার।

—চলুন।

যশোমতী চেয়ে আছে।

যশোমতী চেয়েই আছে।

বিরক্তি চাপতে গিয়েও সেটা প্রকাশ হয়েই পড়ল।—আপনাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই। বাসে ব্যাগ হারাবার পরেও ফিরে যাওয়ার কথাটা মনে হল না আপনার...দেখছেন কি, উঠুন রিকশায়!

পায়ে পায়ে নেমে এসে যশোমতী রিকশায় উঠল। আশ্রয় পাওয়ার পর দ্বিধা, ভাল করল কি মন্দ করল জানে না। যে সঙ্কটে পড়েছে, ভাল হোক মন্দ হোক কিছু একটা করতেই হবে। গাঁয়ের এই স্টেশনে রাত কাটাবার কথা ভাবতেও তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল।

সে বসার পর পাশে যেটুকু জায়গা থাকল, সেখানে কোনো অচেনা পরপুরুষের বসার প্রশ্ন ওঠে না। তবু সভয়ে তাকালো যশোমতী।

চল—। রিকশা চালাতে হুকুম করে শঙ্কর সারাভাই হনহন করে আগেই হেঁটে চলল। তারপর পিছন ফিরে বলল, মালগুলোর দিকে দয়া করে লক্ষ্য রাখবেন পড়ে-টড়ে না যায়, আর খেয়াল খুশি-মতো কোনোটা ফেলে দেবেন না আবার।

রিকশাওয়ালা আবার রিকশা তুলে নিল। হঠাৎ খুব হাল্‌কা আর খুব নিশ্চিন্ত লাগছে যশোমতীর। বিপদের থেকে আরো বিপদের মধ্যে পা বাড়ায়নি, এ আশ্বাস যেন নিজের ভিতর থেকেই পাচ্ছে সে। লোকটার নাম পর্যন্ত জানে না এখনো, কিন্তু আবছা সন্ধ্যায় এ-রকম একটা সুযোগ পেয়েও যে রিকশায় উঠে বসল না, বা বসার কথা একবার ভাবলও না—তাতেই লোকটা যে ভদ্র তাতে আর সন্দেহ থাকল না। ভেবে ভাবনার কূল-কিনারা পাবে না যশোমতী জানে, তাই হঠাৎ সমস্ত ভাবনা-চিন্তা রসাতলে পাঠাতে ইচ্ছে করল। ...ভদ্রই যদি হয় তাহলে জলে পড়বে না। ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হবার দাখিল, আর ভাবতে পারে না। দেখা যাক।

রিকশাওয়ালা তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল। যশোমতী তাকালো একবার। আবছা অন্ধকার সত্ত্বেও পাশ কাটাবার মুখে স্পষ্টই দেখতে পেল। রাজ্যের বিরক্তি মুখে এঁটে মাথা গোঁজ করে চলেছে লোকটা। রিকশা এগিয়ে যেতে হঠাৎ হেসেই ফেলল সে। বাসের টিকিট নিয়ে বিভ্রাটের পর থেকে একজন সঙ্গী পেয়েছে বটে!

দু'ধারে মাঠ, মাঝে রাস্তা। নির্জন। যশোমতী আর একবার তাকালো পিছন ফিরে। তারপর কি ভেবে রিকশাওয়ালাকে বলল, আস্তে চলতে, পিছনের লোকের সঙ্গে আসতে।...হাসি পেয়েছিল বটে, কিন্তু হাসিটা যে ছেলেমানুষি, তার থেকে বেশি কে আর জানে। কোথায় কার বাড়ি যাচ্ছে, কি দেখবে সেখানে গিয়ে কে জানে। সেখানে যারা আছে তাদের মুখ দেখাবে কি করে? তাদের জেরার কি জবাব দেবে? কি ভাববে তারা? কিন্তু উদ্বেগের তাড়নায় কিনা বলা যায় না, একটু আগের স্বতঃস্ফূর্ত আশ্বাসটুকুই আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করল যশোমতী।...সেই বাস থেকে যেমন দেখে আসছে এই অচেনা অজানা সহযাত্রীটিকে, তার মেজাজ যেমনই হোক, বা হিসেবের মুঠোটা যত শক্তই হোক, তার ভিতরের একটা চেহারা যেন সে দেখেছে। সেটা মানুষেরই চেহারা, মেয়েছেলের বিপদ দেখে হীন সুযোগ নেবার মতো নয়। আপাতত এই নির্ভরতাটুকুই সম্বল।

রিকশার গতি শিথিল হবার ফলে পিছনের মানুষ পাশে আসতে যশোমতী উৎসুক মুখে তাকালো। শঙ্করও ঘাড় ফেরাল। আর তক্ষুনি বোঝা গেল মেজাজ তখনো ঠাণ্ডা হয়নি। হয়নি বলেই যেন বেশি নিশ্চিন্ত বোধ করছে। এবারে বিব্রত মুখে যশোমতী চিরাচরিত সৌজন্যের কুণ্ঠাই প্রকাশ করল।

—আপনার হেঁটে যেতে কষ্ট হচ্ছে...

দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর আটকে নিয়ে শঙ্কর বলল, কষ্ট হলে কি আর করা যাবে, ওখানে উঠব? ওখানে অর্থাৎ রিকশায়। কি রকম মেয়ে বোঝার জন্যেই ফিরে বক্র প্রশ্ন ছুঁড়েছে শঙ্কর।

থতমত খেয়ে যশোমতী তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না না বলছিলাম আর একটা রিকশা করলে হত...

—তার ভাড়াটা কে দিত, আপনি না আমি?

এই জবাবই বোধহয় সব থেকে ভাল লাগল যশোমতীর। এরই থেকে মন বুঝতে সুবিধে হয়, অন্তত মনের গতি সোজা পথে চলছে কিনা সেটা বোঝা যায়। ভাল মুখ করে বলল, এখন আপনিই দিতেন, পরে না হয় আমি দিয়ে দিতাম।

যে-রকম হিসেবী, আরো কিছু বললে মাথা একটু ঠাণ্ডা হবে মনে হল। রিকশার গতি আর একটু না কমলে কথা বলার সুবিধে হচ্ছে না। আগে রিকশাওয়ালাকে নির্দেশ দিল, এই, আরো আস্তে চলো। তারপর পাশের লোকের দিকে ফিরে সবিনয়ে বলল, আমার জন্যে আপনার অনেক খরচা হয়ে গেল, কিন্তু আপনার কিচ্ছু লোকসান হবে না, আমি সব মিটিয়ে দেব।

জবাবে শঙ্কর সারাভাই একটা তপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল শুধু। পরমুহূর্তে আচমকা প্রশ্ন করল, আপনার নাম কি।

ঠিক এই মুহূর্তে এ-প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হকচকিয়ে জবাব দিল, লি-লীলা।

লীলা কি?

প্রশ্নের সুরটা খট করে কানে লাগল কেমন যশোমতীর। চোখ-কান বুজে যে পদবী মনে এল তাই বলে দিল।

—লীলা নায়েক। কেন...?

জবাব পেল না। আবছা আলোয় আর একবার যেন তাকে ভাল করে দেখে নিল লোকটা।

কি ভেবে হঠাৎ রিকশাওয়ালাকে রিকশা থামাতে বলল যশোমতী। শঙ্কর দাঁড়িয়ে গেল। যশোমতী নামল। বলল, রিকশাওয়ালা চলুক, আমিও হেঁটেই যাই।

শঙ্কর সারাভাই আপত্তি করল না। তার মনে নানা সংশয় আনাগোনা করছে। বাস থেকে এ-পর্যন্ত অনেক কিছুই অস্বাভাবিক লাগছে তার। রিকশাওয়ালাকে চলতে ইঙ্গিত করে এগিয়ে চুপচাপ চলল। শুধু বলল, বাড়ি এখনো আধ মাইল পথ।

সঙ্গে সঙ্গে যশোমতী জিজ্ঞাসা করল, আপনার বাড়িতে কে আছেন?

বিরক্ত মুখে কিছু বলতে গিয়েও শঙ্করের খেয়াল হল, এই বয়সের মেয়ে অপরিচিত লোকের বাড়ি যাচ্ছে, খোঁজ নেওয়াই স্বাভাবিক।

—দিদি আছে, আর বাচ্চা ভাগ্নে আছে।

দিদি আছে শুনে খানিকটা নিশ্চিন্ত যশোমতী।—আর কেউ নেই?

আর বিহারী আছে—পুরনো চাকর।...আপনি স্কুলে কাজ পাবেন জেনে এসেছেন, না কাজের চেষ্টায় এসেছেন?

ঢোঁক গিলে যশোমতী জবাব দিল, চেষ্টায়...

স্কুলের যারা চাকরি দেবার মালিক তারা আপনাকে এসে দেখা করতে লিখেছিল?

—না...মানে, আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম এসে চেষ্টাচরিত্র করলে কাজ হতে পারে...এসে গেলাম। আপনার তাদের সঙ্গে চেনা-জানা আছে?

জবাব পেল না। আবছা অন্ধকার সত্ত্বেও যশোমতীর মনে হল লোকটার চোখে কিছু সংশয় ঘন হয়ে উঠেছে।

দুই-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শঙ্কর হঠাৎ আবার জিজ্ঞাসা করল, কোথায় থাকবেন ঠিক না করেই অজানা অচেনা জায়গায় দেখা-সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়েছেন? এখানে আসতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে আপনি জানতেন না?

রিকশা থেকে না নামলেই ঠিক হত বোধহয়। মিথ্যে বলা অভ্যেস নেই যশোমতীর। দরকারও হয়নি কখনো। মিথ্যে কেউ বললে সে তাকে ঘৃণাই করত। কিন্তু ইচ্ছে না থাকলেও মিথ্যে না বলে পারা যায় না এ কে জানত। প্রাণের দায়ে অম্লানবদনে মিছে কথা বলার জন্যেই প্রস্তুত হল সে।

প্রথমে মাথা নাড়ল, সন্ধ্যা হবে জানতাম না। তারপর অস্ফুট বিশ্বাসযোগ্য সুরেই বলল, এ-রকম অবস্থায় পড়ে যাব ঠিক ভাবিনি।

—স্কুলে দেখা করে কাল ফিরে যাবেন?

—চাকরি না হলে তো ফিরতেই হবে, তবে ঠিক ফেরার ইচ্ছে ছিল না...এখানে না হলে আবার অন্য কোথাও চেষ্টা করতে চলে যাব ভেবেছিলাম। অত ভিড়ের মধ্যে বাসে ব্যাগটা চুরি হয়ে গিয়েই সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে শঙ্কর সারাভাই খপ্ করে আবার জিজ্ঞাসা করে বসল, ব্যাগে আপনার কত টাকা ছিল?

পা-পাঁচ—পাঁচশো। পাঁচ হাজার বলতে গিয়েও কোনো রকমে সামলে নিয়ে পাঁচশো বলল। এমনিতেই অবিশ্বাস উঁকিঝুঁকি দিয়েছে বুঝতে পারছে, পাঠশালার চাকরি পাবার আশায় পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল শুনলে সঙ্গে সঙ্গে আবার হয়তো স্টেশনের রাস্তাই ধরতে বলবে তাকে। পাঁচশো টাকা বলার ফলেই প্রায় সেই গোছের মুখ।

—পাঁচশো টাকা সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে এখানে আপনি চাকরির চেষ্টায় এসেছিলেন?

—ব-বললাম তো আর ফেরার ইচ্ছে ছিল না—যা ছিল সব নিয়ে বেরিয়েছিলাম। চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত। পরের প্রশ্ন শুনে প্রায় আঁতকেই উঠল যশোমতী।

—বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন?

—পা-পালাব মানে! যশোমতী রেগেই গেল। —পালাতে যাব কেন, বনিবনা হচ্ছিল না, চলে এসেছি। বলে এসেছি, নিজের রাস্তা নিজে দেখে নেব, আর ফিরব না।

ইচ্ছে করেই এতটা বলল যশোমতী। এই বলার ফলে আখেরে সুবিধে হতে পারে।

আবার গভীর প্রশ্ন।—বাড়িতে কে আছে? কার সঙ্গে বনিবনা হয়নি।

ভিতরে ভিতরে নাজেহাল যশোমতী। তবু জিজ্ঞাসাবাদের ফয়সালা এখানেই যে হয়ে যাচ্ছে, সেটা এক পক্ষে ভাল। অজানা অচেনা বাড়িতে গিয়ে ওঠার পর সকলের জেরার সামনে পড়তে হলে আরো বিতকিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।

—দা-দাদার আর দাদার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আর বউদির সঙ্গে।

অন্ধকার ঘন হয়েছে। অদূরের রিকশাটাকেও আবছা দেখাচ্ছে। তবু পার্শ্ববর্তিনীকে আর একবার ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল শঙ্কর সারাভাই।—আপনার দাদা অবস্থাপন্ন?

জেরার ফলেই মাথা খুলছে যশোমতীর। এক মুহূর্তেই মনে হল, তার যা বেশ-বাস, অবস্থাপন্ন না বললে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, খুব। বড় অবস্থা বলেই তো মান বাঁচাতে সরে দাঁড়াতে হল।

যাক। এবারে জেরা শেষ হয়েছে মনে হল। আর মাথা খাটিয়ে যেভাবে জবানবন্দী দিল সে, খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে বলেও মনে হল তার।

—আপনার দাদা কি করেন?

ব্যবসা। এর পর আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে রাগই হবে যশোমতীর।

—কিসের ব্যবসা?

ফের জেরার আগেই তড়বড় করে অনেক কথা বলে ফেলল যশোমতী। পাঁচ রকমের ব্যবসা, আমি অত খবর রাখিনে। মোট কথা তাদের ব্যবহারে সেখানে থাকতে আমার অপমান লাগছিল, তাই যা হোক একটা চাকরিবাকরি নিয়ে থাকব ঠিক করে চলে এসেছি। সেটা কি অন্যায় কিছু করা হয়েছে?

জবাব পেল না। ক্রমাগত মিথ্যে বলে যেতে হচ্ছে বলে রাগ হলেও ফলাফল তার অনুকূলেই যাচ্ছে মনে হল। এভাবে একা বাড়ি ছেড়ে আসার পিছনে একটা মোটামুটি স্বাভাবিক কারণ উপস্থিত করা গেছে সন্দেহ নেই।

অনেকখানি নিশ্চিন্ত হবার পর যশোমতীর খারাপ লাগছে না। ভিতরে ভিতরে এখন বেশ মজাই লাগছে। বাড়ির দিদিটি কেমন কে জানে, বাড়িটা পছন্দ হলে আর নিরাপদ মনে হলে দু'পাঁচ দিন থেকে গিয়ে সত্যিই হয়তো পাঠশালায় চাকরির চেষ্টাও করা যেতে পারে। যে ছাঁদে বাড়ি ছাড়ার গল্প ফাঁদা হয়েছে, ঠকবে না। আর চাকরি একটা পেয়ে গেলে কড়া-ক্রান্তিতে এই লোকের দেনা শোধ তো নিশ্চয় করবে।

...দেনা। দেনার অঙ্ক মনে হতে যশোমতীর হাসিই পেয়ে গেল। রিকশার ভাড়া ধরলেও এ-পর্যন্ত পাঁচ টাকা হবে না হয়তো। পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল, এখন দেখছে পাঁচ টাকার দামও কম নয়। দুনিয়া দেখতে না বেরুলে এ-রকম অভিজ্ঞতা তার হত না ঠিকই।

—আপনার নাম কি? এবারের প্রশ্ন যশোমতীর।

—শঙ্কর—শঙ্কর সারাভাই।

—আপনি এখানে চাকরি করেন বুঝি?

না, ব্যবসা।

যশোমতীর মনে পড়ল, তার মালপত্রর সঙ্গে একরাশ সুতোও দেখেছে। তাই কিসের ব্যবসা জানার কৌতূহলও হল। কিন্তু ভরসা করে জিজ্ঞাসা করতে পারল না, কারণ যেটুকু জবাব দিয়েছে তাতেই বিরক্তি লক্ষ্য করেছে। অথচ ওর বেলায় যেন পুলিসের জেরা শুরু করে দিয়েছিল।

সাত

পাশাপাশি দুটো টালির ঘরের বাড়ি। ঘরের মেঝে শুধু সিমেন্টের। মাটির দেয়াল। সামনে উঠোন। উঠোন পেরুলে ফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরি বলতে টিনের চালার বড় ঘর আর একটা। তাতে গোটা দুই পুরনো তাঁত, ঝরঝরে পাওয়ার মেশিন একটা, আর তেমনি কুড়িয়ে পাওয়া গোছের আনুষঙ্গিক কিছু সরঞ্জাম। অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে নবাগতা শুধু ঘরক'টাই দেখল।

দু ঘরের একটা ঘরে যশোমতীকে ঢুকিয়ে দিয়ে দিদিকে নিয়ে এদিকের ঘরে এলো শঙ্কর। ভাইয়ের সঙ্গে হঠাৎ এ-রকম সুশ্রী একটা মেয়েকে দেখে দিদি অবাক। তার থেকে আরো বেশি অবাক বোধহয় পাঁচ বছরের ভাগ্নে দেবরাজ ওরফে রাজু। মামাকে সে-ই আগে দেখেছে। তার সঙ্গে রমণীমূর্তি দেখে সে-ই আগে হতভম্ব হয়েছে। কিন্তু চিন্তাশক্তি তার রীতিমত চটপটে। প্রথমে যা মনে এলো তাই অবধারিত সত্যি ধরে নিল। মায়ের কাছে যেমন শোনা ছিল, অর্থাৎ মামার ঘরে একজনেরই আসতে বাকি—সে মামী। সেটাই সে ভেবে নিয়েছে তৎক্ষণাৎ। চোখ বড় বড় করে আগে যশোমতীকে দেখেছে একটু, তারপরেই ঘুরে মায়ের উদ্দেশে চিৎকার।—মা! দেখো এসে—মামা মামী নিয়ে এসেছে!

মামার মেজাজ এমনিতেই সপ্তমে চড়া। ভাগ্নের এ-রকম উত্তেজিত এবং উল্লসিত অভ্যর্থনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না সে। চিড়বিড় করে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। —দেব এক চড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে। যা বেরো এখান থেকে!

মামার উগ্র মূর্তি দেখে ছেলেটা সভয়ে দুপা সরে গেল। তারপর ফ্যালফ্যাল করে অপরিচিতার দিকে চেয়ে রইল। মামার এ-রকম ক্ষেপে ওঠার মতো অন্যায়টা কি করল, বোঝার চেষ্টা। যশোমতী হতচকিতের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। সমস্ত মুখ লাল। ফুটফুটে হতভম্ব ছেলেটাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিতেও ইচ্ছে করেছে। কিন্তু ভরসা করে পারেনি।

দিদি ছেলের ডাক শুনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ততক্ষণে। বিধবা। যশোমতীকে দেখে তারও বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। শঙ্করের তাতেও বিরক্তি। জীবনে মেয়ে যেন এই প্রথম দেখল।

ভালো করে আর একবার দেখে নিয়ে বিস্ময় সামলে দিদি অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কে...?

—বলছি। যশোমতীর দিকে ফিরে শঙ্কর বলল, আপনি ওই ঘরে গিয়ে বসুন—

বসতে বলার এই সুরটাও আর যাই হোক খুব সদয় আপ্যায়নের মতো নয়। দ্বিধান্বিত পায়ে যশোমতী দরজার পাশে জুতো খুলে সামনের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। ঘরে ইলেকট্রিক নেই। এক কোণে একটা ছোট লণ্ঠন জ্বলছে। রাতে সাদাটে আলো দেখা অভ্যস্ত চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। এই আলো ঘরের অন্ধকার দূর করলেও যশোমতীর অস্বস্তি বাড়িয়েছে।

দিদিকে নিয়ে শঙ্কর পাশের ঘরে এলো। দু ঘরের মাঝের দেয়াল আর ছাদের মধ্যে দুহাত প্রমাণ ফাঁক। অর্থাৎ, দেয়ালটা একটাই বড় ঘরের পার্টিশনের মতো। ও-ঘরের কথা এ-ঘরে স্পষ্টই শোনা গেল। যশোমতী শোনার জন্য কান পেতেছেও। আর ও-ঘরে কথা যে বলছে, সে আর কেউ শুনছে কি না-শুনছে সেই পরোয়াও করে না বোধহয়।

অল্প দু-চার কথায় দাদার বাড়ি ছেড়ে মেয়েটার চাকরির চেষ্টায় আসার ইতিবৃত্তি শেষ করল শঙ্কর। বুদ্ধি থাকলে কেউ এভাবে আসে না সেই মন্তব্যও জুড়ল। একা পথে-ঘাটে বেরোয়নি, বাসে ব্যাগ হারানোটাই তার প্রমাণ—সেই মতও ব্যক্ত করল। তারপরেই নিজের লোকসানের খেদ। দেখা হওয়ার পর থেকে শুধু খরচাই যে হয়েছে, এমন কি খবরের কাগজটাও যে খোয়া গেছে, সেই বিরক্তিও গোপন থাকল না। বলল, বাসের টিকিট কেটে দিয়েছি, ট্রেনের টিকিট কেটেছি আর জরিমানা দিয়েছি, তারপর রিকশা ভাড়া দিয়ে সমস্ত পথ হেঁটে এসেছি—বুঝলে?

দিদির বরং সন্ত্রস্ত চাপা গলা কানে এলো যশোমতীর, চুপ কর, শুনতে পাবে যে! ভদ্রলোকের মেয়ে বিপদে পড়েছে, খরচা হয়েছে—হয়েছে।

ফলে পুরুষকণ্ঠ আরো চড়ল, শুনতে পাবে তার কি,আমি কি মিছে কথা বলছি!

এ-ঘরে দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে যশোমতী। সামনে একটা চৌকিতে বিছানা পাতা। ক্লান্ত লাগলেও বসেনি।

আরো কানে এলো। দিদি বলছে, আ-হা , মুখখানা বড় সুন্দর, বেশ বড় ঘরের মেয়েই মনে হয়, ভাইটা চণ্ডাল ছাড়া আর কি! যশোমতীর মুখ লাল, বাসের ব্যাগ চোরকেই আর এক দফা ভস্ম করতে ইচ্ছে করছে তার। দিদি বলে চলেছে, রাজুর হাঁক শুনে আর দেখে আমি তো আকাশ থেকে পড়েছিলাম। বড়লোক ভাই-ভাজের কি-রকম না জানি ব্যবহার নইলে এ-ভাবে বাড়ি থেকে বেরোয়!...তার ওপর কত রকমের লোক আছে সংসারে, তুই না সেদিন কার কথা বলছিলি, কে এক ব্যবসাদার নিজের ভাইঝিকেসুদ্ধ টেনে এনে কারবারের চটক বাড়াচ্ছে আর বড় বড় লোকদের হাত করছে—এও কি ব্যাপার কে জানে, মেয়েটি খুব ভাল না হলে এ-ভাবে বেরিয়ে আসবে কেন? কে ভাই, কি-রকম ভাই তুই খোঁজ-টোজ করেছিলি?

দিদির গলা এবং সমস্ত বক্তব্য খুব কান খাড়া করেই শুনতে এবং বুঝে নিতে হয়েছে যশোমতীকে। শুনে ভুরু কুঁচকেছে, মুখও আর এক দফা লাল হয়েছে। কিন্তু তবু ওই দিদিটিকে বেশ সরলই মনে হয়েছে তার।

একটু বাদেই ছেলে-সহ দিদি এ-ঘরে এলো। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যস্ত হয়ে বলল, তুমি দাঁড়িয়েই আছ এখনো, বোসো বোন, বোসো—তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই, নিজের দিদির কাছেই এসে পড়েছো ভাবো। সাগ্রহে আবার আপাদ-মস্তক দেখে নিল, তারপর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, কিন্তু দিদি হলেও গরীব দিদি, তোমার কষ্ট হবে।

সমস্ত দিনের দুশ্চিন্তার পর এই কথাগুলো যশোমতীর ভালো যেমন লাগল, লজ্জাও তেমনি পেল। দারিদ্র্যটা যে যশোমতীর চোখে বেশ বড় হয়ে ধাক্কা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অল্প হেসে বলল, কষ্ট হবে না।

আর একবার তার ঝকমকে গয়নাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে দিদি বলল, হলেই বা আর কি করবে বলো? এক কাজ করো, কুয়োতলা থেকে একেবারে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে ঠাণ্ডা হয়ে বসো। খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়, রাত না করে আগে খেয়ে নাও তারপর কথা হবে। আমার সঙ্গে এস—

লণ্ঠন তুলে নিয়ে থমকালো।—ও, তোমার তো ব্যাগও চুরি হয়ে গেছে, পরবেই বা কি...আমার তো সবই থান!

যশোমতী তাড়াতাড়ি বলল, এইটেই পরব'খন, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

দিদির মনঃপূত হল না, বলল, রাস্তার কাপড়, তাছাড়া এই ভালো শাড়িটা নষ্ট হবে—

যশোমতী বলতে পারল না এটা তার ভালো শাড়ির মধ্যে গণ্য নয়। তবু যা-হোক কিছু বলার আগেই মহিলা এক কাণ্ড করে বসল। এ-ঘরে দাঁড়িয়েই ডাক দিল, শঙ্কর! ওরে শঙ্কর, তুই যা তো, ও-বাড়ির বাচ্চুর মায়ের কাছ থেকে একটা ধোয়া শাড়ি চেয়ে আন চট্ করে—হাত-মুখ ধুয়ে এসে মেয়েটা পরবে কি!

হুকুম শুনে যশোমতী তটস্থ। ফলাফল পরক্ষণেই দেখল। গম্ভীর মুখে শঙ্কর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। যশোমতী মুখ দেখেই বুঝল দিদির ওপর চটেছে।

—সমস্ত দিন বাদে এসে এই রাতে এখন আমি আধ মাইল রাস্তা শাড়ি আনতে ছুটব?

দিদি বলল, তোর সবেতে বেশি-বেশি, সবে তো সন্ধে পার হল, আর এখান থেকে এখানে আধ মাইল হয়ে গেল! যাবি আর আসবি, একটা শাড়ি না পেলে ও পরবে কি?

শঙ্কর সারাভাই সাফ জবাব দিল তোমার যা আছে তাই দাও। আমি এখন যেতে পারব না।

যশোমতী ব্যস্ত হয়ে আবারও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অবকাশ পেল না। মুখের কথা মুখে থেকে গেল, তার আগেই দিদিটি ক্রুদ্ধ।—মেয়েটা বাড়িতে এলো, আর আমি তাকে থান পরতে দেব! কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে তোর? নিজে না যাস, বিহারীকে পাঠা, আমার নাম করে একটা ধোয়া শাড়ি চেয়ে আনে যেন।

যশোমতী সশঙ্কে তাকাল দরজার দিকে, অর্থাৎ দরজার ওধারে যে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে। এবারে তাকেই দু'কথা শোনাবে কিনা কে জানে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল, রাজ্যের বিরক্তি সত্ত্বেও সে আর দ্বিরুক্তি না করে পায়ে পায়ে প্রস্থানই করল।

একটু চুপ করে থেকে বিব্রত মুখে যশোমতী বলল, আমি সেই থেকে খুব অসুবিধে করছি—

দিদির সাধাসিধে কথাগুলো সত্যি মিষ্টি। বলল, অসুবিধে আবার কি! তুমিই কি কম অসুবিধেয় পড়েছ! মুখের দিকে চেয়ে থমকালো একটু, শঙ্কর কিছু বলেছে বুঝি? বকা-ঝকা করেনি তো? ওর কথায় তুমি কান দিও না, ওর ওই রকমই মেজাজ—তার ওপর নড়বড়ে ব্যবসা নিয়ে নাজেহাল হয়ে হয়ে মনটা বিগড়েই আছে। নইলে এমনিতে কারো কষ্ট দেখতে পারে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর যশোমতী ঠাণ্ডা হয়ে সুস্থ মাথায় একটু চিন্তা করবে ভেবেছিল। ব্যাগটা চুরি গিয়ে তার ভাবনা কত যে বাড়িয়ে দিয়েছে ঠিক নেই। ওটা সঙ্গে থাকলে আর কিছু না হোক, কথায় কথায় এ-রকম মর্মান্তিক লজ্জাকর পরিস্থিতিতে পড়তে হত না। শঙ্কর সারাভাইয়ের দিদি ওদিকে খাবার ব্যবস্থা করতে গেছে। যশোমতীর মনে হল দেরি হচ্ছে। মুখ হাত ধোয়া হয়েছে। শাড়িও একটা হয়েছে। এখন তার রীতিমতো খিদে পেয়ে গেছে। ফলে আরো খারাপ লাগছে। কিন্তু ঘড়ির দিকে চেয়ে অবাক। রাত মাত্র সাড়ে সাতটা। মনে হচ্ছিল অনেক রাত হয়েছে।

দরজার দিকে চোখ পড়তে সচকিত হল। সেখানে দাঁড়িয়ে গভীর এবং গম্ভীর মনোযোগে তাকে লক্ষ করছে পাঁচ বছরের ক্ষুদ্রকায় মূর্তি। রাজু। ভিতরে ঢুকতে খুব ভরসা পাচ্ছে না, কারণ এই একজনকে উপলক্ষ করেই তার কিছু অপমানের কারণ ঘটেছে। নতুন মানুষ দেখেই মায়ের উদ্দেশ ও ভাবে হাঁক দেবার ফলে মামা হঠাৎ এ-রকম তেড়ে মারতে আসতে পারে—কল্পনাও করেনি। মামা যে রকম মেজাজেই থাকুক না কেন তার সঙ্গে অন্তত এত খারাপ ব্যবহার কখনো করে না। অতএব কৌতূহল সত্ত্বেও সে খুব ভরসা করে অপরিচিতার কাছে এগিয়ে যেতে পারছে না। যদিও ইচ্ছে বেশ করছে, কারণ তার বিবেচনায় কাছে আসার মতোই লোভনীয় মনে হচ্ছে।

এমন এক পরিবেশে এসে পড়ে যশোমতীরও মুখ খুলতে সঙ্কোচ। কিন্তু ছেলেটা ভারী সুন্দর। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। মুখ না খুলে হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডাকল। কিন্তু মনস্থির করে ছেলেটা তবু কাছে এগোতে পারল না। মামা ধারে কাছেই আছে, টের পেলে এসে দু'ঘা বসিয়েই দেবে কিনা ঠিক কি।

যশোমতী উঠে এসে হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল। চৌকির ওপর বসালো। নিজেও বসল।

—কি দেখছিলে?

তোমাকে...

আমাকে কেন দেখছিলে?

কথায় ছেলে চটপটে বেশ। জবাব দিল, মা মামাকে বলছিল, তুমি খুব সুন্দর দেখতে।

তক্ষুনি আলাপের প্রসঙ্গ ঘোরাল যশোমতী।—তোমার নাম কি।

রাজু। তোমার নাম?

যশোমতী আবার মুশকিলে পড়ল। একটু ভেবে বলল, আমার নাম মাসি।

খুব মনঃপুত হল না যেন। ভয়ে ভয়ে যেন যাচাই-ই করে নিতে গেল।—মামী না?

চকিতে দরজার দিকে একবার তাকিয়ে যশোমতী মাথা নাড়ল।—না।

আর একবার তাকে দেখে নিয়ে রাজু মন্তব্য করল, মা তো বলে মামা মামী আনবে। বিহারীকাকাও বলে—

ছেলেটার মাথায় 'মামী' ঢুকে আছে। যশোমতী সঙ্কোচ বোধ করছে আবার। কানে লাগছেও কেমন। সকালে সেই বাসের থেকে এ পর্যন্ত ভদ্রলোক উপকার কম করল না। তার মেজাজের দিকে না চেয়ে কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। যশোমতী অকৃতজ্ঞ নয়। বাড়িতে কেউ তাকে এ-ভাবে চোখ রাঙালে বা ও-রকম করে তার সঙ্গে কথা কইলে হাতে মাথাই কাটত। তার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করার কথা কেউ কল্পনাই করতে পারে না। কিন্তু তবু যশোমতী তেমন রাগ করেনি লোকটার ওপর, রাগ হলেও তা চাপতে চেষ্টা করেছে, আর কৃতজ্ঞ বোধ করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু পাঁচ বছরের শিশুর মুখেও এ-রকম অসম্ভব সম্পর্কের কথা শুনে সে অস্বস্তি বোধ করছে।....কালচারের ছিটে-ফোঁটা নেই লোকটার, সামান্য চক্ষুলজ্জারও বালাই নেই, ব্যবসা বলতে দিন আনে দিন খায় গোছের কিছু করে হয়তো। অবস্থা অনেকেরই খারাপ হতে পারে, কিন্তু ব্যবহার যা—ইস্কুল-কলেজের মুখ দেখেছে কিনা কোনদিন সন্দেহ।

পাঁচ বছরের শিশুও ওই গোছের একটা সম্পর্ক কল্পনা করলে অস্বস্তি।

আলাপ আর জমার অবকাশ পেল না। খাবার ডাক পড়ল। দিদি নিজেই এসে ডেকে নিয়ে গেল।

সামনের বারান্দার মেঝেতে তিনটে জায়গা করা হয়েছে—দুটো হারিকেন। শঙ্কর পিঁড়িতে বসে আছে। হাব-ভাব নরম একটু। সদয় মুখে ভাগ্নেকে ডাকল, আয়—

এই আলোয় আর এ-রকম মেঝেতে বসে খেতে হবে যশোমতীর সেটা তেমন খেয়াল ছিল না। বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে নেমন্তন্ন উপলক্ষে মেঝেতে বসে হয়তো দু-চারদিন খেয়েছে, কিন্তু এ-রকম আলোয় খেতে বসার অভিজ্ঞতা নেই। বারান্দার চারদিকে যতদূর চোখ যায় অন্ধকার বলেই দুটো হারিকেনের আলোও একেবারে নিষ্প্রভ ঠেকছে।

তার মুহূর্তের দ্বিধা লক্ষ করেই দিদি জিজ্ঞাসা করল, শঙ্করের সামনে বসে খেতে তোমার লজ্জা করবে নাকি? আর তো জায়গা নেই আমাদের, একসঙ্গে না বসলে তো দেরি হয়ে যাবে—সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছ।

যশোমতী তাড়াতাড়ি বসে পড়ে বাঁচল। দিদি নিশ্চিন্ত মনে খাবার আনতে গেল। যশোমতী লক্ষ করল, ওদিকে মামা-ভাগ্নের মধ্যে নিঃশব্দে খোঁচাখুঁচি লেগে গেছে। ভাগ্নের মান ভাঙাবার চেষ্টায় মামা এক-একবার তার গায়ে হাত রাখতে চেষ্টা করছে, নয়তো পিঠে একবার আঙুলের খোঁচা দিয়ে অন্য দিকে তাকাচ্ছে। আর ভাগ্নে ছোট্ট শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে বা কুঁকড়ে মামার সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা করছে, নয়তো হাত দিয়ে মামার হাত ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত দিন বাদে বাড়িতে ঢুকেই মামা তাকে রীতিমতো অপমান করেছে, এখন সাধাসাধি করলেও সে এত সহজে ভাব করতে রাজি নয়।

যশোমতীর ভালো লাগছে। ভালো লাগছে কারণ, লোকটার রুক্ষ মুখে হাসির আভাস এই বোধহয় প্রথম দেখল।

দিদি খাবার নিয়ে এলো। মোটা মোটা চালের লালচে ভাত। আর তরকারীর চেহারা দেখেও ভিতরে ভিতরে আবার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে যশোমতী। ভব্যতা জ্ঞান তার যথেষ্টই আছে, কিন্তু হাতে তুলে এই সব গলাধঃকরণ করবে কি করে ভেবে পাচ্ছে না।

কিন্তু খাওয়া শুরু করতেই অন্যরকম। খিদের মাথায় মনে হল অমৃত খাচ্ছে। এই চেহারার ভাত-ডাল-তরকারী এ-রকম উপাদেয় কি করে হয় সে ভেবেই পেল না। তবু খাওয়ার ধরন-ধারণ দেখে দিদিটির বোধহয় খটকা লাগার কারণ ঘটল কিছু। খানিক লক্ষ করে শেষে বলেই ফেলল, তোমার বোধহয় অসুবিধে হচ্ছে খুব, আমাদের এইরকমই খাওয়া-দাওয়া।

যশোমতী তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। ওদিক থেকে তার ভাইটিও মাঝে মাঝে আড়চোখে তার খাওয়া লক্ষ করছে। পুরুষের সঙ্গে বসে খেতে বা খাওয়া নিয়ে হৈ-চৈ করতে কোনদিন এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করেনি যশোমতী। সঙ্কোচের অনুভূতিটা এই প্রথম।

খানিক বাদেই ভাই-বোনের কথাবার্তায় মোড় একেবারে অন্যদিকে ঘুরে গেল। আর তাই শুনে যশোমতী অবাক মনে মনে। বাইরের একজনের সামনে যে প্রসঙ্গ তোলাটাও অস্বাভাবিক, সেই প্রসঙ্গ নিয়েই ভাই-বোনে বলতে গেলে কথা-কাটাকাটিই হয়ে গেল একপ্রস্থ। যশোমতীর মনে হল, দিদিটিরও মেজাজপত্র কোনো কোনো ব্যাপারে তার ভাইয়ের ওপর দিয়ে যায়। এই এক বিষয়ে অন্তত ভাই-বোনের প্রগাঢ় মিল। কে আছে কাছে বা কে শুনছে এ নিয়ে চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। মেজাজ চড়লে ভব্যতার এই দিকটার প্রতি তারা সচেতন নয় একজনও।

কি মনে পড়তে আহাররত ভাইয়ের দিকে চেয়ে দিদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ রে, একরাশ মালপত্র নিয়ে এলি, তার ওপর দেরাজে আবার অতগুলো টাকা রাখলি দেখলাম, রান্নার তাড়ায় জিজ্ঞেস করতে মনে ছিল না।—অনেকগুলো টাকাই তো মনে হল—এত টাকা হঠাৎ পেলি কোথায়?

যশোমতী লক্ষ করল, ভাইয়ের মুখে হঠাৎ বিরক্তির ঘন ছায়া পড়েছে। প্রসঙ্গটা অবাঞ্ছিত বোঝা গেল। মুখ তুলে একবার তার দিকে তাকালো সে। তারপর খেতে খেতে ক্ষুদ্র জবাবে প্রশ্নের ইতি টানতে চাইল।—যোগাড় করেছি।

দিদি শঙ্কিত। —যোগাড় করেছিস! গলা-কাটা সুদে আবার ধার-ধোর করিসনি তো কোথাও থেকে? সেবারের কথা মনে হলে আমার এখনো গা কাঁপে।

—না! বিরক্তি চাপতে না পেরে প্রচ্ছন্ন ঝাঁঝে ক্ষুদ্র জবাব দিল শঙ্কর সারাভাই।

কিন্তু দিদিটির শঙ্কা যায় না তবু। ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে। খটকা লেগেইছে, সেই সঙ্গে কিছু বোধহয় মনেও পড়ল তার। মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, মেসোমশায়ের কাছ থেকে আবার টাকা আনিসনি তো?

এদিকের ধৈর্য গেল। তিক্ত বিরক্ত হয়ে শঙ্কর সারাভাই বলে উঠল, এনেছি তো, না আনলে টাকা পাব কোথায়, আমাকে ধার দেবার জন্যে কে হাত বাড়িয়ে বসে আছে?

যশোমতী খাওয়া ছেড়ে উঠে পালাতে পারলে বাঁচে। বাইরের কারো সামনে এই আলাপও যে কেউ করতে পারে তার ধারণা ছিল না। কিন্তু এরপর যা শুনল, তার চক্ষুস্থির।

দিদির মুখেও বিরক্তির ছায়া ঘন হতে লাগল। ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।—ফের তুই মিথ্যে কথা বলে টাকা এনেছিস?

সঙ্গে সঙ্গে ভাই চিড়বিড় করে উঠল।—সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হলে মেসো টাকা দেবে? নাকি টাকা ছাড়া চলবে? ওদিকে তো কাজ একরকম বন্ধ, সুতো নেই, মেশিন ভাঙা, ছাদ দিয়ে মাথার ওপর জল পড়ছে—কাপড় বানানো ছেড়ে ওই তাঁতে গামছা পর্যন্ত তৈরি করা যাচ্ছে না।

দিদিটির মুখের দিকে চেয়ে ঘাবড়েই যাচ্ছে যশোমতী। হারিকেনের অল্প আলোয়ও বোঝা যায় মুখখানা তেতে উঠেছে। বলে উঠল, তা বলে তুই ভাঁওতা দিয়ে টাকা আনবি, একবার ওই করে শিক্ষা হয়নি? কালই আমি মাসিমার কাছে চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি সব!

শঙ্কর বলল, তুমি না লিখলেও দু'দিন গেলেই তারা বুঝতে পারবে।

—পারুক, তবু লিখব। ছি ছি ছি ছি, লজ্জায় মাথা কাটা গেল। না হয়, ক্ষেতের শাক-ভাত খেয়ে থাকব আমরা, টাকা মাথায় চাপলে তোর হয় কি শুনি?

ভাই হুমকি দিয়ে উঠল, খেতে দেবে, না সব ফেলে উঠে চলে যাব?

সুর নরম হওয়া দূরে থাক, সঙ্গে সঙ্গে দিদিটিরও সমান উগ্রমূর্তি।

—যা দেখি কেমন আস্পর্ধা তোর! আর-একবারের সেই হাতে-পায়ে ধরার কথা ভুলে গেছিস, কেমন?

যশোমতীর দুই চক্ষু বিস্ফারিত। সে যেন চোখের সামনে নাটক দেখছে কিছু। ওদিকে ক্ষুদ্র শিশুটির কোনোরকম ভাববিকার নেই। সে যেন মা আর মামার এ-ধরনের বিবাদ শুনে অভ্যস্ত। নিবিষ্ট মনে খাচ্ছে এবং এক খাওয়া ছাড়া আর কিছু তার মাথায় নেই। একটু নীরবতার ফাঁক পেয়ে বলল, মা, আর একটা ভাজি দেবে?

মায়ের এইবার খেয়াল হল বোধহয়। বাইরের মেয়ে এই ঘরের কথাবার্তা শুনে কাঠ হয়ে বসে আছে। ছেলের পাতে ভাজা দিয়ে যশোমতীর দিকে ফিরল।—কি হল, তুমি হাত গুটিয়ে বসে আছ দেখি। তুমি এ-সব শুনে কিছু মনে কোরো না বাছা—গরীবের ঘরের সতেরো জ্বালা, তার ওপর এই অবুঝ ছেলে এমন এক-একটা কাণ্ড করে বসে যে মাথার ঠিক থাকে না।

যশোমতী আড় চোখে দেখল অবুঝ ছেলে ঘাড় গোঁজ করে খাচ্ছে। দিদি জিজ্ঞাসা করল আর কি দেব বলো—

যশোমতী তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, আর কিছু চাইনে।

রাতের শয্যা নেবার পর আর চিন্তা করা গেল না কিছু। সমস্ত দিনের ক্লান্তি আর চিন্তার ধকলে স্নায়ুগুলো সব নিস্তেজ। কোন্ পর্যায়ের দারিদ্র্যের সঙ্গে যে এরা যুদ্ধ করছে সেটা ভাবতে ভাবতেই চোখ বুজে এলো যশোমতীর। তার আগে মনে মনে একটা ব্যাপার অনুভব করে কেমন একটু স্বস্তিও বোধ করছে সে। ভাইটির মেজাজ যত তিরিক্ষিই হোক, বোনের কাছে ঢিট সে। এটা তার যেমন মন্দ লাগেনি, ছল-চাতুরী করে কোন এক আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকা আনা হয়েছে শুনে তেমনিই আবার খারাপ লেগেছে।

শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের কোণে স্তিমিত হারিকেন জ্বলছে তখনো। বাইরে কোথায় শেয়াল ডাকছে। ছোট একটা জানলা খোলা, বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকতে গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। চোখ বুজেই বিছানায় পড়ে রইল যশোমতী। সকাল হলে কি করবে সে, মেয়ে-পাঠশালায় চাকরির চেষ্টায় যাবে? তারপর? কালই চাকরি হবে সে-রকম আশা করার কোনো কারণ নেই। চাকরি না হলে কি করবে? আবার এই দারিদ্রের সংসারে ফিরে আসবে? এখান থেকে যেতে হলেও টাকা লাগবে, এক-আধখানা গয়না এখানে বিক্রি করার সুবিধে হবে কিনা কে জানে। আর এত বিড়ম্বনার পর ভাগ্য যদি তার একটু ভালোই হয় অর্থাৎ, মেয়ে পাঠশালায় চাকরি যদি পেয়েই যায় তাহলেও চাকরি হলেই বা কি করবে? থাকবে কোথায়? পরক্ষণে নিজেকেই আবার চোখ রাঙাতে চেষ্টা করল যশোমতী, সমস্যা তো সর্বত্রই আছে। অত ভাবলে বাড়ি থেকে বেরোতে গেছল কেন?

ভাবতে ভাবতে কখন চোখ বুজে এসেছিল। চোখ খুলে দেখে সকাল। প্রথম মনে হল বাড়ির শয্যায় শুয়েই কিছু একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে উঠল সে। চোখ মেলে তাকানোর পরেও সে স্বপ্নের রেশ কমেনি যেন। তারপরেই টের পেল স্বপ্ন নয়। কঠিন বাস্তবের মধ্যেই পড়ে আছে। বিচিত্র বাস্তব। তবু জানলার ভিতর দিয়ে দূরের আকাশ আর প্রথম ভোরের দিকে চেয়ে অদ্ভুত লাগল। প্রকৃতি যেন শুচি-স্নান করে উঠল এইমাত্র।

বিছানা ছেড়ে উঠল যশোমতী। ঘরের কোণে হারিকেনটা নিভিয়ে দিল। পরা শাড়িটা একটু গোছগাছ করে নিয়ে দরজার খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

প্রথমেই যে বস্তুটা তার চোখে পড়ল, সেই বস্তুরই আর-একটার অর্থাৎ দ্বিতীয়টার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালো সে। তারপর বিড়ম্বনার ছায়া পড়ল মুখে।

স্যান্ডাল। তার শৌখিন স্যান্ডালজোড়ার দ্বিতীয় পাটি অদৃশ্য। রাত্রিতে শোবার সময়ে ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে দরজা টেনে দিয়েছে, হারিকেনের স্বল্প আলোয় স্যান্ডালজোড়া চোখে পড়েনি। অলক্ষে সে দুটো বাইরেই থেকে গেছে। এখন তার একটা পড়ে আছে, আর একটা নেই। এদিক-ওদিক খুঁজল একটু। কুকুর বা শেয়ালের কাণ্ড ছাড়া আর কি!

এত সমস্যার ওপর সকালে উঠেই এই সমস্যা কার ভালো লাগে? আশায় আশায় তবু উঠোনে নেমেও নিঃশব্দে এদিক-ওদিক খানিক খোঁজাখুঁজি করল যশোমতী। উঠোনের বাইরেটাও একটু দেখল। তারপর হতাশ হয়ে ওই একপাটি স্যান্ডাল চৌকির আড়ালে এক কোণে পা মোছার ছালা দিয়ে নিরাপদে চাপা দিয়ে রাখল। যদি আর এক পাটির হদিস মেলে ভালো, নইলে যা গেছে তো গেছেই, আবার সেটা নিয়ে অপ্রস্তুত না হতে হয় সেই শঙ্কা।

পায়ে পায়ে বাইরে এলো। উঠোনের ওধারটায় বাগান। যশোমতী বাগানের দিকে এগুলো। সুন্দর তাজা আনাজের বাগান। বাগানে অনেক রকমের আনাজ হয়ে আছে। যা খায়, তা গাছে ফলে জানত। কিন্তু গাছের জিনিস দেখতে যে এত ভালো লাগে জানত না। বাগানের কেনা জিনিসের এক চেহারা, এগুলোর আর এক। ওধারে বাঁধানো পুকুর একটা। আরো ভালো লাগল। পায়ে স্যান্ডাল নেই ভুলে যশোমতী তাড়াতাড়ি সেদিকে এগুলো।

কিন্তু একটু গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল। এত সকালের পুকুরে কাউকে চান করতে দেখবে ভাবেনি। দাঁড়িয়ে চান নয়, মনের আনন্দে সাঁতার কাটছে আর জলে ভাসছে শঙ্কর সারাভাই। ঋজু, পরিপুষ্ট দেহ জলের ওপর যেন কখনো চঞ্চল কখনো বা শিথিল অবকাশ-বিনোদনে রত। যশোমতী যে ভব্যতার আবহাওয়ায় মানুষ, তার চলে আসা উচিত, ফিরে আসা উচিত। তাদের ঘরের পুরুষেরাও স্নানের পর গায়ে জামা না চড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরোয় না। কিন্তু স্থান-কাল ভুলে সে দাঁড়িয়েই রইল, আর চেয়েই রইল।

সাঁতারের পর ঘাটের কাছে এসে নিটোল পুষ্ট দুই হাতে গাত্র-মার্জনা শুরু হল। শক্ত হাতের তাড়নায় পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। প্রথম সূর্যের আলো পড়েছে লোকটার মুখে। যশোমতী আরো অবাক, গালে মুখে কালকের সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর নেই, চানের আগে এরই মধ্যে কখন দাড়ি কামানোও হয়ে গেছে। রীতিমতো সুশ্রী দেখাচ্ছে ঝাঁকড়া চুলে ঢাকা মুখখানা।

পুরুষের মূর্তি...

পুরুষের এই মূর্তি কি যশোমতী আর দেখেছে?

রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে ক্ষুদ্রকায় রাজুর আবির্ভাব। হারানো প্রিয়জনের সন্ধান মিলেছে যেন।—মাসি, তুমি এখানে! আমি আর মা সেই থেকে তোমাকে খুঁজছি!

যশোমতীর সমস্ত মুখ পলকে রাঙা। আরো নাজেহাল অবস্থা ভাগ্নের কলকণ্ঠ শুনে অদূরে স্নান যে করছে সে ফিরে তাকাতে। যশোমতী পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু বিপদের ওপরে বিপদ, লোকটা হাতের ইশারায় কাছে ডাকছে। পালাবার মুখেও বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে গেল। দু'জনের কাকে যে ডাকছে ভাগ্নেকে না তাকেই—হঠাৎ ঠাওর করতে পারল না যশোমতী।

যে ডাকছে তার মুখে কোনরকম সঙ্কোচের চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না। এদিকে খুশির দূত ক্ষুদ্র সঙ্গীটি ততক্ষণে তার হাত ধরে ঘাটের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে—রাজুর যেন এই মুহূর্তে ওখানে না গেলেই নয়। বলছে, মামা এক ডুবে পুকুরটা এপার-ওপার করতে পারে, বুঝলে? দেখবো এসো—

না, ডাকছে ভাগ্নেকেই। যশোমতী সামনে এসে দাঁড়ানো সত্ত্বেও কোনরকম সঙ্কোচের লক্ষণ দেখল না, প্রশস্ত বুকের ওপর ভিজে গামছাটা পর্যন্ত ফেলল না। তার দিকে একবার তাকিয়ে ভাগ্নেকে বলল, চান করবি তো নাম—

মামাকে হঠাৎ এ-রকম উদার হতে দেখে ভাগ্নে অবাক একটু। পরক্ষণে আত্মহারা আনন্দে টেনে-হিঁচড়ে গায়ের জামাটা খুলে যশোমতীর হাতে দিয়ে তরতর করে জলে নেমে গেল। না মাথায় তেল, না গায়ে। জামা হাতে যশোমতী দাঁড়িয়ে রইল, ওদিকে ভাগ্নেকে উল্টে-পাল্টে চান করাতে লাগল শঙ্কর সারাভাই। তাদের দুজনেরই মুখে হাসি ধরে না।

একটু বাদে দিদিও হাজির।—দেখেছ কাণ্ড! এই সাত সকালে ছেলেটাকে ধরে চান করাতে লেগেছে!

তার মুখে কিন্তু অখুশির ছায়া দেখল না যশোমতী। রাতের বিরূপতা সকালে মুছে গেছে।

রাজুর ডাকে যশোমতী সচকিত।...মাসি তুমিও নেমে পড়ো না! সাঁতার জান না বুঝি? কিচ্ছু ভয় নেই, মামা জানে, ধরবে'-খন।

মামার ধমক শোনা গেল, ধ্যেৎ!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দিদির প্রস্থান। যশোমতীও দ্রুত অনুসরণ করে বাঁচল।

চানের পর অবশ্য সেই দুপুরের আগে আর শঙ্কর সারাভাইয়ের দেখা পেল না যশোমতী। স্কুলে দেখা করার ব্যাপারটা আজ যদি কোনোরকমে কাটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কি একটা উপলক্ষে পর

পর তিন দিন ছুটি। আজও দেখা করতে যেতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু জুতোর সমস্যা। গয়না না বেচা পর্যন্ত এক জোড়া স্যান্ডাল কেনারও উপায় নেই। তাছাড়া, বলা নেই কওয়া নেই, মুখ ফুটে এই একটা নগণ্য চাকরি চাইতে যাওয়ার যে মানসিক প্রস্তুতির দরকার, তাও নেই। মোট কথা, লোকটার ও-রকম জেরায় পড়ার আগে প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করার কথা সে কখনো ভাবেওনি। স্কুলের চাকরি যদি কোথাও করতেই হয় তাহলে এখান থেকে চলে গিয়ে কোনো হাইস্কুলে চেষ্টা করাই সঙ্গত।

কিন্তু এখানে থাকার ব্যাপারেও তো চক্ষুলজ্জা কম নয়।

সেই লজ্জার অবসান দিদিটিই করে দিল। সকালে মুড়ি দিয়ে জলযোগ সারার পর সঙ্কোচ-বিনম্র মুখে সমস্যাটা দিদির কাছে যশোমতীই ব্যক্ত করল। বলল, এ-রকম শূন্য হাতে স্কুলে এখন সে দেখা করবে না, তার থেকে আপাতত বরং তার ফিরে যাওয়াই ভালো। কারণ, কাজের সুবিধে হলে তখন স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে সময় চাওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু নানা কারণে ফেরার ইচ্ছে তার একটুও নেই, অনেক রকম ঝামেলায় পড়ার সম্ভাবনা। এখন দিদি যদি তার এক-আধখানা গয়না বিক্রি করার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়—তারপর সে ভেবে-চিন্তে যাহোক ঠিক করতে পারে। এ-সব গয়না তার দাদার দেওয়া নয়, বাবার দেওয়া আর হাতের টাকা চুরি গেছে যখন দুই-একখানা গয়না বিক্রি তো করতেই হবে, ইত্যাদি।

দিদি তার মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ শুনল। গায়ের গয়না লক্ষ করল। হাত দিয়ে হীরে-বসানো বালা দুটো নেড়েচেড়ে দেখল একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা খুব বড়ো অবস্থার লোক ছিল বুঝি?

ছিল শুনে যশোমতীর ভিতরটা খচ করে উঠল, ঢোঁক গিলে মাথা নাড়ল।

দিদি আবার বলল, এ-সব গয়না একখানাও কেনার লোক নেই এখানে। বিক্রি করতে হলে ট্রেনে চেপে ফিরে আবার শহরেই যেতে হবে। কিন্তু বাবার দেওয়া জিনিস তুমি বিক্রিই বা করতে চাও কেন? যে ক'দিন দরকার এখানেই থেকে চাকরির চেষ্টা করো, অবশ্য আমাদের এই গরীবের ঘরে তোমার খুব কষ্ট হবে।

যশোমতী তাড়াতাড়ি বাধা দিল, ও-কথা বার বার বললে আমাকে চলেই যেতে হবে দিদি, আমি যে অবস্থায় পড়েছি তার তুলনায় এ তো স্বর্গ।

দিদিটি মনে মনে খুশি হল। এরই মধ্যে একটা অভিলাষ তার মনে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে সেটা আর কেউ জানে না। ধীরে সুস্থে তার আগে অনেক কিছু জানার আছে, খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করার আছে।...হয় যদি ছোঁড়ার ভাগ্য। বলল, তাহলে আর কি, তুমি নিশ্চিন্ত মনে চাকরির চেষ্টা দেখো, তারপর শঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ করে যা-হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে, আর তোমার কি লাগবে তুমি আমাকে বোলো, বিহারীকে দিয়ে আনিয়ে দেব—তোমার হাতে টাকা এলে তখন শোধ করে দিও।

যশোমতী মাথা নাড়ল বটে, কিন্তু ব্যবস্থাটা মনঃপুত হল না খুব। টাকা কিছু হাতে এলে খরচ-বাবদ জোর করে দিদির হাতে কিছু গুঁজে দিতে পারত। তাহলে ওই লোকের কাছে অন্তত সম্মান বাঁচে। আত্মীয়ের কাছ থেকে যে-ভাবে ধাপ্পা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করেছে শুনলো গত রাত্রিতে, তাতে ভাগ বসাবার রুচিও নেই ইচ্ছেও নেই। যার কাছে টাকার দাম, কোনো একসময় তাকে দিয়েই গয়না বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারবে ভেবে তখনকার মতো এ নিয়ে আর কথা বাড়ালো না যশোমতী।

মুখ কাঁচুমাচু করে পরের সমস্যার সম্মুখীন হল সে। বলল, কিন্তু আজই স্কুলে দেখা করতে যাব?...শরীরটা তেমন ভালো লাগছে না।

—তাহলে যেও না, আজই ছুটতে হবে তোমাকে কে বলেছে? স্কুলের লোকের সঙ্গে শঙ্করের আলাপও আছে, সে-ই না হয় তোমাকে নিয়ে যাবে'খন।

কিন্তু না গেলে শঙ্করবাবু যদি রাগ করেন?

ওর রাগের কথা ছেড়ে দাও, ওর রাগ আর রাজুর রাগ একরকমই।

বসে দিদিটির সঙ্গে গল্পে গল্পে আরো কিছু খবর জানা গেল এরপর। ফলে যশোমতীর আশা বাড়ল, কিছু সঙ্কোচও দূর হল। যেমন, মেয়েদের প্রাইমারি স্কুলটাকে হাইস্কুল করার চেষ্টা হচ্ছে। হয়ে

যাবে হয়তো শিগগীরই। অনেকে এ-জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। আর ছোটখাট গানের স্কুলও আছে এখানে একটা—সেটাকে বড়ো করে তোলার খুব তোড়জোড় চলছে, কারণ, এই দেশে তো গানের ভক্ত বলতে গেলে সবাই। কে একজন নাকি মোটা টাকা দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। দিদির অবশ্য ও-সব গান খুব ভালো লাগে না, দুই-একটা ঠাকুর-দেবতার গান শুনলে বরং কান জুড়োয়।

যশোমতী ভালো করে বুঝে নিয়েছে, এই দিদিটিকে হাত করতে পারলে তার অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। অতএব সেই চেষ্টাই সর্বাগ্রগণ্য মনে হল তার। তক্ষুনি সবিনয়ে প্রস্তাব করল, আমি কিছু কিছু জানি দিদি, ঠাকুরের নাম করব একটু?

দিদি তাকালো আর সানন্দে মাথা নাড়ল। গলা না ছেড়েই একখানা ভজন গাইলো যশোমতী। দরদ দিয়েই গাইল। গান শেষ হতে দিদি হাঁ, ক্ষুদ্র রাজু হাঁ—আর অদূরে দাঁড়িয়ে বিহারী চাকরও মুগ্ধ। দিদি তো পারলে জড়িয়েই ধরে তাকে, বলল, আ-হা, এমন গুণের মেয়েকে কিনা চাকরির জন্যে ঘর ছেড়ে বেরুতে হয়েছে—তোমার দাদা মানুষ না কি!

গোবেচারী মুখ করে বসে রইল যশোমতী। দিদিটির মন দখলের ব্যাপারে আর একটা বড়ো ধাপ উত্তীর্ণ হওয়া গেল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতঃপর দিদির গল্প শোনায় মন দিল সে। এই জমি-জমা আর ঘরের মালিক দিদি নিজে। তার জমিতে ওই ফ্যাক্টরির ঘরটা শুধু শঙ্করের তোলা। এই সবই দিদির স্বামীর ছিল। জমি যা আছে তাই থেকে বছরের ধান এসে যায়, আর বাগানের তরি-তরকারী তো আছেই। কাজেই খাওয়ার ভাবনা তাদের খুব নেই।

শুনে মস্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল যশোমতী। এক অপ্রিয় প্রসঙ্গও মনে পড়েছে তক্ষুনি। মনে হয়েছে আত্মীয়ের কাছ থেকে লোকটার ধাপ্পা দিয়ে টাকা আনার কারণ তাহলে নিছক অনটনের দরুন নয়। আসলে স্বভাব আর টাকার লোভ। সকালে চানের ঘাটে যে দৃশ্য মিষ্টি অনুভূতির মতো মনে লেগে ছিল, তার ওপর বিরূপ ছায়া পড়-পড় হল একটা।

নিজের গল্প থেকে ক্রমে ভাইয়ের অর্থাৎ শঙ্কর সারাভাইয়ের প্রসঙ্গের দিকে ঘুরল দিদি। আর সেই বিরূপ ছায়াটা নিজের অগোচরেই সরে যেতে লাগল যশোমতীর মন থেকে। দিদির কথার সারমর্ম, ওই ভাইকে নিয়েই হয়েছে তার জ্বালা। এক দিদি ভিন্ন তাকে সামলাতে পারে এমন কেউ নেই। বি.এসসি. ভালো পাস করেছে, ভালো মাথা—ইচ্ছে করলেই একটা ভালো চাকরি করে সুখে থাকতে পারত, মেসো তো কতবার চাকরি নিয়ে সাধাসাধি করেছে—কোন্ এক মস্ত কাপড়ের কলে বড়ো চাকরি করে মেসো—তা ছেলে গোলামী করবে না কারো। আর যে মেজাজ, চাকরি করবে কি করে! নিজের নড়বড়ে ব্যবসা নিয়ে মেতে আছে, তিনদিন চলে তো চারদিন সব বন্ধ থাকে। একটু ভালো অর্ডার হাতে এলেই কি করে টাকা যোগাড় করবে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে। মূলধন না থাকলে অর্ডার পেলেই তো আর সাপ্লাই করা যায় না। তখন আর ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে না। ব্যবসা করে বড়ো হবে দিন-রাত খালি এই স্বপ্ন দেখে। বাবার আমলে উড়ুনচণ্ডী ছেলে ছিল, কিন্তু ব্যবসা শুরু করার পর থেকে একটা পয়সাকে সোনার চোখে দেখে।

দিদি যে মুখ করেই বলুক, ভাইয়ের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এই চেষ্টাটাকে খুব ছোটো করে দেখে বলে মনে হল না। বলা বাহুল্য, যশোমতীর ভালো লেগেছে, সবটুকুই কান পেতে শুনেছে। গত রাত্রিতেও লোকটারা শিক্ষা-দীক্ষা আছে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল তার।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে দুপুরে রাজুর হাত ধরে ফ্যাক্টরি দেখতে চলল সে। দুপুরে মানুষটা খেতেও আসেনি, বিহারী তার খাবার নিয়ে গেছে ওখানে। শুনেছে, কাজে মন দিলে এই রকমই নাকি হয়।

ফ্যাক্টরি বলতে টিনের শেড দেওয়া ওই জায়গাটুকুই। কাপড় বানানোর ব্যবসা শুনেই যশোমতীর কৌতূহল হয়েছিল। কিন্তু ভিতরের দশা দেখে তার চক্ষুস্থির। বাবার যে বিশাল মিল দেখে সে অভ্যস্ত সেই চোখে এটা দেখে তার হেসে সারা হওয়ার কথা। যশোমতী হেসেই ফেলেছিল প্রায়। কিন্তু তারপরেই তার দুঃখই হল একটু। এমন করেও কেউ অনর্থক উদ্যম নষ্ট করে!

শঙ্কর সারাভাই একবার দেখল তাকে। কিন্তু ভালো করে তাকানোর ফুরসত নেই। সে তখন কাজে ব্যস্ত। সর্বাঙ্গ দর-দর করে ঘামছে। গায়ে হাত-কাটা গেঞ্জি, পরনে আধময়লা পা-জামা। সে একাই মালিক আর একাই প্রধান শ্রমিক। সাহায্যের জন্য আছে পুরানো সাগরেদ বিহারী।

যশোমতী দেখছে চেয়ে চেয়ে। তার বাবার কলে শ'য়ে শ'য়ে লোক খাটতে দেখেছে। কিন্তু মেহনতী মানুষের এই মূর্তি সে যেন আর দেখেনি। পাওয়ার মেশিন চলছে, ভারী ভারী সরঞ্জাম নিজেই টেনে টেনে তুলছে, পরিপুষ্ট দুই বাহুর পেশীগুলো লোহার মতো উঁচিয়ে উঠছে এক-একবার।

আর নিষ্পলক চোখে পুরুষের রূপ দেখছে যশোমতী। কাজের সময় ক্ষুদ্রকায় চঞ্চল ভাগ্নেটি পর্যন্ত চুপ! এ সময় বিরক্ত করা চলবে না, মামা তাহলে রেগে যায়—সে-সম্বন্ধে যশোমতীকে সে আগেই সতর্ক করে রেখেছিল। কলের মূর্তির মতো মুখ বুজে এটাসেটা এগিয়ে দিচ্ছে বিহারী।

অনেকক্ষণ বাদে হয়তো একটু বিশ্রাম নেবার জন্যই গামছায় ঘাম মুছতে মুছতে শঙ্কর সারাভাই নিস্পৃহ মুখে যশোমতীর সামনে এসে দাঁড়াল। হাতল-ভাঙা একটা কাঠের চেয়ার দেখিয়ে বলল, বসুন। বসার মতো ঘরে আর দ্বিতীয় কিছু নেই।

যশোমতী বসল না, হাসিমুখে চেয়ারটার গায়ে একটু ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ফ্যাক্টরি প্রসঙ্গে দুটো প্রশংসার কথা বললে হয়তো খুশি হবে, কিন্তু বলার মতো কিছু মাথায় এলো না। সে-চেষ্টার আগেই ভাগ্নেটি একটা সুসমাচার জ্ঞাপন করল মামাকে। সোৎসাহে বলে উঠল, মামা, মাসি বলেছে আমাকে একটা সত্যিকারের কলের মোটরগাড়ি কিনে দেবে আর একটা সত্যিকারের তিন চাকার সাইকেল কিনে দেবে!

গেল বছর মায়ের সঙ্গে সাবরমতীর দেব-উঠি-আগিয়ারস্-এর মেলায় গিয়ে সেই বড়ো শহরের দোকানে এই দুটি দুর্লভ জিনিস দেখার পর দুনিয়ায় এর থেকে বেশি কাম্য জিনিস আর কিছু নেই মনে হয়েছে রাজুর। অন্তরঙ্গ আলাপের ফাঁকে সেটা বোঝামাত্র অবস্থা ভুলে যশোমতী তাকে কথা দিয়ে বসেছিল ওই দুটো জিনিসই কিনে দেবে।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সমাচারটা বেখাপ্পা শোনালো। আরো বেখাপ্পা শোনালো এই জন্যে যে, ভাগ্নের আনন্দ দেখে মামাটি যে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকালো যশোমতীর দিকে, তার অর্থ, সে যেন এই হাস্যকর ব্যবসাকে বড়ো মিলে দাঁড় করানোর থেকেও অসম্ভব কিছু আশ্বাস দিয়েছে ওই শিশুকে। এখানে এসব কথা নিয়ে উৎসাহ বোধ করার সময় কম তার। তবু টিপ্পনীর সুরেই জিজ্ঞাসা করল, সকালে স্কুলে দেখা করতে না গিয়ে বেশ গান-টান করলেন শুনলাম।

একে ভাগ্নের আনন্দ-সমাচারের জবাবে ওই চাউনি, তারপর এই উক্তি। শোনামাত্র যশোমতীর ভিতরটা চিড়বিড় করে উঠল। আবার হাসিও পেয়ে গেল পরমুহূর্তে। ভদ্রলোকের অন্য রকম ভাবা অন্যায় কিছু নয়। তবু হালকা জবাব দেবার লোভ ছাড়া গেল না। গম্ভীর সে-ও। বলল, দিদি আমার গানের খুব প্রশংসা করছিলেন, আর ওই বিহারীরও খুব ভালো লেগেছে। আপনি তো শুনলেন না—

শঙ্করের ভালো লাগার কথা নয়, ভালো লাগলও না। মন আপাতত নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন। মেসোব কাছ থেকে যে টাকা এনেছে তার অনেকটাই অবশিষ্ট আছে এখনো। কাজের মধ্যেও তাই সকাল থেকে নতুন চেষ্টার ছক কাটছিল মনে মনে। যা ভাবছে তা করতে হলেও এ-টাকার কম করে বিশগুণ দরকার। তার ভগ্নাংশও পাওয়ার আশা দুরাশা। তবু মাথা খাটিয়ে এই টাকা দিয়েই আরো টাকা আনা যায় কিনা সেই অসম্ভব চিন্তাই তার মাথায় ঘুর-ঘুর করছে কেবল। তাই যশোমতীর কথায় কান গেল বটে, মন গেল না।

হালকা উক্তির কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে যশোমতী আর এক ধাপ এগলো।—স্কুলেই বা দেখা করতে যাই কি করে, কোথায় কি, আমি কিছু চিনি না জানি? সমস্ত দিনের মধ্যে আপনার তো দেখাই পাওয়া গেল না।

—তা আমি কি করব?

—দিদি বলছিলেন, আপনার চেনা-জানা আছে, যখন হয় আপনি নিয়ে যাবেন।

—আমি? আমি এখন আপনাকে নিয়ে নিয়ে চাকরির জন্যে ঘুরব? আমার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই!

—কি কাজ?

শঙ্কর সারাভাই নিজের মধ্যে ফিরে এলো এতক্ষণে। অর্থাৎ পিত্তি জ্বলার উপক্রম হল তার। গম্ভীর মুখে জবাব দিল, দিদির মাথা খারাপ হয়েছে। যা পারেন নিজে করুন গে, আমার দ্বারা আর কিছু হবে না, বুঝলেন? যথেষ্ট হয়েছে—

তার প্রতি পুরুষের এ-রকম নিস্পৃহতা এই বোধ করি প্রথম দেখছে যশোমতী। দিদির সঙ্গে সমস্ত সকাল গল্প করে মেজাজ কেন যেন অতিরিক্ত প্রসন্ন তার। এখনো কৌতুকই বোধ করল। ভালো মুখ করে বলল, কি যথেষ্ট হয়েছে? হবার মধ্যে তো আপনার দশ পয়সা বাস-ভাড়া খরচা হয়েছে আর ছ'আনা আট আনা ট্রেনের টিকিট ভাড়া—

তিনটাকা দু আনাকে ইচ্ছে করেই ছ' আনা আট আনায় দাঁড় করালো যশোমতী। আর হাতে-নাতে প্রত্যাশিত ফলও পেল। রুক্ষ জবাব শুনল, কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে ওটুকুর জন্যেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আপনি মস্ত বড়োলোক বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার কাছে ওই ছ'আনা আট আনারই অনেক দাম, বুঝলেন?

দুই ঠোঁটে হাসি চেপে মুখখানা যতখানি নিরীহ করে তোলা যায় সেই চেষ্টাই করছে যশোমতী। গতকাল বাস থেকে এ পর্যন্ত তিরিশ ঘণ্টাও পার হয়নি, তবু এ-রকম বিচিত্র যোগাযোগের ফলেই হয়তো অনেক স্বাভাবিক সঙ্কোচ অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে সে। পরিবেশ গুণে আর লোকটার মেজাজের গুণেও হয়তো সহজ হওয়া আরো সহজ হয়েছে। অম্লানবদনে বলে বসল, কিন্তু সেও তো আপনার নিজের নয়, কোন্ আত্মীয়ের কাছ থেকে ভাঁওতা দিয়ে টাকা এনেছেন শুনলাম।

বাস্, মামার এই মূর্তি দেখে ক্ষুদ্র ভাগ্নেটি পর্যন্ত মনে মনে শঙ্কিত। শঙ্কর সারাভাইয়ের গম্ভীর দৃষ্টি অদূরবর্তিনীর মুখের ওপর কেটে বসল যেন।—এ-রকম বলার মতো পরিচয় আপনার সঙ্গে আমার এখনো হয়নি বোধহয়।

যশোমতী ভয় পেয়েই মাথা নাড়ল যেন। বলল, না এখনো হয়নি। 'এখনো' কথাটার ওপর সামান্য একটু জোরও পড়ল।

শঙ্কর সারাভাইয়ের মেজাজ ঠিক রাখা শক্তই হয়ে উঠছে। খুব স্পষ্ট করে যশোমতীর কর্তব্য বুঝিয়ে দিল সে।—তাহলে আপনি দয়া করে এ-সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, নিজের ব্যবস্থাটা যত তাড়াতাড়ি হয় সেই চিন্তা করুন গে।

যশোমতী এবারও মাথা নাড়ল, অর্থাৎ তাই করবে। রুষ্ট গাম্ভীর্যে তাকে লক্ষ করে ভদ্রলোক কাজের দিকে পা বাড়াবার উদ্যোগ করতেই যশোমতী আবার বাধা দিল, কিন্তু একজন বিপন্ন মহিলার সঙ্গে আপনিও তো ভালো ব্যবহার করছেন না। শঙ্কর সারাভাইর সপ্রশ্ন চোখে চোখ রেখে গম্ভীর মুখে বলল, দিদির কাছে শুনলাম এখানে নাকি গানের স্কুলও হবে একটা আর প্রাইমারি স্কুল হাইস্কুল হয়ে যাবে—এ-সব খবর আপনি বলেননি তো।

—হাইস্কুল হবে তাতে কি?

—হলে প্রাইমারিতে ঢুকব কেন?

জবাবে শঙ্কর সারাভাই ঠেস দিয়ে বলল, হাইস্কুলে চাকরি করতে হলে কোয়ালিফিকেশনও একটু হওয়া দরকার, বুঝলেন? প্রাইমারির কোয়ালিফিকেশনে হয় না—

—কি রকম হাই হওয়া দরকার, ডক্টরেট-টক্টরেট?

বিরক্তি সত্ত্বেও কথার ধরনে কেমন খটকা লাগল শঙ্করের। এ যেন ঠিক সামান্য পড়াশুনা করা মেয়ের উক্তি নয়। ফিরে আবার দেখল একটু।—আপনি কি পাস?

—আপনার থেকে একটু বেশিই হবে—ফিলসফি অনার্স নিয়ে বি. এ.পাস করেছিলাম, এবারে এম. এ. দেবার কথা ছিল। এতে হাইস্কুলের চাকরি হবে না?

বিশ্বাস করবে কি করবে না শঙ্কর সারাভাই ভেবে পেল না কয়েক মুহূর্ত। খোঁচা খেয়েও মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। সেই অবকাশে দিদির আবির্ভাব। যশোমতী সচকিত। ওদিকে মাকে দেখামাত্র রাজু মামার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল, মা মাসির সঙ্গে মামা ঝগড়া করছিল!

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি এসেই গেল এবারে যশোমতীর। আর রাগতে গিয়ে শঙ্করও হেসে ফেলল। ওদিকে দিদি দুজনকেই নিরীক্ষণ করল একবার। তার কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল, ভাই আগে থেকেই হয়তো বা চেনে এই মেয়েকে, তাই বিপদে পড়েছে শুনে একেবারে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। ঝগড়ার কথা শুনে সন্দেহটা আরো পাকা হল।

হেসে বলল, তোরই তো মামা, ঝগড়া করবে না? কি হয়েছে?

প্রশ্নটা যশোমতীর দিকে চেয়ে। যশোমতী হাসিমুখেই মাথা নাড়ল, কিছু হয়নি। শঙ্কর ভাগ্নের উদ্দেশ্যে চোখ পাকালো, এই পাজী, কি ঝগড়া করেছি?

দিদি মন্তব্য করল, বলেছিস কিছু নিশ্চয়, নয়তো ও বলবে কেন? ভালো কথা, যা বলতে এলাম—তোর কাজ শেষ হয়েছে না হয়নি?

—কেন? শঙ্কর সন্দিগ্ধ।

—একবার বাজারে বেরুতে হবে না? লীলার জন্যে একজোড়া শাড়ি কিনে নিয়ে আয়, ওই একখানা শাড়িতেই চলবে নাকি, তাও ভালো শাড়ি—লোকের সঙ্গে দেখাশুনা করার জন্যেও ওটা তুলে রাখা দরকার। বাড়িতে পরার জন্য তুই একজোড়া কিনে নিয়ে আয়, তারপর তোর সময়মতো নিজে হাতে একজোড়া ভালো শাড়ি বানিয়ে দিস। বক্তব্য শেষ করে দিদি যশোমতীর দিকে ফিরল। ভাইয়ের প্রশংসা করতেও কার্পণ্য করল না। বলল, ইচ্ছে করলে ও নিজেই খুব ভালো শাড়ি বানাতে পারে, দেখবে'খন—

সে-ই যে লীলা নিজেরই খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতে সঙ্কোচে আড়ষ্ট। আর দিদির কথা শোনার পর যে মুখ হল ভদ্রলোকের, তাও দেখার মতোই।

শঙ্কর সারাভাই আকাশ থেকেই পড়ল বুঝি। চিরাচরিত অনুভূতিটা সামলে নিতে সময় লাগল একটু। গম্ভীর মুখে একবার যশোমতীর দিকে তাকিয়ে দিদির মুখোমুখি হল সে।—দু' জোড়া মানে চারটে শাড়ি লাগবে? তা কত দিনের ব্যবস্থা?

ভাইয়ের মেজাজ তেতেছে বুঝেছে, কিন্তু বক্তব্যটা কি দিদির ঠিক বোধগম্য হল না। জিজ্ঞাসা করল, কি বলছিস?

—বলছি, উনি কতদিন থাকবেন এখানে?

এ ধরনের উক্তির সঙ্গে দিদি পরিচিত। কিন্তু ইচ্ছে করেই অর্থাৎ সব জেনে-শুনেও মেয়েটাকে লজ্জা দিচ্ছে ভেবে বিরক্তও। বলল, তোর যেমন কথার ছিরি, কাজের চেষ্টায় নিয়ে এলি আর ভালো রকম চেষ্টা-চরিত্র না করেই ওই দাদার বাড়িতে ফিরে যাবে আবার! নাকি গেলে ওই দাদা এরপর আর একটুও ভালো ব্যবহার করবে ওর সঙ্গে? ব্যবস্থার কথা তোকে কিছু ভাবতে হবে না, লীলার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে—তোকে যা বললাম্ কর, টাকা আমিই দেব'খন, খরচের কথা শুনলেই তোর ভদ্রতাজ্ঞান পর্যন্ত থাকে না।

দিদি চলে গেল। শঙ্কর সারাভাই তখনো ভেবে পেল না, মাত্র একদিনের পরিচয়ের এক বিপদগ্রস্ত অজানা মেয়ে দিদির এরকম আপন হয়ে গেল কি করে। দু-চার মুহূর্ত আবার তাকে নিরীক্ষণ করে কাজের দিকে এগিয়ে গেল সে।

যশোমতী বিব্রত বোধ করছে বটে, আবার পরিস্থিতিগুণে মজাও পাচ্ছে। রাজুর হাত ধরে পায়ে পায়ে সে-ও সেদিকে এগলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাজের বহর দেখল একটু। সে-যে আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ করেও করছে না। অতএব যশোমতী তাকে ডেকেই বলল, শুনুন, এভাবে আপনাদের ঘাড়ের ওপর বসে থাকার ইচ্ছে সত্যিই আমার নেই—যদি সরাতে চান তো আগে আমার একটা কাজের যোগাড় করে দিন। যে-ভাবে চলে এসেছি, বাড়ি ফেরা সত্যিই আর এখন সম্ভব নয়। আর, আপনাকে একটা কথা বলছি, ঋণ রাখার অভ্যেস নেই, আপনারা যা করেছেন সেটা অবশ্য শোধ করা যাবে না—কিন্তু টাকার ঋণ থাকবে না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

টাকার প্রসঙ্গ উঠতে শঙ্কর উষ্ণ হয়ে উঠল, কারণ, এটা সে ঠেস বলেই ধরে নিল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। তার আগেই রাজুর হাত ধরে মন্থর পায়ে প্রস্থান করল যশোমতী। কাজ ফেলে শঙ্কর

সারাভাই সেদিকে চেয়েই রইল। মেয়েটির কথাবার্তা হাবভাব, আচরণ সবই অদ্ভুত লাগছে তার। ইচ্ছে থাকলেও খুব যেন অবজ্ঞা করা যায় না। এম. এ পরীক্ষা দেবার কথা ছিল শোনার পর আরো ধাঁধায় পড়ে গেছে সে। অনার্স নিয়ে বি.এ.পাস করার পর শহর ছেড়ে চাকরির খোঁজে এ-রকম একটা জায়গায় আসবে কেন! হতে পারে দাদার কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়, তাহলেও মেয়েদের হাইস্কুল তো অনেক জায়গাতেই আছে, তার বদলে এলো প্রাইমারি স্কুলের চাকরির চেষ্টায়।

শঙ্করের সবই দুর্বোধ্য লাগছে।

কাজে আর মন বসল না। জোরালো আলোর অভাবে ভালো করে বিকেল না হতে এখানকার আলোয় টান ধরে। বিহারীকে সব গুছিয়ে রাখতে বলে সাবান হাতে পুকুর ধারে চলে এলো। মুখ-হাত ভালো করে ধুয়ে ঘরে ফিরল। রাজুর বা তার ভুইফোঁড় মাসির কাউকে এদিকে দেখল না। জামা-কাপড় বদলে বেরিয়ে পড়ল সে। দুই একজনের সঙ্গে দেখা করে, লাভের অংশ দিয়েও যদি কিছু টাকা আনতে পারে।

সুরাহা হল না। টাকা দেবার নামেই মাথায় আকাশ ভাঙে সকলের। তবু সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরল যখন, একজোড়া শাড়ি হাতে করেই ফিরল। কিন্তু দাওয়ায় ঢোকার আগেই গান কানে এসেছে। ভক্তিমূলক গান। শঙ্কর দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। ব্যবসা নিয়ে নাকানি-চোবানি খাবার পর থেকে মন দিয়ে একটা আস্ত গানও কখনো শুনেছে কিনা সন্দেহ। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এই গান যেন স্নায়ু-জুড়ানো স্পর্শের মতো। এই অনুভূতিটা নতুন। দিদির অনুরোধেই আর একখানা গানও হল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শঙ্কর সেটাও শুনল।

তারপর ভিতরে এসে দাঁড়াল। ঘরের বাইরের দাওয়ায় বসে গান হচ্ছিল। শুধু দিদি আর রাজু নয়, সমঝদার শ্রোতার মতো অদূরে বিহারীও বসে গেছে।

তাকে দেখে দিদি বলল, তুই তো একবারও শুনলি না, আহা, বোনের আমার খাসা মিষ্টি গলা, আর কি দরদ! ওকে একখানা শোনাও না।

যশোমতী হাসিমুখেই অনুরোধ নাকচ করে দিল, বলল, গান সকলের ভালো লাগে না দিদি, আজ থাক্।

ওদিক থেকে বিহারী উঠে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করল, দাদাভাই ছেলেবেলায় খুব গলা ছেড়ে গান করত, আধমাইল দূর থেকে শোনা যেত। বড়ো হয়ে গান ভুলেছে।

দিদি হেসে উঠল।—সত্যি, কি গানই করত, কান ঝালাপালা। কাপড় আনলি?

পুঁটলিটা দিদির হাতে দিয়ে শঙ্কর চুপচাপ ঘরে ঢুকে গেল। দিদি সেটা খুলে হারিকেনের স্বল্প আলোয় শাড়ি-জোড়া আগে পরখ করে নিল, রাগের মাথায় কি এনে হাজির করেছে সেই সংশয়। দেখে অপছন্দ হল না। শাড়ি জোড়া যশোমতীর দিকে এগিয়ে দিল।—নাও।

রাজ্যের সঙ্কোচ আবার। তবু হাত বাড়িয়ে নিতে হল শাড়িজোড়া। না নিয়েই বা করবে কি। কিন্তু নেবার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত রোমাঞ্চকর অনুভূতি কি একটা। জীবনে পাওয়ার দিকটা তার এত প্রশস্ত যে সামান্য দু'খানা আট-পৌরে শাড়ি হাতে নেবার এই প্রতিক্রিয়া নিজের কাছেই বিস্ময়কর।

ঘরে বসে ভাবছে যশোমতী। কপাল-গুণে একটা ভালো জায়গাতেই সে এসে পড়েছে। কিন্তু বাড়ি-ঘর ছেড়ে এসে মাঝখান থেকে এই জায়গায় আঁকড়ে পড়ে থাকবে? কি করবে? চাকরি পেলেই বা থাকবে কোথায়?

—লীলা, খেতে এসো। ওদিক থেকে দিদির গলা কানে এলো।

যশোমতী আবারও খেয়াল করল না যে এখানে সে লীলা হয়ে বসেছে।...ভাবছে দুপুরের দিকে ওদিকের কোন্ বাড়ির বউ এসেছিল—যার কাছ থেকে শাড়ি ধার করা হয়েছিল। শাড়ি চেয়ে পাঠানোর ফলেই আসার কৌতূহল হয়েছিল কিনা কে জানে। যশোমতীকে দেখে অবাকই হয়েছিল বউটি, জিজ্ঞাসাও করেছিল, কে। দিদি তার সামনেই চট করে পরিচয় দিয়েছিল, তাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। স্কুলে চাকরির চেষ্টায় এসেছে—

কিন্তু আত্মীয় হলেও বা চাকরির চেষ্টায় এলেও এক শাড়ি নিয়ে কেউ এক জায়গা থেকে আর এক-জায়গায় আসে কেমন করে তাই বউটির কাছে খুব স্পষ্ট হয়নি।

—লীলা, খাবে এসো।

দিদির দ্বিতয়বারের ডাকও কানে গেছে। কিন্তু সেই-ই যে লীলা, এই ভাবনার মধ্যে পড়ে এবারেও সচেতন হল না। নিজের এলোমেলো চিন্তায় তন্ময় সে।...গত রাত্রিতে এই ঘরে একা থাকতে তার কেমন ভয়-ভয় করছিল। আজ ভাবছে দিদিকে বলে রাজুকে এ ঘরে নিয়ে আসবে কি না। তাছাড়া আর একটা কথা ভেবেও তার সঙ্কোচ হচ্ছে। ওই ভদ্রলোকের ঘর এটা, সে ঘর দখল করার ফলে ঘরের মালিককে তার ফ্যাক্টরির ঘরে বিহারীর সঙ্গে জায়গা করে নিতে হয়েছে। কিন্তু দিদির ঘরে গিয়ে ভাগাভাগি করে থাকতেও মন সায় দেয় না। কি করবে যশোমতী?

—লীলা, খাবে না? দোরগোড়ায় দিদি এসে দাঁড়িয়েছে।

ধড়মড় করে চৌকি ছেড়ে নেমে দাঁড়াল যশোমতী। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমাকে বলছেন?

দিদি বিস্মিত। আর যশোমতী মনে মনে অপ্রস্তুতের একশেষ। নিজের নতুন নাম নিয়ে তৃতীয়বার গণ্ডগোল। দিদি সস্নেহে বলল, কি অত আকাশপাতাল ভাবছ? এসে যখন পড়েছ—সব ঠিক হয়ে যাবে, খাবে এসো।

বাইরে এসে দেখল, ভদ্রলোকটিও খাওয়ার আসনে বসে নিঃশব্দে তাকে লক্ষ করছে। অর্থাৎ, সে যে বিলক্ষণ ভাবনা-চিন্তার মধ্যে পড়েছে ধরে নিয়েছে। নাম নিয়ে গণ্ডগোলটা মাথায় আসার কথা নয় বলেই রক্ষা।

আগের দিনের মতোই খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল যশোমতীর। পাশে রাজু শুয়ে, তাকে ঠেলে তুলল। তারপর মুখ হাত ধুয়ে দু'জনে চলল, বাগান পেরিয়ে পুকুরঘাটের দিকে। রাত্রিতেই রাজুর কাছে শুনেছিল, মামা রোজ ওই সময়ে পুকুরে চান করে।

শুধু এটুকু দেখার জন্যেই যে আসা, সেটা স্বীকার করতে যশোমতীর নিজের কাছেই লজ্জা।

আজকের দেখাটা আরো একটু সহজ হল। চান যে করছে তার যখন ভ্রূক্ষেপ নেই, সে মাঝখান থেকে লজ্জা পেতে যায় কেন। আজও মামা-ভাগ্নের ঘটা করে চান হল। যশোমতী দেখছে, হাসছে—তার ভালো লাগছে।

কিন্তু সেদিন আর সে ফ্যাক্টরিতে গেল না ইচ্ছে করেই। মিছিমিছি ভদ্রলোকের কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে লাভ কি। ফলে আবার দেখা সেই সন্ধ্যার পরে। হাব-ভাব দেখে যশোমতীর মনে হল গান শোনার ইচ্ছে। দিদি ইতিমধ্যে দুই-একবার গান গাইতে বলেছে, বিহারীও আশায় আশায় কাছেই ঘুরঘুর করছে। গান করার জন্য প্রস্তুতও ছিল বলতে গেলে। কিন্তু কি খেয়াল চাপল মাথায়, যশোমতী দিদিকে বলে বসল, আজ থাক, শরীরটা ভালো লাগছে না।

দিদি ব্যস্ত হয়ে উঠল, থাক তাহলে। কি খারাপ লাগছে, নতুন জায়গায় জ্বর-জ্বালা এলো না তো? বলে কপালে হাত ঠেকালো।—না গা তো ঠাণ্ডাই।

আর একটু পরেই দেখা গেল গম্ভীর মুখে শঙ্কর সারাভাই বেরিয়ে গেল। যশোমতীর তখনই অনুশোচনা হল একটু, গাইলে হত। কিন্তু মনে মনে কেন যেন খুশিও আবার।

পরদিন শঙ্কর সারাভাইকে চানের ঘাটে দেখা গেল বটে, কিন্তু চানের পর কারখানায় তার সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বিহারীকেও দেখা গেল কারখানা ছেড়ে এদিকেই ঘোরাঘুরি করছে। দিদির কাছে যশোমতী শুনল, কাজ এ-রকম অনেক দিনই বন্ধ থাকে। কখনো সড়কের ছোটোখাটো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতে হয় বলে, কখনো বা কাঁচা মালে টান পড়ে বলে। তাছাড়া, ভাঙা কল বিগড়ানো তো আছেই। আজ কি জন্যে ফ্যাক্টরি বন্ধ দিদি সঠিক করে বলতে পারল না।

যতবার 'ফ্যক্টরি' শব্দটা শোনে ততোবারই হাসি পায় যশোমতীর। আবার দুঃখও হয়।

শঙ্কর বাইরে থেকে ফিরল সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ। রাজুকে নিয়ে যশোমতী দিদির কাছে বসে ছিল। দিদি চাল বাছছে, আর যশোমতী বই-স্লেট নিয়ে রাজুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অক্ষর পরিচয়ের চেষ্টায় লেগেছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্কও হয়ে পড়ছে আবার।

কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়, শঙ্কর সারাভাই যেন বাতাসেই খবর ছুঁড়ল, সে জেনে এসেছে প্রাইমারি স্কুল বন্ধ থাকলেও সেখানকার কর্তাব্যক্তিটি আজ আপিসে আসছেন, অতএব এক্ষুনি তার সঙ্গে বেরুলে দেখা হতে পারে এবং চাকরির সম্বন্ধে কথাবার্তা হতে পারে।

খানিক আগেই দিদি আশ্বাস দিচ্ছিল, ঠাকুরের দয়ায় কিছু একটা ব্যবস্থা শিগগীরই হয়ে যাবে। তাই শোনামাত্র তাড়া দিল, যাও যাও, তৈরি হয়ে নাও তাহলে। ভাইয়ের দিকে ফিরল, তুই নিয়ে যাবি তো?

শঙ্কর জবাব দিল না। এই নীরবতার অর্থ অনুকূলই মনে হল যশোমতীর। নতুন উৎসাহে রাজুর বই-স্লেট রেখে তাড়াতাড়ি সে ঘরে ঢুকল। নিজের সেই একমাত্র শাড়ি-ব্লাউজ বদলে নিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। আর তারপরেই কি মনে পড়তে ধুপ করে চৌকিতে বসে পড়ল, এবং বসেই থাকল।

জুতো মাত্র এক পাটি।

তার দেরি দেখে দিদি ঘরে এলো, শঙ্করও দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দিদি অবাক, কি হল, বসে আছ যে, যাবে না?

বিব্রত মুখে যশোমতী দরজার দিকে তাকালো একবার, তারপর বলল, স্যান্ডেলের আর-এক পাটি পাচ্ছি না।

সমস্যাটা যে এই মুহূর্তের নয় সেটা ফাঁস করার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দিদি নিজেই তাড়াতাড়ি স্যান্ডেল খোঁজার উপক্রম করতে যশোমতীকে দ্বিধান্বিত মুখে আবার বলতে হল, পাওয়া যাবে না, প্রথম দিন স্যান্ডালজোড়া বাইরে ছিল, কুকুর-টুকুরে নিয়ে গেছে বোধহয় একটা—

সঙ্গে সঙ্গে বাইরের লোকটার মুখের যে পরিবর্তন দেখল, অন্যসময় হলে যশোমতী হয়ত তা উপভোগই করত। কিন্তু স্বার্থটা এখন তারই। তাই মনে হল, বিপদ যেন ষড়যন্ত্র করে একের পর এক এসে তার উপর চড়াও হচ্ছে। এ-সময়ে এই গণ্ডগোলে পড়ার কোনো মানে হয়! ওদিকে দিদিও বিপন্ন মুখে ভাইয়ের দিকে চেয়ে আছে। অর্থাৎ কি করা যেতে পারে তাই জানতে চাইছে।

দিদির এই চাউনিটাই যেন রাগের কারণ শঙ্কর সারাভাইয়ের। সরোষে বলে উঠল, এক পা বুঝে চলার মুরোদ নেই, এ-সব মেয়ে বাড়ি থেকে বেরোয় কেন! চাকরির চেষ্টায় বেরিয়ে আরো বিভ্রাট বাড়ানোর দরকার কি—ঘরে বসে থাকলেই তো পারে!

দিদি ঘরে না থাকলে যশোমতীরও পাল্টা রাগ হতে পারত, কিন্তু এখন অসহায় মুখটি করে দিদির দিকেই তাকালো সে। ফলে দিদি ব্যাপারটাকে সহজ করে নিতেই চেষ্টা করল, তোর যেমন কথা, রাগ করতে পারলেই হল—ওকি জানে, না গাঁয়ে আর এসেছে কখনো—ও কি করবে?

দ্বিগুণ তেতে উঠল শঙ্কর সারাভাই। গাঁয়ে কেন, শহরেও চমৎকার, পাশ থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে গেলেও হুঁশ থাকে না। তা আমিই বা কি করব, মাথায় করে জুতো নিয়ে আসতে ছুটব এখন?

—তোকে কিছু করতে হবে না। দিদি বেরিয়ে গেল, আর একটু পরেই নিজের বিবর্ণ স্যান্ডালজোড়া এনে হাজির করে বলল, এটা পরেই কাজ চালিয়ে এসো কোনরকমে। পায়ে হবে তো আবার...হবে বোধহয়। ভাইকে হুকুম করল, আসার সময় ওর জন্য দেখেশুনে একজোড়া স্যান্ডাল কিনে নিয়ে আসিস।

গরম চোখে ভাই দিদির দিকে তাকালো একবার, তারপর যশোমতীর দিকে। অর্থাৎ সহ্যেরও সীমা আছে একটা। কিন্তু দৃষ্টি বিশ্লেষণের জন্য অপেক্ষা না করে যশোমতী ততক্ষণে দিদির আধছেঁড়া স্যান্ডাল পায়ে গলিয়ে দাওয়ায় নেমে এসেছে।

পাশাপাশি যাচ্ছে দু'জনে। কম করে মিনিট সাত-আট সমনোযোগে রাস্তার দু'দিক দেখতে দেখতে চলল যশোমতী। মুখে একটিও কথা নেই। আড়চোখে তারপর পাশের গম্ভীর মূর্তিটি দেখল বার কয়েক, তারপর হঠাৎ যেন রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বলল, এমন দেশ কে জানত, মানুষ ছেড়ে কুকুরগুলো পর্যন্ত ভদ্রতা-জ্ঞান নেই একটু, মেয়েছেলের জুতো নিয়ে পালাল!

জবাবে শঙ্কর শুধু রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা।

কিন্তু তর্কের ফাঁক খুঁজছে যশোমতী। দম ফেটে এখন হাসিই পাচ্ছে তার। কিন্তু হেসে ফেললে পাশের লোকের ফিরে বাড়ির দিকে হাঁটার আশঙ্কা। গম্ভীর। একটু বাদে আবার বলল, কোনো মহিলা বিপদে পড়লে এমন চেঁচামেচি করে কেউ তাও জানতুম না। সবই বরাত, অমন একশো জোড়া জুতো খোয়া গেলেও বাড়িতে কেউ একটা কথা বলতে সাহস করত না।

শেষেরটুকু বলে ফেলে নিজেই সচকিত। বিপদ ঘটেই গেল বুঝি। সারাভাই মুখ খুলল এবার, বলল, এত কদরের বাড়ি ছেড়ে আপনি এলেন কেন তাহলে? তাছাড়া আপনার জুতো কুকুরে নিয়েছে আগেই জানতেন যখন, আগে বলেননি কেন?

প্রথম বিপজ্জনক প্রশ্নটার জবাব এড়ানোর তাগিদে কথায় ঝাঁঝ মেশাবার ফাঁকটুকু আঁকড়ে ধরল যশোমতী। —আগে বললে কি হত, খুশিতে আটখানা হয়ে আপনি জুতো আনতে ছুটতেন?

রাগের মাথায় শঙ্কর দাঁড়িয়ে গেল। ফলে যশোমতীও। নিঃশব্দ দৃষ্টি-বিনিময়। অর্থাৎ সে কিছু বললে যশোমতীও পাল্টা জবাব দেবেই। দেবার জন্য প্রস্তুত। ঘটা করে চোখ পাকিয়ে তাই বুঝিয়ে দিল। হাল ছেড়ে শঙ্কর সারাভাই হেসে ফেলল।

যশোমতীও।

স্কুলের আপিস-ঘর। দরোয়ান বসতে দিল তাদের। জানালো, কর্তাবাবু এখনো আসেননি, এক্ষুনি এসে পড়বেন।

দুজনে দুটো চেয়ারে বসল। শঙ্কর টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ তুলে নিল। তার অনুকরণে যশোমতীও আর একটা কাগজ তুলে নিল। চাকরির তদবিরে এসেছে, এবং না পেলে সমূহ বিপদ সেটা যেন এতক্ষণ ভুলেই ছিল। কিন্তু হাতের কাগজ খুলতেই সর্বাঙ্গে যেন তড়িত-প্রবাহের ঝাঁকুনি খেল একটা।

কাগজে যশোমতীর ছবি, আর বড় বড় হরফে তাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা! দ্বিতীয় দিনেই বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কারের জাল ফেলেছে। কাগজটা পুরনো তারিখের।

তার এই মূর্তি দেখে ফেললে শঙ্কর সারাভাই হয়তো ঘাবড়েই যেত। কিন্তু যশোমতীর মুখ তখন হাতের কাগজের আড়ালে। এমন আড়ালে যে চেষ্টা করেও দেখার উপায় নেই।

যশোমতী কি যে করবে ভেবে পেল না। ভদ্রলোকের হাতের ওই কাগজেও আছে কিনা কিছু কে জানে। দিশেহারাই হয়ে পড়ল সে। যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, এ-ছবি হয়তো তার চোখে আগেই পড়েছে। মনে হওয়া মাত্র স্কুলের ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়ে যাওয়াটাই যেন সব থেকে বড় বিভীষিকা।

কাগজ ছেড়ে যশোমতী দাঁড়িয়ে উঠল হঠাৎ। বলল, চলুন, বাড়ি যাব—

কাগজ সরিয়ে শঙ্কর সারাভাই আকাশ থেকে পড়ল। কি বলছে তাও যেন বোধগম্য হল না। এই মুখ দেখেও অবাক। ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল সে।

যশোমতী তাড়া দিল. কথা কানে যাচ্ছে? উঠুন, আমি এক্ষুনি বাড়ি যাব—আমার শরীর ভয়ানক খারাপ লাগছে।

হকচকিয়ে গেল শঙ্কর সারাভাই। মুখ হঠাৎ এত লাল দেখে আর এই উগ্র কণ্ঠস্বর শুনে ঘাবড়েই গেল। বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু খবর পাঠানো হয়েছে, ভদ্রলোকের সঙ্গে—

আঃ! আমি চাকরি করব না এখানে, চলুন শিগগীর!

এক ঝলক আগুনের ঝাপটা লাগল শঙ্কর সারাভাইয়ের চোখে-মুখে। কিছু বোঝার আগেই যশোমতী হন্‌হন্ করে দরজা পেরিয়ে এগিয়ে গেছে অনেকটা।

বিমূঢ় বিস্ময়ে শঙ্কর অনুসরণ করল।

খানিকটা পা চালিয়ে আসার পর ধরা গেল তাকে। মুখ স্বাভাবিক নয় তখনো। শঙ্কর ভয়ই পেয়েছে। গতকালও দিদিকে শরীর ভালো না বলেছিল মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, কি হল হঠাৎ বলুন তো, কি খারাপ লাগছে?

ক্ষোভের মাথায় যশোমতী বলে উঠল, সব খারাপ, সমস্ত দুনিয়াটা খারাপ লাগছে, বুঝলেন?

শঙ্কর রাগ করবে কি, দুর্ভাবনা ছেড়ে তার বিস্ময়েরও শেষ নেই। মুখ এখনো সেই রকমই লাল প্রায়। চুপচাপ একটু লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, হেঁটে যেতে পারবেন না রিকশা ডাকব?

যশোমতীর কেন যে রাগ কাকে বলবে? জবাব দিল, থাক, রিকশা ডাকলেই তো আপনার বাজে খরচ! পরে খোঁটা দিতে ছাড়বেন? আবারও এগিয়ে গেল সে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে হঠাৎ একটা সন্দেহ উকিঝুঁকি দিল শঙ্করের মনে। সন্দেহটা মনে আসার পর এই মুখ দেখে আর চলা দেখে এখন আর খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে না তার। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এসে চুপচাপ তার পাশে পাশে চলল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। একটু বাদে আচমকা জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার ডিগ্রীর সার্টিফিকেট-টার্টিফিকেটগুলো কোথায়?

এই মানসিক অবস্থায় এ-রকম একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না যশোমতী। থতমত খেল। মুখ ঘুরিয়ে তাকালো তার দিকে।—সার্টিফিকেট? আনিনি তো...

চট করে এও মাথায় এলো না যে বলবে, সার্টিফিকেটও ব্যাগের সঙ্গেই চুরি গেছে। এ-রকম প্রশ্ন কেন তাও ভাবার অবকাশ পেল না। নিছক সত্যি কথাটাই বলে ফেলেছে।

দৃষ্টি ঘোরালো শঙ্কর সারাভাইয়ের।—চাকরি কি আপনার মুখ দেখে হয়ে যাবে ভেবেছিলেন? স্কুলে চাকরির চেষ্টায় এসেছেন আর ডিগ্রীর সার্টিফিকেট সঙ্গে আনেননি?

আবার কিছু একটা বিড়ম্বনার মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে তাকে। যশোমতী মাথা নাড়ল শুধু। আনেনি।

একটু থেমে শঙ্কর প্রায় নির্লিপ্ত মুখেই জিজ্ঞাসা করল, আপনি সত্যিই বি. এ. পাস করেছেন?

কি! সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠল। রাগে আবার সেই রকমই মুখ লাল যশোমতীর।

শঙ্কর জবাবের প্রতীক্ষা করছে, সন্দেহ যখন হয়েছে রাগ-বিরাগের ধার ধারে না।

আবার ভেবে-চিন্তে জবাব দেবার ব্যাপারে ভুল হয়ে গেল যশোমতীর। সন্দেহটা স্পষ্ট হওয়া মাত্র মাথা আরো বিগড়েছে। বলে উঠল, আপনি ওখানকার মেয়ে-কলেজে চিঠি লিখে দেখুন সত্যি কি মিথ্যে, এম. এ-ও পড়েছি কিনা য়ুনিভার্সিটিতে লিখে জেনে নিতে পারেন—

পর মুহূর্তে খেয়াল হল, সত্যিই লেখে যদি, মিথ্যেই প্রমাণ হবে। কারণ, য়ুনিভার্সিটিতে অন্তত লীলা নায়েক বলে কেউ নেই, আর সত্যিকারের লীলা নায়েক আই. এ. পাশ করার আগেই বিয়ে করে পড়াশুনার পাট চুকিয়েছে। ফলে রাগের চোটে মাথা আবার খারাপ হবার দাখিল তার।

শঙ্কর সারাভাইয়ের দৃষ্টি পার্শ্ববর্তিনীর মুখের উপর থেকে নড়ছে না।—আপনি এ-ভাবে চলে এলেন কেন?

যোগ্য জবাব হাতড়ে না পাওয়ার ফলেও ক্রুদ্ধ যশোমতী।—বি. এ. অনার্স পাশ করে প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করব কেন?

—তাহলে আপনি দেখা করতে এলেন কেন?

—এমনি। প্রথমে ভেবেছিলাম করব, পরে মনে হল করব না। জটিলতা নিজেই পাকিয়ে তুলেছে। তাই কথার সুর আপনা থেকেই নরম একটু, বলল, আপনি বরং গানের স্কুল যেটা হবে সেখানে আগে থাকতে চেষ্টা করে দেখুন।

এবারে শঙ্করের ধৈর্য শেষ।—আমার দায় পড়েছে আপনার চাকরির চেষ্টায় ঘুরতে।

হঠাৎ যশোমতীর মনে হল, লোকটাকে আরো তাতিয়ে দিতে পারলেই এ-যাত্রা বাঁচোয়া। নইলে সন্দেহ আরো কোন্ পর্যায়ে গড়াবে ঠিক নেই।

দুর্বলতার জায়গা বেছে নিয়েই ঘা দিতে চেষ্টা করল।—দায় তো পড়েইছে, নইলে আপনার টাকা শোধ হবে কি করে?

শঙ্করও ঠাস করে জবাব দিল, আর শোধ হয়েছে! পুরুষের ওপর বসে খাওয়া আর পরা ছাড়া আপনাদের আর কোনো ক্ষমতা নেই, বুঝলেন?

বুঝলাম। কিন্তু পুরুষের ক্ষমতাও তো দেখছি, খাওয়া-পরা যোগাতেই বা ক'জন পারে!

রাগে মুখ সাদা শঙ্কর সারাভাইয়ের। সে ভেবে পায় না, এ-রকম অবস্থায় পরেও একটা মেয়ে এ-ভাবে কথা বলতে পারে কি করে।

আড়চোখে এক-একবার তাকে লক্ষ্য করছে যশোমতী, আর নিশ্চিন্ত বোধ করছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে জিজ্ঞাসা করল, দিদিকে কি বলবেন?

ঝাঁঝালো জবাব এলো, কি বলতে হবে সেটাও আপনি অনুগ্রহ করে বলে দিন।

একটু ভেবে অনুগ্রহ করে যেন বলে দিল যশোমতী।—বলবেন চাকরি হল না।

আর যদি জিজ্ঞাসা করে, কেন হল না?

বলবেন, প্রাইমারি স্কুলের পক্ষে ওভার-কোয়ালিফায়েড—এত বিদ্যে থাকলে অত ছোট স্কুলের চাকরি হয় না।

নিজেই বিস্মিত যশোমতী, কি যে আছে অদৃষ্টে কে জানে, রাগ-দুর্ভাবনা ভুলে হাসতেও পারল।

কিন্তু শঙ্করের হাসির মেজাজ নয় আপাতত। বলল, আপনার কোন্ কথাটা সত্যি আর কোন্‌টা সত্যি নয়, সেটা আমার কাছে একটুও স্পষ্ট নয়।

সঙ্গে সঙ্গে আবার অসহিষ্ণু মূর্তি যশোমতীর।—কে আপনাকে অত মাথা ঘামাতে বলেছে? দিদিকে আপনার যা খুশি বলুন গে যান, আমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে এই পর্যন্ত—সেটা যে আপনি সব সময়ে চাইছেন তা আমার বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। ব্যাগটা চুরি না গেলে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারতুম টাকার পরোয়া আমি করি কি না।

শঙ্কর সারাভাই চুপ। তার কেবলই মনে হতে লাগল এ-রকম মেয়ে সে জীবনে দেখেনি।

আট

বাড়ি ফিরে যশোমতী সত্যিই ভয়ে ভয়েই ছিল। কিন্তু লোকটা তাকে বাঁচিয়েই দিল মনে হয়। দিদি শুধু জানল, তার চাকরি হল না। আর সেটুকু শুনেই স্কুলের অজানা অচেনা কর্তাদের উদ্দেশে দিদি বিরূপ মন্তব্য করল দুই একটা। উল্টে যশোমতীকে সান্ত্বনা দিল, তুমি কিছু ভেব না, যা হোক কিছু হবেই। সম্ভাব্য গানের স্কুলের লোকেরা একবার তার গলা শুনলেই হয়তো তাড়াতাড়ি স্কুল শুরু করে দেবে। এই সঙ্গে স্যান্ডাল না কেনার জন্যেও ভাইকে কথা শুনতে হল।

একটা একটা করে দিন যায়। যশোমতীর মনে হয় এ-ভাবে থাকা উচিত নয়। বিবেকে লাগে। আবার এখান থেকে যাবার কথা ভাবতেও ভালো লাগে না। সকাল হলেই রাজুর হাত ধরে পুকুর-ঘাটে আসা চাই তার। এমনি রাত্রিতে বিছানায় শুয়েই সকালের ওই দেখার প্রতীক্ষায় থাকে।

তারপর যশোমতী বাগান পরিচর্যা করে খানিকক্ষণ। এও ভালো লাগে। এক-একদিন দিদি আসে, আর কাজের চাপ না থাকলে শঙ্কর সারাভাইও আসে। দুজনের খটাখটি লাগে অবশ্য, লাগে কারণ, ইচ্ছে করেই যশোমতী জ্বালাতন করে তাকে। তবু মনে হয়, রাগ হলেও লোকটা আগের মতো অত রূঢ় হতে পারে না।

বিশেষ করে দুপুরে কারখানা-ঘরে যেন তার প্রতীক্ষাতেই থাকে। কারখানা...যশোমতীর হাসিই পায়। বাবার কারখানা যদি একবার দেখত।

দুপুরে সেখানে হাজিরা দেওয়া নৈমিত্তিক কাজে দাঁড়িয়েছে যশোমতীর। ইদানীং আবার দুপুরের খাবারটা সে-ই নিয়ে যাচ্ছে। ঢেকে রাখতে বললে রীতিমত তাড়না শুরু করে দেয়, মুখ-হাত ধুয়ে শঙ্করকে খেতে বসতে হয়। বিকেলের চা নিয়েও সে-ই আসছে। এই চা নিয়েও সেদিন একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে।

যশোমতী বলে ফেলেছিল, কি যে জায়গা, একটু ভালো চা-ও মেলে না—এই চা গলা দিয়ে নামতে চায় না।

এ-বাড়িতে নিয়মিত চায়ের পাট ছিলই না। চা-বিহনে যশোমতীর দুই-একদিন মাথা ধরতে দিদি জানতে পেরে চায়ের ব্যবস্থা করেছে। শঙ্কর পেলে খায়, না পেলে খায় না। কিন্তু যশোমতী ভাবখানা এমন করল যেন এই লোকের জন্যেই চায়ের ব্যবস্থা।

দিদি অনেকবার ভাইকে বলেছে, মেয়েটার চাল-চলনে কথায়-বার্তায় আচার-আচরণে সর্বদাই মনে হয় বড় ঘরের মেয়ে। এমন কি বিহারীও বলেছে, নতুন দিদিমণি নিশ্চয় খুব বড় ঘরের মেয়ে ছিল। তাকেও কিছু দেবে-টেবে—এই রকম প্রতিশ্রুতি পেয়েছে হয়তো।

চায়ের প্রসঙ্গে শঙ্কর বলে বসল, ভালো চা কি করে পাওয়া যাবে, আপনার মতো ভালো অবস্থার লোক তো এখানে বেশি নেই।

যশোমতীও ঝপ করে বলে বসেছে, নেই সে-কথা সত্যি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে মনোভাব গোপন করতে চেষ্টা করেছে। —আমার কি অবস্থা আমি খুব ভালো জানি, সে-জন্যে অত খোঁটা দেবার দরকার কি!

কিন্তু দুপুর এলেই কে যেন টানে যশোমতীকে এখানে। কর্মরত মূর্তি দেখে পুরুষের। সংগ্রাম দেখে। কি অসম্ভব চেষ্টা, আর কতখানি আশা। এই কারখানা নাকি বড় হবে একদিন, মাথা উঁচিয়ে উঠবে। দিদির কাছে ভদ্রলোকের এই একমাত্র স্বপ্নের কথা শুনেছে, বিহারীর মুখেও শুনেছে। আর শুনেছে শঙ্কর সারাভাইয়ের নিজের মুখ থেকেও। বলেছে, একদিন এর এই চেহারা থাকবে না, দেখে নেবেন।

যশোমতীর বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু সে বিশ্বাস করতে চেয়েছে।

ইতিমধ্যে সত্যিই নিজের হাতে তাকে দুখানা শাড়ি বানিয়ে দিয়েছে শঙ্কর সারাভাই। কাপড় পাওয়ামাত্র মুখ লাল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এক অদম্য খুশির আবেগ অনুভব করেছে সে। শাড়ি অবশ্য দিদিই এনে দিয়েছিল তার হাতে।

কিন্তু শাড়ি হাতে নিয়েই যশোমতীর মনে হয়েছিল, যত্নের শাড়ি, অবজ্ঞার বা হেলা-ফেলার নয়। দুপুরে যখন ওই শাড়ির একখানা পরে এসেছে তখনো থেকে থেকে মুখ লাল হয়েছে। বলল, চমৎকার শাড়ি, আপনি এত ভালো তৈরি করতে পারেন?

হাসল শঙ্করও। বলল, সরঞ্জাম থাকলে এর থেকে অনেক ভালো তৈরি করতে পারি, নেই তার কি করা যাবে।

না থাকার খেদ যেন বুকের ভেতর থেকে উঠে এলো। সেই দিনই যশোমতী দিদির কাছে শুনেছিল, বিশ হাজার টাকা দেবে এমন একজন অংশীদার যোগাড় করার জন্য তার ভাই কত চেষ্টাই না করেছে—কিন্তু কে দেবে তাকে টাকা? ওই টাকা পেলেই নাকি কারখানার ভোল বদলে যেত।

কথায় কথায় যশোমতী সেই প্রসঙ্গই তুলল। অবাক হবার মতো করে জিজ্ঞাসা করল, মাত্র বিশ হাজার টাকা পেলেই আপনার সমস্ত সমস্যা মিটে যায়?

শঙ্কর সারাভাই জবাব দিতে যাচ্ছিল, বিশ হাজার টাকা একসঙ্গে দেখেছেন? তা না বলে হাসল। অতটা অভদ্র না হয়েও জব্দ করা যেতে পারে। হাল্কা শ্লেষে জবাব দিল, মাত্র। আপনি দেবেন?

হঠাৎ কি মনে পড়ল যশোমতীর। তার চোখে-মুখে উদ্দীপনার আভাস। সমস্যার সমাধান তো তার হাতের মুঠোয়। সাগ্রহে বলল, দিতে পারি না মনে করেন?

এ আলোচনা ভালো লাগছিল না শঙ্করের। হয়তো বড়ঘরের মেয়েই ছিল, তা বলে সদ্য বর্তমানের অবস্থা ভোলে কি করে? হেসেই টিপ্পনি কাটল, আপনি রাজুকে কি সব দেবেন বলেছেন, বিহারীও হয়তো কিছু পাবার আশ্বাস পেয়েছে, নইলে চোখ-কান বুজে ও এত প্রশংসা কারো করে না।...আমাকেও ওদের দলে ফেলাটা কি তার থেকেও একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

—না, যাচ্ছে না। যশোমতীর নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠল। আরো জোর দিয়ে বলল, দিতে পারি, আপনি যদি দিদিকে বা কাউকে কিছু না বলে দেন। নিজের দুটো হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিল।—এই দেখুন, আমার এই বালা দুটোর হীরেগুলোর দামই সাত-আট হাজার ছিল, আর হারের লকেটের এই একটা

হীরের দামই তার থেকে অনেক বেশি। তাছাড়া সোনা আছে, আংটি আছে, বিশ হাজার কেন, তার থেকে বেশিই হবে, আপনি চেষ্টা-চরিত্র করে দেখুন না কি পান, এগুলো দিয়ে আমি আর কি করব? আপনার কাজে লাগলে সার্থক হবে—

শঙ্কর সারাভাই বিস্ময়ে নির্বাক। গায়ের গয়নাগুলো এই প্রথম যেন লক্ষ্য করে দেখল সে। চোখ ঠিকরোবার মতই ঝকঝক করছে তার পরেও মুখে কথা নেই। যশোমতীকে দেখছে, গয়না দেখছে, —দুই-ই দেখছে। গয়নাগুলোর দাম এত হতে পারে, আর তা কেউ অনায়াসে খুলে দিতে চাইতে পারে, সে ভাবতেও পারে না।

যশোমতী আবার বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এসব আমার দাদার নয়, বাবার দেওয়া। এগুলো আমারই। এর জন্যে আপনাকে কারো কাছে কোনোদিন জবাবদিহি করতে হবে না। কাজ আরম্ভ হোক তো, তারপর বাকি টাকাও যোগাড় হয়ে যাবে। নেবেন তো?

শঙ্কর সারাভাই এই একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও লোভ দমন করেছে বটে, কিন্তু জীবনে সে যেন এক পরম বিস্ময়ের মুখোমুখি হয়েছে। সমস্ত রাত ঘুমুতে পারেনি। সে ভেবে পাচ্ছে না, সত্যিই কে তার ঘরে এসে উঠেছে। ওই একটা মাত্র প্রস্তাব যে তাকে কোন্ অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে গেছে তা শুধু সে-ই জানে। কারখানা দাঁড়াবে, কারখানা অনেক বড় হবে জীবনে এর বেশি কাম্য আর কিছু নেই। যে এতখানি দেবার জন্য এগিয়ে এলো, সে নিজে কখনো সরে যাবে না এ-রকম প্রতিশ্রুতি নিয়ে সত্যি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় কিনা, সেই প্রলোভনও মনে অনেকবার আনাগোনা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন থেকে সায় মেলেনি। শুধু প্রতিশ্রুতিটুকু আদায় করার লোভ বার বার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে।

কিন্তু এ চিন্তার খবর যশোমতী রাখে না। প্রস্তাব নাকচ করা হয়েছে এইটুকুই সে বুঝেছে, আর এই জন্যই সে ক্ষুণ্ণ মনে মনে।

জিজ্ঞাসা করেছে, নিতে আপনার আপত্তি কেন?

শঙ্কর সারাভাই হাসিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করেছে, আপনার গায়ের গয়না আমি নেব কেন?

তর্ক করতে গিয়েও যশোমতী হেসে ফেলেছিল, তবে কার গায়ের গয়না নেবেন?

শঙ্কর জবাব দিতে পারেনি। লোভ সামলে মুখ টিপে হেসেছে।

ছাড়বার পাত্রী নয় যশোমতী, গলায় ঝগড়ার সুর।—নেবেন না-ই বা কেন, আমি আপনার বাড়িতে চড়াও হয়ে বসেছি কি করে?

ঠাট্টার সুরেই শঙ্কর সারাভাই জবাব দিয়েছে, বসেছেন সে-কি আমার হাত? এই জবাবে পাছে অহিত হয় সেই জন্যেই আবার বলেছে, আমি গরীব বটে, কিন্তু মনটাকে গায়ের গয়না খুলে নেবার মতো গবীর ভাবা গেল না।

ক্ষুণ্ণ হলেও জবাব ভালো লেগেছিল যশোমতীর।

পরদিনই আবার আর এক প্রস্তাব নিয়ে সোৎসাহে হাজির সে। বলল, আচ্ছা, কট্ন্ চেম্বারের এগজিবিশনে শাড়ি পাঠান না কেন? তাদের বিচারে প্রথম হতে পারলেও তো পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়ে যাবেন?

শঙ্কর সারাভাই অবাক।—কট্ন্ চেম্বারের খবর আপনি রাখেন কি করে?

ছদ্মবিস্ময়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ টান করে ফেলে যশোমতী।—ও মা, কাগজে বেরোয়, কত ঘটা হয়, খবর রাখব না কেন? আমার এক বন্ধুর দাদাই তো একবার পেয়েছে।

মিথ্যে বলেনি। তবে বন্ধুর দাদার পুরস্কার পাওয়ার মধ্যে তারও যে পরোক্ষ হাত ছিল, সেটাই শুধু গোপন। পুরস্কার পাওয়ানোর জন্য বিচারকদের আগের থেকে বশ করতে হয়েছিল।

শঙ্কর সারাভাই জবাব দিল, আপনার বন্ধুর দাদার তাহলে মুরুব্বির জোর আছে। সাধারণ বেড়ালের বেলায় ওই ভাগ্যের শিকে ছেঁড়ে না।

—খুব ছেঁড়ে। এভাবে হাল্ ছাড়তে দিতে রাজি নয় যশোমতী।—আপনি চেষ্টা না করে বলছেন কেন? কখনো পাঠিয়েছেন? পাঠাননি? আচ্ছা, ও-সব ভাবনা ছেড়ে এবারে তাহলে খুব ভাল দেখে

একখানা শাড়ি পাঠান, কার কপালে কখন কি লেগে যায় কে বলতে পারে! আমার মন বলছে আপনিই পেয়ে যাবেন।

এ প্রস্তাবটা আগেরটির থেকেও অর্থাৎ গায়ের গয়না খুলে নিয়ে ব্যবসা বাড়ানোর চেষ্টার থেকেও অবাস্তব মনে হয়েছিল শঙ্কর সারাভাইয়ের। কিন্তু তবু ভাল লাগল। তার জন্যে এতখানি মন দিয়ে কেউ ভাবছে, এ-ই যেন এক দুর্লভ ব্যাপার। তবু, এ প্রস্তাবও হেসেই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল সে। বলল, মনে মনে আপনি নিজেই বিচারক হয়ে বসেছেন কিনা, তাই মন বলছে।

কিন্তু এই এক ব্যাপার নিয়ে যশোমতী রোজ উৎসাহ দিতে লাগল, রোজ তর্ক করা শুরু করল। আর এই প্রেরণাটুকুই হয়তো শঙ্কর সারাভাইয়ের নিজের অগোচরে মনের তলায় কাজ করতে লাগল। খুব অগোচরেও নয়। পুরস্কার পাক না পাক, তার শুকনো হতাশ মনটাকে যে চাঙা করে তুলতে পেরেছে এই প্রাপ্তিটুকুরও দুর্লভ স্বাদ। যশোমতীর উৎসাহ দেখে আর তার অবুঝ ঝোঁক দেখে শেষ পর্যন্ত তাকে খুশি করার জন্যেই যেন রাজি হল, এগজিবিশনের বিচারে শাড়ি পাঠাবে। পাঠানোটা খুব কঠিন ব্যাপার তো কিছু নয়, খুব ভেবে-চিন্তে খেটেখুটে করা।

এই নিয়েই তারপর দুজনের আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। আর, এই আলোচনার ফল সত্যিকারের কাজের দিকে গড়াতে লাগল। শঙ্কর সারাভাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, পাড়, আঁচল ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে জল্পনা-কল্পনাও এই মেয়ের মাথায় বেশ আসে। অন্তত অজ্ঞ বলা চলে না। এই বিস্ময়ই ক্রমশ তাকে আশার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কিনা কে জানে।

সেদিন শঙ্কর সারাভাই যশোমতীর নৈমিত্তিক তাগিদের ফলেই জানালো, সামনের পনেরো দিনের মধ্যেই দেব-উঠি-আগিয়ারস্ এর উৎসব, এই উৎসবের দিন সাবরমতীতে চান করে এবং পুজো দিয়ে রাত্রিতে কারখানার প্রথম কাজ শুরু করেছিল। অবশ্য তার ফল যে আশাপ্রদ হয়েছে তা নয়। তবু, সেই দিনটা এলেই নতুন করে আবার আনন্দ করতে ইচ্ছে করে...এগজিবিশনের শাড়ির ব্যাপারেও তাই করবে। খুব ভোরের ট্রেনে চলে যাবে, দুপুরের মধ্যে চান আর পুজো সেরে চলে আসবে, বিকেলে দুজনে একসঙ্গে পুরস্কারের শাড়ির কাজ শুরু করবে। প্রতি বছরেই ওই দিনটিতে সে নাকি সাবরমতীতে গিয়ে থাকে।

শুনে যশোমতী ভারী খুশি। পুরস্কারটা যে এবারে এখানেই আসবে তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই। ও কোথায় আছে না জানিয়ে বাবাকে যদি সে এই শাড়ির দিকে চোখ রাখার জন্যে একটা চিঠি শুধু লিখে দেয়, তাতেই কাজ হবে।...চিঠি লিখলে আবার ডাকের ছাপ দেখে হদিস পেয়ে ফেলতে পারে। দূরের কোনো জায়গা থেকে পোস্ট করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যাক, চিঠি লিখবে কি অন্য কিছু ব্যবস্থা করবে সেটা পরের ভাবনা, এখন দুর্গা বলে আরম্ভ তো করা যাক্।

কিন্তু ওপরওলার ইচ্ছে অন্যরকম।

বিকেলের দিকে রাজুর হাত ধরে যশোমতী এদিক-সেদিক বেড়াত একটু। সেদিন দেখল, দূর থেকে একজন লোক যেন তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে। লোকটার বয়েস বেশি নয়, চাউনিটাও যেন কি রকম।

বিরক্ত হয়ে সেদিন যশোমতী ঘরে চলে এলো। শহরে পুরুষের এই রোগ কম দেখেনি, গাঁয়ে ইতিমধ্যে আর এই উৎপাত ছিল না। পরদিন সকালে তরকারীর বাগানে ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই লোকটাকে দেখা গেল। বিকেলেও। যশোমতী রেগেই গেল, ভাবল শঙ্কর সারাভাইকে বলে দেবে। লোকটার নির্লজ্জতা স্পষ্ট। কিন্তু বলতে লজ্জা করল। দরকার হলে এ-রকম দু-একটা লোককে নিজেই টিট করতে পারে। বলল না। তবে বললে প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখার লোভ হয়েছিল।

বিরক্তির একশেষ। এর পরদিন অত সকালে মামা-ভাগ্নের চান দেখতে ঘাটে এসেও দেখে, অদূরে সেই লোক। তার দিকেই নিষ্পলক চেয়ে আছে।

এবারে হঠাৎ এক অজ্ঞাত সন্দেহ দেখা দিল যশোমতীর মনে। তাড়াতাড়ি সে বাড়িতে ঢুকে গেল।

কিন্তু দু'ঘণ্টার মধ্যে যশোমতী শঙ্কর সারাভাইয়ের দেখা পেল না। পেলেও তাকে কিছু বলত কিনা জানে না। রাজু বলল, একজন লোকের সঙ্গে মামা কি কাজে গেছে।

এমন প্রায়ই যায়। সন্দেহের কোনো কারণ ঘটল না তখনো। কিন্তু শঙ্কর সারাভাই ফিরল যখন, তার কথা শুনে যত না, তার মুখের দিকে চেয়ে অবাক সকলে। এমন কি পাঁচ বছরের রাজুও। মামার এত ব্যস্ততা আর বুঝি দেখেনি। শুধু ব্যস্ততা নয়, চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা।

এসেই খবর দিল যশোমতীর জন্য খুব একটা ভালো চাকরি যোগাড় হয়েছে, এখান থেকে মাইল পনেরো দূরে, ট্রেনে যেতে হবে এক্ষুনি, মেয়েদের হাইস্কুলের হেডমিস্ট্রেসের চাকরি। কথা-বার্তা এক-রকম পাকা হয়ে গেছে। ভালো মাইনে, থাকার বাসা পাওয়া যাবে, আধঘণ্টার মধ্যে রওনা না হলেই নয়।

শোনামাত্র দিদি আনন্দে আটখানা। কিন্তু তক্ষুনি মনে হল রান্না যে কিছুই হয়নি, মেয়ে খেয়ে যাবে কি? আর তারপরেই ভাইয়ের বুদ্ধি দেখে অবাক। হাতের ঠোঙা আর কাগজের বাক্স আগে লক্ষ্যই করেনি।

ঠোঙায় ভাল ভাল মিষ্টি। আর কাগজের বাক্সয় দামী স্যান্ডাল একজোড়া। যশোমতী পাথরের মতো স্তব্ধ হঠাৎ। শঙ্কর সারাভাইকে দেখছে। দেখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু যে ভাবে দেখতে চাইছে, দেখতে পারছে না। কারণ সে ব্যস্ত-সমস্ত। সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে না।

দিদি যশোমতীকে সাজগোজ করালো, জোর করে খাওয়ালো। তার এই নীরবতা বিচ্ছেদের দরুন বলেই ধরে নিল। নানাভাবে সান্ত্বনা দিল তাকে। রিকশা অপেক্ষা করছে। একটা নয়, দুটো। শঙ্কর সারাভাইয়ের আজ দরাজ হাত।

নির্বাক মূর্তির মতো যশোমতী রিকশায় এসে উঠল।

রিকশা চলল। বাড়ির দোরে দিদি দাঁড়িয়ে, রাজু দাঁড়িয়ে, বিহারী দাঁড়িয়ে। যশোমতী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তাদের একবার। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারল না, বা বলল না।

পাশের রিকশাটা ঠিক পাশে পাশে চলছে না। দু'চার হাত পিছিয়ে আছে। যশোমতী ফিরে তাকালো। কিন্তু তার সঙ্গী এদিকে ফিরছে না, অন্যদিকে চেয়ে আছে। তা সত্ত্বেও লোকটার মুখখানা যেন লালচে দেখাচ্ছে।

স্টেশন। যশোমতী দেখছে লোকটা হন্ত-দন্ত হয়ে টিকিট কেটে আনল। গাড়ির অপেক্ষায় যে পাঁচ-সাত মিনিট দাঁড়াতে হল, তখনো শঙ্কর সারাভাই সামনা-সামনি এলো না। দূরে দূরে ঘুরপাক খাচ্ছে। তখনো যেন অকারণেই ব্যস্ত সে। যশোমতীর আবারও মনে হল, কি এক চাপা উত্তেজনায় লোকটার সমস্ত মুখ জ্বলজ্বল করছে।

গাড়ি এলো। তারপরই যশোমতী আরো ঠাণ্ডা, আরো নির্বাক। সাদরে তাকে নিয়ে একটা ফার্স্টক্লাস কামরায় উঠে বসল শঙ্কর সারাভাই। সে কামরায় দ্বিতীয় লোক নেই।

গদির ওপরেই একটা কিছু পেতে দিতে পারলে ভালো হত যেন, আর কিছু না পেয়ে নিজের রুমালে করেই গদীটা ঝেড়ে মুছে দিল শঙ্কর সারাভাই।

বসুন—

যশোমতী বসল। বসে এবার সোজাসুজি দুটো চোখ তার মুখের ওপর আটকে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারা গেল না। লোকটা এখনো যেন ব্যস্ত। এদিক-ওদিক মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

যশোমতী দেখছে। দেখছে দেখছে দেখছে। যতখানি দেখা যায় দেখছে। চলন্ত গাড়ির ঝাঁকুনিতে দেহ দুলছে বটে, কিন্তু সে মূর্তির মতোই বসে আছে, আর নিষ্পলক চোখে দেখছে।

একটা স্টেশন এলো। একটা কথারও বিনিময় হয়নি। শঙ্কর সারাভাই তাড়াতাড়ি ঝুঁকে কাগজ কিনল একটা। তারপর গভীর মনোযোগে দৃষ্টিটা কাগজের দিকে ধরে রাখল।

যশোমতী দেখছে। গাড়ি চলছে।

—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

এত ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ প্রশ্ন যে চমকে উঠল শঙ্কর সারাভাই। হঠাৎ যেন জবাব খুঁজে পেল না।

গোটা মুখখানা দু'চোখের আওতায় আটকে রাখতে চেষ্টা করে ধীর অনুচ্চ স্বরে যশোমতী আবার জিজ্ঞাসা করল, ফার্স্টক্লাসে চড়ে আমরা কোথায় যাচ্ছি?

হাসল শঙ্কর সারাভাই। এ-রকম কৃত্রিম বিনীত হাসি আর দেখেনি যশোমতী। এ-রকম চাপা অস্বস্তি আর চাপা উদ্দীপনাও আর দেখেনি।

—চলুন না, কাছেই।

চেয়ে আছে যশোমতী।—পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে অনেক টাকা...কেমন?

কাগজের ওপর মুখ নেমে এসেছে শঙ্কর সারাভাইয়ের। তার উদ্দেশ্য গোপন নেই বোঝার ফলে প্রাণান্তকর অস্বস্তি।

একটু অপেক্ষা করে যশোমতী আবার বলল, আমি যদি পরের স্টেশনে নেমে যাই, আপনি কি করবেন?

চমকে তাকালো শঙ্কর সারাভাই। উত্তেজনা সামলে হাসল। বলল, আপনি সে চেষ্টা করবেন না জানি। তাহলে আমাকেও নামতে হবে, স্টেশনের লোককে বলতে হবে। মনে যা আছে খোলাখুলি ব্যক্ত করল এবার, বলল, আপনার বাবার কাছে লোক চলে গেছে, টেলিগ্রাম চলে গেছে, আর তারপরে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথাও হয়ে গেছে। এতক্ষণে তাঁরা সকলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন—তাঁরা জানেন এই গাড়িতে আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

যশোমতীর দেখার শেষ নেই। এতদিন যা দেখে এসেছে তা যেন সব ভুল।

—আপনার জীবনের তাহলে একটা হিল্লে হয়ে গেল, আর কোনো সমস্যা নেই?

শঙ্কর সারাভাই সানুনয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল তাকে, সে কিছু অন্যায় করছে না, দুদিন আগে হোক পরে হোক বাবার কাছে ফিরে যেতে তো হবেই তাকে। কাগজে ছবি দেখেই পাড়ার লোকের সন্দেহ হয়েছে, ক'দিন আর এভাবে থাকা যেত। রাগের মাথায় সে চলে এসেছে, ফিরে গেলে তার বাবা নিশ্চয় অনুতপ্ত হবেন, টেলিফোনে তো প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলেন ভদ্রলোক, তাছাড়া এভাবে বেরিয়ে এসে যে বিপদের ঝুঁকি যশোমতী নিয়েছিল সেটাও কম নয়, কত রকমের লোক আছে সংসারে।

কত রকমের লোক আছে সংসারে তাই যেন নিষ্পলক চেয়ে চেয়ে দেখছে যশোমতী। দেখছে, একটা স্টেশন এলেই অস্বস্তিতে ছটফট করছে লোকটা। আর তারপর আবার ট্রেন চলার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকার আলো দেখছে ওই মুখে।

সমস্তক্ষণ আর একটিও কথা বলল না যশোমতী। শুধু দেখল। একই ভাবে একই চোখে দেখে গেল।

গন্তব্য স্থানে ট্রেন এসে দাঁড়াল। আর তারপর শঙ্কর সারাভাই যেন হকচকিয়ে গেল কেমন। ছোট স্টেশনে বহুলোক এসেছে যশোমতীকে নিতে। মিল-মালিক আর কট্ন্ চেম্বারের প্রেসিডেন্ট চন্দ্রশেখর পাঠক এসেছে, আর তার স্ত্রী এসেছে, ছেলে ছেলের বউ এসেছে। রমেশ চতুর্বেদী, বীরেন্দ্র যোশী, বিশ্বনাথ যাজ্ঞিক, শিবাজী দেশাই, ত্রিবিক্রমও এসেছে। যশোমতীর অনেক বান্ধবীও এসেছে।

এই ব্যবস্থা যশোমতীর বাবা-মায়ের। স্টেশনে এসে মেয়ের কি মূর্তি দেখবে ভেবে ভরসা করে শুধু নিজেরা আসতে পারেনি। অনেক লোক দেখলে মেয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করবে। স্ত্রীর ব্যবস্থায় এবারে আর বাদ সাধেনি তার কর্তাটি।

তাই হল। গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে যশোমতীর এতক্ষণের মুখভাব বদলে গেল। হাসি-ভরা মুখেই নামল সে। আর তাই দেখে আত্মীয় পরিজনেরাও কলহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠল। বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, এমন কথা কেউ উচ্চারণও করল না। যেন অতি আদরের কেউ অনেকদিন বাদে অনেক দূর থেকে ফিরে এলো—সেই আনন্দ আর সেই অভ্যর্থনা।

হাসিমুখেই যশোমতী বাবা-মাকে প্রণাম করল, আর যারা এগিয়ে এলো তাদের কুশল সংবাদ নিল।

একপাশে দাঁড়িয়ে শঙ্কর সারাভাই চুপচাপ দেখছে। তার দিকে তাকানোর ফুরসত কারো নেই। এই মেয়ে তাদের গরীবের বাড়িতে এতদিন কাটিয়ে গেল এ-যেন আর ভাবা যাচ্ছে না।

ফিরে চলল সকলে। পায়ে পায়ে শঙ্করও এগোচ্ছে। তার মুখে সংশয়ের ছায়া। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ ফিরে তাকালো যশোমতী। তারপর বাবাকে কি বলতেই ভদ্রলোক শশব্যস্ত এবার

শঙ্করের দিকে এগোলো। সানন্দে তার দুই হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়েই থমকালো একটু।—তোমাকে...আপনাকে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে?

শঙ্কর সারাভাই মাথা নাড়ল। অর্থাৎ দেখেছে ঠিকই। দ্বিধা কাটিয়ে মেসোর পরিচয় দিল। এই বাড়তি পরিচয়টুকু পেয়ে চন্দ্রশেখর পাঠক উচ্ছ্বাস বর্ষণ করতে করতে তাকে একটা গাড়িতে তুলে দিল। নিজে সকন্যা আর সস্ত্রীক অন্য গাড়িতে উঠল। এখন আর বাড়ি ধাওয়া করা ঠিক হবে না ভেবে এক ছেলে-বউ ছাড়া অন্য সকলে স্টেশন থেকে বিদায় নিল।

আঙিনায় গাড়ি ঢুকতে শঙ্কর সারাভাইয়ের দুই চক্ষু বিস্ফারিত। বাড়িতে ঢুকল কি কোনো রাজপ্রাসাদে, হঠাৎ ঠাওর করে উঠতে পারল না।

গাড়ি থেকে নামতে যে প্রকাণ্ড হলঘরে তাকে নিয়ে যাওয়া হল, তার ব্যবস্থা আর সাজ-সরঞ্জাম দেখেও শঙ্কর সারাভাইয়ের চোখে পলক পড়ে না। কোন্ বাড়ির মেয়ে এতগুলো দিন তাদের ভাঙা ঘরে কাটিয়ে এলো, এখানে এসে বসামাত্র সেটা এখন ঘন ঘন মনে পড়তে লাগল।

ঘরে ঢুকেই যশোমতী ধুপ্ করে একটা সোফায় বসল। বাবা-মা দাদা-বউদি তখনো দাঁড়িয়ে। বসেই শঙ্করের দিকে তাকালো একবার। শঙ্কর সারাভাইয়ের মনে হল, চক্‌চকে দৃষ্টিটা যেন মুখের ওপর কেটে বসল হঠাৎ।

—আমার চেক-বই আনতে বলো।

কার উদ্দেশ্যে এই আদেশ যশোমতীর শঙ্কর বুঝে উঠল না। হুকুম শুনে বাবা বুঝল চেক বইয়ের দরকার কেন। বলল, তুই ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, আমি দেখছি--

দ্বিগুণ অসহিষ্ণুতায় ঝাঁঝিয়ে উঠল যশোমতী।—আমার চেক-বই আনতে বলো এক্ষুনি! যেটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম সেটা চুরি হয়ে গেছে, অন্য যা আছে আনতে বলো শিগ্‌গীর!

হন্তদন্ত হয়ে দাদাই ছুটল। শঙ্কর সারাভাইয়ের বুকের ভিতরটা দুরদুর্ করছে।

দু'মিনিটের মধ্যে দুটো চেক-বই হাতে নিয়ে দাদা ফিরল। যশোমতী সেই ট্রেনের মতোই স্তব্ধ এখন। একটা চেক-বই টেনে নিতেই বাবা তাড়াতাড়ি কলম খুলে ধরল তার সামনে।

খস্ খস্ করে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক লিখে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে যশোমতী ছুঁড়ে দিল সারাভাইয়ের দিকে।—এই নিন। ভালো করে দেখে নিন। তারপর চলে যান!

জ্বলন্ত চোখে এক পশলা আগুন ছড়িয়ে নিজেই সে দ্রুত ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল। চেকটা ছুঁড়ে দেওয়ায় সেটা মাটিতে গিয়ে পড়েছিল। গণেশ পাঠক সেটা তুলে নিয়ে বোবামূর্তি শঙ্কর সারাভাইয়ের হাতে দিল। বিমূঢ় মুখে চেকটা নিল সে। যশোমতীর মা তাড়াতাড়ি মেয়ের পিছনে পিছনে চলে গেল। বউদিও।

চন্দ্রশেখর পাঠক মেয়ের ব্যবহারে অপ্রস্তুত একটু। কাছে এসে বলল, কিছু মনে কোরো না, মেয়েটার এই রকমই মেজাজ। ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করল, আসার সময় গণ্ডগোল করেনি তো?

শঙ্কর সারাভাই মাথা নাড়ল।

চন্দ্রশেখর তার পিঠে হাত রাখল, তারপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল, তারপর অফিসে তার সঙ্গে দেখা করতে বলল, আর তারপর মেয়ের উদ্দেশে প্রস্থান করল।

শঙ্কর সারাভাই রাস্তায় এসে দাঁড়াল। আয়নায় এই বোকামুখ দেখলে নিজেই অবাক হত। পরক্ষণে সর্বদেহে এক অননুভূত রোমাঞ্চ। বুক-পকেটে চেকটা খস্‌খস্ করছে। বার করে দেখল। হাত কাঁপছে। পড়ল। চোখে ধাঁধাঁ লাগছে।

যা হয়ে গেল, সব সত্যি কিনা নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। এক মেয়ে কলম নিয়ে খস্‌খস্ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখে দিল বলেই এই কাগজটার দাম সত্যি পঞ্চাশ হাজার কিনা, সেই অস্বস্তিও মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।...পঞ্চাশ হাজার...পঞ্চাশ হাজার টাকা...কপর্দকশূন্য শঙ্কর সারাভাই পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক আজ এই মুহূর্তে, সে-কি সত্যিই বিশ্বাস করবে? তার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা, একি সে স্বপ্ন দেখছে?

ব্যাঙ্কের সময় পার হয়ে গেছে আজ। একবার মেসোর বাড়ি যাবে কিনা ভাবল। কিন্তু সোজা স্টেশনের দিকেই চলল শেষ পর্যন্ত।

উড়েই চলল। চিন্তা একটু স্থির হতেই মনে হল, পকেটের কাগজটা টাকাই—পঞ্চাশ হাজার টাকা। যে লোকটা কাগজে ছবি দেখে সন্দেহ করেছিল, আর তাকে সকালে ডেকে নিয়ে কাগজ দেখিয়েছিল, তাকে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা দেওয়া উচিত।...দিতে ভালো লাগছে না বটে, কিন্তু তাই দেবে। তাহলেও পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা থাকল।

গলা ছেড়ে হাসতে ইচ্ছে করছে শঙ্কর সারাভাইয়ের।

নয়

দিদি শুনে একেবারে আকাশ থেকেই পড়ল বুঝি। বিহারীও তাজ্জব।

আর এদের উত্তেজনা এবং উদ্দীপনা দেখে ক্ষুদ্রকায় রাজুরও মনে হল তাজ্জব হবার মতো ব্যাপারই কিছু ঘটে গেছে।

বড়ঘরের মেয়ে এ-অবশ্য দিদির বরাবরই মনে হয়েছিল। কিন্তু সে-যে সাক্ষাৎ কুবেরনন্দিনী—এ ভাববে কি করে? প্রাথমিক উত্তেজনা কমার পর দিদির কেবলই মনে হতে লাগল, মেয়েটার কত রকমের অসুবিধা হয়েছে। অথচ হাসিমুখেই সে তার মধ্যে কাটিয়ে গেছে। অসুবিধের কথা বলে ফেলে বা অসুবিধেটা ধরা পড়ে গেলে নিজেই লজ্জা পেয়েছে। ভাইকে অনুযোগও করেছে দিদি, বলেছে, তুই তো এর ওপর আবার ঠাস ঠাস কথা শুনিয়েছিস মেয়েটাকে, যা নয় তাই বলেছিস।

সে-কথা শঙ্কর সারাভাইয়ের এক-এক বার যে মনে হয়নি তা নয়। নিজের আর যশোমতীরও অনেক কথাই মনে পড়ছে তার। আর কেমন যেন অজ্ঞাত অস্বস্তি একটু। তাই তার ফলে যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর মাথা না ঘামাতেই চেষ্টা করেছে সে।

ভাঙা কারখানা-ঘরে এসে বসেছে। সেই ভাঙা ঘর চোখের সামনে চকচকে ঝকঝকে নতুন হয়ে উঠছে যেন। পুরনো মেশিনের জায়গায় নতুন মেশিন দেখছে সে। একটার জায়গায় তিনটে দেখছে। চোখের সামনে একটা ভর ভরতি ফ্যাক্টরি দেখছে।

রাতে ভালো ঘুম হল না। পরদিন সকালে পুকুরে চান করতে করতে বুকের তলায় কেমন যেন খচ করে উঠল একটু।...ভাগ্নের হাত ধরে হাসিমুখে একজন এসে দাঁড়াত। কালও দাঁড়িয়েছিল। ঘুম ভাঙলেই মুখ-হাত ধুয়ে চলে আসত। মুখখানা ভেজা-ভেজা লাগত। দু'দিন যেতে শঙ্কর বলতে গেলে অপেক্ষাই করত তার জন্যে।

আর কেউ এসে দাঁড়াবে না।

না, ভাবতে গেলেই কেমন অস্বস্তি। বড়লোকের মেয়ের ভাবনায় কাজ নেই।

তাড়াতাড়ি চান সেরে কারখানা-ঘরে গিয়ে ঢুকল। সকাল আটটা বাজতে বিহারী খাবার নিয়ে এলো। শঙ্করের আর একবার মনে হল যশোমতীর কথা। সে-ই খাবার নিয়ে আসত। এই স্মৃতিটাও শঙ্কর বাতিল করে দিল তক্ষুনি। ফ্যাক্টরিটা এবারে কোন্ প্ল্যানে দাঁড় করাবে সোৎসাহে বিহারীর সঙ্গেই সেই আলোচনা শুরু করে দিল। দেরি হয়ে যাচ্ছে খেয়াল ছিল না, খেয়াল হতেই ছুটল স্টেশনের দিকে।

ট্রেন থেকে নেমে বাসে চেপে ব্যাঙ্কে যখন এলো, তখন বারোটা বেজে গেছে। বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করতে লেগেছে আবার। ব্যাঙ্কে চেক পেশ করতে একজন বলল, আজ তো হবে না...শনিবার, সময় পার হয়ে গেছে।

শঙ্কর সারাভাই যেন বড়সড় ধাক্কা খেল একটা। বার-টার সব ভুল হয়ে গেছে তার। টাকাটা সোমবার পাবে তাহলে। পেয়ে এইখানেই আবার নিজের নামে জমা করে যাবে।...কিন্তু পাবে তো?

দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চেকটা দেখুন তো, সোমবার এলে টাকাটা পাওয়া যাবে তো?

ভদ্রলোক চেকটার দিকে ভালো করে তাকালো একবার। টাকার অঙ্ক দেখে তার চক্ষুস্থির হল একটু। বেয়ারার চেকে এত টাকার চেক কাটা হয়েছে, এ যেন কেমন লাগল তার। শঙ্কর সারাভাইকে এক নজর দেখে নিল ভালো করে। পঞ্চাশ হাজার টাকা নেবার মতো মর্যাদাসম্পন্ন লাগল না তাকেও। কৌতূহলবশতই খাতা খুলে চেকদাত্রীর সইটা মেলাল সে। মিলল বটে, কিন্তু দ্রুত স্বাক্ষর গোছের লাগল।

তাকে অপেক্ষা করতে বলে চেক হাতে নিয়ে লোকটি এক কোণে চলে গেল। শঙ্কর সারাভাই দেখল সে ফোন কানে তুলে নিয়েছে।

হ্যাঁ, চেক যে কেটেছে, অর্থাৎ চন্দ্রশেখর-কন্যা যশোমতীকেই ফোন করল সে।...এ রকম একটা চেক এসেছে, পেমেন্ট হবে কিনা।

—হবে। দিয়ে দিন। ঝপ্ করে টেলিফোনের রিসিভার প্রায় ছুঁড়েই ফেলেছে যশোমতী।

লোকটি ফিরে এসে বলেছে, সোমবার পেমেন্ট হবে, বেলা একটার মধ্যে আসবেন।

সেদিনও শঙ্কর মেসোর বাড়িতে গেল না। বাড়িই ফিরল। টাকাটা যে পাওয়া যাবে তা বোঝা গেল। নিশ্চিত বোধ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু বিপুল আনন্দের বদলে কি রকম যে লাগছে সে ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারছে না।

পরদিন চানের সময় আবারও একটা মিষ্টি স্মৃতি চোখে ভেসে উঠল। ওদিকে রাজু দিন-রাতই মাসির কথা বলছে। সকালের খাবার সময় তাকে মনে পড়ে। দুপুরেও। কি কথা হত, কিভাবে কথা কাটাকাটি হত। শঙ্কর কাজ ভুলে গেল। গোড়ার দিনে বাসের যোগাযোগ থেকে শুরু করে এ-পর্যন্ত খুঁটিনাটি কত কি যে মনে পড়তে লাগল ঠিক নেই। শঙ্কর সারাভাই আপন মনে মিটিমিটি হাসে এক একসময়। চাকরির জন্যে দেখা করতে গিয়ে ওভাবে স্কুল থেকে চলে আসার কথা মনে পড়তে বেশ জোরেই হেসে উঠেছিল। কেন যে কাগজ হাতে নিয়েই অমন ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিল, সেটা এখন আর বুঝতে বাকি নেই।

দুপুর না গড়াতে প্রায় লাফাতে লাফাতে মেসো এসে হাজির। সঙ্গে মাসি। তার হাজার টাকার সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না কেউ। আনন্দে আটখানা দুজনেই। একটা কাজের মতো কাজ করেছে শঙ্কর। তার আত্মীয় বলে বড়কর্তার কাছে মেসোরই নাকি কদর বেড়ে গেছে। মেসো বার বার অফিসে গিয়ে তাকে বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বলে গেল। আর দিদিকে বলে গেল, তার ভাই ইচ্ছে করলেই বড়সাহেবের মিলের একজন পদস্থ অফিসার হয়ে বসতে পারে এখন। চন্দ্রশেখর পাঠক নিজেই নাকি শঙ্করের মেসোকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছে।

আশ্চর্য, সোমবারেও চেক ভাঙাতে যাওয়া হল না শঙ্কর সারাভাইয়ের। হল না বলে নিজেই নিজের ওপর বিরক্ত। না যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। হঠাৎ কেমন মনে হল, আজ না ভাঙিয়ে কাল ভাঙালেই বা ক্ষতি কি।

কিন্তু ওই একদিনে মনের কোণের সেই অজ্ঞাত অস্বস্তিটা যেন চারগুণ স্পষ্ট হয়ে ছেঁকে ধরতে লাগল তাকে। যশোমতীকে নিয়ে ফেরার সময়ে ট্রেনের দৃশ্যটা মনে পড়ল। হ্যাঁ, শঙ্কর জানে যশোমতীর সেই দৃষ্টিতে শুধু ঘৃণা ছাড়া আর কিছু ছিল না।...আর তারপর সেই চেক লিখে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার দৃশ্যটা চোখে ভাসতেই বুকের ভিতরে মোচড় পাড়তে লাগল। যেভাবে দিয়েছে—কোনো ভিখিরিকেও কেউ ও-ভাবে কিছু দেয় না।

সমস্ত রাত জেগে ছটফট করল শঙ্কর সারাভাই। নিজের সঙ্গেই ক্রমাগত যুঝছে সে। ভাবীকালের ফ্যাক্টরির চিত্রটা বিরাট করে দেখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তারপরেই যা আছে বর্তমানে, সেটাই যেন হাঁ করে গিলতে আসছে তাকে। না, শঙ্কর এই দারিদ্র্য আর সহ্য করতে পারবে না।

পরদিন সময়মতোই ট্রেন ধরল। সময় মতোই ব্যাঙ্কে পৌঁছুল। কিন্তু কি যে হল এক মুহূর্তে কে জানে। কি এক দুর্ভর যাতনা আর যেন সে সহ্য করে উঠতে পারছে না।

চেক পকেটে নিয়েই সে সোজা চলে এলো চন্দ্রশেখরের বাড়িতে। কর্তা বাড়ি নেই। মেয়েকে ডেকে পাঠালো।

কিন্তু মেয়ে নিজেই তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। যশোমতী আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল প্রায়। পরক্ষণে নিদারুণ আক্রোশ। এই লোক তার যেমন ক্ষতি করেছে তেমন যেন আর কেউ কখনো করেনি। চাকর এসে কিছু বলার ফুরসত পেল না। যশোমতী ঝাঁঝিয়ে উঠল, যেতে বলে দাও, দেখা হবে না।

চাকর হুকুম পালন করল। এসে জানালো দেখা হবে না।

শঙ্কর সারাভাই স্থির দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে চলল।

জানলায় দাঁড়িয়ে যশোমতী দেখছে। তার চোখ-মুখ জ্বলছে।

রাতে বাড়ি ফিরে শঙ্কর দিদিকে শুধু বলল, চেকটা চন্দ্রশেখর বাবুকে ফেরত দিয়ে এলাম। মেয়েকেই দিতে গেছলাম, সে দেখা করল না, তাই অফিসে গিয়ে তার বাবার হাতে দিয়ে এলাম।

দিদি হতভম্ব। কিন্তু একটি কথাও আর জিজ্ঞাসা করতে পারল না। ভাইয়ের পরিবর্তনটা এ ক'দিন সে খুব ভালো করেই লক্ষ্য করেছে।

জ্বালা জ্বালা—যশোমতীর বুকে রাজ্যের জ্বালা। তাকে দ্বিগুণ হাসতে হচ্ছে, দ্বিগুণ হৈ-চৈ করে বেড়াতে হচ্ছে। বাড়ির লোকেরা মাসের কতকগুলো দিন মুছে দিতে পেরেছে, ও পারছে না কেন? বাবা আবার ভাবা শুরু করেছে, বিশ্বনাথ যাজ্ঞিকের সঙ্গে এবারে বিয়ের আলোচনায় এগোলে হয়। মা রমেশ চতুর্বেদীকে বিয়ে করার জন্যে আগের মতোই তাকে তাতিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। দাদা আবার তার শালা বীরেন্দ্র যোশীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছে। শিবাজী দেশাই আর ত্রিবিক্রম ঘন ঘন দেখা করার ফাঁক খুঁজছে।

সকলেই ডাকছে তাকে। সকলেই সাদরে নেমন্তন্ন করছে। নিজের বন্ধুরা, মায়ের বন্ধুরা। বাড়ি থেকে পালিয়ে যশোমতী যেন মস্ত একটা কাজ করে ফেলেছে। এদিকে বাবা-মা রীতিমতো তোয়াজ করে চলেছে তাকে।

কিন্তু ভালো লাগে না। যশোমতীর কিচ্ছু ভালো লাগে না। সকালে ঘুম ভাঙলেই পুকুরঘাটে স্নানরত এক পুরুষের শুচি মূর্তি চোখে ভাসে বলেই যত যাতনা। এক কচি শিশুর 'মাসি' ডাক কানে লেগেই আছে। আর সেই ভাঙা কারখানায় কর্মরত পুরুষের মূর্তি আর তার রাগ আর তার অসহিষ্ণুতার স্মৃতি কতবার যে মন থেকে উপড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করেছে আর করছে, ঠিক নেই। লোকটা টাকা ছাড়া আর কিছু চেনে না, টাকা ছাড়া আর কিছু দেখতে শেখেনি—টাকার লোভে সে যেন তাকে জীবনের সব থেকে চরম অপমান করেছে। তাকে সে জীবনে ক্ষমা করবে না। কিন্তু তবু, তবু পুরুষের সেই সবল সংগ্রামের স্মৃতি কিছুতে ভুলতে পারে না। গাঁয়ের সেই ক'টা দিন যেন এক অক্ষয় সম্পদ। সেই সম্পদের ওপর এমন লোভের কালি মাখিয়েছে যে, তাকে সে ক্ষমা করবে কি করে?

অথচ এদিকে জলো লাগে সব। এই সম্পদ, এই আভিজাত্যে মোড়া দিন—এ-যে এত নিষ্প্রাণ এ-কি আগে জানত? ব্যাঙ্ক থেকে যেদিন তাকে ফোনে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল টাকা দেওয়া হবে কিনা, সেই দিন লোকটার ওপর যেমন দুর্বার আক্রোশে ঝলসে উঠেছিল তেমনি রাগও হয়েছিল নির্লজ্জের মতন আবার যেদিন সে দেখা করতে এসেছিল। তাকে দেখামাত্র মুহূর্তের জন্য যে আনন্দের অনুভূতি মনে জেগেছিল সেই জন্যে নিজেকেই যেন ক্ষমা করতে পারেনি যশোমতী।

টাকা-সর্বস্ব লোভ-সর্বস্ব অপদার্থ কোথাকার! ওই ভাবে অপমান করে তাকে বিদায় করতে পেরে একটু যেন জ্বালা জুড়িয়েছিল যশোমতীর।

কিন্তু তার এই মানসিক পরিবর্তনের ওপর কেউ যে তীক্ষ্ণ চোখ রেখেছে, যশোমতী তা জানেও না।

তার বাবা-মা।

চন্দ্রশেখর পাঠক চিন্তিত হয়েছে। আরো অবাক হয়েছে ছেলেটা অমন বেয়াড়া মুখে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেকটা ফেরত দিয়ে যেতে। বুদ্ধিমান মানুষ, মেয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এই টাকা ফেরত দেওয়াটা খুব বিচ্ছিন্ন করে দেখল না সে। একটা নিগূঢ় চিন্তা তার মনে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। যত টাকা আর যত প্রতিপত্তিই থাকুক, সে ব্রাহ্মণ মানুষ, অব্রাহ্মণ কোনো ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়ার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। আর এই বাপারে তার স্ত্রী তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

তাই টাকা ফেরত দেওয়া প্রসঙ্গে মেয়েকে কিছুই বলল না ভদ্রলোক। তার মেসোর কাছে ছেলেটার সম্পর্কে খোঁজখবর নিল একটু। এবং প্রত্যেক দিনই তার চিন্তা বাড়তে লাগল। মেয়ে যেন তার সেই মেয়েই নয়। ভেবেচিন্তে দিন কয়েক বাদে মেসোর মারফত শঙ্কর সারাভাইকে ডেকে পাঠালো চন্দ্রশেখর পাঠক। প্রকারান্তরে ছেলেটিকে একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। পঞ্চাশ হাজার টাকা তাকে আবার দিয়ে সেই সঙ্গে আরো বড় কিছু বিত্তের লোভ দেখিয়ে তাকে বশ করে এ বাধা দূর করা যায় কিনা, সেই চেষ্টাটাই তার মাথায় এলো।

ওদিকে স্ত্রীও সহায়তা করল একটু। মেয়ের উদ্দেশে বার দুই বলল, গরীবের ছেলে, তোকে আদর-যত্ন করে রেখেছিল—খুব ভালো মনে হল।...কিন্তু অব্রাহ্মণের বাড়িতে এতদিন ভাত-টাত খেলি ভাবলেই কেমন খারাপ লাগে।

দ্বিতীয়বার এই কথা শুনে মেয়ে চটেই গেল।—প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না কি করতে হবে বলো?

মা আর ঘাঁটাতে সাহস করল না। সন্ধ্যার পর বাবা এসে বলল, ওই শঙ্কর ছেলেটিকে কাল একবার দেখা করতে বললাম, দেখি যদি কিছু করতে পারি।

যশোমতী চাপা রাগে ফুঁসে উঠল তৎক্ষণাৎ।—কেন, টাকা তো পেয়েছে, আবার কি করতে হবে?

চন্দ্রশেখরের আশা, ছেলেটা যদি আরো বড় টোপ গেলে। তাই টাকাটা ফেরত দেবার কথাটা বলি -বলি করেও বলল না। কিছু গ্রহণ না করার বৈশিষ্ট্যটা মেয়ের কাছে নিষ্প্রভ করে দিতেই চায় সে।

পরদিন বাবা অফিসে চলে যাবার পরেও যশোমতী গুম হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়তে উঠে পড়ল। বেরুবে। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাণ্ড ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েই পড়ল। বড় একটা স্টেশনারি দোকান থেকে অনেক দাম দিয়ে ছোট ছেলেদের একটা মোটর আর সাইকেল কিনল। সঙ্গে আরো টাকা আছে, বিহারীকে দেবে। বিহারীর দেশের বাড়ি-ঘরের সমস্যার কথা শুনে তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেছিল। তারপর টানা মোটরেই সেই পরিচিত গ্রামে চলে এলো।

বাড়ির দোরের আঙিনায় হঠাৎ অমন একটা গাড়ি এসে থামতে দেখে দিদি অবাক হয়েছিল। ছেলে চেঁচামেচি করে উঠল, মাসি এসেছে!

গাড়ি থেকে নামল যশোমতী। চোখে জল আসতে চাইছে কেন জানে না। ভিতরে ভিতরে জ্বলেও যাচ্ছে আবার। তাকে দেখে দিদির মুখে কথা সরল না হঠাৎ। ওদিকে ড্রাইভার রাজুর মোটর আর সাইকেল নামাতে সে আনন্দে লাফালাফি নাচা-নাচি শুরু করে দিল।

দিদি কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ঘরে এনে বসালো তাকে। ভাইকে অপমান করেছে, দেখা করেনি, অথচ নিজেই বাড়ি বয়ে চলে এলো!

বলল, শঙ্কর মেসোমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে, তিনি বিশেষ করে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

যশোমতী হাসিমুখেই বলে বসল, তিনি আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, বিশেষ করে বাবাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

দিদি জানে। তবু মেশোমশাই ও-ভাবে অনুরোধ না করলে ভাই যে যেত না, সেটা আর বলল না। যশোমতী রাজুর সঙ্গে খেলা শুরু করে দিল। তাকে তার মোটর চালাতে শেখাল, সাইকেল চড়তে সাহায্য করল। তারপর ফাঁক মতো বিহারীকে ধরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কারখানার চেহারা কতখানি বদলানো হয়েছে সেই কৌতূহলও কম নয়।

কিন্তু দিদিও এলো সঙ্গে সঙ্গে।

ফ্যাক্টরির ভিতরে ঢুকে যশোমতী অবাক একটু। আরো যেন ছন্নছাড়া চেহারা হয়েছে ভিতরটায়, ক'দিনের মধ্যে কিছু কাজ হয়েছে কিনা সন্দেহ।

বলেই ফেলল, সেই রকমই দেখি আছে, নতুন কিছুই তো হয়নি এখন পর্যন্ত—

দিদি ঠাণ্ডা জবাব দিল, কোত্থেকে আর হবে বলো, ক'দিন তো বন্ধই আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে যশোমতী বলে উঠল, কেন? টাকা হাতে পেয়ে আর খরচ করতে ইচ্ছে করছে না?

দিদি বিমূঢ় প্রথম। তারপর বলল, তোমার দেওয়া চেক তো তোমার বাবার হাতে শঙ্কর ফেরত দিয়ে এসেছে, তোমার বাবা বলেননি?

সেই মুহূর্তে কার সঙ্গে কথা বলছে তাও যেন ভুলে গেল যশোমতী। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, কক্ষনো না! ব্যাঙ্কের লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল টাকা দেবে কিনা, আমি নিজে দিতে বলে দিয়েছি!

দিদি যেন হকচকিয়ে চেয়ে রইল কয়েক নিমেষ। তারপর আত্মস্থ হল। সংযত হবার চেষ্টায় মুখ ঈষৎ লাল। বলল, তোমরা বড়লোক, তোমাদের টাকার কোনো লেখাজোখা নেই শুনেছি। এই জন্যেই বোধহয় টাকার জন্যে গরীবেরা অনায়াসে মিথ্যে কথা বলতে পারে বলে ভাব তোমরা।

এবারে যশোমতীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। ঘাবড়েই গেল সে। দিদি ডাকল, বিহারী, এদিকে আয়—

সোজা বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল সে। পিছনে বিহারী আর সেই সঙ্গে যশোমতীও।

—ওই মোটর আর সাইকেল গাড়িতে তুলে দে। যশোমতীর দিকে ফিরল, শঙ্কর এসে দেখলে রাগ করবে, তাছাড়া গরীবের ছেলের এ-সব লোভ থাকলে অসুবিধে—

যশোমতী কাঠ। পাঁচ বছরের রাজুও হতভম্ব হঠাৎ। ওইটুকু ছেলের মুখের আনন্দের আলো নিভেছে। অথচ মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সাহস করে একটু প্রতিবাদও করতে পারছে না। বিমূঢ় বিহারী সত্যিই ওগুলো নেবার জন্যে হাত বাড়াতে ছেলেটার দিকে চেয়ে বুকের ভিতরটা ফেটে যাবার উপক্রম যশোমতীর।

হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে দিদির পায়ের কাছে বসে পড়ল যশোমতী। তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

দিদি সরবার অবকাশ পেল না। আঁতকেই উঠল।—ছি ছি বামুনের মেয়ে! তাড়াতাড়ি হাত ধরে টেনে তুলল তাকে। তারপর চেয়ে রইল। মুখখানা শান্ত কমনীয় হয়ে উঠল। বিহারীকে বলল, থাক তুলতে হবে না।

বাড়ি ফিরে যশোমতী হাতের প্যাকেটটা প্রথমে যত্ন করে তুলে রাখল। আসার সময় এটা সে দিদির কাছ থেকে চেয়ে এনেছে। ওতে আছে দুটো শাড়ি যে শাড়ি দুটো শঙ্কর সারাভাই নিজের হাতে তৈরি করে তাকে দিয়েছিল। তারপরেও নিজেকে সংযত করার জন্যেই ঘরে বসে রইল খানিক। তারপর বাবার কাছে এলো।

খুব ঠাণ্ডা মুখে জিজ্ঞাসা করল, শঙ্করবাবু সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার চেকটা তোমার কাছে ফেরত দিয়ে গেছেন?

মেয়ের প্রশ্নের ধরনটা ভাল ঠেকল না কানে, চন্দ্রশেখর পাঠক এই প্রথম যেন পরিবারের কারো কাছে বিচলিত বোধ করল একটু। বলল হ্যাঁ, ছেলেটা কেমন যেন...

—ফেরত দিয়ে গেছেন আমাকে বলোনি তো?

—ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে আবার সেটা দিয়ে দেব ভেবেই বলিনি। ওর মেসোর সঙ্গে সেই রকমই কথা হল, তাছাড়া আরো কিছু করা যায় কিনা ওর জন্যে ভাবছিলাম...সেই জন্যেই তো আজ ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

—চেক আজ দিতে পারলে?

বিব্রত মুখে চন্দ্রশেখরবাবু মাথা নাড়ল। পারেনি।

—আর, আর-কিছুও করতে পারলে?

নিজের চিন্তাধারার ব্যতিক্রম দেখে অভ্যস্ত নয় চন্দ্রশেখর পাঠক। তাই ঈষৎ বিরক্ত মুখে জবাব দিল, না, ছেলেটাকে খুব বুদ্ধিমান মনে হল না, কথাই শোনে না ভালো করে।

আরো একটু দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখল যশোমতী। তার রাগ হবে কি, এক উৎকট আনন্দে বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। এ আনন্দ যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না। জীবনে এমন আনন্দ এই যেন প্রথম।

দশ

দেব-উঠি-আগিয়ার্‌স্।

সাবরমতীর মেলা। দেবতা উঠবেন। লোকে লোকারণ্য। এরই মধ্যে যশোমতী একটু ফাঁক খুঁজে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। সঙ্গে কেউ নেই আর। বাড়ির কেউ জানেও না। একা এসেছে। অপেক্ষা করছে।

চিঠির জবাব পায়নি যশোমতী। ছোট্ট দু'লাইন চিঠি লিখেছিল দিনকতক আগে। লিখেছিল, এর পরেও দেখা হবে আমি আশা করছি। দেবোত্থান একাদশীতে সাবরমতীতে আসার কথা ছিল। পুজো দেবার কথা ছিল। আমি অপেক্ষা করব।

অপেক্ষা করছে। নিশ্চিত জানে সে আসবে। দেখা হবে।

এলো। দেখা হল।

চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। গম্ভীর। কিন্তু সেও পুরুষের ক্লান্তি। পুরুষের গাম্ভীর্য।

আশ্চর্য, সমুদ্র-পরিমাণ কান্না চেপেও যশোমতী হাসতে পারছে। হাসছে। একটু কাছে এগিয়ে এলো। চোখে চোখ রেখে বলল, অপেক্ষা করছি।

শঙ্কর সারাভাই জবাব দিল না। চুপচাপ চেয়ে আছে।

যশোমতীর তাড়ায় নদীতে নেমে চান করতে হল শঙ্করকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যশোমতী দেখতে লাগল। নদীর জলে অগণিত মাথার মধ্যে শুধু একজনকেই দেখছে সে।

চানের পর যশোমতী পুজো দেবার কথা বলল।

শঙ্কর সারাভাই জিজ্ঞাসা করল, কি জন্যে পুজো?

—যে জন্যে কথা ছিল। তেমনি চোখে চোখ রেখেই কথা বলছে যশোমতী। হাসছে। বলল, সত্যিকারেরর পুরুষমানুষ কথা দিয়ে কথার খেলাপ করে না—বিশেষ করে অবলা রমণীকে কথা দিলে। আজই বিকেলে ফিরে গিয়ে কট্‌ন্ চেম্বারের এগজিবিশনের শাড়িতে হাত দেবার কথা ছিল।

শঙ্করের মুখখানা গম্ভীর, কিন্তু ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা উঁকি দিতে চাইল একটু। বলল, কথা ছিল, কিন্তু এরপর আপনাদের অনুকম্পা আমার খুব ভালো লাগবে না।

যশোমতী গম্ভীর।—আপনাদের বলতে একজন তো আমি, আর সব কারা?

মুখের হাসি আরো একটু স্পষ্ট হল শঙ্করের। বলল, আপনার বাবা, আপনার মা—

তাদের অনুকম্পা তো কত নিয়েছেন আপনি! আপনি চাইলে ওই কট্‌ন্ চেম্বারের পঁচিশ হাজার টাকা ছেড়ে আমি আপনাকে দু'পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে পারি। আপনিও চাইবেন না, আমিও এক-পয়সা দেব না। অনুকম্পা বলছেন কেন, এখনো আমার শিক্ষা হয়নি বলতে চান?

শঙ্কর সারাভাই পুজো দিল। যশোমতী নীরবে অপেক্ষা করল ততক্ষণ। পুজো শেষ হতে যশোমতী জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করবেন?

—বাড়ি যাব।

—বাড়ি গিয়ে?

হেসেই শঙ্কর সারাভাই জবাব দিল, আপনার হুকুম পালন করব, মানে কারখানায় গিয়ে ঢুকব—

—খাওয়া দাওয়া?

—তার পরে।

—কত পরে?

শঙ্কর সারাভাইয়ের টানা বিষণ্ণ দুই চোখ আস্তে আস্তে তার মুখের উপর স্থির হল।—হঠাৎ আমার ওপর আপনার এই অনুকম্পা কেন?

অনুকম্পা!

অস্ফুট কণ্ঠস্বরে, চোখে মুখে এক অব্যক্ত বেদনার ছায়া দেখল শঙ্কর সারাভাই। বলল, আপনিও সকাল থেকে না খেয়ে আছেন তো?

সেটা অনুকম্পা?

শঙ্কর সারাভাই চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। কি দেখল বা কি বুঝল সে-ই জানে। হাসল একটু।—আচ্ছা, আর বলব না। বাড়ি গিয়ে খেয়ে নেবেন। মিথ্যে কষ্ট পাবেন না।

যশোমতীর দুই ঠোঁটের ফাঁকে এবারে হাসির আভাস একটু। জবাব দিল, কষ্ট পাওয়া কপালে থাকলে আর খণ্ডাবো কি করে। বেশি কষ্ট যদি না চান তাহলে শুভ কাজ শুরু করা হলেই আগে খেয়ে নেবেন।

অর্থাৎ, তার আগে পর্যন্ত তারও মুখে আহার রুচবে না। শঙ্কর সারাভাই বিব্রত বোধ করল। কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে মন সরল না। এই প্রাপ্তিটুকু নিঃশব্দে অনুভব করার মতোই শুধু। বলল, আচ্ছা।

কথা দিচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আর দেরি করে কাজ নেই তাহলে, চলুন আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে তারপর বাড়ি যাব।

এবারেও বাধা দিতে পারল না শঙ্কর সারাভাই। ট্যাক্সি করে দু'জনে স্টেশনে এলো। গাড়ি আড়াল না হওয়া পর্যন্ত হাসি মুখে যশোমতী স্টেশনে দাঁড়িয়েই থাকল।

কথা রেখেছে। বাড়ি ফিরে শঙ্কর সারাভাই কথা রেখেছে। বিহারীকে নিয়ে সোজা ফ্যাক্টরি ঘরে ঢুকে শুভ কাজে হাত দিয়েছে। একটু বাদে বিহারীর বিস্মিত চোখের ওপরেই কাজ বন্ধ করে খেতে গেছে।

তারপর ক'দিন তার এই কাজের তন্ময়তা লক্ষ্য করে করে দিদির খটকা লাগল কেমন। জিজ্ঞাসা করল, নতুন অর্ডার-টর্ডার পেলি নাকি কিছু?

শঙ্কর সারাভাই হাসি মুখেই দিদিকে জানিয়েছে ব্যাপারটা। তারপর বলেছে, পঁচিশ হাজার টাকা এবারে ঘরে আসছে, এটা ধরে নিতে পারো!

দিদি চেয়ে আছে। ভাইয়ের মুখের হাসি দেখছে। ওই হাসির আড়ালে পঁচিশ হাজার টাকা যে আসছে সেই আনন্দের ছিটে-ফোঁটাও চোখে পড়ল না।

দিদি জিজ্ঞাসা করল, এগজিবিশনে শাড়ি পাঠাচ্ছিস কেন?

শঙ্কর সারাভাই আবারও হাসল শুধু একটু, জবাব দিল না।

কিন্তু কটন্ চেম্বারের পঁচিশ হাজার টাকার প্রাইজ শঙ্কর সারাভাই পায়নি। পাবেই যে সেটা স্থিরনিশ্চিত জেনেও সমস্ত একাগ্রতা দিয়েই শাড়িটা শেষ করেছিল। আর মনে মনে আশা করেছিল, সঠিক বিচার হোক না হোক, মানের দিক থেকেও সে খুব পিছিয়ে পড়েনি।

কিন্তু কাগজে যার শাড়ি প্রথম হয়েছে তার নাম দেখে সে অবাক হয়েছে। সেই নাম শঙ্কর সারাভাইয়ের নয়। অপরিচিত একজনের। তার নাম দ্বিতীয়। সে শুধু সার্টিফিকেট পাবে।

বার বার পড়েছে খবরটা শঙ্কর সারাভাই। আর, শুধু হেসেছে নিজের মনে। এমন প্রসন্ন হাসি অনেক দিন তার মুখে দেখা যায়নি। কাগজে খবরটা দেখার পরেই সে যেন নিশ্চিত জেনেছে, কট্‌ন্‌ চেম্বারের পুরস্কারের বিচার এই প্রথম যথাযোগ্য হয়েছে। মান বিচারে এতটুকু কারচুপি হয়নি।

যশোমতী পাঠক হতে দেয়নি।

তাই সাগ্রহে সার্টিফিকেট নিতেই উৎসবে এসেছে শঙ্কর সারাভাই। এত আগ্রহ নিয়ে আসার আরো কারণ আছে। অন্যান্যবার পুরস্কার দিয়েছে মিসেস চন্দ্রশেখর পাঠক, কিন্তু কাগজের ঘোষণায় দেখা দেল এবারে পুরস্কার দেবে চেম্বার-প্রেসিডেন্টের কন্যা যশোমতী পাঠক।

প্রতিবারের মতোই সেই সাড়ম্বর অনুষ্ঠান। সাজের বাহারে ঝলমল করছে চেম্বারের সামনের বিরাট আঙিনা। প্যান্ডেলের আলোর বন্যা দিনের আলোকে হার মানিয়েছে। গোটা দেশের মানী জনের সমাবেশ।

এর মধ্যে প্রেসিডেন্টের পাশে পুরস্কার-দাত্রীকে দেখে অবাকই হয়েছে বহু বিশিষ্ট মেয়ে-পুরুষ। না, ঠিক যশোমতীকে দেখে নয়। এমন সমাবেশে তার সাজসজ্জা দেখে। বাড়িতে অবাক হয়েছিল যশোমতীর বাবা-মা। এখানে সকলে।

কাছাকাছি এক সারিতে বসে নিষ্পলক তার দিকে চেয়ে ছিল শঙ্কর সারাভাই। যশোমতীর গায়ে শুধু সেই গয়না, যে ক'টি গয়না পরে সে একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আর তার পরনে সেই শাড়ি দুটোর একটা, যা শঙ্কর নিজের হাতে তাকে তৈরি করে দিয়েছিল। আর, যশোমতী ডায়াসে ওঠার সময় শঙ্করের বিমূঢ় দৃষ্টিটা তার পায়ের দিকেও পড়েছিল একবার। পায়ে সেই স্যান্ডেলজোড়া—যশোমতীকে তার ঘর-ছাড়া করার দিন যেটা সে তাড়াহুড়ো করে কিনে এনে দিয়েছিল।

প্রাথমিক বক্তৃতা আর অনুষ্ঠানাদির পর প্রথম-পুরস্কৃতের নাম ঘোষণা হতে সেই ভদ্রলোক উঠে এগিয়ে এলো। যশোমতী দাঁড়িয়ে হাসিমুখে পঁচিশ হাজার টাকার চেক সমর্পণ করল তার হাতে।

দ্বিতীয় নাম ঘোষণা হল। শঙ্কর সারাভাই—

যশোমতী তখনো জানে না সে এসেছে কিনা। শুধু আশা করছিল আসবে। এত ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়া কঠিন। কিন্তু আগেও তার দুচোখ থেকে থেকে কাকে খুঁজছিল, শঙ্কর সারাভাই জানে। সে উঠল। এগলো।

সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে যশোমতী দাঁড়িয়ে আছে।

শঙ্কর সারাভাই এগিয়ে গেল। দেখছে দু'জনে দু'জনকে।

সার্টিফিকেট হাতে দেবার আগে সমাগত অভ্যাগতদের উদ্দেশে যশোমতী কয়েকটি মাত্র কথা বলল। বলল, আজ প্রথম পুরস্কার যিনি পেলেন তিনি অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু প্রথম পুরস্কার যিনি পেলেন না, তাঁরও চেষ্টার পুরুষকার একদিন ঠিক এই সার্থকতায় সফল হবে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তাঁর সেই চেষ্টার সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তর যুক্ত থাকল।

চারদিক থেকে বিপুল করতালি।

সার্টিফিকেট নেবার জন্য দু'হাত বাড়াল শঙ্কর সারাভাই। দু'হাতে সার্টিফিকেট নিয়ে যশোমতী সার্টিফিকেটসহ নিজের হাত দুটিই রাখল তার হাতের ওপর। কে দেখছে যশোমতী জানে না। কে দেখছে শঙ্কর সারাভাই জানে না।

...কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। কয়েকটি নিমেষের নিষ্পলক দৃষ্টি বিনিময়।

এগারো

আসার সময় সাবরমতী দেখেছিলাম, আর, যশোমতীকে দেখছিলাম।

স্টেশনে অতিথি-বিদায়ের ঘটাটা মন্দ হল না। আমাকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য যশোমতী পাঠক এসেছে, শঙ্কর সারাভাই এসেছে, ত্রিপুরারি এসেছে, এখনকার নতুন বন্ধুরাও দু-পাঁচ জন এসেছে।

যশোমতীকে কিছু বলার ফাঁক খুঁজছিলাম আমি। ফাঁক পেলাম। বললাম, আপনার ট্রাজেডি পছন্দ নয় বলেছিলেন, এবারে লিখি যদি কিছু, সেটা কমেডিই হোক। কি বলেন?

শুনে হঠাৎ যেন একপ্রস্থ থতমত খেয়ে উঠল যশোমতী। তার পরেই সমস্ত মুখে সিঁদুরের আভা। সবেগে মাথা নেড়ে বলে উঠল, না কক্ষনো না!

কাছেই ছিল শঙ্কর সারাভাই। সকৌতুকে এগিয়ে এলো। জিজ্ঞাসা করল, কি হল? শুনলাম না—

তক্ষুনি চোখ পাকালো যশোমতী, চাপা গলায় বলল, সবেতে নাক গলানোর কি দরকার, ওদিকে যাও না—

হেসেও উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

ট্রেন ছেড়ে দিল। সাবরমতী থেকে দূরে চললাম। সাবরমতীর নীলাভ জলের সঙ্গে কতটা ট্রাজেডির যোগ আর কতটা কমেডির, আমার জানা নেই। জানলায় ঝুঁকে যশোমতীকে দেখছি তখনো। হাসিমুখে রুমাল নাড়ছে। আর আমার মনে হচ্ছে, ট্রাজেডি হোক কমেডি হোক—দুই নিয়েই সাবরমতী পরিপূর্ণ।

আশ্রয়

উৎসর্গ

আমার বাবার লেখা যারা ভালোবাসে

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

সাজগোজ শেষ করে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে বসেছিল নন্দিতা বোস। ভেতরটা সুস্থির ছিল না খুব। বারবার উসখুস করে ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রাখছিল। চব্বিশ বছরের জীবনে এই প্রথম সবথেকে বেশি সময় নিয়ে যত্ন করে সেজেছে নন্দিতা। খুব ভালো করেই জানে সুন্দরী কেন, সাদামাঠা বেশে সেরকম সুশ্রীও কেউ বলবে না তাকে। কিন্তু নিজের রূপ নিয়ে কোনোদিনই খেদ নেই নন্দিতার। সুখের ঘরের চেকনাই চেহারায় ভালোমতোই আছে। তার ওপর চলাফেরা কথাবার্তায় একটা সহজাত স্মার্টনেস আর ঝকমকে আকর্ষণের জন্যে বরাবরই বহু ছেলের চোখ সেরকম সুশ্রী মেয়েকে ছেড়েও ওর দিকে ঘুরতে দেখে অভ্যস্ত। এ নিয়ে মনে মনে মজাও পায় নন্দিতা।

এই যে একজন, মিহির দত্ত, যার জন্যে আজ এত সাজের ঘটা, সে নিজে তো দস্তুরমতো স্মার্ট আর হ্যান্ডসাম। কিন্তু সেও শেষে কিনা মজল এসে এই সাধারণ মেয়ে নন্দিতায়! তবে হ্যাঁ, সহজ সাধারণ নন্দিতা চাইলে যে কোনো ছেলের চোখে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে বইকি। অবশ্য ওর প্রতি মিহির দত্তর আকর্ষণ কোনো হঠাৎ ঝোঁকের ফসল ভাবে না। নন্দিতা স্কুলে যখন ক্লাস এইটে পড়ে তখন থেকে পিছনে লেগে থেকে ও ছেলে শেষ পর্যন্ত ওকে ঘায়েল করে তবে ছেড়েছে। নন্দিতাদের পুরনো বাড়ির, অর্থাৎ যেখানে এখন শুধু বাবা থাকে, তার ঠিক কোনাকুনি সামনের বড়ো বাড়িটা মিহিরদের। দাদু ব্যবসা করে মস্ত সম্পত্তি রেখে গেছে, বাবা বড়ো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট। মিহির নিজেও নামী মিশনারি স্কুলের ভালো ছাত্র ছিল। তার ওপর স্পোর্টস-এ সব সময় এক নম্বর। চেহারাও দস্তুরমতো ভালো। সব মিলিয়ে যাকে বলে একটা ঝকঝকে ছেলে। পাড়ার সব মেয়েগুলো ওকে নিয়ে কী হ্যাংলামিই না করত! শুধু একজন বাদে। নন্দিতা নিজে। চেহারা ছাড়া অন্য সব বিচারে ও-ও মিহিরের থেকে কোনো অংশে কম যায় না। ওদের ওই বাড়ির মুখোমুখি বেশ বড়ো বাড়ি। বাবা নামকরা ল-ইয়ার। আর ও নিজেও এক মস্ত মিশনারি স্কুলের নামী ছাত্রী। তার ওপর চমৎকার ডিবেট করে। কিন্তু সবচেয়ে চটকদার পরিচয় ও লেখিকা শমিতা বোসের মেয়ে। সেই সময় থেকেই এ দেশে শমিতা বোস দস্তুরমতো নামডাকের লেখিকা। ফলে নন্দিতা যে হেলাফেলার পাত্রী নয়, বা অন্যদের মতো মিহিরের পিছনে ছোটার কোনো কারণ ওর যে অন্তত নেই, সেটা বোঝানোর একটা প্রচ্ছন্ন তাগিদ ভেতরে ভেতরে প্রায় সব সময়ই ছিল। সুযোগও একদিন হঠাৎ জুটে গেল।

জয়ার বাড়িতে টেবল-টেনিসের বোর্ড পাতা হয়েছিল। জয়া পাড়ার মেয়ে, তাছাড়া নন্দিতার সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত। পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে নন্দিতা প্রায়ই জয়ার বাড়ি যেত। মিহিরও মধ্যে মধ্যে আসত। ওই বাড়ির সঙ্গে মিহিরদের কী একরকম দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। যেদিন মিহির আসত সেদিন অন্য মেয়েগুলোর জিভে যেন জল গড়ানোর দশা। কে ওর সঙ্গে খেলবে, কে ওর কাছে হেরে কৃতার্থ হবে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আড়াআড়ি, কাড়াকাড়ি। নন্দিতা চুপচাপ লক্ষ্য করত। করুণা ছিটানোর মতো করে ওই ছেলে কখনো এর সঙ্গে একটু কথা বলছে, কখনো ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসছে, কখনো বা কোনো একজনের সঙ্গে নিতান্ত হেলাফেলায় ব্যাটে-বলে তাল ঠুকছে, নন্দিতার পিত্তি জ্বলে যেত। কিন্তু কখনো কিছু বলত না। নির্লিপ্ত অবহেলায় মিহিরের অস্তিত্বকেই যেন পাশ কাটিয়ে যেত। এই চেষ্টাকৃত অবজ্ঞা ওই চৌখস ছেলের না বোঝার কোনো কারণ নেই। ফলে হাসিহাসি মুখে উল্টে সে-ই নন্দিতাকে সকৌতুকে লক্ষ্য করত। ভেতরে ভেতরে নন্দিতা যত জ্বলত বাইরে ততই ঠান্ডা! মুখে একটা আঁচড় পড়তে দিত না।

একদিন বিকেলে হইহই করে খেলা চলছিল। ডাবল্‌স্-এর খেলা। একদিকে নন্দিতা আর জয়া, অন্য দিকে পাড়ারই আর দুটি মেয়ে। এমন সময় হাসিহাসি মুখে মিহির এসে হাজির। নন্দিতারা জিতছিল। হঠাৎ দেখা গেল ব্যাট হাতে টেবিলের ও মাথায় শুধু ও একা দাঁড়িয়ে, আর বাকি সবকটা মেয়ে গিয়ে মিহিরকে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরেছে। এমন কি নন্দিতার পার্টনার জয়াও। কেউ

মিহিরের হাতে ব্যাট গুঁজে দেবার চেষ্টা করছে, কেউ হয়ত হাত ধরে বোর্ড-এ নিয়ে আসার জন্যে টানাটানি করছে, আর মিহির ঠোঁটে নিরুপায় গোছের একটা হাসি ঝুলিয়ে সকলকে সমান মনোযোগ দেবার ভান করছে, আর মাঝেমাঝেই ঘাড় উঁচিয়ে নন্দিতার দিকে তাকাচ্ছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে একবার শ্রাগও করল! যেন বলতে চায়, আমার কদর কত বুঝেছ? ঠিক তখনই নন্দিতার মাথায় আগুন জ্বলল। জেতা খেলাটা পণ্ড হতে নন্দিতা আগেই খেপেছিল, এবার ব্যাটটা টেবলের ওপর আছড়ে ফেলে পায়ে পায়ে মিহিরের এক হাত নাগালের মধ্যে এসে দাঁড়াল। ঠোঁটে ধারালো হাসি, চোখে চোখ। বলল, ক'দিন আগে মায়ের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় গাবে হাউসের সামনে বসে মজা দেখছিলাম। একটা নতুন শিম্পাঞ্জী আনা হয়েছে। সেটার একমাত্র গুণ হল দর্শকদের থেকে বেছে কেবল মেয়েদের বার করে নানা রকম ভঙ্গিতে তাদের এন্টারটেইন করা। মেয়েরা যত লাফায় ওটার লম্ফ-ঝম্পও ততো বাড়ে। ...তোমাকে দেখে হঠাৎ ওটার কথা মনে পড়ে গেল।

অন্য মেয়েগুলো হকচকিয়ে গেছে। কিন্তু মিহির একগাল হেসে বলে বসল, আমিও ওটাকে চিনি। আসলে পছন্দ মাফিক একটা শিম্পাঞ্জীর অভাবেই অমন লাফঝাঁপ করে, পেলেই ঠান্ডা মেরে যাবে। তোমাকে দেখে হঠাৎ আমার এটাই একমাত্র সলিউশন বলে মনে হল।

স্মার্ট মেয়ে নন্দিতা এরপর বোকার মতোই রাগে ফুঁসে এক ঝটকায় চলে এসেছে। পিছনে আদেখলা মেয়েগুলোর আর ওই ডেঁপো ছেলের হাসির হুল্লোড় কান দুটোতে করকর করে বিঁধেছে। পরে রাগ কমতে নিজেরও অবশ্য হাসিই পেয়েছে, আর ও ছেলের কাছে ভালোরকম জব্দ যে হয়েছেই সে কথা অস্বীকার করতে পারেনি। বোকার মতো ওভাবে রাগ করে চলে না এসে উচিত ছিল ধরেধরে বেশ করে মেয়েগুলোর মাথা ঠুকে দেওয়া। ওদের জন্যেই তো এত বাড় ওই ছেলের।

স্কুলের বাসেই যাতায়াত করত নন্দিতা। এরপর থেকে বাস আসার সময় হলেই ডেঁপো ছেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘটা করে হাত নেড়ে টা-টা করত। নন্দিতা না দেখার ভান করত। তখন ওর ক্লাস এইটের শেষ আর মিহিরের সামনেই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা। স্কুলের পাট সারা, বাড়িতে বসে ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কত যে তৈরি হচ্ছে নন্দিতা ভালোই বুঝত। পরীক্ষা কেমন হবে ফল বেরুলেই দেখা যাবে। নিজেও তো ভালো ছাত্রী, রেজাল্ট ভালো করতে হলে কাঠখড় পোড়ানো দরকার তা বেশ জানা আছে। যখনই চোখ পড়ে, তখনই দেখে সামনের বারান্দায় চেয়ার-টেবল সাজিয়ে কতকগুলো বইখাতা নিয়ে মূর্তিমান এদিকেই চেয়ে বসে আছে।

একদিন নন্দিতা স্কুল-বাসে উঠতে যাবার সময় যথারীতি মিহির বারান্দায়, আর ঠিক সামনে তার বাবা দাঁড়িয়ে কী যেন করছে। বাসটা ওদের বাড়ির পাশে আসতেই নন্দিতা সদর্পে ফিরে তাকাল, ভাবখানা, আজ টা-টা'র কী হল? কিন্তু ও ছেলে কত বড়ো বজ্জাত যদি জানত! চোখের পলকে টেবল থেকে লম্বা খাতাটা খুলে বাবাকে আড়াল করে ঘটা করে হাত নাড়তে লাগল। নন্দিতা রাগের চোটে চার আঙুল জিভ বার করে ভেংচি কেটেই অপ্রস্তুত। মেয়েরা অনেকেই, আর বাসে যে দুজন মিস্ থাকে তারাও ব্যাপারটা দেখেছে। দুজনেই ভয়ানক গম্ভীর, মেয়েরা কেউ কেউ রুমালে মুখ আড়াল করে হাসছে। জিনিসটা ঘোরালো হল টিফিনের সময়। প্রিন্সিপাল নন্দিতা বোসকে তাঁর ঘরে তলব করলেন। ভালো ডিবেটার আর নামী ছাত্রী নন্দিতা এত বছরের স্কুল জীবনে এই প্রথম আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল। প্রিন্সিপালের মুখ থমথমে।

—তুমি আজ বাসে কী করেছ?

নন্দিতা তক্ষুণি মাথা নেড়েছে, কিছু করিনি।

—তাহলে দুজন মিস্-ই বাজে কথা বললেন?

নন্দিতা চুপ।

—তুমি ভালো ছাত্রী, ভালো ফ্যামিলির মেয়ে, পড়ছ ভালো স্কুলে, তোমার কাছ থেকে এ ধরনের বিহেভিয়ার আশা করিনি। ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম হলে বাড়িতে চিঠি যাবে, যাও।

অপমানে কাঁপতে কাঁপতে নন্দিতা ক্লাসে এসেছে। সেদিন অর এক বর্ণও পড়া মাথায় ঢোকেনি। স্কুল ছুটি হতে নিঃশব্দে বাসে উঠেছে। কারুর দিকে তাকায়নি। বাস বাড়ির সামনে আসতে নেমেছে,

তারপর গটগট করে রাস্তা পেরিয়ে বাসের মেয়েদের আর দোতলায় দাঁড়ানো মায়ের হতভম্ব চোখের ওপর দিয়ে সোজা দত্ত বাড়িতে ঢুকেছে। মিহির দত্ত তখন বারান্দায় ছিল, এসময় রোজই থাকত। সে বেশ হকচকিয়ে গেছে। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই নন্দিতা ওদের দোতলার বারান্দায়। সামনের টেবলে অন্য বইপত্তরের সঙ্গে সকালের সেই লম্বা খাতাটাও ছিল। আচমকা সেটা তুলে অবাক ছেলেটার মাথায় ঠাস করে একটা বাড়ি মেরে বসল নন্দিতা, তারপর খাতাটা ওর মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে তেমনি গটগট করে নেমে গেল। বাড়ি ঢুকতেই মা ওর ওপর চড়াও, এটা কী করে এলি?

নন্দিতা দ্বিগুণ ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, বেশ করেছি, ওই বজ্জাত ছেলের জন্যে স্কুলে আজ কীরকম নাকাল হয়েছি জানো?

মা অবাক। কী হয়েছে বলবি তো?

রাতে খাওয়ার সময় বলব'খন। তখন বাবাও থাকবে...

মেয়ের মেজাজ দেখে শমিতা বোস আর এ নিয়ে কথা বাড়ায়নি। এরপর নন্দিতা ওই বারান্দার দিকে ফিরেও তাকায় না। কিন্তু কেউ একজন যে ওখানে বসে ওর যাওয়া আসা আগের থেকেও বেশি লক্ষ্য করে তা ঠিক টের পেত।

কিছুদিন পরে জয়া একদিন হাঁপাতে হাঁপতে এসে হাজির। হ্যাঁরে, তুই নাকি মেরে মিহিরের মাথার ঘিলু নাড়িয়ে দিয়েছিস? সত্যি?

নন্দিতার হাসার কথা, কিন্তু রাগই হয়ে গেল। বলল, খবরটা কাগজে বেরিয়েছে?

—বেরুনোর মতোই তো, তুই সত্যি দোতলায় উঠে গিয়ে ওকে মেরেছিস?

—ও তাই বলল?

—বলল মানে? মার খেয়ে অমন খুশি মুখ জীবনে দেখিনি। হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি বয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল সেদিন ওর টা-টা করা আর তোর জিভ ভ্যাংচানো নিয়ে স্কুলে কিছু হয়েছিল কি না।

নন্দিতা খেঁকিয়ে উঠল, আর তুই ওমনি হ্যা-হ্যা করে সব বললি?

—বলবো না তো কী? কিন্তু শেষে তোকে যা একহাত নিল না, শুনে আমরা হেসে মরি। থাক বাবা, তুই আরও রেগে যাবি।

—না তো কি তোদের মতো অনুরাগে ঢলে পড়ব? বলার জন্যে তোর পেট তো ফুলছে, দয়া করে গুণমণির গুণের কথা শুনিয়ে বিদেয় হ'। তোদের মতো আদেখলেও আর দেখিনি বাপু।

জয়ার কাঁচুমাচু মুখ, আমরা তো এলেবেলের দল, তুই হলি গিয়ে আসল নায়িকা। শোন তাহলে, মিহির বলেছে, নন্দিতা বসু তো খুব ভাল ছাত্রী, তাই হৃদয়ে না মেরে সরাসরি মগজে মেরেছে। এর ফলে ওর মাথা এখন দারুণ সাফ, কিন্তু বুকে বড়ই ব্যথা। তোর মার নাকি ওর মস্তিষ্ক ছেড়ে হার্টের একেবারে মধ্যিখানে ঘা বসিয়েছে, তাই এর চিকিৎসাও তোকে দিয়েই করিয়ে ছাড়বে।

এর পরেও নন্দিতা মুখে রাগই দেখিয়েছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এবার যে-রকম সাড়া জেগেছে তা মাত্র এই বয়সের এক মেয়ের কাছে বিচিত্র তো বটেই।

পরের ঘটনা আরও নাটকীয়। নন্দিতা আর মিহিরদের স্কুল একই চার্চের অধীনে। দুটোই নামকরা কেতাদুরস্ত ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুল। এদের কোনো ফাংশনে ওদের বা ওদের কোনো অনুষ্ঠানে এদের ছাত্রছাত্রীদের নেমন্তন্ন থাকেই। সেবারের সিনিয়ার-কেম্ব্রিজ পরীক্ষার ঠিক পরেই নন্দিতাদের স্কুল তাদের বিদায়ী ছাত্রীদের নিয়ে একটা সোশ্যাল গেট-টুগেদারের আয়োজন করল। আর তাতে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হল ঐ চার্চের আন্ডারের আর বাকি তিনটে স্কুলের বিদায়ী ছাত্রছাত্রীরা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মিহিরদের নেমন্তন্ন হয়েছে। নন্দিতাদের কাজ সেদিন অতিথি ছাত্রছাত্রীদের ভালোভাবে অভ্যর্থনা করা।

সন্ধের সময় ফুল-কাগজ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো মস্ত হলে অতিথিরা সব জড় হয়েছে। মিহিরদের স্কুলের সকলেই এসেছে। স্পোর্টস্-এ মিহির দত্ত বরাবরের একচেটিয়া চ্যাম্পিয়ন, ইন্টার-স্কুল স্পোর্টস কম্পিটিশনেও ক'দিন আগে পর্যন্ত নিজের স্কুলকে বহু কাপ-শিল্ড এনে দিয়েছে। তাই তাদের স্কুলের সে মধ্যমণি। তার হাবভাবেও হিরোসুলভ ভাব স্পষ্ট। দেখাচ্ছেও সেই রকমই।

এই বয়সেই প্রায় ছ'ফুট ছুঁই ছুঁই সটান চেহারা। পেটানো ছিপছিপে শরীর। পাকা গমের মতো গায়ের রং। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল আর চকচকে দুটো কালচে বাদামী দুষ্টুদুষ্টু চোখ। পরনে সেদিন ঘন ছাইরঙা সাফারি সুট। সব মেয়ে ছেড়ে নন্দিতাও যে চুরি করে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল, সে কথা নিজের কাছে আর অস্বীকার করে কী করে! নাটকীয় ঘটনাটা ঘটল নাচের বাজনা শুরু হবার পর। সাহেবী কায়দার স্কুল, এ ধরনের স্যোশাল সাধারণত মিউজিক আর নাচ দিয়েই শুরু হয়। সে দিন ছিল লেডিজ চয়েস। অর্থাৎ মেয়েরা যার যার পার্টনার বেছে নিয়ে নাচের ফ্লোরে যাবে। নন্দিতার স্কুল এই ফাংশানের অরগ্যানাইজার। সুতরাং ওদের স্কুলের বিদায়ী ব্যাচের মেয়েদেরই প্রথম চান্স পার্টনার বাছাইয়ের। বলা বাহুল্য প্রথম মেয়েটিই মিহিরকে পছন্দ করল। কিন্তু অবাক কাণ্ড, দেখা গেল মিহির হাতজোড় করে মাথা নেড়ে নিজের অক্ষমতা জানাল। সাধারণত এ ধরনের অনুষ্ঠানে এরকম ব্যাপার বড় একটা হয় না। হঠাৎ কারুর শরীর খারাপ হলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু মিহির দত্তকে দেখে কেউ বলবে না তার শরীর এতটুকু অসুস্থ। ফলে সেই মেয়ে যেমন অপ্রস্তুত তেমনি অবাক। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মেয়েটির বেলায়ও একই ব্যাপার। মিহির সবিনয়ে তাদের কাছেও মাফ চেয়ে নিল। এর পরের মেয়েরা কিছু একটা হয়েছে বুঝে ওকে এড়িয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল মিহিবদের স্কুলের প্রতিটি ছেলেই শুধুমাত্র নন্দিতাদের স্কুলের মেয়েদেরই বাতিল করছে, অথচ অন্য স্কুলের মেয়েরা যখন ডাকছে তখন দিব্যি হাসিমুখে নাচে যাচ্ছে। মিহিরও গিয়ে অন্য স্কুলের একটি মেয়ের সঙ্গে একদফা নেচে এলো। অপমানে নন্দিতাদের স্কুলের মেয়েদের মুখ লাল। হেড প্রিফেক্টকে জানাল, তারা চলে যাচ্ছে, ডিনারেও থাকবে না। হেড-প্রিফেক্ট ডোরা জোন্সও কিছু একটা আঁচ করেছিল। সে আবার মিহিরের প্রচণ্ড ফ্যান। নন্দিতা দেখল, ডোরা মিহিরকে একপাশে ডেকে নিয়ে এ ব্যাপারেই কিছু জিজ্ঞেস করছে। মিহির কী বলতে ডোরা অবাক হয়ে নন্দিতার দিকেই ঘুরে তাকাল, তারপর হাত তুলে ওকে কাছে ডাকল।

কিছু না বুঝেই নন্দিতা এগিয়ে এসেছে।

ডোরা বলল, মিহির বলছে তোমার জন্যেই ওরা আমাদের স্কুলের মেয়েদের বয়কট করেছে—হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার? ইউ শুড নট অ্যালাও এনি পার্সোনাল ফিলিং টু স্পয়েল দিস স্যোশাল! ইউ শুড সেটল্ দিস ইওরসেলফ!

হতভম্ব নন্দিতা কিছু জবাব দেবার আগেই মিহির বলে উঠল, ও ডোরা! ইউ আর সিম্পলি মিস্টেকেন, আমি কখনোই বলিনি, "নন্দিতার জন্যে"—শী ইজ জাস্ট দ্য এফেক্ট, নট দ্য কজ—

ডোরা এবার মিহিরকেই ধরেছে, দেন প্লিজ ডোন্ট স্পয়েল দিস ইভনিং, কী হয়েছে বা কোথায় তোমাদের অসুবিধে আমাকে খুলে বল। আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট টু সল্ভ ইট।

নন্দিতার বিস্ফারিত চোখের সামনে মিহির বলে গেল, ইউ নো ডোরা, নন্দিতা আর আমি এক পাড়ায় থাকি।—মাঝে-মধ্যে এক সঙ্গে খেলাধুলোও করতাম। উই ওয়্যার ভেরি গুড ফ্রেন্ডস্। ও স্কুল-বাসে ওঠার সময় রোজ হাত নেড়ে উইশ করতাম। পরে জানতে পারি এর জন্যে নন্দিতাকে মিসবিহেভিয়ারের অপরাধে তোমাদের প্রিন্সিপাল ওয়ার্নিং দিয়েছেন। আর সেদিন থেকে আমাদের বন্ধুত্বও শেষ।...ন্যাচারালি আই ওয়াজ ভেরি ভেরি আপসেট। আমার বন্ধুদেরও ব্যাপারটা জানিয়েছিলাম। তারপর তোমাদের স্কুল থেকে সোশ্যালের এই ইনভিটেশন পেয়ে আমরা খুব ওরিড।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে মিহির চুপ করল।

নন্দিতা আর ডোরা দুজনেই হাঁ করে মিহিরের কথা শুনছিল। ডোরা উৎসুক, কেন, ওরিড কেন?

মিহির দত্তর নিপাট ভালমানুষের মুখ, ওরিড হব না? যে স্কুলে বন্ধুকে হাত নেড়ে উইশ করাটা মিসবিহেভিয়ারের পর্যায়ে পড়ে, সেই স্কুলের কম্পাউন্ডে দাঁড়িয়ে সেখানকারই ছাত্রীদের কাঁধ ধরে নাচাটা কোন দরের অপরাধ হবে বুঝতে পারিনি যে! সেই ভয়েই তো তোমাদের মেয়েদের সঙ্গে নাচতে রিফিউজ করেছি!

ডোরার মুখ লাল, কিন্তু আমি শুনেছি নন্দিতা তোমাকে ভেংচি কেটেছিল, শী শুডনট হ্যাভ ডান দ্যাট হোয়েন শী ওয়াজ ইন স্কুল-বাস!

মিহির সাদা সাপটা জবাব দিল, এক একজনের এক এক রকম করে উইশ করার রীতি। ও আমাকে বরাবরই ওই ভাবে উইশ ব্যাক করে। তার সঙ্গে স্কুল বা স্কুল-বাসের কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না। আমার শেষ কথা, তোমাদের স্কুলের জন্যেই আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়েছে। আই ওয়াজ ভেরি আপসেট ফর দ্যাট, অ্যান্ড স্টিল আই অ্যাম ইন আ ভেরি ভেরি অফ্ মুড।

নন্দিতা হাঁ! কিন্তু ডোরাই যেন ফাঁপরে পড়ল, এতদিন আগের ব্যাপার, এর জন্যে এখন কি-ই বা করতে পারি। ...ভাবল একটু, তারপর নন্দিতার দিকে ফিরল।— নন্দিতা, তুমিই ব্যাপারটা মিউচুয়াল করো—শেক হ্যান্ডস্ অ্যান্ড সে সরি টু হিম।

হেড প্রিফেক্টের নির্দেশ স্কুলের ছাত্রীরা মানতে বাধ্য। নন্দিতাকে হাত বাড়াতেই হল। কিন্তু মিহিরের দুটো হাতই ট্রাউজার্সের পকেটে। সাফ জবাব দিল, আমি এভাবে মিউচুয়াল করব না।

অপমানে এবার নন্দিতার চোখে জল এসেছে। ডোরাও কী করবে বুঝতে পারছে না। এই স্যোশালের পুরো দায়িত্ব তার ওপর। তাড়াতাড়ি একটা কিছু মিউচুয়াল না করাতে পারলে এই স্কুলের মেয়েরা চলে যাবে। এরকম আর কখনো হয়নি। অসহায় মুখে ডোরাই মিহিরকে ধরল এবার, প্লিজ মিহির, ফেয়ারওয়েল পার্টিতে এ ধরনের আনপ্লেজেন্ট সিচুয়েশান ক্রিয়েট কোরো না, লেট আস পার্ট অ্যাজ ফ্রেন্ডস্। তুমিই বলে দাও ব্যাপারটাকে মেন্ড করার জন্যে আমি কী করতে পারি...।

মিহির এতক্ষণে নন্দিতার দিকে সরাসরি তাকাল। ঠোঁটে চোখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। তারপর ডোরার দিকে ফিরল, এই মিউজিক নাম্বারটা শেষ হলেই তুমি ফ্লোরে গিয়ে অ্যানাউন্স করো, অ্যাজ আ স্পেশাল কেস, নেক্সট রাউন্ডে আমার স্কুলের ছেলেরা শুধু তোমাদের স্কুলের মেয়েদের সঙ্গেই নাচবে, আর আমি নন্দিতার সঙ্গে নাচব। হেড-প্রিফেক্ট হিসেবে তুমি এটা করতেই পারো। তা হলেই মিউচুয়াল হবে।

এরপর কোনোদিকে না তাকিয়ে লম্বা পা ফেলে মিহির তার বন্ধুদের কাছে গিয়ে বসল।

ডোরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। পরের নাম্বারের বাজনা শুরু হবার আগেই মিহিরের কথামতো অ্যানাউন্স করেছে। মিহির ওর স্কুলের ছেলেদের ইশারা করতে তারা নন্দিতার স্কুলের ছাত্রীদের কাছে ঘটা করে মাফ চাইল, তারপর তাদের হাত ধরে ফ্লোরে নিয়ে গেল। মিহির নন্দিতার দিকে এগিয়ে এল! নন্দিতা দরদর ঘামছে, মাথা ঝুঁকিয়ে ওকে বাও করল মিহির, তারপর হাত ধরে ফ্লোরে নিয়ে গেল।

ঝমঝম করে মিউজিক বাজছে, অন্য জুটিরা নাচে মশগুল। নন্দিতা এমনিতে মন্দ নাচে না, কিন্তু সেদিন ওর পা দুটো যেন কাঠ। বাজনা কানে যাচ্ছে না, এমন কি ভাল করে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না। অবশ্য তার জন্যে খুব একটা অসুবিধেও হচ্ছে না। ওর অবস্থাটা আঁচ করেই যেন নাচের সহজ কায়দায় মিহির ওকে আগলে রেখেছে, আর অনায়াস নিপুণতায় ফ্লোরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খুব ভাল নাচতে না জানলে সেদিন মিহিরের যে কোনো মুহূর্তে নন্দিতার নড়বড়ে পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ার কথা।...হলের সমস্ত চোখ ওদের দিকে। পুরো গণ্ডগোলের মূলে যে নন্দিতা, সেটা সবাই বুঝেছে। তার ওপর বন্ধুদের সঙ্গে ডোরার ফিসফিসানি তো এখনো চলছে। রসিয়ে রসিয়ে এই ব্যাপারটাই বলছে নিশ্চয়! নন্দিতার কান-মুখ গরম হয়ে উঠল।

নাচের নাম্বারটা শেষ হওয়া মাত্র শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে কোনোরকমে বাড়ি ফিরেছে নন্দিতা। চেহারা দেখে বাবা-মা অবাক। ওর ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে যেন। তাদের উৎকণ্ঠা এক কথায় এড়িয়ে গেছে। বলেছে, বেজায় মাথা ধরেছে, ঘুমুলেই ঠিক হয়ে যাবে।

নিজের ঘরে এসে বিছানায় আছড়ে পড়েছে নন্দিতা। প্রথমে রাগে বালিশটাকে কুটিকুটি করতে চেয়েছে, তারপর কেন জানি সেটাকেই বুকে আঁকড়ে ধরে ফুলে ফুলে কেঁদেছে, তারও পরে একসময় ওটাকেই জাপটে সারা বিছানায় গড়িয়েছে আর নিজের মনে হেসেছে। ভেবেছে স্কুলের মেয়েরা এরপর ওকে টিকতে দিলে হয়, বিশেষ করে জয়াটা। সামনের ছুটির পরে স্কুলে যাবে কী করে?

নন্দিতা তখনো জানে না এই সমস্যার সমাধান হয়েই আছে। তার মা শমিতা বোস দার্জিলিংয়ের এক কনভেন্টে ওকে রাখার সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছে।

হ্যাঁ, শমিতা বসুই নন্দিতাকে দার্জিলিংয়ে রেখে এসেছিল। দেখা গেল অনেক আগে থেকেই সব ঠিকঠাক করা ছিল। বাড়ির কাজের লোকেরা পর্যন্ত, অর্থাৎ বুদ্ধু, দুলালদা, ছায়াদি, ড্রাইভার ছোটেলাল আর তার বৌ মোতিয়া—সব্বাই সব জানত। এমন কি বাবা প্রতাপ বোসও জানত! জানত না শুধু নন্দিতা নিজে।

ওই নাচের ঘটনার পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে নন্দিতা বাবা-মায়ের সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করছিল। আসল লক্ষ্য ছিল বাবাকে মজার ব্যাপারটা শোনানো। ছোটবেলা থেকেই বাবাকে প্রতিটি কথা না বলা পর্যন্ত নন্দিতার স্বস্তি নেই। লেখিকা হওয়া সত্ত্বেও মা-ই বরঞ্চ সবকিছু সাদা মনে হজম করতে পারে না। ওকে ঠাণ্ডা গলায় কত কথা শুনিয়েছিল মিহিরের মাথায় খাতার বাড়ি মারার ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু সব শুনে প্রতাপ বোস হা হা করে হেসে উঠেছিল। অবশ্য স্ত্রী ঠাণ্ডা চোখে কিছু ইশারা করতে ঝপ করে নিজেকে সামলে নিয়ে কাজের দোহাই দিয়ে নিচের অফিস ঘরে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু নন্দিতা স্পষ্ট দেখেছে বাবার মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি চুঁয়ে পড়ছিল। তারপরে তো স্কুলের এই স্যোশালের ঘটনা। ভেবেছিল, সব শুনে মা-ই গম্ভীর হয়ে যাবে আর বাবা হাসি চাপার চেষ্টা করবে।...অবশ্য মিহিরের সঙ্গে সেদিন অত ক্লোজ নাচার ফলে ভেতরে ভেতরে যে কেমন একধরনের অস্বস্তি লাগছিল, আবার স্বপ্নের ঘোরের মতো কী রকম এক অদ্ভুত ঝিম ধরেছিল সে কথা নন্দিতা মরে গেলেও বাবাকে বলতে পারবে না। খুব সাদাসিধে ভাবে ওই ছেলের দুষ্টুমির গল্পই শুধু করেছিল। তারপর নিজের মনেই বলেছে, কী করে যে এরপর স্কুলে যাব! জয়াটা তো আমাকে পাগল করে ছাড়বে!

নন্দিতাকে চমকে দিয়ে হাসি হাসি মুখে উত্তরটা দিয়েছিল মা শমিতা বোস।—তোকে আর ওই স্কুলে যেতে হবে না।

নন্দিতা হতভম্ব। —তার মানে?

—মানে আবার কী, তোদের এবারের অ্যানুয়াল পরীক্ষার আগে থেকেই দার্জিলিং-এর নামজাদা কনভেন্টে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আগে জানলে পরীক্ষাটা খারাপ হতে পারে ভেবে বলিনি।

নন্দিতা তখনো নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। বলল, কিন্তু আমার অ্যাডমিশন টেস্ট?

শমিতা বসুর হাসি হাসি মুখ, তোদের স্কুল যে চার্চের দার্জিলিং-এর ওই কনভেন্টও সেই এক চার্চের। তাছাড়া দুই প্রিন্সিপালেরও খুব খাতির। ক্লাস ওয়ান থেকে সেভেন পর্যন্ত তোর সব রিপোর্ট ওখানকার প্রিন্সিপাল খুঁটিয়ে দেখেছেন। এবারের নাইনে ওঠার রেজাল্টের কপিও তোদের স্কুল থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা শুধু তোর একটা ইন্টারভিউ নেবে। তা তুই তো সেটা ভালোই পারবি?

তবু সবকিছু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না নন্দিতা। কান্না চেপে ঝাঁঝাল গলায় বলে উঠেছিল, কিন্তু কেন? এর দরকার হল কেন? এবারও আমি সেকেন্ড হয়ে ক্লাসে উঠেছি, এবারও ইন্টার-স্কুল ডিবেট কম্পিটিশনে ফার্স্ট প্রাইজ নিয়ে এসেছি, প্রিন্সিপালই বা তোমার সঙ্গে ষড় করে আমাকে তাড়াতে রাজি হল কেন? সে নিজে তো আমাকে যথেষ্ট ভালবাসে!

জবাবে শমিতা বসু এবার গম্ভীর একটু। —কেউ তোকে তাড়াচ্ছে না! এটা ক্লাস নাইন, মাত্র তিনটে বছর হস্টেলে থাকা। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিয়েই আবার বাড়ি চলে আসবি। এর মধ্যে ছুটি-ছাটায় আমি বা তোর বাবা গিয়ে তোকে নিয়ে আসব, কিংবা সকলে মিলে কোথাও বেড়াতে যাব।

নন্দিতা চিৎকার করে উঠেছে, কিন্তু কীসের জন্যে তোমার এই ব্যবস্থা আমি জানতে চাই।

শমিতা বোস ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিয়েছে, নিশ্চয় জানবি, তোকে নিয়েই ব্যাপার যখন...। প্রথম কথা, তুই আমাদের একটাই মেয়ে। সমবয়সী সঙ্গীসাথীর সঙ্গে প্রত্যেকের অন্তত কিছুদিন একসঙ্গে থাকা দরকার। তাছাড়া আমার লেখার চাপ দিন দিন বাড়ছে, মাঝে মাঝে বাইরেও যেতে হয়। এদিকে তোর বাবা নিজের কাজ নিয়ে নাওয়া-খাওয়ার সময় পায় না, আর তোকে এইভাবে একলা রেখে আমি নিশ্চিন্তে কোথাও যেতেও পারি না...

নন্দিতা ফুঁসে উঠেছিল, ও! তোমার সভাসমিতি, লেখা, বাইরে যাওয়া এসবের জন্যেই তাহলে আমাকে তাড়ানোর প্রয়োজন?

জবাবে কিন্তু মায়ের মুখখানা অদ্ভুত কমনীয় দেখাল এবার। চুপচাপ একটু চেয়ে থেকে বলল, যা করছি শুধু তোরই ভালোর জন্যে করছি, এটা ভাবিস না কেন?

মায়ের এই সুন্দর অথচ ঠাণ্ডা ব্যক্তিত্বকেই সবচেয়ে বেশি ভয় নন্দিতার। যতই নরম গলায় কথা বলুক, এর যে কোনো নড়চড় হবে না সে জানে। তবু শেষ চেষ্টায় মরিয়া হয়ে প্রতাপ বসুর দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠেছিল, বাবা! তুমিও সব জানতে, তুমিও?

দুঁদে উকিল প্রতাপ বোস, সে পেছনে থাকলে জুনিয়রদের বুকের পাটা অনেকটাই বাড়ে, সে-ও মেয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি। কিন্তু কিছু একটা চাপা ক্ষোভে তারও মুখ লাল। বিড় বিড় করে শুধু বলল, আমি মাত্র দু'দিন আগে জেনেছি।...যাক, এত মন খারাপ করছিস কেন, গিয়েই দেখ না কেমন লাগে।...আধ-খাওয়া চায়ের কাপ ঠেলে সরিয়ে নিচের অফিসে চলে গিয়েছিল।

না, এ নিয়ে নন্দিতা আর একটি কথাও বলেনি। ওর বদ্ধ ধারণা মা মিহির দত্তর ব্যাপারে অনেক আগে থেকেই সন্দেহ করে ওকে গোড়াতেই সরিয়ে দিচ্ছে। মনে মনে নন্দিতার আরও রোখ চেপে গেল। মিহিরের সঙ্গে এই জন্যেই ও যোগাযোগ রাখবে। দার্জিলিং তো আর রাজ্য ছাড়া জায়গা নয়! সেখান থেকে চিঠি কলকাতায় আসে না? বাবাকে জব্দ করার কথা নন্দিতা ভাবতে পারেনি, তাকে এই ষড়যন্ত্রের একজন বলেও চিন্তা করতে পারেনি।...যেদিন কলকাতা ছেড়ে এলো তার আগের রাতে বাবা নিঃশব্দে এসে ওর মাথায় হাত রেখেছিল। ওই শক্ত মানুষটার চোখ থেকে তখন জল পড়ছিল। বাবা ভেবেছিল ও ঘুমিয়ে পড়েছে। নন্দিতা কাঠ হয়ে পড়ে থেকে নিজের কান্না আটকেছে। আর সেই মুহূর্তে ও মনে মনে ঠিক করেছে ও পুরোপুরি বাবার মেয়ে হবে। মায়ের এত নাম-ডাক, যা কিনা এতদিন ওরও সঙ্গোপন আকাঙ্ক্ষার জিনিস ছিল, বাবার এই নিঃশব্দ চোখের জলে তা কোথায় ধুয়ে গেল। ভালোভাবে সিনিয়র কেম্ব্রিজ আর বি. এ. পাস করার পর পারলে এম. এ করবে, কিন্তু ল'টা নিশ্চয় পড়বে। আর তারপর নামজাদা লয়ার প্রতাপ বোসের মেয়ে নন্দিতা বোস বাবার অফিসেরই একজন হবে।

স্কুলের তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে গেছে। চিঠিতে মিহিরের সঙ্গে যোগাযোগ তো ছিলই, মধ্যে মধ্যে ছুটি-ছাটায় ও হঠাৎ কয়েকবার দার্জিলিং-এ চলেও এসেছে। ওই ছেলেও এই তিনটে বছর কলকাতায় থাকেনি। কলকাতা-ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা আর রেজাল্টের কোনো ঠিক না থাকায় সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করেই বম্বের এক নামজাদা কমার্স কলেজে অ্যাকাউনটেন্সিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। আর ফার্স্ট ইয়ারেই চার্টার্ড প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাস করে ওরই বাবার এক বন্ধুর ফার্মে আর্টিকল্‌শিপ জয়েন করেছিল। যতই বজ্জাতি করুক না কেন, সিনিয়র কেম্ব্রিজে হাই ফার্স্ট ডিভিশনই পেয়েছিল মিহির। ইয়ার্কি মেরে এর পুরো ক্রেডিট অবশ্য নন্দিতাকেই দিয়েছে। ঠিক সময়ে মাথায় খাতার বাড়ি দিয়ে মগজ সাফ করে দেওয়ার জন্যেই নাকি এত ভাল রেজাল্ট হয়েছে। ছেলে যে পড়াশুনোতেও এত চৌকস তা নন্দিতা সত্যি প্রথমে বুঝতে পারেনি। সিরিয়াসনেসের ছিটে-ফোঁটা নেই, সারাদিন হইহই করে খেলে বেড়ানো আর দিনরাত মগজে যত দুষ্টুমি বুদ্ধির চাষ যে ছেলের, সে এত ভাল রেজাল্ট করে কী করে নন্দিতা ভেবে পেত না। মিহির অবশ্য বলত, ওর পড়ার আসল সময় হল গভীর রাতে।

এরপর বি. কম. পরীক্ষায় মিহির অল্পের জন্যে ফার্স্ট ক্লাসটা ফসকাল। এর সঙ্গে অবশ্য সি এ-র ইন্টারমিডিয়েট, আর ফাইনালের একটা গ্রুপ এক এক বারেই পাস করেছে। কিন্তু আটকেছে দ্বিতীয় গ্রুপে। নন্দিতাকে বুঝিয়েছে সি. এ পরীক্ষায় এই ফেলটুকু না করাই বরং আশ্চর্যের। পরের বার ঠিক উতরে যাবে। নন্দিতা চিঠিতে রাগ দেখাতে ছাড়েনি। সব রেষারেষি ভুলে মনের দিক থেকে দুজনেই তখন অনেক কাছাকাছি।

কিন্তু আশ্চর্য, এই তিন বছরে নন্দিতার একবারও বাড়ি আসা হয়নি। চিঠিতে অবশ্য বাবা-মার সঙ্গে যোগাযোগ বরাবর ছিলই। তারাও একবার না একবার এসেছে। কিন্তু ওর বাড়ি যাওয়া যে

কোনো না কোনো কারণে আটকে যাচ্ছে তা অত খেয়ালও করেনি তখন। ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ওঠার পরীক্ষার পর লম্বা ছুটিতে মা এসে ওকে নিয়ে ছোটমাসি-মেসোর সঙ্গে দক্ষিণ-ভারত বেড়াতে বেরিয়েছে। বাবার কলকাতাতেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়ার সময় থাকে না, ফলে তার না বেরুনোই স্বাভাবিক। বাবা ছোট্ট চিঠিতে জানিয়েছে, কাজের চাপের জন্যে তার আসা হল না। নানু-মা (বাবার কাছে নন্দিতা বরাবরই নানু-মা) যেন বুড়ো ছেলের ওপর রাগ না করে। সামনের বছর নিশ্চয় আসবে।

নন্দিতাও চিঠি পড়ে হেসেছে। কোথাও যাওয়ার কথা উঠলেই বাবা সামনের বছর দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু পরের বছর, অর্থাৎ টেন থেকে ইলেভেন-এ ওঠার পরীক্ষার পর নন্দিতাকে অবাক করে দিয়ে সত্যি সত্যি প্রতাপ বোস এসে হাজির। না এসে উপায়ও ছিল না। কারণ শমিতা বোস তখন বাংলাদেশের প্রথম সারির লেখিকা হিসেবে বিদেশের আমন্ত্রণে ইউরোপে। ফলে মা ছাড়া একা বাড়িতে থাকার চিন্তা বাতিল করে নন্দিতা বাবার সঙ্গে উত্তর-ভারত ঘুরে এসেছে।

তার পরের বছর ফাইনাল ইয়ার। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষার পর স্কুলের পাট গুটিয়ে একেবারে বাড়ি ফেরার কথা। মধ্যে অবশ্য পুজোর ছুটিতে দিন কতকের জন্যে কলকাতা ঘুরে যেতে পারত, কিন্তু পরীক্ষার ভয়ে নন্দিতা নিজেই তা বাতিল করেছে। মা সেবার দুদিনের জন্যে এসে ওকে দেখে গিয়েছিল।

একেবারে তিন তিনটে বছর পরে নন্দিতা কলকাতায় ফিরেছে। এয়ারপোর্টে নিতে এসেছিল শমিতা বোস! তাতে নন্দিতা অবাক হয়নি। প্রতাপ বোস ব্যস্ত মানুষ, তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু অবাক হল যখন ছোটেলাল একটা অন্য বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল। সেখানে জীবনেও আসেনি। আরও অবাক ওই বাড়ি থেকে দুলালদা, ছায়াদি, বুদ্ধু বেরিয়ে এসে ওর মালপত্র নিয়ে যেতে। হাঁ করে নন্দিতা গাড়িতেই বসেছিল। মায়ের ডাকে চমক ভাঙল। কী রে, নাম!

—এখানে কেন, এটা কার বাড়ি?

—আস্তে আস্তে সব জানবি। এখন ভেতরে চল তো আগে।

নন্দিতা আরও অবাক।—কিন্তু এই বাড়ি কবে কেনা হল? আমি তো এখানকার ঠিকানায় কক্ষনো চিঠি দিইনি।...বাবা কোথায়?

—তোর বাবা তার পুরনো বাড়িতেই আছে।

নন্দিতা বিমূঢ়।—তার মানে? বাবা এখানে থাকে না?

—বলছি তো, আস্তে আস্তে সবই জানতে পারবি, আয়। শমিতা বোসের শান্ত জবাব।

তবু গাড়িতে বসে থেকেই নন্দিতা জিজ্ঞেস করল, এখানে তাহলে কে থাকে?

—আমি, ছায়া আর বুদ্ধু। দুলাল, ছোটেলাল আর মোতিয়া আগের বাড়িতেই তোর বাবার সঙ্গে আছে। তুই আসবি বলে ওরাও আজ এখানে এসেছে।

নন্দিতার মগজে একটা হিসেবের কারিকুরি চলছিল। এ ব্যবস্থা কতদিনের? সোজা মায়ের দিকে তাকাল।—ঠিক তিন বছরের বোধহয়?

শমিতা বসুর মুখে একটা দাগও পড়ল না। তেমনি সহজ গলায় জবাব, হ্যাঁ। তোকে হস্টেলে রেখে আসার পর থেকেই।

নন্দিতা দুচোখের ছাঁকনিতে মাকে চুলচেরা করে দেখে নিচ্ছিল। কিন্তু কোনো রকম বিড়ম্বনার ছিটেফোঁটাও সে মুখে ছিল না। যেন এরকমই হবার কথা, এটাই স্বাভাবিক। উল্টে মেয়েকেই মৃদু তাড়া লাগাল, তখন থেকে জেরা করে চলেছিস, নেমে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে আগে ঠাণ্ডা হ। তারপর তোর যেখানে ইচ্ছে সেখানেই থাকবি। যথেষ্ট বড় হয়েছিস, এখন আর আমি কোনোরকম জোর করব না।

নন্দিতা এরপর নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকেছে। আরও অবাক হয়েছে মাকে সহজ গলায় ফোনে বাবার সঙ্গে কথা বলতে শুনে। ওরই আসার খবর দেওয়া হল।

আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল নন্দিতার। বাবা-মায়ের মধ্যে যে বিরাট

কিছু হয়েছে তা জলের মতো পরিষ্কার এখন। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, ঘটেছে ও হস্টেলে যাওয়ার আগেই। অথচ ও কিনা এতদিন বোকার মতো ভেবেছিল মিহিরের থেকে দূরে সরানোর জন্যেই মা ওকে হস্টেলে দিয়েছে! বোকা, বোকা, দুনিয়ার বোকা নন্দিতা আবার কি না নিজের সাফ মাথার বড়াই করে। ...ওর ক্লাস এইট থেকে নাইনে ওঠার পরীক্ষার আগেই বাবার সঙ্গে মায়ের কিছু একটা নিয়ে বড় রকমের গণ্ডগোল হয়েছে। সেই জন্যেই মা নিঃশব্দে ওর ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে ওকে হস্টেলে পাঠিয়েছে। তারপর বুদ্ধু আর ছায়াদিকে নিয়ে বাবাকে ছেড়ে এ বাড়িতে এসে উঠেছে। সিনেমা আর লেখার দৌলতে এখন নিজের টাকার তো অভাব নেই! আর এই তিন বছর কোনো না কোনো ছুতোয় ওর কলকাতায় আসাও ঠেকিয়ে রেখেছে। মায়ের প্ল্যানই ছিল একেবারে ফাইনাল পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত নন্দিতাকে কিছু বুঝতে দেওয়া হবে না। মা যা যা চেয়েছে ঠিক তাই হয়েছে।

সন্ধের পর মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল প্রতাপ বোস, কিন্তু ওপরে ওঠেনি। নিচে থেকে নন্দিতাকে খবর পাঠিয়েছে। আর আশ্চর্য নন্দিতার সঙ্গে সঙ্গে মা-ও নেমে এসেছে। বাবাকে দেখে বুকের মধ্যে মোচড়ই পড়েছে নন্দিতার। গত বছরেও তাকে এত শ্রান্ত দেখায়নি।

বাবা দু-হাতে ওকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়েছে আর বিড়বিড় করে শুধু বলেছে, নানু-মা, নানু-মা, নানু-মা আমার।

মায়ের ওপরেই প্রচণ্ড রাগ হয়েছে নন্দিতার। বরাবর বাবা হাই ব্লাডপ্রেসারের রোগী। যা-ই ঘটুক না কেন, তা বলে এভাবে লোকটাকে ছেড়ে আসতে পারল? ডিভোর্স যে করেনি তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কপালে সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, হাতে ঠাকুমার দেওয়া লোহা-বাঁধানো, শেষের বইটাতেও বোস পদবি, তাহলে এমন কী ঘটেছে? অথচ সমস্ত ব্যবস্থাটাই যে মায়ের সে তো দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট এখন।

শমিতা বোস পেছনে আছে জেনেই নন্দিতা প্রতাপ বোসকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে বলল, মায়ের সঙ্গে তোমার কী হয়েছে জানি না, আর জানতেও চাই না, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাদের পুরনো বাড়িতেই থাকব বাবা।

আশ্চর্য, প্রতাপ বোসই সেটা নাকচ করল। ভেতরের আবেগ প্রবল চেষ্টায় দমিয়ে মাথা নাড়ল।—না, আমি সারাদিন কাজে ডুবে থাকি, তোর ওখানে একলা একলা না থাকাই ভাল। এখন এখানেই থাক, আমার কাছে যখন ইচ্ছে হবে চলে আসবি।—ওটাই তো তোর নিজের বাড়ি!

তারপর আস্তে আস্তে উঠে চলে গেছে। স্ত্রীর দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি। শমিতা বোস নির্বিকার আর নন্দিতা নিস্পন্দ খানিকক্ষণ।

নন্দিতা মায়ের সঙ্গেই থেকে গেছল। কিন্তু সহানুভূতির সবটুকুই জমা হয়েছিল বাবার দিকে। বরং সেই থেকে মায়ের বহু ব্যাপারই খুব সোজা-সরল ভাবে নেয়নি। যেমন, হারানকাকার ব্যাপারটা। হারান ভট্‌চায্যি প্রতাপ বসুর কলেজের বন্ধু, তার তিনকুলে কেউ নেই। নন্দিতা শুনেছে, বাবার সঙ্গে কখনো সখনো তাদের বাড়ি এসে থাকত হারানকাকা। অদ্ভুত মেধাবী ছাত্র ছিল নাকি। কিন্তু বি. এ. পাস করার পর আর পড়লই না। কোথায় একটা চাকরি জোগাড় করে চলে গিয়েছিল। বছর পাঁচ-ছয় বাদে যখন ফিরে এল, তখন সে চাকরিও ছেড়েছে। আর সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে গোটা কয়েক বাচ্চা ছেলে, তার পুষ্যি, ওগুলোরও তিনকুলে কেউ নেই। কলকাতার কাছাকাছিই এক জায়গায় কয়েকটা চালাঘর তুলে হারানকাকা ওদের নিয়ে থাকত। জমিটা জলের দরে পেয়ে গিয়েছিল। ওখানেই একটা স্কুলে মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছিল। ছেলেগুলোকে লেখাপড়া থেকে জুতো সেলাই, সব শেখাত। আর কোথায় কে মরেছে তার সৎকার, কার অসুখ হয়েছে তার ওষুধ, কোন গরিবের ছেলের পড়ার টাকা নেই সেই ব্যবস্থা, তার বাহিনীকে নিয়ে চাঁদা তুলে তুলে এইসব করে বেড়াত। নন্দিতার বাচ্চা বয়সে তার টানেই হারানকাকা ওই পুরনো বাড়িতে আরও বেশি আসত। নন্দিতাও তাকে খুব ভালবাসত। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তার ওই ছেলেগুলোকে দুচোক্ষে দেখতে পারত না। কেমন যেন ভিখিরি ভিখিরি মনে হত। হারানকাকা তার এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছিল 'হোলি গার্ডেন'। কিন্তু নন্দিতা বলত

হারানকাকার গোয়াল। হারান ভট্‌চায্যি কিছু মনে করা দূরে থাক হেসে ওর নামকরণের তারিফ করত আর বলত, ঠিকই বলেছিস নানু-মা, এগুলোর মতো গরু আর দুনিয়ার কোথাও পাবি না। খড় জোটে না, বিচালি জোটে না, তবু দুধ দিতে বললেই এক পায়ে খাড়া।

নন্দিতা তখন কথাগুলোর মানে ঠিক ধরতে পারত না।

ছেলের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল। এখন চল্লিশ না বেয়াল্লিশটা ছেলে নিয়ে হারান ভট্টচায্যি দাপটের সঙ্গে দেশের উপকার করে বেড়াচ্ছে। আগের চালাঘরের বদলে এখন সেখানে একতলা লম্বা দালান-কোঠা। চারদিকের খোলা জমিতে চোখ জুড়োনোর মতোই ফুল আর সবজির বাগান। একদিকে হোগলার ছাউনি দেওয়া সারি সারি পড়ার জায়গা। পেছন দিকে ব্যায়ামের আখড়া। বছরে নানা জায়গা থেকে মোটা ডোনেশন আসে। টাকা বোধ হয় শমিতা বসুই সবচেয়ে বেশি ঢালে। নন্দিতার ধারণা মায়ের দৌলতেই হারানকাকা সবথেকে বেশি পেট্রন জোগাড় করতে পেরেছে।

মা সেই প্রথম থেকেই তার হারানবাবুর ভক্ত। অনাথ হা-ঘরের ছেলেগুলোকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করার এই চেষ্টাটা মা বরাবরই খুব বড় চোখে দেখত। হারানকাকাও তার হোলি-গার্ডেনের সব ব্যাপারে মায়ের ওপর খুব নির্ভর করত। কতদিন ওকে আর মাকে তার 'পবিত্র বাগান' দেখতে নিয়ে গেছে, এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে কতরকম প্ল্যান করেছে। মায়েরও এক দারুণ আগ্রহ লক্ষ্য করত। আগে নন্দিতার কোনোদিন কিছু মনে হয়নি। কিন্তু এখন হয়। কারণ, হারানকাকা বাবার বন্ধু হয়েও এখন আর ওবাড়িতে তার কাছে যায় না, অথচ এখানে হামেশাই আসে। মায়ের কাছে আসে। আর মা-ও কক্ষনো পুরনো বাড়িতে পা দেয় না কিন্তু হরদমই হারানকাকুর হোলি-গার্ডেন-এ যাচ্ছে। কখনো বা দু'চারদিন করে থেকেও আসছে। টাকা যে কত ঢালে তা নন্দিতা সঠিক জানে না, জানতে চায়ও না। নিজের রোজগারের টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে করুক গে। কিন্তু যার ওপর বিতৃষ্ণায় তার সঙ্গে এক বাড়িতে পর্যন্ত থাকে না, তারই বন্ধুর সঙ্গে এত মাখামাখি নন্দিতার খুব স্বাভাবিক মনে হয় না। অথচ শমিতা বোসের ব্যবহারে চেষ্টা করেও কোনো রকম ত্রুটি খুঁজে পায় না। হারানকাকার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় মায়ের মুখখানা উৎসাহ-উদ্দীপনায় জ্বল-জ্বল করতে দেখে। কিন্তু রাগে গা জ্বলে গেলেও কিছু বলতে পারে না। শমিতা বোসের অতি ঠাণ্ডা আচরণে এমন এক ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে যা স্পষ্ট নিষেধের মতো। চেষ্টা করেও এই ব্যক্তিত্বকে আঘাত করা যায় না। হারানকাকা অবশ্য এখনো নন্দিতাকে আগের মতোই ভালবেসে ডাকাডাকি করে, কিন্তু নন্দিতাই সহজ হতে পারে না, এড়িয়ে যায়। ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ ওই লোকটার চোখে যে সেটাও ধরা পড়ে তা বুঝতে পারে। তাই আরও রাগ হয়, আর তার সবটুকু ঝাল গিয়ে পড়ে মায়ের ওপর।

নন্দিতা ইদানীং অনেক সময় মায়ের সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করে। শিক্ষিতা মেয়ের এরকম আচরণে মাকে অবাক হতে দেখে। এর জন্যে পরোক্ষভাবে হারানকাকাকেই দায়ী করে মনে মনে। হস্টেল ছাড়ার পর কোলকাতায় আসার থেকে ওর জীবনের যে কোনো বিশেষ দিনে বাবা তো আসেই আর হারানকাকারও যেন সেদিনই আসা চাই-ই। মা-ই নিশ্চয় তাকে ডাকে। বাবা ওর সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কথা তো বলেই না, এমন কি ফিরেও তাকায় না। মা তেমনি নির্বিকার আর হারানকাকা চোখে ঠোঁটে টিপটিপ হাসি নিয়ে যেন বাচ্চাদের ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখে। বাবা যতই সবাইকে উপেক্ষা করুক, নন্দিতার কেন যেন তাকেই ভিতরে ভিতরে পরাস্ত মনে হয়। তখন মা আর হারানকাকা দুজনের ওপরেই মনে মনে জ্বলে।

সিনিয়র কেম্ব্রিজ-এর রেজাল্টের খবর যেদিন পেল সেদিনও এই এক ব্যাপার। ফাইভ পয়েন্টস, অর্থাৎ এইট্টি পার্সেন্টের ওপর নম্বর পেয়েছে, প্রথম দশজনের মধ্যে নিশ্চয় থাকবে। অন্তত চারটে বিষয়ে লেটার আশা করছে, মার্কশিট এলেই জানতে পারবে। খবরটা পাওয়া মাত্র দৌড়ে গিয়ে বাবাকে ফোন করেছিল। প্রতাপ বোস দারুণ খুশি হয়ে সব কাজ ক্যান্সেল করে রাতে ভাল রেস্তোরাঁতে ডিনার খাওয়াবে বলেছে। এইদিন অন্তত মায়ের সঙ্গে কোনো রকম অশান্তি করার ইচ্ছা নন্দিতার ছিল না। বরং মাকেও ধরে ডিনারে নিয়ে যাবে ঠিক করেছিল। শমিতা বোস আপত্তিও করেনি, যাবেও বলেনি। শুধু হেসেছে।

সন্ধেবেলা কলিংবেলের আওয়াজে নন্দিতা তার বাবা এসেছে ভেবে ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখে হারানকাকা মস্ত এক ফুলের তোড়া আর দুটো মোটা মোটা বই হাতে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। নন্দিতা থমকে গেছল। ওর কৃতিত্বের খবরটা দিতে মা একটুও দেরি করেনি তাহলে! তক্ষুনি মনে হয়েছিল হারানকাকা চলে যাবার পর যেন বাবা আসে। কিন্তু তা হল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রতাপ বোস এসে হাজির। ততক্ষণে শমিতা বোস আদর করে তার হারানবাবুকে ড্রইংরুমে বসিয়েছে, আগ্রহ করে তার আনা বই দুটো দেখছে। আর প্রতাপ বোস যে এসে নন্দিতার গলায় হার পরিয়ে দিল তা যেন চোখেই পড়ল না। নন্দিতার রাগ চড়ছিল। বই আর ফুল পেয়ে হারানকাকাকে প্রণাম করেনি, সকালে রেজাল্টের খবর জানার পর মাকেও না। কিন্তু এখন বাবার দুপায়ে একেবারে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। প্রতাপ বোসের দু'চোখ চিকচিক করছিল। ওর মাথাটা দু'হাতে নিজের বুকে চেপে ধরেছে, ধরা গলায় বলেছে, গুড...ভেরি গুড... আ' অ্যাম সো গ্ল্যাড। বাট মাইন্ড ইউ, ভালোর এটা সবে শুরু—ইউ হ্যাভ টু গো এ লং ওয়ে। নন্দিতাকে আদর করে তারপর সহজভাবেই দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে।

—বাঃ, চললে কোথায়, আমার ডিনার? অবাক নন্দিতা না বলে পারেনি।

এবার হাসি মুখে প্রতাপ বোস ঘুরে দাঁড়িয়েছে, ইউ শুড নট লিভ হোয়েন ইউ হ্যাভ এ গেস্ট ইন ইওর হাউস। আজ থাক, আর একদিন হবে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শেষ আশা নিয়ে নন্দিতা মায়ের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু না, কোনো কথা শুনেছে বলেও মনে হল না। একমনে বই দেখছে। হারানকাকার ঠোঁটে বরাবরের মতোই মজা দেখার হাসি।

নন্দিতার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। আর ঠিক তক্ষুণি মা বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, হারানবাবু, আপনার কী সাজেশান? নানু অনার্সটা কী-সে নিলে ভাল হয়?

দুচোখে আগুন নিয়ে নন্দিতা দেখছিল আর শুনছিল। একটু আগে যে এসেছিল সে ওর বাবা, কিন্তু তাকে এই সাধারণ কথাটা জিজ্ঞেস করা দূরে থাক, তাব অস্তিত্বটাই মায়ের চোখে পড়েনি। আর এখন কিনা তার হারানবাবু বলে দেবে নন্দিতার কী পড়া উচিত!

নিজেকে সংযত করে ঠাণ্ডা গলায় নন্দিতা মাকেই ব্যঙ্গ করেছে, তুমি তো মা! আগে তোমার মতটাই বলে ফেলো। ভবিষ্যতে তোমার মতো লেখিকা হতে হলে অনার্সটা বোধ হয় বাংলাতেই নেওয়া উচিত?

শমিতা বসুর বাংলায় অনার্স ছিল নন্দিতা জানত। হাতের বইটা টেবলে রেখে শমিতা বোস মেয়ের মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিয়েছিল, লেখিকা হওয়ার জন্যে কোনো কিছুতেই অনার্স নেওয়ার দরকার হয় না। তবে আমার ইচ্ছে ইকনমিক্স-এ বি. এ পড়ে তারপর এম. এ আর ল-টা একসঙ্গে কর। কলেজে ঢুকে ডিবেটের অভ্যাসটা ছাড়িস না, ভবিষ্যতে সুবিধা হবে।

রাগ ভুলে নন্দিতা হাঁ কিছুক্ষণ। ঠিক শুনেছে তো? ওর নিজেরও যে ঠিক এই প্ল্যান! মা কি ওর মনের কথা টের পেয়েছে? কিন্তু পরক্ষণেই হারানকাকাকে মাথা নেড়ে এই প্রস্তাবে সায় দিতে দেখে সব সংযম তছনছ হয়ে গেল নন্দিতার। অভদ্রের মতো মায়ের দিকে আঙুল তুলে বলে উঠল, আমি কী পড়ব না পড়ব সেটা ঠিক করার মালিক তুমিও না, হারানকাকুও না। সেটা ঠিক করবে বাবা, শুধু আমার বাবা, বুঝলে? তারপর এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তারপরেও সারাক্ষণ ধরে মনে হয়েছে অত ভাল পাসের আনন্দটা হারানকাকু আসার জন্যেই মাটি হয়ে গেছে।

ইকনমিক্স-এ অনার্স নিয়েই নন্দিতা বি. এ পাস করেছে। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। কিন্তু ওর জীবনের প্রতিটি বিশেষ দিনে হারানকাকা আসবেই, আর শেষ পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে একটা বিচ্ছিরি রকম একতরফা ঝগড়াও হবেই। একতরফা, কারণ চেঁচামেচি রাগারাগি যা করার নন্দিতাই করে। শমিতা বোস একটি কথাও বলে না, চুপচাপ দেখে যায় শুধু।

নন্দিতার যখন বি. এ সেকেন্ড ইয়ার, মিহির তখন চার্টার্ড ফাইনালের দ্বিতীয় গ্রুপটাও পাস করে কলকাতায় ওর বাবার ফার্মেই জয়েন করেছে। চিঠিপত্রে বরাবরই দুজনের যোগাযোগ ছিল। কলকাতায় পা দিয়েই মিহির নন্দিতাকে ফোন করেছিল, জানতে চেয়েছিল কোথায় দেখা করবে। মা খুশি হবে না জেনেও নন্দিতা সোজা তাকে এই বাড়িতেই আসতে বলেছিল। কিন্তু মিহির আসার খানিক পরেই দেখা গেছল শমিতা বোস নিজের হাতে জলখাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। মিহিরও অতি পরিচিতের মতো হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে জিগেস করেছিল—মাসিমা, কেমন আছেন?

শমিতা বসু তেমনি হেসে মাথা নেড়েছে, ভালো।—তা তুমি তো এখন থেকে কলকাতাতেই থাকবে?

—হ্যাঁ, নিজেদের ফার্ম থাকতে আর অন্যের দরজায় ঘুরে মরি কেন?

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে শমিতা বসু।—সেই ভাল। তোমার বাবারও বয়েস হচ্ছে, একই লাইন যখন, তুমি পেছনে থাকলে সব দিক থেকেই ভাল। আচ্ছা, তোমরা গল্প করো।

নন্দিতা হাঁ করে দুজনের বাক্যালাপ শুনছিল। মা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই মিহিরের ওপর চড়াও হয়েছে।—ব্যাপারখানা কী? মায়ের সঙ্গে তোমার এত সদ্ভাব কবে থেকে?

মিহিরের মুখে মজা-পাওয়া হাসি।—জাস্ট গেস!

—তোমার সঙ্গে মায়ের তাহলে আগেই আলাপ হয়েছিল?

—ঠিক তিনবার। অর্থাৎ বম্বে ভায়া কলকাতা হয়ে যতবার তোমার সঙ্গে দার্জিলিংয়ে দেখা করেছি।

নন্দিতা বিমূঢ় খানিক।—দার্জিলিংয়ে যাবার আগে তুমি মায়ের সঙ্গে দেখা করে গেছ?

—হ্যাঁ, পুরনো বাড়িতে তোমার বাবার সঙ্গে আর এ বাড়িতে তোমার মায়ের সঙ্গে। আমি চুরির থেকে ডাকাতি বেশি পছন্দ করি। জানান দিয়েই তাঁদের মেয়ের সঙ্গে দেখা করেছি, তাঁদের তোমাকে কিছু দেবার বা বলার আছে কি না জেনে গেছি। এর থেকেই আমার নাইনথ পেপারের প্রিপারেশন যেটুকু হবার হয়েছে। তাঁরাও সেটা বুঝেছেন আশা করি।

নন্দিতা হাঁ।—প্রত্যেকবার মা-বাবাকে বলে গেছ আমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ?

—তা কেন, বলেছি বেড়াতে যাচ্ছি। দার্জিলিং কি বছর বছর বেড়াতে যাবার জায়গা নয় না কি? মিহিরের মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি।—তোমার বাবা আমাকে পছন্দ করেন বলেই মনে হয়, কিন্তু তোমার মা-কে এখনো ঠিক বুঝতে পারি না, শি ইজ টেরিব্‌লি ইন্টেলিজেন্ট...

হেসে উঠতে গিয়েও নন্দিতা কী ভেবে উৎসুক আবার।—তুমি তাহলে বরাবরই জানতে যে বাবাকে ছেড়ে মা এখানকার এই বাড়িতে চলে এসেছে?

মিহির হেসেই মাথা নেড়েছে, জানত।

—কিন্তু দার্জিলিংয়ে গিয়ে আমাকে তো তুমি কিছুই বলোনি, বা চিঠিতেও কখনো কিছু লেখোনি?

—আই অ্যাম এ স্পোর্টসম্যান, কথা দিলে রাখতে চেষ্টা করি, বলব না কথা দিতে হয়েছিল...

নন্দিতা আবারও হাঁ।—কথা দিতে হয়েছিল? কাকে? মা-কে, না বাবাকে?

মিহির হেসেই জবাব দিয়েছিল, ইওর ফাদার ওয়াজ নেভার ইন দ্য পিকচার, তোমার মা-কেই কথা দিতে হয়েছিল। ...পড়াশুনোয় ব্যাঘাত হবে বলে উনি এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলতে নিষেধ করেছিলেন, সময়ে নিজেই তোমাকে জানাবেন বলেছিলেন।

এরপর নন্দিতা জিগেস না করে পারেনি, বাবা-মায়ের মধ্যে গণ্ডগোলটা ঠিক কী নিয়ে তুমি জানো?

—না। নিজে থেকে না বললে তোমার মা-কে যে কিছু জিগেস করা যায় না তুমি বোঝো না?

তা আর বোঝে না নন্দিতা! আগে মায়ের এই ঠাণ্ডা ব্যক্তিত্বটুকু নকল করার চেষ্টাও করেছে কত সময়। কিন্তু এখন শুধুই দেমাক ভাবতে চেষ্টা করে। আবার সেটা কিন্তু ঠিক নয়, তাও জানে।

এবার মিহিরও উৎসুক একটু। দরজার দিকে একনজর তাকিয়ে সামনে ঝুঁকে জিগেস করেছে, কিন্তু কী নিয়ে ওঁদের মধ্যে গণ্ডগোল তা তুমিও জানো না?

নন্দিতা মাথা নেড়েছে।—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, সে রকম কিছু ঘটেছে বলে তো শুনিনি। সময় সময় এত খারাপ লাগে—

মিহির এরপর কথায় কথায় বলেছে, তোমার মাকে যতটুকু দেখেছি বা বুঝেছি তাতে মনে হয় হঠাৎ করে কিছু করে বাসার মানুষ উনি নন। আমার ধারণা আসল গণ্ডগোলটা অন্য জায়গায়। পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ। তোমার বাবার যত টাকাই থাকুক না কেন, ওনার জগৎ তোমার মায়ের থেকে একেবারে আলাদা। তোমার মায়ের শিল্পীমন হয়তো তাঁর প্রফেশনের বাস্তব আর চড়া দিকটাকে বরদাস্ত করতে পারেনি। শুধুই সাদামাঠা হাউসওয়াইফ হলে কোনো ঝামেলাই হত না। তোমার মা-বাবার ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে হয়তো অনেকটাই ফারাক রয়ে গেছে।

ঠিক এই কথাটাই শুনতে চায়নি নন্দিতা। কারণ, ওর নিজের মনেও মাঝে মাঝে এ ধরনেরই একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দেয়। বাবার ওপর যে ওর সবচেয়ে টান সেটা টের পেয়ে ওকে খ্যাপানোর জন্যে মেসোরা এই নিয়ে একসময় কত ঠাট্টাই না করেছে। এঞ্জিনিয়ার বড় মেসো বলত, ছেলেবেলায় তাদের স্কুলে একবার 'ফিল-আপ-দ্য-গ্যাপস' এ দিয়েছিল, ডেভিল ইজ দ্য ফাদার অব--। ক্লাসের যে ফার্স্টবয়, সে লিখেছিল 'লায়ার্স'। বড় মেসো নাকি তার ঠিক পিছনেই ছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও লায়ার্স-এর এল অক্ষরটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। তখন আন্দাজে গ্যাপের জায়গায় লিখে দিয়েছিল লয়ার্স—অর্থাৎ, ডেভিল ইজ দ্য ফাদার অব লয়ার্স। খাতা যখন ফেরত গেল, তখন দেখা গেল মেসো নাকি ওতে তিনে সাড়ে তিন পেয়েছে।...যদিও সবাই জানত পুরো ব্যাপারটাই বানানো, তবু মজা পেয়ে অন্য মাসি-মেসোরা হইহই করে উঠত। মা-ও হাসত। নন্দিতা যত খেপত, ওদের তত আনন্দ।

চোখের ডাক্তার মেজো মেসোর ঠাট্টা আরও এক কাঠি সরেস। একটা লোক খুন করেছে। তার খালাস পাবার কোনো পথ নেই। শেষে সে মরিয়া হয়ে এক নামী উকিলের কাছে গিয়ে জিগেস করছে, পাঁচ লক্ষ টাকা থাকলেও কোনো উপায় নেই, জেলে যেতেই হবে? উকিল তাকে এক কথায় নিশ্চিন্ত করেছে। বলেছে, পাঁচ লক্ষ টাকা থাকতে কাউকে কক্ষনো জেলে যেতে হয় না, লোকটা তো আনন্দে আটখানা। কিন্তু কিছুদিন পরে জেলে সে ঠিকই গেছে। তবে পাঁচ লক্ষ টাকা থাকতে নয়, সেটা ঐ লয়ারের পকেটে যাওয়ার পর।—নামী লয়ার তার কথা রেখেছে।

কিন্তু মা? মাসি-মেসোদের এই হাসি-ঠাট্টা কি তার মনে কোনো দিন কোনো রকম আঁচড় ফেলেছিল? যার থেকে পরে এই , কী যেন বলেছিল মিহির? হ্যাঁ, পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ?...নিজের মনেই জ্বলে উঠেছে নন্দিতা। কোথায় ছিল এত সূক্ষ্ম পার্সোনালিটি বোধ, যখন প্রথম আর দ্বিতীয় বইটা ছাপানোর জন্যে বাবা ঘর থেকে টাকা বের করে দিয়েছিল? দিনের পর দিন নিজের হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও রাত জেগে লেখা পড়ত, মতামত দিত, কোনো টেকনিকাল বা ডিটেইলের ভুল থাকলে বইপত্র ঘেঁটে ঠিক করে দিত? সপ্তাহে প্রায় চারদিন মাকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দিয়ে আসত আর নিয়ে আসত?...ছোট মাসির কাছে নন্দিতা সবই শুনেছে। আজ নিজের জগৎ তৈরি হয়ে যাবার পর বুঝি বাবার সবকিছুই খুব মোটা দাগের লাগছে? ওসব পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ-ফ্ল্যাশ কিছু না, এত নামডাক হওয়াতে মাকে আসলে স্তুতির মোহতে পেয়েছে। বাইরের কতগুলো আদেখলার হ্যাংলামিই মায়ের মাথাটা খেয়েছে। বাবা কাজের মানুষ। দরকার হলে সাহায্য নিশ্চয় করবে, কিন্তু নিছক সাহিত্য-টাহিত্য তার এত আসেও না বা পাঁচজনের মতো এ নিয়ে বাড়াবাড়িও করতে পারে না। তাছাড়া এ সব করার মতো ইচ্ছে আর সময় কোনোটাই তার নেই। এটাই হয়েছে যত গণ্ডগোলের মূল। লেখিকার উর্বর মস্তিষ্ক তো! তাই পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ, কালচারাল গ্যাপ, এইসব গালভরা কথা চিন্তা করে নিজের কদর বোঝানোর জন্যে বাবার কাছ থেকে সরে গেছে। আর বাবার এককালের বন্ধু হারানকাকার মতো স্কলারকে একেবারে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারার ফলে দেমাকের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। আসলে সুপিরিয়রিটি এয়ার, আর ইগোইজ্‌ম্ —এই দুটোর শিকার হয়েছে মা।

এরপর এম. এ আর ল-তে একসঙ্গে ভর্তি হয়েছে নন্দিতা। বাবা খুশি, কিন্তু মায়ের মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। অথচ তারও যে এটাই ইচ্ছে ছিল তা তো সেই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করার পরেই জেনেছিল। অবশ্য হারানকাকার সামনে সেদিনের আঙুল তুলে শাসানির পর থেকে শমিতা বোস নন্দিতার পড়াশুনো নিয়ে আর কোনো দিন একটা কথাও বলেনি। ল-এর প্রথম দুটো পার্টে ফার্স্ট ক্লাস পেলেও এম. এ-তে সেটা অল্পের জন্য ফসকেছে। সেজন্যে অবশ্য নন্দিতা নিজেকেই পুরোপুরি দায়ী করেছে মনে মনে। মিহিরের জুলুম ইদানীং বেড়েই চলেছিল। ইতিমধ্যে ওর মা মারা গেছে। ফলে সারাদিন বাড়িতে শুধু গোটা কতক কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই। ওই দামাল ছেলে তার পুরো সুযোগ নিচ্ছিল। প্রথম প্রথম নন্দিতাকে ফোন করত, ভীষণ শরীর খারাপ, মাথা তুলতে পারছি না, পারো তো একবার এসো।

নন্দিতা তক্ষুণি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যেত। কিন্তু একবার নাগালের মধ্যে পেলেই দেখা যেত শরীর খারাপ-টারাপ কিছু না, সব বজ্জাতি। প্রথমবার অবশ্য সত্যিই ঘাড়ে একটা বিচ্ছিরি রকমের কারবাঙ্কল হয়েছিল, সঙ্গে বেশ জ্বর। খবর পেয়ে নন্দিতা গিয়ে দেখে মিহির সোজা হয়ে বসে আছে, যন্ত্রণার চোটে শুতেও পারছে না। তাড়াতাড়ি কাছে যেতেই মিহির শক্ত দুটো হাতে ওকে আটকেছে। তারপর বুকে মাথা রেখেছে, মুখ ঘসেছে। নন্দিতা ছিটকে সরে যাবার চেষ্টা করতেই উল্টে ভয় দেখিয়েছে, বেশি টানা-হ্যাঁচড়া করলে যে কোনো মুহূর্তে ফোঁড়াটা ফেটে যাবে। ফলে মুখে গালাগাল করা ছাড়া নন্দিতার আর কোনো উপায় ছিল না। মিহির নিঃশব্দে হেসেছে। তারপর ওকে বিছানায় ফেলে ওর ওপরেই আরাম করে উপুড় হয়ে শুয়েছে। নন্দিতা আবারো বড়ো রকমের একটা ধাক্কা দিতে গিয়েও ফোঁড়ার ভয়ে সামলে গেছে।

এরপর বুকে মুখে সারা গায়ে পুরুষের মায়াবী স্পর্শ আস্তে আস্তে রক্তের মধ্যে ঝিম নেশা এনেছে। নিজের দুটো হাত যে কখন এক সময় ওকে জড়িয়ে ধরেছে, দুটো ঠোঁট ওই দুই ঠোঁটের সঙ্গে সমান তালে জবাব দিয়েছে তা নন্দিতা বহুক্ষণ পর্যন্ত নিজেই বুঝতে পারেনি। আত্মস্থ হবার পর রাগ দেখাতে গিয়ে উল্টে ডবল জব্দ হয়েছে। জামাকাপড় কোনো রকমে টেনেটুনে ঠিক করে এক ঝটকায় নামতে যেতেই মিহির হাত বাড়িয়ে বাধা দিয়েছে। ঠোঁটে দুষ্টু হাসি, খারাপ লেগেছে?

চুমুটুমু তো বহু আগে থেকেই একটু চান্স পেলেই খেত। কিন্তু তা বলে বাড়িতে ডেকে এনে এই বাড়াবাড়ি। নন্দিতা ফুঁসে উঠেছে, খবরদার বলছি, আর কোনোদিন তুমি আমাকে বাড়িতে আসতে বলবে না।

মিহির ভালোমানুষের মতো মাথা নেড়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে আমাকে ছুঁয়ে বলো তো সত্যিই তোমার খারাপ লেগেছে?

নন্দিতা ওকে সরিয়ে দিতে গিয়েও পারেনি, ততক্ষণে মিহিরের মুখ আবার ওর মুখের কাছে নেমে এসেছে। দু-চোখের পাতা আপনা থেকেই বুজে গেছে, ভেজা-ভেজা ঠোঁট নিবিড় আকাঙ্ক্ষায় কেঁপে কেঁপে উঠেছে। কিন্তু আর একজনের মুখ যেখানে ছিল সেখানেই থেমে আছে। নন্দিতা অধীর হয়ে চোখ মেলেছে, সেখানে একটাই প্রশ্ন—কী হল?

মিহির জড়ানো গলায় অস্ফুটে হেসে উঠেছে, কতটা খারাপ লেগেছে দেখছিলাম...। তারপরেই দস্যুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর সবটুকু প্রাণশক্তি পুরু কঠিন দুই ঠোঁটে শুষে নিয়েছে। ফলে বাধা দেবার পাট নন্দিতার সেই প্রথম দিন থেকেই শেষ হয়ে গেছে।

এখন তো রীতিমতো অপেক্ষা করে থাকে কবে আবার ছুতোনাতায় ডেকে পাঠাবে। ডাকলে মুখে সাফ না বলে দিলেও কোনো না কোনো অজুহাতে ঠিকই যায়। এই শরীরটার মধ্যে এত তৃষ্ণা এভাবে জমে ছিল তা কি নন্দিতা কখনো আঁচ করতে পেরেছিল! অন্য দিক থেকে কোনোরকম গণ্ডগোলের ভয় না থাকলে কবেই হয়তো নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিত। অবশ্য চূড়ান্ত মুহূর্ত এগিয়ে আসার সময় পুরুষ হয়েও মিহির আগে সংযত হয়েছে। সেই জন্যেই দিনে দিনে মিহিরের ওপর বিশ্বাস আর নির্ভরতা বেড়েছে।

শরীরের এই দুর্বার তৃষ্ণা নিয়ে নন্দিতা অনেক মাথা ঘামিয়েছে। মনের মধ্যে আঁতিপাতি করে চোখ চালিয়েছে। কিন্তু নিজেকে কখনো সস্তা বলে মনে হয়নি। বইয়ের এক একটা শক্ত চ্যাপ্টার যখন কিছুতেই মগজে ভালো ঢুকত না, তখন মিহিরের সঙ্গে আলোচনার ছুতো করে ওদের খালি বাড়িতে যখন তখন চলে যেত। তারপর সেই এক ব্যাপার, ভোগের সমুদ্রে পুরোপুরি ডুবতে গিয়েও মিহির এক সময় ওকে ফিরিয়ে আনত। কিন্তু তাতেই কাজ হত। দু' ঘণ্টা ঘরে বই নিয়ে বসে থেকেও যা মাথায় ঢোকেনি এরপর অনায়াসে তা পরিষ্কার হয়ে যেত। লেখাপড়া জানা ব্রাইট মেয়ে নন্দিতা অনেক ভেবেও নিজের বাইরের চেহারার সঙ্গে ভেতরের এই লাগামছাড়া মূর্তিটাকে মেলাতে পারেনি। পড়ার বই সামনে নিয়ে দিনের পর দিন তিমির-তৃষ্ণার এক একটা ছবি মনে মনে সযত্নে নাড়াচাড়া করেছে। কিন্তু মায়ের চোখ সহজে ফাঁকি দিতে পারেনি। মাকে মাঝে মাঝেই ওর দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকতে দেখত। নন্দিতা ঝাঁঝিয়ে উঠত, কী দেখো বলো তো?

মা সোজা জবাব দিত, তোকে।

নন্দিতা নিজেই বুঝেছিল, সকলে যা ধরে নিয়েছে এবার তা হবে না, এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস থাকবে না। ঠিক তাই। সবাইকে বিশেষ করে বাবাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। ওদের ব্যাচে যে দুজন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে তারাও হাঁ। তবে ল-র প্রথম দুটো পার্টে একেবারে টায়টায় ফার্স্ট ক্লাস ছিল। তৃতীয় পার্টের পরীক্ষা দিতে নন্দিতা তাই মনে মনে বেশ উতলাই হয়েছিল—এটাতে ফার্স্ট ক্লাস রাখতে না পারলে সব গেল। শেষ পর্যন্ত রাখতে পেরেছে। আজই রেজাল্ট বেরিয়েছে, মিহিরই খবরটা দিয়েছে। তারপর নন্দিতা নিজের চোখে ফল দেখে এসেছে। আনন্দে আটখানা হয়ে বাবাকে ফোন করেছে। মা বাড়ি নেই বলে তার লেখার টেবলে ছোট চিরকুট রেখেছে। তারপর এই সাজগোজ, মিহিরের জন্যে অপেক্ষা, আর ঘন ঘন ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ।

* * *

নিজের মধ্যে একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল নন্দিতা। সেই তেরো বছর বয়স থেকে এই চব্বিশটা বছর পর্যন্ত নিজের সঙ্গে নিজে ঘুরে এল।

এতক্ষণ বিমনা ছিল বলেই হয়তো কলিং বেলের মৃদু টুং টাং প্রথমে শুনতে পায়নি। এবার আরও একটু জোরে বাজতে একেবারে লাফিয়ে উঠল। মিহির এসেছে। চুলের মধ্যে একবার হাত চালাল, শাড়িটা টেনেটুনে একটু ঠিক করে নিল! খুব ভালো করেই জানে ওই ছেলে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়েই দুম করে আগে একটা চুমু খাবে। এত ভালো খবরটা সে-ই যখন দিয়েছে, তখন আজ অন্তত এটা তো তার প্রায় ফান্ডামেন্টাল রাইটের পর্যায়ে পড়ে।

দেরি করে এসেছে বলে চোখে রাগের ঝিলিক আর ভেজা ভেজা ঠোঁটে প্রশ্রয়ের হাসি নিয়ে দরজা খুলল নন্দিতা। আর তারপরেই শুকনো মাটিতে বড়ো রকমের একটা আছাড় খেল যেন। মিহির দত্ত নয়, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মোহন চৌধুরি, হারানকাকার গোয়ালের প্রধান মাতব্বর, তার এক নম্বর চেলা।

মিহিরের জন্যে মনেপ্রাণে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল বলেই এই ধাক্কা। নইলে হারানকাকার সঙ্গে বা একা ওই মূর্তি তো নন্দিতাদের এ বাড়িতে মাঝে মাঝেই হানা দেয়। আসে অবশ্য মায়ের কাছে। তাদের যত কর্ম উদ্ধারের ব্যাপার মায়ের থেকে মোটা টাকার চেক, আর পুরনো জামাকাপড় তো হরদমই পায়। তাছাড়া মা নানা ধরনের শাঁসালো লোকের সঙ্গে সঙ্গে যোগযোগও করিয়ে দেয়। নামজাদা লেখিকার কোনো রকম কাজে আসতে পারলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে এমন কিছু বোকা আর পয়সাঅলা সাহিত্য-প্রেমিকের তো আর দুনিয়ায় অভাব নেই! এই জন্যে নন্দিতা আরও দেখতে পারে না মোহনদের। ডোনেশন চাওয়া আর ভিক্ষে করার মধ্যে খুব তফাত আছে বলে মনে করে না। শক্ত-সমর্থ ছেলেরা চাঁদা চেয়ে বেড়ালে সেই ছেলেবেলা থেকেই কী রকম যেন ভিখিরি-ভিখিরি মনে হত। এদের বেলা তো আরও মনে হয়। হারানকাকার মতো একটা ব্রাইট স্কলার যে কোন পাগলামিতে কতগুলো হতভাগাকে কুড়িয়ে এনে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করছে ভগবান জানে! আর এরা তার পুরো

সুযোগ নিচ্ছে। খাওয়া-পরাটা যখন এমনিই জুটছে তখন আর কাজের চেষ্টা করবে কেন? চাঁদা তুলে দশের উপকার করে বেড়াও! এর চেয়ে আরামের আর কী আছে?...শুধু রাগ নয়, এদের দেখলে এক ধরনের বিতৃষ্ণা হয় নন্দিতার। আরও গা জ্বলে মা-কে মদত জোগাতে দেখে। এ ব্যাপারে বাবার সঙ্গে ওর ভারি মিল। বাবা মুখে কিছু না বললেও ওদের যে একেবারে সহ্য করতে পারে না সেটা নন্দিতা বেশ বুঝতে পারে। এই মোহন চৌধুরির দিকে তো ফিরেও তাকায় না। অথচ মোহনের বাবা নাকি একসময় প্রতাপ বোসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। নন্দিতার বেশ মনে আছে ছেলেবেলায় মোহন তার পুরনো বাড়িতে অনেকবার এসেছে। তখন অবশ্য একটুও খারাপ লাগত না। বরং বেশ স্মার্ট আর মিষ্টি মনে হত। তারপর ওর বাবা মারা যেতে সবকিছু লাটে তুলে হারানকাকার গোয়ালে গিয়ে ভিড়েছে। পড়াশুনোও নিশ্চয় বিশেষ কিছুই করেনি, তাহলে আর মরতে ওখানে গিয়ে ভিড়ত না। নন্দিতা তো ওর কথা ভুলেই গেছল। হোস্টেল থেকে এ বাড়িতে আসার দিন কতকের মধ্যেই বহু বছর বাদে আবার দেখা। প্রথমে তো চিনতেই পারেনি। চিরাচরিত প্রার্থীর বেশ। ধুতিটাকে লুঙির মতো করে ঘুরিয়ে পরা, গায়ে সাদা ফতুয়া, তার ওপর দিয়ে চাদর জড়ানো। চুলগুলো ছোটো করে ছাঁটা, পায়ে হাওয়াই চটি, হাতে চাঁদার খাতার মতো কী একটা। এরকম মূর্তি দেখলে নন্দিতার মেজাজ এমনিতেই চড়ে। সেদিন আরও চড়েছিল ড্যাবড্যাব করে মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে। কোনো সুশ্রী স্মার্ট ছেলে এরকম তাকিয়ে থাকলে মেয়েদের মেজাজ বরং খুশিই হয়, কিন্তু এই বেশভূষার মূর্তি হলে আবার সেটাই অসহ্য লাগে। নন্দিতারও তাই লেগেছিল। কড়া করে কিছু বলতে যাবে এমন সময় মা হাজির। মধুঝরা গলায় বলল, কী হল, ওকে চিনতে পারিসনি? আমাদের মোহন! তোর বাবার আর হারানবাবুর বন্ধু রমেন চৌধুরীর ছেলে। ছেলেবেলায় ও বাড়িতে কত এসেছে, এখন হারানবাবুর কাছেই থাকে।

মেজাজ যেটুকু বা পড়ে আসছিল নন্দিতার, এই শেষের কথাটা শুনে আবার চড়ে গেছল। ব্যঙ্গ করে উঠেছিল, কোথায় থাকে সেটা চেহারাতেই বেশ বোঝা গেছে।

শমিতা বোস যথার্থই বিব্রত। অসন্তুষ্ট স্বরে মেয়েকে বলেছিল, কী ভাবে যে কথা বলিস!

নন্দিতা ঝাঁঝিয়ে মাকেই কী বলতে গিয়েও থমকে গেছল। মোহন চৌধুরির দুচোখ তখনও ওর মুখের ওপর। নন্দিতা মনে মনে স্বীকার না করে পারেনি, এই বেশভূষা বাদ দিলে ছেলেবেলার আদল এখনো বেশ খুঁজে পাওয়া যায়। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ওর চোখ দুটো। চাউনি একেবারে অদ্ভুত সহজ, সুন্দরও। মিহির দত্তর ঝিলিক বা পুরুষের দৃষ্টির ছিটেফোঁটাও নেই, অথচ কী স্বচ্ছ ঝকঝকে চোখ! ইচ্ছে করলেই যেন ভেতর সুদ্ধু দেখে নিতে পারে। মোহন চৌধুরি তখন ওকেই কী বলছিল। প্রথমে নন্দিতা খেয়াল করেনি। পরক্ষণেই কথা শুনে বিড়বিড় করে উঠেছে। মোহন হেসে হেসে বলছিল, সেই ছেলেবেলায় ফ্রক পরা এতটুকু দেখেছি—এত বড়ো হয়ে গেছ যে চেনাই যায় না এখন।

'তুমি' শুনেই আসলে মেজাজ গরম। নন্দিতাও তাই ইচ্ছে করেই 'তুমি' করে জবাব দিল,—তা তুমি তো সেই হাফ-প্যান্টের বয়সেই আটকে আছ দেখছি—কিন্তু তোমাকে বেশ চেনা যাচ্ছে।

মোহন চৌধুরি আর মা দুজনেই হেসে ফেলেছিল। আর তাইতে আরও রাগ নন্দিতার। তারপর যখন শুনেছে কী করা হয় আর মাকে দারুণ উৎসাহে ওদের প্রশংসা করতে আর শেষে মোটা টাকার চেক দিতে দেখেছে, তখন সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠেছিল নন্দিতার। হারানকাকার গোয়াল তাহলে আজও একই ভাবে চলছে! বাচ্চা ছেলেগুলোকে দিয়ে চাঁদা তোলানোটাই নন্দিতার বিচ্ছিরি লাগত। কিন্তু এই ধাড়ি ধাড়ি ছেলেরাও ওই রাস্তা ধরেছে? হারানকাকার ওপরেই সব থেকে রাগ হয়েছিল নন্দিতার। নিজের জীবনটা তো নষ্ট করলই, জোয়ান ছেলেগুলোকে পর্যন্ত অপদার্থ করে তুলল। এর চেয়ে কুলিগিরি করে দুটো পয়সা রোজগার করা অনেক সম্মানের। নন্দিতা ছোটোবেলায় হারানকাকাকে কী ভালোই না বাসত, বা এখনও কি হলপ করে বলতে পারবে একেবারেই বাসে না? কিন্তু এই সাধুগিরি আর মায়ের বশংবদ হবার জন্যেই নন্দিতার যত আক্রোশ তার ওপর।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে নন্দিতার সবচেয়ে বেশি রাগ মোহনের ওপর। মিহির এসেছে ভেবে চোখে-মুখে-ঠোঁটে কতটা প্রশ্রয় ফুটিয়ে দরজা খুলেছিল নিজে খুব ভালো করেই জানে। ড্যাবডেবে

চোখে (হ্যাঁ, এখন রাগের চোটে ড্যাবডেবে চোখই বলে নন্দিতা) তাকিয়ে মোহন চৌধুরিও যে সেটা বুঝতে পেরেছে তাও স্পষ্ট। ওই দুই চোখে কিছুই এড়ায় না। তার ওপর মুচকি হেসে বলল, দেখেই এমন হোঁচট খেলে, আর কাউকে আশা করেছিলে বোধহয়?

সত্যি কথাটা শুনে নন্দিতা আরও ঝলসে উঠল, প্রায় দরজা থেকেই ওকে বিদেয় করতে চাইল—সে খোঁজে তোমার কী দরকার? মা বাড়ি নেই।

কিন্তু গণ্ডারের চামড়া এ সব লোকের। দিব্বি হেসে বলল, তাহলে অপেক্ষা করি, আপত্তি আছে?

নন্দিতা তেমনি শ্লেষে জবাব দিল, আপত্তি থাকলেও তোমাদের ঠেকানো যাবে?

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াতে বেশ হৃষ্টমুখে মোহন চৌধুরি ভেতরে ঢুকে সোফায় গা ছেড়ে আরাম করে বসল। নন্দিতাকেও আমন্ত্রণ জানাল, বোসো না!

—কেন, আমার কাছ থেকে তো কিছু প্রাপ্তির আশা নেই।

—তা কি কেউ বলতে পারে? মেয়েদের মন, কখন দয়া হয় কে জানে!

নন্দিতা আরও তেতে উঠল, দয়া! মানুষের দয়া তোমাদের মস্ত সম্বল, না? এভাবে দয়া চেয়ে বেড়াতে লজ্জা করে না?

মোহন সোজা ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর সাদাসাপটা জবাব দিল, লজ্জা করবে কেন, পরের জন্যে দয়া চেয়ে বেড়ানোটা মিথ্যে কথার চাষ করা বা জাল-জোচ্চুরির থেকে তো ভালো! তারপর আলতো করে বলল, জিগ্যেস করলে তোমার মাও বোধহয় এ কথাই বলবেন।

নন্দিতা প্রথমে হতভম্ব। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল, তার মানে? মিথ্যে কথার চাষ বা জালজোচ্চুরি কে করেছে?

কিন্তু এবার মোহন চৌধুরির দু-ঠোঁট একেবারে সেলাই। গভীর মনোযোগ দেওয়ালের ক্যালেন্ডার দেখছে।

নন্দিতার সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ। এত সাহস! তাহলে বাবার প্রফেশন নিয়ে কটাক্ষ! তা না হলে মাকে জিগ্যেস করার কথা ওঠে কী করে? মা এইভাবে এদের বাড়িয়েছে! শরীরটা কাঁপছে নন্দিতার, মুখ দিয়ে কথা পর্যন্ত বেরুচ্ছে না।

ঠিক তক্ষুণি বাইরে মিহিরের গাড়ির হর্ন। আঃ, গাড়ি নিয়ে আসার আর দিন পেল না? না বেরুনো পর্যন্ত হর্নটা টিপেই বসে থাকবে। মোহন চৌধুরিকে দুচোখের আগুনে ঝলসে দিয়ে নন্দিতা ছিটকে বেরিয়ে গেল। পারলে আজই হারানকাকার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে, আর মায়ের সঙ্গেও। নন্দিতা অনেক সহ্য করেছে, আর না।

নিজের ঘরে লেখার টেবলের সামনে চুপচাপ বসেছিল শমিতা বোস। মেয়েটা সেই কখন বেরিয়েছে, খালি বাড়িটা যেন হাঁ করে গিলতে আসছিল। আজকাল মাঝে মাঝেই অদ্ভুত নিঃসঙ্গতায় পেয়ে বসে তাকে। মেয়ে অবশ্য সঙ্গ বলতে যা বোঝায় কোনোদিনই তা দেয় না। তবু বাড়িতে থাকলে এতটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগে না। আর ঠিক এরকম সময়েই নিজের অতীত যেন ইচ্ছেমতো শমিতাকে পিছনে টেনে নিয়ে চলে। ফেলে আসা দিনগুলোকে পরপর সাজানোর মধ্যে যে নেশা আছে, তার চোরা টানে শমিতা বোস কখন যেন একটু একটু করে তলিয়ে যেতে লাগল।

* * *

বাবা সরকারি অফিসের বড়ো চাকুরে। ছেলে নেই, চার মেয়ে অমিতা, নমিতা, শমিতা আর প্রমিতা। শমিতা তৃতীয়, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই পাকামিতে একেবারে প্রথম। দিদিরা ডেঁপো মেয়ে বলে যখন-তখন শাসন করত। কিন্তু শমির অতটুকু মাথায় কোথা থেকে যে এত প্রশ্ন আসে তা কেউ বোঝার চেষ্টা করত না! সবকিছু ব্যাপারেই শমিতার মন একেবারে গভীরে ডুব দিতে চাইত। ওইটুকু

মেয়ের যতসব আজগুবি প্রশ্ন শুনে কেউ হাসত, কেউ পাকামি ভাবত। দিদিরা বরাবরই শেষের দলের। একমাত্র বিশ্বাসের জন ছিল পুমু—প্রমিতা। প্রায় ছ'বছরের ছোটো বোন। বয়সের এতটা ফারাক সত্ত্বেও একমাত্র সে-ই বিশ্বসংসারের যত রকম উদ্ভট কল্পনা তার ছোড়দির মাথায় আসত, সেগুলোকে হাঁ করে গিলত। কিন্তু কখনো কারুর কাছে বলে দিত না। একদিন যে শমিতা বোস (তখন চ্যাটার্জি) নামজাদা লেখিকা হবে, সেই সম্ভাবনার বীজ ছোট্টবেলা থেকেই তার মধ্যে ছিল। আর বাচ্চা বয়স থেকেই তাতে নানাভাবে জল ঢালার কাজটি করেছে ছোটো বোন পুমু।

শমিতার বয়স যখন সাড়ে পাঁচ, তখন মায়ের ভারী-মাস চলছে, পুমু হবে। ওইটুকু মেয়ে যে মায়ের শরীরের পরিবর্তন প্রথম থেকে লক্ষ্য করে এসেছে, কেউ ভাবতেও পারেনি। একদিন দুই দিদিকে নিয়ে বাবার সঙ্গে খেতে বসেছিল, মা ভারী শরীরটাকে টেনে টেনে পরিবেশন করছিল। হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে শমি প্রশ্ন করে বসেছিল, আচ্ছা, তোমরা যে বল ঠাকুর আকাশ থেকে পরীদের সঙ্গে ভাই কি বোন পাঠিয়ে দেয়, সেটা কি সত্যি কথা?

সবাই তটস্থ, এর পরে কী প্রশ্ন আসবে সেই আশঙ্কা। বাবাই উত্তর দিয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু হঠাৎ এ কথা কেন?

—মোটেই না! তাহলে মায়ের পেটের মধ্যে ওটা কী? রাতে মা যখন আমাকে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে থাকে তখন আমাকেও ভেতর থেকে ঠ্যালা মারে। আসলে পেটের মধ্যেই বাচ্চা থাকে। সেদিনও তো রাঙাদিদু বলছিল, মাকে দেখেই নাকি বোঝা যায় এবারেও মেয়ে হবে। ঠাকুর যদি পরীদের দিয়েই পাঠাবে, তাহলে মাকে দেখেই ওরা বুঝল কী করে? ঠাকুর পাঠানোর পরে তো বোঝার কথা।

বাবার বিব্রত মুখ।—ঠাকুর পরীদের দিয়ে আগেই কখনো সখনো খবর পাঠায়।

সাড়ে পাঁচ বছরের শমি মাথা ঝাঁকিয়েছে, কক্ষনো না! তাহলে একটু একটু করে মা এরকম দেখতে হয়ে গেল কী করে? তারপর বিজ্ঞের মতো বলেছে, আসলে বাচ্চারা পেটের থেকেই বেরোয়। আমাদের কালী কুকুরের পেটে যে বাচ্চা থাকে সে কথা তো মা-ই আমাকে কতবার বলেছে! সেই জন্যেই তখন ওকে মারতে মানা করত।

বাবা চুপ। দুই দিদি কিছু বুঝে উঠতে পেরেছিল কি না জানে না। কারণ, বড়ো অমিতার বয়স তখন এগারো আর মেজ নমিতার সাড়ে আট। তবে এই আলোচনাই অস্বস্তিকর সেটা বুঝে তারা একবারও মুখ খোলেনি। কিন্তু ছোট্ট শমির মাথায় যখন একবার কিছু ঢুকেছে তখন এর সবটুকু বের করে তবে ছাড়বে। আবার কী বলতে যেতে নিরুপায় হয়ে মা-ই তড়পে উঠেছিল, হাজার দিন বলেছি না খাবার সময় কথা বলবি না?

শমিতা তখনকার মতো চুপ করে গেছে, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত চিন্তাটা মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে। পুমুর বছর পাঁচেক বয়স হতে এ সমস্যাটা ওকেও বলেছিল। সে-ও কোনো সমাধান খুঁজে পায়নি। কিন্তু তা বলে আর কাউকে বলেও দেয়নি।

শমিতার বয়স যখন সাত সাড়ে সাত, ওর এক জ্যাঠতুতো দিদি একেবারে নিচু ঘরে বিয়ে করে বসেছিল।

তখনকার দিন! বাড়িতে হইহই কাণ্ড। সবার মুখে এক কথা, বামুনের মেয়ে হয়ে শেষে এই করলি! ক'দিন শুনে শুনে শেষে শমি মাকে ধরেছে, আচ্ছা মা, আমরা বামুন কেন?

—কেন আবার, আমাদের বাবা-ঠাকুর্দা ব্রাহ্মণ বলে!

—আমাদের বাবা-ঠাকুর্দারা ব্রাহ্মণ হল কী করে?

—তাদের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ, তাই।

—পূর্বপুরুষ কী করে ব্রাহ্মণ হল?

মা হাল ছেড়েছে, অতশত জানি না বাপু। এই মেয়ে নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা, সব্বেতে কী, কেন, কী করে—উফ্!

কিন্তু শমিতার প্রশ্ন তখনও শেষ হয়নি। আবার জিগেস করেছে, তাহলে ঠাকুর করেছে?

—হ্যাঁ, সেই করেছে।

—বা রে, তোমরাই তো বলো ঠাকুরের কাছে সবাই সমান, সবাই তার ছেলেমেয়ে! তাহলে এক ছেলে বামুন, এক ছেলে বদ্যি, আরেক জন কায়েত কী করে হয়?...আমি, বড়দি, মেজদি, পুমু—আমরা কি আলাদা?

মা আর কিছু বলতে না পেরে শেষে হাত তুলেছে, দেব এক চড়,—বড্ড পেকেছিস।

শমিতা আর কিছু বলেনি। কিন্তু তা বলে ব্যাপারটা ভুলতেও পারেনি। নিজের মনেই এ নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা করেছে।

এইভাবে সবকিছু নিয়ে চিন্তা করতে করতে কখন একসময় আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেছে শমিতা। দুচোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে চেয়ে চেয়ে দুনিয়াটাকে দেখেছে, কান পেতে সবকিছু শুনতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সহজে আর মুখ খোলেনি। ফলে খুব অল্প বয়স থেকেই বিচিত্র সব অনুভূতি আর কল্পনা শমির মনের আকাশে ভিড় করে আসত। পুমু একটু বড়ো হতেই তাকে সেই রূপকথার রাজ্যের সঙ্গী করে নিয়েছে। দোসর ছাড়া একলা মায়াপুরীতে ঘুরতে কি কারুর ভালো লাগে?

শমিতা কখনও বলত, এই পুমু, জানিস আজ আমি সমুদ্র দেখেছি।

পুমুর চোখ ছানাবড়া, কোথায়?

কোথায় আবার, এখানেই! আমি তো চোখ বুজলেই যা ইচ্ছে হয় সব দেখতে পাই। চোখ বোজ, তুইও পাবি! পুমু অনেকক্ষণ চোখ বুজে থেকে শেষে হতাশ হয়ে মাথা নেড়েছে, ছোড়দিভাই, আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

পাচ্ছিস না! সে কী রে? আচ্ছা আমি বলছি, তুই চোখ বুজে মন দিয়ে শোন আর মনে মনে দেখার চেষ্টা কর। এই যে আকাশটা, এটাকে যদি পায়ের নিচে নামিয়ে আনা যায় তাহলে যেমন হবে, সমুদ্র অনেকটা সেরকম। কী বিরাট! দ্যাখ, চারদিকে শুধু জল আর জল। এখন খুব ভোর তো, সুয্যি উঠবে, তাই নীল রং আস্তে আস্তে কীরকম লালচে হয়ে যাচ্ছে। .... এই সুয্যি উঠল, ওপরে উঠে গেল। এবার দ্যাখ জলটা কীরকম সোনালি দেখাচ্ছে। আচ্ছা, এবার ঝড় আনি। আসছে, সারা আকাশ কালো করে কি বিষম ঝড়, বাপরে! সাগর খুব খেপেছে, বড়ো বড়ো ঢেউ তুলে খ্যাপা মোষের মতো গোঁ গোঁ করে আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। দেখছিস? দূর বোকা, ভয় কী! আচ্ছা আচ্ছা—তাহলে ঝড় থামিয়ে দিই। ঠিক আছে, এবার সুয্যি ডুবে যাচ্ছে—আস্তে আস্তে আকাশের গা ঘেঁষে সাগরের কোলে কেমন নেমে আসছে। জলটা সেই সকালের মতো টকটকে লাল হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস? ডুবল ডুবল, এ-ই ডুবে গেল। জল এখন আস্তে আস্তে কালচে হয়ে যাচ্ছে। যাঃ! সব কালো হয়ে গেল।...দেখতে পেলি সমুদ্র?

পুমু চোখ খুলে অবাক মুখে মাথা নেড়েছে। সত্যি! ও-ও সমুদ্র দেখেছে এবার। কিন্তু ছোড়দিটা কী করে যে আগে থেকেই সব দেখতে পায়! বারো বছরের শমিতা তখনও পর্যন্ত সমুদ্র দূরে থাক, বড়ো গঙ্গাও দেখেনি। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে শুধু কয়েকবার লেকে গেছে। কিন্তু বড়ো হয়ে যখন সত্যিকারের সমুদ্র দেখেছে তখন ছেলেবেলার সেই কল্পনার সাগরের সঙ্গে খুব একটা তফাত খুঁজে পায়নি।

এই ভাবেই আস্তে আস্তে শমিতা তার নিজস্ব এক জগতে ঢুকেছে। স্কুলে সব থেকে প্রিয় বিষয় ছিল বাংলা, আর তারপর ইংরেজি। ইংরেজিটা নিজে নিজে অত ভালো বুঝত না। কিন্তু বাবা যখন সমস্ত কথার অর্থ বলে দিত, তখন অদ্ভুত ভালো লাগত। বাবা 'হোম দে ব্রট হার ওয়ারিয়র ডেড' কবিতাটা বুঝিয়ে দেবার পর কতদিন শমিতা আর পুমু ঘরের দরজা বন্ধ করে কবিতা কবিতা খেলেছে। অর্থাৎ, শমি সেই মৃত সৈনিকের বউ হয়ে পাথরের মতো বসে থেকেছে। কবিতার লাইন মতো কথা বলে (বাংলায় অবশ্য) পুমু তাকে নানা ভাবে কাঁদাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু দুঃসহ শোকে শমিতা তখন সত্যিই পাথর, চোখের পাতা পর্যন্ত পড়েনি। শেষে পুমু দুটো বালিশ ওর কোলে ফেলে দিয়েছে—ও দুটো মৃত যোদ্ধার সন্তান। বালিশ দুটো কোলে নিয়ে শমিতা প্রথমে থরথর করে উঠেছে, তারপর সে দুটোকে আঁকড়ে ধরে ফুলে ফুলে সে কি নিঃশব্দ কান্না! দেখাদেখি পুমুও ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। বহুক্ষণ পর দরজায় ঘা পড়তে যখন সংবিত ফিরেছে তখন নিজেরাও কম আশ্চর্য হয়নি। সত্যিই তো,

কিছুই তো হয়নি। ওই তো মা আর দিদিরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে উতলা মুখে বাবাও। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দুজনে চোখেমুখে জল দিয়ে এসেছে। কিন্তু কেউই সকলের হাজার প্রশ্নেও একটি কথা মুখ দিয়ে বের করেনি।

বাংলা-ইংরেজি ছাড়া আর কোনো বিষয় শমিতার সেরকম ভালো লাগত না বলে সেগুলো পরীক্ষার আগে কোনো রকমে শুধু পাস করার জন্য পড়ত। ফলে ইংরেজি বাংলায় ভালো নম্বর পেলেও কোনোদিন সেরকম রেজাল্ট করতে পারেনি। কিন্তু একটা ব্যাপারের জন্য ক্লাসের ফার্স্ট গার্লের চেয়েও ওর কদর বেশি ছিল। লেখার জন্য। শমিতা যখন নিচু ক্লাসে পড়ে তখন একদিন ওদের বাংলা টিচার বাড়ি থেকে রচনা লিখে আনতে বলেছিল। বিষয়, তোমরা কে কোথায় যেতে চাও। সব মেয়েই কোনো না কোনো জায়গার কথা লিখেছে, সেখানে গিয়ে কী করবে না করবে নিজেদের সাধ্য মতো বর্ণনা করেছে। কিন্তু শমিতা চ্যাটার্জি বাদে। রচনা সে-ও লিখেছে বৈকি! সেও নিশ্চয় কোথাও যেতে চায়। কিন্তু সে যেখানে যেতে চায় দুনিয়ার ম্যাপে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। শমিতা যেতে চায়, 'যেখানে না নেই' এমন এক রূপকথার দেশে। ওর রচনার নামও, 'যেখানে না নেই'। অর্থাৎ এমন এক জায়গার স্বপ্ন দেখে শমিতা, যেখানে কোনোরকম বিধি-নিষেধের বেড়া নেই। এমনকি প্রকৃতিও সেখানে মুক্ত স্বাধীন। সেই দেশে আকাশ নীল, গাছ সবুজ, মাটিকে খয়েরি হতেই হবে, এমন কোনো কড়াকড়ি নেই। এরা সব তাদের খুশিমতো রং পাল্টায়। মাছেরা যখন-তখন উড়তে পারে, পাখিরা মনের সুখে সাঁতার কাটে আর ফুলের মতো ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা যার যার ইচ্ছে মতো কাজ করে। যে ছবি আঁকতে ভালোবাসে সে শুধু ছবিই আঁকে, যে গান গাইতে চায় সে কেবলই গানই করে, আর একটা মেয়ে এই মজার দেশের নানারকম খুশির কথা দিনরাত প্রাণভরে শুধু লিখেই যায়। বলা বাহুল্য, সেই মেয়ে শমিতা নিজে। এরকম আরো কতো অদ্ভুত ব্যাপার ঢুকিয়ে শেষে উপসংহারে দুঃখ করে লিখেছে, কিন্তু শমিতা চ্যাটার্জির শেষ পর্যন্ত কোনোখানেই যাওয়া হবে না। কারণ, 'যেখানে না নেই' এমন কোনো জায়গা এই পৃথিবীর কোথাও নেই।

রচনা পড়ে বাংলা-টিচার অবাক। তারপর ওকে ডেকে প্রশ্ন করেছে, এই আইডিয়া কোথায় পেয়েছ?

শমিতা সত্যি জবাব দিয়েছে, নিজের মাথা থেকে।

কিন্তু সে কথা ক্লাস-টিচারের বিশ্বাস হয়নি। শমিতার খাতা নিয়ে সোজা ওদের ক্লাস-টিচারের কাছে গেছে। রচনা পড়ে সে-ও অবাক। তারপর দুজনেই হেডমিস্ট্রেসের ঘরে। এইটুকু মেয়ে, বিশেষ করে যে মেয়ে এতদিন কোনোভাবেই কারুর নজরে আসেনি, সে এই লিখেছে! খানিক পরে হেডমিস্ট্রেসের ঘরে শমিতার তলব পড়েছে।

—এ রচনা তুমি নিজে লিখেছ?

শমিতা ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়েছে। লিখেছে।

—কেউ দেখিয়ে দেয়নি বা কিছু বলে দেয়নি?

—না, শুধু পুমুকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। ও-ও ভালো বলেছে।

—পুমু কে?

—প্রমিতা চ্যাটার্জি, আমার ছোটো বোন। এই স্কুলে পড়ে, এবার ক্লাস ওয়ানে উঠবে।

গম্ভীর প্রকৃতির মহিলার ঠোঁটেও এবার হাসি এসেই গেছে। সামলে নিয়ে বলেছে, তোমাকে যদি অন্য কোনো বিষয়ে রচনা দিই তাহলে এখানে বসে লিখতে পারবে?

শমিতা থতমত খেয়েছে একটু, কিন্তু এর পরেই যে অঙ্ক ক্লাস, আর তারপর ভূগোল আর বিজ্ঞান?

হেড মিস্ট্রেসের চোখ তীক্ষ্ণ, ওগুলোর একটাও তোমাকে এখন করতে হবে না। কিন্তু লিখবে এখানে বসে। পারবে?

একগাল হেসে শমিতা এবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়েছে, পারবে। অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞান, এই তিনটে বিষয়ই ওর চক্ষুশূল।

রচনার শিরোনাম ছিল, 'তুমি কী হতে চাও।'

এরপর রাশভারী হেডমিস্ট্রেসের উপস্থিতি, সবকিছু ভুলে শমিতার কলম এগিয়ে চলেছে। লিখেছে, এই হতে চাওয়ার কি কোনো শেষ আছে? বা সবসময় কি কেউ একই জিনিস হতে চায়? শমিতার তো এক এক সময় এক এক রকম হতে ইচ্ছে করে। যখন মা ছুটির দুপুরগুলোতে জোর করে ঘরে আটকে রাখে তখন পাখি হয়ে জানালা দিয়ে গলে সারা দুনিয়াটা চক্কর খেয়ে আসতে ইচ্ছে করে। আবার যখন লেকের কিনারে গেলেই বাবা হাত টেনে ধরে, তখন টুক করে লাল নীল মাছ হয়ে জলের মধ্যে তলিয়ে যাবার সাধ হয়। কিন্তু যখনই মনে হয় পাখিগুলোকে ফাঁদ পেতে ধরে ষণ্ডা লোকগুলো খাঁচায় পুরে বিক্রি করে, বা টেঁপিদি ছোটো ছোটো জ্যান্ত মাছগুলোতে বেশ করে ছাই মাখিয়ে ঘ্যাচঘ্যাচ কুটতে থাকে, তখন পাখি বা মাছ দুটোর একটাও হতে চায় না। আবার কখনো ও অঞ্জলি হতে চায় (অঞ্জলি শমিতাদের ক্লাসে ফার্স্ট হয়) বিশেষ করে স্কুলের প্রাইজ-ডে-র দিন! কিন্তু যেই মনে হয় অঞ্জলি দিনরাত মুখ গোমড়া করে বই নিয়ে বসে থাকে, খেলে না, কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না, বা ওকে একেবারেই পাত্তা দেয় না, তখুনি অঞ্জলি হবার ইচ্ছে বরবাদ। কিন্তু একটা ব্যাপারে শমিতা নিশ্চিত—অঙ্ক বা ভূগোল-বিজ্ঞান পরীক্ষার আগে আগে ওর ওদের বাড়ির ঠিকে-ঝি টেঁপিদি হতে ইচ্ছে করে। তবে বাংলা বা ইংরেজি পরীক্ষার আগে এই শমিতাই থাকতে চায়। আবার ক'দিন আগে যেদিন পাড়ার রত্নাদির বিয়ে হল, তখন ও রত্নাদি হতে চেয়েছিল। কত সাজগোজ, গয়নাগাঁটি, ধুমধাম! কিন্তু পরের দিনই যখন রত্নাদি সবাইকে ছেড়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি গেল, তক্ষুণি সে শখ মিটে গেছে। সময়মতো একটা ডাক্তার না পাওয়ার জন্য স্কুলের বন্ধু অঞ্জুর ঠাকুমা যখন ধড়ফড় করে মরেই গেল তখন তো শমিতা ঠিকই পরে ফেলেছিল বড়ো হয়ে ডাক্তার হবে। কিন্তু তার পরের দিনই যখন বাবা ওদের চার বোনকে টারজনের সিনেমা দেখিয়ে আনল, তখন ক'দিন জেনি, অর্থাৎ টারজনের সঙ্গী সেই সাদা মেয়েটা ছাড়া আর কিছু হতে মন চায়নি। আবার কিছুদিন আগে বাড়ির সামনে একটা পাগলীকে দেখে খুব ইচ্ছে হয়েছিল ওটার মতো হতে। যখন খুশি খাবে, ঘুমুবে, হাসবে, কাঁদবে, নিজের সঙ্গে কথা বলবে—কারুর দিকে ফিরেও তাকাবে না, আর ওকেও কেউ বিরক্ত করবে না। কিন্তু বিকেলবেলা বাচ্চা ছেলেগুলো ওটাকে ইট মারতে সে ইচ্ছেও তক্ষুণি উবে গেছে।

...এরকম কত কি-ই তো হতে চেয়েছে বা চায়। কিন্তু সবকিছু কি একবার হওয়া যায়, না মাত্র একটা জীবনে হয়ে ওঠা যায়? তাই ও আপাতত বাবা-মা-দিদিদের আদরের শমি, পুমুর ছোড়দিভাই আর ইস্কুলের সবার শমিতা চ্যাটার্জি হয়েই থাকতে চায়।

লেখাটা পড়ে হেডমিস্ট্রেস খানিকক্ষণ খুদে ছাত্রীটির দিকে তাকিয়ে থেকেছে। পরের দিন স্কুল শুরু হবার আগে সমস্ত মেয়েদের সামনে ওটা পড়া হয়েছে। তারপর স্কুল-ম্যাগাজিনে দুটো রচনাই ছাপা হয়েছে। শমিতা প্রথমে যেমন অবাক, পরে তেমনই খুশি। ওর রচনার যে কোনোদিন এরকম আদর হতে পারে কখনও ভাবেনি।

সেই থেকে শুরু। মোটামুটি পাস করে এক-একটা ক্লাসে উঠেছে, কিন্তু ওর ব্যাপারে লেখাপড়াটাই গৌণ হয়ে গেছে। স্কুল ম্যাগাজিনে তো বটেই, তারপর থেকে প্রত্যেকটা ইন্টার-স্কুল রচনা বা গল্প প্রতিযোগিতায় শমিতা চ্যাটার্জির নাম থাকবেই। আর তার মানেই একটা না একটা প্রাইজ স্কুল পাবেই। পরের তিনটে বছর জুনিয়র গ্রুপ ইন্টার-স্কুল প্রতিযোগিতায় শমিতা রচনা লিখে দুবার দ্বিতীয় আর একবার প্রথম হয়েছে। তার পরের দুটো বছর সিনিয়র গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে ছোটো গল্প লিখে ফার্স্ট প্রাইজ নিয়ে এসেছে। ফলে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস থেকে শুরু করে ছোট্ট মেয়েগুলোর কাছে পর্যন্ত ও বিশেষ একজন।

এরপর শমিতার লেখা নিয়ে হইচই যত বেড়েছে, ওর বাইরের আচরণ ঠিক ততো শান্ত হয়ে উঠেছে! কথা বরাবরই কম বলত, কিন্তু ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি লেগেই থাকত। এই কমনীয় ব্যক্তিত্বটুকুই ওকে পুরুষের কাছে দিন দিন আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। যে সহজ অথচ ঋজু আচরণে মেয়েদের ভেতরে-বাইরে এক ধরনের মাধুর্য ঝরে, শমিতা অল্প বয়স থেকেই সত্তার সেই প্রসাদ পেয়ে এসেছে। ফলে সেরকম সুন্দরী না হওয়া সত্ত্বেও লোকের চোখে বরাবর তাকে লোভনীয় মনে হয়েছে,

সহজে নাগাল পাওয়া যায় না এমন লোভনীয়। লেখাটা এর সঙ্গে বাড়তি জৌলুস ছড়িয়েছে। শমিতা কখনও কাউকে আঘাত করত না, কটু কথা বলত না, হাসি-ছোঁয়া নির্লিপ্ত মুখে নিরাপদ ব্যবধান রচনা করত। অবশ্য বি. এ. পড়ার আগে পর্যন্ত সেরকম ভাবে কেউ এগোয়ওনি।

এসব দিকে বরং পুমু অনেক পাকা হয়ে উঠেছিল। প্রায় ছ'বছরের ছোটো হলেও পড়ত শমিতার থেকে চার ক্লাস নিচে। ক্লাস এইট থেকেই তার হাবভাব অন্যরকম হয়ে উঠল। এক একটা কাণ্ড করত আর হি-হি করে শমিতার গলা জড়িয়ে ধরে সেই সব গল্প শোনাত। মাঝে মাঝে আবার অনুযোগ করত, তোর লেখার এত মাল-মশলা সাপ্লাই করি অথচ আমাকে নিয়ে কিছু লিখছিস না? তোর গল্পের জন্যেই তো একটার পর একটা প্রেম করে যাচ্ছি!

শমিতা রাগের ভান করে ওকে তেড়ে যেত। আর মনে মনে হাসত। পুমু এ কথা বলতে পারে বটে। তাজা ছটফটে মেয়ে, চার বোনের মধ্যে তো নিশ্চয়ই, এমনিতেও সত্যিই সুন্দর। সেই জন্যই শমিতার ভেতরে ভেতরে ওকে নিয়েই যত চিন্তা।

এর মধ্যে দুই দিদির ভালো বিয়ে হয়ে গেছে। এঞ্জিনিয়ার বড়ো জামাইবাবু এক নামকরা ফার্মে চাকরি করে আর মেজ জন ডাক্তার, তারও ভালোই পসার জমছে। বাবা-মা তখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত। তলায় তলায় ওর জন্যও ছেলে খোঁজা শুরু করেছে। শমিতা খুব ভালো করেই জানত পাত্র খোঁজার পালা ওর বেলাতেই শেষ। ছোটো মেয়ের জন্যে বাবা-মা আর সে অবকাশ পাবে না।

কিন্তু পুমু নয়, ওর নিজের জীবনেই যে অন্যরকম কিছু ঘটতে চলেছে তা কি শমিতা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পেরেছিল?

শমিতার তখন বি. এ. সেকেন্ড ইয়ার চলছে, বাংলায় অনার্স। কিন্তু পড়াশুনোর থেকে অনেক বেশি মনোযোগ নিজস্ব লেখায়। কলেজ ম্যাগাজিনে তো বটেই, টুকটাক এদিক ওদিকও তখন বেশ কিছু কিছু লেখা বেরুচ্ছিল। সেই সময় এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কুড়ি পঁচিশ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। বিচারক পাঁচজন নামকরা সাহিত্যিক। গল্প লেখার জন্য সময় চার ঘণ্টা। গল্পের স্টাইল কম্পোজিশন, ডায়লগ এসবের জন্যেও আলাদা আলাদা নম্বর থাকবে। শমিতা চুপচাপ বিজ্ঞাপনের কাটিং-এর সঙ্গে নিজের নাম ঠিকানা আর বয়েস পাঠিয়ে দিয়েছিল। বাগবাজারের যে বিরাট বাড়িটাতে এই প্রতিযোগিতা হয়েছিল সেটা প্রতাপ বোসের ঠাকুর্দার। তারা তখনও কেউ কাউকে চোখের দেখাও দেখেনি। মাস তিনেক পরে প্রতিযোগিতার ফলাফল বেরুতে দেখা গেল শমিতা চ্যাটার্জি প্রথম। আর শুধু তাই নয়, থিম স্টাইল ইত্যাদির আলাদা বিচারের প্রত্যেকটাতেই ওর নম্বরই সব থেকে বেশি। কলেজে ওকে নিয়ে আবার হইচই। প্রিন্সিপাল নিজে ডেকে কংগ্রাচুলেট করেছে। পুমু তো আনন্দে ওকে ধরে জাপটা-জাপটি করেছে। বাবা-মা, দিদি-জামাইবাবুরা সব্বাই খুশি। শুধু একজন বাদে। শমিতা নিজে। একমাত্র ওই শুধু জানত বিচার পুরোপুরি ঠিক হয়নি, আর সেই জন্যেও দায়ী একমাত্র ও-ই।

নির্ধারিত দিনে প্রাইজ আনতে গেছল, সঙ্গে পুমু। বিরাট হল ভাড়া করে চমৎকার করে স্টেজ সাজিয়ে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা। তারপর নাচ-গান-নাটকের প্রোগ্রাম। পুরস্কার বিজয়ীদের উৎসাহ দিতে নামী লেখক-লেখিকারা উপস্থিত। বিপুল হাততালির মধ্যে শমিতা তিনটে মেডেল নিয়েছে, একটা ফার্স্ট হবার জন্য, একটা আলাদা-আলাদা প্রত্যেকটা ভাগের বিচারে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়ার দরুন, আর তৃতীয়টা এক নামজাদা সাহিত্যিক খুশি হয়ে দিলেন। শমিতা পুরস্কার নিয়ে নেমে আসতে আসতে ওর মুখের ওপর ঝপাঝপ ফ্ল্যাশ চমকাল, কে একজন কিছু বলার জন্য ওর মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরল। এড়িয়ে যেতে গিয়েও শমিতা শান্ত গলায় একটিমাত্র পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করল, 'এ মণিহার আমার নাহি সাজে'। অনেকে খুশি হয়ে হেসে উঠল। তারপর নিজের জায়গায় এসে বসতেই বিচ্ছিন্ন অথচ চাপা একটি গমগমে গলা শোনা গেল, 'রাইট।—সাজে না।'

শমিতা চমকে মুখ তুলতেই তার ঠিক সামনের গেস্ট চেয়ারে যার সঙ্গে চোখাচোখি, সে প্রতাপ বোস। ঘুরে বসে তার দিকে চেয়ে আছে। কথাটা সে-ই বলেছে।

নির্লিপ্ত অবহেলায় শমিতা মুখ ফেরাতে গিয়েও পারল না। মনে অস্বস্তি। চোখে চোখ মিলল, কিন্তু অন্য চোখ জোড়ার পাতাটুকু পর্যন্ত নড়ছে না। পুরুষের চাউনি এ পর্যন্ত শমিতা অনেক দেখেছে। নিজে লেখে, তাই এ নিয়ে মনে মনে বিশ্লেষণও কম করে না। চোরা চাউনি, লোভের চিকচিকানি, সম্ভ্রম-ছোঁয়া আকর্ষণ, যা ওকে এতদিন ছেঁকে ছেঁকে ধরেছে তার কোনোটার সঙ্গেই ওই চোখ জোড়াকে মেলানো গেল না।

শমিতা এবার পুরো মানুষটাকে দেখল। বসে থাকা সত্ত্বেও বোঝা যায় বেশ লম্বা, চওড়া বলিষ্ঠ কাঁধ, চৌকো মুখ, পুরু ঠোঁট। একমাথা চুলের নিচে বড়ো কপাল, ছোটোর ওপরে খাড়া নাক আর কালো ফ্রেমের ভারী চমশার ওদিকে তরুণ দুটো চোখ। বছর সাতাশ-আটাশ হবে। কোনো ভণিতা না করে বলল, আমার নাম প্রতাপ বোস। ও কথাটা যে বললাম, তার কারণ আছে। শোনার সময় হবে?

হকচকিয়ে গিয়ে শমিতা আবারো তাকাল। ততক্ষণে আরও অনেক লোক মজা পেয়ে তাদের কথা শুনছে। ব্যস্ত হয়ে শমিতা পুমুকে খুঁজল। পুমু তার চেয়ার ছেড়ে এদিকেই এগিয়ে আসছিল। ও কাছে আসতে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আবার প্রতাপ বোসের দিকে তাকাল।

ভারী গলায় প্রতাপ বোস বলল, বাইরে আসুন, এঁরা ডিসটার্বড্ হচ্ছেন। বলেই লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে এগোল।

পুমু হাঁ করে ছোড়দিকে আর ওই লোকটাকে দেখছিল। তার হাত ধরে শমিতা হল থেকে বেরিয়ে এলো। কেন যেন ওই লোকটার চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। তাকে কেমন নির্দয় গোছের মনে হচ্ছে।

কিন্তু প্রতাপ বোস বাইরের দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে। শমিতার সঙ্গে পুমুকে ভালো করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার বোন?

শমিতা মাথা নেড়েছে। পুমু চোখ গোল করে চেয়ে আছে।

প্রতাপ বোস শমিতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।—আপনারা নেক্সট প্রোগ্রাম দেখবেন না?

—না, বাড়ি যাব, কী বলবেন?

—বলছি। আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে?

—না, ট্রামে যাব, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—দেরি হবে না। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, পৌঁছে দেব। পুমুর দিকে ফিরল। আঙুল তুলে সামনেই পার্ক করা একটা সাদা ফিয়েট দেখিয়ে বলল, তুমি ওই গাড়িতেই গিয়ে বোসো, আমি তোমার দিদির সঙ্গে দুটো কথা বলেই আসছি। ওখান থেকেই ভারী গলায় হাঁক দিল, 'ছোটেলাল'!

ব্যস্তসমস্ত ড্রাইভার পিছনের দরজা খুলে দিলে হতভম্ব পুমু ওদের দিকে চোখ রেখেই গাড়ির দিকে এগোল।

ব্যাপারটা এত সহজে ঘটে গেল যে শমিতা আপত্তি করারও সুযোগ পেল না। প্রতাপ বোস পায়ে পায়ে গাড়ির উল্টো দিকে যেতে নিজের অগোচরে শমিতাও সেদিকে চলল। ও যেন নিজের ওপর দখল হারিয়েছে। প্রতাপ বোস আরও একটু এগিয়ে সামনের একটা সাদা পাথরের বেঞ্চিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। জায়গাটা আবছা অন্ধকার। শমিতার তা চোখে পড়েও পড়ল না। ওর যেন না গিয়ে উপায় নেই।

শমিতা কাছে গিয়ে দাঁড়াতে প্রতাপ বোস একটু নরম গলায় বলল, সকলের অত প্রশংসার মধ্যে আমি হঠাৎ ও কথা বলে উঠতে আপনার নিশ্চয় খুব রাগ হয়েছে?

শমিতা ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, কী বলার জন্যে ডেকেছেন বলুন।

মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে প্রতাপ বোস এবার হাসল একটু।—দেখুন, আমি আইনের ছাত্র। তাছাড়া মাঝে ক'বছর বিদেশে থাকাতে বাংলা সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করার তেমন সুযোগ হয়নি। অনেককাল বাদে আজ সুভেনিরে আপনার এই প্রাইজ পাওয়া গল্পটা পড়লাম। লেখা সত্যিই সুন্দর, কিন্তু এর সবটাই কি আপনার নিজস্ব?

শমিতা প্রায় দম বন্ধ করে চেয়ে আছে।

ভারী গলায় প্রতাপ বোস এবার একটি একটি করে বলল, 'হোয়েনএভার ম্যান কমিট্‌স্ এ ক্রাইম হেভেন ফাইন্ডস-এ উইট্‌নেস।' আপনার গল্পে দেখলাম পুরনো দিনের ইংরেজ নভেলিস্ট বুল্‌ওয়েরে-এর এই কোটেশন কায়দা করে বাংলায় তর্জমা করে আপনিও স্বর্গ থেকে সাক্ষী নামিয়ে এনেছেন, অপরাধীর বিবেককেই শেষ পর্যন্ত সাক্ষীর কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। শমিতার মুখের ওপর দুচোখ রেখে প্রতাপ বোস সামান্য একটু ঝুঁকল।—গল্পটা আপনার হতে পারে, কিন্তু এবার বলুন তো গল্পের থিমটা সম্পূর্ণ আপনার কি?

শমিতার পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। লোকটার অভিযোগ মিথ্যে নয়। মেডেলগুলো হাতে নেবার পর ও ঠিক এই কারণেই বলেছিল, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে'।...ওদের গল্পের বিষয় ছিল অদ্ভুত—'শাস্তি'। কী রকম শাস্তি বা কেন শাস্তি তার কোনো নির্দেশই ছিল না। চার ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টা শমিতা কাগজে একটা আঁচড় কাটতে পারেনি। তারপর হঠাৎ ওই ইংরেজি কোটেশানটা মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। এরপরে গল্প আপনিই এসেছে। আর গল্পের শেষে চালাকি করে ওই কোটেশানটাও বাংলায় তর্জমা করে দিয়েছিল।

বুঝতে চেষ্টা করে শমিতা ঈষৎ রূঢ় গলায় বলে উঠল, আপনার কি ধারণা কোনো আইডিয়া থেকে নিজস্ব গল্প তৈরি করাটাও চুরি?

—তা তো বলিনি। কিন্তু থিম-এর জন্যে আলাদা করে হাইয়েস্ট নম্বর না পেলে আমার কিছুই বলার ছিল না। থিমটা আপনার নয়।

শমিতা আরো শক্ত গলায় বলে উঠল, সে কথা আপনি ফাংশান অর্গ্যানাইজারদের বললেন না কেন? এ-সব বলার জন্যে কেন আপনি আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন?

প্রতাপ বোস এবার অম্লানবদনে জবাব দিল, আপনার সঙ্গে আলাপ করার এটাই সবচেয়ে সহজ রাস্তা বলে।

শমিতা থমকে তাকাল। তারপর বলে উঠল, চোর বানিয়ে আলাপ?

প্রতাপ বোস হাসছে।—চোর বানিয়ে নয়, উইক-পয়েন্ট ধরে দিয়ে। মনে করুন এর বদলে এখানে ডেকে এনে যদি বলতাম, আপনার গল্প খুব ভালো লেগেছে আর সেই সঙ্গে আপনাকেও, সেটা কি খুব ভালো কথা হত?

জবাবে একটা উষ্ণ দৃষ্টি ছুড়ে শমিতা হনহন করে গাড়ির কাছে এল।—এই পুমু নেমে আয়।

হুকুম শুনে পুমু হাঁ। তার পরেই ছোড়দির পেছন থেকে ভারী গলা কানে এল, নামতে হবে না। বোসো।

প্রতাপ বোস শমিতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। গম্ভীর। বললো, কারো উইক-পয়েন্ট ধরে দিলে রাগের বদলে তার খুশিই হওয়া উচিত। ঘুরে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে হুকুম দিল, ছোটেলাল, এঁরা যেখানে যাবেন পৌঁছে দিয়ে আবার এখানেই ফিরে এসো, আমি ভেতরেই আছি।

শমিতা এবারে অপ্রস্তুত একটা। লোকটার সঙ্গে ওরকম কথাবার্তার ফলে অন্যের থিম-গল্প লেখার দরুন বিবেকের কাঁটাটা বুকে আর অতটা খচখচ করে বিঁধছিল না। তর্কাতর্কিতে বরং হাল্কা লাগছিল। ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখে বলল, আপনি যাবেন না?

ওর মুখের পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করে প্রতাপ বোস হাসল একটু। বলল, যেখানে আপনাদের গল্পের কম্পিটিশন হয়েছিল সেটা আমাদের বাড়ি, সেই সুবাদে আজ আমি এদের স্পেশাল গেস্ট, আমার চলে যাওয়াটা অভদ্রতা হবে। নিজেই গাড়ির দরজা খুলে দিল, উঠুন।

গাড়ি চলতে পুমু প্রায় ঘুরে বসে কলকল করে কী বলতে যেতেই নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে ইশারায় ড্রাইভারকে দেখিয়ে ওকে থামিয়ে দিল। ফলে হাঁটুর ওপর পুমুর রাম-চিমটি একটা। ফিসফিস করে বলল, ছোড়দি, লোকটা কে রে?

সামনের দিকে তাকিয়ে শমিতার চাপা শাসানি, জানি না। চুপ করে থাক এখন।

পুমু তবু নাছোড়।—অন্ধকারে গিয়ে এতক্ষণ ধরে কথা বললি, আমাদের পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি ছেড়ে দিল, আর কে তুই জানিস না? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস, অ্যাঁ?

শমিতা খুব চাপা গলায় ধমকে উঠল, আঃ! চুপ করবি!

পুমু এরপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। কিন্তু কৌতূহলে ফেটে পড়ছে। একটু বাদে শমিতার মাথাটা টেনে নিয়ে কানে প্রায় মুখ লাগিয়ে বলল, তোর পছন্দ আছে, লোকটা দারুণ ম্যানলি!

শমিতা ওকে ঠেলে সরাল। কিন্তু তার নিজের ভেতরেও এক প্রস্থ নাড়াচাড়া পড়েছে সন্দেহ নেই। মানুষটার হাবভাব কথাবার্তা জোরালো বটে।...প্রতাপ বোস।...নামের সঙ্গে চেহারা মেলে।...গলাখানাও। স্বীকার করতে না চাইলেও শমিতার মনে হল, ওর জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষ এসেছে।

আশ্চর্য, সে রাতে শমিতা ভলো করে ঘুমুতে পারেনি। প্রাইজ পাওয়ার আনন্দ ছাপিয়ে ঘুরে-ফিরে পরের ব্যাপারটা বারবার মনে আসছিল। বাড়ি ফিরে পুমুর জেরার জেরায় অস্থির একেবারে। চ্যাটার্জির মেয়ের বোসের সঙ্গে শেষ ফয়সালা হবে কী করে পুমুর মাথায় এরই মধ্যে সেই চিন্তা। শুনে শমিতার মুখ লাল, কান গরম।

পরের দিন শমিতা কলেজ থেকে তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরেছে। বাবা অফিসে, মা তার ঘরে ঘুমুচ্ছে, পুমুর স্কুল থেকে ফিরতে তখনো ঘন্টাখানেক বাকি। শমিতাকে কে যেন প্রায় ঠেলেই বসার ঘরে নিয়ে এলো। সন্তর্পণে দরজা দুটো ভেতর থেকে বন্ধ করে টেলিফোনগাইডটা তুলে নিল। বাড়ি-গাড়ি আছে যখন, তখন ফোন থাকাটাই স্বাভাবিক। প্রতিযোগিতার সুবাদে বাগবাজারের ওই বাড়ির ঠিকানা জানাই ছিল, এখন শুধু বোস টাইটেল দেখে সেটা মিলিয়ে নিয়ে ফোন নম্বরটা পাওয়ার অপেক্ষা। পেল। দুরুদুরু বুকে ডায়াল করে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই ওদিক থেকে সাড়া পেতে বুকের ভেতর ধক করে উঠল। সেই ভারী গলা। শমিতা কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করেছে, এটা কি প্রতাপ বোসের বাড়ি?

—হ্যাঁ, প্রতাপ বোস বলছি।

—আমি শমিতা...শমিতা চ্যাটার্জি...কালকের...

ফোনে খুশির হাসি।—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো। আমারও কাল থেকে বার বার তোমার কথাই মনে হচ্ছিল। এ-ই যাঃ! 'তুমি' বলে ফেললাম। তারপরেই হাসি। শুধরে নিয়ে আবার আপনি—আজ্ঞে চালাব?

শমিতার কান গরম। কোনো রকমে বলল, ঠিক আছে, আমি আসলে কালকের ব্যাপারটা জন্যেই ফোন করছি। কাল আপনার ওপর রাগ করাটা আমার উচিত হয়নি। আপনি বরং আমার উপকারই করেছেন, এ ব্যাপারটা জন্যে আমি নিজেও এতদিন কম কষ্ট পাইনি।

প্রতাপ বোস আবারো হেসে বলেছে, জানি। তোমাকে ওভাবে 'এ মণিহার আমার নাহি সাজে' বলতে শুনেই বুঝেছিলাম। তবু যে ওরকম ব্যবহার করেছি সেটা শুধু আলাপের লোভে। যাক, আমার পারপাস সাক্‌সেসফুল। এখন উপকার করার জন্যে কী পুরস্কার দিচ্ছ?

এ কথার জবার শমিতা একটু হাসি দিয়েই চাপা দিতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু প্রতাপ বোস নাছোড়।—শুধু হাসলে চলবে না, গাড়িটা পাঠিয়ে দেব?

—ফোনে মুখ দেখা যায়, না কোনো ফয়সলা হয়?

শমিতা এবার আঁতকে উঠল, না না! গাড়ি-টাড়ি পাঠাবেন না!

—নাঃ, তুমি এত নার্ভাস কেন? আচ্ছা বলতো এরপর আমাদের আর দেখা হবে, না হবে না?

বিপাকে পড়ে শমিতা জবাব দিল, আমি জানি না।

ফোনের ওধারে ওই লোক যেন আরো মজা পেয়ে গেল।

কেন যে ও মরতে ফোন করতে গেছল! ভারী গলা কানের পর্দায় মিষ্টি ধাক্কা দিতে লাগল।—না জানলে তুমি ফোন করতে না। আচ্ছা ধরা যাক, জীবনে আর কোনো দিন আমাদের দেখা হচ্ছে না, ...ভাবতে কেমন লাগছে?

শমিতা চকিতে একবার সামনের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। তারপর সাহসে ভর করে জবাব দিল, ভালো লাগছে না।

ওধার থেকে এবার জোর হাসি—তাহলে? গাড়ি পাঠাই?

শমিতার ভয় করছে আবার অদ্ভুত রোমাঞ্চও অনুভব করছে।—গাড়ি এলে কোথায় যাব?

—কেন, আমার বাড়ি আসবে?

—না না, আজ না...রাখি?

প্রতাপ বোস আবারো হেসে উঠল।—দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার ফোন নম্বরটা তো অন্তত দাও।

শমিতা ঘেমে উঠেছে, আপনাকে ফোন করতে হবে না, আমিই আবার করব, এখন রাখি। তাড়াতাড়ি ফোনটা নামিয়ে বাঁচল।

পরের দিন কলেজ ছুটি হওয়ার মিনিট পনেরো আগে বেয়ারা এসে খবর দিল কে একজন ওকে ডাকছে। শমিতা অবাক হয়ে বাইরে বেরিয়েই চমকে উঠল। প্রতাপ বোস। ওর দুরবস্থাটা বুঝেই যেন মিটিমিটি হাসছে।

শমিতা বলল, আপনি? এখানে?

—কেন, ছবিসুদ্ধু তোমার সব খবরই তো কাগজে বেরিয়েছিল। আর ক্লাস আছে?

শমিতা মাথা নেড়েছে।—নেই।

—তাহলে ছুটি হলেই চলে এসো, আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি। ফিরে চলল।

নিরুপায় হয়েই শমিতা এরপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে বইখাতা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ওকে দেখে হাত বাড়িয়ে পাশের দরজা খুলে দিল। শমিতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে উঠে বসতে মনের আনন্দে বেশ জোরেই গাড়ি ছোটাল। চালাতে চালাতে দু'একবার ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।—কী ব্যাপার বলো তো? মুখ শুকনো কেন? এত ভয় কিসের?

শমিতা এবার হাসতে চেষ্টা করল।—ভয় নয়, আমাদের বাড়িতে এ ধরনের ব্যাপার ঠিক চলে না।

প্রতাপ বোসের ঠোঁটে হাসি। সামনের দিকে চোখ রেখেই আলতো করে জিজ্ঞেস করল, এ ধরনের মানে? আমাদের এটা কী ধরনের ব্যাপার?

শমিতার কান গরম। শুনতেই পেল না যেন, বাইরের দিকে তাকিয়ে রাস্তা দেখছে।

প্রতাপ বোস জোরে হেসে উঠল।—আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার এদিকে তাকাও।

আরও প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে শমিতাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। বাড়িতে নয়, বাড়ির কাছের বাস স্টপে শমিতা নেমেছে। প্রতাপ বোসের এত তাড়াতাড়ি ওকে ছাড়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শমিতা জোর করাতে প্রথম দিন বলেই বোধহয় বেশি চাপ দেয়নি। তবে এরপর থেকে যে এত তাড়াতাড়ি যাওয়া চলবে না, সে কথাও হাসি মুখে জানিয়ে দিয়েছে। ও গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার সময় সাগ্রহে জানতে চেয়েছে, আবার কবে দেখা হবে! শমিতার বিপন্ন মুখ দেখে নিজেই হেসে আশ্বস্ত করেছে, আচ্ছা সে দায়িত্ব আপাতত আমিই নিচ্ছি।

সেই রাতটা শমিতার বড়ো বিচিত্র কেটেছিল। একই সঙ্গে ভয়-ভালোলাগা, দ্বিধা আর আকর্ষণের দোলায় দুলেছে। খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিল গোড়াতেই এটা বন্ধ না করলে পরে ব্যাপার ক্রমশ জটিল হয়ে উঠবে। যতই প্রেমের গল্প লিখুক না কেন, ওদের রক্ষণশীল বাড়িতে এসব কেউ সহজে বরদাস্ত করবে না, বিশেষ করে মা। পুমুকে নিয়েই ভয় সকলের। শমিতার বিয়েটা দিতে পারলেই মা পুমুকে পার করার জন্য উঠেপড়ে লাগবে সে কথা বহুবার শুনেছে। কিন্তু শমিতাই যে এরকম কিছু করে বসতে পারে, এ কেউ চিন্তাও করতে পারে না। কিন্তু সব জানা সত্ত্বেও কে যেন ওকে ঠেলে ঠেলে ওই প্রতাপ বোসের দিকে এগিয়ে দিতে লাগল। তার কথাবার্তা, হাসি, আবাধে গাড়ি ছোটানো, চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। সেই রাত কখন ভোর হয়েছিল শমিতা জানে না।

এরপর প্রায়ই দেখা হয়েছে। জানাজানি হলে বাড়িতে প্রচণ্ড অশান্তি হবে বুঝেও দেখা করার তাগিদ শমিতার নিজেরও কিছু কম ছিল না। প্রতাপ বোসের সামনে এলেই ওর সব বাধা কোথায় ভেসে যায়।

প্রতাপ বোস যখন-তখন কলেজে হানা দিয়ে জোর করে ওকে বের করে এনেছে। নিজের ওপর শমিতার বরাবরই আস্থা ছিল। কিন্তু সময় বিশেষে অন্য কারুর জুলুমও যে এত ভালো লাগতে পারে জানা ছিল না। মাঝে মাঝে বলত, দেখো, এবার ঠিক ফেল করব।

বার কয়েক শেনার পর একদিন প্রতাপ বোস সিরিয়াস মুখ করে জবাব দিয়েছে, চিন্তা কোরো না, আমার হাতে পড়েছ যখন বিয়ে আর বি. এ. দুই-ই হবে।

শমিতা লজ্জা পেয়েও প্রতাপ বোসকে জব্দ করার জন্যই বলেছে, আর, এম. এ? সেটার কী হবে?

প্রতাপ বোস ভালোমানুষের মতো উত্তর দিয়েছে, একবার বিয়ে হলে মা হতে আর মেয়েদের কতক্ষণ লাগে?

শমিতা বিষম থতমত খেয়েছে। এবার প্রতাপ বোস বিশদ করে বুঝিয়ে দিয়েছে, ইংরেজি 'এম' আর 'এ' অক্ষর দুটো পাশাপাশি সাজালে 'মা' উচ্চারণ হয় না? শমিতার মুখে আর কোনো কথা জোগায়নি। ওর দুরবস্থা দেখেই প্রতাপ বোস আরও মজা পেয়েছে। শমিতা এই লোকের ওপর রাগবে কি, কথাগুলোই যেন স্পর্শ হয়ে ওকে ছেঁকে ধরেছে।

বাড়িতে ফিরতে শমিতার প্রায়ই দেরি হচ্ছিল। সন্দিগ্ধ হয়ে মা-ই বাবাকে আর দিদিদের কিছু বলে থাকবে। ফলে সকলেরই চোখ তখন ওর ওপর। কিন্তু ও বলেই কেউ সরাসরি কিছু জিগ্যেস করে উঠতে পারছিল না। একমাত্র পুমুই ব্যাপারটা জানত। আর ও তো মরে গেলেও ছোড়দির ব্যাপারে মুখ খুলবে না। মাঝখান থেকে তড়িঘড়ি শমিতার বিয়ের চেষ্টা শুরু হল।

আর কোথাও বিয়ের কথা শমিতা তখন চিন্তাও করতে পারে না। এর মধ্যে প্রতাপ বোস একদিন ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবার নাম করে সোজা তাদের বাড়িতে এনে হাজির।—মা, দেখে যাও!

মা আসতেই সাদা-সাপটা কথা, এই যে ধরে নিয়ে এলাম।

মা আর শমিতা দুজনেই আঁতকে উঠেছিল। মায়ের ভ্যাবাচ্যাকা মুখ, ধরে নিয়ে এলাম কি রে?

—মানে এখন দেখানোর জন্যে ধরে নিয়ে এলাম, পরে একেবারে নিয়ে আসব।

শমিতা ভেতরে ভেতরে ঘেমে গেছে। প্রতাপের মা হাসিমুখেই ছেলেকে ধমক দিয়েছে এবার, কি যে কথাবার্তার ছিরি তোর, মেয়েটাকে ঘাবড়ে দিয়েছিস।

শমিতা বুঝেছে, ছেলের কাছে সবই শোনা হয়েছে, শুধু চোখে দেখার অপেক্ষায় ছিল। ছেলের বউ যে পছন্দ হয়েছে তা মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তারপর প্রতাপ বোসের বাবার সঙ্গেও দেখা হয়েছে, তার বেশ অন্তরঙ্গ আচরণ।

এর দিনকতকের মধ্যে প্রতাপ বোসের তাগিদ, এবার দু'পক্ষের আলাপ-পরিচয় হওয়া দরকার। শমিতার বিপাকে পড়া মুখ দেখে ঠাট্টা করেছে, তোমার বাড়িতে বলা মুশকিল, আর আমি বাড়িতে বলেই মুশকিলে পড়েছি। তোমার বাবা-মা এখনো কিছু জানেনেই না, আর আমার বাবা-মা সব জানার ফলে দিনরাত তাড়া লাগাচ্ছে।

শমিতা বাড়িতে মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারছিল না। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার, ও নিজে এসব না মানলেও যারা মানে তাদের বোঝাবে কী করে! এক জ্যাঠতুতো দিদি বহুদিন আগে অন্য জাতে বিয়ে করার ফলে আজও তার সঙ্গে সকলের মুখ দেখাদেখি নেই। বাবা হয়তো বুঝবে, কিন্তু মাকে নিয়েই হবে মুশকিল। জাতের সংস্কার তার মজ্জায় মজ্জায়। শমিতা আজ অবধি এমন কিছু করেনি যা বাড়ির সংস্কারে ঘা পড়ার মতো। ভয় নয়, অশান্তির কথা চিন্তা করেই কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। পুমুকে কিছু বলা বৃথা। অসুবিধেটা কোথায় তা বুঝবে তো না-ই, বরং দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে এ নিয়ে হইচই কাণ্ড বাধাবে। বাবা-মায়ের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করবে, দিদিদের বাড়ি গিয়ে তাদের দলে টানার চেষ্টা করবে, আর ঠিক এগুলোই শমিতার চিরদিন অপছন্দ।

এর মধ্যে আবার বড়ো জামাইবাবু তার খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ এনে হাজির। শমিতাকে তারা আগে বহুবার দেখেছে, ফলে নতুন করে মেয়ে দেখার প্রশ্ন নেই। এখন মেয়ে পক্ষের মত থাকলে তারা কথাবার্তায় এগোতে পারে। ছেলে এঞ্জিনিয়ার, সুশ্রী চেহারা, তার ওপর সাহিত্যের অনুরাগী।

মা তো পারলে বিয়েটা তক্ষুনি দিয়ে ফেলে। বেগতিক দেখে শমিতা প্রতাপ বোসকে সব জানাল। শুনে প্রতাপ বোস চুপ একটু। গাড়িটা নির্জন জায়গা দেখে পার্ক করল। তারপর ওর দিকে ঘুরে বসে জিগেস করল, আমি সরে গেলে তুমি অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারবে?

শমিতা নিজের অগোচরেই কাছে সরে এসে তার একটা হাত আঁকড়ে ধরেছে।—তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাবে এ আমি ভাবতেও পারি না।

প্রতাপ বোস শমিতাকে আরও কাছে টেনে নিয়েছে। তার দু'হাতে ওর মুখ, ঠোঁটে ঠোঁট। প্রথম পুরুষ-স্পর্শে শমিতার সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। প্রতাপ বোস ওর গালে, গলায় ঠোঁটে আদরে অস্থির করে তুলেছিল। সেই সঙ্গে বার বার একই কথা—তুমি আমার, তুমি আমার...ভয় কী? আমি তো আছি।

অব্যক্ত আবেগে শমিতার দু'চোখের কোণ শিরশির করে উঠেছিল। দু'হাতে লোকটাকে আঁকড়ে ধরে তার চওড়া বুকে মুখ গুঁজেছে। এমন আশ্রয় থাকতে আর দ্বিধা কীসের?

সন্ধে গড়িয়ে একটু রাতই হয়েছে সেদিন বাড়ি ফিরতে। নামার সময় প্রতাপ বোস শমিতাকে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি বলবে, না আমি তোমার বাড়িতে যাব?

শমিতা শান্ত গলায় জবাব দিয়েছে, এবার আমিই বলতে পারব।

রাতে খাওয়ার টেবলে শমিতা ঠান্ডা মুখে বাবা-মাকে জানিয়েছে, বড়ো জামাইবাবুর আনা সম্বন্ধ বাতিল করতে হবে, সে ওখানে বিয়ে করতে রাজি নয়।

বাবা প্রথমে বিমূঢ় তারপর রাগ করেই বলে উঠেছে, কেন? তারা কী দোষ করল?

শমিতার শান্ত জবাব, তারা কিছু করেনি, দোষ আমারই। আমিই অন্য জায়গায় বিয়ে করব ঠিক করেছি, সেটা তোমাদের আরও আগে আমার জানানো উচিত ছিল।

বাবা-মা দুজনেই নির্বাক খানিকক্ষণ। মুখের ওপর ও এমন কথা বলতে পারে ভাবা যায় না। পুমুও বড়ো বড়ো চোখ করে ছোড়দিকে দেখছিল।

অনেকক্ষণ বাদে বাবা খুব গম্ভীর মুখে মাকে বলেছে, ও কী বলতে চায়, কোথায় কাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে, সব জেনে নাও। তার পরেই উষ্ণ গলা, হাঁ করে চেয়ে আছ কি? আধুনিক মেয়ে তোমার, বড়ো হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তোমার আমার সেই আদ্যিকালের মতো চলবে?

বাবা খাওয়া শেষ না করেই উঠে গেছল।

থমথমে মুখে মা আগে শমিতার কথা শুনেছে। তারপরেই চারখানা হয়ে ফেটে পড়েছিল। কায়েতের ঘরে গিয়ে পড়বি তুই? এত বড়ো হয়েছিস? এত স্বাধীন হয়ে গেছিস? আমরা বেঁচে নেই ভেবেছিস?

অপলক চেয়ে শমিতা মায়ের রাগ দেখেছে। তারপর বলেছে, তোমরা দুঃখ পাবে, তোমাদের সংস্কারে লাগবে আমি জানি মা। যদি মেনে নিতে না পারো, তোমাদের একটা মেয়ে নেই ধরে নাও।

মা আরও জ্বলে উঠেছে, থাকলে নেই ধরে নেব কী করে? এর চেয়ে একেবারে না থাকাই ভালো ছিল, বুঝলি! তুই কায়েতের ঘরে যাবি আর তারপর পুমুর বিয়ে দেব কী করে ভেবে দেখেছিস?

পুমু খাওয়া থামিয়ে মা আর ছোড়দির কথা শুনছিল। হড়বড় করে বলে উঠল, আমার জন্যে তুমি কিছু ভেব না মা। বামুন-কায়েত-বদ্যি-মুসলমান-খ্রিস্টান, আমি যাকে আঙুল তুলে ডাকব সেই ছুটে এসে আমাকে বিয়ে করবে। তুমি প্রতাপ বোসের সঙ্গে নিশ্চিন্তে ছোড়দির বিয়ে দিয়ে দাও, দারুণ স্মার্ট ছেলে মা, আর কি হ্যান্ডসাম! আমারই জিভে জল আসে।

রাগ ভুলে মা খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে ছোটো মেয়ের দিকে চেয়ে রইল। তারপর তেড়ে মারতেই এলো। পুমু ততক্ষণে নাগালের বাইরে। মায়ের চোখে আগুন। শমিতার দিকে ফিরে বলল, এই ছোটটাকে নিয়েই আমার যত ভয় ছিল, তার মধ্যে তুই এমন হলি? তুই?

রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাবার ঘরে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, তোমার মেয়ে এক বিলেত-ফেরত উকিল, তারা আবার বোস, তাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে। তোমার আস্কারা পেয়েই এই শেষের দুটো মেয়ে এতখানি বেড়েছে। কোথায় এঞ্জিনিয়ার আর কোথায় উকিল, দিনকে রাত করতে পারে

এরা। এ বয়সের একটা মেয়েকে যে ভোলাবে সে আর বেশি কী? আমি আর পারি না, এবার তুমি বোঝো।

শমিতার ভাগ্য ভালো, তার ঠান্ডা মাথার বাবা বুঝতেই চাইল। কারণ এই মেয়ের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর তার অগাধ আস্থা। মেয়ে যে ছেলেকে বিয়ে করতে চায় সে ব্রাহ্মণ হলে এ বিয়েতে খুশি হয়ে মত দিতে কারও আপত্তি হবার কথা নয়। অসবর্ণ বিয়ে ইদানীং যথেষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তার ভালোমন্দ নিয়ে কখনও মাথা ঘামানোর কারণ ঘটেনি। তাই সম্মতি দিতে নিজের সঙ্গে কিছুটা যুঝতে হয়েছে। তারপর নিজেই ছেলেকে দেখতে আর তার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলতে গেছে।

সমস্ত দুর্যোগ এত সহজে কেটে যাবে শমিতা কল্পনা করেনি। মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই দেখে মা-ও শেষ পর্যন্ত চুপ করে গেছে। বড়দি গম্ভীর, বড়ো জামাইবাবু হেসে হেসেই ঠাট্টা করেছে, শেষে উকিলের প্যাঁচে পড়লে! মেজদি-মেজ জামাইবাবুও মনে মনে অসন্তুষ্ট। খুশি শুধু পুমু। বড়ো জামাইবাবু মেজ জামাইবাবুর থেকে ছোড়দির বরকে তার ঢের বেশি ভালো লেগেছে। ওদের মতো ভ্যাদভেদে নয়—দারুণ ম্যানলি।

বিয়ের পরের দিনগুলো কোথা দিয়ে কেটে গেছে শমিতা টের পায়নি। জোর করেই কলেজ যাওয়া বজায় রেখেছিল, বি. এ. পরীক্ষাটা যেভাবেই হোক দিয়ে দেবার ইচ্ছে। কিন্তু পড়াশুনা আদৌ হয়নি। মাঝে মাঝে রাগ করেই ঘরের লোকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বই নিয়ে বসত, কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন ওদিকেই ঠেলে দিত। ও পড়তে বসলে প্রতাপ বোস একটা কোলবালিশ বুকে চেপে ওর দিকে চুপচাপ চেয়ে থাকত, ওর যে এক লাইনও পড়া হচ্ছে না সেটা বুঝে মিটিমিটি হাসত। তারপর নিঃশব্দে হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিত। শমিতা রাগ করবে কী! মনে মনে ওরও যে একই প্রতীক্ষা।

বিয়ের পরের মাস থেকেই শরীরের গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। পরের মাসটুকুও একই ব্যতিক্রমের মধ্যে কেটেছে। সন্তান আসছে। শমিতা এত তাড়াতাড়ি ছেলেপুলে চায়নি। বি এ পরীক্ষাটা অন্তত দেবে ভেবেছিল, নতুন কিছু লেখাতেও হাত দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। প্রতাপ বোস অবশ্য খুব খুশি। ঠাট্টা করেছে, বলেছিলাম না, একবার 'বি. এ.' বা বিয়েটা হলে 'এম. এ.' অর্থাৎ মা হওয়াটাও জলভাত ব্যাপার।

শমিতা রাগ করতে গিয়েও পারেনি। যে আসছে তার জন্যে ও নিজেও কিছু কম দায়ী নয়।

ভারী মাস তখন, একদিন শমিতা বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অলস চোখে রাস্তা দেখছিল। ততদিনে ওরা দক্ষিণ কলকাতার বড়ো বাড়িটায় চলে এসেছে। হঠাৎ খেয়াল হল, উল্টো দিকের ফুটপাতে একটা লোক হাঁ করে তার দিকেই চেয়ে আছে। লোকটার পরনে আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি, সঙ্গে পাঁচ থেকে সাত-আট বছরের চারটে ছোটো ছেলে। শমিতা ভেবেছে শ্বশুরবাড়ির দুঃস্থ কোনো আত্মীয় হবে। এরকম অনেককে বাগবাজারের বাড়িতে হামেশাই আসতে দেখত। ততক্ষণে ওই লোকটা এদিকের ফুটপাতে চলে এসেছে। মাথা উঁচিয়ে নিচ থেকেই জিগ্যেস করল, এটা প্রতাপ বোসের বাড়ি?

সাহায্যের জন্য লোকটা শ্বশুরের খোঁজ না করে তার ছেলের নাম করাতে শমিতা অবাক একটু। এরা সাধারণত শ্বশুরের কাছে আসে। মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছে, হ্যাঁ।

লোকটা এবার ইশারায় ওদিকের ফুটপাত থেকে ছেলেগুলোকে এধারে আসতে বলেছে। আবার ওপর দিকে তাকিয়েছে, প্রতাপ আছে?

শমিতা আবার মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছে, না।

—ঠিক আছে, আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।

শমিতা নিচে এসে দেখে লোকটা বাইরের বারান্দায় ছেলে চারটেকে নিয়ে বসে আছে। ছোটোখাটো গোলগাল নিরেট ভালোমানুষ চেহারা, তার ওপর এই বেশভূষা, সঙ্গে না-খেতে-পাওয়া-গোছের চারটে চার রকম বয়সের ছেলে, এসেছে প্রতাপের কাছেই, বলছেও শুধুই

'প্রতাপ'—শমিতা মাথামুণ্ডু ভেবে পাচ্ছিল না। কিন্তু স্বাভাবিক ভদ্রতার খাতিরে বাইরের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে বসতে বলেছে। লোকটা গোল গোল দুই মজার চোখে ওকেই বেশ করে দেখছিল, সরাসরি প্রশ্ন করল, প্রতাপ বিয়ে করেছে?

শমিতা থতমত খেয়েছে, হ্যাঁ।

—আপনিই ওর স্ত্রী?

এবারে মাথা নেড়ে জবাব, অর্থাৎ তাই।

—আমারও তাই মনে হয়েছিল। অনেকদিন পরে এলাম—তা মাসিমা মেসোমশাই কি বাগবাজারের বাড়িতে?

শমিতার বিস্ময় ক্রমশ বাড়ছিল। সবাইকে চেনে তাহলে!

জবাব দিয়েছে, হ্যাঁ।

—ও! লোকটার গলায় মজার ছোঁয়া। নিজের মনেই বলল, দু দুটো পেল্লায় বাড়িতে মাত্র চারটে লোক, আর এই চারটে বাচ্চার থাকার চার ছটাক জায়গাও নেই।...যাকগে, প্রতাপ ফিরবে কখন?

—বলে যায়নি, সাধারণত আটটা হয়।

—ও বাবা! আটটার তো এখনো অনেক দেরি। তাহলে চলি। ওকে বলবেন হারান এসেছিল।

—শুধু এই বললেই হবে?

লোকটা এবার মুখ খুলেই হেসে উঠেছে, হবার হলে এতেই হবে। তারপর ছেলেগুলোকে ডেকেছে, আয় রে, চল।

বাচ্চাগুলো চলে যেতে গিয়েও কী ভেবে দাঁড়িয়ে গেছল। সবচেয়ে ছোটটা শমিতাকে বলেছিল, জল খাব।

—'দিচ্ছি' বলে শমিতা তাড়াতাড়ি ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই লোকটা ওকে বাধা দিয়েছে।—আপনি ব্যস্ত হবেন না তো, জলটল কিছু লাগবে না। তারপর বাচ্চাগুলোকে হাসি মুখেই ধমকে উঠেছিল, আবার? আজকে মারই খাবি তোরা। চল!

শমিতার রাগ হয়ে গেলেও মুখের ভাবে ধরা পড়তে দেয়নি। ঠান্ডা গলায় বলেছে, ছোট বাচ্চা, তেষ্টা পেয়েছে, আপনি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? একটু দাঁড়ান! লোকটা আবারও দাঁত বের করে হেসে উঠে বলেছিল, এই শীতের অবেলায় এত তেষ্টা পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কেন জল চাইছে আপনি বুঝবেন না। তার পরেই তাড়া, এই চল চল।

শমিতার অবাক চোখের সামনে ছেলেগুলোকে নিয়ে চলেই গেছে।

রাতে প্রতাপ বোস ফেরার পর তাকে সব কথা বলতেই সে লাফিয়ে উঠেছে।— হারান! হারান এসেছিল! আর তুমি আমাকে একটা ফোনও করতে পারলে না?

থতমত খেয়ে শমিতা বলল, তাকে আর ওই ছেলেগুলোকে দেখে ফোন করার কথা মাথায় আসেনি।...কেন, লোকটা কে?

শুনেছে তারপর লোকটা কে। লোকটার নাম হারান ভট্টাচার্য, প্রতাপ বোসের একেবারে ছোটবেলার বন্ধু। বাবা-মা নেই, একটা ভাই ছিল, সেটাও গাড়ি চাপা পড়ে মরাতে তিনকুলে নিজের বলতে আর কেউই নেই। গরিবের ছেলে কিন্তু অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিল। প্রতাপ বোসের বাবাই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নিজের ছেলের সঙ্গে ভালো স্কুলে ফ্রিতে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ছাত্র জীবনে প্রতাপ বোস যে দুটি ছেলের সঙ্গে একাত্ম ছিল, তাদের একজন এই হারান ভট্টাচার্য আর একজন রমেন চৌধুরী। রমেন চৌধুরীকে তো শমিতা খুব ভালোই চেনে। কাছেই থাকে। তার মা-মরা ফুটফুটে ছেলে মোহন শমিতার প্রচণ্ড নেওটা, যখন-তখন কাকিমা কাকিমা করে ছুটে আসে।

শমিতা শুনল, এই হারান ভট্চাযের জন্যই নাকি তার ঘরের লোকের বি. এ. পাস করা সম্ভব হয়েছিল।...প্রতাপ বোস নিজেও যথেষ্ট ভালো ছাত্র ছিল। কিন্তু বি. এ. পড়ার সময় খেলাধুলো আর পলিটিক্স নিয়ে মেতে ওঠাতে বইয়ের পাতা ওল্টানোরও সময় পায়নি। পরীক্ষার তারিখ জানার পর

দেখেছে, সে বছর ভালো রেজাল্ট দূরে থাক, পাস করারই কোনো আশা নেই। ঠিক করেছিল সেবারটা ড্রপ করবে। কিন্তু বাড়িতে বাবাকে কিছু বলতেও পারছিল না। কারণ ছেলে সম্পর্কে তাঁর বরাবরই বড়ো আশা। ক্লাসের অন্য ছেলেরা অনেক বুঝিয়েছে, একবার ড্রপ করলে পরের বারটা যে আরও অনিশ্চিত, সে কথা বলে সাবধান করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রতাপ বোসের এক কথা, এবার পরীক্ষা দিলে নির্ঘাৎ ফেল। একমাত্র হারানই এ ব্যাপারে কিছু বলেনি।

একদিন সন্ধেবেলা নিজের ঘরে বসেছিল প্রতাপ বোস, এমন সময় হঠাৎ হারান এসে হাজির।—তোর কোন পেপারটাতে সব থেকে ভয় জানি, সেটাই আমরা আগে ধরব।

প্রতাপ বোস অবাক, তার মানে? বলেছি না এবার পরীক্ষা দেব না?

হারান ওরই বইপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিল। মুখ না তুলেই বলেছে, এবারই দিবি, তুই নিজেই দিবি, পনেরোটা দিন শুধু আমার কথা মতো চল...

জবাবে প্রতাপ বোস কী একটা বলতে যেতে হারান ভট্টাচার্য ধমকেই উঠেছিল। ছোটোখাটো হাসিখুশি ছেলেটার এই গলা কখনো শোনেনি।—চুপ করে আমার কথা শোন, যা বলি শুধু সেইমতো করে যা, তারপর তোর পাস-ফেলের সব দায়িত্ব আমার।

হারান আবারও বলেছে, প্রথমেই তোকে পরীক্ষার কথা ভুলে যেতে হবে। আমি যে রুটিন করে দিচ্ছি, ঠিক সেইমতো প্রত্যেক দিন পড়ে যাবি। যেদিনের যেটা পড়া সেটা হয়ে গেলে আর একটা লাইনও এগোবার চেষ্টা করবি না। এই করে পনেরোটা দিন দেখ, তার পরেও যদি মনে হয় হল না, তখন ছেড়ে দিস।

প্রতাপ বোসের আশা জেগেছে, কারণ ছাত্র হিসেবে হারানের কোনো তুলনা নেই। তবু বলেছে, কিন্তু আমি যে একটুও কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না, তুই এখন বলছিস, তাই জোর পাচ্ছি। কিন্তু যেই চলে যাবি, একটা লাইনও পড়তে পারব না।

হারান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছে, যদি কোনো অসুবিধে না হয় তাহলে এই তিনটে মাস আমি তোর সঙ্গে থাকতে পারি। আমার সমস্ত নোটস রেডি, তোকে আলাদা করে এখন আর কিছু লিখে তৈরি করতে হবে না, সে সময়ও নেই। তাছাড়া মুখে মুখে আমি যদি তোকে পড়াই, আমার নিজেরও রিভিশন হবে আর তোরও কনসেপশন অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

প্রতাপ বোস এরপর উঠে-পড়ে লেগেছে। সারাদিন ধরে হারান তাকে পড়িয়েছে, বুঝিয়েছে, প্রত্যেকটা জটিল বিষয় ধরে ধরে জল করে দিয়েছে, তারপর সেগুলো প্রতাপ বোস রাত্রিবেলা নিজে পড়েছে। আস্তে আস্তে কখন আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছিল টেরই পায়নি। পরীক্ষা ভালোই দিয়েছে। ফল বেরোতে দেখা গেছে হারান ভট্টাচার্য ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আর প্রতাপ বোস সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট। সেবার ফার্স্ট ক্লাস হারান একাই পেয়েছিল!

কিন্তু হারান এতবড়ো ব্যাপারটার কোনো ক্রেডিট নিতে রাজি নয়। বলেছে, আমার নিজের স্বার্থেই তোর বাড়ি গিয়ে থেকেছি। পরীক্ষার আগের তিনটে মাস খাওয়া-দাওয়ার কোনো চিন্তা না থাকাটা যে কত বড়ো রিলিফ তা তোরা বুঝতেও পারবি না।—সেই জন্যেই প্রোপোজালটা দিয়েছিলাম।

প্রতাপ বোস একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। গরিব বলেই ও ছেলে যে ভেতরে ভেতরে কত অভিমানী তা খুব ভালো করেই জানত।

বি. এ. পাসের পর প্রতাপ বোস ল-তে ভর্তি হয়েছে আর হারান ভট্টাচার্য তাদের দেশের কাছে কোথায় একটা চাকরি নিয়ে চলে গেছে। সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও আর পড়লই না। তার নাকি এসব কিছু ভালো লাগছে না। মাঝে দু-একবার প্রতাপ বোসদের বাগবাজারের বাড়িতে এসেছিল, তারপর দীর্ঘদিনের ছেদ। বহুকাল পরে আবার এই যোগাযোগ।

শমিতা এতসব জানত না। রমেন চৌধুরী ছাড়াও প্রতাপ বোসের আর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে শুনেছিল, কিন্তু অত খেয়াল করেনি। সেদিন প্রতাপ বোসের কাছে শোনার পর আপসোস হয়েছে লোকটাকে বসিয়ে রাখেনি বলে। আর আশ্চর্য লোক বটে! বাচ্চাটাকে জল পর্যন্ত খেতে দিল না!

শমিতা প্রতাপ বোসকে জিগ্যেস করেছে, আচ্ছা, তার সঙ্গে ওই বাচ্চাগুলো কারা? বিয়ে-থা করেছে নাকি? অবস্থা তো মোটেই ভালো মনে হল না।

প্রতাপ বোস জবাব দিয়েছে, হারান বিয়ে করেছে বলে মনে হয় না। যেখানেই যায় বাপ-মা মরা কতগুলো হতভাগা ঠিক ওর সঙ্গে জুটে যায়। সেই কলেজ লাইফ থেকে দেখেছি, এরাও তাই হবে।...কোনো ঠিকানাপত্র রেখে যায়নি?

শমিতা মাথা নেড়েছে, না।

এর তিন-চারদিন পরে হারান ভট্টাচার্য আবার এসেছিল। এবার একা। এদিন প্রতাপ বোসও বাড়ি ছিল। হইহই করে বন্ধুকে একেবারে নিজেদের শোবার ঘরে নিয়ে এল, শমিতার সঙ্গে আর এক দফা আলাপ করিয়ে দিল। এদিন আর সে কাজে বেরোয়নি। সারাদিন দুই বন্ধু খাওয়া-দাওয়া গল্প-সল্প করেছে। শমিতা কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই তাদের আড্ডায় যোগ দিয়েছে। হারান ভট্চায সোৎসাহে তাকেও নিজের ভবিষ্যতের প্ল্যান বুঝিয়েছে। বলেছে, তার যত চিন্তা-ভাবনা ওই সর্বহারা ছেলেগুলোকে নিয়ে। কলকাতার কাছাকাছি খুব সস্তায় জমি পেয়েছিল খানিকটা, সেখানেই চালাঘর তুলে ওদের নিয়ে মহা আনন্দে আছে। তার ডেরার নাম দিয়েছে 'হোলি-গার্ডেন'। ছেলেগুলোকে লেখাপড়া থেকে শুরু করে সমস্ত রকম কাজকর্ম নিজে হাতে ধরে শেখায়। ওখানে একটা স্কুলে আর ছেলেগুলোর মনের শিক্ষার জন্যই ওদের নিয়ে মাঝে মাঝে চাঁদা তুলে যারা আরও গরিব, তাদের সাহায্য করে বেড়াচ্ছে। এ ভাবেই এখন চলছে। কিন্তু ভবিষ্যতে এটাকে আরও বড়ো করে তোলার ইচ্ছে। অসহায় শিশুগুলোর যাতে একটু আশ্রয় জোটে, মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগটুকু অন্তত পায়, কখনও যেন না ভাবে ওদের কেউ নেই, প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের আপনার জন হয়ে ওঠে তার জন্য চেষ্টার শেষ নেই হারান ভট্টাচার্যের।

উৎসাহে দুচোখ চকচক করছিল। আপনি-তুমির ভেদ ভুলে গিয়ে শমিতাকে বলেছে, দেখো ম্যাডাম, দিন যত জটিল হবে এরকম শিশুর সংখ্যা তত বাড়বে। কিন্তু ওরা যদি এক চিলতে আশ্রয়ের অভাবে আর একটুখানি ভালোবাসার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তার অভিশাপ থেকে তোমার আমার প্রতাপের কিংবা তোমাদের কোলে যে সন্তান আসছে তার, কারুরই রেহাই নেই। তোমরা আমাকে পাগল ভাবো কিন্তু আমি ভাবি এই একটা মাত্র জীবনে যদি দশটা ছেলেও গড়তে পারি, সেই দশটা তো অন্তত বাঁচল।

কথাগুলো শমিতার একেবারে ভিতরে গিয়ে বসেছিল। নিজে মা হতে চলেছে তাই পরের সন্তানের জন্যে এই মমতা অদ্ভুত ভালো লেগেছিল। বড়ো বড়ো কথা সবাই বলে, কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে সেটা করে ক'জন? আর তখনই মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা খচখচিয়ে উঠেছে সেটা না বলে পারেনি। অনুযোগের সুরে বলেছে, এত মায়া আপনার, অথচ বাচ্চাটাকে সেদিন জলটুকুও খেয়ে যেতে দিলেন না?

হারান ভট্চাযের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরাট।—ওরা যে কত বিচ্ছু জানো না। গরিবের ছেলে তো, হিসেবের মাথা তাই তোমার থেকে অনেক বেশি সাফ। লক্ষ্য করেছ, ওদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটা জল চাইল, আর অমনি অন্যগুলো চকচকে মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শমিতা মাথা নেড়েছে, হ্যাঁ, তাতে কী?

হারান ভট্চায হেসেই বলেছে, ওরা জানে ওইটুকু ছেলেকে শুধু জল তুমি কক্ষনই দেবে না, খাবারও কিছু না কিছু আনবেই—আর একই সঙ্গে রয়েছে যখন, ওদের ভাগ্যেও কিছু জুটবে।

শমিতা, প্রতাপ বোস দুজনেই হতভম্ব। প্রতাপ বোস বলে উঠেছে, সে কথা তো তুই-ই ওকে বলে বাচ্চাগুলোকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতিস।

হারান ভট্চাযের মুখে হাসি মিলিয়ে গেল এবার। মাথা নেড়েছিল, না। অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে ওদের যেতে হবে। এখন থেকে লোভ কন্ট্রোল করতে না শিখলে ওদেরই সবচেয়ে ক্ষতি। ওদের জন্যই আমাকে নির্মম হতে হয়, তাতে আমারও কম কষ্ট হয় না।

শমিতার দু চোখের কোণ শিরশির করে উঠেছিল। ওপর-ওপর নরম এই নিপাট ভালোমানুষটার মধ্যে যে ইস্পাত-কঠিন আর একটা লোক আছে, তাকে ও সেদিন দেখতে পেয়েছিল।

দিন গেছে। কোলে মেয়ে এসেছে। প্রতাপ বোস শমিতার সঙ্গে মিলিয়ে মেয়ের নাম রেখেছে নন্দিতা, আদরের নাম নানু। প্রথম সন্তান, দুজনেই খুশি। কিন্তু সব থেকে খুশি বোধ হয় হারান ভট্‌চায। নানু-মায়ের জন্যই তার আসা আরও বেড়েছে। কাদার মতো জ্যান্ত পুতুলটাকে নিয়ে তার সে কী আনন্দ! ছোট্ট শিশু একটা কিছু করলে হারান ভট্টাচার্য আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, দেখেছ মেয়ের কাণ্ডটা, কী করছে দেখ!

শমিতা যদি কখনো বলেছে, সব বাচ্চাই এরকম করে, হারান ভট্‌চায ওমনি মাথা নাড়ত।—কক্ষনো না। আমার নানু-মা আলাদা, ওর মতো কেউ না।

প্রতাপ বোস আর শমিতা হাসত। হারান ভট্‌চায আরও খুশি মেয়ে হয়েছে বলে। বলত, আমার শুধু গাদা গাদা ছেলে। একটা মেয়ে না থাকলে কি ঘর ভরে? সব বুঝে-শুনেই তো আমার নানু-মা এসেছে।

শমিতা মাঝে মাঝে তার ওপর চড়াও হত, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি কোনো দিন বিয়েই করবেন না?

হারান ভট্‌চায ভালোমানুষের মতো মাথা নাড়ত, নিশ্চয় করব। তোমার মেয়ে হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি, এবার একটা ছেলে হওয়ার জন্যে প্রতাপকে ম্যাক্সিমাম দুটো বছর সময় দেব, তারপর তো তুমি আমার জন্যে ফ্রি।

শমিতা কটমট করে তাকাতে গিয়েও হেসে ফেলেছে।

বড়ো সুখে দিন কাটছিল। মেয়ে বড়ো হচ্ছিল কিন্তু তার লেখাপড়া নিয়ে প্রতাপ বোস বা শমিতা কাউকেই এতটুকু কিছু করতে হয়নি। সে সব ওর হারানকাকুর দায়িত্ব। নন্দিতা একটু বড়ো হতেই হারান ভট্‌চায ওকে নিয়ে তার হোলি-গার্ডেন-এ চলে যেত। নিজে পড়াত। ফলে ছোটবেলা থেকেই নন্দিতার পড়াশুনোর ভিত আশ্চর্য রকমের পাকা। এরপর স্কুলে যে অনায়াসে অত ভালো রেজাল্ট করে গেছে, তার সবটুকুই ওর হারানকাকার হাতযশ।

প্রতাপ বোসের কাজের চাপ দিনে দিনে বেড়েই চলছিল। ইতিমধ্যে তার বাবা মারা যাওয়াতে সমস্ত ক্লায়েন্ট তার একলার ঘাড়ে। এক-একদিন নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত সময় পেত না। আর টাকা তো যেন ছপ্পর ফুঁড়ে আসছিল। এদিকে শমিতার নিজের জগৎও থেমে ছিল না। চেষ্টাচরিত্র করে বি. এ. পরীক্ষাটা নানু পেটে থাকতেই দিয়ে দিয়েছিল। সেটাও আবার হারান ভট্‌চাযের কৃতিত্ব। লোকটা যে বাংলাতেও এত ভালো, জানত না। নিজে আগে শমিতার বইগুলো পড়ে নিয়েছে, তারপর এক একটা টপিক ধরে ধরে মুখে মুখে ওর সঙ্গে আলোচনা করেছে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিদেশি সাহিত্যের তুলনা-মূলক ব্যাখ্যা শুনে শমিতা মুগ্ধ হয়ে যেত। পরীক্ষার খাতায় জায়গা বুঝে হারান ভট্‌চাযের কত কথাই না বসিয়ে দিয়েছিল। ফল বেরোতে দেখা গেছে রীতিমতো উঁচু সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে।

এর সঙ্গে শমিতার লেখাও এগিয়ে চলছিল। নন্দিতা হওয়ার পর কিছুদিনের সাময়িক ছেদ, তারপর আবার শুরু করেছে। ঘরের লোকের কাছ থেকেও এ ব্যাপারে কম উৎসাহ পায়নি তখন। সারাদিনের খাটুনির পর প্রতাপ বোস রাতে শুয়ে শুয়ে লেখা পড়েছে, সমালোচনা করেছে, টেকনিক্যাল কোনো ভুল থাকলে বইপত্র ঘেঁটে ঠিক করে দিয়েছে। সপ্তাহে অন্তত তিন থেকে চারদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দিয়ে এসেছে, নিয়ে এসেছে। প্রথম বই দুটোর ছাপার টাকা তো প্রতাপ বোস পকেট থেকে বার করে দিয়েছিল। সঙ্গে ঠাট্টাও করেছিল, এরপর না আমিই মিস্টার শমিতা বোস হয়ে যাই। অবশ্য এর পরের বইগুলো ছাপতে আর ঘরের টাকা লাগেনি, প্রকাশক আপনিই এসেছে।

কোথাও কোনো ফাঁক ছিল না। শমিতা বোসের দিন বড়ো সুখে কাটছিল। এর মধ্যে শাশুড়ির মৃত্যু বেদনার হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয়, তাঁর বয়েস হয়েছিল। কিন্তু বিরাট ধাক্কা হয়ে এল প্রতাপ বোসের অন্তরঙ্গ বন্ধু রমেন চৌধুরীর মৃত্যু।

এই একটি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শমিতা বোসের ভর-ভরতি সুখের সংসারে ক্রমশ চিড় ধরেছে। তারপর ওই ছোটো একটু ফাঁক আস্তে আস্তে বিরাট ফাটল হয়ে উঠেছে। এখন সেই ফাটলের একদিকে দাঁড়িয়ে প্রতাপ বোস আর অন্যদিকে দাঁড়িয়ে শমিতা বোস নিজে।

* * *

অতীতের জাল ছিঁড়ে আজকের এই মুহূর্তটাতে ফিরে আসতে একটু সময় লাগল শমিতা বোসের। চোখের জলে টেবলের খানিকটা জায়গায় ভিজে দাগ পড়েছে। ল-ফাইনালে নন্দিতার ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার খবরের চিরকুটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল একটু। কলমটা তুলে কাগজে আঁকিবুকি কাটল খানিকক্ষণ। শ্রান্ত লাগছে।

মিহিরের গাড়ির আওয়াজ। নানু ফিরল। শমি॰ ৻বোস উঠে ক্লান্ত পায়ে রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেল।

শমিতা খেতে খেতে মেয়েকে লক্ষ্য করছিল। চোখ-মুখ দিয়ে চাপা খুশি ঠিকরে বেরুচ্ছে। কিছুই খাচ্ছে না, খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে শুধু। মা যে দেখছে সে খেয়ালও নেই। নিজের মধ্যেই ভরপুর। শমিতা বোস জিজ্ঞেস করল, রেজাল্টের খবর তোর বাবাকে জানিয়েছিস তো?

নন্দিতা চমকে উঠল। যা ভাবছিল তাতে আচমকা ছেদ পড়ল যেন। সামলে নিয়ে জবাব দিল, তা আর জানাইনি! বাবাকেই তো সবথেকে আগে বললাম। তুমি বাড়ি ছিলে না বলে খবরটা তোমার টেবিলে লিখে রেখে গেছি।

শমিতা বোস এবার আলতো করে জিজ্ঞেস করল, এতক্ষণ কোথায় ছিলি, মিহিরের বাড়ি?

নন্দিতা থতমত যেন একটু। মায়ের শান্ত দুচোখ সারা শরীরে বিঁধে আছে। কানের কাছটা গরম ঠেকল। বলল, প্রথমে সিনেমা দেখব বলেই বেরিয়েছিলাম, টিকিট পেলাম না, তাই শেষ পর্যন্ত ওদের বাড়িতে বসেই গল্প করছিলাম।

মা চেয়েই আছে দেখে ঝাঁঝিয়ে উঠতে গিয়েও থেমে গেল। কী মনে পড়তে উত্তেজনায় মুখ লাল। বলল, দুপুরে তোমার ওই মোহন চৌধুরী এসেছিল। ওকে একটু বুঝেশুনে কথা বলতে বলে দিও। আর কোনো দিন যদি এরকম হয় সোজা ঘাড় ধরে বার করে দেব।

শমিতা বোস অবাক।—মোহন! কী হয়েছে? সে কী করেছে?

তপতপে গলায় নন্দিতা দুপুরের সমাচার বলল। সব শুনে শমিতা বোস স্তব্ধ খানিকক্ষণ। তারপর ফিরে মেয়েকেই মৃদু অনুযোগ করল, তুই-ই বা প্রথমে ওর সঙ্গে লাগতে গেলি কেন?

নন্দিতা রাগে ছিটকে উঠল, সেটাই তোমার কাছে বড় হল? আর বাবাকে যে এতবড় অপমানটা করে গেল, প্রফেশন নিয়ে কথা তুলে মিথ্যে কথার চাষ করে বলল, আর ঘুরিয়ে জোচ্চোর বলল, সেটা কিছু না?

শমিতা বোস চুপ। নন্দিতা আবার গরগর করে উঠল, আমিও ছাড়িনি; মিহিরের বাড়ি থেকে ফেরার পথে সোজা হারানকাকার ডেরায় গিয়ে তাকে সব বলেছি। হারানকাকুকে দিয়ে ওকে আমার কাছে ক্ষমা চাইয়ে ছেড়েছি।

শমিতা বোসের ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগল একটু। তারপরেই সমস্ত মুখ বিবর্ণ।—তুই হারানবাবুকে এসব কথা বলে এসেছিস?

বললাম না, শুধু বলেই আসিনি, বাছাধনকে একেবারে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে ক্ষমা চাইয়ে তবে ছেড়েছি। আমিও বাবার মেয়ে! নন্দিতার গলার স্বরে এবার রাগের থেকে তুষ্টি বেশি।

শমিতা বোস আধখাওয়া ডিশটা সরিয়ে উঠে পড়ল। মুখ তেমনি সাদা। আস্তে করে বলল, কাজটা ভাল করিসনি, খুব অন্যায় করেছিস।

মায়ের মুখ দেখে নন্দিতা থমকাল। কিন্তু খাবারের প্লেট সরিয়ে দেওয়াতে আবারও রাগ হচ্ছে। খেঁকিয়ে উঠল, তা বলে তোমার না খেয়ে ওঠার কী হল?

—কী যে হল সেটা বুঝতে পারলে তোরও আর খাওয়া হবে না। খেয়ে নে।

রাগ করে এবার নন্দিতাও বেশ জোরেই নিজের ডিশটা ঠেলে দিয়ে উঠে পড়ল। শমিতা বোস চুপচাপ দেখছে শুধু, একটি কথাও বলল না। তারপর নিজের ঘরে চলে গেল।

এর দুদিন পরে হারান ভট্চায এসে হাজির। নন্দিতাকে দেখে একগাল হেসে জিগ্যেস করল নানু-মায়ের রাগ পড়েছে কি না। ও কিছু বলার আগেই শমিতা বোস বলে উঠল, কিন্তু আপনার রাগ তো এখনও পড়েনি। ছেলেটাকে তিনদিন ধরে একেবারে উপোস করিয়ে রাখলেন?

হারান ভট্চায তেমনি হেসেই বলল, একেবারে উপোস কোথায়? নুন দিয়ে যত ইচ্ছে জল খাচ্ছে।

নন্দিতা হতভম্ব হয়ে দুজনের কথা শুনছিল। কিছু না বুঝতে পেরে বলে উঠল, তার মানে?

শমিতা বোসের ঠাণ্ডা দুচোখ এবার মেয়ের দিকে। তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বলল, মানেটা আমি জানতাম বলেই সেদিন বলেছিলাম নালিশ করে ভাল করিসনি। যে কোনো ব্যাপারে সংযম হারানো হারানবাবুদের ওখানে সব থেকে বড় অপরাধ, আর তার শাস্তিও সেরকমই।

নন্দিতার ভয়ানক বিচ্ছিরি লাগছে। ওর জন্যই একটা লোক তিনদিন ধরে না খেয়ে রয়েছে! রাগই হয়ে গেল। হারানকাকার ওপর, মায়ের ওপর, আসলে সবচেয়ে বেশি নিজের ওপর। তপতপে গলায় হারানকাকাকে বলল, সে ব্যাপার তো ক্ষমা চাওয়াতেই মিটে গেছল, তারপরেও এই শাস্তির দরকার হল কেন? আক্কেলটা আমাকেই দেবার জন্যে?

হারান ভট্চাযের হাসি মুখ।—নানু মা, তোর হারানকাকুর গোয়ালে কেউ কাউকে শাস্তি দেয় না। দোষ করেছে বুঝলে ওরা নিজেই নিজেকে শাসন করে, কাউকে একটি কথাও বলতে হয় না। আমাকে শুধু ব্যাপারটা জানিয়ে রাখে।

নন্দিতা জোরেই বলে উঠল, তা বলে একটা ছেলে তিন দিন ধরে না খেয়ে থাকলেও তুমি কোনো কথা বলবে না?

হারান ভট্চায তেমনি হাসি মুখেই মাথা নাড়ল, না। ছোটবেলা থেকেই ওদের মধ্যে আমি শুধু চরিত্র তৈরির বীজটা পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা করি, বাকিটা ওরা নিজেরাই করে নিতে পারে। তখন আমারও কিছু বলতে যাওয়াটা বাড়তি হয়ে দাঁড়ায়।

নন্দিতার রাগ তো পড়লই না, উলটে ব্যঙ্গ করে উঠল, এইসব মহামানব তৈরি করার কারখানাটা একেবারে হিমালয়ে গিয়ে বানালেই তো পারতে, আমাদের মতো পাপী-তাপীদের মধ্যে কেন?

হারান ভট্চাযের দু'চোখ এবার অস্বাভাবিক চকচক করে উঠল। ভারী গলায় বলল, মহামানব নয়, আমি কেবল মানুষ গড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। নির্ভেজাল মানুষ। তার জন্যে এর থেকে ভাল জায়গা আর কোথায় পাব বল? যেখানে মা পেটের জ্বালায় ছেলে বিক্রি করে, বন্ধু বন্ধুর বুকে ছুরি বসায়, ঘরের বউদের ধরে ধরে পুড়িয়ে মারে, তরতাজা ছেলেগুলোকে ট্রেনের চাকার নিচে ফেলে দেওয়া হয়, আর যেখানে হাত-পা নিয়েও পঙ্গুর মতো ভদ্রলোকেরা শুধুই চেয়ে চেয়ে দেখে, মানুষ গড়ার এর থেকে ভাল জমি এই দুনিয়াতে আর কোথায় পাব বলতে পারিস?

নিবিড় ব্যথা থেকে উঠে আসা কথাগুলোর ছোঁয়ায় ঘরের বাতাসও টনটনিয়ে উঠল যেন। মা-মেয়ে দুজনেই চুপ। হারান ভট্চায পরিবেশটাকে হালকা করার চেষ্টা এবার। নন্দিতার দিকে ফিরল। মুখে, গলার স্বরে আবার মজার আমেজ, আসলে তোর হারানকাকার গোয়ালের প্রত্যেকটা গরুরই নিজস্ব এক একটা প্রিন্সিপল্ আছে। যেমন ওই মোহন ছোঁড়টার। ওর প্রিন্সিপল্ হল সবচেয়ে আগে নিজের জিভ সংযত করা।

নন্দিতা বলল, তা বলে এইভাবে তিন দিন ধরে উপোস করে থাকলেও তুমি কিছু বলবে না?

—বললাম যে, কেবলমাত্র ভুল করলেই আমি ওদের কিছু বলি, শুধরানোর চেষ্টা করি। মোহনের তোকে ওরকম বলাটা ভুল হয়েছিল। তখন যা বলার বলেছি।

নন্দিতার ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছে। হারানকাকা যা-ই বলুক সমস্ত ব্যাপারটার জন্য যে আসলে ওই দায়ী সেটা তো ঠিক। প্রায় কবুল করার মতো করেই বলল, কিন্তু আমিই যে ওকে প্রথমে খুঁচিয়েছিলাম।

হারানকাকুর হা-হা হাসি।—সে জন্যেই তো মোহনের নিজের ওপর সব থেকে বেশি রাগ। এই সামান্য প্রোভোকেশানটুকু ও জয় করতে না পেরে রিঅ্যাক্ট করে বসল!

নন্দিতা খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।—অপরাধটা যখন আমার কাছেই করেছে, তখন শাস্তি দেওয়া বা না দেওয়ার মালিকও আমিই। চলো, যা বলার আমিই বলব, ওঠো।

হারান ভট্‌চাযের ওঠার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তেমনি বসে বসেই বলল, তা না হয় উঠলাম, কিন্তু যদি কিছু করতে না পারিস তখন আবার আমাকে দুষিস না।

নন্দিতার হুকুম—ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না, এখন ওঠো তো।

ওর মুখে কতকাল এই দাবির সুর শোনেনি। হারান ভট্‌চায নন্দিতার একটা হাত টেনে উঠে দাঁড়াল।

গাড়িতে যেতে যেতে মোহনের সেদিনের সেই ক্ষমা চাওয়ার ঘটনাটাই ভাবছিল নন্দিতা। এই পরিণাম হবে জানলে কে মরতে হারানকাকাকে বলতে যেত? একটা মানুষ ওরই জন্য তিনদিন ধরে শুধু নুন-জল খেয়ে আছে! তার ওপর হারানকাকু জিভ সংযত করার যে কথাটা বলল, সেটা তো ঘুরে নন্দিতার পিঠেই চাবুক হয়ে নেমেছে। সেদিনের নালিশ করার ব্যাপারটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।...বিশেষ দরকারের ছুতো দেখিয়ে মিহিরের বাড়ি থেকে ফেরার পথে হারানবাবুর 'হোলি গার্ডেন'-এ হানা দিয়েছিল নন্দিতা। মিহিরকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে সোজা হারানকাকুর ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। হারানকাকা যেমন অবাক, তেমনি খুশি। কী রে, তুই! বোস বোস! আজ কী দিন!

—খুব সুদিন নয়, বসতে আসিনি। তোমার ওই মোহনকে ডাকো এখানে।

—কেন? সে কী করেছে?

শুনল কী করেছে। নন্দিতা নিজে যা যা বলেছিল তাও গোপন করেনি। কিন্তু তা বলে মোহন এই কথা বলবে?

হারানকাকার এরকম থমথমে মুখ নন্দিতা আর কখনো দেখেনি। তক্ষুণি মোহনকে ডাকিয়ে এনেছে। গলার স্বর ভয় ধরানোর মতো ঠাণ্ডা। —ওকে কী বলেছিস?

মোহন চুপ।

—আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? নানু-মাকে কী বলে এসেছিস?

মোহন মুখ তুলেছে। চোখে চোখে তাকিয়ে স্পষ্ট জবাব দিয়েছে, আমি আগে কিছুই বলিনি।

হারানকাকুর মৃদু-কঠিন গলা।—আগে না পরে আমি জানতে চাইনি। এতদিন ধরে কী শিখলি তবে? চোখের বদলে চোখ উপড়ে নিলে অন্ধের সংখ্যাই শুধু বাড়ে, একটা বাজে কথার উত্তরে আরেকটা বাজে কথায় শুধু তিক্ততাই বড় হয়ে ওঠে। নিজেই না বলিস মানুষের সবথেকে বড় শত্রু তার নিজের জিভ?

মোহন চুপ একেবারে।

—ওর কাছে ক্ষমা চা, হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চা।

নন্দিতার দারুণ অস্বস্তি লাগছিল। বাধা দিয়েছে, না না, ওভাবে কিছু বলতে হবে না।

মোহন মুখ তুলল। এক সেকেন্ডের জন্য চোখ জোড়া দু'টুকরো জ্বলন্ত কয়লার মতো ধক-ধক করে উঠল, তারপরেই শান্ত আবার। আস্তে আস্তে নন্দিতার একেবারে সামনে এসে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর দুহাত জোড় করে সোজা ওর চোখে তাকাল। রাগ নয়, অনুযোগ নয়, খুব নরম একটু ব্যথার হাসি তখন সেখানে চিকচিক করছিল।

অস্বস্তি ভুলে নন্দিতাও চেয়ে ছিল। চমক ভেঙেছে হারানকাকার কথায়, ওঠ এবার, যা। ঘাড় যত নোয়াবি মেরুদণ্ড ততো শক্ত হবে, বুঝলি রে হতভাগা?

মোহন উঠে দাঁড়াল। সেই ব্যথা-মাখা হাসি-মুখে বলল, বুঝলাম। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আর তারপরে এই উপোস।

হারানকাকার ডাকে নন্দিতার সাড় ফিরল—কিরে নামবি না?

কখন এসে গেছে নন্দিতা খেয়ালই করেনি। ওকে ঘরে বসিয়ে হারান ভট্চায মোহনকে নিজেই গিয়ে ধরে নিয়ে এলো। —নানু-মা বলছে, দোষটা যখন ওর কাছেই করেছিস, তখন শাস্তি দেওয়া না-দেওয়ার মালিকও ও-ই। তোর উপোস ভাঙার জন্যে নিজে এসেছে।

মোহন নন্দিতার দিকে চেয়েও দেখল না। হারানকাকাকেই বলল, দোষ আমি নিজের কাছেই করেছি, কাজেই শাস্তি দেওয়ার মালিকও আর কেউ না।

রাগ করব না প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও নন্দিতা তেতে উঠল।—খুব যে মহাপুরুষ হয়ে গেছ একেবারে! এই না খেয়ে থেকে আক্কেলটা দিচ্ছ কাকে?

এবার নন্দিতার দিকে সোজা তাকাল মোহন। স্পষ্ট জবাব দিল, নিজেকে।

ও! ক্ষোভে ঠোঁট কামড়াল নন্দিতা। আঙুল তুলে হারানকাকাকে দেখিয়ে বলল, এই যে লোকটা তোমাদের গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানানোর জন্যে নিজের সব কিছু ছেড়েছে, এভাবে জল খেয়ে থেকে তাকেও যে তলায় তলায় কত কষ্ট দিচ্ছ জানো না?

মোহন দাঁত বের করে হেসেই উঠল এবার। এরকম মজার কথা আর শোনেনি যেন।—কার কষ্টের কথা বললে? কাকুর?

তেমনি হাসতে হাসতেই বলে চলল, এইখানে দশ থেকে কুড়ি বছরের প্রত্যেকটা ছেলের সপ্তাহে একদিন করে প্রায় নির্জলা উপোসের দিন। আর কাকু সেদিন অন্য সবাইকে নিয়ে হইহই করে যেটুকু ভালমন্দ পারে জোগাড় করে খায়। যাদের উপোস তারা সেদিনের সব কাজ করে। রান্নাবান্না, পরিবেশন, এঁটো বাসন মাজা, বিছানা করা—সব কিছু। তারপর রাত দশটার পর এক গ্লাস করে জল খেয়ে শুয়ে পড়ে।

নন্দিতা দুচোখে তাজ্জব বিস্ময় নিয়ে হারান ভট্চাযের দিকে তাকাল। —সত্যি? তুমি এই নিয়ম বানিয়েছ?

সে-ও হাসতে হাসতেই ঘাড় নাড়ল। সত্যি।

মোহন আবার বলল, কাকু কোনো নিয়ম বানায় না। নিজে যা করে আমরাই নিজেদের স্বার্থে সেটাকে নিয়ম বানাই। কাকু নিজেই সপ্তাহে একদিন নির্জলা উপোস থেকে সমস্ত কাজকর্ম নিজের হাতে করে। রান্নাবান্না করে আমাদের খাইয়ে, এঁটো কাচিয়ে, বিছানা পেতে আমাদের শুইয়ে তারপর নিজে একগ্লাস জল খেয়ে শোয়। কোনোদিন এর নড়চড় হয়নি। আমরাও সেটাই করি। যার ইচ্ছে হবে না সে করবে না। কিন্তু এখানে এমন একজনও নেই যার ইচ্ছে হয় না।

নন্দিতা অবাক। তা বলে নিজের জেদ ছাড়ল না। বলল, সে তোমরা নিজেদের মধ্যে যা-খুশি করো, কিন্তু আমাকে ইনভলভ্ করে এসব চলবে না। তোমাকে উপোস ভাঙতে হবে। কাকু, ওকে কিছু খেতে বলো।

মোহন চৌধুরীর তেমনি হাসি মুখ। হারান ভট্চাযকে বলল, তুমি হুকুম দিলে উপোস ভাঙতেই হবে। কিন্তু এরপর কতদিন যে না খেয়ে কাটাব তা তুমি টেরও পাবে না। কাল থেকেই খাওয়া শুরু করতাম, সেটাও বন্ধ হবে।

হারান ভট্চাযই ফাঁপরে পড়ল, যেন শাস্তিটা তারই। তাড়াতাড়ি বলল, থাক থাক নানু-মা, এ নিয়ে আর কথা বাড়াস না। কাল থেকেই তো খাবে শুনলি।

আর একটাও কথা না বলে নন্দিতা বাড়ি ফিরল। বরাবরই নিজের জোরের ওপর অটুট আস্থা। সেটা এভাবে তছনছ হয়ে যেতে ক্ষোভে চোখে জল আসার দাখিল। কেন যে মরতে ওখানে গিয়ে সেধে অপমানিত হয়ে এল! তা-ও কিনা এরকম একটা মুখ্যু গোঁয়ারের কাছে! এটাকে অপমান ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না নন্দিতা।

বাবার অফিসেই ঢুকল নন্দিতা। পুরনো বাড়ির একতলার বড় হলটা অফিস হিসেবে ব্যবহার করত প্রতাপ বোস। তার নিজস্ব আলাদা চেম্বার। অন্য যে জনা ছয়েক জুনিয়র উকিল ছিল, নন্দিতা আপাতত তাদের সঙ্গে বসা শুরু করল। বাবাকে নন্দিতা ওর এই ইচ্ছের কথা জানিয়েছিল। প্রতাপ বোস খুশি হয়েই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কোর্টে ওর নামও রেজিস্ট্রি করিয়ে রেখেছে, প্র্যাকটিস করার যাতে অসুবিধে না হয়। নন্দিতারও সেই ইচ্ছে, কিন্তু তার আগে বাবার চেম্বারে কিছুদিন কাজ শিখে নেওয়ার বাসনা। এই কর্মজীবন ওর দারুণ লাগছে। এখন সকাল দশটা থেকে পাঁচটা এ বাড়িতেই কাটে। তারপরেও প্রায়ই কোনো কেস নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনায় জমে যায়, তখন আর কিছু খেয়াল থাকে না। মাকে ফোন করে জানিয়ে দেয় সেদিন আর ও ফিরছে না। দার্জিলিংয়ের হস্টেলে যাবার আগে যে ঘরটায় থাকত, এখানে থাকলে এখনো সে ঘরেই শোয়। পুরনো দিনের এক একটা ঘটনা, বাবার সঙ্গে ষড় করে মায়ের পিছনে লাগা, মা-বাবার চোখে-চোখে কথা—সবকিছু সুতোর মতো ওর মনটাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। তখন একই সঙ্গে ভাললাগা আর বিষণ্ণতায় ভেতরটা ছেয়ে যায়।

বাবা যখন যত্ন করে ব্রিফ তৈরি করে বা কেস সাজায়, তখন নন্দিতা সবার অলক্ষ্যে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখে। কোন নিষ্ঠার জোরে আজ এতখানি উঠেছে সেটা অনুভব করে। তখন মায়ের ওপর আরও রাগ হয়। কাজের এই নিষ্ঠাকেও সম্মান করতে পারল না? প্রতাপ বোসের চুলের দুপাশে এখন সাদার ছোপ, কপালে বয়সের রেখা। তবু যখন কাজে ডুবে থাকে তখন সেই তন্ময় পুরুষকারের রূপ আলাদা। কিন্তু আশ্চর্য, লেখিকা হয়েও মা তা দেখতে পেল না! নন্দিতা বাইরের লোকের চোখ দিয়ে বাবাকে মাঝে মাঝে দেখার চেষ্টা করে। তখন রাগ সত্ত্বেও মায়ের জন্য এক ধরনের দুঃখও হয়।

অফিসে কাজের ছুতো ধরেই বাবার সঙ্গে মজাও বড় কম হয় না। কোনো রকম গলদ দেখলেই বাবা ওকে জব্দ করার চেষ্টা করে। নন্দিতাও পালটা জবাব দিতে ছাড়ে না। আর প্রতাপ বোসের যেন মেয়ের কাছে হেরেই আনন্দ। নিজে জব্দ হলে হা-হা করে হাসতে থাকে।

একদিন নন্দিতা সবে অফিসে এসে বসেছে, বেয়ারা ওর নাম লেখা একটা মুখবন্ধ খাম দিয়ে গেল। পড়ে তো ও অবাক। এক যোগ ব্যায়াম সংস্থার মালিকের কনসালটেশন ফি হিসেবে একশো টাকার বিল। প্রথমে নন্দিতা ব্যাপারটা ঠিক খেয়াল করতে পারেনি। একটু পরেই মনে পড়তে রাগে চিড়বিড় করে উঠেছে। কিছুদিন আগে ছোটমাসির বাড়িতে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তার যোগ ব্যায়ামের স্কুল আছে শুনে নন্দিতা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিছু উপদেশ চেয়েছিল। ভদ্রলোক দু'তিনটে আসন বলে দিয়েছে, কীভাবে ওগুলো করতে হবে নিজে করে দেখিয়েও দিয়েছিল। ব্যাপার ওখানেই চুকে গেছে। তারপরে কিনা এই একশো টাকা কনসালটেশন ফি-এর বিল?

সন্ধ্যেবেলা অফিস ফাঁকা হতে নন্দিতা বাবার চেম্বারে ঢুকল। বিলটা বাবার সামনে ফেলল। বাবা অবাক, এটা আবার কী?

—পড়ে দেখো।

প্রতাপ বোস পড়ল। জিগ্যেস করল, যোগ-ব্যায়ামের আখড়ায় আবার কবে গেলি? তারপর ফি দিতে ভুলে গেছিস?

—কোত্থাও যাইওনি আর ফি দেবার প্রশ্নও ওঠেনি। যা যা ঘটেছিল খুলে বলে নন্দিতা জিগ্যেস করল, এখন কী করব?

বাবার সাফ নির্দেশ, আপাতত কিচ্ছু করবি না। চুপ করে থাক। আবার এ ধরনের তাগিদ এলে তখন দেখা যাবে।

এর ঠিক দুদিন পরে নন্দিতা বোসের নামে আবার একটা খাম এলো। খুলে অবাক দেখে, অ্যাডভোকেট প্রতাপ বসুর ফি-এর বিল! দুদিন আগে নন্দিতা বোস তার কাছ থেকে লিগাল অ্যাডভাইস নেওয়ার দরুন একশো টাকার কনসালটেশন ফি-এর দাবি। তলায় স্বাক্ষর, প্রতাপ বোস।

প্রথমটায় নন্দিতা হকচকিয়ে গেলেও পরে বাবার রসিকতা বুঝতে পেরে খুব হেসেছে। মজা করে তারপর নিজের চেক বইটা নিয়ে একটা বাবার নামে আর একটা যোগ-ব্যায়ামের সেই ভদ্রলোকের নামে একশো টাকা করে দুটো অ্যাকাউন্ট-পেয়ি চেক কাটল। সঙ্গে প্রতাপ বোসের নামে অফিসিয়াল চিঠি, দুজনেরই ফি পাঠানো হল, এবার যেন যথাবিধি ব্যবস্থা করা হয়। নিচে স্বাক্ষর, নন্দিতা বোস।

রাতে কাজের শেষে প্রতাপ বোস সেই চিঠি আর চেক হাতে পেয়ে হলঘরে এসে আগে একদফা হেসে নিল। বলল, তুই এত বিচ্ছু হয়েছিস নানু-মা!

প্রফেশনের ছুতো ধরে ঠাট্টা-ইয়ার্কি বাবা-মেয়ের একটা মজার খেলা হয়ে উঠেছিল। নন্দিতা ফাঁক পেলেই বাবাকে নাকাল করার চেষ্টা করে আর প্রতাপ বোসও কুটুস-কুটুস জবাব দিতে ছাড়ে না।

একদিন খুব মন দিয়ে একটা ফাইল দেখছে, নন্দিতা ঢুকে এদিক-ওদিক ঘুর-ঘুর করতে লাগল। প্রতাপ বোস খেয়ালই করল না, তার তখন কোনোদিকে হুঁশ নেই। শেষে আর থাকতে না পেরে নন্দিতা জিগ্যেস করল, ও বাবা, দেখতেই যে পাচ্ছ না, এত মনোযোগ দিয়ে কী পড়ছ?

মুখ না তুলেই প্রতাপ বোসের জবাব, বিধবার সম্পত্তি নিয়ে একটা জটিল কেস।

নন্দিতা মুখ মুচকে বলল, !...আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

এবার প্রতাপ বোস একটু অবাক হয়ে মুখ তুলেছে, কী আগে বোঝা উচিত ছিল?

নন্দিতা ভালোমানুষের মতো জবাব দিয়েছে, এটা যে বিধবার সম্পত্তির মামলা তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।...ইফ আ রিচ্ উইডো ডাইজ, হার ল'ইয়ার আল্টিমেটলি বিকামস্ হার এয়ার।

প্রতাপ বোস এবার ফাইল বন্ধ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক। বাট ইন দিস কেস দি ল'ইয়ারস ওনলি ডটার বিকামস্ দি ওনার অব এভরিথিং।

নন্দিতা হেসেই প্রতিবাদ করে উঠেছে, এটা তো পার্সোনাল অ্যাটাক করলে, দিস ইজ আন-এথিকাল।

—আচ্ছা আচ্ছা, এবার এথিকস্ই ফলো করছি। ভল্‌তেয়ার বলেছিল, হি ওয়াজ নেভার রুইন্ড বাট টোয়াইস। প্রথম, যখন একটা কেস হারল, আর দ্বিতীয়, যখন সব টাকা তার লিগাল অ্যাডভাইসারের পকেটে ঢেলে আর একটা কেস জিতল...কিন্তু সেই ল'য়ারের শেষ পর্যন্ত কী হলো জানিস? হি ট্যু ওয়াজ রুইন্ড ফর দ্য রেস্ট অব হিজ লাইফ, হোয়েন হিজ ওনলি ডটার টুক আপ হিজ প্রফেশন।

নন্দিতা চেঁচিয়ে উঠেছে, বাবা, আবারো তুমি বাজে কথা বলছ! আমিও ভল্‌তেয়ারের কোটেশানটা পড়েছি, পরের কথাগুলো সেখানে মোটেই নেই, ওগুলো সব তোমার বানানো।

প্রতাপ বোস হাসছে।

নন্দিতা আবারো কী বলতে গিয়েও হঠাৎ চুপ করে গেল। হাসা সত্ত্বেও বাবাকে বড় শ্রান্ত লাগছিল।

বাবা যতই সহজ থাকার চেষ্টা করুক, মাঝে মাঝেই যে এক ধরনের হতাশা তাকে ছেঁকে ধরে তা ওর চোখ এড়ায় না। কাজ করতে করতে প্রায়ই মোটা চশমাটা খুলে টেবলের ওপর মাথা রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে থাকে। তার চেম্বারে একমাত্র নন্দিতারই অবাধ যাতায়াত, ফলে ধরাও পড়ে ওরই কাছে। জিগ্যেস করলে বলে, ও কিছু না। কাজ করতে করতে ক্লান্ত লাগলে এভাবে খানিক বিশ্রাম নেওয়া নাকি চিরকালের অভ্যেস। কিন্তু তার ক্লান্তি যে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে, তা নন্দিতা বুঝতে পারে। বরাবরই হাই ব্লাডপ্রেসার, কিন্তু শেষ কবে চেক করিয়েছে নন্দিতা জানে না। ও প্রসঙ্গ তুললেই থামিয়ে দেয়। বলে, কিচ্ছু দরকার নেই, খুব ভাল আছি।

সেদিন নন্দিতা ভেতরে ভেতরে ভালোরকম নাড়াচাড়া খেল একদফা। অন্য দিনের চেয়ে এদিন অনেক আগেই প্রতাপ বোস দোতলায় উঠে গেছল। এরকম বড় একটা হয় না। নন্দিতা একটা কেস খুঁটিয়ে পড়ছিল। বাবাকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে দেখে ভাবল আজ অনেকক্ষণ গল্প করবে, তারপর রাতেও এখানেই থেকে যাবে। কিন্তু ওর পড়া শেষ হতে আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। ওপরে উঠে বাবার ঘরে ঢুকতে গিয়েও দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। বাবা শুয়ে। সামনের বেড-সাইড টেবলে একটা আধ-খাওয়া হুইস্কির বোতল, দুটো সোডার বোতলের একটা পুরো খালি, অন্যটাও প্রায় খালি। আর গ্লাসের জিনিসও অনেকটাই শেষ হয়ে এসেছে।...প্রতাপ বোস যে মাঝে মাঝে ড্রিঙ্ক করে নন্দিতা জানত। সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। এক আধবার শখ করে ও-ও বাবার গ্লাস থেকে চুমুক দিয়েছে। মায়ের চোখে পড়লে রাগ করত, আর বাবা হাসত। কিন্তু আজ ধাক্কা খেল বাবাকে এভাবে একলা ড্রিঙ্ক করতে দেখে। নন্দিতা খুব ভাল করেই জানে বাবা কখনও একলা এসব খেতে পারত না, কাউকে না কাউকে জুটিয়ে নিত। মা ভাজাভুজি নানা রকম খাবার করে দিত। কাউকে না পেলে সঙ্গ দেয়ার জন্য বাবা মাকেই ধরত। মায়ের এ ব্যাপারে কোনোরকম গোঁড়ামি ছিল না, শুধু বিচ্ছিরি গন্ধ লাগত বলে পারতে নিজে মুখে দিতে চাইত না। তবু বাবাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যই কখনও-সখনও লেমনেড বা অরেঞ্জ মিশিয়ে খেত। বাবা হেসে হেসে আক্ষেপ করত, হুইস্কির জাতই চলে গেল। সবটাই মজার ব্যাপার ছিল। তারপর আবার খেল না তো অনেক দিনই খেল না।

...সেই মানুষ আজ একলা শুয়ে এভাবে ড্রিঙ্ক করছে! নন্দিতার মনে হল বাবা যেন নিঃসঙ্গতার প্রতিমূর্তি। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে মাথার কাছে বসল। কাঁচা-পাকা ঘন চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগল। জানে, এটা বাবার ভারি প্রিয়।

ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে। প্রতাপ বোস তেমনি চোখ বুজে থেকেই ওর হাতের ওপর নিজের হাতটা রাখল। নিবিড় চাপ দিল একটু, ভারী টনটনে গলায় বলল, আরও জোরে জোরে টেনে দাও তো...

নন্দিতা অবাক, আজ পর্যন্ত বাবা কখনও ওকে তুমি করে বলেনি। ডাকল, বাবা, ও বাবা!

প্রতাপ বোস প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বসে বড় আলোটার সুইচ টিপল। চোখ দুটো বেশ লাল, বলল, ও, তুই? আমি ঠিক খেয়াল করিনি...ভেবেছিলাম...! চুপ করে গেল। যা বোঝার নন্দিতা তক্ষুণি বুঝতে পেরেছে। অন্যমনস্ক হয়ে বাবা ওর হাতকে মায়ের হাত বলে ভুল করেছে। বুকের তলায় মোচড় পড়ল।

প্রতাপ বোসের মুখ অস্বাভাবিক লাল এখন। গম্ভীরভাবে বলল, রাত হচ্ছে, বাড়ি যা।

—আমি আমার বাড়িতেই আছি। মাকে জানিয়ে দিচ্ছি এখন কিছুদিন এখানেই থাকব।

—আঃ, কেন কথা বাড়াচ্ছিস? বলছি বাড়ি যা।

বাবা এই মেজাজে কখনো ওর সঙ্গে কথা বলে না। মুখ ছেড়ে সমস্ত বুক পর্যন্ত এখন অস্বাভাবিক রকমের লাল। কপালে নাকে, ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম, কী একটা চাপা যন্ত্রণায় রগের শিরাগুলো পর্যন্ত ফুলে ফুলে উঠেছে। ছুটে গিয়ে নন্দিতা ছোটমেসোকে ফোন করল। সে ডাক্তার, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। এবার নিরুপায় হয়ে মাকেই ফোন করল। ফোন ধরল হারানকাকা। মুহূর্তের জন্য নন্দিতার মাথায় রক্ত উঠল, কিন্তু তার পরেই ভাবল, বিপদের সময় তাকে পেয়ে বরং ভালোই হয়েছে।

হারানকাকা সব শুনে ওকে কোনোরকম চিন্তা না করে বাবার কাছে বসে থাকতে বলে বলল, সে এক্ষুণি ডাক্তার নিয়ে আসছে।

...কুড়িটা মিনিট যে এরপর কীভাবে কেটেছে নন্দিতা জানে না। বাবার কষ্ট এতটুকু কমেনি তা মুখ দেখেই বোঝা যায়। নন্দিতা অসহায়ভাবে এক একবার তাকে জড়িয়ে ধরেছে, সব কষ্ট কমিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে যন্ত্রণা আরও বাড়ছে বুঝে আবার ছেড়ে দিচ্ছে। কুড়ি মিনিটের মাথায় হারানকাকা ডাক্তার নিয়ে এল, সঙ্গে মোহন চৌধুরী আর 'হোলি গার্ডেন'-এর আরও কয়েকটি ছেলে।

মায়ের ওখানেই সবাই ছিল নিশ্চয়। কিন্তু বাবার এতটা শরীর খারাপ জেনেও মা একবার এল না পর্যন্ত! নন্দিতা আপাতত জোর করেই ডাক্তারের দিকে মন ফেরাল।

ব্লাড প্রেসার নিয়ে আর অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে ডাক্তার বলল, এখুনি একটা ই.সি.জি. করা দরকার। বাড়িতেই করতে হবে, কোনোরকম নড়াচড়া চলবে না।

—গাড়িতে শুইয়ে এখান থেকে দশ মিনিটের রাস্তাও নিয়ে যাওয়া চলবে না?

বিষম চমকে নন্দিতা দরজার দিকে তাকিয়েছে, বুকের ব্যথা ভুলে প্রতাপ বোসও। দরজায় দাঁড়িয়ে শমিতা বোস। ঘরের আর কারও দিকে তার চোখ নেই। ডাক্তারকে প্রশ্ন করেছে, জবাবের অপেক্ষায় ডাক্তারের দিকেই চেয়ে আছে। আবারও বলল, এখানে ওঁর চিকিৎসা ঠিকমতো হবে না।

ডাক্তার একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি ওঁকে কোথায় নিয়ে যেতে চান?

—ওঁরই আর একটা বাড়িতে, এখান থেকে গাড়িতে দশ মিনিটের পথ। এবার ভেতরে এসে বলল, গাড়িতে শুইয়ে এটুকু নিয়ে যেতে পারলে সব ব্যবস্থা ওখান থেকে করা অনেক সহজ হবে।

দ্বিধা সত্ত্বেও ডাক্তার অনুমতি দিল। সে চলে যেতে গোল বাধল বাবাকে নিয়ে। কোথাও যাবে না। হারানকাকুর দিকে ফিরেও তাকাল না, মায়ের উপস্থিতিটাও নাকচ করার চেষ্টা। নন্দিতাকেই হুকুম করল, সবাইকে যার যার বাড়ি যেতে বল...দুদিন ওষুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে...এ নিয়ে কোনোরকম জোর করলেই বরং আমার শরীর আরও খারাপ হবে। পাশ ফিরে শুতে চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যথায় তাও পারছে না।

সে কথায় কোনো কান না দিয়ে পরিস্থিতি নিজের দখলে নিয়ে এল শমিতা বোস। তার নির্দেশে ইজিচেয়ারে শুইয়ে প্রতাপ বোসকে নামানো হল। তারপর ঠিক সে ভাবেই আবার চেয়ারে করে মোহনরা প্রতাপ বোসকে শমিতা বোসের বাড়িতে দোতলায় তুলল।

নন্দিতা আরো অবাক হয়ে দেখল, এটুকু সময়ের মধ্যেই মা নিজের ঘরে গিয়ে ডবল বেডের খাটটাকে দুদিকে ভাগ করেছে, একটাতে বাবার শোওয়ার ব্যবস্থা আর একটাতে তার নিজের—নন্দিতা এতটা ভাবেনি। ভেবেছিল বাবাকে একলা রাখা চলবে না বলে ওরই ঘরেই বাবার থাকার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু মা খুব সহজভাবেই বাবার সঙ্গে একই ঘরে রয়ে গেল।

নন্দিতা এরপর চেয়ে চেয়ে মোহন চৌধুরীর তৎপরতা দেখছিল। যেন ওরই বাড়িঘর। ততক্ষণে ছোটমেসো এসে গেছে। ছোটমেসো রুগীর ব্যবস্থা নিয়ে কিছু বলতে যেতেই মোহন চৌধুরী হেসে জবাব দিল, একটু সবুর করুন মেসোমশাই, এই ঘরটাকেই কেমন নার্সিং হোম বানিয়ে ফেলি দেখুন না!

ই.সি. জি. রিপোর্টে দেখা গেল খুব মাইল্ড অ্যাটাক, ডাক্তারের নির্দেশ অন্তত তিন সপ্তাহ পুরোপুরি বিশ্রামে থাকতে হবে। এসব ব্যাপারে মোহনের ব্যবস্থাপনা সত্যিই দেখার মতো। কিন্তু নন্দিতার বিরক্তি বাড়তেই থাকল। সেই হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়ার পর থেকে মোহন যেন ওকেই চেনেই না। মা আবার বেশি আহ্লাদ দেখিয়ে ওকে এ বাড়িতেই দিনকতক থেকে যেতে বলেছিল। কিন্তু শ্রীমান হাসি মুখেই সে প্রস্তাব নাকচ করেছে, বলেছে, দরকার হলে তো নিশ্চয় থাকতাম, কিন্তু এখন সেরকম প্রয়োজন নেই, কাকাবাবু তো ভালোর দিকেই যাচ্ছেন।

মায়ের সঙ্গে বাবা পারতপক্ষে কথা বলে না। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ কিংবা না। কিন্তু মায়েরও যেন এখন চামড়া মোটা, অবজ্ঞা গায়েই মাখে না। রাতে তো বটেই, সারাদিনও বই বা সেলাই-ফোঁড়াই কিছু একটা নিয়ে এ ঘরেই বসে থাকে। লেখাটেখা এখন সব বন্ধ। নন্দিতা বুঝে উঠতে পারে না কী নিয়ে এদের গণ্ডগোল। ছোট মাসিকেও অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু সেও আসল ব্যাপার জানে না।

সেদিন মিহিরের সঙ্গে নন্দিতার এসব কথাই হচ্ছিল। মিহির অনেক ভেবেও কোনো কিনারা না পেয়ে শেষে বলল, মোহনের সঙ্গে কথা বলে দেখব? ও মনে হয় কিছু জানলেও জানতে পারে।

নন্দিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল, কক্ষনো না। নিজের মেয়ে হয়ে আমি যা জানি না, তা জানবে একটা বাইরের ছেলে? অতটা ভীমরতি আমার মায়ের এখনো হয়নি।

মিহিরের মুখে এবার অন্যরকম হাসি।—মোহনের ওপর তোমার এত রাগের একটা কারণ কিন্তু ও নিজেই বের করেছে। এখন আমারও মনে হচ্ছে, সেটাই ঠিক। নয়তো একটা উপকারি মানুষের ওপর খামোখা এত রাগ কারুর থাকতে পারে?

নন্দিতা সত্যিই রেগে গেল, কী, কী বলেছে ও?

মিহিরের গোবেচারা মুখ, এই তোমাকে নিয়েই সেদিন কথা হচ্ছিল, একেবারে ছেলেমানুষ ভাবে তোমাকে।

কী কথা হচ্ছিল?

মিহির হাসি চাপার চেষ্টা করছে, একদিন দুপুরে তুমি খুব সেজেগুজে বাইরের ঘরে বসেছিলে আর কলিংবেলের আওয়াজে আমি এসেছি ভেবে দরজা খুলে দেখলে মোহন?

কথাটা কোন দিকে গড়াবে আঁচ করতে পেরে ভেতরে ভেতরে নন্দিতার রাগ বাড়ছে?—হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?

কিছুই হয়নি। মিহির হাসছে।—কী রকম অভ্যর্থনা করে দরজা খুলেছিলে সে তো তুমিই জানো। মোহন বেচারা সেটা বুঝে ফেলাতেই নাকি ওর ওপর তোমার এত রাগ।...একটু থেমে মিহির আবার বলল, রসিক আছে ছেলেটা! বলে, প্রথমে ভেবেছিল ও-ই বোধ হয় হিরো, আর তার পরেই নাকি তোমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে আসল হিরোর আগে এসে পড়ে কী অন্যায়টাই না করেছে...

রাগে সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল নন্দিতার। পুরো ব্যাপারটাই যে বর্ণে বর্ণে সত্যি। কিন্তু তা বলে এ নিয়ে মিহিরের সঙ্গে এরকম ইয়ার্কি করেছে! এবার আর শুধু হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়ানো নয়, চুলের মুঠি ধরে ওই মুখটাই মাটিতে থ্যাঁতলাতে ইচ্ছে করছে নন্দিতার। মিহিরের দিকে তাকাল। পারলে ওকেই ভস্ম করে এখন। খেপে গিয়ে বলে উঠল, তোমাদের গল্পের আর কোনো বিষয় নেই? একটা রাস্তার ছেলের সঙ্গে আমাকে নিয়ে এভাবে ছ্যাবলামি করতে লজ্জা করে না তোমার?

এবার মিহিরও চটেছে।—তোমার সেন্স অফ হিউমার এত কম জানতাম না। তাছাড়া মোহন রাস্তার ছেলে নয়। তুমি যখন তখন ওর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করো বলে ব্যাপারটা লাইট করার জন্যে আমিই তোমার কথা তুলেছিলাম। আমার এমব্যারাসমেন্ট কাটানোর জন্যেই ও এই ঠাট্টাটা করেছিল।

—ঠাট্টা! আসুক এবার, ঠাট্টা বার করছি!

সঙ্গে সঙ্গে মিহিরও তপ্ত, তুমি সবেতে এত মেজাজ দেখাও কেন? আমার সঙ্গে মোহনের যে কথাই হোক না, দ্যাট ওয়াজ স্ট্রিক্টলি বিট্যুইন আ ম্যান অ্যান্ড আ ম্যান, এ নিয়ে তুমি ওকে একটি কথাও বললে তার ফল ভাল হবে না।

রাগে নন্দিতা চেঁচিয়েই উঠল, একশোবার বলব, তুমি চোখ গরম করছ কাকে?

—তোমাকে। আগে বাড়িতে বসে ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো। লম্বা পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রাগে ক্ষোভে নন্দিতা চুপ। পুরো ব্যাপারটার জন্য মোহনকেই দায়ী করল আর মনে মনে ওর ওপর আরও খাপ্পা হয়ে উঠল।

এরপর দিনকতক নন্দিতা মিহিরের সঙ্গে নিজে থেকে কোনো রকম কথাবার্তা বলেনি। মিহির যে নিয়মিত এসে বাবার খোঁজ-খবর নেয়, মা হারানকাকু মোহন ছোট মাসি মেসো এদের সঙ্গে গল্প করে, নন্দিতা নিজের ঘরে বসে টের পায় কিন্তু ইচ্ছে করেই সামনে আসে না। মিহিরও ওকে ডাকে না, বা ফোনও করে না। এই নির্লিপ্ত আচরণে ওর প্রতি নন্দিতার আকর্ষণ আরও বাড়ছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে ক্ষতবিক্ষত করার আর নিজেও ক্ষতবিক্ষত হওয়ার একটা দুর্বার বাসনা জোর করেই চাপা দেয় আজকাল। ফলে তার বাইরের আচরণ দিনে দিনে আরও অসহিষ্ণু, আরও রুক্ষ।

অসুস্থ প্রতাপ পর্যন্ত লক্ষ্য করে সেদিন জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে, তোর মুখ চোখ এমন টান ধরা কেন? কী হয়েছে?

নন্দিতা মাথা নেড়েছে, কিছু হয়নি।

প্রতাপ বোস আবারও জিজ্ঞেস করল, মিহিরের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিসনি তো?

নন্দিতা হাসতে চেষ্টা করল একটু, তা না হয় করেইছি, তা বলে বাইরের লোকের সামনে তুমি এসব কথা বলবে?

প্রতাপ বোস অপ্রস্তুত। মোহন চৌধুরী ওঘরেই ছিল। চেয়ে চেয়ে নন্দিতাকেই দেখল খানিক, তারপর ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেল।

দুপুরে খাওয়ার পর নন্দিতা একটা বই নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুলো। এক বর্ণও পড়ছে না। থেকে থেকে মিহিরের মুখ, পুরু দুই ঠোঁট, শক্ত শক্ত আঙুল আর লোমশ বুকের এক-একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। সেদিনের রাগে গনগনে চেহারাটা মনে পড়ল। ছ ফুট লম্বা শরীরটা চাবুকের মতো টানটান হয়ে উঠেছিল, চোয়াল শক্ত হয়ে এঁটে বসেছিল, পাকা গমের মতো গায়ের রং আর ঘোর বাদামি চোখ রাগের ছটায় লালচে দেখাচ্ছিল। এত সুন্দর আর এত পুরুষালি ওকে আর কখনো দেখায়নি।..নিজের অজান্তেই নন্দিতার সারা শরীর তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল।

কতক্ষণ কেটেছে জানে না, কোন এক ষষ্ঠ চেতনার অনুভূতিতে দরজার দিকে মুখ ফেরাতেই নন্দিতার হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। মিহির খুব আস্তে করে দরজায় ছিটিকিনি তুলে দিচ্ছে। নন্দিতা চেয়ে আছে। বুকের ভেতরে এত জোরে ধক্ ধক্ করছে যে ভয়, মিহির না সেটা শুনতে পায়।

মিহির কাছে এসে শক্ত দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল।

তারপর ওর তপ্ত দুই ঠোঁটের ওপর নিজের মুখ রাখল। নন্দিতা জোর করে নিজের ঠোঁট টিপে রইল, মাথা নাড়ল।

মিহির অস্ফুটে হেসে উঠল, না?

নন্দিতা আবারও মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, না।

মিহির হাসছে।— শুয়ে শুয়ে কী ভাবছিলে? তোমার সারা গা এত গরম যে ছ্যাঁকা লাগছে।

নন্দিতা ঝাঁঝ দেখিয়ে জবাব দিল, ছ্যাঁকা লাগছে তো সরে যাও! কে তোমাকে আসতে বলেছে...

মিহির হাসছেই, আরও ঘন হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। আদরে আদরে ওকে পাগল করে তুলতে লাগল।

তারপর কতক্ষণ কেটেছে জানে না, নন্দিতার এ ক'দিনের জমাটবাঁধা সব ভার যেন গলে গলে বেরিয়ে গেল।

জামাকাপড় ঠিক করে আস্তে দরজাটা খুলে নন্দিতা আগে বেরোল। মিহিরকে বলল একটু পরে আসতে। ভয় নয়, চক্ষু-লজ্জা বলেও কথা আছে। বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে মা আর মোহন বসে। পরের জনকে দেখে ভুরুতে বিরক্তির ভাঁজ পড়ো পড়ো হয়েও পড়ল না। আসলে ভেতরটাই এখন খুশিতে ভরা। বাবার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে নন্দিতা আদুরে গলায় বলল, এবার তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো বাবা—কদিন এক সঙ্গে কাজ করি না, অফিস যাই না...

কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত যে মেয়ের টানধরা রুক্ষ চেহারা দেখেছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে তার এই পরিবর্তন দেখে প্রতাপ বোস মনে মনে অবাক কিন্তু তুখোড় বুদ্ধিমান মানুষ, যা আঁচ করেছে তা মুখে ভাঙল না। বলল, কেন অফিস যাস না? একটু-আধটু গিয়ে বসলেও তো পারিস, আমি তো এখন ভালোই আছি। নন্দিতার আহ্লাদি গলা, তুমি না থাকলে আমার অফিসে যেতে ইচ্ছে করে না, কিছু ভাল লাগে না।

হাসি চেপে প্রতাপ বোস এবার আসল প্রশ্নটা করল, হ্যাঁ রে, মিহির আসেনি?

ও কিছু জবাব দেবার আগেই ওদিক থেকে মোহন ফট করে বলে বসল, অনেকক্ষণ এসেছে। তারপর নিচু গলায় আলতো করে আবারও বলল, এখন ড্রইং রুমে বসে আছে।

নন্দিতা ঘুরে তাকাল। মোহন ড্যাবডেবে দুই চোখে ওর দিকেই চেয়ে আছে, মুখে সবজান্তা হাসি। কান-মুখ গরম হয়ে উঠেছে নন্দিতার। মিহির কখন এসেছে, এতক্ষণ কোথায় ছিল সবই জানে তাহলে! নইলে শুধু ড্রইংরুমে বসে আছে বলত, সঙ্গে 'এখন' কথাটা জুড়ত না। নন্দিতা মনে মনে চিড়বিড় করে উঠল। এক নম্বরের মিটমিটে শয়তান একটা। মিহির আবার ওর পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করে!

জ্বলন্ত দুচোখের ঝাপটা মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে তরতর করে নিচে নেমে এল। মিহিরকে মোহনের শয়তানির কথা বলার পরেও ওর মুখে হাসি দেখে নন্দিতার গা জ্বলে গেল। জিগ্যেস করল, ব্যাপারটা কী বলো তো? ও তোমাদের সক্কলকে এভাবে বশ করল কী করে?

মিহির হাসছে, বশ করার কথা নয়, আজকের এই হ্যাপি-রি-ইউনিয়নের জন্যে আমাদের দুজনেরই ওর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

নন্দিতা অবাক, তার মনে?

মিহিরের ধরা-পড়া গোছের মুখ। —দেখো, এ কদিন ধরে দুজনেই কষ্ট পাচ্ছিলাম অথচ যে যার জেদ ধরে বসেছিলাম। মাঝখান থেকে মোহন আজ যেচে ফোন করল বলেই তো বরফ গলল।

এতক্ষণের ভাল লাগার ঘোর ফিকে হয়ে আসছে। নন্দিতা ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করল, ও তোমাকে কখন ফোন করেছে? আর কী বলেছে?

—সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমার অফিসে ফোন করেছিল। তখন তুমি তোমার বাবার ঘরেই ছিলে। ও বলল, মাথা গরম একটা বাচ্চা মেয়েকে এভাবে কষ্ট দেওয়াটা কি কোনো পুরুষের কাজ? তাছাড়া এ কদিন ধরে তোমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে তোমার বাবা পর্যন্ত উতলা। আর সেটা তাঁর হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর। কী মনে পড়তে মিহির জোরেই হেসে উঠল, ছেলেটা জিনিয়াস। আরও কী বলেছে জানো? আমি যেন দুপুরে আসি। কারণ, সকাল-বিকেল তোমাদের বাড়িতে রুগী দেখতে আজকাল বড্ড ভিড় হয়।

ওর ভালো লাগার রেশটুকু নন্দিতা নষ্ট করতে চাইল না। কিন্তু ভেতরটা মোহনের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠেছে। মাকে তো সেই কবেই হাত করেছে, মিহিরকেও ভাল পটিয়েছে এখন। কিন্তু এতবড় স'হস সে সরাসরি ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলায়! কতদূর স্পর্ধা যে বলেছে, ও একটা হেডস্ট্রং ইমম্যাচিওরড মেয়ে... কিন্তু সব থেকে অসহ্য মিহিরকে দুপুরে আসার জন্য নেমন্তন্ন করাটা। মোহন চৌধুরী সত্যিই সীমা ছাড়িয়েছে এবার।

রাগে নন্দিতার ভেতরটা যত উথাল-পাথাল করতে লাগল, বাইরে তত স্থির। জোর করেই মিহিরের সামনে বসে এটা-ওটা গল্প করল, একটু আধটু খুনসুটিও করল। তারপর ক্লান্তিতে যেন আর চোখ মেলতেই পারছে না এমন ভাব করে সোফায় এলিয়ে পড়ল।

স্বভাবতই মিহির জিগ্যেস করেছে, কী হয়েছে?

নন্দিতার মুখে হাসি টানার চেষ্টা, কী আবার হবে..., দুপুরে একটু রেস্ট না পেয়ে ক্লান্ত লাগছে।

মিহিরও হাসল। উঠে কাছে এসে আলতো করে ওর কপালে চোখে গালে ঠোঁটে গোটাকতক চুমু খেয়ে বলল, তুমি তাহলে এখন রেস্ট নাও, আমি বরং তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি যাই, কাল সকালে ফোন করব।

নন্দিতা এদিক ওদিক তাকিয়ে টুক করে মিহিরের ঠোঁটে একটা চুমু দিয়ে ঘাড় নাড়ল।

মিহির ঘর থেকে বেরুনো মাত্র লাইট নিভিয়ে সোফার ওপরেই পড়ে থাকল। একলা ঘরে ভিতরের ক্রোধ দ্বিগুণ হয়ে উঠল। মায়ের আশকারার ফলেই মোহন চৌধুরী এতখানি বেড়ে উঠেছে।

আজকাল বিকেলের দিকে প্রতাপ বোসকে বারান্দায় পায়চারি করতে বলেছে ডাক্তার। আধ ঘণ্টা করে রোজই টানা বারান্দার এমাথা থেকে ও মাথা হাঁটত। সেদিন অর্ধেকটা আসার পর আর বাকি অর্ধেকটা কিছুতেই পৌঁছুতে পারল না। হঠাৎ বুকে অসহ্য ব্যথা। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, ঘামে সর্বাঙ্গ জবজবে, বুক চেপে ধরে বারান্দাতেই এলিয়ে পড়ল। নন্দিতা তখন নিজের ঘরে, মা বিকেলে গা ধোয়া সারছে, কেউ কিছু টের পায়নি। হঠাৎ কাজের লোকটার চিৎকারে নন্দিতা পড়িমরি করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। বাবাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে নিজেও বসে পড়ল। ঠিক তখনই একগাদা ফল-মূল শাক-সবজি হাতে মোহন দোতলায় উঠে এসেছে। তাদের বাগান থেকে প্রায়ই এসব নিয়ে আসে। কাজের লোকটার চিৎকারে সে-ও প্রথম হকচকিয়ে গেছে। পরক্ষণেই হাতের জিনিসগুলো মাটিতে ফেলে দৌড়ে এসে প্রথমেই প্রতাপ বোসের একটা হাত তুলে

পালস দেখল, ছুটে ঘর থেকে একটা ট্যাব্‌লেট নিয়ে এসে জিভের তলায় গুঁজে দিল, তারপর তাঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

নন্দিতাও এবার উঠে বাবার ঘরে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। আর তারপরেই যা দেখল, তাতে মাথায় রক্ত উঠল। ছোটমেসোর রেখে যাওয়া ওষুধের বাক্স থেকে মোহন ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর কী একটা ওষুধ বের করেছে, এক সেকেন্ডের দ্বিধা একটু, তারপরেই ওষুধ টেনে নিয়ে চোখের পলকে বাবার বাঁ হাতে ফুটিয়ে দিল। তারপর আবারও একটা ইঞ্জেকশন ভরতে লাগল। লোকটা কি পাগল? ডাক্তার না ডেকে অজ্ঞান হার্টের রুগীকে একটার পর একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাচ্ছে! নন্দিতা উন্মাদের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ে মোহনের হাত থেকে সিরিঞ্জটা কেড়ে নিতে গেল। অল্পের জন্য সেটা মাটিতে পড়ল না।

মোহন এই আচমকা আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়ে নিজেও প্রায় পড়তে পড়তে সামলে নিল। তারপর নন্দিতা কিছু বুঝতে পারার আগেই বিষম এক ধাক্কায় ওকে ও ধারের খাটের ওপর আছড়ে ফেলল। মাথাটা দেওয়ালে প্রচণ্ড জোরে ঠুকে যেতে সারা শরীর ঝিমঝিম করে চোখে অন্ধকার দেখল নন্দিতা। একটু সুস্থির হতে দেখে মোহনের দ্বিতীয় ইঞ্জেকশনও দেওয়া শেষ। পাশের ঘরে এবার ডাক্তারকে ফোন করতে যাচ্ছে, হাতে ফোন-নম্বর লেখা চটি বইটা। বাবা একইভাবে পড়ে আছে, মা তখনও বাথরুমে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল। অথচ নন্দিতার মনে হচ্ছে কত যুগ! মাথাটাও ঠিক মতো কাজ করছে না। কপাল টনটন করে উঠতে হাত দিয়ে দেখল খানিকটা জায়গা উঁচু হয়ে ফুলে উঠেছে। অব্যক্ত ক্রোধে নন্দিতার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল।

ফোনে কথা সেরে মোহন ঘরে ঢুকে প্রতাপ বোসের বিছানার দিকে এগোতেই নন্দিতা উন্মাদের মতো তার দিকে ছুটে এল। অসুস্থ বাবার কথা ভুলে মোহনের জামার বুকের কাছটা মুঠো করে ধরে ঝাঁকাতে লাগল।—এত বড় সাহস? গায়ে হাত তোলো তুমি? তোমাকে আমি দেখে নেব। তারপরেই অজ্ঞান বাবার দিকে চোখ পড়তে গলার স্বর নামিয়ে হিসহিস করে বলে উঠল, স্কাউন্ড্রেল কোথাকারের, বাবার যদি এতটুকু ক্ষতি হয় তোমাকে আমি পুলিশে দেব। ঝাঁকানির চোটে জামার খানিকটা নন্দিতার হাতে ছিঁড়ে এল।

মোহন একটু চুপ করে চেয়ে থেকে আস্তে করে বলল, সব থেকে আগে তোমার মাথার চিকিৎসা করানো দরকার। তারপরেই গলার ভেতর থেকে চাপা হুংকার বেরল যেন, রুগীর ঘরে ফের এরকম গোলমাল করলে তোমাকে আমি এখানে ঢুকতে দেব না। ডাক্তার এসে আগে কাকাবাবুকে দেখে যাক, তারপর যা করার কোরো। তখন হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়া ছেড়ে দরকার হলে মাটিতে নাক-খতও দেব।

শমিতা বোস ঘরে এসে হতভম্ব।—কী হয়েছে? একটু জোরেই আবারো চেঁচিয়ে উঠল, কী হয়েছে? মোহন? নানু? তোদের এই চেহারা কেন? উনি এভাবে পড়ে আছেন কেন?

মোহন ধরে তাকে চেয়ারে বসাল।—আমাদের কিচ্ছু হয়নি কাকিমা। কাকাবাবু হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়াতে আমি দুটো ইঞ্জেকশন পুশ করে দিয়েছি। আমাকে ইঞ্জেকশন দিতে দেখে নন্দিতা একটু বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। এক্ষুণি ডাক্তার আসছে, আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন তো।

মোহন যাই বলুক না কেন, শমিতা বোস এক নজরেই বুঝেছে ব্যাপার অত সহজ নয়। কিন্তু স্বামীর অসুস্থতার জন্যই আপাতত এ নিয়ে কিছু ভাবতে চাইল না। ভালোই জানে মোহন দুম করে কিছু করার ছেলে নয়। ইঞ্জেকশন দেওয়ার কথা শুনে বরং স্বস্তি বোধ করল কিছুটা। 'হোলি গার্ডেন'-এ রাতবিরেতে কারুর কিছু হলে মোহনই ইঞ্জেকশন দেয়। ডাক্তার কম্পাউন্ডার না পাওয়া গেলে আশেপাশের লোকেরাও ওকেই ডাকে। নন্দিতা না জানলেও শমিতা বোস জানে ইঞ্জেকশন দেওয়াটা ওর কাছে জলভাত ব্যাপার! এখন প্রশ্ন, ঠিক ওষুধ দিয়েছে কি না। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিশ্চিত না হলে যে কিছু করবে না সে আস্থা আছে।

হার্টের নামকরা ডাক্তার আর ই. সি. জি. মেশিন নিয়ে ছোট মেসো এল। মোহন নিপুণ তৎপরতায় যা যা দরকার হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে। কী কী ওষুধ চলছিল গড়গড় করে বলে গেল। এখন

নিজের দায়িত্বে পেথিডিন আর ডেরিফাইলিন ইঞ্জেকশন দিয়েছে তাও বলল। বড় ডাক্তার কিছু না বলে ই.সি.জি. নেওয়া শুরু করল। নন্দিতা শুধুই দেখে যাচ্ছে। ওকে কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করল না। রিপোর্টে দেখা গেল আর একটা অ্যাটাক হয়েছে। বড় ডাক্তার এতক্ষণে বলল, ইঞ্জেকশন দুটো না পড়লে ব্যাপার রীতিমতো ঘোরাল হতে পারত। এখনও কী হবে বলা যাচ্ছে না, কিন্তু চেষ্টা করার সময়টুকু তো অন্তত পাওয়া গেছে।

ছোট মেসো আর হার্ট স্পেশালিস্ট দুজনেই মোহনকে প্রশংসা করেছে, ও দুটো ওষুধ নাকি এসব ক্ষেত্রে লাইফ-সেভার। মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু নন্দিতার গালে যেন দুটো চড় পড়ল। একটু আশা ছিল ডাক্তাররা এই আনাড়ি লোকের হুটহাট ইঞ্জেকশন দেওয়া পছন্দ করবে না। কিন্তু তার বদলে কিনা এই! বাবা যে প্রাণে বেঁচেছে এতে নন্দিতার থেকে বেশি খুশি আর কে? তবু এর জন্য মোহনের ওপর বিতৃষ্ণা তো কমলই না, উলটে মনে মনে বলল, মোহন চৌধুরীর ভাগ্য ভাল যে ইঞ্জেকশনের ফলে বাবার খারাপ কিছু হয়নি। এতটুকু এদিক-ওদিক হলে ওর শেষ দেখে নিতাম।

আপাতত কোনোরকম নাড়াচড়া না করে বাড়িতেই চিকিৎসার বিশাল আয়োজন শুরু হল। সব রকম নির্দেশ দিয়ে বড় ডাক্তার চলে যেতে মোহন বেরিয়ে ওষুধ আর অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে এল। নিপুণ হাতে প্রতাপ বোসের নাকে নল লাগিয়ে দিল। ছোট মেসো কী একটা প্রশংসার কথা বলতে গিয়ে ওর কাছে প্রায় ধমকই খেল, এখন এসব কথা রাখুন তো, আমাদের ওখানে ছোটবেলা থেকেই এগুলো হাতে-কলমে শিখতে হয়। হারানকাকুর দৌলতে 'হোলি-গার্ডেন'-এর একটা বাচ্চা ছেলেও এসব জানে, এতে বাহাদুরির কিছু নেই। তারপর খুব আলগা করে বলল, তবে শেষ পর্যন্ত যে আমায় জেলে যেতে হল না, এটাই বাঁচোয়া।

শেষের এই কথাটা ঘরের আর কেউ না বুঝলেও যে বোঝার সে ঠিকই বুঝেছে। জ্বলন্ত দুচোখের ঝাপটায় ওই মুখ বেশ ভাল করে পুড়িয়ে নন্দিতা দাঁড়াল। তারপর একটা একটা করে কেটে কেটে বলল, বাবার কিছু হলে শুধু জেল নয়, ফাঁসির দড়ি পর্যন্ত তোমাকে টেনে নিয়ে যেতাম।...নিজের কপালের ফোলা জায়গাটাতে হাত দিল। তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শমিতা বোস স্থির, ছোট মেসো অস্বস্তি বোধ করছে, একমাত্র মোহন চৌধুরীই নির্বিকার। প্রতাপ বোসের নাকে অক্সিজেন ঠিকমতো যাচ্ছে কি না পরীক্ষা করল, প্রেসক্রিপশন অনুসারে সকাল-দুপুর-রাতের ওষুধ আলাদা করে গুছিয়ে রাখল, তারপর শমিতা বোসকে বলল, এখন কদিন এখানেই থাকব, আপনি একলা সব দিক সামলাতে পারবেন না। ছোট মেসোর দিকে তাকাল, আমি না ফেরা পর্যন্ত আপনি থাকুন। হারানকাকুকে খবরটা দিয়ে দু-একটা জামকাপড় নিয়েই আমি চলে আসছি।

এরপর নন্দিতা চেয়ে চেয়ে দেখেছে শুধু মোহন চৌধুরীই নয়, 'হোলি-গার্ডেন'-এর প্রায় বড় ছেলে কটাই পালা করে এ বাড়িতে থেকে বাবার সেবা করেছে। ওকে বা মাকে একটা দিনও রাত জাগাতে দেয়নি।

সকলের আপ্রাণ চেষ্টায় প্রতাপ বোসের অবস্থা আস্তে আস্তে ভালোর দিকে গড়াচ্ছে, এমন সময় মোহন চৌধুরী হঠাৎ বেপাত্তা। কোথাও তার খোঁজ মিলছে না।

একদিন সকালে বাড়িতে পুলিশ দেখে নন্দিতা হাঁ। পুলিশ অফিসার মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। খুব ভদ্রভাবেই মোহন চৌধুরী সম্পর্কে খবরা-খবর নিচ্ছিল, ও কোনোদিন রাজনীতি করেছে কিংবা বিশেষ কোনো দলের ওপর দুর্বলতা আছে কি না নন্দিতা মাকে সব প্রশ্নের একটাই জবাব দিতে শুনল, 'না'। মোহন চৌধুরীকে সে ছোটবেলা থেকে জানে। কোনোদিনই কোনোরকম রাজনীতির সঙ্গে ওর যোগাযোগ নেই। পুলিশ অফিসার এবার খুব নরম করেই জানতে চেয়েছে মোহন এখন কোথায়, কারণ এই কথাগুলো ওর নিজের মুখ থেকে শুনতে পেলেই সব থেকে ভালো হত।

মাকে আবারও ঠাণ্ডা জবাব দিতে শুনল, জানে না।

পুলিশ অফিসারের চোখ ধারাল হয়ে উঠল, —হঠাৎ করে কাউকে কিছু না জানিয়ে এভাবে উবে যাওয়াটা আপনার কাছে অদ্ভুত লাগছে না?

মা স্পষ্ট উত্তর দিল—না। ও বরাবরই ভবঘুরে গোছের। একটা ঝোলা সম্বল করে যখন-তখন পাহাড় বা সমুদ্রের ধারে কোথাও চলে যাওয়া ওর বরাবরের অভ্যেস। বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আবার ফিরে আসে। আগে চিন্তা হত, কিন্তু এখন আর এ নিয়ে ভাবি না।

—মোহন চৌধুরী শেষ কবে এখানে এসেছিল?

—এসেছিল নয়, ইদানীং ও এখানেই থাকত। দিন পনেরো হল চলে গেছে।

নন্দিতা হাঁ। মা সত্যি কথা বলছে না।

অফিসারের গলার স্বর এবার তীক্ষ্ণ, কিন্তু আমাদের খবর মোহন চৌধুরী পাঁচদিন আগেও এখানে ছিল।

নন্দিতাকে অবাক করে মা হাসল।—সেটা তাহলে ভুল খবর। আমার বাড়িতে কে কতদিন আছে সেটা আমারই সব থেকে ভালো জানার কথা। তারপর একটু থেমে নরম করেই জিজ্ঞেস করল, তাহলে পাঁচ দিন আগেই এলেন না কেন? তারপরেই সকলকে চমকে দিয়ে গলার স্বর কঠিন করে বলল, আপনি এত খবরই রাখেন যখন, আমার পেশার খবরটাও নিশ্চয় রাখেন। নিজের লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তার ওপর আমার স্বামী খুব অসুস্থ, তবু আপনাকে যথেষ্ট সময় দিয়েছি। এরপরেও যদি এই ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত করেন, তাহলে আপনাদের ডি সি প্রকাশ রায়কে জানাতে বাধ্য হব।

নন্দিতা জানে ডি সি প্রকাশ রায় মায়ের লেখার দারুণ ভক্ত। ভদ্রলোককে এ বাড়িতে কয়েকবার আসতেও দেখেছে। মা মুখে তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করলেও মনে মনে যে বিশেষ পাত্তা দিত না, নন্দিতা বুঝত।

এতক্ষণে যা হয়নি প্রকাশ রায়ের নামে সেই কাজ হল। কার সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ অফিসারের খেয়াল হল যেন। মায়ের এতটা দামী সময় নিয়েছে বলে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে উঠে দাঁড়াল। সবিনয়ে জানাল, আসলে তারা সন্দীপ সেন নামে একটা ছেলেকে খুঁজছে। ছেলেটা খুনের দাগি আসামী। বেগতিক দেখে নকশাল সেজে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মোহন চৌধুরীকে ওই ছেলের সঙ্গে কয়েকদিন দেখা গেছে। সে তো কত লোকের সঙ্গেই এমনি চেনাশোনা থাকতে পারে। অবশ্য একটা উড়ো খবর, মোহনই নাকি ছেলেটাকে লুকিয়ে রেখেছে। যাক্‌গে, সে তো কত লোকে কত কথাই বলে! কিন্তু শমিতা বোসের মতো মহিলা যখন এতবড় সার্টিফিকেট দিলেন, তখন তো সন্দেহের আর কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। তবু এ ধরনের কথা যখন উঠেছে তখন মোহন চৌধুরী ফিরলেই যেন একবার থানায় গিয়ে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার করে আসে।

মা মাথা নেড়েছে, নিশ্চয় যাবে।

সন্দীপ সেন সম্বন্ধে পুলিশ অফিসার যে ডাহা মিথ্যে কথা বলল, সেটা সবাই বুঝেছে। মোহন চৌধুরী কখনোই একটা দাগী আসামীকে শেল্টার দেবে না। নন্দিতাও সেটা খুব ভাল জানে। তবু জেদ করেই পুলিশের লোকটার কথা বিশ্বাস করতে চাইল, কিন্তু পারল না বলে নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে।

নন্দিতা লক্ষ্য করেছে, পুলিশ অফিসার যাওয়া মাত্র মায়ের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘন হয়ে এঁটে বসল। যে ক'টা ছেলে বাড়িতে আছে তাদের বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে মোহন সম্পর্কে কোনো কথা বলতে নিষেধ করল, 'হোলি-গার্ডেন'-এর অন্য ছেলেদেরও জানিয়ে রাখতে বলল। পুলিশ কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সবাই যেন মোহনের হঠাৎ করে মাঝ মাঝে বাইরে চলে যাওয়ার কথাটাই শুধু বলে। যেন বলে পনেরো দিন আগেও সকলে ওকে এ বাড়িতেই দেখেছে, তারপর আর কেউ কিচ্ছু জানে না।

নন্দিতা দেখল মা ওপরে এসে ডি সি প্রকাশ রায়ের সঙ্গে টেলিফোনে হেসে হেসে কথা বলছে। ছেলেমেয়ের পড়াশোনা কী রকম হচ্ছে, মিসেসের শরীর কেমন, এইসব। শেষে মায়ের আসল কথা, তার লেটেস্ট উপন্যাসের হিরো এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। অতএব সত্যিকারের একজন বড় পুলিশ অফিসারের সাহায্য না পেলে লেখাটাতে অনেক ভুল থেকে যাবে। তাই খুব শিগগিরই এক সন্ধ্যায় প্রকাশ রায়কে কষ্ট করে এখানে আসতে হবে। অবশ্য এমনি খাটাবে না, স্কচ হুইস্কি আর সেই সঙ্গে নিজের হাতে কষা মাংস আর কাবাব রান্না করে রাখবে।

ফোনের ওধারে ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া নন্দিতা ভালই আঁচই করতে পারছে। আহাম্মক ব্যাটা, নামী লেখিকার এই চাটুকারিতায় নিশ্চয় ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।

কিন্তু মা যে এত স্মার্ট নন্দিতার জানা ছিল না। বিপদের গন্ধ পেয়ে আগে থেকেই কী চমৎকার টোপ ফেলে রাখল। মোহন চৌধুরী ভালই গন্ডগোল পাকিয়েছে তাহলে। নন্দিতার ইচ্ছে হল তক্ষুণি পুলিশকে ফোন করে সব বলে দেয়। দেওয়ালে কপাল ঠোকার ব্যথাটা তাহলে জুড়োয় একটু। এতবড় শয়তান যে মাকে সুদ্ধু জড়িয়েছে। মা নিশ্চয় জানে ও কোথায় আছে। যে মা ছোটবেলায় একদিন একটা মিথ্যে কথা বলার জন্য নন্দিতাকে দু-ঘণ্টা বাথরুমে বন্ধ করে রেখেছিল, সেই মা-ই আজ ওই মোহনের জন্য কেমন অবলীলায় এতগুলো মিথ্যে বলে গেল!

এর তিনদিন পরে প্রকাশ রায় মাকে ফোনে জানাল, অসুবিধে না হলে সেই সন্ধেয় সে আসতে পারে। মা যেন এই ফোনের অপেক্ষাতেই ছিল। নন্দিতা চেয়ে চেয়ে দেখল, মা কী যত্ন করে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছে। হারানকাকুকে খবর পাঠাল সে যেন কয়েকটা বাছাই করা ছেলে নিয়ে সন্ধের সময় অতি অবশ্য আসে। শুধু তাই নয়, নন্দিতাকে অবাক করে সেই দুপুরেই আবার মোহন চৌধুরীও হাজির। কিছুই হয়নি যেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই রুগীর ঘরে ঢুকে তার শরীরের খোঁজ-খবর নিল। ওকে নিয়েই যে বাড়িতে কদিন ধরে চাপা অশান্তি চলছে প্রতাপ বোস ঠিক আঁচ করেছে। যে মানুষ পারতে ওর সঙ্গে নিজে থেকে কথা বলে না, সেও আজ জিগ্যেস করল, এ কটা দিন ছিলে কোথায়?

—মিহিরের বাড়ি।

কানের সামনে একটা বাজ পড়লেও নন্দিতা এতটা চমকে উঠত না। নিজের অগোচরেই দু'পা এগিয়ে এলো, কোথায় ছিলে বললে?

—বললাম তো, মিহিরের বাড়ি।

প্রতাপ বোস, নন্দিতা দুজনেই হতভম্ব। শমিতা বোসই একমাত্র নির্বিকার। তার মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে প্রথম থেকেই সব জানে। প্রতাপ বোসই আবার জিগ্যেস করল, কেন, মিহিরের বাড়ি কেন?

—সে অনেক কথা কাকাবাবু। আমার এক বন্ধু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে তাকে নিরিবিলিতে রেখে চিকিৎসার জন্যে ভালো জায়গা খুঁজছিলাম। 'হোলি- গার্ডেন'-এই প্রথমে তুলেছিলাম কিন্তু সেখানে সব সময় নানা লোকের আনাগোনা। তাই সরিয়ে আনতে হল। কাকিমা হারানকাকু আর মিহিরের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে মিহিরই এই প্রোপোজাল দিল।

প্রতাপ বোসের দু-চোখ একটু ছোট হয়ে ওর মুখের ওপর বিঁধল, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে এত ফিসফিস কেন?

মোহন চৌধুরী যেন ভারি মজার কথা বলছে, আর বলেন কেন! পয়সাওলা বাড়ির ছেলে, কোথায় মন দিয়ে পড়াশুনো করবি, ভাল রেজাল্ট করে বিদেশ যাবি, টাকা কামাবি, তা না, বাবু নকশাল হয়েছেন। এমন কান্ডই করেছে পুলিশ আইডেন্টিফাই করতে পারলেই গুলি করে মারবে। কদিন আগে পালানোর সময় পড়ে গিয়ে পায়ে এমন চোট পেয়েছে যে বাছাধন আর ভালো করে হাঁটতে পারে না। কোনো রকমে 'হোলি-গার্ডেন'-এ এসে উঠেছিল, কিন্তু ওখানে রাখাও নিরাপদ নয়। শেষে মিহির এই ভার নিতে সত্যি বেঁচে গেছি।

নন্দিতার মাথার ভেতর তোলাপাড় কান্ড হচ্ছে। এ-কদিন রোজ মিহিরের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো কথা দূরে থাক, কিচ্ছু বুঝতে পর্যন্ত দেয়নি। মোহন এখন এত আপনার যে নন্দিতাকে পর্যন্ত সকলের অবিশ্বাস। মিহিরের সঙ্গে পরে এ নিয়ে বোঝাপড়া তো করবেই, কিন্তু আপাতত মোহনকে এক হাত নেওয়ার ইচ্ছে। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমি যদি এখন পুলিশকে সব জানিয়ে দিই?

মোহন হেসে উঠল, এত লেখাপড়া শিখে এই বুদ্ধি! মিহিরকেই সব থেকে বিপাকে ফেলার রাস্তাটা বাতলালে? পাঁচ পাঁচটা দিন মিহিরের বাড়িতেই ছেলেটা ছিল, আর তারপর মিহিরই নিজে ড্রাইভ করে ওকে বর্ধমানের দিকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে।

নিষ্ফল আক্রোশে নন্দিতা স্তব্ধ। সামনে যে দাঁড়িয়ে তার তো বটেই, সেই সঙ্গে ওই স্টুপিড মিহিরের মাথাটাও ধড় থেকে ছিঁড়ে আনতে ইচ্ছে করছে। কতবড় শয়তান এই মোহন চৌধুরী! চতুর্দিকে আটঘাট বেঁধে তবে কাজে নেমেছে। মাকে তো সেই কবে থেকেই বশ করেছে, এখন আবার মিহিরকেও ভাল রকম ফাঁদে ফেলেছে। আর বোকা মিহির কি না ওর কথা ভুলে বীরত্ব দেখাতে নিজেকে এভাবে জড়িয়েছে! নন্দিতাকে কি এরা পাগল করে ছাড়বে?

সন্ধেবেলা প্রকাশ রায় এল। নন্দিতা দেখল, আদর করে তাকে ড্রইং রুমে বসিয়ে মা কাগজ-কলম আনতে গেল, পয়েন্টস লিখবে। হারানকাকু আর 'হোলি-গার্ডেন'-এর কতগুলো ছেলে সেই বিকেল থেকে অন্য একটা ঘরে বসে আছে, তাদের সঙ্গে মোহন চৌধুরীও রয়েছে। মা কাগজ আনার ছুতো করে আসলে তাদের কী সব বলে এল। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে হাসি ঝুলিয়ে ড্রইং রুমে ঢুকল, পেছনে বুদ্ধু, তার হাতের ট্রে-তে ড্রিঙ্কের সরঞ্জাম আর খাবারের প্লেট পরিপাটি করে সাজানো।

নন্দিতা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখেই যাচ্ছে। মা কেবল ভাল লেখিকাই নয়, নিপুণ অভিনেত্রীও। ভদ্রলোকের সামনে চটপট সব সাজিয়ে দিল। নিজের জন্য একটা কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাস নিয়ে সে তুলে বলল, চিয়ার্স...নিন, এবার খেতে খেতে আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা যেমন মনে আসে বলে যান। আমি আমার মতো করে নোট নেব। যেখানে দরকার হবে আমিই আপনাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করব। আপনার ব্যক্তিগত এক্সপেরিয়েন্সগুলো খুব ভাল করে খুঁটিয়ে বলবেন, ওগুলোই তো উপন্যাসের হাই-লাইট হবে।

ভদ্রলোক বিগলিত। এরপর সে ঝাড়া দুটি ঘণ্টা বকে গেছে আর প্যাডের ওপর শমিতা বোসের কলম চলছে। মাঝে মাঝে প্রকাশ রায়কে থামিয়ে এটা-ওটা জিগ্যেস করেছে, তারপর আবার লিখেছে। তার জীবনের রোমঞ্চকর ঘটনা শুনে শমিতা বোসের চোখে সম্ভ্রম-মাখানো বিস্ময়, সত্যি? এমনিতে আপনাকে দেখে কিচ্ছু বোঝা যায় না তো! গলার স্বরেও প্রশংসা ঝরে পড়েছে।

লোকটার জন্য নন্দিতার মায়াই হচ্ছিল।

আলোচনার পাট যখন প্রায় শেষ, ততক্ষণে ভদ্রলোকের গ্লাস তিনবার খালি হয়ে চতুর্থ রাউন্ড চলছে। এমন সময় দলবলসহ হারানকাকার প্রবেশ। এইমাত্র এল যেন। তাদের দেখে বিব্রত একটু।—ব্যস্ত নাকি? এসে বিরক্ত করলাম না তো?

নন্দিতা দেখছে মা কি নিপুণ অভিনয় করে যাচ্ছে।—আসুন আসুন, কিছু ব্যস্ত না, এইমাত্র কাজ শেষ হল।.. আলাপ করিয়ে দিই, ইনি পুলিশের একজন হর্তাকর্তা, ডি সি মিস্টার প্রকাশ রায়। আর ইনি হারান ভট্‌চায, ব্রিলিয়ান্ট স্কলার, আমাদের ফ্যামেলি ফ্রেন্ড, সারাটা জীবন শুধু পরের ছেলে মানুষ করলেন। আর এরা ওনার সেই সব ছেলে।

প্রকাশ রায় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। মা এবার হারানকাকা আর তার 'হোলি-গার্ডেন'-এর কথা কান পেতে শোনার মতো করেই বলেছে। প্রকাশ রায়ের চোখে সম্ভ্রম। হারানকাকাকে বলেছে, আপনি তো মশাই নমস্য ব্যক্তি, আপনার ওখানে একদিন যাব 'খন, আমরা পাপীতাপী মানুষ, আপনাদের দেখলেও পুণ্যি।

নন্দিতা দেখছে অভিনয়ে কেউ-ই কম যায় না। হারানকাকার বিনয়ের হাসি, না না—কী যে বলেন...

এবার একটা মজার ব্যাপার মনে পড়ল যেমন শমিতা বোসের। প্রকাশ রায়ের দিকে তাকাল।—আরে, লেখার ইন্টারেস্টে আপনাকে কথাটা বলতেই ভুলে গেছি মিস্টার রয়, সেদিন ফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলে সবে লিখতে বসেছি, এমন সময় আমার খোঁজে বাড়িতে এক পুলিশ অফিসার এসে হাজির। আমি তো হাঁ, এ কী করে টের পেলে যে আমার শিগগিরই একজন পুলিশের

লোক দরকার! শমিতা বোস হেসে উঠল। ছদ্ম-ভয় মেশানো স্বরে বলল, কিন্তু ও বাবা, পরে দেখি আমাকেই জেরা করতে এসেছেন।

প্রকাশ রায় অবাক, আপনাকে জেরা করতে পুলিশ? কেন?

—আর বলেন কেন, শমিতা বোসের হালছাড়া গলা, হারানবাবুর এই ছেলেরা সত্যি রত্ন। আজ প্রায় এক মাস ধরে পালা করে আমার অসুস্থ স্বামীর সেবা করে যাচ্ছে। বেশির ভাগ সময় ওরা এ বাড়িতেই থাকে। ওদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে গোবেচারা, সেটার খোঁজেই সেদিন পুলিশ এসেছিল। কোত্থেকে শুনেছে ও নাকি একটি অ্যান্টিসোসালকে শেলটার দিয়েছে। অথচ পনেরো দিন ধরে ছেলেটা কলকাতাতেই ছিল না, আজই ফিরেছে। আছেও আমার এখানেই। তারপর একটু থেমে অনুযোগের সুরে বলল, আপনাদের কারবার, উদোর পিন্ডি তো হামেশাই আপনারা বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন।...সেই এতটুকু বয়েস থেকে ছেলেটাকে জানি। ওর বাবা, এই হারানবাবু আর আমার স্বামী ছেলেবেলার বন্ধু। বাচ্চা বয়সে বাপ-মা খুইয়ে আমাদের কাছেই বড় হয়েছে। সাত চড়ে রা বেরোয় না যে ছেলের তার ওপরই আপনাদের নজর পড়েছে! শমিতা বোস এবার প্রকাশ রায়কেই চোখ পাকাল—আমিও শেষে ওই পুলিশ অফিসারকে আপনার নাম করেই আচ্ছা দাবড়ানি দিয়েছি, বলেছি, ফের যদি এভাবে জ্বালাতন করে তাহলে আপনাকে জানাতে বাধ্য হব। তখন সমঝেছে। আবার যাওয়ার সময় বলে গেছে ছেলেটা ফিরলেই যেন থানায় গিয়ে দেখা করে।

প্রকাশ রায় ধমকেই উঠল যেন, কোত্থাও যেতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করছি। ছেলেটি কোথায়?

—মোহন? ওপরে, আমার স্বামীর কাছে বসে আছে।

নন্দিতা শুনল, মা আবারও ডাহা মিথ্যে কথা বলল। মোহন বিকেল থেকে মোটেই বাবার কাছে ছিল না। হারানকাকু আর তার ছেলেগুলোর সঙ্গে অন্য ঘরে বসে ছিল। এদিকে মা বলেই চলেছে, অসুস্থ মানুষ তো, তাই একলা রাখতে পারি না। আর ছেলেটাও অদ্ভুত, একটানা কি সেবাটাই না করল এতদিন! তারপর দিন পনেরো আগে উনি একটু ভাল হতে কাউকে কিছু না বলে উধাও! অবশ্য কিছুদিন পরপরই এ কাণ্ড করে, পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রের ধারে কাটিয়ে আসে। আগে চিন্তা করতাম, কিন্তু এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে।...ডাকব ওকে?

—কিচ্ছু দরকার নেই। আপনার ফোনটা কোথায়?

মায়ের বিব্রত মুখ।—ফোন এ ঘরেও নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু কেন? আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হবেন না তো...

প্রকাশ রায় হুমকে উঠল, কিচ্ছু ব্যস্ত না, আমি শুধু ওদের একটু বলে দেব, আপনি ফোনটা আনান।

শমিতা বোস ইশারা করতেই একটা ছেলে ফোনটা নিয়ে এসে প্লাগ পয়েন্টে লাগিয়ে দিল। প্রকাশ রায় থানায় ফোন করে নিজের পরিচয় দিয়ে কড়া ভাষায় ও.সি.-কে ধমকাল। তারপর ফোন ছেড়ে আবার পারফেক্ট জেন্টলম্যান। বলল, আর আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না, ওই ছেলেটিকেও থানায় যেতে হবে না।

শমিতা বোসের বিড়ম্বনা-ছোঁয়া হাসি মুখ। —কেন এত ঝামেলা করতে গেলেন?...কী আর বলব আপনাকে, অনেক ধন্যবাদ।

আত্মতুষ্টিতে ভরপুর প্রকাশ রায় আরও এক পেগ শেষ করে ওঠার আয়োজন করতে নন্দিতা দরজার পাশ থেকে সরে গেল। মা আর মিহির এর মধ্যে না থাকলে এই এক ব্যাপার নিয়েই মোহনকে আচ্ছা করে শাসানো যেত। কিন্তু সবদিক থেকেই যে হাত-পা বাঁধা। তার ওপর আজকের এই নাটক! অসহ্য! ছটফট করতে করতে ওপরে উঠে এল। ভাবল, বাবার সঙ্গে গল্প করে মনটা একটু হালকা করবে! কিন্তু সেখানেও আর এক বিপত্তি।

প্রতাপ বোস মেয়ের জন্যই অপেক্ষা করছিল, গম্ভীর। নানু, কদিনের মধ্যেই আমি ওবাড়ি চলে যাব। তার আগে তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। ঠিক ঠিক উত্তর দিবি।

মনে মনে অবাক হলেও নন্দিতা হেসেই বলল, তোমার কাছে কোনোদিন বেঠিক কথা বলেছি? আমাকেও তুমি বিশ্বাস করো না?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা না। আমি জানতে চাই শেষ পর্যন্ত ঠিক কার সঙ্গে তোর বিয়েটা হবে, মিহিরের না মোহনের?

নন্দিতা হতভম্ব প্রথমে। মোহন! তার মানে? এতদিন ধরে তুমি জানো না কার সঙ্গে বিয়েটা হবে? আর এ ব্যাপারে মিহিরের সঙ্গে ওই রাস্কেলটার নাম তুমি করলে কী করে?

—মাথা ঠাণ্ডা করে শোন আগে। প্রতাপ বোস তেমনি গম্ভীর।

—সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে এখন পর্যন্ত তোর সব ব্যাপারে তোর মা-ই ডিসিশন নিয়ে এসেছে। সে যা চেয়েছে আল্টিমেটলি তা-ই হয়েছে। তুই বুঝতেও পারিসনি। মোহন ছেলেটা এমনিতে কিছু খারাপ না। ওর বাবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। বাচ্চা বয়সে বাপ-মা খুইয়েছে বলে ছেলেটার জন্যে আমারও কম মায়া ছিল না। কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম যে কারণেই হোক ছেলেটা সেরকম হয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য তার জন্য ওকে আমি এতটুকু দোষ দিই না। তাছাড়া এবারে আমার প্রাণটাই বলতে গেলে ওর হাত দিয়ে ফিরে পেয়েছি। সে কথা আলাদা, কিন্তু তোর মা ওকে যেরকম পছন্দ করে, আমার চিন্তা সেই ইনফ্লুয়েন্সে তুইও না একদিন মন পালটাস। মিহিরের সঙ্গে তোর মা ভদ্রতা করে, কিন্তু সত্যিকারের ভালবাসে ওই মোহনকে। মুখে যতই ওকে গালাগাল করিস, নিজের মন ভাল করে বুঝে দেখ ডিসিশন পাকা কি না! ...এটা আমার সব থেকে আগে জানা দরকার।

বাবার শেষ কথাটা নন্দিতা খেয়াল করল না, রাগে তখন জ্বলছে। মা! তলায় তলায় মা এই প্ল্যান করেছে! মিহিরের সঙ্গে ও কতখানি ঘনিষ্ঠ সেটা মা-র মতো বুদ্ধিমতী মহিলার না বোঝার কথা নয়। সব জেনেশুনেও এ ধরনের চিন্তা তার মাথায় এল কী করে? নিজের স্বার্থে মা এতই অন্ধ যে একমাত্র মেয়েকেও এ-ভাবে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলার কথা ভাবতে পেরেছে? স্বার্থ ছাড়া কী? হারানকাকার সঙ্গে মায়ের আসল সম্পর্কটা এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে নন্দিতা। লোক- দেখানো ঢং করে বাবাকে এখানে নিয়ে এসেছে। সমস্ত শো-অফ আসলে। সেই কবে একটা ছুতো করে বাবার কাছ থেকে সরে গেছে, সোশাল ওয়ার্কের নাম করে যখন তখন হারানকাকার ওখানে যায়, থাকে, নিজের ইচ্ছেমতো চলে। এখন বয়স হওয়াতে চিন্তা হয়েছে সবকিছু কী করে হাতের মুঠোয় রাখবে! তাই নন্দিতাকে টোপ করেছে। মোহন চৌধুরীর চেয়ে ভালো ছেলে সেই জন্যই আর চোখে পড়ে না। নন্দিতা এতদিন ভেবেছিল ওই মিটমিটে শয়তানই মাকে কবজা করেছে। এখন বুঝছে মা-কে কারুর কবজা করার আগে তাকে একবার জন্ম নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে মোহনের কিছু একটা প্যাক্ট হয়েছেই! নয়তো ওই রাস্কেল এ পর্যন্ত ওর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, আর কেউ হলে তা চিন্তা পর্যন্ত করতে সাহস পেত না।

অন্ধ রাগে চোখে ঝাপসা দেখছে নন্দিতা। চেঁচিয়ে বলে উঠল, আমার ডিসিশন শতকরা একশো ভাগ পাকা, আমি ওই মোহন চৌধুরীকে একটা স্কাউন্ড্রেল ভাবি, বুঝলে? কালই মিহিরকে ..রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিস দিতে বলছি, যতদিন না বিয়ে হয় আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে ও বাড়িতে থাকব।

প্রতাপ বোস কিছু বলার আগেই ছুটে নিজের ঘরে এসে বিছানায় আছড়ে পড়ল। ভেতরটা জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে।

কতক্ষণ কেটেছে নন্দিতা জানে না। হঠাৎ ঘরে আর কেউ আছে মনে হতে মুখ তুলে দেখে দু'হাতের মধ্যে মোহন চৌধুরী দাঁড়িয়ে, ওকেই দেখছে। শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জড়ো হল। চেঁচিয়ে উঠল, এখানে কী চাই?

—কাকাবাবুর ঘরে ওরকম চিৎকার করছিলে কেন? তোমার গলা শুনে আমি দৌড়ে এসেছি, এখন এতটুকু এক্সাইট্‌মেন্টেও ওঁর ক্ষতি হতে পারে জানো না?

নন্দিতা দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, মেয়েদের ঘরে ঢুকতে হলে যে আগে পারমিশান নিতে হয় জানো না?

—ও, এই? মোহন হেসে উঠল। তা এক একজনের বেলায় এক এক রকম নিয়ম কী করে বুঝবে

বলো? তারপর ওকে আরও রাগানোর জন্য বলল, মিহির তো যখন-তখন এ-ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

রাগে নন্দিতা এবার পুরোপুরি জ্ঞান হারাল। ঝুঁকে মেঝে থেকে জুতোটা তুলে নিয়ে মোহনের নাক মুখ বেড়িয়ে বিষম জোরে মেরে বসল। সঙ্গে হিস্টিরিয়া রুগীর মতো চিৎকার, স্কাউন্ড্রেল। বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি বেরোও বলছি, আর কখনো যেন এ বাড়িতে না দেখি।

হিলতোলা জুতোর ঘায়ে চোখের নিচটা কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। মোহন চৌধুরী তাজ্জব, নির্বাক।

নন্দিতার চিৎকার শুনে ঘরের মধ্যে শমিতা বোস আর হারান ভট্চায ছুটে এসেছে। মোহন আস্তে আস্তে ঘুরে তাদের দেখল। ঠোঁটের কোনায় ভারি অদ্ভুত রকমের একটু হাসি। জামার হাতায় রক্তাক্ত চোখের তলা মুছে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সোজা নিচে, তারপর একেবারে রাস্তায়।

নন্দিতার হাতে তখনো একপাটি জুতো। নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

শমিতা বোস এক হাতের মধ্যে এগিয়ে এল। মায়ের এই মূর্তি নন্দিতা জীবনে দেখেনি। মুখ অস্বাভাবিক লাল, দু'চোখ ধক-ধক করছে, একটা হাত তলোয়ারের ফলার মতো ওপরে উঠে গেল, তারপর ওর মুখের ওপর নেমে আসার আগেই হারানকাকা শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলল।

—ছাড়ুন, ছাড়ুন! গলার স্বরে হিসহিস আগুন। ওই ছেলেটাকে যা করেছে ওরও আজ সেই অবস্থা করে ছাড়ব—

—আঃ শমিতা! ছেলেমানুষি কোরো না, আগে ব্যাপারটা বুঝতে দাও।

শমিতা বোসের আগুন-ঝলসানো দু'চোখ নন্দিতার মুখের ওপর। ক্ষিপ্ত আক্রোশে একটি একটি করে বলল, মোহন কী করেছে? কার বাড়ি থেকে তুই কাকে তাড়ালি?

শেষের কথাটায় এবারে নন্দিতার চোখে মুখে দুর্বোধ্য বিস্ময়, হাত থেকে জুতোটা খসে পড়ল।

শমিতা বোস হারান ভট্চাযের হাত ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে এসে নন্দিতার বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আবার বলল, বল? কার বাড়ি থেকে কাকে এভাবে মেরে তাড়ালি তুই? এই ঘরদোর বাড়ি সব মোহনের, সব সব! আমরাই ওর বাড়িতে থাকি—

নন্দিতার স্থান-কাল ভুল হয়ে গেল, কী শুনছে বুঝছে না। মা তখনো রাগে কাঁপছে। হারানকাকু তাকে ধরে খাটের একপাশে বসিয়ে দিয়ে বলল, আগে একটু ঠাণ্ডা হও তো—

দুবার বড় করে দম নিয়ে শমিতা বোস আত্মস্থ গলায় বলল, আপনি ওঘরে যান। এবার সময় হয়েছে। আমি নানুর সঙ্গে কথা বলব।

রাত কত নন্দিতা জানে না। পৃথিবী আগের মতোই তার নিয়মে চলছে কি না তাও জানে না। ঘরে এখন ও একলা। মা অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে। ওর জীবনের সবকিছু ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেছে। অবিশ্বাস্য আঘাতে নন্দিতার জগৎ বড় আচমকা থেমে গেছে। বুকের ভেতর রক্ত ঝরছে। মাথায় হাতুড়ির ঘা পড়েই চলেছে। মা যা যা বলে গেল তা কি সব বিশ্বাস করবে? সব? স—ব?

মায়ের কথাগুলো সিনেমার ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকল।

প্রতাপ বোস, হারান ভট্টাচার্য আর রমেন চৌধুরী—সেই ছোট্টবেলা থেকে হরিহর-আত্মা ছিল। কলেজ ছাড়ার পর তিনজনের কর্মক্ষেত্র তিনদিকে বাঁক নিল। হারান ভট্টাচার্য ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করা সত্ত্বেও নিজের ছন্নছাড়া মতির কারণে কোন অজগাঁয়ের স্কুল-মাস্টার, রমেন চৌধুরী ছোটো থেকে ক্রমশ বড় হার্ড-অয়্যার মার্চেন্ট, আর ল'পাস করার পর বিদেশ থেকে ওই বিষয়েই হায়ার স্টাডি করে প্রতাপ বোস তার বাবার সলিসিটর ফার্মের পার্টনার। বিদেশে থাকতে প্রতাপ বোসের সঙ্গে রমেন চৌধুরীর বরাবরই চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। সেখানে থাকতে থাকতেই রমেনের বিয়ের খবর পেয়েছে,

ব্যবসার খবর জেনেছে, বছর ঘুরতে না ঘুরতে তার ছেলে হবার সুখবর এসেছে, আর তার দুবছরের মাথায় ওই শিশু রেখে ওর বউয়ের আকস্মিক মৃত্যুর খবরও পৌঁছেছে। কিন্তু রমেন চৌধুরীর কোনো চিঠিতেই হারান ভট্‌চাযের খবর নেই, সে নিপাত্তা।

বিয়ের মাত্র তিন বছরের মধ্যে বউ খুইয়ে রমেন চৌধুরী যে আর বিয়েই করবে না কেউ তা ভাবেনি। বিদেশ থেকে ফিরে রমেনের দুধের শিশুটার কথা ভেবেই প্রতাপ বোস তাকে আবার বিয়ে করায় পরামর্শ দিয়েছিল। রমেন চৌধুরীর ব্যবসা তখন দারুণ জমজমাট। তবু আবার সংসারি হবার কথায় আর কানই পাতল না। এদিকে বাচ্চাটার জন্য মহা দুশ্চিন্তা। ছেলেটার দেখাশোনার জন্য দু'দুটো লোক আছে, একটা আয়া আছে। পয়সায় সব পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যিকারের ভালবাসা মেলে না। বন্ধুর ছেলেটার জন্য প্রতাপ বোসের মনেও কম চিন্তা ছিল না। বাচ্চা বয়সে মা হারিয়ে ছেলেটা তখন থেকেই একটু অন্যরকম। শিশুসুলভ দৌরাত্ম্য বা হাসিখুশি একেবারেই নেই, বড় বেশি চুপচাপ।

ইতিমধ্যে শমিতার সঙ্গে প্রতাপ বোসের আলাপ ও বিয়ে। বউভাতের দিন রমেন চৌধুরীর ছেলেটাকে প্রথম দেখা থেকেই শমিতার বুকের ভেতর মোচড় পড়েছিল। ফর্সা রং, একমাথা কোঁকড়া চুল আর অদ্ভুত মায়াবি দুটো ডাগর চোখ। নামটাও মিষ্টি, মোহন। এরপর থেকে যখনই শমিতা রমেন চৌধুরীর বাড়ি যেত, ছেলেটার জন্য নানারকম খেলনাপাতি চকলেট-লজেন্স এসব আনত। কিন্তু ওইটুকু ছেলে সেসবে ভুলত না, এমন কি ফিরে তাকাতোও না। বরং শমিতার কোল ঘেঁষে চুপ করে বসে থাকতেই বেশি ভালবাসত। রমেন চৌধুরী দুশ্চিন্তা করে মাঝে মাঝেই বলত, কী যে করি ছেলেটাকে নিয়ে, ভাবছি ওকে কোনো বোর্ডিং-স্কুলেই দিয়ে দেব। আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে মিশলে যদি স্বাভাবিক হয়...

অতটুকু ছেলে ঠিক বুঝতে পারত যে ওকে সরানোর কথা হচ্ছে। প্রাণপণে শমিতাকে আঁকড়ে ধরে মাথা নাড়ত। সে কোথাও যাবে না। রমেন চৌধুরী জিগ্যেস করত, তাহলে সারাদিন কার কাছে থাকবি?

ছোট্ট মোহন আঙুল তুলে শমিতাকে দেখাত, তার কাছে থাকবে।

সাত-আট বছর বয়সে ভালোরকম অসুখে পড়ল মোহন। জ্বর আর নামেই না। পরে ধরা পড়ল টাইফয়েড। সেই দিনে টাইফয়েড খুব সহজ ব্যাপার নয়। টানা দু'মাস বিছানায়। প্রথম দিন কতক তো যমে-মানুষে টানাটানি। শমিতা তখন দিনের পর দিন এই বাড়িতে মোহনের মাথার কাছে বসে কাটিয়েছে। প্রতাপ বোস দুবেলা আসত। হারান ভট্‌চায ভোরবেলা চলে এসে রাত পর্যন্ত থাকত। কিন্তু যত রাতই হোক তাকে 'হোলি-গার্ডেন'-এ ফিরে যেতেই হত। তখনকার 'হোলি-গার্ডেন'-এর সঙ্গে আজকের 'হোলি গার্ডেন'-এর অনেক তফাত ছিল। ছোট ছোট কয়েকটা অনাথ শিশু এক চিলতে চালাঘরে না খেয়ে না ঘুমিয়ে জড়াজড়ি করে বসে থাকত হারান ভট্‌চায না ফেরা পর্যন্ত।

মোহন বড় বড় ডাক্তারদের চিকিৎসা এবং শমিতা আর হারান ভট্টাচার্যের অক্লান্ত সেবায় সেবারকার মতো সামলে উঠল বটে, কিন্তু একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল মনের দিক থেকে। আগে থেকেই আর পাঁচটা বাচ্চার মতন ছিল না, এবার এই অসুখ থেকে ওঠার পর পুরোপুরি নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেল। একেবারে চুপ, দিন-রাত কী ভাবে আর নিঃশব্দে দুই ঠোঁট নড়ে। নিজের মনে কথা বলে। দুশ্চিন্তায় রমেন চৌধুরীর পাগল হবার জোগাড়। প্রতাপ বোস আর শমিতাও ভেবে পায় না কিছু। হাল ধরল হারান ভট্‌চায। পুরুষ মানুষ হয়েও সে মায়ের মতো মোহনের সঙ্গে মিশতে লাগল। ওকে চান করানো, খাওয়ানো, খেলার ছলে পড়ানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া—সব নিজের হাতে তুলে নিল। মোহনের তখন দুনিয়ার সবাইকে বাদ দিয়ে কেবল এই একটিমাত্র লোকের ওপর সমস্ত টান আর বিশ্বাস।

এদিকে একের পর এক ঘা খেতে খেতে আর দুশ্চিন্তায় রমেন চৌধুরীর ভেতরে যে এতবড় ভাঙন শুরু হয়েছিল তা সে নিজেও টের পায়নি। অকেখানি গড়িয়ে যাবার পর ধরা পড়ল পেটে ক্যান্সার। অনেকদিন ধরেই পেটটা চিনচিন করত, গা গুলত, খেতে পারত না, কিন্তু কেয়ার করেনি। টুকিটাকি ওষুধ-বিষুধ খেয়ে চালিয়ে গেছে। অসুখ ধরা পড় ন একেবারে শেষ সময়ে।

রমেন চৌধুরী ঠাণ্ডা মাথার মানুষ! প্রথমেই চালু ব্যবসা মোটা দরে বেচে দিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা মজুত করেছে! তারপর হারান ভট্‌চায প্রতাপ বোস আর শমিতাকে ডেকেছে। সমস্ত বলেছে তাদের। শুনে সবাই স্তম্ভিত। রমেন চৌধুরী জানিয়েছে, নিজের জন্যে সে এতটুকু ভাবে না; তার সমস্ত চিন্তা মা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে। তার একান্ত ইচ্ছে হারান যেন মোহনের লেখাপড়ার আর তাকে মানুষ করার ভার নেয়। সে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব প্রতাপ বোস আর হারান ভট্‌চার্য দুজনের। মোহন মানুষ হলে একুশ বছর বয়সে সম্পত্তি পাবে। আর সে যদি একুশ বছরের আগেই মারা যায়, বা অপরিণত মস্তিষ্ক হয়, কিংবা মানুষ না হয়, বা কোনোরকম অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে দেখা দেয়, তাহলে প্রতাপ বোস আর হারান ভট্‌চায দুজনে মিলে যা সবথেকে ভাল বিবেচনা করবে তাই হবে। একে বাচ্চা বয়স থেকে মা হারিয়ে মোহন বরাবরই একটু অন্যরকম, তার ওপর অতবড় অসুখ থেকে ওঠার পর তো প্রায় অ্যাবনরমালই হয়ে গিয়েছিল। তাই রমেন চৌধুরীর ভাবনা, শেষ পর্যন্ত ছেলেটা আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক হবে কি না!

হারান ভট্‌চায বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে থাকতে কিছুতেই রাজি হল না। তার সাফ কথা মোহনের অন্য সব দায়দায়িত্ব তো এখনই নিয়েছে, কিন্তু বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে তাকে মাফ করতে হবে। বলেছে, কাঙালকে বিত্তের লোভ দেখাতে নেই। ও দিকটা প্রতাপ একাই দেখুক। সে নিজেও এ-সব নিয়েই আছে, ফলে এগুলো সে-ই সবথেকে ভাল বুঝবে।

শমিতা তো ব্যাপার শুনে প্রথম থেকেই চোখে আঁচল চাপা দিয়েছিল। রমেন চৌধুরীই প্রায় এক তরফা কথাবার্তা বলছিল। হারান ভট্‌চায কিছুতেই রাজি না হওয়াতে একা প্রতাপ বোসই নাবালকের অছি থাকল। সম্পত্তি বলতে এই বাড়ি, ব্যাঙ্কে নগদ লাখ দশেক টাকা আর শমিতা বোস এখন যে অস্টিন গাড়িটা ব্যবহার করে সেই গাড়ি। রমেন চৌধুরী বলেছিল, তার মৃত্যুর পরে গাড়িটা বেচে মোহনের নামে যেন টাকাটা জমা করে দেওয়া হয়। আর মোহনের খরচের জন্যে হারান যা বলবে প্রতাপ যেন মাসে মাসে তাই দেয়।

জীবন সম্পর্কে বন্ধুর এই হতাশা প্রতাপ বোস মেনে নিতে চায়নি। বলেছে, ঠিক আছে, তোর ইচ্ছে মতোই সব করব আমরা, কিন্তু তুই শেষ ধরেই নিচ্ছিস কেন? দরকার হলে চিকিৎসার জন্যে তোকে আমরা বাইরে নিয়ে যাব।

রমেন চৌধুরী হেসেছে, ছেলেটার মুখ চেয়েই শেষ চেষ্টা একটা করব, কিন্তু লাভ হবে না, দিন যে ফুরিয়েছে সে সিগনাল পেয়ে গেছি।

এর চার মাসের মধ্যে রমেন চৌধুরী চোখ বুজেছে। বিদেশের চিকিৎসা, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি, টোটকা—কোনোটাতেই কিচ্ছু ফল হয়নি। মোহনের বয়স তখন বছর বারো। নন্দিতার চার-পাঁচ হবে। ওর তাই এসব কিছুই মনে নেই।

ঘরদোর বাড়িগাড়ি সব প্রতাপ বোসের জিম্মায় রেখে হারান ভট্‌চায মোহনকে বুকে করে বরাবরের মতোই নিজের কাছে নিয়ে গেল। প্রতাপ বোস আর শমিতা মোহনকে ছাড়তে চায়নি, তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু হারান ভট্‌চায হাসিমুখেই আপত্তি জানিয়েছে, বলেছে, রমেন ওকে মানুষ করার ভার একলা আমাকে দিয়ে গেছে। আমার কাছে না থাকলে সে দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। মোহনও হারান ভট্‌চাযকে আঁকড়ে ধরেছে। সে প্রতাপ বোসের বাড়িতে থাকতে রাজি নয়, 'হোলি-গার্ডেন'-এ তার হারানকাকুর কাছে থাকবে।

রমেন চৌধুরীর মৃত্যুতে হাসি গল্প বেড়ানো—সব কিছুতেই একটা ছেদ পড়ে গেল। প্রতাপ বোস তার কাজ নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত, শমিতা লেখায় ডুব দিয়েছে। আর হারান ভট্‌চায তার 'হোলি গার্ডেন'-কে বড় করে তোলার কাজে মগ্ন। সারাদিনে এক মিনিট মোহনকে বসার অবকাশ দিত না, সব কাজে ঠেলে দিত। মাঝে মাঝেই ওখানে যেত শমিতা। মোহনকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখত। এ নিয়ে একদিন কী বলতেই হারান ভট্‌চায হেসে জবাব দিয়েছিল, ওর জন্যে যেটা সব থেকে ভাল আমি তাই করছি। এই শোক না হালকা হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম করতে দিলে ও পাগল হয়ে যাবে।

শমিতা, এখানে ছেলেরা যেভাবে কষ্ট করে বড় হয়, দেখে তোমার খারাপ লাগে জানি। কিন্তু এই কষ্টটুকু না করতে শিখলে ওদেরই সবচেয়ে ক্ষতি। মোহনের জন্য তোমরা ভেব না। বঙ্কিম চাটুজ্জে 'দেবী চৌধুরানী'তে যে খাঁটি ইস্পাতের কথা বলেছিলেন, ও অনেকটা সেইরকম।

শমিতা মোহনের ব্যাপারে তাকে আর কখনো কিচ্ছু বলেনি। ক্রমশ হারান ভট্‌চাযের আসা কমছে কিন্তু শমিতা বোসের ওখানে যাওয়া বেড়েছে। ছোট্ট নন্দিতাকে নিয়ে প্রায় ওখানে বেড়াতে যেত।

একটা বয়স্ক মানুষ আর কতগুলো ছোট ছোট ছেলের উৎসাহে চেষ্টায় যত্নে আর অক্লান্ত পরিশ্রমে 'হোলি-গার্ডেন' আস্তে আস্তে বড় হচ্ছিল। শমিতা বোসও যথাসাধ্য সাহায্য করত। এদিক ওদিক থেকে মোটা ডোনেশনের ব্যবস্থা করে দিত। লেখার মারফত তার নিজস্ব জগৎ যত বড় হয়েছে, 'হোলি-গার্ডেন'-এর পেট্রনের সংখ্যাও তত বেড়েছে। তাছাড়া হারান ভট্‌চাযের নিজস্ব উদ্যোগের তো কথাই নেই। প্রতাপ বোসের সঙ্গেই বরং তার যোগাযোগ অনেক কমে গেছে। কাজ নিয়ে, পশার নিয়ে প্রতাপ বোস নাওয়া-খাওয়ার সময় পায় না। রাতে শুতে শুতে প্রায়ই দুটো তিনটে বেজে যায়। টাকাও আসছিল স্রোতের মতো। একতলাটা অফিস করেছে। অফিস বন্ধ হওয়ার পরেও ওখানে বসেই পড়াশোনা করে। রাতের খাবারও প্রায় দিনই ওখানেই দিয়ে আসা হয়। শমিতা প্রথম প্রথম না খেয়ে বসে থাকত। পরে দেখেছে মানুষটা তাতে বিরক্ত হয়। কাজে যখন ডুবে থাকে তখন আড়াল থেকে প্রায়ই চেয়ে চেয়ে দেখত। পুরুষের এই কর্মী রূপ সত্যিই ভালো লাগার মতো। কিন্তু সেই সঙ্গে খুব সঙ্গোপনে একটু ব্যথাও শমিতার বুকের ভেতর চিনচিন করে উঠত। পাশে থেকেও লোকটা যেন কাজের নেশাতেই আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। তার নিজেরও লেখা বেড়েছে, নামডাক ছড়াচ্ছে, সময় কমছে। তবু এক একসময় বড্ড ফাঁকা লাগত।

রমেন চৌধুরী মারা যাবার পর প্রথম ক'মাস প্রতাপ বোস নিয়মিত মোহনের খবরাখবর নিত। ওর জন্য কত লাগবে জিগ্যেস করলে প্রত্যেকবারই হারান ভট্‌চাযের এক উত্তর, আলাদা করে মোহনের জন্যে কিছুই দিতে হবে না, তাহলে ওখানকার অন্য ছেলেদের সঙ্গে আপনা থেকেই ওর একটা তফাত গড়ে উঠবে। আর পাঁচটা ছেলে যেভাবে বড় হচ্ছে ও-ও ঠিক সেভাবেই বড় হোক। 'হোলি-গার্ডেন'-এর জন্যে বরং মাঝে মাঝে কিছু কিছু দিলে ভালো হয়।

রমেন চৌধুরীর গাড়ি বিক্রি নিয়ে প্রতাপ বোস আর শমিতার একদিন কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। প্রায় বছর ঘুরতে চলেছে, অথচ গাড়ি বিক্রির নাম নেই। এ নিয়ে অনুযোগ করলে প্রতাপ বোস বলত, নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, এখন ফালতু ঝামেলা নিয়ে বিরক্ত কোরো না তো—

এরপর শমিতা নিজেই গাড়িটা কেনার পার্টি জোগাড় করতে প্রতাপ বোস খেপে লাল, সব ব্যাপারে তোমার বাড়াবাড়ি। ও গাড়ি এখন বিক্রি করব না, যেমন আছে থাক।

—কিন্তু রমেনবাবু গাড়ি বিক্রি করে সে টাকা মোহনের নামে জমা করে দিতে বলেছিলেন।

প্রতাপ বোসের অসহিষ্ণু জবাব, গাড়ির মেইন্টেনেন্স-এর কথা চিন্তা করেই ও-কথা বলেছিল। সে খরচ তো আমিই চালাচ্ছি।

—এখন তাহলে গাড়িটা নিযে কী করবে?

—যেমন আছে তেমন থাক। এরকম অস্টিন এখন আর পাওয়া যায় না। ...মোহনের একুশ বছর হলে সবই তো ওর কাছে যাবে। তুমিই বরং এখন ওটা ইউজ করো, না চললে গাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

সেই থেকে রমেন চৌধুরীর এই অস্টিন শমিতা বোসের হেফাজতে। তখনো পর্যন্ত অন্যরকম কিছু মনে হয়নি। ভেবেছে বন্ধুর এত শখের গাড়ি, তাই বেচতে মন চাইছে না। কিন্তু বড় রকমের ধাক্কা খেল অনেক বছর পরে, মোহনের বয়স একুশ হওয়ার মাসকতক আগে।

একদিন শমিতা প্রতাপ বোসের টেবল পরিষ্কার করতে করতে আঁকিবুকি কাটা একটা কাগজ ফেলতে গিয়েও ফেলল না। হিসেবের এক জায়গায় মোহনের নাম দেখে আপনা থেকেই চোখ আটকে গেল। প্রতাপ বোস তার নিজস্ব যাবতীয় সম্পত্তির হিসেবের সঙ্গে মোহনেরটাও ধরেছে! তারপর বাদ দিয়েছে, তারপর আবার যোগ করেছে, তারপর আবার বাদ দিয়েছে। অনেকবার এরকম

করেছে। শেষ পর্যন্ত মোহনের সম্পত্তির অঙ্কটার চারপাশে লাল পেনসিলের একটা গোল দাগ দিয়ে রেখেছে।

সেই থেকে ভিতরে ভিতরে শমিতা বোসের একটা অদ্ভুত অস্বস্তি। লাল পেনসিলের গোল দাগটা অশুভ সঙ্কেতের মতো বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। মোহনের একুশ বছর হতে তখন আর ঠিক পনেরো দিন বাকি। ওই পনেরোটা দিন শমিতা একটা চাপা অশান্তিতে ছটফট করে কাটিয়েছে। তারপর আরও দু'তিনটে দিন। মোহন, হারান ভট্‌চায—কারুরই এ ব্যাপারে কোনো রকম হুঁশ নেই। একে একে আরো পাঁচটা দিন কাটার পর শমিতা প্রতাপ বোসকে ধরেছে, মোহনের বয়স তো একুশ হল, ওর জিনিস এবার ওকে বুঝে নিতে বলো, পরের বোঝা যত তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে নামে, ততোই ভাল।

প্রতাপ বোস গভীর মনোযোগে আইনের বই পড়ছিল।

—কী হল, আমার কথা শুনতে পেলে?

—সব শুনেছি। প্রতাপ বোস ভয়ানক গম্ভীর, এটা আমার ব্যাপার, তুমি এসবে একটু কম মাথা গলিও।

দু'চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে শমিতার। জিগ্যেস করেছে, মোহন, হারানবাবু, ওদের তুমি কবে ডাকবে?

—আমার সময় হলে। বললাম তো তুমি এ ব্যাপারে মাথা গলিও না। প্রতাপ বোসের সাফ জবাব।

শমিতা তখনকার মতো চুপ করেছে। তারপর একটা একটা করে দিন গুনে টানা দুটো মাস অপেক্ষা করেছে। কিন্তু প্রতাপ বোসের সময় হয়নি।

ভিতরে ভিতরে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে শমিতার। হারানবাবুর সঙ্গে এ ব্যাপারেই কথা বলতে 'হোলি-গার্ডেন'-এ ছুটে গেছিল। কিন্তু ওই ভদ্রলোকও আশ্চর্য রকমের চুপ। শমিতা তারপর মোহনকেই ধরেছে। মোহন প্রথমে মুখ খুলতে চায়নি। শেষে জোর করাতে বলেছে। সব শুনে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে শমিতা বোসের।

কিছুদিন আগে অর্থাৎ মোহনের একুশ হওয়ার পর হারান ভট্‌চায এ ব্যাপারে প্রতাপ বোসের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। কিন্তু প্রতাপ বোস তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, মোহন ছাড়া আর কারুর সঙ্গে এ বিষয় কথা বলতে সে নারাজ। হারান ভট্‌চায এরপর মোহনকেই পাঠাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ও বেঁকে বসেছে, বলেছে, কাকাবাবু খুব ভাল করেই জানেন আমার সব ব্যাপারে তুমি যা ঠিক করো তাই হয়, এ ব্যাপারেও তোমার সঙ্গেই ওনাকে কথা বলতে হবে। আমি শুধু সঙ্গে থাকতে পারি, তারপর যেখানে সই দরকার, করব।

হারান ভট্‌চায আবার এসে প্রতাপ বোসকে মোহনের বক্তব্য জানিয়েছে। এবার তাকেই প্রতাপ বোস জিগ্যেস করেছে, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মোহনের কী করার ইচ্ছে। হারান ভট্‌চায বলেছে, 'হোলি-গার্ডেন'কে যতটা সম্ভব বাড়ানোর ইচ্ছে। প্রতাপ বোসের গম্ভীর মুখে একটু হাসির আঁচড়, অর্থাৎ যা ভেবেছি তাই। মুখে বলেছে, রক্ত জল করা টাকা ঢেলে 'হোলি-গার্ডেন'কে বড় করার কোনো রকম বাসনা রমেনের কোনোদিনও ছিল না। তাছাড়া সে আরও বলেছিল, মোহন মানুষ হলে তবেই একুশ বছর বয়সে সব পাবে। একটু থেমে প্রতাপ বোস এবার মন্তব্য করেছে, মোহন যা করছে খুবই ভাল, কিন্তু সে অর্থে মানুষ হয়েছে কি? বি এ-টাও বোধ হয় পাস করেনি?

হারান ভট্‌চায অপমানিত বোধ করেছে। বলেছে, মোহন অনেক আগেই প্রাইভেটে বি. এ. পাস করেছে, ভাল রেজাল্টও করেছে। আর মানুষ হয়েছে কি না, বা কী রকম মানুষ হয়েছে, সে বিচারের ভার আমাদের কারুরই নয়।

প্রতাপ বোস তেতে উঠেছে, খানিকটা আমার বৈকি। অতবড় সম্পত্তি হাতে তুলে দিবার আগে আমি যাচাই করে নেব ও এগুলো সামলাতে পারবে কি না, বা সে ক্ষমতা ওর হয়েছে কি না। রমেনের এত কষ্টের বিষয় এইভাবে আমি নষ্ট হতে দেব না।

হারান ভট্চায এ কথার পর উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুকে বলেছিল, ঠিকই বলেছিস, মোহন ঠিক তোদের অর্থে মানুষ হয়নি, আর সেটা হয়নি বলেই এখন আমার গর্ব হচ্ছে। আচ্ছা চলি, আর কখনো এ নিয়ে তোকে বিরক্ত করতে আসব না।

সব শুনে শমিতা বোস স্তব্ধ। মানুষটা তো কোনো দিন অসৎ ছিল না! এই লোকই না একদিন তার গল্প লিখে প্রাইজ পাওয়া নিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিল? উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তুলেছিল? ...না, শমিতা বোসের দৃঢ় বিশ্বাস এরা যা ভাবছে তা নয়, তা হতে পারে না। নিশ্চয় এদের বুঝতে কোথাও ভুল হয়েছে।

এই ভুলটা বার করার জন্যই অধীর হয়ে শমিতা এরপর স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়ায় বসেছে। আর সেই বোঝাপড়া নিয়েই দুজনের সম্পর্কে এতবড় ফাটল।

প্রতাপ বোসের সাফ জবাব, মোহনের হাতে এখন সবকিছু তুলে দেওয়া মানেই সব জলে ফেলা। হারানের ছায়ায় ওর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু গড়ে ওঠেনি। হারান যেভাবে চাইবে, ও সেইমতো চলবে। হাতে টাকা পাওয়া মাত্র ওই 'হোলি-গার্ডেন' এ ঢালবে। বেঁচে থাকলে রমেন এটা কক্ষনো বরদাস্ত করত না, এখনও আমিও করব না। এর জন্যে যদি কোর্টকাছারি করে তো করুক। তাহলেও বোঝা যাবে ছেলেটার খানিকটা মুরোদ আছে।

এরপর শমিতা বোস একটি একটি করে বলেছে, নিজের সম্পত্তির সঙ্গে মোহনের সম্পত্তি জোড়ার খেলাটা শুরু করেছিলে কবে থেকে?... সেই হিসেবের কাগজটা আমি রেখে দিয়েছি।

প্রতাপ বোস স্ত্রীর কথা শুনে ক্ষিপ্ত। আঙুল তুলে বলেছে, বানিয়ে বানিয়ে গল্প ফেঁদে বসতো পারো, কিন্তু আমি কী জন্যে কী করি বা না করি সেটা তোমার বোঝার ক্ষমতা নেই, বুঝলে? এসব ব্যাপারে দয়া করে মাথা গলাতে এসো না।

শেষ আশাটুকুও ধূলিসাৎ। চারপাশে গোল করে লাল দাগ দেওয়া টাকার একটা অঙ্ক শমিতা বোসের চোখের সামনে রক্তের চাকার মতো বারবার ভেসে উঠেছে। প্রথম দিনই মনের তলায় অশুভ সংকেত পেয়েছিল। তখন প্রাণপণে সেটাকে নাকচ করতে চেষ্টা করেছে। প্রতাপ বোস একদিন বলেছিল, পুরুষ মানুষের কাজের নেশা আর টাকার নেশা যে কী জিনিস তা মেয়েদের বোঝা শক্ত। কিন্তু শমিতা বোস এখন খুব ভাল করেই সেটা বুঝতে পেরেছে।

অনেকদিন থেকেই মানুষটা দূরে সরে যাচ্ছিল, তা বলে এত দূরে সেটা বুঝতে পারেনি শমিতা। বুকের তলায় সব খোয়ানোর হাহাকার নিয়ে কদিন নিজের সঙ্গেই যুঝে গেছে। তারপর স্বামীকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। বলেছে, হয় এক মাসের মধ্যে মোহনকে সব বুঝিয়ে দেবে, নয়তো আমি এ বাড়ি ছাড়ব।

প্রতাপ বোস ব্যঙ্গ করে উঠেছে, যাবে কোথায়? ওই তোমাদের 'হোলি-গার্ডেন'-এ?

শমিতার ঠাণ্ডা জবাব, ঠিক তাই। কিন্তু আমি এখনো আশা রাখি তার দরকার হবে না, এক মাসের মধ্যে মোহনকে তুমি সব বুঝিয়ে দেবে।

এ কথার জবাবও দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি প্রতাপ বোস।

দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেছে। প্রত্যেকটা দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উদগ্রীব হয়ে থেকেছে শমিতা। আজ নিশ্চয়ই মোহনকে ডাকবে। তারপর দ্বিগুণ হতাশা। আবার পরের দিনের অপেক্ষা, আবারও হতাশায় ডুবে যাওয়া। একটা মাসের প্রত্যেকটা মুহূর্ত ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে দিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে শমিতা বোস। কিন্তু ফলাফল শূন্য। ব্যাপারটা প্রতাপ বোসের মাথায় আছে বলেও মনে হয়নি।

শমিতা বোস এর পরের প্রস্তুতি খুব নিঃশব্দে নিয়েছে। নন্দিতাকে হস্টেলে পাঠাবার সব ব্যবস্থা করেছে। মেয়ের গার্জেন হিসেবে বরাবরই দুজনের নাম ছিল। তাই ও ব্যাপারে কোনোরকম অসুবিধে হয়নি। নন্দিতা বোর্ডিং-এ যাওয়া পর্যন্ত ফার্নিচার সাজানোর ছুতোয় ডবলবেডের খাট পৃথক করে নিজের বিছানা আলাদা করেছে। সব ব্যবস্থা করে ওকে হস্টেলে পাঠাবার ঠিক চারদিন আগে স্বামীকে

জানিয়েছে। খেপে উঠতে গিয়েও থমকেছে প্রতাপ বোস। স্ত্রীর এই মুখ আগে কখনও দেখেনি। যা ঠিক করেছে তার যে কোনো নড়চড় হবে না তা ওই মুখেই স্পষ্ট লেখা। কিন্তু তারও জেদ কম নয়। স্ত্রী এতবড় রেষারেষিতে নামতে পেরেছে যখন তখন সেও এর শেষ দেখে ছাড়বে। অকরুণ জেদে প্রতাপ বোসও ঘর ভাঙার খেলায় মেতেছে।

নন্দিতাকে হস্টেলে রেখে এসে শমিতা বোস আর ও বাড়িতে ঢোকেনি, সোজা হোলি-গার্ডেন-এ গিয়ে উঠেছে। হারান ভট্চায আর মোহন অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু শমিতা বোসের এক কথা, সে পাশে থাকা সত্ত্বেও মানুষটা যখন এতদূর বদলাতে পেরেছে, তখন এ ব্যাপারে তার নিজের দায়ও কিছু কম নয়। শুধু লোকটাকে ফেরানোর জন্যেই তার এভাবে সব ছেড়ে বেরিয়ে আসা। হারানবাবু বা মোহন যেন অন্তত সেই চেষ্টা করার সুযোগটুকুতে বাধা না দেয়।

তারপর মোহনের কাকুতি-মিনতি আর হারান ভট্চাযের একান্ত অনুরোধে রমেন চৌধুরীর এই বাড়িতে এসে থাকা। যা নিয়ে নিজের সবচেয়ে আপনার জনের সঙ্গে চূড়ান্ত বিরোধ, সেখানেই শেষ পর্যন্ত মাথা গোঁজা। গ্লানিতে রাতের পর রাত ঘুম হত না। পরে ভেবেছে, এ এক রকম ঠিকই হয়েছে। যাতনা না থাকলে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয় না।

আজও নিঃশব্দে স্বামীর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে শমিতা বোস। প্রত্যেক দিন আশা করে চলেছে, এবার হয়তো মানুষটা তার ভুল বুঝতে পারবে, এবার হয়তো ফিরবে। কিন্তু সে আশা দুরাশাই রয়ে গেছে এ পর্যন্ত। এখন শেষ ভরসা নন্দিতা। এই জন্যই চেয়েছিল ও ল পড়ুক, দরকার হলে নিজের বাবার সঙ্গে যাতে লড়াইটুকু অন্তত করতে পারে।

...আর আজ নন্দিতা এই লড়াই করে উঠল!

ভেতরের অব্যক্ত যন্ত্রণা নন্দিতাকে একময় ঠেলে তুলল। সদ্য ভোর হয়েছে, বড় রাস্তা থেকে প্রথম ট্রাম চলার শব্দ কানে আসছে। নন্দিতা নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। একটা ট্যাক্সি ধরল।

'হোলি-গার্ডেন'-এ বরাবরই রাত থাকতে ভোর হয়। হারান ভট্চায সামনের বাগানেই ছিল। নন্দিতাকে দেখে এগিয়ে এল, মুখে হাসি, এসেছিস? আমি জানতাম তুই আসবি। তুই যে কত ভাল মা আমার, তা তুই নিজেই জানিস না।

গ্লানিতে ধিক্কারে নন্দিতার ভেতরটা ফেটে পড়তে চাইছে, কিন্তু বাইরেটা খরখরে শুকনো, দু চোখে জ্বালা। অস্ফুটে জিগ্যেস করল, মোহন কোথায়?

—ওর ঘরে, ডাকব?

—না, আমিই যাচ্ছি। তোমাদের এখানে এতে কোনো বাধা নেই তো?

—বাধা কীসের? ডানদিকের একেবারে শেষের ঘরটাই ওর, যা না।

নন্দিতা পায়ে পায়ে সেদিকে এগুলো। তারপর আধ ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। ধবধবে সাদা আসনে ও স্থির নিশ্চল শিখার মতো বসে আছে মোহন। মেরুদণ্ড টান, দু চোখ বোজা, বাঁ চোখের নিচে কালচে নীল দাগ ঘন হয়ে ফুটে উঠেছে। ধ্যানের মুদ্রায় দু হাত দুই হাঁটুর ওপর। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কি না বোঝা যায় না। ঘরে পুজোর কোনো উপকরণ নেই বা ঠাকুর-দেবতার একটা ছবিও নেই। সামনের দেওয়ালে শুধু প্লাস্টার অব প্যারিসের ওঁ লেখা। চন্দন রঙের। জানালা দিয়ে সূর্যের প্রথম আলো কপালের ওপর এসে পড়েছে। সমস্ত শরীর জুড়ে সেই আভা।

পায়ে পায়ে নন্দিতা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। কে যেন ওকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। হাঁটু মুড়ে দেয়াল-জোড়া বিশাল ওঁ-কারের সামনে বসিয়ে দিল। দুটো হাত কখন আপনা থেকেই জোড় হয়ে বুকের কাছে উঠে এল। তারপর সমস্ত শরীর পাশের ওই নিশ্চল মূর্তির পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল।...যে অবরুদ্ধ কান্না দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে কাল রাত থেকে মাথা কুটছিল, এতক্ষণে তা মুক্তির

পথ পেল। অব্যক্ত আবেগে সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল, সত্ত নিংড়ানো চোখের জলে মাটি ভিজতে লাগল।

কিছুক্ষণ, বোধহয় অনেকক্ষণ। পিঠে হাতের ছোঁয়ায় আস্তে আস্তে মুখ তুলল। মোহন ওর দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসছে। শান্ত কমনীয় মুখ। অদ্ভুত মায়াভরা চোখ। চোখের নিচে গাঢ় নীল আঘাতের দাগ সত্ত্বেও আশ্চর্য রকমের প্রসন্ন। রাগ ক্ষোভ অপমান কিছুই যেন স্পর্শ করতে পারেনি।

নন্দিতা সোজা হয়ে বসল, চোখে গালে জলের দাগ। বলল, ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম, কিন্তু দেখছি তার আর দরকার নেই, ক্ষমা পেয়ে গেছি।

মোহন তেমনি চেয়ে আছে, হাসছে।

নন্দিতা ওর চোখে চোখে তাকাতে পারছে না। মনে হচ্ছে ওই কালচে কাটা দাগটা ওরই বুকের তলায় খচখচ করে বিঁধছে। অস্ফুট স্বরে বলল, এত ক্ষমা জানো, তবু আক্কেল দাও কেন—ওখানে কিছু লাগাওনি?

লজ্জায় নন্দিতা তাকাতে পারছে না। মানুষের হাসি যে এত সুন্দর হয় তাও কি কখনো দেখেছে? মোহন ওকে নিশ্চিন্ত করার মতো করে বলল, কাকু ডেটল-তুলো দিয়ে মুছে-টুছে দিয়েছে। ওজন্যে একটুও ব্যস্ত হয়ো না, এই দাগটুকুর দৌলতে কতখানি আমি পেলাম সেটা দেখছ না?

হাসছে সেইরকমই। আবার বলল, এত সকালে এসে গেছ, মুখ দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত রাত ঘুমোওনি?

ভেতরের আবেগ আবারও কান্না হয়ে ঠেলে উঠেছে। নন্দিতা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, এখন আমি কী করব বলে দাও।

মোহন অবাক একটু, তুমি কী করবে মানে? তোমার কী করার আছে?

বাবার এই অন্যায়ের বোঝা কোথায় রাখব? এমন গ্লানির ভার এর পরেও আমি টেনে যাব? তোমরা কার ওপর এত নির্ভর করো? কার কাছ থেকে এত জোর পাও। এত বড় লজ্জা মুছে দিতে পারে এমন কেউ কি সত্যি আছে?

মোহন হাসল।—কিছু একটা শক্তি আছে, এই বিশ্বাস থেকেই যেটুকু জোর পাবার তা পাই, কিন্তু কোথায় আছে তা যদি জানতাম তাহলে আর এত যুদ্ধ করে মরছি কেন?

এটুকু বলার মধ্যেও অদ্ভুত আকুতি লক্ষ্য করল নন্দিতা।

একটু থেমে মোহন আবার বলল, যাক, তুমি মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছ, যা হওয়ার তাই হয়েছে। তাই হয়। এ জন্যে তুমি নিজেকে একটুও দায়ী কোরো না। বিশ্বাস করতে পারি তোমার ওপরেও আমার এতটুকু অভিযোগ নেই।

ঈষৎ তপ্ত স্বরে নন্দিতা বলল, কিন্তু আমি এত মহৎ হব কী করে? আজ যদি আমার অবস্থায় তুমি পড়তে, কী করতে?

এবারে মোহন একটু শব্দ করেই হেসে উঠল। বলল, সেই আমি আমি আমি—কী করে তোমাকে বোঝাব এই আমিটারই অন্য নাম অহংকার, এই অহংকার সর্বদা নিজেকে কর্তা সাজায়, কিন্তু আসলে যা হওয়ার তাই শুধু হয়।...যেমন ধরো, নিজের বাঁ চোখের নিচে কালচে ক্ষতটার ওপর আঙুল রাখল, তোমার হাত দিয়ে এই দাগটা এখানে পড়ার কথা ছিল বলেই পড়েছে, কিন্তু কেন যে পড়ার কথা তা তুমিও জানো না, আমিও জানি না। এতে আমাদের কারুরই কোনো দায় নেই।

এই প্রথম নন্দিতার ঠোঁটে একটু হাসি এসেছে, বাঃ, তাহলে তো খুনিও নিষ্পাপ, নিরপরাধ।

মুচকি হেসে মোহন জবাব দিল, এক হিসেবে তাই। কিন্তু এই গবেষণায় ঢুকলে আমার মতো তোমার মাথাটাও যাবে। আঙুল তুলে নিজের মাথা দেখাল, হারানকাকু রসদ জুগিয়ে জুগিয়ে এটির বারোটা বাজিয়েছে।

নন্দিতার হালকা লাগছে, যন্ত্রণাও কমছে। এই হারানকাকা আর মা-কে নিয়ে কত সময় কত কি-না ভেবেছে!

ওকে অবাক করে মোহন বলল, হারানকাকুকে চেষ্টা করলেও কেউ দুঃখ দিতে পারে না, কিন্তু তোমার মায়ের মনে কত কষ্ট জানো না। ...শি ইজ এ জেম অফ এ মাদার।... সব যখন বুঝেছ এবার তাঁর দিকে তাকাও, আমাদের নিয়ে তোমার কোনো ভাবনা নেই।

নন্দিতা একটু হেসেই বলল, আমি হারানকাকু আর মায়ের কথাই ভাবছিলাম। তোমাদের এখানে কি থট-রিডিংও শেখানো হয় নাকি?

মোহন হেসে জবাব দিল, না, আমাদের এখানে থট-ডেভলপিং শেখানো হয়। মাটির আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—এবার তুমি বাড়ি যাও, নয়তো হারানকাকুর কাছে যাও, আমার সকালের অনেক কাজ বাকি—

আগে কেউ এভাবে চলে যেতে বললে ধাক্কা খেত, রাগ হত, কিন্তু আজ নন্দিতা গায়ে মাখল না। বলল, বাঃ, আমার যে অনেক কিছু আলোচনার দরকার ছিল, একটু বসো না, কী এমন কাজ যে ইচ্ছে করলে একদিন না করে পারো না—?

মোহন মাথা নাড়ল, বলল, রুল ইজ রুল, ইচ্ছে করলেই কি একদিন সূর্য না উঠে পারে?

* * *

নন্দিতার জগৎ এর পরে দ্রুত বদলাতে লাগল। ফাঁক পেলেই 'হোলি-গার্ডেন'-এ যায়। হারানকাকা, মোহন, ওখানকার আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে গল্প করে। মাঝে মাঝে মিহিরকেও ধরে নিয়ে যায়। মিহির ওর এই পরিবর্তনে ঠাট্টা করে। ক্রিয়াশ্চরিত্রম...বলে সংস্কৃত শ্লোকটা আওড়াতে গিয়েও পারে না, আসলে ওটুকুর বেশি জানেই না। তখন মোহনই সেটা পুরো করে দেয়, ক্রিয়াশ্চরিত্রম্ দেবা না জানন্তি কুতঃ মনুষ্যা। অর্থাৎ মেয়েদের মনের হদিশ দেবতারাও পায় না, মানুষ তো কোন ছার!

একটা ভরপুর খুশিতে নন্দিতার দিন কাটছে। এই স্বাদ এক মাস আগে পর্যন্তও জানা ছিল না। শুধু একটাই কারণে ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণা। বাবা যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার উপশম কী করে হবে, কী করলে হবে ভেবে পায় না। সেই রাতের ঘটনার দিন তিনেকের মধ্যেই প্রতাপ বোস তার বাড়ি ফিরে গেছে। নন্দিতা খুব চেষ্টা করে সে কটা দিন তার সামনে সহজ থেকেছে। কিন্তু তুখোড় বুদ্ধিমান মানুষ, মেয়ের যে তাকে নিয়েই কিছু একটা হয়েছে, ঠিক বুঝতে পেরেছে। এরপর নন্দিতা নিয়মিত অফিসে যায়, বাবার সঙ্গে কথাবার্তাও বলে, কিন্তু আগের মতো হতে পারে না। এরজন্য নিজেরই সব থেকে কষ্ট। এখনো ও বাবাকেই সবচেয়ে ভালোবাসে। কিন্তু অতি প্রিয়জনের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত পেলে মানুষ যতটা রক্তাক্ত হয়, ততটা আর কিছুতে না। প্রতিটা মুহূর্ত নন্দিতা সেই আঘাতের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত। এ নিয়ে কারুর সঙ্গে একটি কথাও বলতে পারছে না বলে আরও কষ্ট। মায়ের সঙ্গে এতদিনের একটা ঠাণ্ডা দূরত্বের ফলে নন্দিতা তার কাছে গিয়েও বুকটা হালকা করতে পারছে না। হারানকাকুর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলার চিন্তাটাই ওর কাছে লজ্জার। আর মিহিরকে তো কিছু বলার প্রশ্নই ওঠে না। একমাত্র বলতে পারে মোহনকে। ওকে নিয়েই যখন ঘটনা, তখন ওর সঙ্গেই এ ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে, শেষ পর্যন্ত কী ফয়সালা হবে তা ঠিক করতে হবে। বাবাকে নন্দিতা এত বড় অন্যায় করে যেতে দেবে না। মোহন যতই বলুক, যা হবার তাই হয়েছে, নন্দিতা সেটা কিছুতেই মানতে পারবে না। এ কদিন ও অনেক ভেবেছে। বাবা কখনোই মানুষ খারাপ না, এত লোভীও সে হতে পারে না। হারানকাকুকেই আসলে বাবার বুঝতে ভুল হয়েছে। হারানকাকার 'হোলি-গার্ডেন' বাবার মনে কোনো দিনই ঠাঁই পায়নি এটা ঠিক। মোহনের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে বাবা শুধু হারানকাকা আর তার 'হোলি-গার্ডেন'-এর স্বার্থটাই দেখেছে। এর ওপর মায়ের অবিশ্বাস দেখেও হয়তো তার গোঁ বেড়েছে। তবে বাবা সত্যিই কিছুটা না বদলালে মা তাকে অবিশ্বাস করতে যাবে কেন? মায়ের মুখেই তো নন্দিতা শুনেছে কাজ আর টাকা, টাকা আর কাজের পাগল-করা নেশায় বাবা দিনের পর দিন ডুবে থাকত। এমনি নানারকম ভাবতে গিয়ে নন্দিতার এক সময় মাথা গরম হয়ে ওঠে। বাবাকে নিয়ে ওর যে একান্ত নিজস্ব একটা জগৎ ছিল তা চুরমার হয়ে গেছে। তবু সংকল্প, যে করে হোক, আবার সেটা গড়ে তুলবে।

কিন্তু মোহন এ নিয়ে কোনো কথাই বলতে বা শুনতে রাজি না। শুধু হাসে। কখনো বা মিহিরকে বলে, বেশ তো ছিলাম এতদিন, দিলে তো আমার পিছনে লেলিয়ে? মেয়েদের রাগঝাল বরং সয়, কিন্তু তাদের হঠাৎ অনুরাগ বড় ডেঞ্জারাস।

মিহির বলে, আমি লেলিয়ে দিলাম? ওর এই অনুরাগ দেখে আমার বুকের ধপধপানি তুমি শুনতে পাও না?

বাইরে কোনো কাজ না থাকলে মোহন সাধারণত দুপুরের দিকে নিজের ঘরেই থাকে। নন্দিতা যখন-তখন সেখানে গিয়ে হানা দেয়। মোহন একদিন হাসি মুখেই বলল, ব্যাচেলার ছেলেদের ঘরে আসতে হলে বাইরে থেকে জানান দিতে হয় জানো না?

নন্দিতার সেদিনের কথাটাই যে ওকে ফিরিয়ে দিল সেটা বুঝেই ও-ও খোঁচা দিতে ছাড়ল না। বলল, তুমি তো প্রায় মুনিঋষিদের সমগোত্রীয়, তোমাকে আমার জানান দেবার দরকার কী?

মোহন ছদ্ম-ত্রাসে আঁতকে উঠেছে, ও বাবা! মুনিঋষিদের কথা আর বোলে না। যা চিজ এক একটি!

নন্দিতা অবাক, কেন? তারা আবার কী করেছে?

কী করেনি বলো? অত বড় মুনি বিশ্বামিত্র, অপ্সরা মেনকাকে স্নান করতে দেখে তার সব জপতপ মাথায় উঠল। ... এ গল্প তুমি জানো না?

নন্দিতা মাথা নেড়েছে, জানে না। তারপর হেসে বলেছে, এ তো হল একজন। যত বড় মুনিই হোক, মানুষ তো, দেবতা তো নয়।

মোহনের সিরিয়াস মুখ, তাহলে দু একজন দেবতার কথাই বলি এবার। ওনারা তো পরের বউ ধরে টানাটানি করার জন্য ফেমাস। স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি তার নিজের ভাইয়ের বউয়ের জন্যে পাগল। ফলে যে কাণ্ড করেছিল, ইংরেজিতে তাকে তোমরা বলতে পারো স্রেফ হার্টলেস রেপ।

নন্দিতার কান-মুখ লাল হলেও ল পাস করা মেয়ের মতই ক্রটি ধরল, বলল, রেপ আবার হার্টলেস ছাড়া অন্যরকম হয় নাকি?

কি লোককে না আল্‌ঠেছে! সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে মোহন সবিনয়ে বলল, স্বীকার করছি কাম-কলা সম্পর্কে এ অধম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে এসে স্বয়ং শঙ্করাচার্য মহাপণ্ডিত মন্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতীর কাছে সাময়িক হার মেনেছিল। তারপর এক মৃত রাজার দেহে ঢুকে তার রানীর সঙ্গে বিহার করে যে জ্ঞান অর্জন করেছিল সেটা কোন ধরনের রেপ তা আলোচনা করতে রাজি আছ?

মুখ লাল করে নন্দিতা বলে উঠল, খুব হয়েছে, আর আলোচনায় কাজ নেই।

কিন্তু মোহন নির্বিকার।—কেন লজ্জা করছে? তাহলে দেবতাদের প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসা যাক। দেবগুরু বৃহস্পতির তারপর কী নাজেহাল দশা শোনো। টিট ফর ট্যাট নিশ্চয় জানো? বৃহস্পতির এরপর সেই দশা। তার অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী তারার ওপর চোখ পড়ল আমাদের চাঁদমামার, চন্দ্রের। চাঁদ তো টানতে টানতে তারাকে ধরে নিয়ে গিয়ে চুটিয়ে ফূর্তিফার্তা করল। এ নিয়ে বৃহস্পতির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তুমুল মারামারি। তারপর ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় বৃহস্পতি যখন বউ ফিরে পেল, তখন সে আবার প্রেগন্যান্ট। তারা নিজেই স্বীকার করল, বাচ্চাটা চন্দ্রের। তখন বৃহস্পতির হুকুম, তুমি একলা আসবে, কিন্তু বাচ্চা আনতে পারবে না। নিরুপায় তারা সময় হওয়ার আগেই একটা পাহাড়ের ওপর বাচ্চাটাকে জোর করে জন্ম দিয়ে সেটাকে সেখানেই ফেলে স্বামীর কাছে ফিরে এল। ওই বাচ্চাই গ্রহাধিপতি বুধ। এসব কারণেই মুনিঋষি বা দেবদেবীদের আমার সবচেয়ে বেশি ভয়।

বলার ছিরিতে নন্দিতা লজ্জা পেলেও শুনতে দারুণ মজা লেগেছে। কানে আঙুল দেবার মতো কথাও মোহন এমন অবলীলায় বলে যায় যে না হেসে পারা যায় না। ঠাকুর-দেবতা পুজো-আচ্চা বা ধর্মকর্মের ধার দিয়েও যায় না, অথচ এসব ব্যাপারের যাবতীয় তথ্য ঠোঁটের ডগায় মজুত। নন্দিতা একদিন জিগ্যেস করেছে, তোমাদের এখানে কোনো ঠাকুরদেবতার মূর্তি বা কোনো রকম পুজোটুজো দেখি না তো?

মোহন অবাক।—সে সবের সঙ্গে এখানকার কী সম্পর্ক?

—বা রে, সব আশ্রমেই তো এসব হয়!

—এটা আশ্রম তোমাকে কে বলেছে?

—তাহলে এটা কী?

—এটা 'হোলি-গার্ডেন'—পবিত্র বাগান, এখানে মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করা হয়, সেটা সব থেকে ডিফিকাল্ট এখন।

—তাহলে তুমি রোজ সকালে কার ধ্যান করো? কেন করো?

—করি স্রেফ নিজের স্বার্থে। যোগব্যায়ামে যেমন শরীর তৈরি হয়, কনসেনট্রেশনেও তেমনি মন তৈরি হয়। নিজের ভেতরটা দেখার জন্যেই ধ্যান করি। আর কার ধ্যান যে করি তা যদি জানতাম তা হলে আমারও সেই পাঁচিলের ওধারে মুখ থুবড়ে পড়া লোকগুলোর দশা হত।

শেষের কথাগুলো নন্দিতা এক বর্ণও বুঝল না।—তার মানে? কী বলছ? কাদের কথা বলছ?

মোহনের ছদ্ম-বিরক্তি, নাঃ, তুমি দেখছি কিছুই জানো না। শোনো তাহলে। কজন সিদ্ধ পুরুষ ঠিক করল ব্রহ্ম কী তা দেখবে। ব্রহ্মের আর তাদের মাঝখানে একটা বিরাট পাঁচিল ছিল। সেটা টপকাতে পারলেই ব্রহ্মের স্বরূপ দেখা যাবে। ব্রহ্ম আজ অবধি উচ্ছিষ্ট হয়নি জানো তো? কারণ কেউ তার স্বরূপ জানে না। আর তার ফলে কেউ তাকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি, অর্থাৎ বাক্ বা জিভ দিয়ে এঁটো করতে পারেনি। তাই সেই সিদ্ধপুরুষরা ঠিক করল, তারা এই পবিত্র কর্মটি করবে। একজন একজন করে পাঁচিল বেয়ে উঠতে লাগল। শেষে যেই না একজন পুরোপুরি ব্রহ্মকে দেখতে পেয়েছে, অমনি ধপ করে পাঁচিলের ওধারে সেই যে পড়ল আর উঠলই না। তার পরের জনেরও একই দশা, তার পরেরটিও। এভাবে এক এক করে সবাই মুখ থুবড়ে পড়ল। একেবারে শেষে যে ছিল, সে ব্রহ্মের পয়েন্ট এক পার্সেন্ট দেখামাত্র কে যেন তাকে পাঁচিলের এধারেই আবার ঠেলে দিল। লোকহিতের জন্যে তার পৃথিবীতে থাকার দরকার। যেটুকু দেখেছে সেটুকু জগতের কাছে পৌঁছুতে পারলেই মানুষের মোক্ষ লাভ।

নন্দিতা উদগ্রীব, আর যারা পাঁচিলের ওধারে পড়ল? তাদের কী হল?

—তারা ব্রহ্মের সঙ্গে লীন হয়ে গেল। পূর্ণব্রহ্ম দর্শন হলে আর কি দেহে থাকা যায়, না দেহ ধরে রাখা যায়?

নন্দিতা চেয়ে চেয়ে মোহনকেই দেখছে। তুমি এত সব জানলে কোত্থেকে?

কোত্থেকে আবার, বই পড়ে! হেসে বলল, আমি তো স্বীকারই করি আমি মুখ্যু, তোমাদের মতো ঝরঝর ইংরেজি বলতে পারি না, বা ক্লাসিক ছাড়া বিদেশি সাহিত্যও পড়ি না। কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার সত্যিই দুঃখ হয়, কারণ তোমরা হলে আরও মুখ্যু। নিজের ঘরে কত সম্পদ, কিন্তু নিজেরাই তার খোঁজ রাখো না। আমাদের বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-ভাগবত-হরিবংশ, এগুলো কখনো উলটে দেখেছ?

আজকাল মোহনের সব কথা শুনতেই নন্দিতার খুব ভাল লাগে। সরাসরি ওকে মুখ্যু বলাতে রাগ তো হয়ইনি বরং মনে হয়েছে ঠিকই বলেছে।

ভেতরে ভেতরে কখন একটা আমূল পরিবর্তনের পালা শুরু হয়েছে নন্দিতা নিজেই জানে না। মিহিরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেও আজকাল প্রায়ই ভুল হয়ে যায়, মোহনের সঙ্গে কথা বলার জন্য ভেতরটা উদগ্রীব হয়ে থাকে। ফাঁক পেলেই মোহনকে এদিক ওদিক ধরে নিয়ে যায়। মোহন আপত্তি করে না, কিন্তু হেসেই সতর্ক করতে চেষ্টা করে।—তোমার সঙ্গে গল্প করতে বা বেড়াতে আমার ভালোই লাগে, কিন্তু নিজের মনের দিকে তাকিয়ে ঠিকঠাক বলো তো, মিহিরের ওপর কোনোরকম অবিচার করছ না?

নন্দিতার মুখ লাল। সবেগে মাথা নেড়েছে, কক্ষনো না। হি ইজ মাই লাভ অ্যান্ড ইউ আর মাই ফ্রেন্ড।

মোহনের মুখে দুষ্টু হাসি। ও ফ্রেন্ডকে তা হলে ভালোবাসা যায় না, আর যাকে ভালোবাসা যায় সে ফ্রেন্ড হতে পারে না?

নন্দিতা হেসে ফেলেছে, উঃ! এত লজিক শিখলে কোথা থেকে? গীতা-ভাগবত পড়ে?

মোহন হেসে হেসে মাথা নাড়ল, গীতা-ভাগবতে তর্ক কোথায়? শুধু বিশ্বাস আর ভক্তি সার—

নন্দিতা ঠাট্টা করল, তা তোমার ভক্তি কার ওপর?

—তোমার ওপর, আমার ওপর, তোমার গাড়ির ড্রাইভারটার ওপর, ওই গরুটার ওপর—সব্বার ওপর। সব মিলিয়ে সক্কলকে নিয়েই না তিনি!

—এই তিনিটি আবার কে?

—এই তিনিটি যে কে সেটা জানার জন্যেই তো সিদ্ধ-পুরুষদের ওই দশা, সেই যে পাঁচিলের ওদিকে মুখ থুবড়ে পড়ল, এদিকে আর উঠলোই না।...এই তিনিটি কে তা জানতে পারলে আমিই কি আর এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করতাম? কবেই বেমালুম লোপাট হয়ে যেতাম।

বাড়িতে মায়ের সঙ্গে নন্দিতার খুব একটা কথা হয় না। শমিতা বোস কাজে ব্যস্ত। কলকাতার বাইরে এক মস্ত সাহিত্য অধিবেশনের তরফ থেকে ডাক পড়েছে। কথা-সাহিত্যের ক্রম-ধারা নিয়ে তাকে বলতে হবে। তাই পড়াশুনা নিয়েই ডুবে আছে। আলোচনা একটু আধটু শুধু হারান ভট্চাযের সঙ্গে করে। তার সাহায্য নিয়েই মূল ভাষণ লেখা শুরু করবে। এই মা-কেই নন্দিতার এখন কত ভাল লাগে। ব্যস্ততার মধ্যেও মা মাঝেমাঝে ওকে চেয়ে চেয়ে দেখে। এই দেখাটুকুর মধ্যে এখন কত যে নির্ভরতা নন্দিতা তা অনুভব করতে পারে! ওকে নিজের ব্যথার ভাগ দিতে পেরে মা যেন অনেক হালকা হতে পেরেছে। কিন্তু নন্দিতা ভেবে পায় না ও কী করবে এখন, কীভাবে ফয়সালার দিকে এগোবে। যার সাহায্য পেলে কিছু একটা ঠিক করতে পারত, সেই মোহন চৌধুরীর কাছে তার বিষয়-সম্পত্তির কথা তুলতে গেলেই দু হাত তুলে ওকে থামিয়ে দেয়। নয়তো দশ রকমের কথা শুরু করে দেয়।

শমিতা বসু যথাসময় সাহিত্য সভায় যোগ দিতে চলে গেল। তারপর দিন দশ-বারো ধরে উত্তর ভারতের কয়েকটা জায়গা দেখে ফিরবে ঠিক হয়েছে। মা চলে যেতে নন্দিতা বাড়িতে একেবারে একলা। আগে হলে মন টিকত না। মিহিরকে তলব করত, নয়তো ছোট মাসি কিংবা বাবার কাছে গিয়ে থাকত! কিন্তু এখন চুপচাপ একলা দিন কাটাতেই ভাল লাগে। ওর ভেতর-বার সবই এখন অনেক শান্ত।

বিকেলের দিকে রোজই নন্দিতার ভেতরটা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

গাড়ি নিয়ে 'হোলি-গার্ডেন'-এ চলে যায়। মোহনকে তুলে এক একদিন এক এক দিকে।

সেদিন গঙ্গার ঘাটে যেতে নৌকাওয়ালারা ওদের ছেঁকে ধরল। নন্দিতা মোহনকে জিজ্ঞেস করল, যাবে নাকি?

ওর ইচ্ছে বুঝেই মোহন বলল, যেতে পারি।

নৌকা ভাড়া করে ওরা উঠতে গেছে, এমন সময় বিপত্তি। পিছল কাদার ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে মোহন আগে উঠেছে, তার পিছন পিছন নন্দিতাও। কিন্তু গোল বাধল একটা পা নৌকোতে রেখে দ্বিতীয় পা ফেলার সময়। পাটাতনের ফাঁকের মধ্যে পা-টা ঢুকে গিয়ে নন্দিতা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মোহন তাড়াতাড়ি ওকে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু ফাঁক থেকে পা টেনে বার করাই যাচ্ছে না। যন্ত্রণায় নন্দিতার মুখ নীল, মোহনের টানাটানিতেও দাঁড়াতে পারছে না। মাঝিটাও এগিয়ে এসেছে। দুজনে মিলে কোনো রকমে টেনে পা-টা বের করল কিন্তু দাঁড় করাতে পারল না। গা গুলিয়ে বমি পেতে নন্দিতা দাঁতে দাঁতে টিপে চোখ বুজে রইল।... ওর অবস্থা বুঝেই মোহন দাঁড় করানোর চেষ্টা ছেড়ে মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে সোজা পাঁজাকোলা করে দু হাতে তুলে নিল। মাঝির সাহায্যে সাবধানে নৌকো থেকে নেমে কাদার ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে শক্ত জমিতে উঠে এল। তারপর লোকের উৎসুক চাউনির উপর দিয়ে সোজা গাড়িতে।

ব্যথায় নন্দিতা চোখে অন্ধকার দেখছে।

বাড়িতে ফিরেও মোহন ওকে পাঁজাকোলা করে নামাল। দৃশ্য দেখে কাজের লোক দুটো হকচকিয়ে দৌড়ে এল। মোহন সোজা দোতলায় ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। পা-টা এরই মধ্যে বিষম ফুলে উঠেছে। হাড় ভেঙেছে কি না মোহনের সেই চিন্তা। ছোট মেসোকে ফোন করল, কিন্তু সে বাড়ি নেই। রবিবার তাই অন্য কোনো ডাক্তারও পেল না। কাজের মেয়েটাকে চুন-হলুদ গরম করতে বলে আর ড্রাইভারকে ব্যথা কমার ট্যাবলেট আনতে দিয়ে আবার নন্দিতার কাছে এসে বসল। উতলা মুখে ওকেই জিগ্যেস করল, রোববার বলে কোনো ডাক্তার পেলাম না, তোমার মাসি-মেসোও বাড়ি নেই, কী করি বলো তো? তোমার বাবা আর মিহিরকে খবর দিই?

ব্যথা সত্ত্বেও নন্দিতা মোহনকেই চেয়ে দেখছে। অসুখ করলে বাবা-মায়ের চিন্তা দেখেছে, তা নিয়ে কখনো কিছু মনে হয়নি। কিন্তু আজ ওর জন্যে এই একজনের চিন্তার স্বাদ সমস্ত সত্তা নিয়ে অনুভব করতে লাগল। যন্ত্রণা খুব, কিন্তু ব্যথায় এত সুখ তা কি কখনো জানতো? বলল, বাবা বা মিহির এসে কী করবে, তারা কি ডাক্তার?

তাহলে আমিই বা শুধু বসে থেকে কী করব, আমি কি ডাক্তার?

নন্দিতার নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা, বসে থেকো না তাহলে।

কাজের মেয়েটা গরম চুন-হলুদের বাটি আর ড্রাইভার ওষুধ নিয়ে ঘরে ঢুকতে মোহন কী বলতে গিয়েও থেমে গেল। ওদের হাত থেকে সেগুলো নিয়ে বলল, কাছাকাছি থেকো, দরকার হলে ডাকব। ওরা চলে যেতে নন্দিতাকে আগে ওষুধটা খাওয়াল, তারপর বসে বসে ব্যথার জায়গাতে চুন-হলুদের প্রলেপ দিতে লাগল। পায়ে হাত দিতে নন্দিতা সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে হেসে বলল, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলেছেন, দেহি পদপল্লবমুদারম্ —আমি তো কোন ছার!

নন্দিতা লজ্জা পাচ্ছে, কিন্তু ভেতরটা ভরেও যাচ্ছে।

পরদিনই বাড়িতে এক্স-রে করে দেখা গেল হাড় ভাঙেনি, ভাল রকম মচকে গেছে। এরপর নন্দিতা বেশ কিছুদিন বিছানায়। বাবা, মিহির, হারানকাকু, ছোট মাসি-মেসো রোজ আসে। কিন্তু মোহন যদি একদিনও কোনো কাজে আটকা পড়ে যায়, সেদিন আর সকলের আসাটা নন্দিতার বিস্বাদ লাগে।

আর কেউ না হলেও মিহির সেটা বুঝতে পেরেছিল।

নন্দিতা মোটামুটি সেরে উঠলেও সিঁড়ি ভাঙতে গেলে পায়ে এখনও খচখচ করে লাগে। নিজে আগের মতো যখন-তখন যেতে পারে না বলে মোহনকেই গাড়ি পাঠিয়ে ধরে আনে। ওর জোর তলবে সেদিন মোহন এসে ডিভানে বসতে নন্দিতা কিছু খেয়াল না করে প্রায় ওর গা ঘেঁষে বসে কী একটা বলতে যেতেই মোহন নড়েচড়ে একটু সরে বসল।

নন্দিতা মনে মনে অপ্রস্তুত হলেও মুখে ঠাট্টা করতে ছাড়ল না।—এঃ! আর একটু হলেই জাত যেত, তোমাদের যে কামিনী কাঞ্চন বিষবৎ পরিত্যাজ্য ভুলেই গেছিলাম।

মোহন হেসে উঠল, এ আবার তোমায় কে বলল? তাছাড়া কাঞ্চন পেলে তবে তো ত্যাগের প্রশ্ন! আর কামিনীই বা এল কোত্থেকে?

আসেনি? আমি তবে কী? অবশ্য জাত তোমার চলেই গেছে...

জাত গেছে মানে?

মানে, মেয়েদের ছুঁলেই তো তোমাদের মহাপুরুষদের জাত যায়। সেদিন নৌকোর ওই অ্যাকসিডেন্টের ফলে ছোঁয়া বলে ছোঁয়া! সাধকদের কাছে একেবারে বিচ্ছিরি রকমের ছোঁয়া—

—আমি সাধক নই। তাছাড়া ওই বিপদের সময় তুমি মেয়ে কি ছেলে, আমার খেয়াল ছিল? মোহনের সাফ জবাব।

নন্দিতা তড়পে উঠল, দেখো, নিজেকে ঠকিও না, তুমি ঘেমে উঠেছিলে, চোখ বুজে থাকলেও আমি কি তখন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম।

মোহন হাসতে লাগল। বলল, চোখ খুলে থেকেও তুমি এখনো অজ্ঞান। একটা গল্প শোনো তবে।... মহামুনি ব্যাসদেবের নাম শুনেছ তো? সেই ব্যাসদেব একদিন দিব্য চোখে দেখল, তার ছেলে শুকদেব এক দিঘির পাশ ধরে যাচ্ছে, আর অপরূপ সুন্দরী সব অপ্সরা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সেখানে চান করছে।

চিরতরুণ-দিব্যকান্তি শুকদেবকে দেখে তারা লজ্জা তো পেলই না, বরং সে ভাবে থেকেই তার দিকে হাত তুলে সম্ভাষণ করল। শুকদেবও হাসি মুখে তাদের পালটা সম্ভাষণ জানিয়ে আর একদিকে চলে গেল। এদিকে ধ্যান ভেঙে ছেলের বিরহে কাতর ব্যাসদেব তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেই দিঘির ধারে যেই এসেছে, অমনি অপ্সরারা লজ্জায় এক হাত জিভ কেটে তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে নিল। ব্যাসদেব তো অবাক! হাজার হাজার বছরের অতি বৃদ্ধকে দেখে তাদের এই সংকোচ! অথচ তারই যুবক পুত্র শুকদেবের সঙ্গে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় একেবারে সহজ আচরণ করেছে। ব্যাসদেব এর কারণ জিগ্যেস না করে পারল না। জবাবে অপ্সরারা কী বলল জানো? বলল, প্রভু! আপনি বৃদ্ধ হয়েও নারী-পুরুষের ভেদাভেদ সম্পর্কে এখনো সচেতন। কিন্তু আপনার ছেলে বয়সে তরুণ হলেও তাঁর কাছে পুরুষ নারী বলে আলাদা কিছু নেই, তাঁর ভেদাভেদ জ্ঞান ঘুচে গেছে।

নন্দিতা কান পেতে শুনেছে। তারপর ঠাট্টা করেছে, তোমাকে এখন থেকে শুকদেব বলেই ডাকি তাহলে?

মোহন হাসল। তারপর বলল, আমাকে ডাকাডাকি ছেড়ে এখন মিহিরের দিকে একটু মন দাও।

নন্দিতা থতমত খেল। ঠাট্টার ছলে অনুযোগটা বুকের মধ্যে কোথাও গিয়ে বিঁধল।

নন্দিতা অস্বীকার করবে কী করে যে মিহিরের সঙ্গে একটা দূরত্ব আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে? অথচ ও নিজেও তা চায় না, মিহিরকে আগের মতোই ভালোবাসতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। এই না পারার জন্য মনে মনে কষ্ট পায়। যা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, সেটা জোর করে করতে যাওয়ার যে ধকল তা চোখেমুখে ফুটে ওঠে। বুদ্ধিমান মিহির বেশ বুঝতে পারে। কিন্তু সে সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান, ভেতরে ভেতরে ধাক্কা খেলেও মুখে কিছু বলে না। নিজের সঙ্গে একটা এসপার ওসপার করার বাসনা নিয়েই নন্দিতা সেদিন মিহিরের বাড়ি গেল। কখন ওকে পাওয়া যায় তা ভালো করেই জানে।

মিহির নিজের ঘরে ছিল। নন্দিতাকে দেখে হাসল, কী ব্যাপার? আজ যে মেঘ না চাইতে জল?

নন্দিতা ছদ্ম ঝাঁঝ দেখাতে চেষ্টা করল, কেন? আমি এখানে আসি না?

মিহির ঠোঁটে মজা পাওয়া দুষ্টু হাসি।—আগে আসতে, কিন্তু এখন বড় একটা আসো না।

—বাজে বোকো না! পা মচকালে আসব কী করে?

মিহিরের মুখে আবার দুষ্টু হাসি, তাই তো! পা মচকালে গাড়িতে অফিস যাওয়া যায়, মাঝে মাঝে 'হোলি-গার্ডেন'-এ যাওয়া যায়, কিন্তু আমার বাড়ি যে বড্ড দূর, এরোপ্লেন ছাড়া আসাই যায় না।

জবাবে নন্দিতা হেসে কী বলতে গিয়েও থমকে গেল। মিহির দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিচ্ছে।

ও এলে দরজা বন্ধ করা হতই। আর ও নিজেও সেই প্রতীক্ষায় থাকত। কিন্তু আজ নন্দিতার কেমন অস্বস্তি লাগছে। নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে উঠল। জিগ্যেস করল, মেসোমশাই কোথায়?

মিহির ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। ওর দুটো কাঁধ ধরে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। ভারি মজার কিছু শুনল যেন, জোরে হেসে উঠল, মেসোমশাই? মানে আমার বাবা? এ সময় আমাকে ছেড়ে হঠাৎ আমার বাবার চিন্তা? সে এখন কী করবে?

নন্দিতার মুখ লাল। আগে হলে ও-ও একটা পালটা রসিকতা করত। কিন্তু আজ পারল না। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই আর আগের মতো সহজ হতে পারছে না। শুকনো মুখে বলল, না এমনি...

মিহির চোখে ঠোঁটে টিপটিপ হাসি নিয়ে নন্দিতাকেই দেখে যাচ্ছিল। এবার ওকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। নন্দিতা আড়ষ্ট, দু ঠোঁট শুকনো। মিহির আরও ঘন হয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেই নন্দিতা ওকে ঠেলে সরাতে গেল, নিজের অজান্তেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, না, না!

মিহির সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। ঠোঁটে এখনো সেই হাসি। উঠে দরজা খুলে দিল। তারপর নন্দিতার পাশে এসে বসল।

নন্দিতা মিহিরের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না! শুধু নিজের কাছেই নয়, মিহিরের কাছেও ধরা পড়েই গেছে।

—আমার দিকে তাকাও, মিহিরের গলা আশ্চর্য নরম।

নন্দিতা মুখ না তুলে পারল না। মিহিরের অদ্ভুত হাসিছোঁয়া মুখ। ঘোর বাদামি দুটো চোখ ভারি জীবন্ত অথচ শান্ত। বলল, তুমি যে আজকাল ইনডিসিশনে ভুগছ, তা তুমি নিজে স্পষ্ট করে না বুঝলেও আমি টের পেয়েছিলাম। তবু পুরোপুরি যাচাই করে নেওয়ার জন্যেই আজ এরকম করেছি। যাক, এখন আমার একটাই অনুরোধ, জোর করে কিছু করতে চেষ্টা কোরো না। যা নিজের থেকে হওয়ার তা-ই হোক। এটা যদি তোমার একটা সাময়িক ব্যাপার হয়ে থাকে তো আপনিই কেটে যাবে। আর তোমার আমার সম্পর্কটাই যদি সুপার-ফিসিয়াল হয়, তাহলে দ্য সুনার ইট এন্ডস্ দ্য বেটার, আপাতত লেট আস ওয়েট অ্যান্ড সি...

ঠেলে আসা কান্না সামলাতে নন্দিতা দু-হাতে নিজের মুখ ঢাকল।

ক'দিন এরপর বাড়ি থেকেই বেরল না। অফিস গেল না, 'হোল-গার্ডেন'-এও না। মনের যন্ত্রণা নন্দিতাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কারুর সঙ্গে কথা বলে না, সারাক্ষণ শুধু চুপ করে নিজের ঘরে বসে থাকে।

শমিতা বোস কলকাতায় ফিরে মেয়ের এই চেহারা দেখে অবাক, কী হয়েছে তোর? শরীর খারাপ নাকি?

নন্দিতা হাসতে চেষ্টা করল।—পা মচকে গেছিল, এখন ভালো আছি। তুমি কেমন কাটালে?

—সে পরে শুনিস। পা মচকেছে তো মুখে চোখে এরকম কালি পড়েছে কেন? খবর সব ভালো তো?

—ব্যস্ত হয়ো না, সবাই ভালো আছে।

কিন্তু মা এতটুকু আশ্বস্ত হতে পারল না। চুপচাপ খানিক চেয়ে রইল।

দিন তিনেক পরে এক সন্ধ্যায় হারান ভট্চায সোজা ওর ঘরে এসে মাথায় হাত রাখল, নানু-মা তোর কী হয়েছে আমাকে বল তো? ছেলেমেয়ে এরকম করে থাকলে বাপমায়ের যে কত কষ্ট হয় তা আজ বুঝতে পারবি না। তোর মা মুখে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তোর জন্যে চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। কী হয়েছে আমাকে বল।

আকুল কান্নায় নন্দিতা এবার হারানকাকুর কোলে মুখ গুঁজে ভেঙে পড়ল।—কাকু, তুমি তো সবই বুঝতে পারো। আমার জগৎটাই একেবারে পালটে গেছে। আমার যে আর কোনো পথই নেই। মিহিরকেও আমি নিজের দোষে হারাতে বসেছি।

হারান ভট্চায চুপ খানিকক্ষণ। আস্তে আস্তে নন্দিতার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, এটা তুই ঠিক করিসনি নানু-মা। মোহনকে বোধহয় কোনোদিনই কেউ সেভাবে পাবে না। ও বরাবরই অন্য রকম—

মুখ তুলে নন্দিতা এবার একটু জোরেই বলে উঠল, কেন? ঘর-সংসারে থেকে বড় কাজ করা যায় না? তাছাড়া ওর বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা বলতে গেলেই একটা কিছু ছুতোয় থামিয়ে দেয়। বাবার সবকিছুই আমার, আমিই বা এমনি এমনি ওর দয়ার দান নেব কেন? তাছাড়া আমার বাবার ভুলের প্রতিকার তো আমাকেই করতে হবে। এ ব্যাপারে অন্তত তুমি ওকে আমার সঙ্গে কথা বলতে হুকুম করো।

হারান ভট্চায একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল।—বেশ, বলব, তুই যাতে ভাল থাকবি তা করতে নিশ্চয় চেষ্টা করব।

নন্দিতা উৎসাহে সোজা হয়ে উঠে বসল।—তুমি বললেই হবে। তোমার কথা মোহন কিছুতেই ফেলতে পারবে না। এর মধ্যে আমিও বাবার সঙ্গে এই নিয়ে ফয়সালা করব। বাবা যদি এমনি সব ছেড়ে দিতে রাজি না হয়, তাহলে আমি কোর্ট পর্যন্ত যাব। বাবার জন্যেই এটা আমাকে করতে হবে।

হারান ভট্চায চুপচাপ ওকে দেখল খানিক, তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল। নন্দিতার মনে হল সে

যেন নিঃশব্দে একটা ব্যথা চেপে উঠে গেল।

সেই সন্ধ্যাতেই নন্দিতা পুরনো বাড়ির দোতলায় উঠে সোজা প্রতাপ বোসের ঘরে ঢুকল।

প্রতাপ বোস একলা বসে ড্রিঙ্ক করছিল। নন্দিতাকে দেখে হাসল, আয়, কতদিন পরে এলি...

নন্দিতা বসল। হুইস্কির বোতলটা দেখিয়ে জিগ্যেস করল, তোমার না এখন এসব ছোঁয়াও বারণ?

প্রতাপ বোস হাসল।—এত বারণ মেনে কী হবে?

নন্দিতার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠল। জোর করে নিজেকে শক্ত করল। বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে বাবা...

—সে আমি জানি। মিহির বাতিল তো? .

নন্দিতা অসহিষ্ণু একটু, আমি সে ব্যাপারে কথা বলতে আসিনি, আমি জানতে এসেছি মোহনের সবকিছু তুমি ফিরিয়ে দেবে কি না?

প্রতাপ বোসের মুখ কঠিন হয়ে উঠতে লাগল, চওড়া চোয়াল এঁটে বসল।—যদি না দিই?

নন্দিতাও এই বাবারই মেয়ে। স্পষ্ট জবাব দিল, তাহলে প্রথমেই তোমার অফিস ছাড়ব। তারপর মোহনের উকিল হিসেবে উইল নিয়ে কোর্টে যাব। হেরে গেলেও বাবা-মেয়ের এই লড়াই প্রত্যেকটা কাগজে ফলাও করে ছাপবে!

প্রতাপ বোসের মুখে এবার মজা-পাওয়া হাসি।—তুই আমাকে ব্ল্যাকমেইলের ভয় দেখাচ্ছিস? দেন ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। তুই তবে কোর্টেই যা। বাবার এগেনস্টে কেস সাজিয়েই জীবনের প্রথম প্র্যাকটিস শুরু কর। উইশ ইউ এভরি সাকসেস। বড় করে গ্লাসে চুমুক দিল একটা। তারপরেই কঠিন আবার। ভারী গলায় প্রায় গর্জন করে উঠল, ইউ ফুল! আবার তোকে তোর মা যা বুঝিয়েছে তুই ঠিক তাই বুঝেছিস। আমি একটা চিট, টাকার লোভে বাপ-মা মরা ছেলেটার সবকিছু গ্রাস করেছি, না?...নেভার। হোয়াট আই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টেড ওয়াজ টু সেভ হিজ প্রপারটি ফ্রম হারান। আমি একবারও বলছি না হারান ইজ এ ব্যাডসোল, কিন্তু এই সাধু হবার নেশা ওকে খেয়েছে। থামল একটু, তারপর আবার বলল, আমি কখনোই ক্লেম করি না আমি খুব ভালো লোক বা আমার কোনো লোভ নেই, কিন্তু তোরা যদি ভেবে থাকিস টাকার নেশায় আমি মোহনকে চিট করেছি, তো জেনে রাখ মহাপুরুষ হওয়ার নেশায় হারান ওকে আরো বড় চিট্ করার জন্যে তৈরি হয়েছিল। ওই প্রপার্টি হারান তার আশ্রমে ঢালতো। মোহনের কোনোরকম পার্সোনালিটি-ই ডেভেলপ করেনি। হারানের হাতে ও একটা পুতুল মাত্র। আমি মাসে মাসে টাকা দিতে গিয়েছিলাম, হারান অ্যাক্সেপ্ট করেনি, ওর দাবি—যা দেবার তা 'হোলি-গার্ডেনে'-এর জন্যে দিতে হবে। অ্যান্ড আই রিফিউজড্ টু ডু দ্যাট। তারপর থেকে ও তোর মাকে বিষিয়েছে, আস্তে আস্তে এমন অবস্থা করে তুলেছে যে শি আল্টিমেটলি লেফ্ট মি। সেন্টিমেন্টাল ফুল্‌স সব, বাস্তবের মাটি দিয়ে তো হাঁটে না! আমি এত খারাপ যে তোকে পর্যন্ত আমার কাছ থেকে সরানোর জন্যে হস্টেলে পাঠিয়েছে।

প্রতাপ বোস সরোষে হাতের গ্লাসটা আবার মুখের কাছে এনেও নামিয়ে রেখে বলল, মোহনকে আমি আমার কাছে রেখে মানুষ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হারান দেয়নি। দেবে কেন? যে হাঁস ডিম পাড়বে তাকে কেউ ছাড়ে? হারান ভাল করে জানত মোহনের একুশ বছর বয়স হলে সবই তার ওই 'হোলি-গার্ডেন'-এই যাবে। ভালো ছেলেটাকে একেবারে অপদার্থ করে তুলেছে। একে কি মানুষ হওয়া বলে?

নন্দিতা বাধা দেবার মতো করে বলল, বাবা, তুমি মস্ত ভুল করছ। মানুষ হওয়ার আদর্শ সকলের কাছে এক নয়। আর চাঁদা তুলে বেড়ানোটা আমিও এতদিন হেট করতাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারি অনেক কিছুরই একটা আলাদা অর্থ আছে।

প্রতাপ বোসের মুখে একটু ব্যঙ্গ ঝরল, তাই নাকি? তুই বুঝে ফেলেছিস?

—হ্যাঁ ফেলেছি। মোহন ঠিক তোমার আমার লাইফ লিড করে না। তা বলে যদি মনে করো ও অমানুষ হয়েছে তাহলে বিরাট ভুল হবে। আমিও এই ভুলই করেছিলাম। আর চাঁদার ব্যাপারটা যদি ধরো, ওদের জীবনে ওটারও মস্ত ভ্যালু আছে, ওতে অহং নষ্ট হয়, ইগো যায়, আর কিছু গরিব

লোকেরও উপকার হয়। ওদের কাছে এটা সেলফ লেস এলিভেশনের একটা প্রোসেস।

—বাঃ বাঃ বাঃ! এমন জ্ঞানটা তোকে দিল কে? তোর মা, না হারান? না ওই মোহন নিজে?

নন্দিতা স্থির চোখে প্রতাপ বোসের দিকে চেয়ে বলল, বাবা, আমি যে ভুল করেছিলাম, তোমারও ঠিক সেই একই ভুল হচ্ছে। হারানকাকুকে তুমি যা ভেবেছ সে তা না। কোনো রকম বাহবা কুড়নোর নেশায় নয়, নিজের প্রাণের তাগিদেই সে এসব করে। নয়তো মোহনের বাবা যখন তাকেও একজন ট্রাস্টি করতে চেয়েছিল তখন সে রিফিউজ করেছিল কেন?

মহত্ত্ব দেখানোর জন্যে, প্রতাপ বোস তেমনি অসহিষ্ণু, তুই কেন বুঝতে পারছিস না ও খুব ভালো করেই জানতো যে মোহনকে পেলেই ওর সব পাওয়া হবে। অবশ্য আমিও প্রথমে এটা ধরতে পারিনি, বরং ওর নির্লোভ মন দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু পরে সব পরিষ্কার বুঝেছি। থামল একটু, আবারও গ্লাস তুলে বড় একটা চুমুক দিল, তারপর বলে গেল, দেখ, তোরা যতটা ভাবছিস আমি লোকটা তত খারাপ নই। মোহনকে আমি একা এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম, কিন্তু সে আসেনি। হারান ওর মাথাটা এমন ভাবে খেয়েছে যে নিজের প্রপার্টির ব্যাপারে পর্যন্ত নিজে কথা বলার মুরোদ নেই। আমি তখন সোজা বলে দিয়েছি ওরা যেন কোর্টে গিয়ে এব্যাপারে যা করার করে, আমি এক পয়সাও ছাড়ব না। বাপের রক্ত জল করা টাকা, সেটা ক্লেইম করার সাহস পর্যন্ত নেই। ও আবার মানুষ! তোর মা-ও দিনরাত এই এক ব্যাপার নিয়ে আমাকে খোঁচাতে লাগল। এক মাসের আলটিমেটাম দিল। বাট আই অ্যাম নট হারান ভট্চায, আই অ্যাম এ ম্যান। আমিও চুপ করে দেখছিলাম তোর মা কতদূর যে[illegible] পারে। অ্যান্ড শি লেফ্‌ট মি। এখন তোকে সুদ্ধু আমার বিরুদ্ধে বিষিয়েছে! স্টিল আই লাভ হার, [illegible] আই মিস হার, বাট আই ক্যান নট মুভ অ্যাকরডিং টু হার কম্যান্ড!

নন্দিতা বাবার দিকে চেয়েই আছে। পুরুষের রাগ, পুরুষের ক্ষোভ, পুরুষের আত্মাভিমানই বটে। কিন্তু সবটাই যে তারই বিরাট ভুল সেটা আর বোঝানো যাবে না, বুঝবে না। নিজে যা ধরে নিয়েছে তার বাইরে আর কিছু থাকতে পারে বলে বিশ্বাসই করবে না। এই বাপেরই মেয়ে নন্দিতাও যে এতদিন ধরে ঠিক এমনই ছিল। তবু একটা শেষ চেষ্টা করল, মোহনের সম্পত্তি তুমি তাহলে ওকে ফিরিয়ে দেবে না?

প্রতাপ বোসের লালচে দুচোখ ওর মুখের ওপর থমকাল। কেন? তুই ওকে বিয়ে করবি? ও তোকে কথা দিয়েছে? তাহলে এত কচকচির কোনো দরকার নেই। ওকে আমার কাছে নিয়ে আয়, আজ পর্যন্ত ওর যা-যা প্রাপ্য সব কড়ায়-গণ্ডায় দিয়ে দেব।

নন্দিতা মাথা নাড়াল।—না এরকম কোনো কথাই হয়নি।

প্রতাপ বোসের দুচোখ ঘোরাল হয়ে উঠল।—তাহলে? তোর মা আর হারান তোকে আমার এগেন্‌স্টে হাতিয়ার করেছে। তাদের বলে দিস, আমি একটা পাই-পয়সাও ছাড়ব না।

নন্দিতা আরও স্থির, আরও শান্ত। বলল, মা বা হারানকাকু এ ব্যাপারে আমাকে একটি কথাও বলেনি। আমি নিজেই তোমার কাছে এসেছি। মেয়ে হয়ে এত বড় ভুল আমি তোমাকে করতে দেব না। ইউ উইল হ্যাভ টু গিভ এভরিথিং ব্যাক।

মেয়ের ছেলেমানুষি জিদ দেখে প্রতাপ বোস হঠাৎ মজাই পেল এবার।—হুঁ? আদারওয়াইজ ইউ উইল গো টু কোর্ট অ্যান্ড মেক এ বিগ স্ক্যান্ডাল আউট অফ ইট? মোহনের উকিল হিসেবে আমার বিরুদ্ধে মামলা লড়বি?

নন্দিতা বাবার চোখে চোখে চেয়ে মাথা নাড়ল, তাই।

প্রতাপ বোস এবার হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, নানু-মা, এত লেখাপড়া শিখেও শেষে সেই ছেলেমানুষ রয়ে গেলি? মোহনের হয়ে যে মামলা লড়বি, ও তোকে ওর ওকালতনামাটা দিয়েছে তো? আইন পড়ে শেষে নিজেই আইন ভুলে গেলি? ওকালতনামা না পেলে ওর ল ইয়ার হিসেবে কোর্টে যাবি কী করে?

এই খোঁচা শুনে নন্দিতার দুকান গরম হয়ে উঠল। বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো বাবা,